সূচিপত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 01 - 05
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের গৌড় দেশে শ্রীনিত্যানন্দ

বিশ্বনাথ পাহাড়ী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
হীরালাল ভকত কলেজ
Email ID: biswanathpahari96@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
সংস্কৃতি, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, স্বরূপ, বৈষ্ণব, জাতি ধর্ম, আন্দোলন।

Abstract
অকৈতব প্রেমকে অবলম্বন করেই ধর্ম-বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে একাত্ম করে তিনি এক বিশেষ সামাজিক ধর্মীয় সাম্যবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ সকলকে দিয়েছিলেন একটি বীজমন্ত্র, তা হল ভালোবাসার। এই প্রবাহে মধ্যযুগের বঙ্গ-সংস্কৃতিতে নিত্যানন্দের দধি-চিঁড়া মহোৎসব ধর্মান্দোলন ক্রমশ গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এবং এই গণ-আন্দোলনই পরবর্তী কালে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ রোপণ করেছিল।

Discussion

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবকাল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায়। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই মধ্যযুগে বাঙালির জাতীয় জীবনে নবযুগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে এই চৈতন্য সংস্কৃতি মুহ্যমান বাঙালিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। চৈতন্য-প্রবর্তিত আন্দোলন ধর্মভিত্তিক হলেও এর ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল। সে কারণেই বাঙালির দীর্ঘকালীন মূর্ছাভঙ্গ ও নবচেতনা সঞ্চারের কাল হিসেবে এই পর্যায়কে অভিহিত করা চলে। বাঙালি সংস্কৃতির দু'টি ধারার যে মিলন ঘটেছিল, এখানে তা কোমল ও ললিত ভাবধারায় সঞ্জীবিত হয়। প্রেম ও ভক্তির ভাবরস প্রবাহে বাঙালি নিজের মুক্তিমন্ত্র শুনতে পায়। অন্যদিকে, রাজশক্তি হারিয়ে বাঙালি যে হীনমন্যতায় ভুগছিল, সে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলেও, ভাবের দিক থেকে চৈতন্য মহাপ্রভু বাঙালিকে উদ্ধার করেন। আর এই কারণেই চৈতন্য প্রবর্তিত এই ধর্ম আন্দোলন একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বটে। এই আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতি তার আত্মসম্মান ফিরে পায়। পরাজিতের মনোভাব থেকে মুক্তি আর চিত্তের গভীর ভাবপ্রবণতায় নতুন মূল্যবোধের অনুসন্ধান বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নবদ্বীপের প্রেম সাধক শ্রীচৈতন্য ও বীরভূমের একচাকার তন্ত্রবেদান্ত দীক্ষিত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের মিলন আশ্চর্যজনক হলেও যুগের প্রয়োজনেই। নিত্যানন্দের জীবনধারা প্রমাণ করে ভাবযোগী শ্রীচৈতন্যের তুলনায় তিনি অনেক অংশে বাস্তববাদী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁকে আপামর জনসাধারণ, নর-নারীর বোধের সীমানাই এনেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্যের মত বন্ধনমুক্ত ভাববাদী সন্ন্যাসীর কাছে ধর্মপ্রচারের ব্যবহার দিকটি অবহেলিত ছিল। কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা এবং প্রায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের ১৮ বছর দিব্য ভাবের মধ্যেই কেটেছিল। এর প্রেক্ষিতেই প্রয়োজন হয়েছিল ভক্তরূপ চৈতন্যের আদর্শ প্রচারের কর্মবীর নিত্যানন্দকে। বাস্তববাদী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ভক্ত স্বরূপ নিত্যানন্দ তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভক্তিরসদীপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডল। মহান্ত গোস্বামীদের সাধনপীঠ, বৈষ্ণবীয় সংকীর্তন, সাধনবিধি ও মোচ্ছব। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন নিত্যানন্দ। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিরন্তর প্রয়াসে। আসলে চৈতন্যদেবের মত প্রেমের উচ্চ সাধকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ তেমন ছিল না, কেননা তিনি এক উচ্চ সমাজে বাস করছিলেন। তিনি কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হওয়ার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নীলাচলে চলে যান। যাওয়ার আগের কয়েক বছরের মধ্যে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী নির্মাণ করেছিলেন। যে গোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন মুখ্য এবং তাঁর পার্ষদরা ছিলেন গৌণ। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাওয়ার পর গৌড় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ভার পরেছিল নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের ওপর। নিত্যানন্দ পেরেছিলেন নবদ্বীপ তথা বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে। নিত্যানন্দের গুরু ছিলেন, কৃষ্ণ অবতার শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু তিনি গৌড় বাংলায় চৈতন্যদেবের নাম সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতে করতে নিজেই সাধারণ মানুষের কাছে গুরু বা নেতা হয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণেই নবদ্বীপ তথা বাংলায় নিত্যানন্দের জয়গান করা হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাসও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে গুরু নিত্যানন্দের জয়গান গেয়েছেন। তাই কবি বৃন্দাবন দাস বলছেন—

> "চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
> চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে।।
> নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
> নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভক্ত তত্ত্ব জানি।।
> সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।
> সভে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্ত পদ পায়।।"[১]

চৈতন্যভাগবতের শেষ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। নিত্যানন্দ মহিমা, নিত্যানন্দ তত্ত্ব, এখানে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে নিত্যানন্দের তত্ত্ব বিবৃতি করেছেন। এই জন্যই চৈতন্যদেব কর্তৃক নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে প্রেরণ। নিত্যানন্দের পানিহাটিতে আগমন ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ। রাঘব গৃহে নিত্যানন্দের প্রেম বৃষ্টি, নিত্যানন্দ ও তার পার্ষদগণের অলংকার ধারণ, এবং গ্রামে গ্রামে স্বপার্ষদ নিত্যানন্দের ভ্রমণ ও কীর্তন, এবং শিশুদেরও প্রেম দান। নিত্যানন্দ নিজের দণ্ড ভেঙ্গে পরে সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দণ্ড ভেঙে চৈতন্যদেবকে একক পরমাত্মা রূপে ভজনা করেছিলেন। অদ্বৈত গৃহে নিত্যানন্দের আগমন, অদ্বৈতের নিত্যানন্দ স্তুতি, নিত্যানন্দের বেশভূষা, নিত্যানন্দ কর্তৃক চোর দস্যুদের উদ্ধার, এইসব নিত্যানন্দের লীলা। তাঁর দ্বারাই চালিত হয় চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ ভজনা করতেন, কৃষ্ণ অন্বেষণ করতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রথম চৈতন্যদেবকে ভগবান কৃষ্ণের জায়গায় বসিয়ে জনগণকে গৌর ভজনা করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি সমাজে অলৌকিক লীলা বন্ধ করে লৌকিক চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করেছিলেন। এই জন্যই চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে পাঠিয়েছিলেন, প্রেম দান করে মূর্খ, নীচ, পতিতাদের উদ্ধার করার জন্য।

> "মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যতজন।
> ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন।।
> আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
> চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে।।"[২]

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কথাকে কেন্দ্র করে ভক্ত কবিরা যে সব কাব্য রচনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-জীবনীসাহিত্য নামে পরিচিত। শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। শ্রীলোচনদাস এর চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, জয়ানন্দ এর চৈতন্যমঙ্গল ও চূড়ামণি দাস এর গৌরাঙ্গবিজয়। গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় রক্ত মাংসে গড়া বাস্তব মানুষ দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের কর্মের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতে শুরু করেছিলেন। এঁরা হলেন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের মূর্তি তৈরী করে প্রজা প্রচার করেন। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার আরম্ভ হইবার পরেও মহাপ্রভু আঠারো বৎসর নীলাচলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের প্রচার ও তাহার ফল মহাপ্রভুর জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ।

তিনি মাস বৈ নিত্যানন্দ গৌড় গেলা
ঘরে ঘরে সংকীর্তণ পাতিলেক খেলা।।
নিত্যানন্দ কহিলেন ভাষ্কর দাস।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তি দেহ গৌড় দেশে।।

প্রচারের সাফল্যের জন্য নিত্যানন্দ প্রভুই রাঢে ও গৌড়ে মহাপ্রভুর মূর্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে পূজা করিবার আদেশ দেন ও ব্যবস্থা করেন। ইহা মহাপ্রভুর জীবিতকালেই নিত্যানন্দ প্রভু করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধারণের মধ্যে যে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি পূজার প্রচলন অদ্যাপি আছে। প্রচারব্যপদেশে এই প্রথার প্রবর্তক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। খেতুরীর মহোৎসব ইহার অনেক পরের ঘটনা।"[৩]

নিত্যানন্দ নিজের সন্ন্যাসী বেশ পরিত্যাগ করে অবধৌত সর্বসংস্কার মুক্ত হয়ে প্রচারে বেরিয়েছিলেন। জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থের বিজয়খণ্ড এ বলেছেন—

"মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রায়ে।
রুণু-ঝুণু কনক নূপুর বাজে পায়ে।।
সুবর্ণ বৈদূর্য্য বিদ্রুম মুক্তাদাম।
ত্রৈলোক্যসুন্দর রূপ দেখি অনুপাম।।
...   .
নানাফুলে বিরচিত গলে দিব্য মালা।
ধরণি আন্দোলে যেন রহি রহি লোলে।।
গ্রামে গ্রামে নগরে সেবক প্রতিঘরে।
চৈতন্য আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে।।"[৪]

সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি রঘুনাথ গোস্বামী; যিনি পানিহাটি দধি চিড়া মহোৎসব খরচ বহন করেছিলেন। কবি জয়ানন্দ তার চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের উত্তরখণ্ডের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এই দধি-চিঁড়া মহোৎসব নিত্যানন্দের মহা-মহোৎসব। তিনি বলেছিলেন আমি জাত-পাতের বেড়া ভেঙে দেবো। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাই একসঙ্গে খাবে। তুমি তাদের খাওয়ার ভার বহন করবে।

"দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে।।
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে।।
চিড়া দধি দুগ্ধ সদেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা।।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন।।"[৫]

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে এই দধি চিড়ামহোৎসব একটি বিপ্লব। এই রকম বিপ্লব আর হয়নি। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে বাংলায় ভয়ঙ্কর কুসংস্কার ঢাকা সমাজে নিত্যানন্দ তাঁর কাজের মাধ্যমে বিপ্লব করেছিলেন। কলিযুগের যুগবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ এই ধরাধামে অনেক দিব্যলীলার দ্বারা বদ্ধ জীবদের ভগবৎ প্রেম ও ভক্তি দান করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। সেরকমই একটি লীলা হল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটি চিড়া-দধি মহোৎসব। আর যাকে ঘিরে এই আনন্দ। তিনি হলেন ষড় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামী। ধনশালী জমিদার পিতার একমাত্র

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রঘুনাথ এইসব ঐশ্বর্য ও বিষয় এর প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। তিনি পত্নীকে ত্যাগ করে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন গঙ্গার তটে এক বটবৃক্ষের তলে বেদীর উপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন কোটি কোটি সূর্যের মতো জ্যোর্তিময়। তাঁকে পরিবেষ্টন করে বহু ভক্ত বসে আছেন। দূর থেকে রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে পড়ে রইলেন। কোনো ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, রঘুনাথ আপনাকে প্রণতি নিবেদন করছেন। সে কথা শুনে নিত্যানন্দ প্রভু স্নেহ বিগলিত ভাবে রঘুনাথ দাস প্রভুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, – রঘুনাথ তুই এতদিন চোরের মতন পালিয়ে থেকে অবশেষে আজ আমাকে দর্শন দিলি। দাঁড়া আজ তোকে আমি দণ্ড দেব। ভক্তগণ শ্রীরঘুনাথ দাসকে শ্রীনিতানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। শ্রীচরণ মূলে রঘুনাথ দাস লুটিয়ে পড়লেন। করুণাময় নিত্যানন্দ অভয়চরণ তার শিরে ধারণ করলেন। সহাস্য বদনে শ্রীনিতানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন— 'তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়া-দধি ভোজন করাও। এ তোমার দণ্ড'। একথা শুনে শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই চিড়া-দধি মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হল। চারিদিকে লোক প্রেরণ করে চিড়া-দধি আনতে লাগলেন। উৎসবের নাম শুনে পসারিগণ চিড়া দই পাকা কলাদি নিয়ে পসার বসাল। শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপর উপবেশন করলেন। তখন তার সামনে চিড়া-দইপূর্ণ সাতটা মৃৎকুণ্ডিকা রাখা হল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চারিপার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দদাস, গদাধর, শ্রীমুরারি, কমলাকর, শ্রীপুরন্দর, ধনঞ্জয়, শ্রীজগদীশ, শ্রীপরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস, হোড়কৃষ্ণ দাস ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ উপবেশন করলেন। নীচে বসলেন অভ্যাগত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণ। গঙ্গাতটে স্থান না পেয়ে কেহ কেহ গঙ্গায় নেমে চিড়া-দই নিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংশ তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের সাথে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন যার মধ্যে রাখাল চন্দ্র, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), মহেন্দ্র নাথ দত্ত এবং অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ঠাকুর বলেছেন—

> "শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। ... শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইয়া বলিলেন— 'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব'।"[৬]

ঠাকুর পানিহাটিতে যেতেন শুধুমাত্র রঘুনাথকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আর নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। এ যুগের বরেণ্য সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর মধ্যযুগের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব হলেন নিত্যানন্দ। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও বুকভরা প্রেম নিয়ে তিনি এসেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন কলি যুগের কীর্তন কেমন করতে হবে।

> "শুনি শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
> কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে।।"[৭]

সমাজ সংস্করণ নিত্যানন্দের বিপ্লব হল পাণিহাটি গ্রামে চিঁড়ামহোৎসব। ঐ মহোৎসবে তৎকালীন যাবতীয় সামাজিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ছত্রিশ জাতকে একসঙ্গে বসিয়েছিলেন। এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়ে তথাকথিত নিপীড়িত মানুষদের স্বর্গীয় সুখ দিয়েছিলেন। গঙ্গার তীরে বটবৃক্ষের নীচে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে নিত্যানন্দ সেদিন সামাজিক সাম্যবাদের বীজ রোপণ করেছিলেন। এই আয়োজিত মহোৎসব মধ্যযুগের বঙ্গ-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঐতিহাসিক চিঁড়ামহোৎসব তথা দণ্ড মহোৎসব পংক্তিভোজনের ফলে হিন্দু সমাজের বুক থেকে জাতিভেদ নামক বিষবৃক্ষের গোড়াটি একচুল হলেও মাটি থেকে আলগা হয়েছিল। সেই অর্থেই নিত্যানন্দ বৈষ্ণব সমাজে অমৃতের বার্তাবাহক রূপেও চিহ্নিত হয়ে আছেন।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, সাহিত্য অকাদেমি, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ১৮৬

২. তত্রৈব, পৃ. ৫১
৩. রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর, বাংলা চরত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, অরুণা প্রকাশন, ২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-০৯, জুলাই ২০১৫, পৃ. ২৫২
৪. মজুমদার, বিমানবিহারী এবং মুখোপাধ্যায় সুখময়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট কোলকাতা - ১৬, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ২২৪
৫. সেন, সুকুমার, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, প্রকাশকাল ১৯৮২, পৃ. ২৬২
৬. নাথ, রাধাগোবিন্দ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্যলীলা), পঞ্চম খণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কোলকাতা- ০৯, প্রকাশ কাল ১৮৮৮, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬
৭. মজুমদার, বিমানবিহারী এবং মুখোপাধ্যায় সুখময়, পূর্বোক্ত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ২৩২

Bibliography:

সেন, সুকুমার, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, প্রকাশকাল - ১৯৮২
মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১ বিধান সরণী, কোলকাতা - ০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৬
ঘোষ, শিশিরকুমার, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কোলকাতা - ০১, প্রকাশকাল – ২০১৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 06 - 17
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : এক অনন্ত জীবন সুধার উৎস

ড. রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলী
Email ID: rubelpalsans513@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Shrimad Bhagwat Geeta, Monu Sanhita, uponishad, karmayog, food habits, Sttaprajna.

Abstract
Shrimadvagbatgeeta, the dialogue between Lord Krishna and Arjuna, has critically been hailed as a treatise on philosophy and Indian ethics. However, the text manifests an exploration of human management in which Lord Krishna appears as a mentor to Arjuna, who was in a state of confusion and dilemma. The dilemma of Arjuna is moral and ethical as it involves dimensions of relationship with kins. Lord Krishna, in his deliberations on duties, consistency, accomplishments of the tasks assigned and selfless actions impart not only motivation and zeal to Arjuna to overcome the dilemma and procrastination, but also guides him to emancipation via selfless devotion.

The purpose of the paper is to explore the psychoanalytic subtext embedded in Shrimadvagbatgeeta by reviewing the sermons of Lord Krishna to Arjuna.

Discussion

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরস্পর মুখোমুখি দুই পক্ষ, একদিকে কৌরবরা, আরেকদিকে পাণ্ডবরা। জীবনের বহু সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে তারা এখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রস্তুত হয়েছে। বেজে উঠেছে তাদের বিভিন্ন পাঞ্চজন্য, অনন্তবিজয়, সুঘোষ, মণিপুষ্পক ইত্যাদি শঙ্খ। বেজে উঠেছে আনক, প্রণব, গোমুখ, সিঙ্গা, ঢাক, ঢোল, কাসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সকলেই এখন পরস্পরের দিকে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে যথাযোগ্য ভাবে প্রস্তুত। এইরকমই এক তুমুল ভয়ংকর পরিস্থিতিতে মহাবীর অর্জুন হঠাৎ করে বলে উঠল আমি যুদ্ধ করবো না। অর্জুন তার স্বধর্মকে বিস্মৃত হয়ে আরো বলতে লাগলো, আমি যুদ্ধ করবো না আমার সারা শরীরে কাঁপুনি হচ্ছে, আমার মুখ শুকিয়ে আছে, গাত্রে জ্বলন হচ্ছে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যাকুলিত হয়ে ভ্রমিত হচ্ছে। অর্জুন বলতে থাকেন, -

“সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।।”[1]

অর্থাৎ এই প্রকারে ভারসাম্যহীনতায় অর্জুনের হাত থেকে তার যুদ্ধের নিমিত্ত যে প্রধান অস্ত্র গান্ডীব, তাও পতিত হচ্ছে। আর এর কারণ স্বরূপ অজুহাত দিতে গিয়ে অর্জুন বললো, সে নাকি যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করতে এসেছে, যাদেরকে পরাজিত করতে এসেছে, তারা সকলেই তার প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-স্বজন। অর্জুনের এহেন বাক্য শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং দৃঢ়চিত্তে অনুভব করলেন যে অর্জুনের এহেন আচরণের পশ্চাতে যে মূল কারণ লুকিয়ে আছে, তা হল অর্জুনের ভীরুতা, কাপুরুষতা, হৃদয়ের দুর্বলতা এবং স্বধর্মের বিস্মৃতি। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাঙ্খ্য-যোগ থেকে অন্তিম অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষসন্ন্যাস-যোগ পর্যন্ত অবশিষ্ট তার প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্য দিয়ে অর্জুনের জীবনের এই সমস্যা, তার মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা দূর করার প্রয়াস করেছেন এবং অন্তিমে তিনি অর্জুনকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এরই পরিনাম স্বরূপ অর্জুন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার এই আচরণের পশ্চাতে ছিল তার মোহ, ভয়, দুর্বলতা এবং আত্মবিস্মৃতি। অর্জুন নিজেই তার স্বীকারোক্তিতে বলেন, -

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।"[২]

অর্থাৎ অর্জুন তার দুর্বলতা এবং কাপুরুষতাবশত হারিয়ে ফেলা স্মৃতি ফিরে পেয়েছে, সে এখন স্থিতি লাভ করেছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা মতো যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তার যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে একমাত্র শ্রেয় কর্তব্য। আর আমার মনে হয় এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রেম ও যুদ্ধের শুদ্ধতাকে মাথায় রেখে একটি কথা এই সমাজে খুব বহুল প্রচলিত আছে, প্রেম এবং যুদ্ধের ময়দানে অগ্রগমনই একমাত্র উপায় (Everything is fair in love and war)।

আমরা আজ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বাক্যের দ্বারা কিভাবে অর্জুনের এই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ফিরে এলো এবং অর্জুন একজন প্রকৃত বীররূপে আবার বর্তমান সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হল, তা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ছন্দে ছন্দে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাকে বীর মন্ত্র প্রদান করে তার প্রকৃত ধর্ম বা স্বধর্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, -

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।।
ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।"[৩]

অর্থাৎ অর্থ : হে প্রিয় অর্জুন, এই ঘোর সংঙ্কটময় যুদ্ধস্থলে যারা প্রকৃত জীবনের মূল্য বোঝেনা সেসব অনার্যের মত শোকানল তোমার হৃদয়ে কিভাবে প্রজ্জলিত হল। এই রকমের মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোক থেকে বঞ্চিত করবে এবং পক্ষান্তরে তোমার সমস্ত যশরাশি বিনষ্ট হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই অসম্মানজনক কাপুরুষোচিত হৃদয়ের দুর্বলতাকে পরিত্যাগ করে প্রকৃত বীরের মত আত্মমর্যাদায় উত্থিত হতে উপদেশ দেন।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ আত্মোপদেশ দানের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে সংশয় প্রকাশ করেন যে, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, - এদেরকে হত্যা করলে তার মহাপাপ হবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানদানের মাধ্যমে অর্জুনের অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি অর্জুনকে বুঝিয়ে বলেন যে, অর্জুন যে সংশয় প্রকাশ করছে দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদেরকে হত্যা করার বিষয়ে তা খুবই অমূলক। সে আসলে তাদেরকে কখনোই সে হত্যা করতে পারবে না। কারণ তাদের মধ্যে যে চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অজর, অব্যয় আত্মা আছে, তা অবিনশ্বর। তাকে কখনোই অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, জল দিয়ে সিক্ত করা যায় না, বায়ুর দ্বারা শুষ্ক করা যায় না এবং অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করা যায় না। কৃষ্ণ বলেন, -

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ন চৈনং ক্লেদযন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।”[৪]

বস্তুতপক্ষে সর্বভূতের মধ্যেই এই আত্মা বিরাজমান। তার কোন উৎপত্তি নেই, ধ্বংসও নেই। প্রকৃতপক্ষে এই আত্মা হল শাশ্বত এবং চিরন্তনন। কিন্তু এই শরীর হচ্ছে নশ্বর। তার উৎপত্তি হয় এবং ধ্বংসও হয়। যেমন জামা ছিঁড়ে গেলে আমরা নতুন জামা গ্রহণ করি, পুরানো জামা ফেলে দিই, তেমনি এই আত্মা শরীর জরাজীর্ণ হয়ে গেলে সেই শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে খুব সুন্দর উপমা সহযোগে বলেন, -

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।”[৫]

বস্তুতপক্ষে শরীর যে সব সময় বার্ধক্যের কারণে অথবা রোগব্যাধির দ্বারা জরাজীর্ণ হয় তা নয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য ইত্যাদি ষড়রিপুর আধিক্য হলেও সেই শরীর জগৎ-কল্যাণের নিরিখে জরাজীর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এখানে দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবদের শরীর ও তদনরূপ জরা-জীর্ণ, যা সমাজের জন্য হানিকর ও অকল্যাণকর ছিল। তাই শুধুমাত্র সেই শরীল বা দেহকে নষ্ট করাই এখন অর্জুনের শ্রেয়, কিন্তু যেহেতু সেই শরীরের অন্তর্গত শরীরী বা দেহীকে অর্জুন কোনমতেই নষ্ট করতে পারবে না, অতএব সে বিষয়ে অর্জুনের চিত্ত ধীর এবং শান্ত হওয়া উচিত। কোন মতেই অর্জুনের মন বা চিত্ত শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে বলেন, -

“দেহিনোস্মিন্যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।”[৬]

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে। ধরা যাক জগতের কল্যাণের নিমিত্ত বিনামাইট প্রভৃতি বোমার আবিষ্কার বিজ্ঞান করেছে। অর্থাৎ বোমার মধ্যে যে শক্তি আছে তা জগৎ কল্যাণের নিরিখে শুভশক্তি। কিন্তু আমরা দেখি এই কিছু কিছু তোমাকেই আবার জগতের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়। বিশেষত মানুষকে মারার জন্য কখনো কখনো এই বোমার শরীরকে বিকৃতভাবে নির্মাণ করে জনবহুল স্থানে রেখে দেওয়া হয়। তখন কিন্তু এই বোমাকেই জগৎ কল্যানের নিমিত্ত বোম-স্কয়ারের বিশেষ প্রশিক্ষকদের দ্বারা নিষ্ক্রিয় করতে হয়। তেমনি আমরা যদি গীতার প্রেক্ষাপটে কৌরবদের দ্বারা সমাজের প্রতি যে অত্যাচার, তার বিচার ও বিশ্লেষণ করি এবং সেই দিকে নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে খুব সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারব, তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই কৌরবরা ছিল সমাজের কাছে এক-একটা বিষাক্ত বোমা। সুতরাং অর্জুনদের দ্বারা এই ধরনের অশুভশক্তির বিনাশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা ছিল তৎকালীন সমাজের কল্যাণের নিরিখে অত্যাবশ্যক এবং প্রাসঙ্গিক কার্য। আর তাই শ্রীকৃষ্ণ তার এই মূল্যবান আত্মোপদেশ দানের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে সেই অশুভশক্তির বিনাশের জন্য প্রেরিত এবং প্ররোচিত করেন। এবং এরই মাধ্যমে অর্জুনকে সকল বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেতে যথাযথ সাহায্য করেন।

শুধু আত্মোপদেশ নয়, জীবনের যেকোনো অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরো নানান উদাহরণ ও উপদেশ দিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার উপদেশ দেন। তাই তিনি সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, ভয় এবং ক্রোধে অর্জুনের মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে নিষেধ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, -

“দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।”[৭]

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ করতে বলেন, যার ফলে তাকে কোন পাপের ভাগী হতে হবে না। এইভাবেই জীবনের সফলতায় এবং বিফলতায় যদি অর্জুন স্থির থাকতে পারে তবেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সে একজন প্রকৃত যোগী হয়ে উঠতে পারবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে এইভাবে খুব সরল উপায়ে যোগস্থ চিত্তে কর্ম করার উপদেশ দিয়ে বলেন, -

"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।"[৮]

এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মানসিক স্থিতি এবং তার স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে তার প্রকৃত স্বধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্মকে অবগত করান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তিনি প্রত্যেকটি মানুষের গুণ এবং কর্তব্য কর্মের ভিত্তিতেই এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, - এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ বলেন, -

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। ..."[৯]

এই ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্বন্ধে মনুসংহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করে প্রজা সাধারণের রক্ষা করাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, -

"ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে।।"[১০]

এই ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রসঙ্গে মনুস্মৃতিতে আরো বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয় রাজা শুধু নিজের স্বধর্ম পালন করবেন এমনটা নয়, চার আশ্রম এবং চার বর্ণের যে শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম, তা যারা পালন করেন তাদেরকেও তিনি অবশ্যই রক্ষা করবেন। তাই মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্ম-প্রকরণে বলা হয়েছে, -

"স্বে স্বে ধর্মে নিবিষ্টানাং সর্বেষামনুপুর্বশঃ।
বর্ণানামশ্রমানাঞ্চ রাজা সৃষ্টোভিরক্ষিতা।।"[১১]

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা যদি স্বধর্মত্যাগীদের রক্ষা না করেন, তাহলে সেইক্ষেত্রে তার কোন পাপ হবে না। আর এমতাবস্থায় অর্জুনও যদি তার ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে নিজর স্বধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে স্বধর্মত্যাগী কৌরবদের রক্ষা না করেন, তাহলে তার পরিণামের পুন্যই হবে, কিন্তু পাপ কখনোই হবে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার এই ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করিয়ে বলেন যে, তার যুদ্ধ করাই হচ্ছে একমাত্র শ্রেয়। কৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে বলেন, -

"স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।
অথ চৈত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।"[১২]

শ্রীকৃষ্ণ বলেন অর্জুন যদি এই ধর্মযুদ্ধ না করে, তাহলে সে তার স্বীয়কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মহাপাপ ভোগ করবে। শ্রীকৃষ্ণ আরো স্পষ্টভাবে বলেন যে, তার পক্ষে বহুগুণযুক্ত পরধর্ম পালন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রের বিগুণ স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে নিহত হওয়াও অনেক বেশি সম্মানের। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগে বলেন, -

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাত্।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"[১৩]

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ জীবনের প্রকৃত জ্ঞানদানের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে কিভাবে কর্ম করতে হবে, সেই বিষয়ে প্রকৃত কর্মতত্ত্ব উপদেশ দিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আসক্তিহীনভাবে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেন। এখানে নিষ্কাম কর্ম বলতে অবশ্যই কর্তব্য কর্মকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কোন ব্যক্তি যদি তার কর্তব্যকর্ম যথাযথ পালন করে তবে সে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কখনোই সেই কর্মের ফলের কথা ভেবে ভেবে হতাশগ্রস্থ হয় না। বস্তুতপক্ষে অর্জুন এখানে যে তার কর্তব্যকর্ম ধর্মের রক্ষা করা এবং অধর্মকে নাশ করা সেটা বুঝতেই পারেনি। আর সেই কারনেই সে কর্মের বিভিন্ন ফলের কথা চিন্তা করে হতাশায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলেন তোমার কেবল কর্মেই অধিকার আছে, ফলে নয়।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি।।"[১৪]

এই কর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার 'জ্ঞানযোগে' কর্মের প্রকারভেদ সম্বন্ধে অবগত করিয়ে বলেন, -

"কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।"[১৫]

অর্থাৎ সাধারণত তিন প্রকার কর্ম এই পৃথিবীতে মানুষ করে থাকে, - সকাম কর্ম, বিকর্ম বা জগতের পক্ষে অকল্যাণকর কর্ম এবং অকর্ম অর্থাৎ উদাসীন কর্ম কর্মত্যাগ। কিন্তু যে ব্যক্তি এই তিন প্রকার কর্ম করা সত্ত্বেও কর্মফলে আসক্তি রাখেনা অর্থাৎ কর্ম বন্ধনে লিপ্ত হয় না, তার কর্মই নিষ্কাম-কর্মরূপে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায় বলেছেন, -

"ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ।।"[১৬]

বস্তুতপক্ষে এইভাবে কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে কোন ব্যক্তি যদি কর্মকে কর্তব্য মনে করে কর্ম করে যান, তাহলে তিনি কখনোই এই পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীত পরিস্থিতিতেও হতাশগ্রস্থ বা দ্বিধাগ্রস্ত হন না। এরকম বিপরীত পরিস্থিতিতে তিনি জীবনের মূল সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে কখনোই পাপের ভাগই হন না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, -

"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।"[১৭]

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরব্রত, আত্মজ্ঞান লাভ, ভারসাম্যবজায়, স্থিতপ্রজ্ঞ, স্বধর্মপালন, নিষ্কাম-কর্ম ইত্যাদি নানান উপায়ে জীবনের মূল রহস্য বিষয়ে জ্ঞান দান করতে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের এমন একজন বন্ধু যিনি খুব হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে এইভাবে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, এবং সেটা বাস্তবজীবনে পালন করা, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক বিস্তর। তাই যাতে এই জ্ঞান অর্জুন তাঁর জীবনে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে, তার জন্য তিনি বিভিন্ন যাপন-পদ্ধতি অর্থাৎ উপায় বা কৌশল বিষয়েও অর্জুনকে যথার্থ ভাবে বলতে থাকেন। শ্রদ্ধার দ্বারাই কোন জ্ঞান যথার্থভাবে লাভ করা যায়। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগে বলেছেন, -

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।"[১৮]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যথার্থ শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে, এবং এই অর্জিত জ্ঞানকে নিজের জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল হয় না সে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আপাতো ভাবে যদিও সে কিছুটা পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে, তথাপি তার যথার্থ শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার অভাবে সেই জ্ঞান কখনোই জীবনে কার্যকরী হয় না। এই দুই ধরনের ব্যক্তিই সমাজে বস্তুতপক্ষে অজ্ঞরূপে পরিগণিত হন। এর ফলস্বরূপ এই ধরনের অজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মন সর্বদা সংশয় বা দ্বন্দ্বের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। হরি নামে এই ধরনের দ্বন্দ্বের ফলে সেই ব্যক্তি কখনোই ইহলোকে বা পরলোকে সুখ ভোগ করতে পারে না। সুতরাং জীবনকে যদি সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে শ্রদ্ধাবান হয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের মন থেকে সমস্ত প্রকার সংশয় বা দ্বন্দ্বকে দূর করতে হবে। এইভাবে যদি আমাদের জীবনে একটা স্থিরতা আসে, তখনই জীবনের প্রকৃত আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, -

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।"[১৯]

অর্থাৎ যিনি অজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাহীন তিনি নিশ্চিতরূপে সংশয়াত্মা। পরিণামে তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই ধরনের ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে, কোথাও সুখ ভোগ করা সম্ভব হয় না।

এই অজ্ঞতাকে দূর করার জন্য যদি যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে হয়, তাহলে সেই বিষয়ে ভগবান গীতায় আরো তিনটি পথ খুব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। জীবনযাপনের এই তিনটি পথ বা উপায় হল - ১. বিনয় বা অনুগত চিত্ত বা শরণাগতি, ২. পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ জ্ঞানের পিপাসা বা জিজ্ঞাসা, ৩. সেবা। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন, -

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।"[২০]

অর্থাৎ এই তিনটি উপায়ে যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্নশীল হন, তখন সেই সর্বজ্ঞপুরুষ তার সম্মুখে প্রকঠিত হয়ে অর্থাৎ তার অন্তরাত্মায় বিকশিত হয়ে তাকে প্রকৃত জ্ঞানী করে তোলেন।

বস্তুতপক্ষে কোন জ্ঞান অর্জন করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমেই বিশ্বাসপূর্বক, যেখান থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করব সেই বিষয়ের প্রতি বা ব্যক্তির প্রতি আমাদেরকে আস্থা রাখতে হবে। এই অকৃত্রিম বিশ্বাস বা শরণাগতির দ্বারাই যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। এখানে শরণাগতি বলতে অত্যন্ত একাগ্রতার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন, -

"সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"[২১]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে বলছেন, হে অর্জুন তুমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শ্বরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। এখানে তাৎপর্য এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার শরণাগত হতে বলছেন অর্থাৎ তিনি যে কথা বলছেন, একাগ্রচিত্তে সেই কথা শুনে সেই লক্ষ্যে স্থিতধী হতে বলছেন। অর্জুন এখানে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে যুদ্ধ করতে এসেছে। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদেরকে পরাজিত করাই অর্জুনের একমাত্র লক্ষ্য এবং ধ্যান-জ্ঞান হওয়া উচিত লক্ষ্য। আর শ্রীকৃষ্ণের এই প্রদত্ত জ্ঞান তখনই অর্জুন তার জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারবে, যখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত বা শরণাগত হবে। আর তখনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করতে পারবেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত বানীস্বরূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দ্বারা অর্জুন তাঁর জীবন যুদ্ধে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের দ্বারা সুরক্ষিত হবে এবং চির অক্ষয় শান্তি লাভ করতে পারবে।

আমাদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ের জ্ঞান নারান ভাবে বাস্তবায়িত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে খুব স্পষ্টভাবে এটাও বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের এই প্রদত্ত জ্ঞান অর্জুন যেভাবে গ্রহণ করবে, সেই ভাবেই সে তার জীবনে ফল পাবে। যদি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথা মত একাগ্র চিত্তে শরণাগত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, তবেই অর্জুন তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায় খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, -

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।"[২২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেই ভাবেই পুরষ্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতভাবে আমাকে অনুসরণ করে। জ্ঞান লাভের দ্বারা শান্তি লাভের উপায় হিসেবে ভগবান একেই প্রণিপাত বা শরণাগতি বলেছেন।

দ্বিতীয় উপায় হল পরিপ্রশ্ন। অর্থাৎ কোন বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হলে আমাদের মনের মধ্যে সাধারণভাবে একটা ভীতি বা দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তখন সে ভয় বা দুর্বলতার কারণে নিজের জীবনের এই সমস্যাকে দূর করার জন্য কি উপায়, সে বিষয়ে বারংবার প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু এখানে গীতায় আমরা দেখব অর্জুনের মধ্যে এই প্রশ্ন করার মানসিকতা কিন্তু প্রথম থেকেই বিদ্যমান। খাইছে প্রথম অধ্যায় থেকেই তার জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও মনের সংশয়কে দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে বারংবার বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে। আর এইভাবে বারংবার প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই অর্জুন আবার তার জীবনে ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে এবং তার কর্তব্য উপলব্ধি করে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে। আর তৃতীয় বিষয়টি হল সেবা। এই সেবা হল অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রেম থেকে উৎপন্ন জীবনের একটি বিশেষ গুণ, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি নিজেও সন্তুষ্টি লাভ করে এবং অপরেরও সন্তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম হয়। অর্জুনের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সেবাভাব প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিলে। যার ফলে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত জ্ঞান অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পরিণামে জয়ের সুখ পেয়েছে।

জীবনকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে আরেকটি অন্যতম গুণ হল সন্তোষ বা সন্তুষ্টি। শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবী এই প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটি উক্তি করেছেন, - 'সন্তোষের সমান গুণ নাই।' তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
> সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।"[২৩]

অর্থাৎ যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-অনুরাগ ইত্যাদি বিপরীত পরিস্থিতিতেও দ্বন্ধের বশীভূত হন না এবং যিনি কার্যের সাফল্য এবং অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না। আবার এই একই প্রসঙ্গে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলেছেন,-

> "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিত্।
> অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ।।"[২৪]

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে বোঝাতে চাইলেন, যে ব্যক্তি নিন্দা এবং স্তুতি উভয় অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সকল পরিস্থিতিতেই নির্ভীক ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হন। অর্থাৎ তিনি হরিনামে চিরশান্তি লাভ করেন। ভাই এই মহাজগতে মানুষ যতই পায়, আরো বেশি পেতে চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি তার সীমিত অথবা অসীম পাওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই আখেরে সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্য দিয়ে শান্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের উপদেশ শুনেও অর্জুন কিন্তু তার মনের বিভিন্ন সংশয় থেকে সহজে বের হতে পারেননি। অর্জুনের মনে ঘোরাফেরা করতে থাকে নানান প্রশ্ন, যা তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না। অর্জুন যেন আমাদেরই মতো ভাবতে থাকে, কোন মানুষই তো স্বেচ্ছায় পাপাচারে লিপ্ত হতে চায় না। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কেউই চায় না যে, সে দুঃখে থাকুক, খারাপ থাকুক, অসুস্থ থাকুক। কিন্তু তবুও সে চাইলেও এই ধরনের খারাপ থাকা থেকে অর্থাৎ পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারে না। বরং কেউ যেন তাকে পিছন থেকে জোর করে সেই অসুস্থ জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষের জীবনে ভয়ংকর পরিস্থিতি কেন সমুপস্থিত হয়, তা জানার জন্য অর্জুন আবার তার বন্ধু, প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করে -

> "অথ কেন প্রযুক্তোয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
> অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।"[২৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন - হে বাঞ্চেয় (কৃষ্ণ), মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন বলপূর্বকই নিয়োজিত হয়ে পাপাচারণে প্রবৃত্ত হয়?

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর ভাবে মানুষের এই দুঃখ-দুর্দশার কারণ স্বরূপ পাপাচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পশ্চাতে দুটি বিষয়কে উল্লেখ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, -

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।”[২৬]

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতির তিনটি গুণ বিরাজমান, - সত্ত্ব (super ego), রজঃ (Ego) এবং তমঃ (Id)।

এই রজোগুণ থেকে মানুষের মধ্যে কাম এবং ক্রোধের উৎপন্ন হয়। এই কামনার তৃষ্ণা এতই দুষ্পূরণীয় যে, আগুন যেমন কোন খাদ্যেই তৃপ্ত হয় না তেমনি কামনাও অধিক হতে অধিক প্রাপ্তিতে ও তৃপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি যখন কোন এক বিষয়ের জন্য বারংবার চিন্তা করতে থাকে, তখন সেই চিন্তা থেকে আসক্তি জন্মায়। আর এই আসক্তি পরবর্তীতে অতৃপ্ত বাসনায় রূপান্তরিত হয়ে কামনার আগুনে মানুষকে দগ্ধ করতে থাকে। কামনা থেকে উৎপন্ন হয় ক্রোধ, ক্রোধ থেকে প্রচন্ড মোহ। আর এই মোহজনিত অজ্ঞতার কারণেই মানুষ তার নিজের জীবন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়। আর এই আত্মবিসৃত জীবনে তখন আর কোন বুদ্ধি বা বিবেচনা কাজ করে না। এইভাবে কামনা ও ক্রোধের বসবর্তী হয়ে একজন সুস্থ মানুষ ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই রকমই শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে দুঃখ-দুর্দশার কালো মেঘ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের জীবনের এই দৈহিক ও মানসিক ভাবান্তরের ক্রমিক চিত্রটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, -

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাত্ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি।।”[২৭]

এইভাবে ক্রমানুসারে মানুষের জীবনে কিভাবে দুঃখ নেমে আসে শ্রীকৃষ্ণ তা অর্জুনকে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে কাম এবং ক্রোধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন।

উতীকৃষ্ণের এতসব উপদেশ শোনার পরেও অর্জুনের মন চঞ্চল হতে থাকে। বস্তুতপক্ষে মনের ধর্মই হচ্ছে চঞ্চলতা। মন এতটাই চঞ্চল যে, এই মুহূর্তে যদি ঘরের এক কোণে আবদ্ধ থাকে, আবার ঠিক তার পরমুহূর্তে এই মহাকাশের যে কোন গ্রহ-নক্ষত্রে ঘুরে বেড়াতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই মনকে সর্ষের পুটুলির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অতি সযত্নে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা আমাদের মনকে একাগ্র রাখতে হয়। কিন্তু যদি একটুও বেগতিক হয়, এই মন তৎক্ষণাৎ সর্ষের পুটলির বাঁধন খুলে যাওয়ার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনের এই অতিচাঞ্চল্য ধর্ম বিষয়ে অর্জুন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঘ্যানযোগে বলেছেন, -

“যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাত্ স্থিতিং স্থিরাম্।।”[২৮]

অর্থাৎ অর্জুন বললেন - হে মধুসূদন, তুমি যে যোগ (যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ) উপদেশ করলে, আমার মনের চঞ্চল স্বভাববশত আমি তা সত্ত্বেও নিশ্চল স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ কৃষ্ণ যদিও তাকে অনেক জ্ঞান উপদেশ দিলেন এবং সেই জ্ঞান তার জীবনে পালন করার জন্য উপায় বললেন, তথাপি অর্জুন তার মনের চঞ্চলতার কারণে কোন মতেই সাম্যবস্থায় তার মনকে স্থির করতে পারছেন না। তাই অর্জুন বলেই ফেলল যে, তার মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং অত্যন্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বিক্ষেপ উৎপাদক। তার পক্ষে এই মনকে বিষয় বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও কঠিন। অর্জুন বলল, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
OPEN ACCESS A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 06 - 17
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।"[২৯]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের মনের এই দশা দেখে প্রকৃত বন্ধুর মতো প্রথমে তার বক্তব্য ভালো করে শুনলেন এবং মন যে অত্যন্ত চঞ্চল ও তাকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন তা স্বীকারও করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিরন্তর অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই মনকে সংযত করার উপদেশ দিলেন। বস্তুতো পক্ষে অভ্যাসই কোন মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে। অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ তার জীবনের যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত তিনি বৈরাগ্য বা ত্যাগের উপদেশ দিলেন। আমাদের জীবনে অনেক সময় এমন কিছু বিষয় থাকে, যেগুলোকে আমরা তৎক্ষণাৎ ভেবে ভেবেও কোন কুলকিনারা খুঁজে পাইনা। সেই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সেই সমস্যা বহুল বিষয়কে অপেক্ষা কর আবার ত্যাগ করাই একমাত্র শ্রেয়। ঈশোপনিষদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, -

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্।"[৩০]

অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপরের ধনে লোভ না করে, অপ্রয়োজনীয় সম্পদকে ত্যাগ করেই জীবন যাপন করা একমাত্র শান্তিলাভের প্রধান উপায়। তাই এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, -

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।"[৩১]

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন - হে মহাবাহো অর্জুন, এই মন যে দুর্বার ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

তবে এই মনকে বশীভূত করার মাধ্যমে জীবনে শান্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে ভগবান শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন বা অপরের উপদেশ গ্রহণের কথা বলেই অর্জুনকে ক্ষান্ত হননি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কথাও বারংবার এই গীতাতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষ চাইলে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পারে এবং যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে, সেই সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, -

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েত্।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।"[৩২]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তোমার নিজের নিজেকেই উদ্ধার করা উচিত, কিন্তু কখনোই নিজেকে অবসাদগ্রস্থ করা উচিত নয়। কারণ তুমি মনে রেখো আমরা নিজেই নিজের বন্ধু, আবার নিজেই নিজের শত্রু।

বস্তুতপক্ষে যিনি তার ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করে সংযত মনের দ্বারা নিজেকে যেকোন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, তখন তিনি নিজেই তার বন্ধু হন। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কাজ করতে অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের শত্রুরূপে নিজেকে বিপদে ঠেলে দেন।

এই আত্ম-নিয়ন্তন বা আত্মসংযম বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মনুষ্য জীবনে পালনীয় আরো যে অনেকগুলি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল, - পরিমিত আহার, পরিমিত বিহার বা ভ্রমণ, কাজ করার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা, পরিমিত নিদ্রা এবং সঠিক সময়ে জাগরণ। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যান-যোগে খুব সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, -

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।"[৩৩]

অর্থাৎ যিনি পরিমিত আহার বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা জাগরণ নিয়মিত তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

বস্তুতপক্ষে পরিমিত আহার বা বিহার, এই সমস্ত কিছুই করতে গেলে জীবনে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব জীবন প্রকৃতির যে তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজ ও তম, তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সত্ত্ব-গুণ শান্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনাবিল আনন্দের প্রতীক। রজোগুণ জীবনের চঞ্চলতা ও উদ্যমের প্রতীক, আর তমোগুণ অজ্ঞানতা ও হতাশার প্রতীক। আর মনুষ্যজীবনে এই তিন প্রকার গুণের তারতম্য দেখা যায় মূলতঃ তিন প্রকার আহার গ্রহণের ফলে। এই আহার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ভেদে তিন প্রকার। এই প্রসঙ্গে কি তার সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যে আহার গ্রহণ করলে মানুষের জীবনে বল বৃদ্ধি পায় এবং আরোগ্য লাভ হয় তাকেই সাত্বিক আহার বলে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, -

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।"[৩৪]

অর্থাৎ যে সমস্ত আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরল, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম সেগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়।

আবার রাজসিক আহার হল - মনুষ্যজীবনের দুঃখ, শোক এবং রোগ উৎপাদনকারী। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে বলেছেন, -

"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।"[৩৫]

অর্থাৎ যে সমস্ত আহার দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণযুক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর সেগুলি রাজসিকদের প্রিয় হয়। আর তামসিক আহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন, এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না হওয়ার ফলে যে সমস্ত খাদ্য বাসি হয়ে গেছে, যা নিরস, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পূর্বদিনে রান্না হয়ে পর্যুষিত এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধা দ্রব্যসকল তামসিক লোকের প্রিয়। তিনি বলেছেন, -

"যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যত্।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।"[৩৬]

উপরের এই সম্পূর্ণ আলোচনা থেকে আমরা এটা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলাম যে গীতার শুধুমাত্র একটি সনাতনী ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি একটি অনন্ত জীবনের সন্ধানে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার নিরিখে বাস্তবিক সহায়ক গ্রন্থ। এখানে জীবনের প্রতিটি আঙ্গিক তার সে মানসিক স্থিরতা তথা খাদ্যাভ্যাস, এই সমস্ত কিছুই অতি সুচারু ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থটি মানব জীবনের কল্যাণার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রামানিক ও বৈজ্ঞানিক উপজীব্য স্বরূপ।

Reference:

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদ যোগ, শ্লোক ২৯, ৩০
২. তদেব, অষ্টাদশ অধ্যায়, মোক্ষ যোগ, শ্লোক ৭৩
৩. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ২, ৩
৪. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ২৩
৫. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ২২

৬. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ১৩
৭. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৫৬, ৩৮
৮. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৪৮
৯. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ১৩
১০. মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, রাজধর্ম, শ্লোক ৭/১৪৪
১১. তদেব, সপ্তম অধ্যায়, রাজধর্ম, শ্লোক ৭/৩৫
১২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৩১, ৩৩
১৩. তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, কর্ম যোগ, শ্লোক ৩৫
১৪. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৪৭
১৫. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ১৭
১৬. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ২০
১৭. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ২১
১৮. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ৩৯
১৯. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ৪০
২০. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ৩৪
২১. তদেব, অষ্টাদশ অধ্যায়, মোক্ষ যোগ, শ্লোক ৬৬
২২. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ১১
২৩. তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞান যোগ, শ্লোক ২২
২৪. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তি যোগ, শ্লোক ১৯
২৫. তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, কর্ম যোগ, শ্লোক ৩৬
২৬. তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, কর্ম যোগ, শ্লোক ৩৭
২৭. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্য যোগ, শ্লোক ৬২, ৬৩
২৮. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৩৩
২৯. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৩৪
৩০. ঈশাবাস্যোপনিষদ্ মন্ত্র ১
৩১. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৩৫
৩২. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ৫
৩৩. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক ১৭
৩৪. তদেব, সপ্তদশ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ, শ্লোক ৮
৩৫. তদেব, সপ্তদশ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ, শ্লোক ৯
৩৬. তদেব, সপ্তদশ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ, শ্লোক ১০

Bibliography:

উপনিষদ (ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, বাংলা), গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ফোর্থ রিপ্রিন্ট - ২০০৮
জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০০৩
পাল, বিপদভঞ্জন, সাংখ্যকারিকা, সদেশ, প্রথম প্রকাশ, অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪১৭, কলকাতা - ৭০০০০৬
মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, উপনিষদ্ সংগ্রহ, গ্রন্থিক সংস্করণ, কোলকাতা, ১৪১৫

রামসুখদাস, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, সাধক-সঞ্জীবনী, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর- ২৭৩০০৫ (ইন্ডিয়া), ISBN 81-293-0053-2, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা - ১৪১০

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতি শান্তি, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা- ৭০০০০৬, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০০

বসু, অনিলচন্দ্র, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পরিক্রমা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১০

বেদান্তচঞ্চু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর - ২০০৭/c, ISBN-81-247-0615-91

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্লোকার্থসহ গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ISBN 81-293-0439-2, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম-কথিত, প্রথম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর - ২০০৮

সাহা, ঐশানি, শ্রীমাকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স, কলকাতা - ৬, পরিমার্জিত সংস্করণ - ২০১১

স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু, শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, দা ভক্তিবেদান্ত বুক্ ট্রাস্ট, ISBN: 978-93-85986-22-2

AMAL, BRAHMACHARINI, Swami Vivekananda Life ana Teachings (Published on the occasion of 150th birth anniveraary of Swami Vivekananda), Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah, W.B, India, October 2012

Pramananda, Swami, SELF MASTERY, Ramakrishna Math Priting press, Madras-600004, India

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 18 - 42
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রূপগঠনতাত্ত্বিক পর্যালোচনার আলোকে মনসামঙ্গল কাব্য

ড. অরূপা চক্রবর্তী
পি জি ফ্যাকাল্টি, বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়
Email ID: arupachakraborty@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
রূপগঠনতত্ত্ব, স্বরূপ, গঠন, আখ্যান, সাংকেতিক।

Abstract
Eminent professor Ashutosh Bhattacharya has discussed the form and nature of Mangalkabya, one of the most important examples of medieval Bengali literature, in his book 'History of Bangla Mangalkabyo'. In the field of literary history, all researchers have discussed the stories, characters, biographies of poets, etc. of Manasamangal kabya. Some researchers have discussed Manasamangal kabya individually. But it is safe to say that a comparative discussion of the morphology of nine (selected) poets of Bengali Manasamangal poetry has not been done before. Here, I have tried to analyze the differences between these nine poets in terms of the style of writing poetry and the similarities and differences between them in some aspects, with the help of appropriate quotations from their works.

Discussion

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী সাহিত্য ধারার অন্তর্গত মঙ্গলকাব্যগুলি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই কাব্যগুলিতে দেখা যায় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিমতম রূপ। কবিরা অত্যন্ত সাবলীলভাবে তৎকালীন সমাজ ধর্মের বাস্তব রূপটিকে সুস্পষ্ট রূপে মঙ্গলকাব্যগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানসিকভাবে দুর্বল মানুষ পৌরাণিক দেবতাদের কাছে না গিয়ে নিজেদের আত্মিক সন্তুষ্টির জন্যই এই সমস্ত লৌকিক মঙ্গল দেব-দেবীদের সৃষ্টি করেছেন। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের সময়সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন –

> "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম-বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের নামে পরিচিত।"[১]

এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম ও অত্যধিক জনপ্রিয়।

বাংলা ও বাংলার বাইরে মনসামঙ্গলের কাহিনি প্রায় সর্বত্রই নানাভাবে লেখ্য ও মৌখিকভাবে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। মূল কাহিনি বলয়কে অপরিবর্তিত রেখে কবিরা তাঁদের শিল্প সামর্থ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অঞ্চলগত পার্থক্যের জন্য, সমাজগত রূপভেদের কারণে সর্বোপরি সময়ের পার্থক্যের জন্য এই কাব্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি

হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেন ও অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে মূলত তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। যথা -

১। রাঢ়ের ধারা : বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণু পাল

২। পূর্ববঙ্গের ধারা : বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস

৩। উত্তরবঙ্গ বা কামরূপীয় ধারা : তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র

উল্লিখিত কবি ও তাঁদের রচিত কাব্য অবলম্বনে বর্তমান আলোচনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমস্ত গবেষক মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি, চরিত্র, কবিদের জীবনী ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন গবেষক মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের নয়জন (নির্বাচিত) কবিকে নিয়ে এর রূপগঠনতাত্ত্বিক তুলনামূলক আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি বললেই চলে। এখানে কাব্য রচনার রীতির ক্ষেত্রে এই নয়জন কবির স্বাতন্ত্র্য এবং উভয়ের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তা উভয়ের রচনা থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

বস্তুত বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গল কবিদের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষ ধর্মনৈতিক ধারাকে পুষ্ট করে তোলা। বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকতার জন্যই সৃষ্টি হয় সাহিত্যের যুগলক্ষণ। যুগলক্ষণকে স্বাভাবিক সূত্র ধরেই এই ধর্মনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে মঙ্গল কবিরা অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁদের সাহিত্যে ঘটনা বা আখ্যান বিন্যাসে দেখা গেছে সামঞ্জস্য বা ঐক্য। ধর্মীয় আনুগত্যের জন্যই কবিরা দেবতার কাছে নর অর্থাৎ মানুষের পরাজয়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যে। মঙ্গলকাব্যধারায় একই দেব-দেবী কেন্দ্রিক কাহিনি অবলম্বন করার ফলে রচনার বিন্যাস এবং আখ্যানগত বিচার-বিশ্লেষণে সাধারণ ঐক্য দেখা গেছে। তাছাড়া কাব্য রচয়িতাগণ সুনির্দিষ্ট পৌরাণিক আদর্শের সুপরিকল্পিত পরিমণ্ডলেই কাব্যরচনা পদ্ধতিকে রূপ দিয়েছেন। বস্তুত যুগের প্রেক্ষাপটে এবং রচনার বর্গগত সামঞ্জস্যই মঙ্গলকাব্যের সুনির্দিষ্ট যুগশৈলীর ছাঁদ নির্মাণ করেছে।

সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য বিচার আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গল কাব্যগুলির রূপগঠনতাত্ত্বিক আলোচনায় এদের গঠনগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ সম্ভব। সাংগঠনিক আলোচনায় 'স্ট্রাকচার' বা বিন্যাস কোনো বিষয়বস্তুর সামগ্রিক গঠন বোঝায়। ঝোঁকটা এখানে থাকে সামগ্রিকতার উপরে। স্ট্রাকচারের অন্তর্গত উপাদানগুলি শৃঙ্খলিত বিন্যাসে বাঁধা থাকে। গতিশীলতা এবং পরিবর্তন হচ্ছে স্ট্রাকচারের ধর্ম। সেজন্য স্ট্রাকচারকে ব্যাখ্যা করতে হলে এর বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না। নিজস্ব নিয়মেই তার ধর্ম, গতিশীলতা এবং রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামগ্রিক, আভ্যন্তরীণ বিন্যাস, গতিশীলতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা এইসব লক্ষণ যে বিষয়বস্তুতে আছে বা যে বিষয়বস্তুতে এইসব লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় তাকেই প্রচলিত অর্থে স্ট্রাকচার বলা হয়। 'স্ট্রাকচারালিজম' সম্পর্কে ধারণা অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। স্ট্রাকচারাল ভাষাতত্ত্ব থেকে উদ্ভুত কিছু ধারণা এবং নিয়মের প্রয়োগকেই মূলত স্ট্রাকচারালিজম বা গঠনতাত্ত্বিক মতবাদ বলা হয়। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে ভাষাতাত্ত্বিক বিপ্লবের সূচনা করেন এবং যার কিছু উল্লেখযোগ্য ধারণা ক্লদ লেভি স্ট্রাউস নৃতত্ত্বে ও রোলা বার্ত সাহিত্যচিন্তায় প্রয়োগ করেছেন - সেই পরিচয়বাহী চিন্তাভাবনা এখন বিবিধ মানবিক বিজ্ঞানে স্পষ্ট ছাপ রেখেছে।

ভাষাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বাদে অন্য যে বিষয়ে স্ট্রাকচারালিজমের বিশেষ প্রভাব দেখা গেছে সেটি হল সাহিত্য চিন্তা।

> "ভাষার যেমন ব্যাকরণ, গল্পের গঠনেও (উপন্যাস ইত্যাদি সব কাহিনিই এখানে গল্প বলে অভিহিত) তেমন আখ্যায়িকার ব্যাকরণ (grammar of narrative) কেউ কেউ দেখতে চেয়েছেন। কবিতার আলোচনায় বিবিধ উপাদানের (ধ্বনি, অর্থ, ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাদি) জটিল বিন্যাস স্ট্রাকচারালিস্ট পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। এইসব চেষ্টার মূলে আছে একটি নন্দন তত্ত্বের ধারণা- যার প্রধান লক্ষণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> হল একটি বিশেষ ধরনের কলাকৈবল্য, সাহিত্যকে স্বতন্ত্র একটি sign-system হিসাবে দেখা, তার নিজস্বতা এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।"[২]

রূপবাদী বা ফর্ম্যাল সমালোচনারই সাম্প্রতিক পরিণতি এই গঠনাত্মক সমালোচনা। সাহিত্যকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে কিংবা লেখকের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বৈপরীত্যের দিকটিও এই সমালোচনা পদ্ধতিতে দেখা হয়। সাহিত্যের মূল পাঠকে কেন্দ্র করে রচনার অভ্যন্তরীণ গঠনের একটি পদ্ধতি প্যাটার্ণ বা ছককে (pardigm) বুঝবার চেষ্টা করে এবং সেই পদ্ধতিটি কীভাবে সক্রিয় হয় তা লক্ষ করে। এই লক্ষের উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে যে বিচিত্র অর্থ ও তাৎপর্য বেরিয়ে আসে তাকে প্রকাশ করা। এই পদ্ধতির সমালোচকেরা বিশ্বাস করেন বিশেষ প্রসঙ্গে ও পরিবেশে সাহিত্যের ব্যাখ্যা করার চেয়ে সাহিত্য বিশেষের গঠন বৈশিষ্ট্য থেকে তার তাৎপর্য সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা বেশি প্রয়োজন।

ভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যের প্রকাশ হয় বলে ভাষাতত্ত্বকে গঠনবাদীরা সাহিত্যের প্রকাশ রীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁরা প্রকাশের ভঙ্গির ভেতর থেকে ভাষাতত্ত্বনির্ভর একটি বিশেষ আলঙ্কারিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মতে ভাষার বিন্যাসকে যেমন বৈজ্ঞানিক সূত্রে গ্রথিত করে ভাষাতত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সাহিত্যের প্রকাশ রীতির বিন্যাসকে গ্রথিত করে এই গঠনাত্মক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি বিশেষ কবিতার বাক্যগঠনরীতি এবং ধ্বনিবিন্যাস-রীতি কিংবা শব্দবিন্যাস-রীতি লক্ষ করে কবির শব্দ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে কীভাবে নির্বাচনের ক্রিয়া সামগ্রিক সমন্বয়ের দিকে যাচ্ছে তা লক্ষ করাই হবে গঠনবাদীর উদ্দেশ্য।

> "বিশেষ বিশেষ সাহিত্যরূপে একই বাক্য লেখক-পাঠকের প্রথাগত সংযোগ-সূত্র অনুযায়ী তাৎপর্য আনবে। একই বাক্য কবিতার পংক্তিতে এবং সংবাদ-পত্রের পাতায় এই কারণেই ভিন্ন তাৎপর্য আনে।"[৩]

আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান ভাষা ও ব্যাকরণের পাশাপাশি রীতিবিচারের বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি বলে স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞান ও শব্দার্থতত্ত্বের দ্বারা যে রীতিবাদ তার মধ্যে ধ্বনিতত্ত্ব, ছন্দ, রূপতত্ত্ব, অভিদেয়ার্থ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এই রীতিতে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র রচনার যে-কোন একটি অংশ অথবা তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা এবং একের সঙ্গে অপরের সংযোগ বিশ্লেষণের দ্বারা লেখকের মানসিকতা সম্পর্কে সমগ্র রচনায় নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে।

গঠনবাদ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে বিশ্লেষণাত্মক সংযোগের মাধ্যম দেখিয়ে দেয়। এই মতবাদ লেখকের অভিজ্ঞতার বিন্যাসকে সচেতন-বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু সাহিত্য বিশেষের সামগ্রিক ফলশ্রুতির কথা বোধ হয় এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত। গঠনবাদী সমালোচনা যতটা সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া-মুখী ততটা সামগ্রিক আস্বাদনমুখী নয়। প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে, মোটিফগুলিকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েও যে একটি সাহিত্যরূপকে সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রেখে তার উপভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

গঠন শিল্পের দিক থেকে ভাষা ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করার জন্য শিল্পীরা বেশিরভাগ বাক্যের গঠন করেছেন কাব্যের উপযোগী করে। বাক্য দিয়ে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছেন। তারপর ভাষাকে অদ্ভুত সৃজনীপ্রতিভায় গতিদান করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর শিল্প।

> "অবয়ববাদীদের (Structruralists) মতে লেখক, তাঁর সমকাল বা পাঠকের দিকে লক্ষ না রেখে শুধুমাত্র রচনার সংগঠন বিশ্লেষণই শৈলীবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। বিশ শতকের প্রাহা গোষ্ঠী কিংবা নব্য সমালোচকদের (neo-critic) সমালোচনা এরকমই অবয়ব-নির্ভর বিশ্লেষণ।"[৪]

বিশ শতকের শেষার্ধে শৈলী আলোচনার উত্তর-অবয়ববাদী দৃষ্টিকোণ (Post-Structuralism) গড়ে ওঠেছে। লেখকের রচনার ভাষিক সংগঠন বিচার শুধু যে তাঁর রচনার গঠনগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সহায়তা করে তা নয়, একই যুগে প্রচলিত অন্য রচনার তুলনায় তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধর্ম নির্ণয়ে তা সাহায্য করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ব্যক্তির ভাষা স্বভাবত সাংকেতিক নয়, কিছু ব্যক্তির ভাষার সমবায়ে গড়া সামূহিকতা জন্ম দেয় সংকেত ধর্মকে। অবয়ব বা Structuralism একটি বিশেষ কিছুর দিকে নয় কয়েকটি বিশেষকে নিয়ে যে নির্বিশেষ সমগ্রতা গড়ে উঠে সেই দিকেই নিবদ্ধ দৃষ্টি।"[৫]

গঠনাত্মক পদ্ধতি সারাংশ সন্ধান না করে গঠন ভঙ্গিমার দিকে ঝোঁক দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক মূল্যকে বেশি করে গুরুত্ব দেয়। তাই অবয়ববাদী সাহিত্য বিশ্লেষণে বর্ণিত বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্জন করা হয়।

অবয়ববাদীদের আরো বক্তব্য হল, -

> "পাঠ এবং পুনঃপাঠ, চিন্তা এবং আরও নতুন চিন্তার দ্বারা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অবস্থানকে পারস্পরিক সম্পর্কে অন্বিত করা দরকার। ভাষা, নৈসর্গিক রূপচিত্রণ, স্থাপত্য, আত্মীয়তা বন্ধন, বিবাহ বন্ধন, এমনকি গৃহসজ্জার উপকরণ, বিচিত্র কৌশল ও রাজনীতি এসব কিছুই অবয়ববাদীদের আগ্রহের বিষয়বস্তু, আর অবয়ববাদতত্ত্বের উৎসে ছিল ফার্দিনাঁদ দ্য স্যসূরের অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান।"[৬]

স্যসূরের মতে একটি রচনার বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দ সবই পরম্পরাক্রমে আমাদের বিবেচ্য হয়। শব্দগুলি শুরু থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত অগ্রগতিতে একটি ঘটনাপ্রবাহের মতই এগিয়ে যায়। স্যসূরের মতে এই প্রবাহিত অগ্রগতি হল উপরিতলের গঠন, যার গভীর গোপণে বৈপরীত্যের সূত্রে বিরাজ করে অপ্রকাশিত সংকেত। স্যসূর ভাষাকে বিশেষ কালের বিবেচনা করে এ পারম্পর্যকে বর্জন করেছেন।

অবয়ব বিচারকের ধারণা শৈলী বিচারকদের থেকেও আধুনিক। ভাষার ইঙ্গিতধর্ম সম্পর্কে দুই গোষ্ঠীর মতাদর্শ অভিন্ন। অবয়ববাদীদের কাছে কাব্যের শব্দ হচ্ছে ইশারা বা ইঙ্গিত। কবি শব্দকে অঙ্গুলি সংকেতের মত ব্যবহার করে যা বলেন তার চেয়ে বোঝান অনেক বেশি। কবিতায় এই ভাষা বা শব্দ প্রতিমাসদৃশ। কবিতার ভাষার সত্তা মূর্ত এবং এর মধ্যে ধারণা বা কল্পনা সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। পাঠকের চিত্তলোকে উদ্দীপনা সৃষ্টিক্ষম ইমেজ হচ্ছে 'সূচক' এবং পাঠকের বোধ বা কল্পনা হচ্ছে 'সূচিত'। একজন কবি ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া কিছু উপাদান শুধুমাত্র কৌশলে সাজিয়েই তোলেন না, তিনি সৃষ্টিও করেন। কবির কাছে থাকে উপাদান, মনে থাকে উদ্দেশ্য। এই উপাদান ও উদ্দেশ্যর সমন্বয়ে তিনি গড়ে তোলেন একটি 'অবয়ব'। কবিতার অবয়ব বিশ্লেষণ মানে বিচ্ছিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ নয়, সম্পূর্ণ একটি বাক্যের বিশ্লেষণ। লেভি স্ট্রাউসের মতে, একজনের বিশেষ পদ্ধতিতে গড়া অবয়ব অপরকে সেই অবয়বের ভিতরকার উপাদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসু এবং রসিক করে তোলে। কবি সাহিত্যিকেরা সংগঠক উপাদান সমূহের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন করে গড়ে তোলেন কাব্য সাহিত্যের অবয়ব। সুতরাং সাহিত্যিকের সাহিত্যের অবয়ব বিজ্ঞানের মতই গড়ে তোলা সমগ্র একটি রূপ, যার সমগ্রভাবে বিচার হওয়া প্রয়োজন।

গঠনবাদী মতবাদ বা অবয়ববাদ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে বিশ্লেষণাত্মক সংযোগের মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়। লেখকের অভিজ্ঞতার বিন্যাসকে সচেতনভাবে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ গঠনবাদী আলোচনায় লেখকের জীবনের ও লেখকের সময়ের প্রতিফলন হল সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড। এ মতবাদে একটি নির্দিষ্ট ছক বা প্যাটার্ণে আধুনিক জীবনের ছায়াপাত, সাধারণত সময় ও লেখকের জীবনকে মিলিয়ে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করা হয়। তাছাড়া সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ গঠনের তাৎপর্য সমসাময়িক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়েও ব্যাখ্যা করা হয়। গঠনবাদী পদ্ধতিতে আলোচনায় রাঢ়, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ বা কামরূপীয় মনসামঙ্গলের মধ্যে যেমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে তেমনি একই অঞ্চলের প্রত্যেক কবির রচনাও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। এ আলোচনায় শুধুমাত্র ভাষা ও শৈলীগত দিক থেকে মনসামঙ্গলের বিচার করা হয়নি, আখ্যান কাব্য হিসেবে এর সামগ্রিক রূপের গঠনগত বিশ্লেষণও (Structural Analysis) করা হয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের তুলনামূলক বয়ান বিশ্লেষণ আলোচনার প্রধান বিষয়। কবিদের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা নয়, এর মূল উদ্দেশ্য সুবিশাল কালপ্রবাহের মধ্যে ব্যক্তিস্রষ্টার বিশেষ গুরুত্বের অন্বেষণ। অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদারের মতে –

> "মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাবরণে গড়ে ওঠা সাহিত্য তো একটি প্রথাসিদ্ধ সংরূপ (জাঁর)। কাহিনী ঐতিহ্যবাহিত, চরিত্রগুলি পূর্বকল্পিত এবং একান্ত সুনির্দিষ্ট কাব্যগঠন-রীতি।"[৭]

কাজেই এই প্রথাসিদ্ধ ছাঁচের অনুসরণের মধ্যে নিজস্ব শৈলী সৃষ্টির অবকাশ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে মনসামঙ্গলের কবিগণ কতটা প্রথাসিদ্ধ আর কতটাই বা সংরূপ থেকে মুক্তির সন্ধানী, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেই মনসামঙ্গল কাব্যগুলির রূপগঠনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হয়।

মনসামঙ্গল কাব্যের আঙ্গিক বা কাহিনি পরিকল্পনা : আঙ্গিক বিচারে মনসামঙ্গল যৌথ শিল্প। অবয়ব নির্মাণে একদিকে যেমন পৌরাণিক ছাঁচ অনুসরণের চেষ্টা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি লৌকিক উপাদান সংযুক্ত করার প্রয়াসও আলোচ্য কাব্যে লক্ষ করা গেছে। কাহিনি বিন্যাসে স্বল্পাধিক একই রকম পরিকাঠামো অনুসরণ করার ফলে কাব্যের গঠনে পূর্বসংস্কারগত একটি সাধারণ রূপায়ণ পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক ছাঁচে গঠিত মনসামঙ্গল কাব্যের আঙ্গিকের মূলত চতুরঙ্গ বিন্যাস। যথা- বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড, নরখণ্ড বা বণিক খণ্ড।

বন্দনা : মনসামঙ্গল কাব্যে 'বন্দনা' অংশ প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী যুক্ত হয়েছে। সকল উপাস্য দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সাংস্কৃতিক মিলনাকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর বহন করে। সকল মনসামঙ্গল কাব্যেই ইষ্টদেবতা মনসার পাশাপাশি পৌরাণিক দেবতা গণেশ সহ অন্যান্য দেবদেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এমনকি চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গলের কবি জীবন মৈত্র ও কেতকাদাসের কাব্যে চৈতন্যদেবও দেবদেবীদের মতো বন্দিত।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ : আলোচ্য অংশে প্রকৃতপক্ষে কবির আত্মপরিচয় ও কাব্য রচনার কারণ বর্ণনা করা হয়। স্বপ্নাদেশ বা দৈব নির্দেশে যে কাব্য রচিত হয়েছে, তার উল্লেখ মনসামঙ্গলে রয়েছে। বিজয়গুপ্ত, দ্বিজবংশী দাস, জীবন মৈত্র, বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে দৈবাদেশের উল্লেখ রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এই দৈবাদেশ লোকস্বীকৃতি লাভের কৌশল হিসেবেও কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির চিত্রও এখানে সংযোজিত হয়েছে।

দেবখণ্ড : পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সম্বন্ধস্থাপন এই অংশের মূল কথা। পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, সৃষ্টি রহস্য, শিব বীর্যে মনসার জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি বর্ণিত। কোন মনসামঙ্গলে দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের ঘরে উমার জন্ম, শিব-পার্বতীর বিবাহের ঘটনাও বর্ণিত। এসব অংশে পৌরাণিক দেবতা শিবের প্রাধান্য লক্ষিত। পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মিলনের জন্য সকল কাব্যকারকেই শিবের উপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং মনসাকে শিবের মানসকন্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে।

নরখণ্ড বা বণিকখণ্ড : স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের কাহিনিগত মিল নরখণ্ডের পরিকল্পনায় লক্ষ করা যায়। এ খণ্ডের মূল বিষয় হল শাপভ্রষ্ট দেবতার মর্ত্যে আগমন এবং মর্ত্যে এদের দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা প্রচার। মনসামঙ্গলের বেহুলা-লক্ষীন্দর প্রকৃতপক্ষে উষা-অনিরুদ্ধ। লৌকিক কিছু বৈশিষ্ট্যও মনসামঙ্গলগুলিতে যুক্ত হয়েছে। যেমন- বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, কাঁচুলি নির্মাণ ইত্যাদি। এইভাবেই পৌরাণিক জীবনাদর্শ, দেব মহিমার সঙ্গে আর্যেতর লৌকিক সংস্কার সমন্বিত হতে পেরেছে।

মনসামঙ্গলের কাহিনি কবিদের নিজস্ব কল্পনার ফসল নয়, প্রথাগত ঐতিহ্যের অনুসরণ। ঐতিহ্যের ধারায় যে কাহিনি কবিদের কাছে এসে পৌঁছায় তাকে মান্য করাই ছিল যুগোচিত প্রথা। প্রচলিত সংরূপের বন্ধনের মধ্যে থেকেও কবির ব্যক্তিশৈলী নিজস্বতা প্রকাশ করতে চায়। গতানুগতিক কাহিনির মধ্যেও কবিগণ আঙ্গিকের অভিনবত্ব আনতে চান। কারণ প্রথা মানা ও প্রথাকে অতিক্রম করার প্রয়াস - এই দুই বিরুদ্ধ প্রবণতায় কাব্যের আখ্যান গঠিত।

প্রকাশরীতির ভিন্নতা : প্রকাশরীতি বলতে শিল্প সাহিত্যের জগতে কবির শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রিয়া অর্থাৎ রচনা কৌশলকে বোঝায়। একই রচনা ব্যক্তিভেদে প্রকাশের ভিন্নতার জন্য রচনাগত বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। এই রচনা প্রকাশ ব্যক্তিভেদে সর্বক্ষেত্রেই বিভিন্ন হয়। আলোচ্য মনসামঙ্গল কাব্যগুলির বিষয়বস্তু, চরিত্র নির্মাণ এবং রচনার উপাদান মোটামুটি কাছাকাছি সময়ের ও বিষয়ের। কিন্তু কবিদের মধ্যেকার প্রকাশগত ভিন্নতা একই বিষয় প্রকাশকে পরস্পর থেকে ভিন্ন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে দিয়েছে। প্রকাশ রীতিগত পার্থক্য একজনের রচনার সঙ্গে যেমন অন্যজনের রচনাকে পৃথক করেছে, তেমনি তাঁদের নিজস্ব রচনা বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করেছে। এখানে মনসার জন্ম বর্ণনায় প্রত্যেক কবির প্রকাশ রীতির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

১। "সুরঙ্গে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সন্দি
মহারস পাতালে নামিল।
প্রবেশিল পাতাল পুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা সুন্দর দেখিল।।"[৮]

২। "বাসুকি বোলে নির্ম্মালি সুনহে উত্তর।
মহাদেবের বির্য্যে কন্যা গোটা নির্ম্মাণ কর।।
চারিখান হস্ত দেহ তিন নঞান।
সিবের লক্ষণ করি করহ নির্ম্মাণ।।
এত সুনি নির্ম্মালি হুঙ্কার মারিল।
ততক্ষণে পদ্মাবতি নির্ম্মাণ হইল।।"[৯]

৩। "কদ্রুর কোলেতে জন্ম অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ।
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অর্দ্ধ ভাগ।।
নাগের লক্ষণ ধরে শিরে অষ্ট ফণা।
রক্ত গৌর কান্তি অঙ্গ অতি সুলক্ষণা।।
নাগ অলঙ্কারে বস্ত্রে করিয়া সুবেশ।
নানা আভরণে পুনঃ সাজিল বিশেষ।।
দেখি সুলক্ষণা কন্যা অতি শুদ্ধ চারু।
বিলক্ষণ নাম ব্রহ্মা থুইল জরৎকারু।।"[১০]

৪। "জোতির্ম্ময় দীপ্তকরে দেখিল নির্মানি
ধেয়ানে জানিল চন্দ্র এড়িল শূলপাণি।
নিমিষে জানিলা সেই জাতক কারণ
শিবের নন্দিনী হৈলা মনসা-জনম।
ভাবিয়া পরম শিক্ষা জানিল ধেয়ানে
প্রথমে মৃণাল সহ বপুর সৃজনে।
হৃদয় জঠর স্থান নির্মাণ করিল
উরুযুগ কণ্ঠ চারু পয়োধর হৈল।
...
জীবন্যাস করিয়া মনসা থুইল নাম"[১১]

৫। "এসে বিন্দু মহেশ্বর
এসে কালিদহের জল
তার বিন্দু মেড়ের উপর।
পাত্র পাঠাইয়া বিন্দু আনাইয়া

থুইল বিন্দু বাসকির বরাবরি।
গায়ের রুধির চিরি দিল
তায় রস মিলাইল
তায় জন্মিল মনসা কুঙরি।”[১২]

৬। “গড়িয়া পড়িল বীর্য বাসুকির কোলে।
যত্নে বাসুকি লয়্যা থুইল তাম্র-খোলে।।
বাসুকি আনিঞা দিল বিধাতার স্থান।
বিধাতা পাইয়া তাহা করিল নির্মাণ।।”[১৩]

৭। “মহাদেবের মহাবিন্দু আসিঞা মিলিল।।
তখনি বাসুকী নাগ কোন কর্ম করে।
জল সেচন করে মাংসপিণ্ডের উপরে।।
আগে নাক মুখ পাছে অষ্টাঙ্গ হইল।
প্রসবিল মনভাবে মনসা নাম থুইল।।”[১৪]

৮। “শঙ্করের বীর্য্য জ্বলে কমলের পত্রদলে
জন্মিলেন দেবী বিষহরি।।
বিন্দু থুইল হর জলের সে উপর
শতদল কমল উপরি।
মৃণালের বিন্দু দিয়া শিবের বীর্য্য যায় ধায়া
যায়া পাইল রসাতল পুরী
শঙ্করের বীর্য্য জয় অক্ষয় সে অব্যয়
জন্মিল দেবী বিষহরি
সর্ব্ব গায়ে অভরণ করিয়া সে ভূষণ
অপরূপ অতি সে সুন্দরী।।
পাইয়া সে বাসুকী হইলেন মহাসুখী
পুষিলেন নিজ ভগ্নী করি।
করিলেন নাড়ী ছেদ করিল সে কর্ণবেধ
নাম থুইল জয় বিষহরি।।”[১৫]

৯। “পদ্মের মৃণাল বঞাঁ পাতালে পশিল জাঞাঁ
শিব বীর্য্য [গেল] নাগপুরী।।
বাসুকি পাইঞাঁ তারে পরম যতন করে
যত্ন করি করিল নির্ম্মান।”[১৬]

অধিবাচনিক সংগঠন : text বা বয়ান হল ভাষার অর্থগত একক, কোন ব্যাকরণগত একক নয়। বয়ান বাক্যের থেকে বৃহত্তর কোন অধিবাক্যিক একক। অধিবাচনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন রচনার বিশ্লেষণ আধুনিক শৈলী বিজ্ঞানের একটি

অন্যতম লক্ষ্য। এরকম বিশ্লেষণে বাক্যের স্তর অতিক্রম করে শৈলীবিজ্ঞানীকে বয়ান বা 'text' এর উপর নির্ভর করতে হয়।

মনসামঙ্গল কাব্য : অধিবাচনের স্বরূপ : আখ্যানমূলক আধিবাচন (narrative discourse) হিসাবেই প্রধানত মনসামঙ্গলের স্বীকৃতি। লৌকিক দেবতার মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কাব্যের আখ্যানটি তৈরি। আখ্যানমূলক অধিবাচনের বিশ্লেষণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে শৈলীবিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন।
ক। আখ্যানের সংগঠন (structure of narrative events) মনসামঙ্গলের আখ্যানটির সংগঠনে রাঢ়, পূর্ববঙ্গ ও কামরূপীয় মনসামঙ্গলের কবিগণ নিজস্বতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মূল আখ্যানের অবয়ব মোটামুটি এক রেখেও তাদের কাব্যে আখ্যান সংগঠনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

কাব্যের গঠন : মূল কাহিনি দুটি - শিব-পার্বতী ও মনসার কাহিনি, চাঁদ-মনসা ও বেহুলার কাহিনি। সূক্ষ্ম বিচারে কবিদের কাহিনি সৃষ্টির দিক থেকে বৈচিত্র্য রয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের আখ্যানের গঠনের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের গঠনগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিজয়গুপ্ত :
১। বন্দনা
২। স্বপ্নাধ্যায় পালা
৩। দেবখণ্ড - মনসার জন্ম পালা, চণ্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ, মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার, পদ্মার বিবাহ, বিচ্ছেদ পালা, সমুদ্র মন্থন, পদ্মার বনবাস।
৪। নরখণ্ড - রাখয়াল বাড়ীর পূজা, কাজির সহিত যুদ্ধ, গুয়াবাড়ী কাটা পালা, মহাজ্ঞান হরণ, সঙ্কুর গাড়রি নিধন, ছয় কুমার বধ।। ঝাল বাড়ী পূজা, বরের পালা, অনিরুদ্ধ উষাহরণ ও যমযুদ্ধ, চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন, বস্ত বদল, ডিঙ্গা বুড়ান, চাঁদের অবস্থা ও লক্ষীন্দরের জন্ম, লক্ষীন্দরের বিবাহের জুড়নি, লোহার বাসর ঘর গঠন, লক্ষীন্দরের বিবাহ, লক্ষীন্দর দংশন, ভাসান, জিয়ান প্রভৃতি।

নারায়ণ দেব :
১। বন্দনা
২। দেবখণ্ড - বৃষের সজ্জা ও শিবের যাত্রা, ভবানীর বিলাপ, চণ্ডীর ডুমনী-বেশ ধারণ (ডুমনী-সংবাদ), নেতার জন্ম, পদ্মার জন্ম।
৩। নরখণ্ড - পদ্মা-পূজা প্রচারের সূচনা, বেহুলা-লক্ষীন্দরের জন্ম বিবরণ ও মনসাদেবীর যমরাজার সঙ্গে যুদ্ধ, উষা-অনিরুদ্ধকে মর্ত্তলোকে আনয়ন, চন্দ্রধরের বাণিজ্য-যাত্রা, চন্দ্রধরের দক্ষিণ পাটন আগমন, চন্দ্রধরের বদল-বাণিজ্য, চন্দ্রধরের পাটন হতে স্বদেশ যাত্রা, মনসাদেবী কর্তৃক চন্দ্রধরের চৌদ্দডিঙ্গা ডুবান, ডিঙ্গাডুবির ফলে চন্দ্রধরের দুর্দ্দশা, চন্দ্রধরের স্বগৃহে আগমন, ভাটের বর্ণনা শ্রবণে লখাইর বিবাহ অভিলাষে চন্দ্রধরের উজানি নগর যাত্রা, বেহুলাকে পদ্মাদেবীর ছলনা, বেহুলার লোহার তণ্ডুল রন্ধন, চন্দ্রধরের সঙ্গে সাহে রাজার যুদ্ধ, সাহে রাজা ও চন্দ্রধরের মিত্রতা, কসাই কামারের উপর মনসাদেবীর ক্রোধ, বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিবাহ ও মনসাদেবীর প্রতাপ, বিবাহ উপলক্ষে বেহুলার সাজসজ্জা ও বিবাহ অনুষ্ঠান, বেহুলার বিবাহে তারকা রাণীর রন্ধন, নারীগণের হাস্য পরিহাস ও বাসি বিবাহ, চাঁদ সদাগরের স্বদেশে প্রত্যাগমন, লোহার বাসর ও মনসাদেবীর কোপ, লক্ষীন্দরকে কালনাগিনীর দংশন, বেহুলার বিলাপ, সনকার রোদন, চাঁদ সদাগরের ক্রোধ, ভেলা নির্ম্মান, বেহুলার বিদায় গ্রহণ, লক্ষীন্দরের মৃতদেহসহ বেহুলার ভেলা ভাসান, প্রথম বাঁকে মনসাদেবীর পরীক্ষা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ ও বিভিন্ন বাঁকের বিবরণ, নেতার সঙ্গে বেহুলার সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহলাভ, শিবের নিকট বেহুলার অনুগ্রহলাভে নেতার প্রচেষ্টা, শিবের আদেশে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, দেবসভায় বাদানুবাদ, লখাইর পুনরায় জীবনলাভের বিবরণ, চৌদ্দ ডিঙ্গাসহ

বেহুলা-লখাইর যাত্রা, চন্দ্রধর কর্তৃক পদ্মা-পূজার উদ্যোগ, চন্দ্রধরের পদ্মা-পূজা, বেহুলার পরীক্ষা, বেহুলা-লখাইর উজানি নগরে গমন, বেহুলা-লখাইর স্বর্গারোহণ প্রভৃতি।

দ্বিজবংশী দাস :

১। বন্দনা - গণেশ বন্দনা, নারায়ণ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, ভবানী বন্দনা, পদ্মা বন্দনা, ব্রহ্ম বন্দনা, দশ অবতার বন্দনা, সর্ব্বদেব বন্দনা প্রভৃতি।

২। গোত্রাবলী

৩। দেবখণ্ড - সৃষ্টি প্রকরণ, সমুদ্র মন্থন, দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, মদন ভস্ম ও হরিহর একাঙ্গ, পার্ব্বতীর জন্ম ও তপস্যা, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবপুরী নির্মাণ ও গুহ গণেশের জন্ম, শিবের পুষ্পবাটী গমন ও মহামায়ার মায়া, নেত্রাবতী ও পদ্মাবতীর জন্ম, পদ্মার প্রথম পূজা, পদ্মা নিয়ে শিবের গৃহে আগমন, পদ্মাবতীর বিবাহ, নেত্রাবতীর বিবাহ, জরৎকারু মুনির পদ্মা পরিত্যাগ প্রভৃতি।

৪। মানবখণ্ড - আদি প্রসঙ্গ, কাজির বিড়ম্বনা, বিবাদের অঙ্কুর, পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ, তক্ষক ধন্বন্তরির কথা, সর্পসত্র, ধন্বন্তরি বধ, চন্দ্রধরের ছয়পুত্র বধ, বাণিজ্যের উদ্যোগ, অভিশাপ, বাণিজ্যে যাত্রা, চন্দ্রধরের বন্ধন, লক্ষীন্দর ও বেহুলার জন্ম, নারিকেল ভক্ষণ, চন্দ্রধরের বাণিজ্য, ডিঙ্গা ডুবানের আয়োজন, ডিঙ্গা ডুবি, চন্দ্রধরের নানা দুর্গতি, বিবাহের যোড়নী, লৌহ গৃহ নির্ম্মাণ, বর যাত্রা, বিবাহ, লক্ষীন্দরের মৃত্যু, দেবপুরে গমন, দেবতার বিচার, পুনর্জীবন, পূজা, স্বর্গারোহণ।

বিপ্রদাস পিপিলাই :

১। প্রথম পালা - গণেশ বন্দনা, পঞ্চ দেবতার বন্দনা, আত্মপরিচয়, কাহিনি সংক্ষেপ, সৃষ্টিতত্ত্ব, শিবের ধর্মপূজা, শিবের পুষ্পবন গমন, ডুমনী সম্বাদ, শিবের কাঁচুলি নির্মাণ, মনসার জন্ম, কদ্রু-বিনতা-গরুড় কাহিনি, চণ্ডী-মনসা বিবাদ, মনসাকে সিজুয়া পর্বতে নির্বাসন দান, নেতা ও ধামাইর জন্ম।

২। দ্বিতীয় পালা - বিশ্বকর্মার পুরী নির্মাণ, মনুরথ-কপিলা কাহিনি, দুর্বাশার অভিশাপ, লক্ষীর সমুদ্রের ভিতরে যাত্রা, সমুদ্র মন্থন, দেবাসুরের যুদ্ধ।

৩। তৃতীয় পালা - বিষের জন্ম, শিবের বিষপান, ভবানীর শোক, শিবের মৃত্যু বার্তা, মনসার আগমন, বিষঝাড়ন, মনসাকে শিবের বরদান, মনসার বিবাহ, নেতার বিবাহ, মনসাকে পরিত্যাগ, মনসার মিনতি, আস্তিকের জন্ম।

৪। চতুর্থ পালা - রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষকের দংশন, জন্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ, রাখাল বালকদের মনসাপূজা, হাসন-হোসেন প্রসঙ্গ।

৫। পঞ্চম পালা - হাসন-হোসেনের মনসাপূজা, জালু-মালু প্রসঙ্গ, চাঁদের নাখরা বন ধ্বংস, মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ।

৬। ষষ্ঠ পালা - ধন্বন্তরি বধ।

৭। সপ্তম পালা - ধনা-মনা প্রসঙ্গ।

৮। অষ্টম পালা - চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনি।

৯। নবম পালা - চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা।

১০। দশম পালা - লক্ষীন্দরের জন্ম, চাঁদের বিদায় গ্রহণ, চাঁদের ডিঙ্গাডুবি, চাঁদের বিড়ম্বনা।

১১। একাদশ পালা - চাঁদের প্রত্যাবর্তন, লক্ষীন্দরের বিবাহের উদ্যোগ, বেহুলাকে মনসার ব্রাহ্মণী বেশে অভিশাপ, বেহুলার লোহার কলাই রন্ধন।

১২। দ্বাদশ পালা -।। জাগরণ আরম্ভ।। বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিবাহ, বাসর ঘরে লক্ষীন্দর দংশন, বেহুলার শোক, মাঞ্জাস নির্মাণ, বেহুলার যাত্রা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ, মনসার বারমাস্যা, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান।

১৩। ত্রয়োদশ পালা - দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, ডুম-ডুমনী বেশ ধারণ, চাঁদের মনসা পূজা, বেহুলা-লক্ষীন্দরের স্বর্গারোহণ, অষ্টমঙ্গলা।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ :

১। প্রথম পালা - মনসা বন্দনা, গণেশ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, পঞ্চ দেবতার বন্দনা, শকবর্ণনা, গ্রন্থারম্ভ, সৃষ্টি প্রকরণ, বরাহ মূর্তি, অনাদ্যের সৎকার, ধর্মযজ্ঞ, গঙ্গার দেবলোকে আগমন ও শান্তনু-কর্তৃক গঙ্গাবর্জন, গঙ্গার বিলাপ, শিবের তপস্যা, গৌরীর ছলনা, মনসার জন্ম, পিতাপুত্রীর সাক্ষাৎ।

২। দ্বিতীয় পালা - ফুলের সাজিতে পদ্মা, মনসা-ভবানী দ্বন্দ্ব, চণ্ডীর রণসজ্জা, মনসার রণসজ্জা।

৩। তৃতীয় পালা - পদ্মার সিজুয়া পর্বতে গমন, নেতার জন্ম, তুলসী মাহাত্ম্য, চিত্রবতী কাহিনি, কপিলা-মনুরথ কাহিনি।

৪। চতুর্থ পালা - ব্যাঘ্র মনুরথ যুদ্ধ, কপিলার শাপমোচন।

৫। পঞ্চম পালা - সমুদ্র মন্থন।

৬। ষষ্ট পালা - বিষ সমস্যা, গরল-পানে অচেতন হর, ভবানীর শোক, শিবের মৃত্যু বার্তা, মনসার আগমন, বিষঝাড়ন, বিশ্বকর্মার তৌল-নির্মাণ, সর্পগণের মধ্যে বিষবণ্টন, জরৎকারু মুনির নিকট বিবাহ প্রস্তাব, জরৎকারুর শিবনিন্দা, ভবানীর ভীমামূর্তি, জরৎকারুর কৈলাস আগমন, বিজয়িনী মনসা, মনসার বিবাহে দেবগণের যোগদান, সর্পভয়ে বাসর হতে মুনির পলায়ন, মনসার মিনতি, আস্তিকের জন্ম।

৭। সপ্তম পালা - মনসার পূজা লাভের বাঞ্ছা, রাখাল বালকদের মনসাপূজা, হাসন-হোসেনের নিকট মনসাপূজার বার্তা, সাদ্যা কর্তৃক মনসার রূপবর্ণনা।

৮। অষ্টম পালা - হাসন-হোসেন পুরী নাশ, দেবীর স্বপ্নাদেশ ও হাসনের দেশত্যাগ, হাসনহাটিতে দেবীর অবতার।

৯। নবম পালা - চাঁদ বান্যার আদ্যকথা, পুরবর ও মালাধরকে মনসার অভিশাপ, জালু-মালুর জন্ম, নিছনির মনসার বারাপূজা, সনকার মনসা পূজার উদ্যোগ, চাঁদ কর্তৃক মনসার বারাভঙ্গ, মালাধর ও পুরবরের শাপমুক্তি।

১০। দশম পালা - নটীবেশে মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, ধন্বন্তরি কর্তৃক চাঁদকে পুনরায় মহাজ্ঞান দান ও মনসার ক্রোধ।

১১। একাদশ পালা - চাঁদের নাখরা বন ধ্বংস ও মন্ত্রবলে তার পুনরুজ্জীবন, ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিতের মৃত্যু, জন্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ, ধন্বন্তরি বধ, চাঁদের ছয় পুত্রনাশ।

১২। দ্বাদশ পালা - বাণ-অনিরুদ্ধ-উষাকাহিনি, উষা-অনিরুদ্ধের প্রতি শিবের অভিশাপ, লখাই-বেহুলার জন্মের সূচনা।

১৩। ত্রয়োদশ পালা - বিশ্বকর্মার মধুকর নির্মাণ ও চাঁদের বাণিজ্য যাত্রার উদ্যোগ, গঙ্গার কাহিনি, যাত্রাপথে নীলাচল, জগন্নাথের কাহিনি, সেতুবন্ধের বর্ণনা, কালিদহ।

১৪। চতুর্দশ পালা - মনসার ক্রোধ, চাঁদের সাতডিঙ্গা বুড়ি, চাঁদের দুর্দশা, লক্ষীন্দরের জন্ম, বিধাতা কর্তৃক লক্ষীন্দরের ললাট লিখন, বেহুলার জন্ম, চাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও দৈব নির্যাতন, লক্ষীন্দরের সম্বন্ধ নির্ণয়, দেবীর ছলনা, বেহুলার পরীক্ষা ও বিবাহের লগ্ন নির্নয়, বিশ্বকর্মার লৌহ বাসর-নির্মাণ ও মনসার নির্দেশে গমন-পথ, লক্ষীন্দরের বিবাহ যাত্রা, বাসর ঘরে লক্ষীন্দর দংশন, বেহুলার রোদন, দিশেহারা চাঁদবান্যা, সনকার শোক, পতিসহ বেহুলার মাঞ্জাসে ভাসবার সংকল্প, শ্বেতকাককে বেহুলার অনুরোধ, ভাসমানা বেহুলা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ, দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান, বেহুলার ভাশুরগণের পুনর্জীবন প্রাপ্তি ও সপ্ত ডিঙ্গা উদ্ধার, যোগী-যোগিনীবেশে বেহুলা লক্ষীন্দরের নিছনিগমন, বেহুলার মাতাপিতার নিকট পরিচয় দান, বেহুলার শ্বশুরালয়ে গমন, দ্বিধাগ্রস্থ চাঁদের মনসা পূজা, অষ্টমঙ্গলা, কলিযুগ বর্ণনা, বেহুলা-লক্ষীন্দরের স্বর্গারোহণ।

বিষ্ণু পাল :

১। বন্দনা পালা, ২। সমুদ্র মন্থন, ৩। পরীক্ষিত পালা, ৪। ধন্বন্তরি পালা, ৫। জেল্যার জালন, ৬। গন্ধেশ্বরি পালা, ৭। মন্তর ছলনা, ৮। বানুজ্য পালা, ৯। সম্বুন্দ পালা, ১০। জাগরণ পালা।

তন্ত্রবিভূতি :

১। দেবখণ্ড - মনসা বন্দনা, সর্ব্বদেবী বন্দনা, শিবের পুষ্পবন গমন, মনসার জন্ম, চণ্ডী-মনসা বিবাদ, শিবের ধর্মপূজা, মনসার বনবাস, বিষের জন্ম, কপিলা ও ব্যাঘ্র কাহিনি, সমুদ্র মন্থন, শিবের বিষপান ও মনসা কর্তৃক চেতনা দান, মনসার বিবাহ ও মুনি কর্তৃক পরিত্যাগ।

৩। বণিকখণ্ড - চাঁদের পরিচয়, জালু-মালু কাহিনি, হীরা কাহিনি, সনকার মনসাপূজা, চাঁদের ক্রোধ, লক্ষের বাড়ি ধ্বংস, পাঁচ পুত্রের মৃত্যু, ধন্বন্তরি বধ, বাণিজ্য যাত্রা, কুলপানির মৃত্যু, ডিঙ্গাডুবি, চাঁদের বিড়ম্বনা, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনি, লক্ষীন্দরের জন্ম, মাতুলানী হরণ, বিবাহ, লক্ষীন্দর দংশন, যম ও মনসার যুদ্ধ, বেহুলার দেবপুরে যাত্রা, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান, চাঁদের মনসাপূজা।

জগজ্জীবন ঘোষাল :

১। দেব খণ্ড - বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, মনসা ও ধর্মের বিবাহ, ধর্ম ও মনসার মৃত্যু, গৌরীর জন্ম ও হিমালয় মেনকার গৌরীকে প্রাপ্তি, শিবের পুষ্পবন গমন ও ধর্মপূজা, পার্বতীর পুষ্পবন গমন, শিব-পার্বতীর মিলন, গঙ্গাকে নারদের বার্তা দান, পার্বতীর সতীত্ব পরীক্ষা, শিব-পার্বতীর বিবাহ, গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল ও শিবের পুষ্পবন গমন, মনসার জন্ম, পার্বতীর কুচনী ও গোয়ালিনী রূপে ছলনা, পিতা পুত্রীর সাক্ষাৎ, চণ্ডী-মনসা বিবাদ, গঙ্গা ও দুর্গার গৃহত্যাগ, কপিলা ও ব্যাঘ্র কাহিনি, সমুদ্র মন্থন, শিবের বিষপান ও মনসা কর্তৃক চেতনা দান, মনসার বিবাহ ও মুনি কর্তৃক পরিত্যাগ, রাখাল বালকদের মনসাপূজা, জালু-মালু আখ্যান।

২। বানিয়া খণ্ড - চাঁদের পরিচয়, ছয়পুত্রের মৃত্যু, নাখরা বন ধ্বংস, বাণিজ্য যাত্রা, চাঁদের বিড়ম্বনা, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনি, লক্ষীন্দরের জন্ম, মাতুলানী হরণ, বিবাহ, লক্ষীন্দর দংশন, যম ও মনসার যুদ্ধ, বেহুলার দেবপুরে যাত্রা, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন দান, চাঁদের মনসাপূজা।

জীবন মৈত্র :

১। বন্দনা - ব্রাহ্মণ বন্দনা, বিষ-হরি বন্দনা, রাধাকানু বন্দনা, কলি বন্দনা।

২। দেব খণ্ড - পৃথিবীর সৃজন, সৃষ্টি উৎপত্তি, সমুদ্র মন্থন, দেবগণের শিব স্তুতি, দেবগণের অমৃত ভোজন, মনসার জন্ম, শিবদুর্গার কলহ, গৌরীর পাটনী বেশ ধারণ, নেতার জন্ম, মনসার বিবাহ।

৩। বণিক খণ্ড - হাসন হোসেনের কাহিনি, চান্দর আদিপুরুষের নাম, চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার অপমান ও মনসা কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ, মহাজ্ঞান হরণ, রাজা পরীক্ষিত উপাখ্যান, ওঝা ধন্বন্তরির চম্পাত গমন, ব্রাহ্মণবেশী তক্ষকের সহিত ওঝার বিবাদ ও ওঝা কর্তৃক মন্ত্রবল প্রদর্শন, তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু: জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও আস্তিক কর্তৃক তক্ষকের প্রাণরক্ষা, চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু : ওঝা কর্তৃক তাহাদের জীবন দান, চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার অপমান, ওঝা ও মনসার বিবাদ, পদ্মার গোয়ালিনীর বেশ, ওঝার মৃত্যুকথা, পদ্মার করুণা, ওঝা ধন্বন্তরি বধ, ওঝাক ভাসান, চান্দোর ছয় পুত্র বধ, সনকার করুণা, পদ্মা ও যমের রণ, চান্দের মধুকরপত্তন, উষা করুণা, বাণযুদ্ধ, উষাহরণ, উষার প্রতি ইন্দ্রের অভিশাপ, লক্ষীন্দর ও বেহুলার জন্ম, চাঁদের দক্ষিণ পাটন গমন, জগন্নাথ কথা, চাঁদের দক্ষিণ পাটন ও তার সঙ্গে পদ্মার বিবাদ, তিনকড়িয়ার নারিকেল ভক্ষণ, চাঁদের দেশে গমন, বেললির জন্ম কথা, পদ্মার মেঘের সাজন, চাঁদের গৃহ প্রবেশ, লক্ষীন্দরের বিবাহ মন্ত্রণা, বেললির লোহার কলাই রন্ধন, বালা লক্ষীন্দরের বিবাহ, লক্ষীন্দরের কামগঞ্জনগর পত্তন, বালার অধিবাস, লক্ষীন্দরের বিবাহ যাত্রা, যুবতীদিগের পতিনিন্দা, বেললির পতিগৃহে যাত্রা, সর্পের সাজন, কালনাগ আনিতে গমন, ভুরা সাজান, ভাসান, মেনকা ও পাটনীর ছদ্মবেশে বেহুলার নিকট পদ্মার আবির্ভাব, নারায়ণ দানীর ঘাট, রাজকন্যার ছদ্মবেশে পদ্মার ছলনা, গোদার বাঁক, নেতাই ধোবানীর ঘাট, বেললির দেবপুরে গমন, বিষহরির বারমাসী, ডিঙ্গা উদ্ধার প্রভৃতি।

এ ধরনের কাহিনিগুলির সহজ স্বাভাবিক মিলন ঘটিয়ে কবিরা সমগ্র আখ্যানটির একটি গঠনগত পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র কাহিনির বিন্যাসে স্বর্গ আর মর্ত্যকে একবিন্দুতে মিশিয়ে দেবার তাগিদ লক্ষ করা যায়। তাই শাপভ্রষ্ট উষা-অনিরুদ্ধের মর্ত্যে আগমন এবং পরিণতিতে কার্য সমাধা করে আবার দেবলোকে প্রস্থানের কথা সকল কবিই বর্ণনা করেছেন। মূল কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে কবিরা প্রথানুসারী। কাজেই মঙ্গলকাব্যের বিশেষ রীতির বাঁধনে কবিদের ব্যক্তিসত্তা

আবদ্ধ। বিশেষ পরিবেশনের নিজস্বতা ও চরিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কবিদের ব্যক্তিসত্তার স্বকীয়তা লক্ষণীয়। কাহিনিতে পৌরাণিক ও অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা, লোকায়ত প্রসঙ্গ প্রভৃতি অবতারণার ক্ষেত্রেও কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য রয়েছে। নরখণ্ডের কাহিনিতে রয়েছে- চাঁদ-মনসার কাহিনি-> বেহুলা-লক্ষীন্দর কাহিনি-> মনসা-বেহুলা-চাঁদ কাহিনি।

খ। চরিত্রায়ন (characterization) ঘটনার পাশাপাশি চরিত্র বিশ্লেষণ ও যে সাংগঠনিক আলোচনায় সমান জরুরি সে সম্পর্কে রোলা বার্তে আমাদের অবহিত করেছেন। তবে আলোচ্য মনসামঙ্গল কাব্যটি ঘটনা প্রধান। কাহিনির ক্রিয়াশীলতা (action) এখানে চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। চরিত্রের উদ্‌ঘাটনে কাব্যে দু-ধরনের ইঙ্গিত কাজ করে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ। প্রথম ক্ষেত্রে কাহিনির অন্তর্গত কোন নির্ভরযোগ্য কথক (narrator) চরিত্র বা তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আগাম ইঙ্গিত দেন। এ কাব্যে মনসাদেবীর নির্দেশে সরাসরি কবিদের দ্বারা আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। আবার গায়েনদের পারস্পরিক কথোপকথনে আসরে গানের মাধ্যমে তা উপস্থাপিত হয়েছে। সমাগত ভক্তজন তা শ্রবণ করে পূণ্য অর্জন করেছেন।

গ। কালিকমাত্রা (temporal dimension) বাস্তব সময়ের (real time) ধারণা এবং আখ্যান বর্ণিত কালের বিন্যাস এক নয়। কাব্যে পূর্বকথা (flash back) ও উত্তরকথা (flash forward) আখ্যানের বর্ণনায় অভিনব কালিক মাত্রা এনে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উষা-অনিরুদ্ধের আক্ষেপ ও দেহত্যাগ অংশে অভিশাপ দানের মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত। অনুরূপ বেহুলাকে মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশ অংশটিতে দেবী পূর্বজন্ম-কথা স্মরণ করান। ফলে আখ্যানের কালিক প্রবাহে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

পূর্বকথা-উত্তরকথার প্রয়োগ :

১। "ছাড়িলাম বন্দনা ভাই গীতে দেও মন।
পদ্মাবতীর বিবাহ বলি শুন সর্ব্বজন।"[১৭]
২। "পরাশর নাম মুনি বশিষ্ঠের নাতি।"
...
কহ কহ মহামুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
কিমতে হইল সৃষ্টির পত্তন।।
কহ সৃষ্টি না হইতে পূর্ব্বে কে আছিল।
চরাচর ত্রিজগতে কাহনে হইল।।"[১৮]
৩। "পূর্বকথা কহি আমি তোমা বরাবরি
জ্ঞাতি হৈয়া জে কারণে তুমি মোর বৈরী।।"[১৯]
৪। "শুন ভাই পূর্ব্বকথা: দেবী হৈলা বরদাতা: সহায়পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়: চন্দ্রহাস-সম হয়: তাহার তালুকে ঘর করি।।"[২০]
৫। "পূর্বকথা হস্তিনীট পড়ি গেল মন।
পূর্বে বঙ্কের কুলে মোর জন্ম ছিল।
গঙ্গা ধেয়াইয়া হস্তী তনু তেআগিল।"[২১]
৬। "সণেক পুছেন কথা লোমশের স্থানে।
পুরাণ প্রিসংহ কথা কহ আদি হনে।"[২২]

ঘ। দৃষ্টিকোণ (point of view/focalization) যে কোন আখ্যানে কথকের (narrator) একটা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থাকে (Brooks and warren,1959), কথক বা কবি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি বিবৃত করেন। এমনকি অন্যের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হতে পারে। বর্তমান কাব্যে কবিই অধিকাংশ সময়ে কথক। তবে আখ্যানে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন চরিত্র নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনের সুযোগ পায়। তাই সর্পদের কথা তাদের নিজেদের মুখে ব্যক্ত হয়, অথচ কবি নিজেকে এখানে রাখেন নিরাসক্ত।

ঙ। বিবৃতি (narration) আখ্যানমূলক অধিবাচনে বিবৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বিবৃতির মাধ্যমেই ঘটে কাহিনির অগ্রগতি। চ্যাটম্যান বিবৃতি প্রক্রিয়ার একটি মডেল তৈরি করেন এইভাবে-

প্রকৃত লেখক- নিহিত লেখক- (কথক)- (গ্রাহক)- নিহিত পাঠক- প্রকৃত লেখক

প্রকৃত লেখক (real author) রক্ত মাংসের মানুষ, আর নিহিত লেখক (implied author) তাঁরই এক স্থিতিশীল সত্তা, রচনার বয়ানে যার নির্মাণ। তাই লেখকের 'আমি' আর রচনার 'আমি' এক নয়। তেমনই প্রকৃত পাঠক আর নিহিত পাঠকও এক নয়। নিহিত লেখক এবং কথকও (narrator) হতে পারে স্বতন্ত্র। 'কথক' ও 'গ্রাহক' (narratee) অবশ্য ঐচ্ছিক হতে পারে। তবে আখ্যানমূলক অধিবাচনে কথকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কথনের আবার বেশ কয়েকটি স্তর থাকতে পারে। যেমন, কথক যে চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করেন, সে-ই আবার হয়ে উঠতে পারে কথক। এখানে যেমন মনসা ও চণ্ডী কোন্দল বর্ণনা করেন লেখক। পরবর্তী পর্বে দেবী মনসাও চণ্ডীর সম্মুখে কথক হয়ে উঠেন। আবার বনবাসে মনসা নিজের দুঃখ বর্ণনার মাধ্যমে কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও একটু পরেই দেখতে পাই দেবী চণ্ডী এবং সর্পগণও কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে বিভিন্ন স্তরের কথনের মিশ্রণ হয়ে উঠে এ আখ্যানকাব্য।

গ্রাহকেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর থাকতে পারে। যেমন মূল কথনে যখন নিহিত লেখক কথক, তখন গ্রাহক হয়ে উঠে নিহিত পাঠক। কিন্তু কথনের অন্তর্গত কথনে গ্রাহক পাল্টে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনসার অত্যাচারে অত্যাচারিত চাঁদ যখন কথক, তখন দেবী মনসা হলেন গ্রাহক। তিনিই সক্রিয় কথক হয়ে ওঠেন চাঁদ-মনসা কথোপকথনের সময়।

আখ্যানের বিবৃতির সঙ্গে কালিক মাত্রার একটা যোগ আছে। কারণ ঘটনার পরম্পরা সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। মূলত, তিন ধরনের কালিক বিন্যাস আখ্যানে লভ্য- এক, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যখন বিবৃতি দেওয়া হয়। এখানে চাঁদ কর্তৃক অপমানিত হবার পরই মহাদেবের কাছে মনসা তার কষ্টের কথা বিবৃত করেন। দুই, যেখানে ঘটনা ঘটার আগে বিবৃতি সম্পাদিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাঁদের চরম বিড়ম্বনা প্রাপ্তির পূর্বেই দেবীর মন্তব্যে তার পূর্বাভাস থাকে। তিন, ঘটনা ও বিবৃতি যখন একই সঙ্গে চলতে থাকে। মনসামঙ্গলে যম-মনসার যুদ্ধ বর্ণনায় এমনটাই ঘটতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, কথনের বহুস্তরীয় বিন্যাস, দৃষ্টিকোণের বহুধা বিভাজন, বর্ণনা ও সংলাপধর্মী প্রকাশভঙ্গির মিশ্রণ মনসামঙ্গল কাব্যের এই আখ্যানটিকে একটি মিশ্র অধিবাচনের রূপ দিয়েছে।

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে লোককথার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভ্লাদিমির প্রপ লোককথার চরিত্রগুলির নির্বাহনকে ৩১টি ভাগে ভাগ করেছিলেন। এর কয়েকটি হল -

১। নায়কের আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্যোগ
২। আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকাকে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়
৩। নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব
৪। নায়ক বা নায়িকার জয়

লোককথার এই পদ্ধতিতে মনসামঙ্গলের কাহিনি বিশ্লেষণ করা যায়।

১। আকাঙ্ক্ষা: মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচার করবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।
২। আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্যোগ:
ক. চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ
খ. চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু
গ. ধনন্তরি বধ
ঘ. উষা-অনিরুদ্ধকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য প্রেরণ
৩। দ্বন্দ্বের সূচনা: চাঁদের স্ত্রী সনকার মনসা পূজার সময় চাঁদ কর্তৃক মনসার ঘট ভাঙা
৪। নায়ক বা নায়িকার জয় :
ক. বেহুলার দেবপুরে যাত্রার ফলে মনসা কর্তৃক লক্ষীন্দর সহ চাঁদের পুত্রদের প্রাণদান, চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর ফিরিয়ে দেওয়া।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খ. চাঁদের মনসা পূজা

সম্পর্কিত বাক্যের ব্যবহার :

রচনার সংগঠনে বয়ানগত সংলগ্নতা পরস্পর-সম্পর্কিত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমেও গড়ে উঠতে পারে। কবি মূলত সম্বন্ধী সর্বনামের (corelative pronoun) এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেন। সম্বন্ধী বাক্যের সাহায্যে কবি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবাদ এবং প্রবচন-সূচক সংক্ষিপ্ত অথচ সংবদ্ধ রচনায় প্রয়াসী হন। মনসামঙ্গলের কবিদের রচনায় সে সম্পর্কিত বাক্য ব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

১। "চণ্ডী বোলে সই তোমি কহ তত্ত্বসার।
তোমার ঘটে আজি কে হইয়াছে পার।।"[২৩]
২। "পঞ্চ রত্ন করিয়া জদি চাহ তুমি।
নারিকেল বদলে দিতে পারি আমি।।"[২৪]
৩। "যেই পথে পদ্মবনে যাইব শূলপাণি।
সেই পথ আগুলিয়া রহিলা ভবানী।।"[২৫]
৪। "শ্বেত কর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপতি
পীতগিরি বেড়ি জেন বহে ভাগীরথী।"[২৬]

৫। "সহায় শঙ্কর যার যশ কীর্ত্তি বাঢ়ে তার
দুয়ারী ষড়ানন।"[২৭]
৬। "মনসার দোহাই কালি স্মরণে শুনিল।
মুখ হৈতে দুটা মহিস উগরে ফেলিল।"[২৮]
৭। "তুমি যদি জিঞাইঞা না দেহ প্রানেশ্বর।
স্ত্রীহত্যা দিব আমি তোমার উপর।।"[২৯]
৮। "সেইদিনে সনকা আছিল ঋতুবতী।
রজনী সময়ে সম্ভাষিলা নিজ পতি।।"[৩০]
৯। "যার রূপে ত্রিভুবন হয় মূরছিত।
তাহার সতীত্ব আছে এ কোন প্রতীত।।
বেললি পরীক্ষা লয় যদি করে জয়।
করিব ভোজন সভ কহিলাম নিশ্চয়।"[৩১]

প্রশ্ন বাক্যের ব্যবহার -

১। "জেন সুমিত্রা তেন তাহার ঝি।
তোমার বিহা হইব জৌতক দিব কি।।"[৩২]
২। "এ কন্যা লইয়া আমি যাব কোন দেশে।।"[৩৩]
৩। "কে তুমি বিধবা মাও হও কোন দেবী।"[৩৪]
৪। "কোন জাতি কোথা বৈস তনয় কাহার।"[৩৫]
৫। "কি করিতে পারে মা বিষের প্রতাপে।।"[৩৬]
৬। "কেমনে আইল বুড়ী চলিতে না পারে।"[৩৭]
৭। "কে মোরে জিয়াঞা দিবে দুর্ল্লভ লখাই।"[৩৮]
৮। "কেমতে দংশিব বালাক আমি দুচারিণী।।"[৩৯]
৯। "কি করিতে পারে কানি মাগি ভাতারছাড়ী।।"[৪০]

নেতি বাক্যের ব্যবহার -

১। “না জানি কি হয়ে তথা গেলে কাশীনাথে।।”[৪১]
২। “পিপিলিকা না পারে প্রবেস করিবারে।।”[৪২]
৩। “ত্রিভুবনে বধ্য নহে দেব চক্রপাণি।।”[৪৩]
৪। “উঠিতে না পারে মুনি হইল আকুল”[৪৪]
৫। “কথুই না নাগের সঙ্গে না হইল মেলা।”[৪৫]
৬। “সাহস না টুটে যুঝে শার্দ্দুল বিষম।”[৪৬]
৭। “না কর বিলম্ব লেহ নৃত্য অভরণ।”[৪৭]
৮। “দেখিতে না পায় ভেলা গেল কত দূর।”[৪৮]
৯। “সাধু বোলে না মারিয় নগরিয়া ভাই।”[৪৯]

বাক্য গঠনরীতি :

বিজয়গুপ্ত -

১। “মা ভাই কেহ নাহি মনে বড় তাপ।
তোমার কোপ দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ।”[৫০]
২। “দূরে ঘোচ সালিয়ান নারী।
আপনার ছাওয়াল কেন মারি।।”[৫১]
৩। “লাখে লাখে লোক যায়ে কে কার খবর পায়ে
হুলাহুলি কেবা কারে চিনে।”[৫২]

নারায়ণ দেব -

১। “জেহি মতে জিবে লখাইর পরাণি।
সেহি মতে কহিল আসিয়া সুরধনি।।”[৫৩]
২। “তিলেক নাহি অবসাদ পদ্যার সহিতে বাদ
আজি প্রমাদ ফালাইল বিসহরি।।”[৫৪]

দ্বিজবংশী দাস -

১। “পুত্র নাহি কন্যা নাহি জল পিণ্ড আশা।
দিয়াও না দিল বিধি করিল নিরাশা।।”[৫৫]
২। “মারণে দুর্ব্বল গায়, ধীরে ধীরে সাধু যায়,
ভুকে শোকে হইয়া কাতর।”[৫৬]

বিপ্রদাস পিপিলাই -

১। “সতি জাগো রে মাই
সাহের নগরে ভিক্ষা মাগে বেহুলা লখাই।”[৫৭]
২। “বিধির লিখন ছিল সেই মাত্র সার হৈল
ইহা বহি দরশন নাঞিঃ।”[৫৮]
(বি.পি, পৃ. ২০৯)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ -

১। “যতেক ব্রজশিশু: সঙ্গে লইয়া বাসু: মনসা পূজে মহারণ্যে।”[৫৯]
২। “সখী বলে আজি তব সঙ্গে নাই কড়ি।
মাল্য পরিবারে যাহ কাজলার বাড়ী।।”[৬০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষ্ণু পাল -

১। "জয় জয় দিয়া ডাক নড়িলা তক্ষকের ঠাট
বিষের বরিষণ হেন শুনি।"[৬১]
২। "কাণ্ডারি কাণ্ডার বায়
বাঞ্চি ছাড়ি পড়ে নায়
জলমর্দ্ধে কর্ন্না একেশ্বরি।"[৬২]

তন্ত্রবিভূতি -

১। "ভোজন করিতে বেহুলা সহিতে
বালা বসিলেন রঙ্গে।"[৬৩]
২। "কেমতে পূজিবে মোরে চান্দো সদাগর।
পূজার কারণে পদ্মা কাতর অন্তর।।"[৬৪]

জগজ্জীবন ঘোষাল

১। "ভোজন করিতে বেননী সহিতে
বাণিয়া বসিল রঙ্গে।"[৬৫]
২। "উজানির নারীগণ বালার চাহে মুখ।
দেখি নারীগণের মনে লাগে সুখ।।"[৬৬]
৩। "না বোল না কর পাপ পাই আমি মনস্তাপ
কে রক্ষা কর সাধু তুমি ধর্ম্ম-বাপ।"[৬৭]

জীবন মৈত্র -

১। "ভোজন করিতে বেললিক সহিতে
লখিন্দর বসিলেন রঙ্গে।"[৬৮]
২। "তবে কত দিন পরে সাধুর মঙ্গল করে
বিবাহ করিল চন্দ্রপতি।"[৬৯]

বাক্যিক সাযুজ্য

১। "একখানি রথ শ্রিজিলা মহেস্বরে।
রথে শ্রিজিয়া দিলা নেতার গোচরে।।
রথে চড়িয়া নেতা করিল গমন।
অষ্টাবক্র মুনির সনে পথে দরসন।।"[৭০]
২। "নাগের হার নাগের কঙ্কন নাগের বসন।
নাগের সঙ্খ সিন্দুর পদ্যার সাজন।।
নাগের খাট সিংহাসন নাগের বিছান।
নাগের ঝারিতে জল খায়ে নাগের বাটাতে পান।"[৭১]
৩। "লোকমুখে হইল পদ্মা তোমার অপযশ।
চণ্ডীরে জিয়াইয়া দেও দেখি তোমার সাহস।।
লোকে বোলে শুদ্ধজন তায়ে অপবাদি।
লোকে ঘুষিবেক তোমায়ে সতমাই বধি।।
লোকের অপযশ ঘোচাও আমার সাধন।"[৭২]
৪। "উত্তম জলেত স্নান করায়া কৌতুকে।

উত্তম বসন আনি পরায় চান্দকে।।
টঙ্গী ঘরে গিয়া কৈল রন্ধন ভোজন।
উত্তম বিছানা দিল করিতে শয়ন।।”[৭৩]
৫। “অতি লোভে ভালো নহে দেখ ত্রিভুবনে
অতি সতী নারী সীতা হরিল রাবণে।
অতি তপে বলি রাজা গেল রসাতলে
অতি তপে মীননাথ কদলিতে ভোলে।
অতি দানে হরিশ্চন্দ্র অন্তরীক্ষ গতি।।”[৭৪]
৬। “চন্দ্র টলি গেল হোথা দুর্গা সঙরণে।
চন্দ্র টলি গেল বাম হাথে ধরিয়া।
সেই চন্দ্র পদ্মপাতে দিল ফেলাইয়া।।”[৭৫]
৭। “পদ্মানিকে দেখিয়া ইন্দ্র ধরিতে নারে মন।
পদ্মনি স্থানে ইন্দ্র আইলা ততক্ষণ।।
পদ্মনি বলে ছাড়িতে পার যদি সচি ঠাকুরাণি।
তোমাতে আমাতে করি পুষ্পের ছামুনি।
পদ্মানি লাগিয়া ইন্দ্র শচী তেয়াগিয়া।
পদ্মনির স্থানে ইন্দ্র উত্তরিল গিয়া।”[৭৬]
৮। “সত্য লাগি বলিরাজা গেল রসাতল।
সত্যের কারণে পুত্র আছে গঙ্গাজল।।
সত্য লাগি তুলসী হইল বৃন্দাসতী।
সত্যের কারণে পুত্র হয় দিবারাতি।।”[৭৭]
৯। “ধন্য ধন্য ওহে মিতা ধন্য সদাগর।
ধন্য কুলে উৎপত্তি ধন্য রাজ্য ঘর।।”[৭৮]
১০। “সৃজিলেন পৃথিবীখান ধর্ম্ম আদি সুর।
আকাশে অমরাবতী আর নাগপুর।।
অষ্টদিগে সৃজিলেন অষ্ট লোকপাল।
সৃজিলেন সপ্ত সর্গ যে সপ্ত পাতাল।।
সৃজিলেন ইন্দ্রদেব সৃজিলেন নর।
সৃজিলেন গন্ধর্ব্বগণ অসুর কিন্নর।।”[৭৯]
১১। “তিন সন্ধ্যা পাঠ করিলে মহাপাপ হরে।
দুই সন্ধ্যা পাঠ করিলে ভবার্ণব তরে।।
এক সন্ধ্যা পাঠ করিলে ধর্ম্মেত হয় মতি।
প্রত্যুহ করিলে পাঠ ধর্ম্মে হয় দিব গতি।।”[৮০]
১২। “এক দুঃখ এহি যে জঙ্গলে ভাঙ্গা দাও।
ততাধিক দুঃখ বলিতে নাহি মাও।।
ততাধিক দুঃখ যে বলিতে নাহি ভাই।
ততাধিক দুঃখ যার ঘরে অন্ন নাই।।
ততাধিক দুঃখ যার ক্ষেতে নাই হাল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাধিক দুঃখ যার গৃহেতে জঞ্জাল।।
ততাধিক দুঃখ যাহার প্রবাসে ফুটে হাড়ি।
ততাধিক দুঃখ কন্যা অল্প বসে রাড়ী।।”[৮১]

পুনরাবৃত্তি –

ভাষিক উপাদানের পুনরুক্তি ও পুনরাবর্তন অনেকক্ষেত্রেই কোন রচনার শৈলীগত প্রকৌশল হয়ে উঠতে পারে। শব্দের স্তরে পুনরুক্তির পাশাপাশি পদ ও বাক্যের মধ্যেও পুনরুক্তি ঘটতে পারে।

১। “প্রথম যৌবন কন্যার রূপের নাহি সীমা।
ঘরে অকুমারী কন্যা বড় অমহিমা।।
ঘরে অকুমারী কন্যা রহিল আমার।
ভাবিতে চিন্তিতে গেল গৃহে আপনার।”[৮২]
২। “কাকলাসের লেঞ্জ কি হাৰেলের লেঞ্জ।
গুহিলের লেঞ্জ কি সাপের লেঞ্জ।।”[৮৩]
৩। “খাইয়া আগলিয়া দেখে নাগ বিঘতিয়া।
উলুয়া নলুয়া দেখে নাগ সিতলিয়া।।
নড়িয়া ধড়িয়া দেখে নাগ মনিরাজ।
বিলুয়া তিলুয়া দেখে নাগের সমাজ।।”[৮৪]
৪। “কাহার দোসে কাটা গেল লক্ষের বাউগান বাড়ি।
কাহার দোসে মৈল উঝা ধনন্তরি।।”[৮৫]
৫। “আজ্ঞা কর এই ক্ষণে সৃষ্টি করি নাশ।
আজ্ঞা কর ত্রিভুবন করি এক গ্রাস।।”[৮৬]
৬। “কোথাবা থাকিল মোর চাম্পালি নগর।
কোথাবা থাকিল মোরে বিনোদ বাসর।।”[৮৭]
৭। “নির্ম্মাণ করিল চিতা মনসার বোলে।।
নির্ম্মাণ করিল চিতা সাগরের বাটে।”[৮৮]
৮। “অস্থি নয়া মনসা জোড়াইল সব বন্ধ।
হস্ত পদ বুক পুষ্ট জোড়াইল কন্ধ।।”[৮৯]
৯। “বরুণের রস যায়া বরুণে মিশাইল।
পবনের অংশ যায়া পবনে মিশাইল।।”[৯০]
১০। “লক্ষ লক্ষ আছে তথা ওঝা ধন্বন্তরি
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি দুয়ারে প্রহরী।”[৯১]
১১। “চারি বর্ছর পূজা করে হবিষ্য করিয়া।
চারি বর্ছর পূজা করে ফলমূল খেয়া।।”[৯২]
১২। “দেবতার বচনে সকল হয় লয়।
দেবতার ঐরি চিরকাল নাঞি রয়।।”[৯৩]

ধ্বনিবিন্যাস রীতি :

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ধ্বনিবিন্যাস রীতি আলোচনায় প্রধানত ধ্বনির অবস্থানগত বিন্যাসকেই আলোচনা করা হয়।

১। “অতএব এই দৈব হইল তোমার।

চিন্তা না করিয় ধেনু পাইবা আরবার।।”[৯৪]
২। “ঘট ভাঙ্গিবারে আঙ্গা কৈল সদাগর।
জোড় হাতে বুঝাইল সকল দ্বিজবর।।”[৯৫]
৩। “শাপ হেও ধন্বন্তরি ভয় পায়্যা মনে।
মুনিকে স্তবন করে ধরিয়া চরণে।।”[৯৬]
৪। “তবে ত নাগিনী বলে পদ্মা পদ ধরি
সাধিব তোমার কার্য্য জেই রূপে পারি।”[৯৭]
৫। “শুন অরে বাছা পুত্র গঙ্গাধর।
কালি দেখে শুনে অন্নগোলা করিবে ভোজন।”[৯৮]
৬। “বসি নরসুন্দ: পরম আনন্দ: খেরু কৈল সভাকারে।”[৯৯]
৭। “ভোজন করিতে বেহুলা সহিতে
বালা বসিলেন রঙ্গে।”[১০০]
৮। “ভোজন করিতে বেননী সহিতে
বাণিয়া বসিল রঙ্গে।”[১০১]
৯। “ভোজন করিতে বেললিক সহিতে
লখিন্দর বসিলেন রঙ্গে।”[১০২]

শব্দ ব্যবহার :

শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে মনসামঙ্গলের কবিরা অনেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

১। “পদ্মার মনে হেন লয় যমেরে করিবে ক্ষয়
বিজয়ে গোপ্তে রচিল সুসার।।”[১০৩]
২। “পক্ষিনি বোলয় পক্ষিয়া সুন বিবরণ।
আইজ কেনে গাও মোর করে বিঘোরণ।”[১০৪]
৩। “এই ওঝা পৃথিবীতে থাকে যতদিন।
তাবত না দেখি ভৈন জিনিবার চিন্‌।।”[১০৫]
৪। “বরগো দগড় কাড়া রবার পাখজ পড়া
অনিবার হয় বাধ্যধ্বনি।”[১০৬]
৫। “বিক্ষকে বাচায়া পাকে ধর ধর।
হরপিতে ভরেআ পাকে লয়া যাব ঘর।”[১০৭]
৬। “কলা চোপা ইক্ষু গিরা গিয়াছে পেলায়্যা।
দেখিয়া দাণ্ডায় সাধু মালসাট দিয়া।।”[১০৮]
৭। “জাতে মায়া পাতিলেন শঙ্করের ঝিউ।
নাগের কামড়ে বালা হারাইল জিউ।।”[১০৯]
৮। “জটের উপরে বান্ধে সর্পের পাগ।
আশীর্ব্বাদ দিতে ফফায়া উঠে সাপ।।”[১১০]
৯। “শোভিছে বাম ভাগেতে খেটকপূর্ণ চাপেতে
পাশাঙ্কুর আদি করে ধরে।।”[১১১]

উপস্থাপন রীতি :

বিষয় যা-ই হোক না কেন পরিবেশনের গুণে একটি কাব্য যথার্থ কাব্য হয়ে উঠতে পারে। একই কাব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও এক কবি অন্য কবি থেকে পৃথক হয়ে যান। সেই একই বিষয় এক একজন লেখকের হাতে পড়ে এক এক রকম রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের আলোচিত নয়জন কবির উপস্থাপন রীতিকে পৃথকভাবে দেখা যেতে পারে।

১। "সঙ্করের কন্যা তুমি নাম পদ্যাবতি।
সতেক দোস থাকীতে তোমরা বড় সুতি।।
বড় মনস্যের দোস হইলে দোসান না জায়।
মাস পক্ষ হইলে সকলী লুকায়।।"[১১২]

২। "আমার শ্বশুরে কত কৈল তারে জান।
ঈশ্বরের ঝী হইয়া লজ্জা নাহি মান।।
শঙ্করের কন্যা হেন গৰ্ব্ব কর মনে।
ই গৰ্ব্ব না থাকিলে তোমারে কেবা গণে।।"[১১৩]

৩। "বালী বোলে বিশ্বম্ভর সুন দেবগণ।
মনসা করিল মোর জত বিড়ম্বন।।
সত্যের প্রতীত নহে মিথ্যা কথার ঘর।
হেন পাপিষ্ঠে জন্ম দিএাছে শঙ্কর।।"[১১৪]

৪। "বালী বোলে দেবগণ শুনহ বচন।
মনসা যতেক মোর করিল বিড়ম্বন।
সত্য না কহে পদ্মা মিথ্যার ঘর।
হেন পাপিষ্ঠাকে জন্ম দিল মহেশ্বর।।"[১১৫]

৫। "সিবলিঙ্গ আমি পুজি জেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে।।"[১১৬]

৬। "যেই হাথে পুজিনু সোনার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তায় জয় বিষহরি।।"[১১৭]

৭। "জে হস্তে পূজিলাম হর অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর
সে হস্তে পূজিব কেনে কানী।।"[১১৮]

৮। "যেই হস্তে পূজি হর অখিলের ঈশ্বর
হেন হস্তে পদ্মাকে দিব পানি।।"[১১৯]

৯। "যে হস্তে সৰ্ব্বদা পূজি দেব শূলপাণি।
সে হস্তে পূজিতে বল বেঙ্গ খাকা কানি।"[১২০]

১০। "শিব দুর্গার পুত্র আমি সৰ্ব্ব দেবে জানি।
লঘুজাতি হইয়া আইসে পূজ্যমানি।।
তাহারে পূজিতে মোর মনে নাহি লয়।
ভাঙ্গিব তাহার মাথা কহিলাম নিশ্চয়।।"[১২১]

১১। "মনসা চান্দর হাতে পায়্যা অপমান।
ভাবিলাইঁ আমি তার কাটিব বাগান।।
বাগান কাটিলে চান্দ পাবে মনোদুঃখ।
ছয় পুত্র বধি পাছে দিব পুত্রশোক।।
পুত্রশোক পায়্যা চান্দ পূজিব আমারে।"[১২২]

১২। "দেবী পদ্মাবতী নাম খিয়াতি রাখিব।
ধনন্তরি রোজা আমি আগেতে বধিব।।
তবে চান্দোর ছয় পুত্র করিব বিনাশ।
চান্দো সদাগর তখন পাইবেন ত্রাস।।"[১২৩]
১৩। "পদ্মা বোলে দাদা কেনে বাঢ়াইলে দ্বন্দ্ব।
সভার ভিতরে কেনে বোল মন্দ ছন্দ।।
এখন আমাকে দাদা দেহ ফুল জল।
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাদ ঘুচিবে সকল।।
ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দ সুন ভাতারছাড়ি।
যাচিঞা চাহিস কিবা হেমতালের বাড়ি।।"[১২৪]
১৪। "পদ্মা বোলে দাদা কত বাড়াইস দ্বন্দ্ব।
সভার ভিতরে কেনে বোল মন্দ ছন্দ।।
এখন আমাকে দাদা দেহ পুষ্পজল।
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাদ নহিবে কুশল।।
ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দ শুন ভাতার ছাড়ি।
যাচিয়া চাহিস নাকি হেমতালের বাড়ি।।"[১২৫]

বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারায় উল্লিখিত কবিগণ বিশিষ্ট ও প্রতিভাধর, রচনার ক্ষেত্রে উভয়েই স্ব স্ব কাব্যে অপূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মনসামঙ্গলের আখ্যান, চরিত্র সমস্ত প্রকৃতিই এ সকল মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। উভয়েই নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী মনসামঙ্গল কাব্যের প্রকৃতিকে এক রেখে সাফল্য লাভ করেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, তাদের মধ্যে অসামঞ্জস্যও প্রচুর। কোনো কবি সাহিত্যিকই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রভাবিত হননা বা কখনো অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননা। একের সঙ্গে অন্যের রচনার প্রকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন এবং নিজের মৌলিকতা বজায় রাখেন। মনসামঙ্গলের কবিদের সম্পর্কেও একথা সর্বাংশে সত্য। কবিদের পারস্পরিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অনুসরণ থাকলেও এই নয়জন কবির কাব্যের গঠনতাত্ত্বিক পার্থক্য তাঁদের রচনাকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দিয়েছে। বিশেষ করে দুই লেখকের আবির্ভাব কাল বা সময়ের পার্থক্য তাদের সমকালীন সমাজ-প্রেক্ষিত, উভয়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি জীবন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে কবিদের সাহিত্য কর্মের মধ্যেও ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৮-৯
২. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত), বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১৫২
৩. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, সাহিত্য সমালোচনার রূপ ও রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৪৩
৪. মজুমদার, অভিজিৎ, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড): সংগঠন ও শৈলীবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৯
৫. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ৮৯
৬. তদেব

৭. মজুমদার, অভিজিৎ, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড): সংগঠন ও শৈলীবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৯
৮. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ. ১৯
৯. দেব, নারায়ণ, পদ্মাপুরাণ, তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২০
১০. দাস, দ্বিজবংশী, পদ্মাপুরাণ, রামনাথ চক্রবর্ত্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৩১৮ বাং, পৃ. ১১৬
১১. পিপিলাই, বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১৩
১২. পাল, বিষ্ণু, মনসামঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২, পৃ. ৯
১৩. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৪ বাং, পৃ. ১৬
১৪. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ. ৮
১৫. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৭৪
১৬. মৈত্র, জীবন, পদ্মাপুরাণ, প্রথম কয়েকটি পৃষ্টা ব্যাতীত প্রাপ্ত মুদ্রিত বই, প্রাপ্তিস্থান-যতীন্দ্র মোহন সংগ্রহশালা, ঠিকানা-ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০৩২, পাঠাগার কর্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থ নম্বর- ১৩৬, (জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের অভিমত- জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ, "অল্প কিছু অংশ বগুড়া নিবাসী সারদানাথ খাঁ, বি-এল কর্তৃক 'বিষহরি পদ্মাপুরাণ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণগ্রন্থ শ্রী শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।" গবেষকের মতামত- বিভিন্ন তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, মুদ্রিত এবং বর্তমান গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত এই বইখানি শ্রী শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত জীবন মৈত্রের সম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণ), পৃ. ২০
১৭. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬৭
১৮. দ্বিজবংশী, দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৫
১৯. বিপ্রদাস, পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫
২০. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৫-৬
২১. বিষ্ণু পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ২৬
২২. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৯
২৩. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৪
২৪. নারায়ণ, দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২১৬
২৫. দ্বিজবংশী, দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১০৬
২৬. বিপ্রদাস, পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ২
২৭. কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৮৯
২৮. বিষ্ণু, পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ৮৯
২৯. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ৪৬৯
৩০. জগজ্জীবন, ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫৮
৩১. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৮
৩২. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৯
৩৩. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১১৩
৩৪. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৭৬

৩৫. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ৪৮
৩৬. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২১
৩৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৯২
৩৮. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ৩৮৩
৩৯. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২২৪
৪০. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৮৪
৪১. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৩
৪২. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৮২
৪৩. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৬
৪৪. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ৫৯
৪৫. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৪৫
৪৬. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৪৭
৪৭. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ২১৪
৪৮. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৬০
৪৯. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯১
৫০. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৮
৫১. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫০
৫২. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৯
৫৩. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৯
৫৪. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯৫
৫৫. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৫৯
৫৬. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৭
৫৭. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ২৩৩
৫৮. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ২০৯
৫৯. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ১০১
৬০. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫৩
৬১. বিষ্ণু পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ৮৮
৬২. বিষ্ণু পাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ১০৯
৬৩. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ৩১১
৬৪. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ২২৬
৬৫. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ২০২
৬৬. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ১৮৯
৬৭. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ২৭৯
৬৮. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৬৫
৬৯. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৫
৭০. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৬
৭১. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৪
৭২. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭৩. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪২৬
৭৪. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ৩৩
৭৫. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল, পৃ. ৯
৭৬. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৬
৭৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫৬
৭৮. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ১৬৯
৭৯. জগজ্জীবন ঘোষাল, মনসামঙ্গল, পৃ. ৬
৮০. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৫৯
৮১. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯
৮২. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬৮
৮৩. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৬২
৮৪. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৬৩
৮৫. নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৯৭
৮৬. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৪
৮৭. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ২০৩
৮৮. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ১৫
৮৯. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৮৫
৯০। জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৮৪
৯১. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল. পৃ. ২০০
৯২. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৩৪
৯৩. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৪৫
৯৪. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১১৯
৯৫. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯৪
৯৬. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২২৬
৯৭. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ২০০
৯৮. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৬১
৯৯. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ৯৯
১০০. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ৩১১
১০১. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২০২
১০২. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৬৫
১০৩. বিজয়গুপ্ত- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২২৮
১০৪. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৮
১০৫. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৫২
১০৬. বিপ্রদাস পিপিলাই- মনসামঙ্গল, পৃ. ১৮১
১০৭. বিষ্ণু পাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৮
১০৮. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৩৬
১০৯. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ২১১
১১০. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৬২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১১. জীবন মৈত্র- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২
১১২. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৫৫
১১৩. দ্বিজবংশী দাস- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬১৪
১১৪. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ৪৭৪
১১৫. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ৩০৭
১১৬. নারায়ণ দেব- পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৩২
১১৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- মনসামঙ্গল, পৃ. ২৯০
১১৮. তন্ত্রবিভূতি- মনসাপুরাণ, পৃ. ১৪২
১১৯. জগজ্জীবন ঘোষাল- মনসামঙ্গল, পৃ. ১২৫
১২০. জীবন মৈত্র, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৮৪
১২১. বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৪৮
১২২. দ্বিজবংশী দাস, পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯৬
১২৩. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ১১৩
১২৪ তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃ. ৯৭
১২৫. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃ. ১১৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 43 - 52
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেব

ড. রাকা মাইতি
Email ID : rakamaitikabi@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Chaityna renaissance, New consciousness, Religion of love, Harinama, Vaishnavism.

Abstract
The 16th century is an important period in the history of Bengali literature. Sri Chaitanya dev emerged during this time span. This emergence marked an epoch-making change in the social life and literature of Bengal. This change can be called as the Chaitanya Renaissance. In fact, before the advent of Chaitanya dev, the social and religious life of Bengal was turbulent, distrustful and anarchic. The daily life of the common people was a struggle for survival and was marked with fear since there were many obstacles like the oppression of Muslim rulers, the dominance of the upper caste in Hindu society, the forced conversion of weak Hindus to Islam so on and so forth. Humanism was abused and suppressed at every step. When religious belief, societal norms, culture, and politics were under a shadow of darkness, Sri Chaitanya dev, the worshiper of humanism and propagator of the religion of love, redirected them to light. Vaishnavism which was introduced by him, the new consciousness heralding the religion of love, led Bengal from darkness to the path of light in every way. God became one's own, and the loved ones became the closest people. The entire Bengali society became strong through self-mastery. It can be said that through the chanting of the Harinama, the entire community, regardless of race, religion, or caste, became united.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিস্তীর্ণ সময় প্রবাহে ষোড়শ শতাব্দী এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। কারণ, এই সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই আবির্ভাব বাংলার সমাজজীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনকে সূচিত করেছিল। এই পরিবর্তনকেই বলা যেতে পারে 'চৈতন্য-রেনেসাঁস'।

বস্তুতপক্ষে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন ছিল অশান্তিপূর্ণ, অনাস্থাপূর্ণ ও অরাজকতাপূর্ণ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-নির্বাহ ছিল ভয়মিশ্রিত কোনো রকমে বেঁচে থাকা। কারণ তখন ছিল মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা, জোরপূর্বক দুর্বল হিন্দুদেরকে ইসলাম ধর্মান্তরিত করা ইত্যাদি বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা। মনুষ্যত্ব তথা মানবতাবাদ প্রতি মুহূর্তে সেই সময়ে অপমানিত ও অবদমিত হয়েছিল। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি যখন গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ, তখনই আলোর দিশা নিয়ে এলেন মানবতাবাদ তথা প্রেমধর্মের পূজারী শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম মিশ্রিত নবচেতনার বৈষ্ণব ধর্ম-ই বাংলাদেশকে সর্বাত্মকরূপে অন্ধকার থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলোর পথে পরিচালিত করল। ঈশ্বর মানুষের আপনজন, প্রিয়জন, কাছের মানুষ হয়ে উঠল। সমগ্র বাঙালী সমাজ নিজের আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে উঠল। বলা যেতে পারে, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল।

সুতরাং বলা যায়, সমগ্র বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব যেমন যুগান্তকারী পরিবর্তনকে সূচিত করেছিল, তেমনি বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম ছিল না। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, বিবিধ কাব্য সাহিত্য প্রভৃতিতে মানব-মহিমার জয়গান দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীকে আমরা 'সুবর্ণ যুগ' বলতে পারি, আবার 'চৈতন্য যুগ'-ও বলতে পারি। কারণ এই সময়েই গৌড়েশ্বর বিধর্মী হুসেন শাহও ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। ফলে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্মের জোয়ারে উজ্জীবিত মানুষকে তিনি কোনরূপেই ক্ষমতা তথা অহংকারের প্রভাব প্রয়োগ করে সেইসব মানুষের ওপর বাধা প্রয়োগ করেননি। এইভাবে যেমন সমাজে, ধর্মে, রাজনীতিতে নব প্রগতির উদ্ভাবন ঘটেছিল, তেমনি বাংলা সাহিত্যের সবকটি শাখায় মানবের মাহাত্ম্য, মানবতাবাদ উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন - চৈতন্যপূর্ব যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বৈধী ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-উত্তর যুগের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হল রাগানুগা ভক্তি, এল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাব। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হল জীবনীকাব্য, উদ্বোধিত হল বাংলা জীবনী সাহিত্যের শুভ সূচনা। এই সঙ্গে অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনীকাব্য রচনার প্রবণতাও সূচিত হল। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্যগুলিতে চৈতন্যপ্রভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। সেটি হল - মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের নির্দয় রূপটি বহুক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে সহনশীল মানসিকতা লক্ষণীয়। যেমন চাঁদ সদাগরের চরিত্রে চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যউত্তর যুগের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় বৈষ্ণব পদাবলী এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য শাখা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে তিনটি পর্ব বিভাজন বিষয়বস্তু, চরিত্র, সর্বোপরি পদকর্তাদের জীবনবোধ ও অধ্যাত্মবোধের মানদণ্ডের নিরিখে করা যেতে পারে। যথা - চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী। এই সূত্রেই আমার আলোচ্য বিষয় হল চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের চরিত্র-চিত্রণ। যেখানে চৈতন্যপূর্ব যুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে উপস্থিত আছে রাধা, কৃষ্ণ, সখীবর্গ, বড়াই, জটিলা প্রমুখ চরিত্রবর্গ (যেমন - বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ), সেখানে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা, কৃষ্ণ, বিবিধ গৌণ চরিত্র ছাড়াও নির্মিত হল গৌরাঙ্গলীলায় অংশগ্রহণকারী চৈতন্যদেবসহ বিবিধ প্রধান-অপ্রধান চরিত্রবর্গ। ফলে চৈতন্যদেবের চরিত্রের লৌকিক ভাব ও অলৌকিক ভাব দুইয়ের সান্নিধ্যের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সর্বাত্মকরূপে এক নব যুগ সৃষ্টি হল। এই নব যুগ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়-সম্ভারে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল - ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-সমসাময়িক কবিবৃন্দের পদসমূহে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র-চিত্রণ।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরিকরবর্গের মধ্যে অন্যতম প্রধান পরিকর তথা সহচর ছিলেন নরহরি সরকার। এঁর অবির্ভাবকাল সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন—

> "গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন- 'আমরা গুরুপরম্পরা শুনিয়া আসিতেছি যে ঠাকুর নরহরি শ্রী মন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে ৪/৫ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েন।'"[১]

তিনি শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে চার-পাঁচ বছর বরিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া চৈতন্যদেবের প্রিয় সুহৃদ গদাধর তাঁর মিত্র ছিলেন। নরহরির পিতার নাম নরনারায়ণ, মাতার নাম গৌরী দেবী। এছাড়া নরহরির সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল - তিনি শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন, এ সম্পর্কে ড. সত্যবতী গিরি লিখেছেন—

> "বৈষ্ণবদের মধ্যে সুপরিচিত এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় গোপালমন্ত্রের পরিবর্তে গৌরমন্ত্রে শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন। চৈতন্যের নাগরভাব- বৈশিষ্ট্য এঁদেরই সৃষ্টি।"[২]

এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নরহরি পদ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম চৈতন্যলীলা অবলম্বনে বাংলায় পদ লিখেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

পদকর্তা নরহরি সরকার গৌরাঙ্গের ভাবজীবনের মাধুর্য নিয়েই অধিকাংশ পদ লিখেছেন। এইসব পদে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় বিদ্যমান। ফলে তাঁর রচিত পদগুলিতে মহাপ্রভুর চরিত্রের সুন্দর রূপ পরিস্ফুট। তাঁর রচিত মহাপ্রভু রাধাভাব ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমের পরিস্ফূরণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে মহাপ্রভু কখনো খণ্ডিতা, কখনো কলহান্তরিতা, কখনো বিরহী, কখনো আক্ষেপানুরাগ প্রমুখ বিবিধ রূপে রূপায়িত হয়েছেন। যেমন - নিম্নোক্ত পদটিতে চৈতন্যদেবের খণ্ডিতা নায়িকার রূপ বিদ্যমান—

"প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে।।"[৩]

এই সঙ্গে পদটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে বলেছেন যে তাঁর প্রেমের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ কর্তৃক প্রতারণার বৃত্তান্ত। এক্ষেত্রে মহাপ্রভু এটি ব্যক্ত করতে গিয়ে অভিমানে ভেঙে পড়েছেন। এখানেই মহাপ্রভু খণ্ডিতা রাধার ভাবে ভাবিত হয়েছেন।

অন্যদিকে নরহরির অঙ্কিত খণ্ডিতা গৌরাঙ্গ প্রতারক কৃষ্ণের শঠতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। কখনো মহাপ্রভু দিব্যপ্রেমভাবে নিজেকে কৃষ্ণ মনে করে রাধাকে মনন করেছেন—

"গৌরাঙ্গ বৈকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে।।
সুরধুনি দেখি নন্দ যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে।।
পুরুষ আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে।।"[৪]

শুধু তাই নয়, মহাপ্রভু প্রিয়বন্ধু গদাধর পণ্ডিতকে রাধারূপে ভেবেছেন—

"রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে।
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখ পানে চাহে।।"[৫]

কৃষ্ণপ্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমিক চৈতন্যদেব গোপীভাবকেও পরিগ্রহণ করেছেন—

"দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ।।
বিভোর হইলা গোপীভাবে।
কহে পঁহু করিয়া আক্ষেপে।।"[৬]

এখানে যেন মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের রাধার মতোই গোপীভাব গ্রহণ করে নিদারুণ অভিমান প্রকাশ করে বলেছেন যে একদা প্রেমিক তাঁর জন্য চাঁদ আনবে উদ্যত ছিল, এখন সেই প্রেমিক নিজে-ই দুর্লভ হয়েছেন। এইভাবে চৈতন্যদেব প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্বরাগ ('গৌর সুন্দর মোর'[৭]), আক্ষেপানুরাগ ('আরে মোর গৌর কিশোর'[৮]), বিরহ ('গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়'[৯]) প্রভৃতি বিবিধ স্তর অতিক্রম করেছেন। বিশেষ করে 'বিরহ' পর্যায়ে মহাপ্রভুর দিব্যউন্মাদ দশার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অনিবার্যভাবে কৃষ্ণবিরহিনী রাধার অষ্টসাত্ত্বিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার মহাপ্রভুর পূর্বরাগ দশা অনেকটাই চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগদশার অনুরূপ হয়েছে।

এছাড়া নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের চরিত্রাঙ্কনে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নাগরভাব আরোপ করেছেন—

"বেলি অবসানে ননদিনী সনে
জল অনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কলসি ভাঙ্গিয়া এনু।।”[১০]

উপরোক্ত পদটিতে চৈতন্যদেব এক জনৈকা রমণীর নাগররূপে কল্পিত। মহাপ্রভুর এই অভিনব চরিত্রচিত্রণের পশ্চাৎপটে অনুপ্রেরণা ছিল পদকর্তার নাগরভাবের সাধনা। এই ভাবনা থেকেও পদকর্তা কিছু পদ রচনা করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কিত নরহরি সরকারের মহাপ্রভু-চরিত্র স্বতন্ত্র মহিমায় আসীন। এছাড়া তাঁর সৃষ্ট মহাপ্রভু প্রেমের বিবিধ স্তর যেমন অতিক্রম করেছেন, তেমনি চৈতন্যদেব কখনো রাধা; কখনো কৃষ্ণ, কখনো গোপীভাবে মণ্ডিত হয়েছেন।

পরবর্তী পদকর্তা মুরারী গুপ্ত মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ পরিকর ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের একইসঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সহপাঠী ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস শ্রীহট্টে হলেও পরবর্তীকালে তিনি নবদ্বীপে চলে আসেন। তিনি সুচিকিৎসকও ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনিও চৈতন্যদেবের চরিত্রে নাগরভাবের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন—

“সখি হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে।।”[১১]

উপরোক্ত পদটিতে গৌরাঙ্গকে ‘নাগর’ রূপে কল্পনা করে কোন এক নাগরী তাঁর সখীকে প্রেমের ক্ষেত্রে বঞ্চনার কথা আক্ষেপের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। কবি স্বয়ং ঐ নাগরীকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন যে কুলমান সর্বস্ব ত্যাগ করে গৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করলেই গৌরাঙ্গকে লাভ করা যাবে। তবে পদটি সম্পর্কে বিমান বিহারী মজুমদার বলেছেন—

> “গৌর নাগরী ভাবের ঈষৎ আভাষ এই পদের মধ্যে আছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে গৌরাঙ্গ প্রভু আকারে প্রকারে কোন রকমে নাগরীর প্রেমে উৎসাহ দিতেছেন না। পরবর্তীকালের নাগরী ভাবের পদে এই গণ্ডী রক্ষা পায় নাই।”[১২]

মুরারী গুপ্ত চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা অঙ্কিত করেছেন। কারণ তিনি খুব কাছ থেকে নিমাইয়ের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা প্রত্যক্ষ করেছেন। বাল্যলীলা-বিষয়ক পদগুলিতে শচীমাতা ও পুত্র নিমাইয়ের অপূর্ব বাৎসল্যপূর্ণ সম্পর্ক উদ্ঘাটিত—

“শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি।।”[১৩]

এছাড়া নিমাইয়ের হামাগুড়ি, ধীরে ধীরে চরণ ফেলা, ভূমিতে গড়াগড়ি, সমবেত শিশু সঙ্গে নিমাইয়ের নৃত্য সহযোগে ক্রীড়া-সব বর্ণনাই মুরারী গুপ্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। ফলে বালক নিমাইয়ের চরিত্র অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি এই ভাবনার পদগুলি গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক বা লৌকিক জীবন-কেন্দ্রিক। এদিক থেকে পদগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

অন্যদিকে মুরারী গুপ্ত চৈতন্যদেবের দিব্যভাব মূর্তিও অঙ্কন করেছেন—

“গদাধর অঙ্গে পঁহু অঙ্গ মিলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণগান বিভোর হইয়া।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে।।”[১৪]

এইভাবে মহাপ্রভু দিব্য ভাবে বিভোর হয়ে জ্ঞানশূণ্য হয়ে বিবিধ আচরণ করেছেন।

তাই বলা যায়, পদকর্তা মুরারী গুপ্তের অঙ্কিত চৈতন্যদেবের চরিত্রে লৌকিক জীবনের বাল্যাবস্থার চিত্র, অলৌকিক জীবনের দিব্য প্রেমের চিত্র, নাগরভাবের চিত্র- সবই প্রকটিত হয়ে চৈতন্যদেবের চরিত্র সার্থক হয়ে উঠেছে।

পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন চৈতন্যদেবের পরিকরমন্ডলীর মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতার নাম বল্লভ ঘোষ, অপর দুই ভাই হলেন মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ- যাঁরা ছিলেন অন্যতম বৈষ্ণব পদকর্তা। এঁদের বাসস্থান ছিল মুর্শিদাবাদ। কিন্তু মহাপ্রভুর অবতারত্বের কথা শ্রবণ করে গোবিন্দ ঘোষ নবদ্বীপে উপস্থিত হন ও মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে

কৃপালাভ করেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে তিনি পুরীতে অবস্থান করেন। ইনি কীর্তনগান ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করে মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "গোবিন্দ ঘোষের সমস্ত পদ গৌরাঙ্গ বিষয়ক, ইহার সহজ সরল কবিত্ব যেমন প্রশংসার যোগ্য, তেমনি চৈতন্যজীবনের চাক্ষুষ কাহিনী হিসাবে ইহার মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।"[১৫]

আর বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন—

> "গোবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতা প্রভুর ভাব-প্রকাশের বেশ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ছিল।"[১৬]

গোবিন্দ ঘোষ তাঁর ভক্তসত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেই চৈতন্যদেবের রূপানুরাগের কয়েকটি পদ অঙ্কন করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত পদটি—

"গোরাচাঁদ কিবা তোমার বদন-মণ্ডল।
কনক কমল কিয়ে শারদ পূর্ণিমা শশি
নিশি দিশি করে ঝলমল।।"[১৭]

এখানে মহাপ্রভুর দেহসৌষ্ঠবের প্রতি পদকর্তার রূপানুরাগ বিদ্যমান। অপর একটি পদে ('শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে'[১৮]) চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভাবে ভাবিত দিব্যভাবের রূপ প্রতিফলিত। এখানে আবার তিনি রাধাভাবেও ভাবিত হয়ে ললিতা, বিশাখা, যমুনা, বংশীবট, গোবর্দ্ধন পর্বত - এসবের কথাও তিনি ভেবেছেন। স্পষ্টতই এখানে চৈতন্যদেবের ভাব বিহ্বল চরিত্র পরিস্ফুট। আরেকটি পদে ('প্রাণের মুকুন্দ হে তোমরা কি সুধাও আমায়'[১৯]) চৈতন্যদেবের এক অন্যতর রূপ প্রকাশিত- যেখানে তিনি নিজে অবগত করাচ্ছেন সন্ন্যাস গ্রহণের তথা অবতারত্বের রহস্য কারণ-

"দেখিয়া জীবের দুখ ছাড়িনু গোলোকসুখ
লভিলাম মনুষ্য জনম।"[২০]

এই রহস্য ব্যক্ত করার মাধ্যমেই চৈতন্যদেবের অবতারত্বের মহিমা উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পদকর্তার হস্তে চৈতন্যদেবের চরিত্রে অলৌকিকভাব মণ্ডিত হয়েছে। এরই সঙ্গে রূপানুরাগের উপাদান মিশ্রিত আছে।

গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষ চৈতন্যদেবের নাম শ্রবণ করেই আদি বাসস্থান মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভুর ভক্ত হন। পরবর্তীকালে ইনি চৈতন্যদেবের বাক্য মতো গৌড়ে অবস্থান করে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হলেন। এই প্রচারে তাঁর মাধ্যম ছিল কীর্তনগান গীত ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা। তাঁর রচিত একটি পদে চৈতন্যদেবের দিব্য উন্মাদদশা চিত্রিত, যেখানে চৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্যরত, তাঁর সর্বাঙ্গে নানা ভাববিকার লক্ষণ প্রকটিত—

"নাচে পঁহু কলধৌত গোরা।
অবিরত পূর্ণফল মুখ বিধুমন্ডল
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা।"[২১]

এখানে রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় বিদ্যমান।

পদকর্তা বাসুদেব ঘোষও অগ্রজ গোবিন্দ ঘোষের মতোই নিমাইয়ের নাম শ্রবণ করে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। ইনিও কীর্তন গায়ক ছিলেন। ইনিও মহাপ্রভুর নির্দেশ মতো গৌড়বঙ্গে মহাপ্রভু - প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হলেন। ইনি চৈতন্যদেবের চরিত্রাঙ্কনে মহাপ্রভুর লৌকিক জীবন ও ভাবজীবন - উভয়কেই অবলম্বন করেছেন। মহাপ্রভুর লৌকিক জীবনের বর্ণনার ক্ষেত্রে শিশু নিমাইয়ের সুন্দর চরিত্র চিত্রিত—

"একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা।।"[২২]

কিংবা, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়িগুড়ি।।"[২৩]

উপরোক্ত দ্বিতীয় পদটিতে পুত্রের প্রতি শচীমাতার আহ্লাদও প্রকাশিত—

"আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে।।"[২৪]

এছাড়া পদকর্তা বালক নিমাইয়ের ক্রীড়ার বিভিন্ন ধরণও উপস্থিত করেছেন। আবার নৃত্যরত বালক নিমাইয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন—

"কিয়ে হাম পেখলুঁ কনক পুতলিয়া।"[২৫]

কীর্তনাঙ্গনে মহাপ্রভুকে অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তগণ কর্তৃক অভিষিক্ত করার চিত্র প্রকাশিত ('তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী'[২৬]) যেখানে মহাপ্রভুর অনির্বচনীয় রূপ প্রকাশিত। মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাসব্রত নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন—

"ডোর কৌপিন পরি মস্তক মুণ্ডন করি
মায়া ছাড়ি হৈলা উদাসীন।"[২৭]

এখানে চৈতন্যদেব স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত। আরেকটি স্থানে বাসু ঘোষ স্বতন্ত্র চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন- যেখানে মহাপ্রভু শান্তিপুরে অবস্থানকালে স্বয়ং শোকবিধুরা শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন—

"শুনিয়া মায়ের বাণী"[২৮]

পদটিতে। এখানে মহাপ্রভু নানাবিধ আশ্বাসবাক্যের দ্বারা শচীমাতাকে শান্ত করেছেন, এমনকি তিনি নদীয়ার লোকজনকেও প্রবোধ দিয়েছেন।

বাসু ঘোষ চৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবন চিত্রণের ক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবে ভাবিত নানাবিধ ভাববিকার অঙ্কন করেছেন ('সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়'[২৯])। তিনি চৈতন্যদেবকে কখনো কৃষ্ণরূপে, কখনো রাধারূপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন স্তরের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক আকৃতিকে চিত্রিত করেছেন। এখানেই চৈতন্যদেব নবরূপে মণ্ডিত হয়েছেন। কখনো চৈতন্যদেব রাধারূপে পূর্বরাগ ('নিরমল গোরা তনু'[৩০]), কখনো বাসকসজ্জিকা ('আপন জানি বনায়লুঁ বেশ'[৩১]), কখনো উৎকণ্ঠিতা ('এহেন সুন্দর বেশ কেনে বনাইলুঁ'[৩২]), কখনো বিপ্রলব্ধা ('আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চবরে'[৩৩]), কখনো খণ্ডিতা ('নিশি পরভাতে বসি আঙ্গিনাতে বিরস বদনখানি'[৩৪]), কখনো মানিনী ('কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে'[৩৫]), কখনো কলহান্তরিতা ('মঝু মনে লাগল শেল'[৩৬]), কখনো রসোদগার পর্যায়ের নায়িকা ('কি কহিব রে সখি আজুকে ভাব'[৩৭]), কখনো ভাবী বিরহে বিরহিণী ('আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান'[৩৮]) — এই রূপে প্রেমের বিচিত্র স্তর নানারূপে অতিক্রম করেছেন। এইসব ভাবজীবনকেন্দ্রিক পদগুলিতে চৈতন্যদেবের বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র প্রকাশিত। এছাড়া বাসু ঘোষ রাধাকৃষ্ণ লীলার অনুরূপ স্নানলীলা ('বায়স কোকিল ঘুঘু দহিয়াল রব'[৩৯]), গোষ্ঠলীলা ('বৃন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনি'[৪০]), দানলীলা ('আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল'[৪১]), নৌকালীলা ('না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে'[৪২]), পাশা খেলার লীলা ('গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব হইল'[৪৩]), ঝুলনলীলা ('দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র'[৪৪]) প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র লীলা সৃষ্টির দ্বারা চৈতন্যদেবের বিবিধ লীলামুখী চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত বাসুদেব ঘোষ অঙ্কিত চৈতন্যদেবের চরিত্রে নাগরভাব অর্পিত ('আজুকে প্রেম কহনে নাহি যায়'[৪৫])। ফলে এখানে এক অন্যতর ভাবে মণ্ডিত পূর্ণ চৈতন্যদেবের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর চরিত্রাঙ্কনে স্বতন্ত্র চিন্তাচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

গোবিন্দ আচার্য মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে গরিষ্ঠ ছিলেন। এঁর সম্পর্কে বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—

> "কবি কর্ণপুরের মতে গোবিন্দ আচার্য ব্রজে পৌর্ণমাসী ছিলেন, পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপন মুনির মাতা।"[৪৬]

এঁর অঙ্কিত চৈতন্যদেব বেশিরভাগ পদেই ('দেখ দেখ নাগর'[৪৭]) নাগরভাবে মণ্ডিত। এইসব পদে চৈতন্যদেবের নিষ্ক্রিয়তাই লক্ষিত, সক্রিয় শুধু নাগরী রমণী। তবে তাঁর অঙ্কিত একটি পদে ('নাচিতে নাচিতে প্রভু'[৪৮]) মহাপ্রভুর দিব্য ভাবের বর্ণনা প্রকাশিত।

পরমানন্দ গুপ্ত চৈতন্যদেবের সমকালীন কবি ছিলেন। ইনি নবদ্বীপেই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত ও নিত্যানন্দ এঁর গুরু ছিলেন। ইনি নিমাইকে খুব কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত চৈতন্যদেবের চরিত্রে অবতারের মহিমা প্রকাশিত ('গোরা অবতারে যার'[৪৯])। অপর একটি পদে মহাপ্রভু কৃষ্ণরূপে সজ্জিত হয়ে গদাধরকে রাধারূপে কোলে নিয়েছেন—

"গোরা তনু ধূলায় লোটায়।"[৫০]

এখানে মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভাবে ভাবিত হয়ে সখীবৃন্দেরও সন্ধান নিয়েছেন।

বাসুদেব দত্তের সহোদর ও শ্রীচৈতন্যদেবের মিত্র ছিলেন মুকুন্দ দত্ত। ইনি বৈদ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত, কীর্তনগায়ক, মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে গরিষ্ঠ ও পুরীযাত্রাকালে মহাপ্রভুর সঙ্গী হয়েছিলেন। ইনি জন্মেছিলেন চট্টগ্রামে। এঁর রচিত একটি মাত্র শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বিষয়ক পদ পাওয়া গিয়েছে। কাজেই এঁর পদে চৈতন্যদেব অনুপস্থিত।

মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত। ইনি মহাপ্রভুর জন্মের বহু পূর্বে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। এঁর রচিত একটিমাত্র গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ('অপরূপ গোরা নটরাজ'[৫১]) পাওয়া গিয়েছে- যেখানে মহাপ্রভুর সক্রিয়তা অনুপস্থিত। শুধুমাত্র বিদ্যমান কবির জবানীতে গৌরাঙ্গের প্রেমভাবে ভাবিত অনির্বচনীয় রূপের বর্ণনা।

শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধা করতেন। ইনি কবি কর্ণপুর বা পরমানন্দ সেনের পিতা ছিলেন। শিবানন্দের জন্ম কাঁচরাপাড়ার কাছে কুমারহট্ট গ্রামে। তাঁকে মহাপ্রভু একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সেটি হল - প্রতি বছর গৌড়ের যাত্রীগণ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভের জন্য যেতেন, এঁদেরকে নীলাচলে নিয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে এঁদের পথের ব্যয়ভারও শিবানন্দই বহন করতেন। শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণরূপে অঙ্কন করে চৈতন্যদেবের দিব্য প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। ফলে চৈতন্যদেব অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যেমন একটি পদে ('হোলি খেলত গৌরকিশোর'[৫২]) চৈতন্যদেব কৃষ্ণরূপে হোলি খেলছেন রাধারূপী গদাধরের সঙ্গে। এখানেই চৈতন্যদেবের চরিত্র অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী।

রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর একজন বিশিষ্ট সহচর তথা বিশিষ্ট কবি। তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রাম। ইনি মালাধর বসুর বংশধর ছিলেন ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত চৈতন্যদেব রাধাভাবে ভাবিত—

"স্বরূপের কান্ধে পঁহু ভুজ যুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর।"[৫৩]

এইভাবেই রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের অলৌকিক দিব্যভাবসমন্বিত চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান নবদ্বীপের কাছে কুলিয়াপাহাড় নামক গ্রামে। ইনি চৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি ও প্রিয় ভক্ত তথা প্রতিবেশী ছিলেন। এঁর রচিত গোষ্ঠলীলার অন্তর্গত একটি পদে ('শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদবয়ানে'[৫৪]) চৈতন্যদেব কৃষ্ণের মতো গোচারণ গমনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি কৃষ্ণের মতো নটবর বেশও ধারণ করেছেন। এখানে চৈতন্যদেব অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন — যা পদকর্তার কৃতিত্বের পরিচয়বাহী।

পরিশেষে বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের মহৎ আবির্ভাবের ফলে গৌরাঙ্গলীলা সংযোজিত হয়েছিল। ফলে চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রাধাকৃষ্ণলীলা ছাড়াও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ও বিবিধ চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এক সমৃদ্ধশালী সাহিত্য সম্পদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আমরা সকলেই জানি, চৈতন্যদেব নিজে কখনো কোন বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করেননি। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব, তাঁর জীবনদর্শন, ধর্মবোধ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সর্বোপরি তিনি মানবাতাবাদের পূজারী- এসব-ই এক সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, একজন অবতারের বিশেষ চরিত্র মাহাত্ম্য ও স্বভাব মাহাত্ম্য। এগুলি-ই এক যুগ বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দী এক গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তনের সময়কাল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই এই পরিবর্তন উদ্বোধিত হয়েছিল, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। এদিক থেকে বলা যায়, এসময়ের বিভিন্ন পদকর্তাদের পদে যেরূপে চৈতন্যদেবের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অঙ্কিত হয়েছেন, সেদিক থেকে পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এখানেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নব যুগের (চৈতন্য-রেনেসাঁস) দ্বার উদ্ঘাটিত হল।

Reference:

১. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান,* প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ৪৭
২. গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ,* প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৩৭
৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৬১, পদসংখ্যা-২৪ নং, পৃ-১৫৫
৪. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ, ১৩৬৮, পদসংখ্যা-৩৫ নং, পৃ. ৫৫
৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-১৪ নং, পৃ. ১৫৩
৬. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* পদসংখ্যা-৪৬ নং, পৃ. ৬৫
৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-১৬ নং, পৃ. ১৫৪
৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-২৮ নং, পৃ. ১৫৬
৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-২৭ নং, পৃ. ১৫৬
১০. *তদেব,* পদসংখ্যা-৭ নং, পৃ. ১৫২
১১. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯ নং, পৃ. ১৪৯
১২. মজুমদার, ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৮, পৃ. ১৪
১৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ১৪৭
১৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৩ নং, পৃ. ১৪৭
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী লিঃ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৬৬০
১৬. মজুমদার, ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* পৃ. ১৬
১৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-২ নং, পৃ. ১৫৭
১৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯ নং, পৃ. ১৫৯
১৯. *তদেব,* পদসংখ্যা ৬ নং, পৃ. ১৫৮
২০. *তদেব,* পদসংখ্যা ৬ নং, পৃ. ১৫৮
২১. *তদেব,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ১৫৯
২২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ১৬২
২৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫ নং, পৃ. ১৬২
২৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫ নং, পৃ. ১৬২
২৫. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯ নং, পৃ. ১৬৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 43 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৬. *তদেব,* পদসংখ্যা-২০ নং, পৃ. ১৬৫
২৭. *তদেব,* পদসংখ্যা-৯৫ নং, পৃ. ১৭৯
২৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-১০১ নং, পৃ. ১৮১
২৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-১১৩ নং, পৃ. ১৮৩
৩০. *তদেব,* পদসংখ্যা-২১ নং, পৃ. ১৬৫
৩১. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪২ নং, পৃ. ১৬৯
৩২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৫ নং, পৃ. ১৭০
৩৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৬ নং, পৃ. ১৭০
৩৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৭ নং, পৃ. ১৭০
৩৫. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪৯ নং, পৃ. ১৭১
৩৬. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫১ নং, পৃ. ১৭১
৩৭. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫৭ নং, পৃ. ১৭২
৩৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-৭৮ নং, পৃ. ১৭৬
৩৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-৫৬ নং, পৃ. ১৭২
৪০. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৩ নং, পৃ. ১৭৩
৪১. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৫ নং, পৃ. ১৭৩
৪২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৮ নং, পৃ. ১৭৪
৪৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬৭ নং, পৃ. ১৭৪
৪৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-৭০ নং, পৃ. ১৭৪
৪৫. *তদেব,* পদসংখ্যা-৬১ নং, পৃ. ১৭৩
৪৬. মজুমদার ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* পৃ. ২৪
৪৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ৩০২
৪৮. *তদেব,* পদসংখ্যা-১১ নং, পৃ. ৩০৩
৪৯. *তদেব,* পদসংখ্যা-২ নং, পৃ. ২৭৮
৫০. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ২৭৮
৫১. *তদেব,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ১০৮০
৫২. *তদেব,* পদসংখ্যা-৪ নং, পৃ. ২৪৪
৫৩. *তদেব,* পদসংখ্যা-৩ নং, পৃ. ১৯৮
৫৪. *তদেব,* পদসংখ্যা-১ নং, পৃ. ২৭১

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :
মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৬১
মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ, ১৩৬৮

সহায়ক গ্রন্থ :
গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ,* প্রথম সংস্করণ রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৮
গিরি সত্য, *বৈষ্ণব পদাবলী,* দ্বিতীয় সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, মাঘ, ১৪০১

মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান,* প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৬
মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ, ১৩৬৮
মজুমদার, ড. বিমানবিহারী, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড),* প্রথম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬২
মাইতি, রবীন্দ্রনাথ, *চৈতন্য পরিকর,* প্রথম প্রকাশ, বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 53 - 61
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলে উদ্ভাসিত পরিবেশ ভাবনা

শুচিস্মিতা পান
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ঠিকানা : কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : suchismitapan.g@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
ইকো ক্রিটিসিজম, ইকো টেক্সট, পরিবেশবাদী সাহিত্য, পরিবেশভাবনা, প্রাগাধুনিক সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অন্নদামঙ্গল, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, রাজসভার কবি, সাহিত্যতত্ত্ব।

Abstract
Bengali poet 'Bharatchandra Raygunakar' was one of the greatest poets of the medieval era. He wrote the poetry book, name 'Annadamangal'. Although 'Bharatchandra Raygunakar' was a medieval man, he was a modern-minded person. The concept of 'eco-text' is a product of modern times. But there are some hints of it in 'Bharatchandra Raygunakar's book 'Annadamangal'. It is surprising to us that an 18th century poet would make such allusions to Ecology, Ecosystem, food chain etc. Poet 'Bharatchandra' was an environmentally conscious poet. He was passionate about preserving the elements of the environment. In his book 'Annadamangal', Goddess mother Annapurna is the mother of all nature. She fills the entire world. She gives food. She protects every living being in the world. She is the mother of the universe. In the present world, which is plagued by pollution, the main mantra of environmental thinking is to maintain the balance of the environment, that is, the natural environment. In such a beautiful description of nature in the poem 'Annadamangal', all the elements of the known natural environment, such as plants, animals and birds, together create a healthy, beautiful and well-structured natural environment, as well as maintaining the balance and beauty of the environment. The creator of all this stable environment is Goddess Annapurna. Goddess Annapurna is the mother of the universe. This is what the scriptures say. 'Bharatchandra' established her in the image of the welfare of the larger world. The land where Annapurna resides was built, keeping everyone in mind, not at the expense of destroying the great nature.

Discussion

বাংলা ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত আপ্তবাক্য রয়েছে, সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। এই আপ্তবাক্যের মধ্যে সত্যতা রয়েছে। মানুষের সমাজের বিচিত্র সব বিষয় কালে কালে সাহিত্যে স্থান করে নিতে পেরেছে এবং সেটাই প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্যবস্থায় লিখিত সাহিত্যের একটি অতি স্বাভাবিক প্রবণতা। আরও একটু স্পষ্ট করে এক কথায় বলা যেতে পারে, মানব সমাজের বিচিত্র দাবি মেটাতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারার সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে নবস্বাদমুখী মানুষের জন্য। সাহিত্যের স্রষ্টাদের কলমে যখন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি সাহিত্য প্রকরণ একের পর এক সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তার পরে পরেই সাহিত্যের সহৃদয়-হৃদয়বান, মননশীল এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজের মধ্যে শুরু হয়েছে সেই সমস্ত সৃজিত সাহিত্য-প্রকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ, পরিশীলিত চিন্তন, গভীর অভিনিবেশ যুক্ত মনন এবং বহুমাত্রিক আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনা। এর প্রবাহ ও প্রভাব নতুনদের আরও ভাবতে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। আর সাহিত্য বিচারের নিরন্তর ও আধুনিকতার গতিপথের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ বা মনন থেকেই কালে কালে আবির্ভূত হয়েছে সাহিত্য সংশ্লিষ্ট নবতর সাহিত্যতত্ত্ব। কোনো একটি সাহিত্যের সঙ্গে আপাত পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকা সাহিত্যতত্ত্বের সম্বন্ধ ঠিক যেন কোনো নির্দিষ্ট একটি ভাষার সঙ্গে সেই ভাষারই পরিশীলিত ব্যাকরণের অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের মতো। বিশুদ্ধ ব্যাকরণ যেমন ভাষার পরে আবির্ভূত হয়ে সেই ভাষার শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা, পরিশীলিততা এবং ভাষার সঙ্গে থাকা তার যাবতীয় ছোট-বড় খুঁটিনাটি দিকের অনুপুঙ্খ বিচার, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষ ও বিয়োজন করে থাকে, ভাষার আধুনিক সাহিত্যের সাহিত্যতত্ত্বও তেমনই সাহিত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলে এবং পাঠকের মননের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আধুনিক সময়ের সৃষ্ট সাহিত্যের জগতে অন্যতম নবীন, আধুনিক ও যুগোপযোগী একটি ধারা হল 'ইকো-টেক্সট' (Eco-Text), যাকে আমরা সমসাময়িক বাংলা ভাষায় তথা বর্তমান সময়ে এসে 'পরিবেশবাদী সাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করেছি। সাধারণ ভাবে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Rachel Carson-এর 'Silent Spring' গ্রন্থটিকেই পরিবেশবাদী ভাবনার আদি গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন অনেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বিভিন্ন কীটনাশক বা পেস্টিসাইড জাতীয় পদার্থ থেকে পরিবেশ দূষণের বিষয়টি কার্সনের 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থের তুলে ধরেছেন। 'Silent Spring' গ্রন্থে Carson লিখেছেন -

> "On the morning that had once throbbed with the drown chourux of robins, Car birds, doves, Joys, wrens and scores of other birds' voices there was now no sound, only silence lay over the fields and woods and Marsh."[১]

এই ধরনের আধুনিক তথা নবীন ধারার বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ 'ইকো-টেক্সট' বা 'পরিবেশবাদী সাহিত্য' ধারাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য জন্ম নিয়েছে 'ইকো-ক্রিটিসিজম' (Eco-criticism) বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের।

আধুনিক সময়ের পৃথিবী ব্যাপী দূষণের প্রচণ্ড তাণ্ডব এখন সমগ্র মানব সমাজের ভিত্তিকে নাড়িয়ে তুললে শুরু করে দিয়েছে। প্রকৃতির এই পাল্টাঘাতেই মানুষের অসহায় অবস্থায় প্রকটিত হয়ে পড়েছে। আধুনিক থেকে আধুনিকতর বিজ্ঞান ও প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহের বিপরীতে থাকা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমে বিঘ্নিত হতে শুরু করে দিয়েছে। আধুনিক সভ্য মানুষের সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে নাগরিক মানুষের বৃক্ষচ্ছেদন ও নগরায়নে শুধুমাত্র পরিবেশের বিপন্নতা সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির অস্তিত্বও আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। তাই মানবজাতির সামগ্রিক চেতনা শক্তির সমুন্নত বিকাশ ঘটাতে এবং মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্যকে পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তদানীন্তন পরিবেশবাদী চেতনা ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। ফলস্বরূপ প্রকৃতি বা পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা আর শুধুমাত্র পরিবেশবাদী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সাহিত্যেই শিল্প-সাহিত্যেও পরিবেশকেন্দ্রিক সচেতনতা তৈরির প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রবণতা শুরু হয়ে গেছে। আর শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যেহেতু সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল সত্তা অন্তরে প্রতিনিয়ত লালন করেন তাই এই সমস্ত সংবেদনশীল স্রষ্টাদের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিল প্রাকৃতিক দূষণের ভয়াবহতা। তাঁদের আলোড়িত সংবেদনশীল শিল্পীসত্তা অচিরেই মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিল পৃথিবী ব্যাপী মানব সভ্যতা ক্রমাগত এক অনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী অনস্তিত্বের দিকে যাত্রা করতে চলেছে। তার ফলস্বরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরের পরিবেশ আন্দোলনগুলির পাশাপাশি কবি-সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল সত্তার জাগরণ ঘটেছে এবং

তাঁরাও কলম হাতে তাঁদের সৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত আন্দোলনের যোগদান করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সৃষ্ট বিচিত্র সব সাহিত্য সংরূপে এই অনুভূতি ক্রমে ভাষারূপ লাভ করেছে। ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশবাদী সাহিত্য এবং সূচনা হয়েছে পরিবেশবাদী সাহিত্য আন্দোলনের। আর এই সমস্ত পরিবেশবাদী সাহিত্যগুলিকে ভিন্নতর তথা নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন থেকেই 'ইকো-ক্রিটিসিজম' (Eco-criticism) বা পরিবেশবাদী সাহিত্য তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক Cheryll Glotfelty এবং Harold Fromm 'The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology' গ্রন্থে 'ইকোক্রিটিসিজম' বিষয়টিকে একটি ধারনা দেওয়ার প্রচেষ্টা করে বলেছেন–

> "Eco-criticism is the study of the relationship between literature and physical environment."[২]

'ইকো-ক্রিটিসিজম' বিষয়টি সঠিকভাবে জানতে হলে প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকা 'ইকোলজি' (Ecology) বা 'বাস্তুবিদ্যা' বিষয়টি। প্রাণীবিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল 'ইকোলজি' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। যার উৎস গ্রিক শব্দ 'Oikos' অর্থাৎ গৃহ বা বাসস্থান এবং 'Logos' অর্থাৎ বাণী বা অধ্যয়ন। বিজ্ঞানের যে শাখায় সমগ্র বিশ্বের জীবমণ্ডল তথা বিভিন্ন প্রাণী ও তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা বা চর্চা করা হয় তাকে 'ইকোলজি' বা 'বাস্তুবিদ্যা' বলে। যে প্রকৃতিতে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগতের বসবাস সেই প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী ও জীবজন্তু, উদ্ভিদ একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। প্রকৃতিতে ঠিকভাবে টিকে থাকতে গেলে প্রতিটি জীবগোষ্ঠীকে পরস্পরের ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল হতেই হবে। এটিই প্রকৃতির একটি সাধারণ নিয়ম। এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা নষ্ট হলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যাবে। নাগরিক মানুষের নগরায়নের পাশাপাশি অত্যাধুনিক বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অফুরন্ত চাহিদার ক্রমিক বৃদ্ধির ফলে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ সাধনে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মহামারী দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে মানুষের জীবন আজ ওষ্ঠাগত হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী দূষণের ভয়াবহতায় মানবসভ্যতা যখন বিপন্নপ্রায়, ভবিষ্যৎ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে এক গাঢ় তিমিরে, তখন মানুষ ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যার চর্চায় এবং তার প্রয়োগে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যা আজকাল কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের অন্তর্গত প্রাণী ও জীবজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং আন্তঃসম্পর্কের কথাই আলোচনা করে না এর বহুমাত্রিক রূপটি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী নানা বাস্তু ব্যবস্থা ও বাস্তু ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত জীবগোষ্ঠীর বিবর্তন তাদের সামাজিক ও মানসিক আচরণগত নানা রহস্যের উন্মোচন ঘটায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিতে 'ইকোলজি' বা বাস্তুবিদ্যার জন্ম হয়েছে, ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই রচিত হয়েছে সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নবীন সংযোজন 'ইকো-ক্রিটিসিজম' বা 'পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের' প্রেক্ষাপট।

আমাদের দেশ ভারতে নবীনতম সাহিত্যতত্ত্ব 'ইকো-ক্রিটিসিজম'-এর উত্থানের মূলে রয়েছে একটি দার্শনিক ভিত্তি। যাকে আমরা পরিবেশ দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়গুলি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ 'পরিবেশ দর্শন' বা 'Environmental Philosophy' তৈরি হয়েছে। এই ধারার পরিপুষ্টির ফলে পরিবেশ দর্শন ক্রমে দর্শনের একটি শাখা হয়ে উঠেছে। দর্শনের এই বিশেষ শাখাটিতে পরিবেশে বিশেষত প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অবস্থান এবং পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জটিল দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। পরিবেশ দর্শনে মূলত প্রকৃতি বলতে আমরা আসলে কী বুঝি, প্রকৃতি জগতে মানুষের স্থান, মানুষের কাছে মানবেতর পরিবেশের মূল্য কী হওয়া উচিত, পরিবেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিপর্যয়, পরিবেশ দূষণ এবং তার ফলে জলবায়ুর যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাতে মানব জাতির কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এবং সর্বোপরি প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মানব উন্নয়ন ও প্রযুক্তির আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়ে থাকে। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা এবং পরিবেশকে এক ভিন্নতর মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠা করার এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যই পরিবেশ দর্শন একবিংশ শতাব্দীতে এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী হয়ে উঠেছে। যে দৃষ্টিকোণগুলি থেকে পরিবেশ দার্শনিকগণ পরিবেশ

দর্শনের বহুবিধ আলোচনা করে থাকেন সেগুলি হল - পরিবেশ ও প্রকৃতিকে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করে পরিবেশের যথাযথ মূল্যায়ন, পরিবেশবাদ এবং 'ডিপ ইকোলজি' বা গভীর বাস্তুসংস্থান, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের স্বতন্ত্র নৈতিক মর্যাদা, পরিবেশের নানা বিলুপ্তপ্রায় বা বিপদসংকুল প্রজাতির যথাযথ সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে প্রকৃতি রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

পরিবেশ দর্শনেরই একটি শাখা হল 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' বা 'Environmental Ethics' বা 'পরিবেশ নীতিশাস্ত্র'। পরিবেশ দর্শনের এই বিশেষ শাখাটি গতানুগতিক মানবিক নীতিশাস্ত্রকে অতিক্রম করে মানবেতর জগত নিয়ে আলোচনা করে থাকে। পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষের যে নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা উচিত সেটিই পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়। নিজেদের উন্নতির স্বার্থে মানুষের একইভাবে বন-জঙ্গল ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা, কেন মানুষের পরিবেশের উপাদানগুলির সঠিক ব্যবহার, তার সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য পুনঃস্থাপন করা একান্ত কর্তব্য, মানব সম্প্রদায়ের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন জীব-প্রজাতির ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানুষের পরিবেশগত কোন কোন বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা উচিত এই সমস্ত জটিল নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়।

বিশিষ্ট পাশ্চাত্য দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম মানুষের মতো মানবেতর প্রাণীকুলকেও প্রাণের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি জগতে গুরুত্বের ভিত্তিতে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন বিশ্ব প্রকৃতির মানবেতর প্রাণীকুল মানুষেরই সমগোত্রীয়। প্রকৃতির রাজ্যে তারা কোনো অংশে মানুষের তুলনায় পৃথক নয়। বেন্থামের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা মানুষ ও মানবেতর প্রাণীকুলকে চেতনা ও চিন্তাশক্তির মানদণ্ডে পৃথক করার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে বেন্থামের যুক্তিই প্রতিষ্ঠা পায়। বেন্থামের মতে চিন্তা-চেতনার অভাব থাকলেও মানবেতর প্রাণীকুল মানুষের তুলনায় একটুও হীন নয় কারণ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ যে যন্ত্রণা অনুভব করে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরাও চিন্তা-চেতনা শক্তির অভাবে একই যন্ত্রণা অনুভব করে। সুতরাং এই বিশ্ব চরাচরে প্রাণী হিসেবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এবং স্বাধীন জীবনধারণের যে অধিকার সমগ্র মানবজাতির রয়েছে সেই একই অধিকার সমস্ত মানবেতর প্রাণীরও প্রাপ্য। বেন্থামের পূর্বে এমন উদারনৈতিক ও বিশ্বজনীন ভাবনার কথা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কিছুকাল পরেই দার্শনিক ক্রিস্টোফার স্টোন বেন্থামের এই ভাবনাকেই আরও বিস্তৃত আকার দেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র প্রাণীকুলই নয় জীবজগতের চারপাশের সমস্ত জড়প্রকৃতিরও অক্ষত থাকার অধিকার আছে। সমগ্র জড়প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য তথা জল, মৃত্তিকা, বাতাস, অরণ্য, মরুভূমি, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নদী ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই অক্ষত থাকার আইনগত অধিকারের কথা বলেছিলেন ক্রিস্টোফার স্টোন। দার্শনিকদের এই সমস্ত ভাবনা সূত্র থেকেই পরিবেশ নীতিবিদ্যার সফল প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যে কয়েকটি সময়পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে তার মধ্যে প্রাগাধুনিক পর্বটি বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ের সাহিত্য ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে মূলত পদ্যে। অর্থাৎ এসময়ের সাহিত্য ছিল বেশিরভাগই পাঁচালীধর্মী আখ্যান কাব্য। তাই এই সময় পর্বের বাংলা সাহিত্যে বর্তমানের বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচলিত পরিবেশ ভাবনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও নিসর্গ প্রকৃতির নানা বর্ণাঢ্য রূপচিত্রণে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যগুলি বাংলা সাহিত্য সভায় এক অনন্য স্থানের অধিকারী। ইংরেজিতে যাকে আমরা 'Nature Writing' বলে চিহ্নিত করি তার বৈশিষ্ট্য হয়তো এই পর্বের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ বর্ণিত বন জঙ্গলে ঘেরা আরণ্যক প্রকৃতির ছায়াসুনিবিড় পরিবেশ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকৃতিনির্ভর বৃন্দাবনীজীবন, বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুনিপুণ বর্ণনার পাশপাশি বারোমাস্যা অংশে বাংলার বারো মাসের সুখ-দুঃখের কাহিনিতে ষড়ঋতুর মনোরম প্রাকৃতিক শোভা এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত প্রকৃতির প্রতিকূলতার দৃশ্য — এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতিরাজ্যের অভাবনীয় সৌন্দর্যের অফুরন্ত সম্ভার।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক পর্বের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলি থেকেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক চর্চার একটি ধারা চলে এসেছে। যার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে রচিত বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতি একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। স্বর্গের দেব-দেবীদের মর্ত্যলোকে পূজা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রচারের কাহিনি নিয়ে রচিত বাংলাা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বাংলার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যে বর্ণনাগুলি মঙ্গলকাব্যের কবিরা করেছেন আপাতদৃষ্টিতে তা নিছকই প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ও সুন্দর রূপচিত্রণ বলে মনে হলেও এর মধ্যে কোথাও কোথাও ফুটে উঠেছে আধুনিক পরিবেশ ভাবনার প্রাক্-রূপের বেশ কিছু উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, কখনও বা উঠে এসেছে বাঙালি কবিদের পরিবেশ সচেতনতার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত।

পরিবেশবাদী ভাবনার সাহিত্য বা সাহিত্য বিচারে পরিবেশ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের পরিসরে একটি নবতম সংযোজন। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই ভাবনার তেমন কোনো অবকাশ ছিল না। কবিরা তাঁদের স্বভাববশত প্রকৃতির যে বর্ণনা করেছেন, বর্তমান পরিবেশ ভাবনার প্রেক্ষিতে কোথাও কোথাও তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্যিকেরা পরিবেশবাদী ভাবনার যে সাহিত্য রচনা করেছেন মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন কাহিনির মধ্যে কখনও কখনও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বের কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকলেও পরিবেশ ভাবনার যে দৃষ্টান্তগুলি মঙ্গলকাব্যের পরিসরে ফুটে উঠেছে আধুনিক পাঠকের পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে তা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই পরিবেশের সূত্র ধরেই কাব্যে এসেছে প্রকৃতি সংলগ্ন জনজীবনের কথা। সাধারণভাবে জনজীবন বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ বসবাস করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিশেষ ধরনটি। জীবনযাত্রার এই ধরনটি গঠিত হয় সেখানকার পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা ইত্যাদি পরিবর্তনশীল বিষয়ের সমন্বয়ে। পরিবেশ ভাবনার আলোচনায় জনজীবনের বিষয়টিও তাই পাশাপাশি চলে আসে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে জনজীবনের এরকমই বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড, বিক্ষিপ্ত চিত্রগুলি উঠে এসেছে, যেগুলি থেকে তৎকালীন জনজীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের যশস্বী কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাকবি ছিলেন। সাবেক বিদ্যায় দক্ষতা ও আধুনিক জীবন চেতনা তাঁর স্বভাবসুলভ ছিল। এরই প্রভাব তাঁর কাব্যে বারবার উদ্ভাসিত হতে দেখা গেছে। ফলে পরিবেশের উপাদানগুলির প্রতি সচেতনতার বোধ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হতেও দেখা গেছে। তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কাব্যের বহু অংশ ভারত কবির নিজস্ব পরিবেশ সচেতনতার দৃশ্য রয়েছে, যা বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকেও চর্চার সুযোগ রয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা একজন রাজসভার কবি সেই সময়ে এতটা আধুনিক চেতনাসম্পন্ন ছিলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের পরিসরে উদ্ভাসিত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পরিবেশ ভাবনার কয়েক দিক নাতিদীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে।

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম খণ্ডে কবি শিবের নিজস্ব ভূমি কৈলাস পর্বতের বর্ণনা অংশে পার্থিব সৌন্দর্যে ভরপুর প্রাকৃতিক পরিবেশের এক দারুন চিত্ররূপময় বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কৈলাসের ভূমিতে রয়েছে নানা জাতির তরু ও লতারাজি। বিভিন্ন ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে রয়েছে সমগ্র কৈলাসের ভূমি। বিবিধ পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ নিজ নিজ কর্মে রত রয়েছে সেখানে। শিবভূমি যেন তাদের অভয়ারণ্য। সেখানে সিংহের গম্ভীর গর্জন, কোকিলের মৃদু হুঙ্কার, ভ্রমরের ঝটিকা ঝঙ্কার, মৃগের পালের গতাগতি; এর সবকিছুই একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় কাব্যে। এখানে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ নিরাপদে তাদের জীবন কাটাচ্ছে। এখানে কোথাও কোনো বিপ্রতীপ ঘটনা নেই। ভারতচন্দ্র লিখেছেন -

"তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত।।
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে

মুনির মানস হরে।।”[৩]

এই দৃশ্য যেন প্রকৃত অর্থেই আধুনিক সময়ে বহু কাঙ্ক্ষিত এক আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশের দৃষ্টান্ত। মানুষের অপরিমিত লোভের ধাক্কায় বর্তমানকালে এই ধরনের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য আর সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না বললেই চলে। শুধু এটুকুর মধ্যেই ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কল্পনা সীমাবদ্ধ নয়। কৈলাসের সমস্ত জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ মিলে কৈলাসের পটভূমিতে সুন্দর এক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলেছে। সেখানে ময়ূর-ভুজঙ্গ, ইঁদুর-বিড়াল পরস্পর রক্ষক ও ভক্ষকের অবস্থায় থাকলেও পরস্পরের বিপর্যয় বা বিনাশের কারণ হয়ে ওঠেনি। শিবক্ষেত্র কৈলাসে একই বলয়ের মধ্যে পরস্পর খাদ্যখাদক সম্পর্কে থেকেও প্রাকৃতিক বিপত্তি নির্মাণ করেনি। এরা সবাই মিলে একটি সামগ্রিক বাস্ততন্ত্রেরও ধারণা তৈরি করেছে। অথচ ভারতচন্দ্র যে সময়ে এই চিত্রটি নির্মাণ করেছেন তখন আধুনিক বাস্ততন্ত্র ও খাদ্যশৃঙ্খলের ধারণাই তৈরি হয়নি। এখানে ধরা পড়েছে যে দৃশ্যগুলি তার সবটাই কবি সংগ্রহ করেছেন জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে। ভাবতেই অবাক লাগে মধ্যযুগের পটভূমিতে দাঁড়িয়েও কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পরিবেশ ভাবনা সময়ের থেকে কতটা এগিয়ে ছিল। কবি লিখেছেন -

“ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল।।
সব পিয়ে সুধা নাহি তৃষা ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে।।”[৪]

বলাবাহুল্য অন্নদামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত এই ঘটনা প্রকৃত বাস্তবসম্মত নয়। কৈলাসের হিমশীতল ভূমিতে এই জীববৈচিত্র্য সম্ভব নয়। কবি যেন হিমশীতল কৈলাসকে বঙ্গের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। এবং এত চমৎকার জীবসন্নিবেশের মধ্যে দিয়ে তিনি জাগতিক বহুল পরিচিত পরিবেশের সুন্দর এক জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরে রেখেছেন। বর্তমান সময়ের পরিবেশ ভাবনার তথা পরিবেশকে রক্ষা করার অন্যতম দৃষ্টান্ত হতে পারে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যে প্রকাশিত এই বর্ণনাটি।

‘অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মান’ অংশে কাশীতে অন্নপূর্ণার যে পুরী নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে সৃজন করা হয়েছে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। পুরীর সম্মুখে নির্মিত হয়েছে মনোহর সরোবর, যার মধ্যে পাতালগঙ্গায় ভোগবতীর গভীর সুশীতল নির্মল জলরাশি রয়েছে। সেখানে আরও বহু প্রাণীর সৃজন করা হয়েছে। ডাহুক, খঞ্জন, সারস, বক, তিতির, পানিকাক, চক্রবাক, কাদাখোচা, বেনে বউ প্রভৃতি পাখি রয়েছে; হাঙ্গর, কুমির, শুশুক, মকর প্রভৃতি জলচর প্রাণী উপস্থিত রয়েছে; চিতল, কই, কাতলা, মৃগেল, ল্যাটা, শোল, খয়রা, ভোলা, মাগুর, বাটা, সিঙ্গি, চিংড়ি, ট্যাংরা, পুঁটি, ইলিশ, তোপসে প্রভৃতি মাছ রয়েছে; অশোক, কিংশুক, চাঁপা, করবী, গন্ধরাজ, বকুল, টগর, শিউলি, রঙ্গন, মালতি, মাধবীলতা, মল্লিকা, কাঞ্চন, জবা, চন্দ্রমল্লিকা, কনকচাঁপা, কেতকী, চন্দ্রমুখী, সূর্যমুখী, অতসী, কদম, বক, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষ রয়েছে; আম, জাম, নারকেল, কাঁঠাল, খেজুর, সুপারি, শাল, পিয়াল, তমাল, হিজল, তেঁতুল, তাল, বেল, আমলকি, অশ্বত্থ, বট, হরিতকী ইত্যাদি বৃক্ষ রয়েছে; ময়না, শালিক, টিয়া, তোতা, কাকাতুয়া, চাতক, ময়ূর, কোকিল, বাজ, শকুন, শঙ্খচিল, নীলকণ্ঠ, কাক, প্যাঁচা, বাবুই, বাদুড়, ছাতারে, ফিঙে, টুনটুনি, মুনিয়া, চড়ুই, বুলবুলি ইত্যাদি নানা জাতের পাখি আছে; বাঘ, গণ্ডার, ঘোড়া, উট, মহিষ, হরিণ, বানর, ভাল্লুক, গরু, ছাগল, কুকুর, ভেড়া, সজারু, খেঁকশিয়াল, গাধা, বারশিঙ্গা, নকুল, বিড়াল, শৃগাল ইত্যাদি পশু রয়েছে; কেউটে, খরিশ, ময়াল, বোড়া, চিতি, শঙ্খচূড়, অজগর, তক্ষক, লাউডগা, বিছা, পিঁপড়ে প্রভৃতি প্রাণী আছে, বহু সাপ ও বিষধর প্রাণী রয়েছে দেবীর পুরীর বৈচিত্র্যের অংশীদার হয়ে। শুধু তাই নয় স্বয়ং মহাদেব এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রাণ দান করেছেন :

“সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব।।”[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিবেশের সমস্ত পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল এই সমস্ত কিছু নিয়ে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃজন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে, তাকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে পরিবেশের সমস্ত উপাদানগুলিকে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান নগরায়নের যুগে যেখানে মানুষ বন-জঙ্গল কেটে প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা পরিবেশের উপাদানগুলির বিনাশ ঘটিয়ে গড়ে তুলছে বিলাস-বহুল বিশালাকার অট্টালিকা, শিল্পাঞ্চল, কলকারখানা সেখানে মধ্যযুগে রচিত কাব্যটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশকে অক্ষত রেখে পুরী নির্মাণের এহেন ঘটনা আমাদের মনে পরিবেশ ভাবনারই জন্ম দেয়। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নাগরিক সমাজকে কাছ থেকে দেখেছিলেন। মধ্যযুগের শেষপ্রান্তেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নগরায়ন ও বনপালন ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। বন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র্য সম্পন্ন প্রাণীকুলের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখেই নগরায়ন সম্ভব। পৃথিবীটা সবার। মানুষ যেমন খুশি তেমন ভাবে তার প্রতিপত্তির প্রভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করতে পারে না। সদ্য মধ্যভারতে বনধ্বংসের বিরুদ্ধে মানুষ সমবেত হয়ে বিরাট জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অথচ ভারতচন্দ্র রায় সেই যুগে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন নগরায়ন ও বনপালন পরস্পরের সঙ্গে বিরুদ্ধ সম্পর্কে দাঁড়িয়ে থাকা কখনও কাঙ্ক্ষিত নয়। বণপ্রকরণ প্রয়োজন, নগরায়নও প্রয়োজন। তাদের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে। প্রকৃতির ধ্বংসস্তূপের ওপর সভ্যতার নির্মাণ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরেরও কাঙ্ক্ষিত ছিল না। ভারতচন্দ্র আমাদের যেন আধুনিকতার পাঠ দিচ্ছেন, পরিবেশ বিপন্ন করাটা আধুনিকতার লক্ষণ নয়। পৃথিবীটা সবার। মানুষের যেমন এর ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনই সমান অধিকার রয়েছে মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদের। এদের একজনেরও বিপন্নতা পৃথিবীর জন্য শুভ হতে পারে না।

কাশীপুরে 'অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান' অংশে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের যে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যেও আমরা বর্তমানের আধুনিক পরিবেশ ভাবনারই সমমাত্রার ইঙ্গিত ফুটে উঠতে দেখি। অন্নপূর্ণেশ্বরী ভগবতীর কাশীপুরে কোকিলের কলতান, বকুল ফুলে ভ্রমরের দল, পরিমল কমল নিয়ে শীতল জল বাতাসের দোলায় উছলে উঠছে, ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন, কুসুমে সুশোভিত উপবনে মন্দ মধুর মলয় বাতাস, কোকিলের কুহু কুহু হুঙ্কার, ভ্রমরের গুনগুন ঝঙ্কার ইত্যাদি মিলে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা রচনা করেছে। এই দৃশ্যগুলি যেন কাশীতে ভগবতী দেবী অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের চালচিত্র তৈরি করেছে। দেবী অন্নপূর্ণেশ্বরী দুর্গা বা অন্নদা এখানে অন্নদাত্রী রূপে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেননি। দেবী এখানে পূর্ণতার প্রতীক। সমগ্র মহাপ্রকৃতির ধাত্রী তিনি। সবাইকে তিনি পোষণ করেছেন, রক্ষা করেছেন, আগলে রেখেছেন। এই অপূর্ব সৌন্দর্য মানসে উপভোগ করে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখলেন -

"মধু মাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন।।
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে।।
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে।।
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে।
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে।।"[৬]

বর্তমানে দূষণে জর্জরিত সমগ্র পৃথিবীতে পরিবেশ ভাবনার মূল মন্ত্রই হল পরিবেশের তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রকৃতির এহেন সুন্দর বর্ণনার মধ্যে গাছপালা, পশু-পাখি ইত্যাদি পরিচিত সব প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্ত উপাদানগুলি মিলিতভাবে এক সুস্থ সুন্দর সুগঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য ও সুন্দর ভাবে রক্ষিত হয়েছে। এই সমস্ত সুস্থির পরিবেশের নির্মাতা দেবী অন্নপূর্ণা। দেবী অন্নপূর্ণা যে বিশ্বজননী। এ তো শাস্ত্রের কথা। ভারতচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠা করেছেন বৃহত্তর জগতের কল্যাণের চিত্রে সংস্থাপিত করে। অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের ভূমি নির্মিত হয়েছে তাই সবাইকে আগলে রেখে, মহাপ্রকৃতির ধ্বংসের বিনিময়ে নয়। সময়ের থেকে কতটা এগিয়ে ছিলেন ভারতচন্দ্র তা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়।

এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনিতে 'পুরবর্ণন' অংশে সরোবরের চারিপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করেছন কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। চারিপাশে সুচারু পুষ্পের উপবন, মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে তার সুগন্ধ, কোকিলের কুহু কুহু ডাক, ভ্রমরের গুঞ্জন, মৃদুমন্দ বাতাসের ছোঁয়া লেগে জল টলটল করছে, নানা পাখি জলচর সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে, জলে নানা রঙের পদ্ম ফুটে রয়েছে, ডাহুক-ডাহুকী ডাকছে, খঞ্জন-খঞ্জনী গান গাইছে, এছাড়া সারস-সারসী ও রাজহংস ইত্যাদি জলসংলগ্ন পাখি আনন্দ করছে, নগরের পুষ্পবনে বনচারী পাখিরা নিশিদিন জেগে রয়েছে। কল্পরাজ্যের মতো সেখানে সর্বদা ছয় ঋতু বিরাজ করছে। এই অংশেই তৈরি হবে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমের আখ্যান। প্রকৃতি এই রূপবৈচিত্র্য যেন এই দুই মানব-মানবীর প্রেমের পটভূমি রচনা করে চলেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যময় দিকটি বাস্তবিকই মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। এটা একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এর সমর্থন করে। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমের পটভূমি সাজিয়ে তুলতে গিয়ে আয়োজন করেছেন এমন এক চিত্ররূপময় পরিবেশের। ভারতচন্দ্র এই অংশে লিখেছেন -

"চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন।।
কুহু কুহু কোকিল কোকিলাগণ ডাকে।
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা ঝাঁকে ঝাঁকে।।"[৭]

এছাড়াও কাব্যের এই খণ্ডে 'সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা' অংশে আমরা গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য এবং নদী বিধৌত অখণ্ড বাংলাদেশের চিত্ররূপের আলোকচ্ছটা ফুটে উঠতে দেখি। বাংলাদেশের নদীভিত্তিক জীবনচর্চার ঝলক রয়েছে এখানে। মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির শুভশক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এখানে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। যা প্রকৃত অর্থেই কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সচেতন পরিবেশ ভাবনারই ইঙ্গিত বহন করে। আধুনিক সভ্যতায় বসবাসরত কেউই প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে নদ-নদীর ভূমিকার কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আর নদ-নদী না থাকলে সে দেশের মানুষের জীবনধারণ যে কতটা কষ্টকর এই বিষয়টিও উঠে এসেছে কাব্যে। তা যেন প্রকারান্তরে নদী সংরক্ষণের ও জলসম্পদ রক্ষার প্রতিই আমাদের চেতনা ফিরিয়ে দেয়। জলের ওপর নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে। জল মানুষের জীবনধারণের আবশ্যক অঙ্গ। জলের অপ্রতুল অবস্থা একটা সভ্যতাকে নিমেষে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। নদীহীন বা জলহীন অবস্থার বিপর্যয়ের দৃশ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন কবি ভারতচন্দ্র আমাদের দেখিয়েছেন অনন্য দক্ষতার সঙ্গে। কাব্যের এই অংশে রয়েছে -

"শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা।।
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর।"[৮]

এছাড়াও সমগ্র কাব্যজুড়ে পরিবেশের তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা ছোট বড় চিত্র, অসংখ্য ফুল, ফল, বৃক্ষ, পশু-পাখি, নদ-নদীর নাম ও পরিচয় এবং অসংখ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় কবি ভারতচন্দ্রের পরিবেশ ভাবনা তথা পরিবেশ সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

Reference:

১. Carson, Rachel, Silent Spring, 1st Edition, Penguin Books, London, Repented in Penguin Classics 2000, P. 21

২. From, Harold and Glotfelty, Cheryll (Edited), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, The University of Georgia Press, Athens and London, 1996, P. xviii

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ এবং সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম সংস্করণ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮

৪. তদেব, পৃ. ৭৮

৫. তদেব, পৃ. ১০৪

৬. তদেব, পৃ. ১১৪

৭. তদেব, পৃ. ২১৬

৮. তদেব, পৃ. ৩৪৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 62 - 70
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কৃত্তিবাস পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে রামকথা

ড. মর্জিনা খাতুন
সহকারি অধ্যাপক, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ
রাণীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান
Email ID: marjinakhatun050@gmail.com

***Received Date** 10. 04. 2025*
***Selection Date** 23. 04. 2025*

Keyword
Ramayana, Pre-Krittibas, Krittibas, Bengali Literature, Folk tales, Rhymes, Oral traditions, Cultural practices.

Abstract
To the Bengali populace, the Ramayana is synonymous with Krittibasi Ramayana. It is Krittibas's rendition of the epic that is revered and read with devotion in Bengali households even today. Krittibas, believed to have lived in the fifteenth century, holds a unique position in literary history, as no evidence of a complete Ramayana composed in Bengali exists prior to his work. In essence, it was Krittibas who pioneered the tradition of retelling the Ramayana in the Bengali language. This raises a compelling question: what inspired Krittibas to undertake such a monumental task in the absence of a pre-existing Bengali model? Those familiar with Krittibas recognize him not only as a learned scholar but also as someone deeply attuned to the social and cultural ethos of his time. A man of such insight would not have embarked on this endeavor impulsively. Rather, he must have been acutely aware of the Bengali people's emotional and spiritual connection to the Ram narrative, even if a complete textual tradition was absent. While a unified Bengali Ramayana may not have existed before him, fragments of the epic had long permeated everyday life—through folk tales, rhymes, oral traditions, and cultural practices. The Bengali psyche was already steeped in the essence of Rama's story. In this article, I attempt to reconstruct how the tales of Rama permeated pre-Krittibas Bengal, exploring the forms and channels through which Ramkatha (the story of Rama) thrived in the cultural and social landscape of the Bengali people long before it found its definitive literary expression.

Discussion

ভূমিকা : বাঙালির ঘরে ঘরে বহুল পঠিতব্য রামায়ণ বাল্মীকির নয়, কৃত্তিবাসের রচিত। বলা যায় রাম কথাকে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বাল্মীকির রামকথাকে বাঙালির ঘরের কথায় পরিণত করেন। অর্থাৎ এককথায় রামকথাকে তিনি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তবে সুদূর প্রাচীনকালেও রামায়ণের জনপ্রিয়তা বাংলাতে কোন অংশে কম ছিল না। অর্থাৎ বাঙালি একেবারে রামায়ণ সম্পর্কে অনবহিত ছিল তা নয়। বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের গঠন প্রকৃতি ও বিষয় বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কৃত্তিবাসের পূর্বেও বাংলায় রামায়ণ চর্চার একটা সমৃদ্ধ ধারা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহমান ছিল। শিষ্ট সাহিত্যের ভাষা যখন সংস্কৃত ছিল তখনও বাঙালি কবির লেখনীর বিষয় হয়েছে রামায়ণ। আবার অনেকসময় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে রামায়ণে ঘটনাবলী। প্রাদেশিক ভাষা তথা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার প্রাক্ পর্বে যখন কবিরা নিজেদের মাতৃভাষায় টুকরো টুকরো আকারে ছড়া বা কবিতা রচনা করেছেন তখনও কখনো কখনো রামায়ণকে বিষয় করেছেন। আবার যে সব রচনা মৌখিক ছিল যেমন- ছড়া, লোকসঙ্গীত, লোককথা, পটুয়া সঙ্গীত সেগুলোতেও রামায়ণ বিষয় হিসেবে এসেছে। যদিও কালের গ্রাসে পতিত হয়ে সেগুলো আজ আর পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে বাংলার জনসমাজে রামায়ণের জনপ্রিয়তা বহু প্রাচীন তা হঠাৎ করে প্রাপ্ত নয়।

(১)

সংস্কৃত ভাষায় বাঙালির রচিত প্রথম রামচরিত গ্রন্থ অভিনন্দের লেখা। তাঁর কাব্যের নাম 'রামচরিত'। তবে কাব্যে রামের মাহাত্ম্যের তুলনায় দেবীর মাহাত্ম্যই বেশি কীর্তিত হয়েছে। তিনি হনুমানের মুখ দিয়ে দেবীর স্তব করিয়েছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর নামেও একখানা 'রামচরিত' কাব্য পাওয়া যায়। তাঁর পরিচয় তিনি রামপালের মহামন্ত্রী এবং প্রজাপতি নন্দীর পুত্র। তিনি কাব্যে নিজেকে 'কলিকাল-বাল্মীকি' নামে অভিনন্দিত করেছেন। কাব্যটির বিষয় এক অর্থে রামের কাহিনি অন্য অর্থে রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারি দ্বিতীয় গোপাল ও মদনপালের ইতিহাস। রামায়ণ শুধু কাব্যের বিষয় নয় অনেক সময় নাটকের বিষয়ও হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দির দিকে লেখা মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘ রাঘব' রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে লেখা। এছাড়া 'মারীচবঞ্চিতক' 'কেকয়ীভরত' 'কৃত্যারাবণ' এবং বালিবধের কাহিনিও রাময়ণ থেকে গৃহীত।

শুধু সংস্কৃত নয় বাঙালির অবহট্ট ভাষাতেও রচিত সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন মেলে এবং অবহট্ট ভাষাতেও যখন তাঁরা সাহিত্য চর্চা করছেন তখনও প্রসঙ্গ ক্রমে রামায়ণের ঘটনা এসেছে। নবম শতাব্দি থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দির আরম্ভ পর্যন্ত পশ্চিমে গুজরাট থেকে আরম্ভ করে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত নবীন আর্যভাষার প্রাদেশিক রূপ লাভের পূর্বে অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ অবহট্ট বা অপভ্রষ্ট প্রচলিত ছিল লোকসাহিত্যের ভাষারূপে, সংস্কৃতের হীন বিকল্প ভাবে।[১] খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দির দিকে সংকলিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' অপভ্রংশ-অবহট্ট ছন্দোনিবন্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা ও গান পাওয়া যায়। গ্রন্থের আশীর্বচন পুষ্পিকায় রাধাকৃষ্ণ, হর-গৌরী, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর বন্দনার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনাও পাওয়া যায়। অর্থাৎ রামের মাহাত্ম্য বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় ছিল। তবে এই রাম কোন ক্ষত্রিয় যুবরাজ নন তিনি একজন বিঘ্নহন্তা, বিপদতারণ। বাঙালি নিজের মত করে রামকে অঙ্কন করেছেন -

"দীহা বীহা কামো রামো।
জহা জুঝঝে সুভভং দেউ।।"[২]

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ পরম সুন্দর রাম, যেখানে দুঃখ যেখানে যুদ্ধ বা জীবন সংগ্রাম সেখানেই তুমি চির মঙ্গলময়ী রূপে বিরাজ কর।

"বপ্পঅ উত্তি সিরে জিণি লিজ্জিঅ
তেজ্জিঅ রজ্জ বণন্ত চলে বিণু
সোঅর সুন্দরি সঙ্গহি লগগিঅ
মারু বিরাধ কবন্ধ তহা হণু।
মারুই মিল্লিঅ বালি বহিল্লিঅ
রজ্জ সুগীবহ দিজ্জ অকন্টঅ
বন্ধু সমুদ্দ বিণাসিঅ রাঅণ
সো তুহ রাহব দিজ্জউ ণিবভঅ।।"[৩]

অর্থাৎ 'বিজ্ঞ যিনি বাপের উক্তি শিরে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে বনান্তে চলেছেন, সোদর ও সুন্দরী সঙ্গে নিয়েছেন; যিনি বিরাধকে মেরেছিলেন, কবন্ধকে হত্যা করেছিলেন, মারুতির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, বালি বধ করেছিলেন, অকন্টক রাজ্য সুগ্রীবকে দিয়েছিলেন, সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন, রাবণকে বিনাশ করেছিলেন, সেই রাঘব তোমাদের নির্ভয় দান করুন।'

(২)

বাঙালির রামায়ণ চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল সেন রাজত্বকালেও। রাজসভা এবং সামন্তসভাতে গীত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান। শুধু যে রাজসভাতে রামকাহিনির চর্চা হয়েছে তা নয়, সমাজের নিম্নস্তরেও দেশীয় ভাষার লোকসাহিত্যে রামের কাহিনি, কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি প্রচলিত ছিল। তবে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলার মত নিরেট কোন তথ্য প্রমাণ আজ আর আমাদের হাতে নেই। তথ্য প্রমাণ না থাকলেও পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে এই সময়ে মনসার কাহিনি, ধর্মের কাহিনি, চণ্ডীর কাহিনি ইত্যাদি দেশীয় বিষয় এবং রামায়ণ কাহিনি ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনি গানে, পাঁচালিতে, নৃত্যে ছোটবড়ো উৎসব উপলক্ষে পরিবেশিত হত। অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের উপাদান কোন না কোনভাবে বাঙালির সমস্ত সাহিত্যকৃতিতেই মিশেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলায়ূধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থটি। যদিও গ্রন্থটিকে নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক রয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বাদশতম পরিচ্ছেদে ফকির সাহেব জালালুদ্দীন তাব্রিজি লক্ষণ সেনের মন্ত্রীকে কর্মের পরিণতি সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে রামের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন -

"সেক- রাম রাজা বর্ত্তে ইন্দ্র বর্ষে জল।
যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল।।"[৪]

সংস্কৃত ভাষা এবং অপভ্রংশ ও অবহট্ট ভাষায় রচিত সাহিত্য তো বটেই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যও রামায়ণের কাহিনির এবং রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের আগে বাংলা ভাষায় হয়ত আমরা সম্পূর্ণ রামায়ণ পাইনি তবে রামায়ণের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের আদিলগ্ন থেকেই ছিল। এর প্রমাণ আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য খুঁটিয়ে পাঠ নিলেই লক্ষ্য করি। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল সর্বত্রই কখনো কাহিনিতে কিংবা কখনো চরিত্রের উপর রামায়ণের প্রভাব পড়েছে।

(৩)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন সংক্রান্ত তত্ত্ব ছোট ছোট পদের আকরে গ্রথিত হয়েছে এখানে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে চর্যাপদের সঙ্গে রামায়ণের দূর দূরান্তের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ দুটোর বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে চর্যাপদের পদগুলির পাঠ নিলে দেখা যায় অনেক পদ বিশেষ করে সেই পদগুলির অন্তর্নিহিত অর্থের সঙ্গে মিল রয়েছে রামায়ণের। অবশ্য সবটাই যে বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে মেলে তা নয়। অনেক সময় যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে বাংলা সাহিত্যে পড়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে বাঙালি শুধু বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। বাল্মীকির পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ধরনের রামায়ণের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় ছিল। দু-একটি উদাহারণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। যেমন- যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণের এক অংশে বলা হচ্ছে -

"ইদং প্রমার্জিতং দৃশং ময়া চাত্রাহমাস্থিতঃ।
এতগেবাক্ষয়ং বীজং সমাধৌ সংসৃতিস্মৃতেঃ।।
সতি ত্বস্মিন্ কুতো দৃশ্যে নির্বিকল্পসমাধিতা।
সমাধৌ চেতনত্বন্তু তূর্য্যঞ্চাপুযপপদ্যতে।।
ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইবাখিলম্।
জগদঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতম্।।"[৫]

অর্থাৎ- জ্ঞাননিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি দ্বারা দৃশ্যমার্জন হয়, তা মনে কর না। কারণ এই সমাধিকালেও সংসারের সংস্কার থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না" এ রূপ বোধ সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেই জন্য সমাধি ভঙ্গের পর তার স্মরণ হয়। সেই স্মরণ পুনঃ সংসারের অক্ষয় বীজ এবং সেই পুনঃপুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। নির্বিকল্প সমাধিতে দৃশ্যমান উত্থিত হলেও পুনর্বার পুর্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ-পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয়। একই ভাবনার অনুরণন যেন আমরা শুনতে পাই লুই পাদের চর্য্যায় –

"সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই/ সুখ দুঃখেতেঁ নিচিত মরিঅই"[৬]

অর্থাৎ সমাধি দ্বারা কিছু হয় না। কেবল সুখ দুঃখ ভোগ করে মরতে হয়। যো.রামায়ণ বলছে –

> "আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীবিত এ সকল কুকল্পনা। বস্তুতঃ কেহই জাত অথবা মৃত হয় না (পুমান্ মৃতোস্মি জাতো'স্মি জীবামীতি কুদৃষ্টয়ঃ।/ চেতসো বৃত্তয়ো ভান্তি চপলস্যাসদুত্থিতাঃ।/ ন কশ্চনেহ ম্রিয়তে জায়তে ন কশ্চন।"[৭]

৪১ সংখ্যক চর্য্যা যেন একই ভাবনার প্রতিধ্বনি - "ভব জাই ণ আবই এসু কোই,"[৮] অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কিছু আসেও না, এবং এখান হইতে কিছু যায়ও না। পণ্ডিতদের মতে আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দিতে যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ রচিত হয়েছিল। আর চর্যাপদ সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের অনুমান এগুলি খ্রিস্টিয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যে রচিত। অর্থাৎ বাংলা ভাষা সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর্বে।

(8)

অর্থাৎ বলা যায় বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে রাম এবং রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কৃত্তিবাসের পূর্বে সম্পূর্ণ রামকাহিনি দেশীয় ভাষায় কোন বাঙালি কবির রচনাই পায়না ঠিকই তবে বাংলায় যে রামকাহিনি জ্ঞাত ছিল তার প্রমাণ আমরা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই পাচ্ছি। আদি-মধ্য যুগ পর্বে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম কাহিনি অবলম্বনে রচিত। কিন্তু কবি কাব্যের শুরুতে রাধা-কৃষ্ণকে রাম-সীতার অবতার রূপে দেখিয়েছেন। এই কাব্যেরই কালীয়দমন খণ্ডে বলভদ্র কৃষ্ণকে পূর্বকথা স্মরণ করাতে গিয়ে রামের প্রসঙ্গ এনেছেন -

"বামনরূপে তোহেম বলিক ছলিলে।
পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলে।।
শ্রীরাম রূপে তোহেম বধিলে রাবণ।
বুদ্ধরূপে ধরিআ চিন্তিলে নিরঞ্জন।।"[৯]

শ্রীকৃষ্ণ নিজে রামচন্দ্রের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন কল্পনা করে শ্রী রাধিকাকে বলেছে -

"রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
আহ্মার শুন তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাড়ে লঙ্কার রাবণে ল।
তাহার কাটিলো দশমাথা।।
রাধা ল। আহেম চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাত্র দৈবকী ইল মোরে।।"[১০]

এছাড়া কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন অনুসঙ্গে রাম-সীতার কথা এসেছে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে বড়ায়ি রাধার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় সীতার প্রসঙ্গ এনেছে—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারী। সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।।"[১১]

তবে বড়ায়ি এখানে কিছুতেই রাধাকে সীতার সম মর্যদা দিতে রাজি নয়। তার মতে রাধিকা কি সীতার মত সতী নারী যে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। রাধাবিরহ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে মথুরায় চলে গেলে রাধা আক্ষেপের সঙ্গে যুক্তিস্বরূপ সীতার কথায় বলেছে -

"বিণি দোষে কেহ নাহি তেজে রমণী।
সীতারামে দুঃখ পাইল শুন চক্র পাণি।।"[১২]

দূতি প্রসঙ্গে এসেছে হনুমানের কথা –

"রাম কাজে হনুমন্তা। তেহেন আহ্মার দূতা।"[১৩]

অর্থাৎ পুরো কাব্য জুড়েই লক্ষ্য করা যায় রামায়ণের প্রভাব।

(৫)

বাংলায় রামায়ণের জনপ্রিয়তা এত ব্যাপক ছিল যে কোন কবিই এই প্রভাব থেকে বেরোতে পারেননি। হয়তো অনেক সময় সরাসরি রাম কাহিনি থেকে কোন চরিত্র বা ঘটনা নিচ্ছেন না কিন্তু কোথাও না কোথাও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে বলতে হয় মঙ্গলকাব্যগুলির কথা। যেমন মনসা বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা যখন বেহুলা বা ফুল্লরার দুঃখের বর্ণনা পড়ি তখন আমাদের মনে পড়ে যায় জনক নন্দিনী সীতার দুঃখের কথা। আবার যখন কবিরা দৃঢ়, অনমনীয় পৌরুষ চরিত্র চাঁদসদাগরকে অঙ্কন করেন তখন আমরা যেন মিল খুজেঁ পাই রাবণের সঙ্গে। আবার শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনিও মিলে যায় হনুমানের কাহিনির সঙ্গে। আবার কখনো কখনো রামায়ণের মন্থরা হাজির হয় চণ্ডিমঙ্গলে দূর্বলা রূপে। যে খুল্লনাকে পরামর্শ দিয়েছে সতীন ফুল্লরাকে কিভাবে স্বামীর চোখে বিষ করতে হবে।

(৬)

বৈষ্ণব পদকর্তারাও রামায়ণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আমরা পঞ্চদশ শতাব্দিতে মূলত দুইজন বৈষ্ণব পদকর্তার সন্ধান পাই। একজনের নাম বিদ্যাপতি এবং অপরজন চণ্ডীদাস। এই দুই কবির মধ্যে বিদ্যাপতি যিনি বাংলা সাহিত্যে ভীষণ পরিচিত নাম তিনি বাঙালি নন। জন্মসূত্রে তিনি মৈথিলি। কিন্তু তাঁর রচনাবলী বাংলার এবং বাঙালির সম্পদ। তাঁর রচিত পদাবলী বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর খ্যাতি মূলত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনায়, তবে তিনি বেশ কয়েকটি পদ রাম-সীতাকে নিয়েও রচনা করেছেন। সীতা বিষয়ক 'জানকী বন্দনা' তাঁর বিখ্যাত পদ। এই পদে তিনি বর্ণনা করেছেন সীতর জন্ম, বিবাহ ও পাতাল প্রবেশের কথা—

"হে নর নাহ সতত ভজু তাহী।
তাহি, নহি জননী জনক নাহী জাহী।।
বসু নই হরা সুসুরাকে নাম।
জননিক সির চঢ়ি গেলি বহি গাম।।
সাসুক কোর মেঁ সুজল জন্মায়।
সমধি বিলহ তৌ বিলহন জায়।।
জাহি ওদর সে বাহর ভেলি।
সে পুনি পলটি ততয় চলি গেলি।।
ভন বিদ্যাপতি সুকবী ভান।
কবিকে কবি কঁহ কবি পহচান।।[১৪]

রাধার বিরহ বিষয়ক পদের মত সীতার বিরহ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন—

"কুসুম রস অতি মুদিত মধুকর
কোকিল পঞ্চম গাব।
ঋতু বসন্ত বিদেস বালভ্
মানস দহো দিস ধাব সাজনিআ।
তেজল তেল তমোল তাপন
সপন নিসি সুখ রঙ্গ।
হেমন্ত বিরহ অনন্ত পবিতা
সুমরি সুমরি পিয়া সঙ্গ সাজনিয়া।।
মোর দাদুর সোর অহনিসি
ররিস বুঁদ সবুন্দ।
বিসম বারিস বিনা রঘুবর
বিরহিনি জীবন অন্ত সাজনিআ।।
সুমুখি ধৈরজ সকল সিধি মিল
সুনহ কত সুবণি।।
সিসির শুভদিন রাম ঋঘুবর আগুব।
তুআ গুণ জানি সজনিআ।।"[১৫]

রাবণের আক্ষেপোক্তি বিষয়ক পদও রচনা করেছেন তিনি। শিব-দুর্গার ভক্ত রাবণ জানেন যতক্ষণ শিব-দুর্গা তার সহায় ততক্ষণ পযর্ন্ত রামের কাছে অপরাজেয় তিনি। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তার জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজিক মুহূর্ত। শিব-দুর্গাও তাকে ছেড়ে চলে যায়। শুরু হয় রাবণের পরাজয়। শিবভক্ত রাবণের খেদোক্তি কবি বর্ণনা করেছেন—

"জোঁ হম জাণিত হুঁ ভোলা ভেলা ঠেকনা।
হোই তহুঁ রাম গুলাম গে মাই।।
ভাই বিভীখন বড় তপ কৈলহ্নি।
জপলক রামকা নাম গো মাঈ।।
পুরুব পছিম একো নহি গেলা।
অচল ভেলা যহি ঠাম, গে মাঈ।।
বীস ভুজা দস মাখ চড়াওলি।
ভাঁগ দিহল ভর গাল, গে মাঈ।।
এক লাখ পুতা সবা লাখ নাতী।
কোটী সোবরনক দান, গে মাঈ।।
গুণ অবগুন সিব একো নহি বুঝলহ্নি।
রথলহ্নি রাবণক নাম, গে মাঈ।।
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুণিত মতি।
কর জোরি ধিনও মহেশ গে মাঈ।।"[১৬]

(৭)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যের লিখিত ধারার পাশাপাশি লোকসাহিত্যেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব পড়েছে রামায়ণের। লোকসাহিত্য বলতে ছড়া, কথকতা, লোকসঙ্গীত, পটুয়া সঙ্গীত। এই ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচারিত ছিল। এগুলির কোন লিখিত নিদর্শন নেই। তাই এগুলির উৎপত্তি কোন সময়ে সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। যুগ যুগ ধরে লোক মুখে প্রচারিত হতে হতে বর্তমানের দোরগড়ায় যতটুকু পৌঁছেছে তার থেকে অনুমান করা যায় বিষয় বৈচিত্র্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল আমাদের লোকসাহিত্যের ধারা। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোকসাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি ও হরগৌরির গৃহস্থালীর টুকরো টুকরো চিত্রণ। এই দুই ধারার পাশাপাশি বাংলাদেশে রামায়ণেরও একটি লোকায়ত ধারা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। লোকসাহিত্যের কবিদের রচনায় বারবার উঠে এসেছে জনম দুঃখিনি সীতার দুঃখ ক্লিষ্ট জীবন, রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকতে পরিণত হওয়ার কাহিনি, হনুমানের বীরত্ব প্রভৃতি। লোককবিরা জটিল কোন তত্ত্ব নয় বরং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখের ঘটনাকে রামায়ণের কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আবার নিজেদের জীবনের আনন্দদায়ক এবং দুঃখের মুহূর্তেও তারা স্মরণ করেছে রাম-সীতাকে। যেমন - গ্রামে শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে রাম-সীতাকে অবলম্বন করে ছড়া কাটা হয়। যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে শোনানো হয় রামের জন্ম বৃত্ত্বান্ত এবং কন্যা সন্তান হলে সীতার -

> "দশমাস দশদিন গো পূর্ণিত হইল।
> সর্ব সুলক্ষণ গো শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।।
> সুবর্ণ কাটারিতে গো ধাই নারিচ্ছেদ করে।
> জয়াদি জোকার পড়ে গো কৌশল্যার মন্দিরে।।
> দূতে গিয়া বার্তা কইল গো দশরথের আগে।
> হীরামণ মানিক্য দিয়া গো রাজা পুত্রমুখ দেখে।।"[১৭]

বাঙালির বিবাহ অনুষ্ঠানের বহু লোকগীতির বিষয় হয়েছে রাম-সীতার জীবনের ছোট ছোট ঘটনা—

> "সীতারে সাজাইল রে সখীগণ মেলি।
> বাজু দিল, খাড়ুদিল, দিল পাঁচ লহরী।।
> সীতারে সাজাইল রে আইয়গণ মেলি।
> মাথায় ঘটুক দিল অগ্নি পাটের চেলি।।
> সীতারে সাজাইল রে মায় সুমিত্রা রানী।
> লজ্জাবস্ত্র দিয়া মুছে নয়নের পানি।।"[১৮]

গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠানোর সময়ে গ্রাম্য মহিলারা সমবেত ভাবে রামায়ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করে গান করেন—

> "রামের মা কৌশল্যা রানী বুলে তোরা আয়।
> তৈল কাপড় আর্ঘিবার শুভ সময় বইয়া যায়।।
> যাইতে ঐব মিথিলাতে জনক রাজার বাড়ী।
> সেইখানে হইব বিয়া তাহার কুমারী"[১৯]

কন্যার বিদায়ে মাতার হৃদয় বেদনা প্রকাশিত হয়েছে সীতাকে কেন্দ্র করে—

> "সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো।
> বড় পুকুরের ভদই চিংড়ি কে খাইবে গো
> মাছের তলায় ছাতুর হাঁড়ি কে খাইবে গো
> সীতা মোর ঘর যাইবে গো।

সাত গাইয়ের দুধ খাবিয়ে।
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো"[২০]

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা পটুয়া সঙ্গীত। বর্তমানে এই শাখাটি লুপ্তপ্রায় হলেও একসময় এই শিল্পীরা সারা বাংলায় পটচিত্র দেখিয়ে গান করতেন। তাদের পটচিত্রে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং মঙ্গলকাব্যের কাহিনি পরিবেশিত হত। যে সব কথা চিত্রে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হত না সেগুলো তারা গানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করতেন। তবে চিত্রে হাস্য চটুল বা লঘু পরিহাস বিষয়ক কোন বিষয় থাকত না। উন্নত জীবানাদর্শ এবং সমাজ জীবনে হিতকারি বিষয়ই তারা উপস্থাপন করতেন। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত স্মরণযোগ্য –

> "চিত্র ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সমাজ শিক্ষার বিষয় যে ভাবে পরিবেশন করা হইত তাহাতে শিক্ষা ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত এবং ইহার ভিতর দিয়া সমাজ যে শিক্ষা লাভ করিত জীবনে তাহার ফল সুদূর প্রসারী হইত।"[২১]

পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শের উদাহরণ তারা খুঁজে পেয়েছেন রামায়ণ কাহিনির মধ্যে। এই শিল্পীরা সাধারণত উঠে আসতেন সমাজের নিম্নস্তর থেকে এবং তাদের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না বললেই চলে। বেশিরভাগই নিরক্ষর। তাই তাদের পক্ষে মূল রামায়ণ পড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক সম্ভব নয়। তাই তারা যখন রাম-সীতাকে নিয়ে কাহিনি তৈরি করেছেন তখন সেই কাহিনি যতটা না রামায়ণ থেকে আহৃত তার থেকে বেশি বাঙালি জীবন থেকে। তাদের রাম-সীতা কোন ভাবেই আর্য নয় বরং তারা অনেক বেশি বাঙালি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে কৃত্তিবাসের পূর্বে আমরা পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনার নিদর্শন পাইনা। তবে বাংলার জনসমাজে রামায়ণের প্রভাব যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল তার প্রমাণ বাঙালির রচিত বিভিন্ন সাহিত্যকীর্তি থেকে পাচ্ছি। দৈনন্দিন জীবন থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যকর্মের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রামায়ণের প্রভাব বর্তমান। ইসলামি শাসনের পূর্ববর্তী কবিরা রৌরব নরক প্রাপ্তির আতঙ্কে দেব ভাষাকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদের সাহস হয়ত দেখাতে পারেননি তবে রামায়ণের আদর্শের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। তার প্রমাণ তাঁদের রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে রামায়ণের উল্লেখ থেকে পাই। অর্থাৎ কৃত্তিবাসের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ চর্চার একটি ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছিল এবং কৃত্তিবাস সেটিকে চূড়ান্ত রূপ দান করেন। কৃত্তিবাস বাঙালির আবেগ এবং বাঙালি মানসকে ভালো করেই বুঝেই এরকম একটি মহতি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ৩৮
২. পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, প্রাকৃত পৈঙ্গল, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ১৯০২ পৃ. ৩৪৪
৩. তদেব, পৃ. ৫৭৬
৪. সেন, সুকুমার (সম্পা.), সেক শুভোদয়া, সিদ্ধেশ্বর প্রেস, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ. ৬৫
৫. বসু, মণীন্দ্র মোহন (সম্পা.), চর্যাপদ, সাহিত্য সেবক সমিতি, ২০১০, পৃ. ২৯
৬. বসু, মণীন্দ্র মোহন (সম্পা.), চর্যাপদ, সাহিত্য সেবক সমিতি, ২০১০, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ৫৭
৮. তদেব, পৃ. ৩১
৯. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬, পৃ. ২৩৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. তদেব, পৃ. ৩৫১

১১. তদেব, পৃ. ১৭০

১২. তদেব, পৃ. ৩৫৭

১৩. তদেব, পৃ. ২১৬

১৪. বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ ও বসু, খগেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বিদ্যাপতি, ভারতী প্রেস, ১৩৪৮, পৃ. ৩২৮

১৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭

১৬. তদেব, পৃ. ৩২৮

১৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৩০৩

১৮. তদেব, পৃ. ৪০৫

১৯. তদেব, পৃ. ৩৭৮

২০. তদেব, পৃ. ৪২৭

২১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৮১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 71 - 82
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্যে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতা ও ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়

উমা বেরা
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mail2umabera@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Social Reality, Religious Culture, Communal Harmony.

Abstract
The primary history of Mangal Kavya dates back nearly five hundred years. Following the Turkish invasions, a new literary tradition known as Mangal Kavya emerged in Bengali literature, centered around mythological and folk deities. This literary genre synthesized religious elements from Buddhism, Jainism, Hinduism, Islam, and Vaishnavism. Although the early Mangal Kavya of the medieval period predominantly featured supernatural themes, they also reflected contemporary social structures and hinted at the integration of religious cultures within socio-economic, political, historical, and religious contexts. During the Mughal rule in the medieval period, gradual transformations took place in the social system. These changes over time influenced the style and composition of Mangal Kavya. Alongside supernatural themes, the depiction of folk life became particularly prominent in the Mangal Kavya composed during the later medieval period.

Poet Krishnaram Das, active in the latter half of the 17th century, was the first to compose five separate Mangal Kavya dedicated to five different deities. His works reflect both the traditional structure of Mangal Kavya and the introduction of new stylistic elements. During the reign of Mughal Emperor Aurangzeb, he composed five Mangal Kavya: Kalika Mangal, Ray Mangal, Shashti Mangal, Shitala Mangal, and Kamala Mangal. Krishnaram Das's writings exhibit not only devotional sentiments but also a strong pragmatic outlook. Alongside devotion, his works vividly portray contemporary social realities, folk traditions, and the synthesis of religious cultures. His literary style prominently features Vaishnavism, while also reflecting the long-standing coexistence of Hindus and Muslims. This cohabitation led to a unique socio-religious and cultural integration, which finds expression in his poetry. In this article, I have attempted to provide a comprehensive discussion on these aspects of his work.

Discussion

তুর্কি আক্রমণের প্রায় তিনশত বছর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক এবং লৌকিক দেবতাদের নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্য নামে নূতন সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাহিত্য ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রায় পাঁচশত বছর ধরে বহমান ছিল। এরই পাশাপাশি বৈষ্ণব সাহিত্য, চরিত সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, পীর সাহিত্য প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে নূতন সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত এই সাহিত্যধারাগুলির মধ্যে প্রথম পর্যায় অলৌকিক ভাবধারা বেশি মাত্রায় থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, রাজনৈতিক অবস্থা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, লোকাচার, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় পটভূমি সাহিত্যধারাগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং রচনারীতির পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় সমন্বয়ের আভাস স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।

পৌরাণিক এবং লৌকিক ভাবধারা থেকে সৃষ্ট মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের নিয়ে রচিত কাব্য মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বাইরে থেকে দেখতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণত বিশেষ কোনো হিন্দু দেবতা বা দেবীকে ঘিরেই আলোচনা হয়ে থাকে। এই সকল দেবভাবনার মধ্যে ছিল মূলত বাংলার নিজস্ব মাটির লৌকিক স্তর থেকে উঠে আসা স্থানীয় ভাবনা। এরই পাশাপাশি লৌকিক জনজীবনের লোকাচার, রীতিনীতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ আঞ্চলিক হিন্দুত্ববাদ ও বাংলার ইসলাম ধর্মের জনজীবনের বাস্তব প্রতীকী রূপ।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদেরকে অসাধারণ, দৃঢ় মানবিক গুনাবলীর অধিকারী হতে দেখা যেত। মঙ্গলকাব্যে স্থানীয় ও লৌকিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে সংঘাত ঘটে থাকে, শেষপর্যন্ত ভক্তের মনে দেবতাগণ ভক্তিভাব জাগাতে সক্ষম হন এবং ওই অঞ্চলে নিজেদের স্থায়ীভাব প্রচার করে পূজা গ্রহণ করেন। ভক্ত এবং ভগবানের সংঘাত মধ্যযুগে রচিত প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই দেখা যায়। মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের উদ্দেশে দেবী মনসা, দেবী শীতলা, দেবী চন্ডী প্রমুখ দেবদেবীগণ নানান বিপর্যয় সৃষ্টি করে ভক্তিহীন ভক্তের মনে জাগিয়ে তুলেছেন ভক্তিভাব, নিয়েছেন পূজা পাওয়ার অধিকার। *মনসামঙ্গল* কাব্যে জালু-মালু, হাসান-হোসেনের হাত থেকে যেমন মা-মনসা পূজা নিয়েছেন, তেমনই চাঁদ সদাগরের হাত থেকেও পূজা নিয়েছেন। একইভাবে *শীতলামঙ্গল* কাব্যে মা-শীতলা মদনদাস জগাতি, কাজী সাহেব প্রমুখের হাত থেকে পূজা নিয়েছেন। *ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যে* মা ষষ্ঠী ভক্তিহীন বেনে বৌ-এর মনে ভক্তিভাব জাগিয়েছেন তার সদ্যোজাত সন্তান অপহরণের মাধ্যমে। *কালিকামঙ্গল* কাব্যে উল্লিখিত কাঞ্চি দেশের রাজপুত্র সুন্দর মা-কালীর প্রতি সাধকভাবে ভক্তিভাব প্রকাশ করেছে। মধ্যযুগে রচিত প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই দেবদেবীগণ এইভাবে পূজা প্রচার করিয়ে সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম প্রভৃতি ধর্মীয় ভাবধারাগুলি এসে মিলিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যায়ে কবি কৃষ্ণরাম দাস পাঁচজন আলাদা দেবতাদের নিয়ে পাঁচটি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যগুলি রচনার মাধ্যমে তিনি সমকালীন সমাজবাস্তবতা, লোকাচার, ধর্ম-সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই হিন্দু মুসলিম ধর্মের সমন্বয়ের অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কবি একদিকে যেমন জনজীবনে ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তেমনই রোমান্টিক প্রেমের বর্ণনা করেছেন।

রায়মঙ্গল কাব্যে কাঠুরিয়া রতাই ভক্তিভাবে পূজা করে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য স্মরণ করেছেন-

> "ভকতবৎসল রায় গুণের সাগর।
> বাউল্যার পূজা লইয়া বড় কুতুহল।।
> অভিমত বর দিয়া করিলেন গতি।
> অন্তর্ধান হইল দেব দক্ষিনের পতি।।"[১]

পুষ্প দত্তের মাতা রানী সুশীলা দক্ষিণরায়ের ভক্তিভরে সেবা করেন পুত্রের বাণিজ্য যাত্রার মঙ্গল কামনায়-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"তথায় সুশীলা রামা পরম বিকল
রাখিতে না পারে দুটি নয়ানের জল।।
পাটনে হইবেক শুনি পুত্রের গমন।
পূজিয়া দক্ষিণরায় করেন স্তবন।।
তোমা বিনা গতি নাহি বলি করপুটে।
উদ্ধার করিয়া লবে বিষম শঙ্কটে।।"[২]

রায়মণির কাছে মাতা সুশীলা যেমন পুত্রের মঙ্গল কামনা করেছেন, তেমনই পুত্রকেও বিপদে রায়মণির স্মরণ নিতে বলেছেন। *ষষ্ঠীমঙ্গল* কাব্যে মা-ষষ্ঠী সখী লীলাবতীর রূপ ধরে সপ্তগ্রামের অধিপতি সত্রজিতের অন্তঃপুরে রানীর নিকটে গিয়ে মা-ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ভক্তিভাব জাগিয়েছিলেন সনকপুরের সায়বেনের পত্নীর ভক্তিভাব বর্ণনার মাধ্যমে-

"ষষ্ঠীর দিবসে সতী যতন করিএ অতি
উপহার আনিল সকল।
ভকতি কি কবো আর যেমন শকতি তার
যাইতে দেবীর কুতূহল।।"[৩]

একইভাবে *কমলামঙ্গল, শীতলামঙ্গল* কাব্যেও জনজীবনে ভক্তিভাবের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমভক্তি বর্ণনার পাশাপাশি কবি কৃষ্ণরাম দাস জনজীবনের রোমান্টিক প্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বর্ণনা করেছেন। যা বর্তমান সমাজেও বহমান আছে। কালিকামঙ্গল কাব্যে কবি রোমান্টিক প্রেমের বর্ণনা করেছেন বিদ্যাসুন্দরের প্রেম কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে। কাঞ্চি দেশের রাজপুত্র ভক্ত বৎসল সুন্দর সাধকভাবে কালীর সাধনা করতেন। তিনি স্বপ্নে বর্ধমানের রাজা বীর সিংহের কন্যা বিদ্যার রূপমাধুর্যে মোহিত হয়েছিলেন। কবির বর্ণনায় মা-কালীর কৃপায় বিদ্যাসুন্দরের মিলন ঘটেছে। কবি কৃষ্ণরাম দাস বিদ্যাসুন্দরের প্রেম কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কাব্যের আরম্ভেই রাধা কৃষ্ণের স্মরণ করেছেন।

"রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে।
মৎস্য আদি অবতার বন্দি ক্রমে ক্রমে।।"[৪]

কবি এভাবেই নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রেম ভক্তির পাশাপাশি রোম্যান্টিক প্রেমের বাস্তব প্রতিরূপ তুলে ধরেছেন।

মধ্যযুগের প্রথম পর্যায় রচিত *মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল* প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের রচনারীতির থেকে কবি কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্যগুলির রচনারীতি অনেকখানি আলাদা। কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে না পারলেও তাঁর রচনায় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অলৌকিকতার প্রভাবের চাপ কমে গিয়ে লোকায়ত ভাবধারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি এবং ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে।

দিল্লির সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বাংলাদেশে শায়েস্তা খাঁর শাসনকাল মোঘল যুগের ইতিহাসে সুশাসন নামে অভিহিত ছিল, যার ইঙ্গিত কবি *রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল* প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের রচনাশৈলীতে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া তৎকালীন সময় জমিদারী ব্যবস্থার প্রচলন ছিল; জমিদাররা যেমন অত্যাচারী ছিলেন তেমন অনেক জমিদার সুশাসকও ছিলেন। তাদের শাসনে শৃঙ্খলতা থাকার ফলে গ্রামে শান্তি বজায় থাকত। কবি কৃষ্ণরাম দাস এমনই এক জমিদারের কথা তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন সপ্তগ্রামের অধিপতি সাবর্ণ রায়চৌধুরী, নিমিতা গ্রামে যাঁর আদিবাস ভূমি ছিল।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচিত পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে চারটি দেবতা বিষয়ক এবং একটি প্রণয়কাহিনী মূলক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর কোনো কবি এতজন দেবতা নিয়ে একত্রে এতগুলি মঙ্গলকাব্য রচনা করেননি। এই বৈচিত্র্যই কবি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৃষ্ণরাম দাসের রচনার প্রধান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য থেকে কবি কৃষ্ণরাম দাসের ধর্ম বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বর্ণিত কোনো দেবদেবীরই ভক্ত ছিলেন না। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় যেখানে বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে কথা বলেছেন সেখানেই তাঁর উচ্ছ্বসিত ভাব প্রকাশ করেছেন। কালিকামঙ্গল কাব্যের দিক বর্ণনা অংশে-

"যথায় কীর্তন হয় চৈতন্যচরিত্র।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র।।
তাহে গড়াগড়ি দেয় যেবা প্রেমে নৃত্য করে।
জীবনমুকুত তার ধন্য দেহ ধরে।।
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।
তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত ।।
শ্রীকৃষ্ণগুণ শ্রবণে পুলক যার হয়।
তাহারে[১] পুণ্যবান বলি বেদ মিথ্যা নয়।।"[৫]

শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল কাব্যে কবি পুষ্প দত্ত, ঋষিকেশ সাধুর সমুদ্রযাত্রাবর্ণনায় সেতু বন্ধ অংশে *রামায়ণ* বর্ণনার মাধ্যমে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। একইভাবে কবি কৃষ্ণরাম দাস *রায়মঙ্গল, কমলামঙ্গল* কাব্যের পরতে পরতে উচ্ছ্বসিত ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের বর্ণনা করেছেন।

বৈষ্ণবধর্ম বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এইসময়ের মধ্যে লৌকিক মঙ্গলকাব্য বলতে শুধু *মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে কিন্তু সাহিত্য ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তন ধারার মূল কারণ হল যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাব ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্রমন্বয়ে অবনতি। সমাজজীবনের কালানুক্রমিক বিবর্তনের ধারাতে এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিস্ময় ও একান্ত দৈব নির্ভরতার প্রভাব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিপ্রবণ মনের বিকাশ ঘটতে থাকে। ষোড়শ শতকের চন্ডীমঙ্গলের শিব-দূর্গা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিব-দূর্গার পার্থক্যই এর মূল প্রমাণ। ভক্তি ক্রমে ব্যঙ্গের স্তরে নেমে গেছে, দৈববিশ্বাস ক্রমে অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের ধর্মবিশ্বাসে যে দোলাচল সৃষ্টি হয়েছিল, কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচিত মঙ্গলকাব্য তারই প্রমাণ। পঞ্চদশ শতকের মঙ্গলকাব্য রচনার যে ধারা- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, তা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে শেষ হয়েছে।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ নূতন অনুশীলনের যুগ। তবে এই অনুশীলন পুরোপুরি নূতন ধারায় প্রভাবিত হয়নি। পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা সংস্কার সাধন করে যেমন নূতন নূতন ছোট্ট ছোট্ট গৃহে রূপান্তরিত হয়েছে তেমনই এ যুগে সাহিত্যে দুটি প্রধান লক্ষণ দেখা গিয়েছে -

ক. পুরাতন লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে নূতন নূতন দেবদেবী নিয়ে কাব্যের সৃষ্টি।
খ. ভক্ত মনোভাবের বিলোপ ঘটেছে ধীরে ধীরে।

কবি কৃষ্ণরাম দাস একাই একাধিক দেবদেবী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি যে বিশেষ কোনো দেবতার ভক্ত ছিলেন না, তারই প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া লৌকিক ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ লৌকিক প্রণয়কাব্য তিনি সৃষ্টি করেছেন।

কবি কৃষ্ণরাম দাস একাধিক দেবদেবীদের নিয়ে কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে ভক্ত মনোভাব অপেক্ষা বৈষয়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অষ্টদশ শতাব্দীর কবিদের মত দেবতার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে না পারলেও, এই পথের ইঙ্গিত যে তিনি করে দিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই প্রাচীন লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ধারার সঙ্গে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্বাচীন মঙ্গলকাব্যের ধারায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের প্রভাব দুই ভাবে পড়েছে। প্রথমত লৌকিক প্রণয়কাব্যকে তিনি শুদ্ধ সামাজিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। ধর্মের সঙ্গে লৌকিক প্রণয়কাব্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। প্রণয়কাহিনী লৌকিক মঙ্গলকাব্যের অঙ্গীভূত হয়ে কালীর মাহাত্ম্য সূচক পাঁচালী হিসাবে অষ্টদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। কবি কৃষ্ণরাম দাসের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী যুগোপযোগী অভিনব সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের ধারায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী এক বিচিত্র সংযোজন।

কবি কৃষ্ণরাম দাস কয়েকজন লৌকিক দেবদেবীকে সাহিত্যের আসনে মহিমাময় স্থান দিয়ে মঙ্গলকাব্যের ধারায় নূতনত্বের সৃষ্টি করেছেন। কবি *কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল* কাব্যের আদি এবং অন্যতম রচয়িতা। কবি কৃষ্ণরাম দাসের কোনো রচনারই পূর্ববর্তী রচনা না পাওয়া গেলেও তাঁর উপর পূর্ববর্তী কবির প্রভাব পড়েনি এমনটা নয় বরং একজন কবির প্রভাব কবি কৃষ্ণরাম দাসের ওপর এত বেশি মাত্রায় পড়েছে যে সহজেই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। কবি কৃষ্ণরাম দাস নানাভাবে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে অনুসরণ করেছেন, *কালিকামঙ্গল* কাব্যের বিমলা মালিনী *চন্ডীমঙ্গল* কাব্যের দুর্বলা দাসীর আদর্শে রচিত। মালিনীর চাটুর্য, সুন্দরকে ঠকানোর বিশেষ পদ্ধতি সবই *চন্ডীমঙ্গল* থেকে নিয়েছেন।

রায়মঙ্গল কাব্যটি পশুর দেবতা বিষয়ক। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ডের কালকেতু উপখ্যানের বনদেবী এখানে ব্যাঘ্র দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এছাড়া রায়মঙ্গল কাব্যে পুষ্পদত্ত সাধু এবং শীতলামঙ্গল কাব্যের ঋষিকেশ সাধুর বাণিজ্য যাত্রা, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার অনুকরণে বর্ণিত হয়েছে। বাণিজ্য যাত্রা পথের বর্ণনা প্রায় একই রুপ; পথের সমস্ত ঘটনা, মায়া দৃশ্য প্রভৃতি সব এক। সাধুগণের বিপদ এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের বর্ণণায় কোনো বৈচিত্র্য নেই। চন্ডীমঙ্গলে সাধু অজয় নদ থেকে যাত্রা করে গঙ্গা দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছে সিংহল গিয়েছিলেন, রায়মঙ্গলে বর-দহ থেকে সাধু যাত্রা করে গঙ্গা বেয়ে সমুদ্র পথে সিংহল, রাজদহ অতিক্রম করে দক্ষিণ পাটনে উপস্থিত হয়েছিলেন। শীতলামঙ্গলে সাধু আবার অজয় নদ থেকে যাত্রা করে রায়মঙ্গলের পথে সিংহল, রাজদহ, মায়াদহ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছেন। রায়মঙ্গলে উত্তরে যেটুকু পথ বাকি ছিল শীতলামঙ্গলে তা পূর্ণ হয়েছে; চন্ডীমঙ্গলের যাত্রাপথ যে কৃষ্ণরাম দাসের লক্ষ্য এর থেকেই তা প্রমাণিত হয়। কমলামঙ্গলে কমলা বৃদ্ধা বেশে বল্লভ সাধুকে রক্ষার জন্য এসেছেন, চন্ডীমঙ্গলে চন্ডীর জয়তী বেশে আগমনের ছায়া অবলম্বনে কবি কৃষ্ণরাম দাস তা রচনা করেছেন। এইভাবেই কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচনার পরতে পরতে চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ছাপ বর্ণিত হয়েছে।

লৌকিক সমাজে গল্প কাহিনীতে সাধারণত হিন্দু, মুসলমান, ভুস্বামীদের যুদ্ধ সংঘর্ষ তৎকালীন সমাজে ঘন ঘন ঘটে থাকত; সমাজের এই দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি সমকালীন সময়ে রচিত সাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। কবি কৃষ্ণরাম দাসের পূর্বে দক্ষিণরায়ের বর্ণিত পুঁথি পাওয়া যায় না; তবে *রায়মঙ্গল* কাব্যে মাধবাচার্য নামে আদি কবির নাম পাওয়া যায়, তাঁর রচিত কোনো সংক্ষিপ্ত পুথি পাওয়া যায়নি। তাই বলা যেতে পারে কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত *রায়মঙ্গল* কাব্যে গাজী সাহেব ও রায়মনির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ের সমাজের হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি বর্ণনা করেছেন-

"অকালে প্রলয়ে পড়ে   ঢাল খাঁড়ায় দুহে নড়ে
সাঁজোয়ার কোপ ঝনঝন।
ক্ষিতি করে টলমল   হেন বুঝি যায় তল
বিকল সকল দেবগণ।।"[৬]

রায়মঙ্গল কাব্যে বড়ো গাজী খাঁর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের বিরোধের কাহিনীটি প্রশংসার যোগ্য। উদ্ধত মুসলমানের ধর্মান্ধতাবশত হিন্দুর প্রতি অত্যাচার বর্ণনায় কবিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ব্যাঘ্রবাহন বড়ো গাজী খাঁ দক্ষিণরায়ের আস্তানা ভেঙে রায়ের সেবকদের মেরে ধরে থামেননি বরং অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছেন, যা আসলে তৎকালীন সমাজ

জীবন থেকে উঠে আসা প্রতিচ্ছবির ইঙ্গিত দেয়।

মঙ্গলকাব্যে সমাজ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকে অষ্টদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোট একশত বছর ধরে বাংলার সামাজিক জীবন বিকাশের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পঞ্চদশ শতক থেকে ধর্মান্তকরণের ফলে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। একদিকে রাষ্ট্রের দুর্নীতি, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অপ্রীতিকর ব্যবহার; আর একদিকে উদারতা, ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান, পীর-ফকিরদের আধ্যাত্মবোধ, কলাকৌশল ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজে একদিকে ধর্মান্তকরণের যে ধারা বেড়েছিল তা মোঘল যুগেও হ্রাস পায় নি। ধর্মান্তকরণের জোয়ারকে থামাতে ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরগণ যেভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই কয়েকজন কবি লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করে সামাজিক গোঁড়ামি এবং ধর্মীয় বিরোধ ভুলিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং সমগ্র জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। কায়স্ত কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর রচনা *রায়মঙ্গল* কাব্যে বড়ো খাঁ গাজী ও দক্ষিণরায়ের কাহিনী বর্ণনা এবং *শীতলামঙ্গল* কাব্যে কাজী পালায় কাজী সাহেব মা শীতলা ও তাঁর সেবক বসন্ত রায়ের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে সমাজে সেই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের একটি বড়ো গুণ, কবি যা তাঁর রচনারীতির পরতে পরতে তুলে ধরেছেন। কবি তাঁর গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকধর্মকে নিয়েছেন। *শীতলামঙ্গল* কাব্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস তিনটি কাহিনী নিয়েছেন। মদনদাস জগাতি পালা, কাজী পালা, ঋষিকেশ সাধুর পালা বর্ণনার মাধ্যমে সমাজে তৎকালীন সময় যে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ঘটেছিল তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাজী পালায় কাজী হিন্দুর দেবতা মা- শীতলার কাছে ভর্ৎসিত হয়ে বলেছেন-

"কাজি বলে মহাশয় যে বলো সকল হয়
অমন অজ্ঞান বটে আমি।
নয়ান থাকিতে সন্দ না বুঝে বলিলেম মন্দ
কি লাগি আসিয়েছিলে তুমি।।
এখন বুঝিলেম ভাবি শীতলা পরম দেবী
পূজিব তাহার পদযুগ।
তিনি সকলের সার যতো ব্যাধি আদি তার
নিন্দি অধম পায় দুখ।।
বিচার করিএ দেখি কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্বঘটে।
হিঁদুকি মোচলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদাজুদা বটে।।"[৭]

রায়মঙ্গল কাব্যে হিন্দুর ঠাকুর দক্ষিণরায় ও মুসলমান পীর গাজী সাহেবের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়েছিল কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি কারোর গায়ে লাগেনি, কারণ যে দেবতা গাজী ও দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ থামাতে এসেছিলেন তার অঙ্গে যুগোপৎ হিন্দু মুসলামানের ছাপ ছিল-

"অর্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাথে।"[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঈশ্বর গাজীকে সম্বোধন করে বলেছেন-

"যেই তুমি সেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল মিথ্যাকার খেলা।।"[৯]

এই বর্ণনার মাধ্যমে কবি কৃষ্ণরাম দাসের সমাজ সচেতনতার পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সপ্তদশ শতকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, দীর্ঘদিন এই দুই জাতি পাশাপাশি বাস করার ফলে প্রতিবেশী শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সামাজিক জীবনে সুস্থতা সৃষ্টির জন্য এই দুই শ্রেণির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল যা তৎকালীন সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন - ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুর ফকিরের বেশ ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলমানের কাছে যা সত্যপীর, হিন্দুদের কাছে তা সত্যনারায়ণে রূপান্তরিত হয়েছিল। দৈবীভাবের এই পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনই আসলে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সাম্প্রদায়িক সমন্বয় ঘটাতে সহায়তা করেছে।

বাস্তবতা কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের একটি বড়ো গুণ। কবি তাঁর মঙ্গলকাব্যগুলির পরতে পরতে সুন্দর বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে প্রবাদ-প্রবচনের ছড়াছড়ি, যা বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রমাণ দেয়। কবি কৃষ্ণরাম দাস রচনার বিভিন্ন অংশে সামান্য দু-একটি পঙক্তি ব্যবহার করে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে ওই জাতির প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন। যথা-

"লুব্ধ ব্রাহ্মণ জাতি সহজী ব্রাহ্মণী।
ধনলোভে ধীরে ধীরে চলিল তখনি।।"[১০]

কালিকামঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণী লোভী স্বভাবের সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তৎকালীন সময় দেখা যেত ব্রাহ্মণ জাতির প্রকৃতি ছিল খুব লুব্ধ স্বভাবের। তৎকালীন সময় যেহেতু পূজা অর্চনা ছিল ব্রাহ্মণ জাতির মূল বৃত্তি, সেহেতু তাদের ব্রাহ্মণ্য তেজ ব্যবহার করে চাওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পেত বেশি মাত্রায়। একইভাবে কবি কালিকামঙ্গল কাব্যে সুন্দরের গোপনে বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে এক ধরণের চৌর্য বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তৎকালীন সময় রাজদরবারে রাজকুমারদের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি সু-শাসক হওয়ার জন্য সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রণনীতি, রাজনীতি, কলাবিদ্যা, চৌর্যবিদ্যা, কূটনীতি, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। তবে কখনো কখনো রাজকুমারেরা চৌর্যবিদ্যা শিক্ষা পদ্ধতিটি রাজকন্যার মন প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করার জন্য ব্যবহার করতেন। কালিকামঙ্গল কাব্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস সুন্দরের এই প্রবৃত্তি বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের সমকালীন সমাজের রাজপরিবারের বীর সাহসী রাজকুমারদের প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুন্দর বিমলা মালিনীর গৃহে আশ্রয় নিয়ে মালিনীর সহায়তায় চিকন মালা গেঁথে বিদ্যার নিকটে পৌঁছে দিয়েছিল-

"চিকন গাঁথনি ফুল দেখি চিত্ত ব্যাকুল
রতিপতি হানিল তখনি।।
মালাটি[১] লইয়া হাতে[১] সুন্দর লিখন তাতে
যত্ন করি পরিল সকল।
বিরহে হরিল জ্ঞান ঘুচিল পূজার ধ্যান
সখিগণে শুনি কুতূহল।।"[১১]

এইরূপে সুন্দর প্রথমে বিদ্যার মন চুরি করে বিচিত্র মালার গাঁথুনি ও লেখনীর মাধ্যমে।

ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস সায়বেনে পত্নীর ছোট পুত্রবধূর মা-ষষ্ঠীর প্রসাদ চুরি করে খাওয়ার চিত্র অঙ্কন করেছেন-

"কুবুদ্ধি তাহার এই আগে আগে দ্রব্য লই
উদর ভরিল চুরি করি।।
শাশুড়ি আসিএ তার নাহি দেখে উপহার
মনেতে হইল বড় রোষ।
সেই দুরাচার নারী বাঁচে প্রবঞ্চনা করি
দিএ কালবিড়ালের দোষ।।"[১২]

ছোট পুত্রবধূ প্রায়ই এমনই চুরি করে খায় আর কালো বিড়ালের দোষ দেয়। আসলে তৎকালীন সময় বাড়ির বধূরা সাধারণত পেট ভরে ভালো খাদ্য খেতে পেত না। তাই ক্ষুধায় কাতর এমন কিছু গৃহবধূ থাকতেন যারা নিজেদের সামলাতে না পেরে চুরি করে খেত, আর বাড়ির গৃহিনী আর অপরাপর গুরুজনদের হাত থেকে বাঁচতে বিড়ালের দোষ দিত, সমাজ বাস্তবতার সেই ইঙ্গিতই কবি তুলে ধরেছেন।

কবি কৃষ্ণরাম দাস সমাজ সচেতন কবি, তাঁর মঙ্গলকাব্যগুলির পরতে পরতে প্রবচন বাক্যের ছড়াছড়ি রয়েছে। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা কত বেশি গভীর ছিল তা এই প্রবচন বাক্যের প্রয়োগ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা-

১. 'হাতি হাতি ঝগড়া ভাঙ্গে নল খাগড়া'।[১৩]
২. 'কমলে বেড়িয়া থাকে কুমুদ সঞ্চয়'।[১৪]
৩. 'চাঁদ কিনা চেনা যায় তারাগণ সাথে'।।[১৫]
৪. 'গুণী সে গুণীর পূজা ভালো মতে জানে'।[১৬]

এই ধরণের বহু প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের জনজীবনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কবির বাস্তব জ্ঞানের ও সচেতনতা বোধের প্রকাশ ঘটে।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের বাস্তব অনুরাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় - কন্যার শ্বশুরালয় যাত্রা বর্ণনায়, হিন্দুর ঘরে কন্যার শ্বশুরালয় যাত্রার দৃশ্য বড়োই করুণ। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে কন্যার সঙ্গে পিতামাতার সাধারণত আর সাক্ষাৎ হত না। তৎকালীন সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাই ছিল মূল বাধা। কালিকামঙ্গল কাব্যে বিদ্যার শ্বশুরালয় গমন দৃশ্যে দেখা যায় পিতা বীর সিংহ রায় জামাতাকে নানান বসন-ভূষণ উপহার দিয়ে যাত্রাপথ সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করেছেন। যা সমকালীন সমাজের সঙ্গে বর্তমানেও বহু কন্যার পিতা করে থাকেন। মাতা অশ্রুজলে কন্যাকে বিদায় জানিয়েছেন-

"বিদ্যারে করিয়া কোলে ভাসিল নয়ন জলে
অস্থির হইল রাজরানী।
বিদ্যা মোর কোলচাছা দূর দেশে যাবে বাছা
কেমনে রহিব একাকিনী।।"[১৭]

একইভাবে কবি আরও নিপুণভাবে রায়মঙ্গল কাব্যে রাজকন্যা রত্নাবতীর শশুরালয় যাত্রার দৃশ্য বর্ণনা করেছেন-

"রাজার নয়নে জল করে ছলছল।
কাঁদয়ে পূর্ব্বে লোক হইয়া বিকল।।
কন্যারে লইয়া কোলে রাজরাণী কাঁদে।

বিকল রাজরাণী বুক নাহি বাঁধে।।"[১৮]

এই রায়মঙ্গল কাব্যে আরও দেখা যায় রাজরানী অবোধ কন্যা রত্নাবতীকে উপদেশ দিয়ে বোঝাচ্ছেন কীভাবে কন্যা শ্বশুরালয়ে সকলের সাথে ব্যবহার করবে-

"কন্যারে বুঝায় রাণী করিয়া যতন।
দুহার নয়ন জলে তিতে দুই জন।।
তুমি বিদগধ আমি বুঝাইব কিবা।
করিও যতনে অতি শাশুড়ীর সেবা।।
দাসদাসীগণ যতো যতনে পালিও।
জনকজননী বলি সবাকে ডাকিও।।
রোষ না করিহ কভু না কহিও বড় কথা।
তবে সে সবার ঠাঞী যশ পাবে তথা।।
দারুন পরের মন তিলে তিলে ফিরে।
আপনি হইলে ভালো ভয় কিবা কারে।।
করিও স্বামীর সেবা সদা একমনে।
পতিবিনে গতি নাই জীবন মরণে।।"[১৯]

কবি কৃষ্ণরাম দাসের এই বর্ণনা একদিকে যেমন সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে তেমনই বর্তমান সময়কেও তুলে ধরেছে। একইভাবে সংস্কৃত কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' কাব্যে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্বমুনি যেভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন হুবহু সেই প্রতিচ্ছবি বর্ণিত হয়েছে।

কমলামঙ্গল কাব্যেও কন্যার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি আরও নিপুণ ভাবে কবি বর্ণনা করেছেন-

"কান্দে রাজা বলে মাতা বড় অবিচার ধাতা
কেন সৃষ্টি করিল এমন।
কোন দেশে জনমিয়া কাহার বসতি গিয়া
এজনমে নাহি দরশন।।"[২০]

কবির শ্বশুরালয়ে যাত্রা দৃশ্যের জীবন্ত বর্ণনা বস্তুত সকল বাঙালি ঘরের, বর্তমানেও এই দৃশ্যের পরিবর্তন হয়নি।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা রায়মঙ্গল, কমলামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে শ্বশুরালয় যাত্রাকালে কন্যার অভিমানের মধ্য দিয়েও প্রকাশ ঘটেছে-

"বাপের চরণধূলি লইল মাথায় তুলি
আকুল হইল যত রামা।
নিদারুণ নাই হইবে বারেক তল্লাস নিবে
বিদেশে পাঠাইয়া দিলে আমা।।"[২১]

একইভাবে রায়মঙ্গল কাব্যে রাজকন্যা রত্নাবতী অভিমানে বলেছে -

"দূরে বিভা দিলে মোরে সাগরের পার।
কাঁদিলে এখন তবে কি হইবেক আর।।"[২২]

কন্যাদান করে পিতাই যেন মহাদোষী তাই জামাতাকে সন্তুষ্ট করাই যেন শ্বশুরের মূল কর্ম। এই ছবি তৎকালীন সমাজে

ভীষণভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ তৎকালীন সময়ে পণপ্রথার প্রচলন ছিল। বর্তমানেও কন্যার পিতা জামাতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় থাকে তবে সময়ের সাথে সাথে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম।

কন্যার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের মানসিক অবস্থা, কন্যার শ্বশুরালয়ের গমন দৃশ্য বর্ণনায় জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচনায়। এই দৃশ্যকে উপলক্ষ্য করে কালিকামঙ্গল এবং রায়মঙ্গল কাব্যের কোথাও কোথাও দার্শনিকতার প্রভাব দেখা যায়। কালিকামঙ্গল কাব্যের সুন্দর শ্বশুরকে বলেছেন-

"সারেতে অচলমন কেন তবে অকারণ
খেদ কর দেব বিজ্ঞজনে।
জায়াপুত্র পরিবার যতেক যাহার আর
জেন যেন জলবিম্বগণে।।"[২৩]

একইভাবে কবি রায়মঙ্গলে দাসীর মাধ্যমে রানীকে এই উপদেশ দিয়েছেন-

"অকারণে কাঁদ রাণী শুন দেখি বলি।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সংসার সকলি।।
কেবা কার পুত্রকন্যা কেবা মাতাপিতা।
জ্ঞানবান জন তার না থাকে মমতা ।।
তুমি জনমিলে কোথা বসতি কোথায়।
সংসার এমনি দেখ মোহিত মায়ায়।।"[২৪]

এইভাবে দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের আরও কয়েকটি স্থানে দেখা যায় বাস্তবতার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। শীতলামঙ্গল কাব্যে মদনদাস জগাতি পালায় নদী পারাপারের সময় শুল্ক আদায়ের ছবি পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে নদী পারাপারের জন্য পারানীর কড়ির সঙ্গে শুল্ক দিতে হত। শুল্ক আদায়ের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, শুল্ক আদায়কারীর মর্যাদাবোধ ও যাত্রী সাধারণের ওপর অত্যাচারের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। দেশের রাজশক্তি যতই শক্তিশালী হোক, রাজকর্মচারীই যে দেশের অভ্যন্তরে সব সেই ইঙ্গিতই কবি কৃষ্ণরাম দাস শীতলামঙ্গল কাব্যের মদনদাস জগাতি পালায় তুলে ধরেছেন। একইভাবে কালিকামঙ্গল কাব্যে কোটালের নগর ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে রাজ্যে রাজকর্মচারীর প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ভাষা প্রয়োগে কবি কৃষ্ণরাম দাসের বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র অনুসারে তিনি লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। গাজীর ভাষা উর্দু, কোটালের ভাষা হিন্দি, মুসলমান ফকির ও গাজীর মুখের ভাষা তৎকালীন সময় অবাঙলা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কারণ বর্তমানে আরবী-উর্দু মিশ্রিত বাঙলা ভাষায় গাজী-ফকিররা কথা বলেন। *কমলামঙ্গল* কাব্যে কবি বহুপ্রকার ধানের উল্লেখ করেছেন- কনকচূড়, পারিজাত, লক্ষীভোগ, মুক্তাঝুরি, প্রভৃতি। কবির সমকালীন সময়-সমাজ সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে ধানের বর্ণনার মাধ্যমে। কবি তাঁর গ্রন্থে কায়স্থদের মর্যাদার কথা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এইরূপে নানাভাবে নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে কবির বাস্তব জ্ঞান, কবিত্ব, রচনাশৈলী, দার্শনিক মনোভাব, ধর্ম-সংস্কৃতির ও সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গলকাব্য,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৭৯-৮০, পৃ. ১৭২
২. তদেব, শ্লোক- ১২১-১২৩, পৃ. ১৭৬
৩. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠীমঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮,

শ্লোক- ৩৫, পৃ. ১৫৩
৪. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ২৫, পৃ. ৫
৫. তদেব, শ্লোক- ৩৭-৪০, পৃ. ৬
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৪১৪, পৃ. ২০১
৭. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, শীতলামঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ১৩৮-১৪০, পৃ. ২৬৩
৮. ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৪১৬, পৃ. ২০১
৯. তদেব, শ্লোক- ৪১৯, পৃ. ২০১
১০. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৭৪৯, পৃ. ৭৮
১১. তদেব, শ্লোক- ২৯০-২৯১, পৃ. ৩২
১২. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠীমঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৩৬-৩৭, পৃ. ১৫৪
১৩. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ২৪১, পৃ. ১৮৬
১৪. তদেব, শ্লোক- ৮২১, পৃ. ২৩৫
১৫. তদেব, শ্লোক- ৮২২, পৃ. ২৩৫
১৬. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ১২৪৬, পৃ. ১৩০
১৭. তদেব, শ্লোক- ১১৮৮, পৃ. ১২৩
১৮. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৮৮৪-৮৮৫, পৃ. ২৪০
১৯. তদেব, শ্লোক- ৮৯৪-৮৯৯, পৃ. ২৪০-২৪১
২০. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কমলামঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৬১৭, পৃ. ৩৪৩
২১. তদেব, শ্লোক- ৬১৬, পৃ. ৩৪৩
২২. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৯০৬, পৃ. ২৪১
২৩. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ১২৬১, পৃ. ১৩১
২৪. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পা.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, রায়মঙ্গল,* কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, শ্লোক- ৮৯১-৮৯৩, পৃ. ২৪০

Bibliography:

ঘোষ, কবিতা, *সপ্তদশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সাহিত্য,* কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশনা, ১৯৯৪
চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 71 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড, প্রথম পর্ব, কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৯-১০

বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, *পঞ্চোপাসনা,* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪,

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২০

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা: এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম সংস্করণ: ১৯৯৮

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *হিন্দুদের দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব),* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *হিন্দুদের দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব),* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০

ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যনারায়ণ, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮

সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৭৫

শরিফ, আহমেদ, *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য,* ঢাকা: বর্ণমিছিল, ১৯৭১

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 83 - 89
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের কবি শাহবারিদ খানের সৃষ্টিকর্ম : বিশ্লেষণী অধ্যয়ন

হুমায়ুন কবির
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম
Email ID: hkm4all@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Medieval period, Bengali literature, Shah Barid Khan, Janganama, drama, poetry, society, culture.

Abstract
The 16th century poet Shah Barid Khan is the author of three poems, 'Vidyasundar', Rasul Bijoy' and 'Hanifar Digbijay'. The poem 'Vidyasundar' is full of dramatic qualities, and the dialogues of the characters are dramatic. The poet also mentioned it as 'Natgiti' in his poem. Natgiti were also important in medieval social life from the point of view of women's education. His second poetry is the story of war, the poem 'Rasul Bijoy', for the purpose of spreading Islam. Although the background of the poem is foreign, it has domestic social and cultural environment also. In the poem 'Rasul Bijoy', hidusism is expressed and it says poet's non-communal thinking. In the poem, the eternal patriarchy is shown in the character of Raja Jayakum. In the poem, we see female character Jaygun, who is immersed in weapons of war. Poet also expressed romantic character through fairy in his poem. The poet used rhythm, simile, ornamentation in his poem to enhance his writing.

Discussion

ষোড়শ শতাব্দীর কবি সাবিরিদ খান বা শাহবারিদ খান[১] রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুল বিজয়' ও 'হানিফার দিগ্বিজয়' নামে কাব্য। প্রাপ্ত কাব্যগুলি যেমন কলেবরে ক্ষীণ, তেমনি খণ্ডিত। খণ্ডিত হবার কারণে কবির আত্মপরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া যায় না। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের 'বিদ্যার পণ প্রচার" অংশে বিধৃত কবির পূর্ব-পুরুষদের পরিচয়ই কবি-পরিচয়ের মুখ্য উৎস। 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য' গ্রন্থে মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২ খ্রি.) কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।[২] কবি সাবিরিদ খানের পুথি আবিষ্কার করে সারস্বত সমাজে প্রথম তুলে ধরেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩ খ্রি.)। রোমান্টিক প্রণয় ও জঙ্গনামাধর্মী কাব্য তিনি রচনা করেন। এই সাহিত্য ধারার তিনিই একমাত্র আদৃত কবি নন। 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুলবিজয়' কাব্যের আরও একাধিক কবিকৃত কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন কবি কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছেন। 'রসুল বিজয়' রচনা করেন সৈয়দ সুলতান, সেখ চান্দ প্রমুখ কবি। এইসব কাব্যের সঙ্গে সাবিরিদ খানের কাব্যের পার্থক্যের একটি নির্দিষ্ট দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি, কবিকৃত ত্রয়ী কাব্যের বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে কাব্যকৃতি নির্ণয়ের

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেজন্য আমাদের প্রবন্ধের শিরোনাম পরিকল্পিত হয়েছে— "মধ্যযুগের কবি সাবিরিদ খানের সৃষ্টিকর্ম : বিশ্লেষণী অধ্যয়ন"। এই আলোচনায় বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী'-কে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এক

কবি সাবিরিদ খানের প্রথম রচিত গ্রন্থ 'বিদ্যাসুন্দর'। কাব্যটির সারকথা হল রত্নাবতীর রাজা গুণসার ও রানি কলাবতী দেবী পার্বতীর বরে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন, নাম রাখেন সুন্দর। কাব্যের নায়ক সুন্দর কাঞ্চিদেশের রাজা বীরসিংহ ও রানি শীলাদেবীর একমাত্র কন্যা বিদ্যাবতীর রূপের বিবরণ ভাট মুখে শ্রবণ পূর্বক মুগ্ধ হয়ে পরিণয়ের মনোবাঞ্ছায় কাঞ্চিদেশে উপস্থিত হয়ে এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় নেন, এরপর পুথি খণ্ডিত। কাব্যটিকে ভণিতায় কবি 'নাটগীতি' বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যে কাঞ্চিদেশের মালিনী ও নায়ক সুন্দরের সংলাপধর্মী কথোপকথন নাট্যগুণান্বিত। যেমন—

সুন্দর— "পুছিএ স্বরূপে সুবদনি বোল মোরে।
পুষ্পমালা দেঅ তুহ্মি কার কার তরে।।"[৩]
মালিনী— "সুকুমারী বিদ্যাবতী আছিল অবোলা।
সে অবধি যোগাই কুসুম্ব পঞ্চমালা।।"[৪]
সুন্দর— "পন্থশ্রম শান্তি ভেল তুয়া মিষ্টালাপে।
প্রমোদা, প্রমোদে বাসাখানি দেঅ মোকে।।"[৫]

কাব্যে রত্নাবতী কুমার সুন্দর ও ভাট মাধবের সংলাপ নাটকীয় ভাব বহন করে। কাব্যের নাট্যগুণ সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

"ইহাতে নাট্যকলা প্রস্ফুট না হইলেও, অস্ফুট নহে। প্রত্যেকটি বর্ণনা যেন এক একটা দৃশ্যের চিত্র। ফলে, কাব্যখানিতে নাটকীয় গুণ ফুটিয়া উঠায় ইহা একটি 'নাট্য-কাব্য' হইয়া উঠিয়াছে।"[৬]

নারীশিক্ষার দিক থেকেও নাট্যগীতিটি মধ্যযুগীয় জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ। কাঞ্চীরাজ বীরসিংহের কন্যা তথা নায়িকা বিদ্যাবতীর পাঁচ বছর পূর্ণ হলে একমাত্র কন্যাকে শিক্ষার জন্য গুরু মহাশয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কাব্যপঙ্ক্তিগুলি হল—

"পঞ্চম বরিষ কালে পঠিতে কুমারী বালে
গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল।
শুনিমাত্র শিখে পাঠ লজ্জিত সকল চাঠ
পঢ়িয়া বিদ্বান বড় হৈল।।"[৭]

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধনী পরিবারের অন্তঃপুরের নারীদের শিক্ষিত করে তোলা হত তার পরিচয় এখানে আমরা পাই। অভিজাত ধনাঢ্য পরিবারের নারীদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে শিক্ষাপ্রদান করা হত। কিন্তু এখানে বিদ্যাবতী রাজকন্যা হলেও গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে দেখি 'গোপীচন্দ্রের গান'-এর ময়নামতী, 'পদ্মাবতী' কাব্যের সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতী প্রমুখদেরও।

দুই

সাবিরিদ খানের দ্বিতীয় কল্পনাপ্রসূত কাব্য 'রসুল বিজয়'। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কল্পিত যুদ্ধবিষয়ক জঙ্গনামা কাব্য 'রসুল বিজয়'। 'রসুল বিজয়' পুথিটি খণ্ডিত। কাব্য কাহিনির অনুসরণে বোঝা যায় কাব্যটি কলেবরে ক্ষীণ। সাবিরিদ খানের 'রসুল বিজয়' হজরত মুহম্মদ মুস্তফার দিগ্বিজয় কালের একটি ঘটনা নিয়ে রচিত। এই কাব্যের আগে কবি জৈনুদ্দিন বা জয়েন উদ্দিন 'রসুল বিজয়' কাব্য লিখেছিলেন। দুটি কাব্যের কোনটিরও সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায়নি। এছাড়া আরও কয়েকজন কবির 'রসুল বিজয়' কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন সৈয়দ সুলতানের 'রসুল বিজয়' (ষোড়শ শতক), শেখ চান্দের 'রসুল বিজয়' (সপ্তদশ শতক)।

'রসুল বিজয়' কাব্যের আদি কবি হলেন জৈনুদ্দিন বা জয়েন উদ্দিন। জৈনুদ্দিনের কাব্যের নাম 'রসুল বিজয়' বলে পরবর্তী সময়ে এই ধারার কাব্য রচয়িতাগণ তাঁদের কাব্যের নামের সঙ্গে 'বিজয়' শব্দটি যোগ করেছেন বলে মনে হয়। আধুনিক যুগে যেমন - 'নীলদর্পন' (দীনবন্ধু মিত্র : ১৮৬০ খ্রিঃ) নাটকের নামের অনুকরণে 'চা-কর দর্পণ নাটক' (দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : ১৮৭৫ খ্রিঃ), 'জেল দর্পণ নাটক' (দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : ১৮৭৫ খ্রিঃ), 'টাইটেল দর্পণ' (প্রিয়নাথ পালিত : ১৮৮৪ খ্রিঃ), প্রভৃতি বহু দর্পণ গ্রন্থ রচিত হতে দেখেছি; তেমনি ছেলে ভুলানো রূপকথা গল্প সংকলন গ্রন্থ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রিঃ) 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৮ খ্রিঃ) ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-র (১৯০৯ খ্রিঃ) অনুকরণে পাই 'ঠাকুরমার ঝোলা' (শ্যামাচরণ দে : ১৯১৮ খ্রিঃ), 'ঠাকুরদাদার ঝোলা' (শ্যামাচরণ দে : ১৯২০ খ্রিঃ), 'ঠাকুরমার রূপকথা' (চণ্ডীচরণ গুপ্ত : ১৩৩২), ঠাকুরদাদার রূপকথা' (কালীমোহন ভট্টাচার্য : ১৯২২ খ্রিঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ। আবার, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখতে পাই কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অবলম্বনে 'পবনদূত' (ধোয়ী), 'বকদূত' (অজিত ন্যায়রত্ন), 'কাকদূত' (গৌরগোপাল শিরোমণি), 'গোপীদূত' (লম্বদর বৈদ্য), 'অনিলদূত' চন্দ্রদূত' প্রভৃতি দূত বিষয়ক কাব্য। এরূপ বহুল প্রযুক্ত আরও দুটি কাব্য ধারার নাম পাই আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি 'মঙ্গল', অপরটি 'চরিত' কাব্য।

উদাহৃত চারজন কবিকৃত চারটি কাব্যই ফারসি বা উর্দু থেকে বাংলায় অনুসৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য 'রসুল বিজয়' মৌলিক কাব্য নয়, তাই বলে আক্ষরিক অনুবাদও নয়। পূর্ববর্তী কোনো ফারসি কাব্যের স্বাধীন অনুসৃতি। কবি (জৈনুদ্দিন) বলেছেন—

"বিস্তর আছিল যুদ্ধ কেতাবে লিখন।
কিঞ্চিত লিখিল লোকে জানিতে কারণ।।"[৮]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে মাতৃভাষায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশীয় ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন কবিগণ।

বিদেশীয় পটভূমিতে রচিত কাব্যে স্বদেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতি : সাবিরিদ খানের 'রসুল বিজয়' কাব্য ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য মুসলমানদের দিগ্বিজয় কাহিনি বর্ণিত হলেও আমরা সেদিনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিভিন্ন আঙ্গিক ফুটে উঠতে দেখি তবে তার পটভূমি আরব দেশ নয়, আমাদেরই স্বভূমি বাংলাদেশ (সেদিনের অবিভক্ত বাংলা)। সেদিনের সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে ধনী গৃহে মেয়ে মহলে বাঁদি শ্রেণির ধনি বা বৌ-ঝি সমেবেত নাচ করতেন। ধনী গৃহে উৎসব অনুষ্ঠানে নাচিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে বেশ্যা আনা হত, কারণ তাঁরা প্রশিক্ষিত হতেন। এই কাব্যে নবির সেনাপতি খাবাইল ও জয়কুম তনয়ার বিবাহে এইরকম বর্ণনা পাই। সেখানে রাজবালার বিবাহ উপলক্ষ্যে নানারকম বাজনা ঝংকৃত হচ্ছে—

"তথি ব্যাল্লিশ বাজন বাজএ ঘনে ঘন
সব হুলুস্থূল আতি।"[৯]

এই বাজনার সঙ্গে নৃত্যও পরিবেশন হত, আয়োজনের আড়ম্বরে রাজঅন্তঃপুর রীতিমতো উৎসবে মুখরিত। বিয়ের উৎসব উপলক্ষ্যে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে নবীন সাজে সজ্জিত করা হচ্ছে, কেবল বাড়ির বাহির প্রাঙ্গন নয়, অন্তঃপুরও বর্ণময় করে সাজানো হচ্ছে। যেহেতু জয়কুম রাজা সেহেতু তাঁর এই কাজের মধ্যদিয়ে রাজোচিত বিলাসিতা প্রকাশ পাবে এটাই স্বাভাবিক—

"রাজ অন্তঃপুর রচিত সুন্দর
সকল সুবর্ণমএ।"[১০]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'জগতীমঙ্গল' কাব্যে দেখি বেহুলার পিতা বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁদের সমগোত্রীয় বণিকদেরই নিমন্ত্রণ করেছেন। শাহ্‌বিরিদ খানের কাব্যেও দেখি রাজা জয়কুম তাঁর তনয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে রাজ্যের মহৎ ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করেছেন। সেদিন সমাজে পান সুপুরি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি ছিল। জয়কুম রাজাও সেই রীতি মেনে নিমন্ত্রণ করেন—

"সুগন্ধি তাম্বুল বাটি ঘরে ঘরে
বোলাইয়া সবরাজ।"[১১]

বাঙালি নারীর প্রসাধন সামগ্রী কস্তুরি, কুমকুম, কাজল, মেহেদি ইত্যাদি জয়কুম রাজার তনয়ার সাজসজ্জা প্রসঙ্গে লক্ষ করি। স্নানের পূর্বে হলুদ, কুসুম, চন্দন দ্বারা গাত্রলেপন ইত্যাদি ধনী গৃহের নারীদের মধ্যে প্রচলিত একটি রীতি। তারপর সুবাসিত জল দ্বারা স্নান করানো হত এবং কনেকে বিচিত্র বসনভূষণে সাজানো হত—

"সুবাসিত জল করাইয়া গোসলি
ভূষণ ভূষে কর্ণে অঙ্গে।"[১২]

এই কাব্যে আমরা রাজকুমারীর অঙ্গের কোনো নির্দিষ্ট অলংকারের নাম পাইনা ঠিকই, তবে সেদিনের সামাজিক ইতিহাস লক্ষ করলে বোঝা যায় তখন মেয়েরা হাতে কঙ্কণ, বলয়া, চুড়ি; নাকে কোর, নাকমাছি; কানে কানফুল, ঝুমকা, কানবালা, কুন্তল; পায়ে নূপুর, ঘুঙুর; হাত-পায়ের অঙ্গুলে আংটি, বাহুড়ে, বাজু, হাতের পাতার উপর আঙুল সংলগ্ন রতন চূড় ইত্যাদি ধারণ করতেন। কিন্তু রাজতনয়া নিজের আভিজাত্যের মর্যাদা বজায় রাখতে বিলাসবহুল প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকবেন।

নারীদের কেশবিন্যাস সজ্জায় দেখা যায়, খোপারও বিচিত্র রকমের গড়ন ছিল এবং নানা ছাঁদের বেণী ও কবরী হত, সেই গড়ন ও গঠন অনুযায়ী নামেরও বৈচিত্র্য ছিল। যেমন চিত্রল, বেহারি, কানাড়ি, দেবমহলী প্রভৃতি। এদের মধ্যে কর্ণাট, দেশীয় 'কানাড়ি' ছাঁদে বাধা কবরীর কদর ছিল বেশি তা বোঝা যায় জয়কুম তনয়ার কেশ বিন্যাসের গঠন—

"কুটিল কুন্তল করিএ উচ্চল
কবরী কানড়ী ছন্দে।"[১৩]

সেসময় পুরুষরাও অলংকার পরিধান করতেন। পুরুষরের অলংকার রূপে বাহুতে কবচ ও বাজু এবং গলায় তাবিজ, হাতে বলয় প্রভৃতি ধারণ করতেন। এই কাব্যে মুসলমান যোদ্ধার পোশাকের নিম্নরকম বর্ণনা পাই—

"শতমন লোহা গঠ কবচ ভূষিত।
চল্লিশমনের টোপ কাঞ্চনে জড়িত।।"[১৪]

'রসুল বিজয়' কাব্যে আহার্য সামগ্রীর বর্ণনা তেমন করে পাই না, তবে জয়কুমের তনয় খাখান যুদ্ধের সময় ভাত, পান, বিচিত্র ব্যঞ্জন প্রভৃতি আহার্য গ্রহণ করেন— "ভাত খাই তুষ্ট হৈলা নৃপতি নন্দন"[১৫]। তৃপ্তি সহকারে ভাত খাওয়ার পর মুখ শুদ্ধির জন্য পান খাওয়ার রেওয়াজ বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত। এখানে ভাত খাওয়ার পর মুখ শুদ্ধির জন্য জয়কুম তনয়কে তাম্বুল সেবন করতে দেখা যায়। এটাকে এখানে নেশা জাত দ্রব্য রূপে না-ধরে বিলাসিতার অঙ্গ রূপে ধরা যেতে পারে— "কর্পূর তাম্বুল পুনি করিল গ্রহণ।"[১৬] এই আহার্য তালিকা বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ সন্ধান : মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। বিভিন্ন রোমান্টিক প্রণয় আখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলি প্রভৃতিতে মুসলমান কবিগণ নানা হিন্দুশাস্ত্রীয় শব্দ, লোকাচার, রীতিনীতি প্রভৃতি ব্যবহার করে উদার মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। আলোচ্য কাব্যের কবিও উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি মুসলমান হলেও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'রসুল বিজয়' কাব্যেও তিনি হিন্দু সংস্কৃতি তুলে ধরে অসাম্প্রদায়িক মননের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বিবাহসভায় রাজা জয়কুম তনয়া বাঙালি হিন্দু নারীর মতোই সিঁথিতে সিন্দুর পরেছেন—

"শিথেত সিন্দুর সুর বিকিরত
শোভিত সুন্দর ভালে।"[১৭]

আসলে অনেক দূরবর্তী দেশ আরব, রূপকথার ভাষায় বলা যায় সাত সুমদ্র তেরো নদীর ওপারের একটি দেশ। তাই সেদেশের মানুষের সমাজজীবন, জীবিকা বা আচার সম্বন্ধে দেশের লেখকের বা মানুষের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তখন ছিল না। কাজেই কাব্যে আরবীয় পরিবেশ পটভূমি অনুপস্থিত এবং বাংলার পরিচিত সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই আরবীয় পটভূমি নির্মিত হয়েছে। এজন্য এই কাব্য হয়ে উঠেছে বাঙালির কাব্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিন

সাবিরিদ খানের তৃতীয় কাব্য আবিষ্কার করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ নামকরণ করেন 'হানিফা ও কয়রাপরী'। আহমদ শরীফ 'হানিফার দিগ্বিজয়' নামে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।[১৮] কাব্যটি জঙ্গনামাধারার যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে কাব্যকাহিনিতে যুদ্ধাস্ত্রের ঝংকারে দৃপ্ত হয়ে উঠেছে নারী চরিত্র জয়গুণ। কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এটি। জয়কুমের বীরত্বের আস্ফালনের পাশে পরিকন্যা কয়রাপরি চরিত্রের মানব সন্তানের সঙ্গে প্রেমের চিত্র অলৌকিকতা মন্দ্রিত।

বিধর্মীদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কাহিনিতে মোহাম্মদ হানিফা স্ত্রী জয়গুণের পতিপ্রেম, নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম কিংবা পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ তাঁকে প্রকৃত বীরঙ্গনা করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ওয়াকিল আহমদ (জন্ম ১৯৪১ খ্রি.) বলেছেন - "জয়গুণ যথার্থ বীরঙ্গনা।"[১৯] সহীরাম রাজবালা জয়গুণ মোহাম্মদ হানিফার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করে পরিণয় প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হন। কাহিনিতে জয়গুণ চরিত্রে পতিব্রত্যানারীর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অবয়বে চিত্রার্পিত। প্রচার যুদ্ধের দিগ্‌বিজয়কালে সহীরাম রাজ্যে রাজার কূটচক্রান্তে হানিফা পরিখার মধ্যে পতিত ও আবদ্ধ হন। যুদ্ধে মৃত "গজ অশ্ব উট সৈন্য" প্রভৃতি কূপে নিক্ষেপ করে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন সহীরাম রাজ যেন উঠতে না-পারেন আলীর নন্দন মোহাম্মদ হানিফা। কূপে পতিত, বদ্ধ হানিফাকে উদ্ধার করতে সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে ত্বরিত আসেন স্ত্রী জয়গুণ। সহীরাম রাজা জয়গুণের পিতৃদেব। পিতৃপক্ষের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়গুণ পতিকে উদ্ধার করেছিলেন—

> "আমীরের বাক্য শুনি জয়গুণ চলিলা।
> পিতৃ সৈন্য মধ্যে জয়গুণ প্রবেশিলা।।
> জয়গুণের মুখ যদি সে সৈন্য দেখিলা।
> উজির সহিতে সৈন্য রণে ভঙ্গ দিলা।।"[২০]

নারীবাহিনী নিয়ে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে পতিকে মুক্তি করায় যেমন পতিপ্রেম চরিত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে, অনুরূপ তাঁর বীরঙ্গনা মূর্তিও এখানে সমুজ্জ্বল। সমালোচক জয়গুণকে তুলনা করেছেন 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা'র বীরঙ্গনা সখিনার সঙ্গে।[২১] স্বামীকে উদ্ধারের জন্য পিতার সৈন্যদলের সঙ্গে পুরুষ বেশে লড়াই করে সখিনা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

জঙ্গনামাধর্মী কাহিনিতে কবি হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্যের পাশে রোমান্সধর্মী প্রণয়চিত্র অঙ্কন করেছেন পরি চরিত্র সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। শাহাপরি নন্দিনী কয়রাপরী মোহাম্মদ হানিফার প্রতি অনুরক্তা এবং এই অনুরাগ একমুখী। কবি হানিফার প্রতি কয়রাপরীর অনুরক্তের ব্যাকুল অভিব্যক্তি বোঝাতে বলেন— "দিনে একবার মুখ না দেখিলে মরে"। যুদ্ধের অলৌকিক কাহিনিতে কবি মানবসন্তানের সঙ্গে পরি কন্যার প্রেম দেখিয়েছেন যা বাস্তবতা বর্জিত অলৌকিক। কয়রাপরীর প্রেমের নিষ্ঠতা শুধু নয়, হানিফার প্রতি তাঁর আকর্ষণও প্রবল ছিল। "চতুর্দশ অব্দ" ছায়ার মতোই তাঁর সান্নিধ্যে থাকেন পাওয়ার আশায় এবং সুযোগ পেয়ে প্রাণপ্রিয়কে উড়িয়ে নিয়ে চলে যান নিজ শহর রোকাম। এব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর সহচরী পরিগণ। অবহিত হওয়া যায় এতে কয়রাপরীর প্রেমের তীব্রতা। সমগ্র কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিসর 'কায়রাপরী কর্তৃক হানিফা হরণ' অংশে অনুরক্তা নারী কয়রাপরীর প্রেমচিত্র অঙ্কিত।

ছন্দ ও অলংকার : সাহিত্যশিল্পী সাবিরিদ খান ছিলেন আঙ্গিক সচেতন কুশলী-কবি। মধ্যযুগীয় প্রচলিত রীতির ধারায় পয়ার, ত্রিপদী, খর্ব ছন্দ, মালিছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'খাখানের যুদ্ধ' [চতুর্থ যুদ্ধ] বর্ণনায় কবি প্রয়োগ করেছেন খর্বছন্দ—

> "অলক্ষিতে আলিকে সান্ধিয়া দিব্য শর।
> হস্তের ধনুক কাটি পাড়িলা তৎপর।।
> লজ্জিত খাখান বীর ধরি আর ধনু।
> শরজালে আবরিল আমীরের তনু।।"[২২]

ছন্দ ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগেও সমুজ্জ্বল শিল্পকুশলী কবি সাবিরিদ খান। কয়েকটি শব্দালংকারের উদাহরণ—

অনুপ্রাস— "সাক্ষাৎ হইয়া দেবী দিলা বরদান।
সন্ততি জন্মিব তোর ভুবন প্রধান।।"[২৩]

উদাহৃত চরণ দুটির অন্ত্যে 'আন' ধ্বনি সাম্যে মিল সূচিত বলে এটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের দৃষ্টান্ত।

বক্রোক্তি— "কথাতে সিংহের নারী কুকুরের ভোগ্য।"[২৪]

বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতেই প্রশ্নের মধ্যে উত্তর অবহিত হওয়া যায়। এখানে প্রশ্ন সিংহের নারী কোথায় কুকুরের ভোগ্য? বলার ভঙ্গিতে উত্তর বোঝা যাচ্ছে, না— কোথাও ভোগ্য নয়। এজন্য এটি কাকুবক্রোক্তির দৃষ্টান্ত।
কয়েকটি অর্থালংকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

উপমা— "বজ্রসম মহাগদা ধরি বীরবর।"[২৫]
রূপক— "অস্ত্র সমে হস্ত ছেদে ভুজ সমে ধনু
নিরন্তর শরজালে আবরিল তনু।।"[২৬]

কাব্যপঙ্‌ক্তির 'শর', 'জাল' উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পিত হয়েছে বলে এটি রূপক অলংকার। আবার, প্রথম চরণের 'ধনু' ও দ্বিতীয় চরণের অন্ত্যশব্দ 'তনু'-এর মধ্যে ধ্বনিসাম্যে মিল সূচিত বলে এটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার।

উৎপ্রেক্ষা— "নবীন জলধর যেন গগনে গর্জেএ।।"[২৭]

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের দুটি বিভাগ— বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। এখানে 'যেন' সংশয়বাচক শব্দে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের সংশয় সূচিত বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার। কবির মণ্ডনকলাগুণ সম্পর্কে সমালোচক আজহার ইসলাম (জন্ম ১৯৪৪ খ্রি.) বলেছেন—

> "ছন্দ, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা কবিতাবলয়ের এসব অপরিহার্য অঙ্গ তাঁর শিল্পচেতনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। ...কাব্যকলা-মণ্ডিত শিল্পচেতনার রীতিসম্মত বিকাশ একাব্যেও যথারীতি বিদ্যমান।"[২৮]

উপসংহার : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর গতানুগতিক ধারার বাইরে রচিত কবির প্রথম গ্রন্থ 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নায়িকা বিদ্যা বিদুষী এবং তিনি কাঞ্চীপুরের রাজবালা, অন্যদিকে বর্ধমানের রাজবালা রূপে বিদ্যাবতীকে পাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। 'রসুল বিজয়' খণ্ডিত কাব্যে সাবিরিদ খান নবির মাহাত্ম্য প্রচারের অতিরঞ্জিত বর্ণনায় রসুলের বিজয়গাঁথা তুলে ধরে এই কাব্যধারার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নবির মানবীয় গুণের সঙ্গে তিনি যে যোদ্ধা হিসেবেও অসাধারণ রণকুশলী কাব্যের বর্ণনায় তা ধরা পরে। চিরন্তন পিতৃসত্তার স্বরূপ হিসেবে উঠে আসে রাজা জয়কুম চরিত্র। তাঁর সঙ্গে আমরা মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.) 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১ খ্রি.) কাব্যের রাবণ চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষণ করতে পারি। রাবণ যেমন লঙ্কার অধিপতি, জয়কুম তেমনি ইরাকের অধিপতি তথাপি যুদ্ধে আপন পুত্রের মৃত্যু জনিত বিলাপে রাজাসত্তা নয়, পিতৃসত্তা বড়ো হয়ে উঠেছে। জয়কুম রাজকুমারীর বিবাহের সঙ্গে বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহরীতির সাযুজ্য, কিংবা বাঙালির জীবনাচার আরবীয় পটভূমি নিয়ন্ত্রণ করে নির্মিত হয়েছে বিদেশীয় পটভূমিতে বাঙালি কাব্য।

Reference :

১. শরীফ, আহমদ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৮০
২. হক, মুহম্মদ এনামুল, 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে ২০১৩, পৃ. ৫৬
৩. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), 'শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৭৩, পৃ. ২০
৪. তদেব, পৃ. ২০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. তদেব, পৃ. ২০
৬. হক, মুহম্মদ এনামুল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৮
৭. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯
৮. হক, মুহম্মদ এনামুল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮
৯. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯০
১০. তদেব, পৃ. ৯০
১১. তদেব, পৃ. ৮৯
১২. তদেব, পৃ. ৯০
১৩. তদেব, পৃ. ৯১
১৪. তদেব, পৃ. ৪৫
১৫. তদেব, পৃ. ৭৪
১৬. তদেব, পৃ. ৫৯
১৭. তদেব, পৃ. ৯১
১৮. শরীফ, আহমদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭৭
১৯. আহমদ, ওয়াকিল, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, দশম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ১৯৪
২০. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৮
২১. আহমদ, ওয়াকিল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৪
২২. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৭
২৩. তদেব, পৃ. ৪
২৪. তদেব, পৃ. ১৪৬
২৫. তদেব, পৃ. ৪৪
২৬. তদেব, পৃ. ৫৬
২৭. তদেব, পৃ. ৪৯
২৮. ইসলাম, আজহার, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৯৯, পৃ. ৩৩

Bibliography :

আহমদ, ওয়াকিল, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, দশম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২৪
ইসলাম, আজহার, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৯৯
শরীফ, আহমদ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (১ম খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০২৪
শরীফ, আহমদ, 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০
হক, মুহম্মদ এনামুল, 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে ২০১৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 90 - 96
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : প্রসঙ্গ প্রতিবাদী নারীর আলোকে

মুকুল সেখ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mukulsk2015@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
protest, women, justice, injustice, movement, society, feminism.

Abstract
Throughout the ages, people have protested for justice and against injustice. The dictionary meaning of the word protest is objection. Standing up against socio-economic, political corruption, exploitation, oppression, and injustice is protest or resistance. Through this, rebellion or movement is organized. The opposing forces of society are defeated. Society is reformed. Society becomes healthy and beautiful. Socialized people become happy and comfortable. And the word 'rebellion' means refusing obedience or obedience, going against the rule or established customs. This protest or rebellion has been going on since ancient times. In a healthy, peace-loving, developed country, its tendency is less. Protest is seen in every system of government, be it monarchy, democracy, or dictatorship. This protest is born from inequality and inconsistency. Every person who worships truth and beauty wants to establish truth and beauty. When obstacles are created step by step in the establishment of truth and beauty, people protest against that obstacle and that is the beginning of rebellion. From that distant primitive society to this day, the strong have been oppressing the weak, whether they are men or women. If we step back a little from today's feminism and feminist thought movement, we will see that the poets' thoughts on women in the fifteenth and sixteenth centuries were very brave and exceptional. Some of the female characters they created were truly protestors. At that time, they were supposed to be trapped in illiteracy and superstition, but they protested in some places despite various adversities. They sometimes lost but did not give up. Although in today's context, that protest may be completely right for some, no social movement or its impact fell widely on society, it fell a little later after the advent of Chaitanya. Due to the awakening that took place in society, the women were enlightened in the light of education, although a little. Those education leaders were able to give literacy to the girls of aristocratic families like the Tagore family. Of course, that was a much later story.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সুস্থতা ও সৌন্দর্যেই সমাজবদ্ধ মানুষের মঙ্গল। সমাজের প্রতিটি মানুষের সম অধিকার থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটে। তখনই রূপ নেয় সমাজ বিদ্রোহের। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ নুতন নুতন ভাবে রূপ নেয়। অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও কুসংস্কার থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণির সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনে পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা, বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি নানা প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। জোতদার ও জমিদার শ্রেণি কৃষকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। এর ফলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধছে। শিল্পপতিরা শ্রমিকদের উপর শোষণ যন্ত্র চালিয়ে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। আজকের নারীবাদ ও নারীবাদের চিন্তাভাবনার আন্দোলন থেকে একটু যদি পিছিয়ে যায় তবে দেখতে পাব, পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে কবিদের নারী ভাবনা অনেকটাই সাহসী ও ব্যতিক্রমী। তাদের সৃজিত কিছু নারী চরিত্র যথার্থই প্রতিবাদিনী। সে সময় অশিক্ষা কুসংস্কার শৈবালদামে আটকে যাওয়ার কথা ছিল যাদের, তারা কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু কিছু জায়গায় প্রতিবাদ করেছে। কখনো হেরেছে কিন্তু হার মানেনি। যদিও আজকের নিরিখে সে প্রতিবাদ কারো কাছে একেবারে ঠিক হতে পারে। কিন্তু কোনো সামাজিক আন্দোলন বা তার প্রভাব ব্যাপকভাবে সমাজে পড়েনি। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পরে সমাজে যে জাগরণ ঘটেছিল তাতে নারী জাতি কিঞ্চিত হলেও বিদ্যা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েছিল। সেই বিদ্যা নেতারা ঠাকুর বাড়ির মত অভিজাত পরিবারের মেয়েদের অক্ষরজ্ঞান দিতে সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য সে অনেক পরের কথা।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারীর বন্দি দশার পরিচয় মেলে। নারী আজীবন যে বন্দি দশার মধ্যে দিনাতিপাত করতো তার প্রমাণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। নারীর স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা, শিক্ষা, প্রেম, বিবাহ, সর্বোপরি নারী মনের আশা আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছুতেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেনে নেয়নি। নারী আজীবন সমাজের বিধি-বিধানের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত। সমাজের বিধি-বিধানের শৃঙ্খলার নিগর যা নারী জীবনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল অক্টোপাসের মতো। তারই চাপে পড়ে রাধা নামী একটি বালিকা, যে কিনা সেকালের নারীধর্মের সামাজিক প্রতিরূপ। লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে বুকফাটা আর্তনাদ ব্যক্ত করেছে। চিরকাল সে চোখের জলে মধ্যযুগের মাটিকে সিক্ত করছে।

রাধা হিন্দু ঘরের কুলবধূ। হিন্দুদের দেহ, মন ও সতীত্ববোধ সদা জাগ্রত। সতীত্ব-ই বাঙালি মেয়ের চিরকালীন সম্পদ। তাই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরবর্তী ফসল মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, বেহুলা তার সতীত্বের জোরে স্বামীসহ ছয় ভাসুরের প্রাণ এবং শ্বশুরের হারানো সম্পদ সব ফিরে পেয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কাহিনির প্রস্তাবনা অংশে মঙ্গলকাব্যগুলির দেবখন্ডের অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনির সঙ্গে জন্মখন্ডের বিশেষ কোনো যোগ নেই। কাব্যের দ্বিতীয় খন্ড তাম্বুলখন্ড হতে রাধা কৃষ্ণের লীলা কাহিনির সূত্রপাত। মূল কাহিনির পূর্বে জন্মখন্ডে বিভিন্ন পুরাণের অনুসরণ রাধা কৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মূল কাহিনির সূত্রপাত তাম্বুলখন্ডে। তাম্বুল দলনের মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণের যে প্রেম প্রস্তাব তা বড়াই-এর মাধ্যমে কৃষ্ণ রাধাকে পৌঁছে দিয়েছে। রাধা এই প্রেম প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বড়াইকে কঠোরভাবে জানিয়ে দিয়েছে —

> "ঘরে স্বামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর আছে সলক্ষণ দেহা।
> নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।"[১]

রাধা কৃষ্ণের প্রেম নিবেদনে যে প্রতিবাদ তা উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে নারীর যথার্থ অবস্থান অনুধাবন করা না গেলেও, আদি মধ্যযুগের কবি বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধা পুরুষশাসিত সমাজে অসহায় রূপে বিরাজ করেছে। 'বাণখন্ডে' রাধাকে কৃষ্ণ মন্মথবান নিক্ষেপ করে মূর্ছিত করলেন। রাধা অনেক মিনতি করলেন কিন্তু কৃষ্ণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি তাকে আমল দেবে কেন? রাধা তো তার কাছে কেবল প্রয়োজনের। তার মানসিক প্রকাশ ও বিকাশ সে চায় না। অর্থাৎ মধ্যযুগের নারী ছিল গৃহ কোণে আবদ্ধ। তাই তারা তাদের ছোট্ট পরিবারের মধ্যে থাকতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকতে মনের ভাবনাকে কখন যেন প্রকাশ করে ফেলেছে ছড়ায়, গানে, ধাঁধায়, প্রবাদে, আলপনায় ও নকশি কাঁথায় ইত্যাদির মধ্যে। তবে এ কথা সত্যি যে নারীরাও কাব্যচর্চা করতো মধ্যযুগে। তবে পুরুষ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অনধিকার প্রবেশ স্বীকৃতি হয়নি। তাই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে তারা। নারীবাদরা হারিয়ে যাওয়ায় নারী সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে উৎসাহী হয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বংশীখণ্ডের এই অংশটি পাঠ করলে সহজে বোঝা যায় এক হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যের অংশ-

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে।।
অকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদে ম আউলাইন রান্ধন।।"[২]

প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা, ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত নানা আকর্ষণ বিকর্ষণ মধ্যে দিয়ে প্রেম প্রণয়ের চিত্রটাকে আরও স্পষ্ট করেছে। এখানে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনের কৃষ্ণ বিশুখা একাদশী বালিকাটি কৃষ্ণ অনুরাগে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং কৃষ্ণের বিরহে কখনো মনে হয়েছে —

"দাসী হআ তার পাএ নিশিবো আপনা।।"[৩]

আর এখানে রাধার সে বিরহ বেদনা শুধুমাত্র রাধার মধ্যে আবৃত না থেকে সর্বকালের সর্বদেশে বিরহ বেদনা সুরে একীভূত হয়েছে। আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে শেলীর সেই বিখ্যাত উক্তি—

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

এর প্রতিবাদ দেখতে পায় কৃষ্ণের প্রতি প্রেমে। তাম্বুলখন্ডে তাম্বুল দলনের মধ্যে দিয়ে শুরু করে কৃষ্ণের ছেড়ে যাওয়া ও রাধার উক্তির মধ্যে প্রতিবাদের সুর জোরালো হয়েছে। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সুর বুঝতে পারা কঠিন। তবুও দেশ-কাল-সমাজ প্রেক্ষিতে এই রাধার কথায় প্রতিবাদ ফুটে ওঠে।

প্রতিবাদ এখন যেমন আছে তখনও ছিল কিন্তু তার প্রকাশের উপায় ছিল ভিন্ন। মনসা, 'মঙ্গলকাব্যে'র মূল দেবী। সে নানাভাবে চাঁদ সওদাগরকে দমন করতে চেয়েছে। চাঁদকে তার পূজা প্রচারে বাধ্য করেছে। চাঁদ সওদাগর যত প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, তত প্রবলভাবে মনসা বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যের অন্য কোনো দেব-দেবী মনসার মত এত হিংস্র রূপ ধারণ করেনি। মনসা এবং চাঁদ সদাগরের বিরোধকে কেন্দ্র করে এই কাব্য কাহিনি বিকশিত হয়ে উঠেছে। কাজেই মনসার রুদ্ররূপ সকল কবি অঙ্কন করেছেন। মনসার প্রতিবাদ সমাজের প্রতি। মহাদেবের পুত্র গণেশ ও কার্তিক। তাঁরা সমাজে যেভাবে সম্মান পায় মনসা সেখানে বঞ্চিত, অবহেলিত। এতে মনসা ক্রুদ্ধা নাগিনী দংশন করতে ছাড়েনি। সমাজে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য মনসা চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে পূজা আদায়ের মাধ্যমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে দেব সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। লোক জীবনের প্রাণ ও সৃষ্টিধর্মী শক্তির সঙ্গে সর্প শক্তি একীভূত হয়েছে মনসার মধ্যে। তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সামাজিক উচ্চবর্ণের ভাব ও ভাবনার বিরুদ্ধে সামাজিক নিম্নবর্ণের ভাবনার সংগ্রামের কাহিনি পুনরাবৃত্ত হয়।

মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র বেহুলা। জেদ, প্রতিজ্ঞা, অসাধ্য সাধনের প্রতিচ্ছবি এই মেয়েটি স্থিতাবস্থা ভেঙেছে। অন্য আর পাঁচটা মেয়ের মত সেও স্বামী মারা যাবার পর বাড়িতেই থাকতে পারতো। কিন্তু সে পুরাণের মহাভারতের সাবিত্রির মতো স্বামীকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে ফিরেছে। মুক্ত সরবরে সখীদের সঙ্গে জলক্রিড়ায় মত্ত বেহুলার পায়ের জল বৃদ্ধা বেশে থাকা মনসার গায়ে পড়ে। তখনই তাকে অভিশাপ দিল-

"বিভা রাতে খাইবা ভাতার।"[৪]

মনসার অভিশাপকে উপেক্ষা করে বেহুলা চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরকে বিয়ে করে। দেবতার বিরুদ্ধে তার এই প্রতিবাদ যেন বলতে চাইছে হতে না পারি দেবতা, মানুষ হিসেবে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। মা, শ্বশুর, শাশুড়ি আত্মীয়

পরিজনের ভাষায় সংসারে আমার মতো কে আছে। বিবাহের দিনে বিধবা! দেখে নেব আমি, কি আছে আমার কপালে? এখানে তার প্রতিবাদ এসেছে জেদ প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে।

বেহুলা স্বামীর শবদেহ সঙ্গে করে একটি কলার মঞ্জুষায় ভাসতে ভাসতে যত নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে ততই তার প্রতিবাদী সত্তা গর্জন করে উঠেছে। এভাবে সুরক্ষা করেছে স্বামীর শবদেহসহ নিজেকে। সে যদি দেবতা ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করতো তবে সাফল্য আসত না। যদিও মধ্যযুগের চরিত্রগুলি বেশিরভাগই দেবতার বর পুষ্ট। এখানে বেহুলা ও মনসা সেবিকা। কিন্তু প্রতিবাদী নারী হিসাবে আমরা বেহুলাকে পাই। আধুনিক সমালোচকরা কেউ কেউ বেহুলাকে বলে থাকেন লাস্যময়ী রমণী। কিন্তু আমাদের মন তাতে সায় দেয় না। বেহুলা নৃত্যকলাপটিয়সী নিশ্চয় ছিল। কিন্তু লাস্যময়ী রমণী তাকে আমরা কখনোই বলতে পারিনা। কেননা জীবনে আর কোনো ক্ষেত্রে কোনো মঙ্গলকাব্যের কবি তার নারী লাস্যময়তার পরিচয় দেননি। বেহুলা সেই নারী যে মনে করে **'Do or Die'** আমার স্বামীকে যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনবোই।

শেষপর্যন্ত বেহুলা তার স্বামীকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনে। এখানে কাজ করেছে তার জেদ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিবাদী সত্তা। আর কবি জীবনানন্দ ধরেছেন বেহুলা জীবনের যন্ত্রণায় দুঃখিত সবাই। তার চরিত্রের অবমাননায় ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে তার মানবী কান্নাকে সমর্থন করেছে তা জন্মভূমির ফুল-ফল-মাঠের আত্মীয় জনেরা অনেকটা কৃষ্ণ চলে যাওয়ায় তার পারিপার্শ্বিক বন্ধু আত্মীয়দের মানসিকতার মতো।

প্রাগাধুনিক যুগেও প্রতিবাদ ছিল কিন্তু তার ধরণটা ভিন্ন। আজকের মত না হয়েও বাস্তব বিচারে তা উল্লেখযোগ্য। মনসার ব্রতদাসী হলেও বিপদ বেহুলাকে ঘিরে ধরেছিল। লোভী পুরুষদের, বন্য জন্তুদের নানাভাবে বাঁধা দিয়েছে। সে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে সচেতনভাবে সতীত্বের জোরে একটি মেয়ে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তা আমাদের বিস্ময়াপন্ন করে তোলে।

মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গলের কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দের ব্যতিক্রমী নারীভাবনাকেও আমরা সেই অর্থে প্রতিবাদী নারী ভাবনা বলতে পারি। তিনি তাঁর কাব্যে নানাভাবে তা ব্যবহার করেছেন। নারী মনস্তত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুকুন্দের অসামান্যতা ষোড়শ শতকে ব্যতিক্রমী। কবি নিজের ভাগ্যের নির্যাতনে যা ভোগ করেছিলেন তার প্রতিবাদ বাস্তবে করতে পারেনি। কিন্তু মসী দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন তার সৃষ্ট বিভিন্ন নারী চরিত্রের মাধ্যমে বা কিছু পরিস্থিতি নির্মাণে।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খন্ডের প্রধান নারী চরিত্র ফুল্লরা। ফুল্লরা জটিল চরিত্র নয়, অত্যন্ত জীবন্ত, কিন্তু প্রয়োজনে ছলনা ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করতে জানে। সে কালকেতু ব্যাধের স্ত্রী। ফুল্লরা পরিশ্রম করে হাটে পশুর মাংস বিক্রি করে। এটাই তাদের জীবিকা। অন্ত্যজ| শ্রমজীবীর হিন্দু পরিবারের বধূদের মত গৃহকোণে আশ্রয় নয়, উপার্জনে সে স্বামীর সমান। যে দিন কালকেতু শিকার পাইনা সেদিন এই দরিদ্র ব্যাধ দম্পতির **অন্ন** চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। দরিদ্র ও দুঃখ ভারাক্রান্ত ফুল্লরার একটি চমৎকার ছবি মুকুন্দ এঁকেছেন। সুখ-দুঃখে, শ্রমে দারিদ্র্য ফুল্লরার জীবনযাত্রা এবং স্বভাবে যে রূপটি কবি এঁকেছেন তার মধ্যে মধ্যযুগের শ্রমজীবী শ্রেণির নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ফুল্লরার মধ্যেও প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। ফুল্লরা ঘরে এসে দেখতে পেল এক পরমা সুন্দরী রমণী বহু অলংকারে ভূষিত হয়ে অবস্থান করেছেন। এই দৃশ্য দেখেই সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ফুল্লরার মধ্যেও একটা বড় সান্ত্বনা ছিল যে তাকে সতীনের ঘর করতে হয়নি। ফুল্লরা প্রথমে চেষ্টা করলো ভালোভাবে কথা বলে, উপদেশ দিয়ে যুবতী নারীকে তার নিজের বাড়ি ফেরত পাঠাতে। লোকলজ্জার ভয় দেখিয়ে তাকে পুরাণের নানা উদাহরণ দিয়ে সতীত্বের মাহাত্ম্য বোঝাতে চাইল। তাতে যখন কাজ হলো না তখন সে তার দৈনন্দিন জীবনের অভাবের এক এক ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো। ফুল্লরার এই দুঃখের ফর্দটাই তার বারমাস্য। বারমাস্য হল মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদের একটি প্রথাগত দুঃখের তালিকা। মুকুন্দ চক্রবর্তী সেই বারমাস্যকে ফুল্লরার চরিত্রের একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন। অনেক সমালোচকই বলেছেন ফুল্লরার বারমাস্যই তার প্রচন্ড দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ। ফুল্লরার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন সে অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে গোলা হাটে গিয়ে কালকেতুকে ভর্ৎসনা করতে লাগে। কালকেতুকে সে যে ভাষায় অভিযুক্ত করল তা স্বামী প্রেমে

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূণ্য রমণী অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত তীব্র বেদনা এবং অপমান চাপিয়ে দেওয়া। মহাপাপের কথা তার মতো জোর গলায় উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীরা বোধ হয় সেকালে বলতে পারত না। ফুল্লরা যে কথাগুলি বলেছে —

"সতা সতীন নাহিপ্রভু তুমি মোর সতা।
আজি হইতে ফুল্লরারে বিমুখ বিধাতা...।"[৫]

অবশেষে সংশয় ঘুচে গেল। কিন্তু ফুল্লরার মধ্যে যে ভালোবাসা কালকেতুর উপর এবং সেই ভালোবাসার সত্তা থেকে প্রতিবাদ করছে। তার অধিকারের জন্য। যা আমরা বর্তমান সমাজে দেখে থাকি। সেই সময়ের ফুল্লরা এক অন্যরকম প্রতিবাদ যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সামাজিক অবস্থান শুধু পুরুষ নয়, নারী অনেক সময় উৎপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা চন্ডীর আচরণে পরিস্ফুটিত। অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারীর সম্পর্কে সমাজ অনেকটাই নিশ্চুপ। এই সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মনসার। মনসার প্রতিবাদ থেকে মনসা অত্যাচারী দেবী রূপ নিয়েছে। তবে তার এই প্রতিবাদ মান্যতা দেওয়ার জায়গা করে নিয়েছে।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্যতম চরিত্র রম্ভাবতী। চরিত্রটি বলতে গেলে নীরবে এসেছে প্রায় নিরবেই চলে গেছে। কিন্তু দু একটি কথায় এবং কাজে সে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। চরিত্রটির বিদ্রোহী মনোভাব, সাহস, ও বাক্ নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে। ক্ষণকালের জন্য হলেও নবজাগরণের কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি মনে করাই। যদিও কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী এই চরিত্রটিকে পূর্ণতা দেননি। একটু তুলে ধরেই চরিত্রটিকে হার স্বীকার করিয়েছেন পরিস্থিতির কাছে এবং চিরন্তন, স্নেহিক দুর্বলতার কাছে। চাঁদ সওদাগরকেও যেমন করতে হয়েছিল সর্ব মুশকিল আসন স্নেহের পুত্রবধূর কাছে।

রম্ভাবতী খুল্লনার মা ও লক্ষপতির স্ত্রী। আর পাঁচটা সাধারণ মায়ের মতই স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়না। কিন্তু তার প্রথা বিরোধী কথা এবং স্বামীর সঙ্গে কথপোকথনে ধরা পড়েছে তার প্রতিবাদ। আর এখানেই সে স্বতন্ত্র। স্ত্রী স্বামীকে গঞ্জনা দেবার সাহস সে যুগে ছিল না। ঘরে ঘরে সতীন সমস্যা, স্বামীকে রাগিয়ে দিলে নিজেরই ক্ষতি। বাবা, মা, দাদা কোনো বিপর্যয়ে দেখবে না বিয়ের পর। কন্যাকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়েছি। কন্যাপণও নেব না, নিজেরা খরচ করে যৌতুক ইত্যাদি দিয়ে দেব। তাহলে কেন নির্ধারণ সতীনের ঘরে মেয়ের দুর্গতি দেখার জন্য এই পাত্রের কাছে বিয়ে দেবো? তার যে এখানে মেয়ে দেবার এতটুকু ইচ্ছে নেই তা স্পষ্ট করে সে বলে দিয়েছে। বিশেষ করে নিজের ভাসুরের মেয়ে লহনা ভুখিল বাঘিনীর মতো এমন সতীনের ঘরে সে তার আদরের খুল্লনা হরিনকে কিছুতেই বিয়ে দেবে না। তা সত্ত্বেও লক্ষপতি তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে।

বিলম্বে করিব কন্যা দান এবং এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা সে বলছে, যা সে যুগে দেখাই যায় না। -'কন্যা পাবে কতুহল' বিয়েতে মেয়ের পছন্দের কথা কেউ কখনো ভাবতো না। রম্ভাবতী প্রতিবাদিনী বলেই ভাবতে পেরেছে। এত বলিষ্ঠভাবে মধ্যযুগের কোনো নারী সম্ভবত বলেনি। তারপরে অবশ্য জ্যোতিষীর কথায় মায়ের মন নরম হয়েছে। সে মেয়ের এই বিয়েতে মত দিয়েছে। খুল্লনার চরম দুর্ভাগ্যের জন্য সে দনাই পন্ডিতকে বারবার দুষলেও স্বামীর যে দোষ আছে সেটা একেবারও বলল না। তাই পুরুষের ও কবির মনে থাকেনি এই প্রতিবাদী মেয়েটিকে পূর্ণতা দেবার কথা। অথবা সত্যদ্রষ্টা কবি জানতেন মেয়েদের কথা সত্যি সত্যি কেউ গ্রাহ্য করে না। তাই তার কোনো দাম নেই। সংসার চলে সংসারের নিয়মে। তাই রম্ভাবতী একবার জ্বলে উঠেই শেষ হয়ে গেছে কবির প্রতিবাদীসত্ত্বার স্ফুলিঙ্গ হয়ে।

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের অপর একটি প্রতিবাদী নারী চরিত্র লহনা। সে জীবন যুদ্ধে কখনো হেরে গেলেও কিন্তু হার মানেনি। এমন জেদি, সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা চরিত্র মঙ্গলকাব্যে খুব কমই আছে। বিশেষ করে প্রতিবাদ মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সে যুগের নিয়ম অনুসারে তার জীবনেও সতীন আছে - এ খবর পেয়ে 'শেল যেন বাজে বুকে/প্রভু দিব নিদারুণ সত্য'—ভাবতে বসল লহনা। জৈব অজৈব সবকিছুর উপর আসক্তি লহনার। এমন নিজের সংসার শেষপর্যন্ত কিনা সতীনকে দিয়ে দেবে? পুরুষের ছলনা সে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলেও মেনে নেয়, আবার কখনও সে প্রতিবাদ করে। পরবর্তী সময়ে লহনা এসব মুখ বুজে মেনে নেয়নি। মেনে নিতে বাধ্য হলেও যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছে। যেখানে নারীত্বের অবমাননা হয়েছে সেইখানে সে ক্ষুদ্র হয়েছে। প্রশ্ন করেছে সোজাসুজি ধনপতিকে যে তার নারীত্বের কেন অবমাননা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 90 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করছে সজ্ঞানেই। যদিও সে যুগের প্রবণতায় ধনপতি দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণ মোটেই দোষের ছিল না। আর নারীর যৌবন কাল তো জনম অব্দি থাকে না কারো। বন্ধ্যাত্ব নিয়েও তাকে গালাগাল শুনতে হয়েছে। সে এইসব কথার উত্তর দিয়েছে অত্যন্ত আধুনিকতার মতো। সন্তান না হবার দায় কেবল তার একার নয়। দায়ী তারা দুজনেই। এমনকি দোষ বংশেরও। এমন কথা যে কবি তার চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই আধুনিক এই কথা বলায় বাহুল্য।

লহনা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে। সে তার স্বামীর মন পাবার জন্য স্বামীর প্রিয় খুল্লনাকে ভালোবেসেছে। কখনো সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। আমরা তার বাপের বাড়ির ছেলেবেলার পরিচয় কিছুই জানিনা। নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য সে খুল্লনাকে নির্যাতন করেছে। স্বামীকে বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে নিজ মুখি করতে চেয়েছে। সব সময়ে লহনাকে খল চরিত্র বলে মনে হয় আমাদের। পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র, কুটকৌশল, অপমান, মারধর করেছে খুল্লনাকে। আসলে সমস্ত রকম কু-কর্ম সে স্বামীকে হাতছাড়া না করার জন্য করেছে। সন্তানহীনা স্বাধীনচেতা মেয়েটির দুর্বল জায়গা তার স্বামী। এত কিছু করেও কিন্তু তেমন কোনো ফল হয়নি। লহনার আসল কষ্টটা যে কি তা সমাজতত্ত্বের ভাষায় বলা চলে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। স্বতন্ত্র জীবনের জন্য পরাজিত হবে তবুও সে যুদ্ধ করছে। সবক্ষেত্রে এটাই যেন সমস্যা চিরন্তন হয়ে উঠেছে যে তাকে ভাত কাপড় দেবে সমাজে স্বীকৃতি দেবে। তাকে কোনো কিছুর বিনিময়ে হাতছাড়া করতে চাইনি। এই কারণেই তাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে গৌরী প্রতিবাদ করেছে স্বামীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে। বিনা নিমন্ত্রণে নারী পিতৃগৃহে গেলে স্বামীর অপমান অনিবার্য। তবু গৌরী শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করার যুক্তি দেয়—

“ভবানী বলেন যাব বাপের সদন ইথে দোষ নাহি নাথ লোকের গঞ্জন।”[৬]

এখানে প্রচ্ছন্ন হলেও স্বামীর বক্তব্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা আছে। এটা এক ধরনের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবাদ ছাড়া কিছু নয়। যার প্রমাণ আমরা পাই শিবের নিষেধ অমান্য করার অসীম দুঃসাহসীকতায়। শিব গৌরীর স্বামী। পতিপরায়ণতাই নারীর একমাত্র ধ্যান। তবে তাকে অবজ্ঞা করে কেমন করে? মনে হয় গৌরী প্রতিবাদ করেছিল শিবকে নয়, তার আদেশকে। কেননা নারী স্বাধীনতা চায়, সমাজ তাকে দেয় না, তাই নারী গর্জে ওঠে সেই সমাজের প্রতি। বিপরীত দিকে গৌরী বিনা আমন্ত্রণে এসে প্রতিবাদই করেছে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে। কেননা গৌরীর বাবা জেনে শুনেই কুলীন পাত্র শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, অথচ সামাজিক আভিজাত্যের মোহে তাকে ভুলে যায় দক্ষ। কন্যা গৌরী তো নির্দোষী তবে কেন আমন্ত্রণ করা হবে না উৎসবের অনুষ্ঠানে। বিনা আমন্ত্রণে এসে সে দক্ষের চক্ষু খুলে দিতে চেয়েছে। একে সার্থকতম নারী প্রতিবাদের নমুনা বলে গ্রহণ করা চলে।

নারীবাদ একান্তভাবে আধুনিককালের ধারণা হলেও সুপ্রাচীনকাল থেকেই নারী আপনার মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের শক্ত প্রাচীর ভেদ করে সে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি বটে। কিন্তু তারা যে একেবারেই অবলা ছিল না সেকথা স্বতঃসিদ্ধ। প্রাচীন তথা মধ্যযুগের প্রত্যেক সমাজ সচেতন কবির কাব্যেই তাই নারীর মুখে বসানো হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে তার জীবন্ত রূপই ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে প্রণয়োপাখ্যান কাব্যের মধ্যেও আমরা প্রতিবাদী নারী চরিত্রের আভাস পায়। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণকে গ্রহণ না করার প্রতিবাদ দেখতে পায়। আবার অন্যদিকে শাহ মহম্মদ সাগীর রচিত ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্যে ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই কাব্যে জোলেখার মধ্যে ইউসুফকে না পাওয়ার প্রতিবাদ উদ্ভাসিত হয়েছে। আর সেই জোলেখার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে জোলেখার প্রতিবাদী সত্তা। মনসামঙ্গলের মনসার মতোই জোলেখার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। তার স্বপ্নে দেখা মিশরীয় রাজকুমার আদৌ তার স্বপ্নের রাজকুমার নয়। এটা জানার পর থেকেই সাংসারিক জীবনে একটা বি-তৃষ্ণা জন্ম হয়। জোলেখার স্বামী নপুংসক এই বাস্তব সত্যটা সামলাতে নারাজ ছিল, কেননা সে এত সুন্দরী ছিল যে কোনো সুপুরুষ ব্যক্তি তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। সে কোনো দিন মা হতে পারবে না এটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এবং সে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি হবার প্রতিবাদ করে প্রকাশ্যে। একদা একদিন মিশরীয় রাজকুমার আজিজ রাজার থেকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়ে ইউসুফকে কিনে নিয়েছিল। আজকে ইউসুফকে প্রথম দেখে জোলেখা প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। মনে মনে কল্পনার শিখরে

ইউসুফকে পাওয়ার একটা জাল বুনতে থাকে। বিবাহের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জোলেখার জীবনে কাম প্রবৃত্তি ইউসুফকে দেখে আবার জেগে উঠল। সে যে তার স্বপ্নের দেখা রাজকুমার, সৌন্দর্যে মুখরিত রাজকুমার ইউসুফকে দেখার পর আবার স্মৃতিপটে জেগে উঠল। সে ভাবল এই সেই রাজকুমার, যাকে একদিন স্বপ্নে দেখেছিল। স্বপ্নেরই রাজকুমারকে পাওয়ার জন্য একটা প্রতিবাদী নারী সত্তার জাগরণ ঘটাল। কেননা সে একজনের স্ত্রী। সে পরের স্ত্রী হয়েও অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। সাধারণভাবে এটা সমাজবিরোধী কাজ। জোলেখা সেই সমাজকে উপেক্ষা করে বীরঙ্গনা নারীর মতো কাব্যের পরতে পরতে একটা বিদ্রোহের সুর বাজিয়ে তুলেছে। যতদিন যায় ইউসুফকে পাবার আকাঙ্ক্ষা ততই তার বেড়ে যায়। কোনোক্রমে একদিন ইউসুফকে ছলনা করে নির্জন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে বলে। জোলেখা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। সে মূর্তিগুলির সামনে অনৈতিক কাজ না করার জন্য সেগুলিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। এখানে তার প্রতিবাদী সত্তা বাইরেও কিন্তু দেব ভাবাপন্ন মনোভাব জাগ্রত হয়। ইউসুফকে পাওয়ার জন্য জোলেখা সমাজ বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এবং তাকে পাওয়ার জন্য সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

জীবন চলছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের ঘূর্ণিচাকায়। ধর্ম ও মোক্ষের কথা তো সবার মুখেই আমরা শুনেছি। অর্থের কথাও বলা অশোভন নয়। কিন্তু কামের কথা বললেই সমাজপতিদের গেল গেল রব ওঠে। ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত নারী চরিত্রটি যতই ছোটো হোক তার কথার মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ সংসারের একটি ছোটো সুখী গৃহকোণের স্বপ্নের প্রতি আঘাত যা দেবী তাকে দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে এক বিরহিনী মানবীর প্রতিবাদ। আর ছিল যুক্তিবাদী একটি মেয়ের সাহসী উচ্চারণ। স্পষ্ট কথা দেবীকে বলতেও সে ভয় পায়নি।

তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে রাজ্য জুড়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছিল তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল মঙ্গলকাব্যগুলি। এই দেবমাহাত্ম্যমূলক আখ্যানগুলিতে ধরা পড়েছে তৎকালীন সমাজজীবন। তাই এদের বলা হয় বাংলার পুরাণ। পুরুষশাসিত সমাজের কথাই সব রকম সাহিত্যে থাকে। মঙ্গলকাব্যেও তাই-ই আছে। তবুও তার মধ্যে কয়েকটি নারীচরিত্র তাদের বুদ্ধিমত্তায়, কার্যকারিতায়, স্বাতন্ত্র্যে আমাদের মন কেড়ে নেয়। এতদিন ধরে চলে আসা জগদ্দল পাথরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে নড়াতে পারেনি। তবুও কেউ হয়তো চেষ্টা করেছিল। সমাজগাত্রে, পরিবারের রীতিনীতির কঠোর অনুশাসনের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ ফানুসের মতো উড়ে গেলেও স্মৃতিতে রেখে গেছে তাদের সাহসী প্রয়াসের রেশ। লহনা প্রতিবাদ করে শেষপর্যন্ত জিতেছিল। দেবতার কৃপায় সে সন্তান পেয়েছে। তার চেয়েও বড় পাওনা তার স্বতন্ত্রতা সংসার যেখানে সে তার স্বামীর একমাত্র স্ত্রী, সে একেশ্বরী। ধর্মমঙ্গলের বীরাঙ্গনারা শৌর্য বীর্যে জীবনে ও সমাজে যোগ করেছিল অন্য এক মাত্রা। এখানেও বলতে হয় জেতাটাই বড় কথা নয় প্রতিবাদ করাটাই বড় কথা।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৪, তদেব, পৃ. ২১১
২. তদেব, পৃ. ৩৮০
৩. তদেব, পৃ. ৩৮০
৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য : 'কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল', কলকাতা, নিউ বইপত্র, ২০১৭, তদেব, পৃ. ২৯৭
৫. নস্কর, সনৎকুমার : (সম্পাদনা) 'মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কন-চন্ডী,' কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫, তদেব, পৃ. ২৪১
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র : 'কবিকঙ্কন চণ্ডী', কলিকাতা, কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৮, তদেব, পৃ. ৩২০

Bibliography:

গিরি, পুষ্পেন্দু শেখর : 'ইউসুফ জোলেখা নিবিড় পাঠ', কলকাতা, গ্রন্থ বিকাশ, ২০০৫
দাস, দেবরঞ্জন : 'বাংলা মঙ্গল কাব্যে নারী চরিত্র : বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য', কলকাতা, দে বুক স্টোর, ২০০০
নস্কর, সনৎকুমার : (সম্পাদনা) 'মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কন-চন্ডী,' কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র : 'কবিকঙ্কন চণ্ডী', কলিকাতা, কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৮
ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 97 - 106
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সর্বনামপদের রূপ ও প্রয়োগবৈচিত্র

ড. অমরকুমার পাল
সহকারী অধ্যাপক
পাটলিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার
Email ID : paul.amar633@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Chandimangal, Manik Dutta, Pronoun, Linguistics.

Abstract
Till now, the poet Manik Dutta of Malda is considered to be the ancient poet of Chandimangal. Sunil kumar Ojha collected the main part of this poetry from the notebooks written by the singers in 1784 and published it as a book. As a result, the poetry edited by Ojha also depicts the contemporary language of the singers. The said poem by Manik Dutta is very important in the judgment of Bengali linguistics. The poem creates a bridge between the middle-ages and the modern era of Bengali language. And the thing that attracts the most attention while analyzing the language of Manik Dutta's poem is the pronoun. The well-decorated, developed form of the pronoun in the Bengali language in the modern era seems to have its roots in Manik Dutta's poetry.

Discussion

এখনও পর্যন্ত মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি বলা হয়। চণ্ডীমঙ্গলের এই আদিকবির পুথি নিয়ে নানান সমস্যা থাকলেও শ্রীসুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কাব্যটি যে অনেকটাই সম্পূর্ণ, তা অনেকেই স্বীকার করেছেন। তবে একথা স্মর্তব্য যে, সুনীলকুমার ওঝা তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে খুব একটা প্রাচীন পুথি অবলম্বন করতে পারেন নি। তিনি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা পুথি দেখে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সেই সম্পাদিত গ্রন্থের প্রারম্ভে 'চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে দু'চার কথা' অংশে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, -

> "এ রচনাটির প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনে বাঞ্ছিত ছিল। সে বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এখন শ্রীমন সুনীলকুমার ওঝা। ইনি খুব একটা প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন না করলেও এঁর প্রধান অবলম্বন হল ১১৯১ সালে (১৭৮৪ খ্রি:) লেখা প্রায় সমাপ্ত একটি পুঁথি। এছাড়া তৎপরবর্তীকালের কয়েকখানা পালার ভিন্ন ভিন্ন পুঁথি এবং চণ্ডীমঙ্গল গায়কদের নিজ প্রয়োজনে পুঁথি দেখে লেখা খাতা। এই গ্রন্থটির দোষ হল এই যে এটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে পাওয়া ভিন্ন ভিন্ন পালার সংহিতা। আর বইটির গুণ হল এই যে, এটিতে চণ্ডীমঙ্গলের যথাযথ পাঠ যেন গায়কের মুখ থেকে ধরে দেওয়া হল।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমরা জানি ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক ভাবে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। তাই সুনীলকুমার ওঝা যে সময়ের পুথি দেখে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনা করেন সেই সময়কাল আন-অফিসিয়ালি আধুনিক যুগের চৌকাঠ ছুঁয়ে ফেলেছে। সুতরাং ওঝা সম্পাদিত গ্রন্থে যে খুব একটা প্রাচীনত্বের আস্বাদন পাওয়া যাবে না, তা কষ্টকল্পিত নয়। আমরা মানিক দত্তের সেই কাব্যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রূপতত্ত্বের যে অন্যতম উপাদান সর্বনাম পদ, তার রূপবৈচিত্র নিয়ে আলোচনায় অগ্রসিত হবো।

রচয়িতার রচনায় তাঁর মাতৃভাষার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তাই যে কোনও রচনার ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণের পূর্বে রচয়িতার জন্মস্থান ও যাপনস্থান জানা জরুরী হয়ে পড়ে। মানিক দত্ত পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যে ফুলবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনপদের নানান পরিচয় রয়েছে। এই অঞ্চলটি উপভাষিক বিভাজনের নিরিখে বরেন্দ্রী উপভাষার মধ্যে পড়ে। উল্লেখ্য যে, 1898-1927 সাল পর্যন্ত উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের 'Linguistic survey of India'। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে মালদহ অঞ্চলের ভাষাজরিপ করার সময় এই অঞ্চলের ভাষার বিভিন্নতা দেখে গ্রিয়ার্সন সাহেব বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাই বলেছিলেন, -

> "Malda District is a meeting-place of several languages, - of Bengali, Bihari, Santali, Koch and others. Curiously enough language is distributed by race, rather than by locality, so that in one village four or five languages may be heard spoken."[২]

প্রসঙ্গটি উত্থাপনের কারণ হল, এই অঞ্চলের ভাষার বিভিন্নতা যে স্থানের চেয়ে জাতি বা সম্প্রদায় অনুযায়ী বেশি পরিবর্তিত হয়, তা স্মরণ না রাখলে ভুল পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

আঞ্চলিক ভাষা বিশ্লেষণে মালদহের ভাষার স্বতন্ত্রতা খুব সহজেই চোখে পড়ে। যা মানিক দত্তের কাব্যেও স্বভাবতই পড়েছে। তবে এইকথাও স্মর্তব্য যে, আবিষ্কৃত পুথিগুলি কিন্তু সবই মালদহের ছিল না। উত্তর দিনাজপুর থেকেও সুনীলকুমার পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরদিনাজপুর অঞ্চলটি আবার উপভাষা বিভাজনের নিরিখে রাজবংশীর অন্তর্গত। তাই বরেন্দ্রী এবং রাজবংশী এই দুই উপভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায় ওঝা সম্পাদিত গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক যে পুথিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেইগুলি ছিল পালাগানের গায়েনদের। চণ্ডীমঙ্গলের গায়কেরা পালাগান গাইবার প্রয়োজনে অনেক সময় খাতায় কপি করে রাখতেন সেইসব পুথি। কপি করতে গিয়ে আবার সেইসব পুথিতে কপিকারের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়ত। তাই মূল রচয়িতার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে কপিকারের আঞ্চলিক ভাষা মিলেমিশে বর্তমান সম্পাদিত গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আর সুনীলকুমার ওঝার কাব্যটি খুব প্রাচীন না হওয়ায় হাল আমলে প্রচলিত বেশ কিছু সর্বনামও সেই কাব্যে লক্ষ করা যায়।

আমরা জানি, যে সব পদ নামপদ বা বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাদের সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম পদ মূলত বাক্যের প্রথমেই বসে। তাই বলা হয় 'সর্বাদিনী সর্বনামানি'। সংস্কৃত ভাষায় সর্বনামের উত্তম ও মধ্যম পুরুষে লিঙ্গভেদ নেই, অন্য সর্বনামে এবং সর্বনামঘটিত বিশেষণে রয়েছে। এই রীতি প্রাকৃত পর্যন্ত বহমান ছিল। অপভ্রষ্টে প্রধানত মুখ্যকারকে (অর্থাৎ কর্তা ও কর্ম) লিঙ্গভেদ থাকলেও অন্য কারকে সেই ভেদাভেদ একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর সবশেষে প্রাচীন বাংলায় এসে সর্বনামের লিঙ্গভেদ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৩] সর্বনামগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়— পুরুষবাচক এবং নির্দেশক। তবে সব মিলিয়ে বাংলা সর্বনাম আট প্রকার। যথা— ১। পুরুষ বা ব্যক্তিবাচক (Personal) ২। নির্দেশক (Demonstrative) ৩। অনির্দেশক (Indefinite) ৪। সমষ্টিবাচক (Inclusive) ৫।সংযোগবাচক (Relative) ৬। প্রশ্নবাচক (Interrogative) ৭। আত্মবাচক (Reflexive) ও ৮। পারস্পরিক (Reciprocal)। আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উপর্যুক্ত সর্বনামগুলির বিভিন্ন প্রকার ও রূপ এবং সেগুলি কোন কোন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা দেখে নেব।

১। পুরুষবাচক সর্বনাম (Personal Pronoun) : যেসব সর্বনাম ব্যক্তি বা পুরুষের নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদের পুরুষবাচক সর্বনাম বলে। বাংলায় পুরুষবাচক সর্বনাম তিন প্রকার, যথা— ক) উত্তম, খ) মধ্যম ও গ) প্রথম। বাংলা সর্বনামের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, কর্তৃকারকে শব্দের যে রূপ ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে অন্যান্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কারকের রূপ গঠিত হয় না, সেই রূপ গঠন করতে শব্দের সঙ্গে প্রাতিপদিক যুক্ত করতে হয়। তাই প্রত্যেক সর্বনামের দুইটি করে রূপ বিদ্যমান। এইবারে মানিক দত্তের কাব্যে ব্যবহৃত পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলি আমরা দেখে নিতে পারি—

১. ক। উত্তম পুরুষবাচক (First Personal) : আধুনিক মান্য বাংলায় উত্তম পুরুষবাচক সর্বনামের একবচনের রূপ হল আমি, আমাকে, আমার, মোর এবং বহুবচনের রূপ হল আমরা, আমাদের, আমাদিগকে প্রভৃতি। 'আমি' শব্দটির উৎস দুই রকম ভাবে পাওয়া যায়। প্রথমত, (সংস্কৃত) অস্মাভি> (প্রাকৃতে) অমহাহি> (অপভ্রংশে) অমহহি> (প্রাচীন বাংলায়) অমহে, আম্মে, আম্ভে, অম্মে, অম্ভে> (মধ্য বাংলায়) আম্মে, আমি> (আধুনিক বাংলায়) আমি। দ্বিতীয়ত, (সং) অস্মে> (প্রা) অমহে> (প্রা বাং) অমহে> (মধ্য-বাং) আম্মি, আমি> (আধু-বাং) আমি।

চর্যাপদে আমরা দেখি সংস্কৃত 'অহম্' থেকে সৃষ্ট 'হাঁউ' কর্তৃকারকে 'আমি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা - 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী' (১০ নং চর্যা), 'হাঁউ নিরাসী খমন-ভতারি' (২০ নং চর্যা)। তবে সেখানে 'আম্মে' (১১ ও ২২ নং পদ) এবং 'অমহে' (৪ ও ১২ নং পদ) সর্বনামকেও 'আমি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখি।

ওঝা সম্পাদিত গ্রন্থে আমরা দেখি উত্তম পুরুষের এক বচনের সর্বনাম পদ হিসেবে সেখানে আধুনিক কালের রূপ 'আমি' ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও 'আমি' সর্বনামের যথেষ্ট প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মানিক দত্তের কাব্যে দেখি,

> 'তখন আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিআনে।।'(পৃ - ১)
> 'আমি জাকে জন্ম দেই তুমি দেহ স্থান।।'(পৃ - ২)
> 'শিব বোলে শুন দুর্গা কহি আমি বাণী।।' (পৃ - ২৫)
> 'আমি নানা মতে বিজু বন করিব সৃজন।।' (পৃ - ৪৩) প্রভৃতি।

আবার কোনও কোনও স্থানে 'আমি' সর্বনামের বানান হিসেবে 'য়ামি' ব্যবহৃত হয়েছে। যথা - 'শিব পূজার পুষ্প য়ামি জাই তুলিবারে' (৫৭), 'ব্যাধ ঘরে জন্ম তুমি শাপ দিলাঙ য়ামি' (৬০), 'জে মতি আরজিয় য়ামি/ তেমতি সাফ কর তুমি' (১৩৬) প্রভৃতি। খুবই কম হলেও দুই-একস্থানে কর্তৃপদের একবচনের রূপ হিসেবে 'আমি' বা 'য়ামি' প্রয়োগ না হয়ে 'মুঞি' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন - 'দেবি বোলে পদ্মা মুঞি বোলো তোমারে' (১৬৩), 'মুঞি দেবি দশভূজা' (১৬৪), 'মুঞি তারে দিল ধন' (১৬৪)। আমরা জানি সংস্কৃত 'ময়া' থেকে প্রাচীন বাংলায় 'মই', 'মোএ' এবং মধ্য বাংলায় 'মোই', 'মুঞি', 'মুই' এর আগমন ঘটে। মানিক দত্তের কাব্যে 'আমারে' এর স্থলে 'য়ামারে' এবং 'আমার' এর স্থলে 'য়ামার' পাওয়া যায়। যথা- 'য়তএব জানিলাম তাহা নহিল য়ামারে' (১৩৪), 'মন্দ জানি বল য়ামার প্রজা লোকের তরে (১৩৪)।

তবে কিছু ক্ষেত্রে 'আমারে' এবং 'আমার' বানানও দেখা যায়। যেমন-'ভক্ত হইয়া গোপ্ত রূপ দেখিলে আমারে' (১০৮), 'গোপ্ত কথা আর জানি পুছহ আমারে' (১০৯)। খেয়াল করলে বোঝা যায় দুই ক্ষেত্রে 'আমারে' পদের অর্থ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে 'আমার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'আমারে' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'আমাকে' অর্থে। অর্থাৎ একই পদ তার বেশবদল না করে কোথাও হচ্ছে সম্বন্ধ পদ আবার কোথাও বা গৌণকর্ম। শব্দের এই বর্গান্তর ঘটার প্রক্রিয়াটি আধুনিক বাংলা ভাষাতেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ধ্বনিমূলের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে মধ্যযুগের ধ্বনিমূলের অবস্থানগত পার্থক্যও পরিস্ফুটিত হয়েছে এখানে। বাংলা বর্ণমালার একটি অর্ধস্বর হল 'য়' বর্ণটি। বাংলায় যে দুইটি অর্ধস্বর রয়েছে সেগুলি দিয়ে বাংলা অক্ষর এবং শব্দের সূচনা খুব কমই হয়। বিদেশী 'ইয়ার', 'এয়ার', 'ইয়োরোপ', 'ওয়ার্ড' ইত্যাদি শব্দে ছাড়া আদৌ হয় কিনা তা তর্কসাপেক্ষ।[৪] 'য়' বর্ণটিকে আমরা বর্তমানে পদের প্রথমে প্রয়োগ করতে পারি না। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে তা পদের প্রথমেই ব্যবহৃত হত। আমার অর্থে কখনো কখনো আবার 'আমা' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'জদি কথা মিথ্যা হয় শুন আমা স্থানে' (৩২০)।

'আমরা' পদটির প্রাতিপদিক হল 'আমা'। এর উদ্ভব হিসেবে দুইটি উৎস পাওয়া যায়। প্রথমত, সং. অস্মাকম্> প্রা. অমহাকং> অপ. অমহাঅঁ> প্রা.বা. অমহা> ম.বা. আম্মা> আ.বা. আমা। দ্বিতীয়ত, সং. অস্মাম্> প্রা. অমহং> প্রা.বা. অমহ> ম.বা. আম্মা> আ.বা. আমা। এই 'আমা'-এর সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আমরা, আমাগো, আমাগোর প্রভৃতি। এটি হল উত্তম পুরুষের বহুবচনের রূপ। ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন, প্রথমে 'মো' ('ম-') ছিল একবচনের প্রাতিপদিক, 'আমা-' বহুবচনের। প্রাচীন বাংলার শেষে 'আম-' একবচনেও চলিত হয়। মধ্য বাংলায় তাই নতুন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে বহুবচনের পদ তৈরি হয় 'আম্মারা'।[৫] চর্যাপদে আবার উত্তম পুরুষের বহুবচনের রূপ হিসেবে পাওয়া যায় আমহে, মো, আম্মে, আহমে। মানিক দত্তের কাব্যে 'য়ামি' বা 'আমি; উত্তম পুরুষের বহুবচনের রূপ পাওয়া যায় 'য়ামরা' বা 'আমরা'। যথা- 'গন্ধর্ব বোলেন মাতা য়ামরা করি গান'(বুধবার দিবসের পালা)। উত্তরবঙ্গে উত্তমপুরুষের একবচনের সর্বনাম হিসেবে 'হামি' এবং বহুবচনের সর্বনাম হিসেবে 'হামরা'র ব্যাপক প্রচলন বর্তমানেও রয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন Northern Bengali অঞ্চলের ভাষার সর্বনাম প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

> "In ragard to the Pronouns, the pronoun of the first person is haami, I. Its Accusative-Dative Singular is haamaake, or haamaak,its Genitive Singular is haamaar, and its Nominative Plural is haamraa."[৬]

তবে মানিকদত্তের কাব্যে 'হামি' অথবা 'হামরা'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন বাংলায় 'মো' একবচনের প্রাতিপদিকে পরিণত হয়েছিল এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করে তির্যক কারকের পদ নিষ্পন্ন হয়েছিল। যেমন কর্তা-মো; সম্বন্ধে-মোর, মোরি (প্রা-বা)। কর্ম-সম্প্রদান মকুঁ (প্রা-বা), মোক, মোকে, মোরা, মোরে। অধিকরণ মোত, মোতে। করণ মোতে (ম-বা)। প্রা-বা সম্বন্ধে 'মোহোর'।[৭] মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে 'মোর'/'য়ামার', 'মোকে'/'আমাকে', 'মোরে/'য়ামারে' প্রয়োগ করেছেন উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম পদ হিসেবে। যথা- 'দআ করি মোর স্বামী হঅ প্রভু তুমি' (৯), 'নিরামিশের ঘাটে মোকে করাহ দাহন' (৪), 'কুনগুণে স্বামী করিতে চাহ মোকে' (৯), 'দুর্গা বোলে শিব ঠাকুর কেন ভাণ্ড মোকে' (৯), 'আমাকে দেখিয়া বেটা না করিল শঙ্কা' (১৩৫), 'পাগলের বড়াই কর মোর বিদ্যমান' (১৩১), 'দুই পুত্র হৈল মোর পরম সুন্দর' (২৪), 'গণেশ কার্তিক মোর করুক পালন' (২৫), 'মোর নাম অসুর দলনী দশভুজা' (২৮), 'হনু বোলে কে মোকে করিল স্মরণ' (২৯), 'রাজা বোলে শুন মা মোর নিবেদন' (৪০), 'কি মতে হইবে মোর ব্রতের সৃজন' (৪৬), 'অল্পজ্ঞান করি তুমি কর মোর পূজা' (৫৯), 'সুরপুরি বাম হৈল স্থল দেহ মোরে' (৬২), 'মা জানিয়া বিচার কর মোরে' (৭৫), 'দুই গোটা কন্ন কেবল মোর প্রাণের বৈরি' (৭৭), 'সুযুক্তি দেহ মোকে যে আইসে বিচারে' (৮২), 'ভালমন্দ না জানে ব্যাধ বান্ধে মোর তরে' (৮২), 'কালকেতু আনিলে মোকে সত্য বাক্য দিয়া' (৯৬), 'দুর্গা বলে কেন বিদায় দেহ মোরে' (১০৫) প্রভৃতি। এইরকম দৃষ্টান্ত আরও প্রচুর রয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। লক্ষণীয় যে, 'মোকে' এবং 'মোরে' এই দুই রূপই গৌণকর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'মোর' ব্যবহৃত হয়েছে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে। গৌণকর্মের রূপ হিসেবে মানিক দত্তের কাব্যে 'মোকে' এর স্থলে 'মোখে'ও দেখা যায়। গায়েনদের মুখে মুখে উচ্চারণে মহাপ্রাণীভবনের জন্যে এমনটি ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির উচ্চারণ সম্পর্কে 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, -

> "ইহাদের যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র গৌড়-বঙ্গদেশ(অর্থাৎ রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল) এক নহে। এই বর্ণগুলির দুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। এক প্রকারের উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গে (গৌড় দেশে) শোনা যায়; অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূর্ববঙ্গে (বঙ্গ দেশে) মিলে।"[৮]

এই প্রসঙ্গে ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন, -

> "প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে মহাপ্রাণধ্বনির আগম কেবল গানের ক্ষেত্রেই নয়, কথ্যভাষাতেও তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।"[৯]

সর্বনামপদের ব্যবহারেও মহাপ্রাণীভবন ঘটেছে মানিক দত্তের কাব্যে। যেমন, বৃহস্পতিবার রাত্রির পালায় দেখি কালকেতু দেবী চণ্ডীকে বলছে 'কেতু বলে মোখে জদি তুমি দেহ ধন'।

১. খ। মধ্যম পুরুষবাচক (Second personal) **:** মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনামের ব্যবহার বাংলায় বেশ বৈচিত্রময়। তুচ্ছার্থে, সাধারণ অর্থে এবং সম্মানার্থে এর রূপ ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। তুই, তোরা তুচ্ছার্থে; তুমি, তোমরা সাধারণ অর্থে এবং আপনি, আপনারা সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানিক দত্তের কাব্যে আমরা মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিন ধরণের রূপেরই সন্ধান পাই।

ডক্টর সুকুমার সেন জানিয়েছেন, 'যুষ্মদ' শব্দের অর্থাৎ মধ্যমপুরুষের প্রাতিপদিক পাই প্রধানত দুইটি, 'তো' এবং 'তোম্মা'। 'তো' এসেছে সম্বন্ধ একবচন 'তব' থেকে, আর 'তোহ্মা' এসেছে সম্বন্ধ 'তুষ্মাক(ম)' থেকে। গোড়ার দিকে 'তো' ছিল একবচন, 'তোম্মা' বহুবচন। প্রাচীন বাঙ্গালাতেই 'তো' সাধারণ এবং তোম্মা' সম্ভ্রমসূচক প্রাতিপদিকে পরিণত হয়েছিল।[১০] আধুনিক বাংলায় মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমসূচক রূপ হল 'আপনি'। যা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের পূর্বে খুব বেশি বাংলা সাহিত্যে দেখাযায় না। মানিক দত্তের কাব্যেও কিন্তু 'আপনি' সর্বনামকে মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক রূপ হিসেবে স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ও খুঁজে পান নি। তিনি ভূমিকার এক অংশে তাই জানিয়েছিলেন, -

> "গৌরবে মধ্যমপুরুষের 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ এই গ্রন্থে কোথাও নাই। যে প্রয়োগগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা সবই 'নিজ' অর্থে।"[১১]

তবে আমরা অন্বেষণ করে দেখেছি সংখ্যায় খুব কম হলেও মানিক দত্তের কাব্যেও কিন্তু মধ্যম পুরুষের গৌরবার্থক রূপ হিসেবে 'আপনি' পদের ব্যবহার রয়েছে। যথা—

'দুখী দাসে তরা করি তরাহ আপনি' (৩৩১)
'দানাকে স্মরণ করি আনাহ আপনি' (৩৩৮)

অনেকক্ষেত্রে আবার 'আপুনি' পদ দ্বারা 'আপনি'কে বোঝানো হয়েছে। যেমন—

'ধরিঞা কোতাল বধ করহ আপুনি' (৩৩১)
'মশানে কাটিতে চায় তরাহ আপুনি' (৩৩১)

তবে আত্মবাচক সর্বনাম পদ হিসেবেই মানিক দত্তের কাব্যে আমরা 'আপনি' 'আপুনি' প্রভৃতি পদের বেশি ব্যবহার পাওয়া যায়।

আমরা জানি আধুনিক বাংলায় কীভাবে তুই, তুমি এবং তোমা-এর আগমন ঘটেছে— সং. ত্বয়া (করণ)> প্রা. তএ, তুএ> প্রা. বা. তই, তোএ> আ. বা. তুই এবং সং. তুষ্মে> প্রা. তুমহে> প্রা. বা. তুমহে> আ.বা. তুমি আবার সং. তুষ্মাকং> প্রা. তুমহাকং> অপ. তুমহং> প্রা.বা.> তোমহা> ম.বা.> তোম্মা, তোহাঁ, তোমা। তোহ্মার তির্যক কারকের প্রাতিপদিক তোহ্মার> আ.বা. তোমার। তোহ্মাক> তোমাকে, তোহ্মাত> তোমাতে। মধ্যম পুরুষে 'তু', 'তুম' প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে তার সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যোগ করে পদ নিষ্পন্ন হয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। আর এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে তুই, তুমি। এছাড়াও অন্যান্য কারকের রূপ তৈরির ক্ষেত্রে 'তো' 'তু', 'তোমা' প্রাতিপদিকের ব্যবহার দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানিক দত্তের কাব্যে মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ দেখে নেওয়া যেতে পারে—'বিবাহ করহ তুমি' (পৃ - ৫), 'শিব বোলে শুন তুমি' (পৃ - ৫), 'শিব ঠাকুর বলে দুর্গা বর চাহ তুমি' (পৃ - ৯), 'মুনি বোলে শিব কেন আল্যা তুমি' (পৃ - ১০), 'হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারণ' (পৃ - ১৫), 'তুমি জাঞা রণ করি মার অসুরগণ' (পৃ - ২০), 'তুমি জারে সদয় মাগো তারে কিবা দুখ' (পৃ - ৪০), 'সু লগ্ন করিয়া পুত্র বিভা দেহ তুমি' (পৃ - ৫৩), 'আইলাম তোমার ঘরে জা কর তুমি' (পৃ - ১০৫), 'তুমি ভাঙ্গিলে আমার কলিঙ্গের শাসন' (পৃ - ১৪৬), 'তোর নারী ফুলরা সতীন করিয়া বলে' (পৃ - ১০৫), 'তোর দুঃখ দেখিয়া প্রসন হৈলাঙ আমি' (পৃ - ২৩২), 'তোর গৃহে আমরা না করিব ভোজন' (পৃ - ২৪৮), 'সে মূর্তি দেখিতে জদি সাধ গেল তোরে' (পৃ - ১০৭)। এখানে 'তোর' অর্থে 'তোরে' ব্যবহৃত হয়েছে। 'অর্ধ রাজ্য আমি তোরে দিবত তক্ষন' (পৃ - ২৭৬)। 'সে দেবে তোমাকে দিবে বর' (পৃ - ৫০), 'তব গৃহে আমার শ্রীমন্ত নাকি আছে' (২৮৭), 'ঢালিলাঙ তব পদে আপন জীবন' (৩৩০) 'তোক উদ্ধারিবে শ্রীমন্ত সদাগর' (২৮০), 'সেবক জানিয়া তোকে জানি ভালে' (২৮), 'মহারাজা থাকিতে বেটা তোকে সাদ লাগে' (১৪৯), 'দ্বারেথুইয়া তোখে আইলাম আমি' (১৪৮) প্রভৃতি। লক্ষণীয় যে, কর্মকারকের রূপ 'তোকে' কিছুক্ষেত্রে মহাপ্রাণীভবনের ফলে 'তোখে' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কর্মকারকের রূপ হিসেবে যেমন তোক, তোকে, তোমাকে পাওয়া যায় তেমনই 'তোরে' দিয়েও অনেকসময় কর্মকারকের রূপ বোঝানো হয়েছে। মধ্যম পুরুষের এক ধরণের ব্যবহার মানিক দত্তের কাব্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল তোরে, তোর এই পদের কর্তার রূপ কিন্তু 'তুই' হয় না। তা হয়ে যায় তুমি। যেমন, 'অষ্টবিংশতি বৎসর মর্থে বৈভোগ তোরে/ পুনশ্চ আসিবে তুমি অমরা নগরে' (১৮৯), 'জে বাক্য বলিলাম আমি সেই দিব তোরে/ তুমি পুত্রবতী হৈবে উজানী নগরে' (২৬৭)। অর্থাৎ বক্তা একই ব্যক্তিকে যখন উদ্দেশ্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে কথা বলছেন তখন কর্ম, করণ, অপাদানে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থ রূপ প্রয়োগ করলেও কর্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন সাধারণ রূপ।

এই গ্রন্থে আধুনিক কালের অনেক ভাষিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যম পুরুষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রূপ তঁই, তুঁহু এই গ্রন্থে একেবারেই দেখা যায় না। তবে আধুনিক যুগের মধ্যম পুরুষের রূপ 'তোমার' এর স্থলে এই কাব্যে 'তুমার' এর প্রয়োগ দেখা যায়। স্মর্তব্য যে, বরেন্দ্রী অঞ্চলের ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল শব্দের আদি 'ও' কে অনেক সময় 'উ' হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। সেই বৈশিষ্ট্যের নিরিখে 'তোমার' হয়ে যায় 'তুমার'। মানিক দত্তের কাব্যেও সেই বৈশিষ্ট্য রেখায়িত হয়েছে, 'আদ্যা জনম তুমার সৃষ্টি রক্ষার তরে' (পৃ - ৬), 'তুমার মরণে শিব হবেন অজ্ঞান' (৬), 'মুনি বোলে আছে তুমার কন্যা গৌরি' (পৃ - ৯), 'তুমার নারি গঙ্গা যদি করএ রন্ধন' (১০), 'মেনকা বলেন রাজা ভাল তুমার জ্ঞান' (পৃ - ১৫), 'তুমার মহিমা ব্যাস পুরাণে লিখিল' (১৯) প্রভৃতি। 'তুমার' পদটি কখনও কর্তা আবার কখনও সম্বন্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. গ। প্রথম পুরুষবাচক (Third Personal) : বাংলায় প্রথম পুরুষবাচক সর্বনামপদের একবচনের রূপগুলি হল, সে, তিনি, তাঁরএবং বহুবচনের রূপ হল তারা, তাঁরা, তাহারা, তঁদের, তাহাদিগকে প্রভৃতি। সাধারণত অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সর্বনামগুলি ব্যবহৃত হয়। মানিক দত্তের কাব্যে প্রথম পুরুষবাচক সর্বনামগুলির ব্যবহার দেখে নেওয়া যাক—'ব্রহ্মাকে ছাড়িয়াছাড়িয়া ভাসিয়া সে জাএ' (৪), 'সে দেবে তোমাকে দিবে বর' (৫০), 'সে লইয়া জায়ে মারিয়া খাইতে' (৮০), 'সেবক বলিয়া তার কিছু চিন্তা নাই আর' (৫০), 'পুত্র তার মালাধর' (১৮৬), 'গলে হার বাহে তার শঙ্খ পদ্বে হাতে' (৩৫৭), 'তার দেশে বৈসে ধনপতি সদাগর' (৩৭৪), 'দুইটা শৃকাল আসি নোওাইল মাথা/ তারে বর দিল কালি জগতের মাতা' (৭৬)। লক্ষণীয় যে, এখানে 'তারে' সর্বনাম পদটি কিন্তু প্রথম পুরুষের বহুবচনের রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'তারে' এর অর্থ এখানে 'তাদের'। 'পৃথিবী ধরিতে আঙ্গা তাহাকে করিল' (২), 'তাকে বিভা কিরূপে করিবো' (৫), 'তাকে হব বরদায়' (৩০), 'সকল ইনাম তাক দিল' (৬৬), 'পদ্মা করেন তাক শ্বেত চামরের বাও' (৩৭২)। কর্মকারকের রূপ হিসেবে 'তাহাকে', 'তাকে' এবং 'তাক' এই তিনরূপই ব্যবহৃত হয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। এছাড়াও গৌণ কর্মের রূপ হিসেবে দুই-এক জায়গায় 'ওহাক' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'সেহি সে পারিবে ওহাক দুঃখ দিবার তরে' (১২৫)। 'তেহো' সর্বনামের দ্বারা 'সেও' বোঝানো হয়েছে। যেমন, 'দিবসে দিবসে তেহো বাড়িতে লাগিল' (১৮২)।

২। নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative) : যে সব সর্বনাম কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুবাচক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদের আমরা নির্দেশক সর্বনাম বলে জানি। নির্দেশক সর্বনাম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই প্রকার বস্তু বা প্রাণীকে নির্দেশ করে। প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে সাধারণ ও সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অর্থে একবচনের ক্ষেত্রে এ, এই, ইহা এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে ইহারা, এরা, ইহাদিগের, এদের ব্যবহৃত হয়। আবার সম্মানার্থে একবচনের ক্ষেত্রে ইনি, ইঁহা, এঁ এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে ইঁহারা, এঁরা, ইঁহাদিগের, এঁদের, ইঁহাদের ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপ্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে একবচনে ইহা, এই, এটা, এটি, এখানা, এখানি এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে এ-সব, এগুলা, এগুলি, এ সমস্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পরোক্ষ ক্ষেত্রে প্রাণীবাচক শব্দের সাধারণ অর্থে একবচনের রূপ হিসেবে দেখা যায় ওই, উহা, ও আর বহুবচনের ক্ষেত্রে উহারা, ওরা, উহাদিগের, ওদের। গৌরবার্থে একবচনের রূপ হল উনি, উহা, ওঁ আর বহুবচনের রূপ হল উঁহারা, ওঁরা, উঁহাদের, ওঁদের প্রভৃতি। অপ্রাণীবাচক শব্দে একবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় উহা, ওই, অই, ঐ, ওটা, ওখানা, ওখানি আর বহুবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ঐ-সব, ওগুলা, ওগুলি প্রভৃতি।[১২] আলোচনার সুবিধার্থে আমরা মানিক দত্তের কাব্যে যেসব নির্দেশক সর্বনামের পরিচয় পাই তাদের নিকট নির্দেশক এবং দূর নির্দেশক হিসেবে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসরমান হবো।

২. ক। নিকট নির্দেশক (Near Demonstrative) : এ, ইনি নিকট নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে আধুনিক মান্য বাংলায় ব্যবহৃত হয়। একবচনে কর্তৃপদে এ, এটা কর্মে একে, এটাকে, করণে এর দ্বারা, একে দিয়ে নিমিত্তে একে, এটাকে, এর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জন্যে, অপাদানে এর থেকে, অধিকরণে এতে এবং সম্বন্ধে এর এবং বহুবচনে ক্রমান্বয়ে এরা-এসব-এগুলি, এদিগকে-এদেরকে, এদের দ্বারা-এদের দিয়ে, এদিগকে-এদের জন্যে, এদের থেকে, এদের মধ্যে এবং এদের এই রূপগুলি আধুনিককালে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। সংস্কৃত 'এভিঃ' প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় হয় 'এহি', যার আধুনিক কালের রূপ হল 'এই'। আর 'ইনি' এসেছে সংস্কৃত 'এষাম' থেকে। যা প্রাকৃতে হয় 'এনহং', অপভ্রংশে 'এণ' বা 'ইণ', মধ্য বাংলায় 'এনা', 'ইহ্নি', 'এই' এবং আধুনিক বাংলায় 'ইনি'। মানিক দত্তের কাব্যে নিকট নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে 'ই', 'এই','এহি' 'ইহা' 'ইহ' 'এ' ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-'ই তিন ভুবন মধ্যে ব্রহ্মা একজন' (৪), 'এই দুঃখে কালকেতু মরে' (৮০), 'ই হেন মোহন বেশ জদি আছে তোরে' (৯১), 'চলহে সুন্দরি পথ অনুসারি ই তোর ব্যবহার নয়' (৯৪), 'একা হৈয়া জিনিলাম ই চারি দুয়ার' (১৫৪), 'বীর করুনা করে ই মহী মণ্ডলে' (১৬৩), 'ই কথা শুনিল যদি গণকের তুণ্ডে' (২৬৭), 'ই কথা শুনিয়া জম বলে সাজ সাজ' (৩৭১), 'এই দুঃখে কালকেতু মরে' (৮০), 'এই কথা দুর্গা মাতা করিছে মন্ত্রনা' (২১২), 'বিষ্ণু দত্ত বলে এই পরীক্ষাএ লয়' (২৫১), 'এহি গুধিকা তুমি করগা রন্ধন' (৮০), 'এহি পথে নোকাতে গেল মোর প্রাণস্বামী' (২৮১), 'এহি ডিঙ্গা রাখ মোর ব্রতের কারণ' (২৭২),'ইহা শুনি বলে কিছু নীলাম্বর দাস' (২৪৭), 'ইহ সাক্ষী দিলে হবে নরকে গমন' (১৭৪), 'এ বাক্য শুনিয়া শিব বড় তুষ্ট হৈল' (১৭৮), 'গতি নাই এ সময় তুয়া বিনা আর' (৩২৯)।

২. খ। দূর নির্দেশক (Far Demonstrative) : মান্য বাংলায় দূর নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত সর্বনামগুলির একবচনের রূপ হল ও, উহা, উনি এবং বহুবচনের রূপ হল ওরা, উহারা, ওনারা প্রভৃতি। সংস্কৃত 'অব' বা 'অবৎ' থেকে অপভ্রংশে ও বাংলায় হয়েছে 'ও'। 'উহা' - এর আগমন ঘটেছে সংস্কৃত 'অবস্য' থেকে। যা পরবর্তীতে অপভ্রংশে 'ওহ' হয়ে যায় এবং সবশেষে 'উহা' রূপে মধ্য ও আধুনিক বাংলায় প্রবেশ করে। আবার 'উনি' এর আগমন ঘটে সংস্কৃত 'ওহানং' থেকে। যা প্রাকৃতে হয়ে যায় 'উহানং', অপভ্রংশে 'উহাঁ' এবং বাংলায় 'উনি'। মানিক দত্তের কাব্যে 'উহাকে' এর পরিবর্তে 'ওহাক' ব্যবহৃত হয়েছে দূর নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে। যথা- 'সেহি সে পারিবে ওহাক দুঃখ দিবার তরে' (১২৫)। বরেন্দ্র অঞ্চলে দূর নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে বর্তমান কালেও 'উয়াক' ব্যবহৃত হয়।

৩। অনির্দেশক (Indefinite) : যে সর্বনামগুলি কোনও অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনির্দেশক সর্বনাম বলে আমরা জানি। যেমন, কেহ, কিছু, কার,কোনো, কেউ, অমুক প্রভৃতি। অনেকসময় একাধিক সর্বনাম পদ একত্রে বসে অনির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে। যখন এইরকম প্রয়োগ ঘটে থাকে তখন তাকে যৌগিক সর্বনাম বলে। যেমন, যে-কেহ, যাহা-কিছু, কোনওকিছু প্রভৃতি। অনির্দেশক সর্বনামগুলির বাংলায় আগমন ঘটেছে মূলত সংস্কৃত থেকে। সংস্কৃত কয়স্য > অপ. কেহ > প্রা. বা. কেহো > ম. বা + আ. বা কেউ, কেহ। সং. কিঞ্চ > অপ. কিচ্ছ > বা. কিছু। সং. কমনঃ > অপ. কবণ > ম. বা. কমন, কোন > আ. বা. কোন, কোনো, কোন্। মানিক দত্তের কাব্যের কিছু চরণ তুলে ধরে দেখে নিতে পারি আমরা অনির্দেশক সর্বনামের প্রয়োগ বৈচিত্র। যেমন, 'কেহো করে দান পুণ্য ভব তরিবারে' (৯৯), 'কেহ কাটে পাছে বন কেহ কাটে অগ্রে' (১১৭), 'কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহু নাহি জাএ/ কাহার পুষ্কনির জল কেহু নাহি খাএ' (১৩৩), 'কেহু আগে কেহু পাছে কেহু ঘোড়াএ শোয়ার'(১৪০), 'কেও ঘোড় ধাইয়া মারে দুই চারি চাবুক' (১৪৭)। দেখা যাচ্ছে 'কেহ' সর্বনামটির অর্থ অভিন্ন থাকলেও বানানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। 'কেহ', 'কেহো' এবং 'কেহু' 'কেও' এই চার প্রকার বানানই রয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। 'কার হস্তে কাটারি কুড়ালি কার হস্তে দাও' (১১৭), 'কার কথা নাহি শুনে হৈল গণ্ডগোল (১৪০) – এখানে 'কারো' অর্থে 'কার' ব্যবহৃত হয়েছে। আবার শুধু 'কার' অর্থেও 'কার'–এর প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, কার যুক্তি পাঞা বাছা জাইছ বিদেশ' (২৯৩)। ছন্দের খাতিরে পাশাপাশি দুইটি চরণে দেখা যায় কোথাও 'কার' আবার কোথাও 'কাহার' ব্যবহৃত হয়েছে। যথা - 'কার লব নারী আমি কার লব ধন/ আমার জগত্যা ভাঙ্গে কাহার শাসন' (১১৮)। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বে ছয় মাত্রা করার খাতিরে 'কাহার' ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। মানিক দত্তের কাব্যে 'কাওকে' বোঝাতে কখনো 'কাখ' আবার কখনো 'কাক' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'কাখ মারে কাখ কাটে কেহু হৈল তল/ য়াওাস ভাঙ্গিয়া গেল হুদুরা মহল' (১৪০), 'কাক মারে কাক কাটে কেহু হৈল তল/ দ্বার ছাড়িয়া পালা এ কালুর নস্কর' (১৪১)।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪। **সমষ্টিবাচক** (Inclusive) **:** যে সব সর্বনাম সমষ্টিবাচক ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদের সমষ্টিবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, সকল, সব, উভয়, সমস্ত প্রভৃতি। এই সবের সঙ্গে বিভক্তি অথবা অনুসর্গ যোগ করে তৈরি হয় সকলের, সবগুলি, সবার চেয়ে, সবার দ্বারা, সবারে প্রভৃতি। মানিক দত্তের কাব্যে সমষ্টিবাচক সর্বনামগুলির প্রয়োগ দেখে নেওয়া যাক— 'তুমি সৃষ্টি কর ধম্ম সকল সংসার' (১), 'শিবের আগে জাঞা মুনি সকল কহিল' (১০), 'এইরূপ করিঞা সকল দ্রব্য নিল' (১২), 'সকল দেবতাগণ দেখিতে আইল' (১৭), 'সকল অসুর হৈল বড়ই প্রচণ্ড' (১৯), 'গুরুকে ভাণ্ডিয়া ধন খাইলাঙ সকল' (২৯৪)। 'সকল'পদের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে মানিক দত্তের কাব্যে যে রূপগুলি পাওয়া যায় সেইগুলি হল, 'সকলি', 'সকলিকে', 'সকলির'। সমস্তটাই অর্থে 'সকলি', সকলকে অর্থে 'সকলিকে' এবং সকলের অর্থে 'সকলির' ব্যবহৃত হয়েছে সেই কাব্যে। যথা- 'দুইজনে আনন্দে সকলি খাইল' (১২), 'তোমার রাজাকে খাব সেনা সকলি' (৩৩৫), 'সকলিকে কহিল সাজিতে' (১৩), 'দেখিয়া কতাল ভএ বলে সকলিকে' (৩৩৫), 'ক্রোধে বলে কতাল পাইক সকলিকে' (৩৩৭), 'সকলির মন আনন্দিত' (১৪)। প্রত্যেকে বা সকলে বোঝাতে মানিক দত্তের কাব্যে 'সকলিএ' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'শিবের চরিত্র দেখি সকলিএ হাসে' (১৪)। 'সব' সর্বনাম পদ দ্বারাও অনেক সময় সমস্ত বোঝানো হয়েছে। যেমন, 'কামদেব ডাকিঞা কহিল সব কথা' (৮), 'সভার মধ্যে ভীম জাঞা সব ভার থুল্য' (১২), 'চতুর্থ মজিলে সাধু সব এড়াইল' (২৪১)। সমষ্টিবাচক সর্বনাম হিসেবে আমরা মানিক দত্তের কাব্যে 'সর্ব্বজন' পদেরও উল্লেখ পাই। যথা - 'জল সাধে নারীগণ ঘরে আইল সর্ব্বজন' (১৩), 'হৃদয়ে ভাবিয়া কথা বুঝ সর্ব্বজনে' (১৬)।

৫। **সংযোগবাচক** (Relative) **:** যে সব সর্বনামপদের দ্বারা দুই বা তার বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সংযোগ বোঝায় তাদের সংযোগবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে, যাহা, যে যে, যা যা প্রভৃতি এবং সম্মাননীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি, যাঁহারা, যাঁহাকে, যাঁর প্রভৃতি। আবার অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে যা, যাহা, যেটা, যেটি, যেগুলো, যে সমস্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় একটি সংযোগবাচক সর্বনামপদ তার ভাবের পূর্ণতার জন্যে অপর একটি সংযোগবাচক সর্বনামের অপেক্ষায় থাকে। এই ধরণের সংযোগবাচক সর্বনামকে সাপেক্ষবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, যে-সে, যা-তা, যিনি-তিনি, যাহা-তাহা, যার-তার প্রভৃতি। চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবির রচনায় সংযোগবাচক সর্বনাম হিসেবে কী কী ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখে নিতে পারি— 'কাল পেচা লেখিল জে খোকের ভিতরে' (৮৬), ''মৎস্য রাঙা লেখিল জে ছোয়ে মৎস্য ধরে' (৮৭), 'বউ পক্ষ লেখিল জে জলে চরে ভেলা' (৮৮), 'জে জন দরিদ্র হএ ধন দেএ তারে' (১৩৩), 'জে জন পালন করে সে জন জননী' (২৫), 'জে মাএ ধ্যান কর সেহি মাএ আমি' (১৫৫), 'জে দিনে সামী বিভা করিল তোমারে/ সেই দিনে বন্দি জাঞা হৈল রাজঘরে' (২২৪), 'জাখে কৃপা কৈল মা মঙ্গলচণ্ডীগণ' (৬৪), 'অনাদ্য ঠাকুর জারা কথা পালন করে তারা' (১৩৬), 'স্বামী জার জয়ধর পুত্র তার মালাধর' (১৮৬), 'জেহি মন্ত্র জপ তুমি সেহি মাত্র আমি' (১৬৮), 'জেই শিব সেই দুর্গা এক মনে জানে' (১৮০), 'জেই বর চাহ তাহা তোরে দেই আমি' (১৭৬), 'প্রথমে জে অন্ন খায় তার লাগে ধান' (২২৩)। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি মানিক দত্তের কাব্যে সংযোগবাচক সর্বনাম হিসেবে 'জে'ব্যবহৃত হচ্ছে 'যে' এর স্থলে। বর্গীয়-জ দিয়ে জদি, জখন, জার প্রভৃতি শব্দেরও বানান লেখা আছে সেই কাব্যে। আমরা জানি সংস্কৃত 'যঃ', 'যকঃ', 'যৎ' থেকে প্রাকৃতে সৃষ্টি হয় 'জো', 'জত্র', 'জং'। অপভ্রংশে তা হয় 'জু', 'জি', 'জ', 'জং' এবং প্রাচীন বাংলায় 'জে', 'জ'। সবশেষে মধ্য ও আধুনিক বাংলায় তা পরিণত হয় 'জে' এবং 'যে' তে। তাই শুধু মানিক দত্তের কাব্যে নয় মধ্যযুগের অপরাপর কাব্যেও বর্গীয়-জ দিয়ে 'যে' এর বানান পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, বরেন্দ্র অঞ্চলের কথ্যভাষায় চ-বর্গীয় চারটি প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনির[১৩] উচ্চারণে বর্তমানেও শিসধ্বনির প্রভাব টের পাওয়া যায়।

৬। **প্রশ্নবাচক** (Interrogative) **:** যেসব সর্বনাম দ্বারা কোনও কিছু জানতে চাওয়া হয়, তাদের প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, কে, কী, কেন, কোন, কারা, কোনগুলি, কে কে প্রভৃতি। প্রশ্নবাচক প্রচুর সর্বনামের দৃষ্টান্ত আমরা মানিক দত্তের কাব্যে পাই। যথা- 'কি করিতে পারে তোর চান্দো সদাগর' (২৪৮),'কত যুগ বএ গেল বল তার কথা' (১), 'কোন বা বান্যার নারী কত ধর্ম্ম করে' (২৫৫), 'কেনে আগমন মুনি বল বিবরণ' (৯), 'কেন হৈলা তুমি দুই কুল খাঁ খাঁ কারি' (৯৩), 'তবে কেন এত লোক তেজিবে জীবন' (১৫৫), 'তুমি তাখে বন্দি কর কেনে' (১৬৪), 'আজি কেনে পদ্মাবতি দেখি অমঙ্গল' (৩৩৩),

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'জম বলে হনুমান কেনে আগমন' (৩৫৪), 'কুনগুণে স্বামী করিতে চাহ মোকে' (৯), 'বলে কুনজনে জাবে গরূড়েক আনিবারে' (৮৯), 'কুন মেঘের কুন কম্ম আমারে বুঝাও' (১২২), 'কুন বা দেবতা এ বর দিল মোরে' (২৮৫), 'কুন কাজ কিবা হেতু বল বিবরণ' (৩৫৪), 'শিব বোলে এমত কর্ম্ম কোন দেবে করে' (৪৩), 'সাধু বলে পরীক্ষাএ কোন প্রয়োজন' (২৪৯), 'কোন বা বান্যার নারী কত ধর্ম্ম করে' (২৫৫), 'ভাঙ্গের খীপীরে কোথা আছিলে বসিয়া' (৮১), 'কোথাহ পশুর সনে না হৈল দরশন' (৮১), 'এমন মোহন বেশে কোথাতে জাহ তুমি' (৯১), 'প্রভু কেবা তোমাক বন্দি কৈলে কেবা তোমাক উদ্ধারিলে' (১৬৫), 'মনতে রহিল ব্যথা কাহাকে কহিমু কথা' (১৬৭), 'কেমতে রন্ধন করি তাহা নাই জানি' (২৫৬), 'কার সনে যুদ্ধ হবে হেন প্রায় আখি' (৩৩৩) । উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'কি', 'কত', 'কেনে', 'কেন', 'কুন', 'কোন', 'কোথা', 'কোথাহ', 'কোথাতে', 'কেবা', 'কাহাকে', 'কেমতে', 'কার' সর্বনামগুলি প্রশ্নবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। কিছু ক্ষেত্রে একই অর্থ বহনকারী একটি সর্বনাম একাধিক রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। যেমন, কেনে/কেন, কুন/কোন। কোথা এবং কোথাতে দ্বারা একই অর্থ 'কোথায়' প্রকাশিত হয়েছে। তবে 'কোথাও' বোঝাতে 'কোথাহ' এবং 'কেমন করে' বোঝাতে 'কেমতে' সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। আত্মবাচক (Reflexive) : যেসব সর্বনামে ক্রিয়া সম্পাদক হিসেবে কর্তা নিজেকেই বড়ো করে দেখায়, তাদের আত্মবাচক সর্বনাম বলে। যেমন - আপনি, নিজ, খোদ, স্বয়ং প্রভৃতি। চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবির কাব্যেও আমরা বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাই আত্মবাচক সর্বনামের। যথা- 'আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজরূপ হৈল' (২), 'আপুনি করহ গিঞা পশুর সৃজন' (৪২), 'আপন গৃহেতে হইল বীরের গমন' (৭৭), 'আপনার গৃহে বীর দিল দরশন' (৮০), 'জে নাম স্মরিলে বাছা আসিব আপুনি' (১১৫), 'নিজ নামে স্মরিলে বাছা আসিব আপনি' (১১৬), 'শিবারূপে বাহিরাএ আপনে শিবানী' (১৪৭), 'আপনার বল কিছু না বুঝিআপনি' (১৫০), 'সেহ বল ভগবতী লইল আপনে' (১৫২), 'আপন উদরে দেবী আপনে বিদারে/ আপনার রুধির আপনে পান করে' (১৫৩), 'আপনার গৃহে চলে কেতু আহিড়ি' (১৫৪), 'সাধিলে আপন কার্জ্য কার কেহু নয়ে' (১৭৪), 'শৃঙ্গার করিল তেহো আপনার সুখে' (১৮১), 'আপনার দেশে আস্যা দরশন দিল' (২৪১), 'রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে' (২৮৭), 'আপনে ছলিছ মাতা শ্রীমন্ত সাধুকে' (৩৩৩), 'আপুনি মরিল সেনা আপনার অস্ত্রতে' (৩৫০), 'সোমবারে সর্ব্বলোকে পূজিহ আপুনি' (৩৭৬)। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানিক দত্তের কাব্যে আত্মবাচক সর্বনামপদের রূপবৈচিত্র। 'আপনি', 'আপনে', 'আপন', 'আপুনি', 'আপনার' সর্বনামগুলি সেই কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে আত্মবাচক সর্বনাম হিসেবে।

৮। পারস্পরিক (Reciprocal) : এই ধরণের সর্বনামকে অনেকে ব্যতিহারিক সর্বনামও বলে থাকেন। এই সর্বনামগুলি অন্যের প্ররোচনা ছাড়াই স্বেচ্ছায় ব্যবহৃত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ধরণের সর্বনাম হিসেবে 'আপস' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। এই সর্বনামের দ্বারা পারস্পরিকতা বোঝায়। আপনা-আপনি, নিজে-নিজে এই ধরণের সর্বনামের দৃষ্টান্ত। তবে মানিক দত্তের কাব্যে আমরা পারস্পরিক সর্বনামের সন্ধান পাই নি।

বাংলা সর্বনামপদগুলির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আজও ঐকমত্য হয় নি ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে। অনেকে স্বয়ং, খোদ, আপনা-আপনি প্রভৃতিকে সর্বনাম বলতে গররাজি। কেননা, এই শব্দগুলির বিভক্তিযুক্ত ভিন্ন রূপ পাওয়া যায় না। আমরা জানি যে, পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদের বারংবার ব্যবহার পরিহার করার জন্যেই সর্বনাম পদের সৃষ্টি। কিন্তু খেয়াল করলে বোঝা যায়, এমন অনেক সর্বনাম রয়েছে যাদের ব্যবহার করতে হলে পূর্বে বিশেষ্য পদের প্রয়োজন হয় না। যেমন- আমি, আমরা, তুমি, তুই, আপনি প্রভৃতি। তাহলে সংজ্ঞানুযায়ী এই শব্দগুলি কিন্তু সর্বনামের আওতায় পড়ে না। আবার সর্বনাম যে শুধু বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাও নয়, অনেক সময় একটি বাক্যের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় । যেমন, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। এ আমি বিশ্বাস করি না। এখানে 'এ' পূর্ববর্তী সমস্ত বাক্যের অর্থ বহন করছে। তাহলে 'এ' তো সংজ্ঞানুযায়ী সর্বনাম হতে পারে না। তাহলে বলা যায়, সময় এসেছে সর্বনামের সংজ্ঞা পরিবর্তনের। নইলে এই মতানৈক্য কখনোই মিটবে না। আর আমাদেরও সময় এসেছে আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত করে এখানেই সমাপ্তিরেখা টানার।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. সেন, সুকুমার : চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে দু'চার কথা, ওঝা শ্রীসুনীলকুমার সম্পাদিত, মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, ১৩৮৪

২. Grierson,G.A : Linguistic Survey of Bengal,2007. vol.I, kreativmind, Kolkata, P. 143

৩. সেন, সুকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,পৃ. ২০৫

৪. হাই, মুহম্মদ আবদুল : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, পঞ্চদশ মুদ্রণ ২০১২, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ২৪

৫. সেন, সুকুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৬. Grierson, G.A, ibid, P. 135

৭. সেন, সুকুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৮. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার : বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২০১

৯. ভৌমিক, ডক্টর নির্মলেন্দু : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা, ১৯৮৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৩৫

১০. সেন, সুকুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

১১. ওঝা, শ্রীসুনীলকুমার সম্পা., মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকা অংশ, ১৩৮৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, পৃ. ৪৪

১২. বিশ্বাস, ড. সুখেন : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১২, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭০

১৩. হাই, মুহম্মদ আব্দুল যুক্তি সহকারে চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলির নাম তালব্য ধ্বনি না বলে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি বলেছেন। এই বিষয়ে তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি অধ্যায়টি দেখতে অনুরোধ জানাই। মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 107 - 114
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নাসরীন জাহানের 'স্থবির যৌবন' : নারী জীবনের বহুমাত্রিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ

ড. প্রতাপ ব্যাপারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনি
Email ID : pratapbapari@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nasreen Jahan, Bengali fiction, Storytelling, Patriarchy, Symbolism, Self-empowerment, Gender relationships, Societal conflicts, Psychological experiences.

Abstract

Nasreen Jahan is a unique voice in Bengali fiction, known for her deeply artistic and unconventional storytelling. Her narratives break away from traditional structures, weaving a rich tapestry of human emotions, societal conflicts, and psychological complexities. Without resorting to exaggerated emotions, her works offer a refined and artistic portrayal of reality, where every character and setting reflects life's intricate truths. Her storytelling follows two distinct yet interconnected threads. On one hand, she explores the suffocating patriarchy of urban life, highlighting strained relationships, conflicts, and the anxieties of mistrust. On the other hand, she captures the aesthetic essence of rural life, where women are not merely oppressed figures but individuals engaged in an ongoing quest for self-empowerment. She does not depict a singular, rigid reality; instead, her stories unfold through layers of symbolism, contrasts of light and shadow, and an intricate analysis of human relationships.

A defining feature of Nasreen Jahan's storytelling is her ability to create depth without relying on sensationalism. The surprises in her narratives arise naturally from her keen insights rather than from deliberate dramatic twists. Unlike many conventional female writers, she does not portray men solely as oppressors or women as helpless victims. Instead, she presents a complex reality where both men and women exist in conflict, engage with societal forces, and ultimately seek meaning through their struggles. Her literature is not detached from reality but a refined representation of lived experiences. She masterfully unveils the hidden tensions within gender relationships, compelling readers to reflect on social structures and personal identities. In a society where women's contributions and struggles often remain invisible, her stories serve as a powerful medium for recognition and change. Nasreen Jahan's fiction is more than just storytelling— it is a profound meditation on life, relationships, and the search for identity, making her an essential voice in contemporary Bengali literature.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

নাসরীন জাহান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভুবনে এক স্বতন্ত্র স্বর, এক নিবিড় শিল্পীসত্তা। তাঁর লেখনী যেন বর্ণনার এক অভিনব প্রবাহ, যেখানে প্রচলিত ঘরানা থেকে সরে এসে তিনি আপন কণ্ঠস্বরের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তাঁর গল্পসমূহ কেবল আখ্যান নয়, বরং বাস্তবতার এক গভীর অনুধ্যান। সমাজের সংকট, মানুষের মনোজগতে লুকিয়ে থাকা দ্বন্দ্ব, সংশয় ও বিকার— সবকিছুই তাঁর সৃষ্টির মেদুর মাটিতে গেঁথে আছে। তাঁর রচনায় আবেগের অতিশয়োক্তি নেই, বরং আছে সূক্ষ্ম ও শিল্পিত নির্মাণ, যেখানে প্রতিটি চরিত্র ও পরিবেশ যেন জীবনেরই অনিবার্য প্রতিফলন।

নাসরীন জাহানের গল্পের বুননে দুটি প্রধান ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একদিকে নাগরিক জীবনের পুরুষতান্ত্রিক বলয়ের নিঃশ্বাসরোধী আবহ, সম্পর্কের ক্লান্তি, দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের অস্থিরতা, অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনের এক অনন্য নন্দনচেতনা, যেখানে নারী কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু সেই নারী নিছক অবদমিত বা শোষিত নয়— বরং সময়ের স্রোতে নিজস্ব শক্তির অন্বেষায় নিরন্তর তৎপর। গ্রাম ও শহর, দুই প্রেক্ষাপটেই তিনি কোনো একরৈখিক বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চান না; তাঁর গল্পের পরতে পরতে থাকে প্রতীক, আলো-আঁধারের মিতালি, এবং মানুষ ও সমাজের সম্পর্কের এক অন্তর্গত ব্যাখ্যা। একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নাসরীন জাহান চমকের মোহে আখ্যানকে পরিণত করেন না; বরং চমক তাঁর গল্পে আসে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ। সেই চমক নিছক নাটকীয়তা নয়, বরং আখ্যানের অন্তর্নিহিত দর্শনের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ। এখানেই তিনি প্রচলিত নারী সাহিত্যিকদের চিরাচরিত একপেশে পুরুষবিরোধী অবস্থান থেকে পৃথক। তিনি পুরুষকে এককভাবে শোষকের প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখান না, আবার নারীকে নিছক দুর্দশাগ্রস্ত চরিত্র হিসেবেও উপস্থাপন করেন না। বরং তাঁর গল্পের নারী ও পুরুষ বাস্তবতার বহুস্তরীয় পরিপ্রেক্ষিতে একসঙ্গে বাঁচে, দ্বন্দ্বে জড়ায়, আবার সেই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই সমাজ-সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের মূল সত্যকে উপলব্ধি করে।

তাঁর রচনা কোনো কাল্পনিক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; বরং বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা অভিজ্ঞতার এক শিল্পিত রূপায়ণ। সমাজ-বাস্তবতায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, টানাপোড়েন এবং তার গভীর অন্তর্নিহিত অসংগতি তিনি পাঠকের সামনে মেলে ধরেন এক অনন্য দক্ষতায়। তাঁর গল্পের চরিত্ররা নিছক কাহিনির অংশ নয়; তারা জীবনেরই প্রতিনিধি। ফলে, তাঁর সাহিত্য নিছক গল্প বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা পাঠকের অনুভূতি ও বোধের জগতে প্রবল আলোড়ন তোলে। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান এক অদৃশ্য উপস্থিতি— তার শ্রম, তার আত্মসংগ্রাম, তার অনুভূতি যেন পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। অথচ নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক, একে অপরের অপরিহার্য সঙ্গী। এই সত্যের স্বীকৃতি ছাড়া সমাজের সামগ্রিক চিত্র অসম্পূর্ণ। নাসরীন জাহান সেই অসম্পূর্ণতাকে গল্পের ভাষায়, শৈলীর সৌন্দর্যে, গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর গল্প শুধু গল্প নয়— তা হয়ে ওঠে এক অনিবার্য জীবনদর্শন।

নারী ও পুরুষ— উভয়েই মানবপ্রজাতির অংশ, অথচ সমাজের বাস্তব চিত্র একেবারেই অন্যরকম। পুরুষ সেখানে শাসকের ভূমিকায়, আর নারী যেন চিরকাল অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা। এই বৈষম্য শুধু অন্যায়ই নয়, এটি মানুষের মৌলিক মর্যাদার বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট আঘাত। কোনো সমাজে যদি একজন মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে তা নিপীড়নের চূড়ান্ত রূপ। নাসরীন জাহানের ছোটগল্পের পরতে পরতে এই বাস্তবতার এক সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ধরা পড়ে। তিনি কেবল নারীজীবনের নিছক বর্ণনা দেন না, বরং সেই বর্ণনার মাধ্যমে সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা নির্মম সত্যকে উন্মোচিত করেন। তাঁর রচিত নারীচরিত্ররা কল্পনার ফসল নয়, তারা আমাদের চারপাশের বাস্তব জীবনেরই প্রতিচিত্র। আমাদের চেনাজানা পরিধির বহু নারী যেন তাঁর গল্পের আঙ্গিকে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যেন তারা জীবনের কঠিন বাস্তবতার এক নীরব স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তাঁর গল্পে নারীজীবনের বহুমাত্রিক সংকট অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী শিল্পভাষ্যে রূপ পেয়েছে। সেখানে নারীর অবদমিত স্বর, তার লড়াই, তার স্বপ্ন ও ব্যর্থতা— সবকিছু এক সংবেদনশীল বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্পগুলো নিছক কাহিনি নয়; বরং সমাজের এক নির্মম আয়না, যেখানে প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি দ্বন্দ্ব ও প্রতিটি যন্ত্রণার রেখা আমাদের বাস্তবতার সাথেই মিশে থাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাসরীন জাহানের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'স্থবির যৌবন'-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প 'পরগাছা', যেখানে কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে নাদের আলী নামের এক নিঃস্ব, আশ্রয়হীন মানুষ। তাঁর মেয়ের করুণ পরিণতির পর সে ঠাঁই নিয়েছে মৃত মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে, কিন্তু সেই আশ্রয় যেন দাসত্বের শেকলে বাঁধা। গৃহকর্তা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে সে কেবলই এক বোঝা, এক বোবা পশু, যাকে শুধু হুকুম তামিল করার জন্যই রাখা হয়েছে। তবু সে সেখানেই পড়ে থাকে, অপমান গিলে, শাসন সহ্য করে, কারণ তার আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তবে এই পরিবারে একমাত্র ব্যতিক্রম গৃহকর্তার মেয়ে নীলা। যদিও সে নাদের আলীর প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতিশীল, তবু তার দৃষ্টিতেও নাদের আলী একজন 'পরগাছা', এক পরজীবী, যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। নীলা যখন নাদের আলীর প্রতি মমতা দেখায়, তখন সে নিজের মৃত মেয়ের ছায়া খুঁজে পায় তার মধ্যে, এবং সেই স্মৃতির ভারে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করে। গল্পের গভীরতম বাঁকে ফুটে ওঠে সমাজের অন্ধকারতম চিত্র। নাদের আলীর কন্যার করুণ পরিণতি—

> "এদের বাড়িতেই কাজ করত তার মেয়ে। তারপর গৃহকর্তা একটু অসতর্ক হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বস্তির গুণ্ডারা হুমকি দিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করে গৃহকর্তাকে। অনেক রকম লাঞ্ছনা সহ্য করেও এই বাড়িতে সেই যে পা রেখেছিল সে, এরপর হাজার ধাক্কায়ও এ বাড়ির মানুষগুলো সেই পা সরাতে পারেনি। প্রথম দিকে এ নিয়ে কম ধাক্কা সামলাতে হয়নি। সেই ধাক্কা খেতে খেতেই এক সময় নাদের আলীর সব ইন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে গেছে।"[১]

এক নিঃস্ব নারী, যাকে গৃহকর্তার লোলুপ দৃষ্টির শিকার হতে হয়, যে নিরুপায় হয়ে এই ঘরেই বধূ হয়ে আসে, কিন্তু শেষতক বাঁচতে পারে না। তার আত্মহত্যা যেন নারীর প্রতি সমাজের নির্মম নিষ্পেষণের এক প্রতীক। পুরুষতন্ত্রের রক্তচক্ষুর সামনে নারী এখানে শুধু একটি শরীর, ভোগ্যবস্তু— তার ব্যক্তি স্বত্তা, তার অনুভূতি, তার স্বপ্নের কোনো মূল্য নেই। এই সমাজ ধর্ষিতাকে কলঙ্কিত করে, কিন্তু ধর্ষক থেকে যায় নির্বিঘ্নে। কিন্তু গল্পটি এখানেই থেমে থাকে না। গল্পকার নাদের আলীর মধ্যে দিয়ে পুরুষতন্ত্রের আরেকটি দিক তুলে ধরেন। যে পুরুষ নিজে অবহেলিত, যাকে সমাজ পরগাছা বলে, সেও কি এই ব্যবস্থার শিকড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে? নাদের আলীর অবচেতনেও কাজ করে পিতৃতন্ত্রের সেই গোপন ছায়া। যখন সে জ্বরের ঘোরে মৃত কন্যার মুখে স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়, যখন সে নীলাকে কাছে টানতে চায়, তখন স্পষ্ট হয় যে এই সমাজব্যবস্থা শুধু নির্যাতিত সৃষ্টি করে না, একই সঙ্গে তা নির্যাতকের জন্মও দেয়। সেই মুহূর্তে নীলা তাকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে— যে নীলা এতদিন নাদের আলীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেই নীলাই আজ তাকে তাড়িয়ে দেয়।

গল্পের শেষ দৃশ্যটি এক অবিস্মরণীয় যন্ত্রণার মুহূর্ত। নাদের আলী যখন জানতে পারে 'প্যারাসাইট' শব্দের প্রকৃত অর্থ, তখন তার আত্মা হাহাকার করে ওঠে। এতদিন যাকে সে আশ্রয় ভেবেছিল, যে সম্পর্কগুলোকে সে নিরাপদ ভেবেছিল, তা আসলে শুধুই এক পক্ষপাতমূলক সমাজের নির্মম খেলা। গল্পের অন্তিম মুহূর্তে নাদের আলী আর ফিরে যেতে পারে না, সে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়— যেন প্রতিটি নিঃস্ব মানুষের চিরন্তন পরিণতি। 'পরগাছা' কেবল একটি গল্প নয়, এটি আমাদের সমাজের একটি নির্মম প্রতিবিম্ব। এখানে নারী কেবল নিপীড়িত নয়, বরং তার প্রতি অবিচারের শেকড় এত গভীরে যে তা একদিন নিপীড়কের মনস্তত্ত্বেও স্থান করে নেয়। নাসরীন জাহান এই গল্পে কেবল নারী নির্যাতনের চিত্র আঁকেননি, বরং দেখিয়েছেন কীভাবে একটি গোটা সমাজব্যবস্থা এর জন্য দায়ী।

নারী জীবনের এক অনন্য অনুষঙ্গ— মাতৃত্ব। এই মাতৃত্ব কখনো স্নেহময়ী আশ্রয়, কখনো বা এক অন্তহীন সংকটের নাম। সমাজের কঠোর বাস্তবতায় এই মাতৃত্বের মর্যাদা ও সংকটের দ্বৈততা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাসরীন জাহানের 'জনক' গল্পটিও যেন সেই জীবনদর্শনের এক চিত্রপট। গল্পের কথক এক সন্তানসম্ভবা নারী, হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে চিন্তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। সে ভাবছে— গর্ভে যে প্রাণ অঙ্কুরিত হয়েছে, তার প্রকৃত জনক কে? স্বামী রায়হান, নাকি এক সময়ের ভালোবাসার পুরুষ জিতু? এই এক প্রশ্ন তাকে ছিন্নভিন্ন করে, টেনে নিয়ে যায় এক গভীর আত্মসংকটের জগতে। তার মনে হতে থাকে— একটি শব্দ, একটি অনুভূতি কতখানি নিঃসংশয়, কতখানি কঠোর! গল্পকারের ভাষায়, -

> "সন্তান! কী আজব শব্দ! কী মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর শব্দ! সায়েন্স আর কী বলে! নিয়ম মতো লাল স্রোতের আগমনের পর এগারো, বারোদিনের ডগায় জিতু নামের এক মহাশক্তির দিকে আমি তর্জনীর ডগায় করে আমার দেহটি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিজ্ঞানের হিসেবে সন্তান আসার সেটাই একজন নারীর বিপদজনক সময়।"[২]

বিজ্ঞানের নিরিখে সে হিসাব মেলায়— সে সময়, সে মুহূর্ত, যখন জিতুকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিল। তাহলে কি তার গর্ভে বেড়ে ওঠা এই প্রাণের উৎস জিতু? প্রশ্নের ভার যেন তার মনকে গ্রাস করে। মাতৃত্ব, যে নারীর শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি, তার মধ্যেই কি লুকিয়ে আছে নিঃসীম শঙ্কার আধার? সমাজ তো নারীকে শুধু 'মা' বলেই জানে না, আরও কিছু পরিচয় তার গায়ে সেঁটে দেয়— সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলে। নারীর ভালোবাসা পুরুষতন্ত্রের চোখে যেন আত্মবিসর্জনেরই আরেক রূপ। তার ইচ্ছা, তার আকাঙ্ক্ষা, তার ব্যক্তিসত্তা— সবই যেন অগ্রাহ্য। ভালোবাসা মানে কি কেবল পুরুষের আনন্দ, নারীর আত্মনিবেদন? এ যেন এক পক্ষপাতদুষ্ট সমাজের লিখে দেওয়া শর্ত, যেখানে নারীর দ্বিধা, সংকট, অভিমান সবই পরিণামে তার এক অনিবার্য আত্মত্যাগের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এই সংকটে পড়ে কথকের হৃদয়ে জন্ম নেয় এক অস্থির প্রশ্নমালা—

> "আমার পুরোটা জীবন কি এইভাবে যাবে? সন্তানের ভেতর জিতুকে আবিষ্কার করে, ওকে কেন্দ্র করে ডালপালা মেলতে থাকা রায়হানের স্বপ্নে... দ্বন্দ্বে, কষ্টে... এই রকম অর্থহীন অস্থির জীবন যাবে? আমি কি কোনোদিন সুস্থ গাছ হতে পারব না? আমার চুড়ো কি স্পর্শ করবে না আকাশ? এই রকম রক্তপাত, এইরকম সিদ্ধান্তহীনতা, বিবেকের পচা কামড়... এক জীবন? আর আমার সেই ক্ষয়িষ্ণুতার ওপর পা ফেলে লাফাবে উদ্ভাসিত সন্তান, তার ডাল হবে, পাতা হবে, আকাশ ছোঁবে সে।"[৩]

অথচ নারীকে চিরকাল এইভাবেই যেন টিকিয়ে রাখা হয়েছে— এক দ্বিধার অতলে, এক অস্পষ্টতার গহ্বরে। পিতৃতন্ত্র চায়, নারী যেন প্রশ্ন না তোলে, যেন চোখ বুজে সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কিন্তু যদি একদিন সে নিজের পরিচয় নিজের হাতেই তুলে নেয়? যদি সে বুঝতে পারে যে, মাতৃত্বের আসল পরিচয় কেবল সমাজের দেওয়া নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়? এমনই এক উপলব্ধির মুহূর্ত আসে কথকের জীবনে। শয্যায় শুয়ে, শিশুটির অস্তিত্ব অনুভব করে হঠাৎই তিনি যেন নিজেকে চিনতে পারেন নতুন করে। রায়হান নয়, জিতু নয়— এই সন্তানের একমাত্র জনক সে-ই! সে-ই তার সৃষ্টির আধার, তার পরিচয়ের মূল। গল্পকারের ভাষায়—

> "হঠাৎ কী এক আবিষ্কারে আমি উদ্ভাসিত হয়ে জেগে উঠতে থাকি। এত অপাঙক্তেয়, এত ক্ষুদ্র করছি নিজেকে নিজে! নিশ্চয়ই পরিচয় তার কাছে। কুয়াশার জট থেকে বেরোতে বেরোতে রোদের আলোয় শিশুটিকে উল্টেপাল্টে দেখি। বিচিত্র আনন্দের মধ্যে জিতু নয়, রায়হান নয়, শিশুটির একমাত্র জনক হিসেবে এক সময় আমি নিজেকে চিহ্নিত করি।"[৪]

এ গল্প শুধু এক নারীর নয়, এ গল্প সমাজের সমস্ত নারীর, যারা যুগে যুগে নিজের পরিচয়ের জন্য, নিজের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। একদিন হয়তো সমস্ত নারীরাই এই সত্য উপলব্ধি করবে— তাদের পরিচয় কারও দয়া বা স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের অস্তিত্বই তাদের প্রকৃত পরিচয়।

এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে 'বিকার' গল্পে। মতি— এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু সে কি আদৌ কোনো কেন্দ্র ধরে রাখতে পেরেছে তার জীবনে? সমাজের কঠোর বাস্তবতা, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, এবং বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রামের মধ্যে সে ক্রমাগত এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছে। জীবনের দুঃস্বপ্নগুলো তার রক্তে, তার স্নায়ুতে এমনভাবে মিশে গেছে যে মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে কাঁপতে থাকে। এটিই তার বিকার। এই বিকারের বীজ সে বহন করে এসেছে তার পরিবেশ থেকে— সে সমাজ যেখানে দুর্বলতা মানেই পরাজয়, যেখানে বঞ্চিত মানুষেরা স্বপ্ন দেখলেও তা একদিন কর্পূরের মতো উবে যায়। এক নির্মম খুন, স্ত্রীর জন্য কিছু করতে না পারার গ্লানি, কিংবা তার সাইকেলের নিচে চাপা পড়ে যাওয়া এক বৃদ্ধার মৃত্যু— এসব দৃশ্য ক্রমশ জমাট বাঁধে মতির অবচেতনে। কিন্তু সে জানে না এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথ কী। কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই, কিছু বদলে ফেলার উপায় নেই। তারপরও মানুষ স্বপ্ন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেখে, স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হয়। মতি স্বপ্ন দেখেছিল তার ছোট ভাইটিকে নিয়ে— যে শহরে পড়ে স্মার্ট হবে, বড় মানুষের মতো ইংরেজি বলবে, চেয়ারম্যানের ছেলের সামনে গড়গড় করে কথা বলবে। আর সেদিন গর্বে ফুলে উঠবে তার বুক। কিন্তু জীবন কি কাউকে সহজে স্বপ্নের নাগাল পেতে দেয়? গল্পকারের ভাষায় মতির হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে —

> "কিন্তু ছেলেটা শহুরে হতে পারল না কোনোকালে। যতবারই সে গাঁয়ে এসেছে, মতি তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে তার ভেতর। বারবারই ছেলেটি মতিকে নিভিয়ে দিয়ে সেই পুরনো কায়দায় কাপড় পড়ে মতির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে বলেছে ভালো আছেন ভাইজান? কলেজে পড়েও সে চেয়ারম্যানের মেট্রিক ফেল ছেলেটার সামনে গিয়ে মতির মতোই কুঁকড়ে থাকে। আরে। এই যদি তোর উন্নতি হইবো তো শহরে গিয়া কি বাল ফালাইবার লাইগা ভর্তি হইছস? মতির মতো দফতরি নয় চাষাগিরি করলেই তো হইতো।"[৫]

মতির জীবনে কোনো বিপ্লব নেই, কোনো পরিবর্তন নেই। আছে শুধু ভয়। মৃত্যু ভয়। ক্ষুদ্র এক জীবনের আরও ক্ষুদ্রতর সংকট, এবং সেই সংকট থেকে বেরোতে না পারার যন্ত্রণা। অথচ এই ভয়ই যেন তার একমাত্র সহচর। কিন্তু এই গল্প শুধু মতির একার নয়। এ গল্প আরও কারও, আরও কারও বঞ্চনার, বিশেষত নারী জীবনের। তাহেরা— মতির স্ত্রী, সে এই ভয়-সংকট-দারিদ্র্যের বাস্তবতায় আরও অসহায়, আরও উপায়হীন। মতি হয়তো সমাজের চোখে এক অকর্মা, ভীরু পুরুষ। কিন্তু নিজের ঘরের ভেতরেই তার পুরুষত্ব যেন তীব্র হয়ে ওঠে। তাহেরা তার পৌরুষত্ব নিয়ে কটাক্ষ করলে আহত হয়ে মতি গর্জে ওঠে—

> "চুপ কর হারামজাদি। হঠাৎ মিশ্র অনুভূতির ধাক্কায় ক্ষেপে ওঠে মতি। বেশি লাই পায়া গেছস। এই মরদের পা চাইট্যাইতো খাইতাছস।"[৬]

পুরুষতন্ত্র শাসিত সমাজে একজন হতাশ, দুর্বল পুরুষও নিজের হতাশার ভার নারীর ওপর চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বাইরে যেখানে সে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, ভিতরে সেখানে তার পৌরুষ অহংকারে উথলে ওঠে। নারীর প্রতি অবদমন আর পুরুষের ভিতরের ক্ষয়ে যাওয়া সত্তার এক বিকৃত প্রতিফলন ঘটে মতির এই আচরণে। সমাজের চোখে সে হয়তো প্রান্তিক, সে হয়তো নিরুপায়— কিন্তু এই নিরুপায় পুরুষই ঘরের মধ্যে একজন অসহায় নারীর জন্য হয়ে ওঠে আরো ভয়ংকর। গল্পের শেষ দৃশ্য যেন এক চূড়ান্ত পরিণতির ইঙ্গিত। বিকারের তীব্রতম পর্যায়ে মতি যখন উন্মাদপ্রায়, তাহেরা তখন অসহায় কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—

> "কে আছো গো—পাগল হইয়া গেছে! পাগল!"[৭]

এই সমাজ কি তার মতো নিম্নবর্গের, ভাগ্যবিড়ম্বিত, হতভাগ্য মানুষদের জন্য কিছু করতে পারে? না, পারে না। কারণ তারা যে কেবল সংখ্যায় থেকে যায়, তাদের পরিচয় কখনো হয়ে ওঠে না। মতির বিকার তাই শুধু তার একার নয়, এ এক শ্রেণির মানুষের নৈমিত্তিক দুঃস্বপ্ন, যা সমাজের দেয়ালে অদৃশ্য অথচ গভীরভাবে আঁকা থাকে। তার শোচনীয় নিদারুণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহেরার মতো অসহায় নারীর জীবন বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে।

নারীর অসহায়তার নির্মম চিত্র 'জঠরবন্দি' গল্পটি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট, সমাজের নিম্নবর্গের নারীদের ভাগ্যে কী-ই বা থাকে? বেঁচে থাকার এক অন্তহীন লড়াই, যেখানে নিরাপত্তা নেই, নেই সম্মান, নেই অধিকার। আঙ্গুরী সেই বাস্তবতার প্রতিচিত্র— ন'মাসের গর্ভবতী, অথচ তার পাশে কেউ নেই। চিররুগ্ন স্বামী তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে, ফিরেও আসেনি। আসলেও তার জীবনে আদৌ কোনো পরিবর্তন আসত কি? কারণ সংসারের যাবতীয় দায়ভার এমনিতেই তার কাঁধে। স্বামীর ওষুধ, খাবার, নিজের শারীরিক যন্ত্রণা— সবকিছু পেরিয়ে ঠিকে ঝি-এর কাজ করে সে দিন গুজরান করে। তবু, স্বামী নামক ব্যক্তির উপস্থিতি যেন একটুকরো মনস্তাত্ত্বিক অবলম্বন। প্রতিবেশী স্বর্ণলতার দয়া-দাক্ষিণ্যে কোনোরকমে বেঁচে আছে সে। কিন্তু সমাজ কি একজন একাকী, স্বামী-পরিত্যক্ত নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়? দেয় না। বরং তার দুর্বলতাকে আরও ক্ষত-বিক্ষত করার জন্য প্রস্তুত থাকে চারপাশের লোলুপ চোখ, অপেক্ষায় থাকে সুযোগসন্ধানী শকুনেরা।

গল্পের অন্যতম বাস্তবতা হলো নারীর মাতৃত্ব— যেখানে সন্তান জন্মদান নারীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার থাকে না। সন্তান ধারণক্ষম কি না, শরীর সুস্থ আছে কি না, এমনকি কতজন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সন্তান হবে—এসবের নিয়ন্ত্রণ পুরুষের হাতে, পরিবারের হাতে। সন্তান জন্ম দেওয়া যেন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে নারীর অনুভূতি, শারীরিক সক্ষমতা কোনো গুরুত্বই পায় না। আঙ্গুরীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। অপুষ্টিজনিত রোগে দুই সন্তানের মৃত্যু দেখেও তার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং এক অমানবিক দাম্পত্যে সে প্রতিনিয়ত কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। যেখানে ভালোবাসা নেই, আছে শুধু কঠিন বাস্তবতা—

> "এমনিতেই চাপা স্বভাবের আঙ্গুরী। অপুষ্টিজনিত রোগে দুই ছেলের মৃত্যুর পর আরেকটি সন্তান গর্ভে মোটামুটি দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অনেক সময়ই দু'জন অনেক জঘন্য কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। আঙ্গুরী তাকে বলেছে কুত্তার ছাও, স্বামী বলেছে বেশ্যামাগি।"[৮]

এমন সম্পর্কেও নারী একরকমের নির্ভরতার ছায়া খোঁজে। যদিও এই ছায়া তাকে রক্ষা করতে পারে না, পরিবর্তন আনতে পারে না। প্রথাবদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতির বাইরে যাওয়ার সাহস নারী করতে পারে না। করলে তাকে একঘরে করে রাখার জন্যই প্রস্তুত থাকে সমাজ, পরিবার, প্রতিষ্ঠান। আঙ্গুরীর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বামী পরিত্যাগ করে চলে গেলেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, কিন্তু তার দেহটিকে ভোগ করার জন্য ব্যাকুল লোকের অভাব নেই। এখানে কাকের প্রতীকে প্রতিভাত হয়েছে সেই সমাজ, যারা নারীর দুঃসময়ের সুযোগ নিতে সদা প্রস্তুত। গল্পকারের বর্ণনায়—

> "বেলা পড়লে কাক আসে তির তির লাফিয়ে। পেছনে আরো কাক। বাচ্চাদের হুল্লোড় শুনে সরে গিয়ে টিনের চালে, সজনে গাছে বসে। আঙ্গুরীর পেটে হাঁ হাঁ ক্ষুধা। নেতিয়ে পড়া স্তনের হুকে হাত রাখতেই চোখে পড়ে ছায়া। চোখের মধ্যে ধাঁধা লেগে যায়। ঘোর ছায়া ছিন্ন করে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড এক কাক। কাকটির ঠোঁটে একটি কাঁঠালের টুকরো। আঙ্গুরীর অশরীরী শরীর, লম্বা লকলকে জিহ্বা, শুকনো শক্ত হাত দৌড়ে গিয়ে-হেইস এরকম প্রচন্ড একটি শব্দের প্রতিধ্বনি তোলে। সবগুলো কাক রাস্তা পেরিয়ে দূরে চলে যায়। কাঁঠাল মুখের বড় কাকটি হলুদাভ টুকরোটা দরজার ওপর ফেলে দিয়ে অপর পাশের টিনের ওপর গিয়ে বসে। ...কাঙাল হাত বাড়িয়ে আঙ্গুরী কাঁঠালের কচকচে টুকরোটি দাঁতের তলায় পিষে ফেলে। এরপর যখন সন্তানের কাঁঠালের তৃষ্ণা আরো প্রবল হয়, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীর মাটির মধ্যে মিশে পড়তে চায়, তখন ঘোরে পড়ে মানুষের মতো আঙ্গুরী কাতর হাত বাড়ায়— কাক ও কাক। কাকটি এসে গর্ভবতী আঙ্গুরীর পেটে তিড়িৎ তিড়িৎ লাফাতে থাকে।"[৯]

সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে সমাজে সহায়-সম্বলহীন নারীরা শেষমেশ নিজেদের নারীত্বও হারিয়ে ফেলে। তারা কেবল জীবনের ক্রমাগত এক যুদ্ধে নিজেদের বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আঙ্গুরীর সংগ্রাম তাই কেবল তার একার নয়, এটি এক পুরো বঞ্চিত, নির্যাতিত, দারিদ্র্যপীড়িত নারীর চিত্র— যারা সমাজের চোখে শুধুই এক শরীর, এক কর্মক্ষম হাত, কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়।

নেশার কাছে দুই মাতাল বন্ধু জাহিদ ও প্রণবের নতজানু হওয়ার গল্প 'আত্মসমর্পণ'। একটি সমাজ, যেখানে পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত, কিন্তু নারীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে বন্দি, সেখানে রিনুর বিদ্রোহ যেন এক প্রতিবাদী সুর তোলে। 'আত্মসমর্পণ' গল্পের এই নারী চরিত্র কেবল দাম্পত্য জীবনের গ্লানিজনিত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়নি, বরং সে উপলব্ধি করেছে যে, নিজের অস্তিত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা না করলে সে চিরকাল এক অবহেলিত, পদদলিত সত্তা হয়ে থাকবে। স্বামীর প্রতি তার যে আবেগ ছিল, তা বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে— একবার নয়, অসংখ্যবার। প্রত্যেকটি সন্ধ্যায়, যখন নেশার কুয়াশায় জাহিদের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখনই রিনুর মনোজগতে আরেকটি নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। সংসার কি কেবল নারীকে অবদমন করার এক নিগূঢ় ব্যবস্থা? নাকি এটি সেই জায়গা, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতা সমানভাবে বিকশিত হয়?

গল্পের সূচনাতেই আমরা দেখি, জাহিদ আর তার বন্ধু প্রণব নেশার কবলে পড়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এই নেশা কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বরং তাদের চারপাশের সম্পর্কগুলোতেও বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। জাহিদের স্ত্রী রিনু এই পরিস্থিতি আর সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে যায়, তবে তার এই প্রস্থান কোনো অস্থায়ী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 107 - 114
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিমান নয়—এটি তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সূচনা। গল্পে দেখা যায়, জাহিদ যখন নেশার আচ্ছন্নতায় স্ত্রীকে তুচ্ছ করে, তখন সে সামান্যতম অনুশোচনা বোধ করে না। বরং আরও একবার গাঁজার টান দিয়ে বলে—

> "আর একটা টান। এই টানটা রিনুর নামে উৎসর্গ করে দেব।"[১০]

এই বাক্যে ফুটে ওঠে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই নির্মম বাস্তবতা, যেখানে স্ত্রী কেবল এক অনুষঙ্গ, তার কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, তার দুঃখ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু রিনু এসব অন্যায়ের শিকার হয়ে কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়নি। সে নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে, পুরুষের শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে। জাহিদের চোখে যখন এই বিদ্রোহ নারীর চরিত্রের 'ভ্রষ্টতা', তখন পাঠকের দৃষ্টিতে এটি পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিবাদ। নারী যে কেবল পুরুষের সংযমের জন্য নয়, বরং নিজের অস্তিত্বের দাবিতেও সমাজের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সেটিই রিনুর চরিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে এখানেই শেষ নয়। এই বিদ্রোহ যে পুরুষের পৌরুষে আঘাত হানে, সেটি আমরা দেখতে পাই জাহিদের প্রতিক্রিয়ায়। যখন সে জানতে পারে যে প্রণবের সঙ্গে রিনুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তখন তার ক্ষোভ, যন্ত্রণা, ও প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। গল্পকারের ভাষায়—

> "যে রিনু তার নরম হাত দিয়ে জাহিদের গাল স্পর্শ করে, জাহিদের সাথে একই খাটে শোয়, জাহিদের গলা জড়িয়ে ভালোবাসার কথা বলে, বিয়ের এক বছর না যেতেই সেই রিনু ঠিক একইভাবে সমর্পিত হচ্ছে প্রণবের কাছে? যে প্রণবকে সে নিজের আত্মা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি, সে জাহিদের কথা একবারও না ভেবে রিনুকে স্পর্শ করেছে? কেন আজ প্রণব স্বীকার করল? নেশার ছুতোয় বিষয়টা সে কাটিয়ে যেতে পারত। তবে কি দু'জন সমঝোতায় এসে গেছে? পরিকল্পনা করেই রিনু বাপের বাড়ি গেছে? ...ভাবতে পারে না জাহিদ। ওর ইচ্ছে হয় থাপ্পড়ে লাল করে দেয় রিনুর গাল। রেললাইন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিশপিশ করা হাতকে অনেক কষ্টে সামলায়। ...অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে জাহিদের ভেতরটা। রিনু যদি কিশোরগঞ্জ চলে না যেত তাহলে এক হাত দেখে নিত জাহিদ।"[১১]

অথচ এই প্রতিক্রিয়ার পেছনে লুকিয়ে থাকে এক গভীর বৈপরীত্য— একদিকে সে নিজেই রিনুকে অবহেলা করেছে, ভালোবাসা ও সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, বারবার রিনুর আপত্তি সত্ত্বেও সে পুনরায় নেশার কাছে নতজানু হয়েছে। প্রতিবারই তার কাছে স্বাস্থ্যকর দাম্পত্য সম্পর্কের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে অস্বাস্থ্যকর নেশা। হাজার কান্নাকাটি ঝগড়া ঝাটি করেও রিনু জাহিদকে সুস্থ জীবনে ফেরাতে পারেনি। তাই অবজ্ঞা-অবহেলা-অপমানে বিপর্যস্ত রিনু যখন নিজের ইচ্ছায় মুক্তির নতুন পথ বেছে নিয়েছে, তখন জাহিদ তা সহ্য করতে পারছে না। এখানে পুরুষতন্ত্রের দ্বৈত চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে— নারী যখন পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তখন সে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু যখন সে নিজের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে 'অবাধ্য', 'অবিনীত', 'ভ্রষ্টা'। তবে গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, রিনুর আত্মসমর্পণ আসলে কার কাছে? সমাজের বিধিনিষেধের কাছে? না, সে আত্মসমর্পণ করেছে নিজের সত্তার কাছে। সে বুঝতে পেরেছে, যদি সে নিজের জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তবে সারাজীবন কেবল অন্যের ইচ্ছার পুতুল হয়েই থাকতে হবে। তাই সে সমস্ত শেকল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। এ সমাজ হয়তো তাকে অপরাধী হিসেবে দেখবে, নিন্দার চোখে বিচার করবে, কিন্তু সে সেসব নিয়ে চিন্তিত নয়। তার লক্ষ্য একটাই— নিজের জন্য নিজের জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা।

এভাবেই 'আত্মসমর্পণ' গল্পের মধ্যে এক নতুন বয়ান নির্মিত হয়, যেখানে নারী কেবল সহনশীল, আত্মত্যাগী কিংবা পুরুষের অনুগামী নয়, বরং এক স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সত্তা, যে তার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করতে চায়। সমাজের চোখে এটি হয়তো একটি 'বিপর্যয়', কিন্তু নারী জাগরণের ইতিহাসে এটি এক সাহসী পদক্ষেপ, যে পদক্ষেপে প্রতিধ্বনিত হয় স্বাধীনতার সত্য স্বরূপ।

সব মিলিয়ে বলা যায় নাসরীন জাহানের গল্প সময়ের প্রতারণাময়, জটিল ও বহুমুখী সংঘাতে বিপর্যস্ত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের এক অন্তর্দৃষ্টি। সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি গল্পে সহজ বর্ণনা, সোজাসাপটা কাহিনি কিংবা ঘটনাবহুল

প্লটকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে সময়ের বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন প্রতীকের গভীরতা ও রূপকের রহস্যময়তায়। তাঁর গল্পের নারী-চরিত্রগুলোও তাই নাম-পরিচয়হীন, অস্পষ্ট, কখনো রহস্যময়, কখনো বা অসম্পূর্ণতার ঘেরাটোপে বন্দি— এ যেন সময়ের প্রতিচ্ছবি, যা শনাক্তহীন, অথচ সর্বব্যাপী। তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের ভেতরকার ক্ষয়, মানসিক বিপর্যয়, নারীজীবনের বিচিত্র দোলাচল, পুরুষ ও নারীর অভিন্ন সমাজে দুই বিপরীত বাস্তবতা, এবং সামাজিক সংকটের নির্মম প্রতিচিত্র। প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এক অস্থির, অসহিষ্ণু সমাজব্যবস্থার চিত্র— যেখানে সম্পর্কের টানাপোড়েন, সামাজিক জটিলতা, ও ক্রমবর্ধমান সংকট মানবজীবনকে এক অবিন্যস্ত পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা কেবল ব্যক্তি নয়, তারা সময়ের প্রতিনিধি— সমাজের ভাঙাচোরা চেহারারই প্রতিফলন। ‘স্থবির যৌবন’ সংকলনের গল্পগুলো লেখিকার কৈশোর ও তারুণ্যের ভাবনার প্রতিচিত্র। বয়সে নবীন হলেও তাঁর গল্পগুলোর বিস্তৃত পরিসর ও বর্ণনার ধরণেই বোঝা যায় এক সম্ভাবনাময় শিল্পবোধের জন্ম। রহস্য ও কল্পনার আবরণে তিনি যে বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন, তাতে সময় ও সমাজের বহুমাত্রিক রূপ যেমন স্পষ্ট, তেমনি নারীর জীবনসংগ্রাম ও মনোজগতের জটিলতাও গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নাসরীন জাহানের লেখনীতে তাই সময় ও সমাজ কেবল পটভূমি নয়, বরং চরিত্র হয়ে ওঠে, যা তাঁর গল্পের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে পরিচালিত করে।

Reference:

১. জাহান, নাসরীন, ‘পরগাছা’, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ২৪
২. জাহান, নাসরীন, ‘জনক’, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৩৬
৩. জাহান, নাসরীন, ‘জনক’, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৪০-৪১
৪. জাহান, নাসরীন, ‘জনক’, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৪৪-৪৫
৫. জাহান, নাসরীন, ‘বিকার’, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫৪
৬. জাহান, নাসরীন, ‘বিকার’, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫১
৭. জাহান, নাসরীন, ‘বিকার’, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫৫
৮. জাহান, নাসরীন, জঠরবন্দি, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৫৭-৫৮
৯. জাহান, নাসরীন, জঠরবন্দি, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৬০
১০. জাহান, নাসরীন, আত্মসমর্পণ, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৬২
১১. জাহান, নাসরীন, আত্মসমর্পণ, ‘স্থবির যৌবন’, গল্পসমগ্র-১, জলধি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২২, পৃ. ৬৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 115 - 123
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে আদিবাসী নারীর সামাজিক অবস্থান এবং নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ

সাগরিকা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sagarikasaha111@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tribe, Adivasi, Dalit, Ramapada Chawdhury, women's characteristics features, psychological analysis.

Abstract
Ramapada Chowdhury, one of the strongest writer in the Bengali literary world of the 20th century, has the credit of authorship of nearly 135 short stories. In this article, the position of Dalit-Tribal women in society, the nature of Tribal women's characters, characteristics features and the layered structure of pshychology speak to the immense mystery of human life are explored based on the short stories by Ramapada Chowdhury. Society & human life complement with each other and human life can't be complete without the mind, because the mind is never separated from the human surroundings and society. The subject of this essay is the craft of character development and the finer levels of psychological hierarchy through character psycho analysis in the context of the psychological theories of various psychologists.

Discussion

"The most exploited section of the pluralist Indian society."[১]

হিসাবে চিহ্নিত, উচ্চবিত্ত সমাজের পদদলিত, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর প্রান্তবাসী দলিত আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ যারা, সেই আদিবাসী মানুষদের নিয়ে লেখা রমাপদ চৌধুরীর গল্পের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, অল্পসংখ্যক গল্পেই - 'এক অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই যেন অনন্ত সিন্ধু'র আস্বাদ প্রাপ্ত। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মূলে থাকে স্রষ্টার আজীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা-প্রত্যয়। লেখকের নিজস্ব নিরপেক্ষ জীবনদর্শন, নির্মোহ অভিব্যক্তি তাঁর গল্পনির্মাণে পরিস্ফুট।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অন্ত্যেবাসী আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান, আদিবাসী নারী চরিত্রের স্বরূপ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানবজীবনের অপার রহস্যচেতনায় মুখর মনস্তত্ত্বের স্তরীয় বিন্যাসের অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। সমাজ এবং মানবজীবন একে অপরের পরিপূরক, আবার মন ব্যতীত মানবজীবন সম্পূর্ণ হতে পারে না, কারণ মন কখনই মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থান, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের আধারে নারী চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবমনের অতল রহস্য অনুধাবনের পাশাপাশি চরিত্রনির্মাণের নৈপুণ্যতা, আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান এই প্রবন্ধের মূল আলোচনার বিষয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখকের ছোটগল্পে আদিবাসী নারীচরিত্র চিত্রায়ণের মাধ্যমে সমাজের যে স্বর ব্যক্ত এবং স্রষ্টার যে মনোভাব মূর্ত, আবার কোথাও স্রষ্টার মনোভাবকে উপেক্ষা করেই চরিত্ররা তাদের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, সে বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আলোচনায় রমাপদ চৌধুরীর 'জলরঙ', 'নারীরত্ন', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি', 'ইম্‌লী', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'তিনতারা', 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পগুলির নিরিখে আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং অপার রহস্য চেতনায় মুখর নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস করা হয়েছে।

লেখকের আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলিতে সমাজের প্রান্তবাসী আদিবাসী মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তাদের জীবনচর্যার পাশাপাশি প্রাধান্য পেয়েছে মানব মনের জটিলতা, মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্য। কোন মানুষের ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে থাকা কারণ খুঁজতে গেলে মানব মনের অতল রহস্য অনুধাবনের পাশাপাশি সেই মানুষের আচরণ, ক্রিয়াকলাপের কার্যকারণ সূত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান, সমাজ-পরিবেশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানাও আবশ্যক। কারণ মানুষের ক্রিয়াকলাপ, মানবমন এবং সমাজ একসুতোয় গাঁথা। মন সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মত - মন ও মানুষের দেহ এক ও অবিচ্ছিন্ন সত্তা। আধুনিক যুগে স্নায়ুবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান বিকাশের পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটেছে। সমাজ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণ আবশ্যক। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, আইভন পাভলভ, বি. এফ. স্কিনার, কার্ল রজার্স, আলফ্রেড অ্যাডলার, কার্ল ইয়ুং, ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব সমাজের সামনে মানুষের অবচেতন মনের গহনে চলা অপ্রকাশ্য ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে। মানুষ কিছু আবেগ-প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত, চেতন এবং অবচেতনের জগৎ নিয়েই মনস্তত্ত্বের জগৎ। মানুষ তার নিজের অন্তরের গহনে চলা ভাবনা সর্বদা উপলব্ধি করতে পারে না। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানবমনের ভাবনার রহস্য-প্রকোষ্ঠে ধাপে ধাপে প্রবেশ করে, জীবনের ছন্নছাড়া মিছিলে একটি চরিত্র কতটা জীবন্ত ও তার ক্রিয়াকলাপের যে কার্য-কারণ সূত্র নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে রচিত রমাপদ চৌধুরী 'জলরঙ' গল্পে কোলিয়ারির শ্রমিক-মানুষদের নিবিড় জীবনযাপনকে কেন্দ্র করেই যেন জলরঙে শ্রমিকদের জীবন ছবি এঁকেছেন। সামান্য অসাবধানবশতায় জলরঙে আঁকা ছবি যেমন নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তেমনি কোলিয়ারিতে কাজ করা শ্রমিকদের জীবনও সামান্য অসাবধানতায় বিপন্ন হতে পারে। লেখক কোলিয়ারি অঞ্চল, কোলিয়ারিতে কাজ করা অসহায়, দরিদ্র মানুষদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, পর্যবেক্ষণের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের চরিত্রচিত্রণকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করে।

গল্পের শুরুতেই নির্মল প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণির সৌন্দর্যের তুলনা পাই সদ্য কোলিয়ারিতে যোগ দেওয়া বাবুর মুখে। এই কোলিয়ারিতে কাজ করা এক নারী শ্রমিক বা রেজাদের উপর হয়ে চলা অত্যাচার, শোষণের প্রকট রূপ রূপমণি চরিত্রটি বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে লেখা এবং তৎকালীন সময়ে দেশে নারীসুরক্ষা, নারীপ্রগতি আইন নিয়ে নানান আন্দোলনের ফলে জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি হলে সরকার কর্তৃক দেশে নারীসুরক্ষা, নারী প্রগতির জন্য নানান আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এই সকল আইন-নিয়ম কেবল খাতায়-কলমেই সীমাবদ্ধ, আদৌ আদিবাসী সমাজে তার বাস্তবায়ন হয় না, এই গল্প তারই দৃষ্টান্ত। সরকারি আইনানুযায়ী মহিলা শ্রমিকদের রাতে কাজে আসতে হয় না কোলিয়ারিতে, কিন্তু কোলিয়ারির উচ্চপদস্থ বাবুদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য বাবুদের বাংলোয় যেতে হত তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। প্রভান্স যখন বলে ওঠে—

> "খাদে এখন রাতপাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো...।"[২]

প্রভান্সের মুখের এই অসম্পূর্ণ কথাতেই ব্যক্ত হয় কোলিয়ারিতে কাজ করা আদিবাসী নারী শ্রমিকদের উপর হয়ে চলা অকথ্য অত্যাচার এবং তাদের অসহায়তা। এই বাবুদের ভোগ-লালসা চরিতার্থতার জন্যই যখন রূপমণিকে সর্দার গোপী সিং-এর ডেরায় যেতে বলে, তখন সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তার কাজ চলে যায়। এখানে আদিবাসী নারী শ্রমিকদের বাড়িতে কাজে ডাকার নামে কেবল উচ্চপদস্থ বাবুরা তাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করে এবং কোনো নারী যদি যেতে অস্বীকার করে, তাকে ক্ষমতাধারী মালিক শ্রেণির ষড়যন্ত্র, লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। রূপমণি চরিত্রটিতে দৃঢ় প্রতিবাদী সত্তা অন্বিত, যখন সে বলে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আর সকল কুড়ীরা যাক, আমি যাব নাই।"[৩]

রূপমণি জানে যে সে না গেলে তার কাজ চলে যাবে, রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হয়েও রূপমণি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। দৃঢ় সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে- সে উচ্চপদস্থ বাবুদের ডেরায় মনোরঞ্জনের জন্য যাবে না। কিন্তু পরের দিনই সে তার হবু স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে এবং গল্পের কথককে বদনামের হাত থেকে রক্ষা করতে রূপমণি তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোপী সিং-এর লোলুপতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এখানে রূপমণি চরিত্রটি বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানী আইভন পাভলভের তত্ত্বের কথা এসে যায়- পাভলভ মনে করেন, মানুষের মানসিকতা কার্যকারণ সম্পৃক্ত, স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর। তিনি মানুষের পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে রূপমণি প্রবল অভাব সত্ত্বেও কাজ চলে যাওয়ার ভয় পায়না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু সেই রূপমণি পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

যে পরিয়াগের প্রাণ বাঁচাতে রূপমণি নিজের সম্মানের আত্মবলিদান দেয়, সেই পরিয়াগই তার প্রাণরক্ষাকারী হবু স্ত্রী রূপমণিকে ভুল বোঝে, তার নামে ভুল ধারণা পোষণ করে—

> "বিষণ্ণ হাসি হাসলে পরিয়াগ— গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।"[৪]

পরিয়াগের রূপমণি সম্পর্কে এমন কথা বা ভাবনা বড় বেদনাদায়ক। যে নারী প্রাণপাত করে নিজের সবকিছু বলিদান দিল, সেই নারীকেই তার প্রিয়পুরুষ তার ত্যাগের কোনো স্বীকৃতি দিল না। আবহমান কাল ধরেই নারী তার আত্মবলিদান, ত্যাগের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। রূপমণির আত্মবলিদানের পিছনে কেবল পরিয়াগ নয়, এছাড়াও আছে 'হাজরিবাবু', যার জন্য রূপমণি নিজের মান-সম্মান আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত হয়। গল্পে রূপমণির পরিয়াগের প্রাণ ও হাজরিবাবুর সম্মান রক্ষার্থে আত্মত্যাগ, বৃহত্তর ক্ষতিসাধন থেকে বাঁচাতে আত্মবলিদান আদিবাসী নারী শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান, কোলিয়ারির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে সুস্পষ্ট করে। গল্পের শেষবাক্যে যেন রূপমণির গভীর ভাবনার তল অধরা -

"শুধু প্রভাস বললে, কে জানে, হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে।"[৫]

রূপমণির সৎ, মানবিক, নির্ভীক-সাহসী, প্রতিবাদী, আত্মত্যাগী চরিত্রের গভীরে আছে তার মানবমনের এক অন্য জগৎ। মানবমন অত্যন্ত জটিল, অপ্রকাশ্য রহস্যময়, গভীর। মনের চেতনার যে অংশ প্রকাশিত তা থেকেই অনুমান করে নিতে হয় অপ্রকাশ্য মননের অব্যক্ত কথা।

১৩৬২ বঙ্গাব্দে রচিত 'নারীরত্ন' গল্পটির কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র ময়না কিস্কু এবং ময়নার মেয়ের চরিত্রের স্বরূপ আলোচনা করা হল। রমাপদ চৌধুরীর অন্য গল্পগুলিতে যেসমস্ত নারী চরিত্র রয়েছে ময়না কিস্কু তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের এক নারী চরিত্র। ময়না চরিত্রের মধ্যে যে স্বার্থপর, প্রতারক, ক্রূঢ়, প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব পাই তা রমাপদ চৌধুরীর সৃষ্ট অন্য আদিবাসী নারী চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

যৌনানুভূতির তীব্রতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি— এই তীব্র প্রবৃত্তির ক্রিয়াপদ্ধতির যে রূপ অব্যস্ত জীবনযাত্রার পেলব সম্পর্কের অন্তরালে, তার সত্য রূপটি লেখক ছোটগল্পের এই সূক্ষ্ম পরিসরে ময়না চরিত্রে তুলে ধরেছেন। ভুখন কিস্কুর বউ ময়না কিস্কু তার স্বামীর আড়ালে ধুলন টুডুর সঙ্গে পরকীয়া করে, স্বামীর কাছে ময়নার পরকীয়া ধরা পড়ে গেলে সে নিজের হাতে তার স্বামীকে খুন করে। প্রেমিক ধুলন যখন ময়নার এই অপরাধের কথা জানতে পেরে তার অপরাধের দায় নিতে অস্বীকার করে, ময়নার ভুল কাজের অংশীদারিত্ব হতে চায় না, তখনই ময়নার প্রেমিকাসত্তার বদলে জেগে ওঠে এক স্বার্থপর, প্রতারক সত্তা। ময়না কিস্কু এমন এক নারী চরিত্র– যে চরিত্রের মনের গহনে অপরাধী, খুনী, স্বৈরিনী, প্রতারক সত্তা বিরাজমান। গল্পে সুধীরবাবু চরিত্রের মুখে নারী সম্পর্কে বলতে শোনা যায়— নারী নরকের দ্বার। ময়না কিস্কু সত্যিই 'নরকের দ্বারী', যে একটা নয় তিনটে মানুষের জীবনকে নরকে পর্যবসিত করেছে। এখানে ময়না তার মেয়ে, তার স্বামী, তার প্রেমিক— এই তিনটে মানুষ, যারা তার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের প্রত্যেকের জীবনকে নরকে পর্যবসিত করেছে। ময়না চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাকে 'ক্রিমিন্যাল মাইন্ড' বলা যায়। যে তার স্বামীকে হত্যা

করতে একবারও দ্বিধা করে না এবং পরক্ষণে যখন প্রেমিক ধুলনের কাছে সে ধরা পড়ে তখন সে ধুলনকে বলে যে ধুলনের জন্যই নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে। আবার পরক্ষণেই ময়না ধুলনকে তার স্বামীর খুনের ঘটনায় দায়ী করে অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জঘন্য অপরাধ করতেও পিছপা না হওয়া, আদিমতায় পূর্ণ, ক্রূঢ়-স্বার্থপর, স্বৈরিণী, অত্যন্ত জটিল মনোভাবাপন্ন এক চরিত্র এই ময়না কিস্কু।

ধুলন টুডু ময়না বিবাহিত জানার পরেও সে তার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত হয়। ময়নার নিজ স্বামীকে খুন এবং সেই খুনের দায়ে ধুলনকে মিথ্যাচারে ফাঁসানো, এই গোটা ঘটনায় ধুলন বিহ্বল, হতাশাগ্রস্ত বা প্রবলভাবে মানসিক বিধ্বস্ত। ধুলন ভাবতেই পারে না তার ভালোবাসার মানুষ অন্য আর এক মানুষের প্রাণ নিতে পারে। সে এই ঘৃণ্য কাজে ময়নার সঙ্গ দিতে পারেনি, সে তার নিজের মনের বিবেককে, সৎ মনোভাবকে ময়নার জন্য বিসর্জন দিতে পারেনি। হত্যা সমস্যা সমাজের এক বড়ো সমস্যা। এই সমস্যায় মনের নির্জ্ঞান অংশে বিষয়টির মূল একটিই। মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মানব প্রবৃত্তিকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছেন— *Eros* এবং *Thanatos*। এই *Eros* হল 'ভালোবাসার প্রবৃত্তি' বা 'জীবনমুখী' এবং *Thanatos* হল 'মৃত্যুচেতনা' বা 'মৃত্যুমুখী'। এই *Thanatos* বা মৃত্যুচেতনা দুইভাবে প্রবাহিত হয়- পরঘাতী অর্থাৎ হত্যা, আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মহত্যা। পরঘাতী এই মৃত্যুচেতনা থেকেই মানুষের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির জন্ম, এর উদ্দেশ্য হল- অপরকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা। ময়নার মধ্যে এই পরঘাতী প্রবৃত্তির মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। ভুখনের কারণে ময়নার ধুলনের প্রতি ভালোবাসার ধারা প্রতিহত হওয়ায় তার আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এই আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকেই ময়না তার স্বামীকে হত্যা করে আবার পরক্ষণেই এই একই কারণে সে নিজেকে বাঁচাতে ধুলনকে মিথ্যা খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন শাস্তি দেওয়ায়। 'নারীরত্ন' গল্পে ময়নার মনোবিশ্লেষণে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের হত্যাকেন্দ্রিক সমস্যা পরিলক্ষিত।

সে তার স্বামীকে খুন করে এসে এমন সুন্দর অভিনয় করে কাঁদে যে দুঁদে পুলিশ অফিসার, গ্রামের লোকজন – সকলেই তার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে। আদ্যোপান্ত এক জটিল নারীচরিত্র, যার মনের পরতে পরতে হিংসাত্মক মনোবৃত্তি। নারী মানেই যে সে কেবল অসহায়, দুর্বল, লাঞ্ছিত— এই প্রথাগত ধারণায় সজোরে আঘাত হানে এই ময়না চরিত্রটি। সে গ্রামের হোক; কি শহরের; কি আদিবাসী, মানবমনের রহস্য একই। নারীও রক্ত-মাংসের মানুষ, কেবল সে লাঞ্ছিত হয়, তা নয়। তার দ্বারা অন্যরাও লাঞ্ছনা-অন্যায়ের শিকার হতে পারে, এবং মেয়ে হওয়ার সুযোগ সে নিতে পারে, সে কারো মা বা স্ত্রী হলেও তার মনে পাপের বাসা বাঁধতে পারে। নারী নিয়ে মানুষের যে প্রথাগত ধ্যান-ধারণার ছক তা ময়না চরিত্র ভেঙে দেয়। গল্পের শুরু থেকে ময়নার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও হঠাৎ তার মেয়ের ময়নাকে 'ডাইনি' সম্বোধন করা, নিজের মায়ের কাছে থাকতে না চাওয়া, তার মায়ের অসৎ চরিত্র সকলের সামনে আনায় ময়না চরিত্রের মনস্তত্ত্বের জটিল দিকগুলি প্রকট হয়। মাকে মেয়ের 'ডাইনি' সম্বোধনে 'মা' ভাবনার প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় একটা আঘাত লাগে। একটা মেয়ে জনসম্মুখে তার মাকে ডাইনি বলছে, তার মায়ের যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, কুকীর্তি, মায়ের মিথ্যাচারিতা, কপটতার দিক উন্মোচন করছে পনেরো বছর বয়সে, এখানে যেমন ময়না চরিত্রের কদর্য অপরাধমনস্ক মনের পরিচয় পাই, পাশাপাশি একটি পনেরো বছরের মেয়ের মায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ, সৎ সাহস, প্রতিবাদী সত্ত্বা পরিলক্ষিত। মা-মেয়ে যেন দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমনস্ক নারী। মেয়েটি প্রথমে ভয় পেয়ে চুপ থাকলেও তার বাবার খুনিকে শাস্তি দেওয়া, তার মায়ের প্রতি প্রবল ঘৃণা, তার মা'র কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়াতে সে আওয়াজ তোলে। মেয়েটির ময়নাকে ডাইনি বলার মধ্যে তার পিতার খুনির প্রতি তীব্র ক্ষোভ পরিলক্ষিত।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে রচিত রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি' গল্পের আদিবাসী নারীচরিত্র— লাটুয়া ওঝার মেয়ে সুরমণি। গল্পে ওঁরাও, মুণ্ডা, খেড়িয়া, ভূমিজ, সাঁওতাল এই সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিশ্বাস লাটুয়া ওঝার ওষুধে এবং মন্ত্রের জোরে সাপের বা কাঁকড়া বিছের বিষও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মৃত মানুষও প্রাণ ফিরে পায় এই রকম নানান কুসংস্কার, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত আছে সমাজের প্রান্তবাসী দলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এই লাটুয়া ওঝার কন্যা সুরমণি, বাইশ-চব্বিশ বছরের যুবতী। অন্ধ লাটুয়া ওঝা কথককে কুকুরে কামড়ানোর জন্য নানা রকমের জংলী শিকড়বাটা দেয় এবং সুরমণিও তার বাবার সব নির্দেশ পালন করে। কথকও এই সমস্ত শিকড়বাটা নেয় এবং সুরমণির

হাতে দুটি রূপোর টাকা দেয় শিকড়ের মূল্য স্বরূপ। সুরমণি সে টাকা নিলেও পরের দিন সে কথককে সেই মূল্য ফিরিয়ে দেয়। শত অভাব-অনটন, দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও সুরমণি কথককে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে তার অন্ধ পিতার গোপন সত্য তুলে ধরে—

"ইটা ফিরায়ে লে বাবু, কাম হবে না তুয়ার, ই দাওয়াই মিছা বটে।"[৬]

সুরমণির মধ্যে প্রথমে সত্যিটা অবদমনের প্রয়াস থাকলেও পরবর্তীতে সত্যি কথা বলে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া, যে টাকাটা তাদের চরম অভাব-অনটনের সংসারে বড় সম্বল, যা সুরমণি চরিত্রের আত্মপ্রত্যয়ী, সরল-সৎ, সাহসী, আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলে। লাটুয়ার অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং অন্ধ বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, সুরমণি মিথ্যা কিছু ঘাসপাতা এনে তার বাবার ওঝাবৃত্তির কাজে দিয়েছে। একদিকে সুরমণি তার বাবার অস্তিত্বের সংকটে যেমন সন্তান হিসাবে বাবার অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তেমনই মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে কথকের সামনে সুরমণির এই সত্য স্বীকারোক্তি তার চরিত্রের সাহসিকতাপূর্ণ সততার দিকটিকে উন্মোচিত করেছে।

সুরমণি চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাবার প্রতি মেয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসার পাশাপাশি রয়েছে বাবাকে মিথ্যা বলার যন্ত্রণা, বাবার স্বপ্ন সে ভালো ওঝা হবে, সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে না পারার কষ্ট। প্রতিটা মানুষ একটা লক্ষ্যকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে, মানুষ সংকটে ইউটোপিয়াকে আঁকড়ে বাঁচে। তেমনই লাটুয়া অন্ধ হয়ে যাবার পর আশা করে তার মেয়ে সুরমণি তার অস্তিত্ব-পেশা রক্ষা করবে। লাটুয়া তার জীবনের গভীর সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সুরমণিকে আশ্রয় করে। সুরমণি তার বাবার কাছে ইউটোপিয়া। একদিকে সুরমণি তার বাবার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে সে নিজেই তার বাবার গোপন সত্যিটা সামনে আনছে। প্রথমে টাকা নিলেও পরে লোভ সংবরণ করে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া, এই দ্বিস্তরীয় বৈপরীত্যের রেখায় চিত্রিত সুরমণি চরিত্রটি কেবল চরিত্র হয়ে থাকেনি, সুরমণির পাথর-কালো যুবতী দেহের যেমন সৌন্দর্য, তেমনই তার মনও অনন্য সাধারণ সততার মূল্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে রচিত 'ইমলী' গল্পের আদিবাসী চরিত্রচিত্রণে ইমলী এক অনবদ্য ট্র্যাজিক ভাস্বর নারীচরিত্র। ইমলী জাতিতে বেদিয়া, সেও আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই জীবনের ঘর বাঁধার রঙিন স্বপ্ন দেখত নিজের মনের মানুষের সঙ্গে। একটা ঘর, যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী জীবন, নিজের একটা কাছের মানুষ এটুকুই, কিন্তু কোনোটাই তার পূরণ হয় না। সে যেন অসহায়, বিপর্যস্ত, লাঞ্ছিতমানবতার প্রতিনিধি। সুন্দরবন থেকে শহরে ইমলী ও তার জাতের মানুষরা মধু বেচতে আসে। সেখানে ইমলীর মন বাঁধা পরে ফালসার কাছে। কিন্তু সে তার নিজের লজ্জা-সংকোচবোধে ফালসার থেকে দূরে থেকে ফালসাকে হারিয়ে ফেলে। এখানে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের, নারীমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফালসার সঙ্গে একরাত কাটানোয় একদিকে ইমলীর মনে একটা অন্যরকমের ভালো লাগার পরশ আবার অন্যদিকে সে নিজেকে 'বেশরম' মনে করে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এক অদ্ভুত দ্বিধা-দোলাচলের চিত্র স্পষ্ট। সে নিজের স্বভাব-লজ্জার কারণে ফালসাকে হারিয়ে একাকীত্বে, অসহায়তার চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে সে ভিক্ষা করে, লোকের বাড়ি কাজ করে পেট চালাতে চায় কিন্তু তা হয়না। বাস্তব বড় নির্মম। সে কোথাও কাজ পায় না, সকলেই চোর ভাবে। কলকাতা শহরের বুকে দাঁড়িয়েও ইমলীর কোনো কাজ না পাওয়ার যে কারণ তা আধুনিক সমাজে আদিবাসী নারীদের অবস্থান, তাদের নিয়ে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের ভাবনাচিন্তার বাস্তবরূপ লেখক তুলে ধরেছেন। যতই সভ্য সমাজ নারীপ্রগতি, সমানাধিকারের কথা বলুক, মুখের আড়ালে যে মুখোশ আছে আর সেই মুখোশের আড়ালে মানুষের মানসিকতা ঠিক কীরূপ তা পরিস্ফুট—

> "কাজের চেষ্টায় অনেক ঘুরেছে, আর নয়। কেউ সন্দেহ করেছে চুরি করে পালাবে, কেউ ভেবেছে ঘরে উঠতি বয়সের ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কলকারখানাতেও কোনও কাজ জোটেনি।"[৭]

সমাজের নির্মম বাস্তব মানসিকতার প্রতিচ্ছবি প্রতীয়মান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইমলী যে লজ্জা-সঙ্কোচবোধের কারণে সে তার মনের মানুষকে হারিয়ে ফেলে, পেটের দায়ে সেই লজ্জাকেই তার বিসর্জন দিতে হয় রাতের ছায়া শরীরের কাছে। এখানে শহরে রাতের ছায়াপথের অন্ধকার নগ্ন বাস্তবরূপ পরিস্ফুট। ইমলী প্রথমে মন থেকে ধাক্কা দিয়ে ছায়াশরীরকে সরিয়ে দিতে চাইলেও পেটের দায়ে তা পারে না, পরে আবার সে সেই ছায়াশরীরের জন্যই অপেক্ষা করেছে। ইমলীর এই আচরণে মনে হতেই পারে চরিত্রে ফ্রয়েডের লিবিডোর প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু কথাতেই আছে 'খিদের জ্বালা বড় জ্বালা' — একথা যেন ইমলীর গল্পে ভীষণ ভাবে সত্যি। এই সত্যির থেকে বড় সত্যি যেন আর কিছু নয়। ইমলীর জীবন প্রসঙ্গে মনে আসে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন-

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।।"

এ কথার সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারে ইমলীর মতো মেয়েরা তাদের জীবন দিয়ে। আসলে এক্ষেত্রে ইমলীর মানসিকতায় পাভলভীয় 'নিমিত্তবাদ' মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। মনোবিজ্ঞানী পাভলভ মনে করেন, মানুষের সব মননক্রিয়ার সঙ্গে তার সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং অবস্থিতি সম্পর্কযুক্ত। সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আর কোনো উপায় না থাকায় ইমলী দেহ ব্যবসার মত ঘৃণ্যপথ, ঘৃণ্যবৃত্তি বেছে নিতে হয়। যা সে নিজেও প্রথমে চায়নি কিন্তু খিদের তাড়নায় বাধ্য হয়ে তাকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইমলী কখনই নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে এই পথে আসেনি, তাই এক্ষেত্রে তার মধ্যে ফ্রয়েডের নয় বরং পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। সে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে এই বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় খাদ্য সংস্থানের জন্য উদ্বাস্তু শিবিরে গেলে সেখানেও সে লাঞ্ছিত হয়ে সে যেন সর্বস্বশূন্য হয়ে পড়ে। সামাজিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, জীবনের চরম সংকটের লড়াইয়ে সর্বস্বশূন্য বোধে ইমলী মর্মস্পর্শী এক ট্র্যাজিক নারী চরিত্র।

লেখকের 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পের আদিবাসী নারী চরিত্র রূপমতী সোরেনের রেবেকা সোরেন হয়ে ওঠায় আলোকপাত করা হল। গল্পের প্রথমেই দেখা যায় 'ভিখারিয়ার নাচ' নামক এক আদিবাসী উৎসবের নামে সেখানে মেয়েদের অপমান করা হয়, মেয়েদের নামে নানান অশ্লীল ছড়া বা গান গাওয়া হয় গোটা গ্রামের সামনে। কিন্তু সমাজের কোনো একটা মানুষও এর কোনো প্রতিবাদ করে না। এখানে আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান ঠিক কীরূপ তা স্পষ্ট। সমাজের কাছে মেয়েরা কেবল ভোগ্য-পণ্য বস্তু রূপে চিহ্নিত, কেবল 'এন্টারটেইনমেন্ট'— গল্পে সেই বাস্তব নির্মম রূপ সুস্পষ্ট। এই ভিখারিয়ার নাচে যখন রূপমতীকে নিয়ে অশ্লীল গান-কথা বলে গ্রামের মানুষ, তখন রূপমতীর প্রেমিক লালোয়া কুড়ুখ নিজের রাগ সামলাতে না পারায় মারামারি শুরু হয়। সেখানে রূপমতীর কোনরকম দোষ না থাকা সত্ত্বেও যেহেতু সে নারী, তাই সমাজের চোখে সে দোষী, পাপী হিসেবেই গণ্য। আদিবাসী সমাজের নিয়মানুযায়ী তাদের যে নিজস্ব পঞ্চায়েত থাকে, সেই পঞ্চায়েতে গ্রামের মাতব্বররা রূপমতীকে 'বিটলা' রায় দেয়, যা সাঁওতাল সমাজে এক নারীর জন্য চরম শাস্তি। সাজাপ্রাপ্ত নারীকে সমাজচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পুরুষরা তাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করে সেই নারীর সম্মান নষ্ট করে। এই বিটলার অমানবিক নির্যাতন, অপমান-আক্রমণের হাত থেকে ম্যাকুসাহেব রূপমতীকে, সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঁচায়, বিবাহ করে। রূপমতী সোরেন থেকে সে পরিণত হয় রেবেকা সোরেনে।

রূপমতী ওরফে রেবেকার জীবনের দুটো স্তর দেখা যায়। প্রথমত লালোয়া কুড়ুখের প্রতি রূপমতির একনিষ্ঠ প্রেম, নিজেদের ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। রূপমতী ভিখারিয়ার নাচের বাস্তব বর্বরোচিত ব্যবস্থার কথা জানার পরও সে শুধুমাত্র লালোয়ার জন্য ওই মেলার পথে পা বাড়ায়। এখানে রূপমতির লালোয়ার প্রতি গভীর প্রেম পরিস্ফুট। পরবর্তী দ্বিতীয় স্তরে আদিবাসী সমাজের চোখে 'বিটলাহা' হওয়ার পর রূপমতীর ম্যাকুসাহেবের স্ত্রী রেবেকা হয়ে, তার স্বামীর প্রতি অটুট বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ছবি ব্যক্ত। ম্যাকুসাহেবকে রূপমতী নিজের চরম দুঃসময়ে পাশে পেয়েছিল, তাকে অপমান-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, এই কারণে রেবেকার মনের গভীর থেকে ম্যাকুর প্রতি তার যে গভীর বিশ্বাস-শ্রদ্ধাবোধ জন্মেছিল, তার এই বিশ্বাস সে আমৃত্যু দৃঢ় রেখেছে। ম্যাকুসাহেব তার পিতার কথায় রেবেকাকে ফেলে চলে যাওয়ার সময় এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, রেবেকা তার পুত্রসন্তানকে অবলম্বন করে ম্যাকুর প্রতি অগাধ আস্থা-বিশ্বাস-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভরসায় আমৃত্যু স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে গেছে। রেবেকার দৃঢ় নারীসত্তার পাশাপাশি সেই মানুষটা যে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছিল, নিজের স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-আস্থার চিত্র উদ্ভাসিত।

কালজয়ী প্রেম মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল এই রেবেকা চরিত্রটিকে তার মনোভাবনা দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কী অসম্ভব দৃঢ় চরিত্রের নারী সে। সে মন-প্রাণ দিয়ে যখন লালোয়াকে ভালোবেসেছিল তখন তার লালোয়ার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, আবার রূপমতীকে যেদিন বিটলা ঘোষণা করা হয় তখন সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লালোয়া রুখে দাঁড়ায়নি বা তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। সেদিনই যেন রূপমতি লালোয়াকে মন থেকে মুছে ফেলে, তার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে—

"ওটা মরদ বটেক, না ধুমুড়িয়ার কুড়ী? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে?"[৮]

এরপর সোনামিরু ও লালোয়ার হাজার মিনতিতেও রূপমতী লালোয়াকে আর কখনও গ্রহণ করেনি। যে পুরুষ তার সম্মান বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি মন থেকে সেই ভালোবাসা; সেই পুরুষের প্রতি এক ধিক্কার, রাগ, প্রত্যাখ্যান। যে সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যায়, সেই সম্পর্ক, সেই মানুষের প্রতি আর কোনো ভাবনা আসে না, সেখানে আর কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না, এর জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি রূপমতি ও লালোয়ার সম্পর্ক। 'ফিরবো রে, ফিরে আসবে'- এই বিশ্বাসে ম্যাকুসাহেবের প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ, শ্রদ্ধা-আস্থা নিয়ে সে আমৃত্যু অপেক্ষা করে থাকে। এই শ্রদ্ধাবোধই রূপমতীর ম্যাকুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, ভালোবাসা, বিশ্বাসের অন্যতম পরিপন্থী।

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল-এর তত্ত্বানুসারে মানুষের মধ্যে ভয়ের অনুভূতি থেকে 'পলায়নী প্রবৃত্তি' জন্মায়। কিন্তু রূপমতী বিটলার অত্যাচারের কথা ভেবে 'পলায়নী প্রবৃত্তি' গ্রহণ করে না, সে বিটলার ভয়কেও হার মানায়—

> "হোক বিটলা। পট্টি ভালো ওর। ...আর, আর বুড়ো বাপ মাধা সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী?"[৯]

বরং লালোয়া চরিত্রে এই পলায়নী প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত লভ্য। রূপমতী চরিত্রে দৃঢ়, প্রতিবাদী নারীসত্তার পাশাপাশি যেমন এক প্রেমিকার চিরন্তন মূর্তি ভাস্বর তেমনই তার পিতার প্রতিও নিখাদ ভালোবাসা দৃশ্য প্রতিবিম্বিত। রূপমতী চরিত্রের মনোজগৎ বিশ্লেষণে আমরা মানবমনের বিচিত্র স্তরের হদিশ পাই। রূপমতী কন্যা হিসাবে, প্রেমিকা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এক আদর্শ নারী চরিত্র। রূপমতী ওরফে রেবেকাকে ছেড়ে ম্যাকু চলে গেলেও সে তার স্বামীর সম্মানের কথা ভেবে কোলিয়ারির খাদানে কাজে যোগ দেয় না। সমাজের যে মানুষরা তাকে সমাজচ্যুত করার পরিকল্পনা করেছিল, রূপমতী থেকে রেবেকা হতে বাধ্য করেছিল; নিজের পরিবার থেকে দূরে করেছিল, রেবেকা যেন তাদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে, তার পবিত্র দৃঢ়চিত্তের সত্তাকে, আত্মসম্মানকে নষ্ট করতে চায় না। সে এই কলুষিত সমাজের কাছে ফিরে নিজের নারীসত্তার অপমান করতে চায় না, বরং তার থেকে সে না খেয়ে মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মনে করেছে। লালোয়া রূপমতী নামের যে প্রদীপ জ্বালাতে ব্যর্থ, সমাজ যে রূপমতীকে রেবেকা বানিয়েছে, সেই রূপমতী-ই নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে গোটা সমাজের বুকে এক নিরুচ্চার প্রতিবাদ রেখে গেছে। রেবেকার নিরুচ্চার প্রতিবাদে ভাষা না থাকলেও প্রতিবাদের তীব্রতা গভীর মননে দাগ কাটে। তার মৃত্যুকে এক আত্মহত্যা ও সমাজ দ্বারা হত্যাও বলা যায়। রূপমতী চরিত্রের ন্যায় দলিত, আদিবাসী অনেক নারীকে সমাজের এরকম কুপ্রথা 'বিটলাহ'-র বলি হতে হয়। সকলের ভাগ্যেই এরূপ নিদারুন কষ্ট, অপমান, দুর্ভোগই বরাদ্দ থাকে। আদিবাসী নারীদের উপর হয়ে চলা বর্বরোচিত অত্যাচার, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং একটা ঘুণধরা সমাজকে তীব্র প্রত্যাখান, রূপমতী ওরফে রেবেকা চরিত্রের দৃঢ় নারী চেতনা, প্রতিবাদী-সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী নারীসত্তা স্বমহিমায় ভাস্বর। ত্যাগের মহিমায়, প্রতিবাদের স্বতন্ত্রতায় রূপমতী কেবল গল্পের চরিত্র রূপে আবদ্ধ থাকে না, উত্তরিত হয় অপরাজেয় নারী প্রতিভূ রূপে।

'তিনতারা' গল্পে আদিবাসী রমনী লখিয়া চরিত্রটি অদ্ভুত শক্ত ধাতের, রহস্যময়ী নারী। তার বিয়ে হয় প্রথম তাদের দলের সর্দার বুড়ো রতনলালের সঙ্গে, কিন্তু সে পরে শাঁওনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। লেখক কেবল হৃদয়াবেগের রঙীন ফানুসের চিত্র আঁকেননি পাশাপাশি বাস্তবের কঠোরতাও চিত্রিত। যৌবনোচ্ছল লখিয়া যেমন ভালোবাসে উদ্দামতার সাথে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 115 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তেমনই ঘর ভাঙতেও সময় নেয় না। অনুপমের প্রতিও লখিয়ার এক অদ্ভুত মোহ-টান, তা কেবল দৈহিক, এর অন্তরালে রয়েছে কেবলই যেন যৌন কামনা-বাসনা। গল্পে একদিকে স্বার্থান্বেষী তথাকথিত ভদ্রলোকদের পাশাপাশি বয়ে চলে খুনী আসামী শাঁওন ও লখিয়ার উদ্দাম জীবন। আদিম মুক্ত, যৌবনোচ্ছল, বাঁধন না মানা ভালোবাসা-প্রেম-মোহ চিত্রিত। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে, আমাদের জীবনের যাবতীয় ইচ্ছা, চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের মূলে রয়েছে যৌন প্রবৃত্তি বা *Libido.* লখিয়া চরিত্রেও যেন ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের ছায়াই বর্তমান। এব্যাতীত লখিয়া চরিত্রটিতে ভিন্নমাত্রার স্তরীয় বিন্যাস লক্ষ্যণীয়- প্রথমত সে একজনকে বিবাহ করে, আবার তাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সাথে পালিয়ে যায়, দ্বিতীয়ত সে শাঁওনের কাছে প্রহারিত লাঞ্ছিত হলেও শক্ত হাতে প্রতিবাদ করে না, তাকে পরিত্যাগও করে না, তৃতীয়ত সে ইজারাদারদের তার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিকে উপভোগ করে, চতুর্থত সে অনুপমের সাথেও দৈহিক কামনা-বাসনার তাগিদে এক সম্পর্কে জড়ায়। লখিয়া চরিত্রে মনোজগতের অপ্রকাশ্য জটিল মনস্তত্ত্বের এক গুঢ় রহস্যময়তার চিত্র পরিস্ফুট।

লেখকের ‘ঝুমরা বিবির মেলা’ গল্পটিতে বর্ণিত আদ্যপ্রান্ত আদিবাসী মানুষদের কুসংস্কার, যুক্তিবুদ্ধিহীন অন্ধবিশ্বাসের কথা, মনগড়া নানান আজগুবি গল্পকথা যা গ্রামের মানুষদের মননের গভীরে নিহিত। এই গল্পে বাৎসল্যের এক আশ্চর্য আখ্যানের পাশাপাশি গল্পটির গভীর দর্শনে পরতে পরতে উঠে আসে মানব মনের অপার রহস্য। ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছেলেকে জীবনে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে ডাকাত বুধনের পিতা বৃদ্ধ মিঞা মাঝি নিজে ফাঁসির শাস্তি নিতে চায় খুনের মিথ্যা দায়ে বিনা অপরাধে।

এই গল্পের মূল নারীচরিত্র যার নামেই এই গল্প— ঝুমরা বিবি, যাকে গ্রামের লোক বিনা অপরাধে ডাইনি বলে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে। ঝুমরাবিবি চরিত্রের পরিণতির মধ্যে দিয়ে লেখক আদিবাসী সমাজের কুসংস্কার, যুক্তিজ্ঞানহীন বিশ্বাসের অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন। ঝুমরা এমন এক নারী চরিত্র যে আদিবাসী সমাজের শোষিত-লাঞ্ছিত, বিনা অপরাধে দোষী ও অপবাদের কারণে নির্যাতিত নারীদের প্রতিনিধি স্বরূপ। বিধবা হয়েও সে তার থেকে বয়সে দশ বছরের ছোট মিঞা মাঝির ছেলে বুধনের সঙ্গে প্রেম করে। আবার বেঁচে থাকার জন্য ঝুমরা নিজের মেয়ে আসমিনাকেও সে বুধনের হস্তগত করে। পারিপার্শ্বিকতার কারণে ঝুমরা আসমিনাকে বুধনের হাতে সমর্পণ করলেও সে বুধনকে ভালোবাসতো একথার ইঙ্গিত মেলে যখন সে শোনে মিঞামাঝি বুধনকে হত্যা করেছে এবং সেই কারণে সে কেঁদে পড়ে। এই কান্না বুধনের মৃত্যুর জন্য কান্না, নাকি নিজের মেয়ের খুনীর শাস্তির জন্য কান্না তা অস্পষ্ট। তবে ঝুমরা চরিত্রটিকে বিশ্লেষণে প্রথমেই মনে হয় ফ্রয়েডের লিবিডোর প্রকাশ অর্থাৎ বিধবা হওয়া সত্ত্বেও ঝুমরা নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কমবয়সী পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত। কিন্তু আরও তলিয়ে ভাবলে ঝুমরা ও তার মেয়েকে যখন গ্রাম ছাড়া হতে হয় ডাইনি অপবাদে, সমাজ তাদের সামান্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অধিকারটুকুও কেড়ে নেয় তখন বুধন তাদের খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। ঝুমরা এবং তার মেয়ের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ তখন বুধন। এখানেও স্পষ্ট আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের দুর্ভোগ-দুর্দশার নির্মম চিত্র। এক্ষেত্রে ঝুমরা বিবির মননে মনোবিজ্ঞানী পাভলভের ‘নিমিত্তবাদ’-এর মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল একথাও বলতে পারি। কারণ পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে ঝুমরা নিজেকে এবং তার মেয়েকে বুধনের হাতে সঁপেছিল। এই গল্পের ঝুমরাবিবি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে অপার রহস্যময় চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি প্রান্তিক আদিবাসী সমাজের মানুষদের মনে প্রোথিত অন্ধ কুসংস্কারের বীজ কতটা গভীরে প্রোথিত তা প্রতীয়মান। এই গল্পের পরিণতির নির্মিতির সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে একটি ঘটনাবৃত্তের মিথ হয়ে ওঠার দুরূহ জটিল প্রক্রিয়া।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের সৃষ্টিসম্ভার বিপুল না হলেও তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখা সচেতন শিল্পী মনের অভিজ্ঞান। সর্বোপরি আলোচনার পর একথা বলা যায়, আমাদের আলোচ্য প্রতিটা গল্প সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্যতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই প্রবন্ধে রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে দলিত আদিবাসী নারীদের সামাজিক অবস্থান চিত্রের পাশাপাশি আদিবাসী নারী চরিত্রের স্বরূপ, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানব জীবনের অপার রহস্য চেতনায় মুখর মানব মনস্তত্ত্বের স্তরীয় বিন্যাসের অনুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে দলিত, আদিবাসী নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

Reference:

১. দেব, রণজিৎ, *আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস,* কলকাতা, পারুল বই, ২৭ আষাঢ় ১৪২৮, পৃ. ১৪
২. চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২১৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

Bibliography:

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ:

ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *পাভলভ পরিচিতি,* কলকাতা: পাভলভ ইন্সটিটিউট, জানুয়ারী, ২০১৭
রমাপদ চৌধুরী, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর, ২০১৭
দেব, রণজিৎ, *আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস,* কলকাতা: পারুল বই, ২৭ আষাঢ়, ১৪২৮
সরকার, সুনীল কুমার, *ফ্রয়েড (Freud : life and psychoanalysis),* কলকাতা: তৃতীয় সংস্করণ. জুলাই ১৯৫৯

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ:

G. STANLEY HALL, *A general introduction to psychoanalysis by Sigmund Freud,* Global grey, 2018

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 124 - 135
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে মিথ-পুরাণের অনুসন্ধান

ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম
Email ID : saifulphd@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Myth, Archetype, Scarcity, Partition, Quran, Psychoanalysis, Fairy tale, Folklore, Motherhood.

Abstract
The purpose of the present research article is to explore how the spirit of Myth and 'Purana' has been instrumental in the formatiuon of Sayed Waliullah's Short Stories. The core of the writer's literary work was to highlight the true truth and conflicts of the religious life of middle and lower middle classes of the Muslim society of East Pakistan. Waliullah's philosophy of life, character creation and artistic consciousness have been revealed to us through the discussion of selected stories such as 'Nayanchara', 'Parajoy', 'Mrityu yatra', 'Rakta', 'Dui-Tir', 'Ekti tulsi gacher kahioni', 'Ston', 'Na kande bubu'. In judging the Myth, we have explored the surprising truth about the storyteller Waliullah's artistic awareness. This awareness comes from ancient Indian, that is, Hindu Myths and Arabian Myths— mythology and historical knowledge. Waliullah's Short Stories have not been discussed in the light of Mythology before, so our discussion explores the identity of author's work, its aesthetic and philosophical appeal and its innovation. Our discussion covered the literature of Bangladesh and East Pakistan, the literary identity of Sayed Waliullah, the identity and criticism of Myths and legends and the analysis of Stories in that context.

Discussion

এক

ভূমিকা : তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) তাঁর ছোটগল্পে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করেন টুকরো টুকরো কোলাজে, মিথের ব্যবহারে ও জাগরণে অনড় কেন্দ্রবিন্দুগুলি ভেঙ্গে দিয়ে প্রতীকী তাৎপর্যে। লোকায়ত জীবনের ইতিহাস ও 'মিথ' বা মাইথলজিকে আশ্রয় করে তাঁর লেখনি নির্বিকার উচ্চারণ হয়ে উঠেছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবৎকালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন শ্রেষ্ঠ ও ভিন্নরুচির বাঙালি লেখক হিসাবে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বাংলা উপন্যাসে তাঁর মূল্যবান অবদান— 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'র মতো উপন্যাস। নাটক ও প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাঁর মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ— 'নয়নতারা' (১৯৪৪), এবং 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প', (১৯৬৫)। গ্রন্থবদ্ধ ও অগ্রন্থিত গল্প নিয়ে পঞ্চান্নটির মতো গল্প বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র অবস্থান ও অবদান চিহ্নিত করে দেয়।[১]

তাঁর ছোটগল্পের পাত্র-পাত্রীরা মার্জিত, রুচিসমৃদ্ধ, সংস্কৃতিবান হয়েই একাকিত্ববোধে বিপন্ন, অন্তরের গভীরে অনিকেত চেতনায় আক্রান্ত। আর এখানেই পুরাণ ও প্রত্নপ্রতিমার বীজ উপ্ত হয়েছে। মূলত, বাঙালি-মুসলমান সমাজের অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা নির্মাণের জীবন সংকট, চৈতন্যের সংকট ও মননের সংকট ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে মিথ-পুরাণের পুনর্নির্মাণ শৈলীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মিথ সম্পর্কে সমালোচক বলেন—

> "মিথ শব্দটি গ্রিক 'মুথস' থেকে উৎপন্ন। 'মুথোস' বলতে বোঝায় সেই বাচন যাকে অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত না করে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে মিথ হল একটি বিশেষ বাচনপদ্ধতি। ...মিথগুলি আসলে ক্রিয়াশীল সত্তারূপে সমাজে বিরাজ করে। সমাজকে বেঁধে রাখে, ঐতিহ্যগত মতাদর্শ, মানবিক ব্যবহার প্রভৃতির আদর্শ জিইয়ে রেখে সামাজিক পরম্পরাকে ধরে রাখে। মিথের মধ্যে আমরা পাই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের উপস্থাপনা অর্থাৎ ইতিহাসের বিশেষ গতিপথ দিয়েই আসা জীবনের দাবিদাওয়া, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা।"[২]

'মিথ' ব্যবহারের তিনটি দিক— সরল ব্যবহার, সৃষ্টি ও ধ্বংস। বাংলা সাহিত্যে 'মিথ' ভাঙার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য'। 'মিথ' ব্যবহারের প্রক্রিয়া মূলত সচেতন। যদিও, অনেক সময়েই লেখকের অজান্তে 'মিথ' তাঁর লেখায় প্রবেশ করে। দেশ-বিদেশের পুরাণকথা, লোককথা ও কিংবদন্তি এমনকি ইতিহাস প্রসঙ্গও 'মিথ' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যার দ্বারা সাহিত্য আর কোনো একজন পাঠকের কথা-অনুভব হয়ে থাকে না, তা সমষ্টির চেতনা দ্বারা জারিত হয়; ব্যক্তির সংকট সার্বজনীনতা লাভ করে। 'মিথ' তৈরি মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। পুরাকালে প্রকৃতির নানা রূপকে ব্যাখ্যা করবার জন্য যেমন দেবদেবীর মিথ তৈরি হয়, তেমনিই বর্তমানেও সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে মানুষ নিজের মনেই নানা মিথ তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে কার্ল ইয়ুং-এর মন্তব্য স্মরণীয়—

> "The unconscious mind is capable at times assuming an intelligence and purposiveness which are superior to actual conscious insight."[৩]

ইয়ুং এর 'কালেকটিভ আনকনসাস' বা সামূহিক নির্জ্ঞানের মধ্যে আদিম মূর্তিটি লুকিয়ে থাকে, আর চেতন মানসিকতায় তার ব্যাখ্যা উঠে আসে প্রাসঙ্গিক গল্প-কাহিনির অনুসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত তার 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> "মিথের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের হদিশ মেলে, এমন কথা হয়তো অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে—কিন্তু এটাও ঠিক যে, মিথের মধ্যে একটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিকাঠামোটি নিবিড়ভাবে মিশে থাকে। উত্তরকালে তার ওপরেই গড়ে ওঠে সাহিত্যের বহুবিচিত্র হর্ম্য-সৌধ-প্রাসাদ-অট্টালিকা। মিথের আদিরূপটির মধ্যে ধর্মাচার, দেবতাকল্পনা এবং বিচিত্র ধরণের সংস্কার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে, আর উত্তরকালের কবি-শিল্পীরা সেই উপকরণগুলিকে চয়ন-বর্জন করে নিজেদের সমসাময়িক জীবনধারার লব্ধফল যে সব ধ্যানধারণা তার সঙ্গে মানানসই করেই নতুন-নতুন কাহিনী সৃষ্টি করেন।"[৪]

ব্যক্তিপ্রতিভা কল্পনাশক্তি দিয়ে ঐতিহ্যের মাটি থেকে রস আস্বাদন করে যে ফুল ফোটান, তা হয়ে উঠে এক একটি 'প্রত্নপ্রতিমা' বা 'Archetype', সমালোচক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যের মতে —

> "এই ভাবেই কোনো দেশের সামূহিক লোকবিশ্বাস বা সামগ্রিক নির্জ্ঞানে সঙ্ঘবদ্ধ থেকে উদ্ভূত হয়ে কবির ব্যক্তিচৈতন্যের মর্মমূলে অধিষ্ঠিত হয়, আর সেই চৈতন্যের গভীরতল থেকে কখনও কখনও কাব্যের উপরিতলে উঠে আসে সেই সব প্রত্ন-প্রতিমা নব নব চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনাবাহী প্রকাশরূপে।"[৫]

মিথ ও আর্কেটাইপ-এই দুইয়ের মধ্যেই অলৌকিক রসের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু মিথের মধ্যে সেই অলৌকিক রস যেমন মানবনিয়তি ঘনিষ্ঠ, লোকগল্প ও আর্কেটাইপের মধ্যে তেমন নাও হতে পারে। ডি.ডি. কোশাম্বি তাঁর গবেষণা গ্রন্থ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'Myth and Reality'তে দেবভাবনার উৎস বিবেচনায় প্রাকৃতিক ঘটনাকে চিহ্নিত করেছেন। সমালোচক এম. এইচ. আব্রামস 'A Glossary of Literary Terms' গ্রন্থে বলেছেন,- "Most Myth are related to social rituals—set forms and procedures in sacred ceremonies." এই ব্রতাচার ও কৃত্যজাত মিথিক উপাদানের ব্যবহার ওয়ালীউল্লাহের রচনায়ও দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মেরও প্রাচীন এই পুরাকথাকে আব্রামস্‌ এইভাবে ব্যাখ্যা করেন—'It can be said that a mythology is a religion in which we no longer believe." এই পুরাকথা নানা দেশ ও জাতির সংযোগকে চিহ্নিত করে। গভীরভাবে পুরাকথার সংযোগ (Deep structure জাত) পিতৃপুরুষ ও দৈবসত্তার নিকটবর্তী হয়ে উঠে। গিলবার্ট মারে একেই 'ইন্টারন্যাল ডিউরেবিলিটি' বলে চিহ্নিত করেন। আর্কেটাইপের ব্যাখ্যায় জে. এ. কুডন সাম্প্রতিক Cultural Anthropology চর্চার প্রসঙ্গ এবং ইয়ুং-ফ্রয়েডকে অনুসরণ করেই বলেছেন—

> "An archetype is a vestie and universal, the product of a collective unconscious and inherited from our ancestor. The fundamental fads of human existence are archetypal: birth, growing up, love, family and tribal life, dying, death, not to mention struggle between children and parents and fraternal rivalry."[৬]

পুরাণপ্রতিমা অর্থাৎ মিথ এবং আর্কেটাইপের এই পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোচনায় প্রবেশ করব। তবে, বর্তমান আলোচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কিভাবে আধুনিক জীবনসঙ্কট ও অন্তর্বিরোধের বর্ণনায় মিথের ব্যবহার করেন তা অনুসন্ধানই হবে আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। এখানে একটি কথা স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের অভিভাষণে বলেছেন, - "আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব সমস্যাই চিরকালের।" এখানেই মিথের সার্বজনীন আবেদন— চিরনতুন ও চিরপুরাতনের মেলবন্ধন ঘটেছে।

দুই

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম আত্মপ্রকাশ 'নয়নচারা' গল্পে, পূর্বাশা পত্রিকায়।[৭] ১৩৫০ মন্বন্তর ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-এর পটভূমিতে ওয়ালীউল্লাহ তিনটি গল্প লিখেছেন— 'নয়নচারা', 'মৃত্যযাত্রা', ও 'রক্ত'। প্রথম গল্পটিতেই ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল মনোবাস্তবতার শিল্পাঙ্কনে।

'নয়নচারা' গল্পে, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে আমু ও তার মতো আরো অনেকে একমুঠো খাদ্যের আশায় গ্রাম ছেড়ে এসে কলকাতা শহরের পথে পথে ঘূর্ণমান ছিল।[৮] তাঁর গল্পে কখনোই মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়, মানবিক নীতি-আদর্শের সর্বাত্মক ব্যত্যয় ও স্খলন কিংবা জৈব-পঙ্কিলতার কোনো মনোহর ছবি উপস্থাপিত হয়নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা' গল্প তাঁর এই সুস্থির ও আদর্শায়িত এবং দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ব্যক্তির চেতনাপ্রবাহআশ্রিত, অনুভূতিমগ্ন রূপের শিল্পকথা। এই গল্পে আমরা 'আমু'কে শৈবপুরাণের শিবের অনুষঙ্গীভাবে দেখতে পাই। বিশেষত লোকপুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের ভিখারি শিবের ভিক্ষা ও অন্নপূর্ণার অন্নদান প্রসঙ্গের ছাপ এই গল্পে লক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাথে ব্যক্তির চূড়ান্ত সঙ্কটের সময়ে—শিবের বিষের জ্বালার চেয়ে বড় হল পেটের জ্বালা—'অন্নদামঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্র তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। 'নয়নচারা' গল্পের শিব-রূপ আমু চরিত্রটির কাছে, "এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উম্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।" মৃত্যকে জয় করে যে, সে-ই মৃত্যঞ্জয়। অর্থাৎ জিতপুত্র, মৃত্যহীন, অমর। পুরানের পাঠে আমরা জানি—

> "অধর্মের স্ত্রী 'হিংসা', ছেলে 'অনৃত' এবং 'নিকৃতি'। এদের থেকে জন্মায় ভয়, নরক, মায়া ও বেদনা। মায়ার ছেলে মৃত্যু। মৃত্যকে বহু জায়গায় নারীও বলা হয়েছে।"[৯]

'শিব' মৃত্যকে জয় করেছিলেন, এখানে 'আমু'র মধ্যেও সেই চেতনা কাজ করছে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে গ্রাম ছাড়া 'আমু' ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পথে-পথে, দোরে-দোরে ঘুরে ফেরে একমুঠো খাদ্যের প্রত্যাশায়। কাহিনিতে দেখি, তার "গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে, এবং যখন সে আর্তনাদ শূণ্যতায় মুক্তি পেল, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেল, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনাল তা। এ কী তার গলা— তার আর্তনাদ?"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যযুগের কাব্য পূর্বে উল্লেখিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' শিবের ভিক্ষাফল যা মিলেছে, তা হল—

"সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব।।
কি জানি কি দিব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছে আকুল।।"

গল্পটিতে আমরা দেখি, কোথাও ভিক্ষা পায় নি আমু, তাকে সকলে দেখেও না দেখার ভান করে। শহরের ধনতন্ত্রের আগ্রাসী মানুষদের কাছে এরা যাই হোক না কেন; 'আমুর' কাছে বিচিত্র স্বার্থপর এই শহরের সব মানুষ। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আড়ষ্ট আমু খোয়াব অর্থাৎ স্বপ্ন দেখে—

> "লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে; রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিঞার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নীচেটা সাদা, এত সাদা সে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্য খাঁ-খাঁ করে উঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে।"[১০]

আমুর এই খোয়াব অর্থাৎ স্বপ্ন তার মনোসমীক্ষায় ধরা পড়ে—শিবের অন্ন মেলে অন্নপূর্ণার কৃপায়। আমুর ক্ষেত্রেও বাস্তবে যা ঘটে—'অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপল, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বলল নাও'। অন্নপূর্ণার সম্পর্কে আমরা জানি—

> "অন্নপূর্ণা—শক্তির একটি রূপ। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রানুসারে এই পূজার নিয়ম দেওয়া আছে। দেবী রক্তবর্ণা, বচিত্র বসনা, স্তনভারনম্রা, অন্নপ্রদান নিরতা ও ভবদুঃখহন্ত্রী। তাঁর মাথায় বালচন্দ্র। নৃত্যপরায়ণ শিবকে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হ্ন, চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে তাঁর পূজা হয়।"[১১]

উল্লেখ্য স্বপ্নের লালপেড়ে শাড়ি, রক্ত ও দেবীর 'রক্তবর্ণা' ও 'হাতে অন্নপাত্র' ও অন্নদান-স্বপ্ন, বাস্তব ও পুরাণ প্রতিমা একাকার হয়ে গিয়েছে এই গল্পে। ওয়ালীউল্লাহ 'নয়নচারা' গল্পে পুরাণ প্রসঙ্গকে এইভাবেই রূপকের ব্যবহার দ্বারা বর্তমান যুগ ও জীবন-সংকটকে, দুর্ভিক্ষের বাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন।

মন্বন্তরের সর্বব্যাপী শূন্যতা এ গল্পের অপর চরিত্র ভুতনির ভাই 'ভুতো' কে গ্রাস করেছে। তার মৃত্যু প্রতিভাত হয়েছে কাব্যিক ব্যঞ্জনায়— "মরছে মরছে কথা দু-রঙ্গা দানায় গাঁথা মালা।" ভুতো প্রসঙ্গে গড়ুরের সমুদ্রে আত্মবিসর্জনের প্রত্নছাপ এক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়ে। আবার, 'নয়নচারা' গল্পে ইসলামিক আজরাইল মিথের[১২] বারংবার ব্যবহার দেখা যায়। এই মৃত্যু ও পাপের বাহক শয়তানের প্রসঙ্গ—

> "লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। ...শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে, শুধু এই বিস্ময়-ই; ভয় করে না একটুকুও; বরঞ্চ সে (আমু) যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করার জন্য অপেক্ষমান। ...পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারও কোনো আপত্তি নেই...।"[১৩]

কোরান শরীফের সৃষ্টিতত্ত্বে এই শয়তানের কথা আছে। শয়তান মানুষের পদস্খলন ও পাপে নিমজ্জিত হতে অনুপ্রেরণা দেয়। কোরানের ২নং পারার ২১ রুকু-এর ১৬৮ নং আয়াত বা বাক্যে বলা হয়েছে, "শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" কোরানে আল্লাহর অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।

এখানে উল্লেখ্য 'আমু'র জীবনে মন্বন্তর ও বিশ্বযুদ্ধের নঞর্থক বীভৎসতার হাহাকারে নির্লিপ্তি প্রাপ্তি ঘটেছে। কৃষির দুর্বলতা, গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে ভাঙন, শিল্পে মন্দা, শহরমুখী উদ্বাস্ত জনতার ভিড়, মহামারি, রোগের সংক্রমণ, আধুনিক নগর সভ্যতার আত্মকেন্দ্রিকতা ও মূল্যবোধের অবমূল্যায়ণ, গ্রাম ছেড়ে আসা এই সহজ-সরল ধর্মমুখী মানুষগুলোর অস্তিত্বে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এমন সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, যেখানে একমুঠো খাদ্য, সর্বোপরি বেঁচে থাকাই দুষ্প্রাপ্য; তখন শয়তানের বীভংসতা বা ভয় নয়, বরং এই সময়ে ব্যক্তির বোধ 'শূণ্য মনে হয়'। এইভাবে ওয়ালীউল্লাহ মিথ ভাঙেন আধুনিক জীবন আততির বিপ্রতীপে।

'একটি তুলসী গাছের কাহিনি', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অসাধারণ এক শিল্পসার্থক নির্মাণ। এই গল্পে দেশভাগের সাম্প্রদায়িক হুজুগে কর্মস্থল ও পূর্ববাসস্থান ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববাংলার এক শহরে এসেছে মতিন, বদরুদ্দিন, এনায়েত, ইউনুস, মোদাব্বের ও মকসুদ প্রভৃতি চরিত্রেরা। তারা শহরে বহিরাগত ও নিরাশ্রয়, কিন্তু অচিরেই একটি পরিত্যক্ত 'হিন্দুবাড়ি' দখলের মাধ্যমে তারা অর্জন করেছে নিজেদের নির্দিষ্ট ঠিকানা। অতীতের দুর্গন্ধময় ও নোংরা বস্তির তুলনায় বড়ো-বড়ো কামরা, নীলকুঠির দালানের ফ্যাশানের মস্ত মস্ত জানালা-যুক্ত এই বাড়িটির রাজসিক মুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিসরের স্বাস্থ্যময় পরিবেশে তারা তৃপ্ত ও স্বপ্নাতুর। অচিরেই রান্নাঘর সংলগ্ন উঁচু জায়গায় তারা আবিষ্কার করে একটি শীর্ণপ্রায় তুলসী গাছ। আর সেই অনুসঙ্গে তাদের মধ্যে জেগেছে অজানা বাড়ি ছেড়ে যাওয়া গৃহকর্ত্রীর প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, সহমর্মিতা। প্রথমেই যদিও তারা বলেছিল, "উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। ...কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।" তবু গোপনে গোপনে ওই তুলসীগাছের যত্ন নেয়। আগাছা পরিস্কার করে, গাছে পানি দিয়ে সতেজ করে। পরবর্তীকালে সরকার বাড়িটা রিকুইজিশন করলে, তাদের বাড়ি ছাড়তে হয় এবং তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে যায়।

ওয়ালীউল্লাহ এই গল্পে তুলসীগাছকে যে প্রতীকে ব্যবহার করেছেন, তা মানবিকতা; সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্দ্ধে। হিন্দু পুরাণে 'তুলসী'র যে ব্যাখ্যা পাই—

> "তুলসী—রাধার সহচরী। স্বর্গে একদিন কৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীকে বিহার করতে দেখে রাধিকা একে মানবী হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। অন্য মতে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিন জনে বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণু ও গঙ্গাকে পরস্পরের প্রতি এক দিন বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হয়ে উঠতে দেখে লক্ষ্মী সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনের মধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যায় এবং সরস্বতী শাপ দেন লক্ষ্মী পৃথিবীতে গাছ হয়ে জন্মাবেন।"[১৪]

তবে, উক্ত গল্পে 'তুলসীগাছ' অলৌকিক রসহীন সত্যতা মাত্র নয়, 'সামগ্রিক নিজ্ঞানে'-এর চিহ্ন বা প্রতীক, যা গল্পে ব্যক্তিচৈতন্যের মর্মমূলে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই সন্দর্ভের গোড়ায় আব্রামসের ব্রতাচার ও কৃত্যজাত মিথিক উপাদান সম্পর্কে বলেছিলাম— "Most Myth are related to social rituals-set forms and procedures in scared ceremonies." —এর প্রাচীন কথার সাথে সংযোগ নির্মাণ করে। গল্পে আমরা দেখি সঙ্কটের দিনে আশ্রয় পাওয়ার তাদের মধ্যে এক গভীর আন্তরিক সহানুভূতি জাগে—

> "হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই। তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ...আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারও জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে। কিন্তু এ-প্রদীপ দেওয়া-অনুষ্ঠান একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নাই।"[১৫]

সমালোচক H. Krappe বলেছেন, "any belief or practice has is not Recommend or enjoyed be any of the great organized religions such as Christianity, Judaism, Islam and Buddhism." সংহত সমাজের এক বিরাট অংশ যখন দীর্ঘকাল ধরে বিচার না করেই কিছু আচার-আচরণ মেনে চলে এই ধারণায়, যে এগুলিকে মেনে চললে তাদের মঙ্গল এবং না মানলে অমঙ্গল— এভাবে এ গল্পে সংস্কার তৈরি হতে গিয়ে ভেঙে গেল—মানুষগুলোর অস্তিত্বের সঙ্কট সেই প্রত্ন-প্রতীককে, সেই মিথিক্যাল ভাবনাকে নস্যাৎ করেছে এখানে।

তিন

কথাসাহিত্যিক ওয়ালীউল্লাহের 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়'[১৬] একটি মনোসমীক্ষণজাত ছোটগল্প। এই গল্পে দেখি, 'এ বস্তিতে আজ এই যে এত আনন্দ কোলাহল এর মূলে রয়েছে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন।' বস্তির ক্লিন্নতা, মালিন্য, অসংগতি ও বিকৃতির জীবনে তীব্র উল্লাস 'আলোর বৃত্তে' নয়, 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়'। আমরা জানি পুরাণে আছে, চন্দ্র মন্ডলের দেবতা। কল্পে কল্পে বহু চন্দ্রের উৎপত্তি ও লয় হয়েছিল। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্র, অমৃত, পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ইত্যাদি উঠেছিল। মহাদেব হলাহল পান করেছিলেন বলে তার বিষের জ্বালা কমাবার জন্য চাঁদ রূপ এই স্নিগ্ধ রত্নটিকে তাকে মাথায় ধারণ করতে দেওয়া হয়। 'হরিবংশ' থেকে জানতে পারি, অত্রির চোখ থেকে চন্দ্র রূপে 'কাম' জন্ম লাভ করে। দক্ষ জগতের হিতার্থে চন্দ্রকে বর দেয় ১৫ দিন ক্ষয় ও ১৫ দিন বৃদ্ধি এবং নির্দেশ দেয় সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে হবে।

আলোচ্য গল্পে 'ঘোড়েকা বাদশা' শেখ জব্বার চতুর্থ বিবির আগমনে বিপুল আয়োজন ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে। এই জব্বার শিবের আর্কেটাইপ-জাত সৃজন। গল্পের শেষে দেখি আকাশে খণ্ডচাঁদ ঝুলছে। ক্ষয়িত চাঁদের বক্রতায় কামনার ইঙ্গিতময় গুচ্ছগুচ্ছ আঙুরফল ঝুলছে—

> "আকাশে হয়তো গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙুর ফল ঝুলছে, তার প্রত্যেকটি মহব্বতের রসে ভরা। কেন অত আঙুর, কেনই বা ঝুলছে? — ঝুলছে শুধু নারীর দেহে ঝরঝর করে ঝরে পড়বার জন্যে। জয় হোক নারীর দেহের আর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের।"[১৭]

আর এই সময় জব্বার কামাতুর গলায় 'শাহি-গলায় বজ্রনিনাদ করে উঠল। সে আওয়াজে ভাষা নেই, শুধু তাতে টাটকা গরম খুন টগবগ করছে।' এই গল্পটির প্রসঙ্গে গ্রিক পুরাণের আর্টেমিস-এর কথা মনে পড়ে, যে ছিল চন্দ্রদেবী। যে সব মানুষ অসৎ, নারীর প্রতি বিশ্বস্ত নয়, তাদের এই দেবী শাস্তি দেন। আর্টেমিস সতীত্বের প্রতীক-দেবী। ভালবাসার শক্তিকে আর্টেমিস অগ্রাহ্য করেছেন বারবার। গ্রিক পুরাণের এই ইঙ্গিতে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন ঘটনাটি গভীর অতলচারী ব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ লাভ করেছে।

ওয়ালীউল্লাহর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত 'পরাজয়' গল্পের ভাষা নোয়াখালি-রংপুর অঞ্চলের পরিচয় বহণ করে। নদী-চরের অনিশ্চিত জীবন প্রকৃতির কাছে অসহায়, নিরুপায়ভাবে পরাজিত। গল্প কাহিনিতে দেখি, নতুন চরে বাসা বেঁধেছিল ছমির ও কুলসুম। মাচায় ওঠার অনতিকাল পরেই সর্পদষ্ট হয়ে ছমির মারা যায়। রাতের নিস্তরঙ্গ নদীতে কুলসুমের অনুচ্চ কণ্ঠের ডাক কেবল শূন্যেই মিলিয়ে গেছে, তার সাহায্যে কেউ আসেনি। পরের দিন মজনু ও কালু এসে সদ্য বিধবা কুলসুমসহ মৃতদেহ নিয়ে যায়। কালা ও মজনু এসে ডাকাডাকি করে—

> "—বউ-এর না হয় লজ্জা হইছে, তোমার মুখে রা নাই ক্যান ছমির মিঞা?
> —মোরা রাজপুত্তুর গো, এবার মজনুর কৌতুকোচ্ছল গলার আওয়াজ শোনা গেল, সাত-সমুদ্দুরের পার হইতে আসিতাছি রাজকইন্যারে দেখবার লাইগা। ...কালো-কালো ডাগর চোখের ছাড়ায় ওর মুখটি ভারি স্নিগ্ধ ও কোমল দেখায় বলে মজনু বলে যে, সে কোনো অচিন দেশের রাজকন্যা, যার রূপ নীল আকাশের পরির মতো, চুল মেঘের মতো, আর দেহের রঙ সোনার মতো। কিন্তু সে চোখে কী স্তব্ধতা এখন।
> ...অমন থির হইয়া বইসা ক্যান্‌ গো রাজকইন্যা, ছোট্ট নাকের ছোট্ট নথটাও যে নড়তাছে না। দুই জনে বুঝি খুব হইছে একচোট?"[১৮]

এরপর কুলসুম অমোঘ সেই পরিণতির কথা জানায়—'কাটি ঘায়ে মরেছে সে'। লোককথার বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে সমৃদ্ধতর হল রূপকথা। যেখানে 'খল' চরিত্ররূপে আসে রাক্ষস বা দৈত্য। এ প্রসঙ্গে গল্পে দেখি, "স্রোতের অনুকূলে ওদিক হতে একটা দৈত্যের মতো গোপালপুরি নৌকা আসছে, পালের রঙ তার সাদা। পেছনে মাচার ওপর লাল ডোরাকাটা নিশানার তলে বসে রয়েছে ন্যাড়া হিন্দুস্তানি মাঝি, তা ছাড়া বাইরে কেউ নেই। মাঝির পানে চেয়ে মজনু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, হেইগো,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাঁয়ে বাঁয়ে, নৌকা না তো, সত্যিই যেন দৈত্য।" এই রূপকথার কাহিনিতে সহানুভূতি পায় রাজকন্যা-রাজপুত্র। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন—

> "রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানা-ডাইনী-পেত্নী জনমানসের সামূহিক অবচেতনে এরা হল অশুভের প্রতীকবাহী। রাজপুত্র - মন্ত্রীপুত্র - কোটালপুত্র - রাণী - রাজকুমারী আপাত বিচারে সাধারণ মানুষের ওপরতলার বাসিন্দা হলেও, এদের মতো করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় রূপকথার স্রষ্টারা এদের মধ্যে নিজেদেরকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন; অর্থাৎ যে শ্রেণির হাতে বাস্তবে তাঁরা পীড়িত হন, এরা তাদেরই প্রতিরূপ। যৌথ অবচেতনার এ এক বিচিত্র জটিল গ্রন্থি।[১৯]

পরাজয় গল্পে 'প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা' অশুভ শক্তির প্রতীকে প্রতিফলিত হয়েছে। কালু ও মজনু রূপকথার চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের একান্ত করে কুলসুমকে 'রাজকন্যা' রূপে কল্পনা করে এবং তারই অনুষঙ্গে জনজীবনের সামূহিক-নির্জ্ঞানজাত ও ঐতিহ্যগত সংস্কারও গড়ে তোলে। আলোচ্যংশে 'সাত-সমুদ্দরের পার' রূপকথারই পরিচিত একটি উপকরণ এবং এটিও একান্তভাবেই বাঙালি লোকজ-অভিপ্রায় বা মোটিফ। রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে গিয়ে রাজকন্যাকে লাভ করেন। গল্পকারও কুলসুমকে লাভ করার মতো কালু বা মজনুর সামনে অনুকূল অভিক্ষেপ এনেছেন—

> "...দুঃখী ও গরিব বলে তাদের কাছে মৃত্যু তত অস্বাভাবিক, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক নয়; তাদের জীবন নর্মবিলাসে ও সুখের মোলায়েম সুবেদী আবরণে ঘেরা নয় বলে মৃত্যুকে তারা বড়ো করে দেখে না, বরঞ্চ সেটা যেন তাদের কাছে মুক্তি, অর্থশূন্য একটানা নিষ্ফল শ্রমের অবসান। তাছাড়া ওদের ব্যথার ভাষাও সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বলে ওরা নীরব হয়েই রইল।
> ...বেহুলার কাহিনি কুলসুমের মনের প্রান্তে তুলোর মতো, হালকা সাদা মেঘের মতো নিঃশব্দে উদয় হয়েছে। বেহুলার মতো মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে ভেলায় ভেসে সেও যাবে। কিন্তু কোথায়?"[২০]

বেহুলার মতো কুলসুমও বলেছে— 'কলা গাছের ভেলা কইরা অরে তোমরা ভাসাইয়া দেও, আর আমি যামু লগে।' বাংলাদেশের নিজস্ব লোক-পুরাণ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বেহুলা-লখিন্দরের করুণ কাহিনির সরাসরি ব্যবহার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। গল্পকার এখানে মানুষের লোকপুরাণের যে ব্যবহার করেছেন, তা দেব-দেবীর অলৌকিক আবরণহীন সাধারন মানুষের চিরকালীন সঙ্কট— মৃত্যুর রহস্য। পৃথিবীতে অন্তত একবারের জন্য অর্ফিয়ুসের ভাগ্যে মৃত্যু বিজয়ের সুযোগ এসেছিল। অর্ফিয়ুস কাহিনির মতো মানব-নিয়তির প্রহেলিকাসম্পন্ন মিথগুলিই আধুনিক মনকে বেশি করে আকৃষ্ট করে। কারণ আধুনিক মন অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দর্শনে শিক্ষিত হয়েও ঐ নিয়তির প্রহেলিকার কাছে আজও অসহায়।

মঙ্গলকাব্যের লখিন্দর-বেহুলা মিথটিতেও দেখি বেহুলার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সাপে কাটা স্বামীকে কলার মান্দাসে ভাসিয়ে স্বর্গপুরীতে গিয়ে দেবতাদের বিনোদনের মাধ্যমে খুশি করে মৃত স্বামীসহ ভাসুর ও ধন-সম্পত্তি উদ্ধার করে আনা।[২১] এখানে দেবী মনসার কোনও কোপ নয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা কুলসুমের জীবন থেকে চিরকালের জন্য ছমিরকে কেড়ে নিয়েছে। আর ধর্মীয় বৈরিতার কারণে ছমিরের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় গাঁয়ে, কবর দেবার উদ্দেশ্যে। এই যাত্রাপথে কুলসুমের অবস্থা যেন যক্ষপ্রিয়ার ব্যঞ্জনা এনেছে। 'পরাজয়' গল্পে ইসলামিক পুরাকথার প্রসঙ্গও এসেছে।

> "—মইরা মানুষ কই যায়, কইবার পার মজনু ভাই?
> —ওই আকাশে যায়। চোখ উলটে ওপরের পানে ইঙ্গিত করে উত্তর দিল মজনু।
> —জান্‌ডা নিবার কালে আজরাইল কী জবর কষ্ট দেয়?"[২২]

মৃত্যর পর মানুষ কোথায় যায়— এই প্রশ্ন এসেছে দরিদ্র-অশিক্ষিত কুলসুমের। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক পন্থীরা পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। বৌদ্ধগণ পরলোক মানেন, কিন্তু নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না। পাপ ও পুণ্যের ফল অনুসারে পরলোকে বাস করতে হয়। পুণ্যক্ষয় হলে আবার জন্মাতে হয়। নরক ভোগের পরও জন্মাতে হয়। ধার্মিকরা দেবযান পথে স্বর্গে যান। এই পথে অগ্নিলোক, বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোক বিদ্যমান। ভারতীয়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দর্শনে স্বর্গলোক অপেক্ষা মুক্তিকে বড় বলা হয়েছে। মুক্তি বা মোক্ষ[২৩] লাভের পর আর জন্মাতে হয় না। আবার, ইসলামিক মতে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম নেই। আত্মার মোক্ষফলও নেই। পাপ-পুণ্যের বিচার হবে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিনে—

> "তখন যার পাল্লা (পুণ্য) ভারী হবে, সে লাভ করবে সন্তোষজনক পরিণতি। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে 'হাবিয়া' দোজখ। তা (হাবিয়া) কি, তা তুমি জান কি...তা উতপ্ত অগ্নি।"[২৪]

আজরাইল-মিথ প্রসঙ্গ এখানে চরিত্র ও আবহের ভয় ও নিঃসঙ্গতার দ্যোতনা এনেছে। বেহুলা মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রাণের উজ্জীবন ঘটিয়েছিল। বাংলার লোকপুরাণের এই সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকাকে ওয়ালীউল্লাহ কুলসুমের চিত্রকল্পে এ গল্পে ব্যঞ্জিত করেছেন। তার সমস্ত উপলব্ধি উক্ত মিথটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বাস্তবের কাছে ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেছে।

চার

হিন্দু পুরাণে কথিত আছে 'কালরাত্রি'তে যাত্রা করতে নেই এবং 'যাত্রায়ং মরণং কালে'—এই বচনানুসারে বারবেলা বা কালরাত্রিতে যাত্রা করলে মৃত্যু হয়ে থাকে। পুরাণ এবং 'জ্যোতিষরত্নাকর'-এর যাত্রার আচার-অনুষ্ঠান এবং নীতি ভেঙে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'মৃত্যুযাত্রা' নামক ছোটগল্পটিতে। গল্পের প্রথম বাক্যটি এইরূপ— 'অন্ধকার নিবিড় হলেও তবু আবছা-আবছা নজরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছইশুন্য ভারী খেয়া নৌকাটা।' তিনু, করিম, শুকলু, মতি নাপিতের বউ— এরা মন্বন্তরের হাত থেকে প্রাণে বাচঁতে ভেসেছে নদীতে (শুধু যে তাদের গাঁয়ে নয়, সর্বত্র আকাল ও অনটন লেগেছে— একথা খেয়াল হয় না)। এই দুর্ভিক্ষ তাড়িত জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার এইভাবে— 'মৃত্যু যেন তাকিয়ে রয়েছে কালো জীবনের পানে।' তাদের সে যাত্রা আশায় দোলায়িত, অথচ নিরাশায় জর্জরিত। সদ্যমৃতা বুড়ির 'জানাজা' সম্ভব হয় না, এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইল অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মতো। ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নীতি মেনে সৎকার্য সম্পন্ন হয় না। মর্মান্তিক জীবনযুদ্ধে, সামূহিক সঙ্কটের মুহূর্তে তৈরি হয় জীবনকথা— 'এরা শহিদ; যারা দুভিক্ষের সাথে সংগ্রাম করে প্রাণ দিচ্ছে তারা শহিদ গো, শহিদ।'

> "মৃতুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
> অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্‌।।"
>
> (ভাগবত ১০। ১ অ.)

'মৃত্যুর পর শোক করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। কারণ, যাহা অন্যথা করা একেবারে অসম্ভব, তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া লাভ কি...' এই শাস্ত্রীয় বচন গল্পের চরিত্রগুলি আজ কত সহজে হৃদয়ঙ্গম করেছে; গল্পকার নির্লিপ্ত বর্ণনায় কখনো পুরাণ প্রসঙ্গ, কখনো কলমন পরি প্রসঙ্গ (রূপকথা, লোককথা) বা কখনো খোদাদ্রোহী ইবলিশ শয়তানের মিথিক্যাল ইমেজ বা রূপকের মাধ্যমে একদল অসহায় মানুষের জীবন সঙ্কটকে এ গল্পে ফুটিতে তুলেছেন।

'স্তন' গল্পটিতে দেখি আবু তালেব মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দিন সাহেব দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কাদেরের কাছে আসে, যার তিনদিন আগে ষষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। আর সালাহ্‌উদ্দিন-এর অতি আদরের ছোট মেয়ে খালেদা প্রসবকালে প্রায় একই সময় তিনদিন আগে মারা গেছে। কাদেরের কাছে সালাহ্‌উদ্দিন সাহেব তার নাতিকে দুধ দেবার (কাদেরের স্ত্রী কর্তৃক) প্রস্তাব নিয়ে আসেন—'আমার নাতিকে দুধ দেবার কেউ নেই।' তখন মাতৃত্বের অনুভবে মাজেদা ভেবেছে—

> "দুধের শিশুকে কেউ কি ফেলতে পারে? যে মানুষ সদ্য সন্তান হারিয়ে শোকাপ্লুত, সেও পারে না। ...মাজেদার চোখ আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে, অস্পষ্ট কোমল হাসির রেখা জাগে। হ্যাঁ, সে দুধ দেবে বৈকি। তার উন্নত স্ফীত স্তনে ঝরনার মতো আওয়াজ করেই যেন দুধ জমেছে। তার স্তনে সঞ্চিত দুধের বেদনা। সে-বেদনা জীবনেরই বেদনা; বুকে যা জমেছে দৃষ্টির অন্তরালে তা স্নেহ-মমতার সুধা।"[২৫]

এখানে উল্লেখ্য—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "অরোনশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ।
> কঠিনার রোম সুরো মৃদুগ্রীবা চ কম্বুভা।।"
>
> (গরুড়পুরাণ ৬৫। ৯৫)

কৃষ্ণের মা দৈবকী কংস কর্তৃক কারাগারে বন্ধ, কৃষ্ণ মানুষ হচ্ছে যশোদার কাছে। এছাড়া কর্ণকে মা পরিত্যাগ করলে সারথি অধিরথ-এর বউ রাধা মানুষ করেছিল কৃষ্ণকে। স্তন—যা বিম্বফল, কুচফলের সঙ্গে তুলনীয়, সেই স্তনে ডাক্তার জানায় দুধ আসেনি। পৌরাণিক প্রত্নছাপটুকু ছাড়িয়ে মাজেদার জীবনে নেমে আসে মাতৃত্বের সঙ্কট।

> "মাজেদা আর দেরি করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাইজের বোতাম খুলে প্রথম ডান স্তন, তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করে। এবার বালিশের নীচে থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়। তারপর, নিষ্কম্পহাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দেয়।...দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু করেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়েছে।...তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল।"[২৬]

ওয়ালীউল্লাহের 'দুই তীর' গল্পে দেখি, নদীর 'দুই তীর'-ভাঙা ও গড়ার নিয়ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয়, বড় হয়ে উঠেছে ব্যবধান; আফসারউদ্দিন ও হাসিনার দাম্পত্য জীবনে সময়ের ঢেউ বয়েই চলেছে। এদের জীবনের বিচ্ছিন্নতা নগরকেন্দ্রিক ধনবাদী সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি-চেতনা, শ্রেণি-অবস্থানগত কারণে। দাম্পত্য জীবনে অভিন্ন শয্যায় নিত্য নিঃসঙ্গ। আফসারুউদ্দিন হাসিনার মূলকাহিনির সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরশাদ আলী-মরিয়ম খানমের উপকাহিনি অপ্রতিরোধ্য নিঃসঙ্গতার সম্পর্ক চিহ্নিত করেছে। Plerre Brunel এর 'Hreoism, Companion to Literary Myth', গ্রন্থে 'Heroes and Archetypes' প্রবন্ধে Hero's solar nature নামক একটি টেবিল পায়, যেখানে Solar hero-এর লক্ষণগুলি এইরূপ—

Physical aspect	: Shining (orpale) eyes, Bright hair, facial beauty, sharp profile.
Character	: Openness, Honestly
The social	: A powerful and solitary saviour. (Myth of de Gaulle)
General Symbolisum	: Light (Good)

আমাদের আলোচ্য 'দুই তীর' গল্পে এই মিথিক হিরোর লক্ষণগুলি প্রায় সবকটি মিলে যায়। আফসারউদ্দিন প্রতিনিয়ত তাদের অসুখী সম্পর্কের দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে চেয়েছে। তার দিক থেকে বাধা হয়ে এসেছে আত্ম-অহঙ্কার আর অপমানবোধ; হাসিনার দিক থেকে তার মানস-গঠন। দাম্পত্যের শূন্যতা শুষে নেবার মতো কোন অবসর বা ঘটনা এখানে ঘটে না। এই অন্তঃসারশূন্য নিয়তির অমোঘ প্রহসনের বিরুদ্ধে আফসারউদ্দিন লড়াই করেই চলে সেই 'মিথ অব সিসিফাস' কাহিনির মতো। সিসিফাস যেমন সারাদিনের শ্রমের ফল শূন্য জেনেও কর্ম-কর্তব্য পালন করতো; আফসারউদ্দিনও তাই করেছে। 'বড় নিঃসঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতায় মানুষ বাঁচতে পারে না। অদম্য আশা নিয়ে মানুষ যে-নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সে সংগ্রামে পরাজিত হলে তারপর তার আর কিছু থাকে না।' হাসিনার মনের গঠন ও দ্বন্দ্বের কাছে তার স্বপ্ন, আশা, কল্পনা, পরিশ্রম— সব প্রতিনিয়ত অর্থহীন-শূন্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

'না কান্দে বুবু' গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্‌ গল্পের কাঠামো ও সংলাপে রূপকথা বা লোককথার folk-narration-এর ঢঙে বাক্যের বারংবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। গল্পকার এই গল্পের শরীরে কাহিনির সঙ্গে একটি লোককাহিনি বা লোকপুরাণ বুনে নিয়েছেন। লৌকিক ধর্মীয় সদাচারণের উপদেশ শুধু নয়, পির-ফকিরের প্রবল উচ্চারণ এসে যুক্ত হয়েছে এখানে —

> "আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর। ভাই সকল তোমরা সবে করহ শ্রবণ, নতুবা কারও নাহি পরিত্রাণ। হের শুন চারিদিকে, দোয়া মাঙ্গ পির থেকে। কোন ভাই উটের কীর্তির যশ, শুনে দিলে হোক সাহস। খোদার কেরামতির কথা তাই, তোমাদের বলি তাই শুন ভাই, শুন ভাই মন দিয়ে শুন তাই। প্রশাব করিতে নিতে হবে ঢেলা, নাহলে হাসরের মাঠে বুঝিবে ঠেলা। ফেলে রাখি অন্য কাজ, পাঁচ ওক্ত পাড়িবে নামাজ। আর কি বলিব ভাই, মনে করে রেখ তাই, আল্লাহু-আকবর।"[২৭]

পীর-ফকিরের বয়ানের মিথিক্যাল ইঙ্গিত সম্পূর্ণত ধর্মীয় নয়, লৌকিকও; যা পূর্বপুরুষের ট্যাবু-টোটেমকে পরিস্ফুট করেছে। আবার, রূপকথার মতো শ্যামলপুরের বাদশার ছেলে আর মেয়ের কথা এই ভাবে এসেছে—

> "ছেলেটা মণিমাণিক্য খচিত অত্যাশ্চর্য লেবাস পরে শাদি করল, রাজত্ব করল, তারপর মরে গেল। গম্বুজওয়ালা সুদৃশ্য একটি ইমারত উঠল তার কবরের ওপর। আর মৃত্যুর দিনে এক সহস্র কবুতর ছাড়া হল। শাহজাদিরও শাদি হল আর স্বামীর ঘরে গোসাঘর পেল। শেয়ার ঘরে আর গোসা-ঘরে দিন কাটিয়ে সেও মরল। সেদিন এক সহস্র লোক দিনমোহর পেল।"[২৮]

পীর-ফকির কথা ও রূপকথার মধ্যে বাঙালির পুরাণ ঐতিহ্যের যে উৎসমুখ এবং মোহানা-দুইই লুকিয়ে রয়েছে তাকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-এর গল্পে ধরা যায়। 'সাত বোন পারুল' গল্পের নামকরণে এবং সাত বোনের অনুষঙ্গে রূপকথার কাহিনি মনে পড়ে। মুসলিম ঐতিহ্য বাঙালি সংস্কৃতিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত হবার পরই পরীকথাগুলি গড়ে উঠেছে। বিলিতি রূপকথায় ভাল এবং মন্দ, দু-রকমের পরীই আছে। ওয়ালীউল্লাহ্-এর গল্পে বারবার এই পরী-কাহিনি দেখা যায়। ইসলামিক ও প্রাক্-ইসলামিক নানা মিথ যেমন আজরাইল-মিথ, জিন প্রসঙ্গ তাঁর গল্পে মুসলিম সমাজের বিশ্বাস ব্যাখ্যায় উঠে আসে। 'বংশের জের' নামক ছোটগল্পটিতে সেকেলে মস্ত ভারী লোহার সিন্দুকটির দশমনি ডালা তুললে মিলবে 'বংশানুক্রমে স্তরে স্তরে লিপিবদ্ধ করা বংশ ইতিহাস, তার মূলের আর ঘোরালো শাখা প্রশাখার বিস্তারিত কাহিনি।' পুরাণের যে লক্ষণ[২৯] — সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়, মন্বন্তর এবং বংশ— এদের মধ্যে 'বংশ' বিবরণী বা বংশ ইতিহাস এই গল্পের একটি অন্যতম মিথিক্যাল উপাদান।

উপসংহার : আলোচ্য গল্পগুলির প্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম ওয়ালীউল্লাহ্ মিথকে জোর করে ব্যবহার করেন না। খুবই প্রাসঙ্গিক ভাবে তার চরিত্র সমাজ বিশ্বাসের সামূহিক নির্জ্ঞান হিসাবেই কাজ করে মিথের ধারণা। দেশি-বিদেশি মিথ, রূপকথা-লোককথা প্রভৃতি লোকপুরাণ এবং প্রত্ন প্রতিমার ব্যবহার ও তার উত্তরণ ওয়ালীউল্লাহ্রে শিল্পিত নির্মাণে সহজ, স্বাভাবিক হয়েছে। পিতৃপুরুষের সঙ্কট বর্তমান জীবন-সঙ্কটের সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়ে থাকে পরতে পরতে। 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কাজি আফসারউদ্দিনকে লিখিত পত্রে ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্য-ভাবনার মূল সুরটি জানা যায়—

> "...I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে—আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম passion থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা— এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত(?) করতে চাই।"[৩০]

ওয়ালীউল্লাহের রচনায় বাঙালি মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরাই কথাসাহিত্যের প্রকৃতি উদ্দেশ্য তা, বোঝা যায় এই বক্তব্যে। আর তা করতে গিয়ে মিথের নবরূপায়নের সাহিত্যিক প্রক্রিয়াটি তাঁর লেখনীর একটা অন্যতম উপাদান হয়তে উঠেছে। বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার প্রেক্ষিতে ওয়ালীউল্লাহের নির্বাচিত ছোটগল্পে মিথের বহুমাত্রিক স্বর-দ্যোতনার পরিচয়টি পেলাম।

হিন্দু ও ইসলামিক পুরাণের ব্যবহার অর্থাৎ ভারতীয় এবং আরবীয় সমাজ সংস্কৃতি ও পুরাণ-লোকপুরাণ সম্পর্কের গভীর জ্ঞান এবং অনুভব নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর ছোটগল্পের অপূর্ব শিল্পনির্মাণ করেছেন। আমরা মিথের আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখলাম, সুদূর প্যারিসে জীবিকাসূত্রে বসবাস করেও দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি মমত্ব নিয়ে মুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সত্যের উদ্ভাসনে বলিষ্ঠ লেখনশৈলীর প্রয়োগ করেছেন তিনি।

Reference:

১. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৮

২. দাশগুপ্ত, শুভা চক্রবর্তী, 'মিথ', 'সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত বুদ্ধিজীবীর নোটবই', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ৩৮৩

৩. Jung, Carl, 'Modern Man in Search of a Soul', A Harvest/HBJ Book, New York and London, 1933, p. 15

৪. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, 'মিথকথার পূর্বসূত্র : পরিচয়, প্রেরণা, প্রয়োগ, পুনর্নির্মাণ', 'মিথ পুরাণের ভাঙা-গড়া', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, 'জীবনানন্দ: পুরাণ প্রসঙ্গ ও প্রত্নপ্রতিমা', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সপ্তদশ সংখ্যা, ২০০০ পৃ. ৩৭

৬. J.A. Kudan, 'A Dictionary of Literary Terms', Dubal and company, New York, 1976, p. 121

৭. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-র উপন্যাস: দ্বিতীয় চিন্তা', ভাষা-সাহিত্য পত্র, ১৩৮৫। অন্য একটি মত হল, প্রথম মুদ্রিত ছোটগল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে'। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজ বার্ষিকীতে।

৮. দুর্ভিক্ষ ও তৎসৃষ্ট নানা, সমস্যা ও সংকটকে উপজীব্য করে গল্প লিখেছেন জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নয়নচারা' গল্পে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের মতো ক্ষুধাতুর মানুষের সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কুমার, 'পৌরাণিকা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পৃ. ১৬২

১০. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামাই, 'নয়নচারা', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৩

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, 'পৌরাণিক' (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে.এল.এম.প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮, পৃ.৪৭

১২. দত্ত, মিলন, 'চলিত ইসলামি শব্দকোষ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০১১, পৃ. ২৯
লেখক 'আজরাইলের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন— "আজরাইল প্রাণহরণকারী ফেরেশ্‌তা। ফেরেশ্‌তা ফার্সি শব্দ। আরবিতে বলা হয় মলক। ...আজরাইল হল মৃত্যুর দূত। তাই তাকে বলা হয় মালেক-উল-মৌত। ইহুদি ধর্মেও আজরাইল রয়েছে।

১৩. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, 'নয়নচারা', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.২

১১৪. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের চারটি খণ্ডের নাম—ব্রহ্মখণ্ড, গনেশখন্ড, প্রকৃতিখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ। এর মধ্যে প্রকৃতিখণ্ডের ত্রয়োদশ এবং পরবর্তী অধ্যায় জুড়ে তুলসীর জন্ম, ও জীবনী জানা যায়। তুলসী নারায়ণের স্ত্রী। এক কথায় তিনি বঞ্চিতা মহিমা। পুরাণের একটি নারীচরিত্র বেছে নিয়ে, গল্পকার মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটে মহিলার ভূমিকার কথা স্মরণে এনে দিয়েছেন, বঞ্চিতা তুলসী সবদিক রক্ষা করতে পারে না।

১৫. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, 'একটি তুলসীগাছের কাহিনি', 'গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৮১

১৬. Chetwynd, Tom, 'Dictionary of sacred Myth', Aquarian/ thorsons, 1886, p. 132
এখানে আরও বলা হয়েছে—
The three-formed Moon appears to have been sin (or sune)-Nanna-Dumuzi in Mesopotamia, Artemis-seleno-Hecate in Greece, Dianna-Luna-Prosperpina Rome.But Hecate herself was also three form, and appeared as selenc in Heaven, Artemis on Earth, and Persephone in the under-world. With three bodies of Lioness (Like Sekhmet in Egypt), horse and dog.... Moon is especially associated with dance, music, the inner life of man, story-telling, myth, ritual, sex drame the civilization and culture which alternates with the world.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 135
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, ‘খণ্ড চাঁদের বক্রতায়’, ‘গল্পসমগ্র’, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৫৫

১৮. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, ‘পরাজয়’, ‘গল্পসমগ্র’, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.১৮

১৯. চৌধুরী, ড. দুলাল, সম্পাদিত, ‘বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ’, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ৫১

২০. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, ‘পরাজয়’, ‘গল্পসমগ্র’, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.১৯

২১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, সম্পাদিত, ‘কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল’, নিউ বইপত্র, কলকাতা, প্রকাশ কাল ২০১৭, পৃ. ৩২১

বিজয় গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’ এর ভাসান পালা’য় বেহুলার সংলাপ—

“পতি বিনে মোর চিত্তে থাকে যদি আন। অঘোরে নরকে যাব নাহি পরিত্রাণ।।
মরা স্বামী লয়ে যাব দেবের সমাজ। শিবপুরী গেলে মোর সিদ্ধ হবে কাজ।।
পৃথিবীতে আশা করি রাখিব ঘোষণা। জিয়াইব নিজ পতি ভাসুর ছয়জনা।।”

২২. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, ‘পরাজয়’, ‘গল্পসমগ্র’, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.২১

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কুমার, ‘পৌরাণিকা’ (দ্বিতীয় খণ্ড), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পৃ. ১৪

২৪. আহমেদ, হাফেজ মুনির উদ্দীন, ‘সূরা আল ক্বারিয়াহ’, ‘কোরআন শরীফ’ (সহজ সরল বাংলা অনুবাদ), আল কোরআন একাডেমী লণ্ডন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৬৪০

২৫. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, ‘স্তন’, ‘গল্পসমগ্র’, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ১৩১

২৬. তদেব, পৃ. ১৩৪-১৩৫

২৭. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, ‘না কান্দে বুবু’, ‘গল্পসমগ্র’, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৩৮৫

২৮. তদেব, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯

২৯. বসু, গিরীন্দ্রশেখর, ‘পুরাণপ্রবেশ’, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৯, পৃ. ১

৩০. মকসুদ, সৈয়দ আবুল, ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য’, দ্বিতীয় খণ্ড, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৩৯

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 136 - 142
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে সম্প্রীতির স্বর

মৌসুমী পাত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী
Email ID: mousumipatrasp@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Communalism; Riots; Short story; Hindu-Muslim; Bengali writers; Post-independence; Anti-communalism; Anti-riots.

Abstract
Recently, one of the major problems in our country is communalism. Communalism started in this country during the pre-independence period by the British imperialist rulers. Currently, communalism is gradually assuming complex forms, bringing the country and the nation to a severe crisis. Communalism has always been a hindrance to the country as well as the nation, and it has closed off the path of progress. On the other hand, the writers associated with the progressive society have repeatedly argued in favor of harmony against communalism in different forms of literature. Bengali writers are not an exception either. Whenever the dark cloud of communalism has gathered over the country, Bengali writers, drawing from Bengali tradition and consciousness, have also spoken against communalism in various literary forms such as poetry, stories, novels, essays, dramas, etc. However, in most cases, authors have adopted short stories. Within the limited confines of short stories, a connection emerges easily between the authors' thoughts and the readers' emotions. As a result, the trend of anti-riot and anti-communal short stories has developed. As a result, a genre of anti-riot and anti-communal short stories has emerged. In our article titled "The Voice of Harmony in Selected Bengali Short Stories after Independence", we have selected stories written in the post-independence period that oppose riots and communalism. These stories are dazzling with the prospects of Hindu-Muslim prosperity and coexistence against communalism. Additionally, the stories also demonstrate the brutality and futility of the riots.

Discussion

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ও ব্যাপ্তি রাষ্ট্র-সমাজ-জীবনকে গভীর সংকটের মুখোমুখি করে। দেশবিভাগের ঘটনাটি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা ও সংঘতির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও কার্যপদ্ধতি জাতীয় সংহতির বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানসিক ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকতা যে শুধু বেড়ে চলেছে তা নয় ক্রমশ জটিল রূপও ধারণ করছে — স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইতিমধ্যেই তা প্রমাণ করে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির মত বাঙালিরাও সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কুফল ভোগ করে চলেছে। দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার সহিংস রূপ ছড়িয়ে পড়লে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তথা সাহিত্যিকরা দেশ ও জাতির সংকটে নীরব থাকতে পারেননি। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যিকদের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাকারদেরও ভূমিকা ইতিমূলক। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভেদমুক্ত উদার মানবিক সাহিত্য চিন্তনের যে ধারাটির প্রবর্তন ঘটেছিল তার যথার্থ অনুগামী বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীরাও। তাঁরা দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষা ও প্রসারে বারবার সরব হয়ে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন — তাঁদের সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে সম্প্রীতির স্বর। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত দশজন গল্পকারের দশটি গল্প আলোচনা করে বুঝে নিতে চাই কীভাবে প্রগতিশীল সমাজ সংলগ্ন সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির স্বরকে প্রতিষ্ঠা করে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বাস' গল্পে দেখা যায় পরেশ আর রহমান আশৈশব বন্ধু। কলকাতা শহরের ছোট্ট এক পল্লীতে থাকে তারা। তাদের কেবল প্রতিবেশী বললে ভুল বলা হয়, তাদের মধ্যে ছিল নিখাদ খাঁটি বন্ধুত্ব। পরবর্তীতে, পরবর্তী প্রজন্মের সূত্র ধরে পরস্পরের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আলাপ-পরিচয় ও হৃদ্যতা গড়ে ওঠে দুটি পরিবারের মধ্যেও। ইতিমধ্যে ঘটে যায় ভারতভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং আরও দাঙ্গার সম্ভাবনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাওয়া এসে লাগে রহমানের গায়েও — সাম্প্রদায়িকতার বিবেকহীন দংশনকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। সাম্প্রদায়িকতার ক্লিন্ন মনোভাব তাকে হিন্দুদের প্রতি বিদিষ্ট করে তুললেও সে পরেশকে সাবধান করেছিল। বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য পরেশকে অনুরোধ করে কিন্তু পরেশ তার বিশ্বাসের অসীম শক্তিতে স্ত্রী সন্তানসহ স্বগৃহেই থাকে। বিশ্বাসের জোরেই সে দাঙ্গার দিন রুগ্ন মেয়ের জন্য ওষুধ আনতে যায়। বাড়ি ফিরে দেখে পরিবারের সদস্যদের অগ্নিদগ্ধ দলিত শবদেহ। অচিরেই রহমানের ওপর এসে পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রোধানল। হিন্দুদের প্রত্যাঘাতে আক্রান্ত হয় রহমানের আপনজনরা। দাঙ্গা আক্রান্ত শহরে লুঠতরাজ, হত্যা, অগ্নিকাণ্ডে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে চলে রহমান। হঠাৎ চোখে পড়ে উন্মত্ত পরিস্থিতিতে তার কন্যা নুরীকে পরম মমতায় বুকে আগলে রেখেছে পরেশ — সাম্প্রদায়িকতার বিভীষিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতার মধ্যেও বিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠল — এভাবেই ঘৃণা আর অবিশ্বাসের শ্মশানভূমিতে বিশ্বাসের আলো জ্বেলে লেখক গল্পটির সমাপ্তি টেনেছেন। সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র বাতাবরণে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির-সহমর্মিতার এই চিত্র নিমেষেই নস্যাৎ করে দেয় হিন্দু-মুসলমান যাবতীয় বিভেদ-বিদ্বেষ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ছেলেমানুষি' গল্পে সুখে-দুঃখে মিলেমিশে থাকা ভিন্নধর্মী দুটি পরিবারের কথা বলেছেন। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের মানুষগুলোর মধ্যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আনন্দের কোনো পার্থক্য ছিল না। হিন্দু পরিবারের কর্তা তারাপদ এবং মুসলিম পরিবারের কর্তা নাসিরুদ্দিনের কেবল ধর্মই আলাদা তাদের ভাষা এক, জাত এক, তারা মনে করে — তারা একই শ্রেণীভুক্ত। পরিবারের দুটি কর্ত্রী ইন্দিরা আর হালিমার যাপনের মধ্যে কোনো ব্যবধান ছিল না। তাদের নৈকট্য বোঝাতে লেখক বলেছেন —

"আঁচল বিছিয়ে পাশাপাশি একটু শোয় তারা দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনি, দুটি দাসী।"[১]

পরিবারের দুই বয়স্ক সদস্যদের আন্তরিকতাও ছিল ঈর্ষনীয়। হালিমা ও ইন্দিরার সন্তান হাবিব ও গীতা আশৈশব বন্ধু। দুটি শিশুকে কেন্দ্র করে পরিবারের সখ্যতা ক্রমশ বেড়ে চলে। হঠাৎই দেশজুড়ে ঘনিয়ে আসা ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব এসে পড়ে দুটি পরিবারের ওপর। ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ দানা বাঁধে। হাবিব ও গীতা শিশুসুলভ সারল্যে বাড়ির চিলেকোঠার নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে গেলে তাদের অনুপস্থিতিতে দুই পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে শিশুকে আটকে রাখার ভিত্তিহীন অভিযোগ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি বাড়ির সামনে উন্মত্ত মানুষের জমায়েত শুরু হয়। ইতিমধ্যে দাঙ্গা বাঁধার উপক্রম হলে হঠাৎ কয়েকজনের চোখে পড়ে যাদের উপলক্ষ করে এই আতঙ্ক, উন্মাদনা সেই হারানো শিশু দুটি ছাদের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে নিচের কান্ড-কারখানা লক্ষ্য করছে। বাচ্চা দুটির জলজ্যান্ত আবির্ভাবে, পিস কমিটির দুজন সম্পাদকের চেষ্টায় কোনোরকমে দাঙ্গা ঠেকানো যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে শিশুদের শিশুসুলভ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচরণকে কেন্দ্র করে বড়রা যেভাবে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিদ্বেষের দেওয়াল

তুলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত করেছে— তা ছেলেমানুষির পর্যায়ভুক্ত - এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে সাম্প্রদায়িকতার মতো ভয়াবহ বিষয়কে ছেলেমানুষি বা উপহাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনে প্রকারান্তরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-বিদ্বেষকে স্থূল ও কৃত্রিম রূপ দিয়েছেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের সখ্যতা ও সম্ভাবকে স্থায়ী করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুর 'দাঙ্গার একটি কাহিনী' গল্পটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ স্বরূপ। গল্পের শুরু হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা দুজন ভিন্নধর্মী অসমবয়সী মানুষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। দুজনেই কলকাতা শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার। তাঁদের কথোপকথনের সূত্রে জানা যায় দুজনের বাড়ি পাশাপাশি দুটো গ্রামে — সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছিল। দাঙ্গার নিষ্ঠুরতায় মুসলিম ছোকরা খোঁড়া হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির জটিলতায় বৃদ্ধেরও চাকরি যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর পরবর্তী ভবিষ্যতের চিন্তা দু-জনকেই ভারাক্রান্ত করে। হিন্দু বৃদ্ধটির মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই জেনে মুসলিম তরুণ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সহানুভূতির সঙ্গে বৃদ্ধকে তার গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্তে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অথচ গল্পের শেষে জানা যায় ঐ মুসলিম ছোকরাই হিন্দু বৃদ্ধকে রাতের অন্ধকারে ছুরির আঘাতে বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পরস্পরের দুঃখে যন্ত্রণায় পাশে থাকার যে আকুতি ধরা পড়ে তা মনুষ্যত্বকে জয়ী করে। গল্পের শেষে হিন্দু বৃদ্ধ ও মুসলিম তরুণ যুবকের পরস্পরের প্রতি দরদী অনুভব ঘাতক সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে।

প্রফুল্ল রায়ের 'মাঝি' গল্পেও দেখা যায়, ফজল মাঝি ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা চালায়। মাঝিবৃত্তিই তার উপার্জনের মাধ্যম। সে ভালোবাসে সলিমাকে কিন্তু সলিমাকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার জন্য প্রয়োজন কন্যাপণ বাবদ সাত কুড়ি টাকা — এই উদ্দেশ্যে ফজল অবিরাম নৌকা বেয়ে একটু একটু করে সঞ্চয় করে উপার্জিত টাকা। যখন সে তার লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন একদিন তারই প্রতিবেশী ইয়াছিন এক বোরখা-অবগুণ্ঠিতা রমণীকে নিয়ে ফজলের নৌকায় উঠে আসে। মাঝ-নদীতে পৌঁছে ফজল ছইয়ের ভেতর থেকে ধস্তাধস্তির আওয়াজ ও নারীকণ্ঠের মর্মান্তিক চিৎকার শুনতে পায়। নিমিষের মধ্যে সে আর্ত মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন জানতে পারে মেয়েটি একটি হিন্দু রমণী এবং ইয়াছিন তার স্বামীকে হত্যা করে তারও সম্ভ্রম হরণের উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাচ্ছে ইসমাইলের চরে তখনই ফজল ধারালো কোচের আঘাতে ইয়াছিনকে হত্যা করে। ইয়াছিনের কবল থেকে অসহায় রমনীকে রক্ষা করে সে শান্তি পায়। শুধু তাই নয়, তার সঞ্চিত টাকা দিয়ে সে মেয়েটিকে কলকাতায় তার আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং বাকি টাকাও তার হাতে তুলে দেয় যাতে সে অচেনা জায়গায় কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। একজন অপর সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীর জন্য যেভাবে ফজল নিজের প্রাণ বাজি রেখে ইয়াছিনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে বিধর্মী একটি রমণীকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তা সাম্প্রদায়িক হিংসার বিপরীতে সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্পে উল্লিখিত রাজমোহন রায় পূর্ববঙ্গের এক সম্পন্ন গৃহস্থ, বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। স্বাধীনতার পর তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ ভারতবর্ষে চলে গেলেও রাজমোহন সাত পুরুষের মাটি আঁকড়ে মুসলিম শাসিত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে থেকে যান— এখানে তাঁর শান্তিপূর্ণ জীবন ছিল। যেদিন রাজমোহনকে পুত্রবধূ চিঠি লিখে তার বাপের বাড়ির দেওয়া কারুকার্য খচিত পালঙ্কটি বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করে সেদিন থেকেই বৃদ্ধ রাজমোহনের জীবনে অশান্তি শুরু হয়। অপমানে, দুঃখে ক্ষিপ্ত রাজমোহন পালঙ্কটি বিক্রি করে দেন প্রতিবেশী মকবুলকে। পরে মানসিক স্থিরতা ফিরে এলে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। ডেকে পাঠান মকবুলকে। রাজমোহন ফিরিয়ে নিতে চান তাঁর পালঙ্ক অন্যদিকে মকবুল তা কিছুতেই ফিরিয়ে দেবে না। শুরু হয় উভয়ের দ্বন্দ্ব — একদিকে রাজমোহনের আভিজাত্যবোধ অন্যদিকে মকবুলের জ্যাত্যাভিমান। অচিরেই রাজমোহন ও সুবিধাভোগী মুসলমান গেদু মুন্সীর চক্রান্তে মকবুলের জীবনে নেমে আসে চরম সংকট। আর্থিক অনটনে জর্জরিত মকবুল স্ত্রী সন্তানদের দুবেলা অন্নের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। দারিদ্র্যের ভারে যখন মকবুল ন্যুব্জপ্রায় তখন রাজমোহন পালঙ্ক বিক্রি হয়ে গেছে শুনে অসুস্থ শরীরে পালঙ্কের দাবি নিয়ে হতদরিদ্র মকবুলের কুটিরে উপস্থিত হন কিন্তু মকবুলের ছেলে-মেয়েকে পালঙ্কে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে — অনুভব করেন পালঙ্কের কার্যকারিতা। পালঙ্কের দাবি ফিরিয়ে নিয়ে বলেন —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম - দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে।"[২]

মকবুলের পুত্র-কন্যার মধ্যে হিন্দুদের দেবদেবী রাধাগোবিন্দকে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে দুই ধর্মের সমন্বয় ও সম্প্রীতির স্বরটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিতির' গল্পে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতায় তথা স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রে আবাল্য বন্ধু সুখলাল ও জুলফিকার ছিটকে পড়ল দু'দেশে — একজন ভারতে অন্যজন পাকিস্তানে। তারপর বছর কয়েক ব্যবধানে একদিন হঠাৎ দু'বন্ধুর দেখা হল দু'দেশের সীমান্ত রেখায়। দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের দুই প্রতিহারি সুখলাল ও জুলফিকার — তাদের মাঝখানে পঞ্চাশ গজের মতো নোম্যান্সল্যান্ডের দূরত্ব। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব সৃষ্টি করলেও অন্তরের নৈকট্যকে ছিন্ন করতে পারেনি। তাই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেখা হলেও সীমান্তের দু'পাশ থেকে দু'বন্ধু এসে বসে নোম্যান্সল্যান্ডে। স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফিরে যায় তাদের ছেলেবেলায়। তারপর নোম্যান্সল্যান্ডে ঘাস বনে বিষাক্ত গোখরো সাপ সুখলালকে আক্রমণে উদ্যত হলে সাপটিকে হত্যা করে সুখলালের প্রাণ বাঁচায় জুলফিকার। অতঃপর তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয় নিজেদের দেশের সীমারেখায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস নারকীয় পরিবেশে যে তিতির গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সেই তিতির, গল্পের শেষে পরস্পর বিপরীত সম্প্রদায়ের দুটি মানুষ — সুখলাল ও জুলফিকারের মেলবন্ধনে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হলে সম্প্রীতির স্বরে মানবতার তথা সমন্বয়ের জয় ঘোষণা করে।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর 'রাম রহিমের কথা' গল্পটি মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ কেন্দ্রিক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা। গল্পে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষের পরস্পরবিরোধী শক্তি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে লেখক পরস্পর শত্রু হিসেবে নয় বরং সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন। হিন্দু সাজুমণি ও মুসলিম পাঁচুবিবি উভয়ের সন্তান দাঙ্গার বলি হলে শোকাকুল দুই সন্তান হারা মা পরস্পরের শোকে সান্ত্বনা দেয়। রামলালকে হারানো সাজুমণি ও রহিমকে হারানো পাঁচুবিবির ধর্ম আলাদা হলেও তাদের দুঃখ আলাদা নয় বরং একই সুতোয় গাঁথা। সন্তান হারানো মায়ের শোক কখনও পৃথক হতে পারে না তাই সাজুমণির শোকাকুল মন আর এক সন্তান হারানো মা পাঁচুবিবিকেই খোঁজে —

> "সে জানে আমার জ্বালা, আমি জানি তার জ্বালা। তাকে পেলে কাঁদতে পারতাম। বুকটা হালকা হতো।"[৩]

— দুই সম্প্রদায়ের হিংসা-হানাহানি, সংঘাত-সংঘর্ষ শেষ সত্য নয় বরং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই শেষ সত্য। তাই পাঁচুবিবি তার পুত্রবধূ বাতাসীর প্রসব যন্ত্রণা অনুভূত হলে সাজুমণিকেই ডাকে। সাজুমণিও ছেলের ঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় — তার হাতেই বাতাসী ও রহিমের তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। লেখিকার বর্ণনায় উঠে এসেছে —

> "রহিমের সন্তানকে মাটি ধরাবার কাজে ঘন্টা দুয়েক ব্যস্ত থাকে সাজুমণি। বাতাসীর দু-চোখে আকুল কান্না। ভয় কী? আর দুটো কার হাতে হয়েছিল? কোঁক পাড়ো, চাপ দাও, এই তো!"[৪]

লেখিকা গল্পে হিন্দু সম্প্রদায়কে দাঙ্গার পটভূমিতে মুসলিমদের ঘাতক হিসেবে যেমন দেখিয়েছেন তেমনি দাঙ্গা-পরবর্তীতে দেখিয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতেই মুসলিম প্রাণের আগমণ ঘটছে। যা আসলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে মানুষকে ইতিবাচক চিন্তার জগতে পৌঁছে দেয়।

আটের দশকের শেষ বা নয়ের দশক শুরুতে ভারতবর্ষে ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তথা মন্দির-মসজিদ লড়াই শুরু হয় তা কিন্নর রায়কে বিচলিত করে, যার প্রভাব পড়েছে তাঁর 'উপমহাদেশ' গল্পটিতে। গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে রাধেশ্যাম চিত্রকরকে কেন্দ্র করে। রাধেশ্যামের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে পটুয়া সমাজের নানান সমস্যার কথা। পটুয়াদের হিন্দু নামের সঙ্গে একটি মুসলিম নাম রাখতে হয়। প্রথম নামটি হয় ইসলামি দ্বিতীয়টি হিন্দু। নারীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। পটুয়াদের নিজস্ব মসজিদ আছে, মুসলিমদের মসজিদে যাবার অধিকার তাদের নেই। তারা গোমাংস খায়, শুয়োর খায় না। পূর্বেকার কড়াকড়ি শিথীল হয়ে বর্তমানে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সকলের সঙ্গে পটুয়া সমাজের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়। তাদের সুন্নত করাও বাধ্যতামূলক। এই পটুয়া সমাজেরই একজন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় চরিত্র রাধেশ্যাম চিত্রকর। তার অপর একটি নাম রহিমতুল্লা রাধেশ্যাম। হিন্দু ও মুসলিম দুটো নাম পটুয়া শিল্পী রাধেশ্যামের জীবনে বিড়ম্বনার কারণ হয়নি। কারণ —

> "আসলে রাধেশ্যাম কখনই ভাবেনি সে আসলে কি! রহিমতুল্লা না রাধেশ্যাম!"[৫]

আসলে শিল্পের প্রয়োজনে নিজেকে হিন্দু, মুসলমান বা সাঁওতাল ভাবতে তার মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়নি। জাতি-ধর্ম সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি থেকে সে মুক্ত। তাই শিল্পের প্রয়োজনে নিজেকে কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও সাঁওতাল ভাবতে হলেও তার জীবনে কোন ধর্মীয় পরিচয়কে সে মান্যতা দেয়নি। রাধেশ্যাম নিজেকে সমাজের কাছে পরিচয় করাত 'শিল্পী' হিসেবে। চিত্রকর রাধেশ্যামের এহেন ভাবনা বা জীবনবোধ আসলে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদের সপক্ষে বলিষ্ঠ উচ্চারণ।

প্রখ্যাত ছোটগল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের ভাগলপুরের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা একটি বিখ্যাত গল্প *'হিন্দু'*। গল্পের প্রেক্ষাপট ভাগলপুর জেলার রামপুর গ্রাম। এই রামপুরে থাকতেন নৈষ্ঠিক হিন্দু ব্রাহ্মণ মথুরানাথ। একদিন গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে এক মুমূর্ষু ব্যক্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। অচেতন ব্যক্তিটির শরীরে প্রাণের লক্ষণ দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। চাকর দয়ারামকে নির্দেশ দেন মুমূর্ষু, অসহায় ব্যক্তিটির মুখে একটু তৃষ্ণার জল দিতে — দয়ারাম মুমূর্ষু ব্যক্তিটির জাতের দোহাই দিয়ে দ্বিধা বোধ করলে মথুরানাথ বলে ওঠেন —

> "মরিজকে ভি জাত হোতা হ্যায় কেয়া! এক বেচারা মনুষ্য – উসে পানি পিলানা ধরম হ্যায়।"[৬]

ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে মানবধর্মের মূল কথাটিই ব্যক্ত হয়েছে মথুরানাথের কথায়। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মথুরানাথ পরের দিন মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। দেখা গেল হাসপাতাল, পুলিশ উভয়েই তার প্রতি উদাসীন। স্ত্রী-পুত্রের বাধা উপেক্ষা করে তিনি মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে নিজের বাড়ির আশ্রয় দেন। তাঁকে কেবল বাড়িতে এনে থেমে থাকেননি, তার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে তার শুশ্রূষাও করেন। ইতিমধ্যে মরণাপন্ন ব্যক্তিটির ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পায় — জানা যায় ব্যক্তিটি মুসলিম ধর্মাবলম্বী। মুমূর্ষু ব্যক্তিটির ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পাবার পরেও, এমনকি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ইঙ্গিত পেয়েও মথুরানাথ মুমূর্ষু ব্যক্তিটির প্রতি বিরূপ হননি বরং বলেন —

> "উয়ো এক বেহুঁস মনুষ্য ভি তো হ্যায়। আভি আরাম হোনে দেও, ফির চলা যায়গা। মেরা ধরম এইসে হি কহতা হ্যায়।"[৭]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-উন্মত্ত পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মথুরানাথের উকিল পুত্র বিপিন ও তার প্রতিবেশী জানকীনাথ অপরিচিত মানুষটিকে হাসপাতালে রেখে আসেন। মথুরানাথের ধর্ম ও ইচ্ছা তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি মথুরানাথ। তাই পরদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নানে গিয়ে আর বড়িতে ফিরে আসেননি। সমগ্র গল্পজুড়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মথুরানাথের একজন বিধর্মীর প্রতি আচার-আচরণে, সেবা-শুশ্রূষায় সর্বোপরি তাঁর উদার চিন্তা-চেতনায় সম্প্রীতির স্বর ধ্বনিত হয়েছে।

'দীন-ইলাহি' নব্বইয়ের দশকে হিন্দ-মুসলমান সম্প্রীতি নিয়ে লেখা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর একটি ছোটগল্প। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত সর্বধর্ম-সমন্বয়-ধর্মমত 'দীন-ই-ইলাহি'-র সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গল্পের নামকরণ করেছেন *'দীন-ইলাহি'*। এই সাদৃশ্যসূচক নামকরণ থেকে গল্পের সারবস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়— গল্পটিও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবহ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবন পাত্র, নুরুল ও স্বাতী সহায়ক চরিত্র। জীবন পাত্র নুরুল ও স্বাতীর জীবনের গল্পের পাঠক। জীবন পাত্র যেমন নুরুল-স্বাতীর গল্পটি পাঠ করে শুনিয়েছেন তেমনি পাঠক হিসেবে তাঁর প্রতিক্রিয়াও গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী আলোচ্য গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন। নুরুল ও স্বাতী দুজনেই উচ্চশিক্ষিত ও জাত-পাত, ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি থেকে তারা মুক্ত। তাই উভয়েই জাতি-ধর্মের বিভেদকে দূরে সরিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের এই বিবাহ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত হলেও সমাজ এই বিবাহবন্ধনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় না। একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও সামাজিক সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা তাদের এক ছাতের তলায় আসতে দেয়নি। এক সঙ্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা ও আকুতিতে তারা কলকাতা শহরের চতুর্দিকে বাড়ি ভাড়া খুঁজতে থাকে কিন্তু দুজন ভিন্নধর্মী যুগলকে কেউ

থাকতে দিতে সম্মত হয় না। গল্পপাঠক জীবন পাত্র কমিউনাল হারমনির উপর প্রোগ্রাম করে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ-বিদ্বেষ দূর করা যার লক্ষ্য সেই তিনিও নুরুল ও স্বাতীর আন্তঃধর্মীয় বিবাহ এবং একত্রে ঘরবাঁধার স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিতে পারেননি। এমনকি তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক বলে সুপরিচিত এক হিন্দু দম্পতি যাদের কাছে গো-মাংস ভক্ষণ ধর্মের আদর্শ ও সংস্কার বিরুদ্ধ নয়, তারাও নুরুল ও স্বাতীর বিবাহকে মেনে নেননি। মালকিন ভদ্রমহিলা নুরুলকে বিয়ে করায় স্বাতীর রুচিবোধ সম্পর্কে সন্দীহান হয়ে তাকে বলে —

> "কিছু মনে কোরো না, শিক্ষিত হতে পারো কিন্তু রুচিটা খুবই খারাপ। মুসলমান বিয়ে করলে? জানো না ওরা আমাদের কীরকম মেরেছিল। কী না অত্যাচার করেছে... তাড়িয়ে দিয়েছে...।"[৮]

সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরে বাড়ির সন্ধান না পেয়ে বিধ্বস্ত মন নিয়ে যখন স্বাতী নুরুল ময়দানের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার কথা ভাবে সেখানেও তাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় — নুরুলের নাম পরিচয় প্রকাশের পর তাকে শুনতে হয় —

> "নুরুম আলম? গভমেন্ট সার্ভিস? ছিঃ, একটা হিন্দু মেয়ের সর্বনাশ করছেন? সাসপেন্ড হয়ে যাবেন।"[৯]

ধর্ম সম্বন্ধে নুরুল উদারচেতা ও সহনশীল কেবল তার নামেই আছে মুসলিম ধর্মের স্বীকৃতি। নাম ছাড়া কোথাও সে ধর্মকে বহন করে না — সে রোজা রাখে না, নামাজও পড়ে না। স্বাতীকে বিয়ের সময় সে কবুল, ওলা, খোৎরা কিছুই সে করেনি। সে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে নিজের নাম পরিবর্তন করে হিন্দু নাম ও পদবি গ্রহণ করতে পারে। শুধু তাই নয় সরস্বতী পুজোর অঞ্জলিও সে দেয় মন্ত্র উচ্চারণ করে। পরবর্তীতে নুরুলের আসল ধর্মীয়-পরিচয় প্রকাশ পেলে সমাজের কাছে তাকে নিন্দিত, লাঞ্ছিত হতে হয়। নেই। কিন্তু নুরুল প্রকৃত অর্থে যথার্থই ধর্মীয় উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তাঁর কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। তাই লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাঁর আত্মকথন —

> "আমি তো একই, আমি তো সেই, সেই একই, শুধু নামটা..."[১০]

অসাম্প্রদায়িক নুরুল ও স্বাতীর ভালোবাসা এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও কূপুমন্ডুকতার আক্রান্ত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রচিত গল্পগুলো প্রত্যেকটিই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা এবং সম্প্রীতির সম্ভাবনায় প্রত্যাশী। তবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-কলুষিত সমাজের বিপন্ন রূপটিও ধরা আছে গল্পগুলোতে। সর্বোপরি আলোচ্য গল্পগুলোতে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন ও সম্মিলনের টানাপোড়নে বিধ্বস্ত জীবনের ছবিও অপ্রত্যক্ষ নয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালের দশটি গল্প আলোচনা করে বোঝা গেল ইংরেজরা সুকৌশলে দুই বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদের বীজ বপন করেছিল তা নির্মূল হয়নি ঠিকই কিন্তু সমাজে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও সহাবস্থানও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সমাজে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ-বিবাদ অব্যাহত থাকলেও এই বিরোধ-বিবাদ শেষ কথা নয়— বৃহৎ সমাজে অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ মানুষও রয়েছেন। তাই প্রগতিশীল লেখকেরা যুগে যুগে বারবার তাঁদের সাহিত্যে সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সর্বদা হিন্দু-মুসলমান প্রাণ সম্মিলনের সম্ভাবনায় আশাবাদী।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'ছেলেমানুষি', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ১৩২

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'পালঙ্ক', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ১৮২

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'রাম রহিমের কথা', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪৫

৪. তদেব, পৃ. ৩৪৭

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'উপমহাদেশ', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৬

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'হিন্দু', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৪৮৪

৭. তদেব, পৃ. ৪৮৯

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'দীন-ইলাহি', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৫২৭

৯. তদেব, পৃ. ৫২৮

১০. তদেব, পৃ. ৫৩১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 143 - 148
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হাসান আজিজুল হকের গল্প : ক্রোড়বিচ্যুত চিত্তের রক্তাক্ত ইশতেহার

মোঃ তাজুল ইসলাম
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
ও
গবেষক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
Email ID : islammd.tazul20@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
ক্রোড়বিচ্যুত, দেশভাগ, দ্বিজাতিতত্ত্ব, বিপর্যয়, দুই বাংলা, যাপিত জীবন।

Abstract
রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১)। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটে বিশ শতকের ষাটের দশকে। রচনারীতিতে স্বকীয়তা আর সুতীব্র মানবতাবোধের মেলবন্ধন দেখা যায় তাঁর বেশিরভাগ রচনার শরীর জুড়ে। এরই প্রতিফলন হয়েছে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে। হাসান আজিজুলের গল্পে সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত অতিরঞ্জন নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর রচনা সম্ভার। সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া নিষ্প্রভ, সম্ভাবনাহীন, পরাজিত মানুষগুলোর জীবন তুলে ধরাই তাঁর গল্প ভুবনের প্রধান অনুষঙ্গ। শৈশব-কৈশোর না পেরুতেই প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগের মতো মর্মভেদি ঘটনা, দুই বাংলার মানুষের দেশত্যাগের বেদনা, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী মানুষের চাওয়া-পাওয়ার অসামঞ্জস্যতা, দেখেছেন রাঢ়বঙ্গের মানুষের জীবনচিত্র। ফলে তাঁর গল্পের জগৎ নির্মিতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে এসব বিষয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর গল্পগুলো পেয়েছে নানান মাত্রা। রাঢ়বঙ্গের জীবন বাস্তবতা বিষয়ক ছোটগল্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দেশভাগ বিষয়ক ছোটগল্প, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী জনমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বিষয়ক ছোটগল্প, সামাজিক অবক্ষয়পীড়িত মানুষের নৈতিক ¯খলন বিষয়ক বহুমাত্রিক ছোটগল্পসম্বলিত গল্প ভুবন থেকে নির্দিষ্ট কিছু গল্প যেমন – 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' এবং 'খাঁচা' - গল্প দুটিতে ক্রোড়বিচ্যুত অর্থাৎ শেকড়হারা মানুষগুলোর যাপিত জীবনে এর প্রভাব কত বেদনাবিধুর ও হৃদয়ের ক্ষত কত গভীর তারই স্বরূপ উন্মোচন এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

Discussion

ধর্মকে পুঁজি করে ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মতো মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। ফলে আলাদা সীমারেখা বরণ করতে হয় দুই বাংলার মানুষকে। সেরিল রেডক্লিফের (১৯৪৭) অদূরদর্শী তুলির আঁচরে বিভক্ত হয়ে যায় এপার বাংলা-ওপার বাংলার সামষ্টিক অস্তিত্ব। এপার বাংলার সনাতন বিশ্বাসীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জান-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে শেকড়বিচ্যুত হয়ে চলে যেতে হয় ওপার বাংলায় (পশ্চিম বাংলা)। ঠিক একই ঘটনা ঘটে ওপার বাংলার মুসলিম জনসমষ্টির ক্ষেত্রে। দেশের, মা-মাটির মায়ার চিরকালীন বাধঁন ছেড়ে যাত্রা ঘটে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। নাটক, গল্প, উপন্যাস, ছোটগল্প কিংবা কবিতায় বিভিন্নভাবে এর প্রসঙ্গিকতা উঠে এসেছে। কিন্তু খুব কম লেখকের লেখায় আমরা এর প্রত্যক্ষ ছায়াপাত দেখতে পাই। হাসান আজিজুল হক সেই ব্যতিক্রম লেখকদের মধ্যে অন্যতম যিনি দেশভাগের রক্তাক্ত ক্ষতের উপর দাঁড়িয়ে শৈশবের মাটি-মায়ার ঘ্রাণকে ম্লান হতে দেখেছেন। রক্তাক্ত হয়েছে তাঁর অন্তকরণ -

> "দেশভাগ নিয়ে একটির পর একটি গল্প বা দীর্ঘ উপন্যাস লেখা আমার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু কোনোদিন সে পথ এগোনোর সাহস বা সংকল্প সংগ্রহ করতে পারলাম না। তবে বুকের পাঁজর ফাটিয়ে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে একটি দুটি করে গল্প বেরিয়ে এসেছে। ঠিক যেন করাতকলে হৃৎপিÐ-চেরাই হচ্ছে এরকম তীব্র কষ্টের সব মুহূর্তে এক একটি গল্প লেখা হয়েছে।"[১]

তাঁর এ মন্তব্য থেকে খুব সহজেই লেখকের হৃদয়ের সংবেদনশীল অনুভূতির কথা উপলব্ধি করা যায়।

আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৬) যেন সেই সংবেদনশীল চিত্তের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। গল্পে দেশভাগের ফলে শেকড়চ্যুত মানুষের তীব্র যন্ত্রণাময় প্রতিধ্বনি আর বেঁচে থাকার আকুল আবেদন প্রকাশিত হয়েছে গল্পের পরতে পরতে। চরিত্রগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব। তেতাল্লিশের মন্বন্তর (১৯৪৩), হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দেশভাগের (১৯৪৭) প্রভাব মানুষের সহজাত বেঁচে থাকাকে কতটা গ্লানিময় ও স্খলিত করে তুলেছিল তারই বাস্তব প্রতিবিম্ব গল্পের তিন যুবক-সুহাস, ফেকু আর ইনাম এবং বৃদ্ধ ও তার পরিবার। দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত মুসলিম পরিবারটির ওপার থেকে এপার বাংলায় এসে অসহায় ও ক্লেদাক্ত জীবনযাপনের দুঃখবোধ যেন পাঠকের চিত্তেও বিষাদরেখায় অঙ্কিত হয়। গল্প পাঠের শুরুর দিকে পাঠক যেন কোনোভাবেই বুঝতে পারেন না তিন যুবক গল্প করতে করতে আসলে কী উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। ফেকুর পকেটমারের গল্প, সুহাসের মামার বিয়ের গল্প এবং ইনামের স্কুল ত্যাগের গল্প-তিনটি বিচ্ছিন্ন গল্প যেন অসংলগ্ন এক গল্পের কথকতা হয়ে পারম্পার্য রক্ষা না করেই যে যার মতোই বলে যেতে থাকে।

> "করবটা কী কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি না হয় -। লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ-ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি-ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়োয়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যাবসা করি-কী কলাডা করবানে?"[২]

আপাত দৃষ্টিতে তিন যুবকের গল্পকে খাপছাড়া মনে হলেও তাদের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে নির্মম সমাজবাস্তবতার ক্লেদাক্ত রূপটি। যে রূপটি একটি রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার তথা শিক্ষা বঞ্চিত হওয়া যুবকদের নৈতিক স্খলনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। গল্পের একটু সামনে এগুলেই নৈতিক স্খলনের এই রূপটি আরো তীব্রভাবে ধরা দেয় –

> "আজ না আসলিই হতো - সুহাস অভিযোগ করতে থাকে, ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কচি ছ্যামরা, দুদু খাবা। সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেনে এহুনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেনে।"[৩]

ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে গল্পের মূল প্লট। তিন যুবক যে বাড়ির সামনে থামে সেই বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ বের হয়ে আসে, দুটো শুকনো পা এসে দাঁড়ায় করবী গাছের কাছে। যে বৃদ্ধ ও তার পরিবার দেশভাগের ফলে ক্রোড়বিচ্যুত হয়ে উদবাস্তু জীবনের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে অথবা মানতে বাধ্য হয়েছে। ঠাণ্ডায় বাইরে না দাঁড়িয়ে ফেকু, ইনাম ও সুহাসকে ভেতরে যেতে বলে বৃদ্ধ। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর-বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।[৪] দুটো টাকার বিনিময়ে বৃদ্ধ

তার আত্মজার সম্ভ্রমকে যেন বিকিয়ে দেয় ছেলেদের কাছে। পরিবার নিয়ে কেবল বেঁচে থাকাই অর্থবহ হয়ে উঠেছে, বাকিসব যেন অর্থহীন। এই গ্লানিময় বেঁচে থাকার স্বরূপ যে কতটা বেদনা মথিত তার বাস্তব দৃষ্টান্তই যেন উঠে এসছে বুড়োর গল্পে –

> "এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা! ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কী ভালোই না বাসে! এই দ্যাখো না, বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্য।"[৫]

এই চা খাওয়ানোর ব্যাপারটা নিছক একটা বাহানা। আসলে যুবকেরা থাকলে হয়তো কন্যার সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্থ লাভের পথ সুগম হবে ভেবেই চায়ের কথা বলে বৃদ্ধ। অবশেষে ফেকু আর সুহাস মিলে টাকা দেয় এবং দুজনেই বৃদ্ধে কন্যার কাছে যায় জৈবিক লালসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে। এদিকে বৃদ্ধ ইনামকে ডাকে গল্প করার ছলে। গল্পের তীব্রতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে বুড়োর শ্লেষাযুক্ত কাশি। আর সেই সাথে জীবন-জগৎ সমস্তটাই অসহনীয় হতে থাকে। বিষবাষ্প পান করে বেঁচে থাকার অসহনীয় গ্লানি যেন ছেয়ে যায় বুড়োর অন্তর জুড়ে –

> "বুড়ো গল্প করছে...আমি যকন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম- আমি একটা করবী গাছ লাগাই... তখন হু হু করে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ-সুহাস হাসছে হি হি হি- আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামল বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এল-আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ-প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই তুমি বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো- এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ?"[৬]

জীবন ধারণের এমন নির্মম বাস্তবতা যেন বৃদ্ধের রোপিত করবী গাছের প্রতীকী ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত বহন করে। কন্যার দেহ বিক্রির টাকায় যে জীবন বেঁচে অছে তা যেন বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার মতোই মর্মভেদি! বুড়োর বেঁচে থাকা আর যুবকদের কথকতা যেন সমাজের ক্ষতকেই চিহ্নিত করে।

> "অনাকাঙ্ক্ষিত দেশভাগ পিতা ও মেয়ের জীবনকে দাঁড় করিয়েছে এক বিমূঢ় অভিজ্ঞতার সামনে। দেশভাগে তাদের কোন হাত নেই, কাঙ্ক্ষিতও ছিল না। গল্পে রাজনীতির আবরণ প্রচ্ছন্ন আবরণ মাত্র কিন্তু গল্পটি পড়া শেষে মনে হয় প্রবল রকমের একটি রাজনৈতক গল্প। ব্যক্তি বিশেষ বা পরিবার বিশেষের হলেও দেশভাগের ফাঁদে পড়া সকল উদ্বাস্তু মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে গল্পের পাত্র-পাত্রীরা। এটি শুধু একটি করবী গাছের গল্প নয়, অসংখ্য উদ্বাস্তু প্রাঙ্গনের করবী গাছের গল্প।"[৭]

খাঁচা (১৯৬৭) গল্পেও দেশভাগের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে এনেছেন হাসান আজিজুল হক। সরোজিনী-অম্বুজাক্ষ দম্পতি দেশ (তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান) ছেড়ে যাবে যাবে করেও শেষ পর্যন্ত আর যেতে পারেনি। দেশভাগের ফলে একটি মুসলিম পরিবারের সঙ্গে বাড়ি বদল করে ইন্ডিয়া চরে চলে যাবার আশায় আশায় দিন গুনতে থাকে তারা। বিনিময়ের বন্দোবস্ত করতে গেলে মুসলমান লোকটির সাথে অম্বুজাক্ষের কথোপকথনে আরো কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে –

> "...আপনি এসে নতুন করে পত্তন করুন না। আমরা কী আর আছি এখানে? এ বাড়িতে আমরা একরকম মরেই গেছি বলতে পারেন। কেন যাচ্ছেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। আপনারা কেন আসছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম উল্টো।"[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিজ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দুরবস্থার প্রভাব যেন পরিবারটির অর্থনৈতিক দীনতা, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংশয় ও সেই সাথে তীব্র মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েনসহ যাবতীয় সমস্যার মূল কারণ। এই সত্যটি যেন এপার বাংলা-ওপার বাংলা দুই বাংলার জন্যই নির্মমভাবে সত্য। তৎকালীন ভারত-পাকিস্তানের হিন্দু কিংবা মুসলিম কেউই এই রাজনৈতিক হঠকারী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি কিন্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। জীবন যেন স্থবিরতার কাছে বারবার হার মেনে যাচ্ছে। হয়তো স্থানান্তর ঘটলে জীবনে গতি আসবে এই প্রত্যাশা মনে মনে জিইয়ে রাখে-এমন হয়েছে আজকাল যে চুল-নখ বড় হলে মনে হয় একেবারে সেখানে গিয়ে কাটাব।[৯]

কিন্তু শেষপর্যন্ত আর দেশ ত্যাগ করে যাওয়া হয় না তাদের। ততদিনে অবশ্য পরিবারের ভেতরে ঢুকে গেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। চোখের সামনেই সাপের কামড়ে প্রাণ চলে যায় বড় ছেলে অরুণের, বাবা কালীপ্রসন্ন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে জীবনের পরাজয় মেনে নেন। ছেলেকে অনুরোধ করেন যেন নিজ হাতে মেরে ফেলে!

> "মানুষ নিজের ইচ্ছায় মরতে পারে না হিরণ (অম্বুজাক্ষ), তবে নিজেকে মেরে ফেরা যায় ইচ্ছে করলে। আমাকে মেরে ফেল বাবা, তোর পায়ে পড়ি, তোর ভালো হবে- আমি আর্শীবাদ করবো তোকে।"[১০]

জীবনের বোঝা কত ভারি হয়ে এলে মানুষ নিজ ছেলেকে অনুরোধ করে নিজেকে মেরে ফেলতে তা বুঝতে খুব বেশি শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। দুঃখবোধ, হতাশা, অপ্রাপ্তি সবই যেন জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। ধীরে ধীরে নিজেদের মরতে দেখার চেয়ে যেন একেবারে মরে যাওয়াই ভালো মনে হচ্ছে কালীপ্রসন্নের কাছে। বাড়ির দেয়ালের পলেস্তারা খসে পরা যেন পরিবারটির বিপন্নতাকেই ইঙ্গিত দেয়। জীর্ণ-শীর্ণ বাড়িটি যেন দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হতে থাকে তবুও নিজ বাড়ি-নিজের শেকড়ের টান যেন নিজেরই অস্তিত্বের টান। অথচ তাদের কিছু করারও নেই। এই না থাকার যন্ত্রণাই যেন খাঁচায় বন্দি থাকা পোষা পাখিদের জীবনের সাথে তুলনা করা যায়। আর তাই হয়তো গল্পের নামের সাথে সরোজিনী-অম্বুজাক্ষ পরিবারের জীবনের বোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত বদল ঘটে অম্বুজাক্ষের। অম্বুজাক্ষ শেকড় ছেড়ে যেতে পারেনি কিন্তু মনের দিক থেকে বাস্তুচ্যুতি ঘটে গেছে ঠিকই –

> "খবরাখবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয়, এখানে তবু খেতে পাচ্ছি দুমুঠো-সেখানে লোকজন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। ...কোথাও যাব ভাবতেই ভালো-যাওয়া ভালো না। তাই না? এতদিন যাব যাব করে কাটালাম। এখন যেতে হবে না ভেবে দেখি কেমন লাগে।"[১১]

সমগ্র সত্ত্বাকে উৎপাটন করে মাতৃভূমি ত্যাগ যে কতটা কঠিন এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠতে যাচ্ছে সেই বাস্তবতা অম্বুজাক্ষ ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিল আর তাই হয়তো সে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আকস্মিক এমন সিদ্ধান্ত তার স্ত্রী সরোজিনীর মোটেও ভালো লাগেনি। রাগে অম্বুজাক্ষের সেতারটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে –

> "দেশত্যাগের মাধ্যমে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সামান্য যে প্রত্যাশা বা স্বপ্ন জেগেছিল, তার অপমৃত্যু ঘটেছে বলে সরোজিনীর এই উন্মাদনা। সরোজিনীর আক্রমণের মুখে অম্বুজাক্ষের 'আমাকে নয়, আমি নই' চিৎকার দেশভাগের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসে।"[১২]

একটা ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কীভাবে রাষ্ট্রের বসবাসকারী মানুষের সাদামাটা জীবনকে নারকীয় যন্ত্রণায় উপনীত করে তার বাস্তব সাক্ষী উপরে উল্লেখিত গল্প দুটির প্রত্যেকটি চরিত্র। ফেকু, ইনাম, সুহাসের প্রগলভ জীবন, আত্মজা রুকুর দেহ বিক্রির টাকায় বেঁচে থাকা বৃদ্ধের যন্ত্রণাময় আর্তচিৎকার, সেতারের করুন সুর তোলা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অম্বুজাক্ষ, উন্মাদ সরোজিনী, হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কালীপ্রসন্ন সবাই যেন একটা বিপন্নতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যে বিপন্নতা সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের কারণে। এরা সবাই যেন ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হওয়া জনগণেরই প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। বাহ্যিকভাবে কেউ রক্তাক্ত হয়নি ঠিকই কিন্তু উদ্বাস্তু জীবনের যে অনুভূতি তা প্রত্যেক চরিত্রের অন্তরে যে রক্তক্ষরণের স্রোতধারা বয়ে চলেছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* গল্প প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষের মন্তব্যটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কেশো-বুড়ো উদ্বাস্তু মানুষ, দেশ-ছাড়া অসহায় এক পিতা। চরিত্রসমূহের ভাষা থেকে বোঝা যায় এদের বাস উত্তরবঙ্গে। পক্ষান্তরে কেশো-বুড়ো শুকনো-দেশ থেকে এসেছে সে অঞ্চল। বোঝা যায় দেশ-বিভাগের পটভূমিতে লেখা এই গল্প। দেশ বিভাগ মানুষকে বাংলার জনসাধারণকে যে ভাবে বিপন্ন উন্মুলিত-লাঞ্ছিত করেছে, তারই যেন প্রতীকী রূপ কেশো-বুড়ো।"[১৩]

শেকড়হীনতার যন্ত্রণা মানব জীবনকে ক্রমেই করবী গাছের বিষাক্ত বিষের সাথে মিলিয়ে দেয় আবার কখনো বা খোলা আকাশের পরিবর্তে সংকীর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য করে তোলে। করবী ফুলের গাছ লাগানো বুড়ো কিংবা খাঁচার মতো বাড়িতে বাস করা বন্দি অম্বুজাক্ষ পরিবার যেন সেই যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে যাওয়া হাজার হাজার মাতৃভূমির ক্রোড়বিচ্যুত মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করে। লেখক হাসান আজিজুল হকও তাদের মতো শেকড়চ্যুত হয়েছেন শৈশবে। আর এই কারণে তাঁর আত্মজা ও একটি করবী গাছ এবং খাঁচা গল্প হয়ে উঠেছে ক্রোড়বিচ্যুত চিত্তের রক্তাক্ত ইশতেহার হয়ে ফুটে উঠেছে। আর তাই –

> "দেশভাগ-দেশত্যাগে মানুষকে যখন হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে- আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেননি।"[১৪]

হাসান আজিজুল হক যেন তাঁর সুনিপুণ তুলির আঁচরে সে কথাই লিখে গেছেন তাঁর কথাসাহিত্যের শরীর জুড়ে।

ভিন্ন আঙ্গিকের অভিন্ন বেদনার করুন সেতার ধ্বনি হয়ে উঠেছে তাঁর *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* এবং *খাঁচা* গল্প দুটি যা বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের বাস্তবতা যেখানে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে এক অনবদ্য আখ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে।

Reference:

১. হক, আজিজুল, 'প্রসঙ্গ কথা', দেশভাগের গল্প, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১৮
২. হক, আজিজুল, শ্রেষ্ট গল্প, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, বাংলামোটর, ঢাকা, পৃ. ১০৫
৩. তদেব, পৃ. ১০৬
৪. তদেব, পৃ. ১০৭
৫. তদেব, পৃ. ১০৮
৬. তদেব, পৃ. ১০৮
৭. আনোয়ার, চন্দন, *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল*, নভেম্বর ২০১৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৬
৮. হক, আজিজুল, শ্রেষ্ট গল্প, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, বাংলামোটর, ঢাকা, পৃ. ১৪৯
৯. তদেব, পৃ. ১৪৯
১০. তদেব, পৃ. ১৫১
১১. তদেব, পৃ. ১৫৩
১২. আনোয়ার, চন্দন, *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল*, নভেম্বর ২০১৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৫০
১৩. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ছোটগল্পের শিল্পরূপ: আত্মজা ও একটি করবী গাছ 'গল্পকথা', মাঘ ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২, বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, পৃ. ৭১
১৪. সিকদারের, অশ্রুকুমার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিন্দুমুসলমান, কালান্তর, পৌষ ১৩৫৫(পরিবর্ধিত সংস্করণ), কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
তপোধীর ভট্টাচার্য, কথাপরিসর বাংলাদেশ, ডিসেম্বও ২০১৭, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ-দেশত্যাগ, ১৯৯৪, কলকাতা, অনুষ্টুপ।
সানজিদা আখতার, *বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ (১৯৪৭-১৯৭০)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০২।
উদয়চাঁদ দাশ (সম্পা), দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৬।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 149 - 163
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে গৌণ চরিত্রের ভূমিকা ও জীবন-ভাবনা

ড. মোঃ মিসবাহুল ইসলাম
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, শান্তিপুর, নদীয়া
Email ID: misbahul89@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Gouno charitrer bhumika, Jiban-Bhabana, Probhab.

Abstract
Literature is a reflection of society and culture. And so Manik Banerjee wanted to capture the full picture of life even in this youngest form of literature, wanted to find the real, down-to-earth people, that is, the meaning of the whole human being. In Manik's stories, we get to know the innermost parts of the human mind, the complex mind. He presented the 'reptilian nature' that exists in the human mind to the reader through short stories. And he created various secondary characters to properly unfold all these events in the story. How these secondary characters have influenced his stories is explained through a discussion of a few stories.

Discussion

সাহিত্য হল সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিরূপ। আর তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের এই কনিষ্ঠতম সংরূপটিতেও ধরতে চাইলেন জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি, খুঁজতে চাইল বাস্তবের মাটি-ঘেঁষা-মানুষকে তথা 'গোটা মানুষের মানে।' মানিকের গল্পে তাই আমরা পাই মানব মনের আঁতের কথা, জটিল মনের পরিচয়। মানুষের মনে যে 'সরীসৃপ' সত্তা রয়েছে তা পাঠকের সামনে তিনি তুলে ধরলেন ছোটগল্পের মাধ্যমে। আর এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে যথাযথভাবে গল্পে পরিস্ফুটনের জন্য নির্মাণ করলেন নানান গৌণ চরিত্রের। তাঁর গল্পে এই গৌণ চরিত্রগুলি কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা কয়েকটি গল্প আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যখন বাংলার আকাশে শুধুই হতাশা, দুর্ভাবনা, ভয় এবং সানাইয়ের সুর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তেমনই এক সময়ে আশ্বিন ১৩৫৩ কথা-শিল্প (গল্প সংকলন) নামক পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্রান্ত গল্পটি প্রকাশিত হয়। কার্তিক ১৩৫০ সালে খতিয়ান গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এই যুদ্ধকালীন সময়ের ছাপ গল্পটির পরতে পরতে লক্ষ করা যায়। গল্পটি মূলত দু'জন স্বপ্নসন্ধানী মানুষের; প্রতিমা-মহেশের। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিল জীবনে সানাইয়ের সুর বাজার। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালীন সময় কীভাবে তাদের জীবনের সুন্দরগুলোকে মলিন করে তুলেছে তার পরিচয় পাবো। আর এই মলিনতার ছাপ ধরেই সমাজের তিনটি শ্রেণির পরিচয়ও পেয়ে যাব। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ সচেতন শিল্পী। তাই তাঁর গল্পে সমাজভাবনার বিন্যাস থাকাটাই স্বাভাবিক। এই গল্পেও আমরা দেখব একদিকে রয়েছে ধনতান্ত্রিক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ বা মালিক শ্রেণি যারা সময়ের চাহিদায় কিছু মানুষকে চাকরি দেয় এবং কার্যসম্পন্ন হলে তাদের একেবারে ছুটিও দেয়, যার শিকার হয়েছে - মহেশ, মাখন, বীরেন এবং মিনতির বর। অন্যদিকে রয়েছে একেবারে খেটে খাওয়া মানুষ অর্থাৎ আহ্লাদীর মতো কাজের ঝি-রা, যারা পেটের তাগিদে কোলের বাচ্চাকে লুকিয়ে রেখে কাজে যোগ দেয় এবং পরে কান্নারত শিশুকে মাটিতে এক কোণে ফেলে নির্লিপ্তভাবে কাজ করে —

> "ছেলেটা মেঝেতে পড়ে কাঁদে বলেও আহ্লাদী যেন অপরাধী হয়ে থাকে। অন্য ঝিদের তুলনায় সে তাই আশ্চর্যরকম নরম, ভালভাবে কাজ করতে উৎসুক।"[১]

শিশুর কান্নার জন্য নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকে। আসলে এই শ্রেণির মানুষরা সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষদের থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা রাখে না।

আবার প্রতিমাদের মতো সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা একদিকে যেমন মালিক শ্রেণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তেমনই আবার মালিকের কাজের প্রতি 'সম্মানজনক' দায়বদ্ধতা থাকে। আবার কীভাবে নিজের অজান্তেই নিজেরাই কখন এই মালিক শ্রেণির মতোই ব্যবহার করে বসে সমাজের একেবারে নীচু শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে। তাই আহ্লাদীর বাচ্চা কাঁদতে থাকলে—

> "প্রতিমা মাঝে মাঝে অতিষ্ট হয়ে বলে, একটু সামলে নাও ছেলেকে আগে।... গোড়ায় জানলে ওকে প্রতিমা রাখত না। প্রথম দুদিন বাচ্চাটাকে আহ্লাদী সঙ্গে আনেনি— কোথায় কার কাছে ফেলে এসেছিল কে জানে!"[২]

আসলে গল্পটি প্রতিমাদের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের Self Realization-এর গল্প। তাই গল্পের শেষে এই প্রতিমাকেই দেখব আহ্লাদীর ছেলের 'গা পোড়া জ্বর'-এর কথা শুনে—

> "কাজ করতে এলি কেন তুই? ধমক দিয়ে বলে প্রতিমা।"[৩]

আর এরপরে আহ্লাদি যা বলে তার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ের বিশ্রী রূপটি ধরা পড়ে পাঠকের সামনে—

> "না হলে তো মাইনে কাটবে। খাব কী? আহ্লাদী বলে দাঁতে দাঁত কামড়ে।"[৪]

এখানেই আহ্লাদী গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র প্রতিমার জীবন-ভাবনার পরিবর্তন এনেছে। তবে গল্পে একা আহ্লাদী এই কাজটি করেনি। একই সঙ্গে উপস্থিত দুটি পরিবার যারা মূলত গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবেই বিবেচিত অর্থাৎ মিনতি, মাধব, সুধার স্বামী এদের চোখে দেখা পারিবারিক জীবনও প্রতিমার উপর প্রভাব ফেলেছে। শুধুমাত্র ক্ষণিকের উপস্থিতিতেই এই চরিত্রগুলো প্রধান চরিত্রের মানসিকতায়, ভাবনায়, নিম্ন শ্রেণির মানুষদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনেছে। তাই যে প্রতিমা একসময় আহ্লাদীর বাচ্চার কান্নায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিল সেই প্রতিমাই বাচ্চার অসুস্থতার জন্য ছুটি নিতে বলেছে আহ্লাদীকে। আর এখানেই গৌণ চরিত্রগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পাঁচ বছর পর কর্মক্ষেত্র থেকে মুকুলের বাড়ি ফেরা ও বাড়িতে আসার পর পরিবর্তমান জীবনের ছবিগুলো নিয়ে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগন্তুক গল্পটি। গল্পটি ১৩৩৯ সালে কার্তিক সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে অতসীমামি গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'আগন্তুক' গল্পটি একাধারে যেন চরিত্র চিত্রশালা। গল্পে মুকুল ছাড়া বাকি সব চরিত্রগুলোকেই আমরা গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। মুকুলের আগমনকে ঘিরে গল্পের প্রত্যেকটি গৌণ চরিত্রের কল্পনা ও ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করে থাকব। অতুল, বাসন্তী, মাসি, পটলি সকলেই মুকুলের আগমনকে কেন্দ্র করে তাদের ভাবনার জগৎ আবার ভাবনার সঙ্গে মুকুলের কর্মক্রিয়ার ছেদ ঘটায় তাদের মান, অভিমানও প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পটলির কথা—

> "পটলির আবার অভিমান হইয়াছে। দাদা আসিয়া খোকাকে দেখিবে। কোলে নিয়ে আদর করিবে, এ তাহার অনেক দিনের সাধ। এ সাধ মিটিতে দেরি হইবে না, খোকার ঘুম মিনিটে মিনিটে ভাঙে, কিন্তু দাদা যে কতদূর পর হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পটলির সাধের আর তেমন জোর রহিল না। বাড়ি পা দেওয়া মাত্র সকলের আগে তার খোকাকে দেখিবার আগ্রহ নাই দাদার। এ তো সে দাদা নয়।"[৫]

এই সমস্ত গৌণ চরিত্রগুলি ছাড়াও গল্পে আর একটি গৌণ চরিত্রের উপস্থিতি আমরা লক্ষ করব, সেটি হল মুকুলের স্ত্রী শশীমুখী মুকুলের আগমনকে কেন্দ্র করে একমাত্র শশীমুখীর কোনো কল্পনা বা অভিসারের কথা গল্পে প্রকাশিত হয়নি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু গল্পটির নামকরণের সার্থকতা দানে ও তৎকালীন নারী সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে শশীমুখী।

গল্পে শশীমুখীর প্রথম প্রবেশ যখন মুকুল বাড়ি এসে উপস্থিত হয়—

"শশীমুখী রান্নাঘরে গিয়া লুকাইল।"[৬]

পুরো গল্প জুড়ে আমরা শশীমুখীর তেমন প্রত্যক্ষ উক্তি পাই না। গল্পে শশীমুখীর যেটুকু পরিচয় পাই—

পাঁচ বছর পর স্বামীকে রান্নাঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, চোখাচোখি হল 'ফরসা মুখ ডগডগে লাল' হয়ে যায়। অর্থাৎ শশীমুখী আর পাঁচজন বাঙালি গৃহবধূর মতোই। আসলে পুরো গল্প জুড়ে মুকুল সকলের কাছেই আগন্তক হিসাবে গণ্য হলেও প্রকৃত আগন্তক হয়ে উঠেছে তার স্ত্রীর কাছেই। শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের দেখা হল অনেক পরে। তারা আগে যে ঘরে থাকত সেখানেই তাদের বিছানা করা হয়েছে। কিন্তু —

"পূর্বের শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের পঁচিশ বৎসর দেখা হয় নাই, ফুলশয্যায় বিছানাই তাই সত্যিকারের ফুল ছিল। এবারের বিরহ মোটে পাঁচ বছরের বিছানাই তাই সুতোর ফুল।"[৭]

শশীমুখী আজ ভেজা মুখ আঁচলে মুছে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে— 'প্রেমে নয়, উত্তজনায় নয়, ভয়ে তাহার বুক ঢিপঢিপ করছে।' কেননা, একটা সময় স্বামী যখন রোজ তার কাছে থাকত তখন শশীমুখীর মুকুলের 'মন জোগাইয়া' চলা খুব সহজ ছিল না। যদিও তখন সে মুকুলের থেকেই নানান নির্দেশ পেত কেমন করে তাকে ভালোবাসবে, কী করলে তাকে খুশি রাখা যাবে। কিন্তু আজকের 'অসাধারণ অবস্থায়' শশীমুখীর কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছে না। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে—

"মাস্টারের কাছে পড়া-দেওয়ার মতো করিয়া সে তাই বলিল ভালো ছিলে?"[৮]

এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও শশীমুখী গল্পের নামকরণের সার্থকতা দান করেছে। একই সঙ্গে তৎকালীন গৃহবধূর সামাজিক অবস্থা প্রকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে মুকুলও প্রকৃত আগন্তক হয়ে উঠেছে। এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও শশীমুখী গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরীসৃপ গল্পে আমরা সর্পিল সমাজের পরিচয় পাই। এই সর্পিল জগতে আসলে প্রতিটি মানুষই সরীসৃপ তুল্য। প্রতিটি মানুষের মনই সর্পিল। গল্পে দেখব বনমালী, চারু, পরী প্রত্যেকেরই সর্পিল মনের পরিচয় পাব। প্রত্যেকের মধ্যেই একই সঙ্গে দুটি সত্তা বিরাজমান। প্রত্যেকেরই মুখ এবং মুখোশের আড়ালে রয়েছে আর একটি মুখ। তাই গল্পে বনমালী-চারু, বনমালী-পরী, চারু-পরী প্রত্যেকটি সম্পর্কের সমীকরণে রয়েছে স্বার্থকামী মানুষের সর্পিল মনের পরিচয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পে একমাত্র ভুবন চরিত্রটির মধ্যে কোনো জটিল মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। আসলে গল্পে ভুবন গৌণ চরিত্র হিসাবে গণ্য হলেও একমাত্র চরিত্র যে এই সর্পিল জগতে থেকেও নির্মল থাকতে পেরেছে। তাই গল্পে আমরা ভুবনকে বিকৃত চরিত্র হিসাবে পেয়ে থাকি। আসলে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে এই সর্পিল জগতে সহজ-সরল-নিঃস্বার্থ মানুষেরা আসলে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আবার গল্পে ভুবনের এই সহজ-সরলতা বনমালীর মতো হিসেবি, স্বার্থপর, জটিল, কুটিল মানুষের মনেও একপ্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করে থাকে। তাই বনমালীর মতো কুটিল মনের মানুষও ভুবনকে ভালো না বেসে থাকতে পারেনি—

"চারুর জন্যে পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত, চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে, বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।"[৯]

আসলে এই সর্পিল জগতে ভুবন হল এক টুকরো মানবিকতা। আর এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও ভুবন গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখব ভুবন যেমন এই সর্পিল জগৎ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে মায়ের উদ্দেশ্যে একই রকমভাবে বনমালীর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনটি—

"দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও ভুবন গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্পে আমরা ভুবনের যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তা হল ভুবন স্থুল বুদ্ধির অধিকারী ও সে সকলকেই সহজ-সরলভাবে বিশ্বাস করতে পারে। গল্পে ভুবন একমাত্র চরিত্র যার মধ্যে কোনোরকম সরীসৃপ সত্তা নেই। ভুবন সম্পর্কে চারু যা বর্ণনা দিয়েছে তা এরকম—

> "ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।"[১১]

আর এরকম ভুবনের প্রতি চারুর অদম্য ভালোবাসা দেখে বনমালীর মনে হয়েছে—

> "এই ছেলেকে অত ভালোবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ।"[১২]

গল্পে ভুবনের পরোক্ষে উপস্থিতি থাকলেও প্রত্যক্ষ ভাবে ভুবনের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি একেবারে গল্পের শেষপ্রান্তে এসে। আর এই ভুবনকে কেন্দ্র করেই গল্পের শেষে অন্যান্য চরিত্রগুলির সরীসৃপ সত্তার চরমরূপ প্রকাশিত হয়েছে পাঠকের সামনে। চারুর মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়েও দেখব কিভাবে ভুবনকে কেন্দ্র করে বনমালী ও পরীর চরিত্রের সরীসৃপ সত্তার প্রকাশ ঘটেছে—

> "মানে বুঝুক আর না বুঝুক বনমালী বারকতক তাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্য তার কোন ভয় নাই, ভুবনের ভার সে নিল।"[১৩]

অন্যদিকে কিছু বলা দরকার বলে পরীও দিদিকে জানাল—

> "ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনও।"[১৪]

কিন্তু এ প্রসঙ্গে চারুর যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে আমরা চরিত্রগুলির সরীসৃপ সত্তার আঁচ পেয়ে থাকি গল্পে—

> "কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথাও বিশ্বাস করে। চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, মৃত্যু যাহার বিধান তারও বোধহয় ক্ষমতা নাই যে শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।"[১৫]

কিন্তু এসবের মধ্যে একমাত্র ভুবন সহজ-সরল মন নিয়ে পরী ও বনমালীকে ভালোবেসেছে তাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। তাই দেখব মাকে ওষুধ খাওয়ানোর কথা বনমালী অন্য একজনকে দায়িত্ব দিলেও ভুবন নিজে থেকেই সে দায়িত্ব নিয়েছে ও বনমালীকে ঠিক সময়ে গিয়ে মনে করিয়েছে। আর এসব দেখে বনমালীর মতো হিসেবি জটিল কুটিল মানুষও ক্ষণিকের জন্য অবিচলিত হয়ে পড়েছে। –

> "কেন করিয়াছে? তাহাকে একটু খুশি করার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য।"[১৬]

আবার এই ভুবনকে কেন্দ্র করেই দেখব পরীর সর্পিল মনের চরমরূপ প্রকাশ। কিন্তু ভুবন মাসি পরীর চক্রান্তকেও সরল মনে বিশ্বাস করেছে। তাই মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন পরী ভুবনকে বলল—

> "জামা গায়ে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।"[১৭]

ভুবন নিষ্পাপ মন নিয়ে পরীর এই কথাগুলোকে বিশ্বাস করেছে। পরীর কথা মতো বেরিয়ে এসে ট্রেনে উঠেছে। আর পরীর কথা মতো পরদিন হাটার সময় ট্রেন থেকে নেমে পড়ারও সম্মতি জানিয়েছি। আর এসবের মাঝেও যেন ভুবন তার সহজ-সরল মন নিয়ে পরীর কুটিল মনের ষড়যন্ত্রকে নিজের অজান্তেই বিদ্রুপ করেছে—

> "খোকাকে দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।"[১৮]

যা শুনে পরী খোকাকে আরও বেশি করে বুকে আঁকড়ে ধরেছে। এভাবে ভুবন গল্পে উপস্থিত থেকে বাকী চরিত্রগুলির সরীসৃপ সত্তাগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। এমনকি নিজের নিঃস্বার্থ আনুগত্য দিয়ে একদিন যে বনমালীকেও সে বিচলিত করতে পেরেছিল গল্পের শেষে সেই বনমালীর সরীসৃপ সত্তার চরম রূপ প্রকাশ হতে দেখি। –

> "একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?
> বনমালী বলিল, আপদ গেছে, যাক।"[১৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর এখানেই ভুবন গল্পে গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বনমালী পরীর মতো মানুষরা কতটা হিসেবি, কঠিন, জটিল, কুটিল মানসের হতে পারে গল্পে এই ভুবন চরিত্রটির উপস্থিতির মাধ্যমে পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। এখানেই গৌণ চরিত্র হিসাবে ভুবন চরিত্রটি সার্থকাত লাভ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিড়ম্বনা গল্পটি একজন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের দশ বছর বিরহে কাটানোর পর পুরোনো প্রেমিকার কাছে 'বিড়ম্বনার' গল্প। গল্পটি আষাঢ় ১৩৩৮ সালে আগতা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪৫ সালে মিহি ও মোটা কাহিনী গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র সুকলের নতুন হেডমাস্টার অনন্ত, বুড়ো শিবরাম ও শিবরামের কন্যা মহাশ্বেতা। এছাড়াও উপস্থিত রয়েছে মহাশ্বেতার ছেলে ও মাসি এবং গল্পে পরোক্ষে উল্লেখ রয়েছে অনন্তের স্ত্রী নীলা। গল্পে এরা অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে বিচার্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল গৌণ চরিত্র হয়েও নীলা ক্ষণিকের উপস্থিতির মাধ্যমের গল্পে কী প্রভাব ফেলেছে।

গল্পের আখ্যান যখন প্রায় শেষের দিকে, যখন সাধারণ পাঠক দীর্ঘ বিরহে কাটানো নায়ক-নায়িকার সৌভাগ্যক্রমে আবার দেখা হওয়ার মুহূর্তে মশগুল, যখন আমরা সকলে গল্পের স্বাভাবিক গতিধারা অনুযায়ী ভেবে নিয়েছি এই বিরহী যুগল অর্থাৎ অনন্ত ও মহাশ্বেতার পুনর্মিলন সময়ের অপেক্ষা মাত্র ঠিক তখনই গল্পে প্রথম প্রবেশ ঘটে আলোচ্য গৌণ চরিত্র অর্থাৎ অনন্তের স্ত্রী নীলার। গল্পে আমরা নীলার উপস্থিতি মূলত পরোক্ষে পেয়েছি। গল্পে উপস্থিত মহাশ্বেতার 'ঝি'-এর মুখ থেকে আমরা নীলা সম্পর্কে যেটুকু জানতে পারি, তা হল—

> "খাঁটি মেম নয় গো, দিশি। কিন্তু কী রূপ দিদি, আহা! মা দুগ্‌গো যেন ফিরিঙ্গি মেয়ে হয়ে এলেন।"[২০]

এছাড়াও আমরা গল্প থেকে জানতে পারি অনন্ত ও নীলার দাম্পত্য জীবন খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না—

> "মাস্টার গগন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললে, এই বদস্বভাবের জন্য তোমায় আমি দেখতে পারি না নীলা! যারা গায়ের জোরে বিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন?"[২১]

অনন্তের থেকে আমরা আরও জানতে পারি—

> "আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্তিরি হয়েছে।"[২২]

অর্থাৎ এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি স্ত্রী নীলার সঙ্গে স্বামী অনন্তের দাম্পত্য জীবন খুব একটা সুখের ছিল না।

গল্পে আমরা দেখি অনন্ত মহাশ্বেতা কোনো এক সময়ে পরস্পরকে ভালোবাসলেও অনন্তকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয় ও মহাশ্বেতার অন্যথায় বিয়ে হয় ও পরে বৈধব্য নেমে আসে জীবনে। কিন্তু মহাশ্বেতার বাবার সুকলে হেডমাস্টার রূপে অনন্তের আসার সুবাদে দীর্ঘ দশ বছর পর আবার তাদের সাক্ষাৎ হয় আবার অনন্ত এতদিন ধরে 'কায়ার প্রত্যাখ্যানে' 'ছায়া' নিয়ে কাটিয়েছে এ কথা জানার পর মহাশ্বেতার মনে জীবন সম্পর্কে আবার নতুন করে রঙিন স্বপ্ন জাগে। পাঠকের মনেও ধারণা তৈরি হয় বিরহী নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের কথা। ঠিক এই মুহূর্তে গল্পে নীলার হঠাৎ আবির্ভাব হয় ও প্রেমিক অনন্তকে একই সঙ্গে পাঠককেও বিড়ম্বনার সম্মুখীন করে। গল্পটি হঠাৎ যেন ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়ে যায়। আখ্যানের হঠাৎ এক বাঁক তৈরি হয় যা কাহিনীকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে দেয়। এভাবেই গৌণ চরিত্র হয়েও নীলা পরোক্ষে একবার মাত্র উপস্থিত থেকে কাহিনী ধারায়, মুখ্য চরিত্রের উপর একই সঙ্গে গল্পের নামকরণের প্রভাব ফেলেছে। চরিত্রটি গৌণ হয়েও তাই গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নীলা সম্পর্কে গল্পে যেটুকু পরিচয় পায়। তা পুরোটাই ঝি-এর দেওয়া বর্ণনা থেকে—

> "গটগট করে বাড়ির ভিতর ঢুকল এক ফিরিঙ্গি খেস্তান মেমসায়েব।"[২৩]

আরো বলেছে—

> "খাঁটি মেম নয় গো, দিশি। কিন্তু কী রূপ দিদি, আহা? মা দুগগো যেন ফিরিঙ্গি মেয়ে হয়ে এলেন। পায়ে জুতো মোজা, ঘাঘরার মতো শাড়ি পরা, গলায় লিকলিকে সরু হার।"[২৪]

আবার ঝি-এর বর্ণনা থেকে যা শুনতে পায় তা থেকে অনুমান করাই যেতে পারে যে নীলার— হেডমাস্টারের দাম্পত্য জীবন খুব একটা সুখকর ছিল না। কেননা হেডমাস্টারের কথা থেকে জানতে পারি তিনি নীলার আগমনে সম্মতি জানায় নি—

> "তুমি কোথা থেকে এলে নীলা? তোমায় না আসতে বারণ করেছিলাম?"[২৫]

এরপরেই শুরু হয় বিষম ঝগড়া। যা ঝি-এর কথায় 'খুনোখুনি' হওয়ার যোগাড়। মাস্টার গগন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—

> "যারা গায়ের জোরে বিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যাও আমার কাছে এসেছ কেন? মেয়েটা বললে, আমার কী দোষ! তোমার কাছে আমি কোনো অপরাধ করিনি। মাস্টার তাতে আরো চেঁচিয়ে বললে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্তিরি হয়েছে, এই দোষ।"[২৬]

অতএব মাস্টারের বক্তব্য থেকে আমরা ধারণা করতে পারি নীলার সঙ্গে তার বিবাহটাও 'বিড়ম্বনা'র সম্মুখীন হওয়ার কারণে। তাই নিজের এক সময়ের 'বিড়ম্বনা' কাটানোর জন্য করলেও মন থেকে সেই বিয়েকে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে এই খবর শোনার পরেই মহাশ্বেতা—

> "লাটিমের মতো সারা বাড়িতে শ্বেতা একা পাক খেয়ে বেড়াতে লাগাল, ভিতরের অস্থিরতার সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্য রেখে যতটুকু স্বস্তি মেলে।"[২৭]

এভাবে আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্র নীলা একবারমাত্র ক্ষণিকের উপস্থিতির মাধ্যমে সমগ্র গল্পটিকে এক ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে। গল্পে শ্বেতা-অনন্তের মধ্যে এক 'বিড়ম্বনা'র পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আর তাই একবার বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়ে অনন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলাকে বিবাহ করেছিল আর এবারেও বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুকল, গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। আর একই সঙ্গে পাঠকদের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে গল্পের নামকরণেও প্রভাব ফেলেছে আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলুদ পোড়া গল্পটি গল্পের শিরোনামাঙ্কিত গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জুন ১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি মূলত দুটি আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। দুটি মার্ডারকে কীভাবে একটি অতিলৌকিক ন্যারেটিভ হিসাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তারই গল্প হলুদ পোড়া গল্পটি। তারাশঙ্করের বন্দিনী কমলা গল্পে যেভাবে রায়বাড়ির একটি মার্ডারের ঘটনাকে মিথ হিসাবে দেখানো হয়েছে ঠিক একই রকম ভাবে দেখানো হয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে। আর এই পুরো ন্যারেটিভ সেট করতে গল্পে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় গল্পে অপ্রধান চরিত্র হিসাবে পরিচিত বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল, তারই পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এবারে আমরা আলোচনা করব গৌণ চরিত্র হয়ে পঙ্কজ ঘোষাল গল্পটির উপর কী প্রভাব ফেলেছে।

গল্পটি শুরু হচ্ছে বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার আকস্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আর দুটি মৃত্যুই যে স্বাভাবিক নয় তা আমরা গল্পের আখ্যান থেকে জানতে পারি। গল্পের অন্যান্য চরিত্রের মতো যখন সাধারণ পাঠকরাও দুটি মৃত্যুর মধ্যে যোগসাজশ খুঁজে বের করতে অক্ষম, তখন গল্পে আবির্ভাব হয় বলাই চক্রবর্তীর ভাইপো নবীনের। নবীন চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে এসে সম্পত্তির ভার নিয়ে ঘোষণা করল—

> "কাকাকে যারা অমন করে মেরেছে তাদের যদি ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে না পারি।"[২৮]

পাঠকের মনে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টির আগেই গল্পে দেখি একটি ঘটনা ঘটে। নবীনের বউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গল্পে প্রথম উপস্থিতি ঘটে আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্র তথা বুড়ো পঙ্কজ ঘোষালের এবং উপস্থিতিতেই সক্রিয় হয়ে পুরো গল্পটিকে নিজের মতো করে চালনা করে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন মাত্র শিক্ষিত বীরেন যখন দামিনীর অসুখ সারাতে না পেরে শহরের ডাক্তার ডাকার কথা বলে তখনই পঙ্কজ ঘোষাল তীব্র প্রতিবাদ জানায়—

> "ডাক্তার? ডাক্তার কী হবে? তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।"[২৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এভাবেই আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি গল্পের কাহিনীকে একেবারে ভিন্নপথে প্রবাহিত করে দিল। আর এরপর দেখব কুঞ্জ এসে নানারকম তুকতাক করে দামিনীর নাকের সামনে হলুদ পোড়া ধরলে দামিনী বলে উঠল, 'আমি শুভ্রা'। আর এই সুযোগে আবার পঙ্কজ ঘোষাল জানতে চাইল শুভ্রাকে কে মেরেছে। যার উত্তরে দামিনী জানাল—

"দামিনী নিজে থেকেই ফিশফিশ করে জানিয়ে দিল, বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।"[৩০]

আবার মানুষের মনে যখন প্রশ্ণ উঠল তিন দিন আগে মরে যাওয়া মানুষের পক্ষে শুভ্রাকে খুন করা কীভাবে সম্ভব! তখনও আবার এই পঙ্কজ ঘোষালকে দেখব একটি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে—

"শুধু জ্যান্ত মানুষ কী মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে-মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কীসে!"[৩১]

এরপর গ্রামের মানুষদের কাছে অবিশ্বাসের কোনো কারণ থাকে না। আর পঙ্কজ ঘোষালের তৈরি করা এই ন্যারেটিভ কখন অজান্তে বীরেনের মতো শিক্ষিত মানুষকেও বিকারগ্রস্থ করে তোলে, তাই গল্পের শেষে বীরেন অচৈতন্য হয়ে আর্তনাদ করতে করতে বলতে থাকে—

"আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।"[৩২]

এভাবে গল্পে গৌণ চরিত্র হয়েও পঙ্কজ ঘোষাল সচেতন পাঠকের কাছে যে মৃত্যু দুটি মার্ডার হিসাবে বিবেচিত তাকে কীভাবে একটি ন্যারেটিভ তৈরি করে তাকে কাহিনীতে অলৌকিক ঘটনায় রূপান্তরিত করেছে তার পরিচয় পাই। আর এখানেই চরিত্রটি গৌণ হয়েও গল্পের ন্যারেটিভ তৈরিতে, গল্পের কাহিনীতে সর্বোপরি গল্পের নামকরণেও প্রভাব ফেলেছে। আর এখানেই চরিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরাবাঁধা জীবন গল্পটি আশ্বিন ১৩৪৮ নর নারী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি মানিকের প্রকাশিত তৃতীয় গল্প। আবার ভাদ্র ১৩৪৯-এ প্রকাশিত ধরাবাঁধা জীবন উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের শুরু থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গল্পের প্রয়োজনে অল্প বিস্তর পরিবর্তনসহ আলোচ্য গল্পে গৃহীত হয়েছে। কোনো পূর্ব প্রকাশিত গল্প উপন্যাসে গ্রহণ বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপন্যাস থেকে নির্মিত গল্প, এ-জাতীয় সর্বমোট প্রায় তিরিশটির মতো গল্পের মধ্যে ধরাবাঁধা জীবন একমাত্র গল্প যার শিরোনাম এবং উপন্যাসের শিরোনাম অভিন্ন।[৩৩]

গল্পটি মূলত ভূপেন ও প্রভার গল্প। যারা তাদের 'ধারাবাঁধা জীবন' ছেড়ে বিবাহ বন্ধনে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বার্থকামী পরিবারের নির্লিপ্ততা তাদের এই শেষ আশাটিতেও বাঁধ সেজেছিল। একটা সময় বউ আর সন্তান মারা যাওয়ার পর ভূপেন নির্লজ্জের মতো বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল প্রভাকে। কিন্তু দুই স্বার্থকামী সংসারের 'ভীত সন্ত্রস্ত' রূপ আর তাদের এক হতে দেয়নি। ভূপেন ও প্রভা ছাড়াও গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলি হল ভূপেনের বউদি ও প্রভার দাদা প্রসন্ন। এছাড়াও গল্পে পরোক্ষে উপস্থিত রয়েছে মনু। অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে আমরা এদের বিবেচনা করতে পারি। আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্র দুটি হল— ভূপেনের বউদি ও প্রসন্ন। এবারে আমরা আলোচনা করব গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে বউদি কী প্রভাব ফেলেছে।

গল্পে যখন প্রভা ও ভূপেন সাময়িক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আবার তারা বিবাহ-বন্ধনে লিপ্ত হওয়ার ভাবনায় একে অপরের কাছে আসার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই এক তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে গল্পে প্রথম উপস্থিত হয়েছে আলোচ্য গৌণ চরিত্র অর্থাৎ ভূপেনের বউদি—

"হঠাৎ দুজনে আবার কী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে দ্যাখো।"[৩৪]

আসলে, 'প্রভা বাড়িতে বউ হইয়া আসিলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে ভাবিতে গেলেও বউদির বুক ধড়ফড় করে'[৩৫] আর এরপর আমরা বউদির আপত্তির মূল কারণটি জানতে পারি—

"বিবাহ করার সাধ হইয়া থাকে সরমার মতো আরেকটি ভীরু নরম বউ আসুক কর্তালি করার অভ্যাস যার নাই, সব বিষয়ে যে বউদির মুখ চাহিয়া থাকিবে।"[৩৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি চরিত্রটি সাংসারিক দিক থেকে প্রচন্ড হিসেবী ও স্বার্থকামী নারী। যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভূপেন ও প্রভার মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শুধু বাঁধা হয়েই থাকেনি একই সঙ্গে ভূপেনের জীবন-ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে।

গল্পে আমরা দেখব এরপরই বউদি—

> "তাড়াতাড়ি একটি মেয়েকে একদিন বাড়িতে আনিয়া সে ভূপেনকে দেখাইয়া দিল।"[৩৭]

এবং কান্নাভেজা চোখে এও জানাল মেয়েটির চাল-চলন কথাবার্তা স্বভাব সব যেন সরমার মতো। সরমার মৃত্যুর পর ঘর ও সবার বুকে যে খালি স্থান তৈরি হয়েছে তা এই মেয়েটিই পূরণ করতে পারবে। আর তাই স্ত্রী বর্তমানে যে ভূপেন প্রভার কথা ভাবত। বউ ও ছেলে মরার পরপরই নির্লজ্জের মতো যে ভূপেন প্রভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় বউদির কথা শোনার পর সেই ভূপেন এবারে ভাবতে থাকে—

> "প্রভাকে বিবাহ করার কথা ভাবা যায় কিন্তু সরমার বিনিময়ে তাকে বাড়িতে আনিবার কথা কল্পনাও করা যায় না। এই মেয়েটিকে সে ভাবে, ভাবা চলে।"[৩৮]

আর এরপর থেকেই গল্পে আমরা দেখব ভূপেন সারাক্ষণ সরমার অভাববোধ করতে থাকে। গল্পের শেষে তাই সরমার অভাব পূরণে বউদির আনা সেই মেয়েটি অর্থাৎ মনুকে বিবাহ করতে রাজি হয়ে যায়। এইভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি পূরণের জন্য গৌণ চরিত্র হিসাবে পরিচিত বউদি ভূপেন ও প্রভার মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। আসলে গৌণ চরিত্র হয়েও বউদি নিজের ভাবনার দ্বারা গল্পের প্রধান চরিত্র ভূপেনের জীবন-ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে। আর এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও বউদি চরিত্রটি গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত প্রসন্ন চরিত্রটিও গল্পে কী প্রভাব ফেলেছে সেদিকেও আলোকপাত করব। গল্পে প্রসন্নের যেটুকু পরিচয় পায় তা হল— প্রসন্ন প্রভার দাদা ও সে পঁচাত্তর টাকার মাইনের একটা চাকরি করলেও সংসার চালানোর ক্ষেত্রে বোনের উপর নির্ভরশীল—

> "সংসারের খরচের জন্য টাকা চাহিতে গিয়া বোনের কাছে অপমানিত প্রসন্ন কিছুক্ষণের জন্য এমন কথাও ভাবে যে, এর চেয়ে নিজের পঁচাত্তর টাকাতে সংসার চালানোর চেষ্টা করাও ভালো।"[৩৯]

কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব নয়। তাই প্রভা ও ভূপেনের ভাবি মিলনের কথা কল্পনা করে ভীত সন্ত্রস্ত বোধ করে প্রসন্ন। তাই সে চাকুরিজীবী বোনকে ফেমিনিজমের পাঠ দেয়—

> "ভারী অগৌরবের বিষয় হয়। পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার চায়, অথচ স্বাধীনভাবে থাকবার সুযোগ পেলেও নিজেরাই সেটা বজায় রাখতে পারে না। সাধে কি পুরুষজাত মেয়েদের দাবিয়ে রাখে।"[৪০]

কিন্তু পরক্ষণেই প্রভা তার দাদার ভেকধারী মুখোশটা খুলে দেয় পাঠকের সামনে বেরিয়ে আসে একজন স্বার্থকামী মানুষ—

> "প্রভা মৃদু হাসিয়া বলে, তুমি যেমন বউদিকে রেখেছ?"[৪১]

এরপরেই আমরা প্রসন্নের আসল সংসয়ের কারণটা জানতে পারব—

> "নিজের চাকরির পঁচাত্তর টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবিলে প্রসন্নের কপাল ঘামিয়া ওঠে! প্রথম প্রথম প্রভা অবশ্য সাহায্য করিবে, কিন্তু সে আর কতদিন। তার ছেলেমেয়ে হইবে, সংসার গড়িয়া উঠিবে, তখন কি আর মনে থাকিবে বাপ, দাদা, ভাইপো, ভাইঝির কথা? অথচ স্পষ্ট করিয়া ওরা কিছুই বলিবে না। এরকম সংশয়ের মধ্যে মানুষ থাকিতে পারে?"[৪২]

এইভাবে এই স্বার্থকামী মানুষগুলো প্রভা ও ভুবনের ভাবী মিলনের কথা ভেবে শঙ্কিত বোধ করেছে এবং নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে তাদের মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গল্পে যেমন বউদির ভাবনার দ্বারা ভুপেন প্রভাবিত হয়েছিল একইরকম ভাবে প্রসন্নের ভাবনার দ্বারাও প্রভা প্রভাবিত হয়েছে। তাই—

> "প্রভা ঘরের চারিদিকে তাকায়। এ-ঘর ছাড়িয়া ভুপেনের বাড়িতে একটা ঘরে তাকে বাস করিতে হইবে। বাহিরে বারান্দায় গিয়া প্রভা সংসারের কলরব শোনে, আপনজনের চলাফেরা চাহিয়া দেখে। ভুপেন যেমন তার বাড়ির সংসারটির কর্তা, সে-ও তেমনি এই সংসারের কর্ত্রী। তার টাকায় তার নির্দেশে এই সংসার চলে। তাকে গিয়া চালাইতে হইবে ভুপেনের সংসার। সে টাকা পাঠাইবে কিন্তু তার এই সংসারে কর্তৃত্ব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> করিবে অন্য একজন। তার প্রচলিত নিয়ম আর ব্যবস্থাগুলিও হয়তো বাতিল হইয়া যাইবে দু-দিনের মধ্যে।"[৪৩]

আর তাই এরপর যখন ভুপেন নিজে প্রভাকে বিবাহ প্রস্তাব দিলে এবারে সে আর সম্মতি জানায় না। তাই তো গল্পের শেষে ভুপেন তার বউদিকে বলে—

> "ভুপেন গম্ভীর মুখে বলে, কলকাতায় চলবে না। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না, আরও ক-মাস ছুটি নিয়ে সিমলা যাব ভাবছি। ওদের বলে দিয়ো, বিয়ে যদি দিতে হয় মেয়ের, সিমলায় গিয়ে সব ঠিক করুক। নইলে কাজ নেই।"[৪৪]

এভাবে আলোচ্য গৌণ চরিত্র দুটি নিজেদের জীবনভাবনার দ্বারা গল্পের প্রধান চরিত্রদুটিকে প্রভাবিত করেছে। তাদের ভাবী মিলনের বাঁধা হয়ে তাদের জীবনকে একেবারে 'ধরাবাঁধা জীবনে' আবদ্ধ রেখেছে। এভাবে গল্পের নামকরণে গৌণ চরিত্রদুটি প্রভাব ফেলেছে। আর এখানেই অপ্রধান চরিত্র হয়েও গল্পে বউদি ও প্রসন্ন চরিত্র দুটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের এক কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। সমাজে কিছু স্বার্থসিদ্ধি মানুষের জন্য তৈরি হয়েছিল 'কালোবাজারের'। সে বাজারের সবকিছুর বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল। বাদ যায়নি মানুষের মূল্যবোধ এমনকী নিষ্পাপ ভালোবাসাও। এরকমই এক সময় প্রেক্ষাপটে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালোবাজারের প্রেমের দর গল্পটি। গল্পটি ছাড়পত্র পত্রিকায় শারদীয় ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।

কালোবাজারের প্রেমের দর অর্থাৎ গল্পটির নামকরণ থেকেই আখ্যান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আলোচ্য গল্পে দেখব কীভাবে ধনঞ্জয় ও লীলার গভীর ভালোবাসার দাম নির্ধারিত হয় কালো বাজারের মার্কেটে। গল্পে প্রধান চরিত্র হল ধনঞ্জয় ও লীলা। এছাড়াও উপস্থিত রয়েছে লীলার বাবা পশুপতিবাবু ও মোটা নিরঞ্জন। এরা মূলত গল্পে অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত। আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি হল মোটা নিরঞ্জন। এবারে আমরা দেখব গল্পে অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত থেকে কীভাবে গল্পে প্রভাব ফেলেছে।

ব্যবসা উপলক্ষে ধনঞ্জয় ও লীলার মাসখানেক বিচ্ছেদে থাকার পর তারা যখন তাদের এত দিনের সম্পর্কটিকে ভালোবাসা হিসাবে বুঝতে পারে এবং পশুপতিবাবুর সম্মতিতে যখন দুজনের বিবাহ নিশ্চিত ঠিক তখনই গল্পে প্রথম প্রবেশ ঘটে আলোচ্য গৌণ চরিত্রটির। যদিও গল্পে প্রথম উপস্থিতি পরোক্ষে। নিরঞ্জন সম্পর্কে গল্পে যেটুকু আমরা জানতে পারি ধনঞ্জয়ের কথায়—

> "লোকটা নিজে এতটুকু রিস্ক নেবে না, সব নিয়ম দুরস্ত হওয়া চাই! কোনদিকে ফাঁক থাকলে চলবে না। অথচ এদিকে চাহিদাটি ঠিক আছে।"[৪৫]

আর লীলার কথায়—

> "মোটা নিরঞ্জন তো? গোলমাল করবে না মনে হয়। ... লোকটা খুব শিভালরাস।"[৪৬]

অর্থাৎ উপরের কথোপকথন থেকে আমরা অনুমান করতে পারি নিরঞ্জন একজন ক্রেতাদুরস্ত ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতিনিধি। আর এই ক্রেতাদুরস্ত বুদ্ধি দিয়েই গল্পে দেখব কীভাবে লীলা ও ধনঞ্জয়ের এতদিনের ভালোবাসার মূল্যও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এভাবেই গল্পের গৌণ চরিত্র হয়েও নামকরণ ও কাহিনীর পরিণতিকেও প্রভাবিত করেছে।

গল্পে আমরা দেখব এই কালোবাজারে দাঁড়িয়েও লীলা ও ধনঞ্জয়ের এতদিনের ধারণা ছিল—

> "জগতে অন্য সমস্ত কিছুর দরদাম আছে, ...প্রেম অমূল্য। কারণ প্রেম তো কোনো বস্তু নয়— মাল নয় যে দাম দিয়ে কেনা যাবে।"[৪৭]

কিন্তু তাদের এতদিনের ধারণাকে নিমেষে ধ্বংস করে দেয় গল্পে উপস্থিত গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত মোটা নিরঞ্জন—

> "নিরঞ্জন স্বয়ং ক্রেতা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।"[৪৮]

ধনঞ্জয় নিজের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার প্রত্যাশায় নিরঞ্জনের কাছে গেলে—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে, কিন্তু বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হচ্ছি ভাই। তুমি চেনো, পশুপতিবাবুর মেয়ে।[৪৯]

এরপর একটু হাসিমুখে বলে—

> পশুপতিবাবু অনেকদিন ঘোরাফেরা করছেন— এ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি। এবার কিছু করে দিতে হবে। তোমাকে কথা দিয়ে ফেলেছি— অন্য কেউ হলে এই কন্ট্রাক্টই পশুপতিবাবুকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু তোমার কথা আলাদা— তোমাকে তো আর না বলতে পারি না এখন।[৫০]

এভাবেই কালোবাজারের মার্কেটে লীলা ও ধনঞ্জয়ের প্রেমের মূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তাদের এতদিনের ভালোবাসার মূল্য হয়ে দাড়ায় একটা ব্যবসায়ী 'কন্ট্রাক্ট'। আর তাই কথাটা শোনার পর — 'ধনঞ্জয় ও লীলা' দুজনেই সারা রাত জেগে কাটায় — মাইলখানেক তফাতে শহরের দুটি বাড়ির দুখানা ঘরে, যে ব্যবধান তারা যে কেউ একজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কয়েক মিনিটে ঘুচিয়ে দিতে পারে।' কিন্তু এই 'ব্যবধান' ঘোচে না কেননা তারা 'ছেলেমানুষ' নয়। তাই তারা এই কালোবাজারে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রেমের নির্ধারিত মূল্য মেনে নেয় হয়তো-বা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে নিরঞ্জন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিক্ষুক গল্পে দেখব করুণামিশ্রিত মিথ্যে কাহিনীর আশ্রয় করে কীভাবে মানুষ পরিশ্রমহীন উপার্জনের ব্যবস্থা করে নেয়। গল্পের প্রধান চরিত্র যাদব দীর্ঘদিন শহরে কাজ করার পর শ্বশুরবাড়ি ফিরেছে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের নিজের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু স্টেশন থেকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার নির্জন রাস্তাটুকু রাতের বেলা একা একা জমানো টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে। মনের দোটানা ভাবনা নিয়ে রাতের অন্ধকারে একা একা পথ চলতে আরম্ভ করলে রাস্তায় একজন সঙ্গী জুটে যায়। সঙ্গীর নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে যাদবের মনে নিজ নিরাপত্তাজনিত সন্দেহ জাগে। ফলত ছেলের কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার মিথ্যে গল্প শোনায়। এরপর দেখি পথ শেষে সঙ্গীটি ছেলের চিকিৎসার জন্য তাকে দশ টাকার একটি নোট দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যাদবের—

> "প্রথমে কেমন বিস্ময় জাগিয়াছিল, তেমনি হইয়াছিল আনন্দ। সকলকে শহরে নেওয়ার খরচটা ভগবান জুটাইয়া দিলেন। ঘরের পয়সা আর খরচ করিতে হইবে না।"[৫১]

এইভাবে গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত সঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত চরিত্রটি ক্ষণিকের মাত্র উপস্থিতিতে যাদবের মনে একপ্রকার বিশ্বাসের সৃষ্টি করলেন যা তাকে বিনা পরিশ্রমের উপার্জনের পথটি তৈরি করে দিল। কেন না গল্পে আমরা এরপর দেখব শহরে গিয়েও যাদব একই রকম ভাবে রাস্তার মানুষকে তার বানানো গল্প শোনায় ও তাদের থেকে সে সাহায্য পায়। এমনকি সদ্য সন্তানহারা পিতার থেকেও সে পাঁচ টাকার সাহায্য নিয়েছে। আবার এই উপার্জনের নতুন উপায়টিতে সে যেন আরও বেশি সময় দিতে পারে তাই—

> "আগে যাদব হাঁটিয়াই যাতায়াত করিত। আজকাল সময় বাঁচানোর জন্য ট্রামে চাপে।"[৫২]

এখানেই গল্পে গৌণ চরিত্র হয়েও সঙ্গী চরিত্রটি কাহিনী নির্মাণে গল্পের নামকরণে ও সর্বোপরি যাদবের অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের উপায় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই শহরে পরিবার নিয়ে আসার পর সংসারের অভাব অনটনের কারণে খাটুনিটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে এখন তার। এরপর সে ভাবতে থাকে সহজে টাকা রোজগার করার উপায়। এ প্রসঙ্গেই সেদিন রাত্রের কথা মনে পড়ে। তখন তার মনে হয়—

> "ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হয় দয়ালু লোক কি জগতে সেই একজনই ছিল, আর নাই শহরের এই লাখ লাখ লোকের মধ্যে? মর্মস্পর্শী করিয়া দুঃখ দুর্দশার কাহিনি সে কি একবারেই বলিতে পারিয়াছিল, আর পারিবে না?"[৫৩]

মনে এই প্রশ্ন জাগার পরেই একদিন সে কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে চেষ্টা করে দেখল ও অসফল হল। কিন্তু তবুও সে এই বিনা পরিশ্রমের অর্থ উপার্জনের সহজ পথটি ত্যাগ করতে পারল না। আবার পরদিন বন্ধুদের সাথে সারারাত ফূর্তি করার পর অফিস যাওয়ার পথে এক ভদ্রলোকের কাছে বলতে শুরু করে—

> "আমি বড়ো বিপদে পড়েছি, আমার বড়ো ছেলের কাল থেকে কলেরা। ওষুধ কিনবার পয়সা নেই— আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন।"[৫৪]

এবারে যাদব সফল হয়। কেননা—

> "বিব্রত ও বিরক্ত ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়া মানিব্যাগটা বাহির করেন। প্রথমে একটা সিকি বাহির করিয়া যাদবের দিকে একবার তাকান সমস্ত রাত ফূর্তি করার ফলে মুখখানা যাদবের এমনি শুকনো দেখাইতেছিল সে সিকিটা বদলাইয়া গোটা একটা আধুলি তাকে দান করিয়া বসেন।"[৫৫]

এভাবেই যাদব রোজগারের সহজ উপায়টি আসতে আসতে করায়ত্ত করে ফেলেছে। তাই এখন সে পুরোনো কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে চুলে তেলও দেয় না, আঁচড়ায়ও না, ছেঁড়া জামাকাপড় ও ছেঁড়া জুতো পড়ে মানুষকে তার দুঃখ দুর্দশার কাহিনি শোনায়। মানুষের দয়ায় যেন তার অধিকার রয়েছে, তাই কেউ সাহায্য না করে চলে গেলে এখন সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। এভাবেই তার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়— চেহারায়, চলনে, পোশাকে বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকই মনে হয়। লোকটি যাদবকে ডেকে বলে—

> "লোকটি মৃদু একটু হাসে, বলতে এমন লজ্জা বোধ হচ্ছে মশাই। আমি থাকি শেওড়াফুলিতে, একটু দরকারে আজ কলকাতা এসেছিলাম। দোকানে কয়েকটা জিনিস কিনতে যাচ্ছি। কোন ফাঁকে কখন যে কে পকেটটা কেটে মানিব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছে, টেরও পাইনি। পাঞ্জাবির ডানদিকের পকেটটা তুলিয়া দেখায়, সত্যই পকেটটা কাঁচি দিয়া কাটা। রিটার্ন টিকিটটা পর্যন্ত সে ব্যাগের মধ্যে ছিল। মহা মুশকিলে পড়েছি, কাউকে চিনি না শহরে, কী করে যে এখন টিকিটের দামটা—"[৫৬]

আমরা সাধারণ পাঠকরা যখন দেখার অপেক্ষায় রয়েছি অন্যের বিপদের কাহিনি শোনার পরে যাদব কি প্রতিক্রিয়া দেখায়, তখনই গল্পে আমরা দেখি—

> "স্তম্ভিত যাদব তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, যেভাবে জুনিয়ার উকিল হাঁ করিয়া শোনে বিখ্যাত আইনজীবীর বক্তৃতা।"[৫৭]

আর তখন আমরা পাঠকরাও বিস্ময়ভূত হয়ে পড়ি। সমাজের মানুষের দয়া, করুণার সহায়তাকে নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করা দেখে। এভাবে আলোচ্য গল্পে 'সঙ্গী' নামে চিহ্নিত গৌণ চরিত্রটির দয়া, করুণা বা 'সঙ্গী' নামক মানুষটির মতো দয়ালু আরো অনেকে প্রতিনিয়ত নিজেদের দয়ার দ্বারা সমাজে যাদবের মতো কর্মজীবী মানুষকে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করে দেয়। আর এখানেই গল্পের নামকরণ সার্থকতা লাভ করেছে। এভাবেই গল্পে আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি গল্পের প্রধান চরিত্রের জীবন ভাবনাকে একই সঙ্গে গল্পের নামকরণকে প্রভাবিত করেছে। এভাবে চরিত্রটি অপ্রধান হয়েও গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মন্বন্তরকালীন একটি মৃত্যু কীভাবে এত দিনের নিরাপদ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নগ্ন বাস্তবের সামনে দাড় করিয়ে দিল তারই গল্প হল কে বাঁচায়, কে বাঁচে! গল্পের প্রধান চরিত্র মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবি মৃত্যুঞ্জয় যে 'এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা।' আজ আপিস যাবার পথে প্রথম মৃত্যু দেখল - 'অনাহারে মৃত্যু।' আর এই একটিমাত্র মৃত্যু কীভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনে ও তার পরিবারে সর্বোপরি সমাজের কতটা প্রভাব ফেলল তারই গল্প হল আলোচ্য গল্পটি। আলোচ্য গল্পে আমরা গৌণ চরিত্র হিসাবে অনাহারে মৃত ব্যক্তিটিকে বিবেচনা করতে পারি। যদিও চরিত্রটির গল্পে কোনো নাম নেই। কেননা চরিত্রটি আসলে ব্যক্তিবিশেষ হিসাবে নয়, আসলে চরিত্রটি শ্রেণি প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত রয়েছে গল্পে। গল্পের পাঠ ও তৎকালীন সময়ের ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি এই মন্বন্তরকালীন খাদ্য সংকটের জন্য বহু গ্রামের মানুষ শহরাঞ্চলে উঠে এসেছিল ও কিছু দিন অনাহারে থাকার ফলে ফুটপাথেই তাদের মৃত্যু হত। অর্থাৎ গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত এই মৃত ব্যক্তিটি সেই গ্রাম থেকে উঠে আসা অনাহারে মৃত ব্যক্তিদেরই শ্রেণি প্রতিনিধি চরিত্র। চরিত্রটি একবার মাত্র পরোক্ষে উপস্থিতির মধ্য দিয়ে নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের মত মানুষদের প্রতি দরদী প্রতিবাদ জানাল। আর এরপরেই দেখব গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কীভাবে এই মৃত্যুর জন্য নিজের কিছু না করতে পারা, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোকে দায়ি করেছে। টুনুর মা'র মুখ থেকে জানতে পারি---

> "কিছুই কী করা যায় না? এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।"[৫৮]

গল্পে তাই দেখব মৃত্যুঞ্জয় একটা সময় অফিস, পরিবার সবকিছু ছেড়ে এই অনাহারে ফুটপাথে থাকা মানুষগুলির সঙ্গ নিয়েছে। 'পরনে ধূতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া।' লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খায়। বলে 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।' আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রেণি প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় তার না পারার হতাশা থেকে মুক্তির জন্য নিজেই আশ্রয় নিয়েছে এই সর্বহারা শ্রেণির মাঝে। এভাবে গল্পের গৌণ চরিত্র হয়েও মৃত ব্যক্তি নিজের ক্ষণিকের উপস্থিতিতে গল্পের প্রধান চরিত্রের উপর সর্বোপরি গল্পের নামকরণকেও প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি শুধুমাত্র মৃত্যুঞ্জয়কেই প্রভাবিত করেনি, পরোক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী তথা টুনুর মা এবং নিখিলকেও প্রভাবিত করেছে। তাই টনুর মা অসুস্থ হয়ে বিছানা নিলে নিখিলকে সকরুণ আবেগে জানান মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে পাশে থাকার জন্য। আর তখন নিখিল তাকে এ প্রসঙ্গে সুস্থ হয়ে ওঠার কথা বললে টুনুর মা বলে---

> "উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।"[৫৯]

যা শুনে হতবাক হয়ে যায় নিখিল। কিন্তু টুনুর মা আরও জানান—

> "ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মতো হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলই মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলির কথা।"[৬০]

আবার একই রকম ভাবে পরোক্ষে নিখিল-এর জীবন ভাবনায় প্রভাব ফেলেছেন সেই মৃত ব্যক্তিটি। তাই যে নিখিল গল্পের শুরুতে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় যে যুক্তিগুলো দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে বোঝানোর চেষ্টা করত, গল্পের শেষে সেই নিখিলকেই দেখব—

> "ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে-ও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে উলটো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়।"[৬১]

এভাবেই গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত অনাহারে মৃত ব্যক্তিটি গল্পের প্রধান চরিত্রগুলির জীবনযাপনাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। একই সঙ্গে গল্পের নামকরণের সার্থকতা দানেও সহায়তা করেছে। আর এখানেই চরিত্রটি গৌণ হয়েও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিনের দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক রাগে-অনুরাগে, প্রেমে-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটি গল্প স্বামী-স্ত্রী। বৈশাখী বার্ষিক পত্রিকায় ১৩৫০ সালে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। যদিও প্রথমে স্বামী-স্ত্রী প্রেম শিরোনামে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে গল্পের শিরোনামে থেকে 'প্রেম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ গোপাল-মেনকা গড়পড়তা মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করছিল। জীবনানন্দের ভাষায় তাদের দাম্পত্য প্রতিদিনের অভ্যাসে 'ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত ব্যবহৃত...' হয়ে দিন দিন যেন ভালোবাসাটা যেন কেমন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। গোপাল অফিস ও বই পড়ে জীবন কাটাচ্ছিল, অন্যদিকে দেওর ননদ, শাশুড়িতে ভরা সংসারে নিত্য অভাব-অভিযোগ নিয়ে মেনকাও দিন কাটাচ্ছিল। এর মধ্যে তাদের জীবনে উপস্থিত হয় অতিথিরূপে রসিক ও রসিকের স্ত্রী। আর এই রসিকের স্ত্রীকে নানাভাবে খুশি করার আছিলায় বারবার গোপালের তার কাছে যাওয়াকে ঠিক সহজভাবে মেনকা মেনে নিতে পারছিল না। যদিও মেনকার এই ঈর্ষা স্ত্রী স্বভাবজনিত। আর এরপরেই দেখব গোপাল ও মেনকা যারা এতদিন পাশাপাশি শুয়েও নিজেদের স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায় ভালোবাসাটা হারিয়ে ফেলেছিল। সেই ভালোবাসার যেন পুনরুদ্ধার ঘটল রসিকের স্ত্রীর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। তাই আজকের এই একটি মাত্র রাত্রির বিচ্ছেদ-বেদনা যেন দু'জনকেই কাতর করে তুলেছে। ক্ষণিকের বিচ্ছেদ যেন দুজনের কাছেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাই আজ গোপাল-মেনকা খোলা ছাদের পাটি ও একটি বালিশে শুয়ে স্বস্তি বোধ করল। দু'জনেই মাঝরাত্রিতে নানা অজুহাত দেখিয়ে একসঙ্গে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করল। গল্পের শেষে তাই দেখি---

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"গোপাল জড়িয়ে ধরতে কিছুক্ষণ তার শ্বাস বন্ধ হয়ে রইল। আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। একটা বালিশেই হবেখন।"[৬২]

এই ভাবেই আলোচ্য গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত রসিকের স্ত্রী ক্ষণিকের মাত্র উপস্থিতিতে গোপাল ও মেনকার জীবনে তাদের হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার পুনরুত্থান ঘটাল। এখানেই চরিত্রটি গৌণ হয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে গল্পে।

আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পে গৌণ চরিত্রগুলির মাধ্যমে কখনো সমাজের শ্রেণিবিন্যাসের নগ্ন বাস্তবরূপ, কখনো মানব মনের জটিল কুটিল মনের পরিচয় উদ্ঘাটনে আবার কখনো কখনো মধ্যবিত্ত জীবনে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা, মূল্যবোধের পুনরুত্থানে আবার তৎকালীন সময়ে সমাজে নারীর অবস্থানও বুঝিয়েছেন। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু একজন সমাজ সচেতন শিল্পী, তাই সমাজের বিভিন্ন দিকগুলো তার গল্পে উঠে এসেছে। আর সেগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে এই গৌণ চরিত্রগুলোর। যেমন 'হলুদ পোড়া' গল্পটির মাধ্যমে সমাজের একেবারে কালো দিকটিকে তুলে ধরেছেন। কীভাবে কুসংস্কারের সহায়তা নিয়ে সমাজে একশ্রেণির মানুষ নিজেদের অন্যায় অপকর্মকে চাপা দেয় তা দেখানো হয়েছে আলোচ্য গল্পে গৌণ চরিত্রের সহায়তা নিয়ে। আবার স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কায়েম করতে গিয়ে দুটি মানুষের ভাবী মিলনেও কীভাবে বাঁধার সৃষ্টি করে থাকে তাও দেখানো হয়েছে গৌণ চরিত্রের মাধ্যমে। আবার সমাজের দয়ালু মানুষরা কীভাবে একজন কর্মজীবি মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করে দেয় আবার কখনও কখনও আমাদের মতো মানুষদের উদাসীনতার জন্য, আমাদের অতিরিক্ত খরচের কারণে সমাজের কিছু মানুষ অনাহারে থেকে রাস্তায় মরে পড়ে থাকে। অথচ আমাদের ব্যস্ততাভরা জীবনে তাদের প্রতি আলোকপাত করারও সময় থাকে না। আবার মানব সমাজের অমূল্য সম্পদ ভালোবাসা বা প্রেম তারও মূল্য নির্ধারণ করে দেয় সমাজের দ্বারা সৃষ্ট কালোবাজার। এই বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার সহায়তা নিতে হয়েছে অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রগুলির। কখনও কখনও পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর একঘেয়েমি দাম্পত্য-জীবনেও গৌণ চরিত্রের ক্ষণিকের উপস্থিতির মাধ্যমে তাদের ভালোবাসার পুনরুত্থান ঘটেছে। এইভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্পে নানারকম বিসয় বৈচিত্র আনতে গিয়ে সহায়তা নিয়েছেন গৌণ চরিত্রগুলির। এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে গৌণ চরিত্রের উপস্থিতি সার্থকতা লাভ করেছে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, চক্রান্ত, উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., দ্বাবিংশতিতম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১৫৫

২. তদেব

৩. তদেব, পৃ. ১৬৩

৪. তদেব

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, আগন্তুক, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২১১

৬. তদেব, পৃ. ২১০

৭. তদেব, পৃ. ২১৫

৮. তদেব

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, সরীসৃপ, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৭৫

১০. তদেব, পৃ. ২৭৮

১১. তদেব, পৃ. ২৬১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১২. তদেব
১৩. তদেব, পৃ. ২৭১
১৪. তদেব
১৫. তদেব
১৬. তদেব, পৃ. ২৭৫
১৭. তদেব, পৃ. ২৭৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৭৭
১৯. তদেব, পৃ. ২৭৮
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, বিড়ম্বনা, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২৯
২১. তদেব
২২. তদেব
২৩. তদেব, পৃ. ১২৮
২৪. তদেব
২৫. তদেব
২৬. তদেব, পৃ. ১২৯
২৭. তদেব
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, হলুদ পোড়া, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৮৪
২৯. তদেব, পৃ. ৩৮৫
৩০. তদেব, পৃ. ৩৮৬
৩১. তদেব, পৃ. ৩৮৭
৩২. তদেব, পৃ. ৩৯০
৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, গল্প পরিচয়, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫০১
৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ধরাবাঁধা জীবন, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৩২
৩৫. তদেব
৩৬. তদেব
৩৭. তদেব
৩৮. তদেব, পৃ. ৩৩৩
৩৯. তদেব, পৃ. ৩৩৪
৪০. তদেব, পৃ. ৩৩৩
৪১. তদেব
৪২. তদেব
৪৩. তদেব
৪৪. তদেব
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, কালো বাজারের প্রেমের দর, উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.,

দ্বাবিংশতিতম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৩৮
৪৬. তদেব
৪৭. তদেব, পৃ. ৩৩১
৪৮. তদেব, পৃ. ৩৩৯
৪৯. তদেব
৫০. তদেব
৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ভিক্ষুক, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৩১৭
৫২. তদেব, পৃ. ৪০০
৫৩. তদেব, পৃ. ৩৯৮
৫৪. তদেব, পৃ. ৩৯৯
৫৫. তদেব
৫৬. তদেব, পৃ. ৪০০
৫৭. তদেব
৫৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, কে বাঁচায়, কে বাঁচে! গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৪৩৯
৫৯. তদেব
৬০. তদেব
৬১. তদেব
৬২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, স্বামী-স্ত্রী, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৪৯১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 164 - 175
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ছোটগল্পে শিক্ষক : একটি সামগ্রিক আলোচনা

রণজিৎ দাস
Email ID : ranjitdas7384@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Teacher, Idealism, Values, Aesthetics, Reality, Initiative, Harmony, Humanity, Dedication, Sense of duty.

Abstract
Education is the main force of the entire human society and human life. Education brings people from darkness to the path of light. Education helps in forming various senses like moral, aesthetic, intellectual, social etc. among the people and the main responsibility of imparting this Senses among people is on the teachers. That is why teachers are called the backbone of our society. Just as the spine plays a very important and vital role in the human body, teachers also play a vital role in society. Teachers have dedicated themselves to the welfare of society. Through their education, teachers transform people into human resources. Therefore, the importance of teachers in society is immense. So, the character of the teacher has emerged in Bengali literature at various times by various writers. Here we will try to discuss the significance of the character of the teacher in Bengali literature.

Discussion

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ এক সুমধুর ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে, সেটির বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল প্রাচীনকালেই। যদিও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধরণ আদিতে এরকম ছিল না। প্রাচীন সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরুকুল প্রথার মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে জীবনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করতে গুরুগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করতো এবং শিক্ষাকর্মে নিযুক্ত হত। সে সময় ছিল বেদের সময়, মৌখিকভাবে শিক্ষা লাভের সময়। তারপর ধীরে ধীরে নানান পালা বদল দেখা যায় শিক্ষা ব্যবস্থায়। গুরুকুল প্রথায় গাছের নিচের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি। ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল সেই সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা পেয়েছি 'তক্ষশীলা', 'নালন্দা' ও 'বিক্রমশিলা'-এর মতো শিক্ষায়তন এবং কৌটিল্য, পাণিনি, চরক ও সুশ্রুতদের মতো গুণী শিক্ষকদের। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নানান পরিবর্তনের পাশাপাশি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল বদল ঘটতে থাকে। আধুনিক যুগের প্রারম্ভিকে এসে আমরা পাই 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' এবং এই কলেজের হাত ধরেই শেষপর্যন্ত পেয়েছি বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এই সময়ে শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় এবং গোলকনাথ শর্মার মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গরা।

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন হয়েছে বারংবার এবং প্রতিনিয়তই আমরা পেয়েছি সংস্কারকমূলক নানান সাধক তথা শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দদের। একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে আমরা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি নবদ্বীপ

বিখ্যাত ‘বুনো রামনাথ’ তথা রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত-কে। ভারতচন্দ্রের স্ত্রী একবার সাংসারিক অভাব অনটনের অভিযোগে পতিনিন্দা করে বলেছিলেন-

“তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি।।
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।।
নানাশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলংকার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার।।
শাখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু।।”[১]

রামনাথ সম্পর্কেও শোনা যায় একই কথা। তিনি নাকি তেঁতুল পাতা খেয়ে শিক্ষা দিতেন বিনা পয়সায়। দারিদ্রতা ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী, তবুও চরম সংকটের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন অকাতরে এবং কোন পয়সা না নিয়ে। তাঁর মতো শ্রদ্ধেয় এবং মহৎ আত্মা অবশ্যই আমাদের আদর্শ। তবে সাহিত্য শুধুমাত্র আদর্শের কথাই বলেনা, বাস্তবের কথা এবং সমাজের কথাও বলে। শিক্ষক সম্প্রদায় বাস্তব বহির্ভূত কোন কিছু নয়। রক্তমাংসে গড়ে ওঠা এই শিক্ষকরাও দোষে-গুণে সম্পন্ন মানুষ। বাস্তবোচিত এই সত্যটিকে মান্যতা দিয়েই বাংলা সাহিত্যে তথা আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে তুলে ধরা হয়েছে শিক্ষক সম্প্রদায়কে। যেখানে তারা শুধু আদর্শের ধারক এবং বাহক নয়, অনেক সময় দেখা যায় তারা হয়ে উঠেছে আদর্শভ্রষ্ট, অসৎ এবং কপট চরিত্র।

‘সাহিত্য’ শব্দটির খোলস ছাড়ালে পাওয়া যায় ‘সহিত’ ভিত্তিটিকে। সহিত অর্থাৎ সাথে। সুতরাং সাহিত্য হল শব্দের সাথে শব্দের, শব্দের সাথে অর্থের, অর্থের সাথে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সাথে শব্দার্থের একটি সম্পর্ক। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের এই বিষয়টিকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন -

“অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।”[২]

তবে এই কাজ করতে গিয়ে সাহিত্য বাছাইধর্মী হলে চলবে না। বাস্তবে যেমন, সাহিত্যে তেমনটাই হওয়া চাই। বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে সাহিত্য তার মর্যাদা হারাবে। সাহিত্য মানুষের জীবনের গণ্ডির বাইরের জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করে না –

“সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।”[৩]

মানুষের হৃদয়ের প্রবাহ যেমন বিচিত্র তেমন মানব চরিত্রও বৈচিত্র্যময়। তাইতো শিক্ষক চরিত্রকে শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা কখনোই ঠিক হবে না। প্রতিটি শিক্ষক যেমন একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র, ভিন্ন, মৌলিক তেমনি বিভিন্ন রচয়িতার রচনাশৈলীর মধ্যেও দেখা যায় বৈচিত্র্যতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

“বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা মন্দলাগা, আমাদের ভয় বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত - তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আবাসিত হইয়া উঠিতেছে।”[৪]

এই সমস্ত কিছুর মিলিত কারণের ফলেই বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট প্রতিটি শিক্ষক চরিত্রকে মৌলিকভাবে এবং স্বতন্ত্র নজরে দেখা প্রয়োজন। এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত শিক্ষক চরিত্রগুলো দেখেছি, তারা প্রত্যেকেই বাস্তবিক চরিত্র। তবে এর পরবর্তী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অংশে আমরা যে সমস্ত শিক্ষক চরিত্রের কথা বলবো, সেগুলি সমস্তই সাহিত্যিক চরিত্র। সাহিত্যিক চরিত্র শুনেই সেগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনো কারণ নেই। বরং সাহিত্যিক চরিত্রগুলিই হয়ে ওঠে বাস্তবের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল। কেননা

> "সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়; অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়।"[৫]

তাই –

> "রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।"[৬]

নিচে আমরা বাংলা ছোটগল্পে ফুটে ওঠা শিক্ষক চরিত্রগুলোকে বেশ কিছু রচনাকারের রচনার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

বুনো রামনাথ সম্পর্কে তাঁরই বংশধর বলেছেন –

> "বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত তৎকালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক পণ্ডিত ছিলেন। তার একটা সংস্কৃত টোল ছিল। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু শিষ্য শিক্ষালাভের জন্য আসতেন। কিন্তু রামনাথ তাদের কাছ থেকে কোনরূপ গুরুদক্ষিণা নিতেন না। অথচ সংসারে ছিল নিত্য অভাব। তেঁতুল পাতার ঝোলই ছিল একমাত্র ব্যঞ্জন। তাই দিয়েই তারা সশিষ্য অন্ন সেবা করতেন। তবুও তাঁর খ্যাতি ছিল সমগ্র দেশজুড়ে।"[৭]

আবার তাঁর পরিবারের কথা বলতে গিয়ে রামনাথের স্ত্রীর কথা বলেছেন। যিনি তাদের চরম অভাবের মধ্যেও সহজ ভাবে বলতে পারতেন –

> "তাদের কোনই অভাব নেই। তাদের জল খাওয়ার জন্য ঘটি আছে, শোওয়ার জন্য চ্যাটাই আছে, আর তার হাতে এয়তির শাঁখা-পলা না থাকলেও একগাছি করে লাল সুতো ও সাদা সুতো আছে। যা তার এয়োতির চিহ্ন। ফলে তাদের কোনো অভাবই নেই।"[৮]

বাংলা সাহিত্যেও বুনো রামনাথের মতো অতি দরিদ্র অথচ ন্যায় পরায়ণ শিক্ষকের কোনো অভাব হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'টিচার' গল্পটিতে আমরা দারিদ্র্যসীমারও দু-এক ধাপ নিচে অবস্থানকারী গিরীন-এর মতো শিক্ষকদের পাই। এই গল্পে শিক্ষক গিরীনকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে সেটি সত্যিই বেদনাদায়ক। দীন-দুঃখী অতি দরিদ্র এক শিক্ষক হলেন গিরীন। অথচ স্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর-এর মতো বিষয় আসক্ত লোকেরা শিক্ষকদের বিবেচনা করে শুধুমাত্র আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে। ক্ষুধার জ্বালায় শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য দাবি, ভাত কাপড়ের দাবি জানালে সেটাকে ব্যভিচারী বলে মনে করা হয়। গল্পের চরিত্র রায়বাহাদুর-এর কথায় –

> "টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকি থাকে বলে, এটা সেটা হরেক রকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে। বাপের জন্মে রায়বাহাদুর এমন কথা শোনেনি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙর যে ধর্মঘট করবে?"[৯]

নিজের প্রাপ্য দাবি জানানোতে, না খেতে পেয়ে মরতে রাজি না হওয়াতে রায়বাহাদুর গিরীন-এর মতো শিক্ষকদের মার্কা দিয়ে দেয় আদর্শভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারী এবং স্বার্থপর হিসেবে। কেননা এরা মনে করে শিক্ষক মানে স্বার্থ ভুলে, বিলাসিতা ভুলে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্রতাকে যারা হাসিমুখে স্বীকার করে। বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব, তাদের দু-চারটা পয়সার জন্য না খেতে পেয়ে মরলেও আদর্শ ভুলে গিয়ে অসভ্য মজুরদের মতো হাঙ্গামা করা উচিত নয়। অথচ বাড়িতে এই সমস্ত শিক্ষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে মরতে বসেছে আর কী! টাকার অভাবে বাবার চিকিৎসা হচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড় পাচ্ছে না। তবুও তাদের স্বার্থ ভুলে গিয়ে বজায় রাখতে হবে আদর্শ, এই হল সমাজের বিধান। রায়বাহাদুরের কথার মধ্য দিয়ে আমরা গিরীনের যে পরিচয় পাই –

> "এত ছোট, এত পুরনো, এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ি হয়, রায়বাহাদুর তা জানত না।"[১০]

আবার আরেক জায়গায় জানায় –

> "রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়িতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ির ঝিয়ের মতোই, তবে রায়বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়িরই কোন বৌ-ঝি।"[১১]

রায়বাহাদুর এর মতো লোকেরা, যারা শিক্ষকদের বুনো রামনাথের আদর্শের কথা বলে, সেই রায়বাহাদুরই আবার শিক্ষকদের সম্পর্কে পোষণ করে বিরূপ মনোভাব। সামান্য একটা কলার কাঁদি দিয়েও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না শিক্ষকদের। তাই কলার কাঁদিটাও পেকে যাওয়ার আগে কেটে এনে রেখে দেন এই ভয়ে যে সেটি যদি আবার কোন ক্ষুধার্ত শিক্ষকের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের উপায় হয়ে যায়! অন্যদিক দিয়ে ভাবলে রায়বাহাদুর কোন কিছুকেই বেশি ঢিলে দিতে চান না, অবকাশ দিতে চান না পাকার। নতুবা তারা যদি গিরীন-এর মতো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে রায়বাহাদুরের রাতে ঠিকঠাক ঘুমও আসে না। তাই শেষপর্যন্ত প্রতিবাদ করতে গিয়ে গিরীনকে তার চাকরি হারাতে হয়। তবে গিরীন জানেন এরপর থেকে রায়বাহাদুরের বিবেক কিছুটা হলেও জাগ্রত হবে এবং "শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে যাবে কথাগুলো, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা, দয়া মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মাস্টারমশাই' গল্পে হরলালকে চিত্রিত করেছেন ট্রাজেডির এক অতলস্পর্শী বেদনার সংমিশ্রণে। মাস্টারমশাই হরলাল অতি দরিদ্র মর্মস্পর্শী এক চরিত্র। যিনি কলেজের শিক্ষার খরচ চালানোর জন্য শিক্ষকের চাকরির উমেদারি নিয়ে হাজির হয় ধনী মজুমদার বাড়িতে। মাস্টারমশাই-এর পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পকার জানান –

> "গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারের উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্ট্রান্স স্কুলে কোনমতে এন্ট্রান্স পাস করাইয়াছে।"[১৩]

ভাগ্যক্রমে চাকরিটা হয়েই যায় হরলালের এবং ছাত্র বেণুগোপাল-এর সাথে অতি গভীর একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্ক যে কতটা সুমধুর এবং মাধুর্যময় হতে পারে, সেই দিকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় খুব ভালোভাবেই ব্যক্ত হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। কিন্তু এখানেও বিপত্তি। সততা এবং সদিচ্ছাকে চলে বেআব্রু করার চেষ্টা। কথায় কথায় আমরা অনেক সময় বলে থাকি একজন শিক্ষার্থীর জীবনে পিতা-মাতার পরেই দায়িত্ব হয়ে থাকে শিক্ষকের। কিন্তু বেণুগোপালের মায়ের মতো চরিত্ররা কখনোই এই সত্যটিকে বুঝে উঠতে পারেন না। আবার কানে বিষ ঢালার জন্য সর্বদাই রয়েছে রতিকান্তর মতো খল চরিত্ররা। তাই তারা বলতে পারেন –

> "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘন্টা, বিকালে এক ঘন্টা পড়াইবে-দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন।"[১৪]

একজন শিক্ষক যার কর্তব্য শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ তৈরি করা, আদর্শ মননশীল হতে সাহায্য করা এবং নান্দনিকতার বিকাশ ঘটানো, সেই শিক্ষকের প্রতিই সমাজ আঙ্গুল তুলে অপবাদ দেয় মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, আদর্শভ্রষ্টতা এবং লোলুপতার। দরিদ্র হরলাল প্রতিনিয়তই মানুষের ব্যবহার এবং কুরুচিপূর্ণ নানান মন্তব্যের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছেন। নিজের আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে হরলাল উপলব্ধি করেছেন যে মানুষের কাছে শিক্ষকরা গোয়াল ঘরে বাঁধা গরুর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নয়। এই উপলব্ধি সমগ্র শিক্ষক জাতির আত্মপোলব্ধি। এখানে এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে সমগ্র শিক্ষক জাতির বেদনা ফুটে উঠেছে। হরলাল ব্যাথিত হৃদয়ে ভেবেছেন –

> "গোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে।"[১৫]

মাস্টারমশাই হরলালের ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে তিনি যেখানে নিঃস্বার্থভাবে তার সমস্ত কিছু উজাড় করে বেণুগোপালকে শুধুমাত্র আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানে বিনা অপরাধে তাকে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উঠে আসে চুরির অপবাদ, ছেলেকে বশীকরণ করার অপরাধ। সবশেষে ছাত্র বেণুগোপালের

প্রতি শিক্ষক হরলালের অগাধ স্নেহের প্রতিদান হিসেবে তিনি পেয়েছেন শুধুমাত্র লজ্জা, বঞ্চনা এবং প্রতারণা। এই সমস্ত কিছুর পরিণতি স্বরূপ দেখা যায় –

> "হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।"[১৬]

সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি অন্য সকলের চেয়ে। শিক্ষাই একমাত্র শক্তি, যার জ্যোতিতে আমরা সমাজের অন্ধকারকে চিরতরে বিলীন করে দিতে পারি। একজন শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই আদর্শ মানবিকতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। প্রতিটি মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত হতে অনুপ্রেরণা জোগায়। একজন শিক্ষকই পারেন ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব প্রোথিত করে দিতে, যাতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক আদর্শ মানবিক মূল্যবোধ। এইরকমই এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কান্ডারী ছিলেন শঙ্খ ঘোষ-এর 'সম্প্রদায়ের ভাষা' গল্পের হেডমাস্টারমশাই। দেশভাগের মর্মান্তিক বেদনার সময় যখন চারিদিকই মুখরিত 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আর 'বন্দে মাতরম্' - এর মতো ধ্বনিতে, তখন হেডমাস্টারমশাই-কে যত্ন নিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবের বিকাশ সাধনে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভাষাগত বিভাজনের ঊর্ধ্বে আমরা সমস্ত মানুষই যে এক, এই দিকটি উন্মোচিত করতে হেডমাস্টারমশাইকে গভীর উদ্যোগী দেখা যায়। তিনি বলেন –

> "ভাষাটাকে যে ভালো করে শিখবে, সেই তো তাকে ভালো করে জানবে? এর মধ্যে আর হিন্দু মুসলমানের কী? ভাষা তো কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য গণ্ডিবাঁধা নয়!"[১৭]

সমাজের বক্রদৃষ্টি এবং অসৎ ব্যক্তিদের নিন্দাবাদ-এর পরোয়া না করে হেডমাস্টারমশাই ভাষাকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন মুক্তভাবে এবং সবার কাছে সমান ভাবে। তাইতো তাঁর বিদ্যালয়ে দেখা যায় –

> "মৌলবি সাহেবের কাছে আরবি ফারসি শিখতে যায় জিতেন আর আশিস, পন্ডিতমশাইয়ের সংস্কৃত ক্লাসে গিয়ে বসে আনোয়ার।"[১৮]

সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার কৌশল, মাধ্যম এবং প্রণালীরও নানান পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ এখন বলে শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আকর্ষণীয়। যেখানে থাকবে না কোন লিঙ্গগত অসাম্যতা বা কারো প্রতি কটুক্তিমূলক কোনো ইঙ্গিত। তবে এতসব সত্বেও প্রতিটি শিক্ষকের মধ্যেই রয়েছে মৌলিকতা, নিজস্বতা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'দাম' গল্পে আমরা তেমনই এক অঙ্কের মাস্টারমশাইকে পাই, যিনি মনস্তাত্ত্বিকতার চেয়ে লাঠির শক্তি এবং হাতের জোরকেই বেশি মান্যতা দিতেন। শিক্ষার্থীদের কাছে অঙ্ক বিষয়টা এমনিতেই একটু কঠিন, তার উপরে দাপুটে মাস্টারমশাই-এর প্রভাবে সেটি হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। কথক সুকুমার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "অঙ্কে যারা একশোর মধ্যে একশো পায়, ওঁর ভয়ে তারাই তটস্থ হয়ে থাকত। আর আমাদের মতো যেসব অঙ্ক-বিশারদের টেনেটুনে কুড়িও উঠতে চাইতো না, তাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে।"[১৯]

সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে মাস্টারমশাই-এর অনেক খামতি ছিল। যেমন তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী মনস্তাত্ত্বিক ছিল না, তিনি লিঙ্গগত সাম্যতার কথা চিন্তা করতেন না। তাই তিনি বলতেন –

> "পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে-তার উপরে কাঁদতে লজ্জা করে না?"[২০]

কথকের মতো মাস্টারমশাইকে তাই সদুপদেশ দেওয়াই যায় –

> "অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধাটাই পঞ্চত্ব পায়।"[২১]

তবে মাস্টারমশাই-এর উদ্দেশ্য অসৎ ছিল না। তিনি বরাবরই ছিলেন শিক্ষার্থীদের শুভাকাঙ্ক্ষী। উনার মতো আদর্শ শিক্ষক সমালোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েও সামান্য একটু বিচলিত হননি। বরং আরও বলেছেন –

> "অন্যায় যদি করেই থাকি, ওরা ছাত্র-ওরা সন্তান- বড়ো হলে সে অন্যায় আমার শুধরে দেবে বই কি।"[২২]

তাইতো গল্পের শেষে এসে কথক সুকুমার যিনি একসময় মাস্টারমশাইকে নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন, তিনিও তাকে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসতে বাধ্য হন এবং বিদ্ধ হন আত্মগ্লানিতে –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সেই স্নেহ- কোটি মণি মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয় না; সেই মমতা- যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা- কুবেরের ভান্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায় না।"[২৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর আরেকটি গল্প 'ভাঙ্গা চশমা'য় মাইনর স্কুলের হেডমাস্টারকে দেখা যায় তিনি একাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভাঙা সমাজের বিরুদ্ধে আদর্শ স্থির দীপশিখা হয়ে। শিক্ষকতাকে তিনি দেখেন তাঁর ব্রত হিসেবে আর শিক্ষার আলয় তাঁর কাছে মন্দিরের মতো পবিত্র এক স্থান। জীবনের বিনিময়েও এই আদর্শকে রক্ষা করতে তিনি সদা প্রস্তুত। দুর্ভিক্ষের মহাপ্লাবন মাস্টারমশাই-এর নিষ্ঠার এতটুকু নড়চড় করতে পারেনি। গল্পে এক জায়গায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন –

> "বৌয়ের হার বিক্রি করে চালা উঠিয়েছি, মনে আশা ছিল দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব, হেডমাস্টার হব। কিন্তু স্যার, কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারাজীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন?"[২৪]

ধূলিধূসরিত কাপড় পরণে, আলুথালু বেশের অধিকারী মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার, যাকে দেখে মনে হয় তিনি দূরের কোন বাঁকের শ্মশানঘাট থেকে উঠে আসা মৃত বাংলার কোন এক প্রেতমূর্তি। তাঁর মনে যে এত পরিমাণ নিষ্ঠা, আকাঙ্খা এবং উদ্যমতা লুকিয়ে থাকতে পারে একথা চোখের সামনে না দেখলে হয়তো কথক বিশ্বাসই করতে পারতেন না। কথক, যিনি নিজেও পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন কিন্তু পরিস্থিতির কুটিলাবর্তে নিজের পেশার বদল করে নিয়েছেন, শেষ অবধি তিনি আত্মসমালোচনায় বিধ্বস্ত হয়ে হেডমাস্টারমশাই-এর সামনে থেকে পালিয়ে চলে আসেন। কথকের মনে হয় –

> "মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই - আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সবকিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।"[২৫]

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন - 'মিষ্টান্নমিতরে জনা:"[২৬] অর্থাৎ হাতে হাতে মিষ্টিটা না পেয়ে শুধুমাত্র ভান্ডারে কি পরিমান জমা আছে সেটি আন্দাজ করে কোনো লাভ নেই। প্রাবন্ধিক লিখেছেন –

> "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ।"[২৭]

প্রাবন্ধিকের এই বাণীকে গুরুত্ব দিয়েই যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত করেছেন 'শাবলতলার মাঠ' গল্পের উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে। উমাচরণ মাস্টার ছিল বিচিত্র চরিত্রের এক মানুষ। মাস্টারমশাই-এর বর্ণনায় গল্পের কথক জানান একবার মাস্টারমশাই চালতে বাগানে মাদুর পেতে কাগজ বই সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকেন এবং কখনো উপুড় হয়ে, কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে কী সব লিখতে থাকেন। আবার অন্যত্র বলেন –

> "একটা শুকনো খাল মতো নিচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড়বিড় করে আপন মনে কী বলছেন, এমন কী আপন মনে ফিকফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল।"[২৮]

শিক্ষক হিসেবে উমাচরণ মাস্টার কেমন ছিলেন সে পরিচয় গল্পে খুব একটা না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি শিক্ষক হিসেবে তিনি খুব একটা উঁচুদরের ছিলেন না। শিক্ষকতার চেয়ে তার বই বিক্রি করার প্রতি ঝোঁকই ছিল বেশি। 'আক্কেল গুড়ুম'-এর মতো কম দরের একটা বইকে প্রহসন বলে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালিয়ে দিতেন এবং একপ্রকার জোর করেই তাদের কাছে বিক্রি করতেন। তবে সমগ্র গল্পজুড়ে তার কবিয়ানা ভাবটা বহাল থেকেছে বরাবর। যদিও এই কবিত্ব ছিল শুধুমাত্র নীরব কবিত্ব। কেননা কথক শেষে জানিয়েছেন বড় হয়ে উমাচরণ নামের কোন কবিকে তিনি আর খুঁজে পাননি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অপর একটি গল্প 'মাস্টারমশায়' গল্পে আমরা পেয়েছি নতুন হেডমাস্টার প্রশান্তবাবুকে। প্রশান্তবাবুর মধ্য দিয়ে শিক্ষক চরিত্রের মহানতার দিকটি খুব ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। তিনি বিধবার ছেলে ছিলেন বলে সমাজ উনার প্রতি বিরূপ ছিল। পদে পদে তাকে নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের এইসব ব্যক্তিগত বেদনা কখনোই প্রভাব ফেলতে পারেনি উনার পবিত্র শিক্ষকতার কর্তব্যে। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রদের যে কোন সমস্যায় সাহায্যের জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলেন। ছেলেরা অন্যায় করলে তাদের বিরুদ্ধে তিনি যেমন কঠোর হয়ে উঠতেন আবার ছেলেরা ভালো কাজ করলে তাদেরকে ভালোও বাসতেন। এই রকমই এক আদর্শ, গুণী এবং দরদী শিক্ষকের মুখে তাই সহজেই শোনা যায় প্রকৃত শিক্ষার সারমর্ম। তিনি উপদেশ দেন –

> "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপ:। এখন তোমরা শুধু পড়বে। পড়া মানে যে কেবল বইয়ের পড়া তা নয়। পড়া মানে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে পৃথিবীর চারিদিক গভীরভাবে দেখা।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'অধ্যাপক' গল্পটিতে আমরা দুই ধরণের শিক্ষক চরিত্রের আভাস পাই। একদিকে রয়েছে মহীন্দ্রকুমারবাবুর মতো চরিত্ররা, যারা অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা আদর্শের দাম্ভিকতা নিয়ে বড়াই করতে পছন্দ করে আবার অন্যদিকে নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর মতো চরিত্ররা, যারা নিভৃতে, নিরালায় থেকেও অনবরত নিজেদের কর্ম এবং কর্তব্য সমাধা করে যান। মিথ্যা দাম্ভিকতার ফাঁপা ফানুসের বড়াই করে মহীন্দ্রবাবুর মতো চরিত্ররা মুখে মুখে পান্ডিত্যের জাহির করেও আবার নির্লজ্জের মতো বলতে পারে –

> "ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি। যে সকল বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরী প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।"[৩০]

উল্টোদিকে নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর মতো লোকেরা বাইরে কোনরূপ পাণ্ডিত্যের খোলস পরিধান না করেও নিভৃতে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যায় আদর্শ, ন্যায় এবং সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা রূপে।

গল্পটিতে একাধারে খল ও আদর্শচ্যুত চরিত্র এবং অন্যদিকে নিষ্ঠাবান ও ব্রতী চরিত্রদের সমান্তরালভাবে অবতারণা করা হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত সত্যের কাছে অসততাকে মাথা নোয়াতেই হয়েছে। তাইতো মহীন্দ্রকুমার যে কিরণকে দেখে আসক্ত হয়েছিল এবং অনবরত চেষ্টা করেছিল কিরণের চারিদিকে একটা ভাবের মোহজাল রচনা করতে, সেই কিরণকে শেষ পর্যন্ত জয় করে নিয়ে যায় কলেজের নবীন অধ্যাপকমশাই। গল্পের শেষে দেখা যায় –

> "কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছলছল করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।"[৩১]

একজন আদর্শ, ব্রতী এবং প্রকৃত শিক্ষক সমাজের বা পরিস্থিতির যেকোন প্রতিকূলতাতেও ভুলে যায় না তার কর্তব্য। যেমন করে ভুলেননি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর 'ভাঙা চশমা' গল্পের মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার। যুদ্ধপীড়িত এবং দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েও তিনি তার শিক্ষকতার গুরু দায়িত্ব ভুলতে পারেননি। তিনি শূন্য শ্রেণিকক্ষেও শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দিয়ে গিয়েছেন প্রিপোজিশন-এর শিক্ষা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' গল্পের সাগরপুর এম.ই. স্কুলের হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্নকেও অনেকটা সেই আদলেই নির্মিত হতে দেখা যায়। মাস্টারি জীবনে তার পদোন্নতির নানান সুযোগ আসলেও তিনি সেগুলি নেননি এই ভেবে যে সেখানে তিনি হেডমাস্টারির মতো দায়িত্ব এবং কর্তব্য হয়তো পাবেন না। যিনি শুধুমাত্র সাগরপুরের মানুষদের কথা চিন্তা করে, সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রতনপুর এবং রাধাগঞ্জের মতো দুটি হাইস্কুলের মাস্টারির চাকরির সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তথাকথিত সভ্যদের বলতে শোনা যায়-

> "হেডমাস্টার সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সাগরপুর এম.ই. স্কুলের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সে ছাড়তে রাজী নয়।"[৩২]

পরিস্থিতির কুটিল আবর্তে এবং দারিদ্রতার পীড়নে শেষপর্যন্ত সংসারকে বাঁচাতে তিনি বাধ্য হয়ে মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে যোগদান করেন তারই একটি পুরনো ছাত্রের ব্যাঙ্কে। জীবনের এই মর্মান্তিক ঘটনায় তিনি দারুণভাবে ব্যথিত হন। তাই একসময় অভিমান করে বলেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "না খেয়ে মরবো, তবু মাস্টারী আর জীবনে করব না। কেরানীগিরি থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজি আছি। কিন্তু মাস্টারী আর নয়। সাতাশ বছর ধ'রে মাস্টারী করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।"[৩৩]

তবে এটা ছিল শুধুমাত্র মাস্টারের মুখের কথা। মাস্টারিটা ছিল তাঁর অন্তরাত্মার সাথে জড়িত। তিনি কোনদিনই তাঁর মন থেকে মাস্টারি মনোভাবটুকু মুছে ফেলতে পারেননি। তাই যখনই যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানে প্রতিবাদী হয়েছেন। ব্যাঙ্কের সিনিয়র ব্যক্তিবর্গদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতেও পিছপা হতেন না। মাস্টারসুলভ এইসব আচরণের জন্যই মাস্টারমশাই-এর বিরুদ্ধে পরিমলবাবু একবার অভিযোগ করেন –

> "এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েও কথায় কথায় তাঁর সমালোচনা করেন মাস্টারমশাই। ছোকরা কর্মচারীদের সামনে তাঁর ইংরেজীর ভুল ধরেন। কথাবার্তার খুঁত ধরেন।"[৩৪]

একজন মাস্টারমশাই যে যেকোনো পরিস্থিতিতেই মাস্টারমশাই, এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণপ্রসন্ন নামক মাস্টার চরিত্রটি। তিনি ব্যাঙ্কে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়েও ভুলতে পারেননি মাস্টারি। তাই পদে পদে সংঘর্ষ বেঁধেছে ব্যাঙ্কের অন্যান্য সমস্ত কর্মীদের সাথে। বিরক্তি প্রকাশ করেছে সহকর্মীদের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে, কামুকতা মিশ্রিত নানান কথাবার্তায় এবং প্রতিবাদী হয়েছে কর্মরত বেয়ারাদের অধিকার নিয়ে। তাইতো গল্পের শেষে মাস্টারমশাই বেয়ারাদের প্রতি আক্ষেপ করে পুরনো ছাত্র তথা বর্তমান ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিরূপমকে বলেছেন –

> "ইংরেজী বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে সমান উৎসাহ। এই সব ছেলেকে দিয়েই স্কলারশিপের এ্যাটেম্পট নিতে হয়। প্রায় ক্লাস সিক্সের স্ট্যান্ডার্ডে আছে। জানো, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট ক'রে তোলা যায়।"[৩৫]

শুধুমাত্র বাংলা ছোটগল্প নয়, বেশ কিছু বাংলা উপন্যাস ও প্রবন্ধেও আমরা পাই নানান শিক্ষক চরিত্র। অমিয়ভূষণ মজুমদার এর 'নির্বাস' উপন্যাসে আমরা পাই স্কুলমাস্টার ভুবনবাবুকে। ভুবনবাবুর অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব বেশি উচ্চমানের ছিলনা। সংসারের অতিরিক্ত খরচ বহন করার জন্য ভুবনবাবুকে বাড়তি কিছু টিউশন পড়াতে হয়, আবার শীতকালে ভুবনবাবুর গায়ে চাদর তুলে দেওয়ার জন্য বিমলাকে লেপ-এর আশা ত্যাগ করতে হয়। তবুও তাদের সবসময়ই আদর্শের কথা ভাবতে হয়, সভ্যভাবে চলতে হয়। কারণ ভুবনবাবু একজন স্কুলমাস্টার এবং সমাজের চোখে বিমলা স্কুল মাস্টারের স্ত্রী। যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রী ছিল না। কিন্তু একজন স্কুলমাস্টারের সাথে থাকতে থাকতে বিমলা নিজেও আদর্শেরই বাহক হয়ে উঠেছে। সমাজের কাছে শিক্ষক চরিত্র মানেই হল সমস্ত নৈতিক, নান্দনিক এবং প্রজ্ঞাগত গুণাবলীর সমষ্টি। তাই বিমলা ওরফে বিমি নিজেই নিজের প্রতি উচ্চারণ করেছে –

> "জানো ভুবনবাবু, একজন স্কুলমাস্টারের বিমিকে ধর্মপত্নীই ভাবা উচিত লোকের। নষ্টচরিত্র স্কুলমাস্টারের চাকরি থাকেনা।"[৩৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে আমরা পাই স্কুলমাস্টার সীতারামকে। তিনি প্রায় জীবনের পুরোটাই কাটিয়ে দিয়েছেন দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে। শিক্ষকতা করতে এসে তিনি করে যাচ্ছিলেন দুঃখের সাধনা। তিনি দুঃখের সাথে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে দুঃখটাকেই জীবনের নিত্য সঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। অনেক সময় তাকে নিজের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করতে শোনা যায়। নিজেকেই তিনি প্রবোধ দিয়ে বলতেন দুঃখের মধ্যেই সুখ আছে। কেননা একটা ফুল ঝরে গেলে তবেই ফল হয় আবার ফলটি খসে পড়লে তবেই নতুন একটি চারাগাছ। সারাজীবন মাস্টারি করে জীবনের সম্বল হিসেবে শেষপর্যন্ত সীতারাম শুধু পেয়েছিলেন একতারার মতো একঘেয়ে সুর, বাউলের মতো বৈচিত্রহীন আস্বাদ এবং একরঙা ছবির মতো সাদাসিধে একটি জীবন। তবুও তিনি শিক্ষকতাকে একদিনের জন্যও ভুলে যেতে পারেননি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তিনি মানুষেরা যখন যন্ত্রের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন, সেই রকম মুহূর্তে মানুষকে সুমধুর প্রকৃতির আলতো স্পর্শ এনে দিয়েছেন। এই প্রকৃতির স্পর্শের সাথে বেশ কিছু মানবিক স্পর্শও

তিনি দিয়েছেন আমাদের। 'গনোরী তেওয়ারী' তাঁর সৃষ্ট এমনই এক শিক্ষক। 'আরণ্যক' উপন্যাসে স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারীর দুঃখ দুর্দশাময় পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা জেনেছি তার দৈন্যদশা। তেওয়ারীর নিজের কথায়-

> "আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল। তার পর আর খাই নি।"[৩৭]

তার শারীরিক বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানান –

> "শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, মাথায় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই, এদেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্য্যন্ত নাই।"[৩৮]

এই ছিল তৎকালীন শিক্ষকদের অবস্থা। গায়ের 'মেরজাই' যেটা থাকা উচিত ছিল বলে ঔপন্যাসিকের মনে হয়েছে সেইটুকুও জোগাড় করতে অক্ষম ছিল তারা। তবুও তারা শিক্ষকতাকে বেছে নিতেন শুধু তাদের উদ্দেশ্যটা সৎ ছিল বলে। তাদের ব্রত একটাই, সমাজের মঙ্গল, মানব প্রজাতির মঙ্গল।

সাংসারিক নানান প্রতিকূলতা এবং বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবুর মতো আদর্শবান চরিত্রকে অনায়াসেই ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে। চন্দ্রনাথবাবুকে বরাবরই বেষ্টন করে থাকতো ন্যায়, নীতি এবং নিষ্ঠাবোধ। মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ-এর আকর্ষণ এতটাই তীব্র ছিল যে, নিখিলেশ স্কুলজীবন ত্যাগ করেও মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেননি। নিখিলেশ মাস্টারমশাই সম্পর্কে বলেছেন-

> "তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না; কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন- তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।"[৩৯]

এরাই তো প্রকৃত শিক্ষক যারা ন্যায় কে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য নিজের ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে দিতেও দুবার ভাবেন না। পঞ্চু-কে তার নকল মামির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের ধর্মকে উপেক্ষা করে পঞ্চুর বাড়িতে তাদের সাথে এক আসনে বসে খাওয়া দাওয়া করেছেন মাস্টারমশাই। এর ফলে সমাজ প্রদত্ত কৃত্রিম ধর্মটি খোয়াতে হয়েছিল মাস্টারমশাইকে। তবে তিনি ছিলেন মানবধর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। মাস্টারমশাই-এর কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তাঁর সরল, সাদাসিধে এবং উদার মনের পরিচয় –

> "ওর মা হারা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না।"[৪০]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর 'আমার বাংলা' প্রবন্ধের 'দীপঙ্করের দেশে' অংশে আমরা পাই দুর্ভিক্ষ পীড়িত মর্মান্তিক এক সময়ের বর্ণনা। মানুষ যখন মারা যাচ্ছে না খেতে পেয়ে, পরিত্যক্ত বাড়িঘর শুকিয়ে যাচ্ছে লোকজনের অভাবে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এক বৃদ্ধের মুখে মিনতি শোনা যায় –

> "দেখুন ও গাঁয়ে মেয়েদের পরবার কিছুই নেই। খাটতে তো হয়। তাই দিনের বেলায় ঘরেও বসে থাকতে পারে না। আপনি গেলে ওরা ভারি লজ্জা পাবে।"[৪১]

আবার এক জায়গায় প্রাবন্ধিককে বলতে দেখা যায়-

> "শেষপর্যন্ত বাইরে থেকে মাইনে করা ডোম আনতে হল খাল থেকে মড়া ফেলার জন্যে। মহাজনদের গাঁটের কড়ি বেশ কিছু খরচ করতে হল। কিন্তু মানুষ মেরে যা লাভ তারা করেছে তার তুলনায় তা কিছুই নয়।"[৪২]

সমাজের এমন দুঃসময়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষেরা যখন নিজেদের দাঁত মুখ বিকৃত করে মানুষের রক্ত শোষণে ব্যস্ত, সেই রকম সময়ে রহমান মাস্টার আবির্ভূত হয়েছেন আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুন্নেসা, সুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম-দের মতো নিঃস্ব ছেলেমেয়েদের রক্ষাকর্তা এবং অন্নদাতা রূপে। রহমান মাস্টার তাদের শিখিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। একজন শিক্ষকের পক্ষেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মূল্যবোধ, আদর্শ,

ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি সঞ্চার করে দেওয়া সম্ভব। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে রহমান মাস্টার সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্য খুব ভালোভাবেই পালন করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আশ্রয়দাতা হয়েছেন। আবার এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাঁচার অধিকার যারা ছিনিয়ে নিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাইতো প্রাবন্ধিকের জিজ্ঞেস করা 'বড় হয়ে কী হতে চাও?' প্রশ্নের উত্তরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা যায় রহমান মাস্টারের শেখানো বুলি, তারা "হাতের মুঠোটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে বলে, বড়লোকদের শেষ করবো।"[৪৩]

পরিশেষে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গল্পের বিভিন্ন পটভূমিকাতেই শিক্ষক চরিত্ররা ফিরে ফিরে এসেছেন বারবার। তবে বাংলা সাহিত্য কখনোই বাস্তব ভূমিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র আদর্শের ডালি দিয়ে শিক্ষকদের ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেনি। এখানে যে শিক্ষক চরিত্ররা এসেছেন, তারা এসেছেন বাস্তবতার স্পর্শ নিয়ে। শিক্ষকরাও যে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা সাধারন মানুষ এই সত্যটিকে বাংলার রচয়িতারা কখনোই ভুলে যাননি। তাইতো শিক্ষকরা এসেছেন কখনো আদর্শবাদী, নিষ্ঠাবান এবং ব্রতী হয়ে আবার কখনো এসেছেন ব্রতচ্যুত এবং আদর্শহীন হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে আমরা একদিকে যেমন পেয়েছি বুনো রামনাথের মতোই আদর্শবান কিছু শিক্ষকদের আবার অন্যদিকে পেয়েছি মহীন্দ্রবাবুর মতো অন্তঃসারশূন্য এবং দাম্ভিক শিক্ষকদেরও।

বাস্তব ভূমির স্পর্শ রেখেই বাংলা সাহিত্যে শিক্ষক চরিত্রদের ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে তারা আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পেরেছে। প্রতিটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী। সব মিলিয়ে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক চরিত্ররা প্রকৃত শিক্ষক চরিত্রের স্বরূপটিকে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন। তারা আমাদের আদর্শ, আমাদের অনুপ্রেরণা। সমান্তরালভাবে বাংলা সাহিত্য রায়বাহাদুরের মতো বিষয়াসক্ত এবং স্বার্থান্বেষী চরিত্রদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আদর্শ, মূল্যবোধ, নান্দনিকতা, মানবিকতা প্রভৃতি সমস্ত বোধের সঞ্চার ঘটানো অবশ্যই শিক্ষকদের গুরু দায়িত্ব। তাঁরা সমাজের সংস্কারমূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন এটি আমাদেরই পরম সৌভাগ্য। মানবের মঙ্গলার্থে, সমাজের কল্যাণে শিক্ষকরা প্রতিনিয়তই কর্ম করে যাচ্ছেন আড়ালে আবডালে অন্তরালে। তবে তারাও মানুষ। তাদেরও রয়েছে পেটের ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজন এবং বেঁচে থাকার অধিকার। 'শিক্ষকরা শুধুমাত্র আদর্শের ধারক ও বাহক'- তাদেরকে এইরূপ প্রতীকি রূপে না দেখে আমাদের উচিত তাদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা। 'গিরীন'-এর মতো তাদেরকে শুধুমাত্র আদর্শের কথা শুনিয়ে ক্ষুধার্ত না রেখে সম-সুযোগ এবং উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা। আমাদের এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বর্তমান সময়েও কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যতিক্রমমূলক আদর্শহীন এবং ব্রতচ্যুত শিক্ষক চরিত্ররা থাকলেও সামগ্রিকরূপে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষক চরিত্ররা সর্বদাই নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে মানবজীবন এবং মানব সমাজের মঙ্গলার্থে। তারা ব্রতী হয়েছেন সমাজের কল্যাণে, মানবের কল্যাণে। আমরা মানুষ হয়ে অবশ্যই এইসব আদর্শের পাশে দাঁড়াবো। এই কথাটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতটা সত্য, বাঙালি সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রতিও ততটাই খাঁটি।

Reference:

১. চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ৭ আগস্ট ১৯৫৭, পৃ. ২৪৯

২. লাহা, জগত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৯২

৩. তদেব, পৃ. ৮২

৪. তদেব, পৃ. ৮০

৫. তদেব, পৃ. ৯১

৬. তদেব, পৃ. ৯০

৭. ভট্টাচার্য্য, বিপ্লব, ইতিহাস উপেক্ষিত এক শিক্ষক: পন্ডিত প্রবর বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কথালহরী(সাহিত্য পত্রিকা), মে ১৮, ২০২১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 175
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. তদেব
৯. বিশ্বাস, তপনকুমার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২৪, পৃ. ১২৬
১০. তদেব, পৃ. ১২৮
১১. তদেব, পৃ. ১২৯
১২. তদেব, পৃ. ১৩২
১৩. সাহা, ঐশানী, গল্পগুচ্ছ, শুভম, ৭ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, কলকাতা পুস্তকালয়, ২০০৭, পৃ. ৪৬৯
১৪. তদেব, পৃ. ৪৭১
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭১
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮৬
১৭. ঘোষ, সুব্রত, সাহিত্যকথা, ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ), প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৮৫
১৮. তদেব, পৃ. ৮৫
১৯. চ্যাটার্জি, নবনীতা, সাহিত্য সঞ্চয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ), পঞ্চম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১২
২০. তদেব, পৃ. ১২
২১. তদেব, পৃ. ১৩
২২. তদেব, পৃ. ১৫
২৩. তদেব, পৃ. ১৫
২৪. মুখোপাধ্যায়, বামাচরণ, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা- ০৯, প্রথম করুণা মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২০, পৃ. ১৬১
২৫. তদেব, পৃ. ১৬২
২৬. লাহা, জগত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৮৪
২৭. তদেব, পৃ. ৮৪
২৮. সাহা, অর্জুন, বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র, শুভম, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, প্রথম শুভম সংস্করণ, ১ জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ১৩৮
২৯. তদেব, পৃ. ১৯
৩০. সাহা, ঐশানী, গল্পগুচ্ছ, শুভম, ৭ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, কলকাতা পুস্তকালয়, ২০০৭, পৃ. ৩১৮
৩১. তদেব, পৃ. ৩১৯
৩২. মিত্র, সুবীরকুমার, গল্পমালা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ০৯, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৪৬
৩৩.তদেব, পৃ. ১৪৮
৩৪. তদেব, পৃ. ১৫৩
৩৫. তদেব, পৃ. ১৫৬
৩৬. দে, সুধাংশুশেখর, নির্বাস ও অরণ্য রোদন, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৪৪

৩৭. সাহা, অর্জুন, বিভূতিভূষণ উপন্যাস সমগ্র, শুভম, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৯৩

৩৮. তদেব, পৃ. ৪৯২

৩৯. সাহা, অর্জুন, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, শুভম, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০, ১ লা বৈশাখ, পৃ. ৬২২

৪০. তদেব, পৃ. ৬৯০

৪১. সিংহরায়, জে. এন., আমার বাংলা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলকাতা- ০১, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৬১, পৃ. ৩৩

৪২. তদেব, পৃ. ২৬

৪৩. তদেব, পৃ. ৩০

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 176 - 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 176 - 183
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প : পুং-তন্ত্র বিরুদ্ধতায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

কিশোর কুমার রায়
সহকারী অধ্যাপক
দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ
Email ID: kishoreroy84@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Feminism, patriarchy, self-reliance, women's rights, liberty, severalty, protest, society.

Abstract

Tilottama Majumdar is a renowned writer in Bengali literature in recent times. She is a novelist, short story writer, poet, essayist. However, her main identity and popularity is as the author of the first two literary works. She was born in North Bengal and spent her childhood in the Kalchini tea garden of Alipurduar district of North Bengal. She studied at Union Academy School there. Later, in 1985, she came to Kolkata to study at the undergraduate level at the Scottish Church College. Her writing began in 1993. One of the subjects of her writing is women. Women's characters usually occupy a large part in her writing. Their rights, self-reliance etc. are integrally involved in her writing. Since the beginning of civilization, society has been male-centric. Women are defined by the definition given by men. Their appearance, beauty, intelligence, and rights all are determined by the standards given by men. Times have changed - society has entered the third decade of the 21st century, but the position of women has not changed. Women are still the property of men, and men are the absolute masters of society. Despite various women-centric movements and theoretical discussions to protect women's rights, women's place in society has remained unchanged. The attempt to blunt women's brains with the tricks of saying that women are great, omnipotent, etc. has existed throughout the country. It is in this context that Tilottama Majumdar's women-centric stories have gained status in opposition to patriarchy and in a spirit of protest. In her stories the women try to strike a powerful blow at the patriarchal mentality of society. They are brave, financially strong, and possess modern thinking. This distinction is not imposed on them; they are like the story-writer's own entity. The writer's own mentality towards establishing women's rights seems to be embedded in the characters. And in this way, the stories become a text of a special statement beyond the limits of the story. In the present article, an attempt will be made to recognize the uniqueness of women in the light of some such stories.

Discussion

তিলোত্তমা মজুমদার [১৯৬৬] একালের অন্যতম সাহসী ও শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত বিগত শতকের শেষ পাদে; এবং বলা যায় একবিংশে এসে তার আলোকোজ্জ্বল সম্পূর্ণতা। বিষয় স্বাতন্ত্র্য, ভাষাপ্রয়োগ ও মননের গভীরতা যার চিহ্নায়ক। আনন্দ পাবলিশার্সে সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত তিলোত্তমার সাহিত্য-বিচরণ মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই। তবে কবিতাও তাঁর লেখালেখির অঙ্গ। বর্তমান প্রবন্ধে যদিও তাঁর ছোটগল্পই আলোচ্য। গল্পগুলি ‘মানবচরিত্র এবং জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়’মণ্ডিত ও তাঁর স্বাতন্ত্র্যনির্মাণের অন্যতম স্তম্ভ। দেশ-কাল লেখকের মনন-ধৃত হয়ে কলমে উদ্ভাসিত হওয়ার সৌত্রেই গল্পগুলি যেন একালের নারীর যুগযন্ত্রণার অন্যতম প্রতিবিম্বন। নারী ভোগ্য, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, সংসারের অলিখিত দাসী-বাঁদি — আরও অনেকানেক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে দেখবার। কোনটিই মর্যাদাব্যঞ্জক নয় এবং সামাজিক-পারিবারিক এই দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুবত্বেই নারীর অবস্থা অপরিবর্তিত, স্থির। তবে তিলোত্তমার গল্পের নারী চরিত্রগুলির দিকে দৃকপাত করলে তদূর্দ্ধে আরেকটি বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করে। তা হল, বহুকালব্যাপী পুংতন্ত্রের যে প্রকাশ্য-প্রচ্ছন্ন নারীশোষণ; তার বিপ্রতীপ একটি বলিষ্ট স্রোতের প্রবাহ। নারী সেখানে মাত্রই পুরুষের কাষ্ঠপুত্তলিকা বা গলগ্রহ নয়; স্বাবলম্বী, আত্মপোষণকারী, সর্বোপরি আত্মমর্যাদাভিলাষের স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। সেই বিশিষ্টতায় দেখি, বিশ্বায়নের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল জীবনে আধুনিক মানবীর রক্ষণশীল মানসিকতা ও সামাজিক কারাগার অর্গলমুক্ত করে আত্নচেতনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবনাখ্যান রচনার প্রয়াস।

কবি নারী/ মানবীর রূপনির্মাণ করেছিলেন আপন সৌন্দর্যরসের নিষেকে -

“শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী-
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।
…।
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।”

— এই রোমান্টিক কল্পনা আজ আধুনিক নারীচেতনাবাদ-পাঠে প্রশ্নের সম্মুখীন। শ্রদ্ধেয় তপোধীর ভট্টাচার্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন–

> “…যার তিলোত্তমা মূর্তি গড়ছে পুরুষ, কে সে? সে কী বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নাকি এই ‘রচনা’ আসলে আত্মরতির প্রয়োজনে! নিজেকে তৃপ্ত করতে চাই বলে ব্যক্তি-নারীর ওপর চাপিয়ে দিই নারীপ্রতিমার মোহিনীমূর্তি? খররৌদ্রের বাস্তবে দেখতে চাই না বলে কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিই, স্নিগ্ধতা আর লাবণ্যের অতিরেক তৈরি করি। এতে নারীব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানো হয় নাকি সুকৌশলে তার কল্পিত অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করে তাচ্ছিল্য দেখানো হয়, এই খটকা থেকে যায়।”[১]

এই সুকৌশল কল্পনা আসলে পিতৃতান্ত্রিকতারই প্রতিচ্ছায়া। স্থান ও কাল নির্বিশেষে সমাজ পুরুষতান্ত্রিক— এই একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও যা ব্যত্যয়হীন। নারী যুগে যুগে পুরুষের যৌন কামনার ধন, ভোগ্যপণ্য; এবং সমাজনীতির যাঁতাকলে ক্লিষ্ট, পিষ্ট। তার সত্তা আত্ম-বর্জিত। ‘নারী’ শব্দ তারই ইঙ্গিতবাহী। ‘নর’-এর বিপরীত বোঝাতেই যেন তার সৃষ্টি। কিংবা রমণী, স্ত্রী, যোষিৎ, যোষা, অবলা, কামিনী! — সেখানেও রয়েছে পুরুষেরই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিবেশ; রয়েছে নারীর অবমাননা। নারী যেন মানবজাতির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, নর-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অন্বিত হয়েই তার স্থিতি। বলাবাহুল্য, সে স্থিতি গৌরবময় নয়। কারণ পিতৃতান্ত্রিকতা আপন স্বার্থেই নারীমননে করেছে নানা কূট-কৌশলের আরোপন। কখনো তার দেহজ লাবণ্য-সৌন্দর্যের গুণগানে, কখনো বা ‘নারীত্বের অপার মাহাত্ম্য’- ধারণার মধ্য দিয়ে তাকে আবেগচালিত করে। যুগব্যাপী এই আরোপিত ধারণার সফল প্রয়োগে নারী মানসিকতাও নিয়েছে এমন আকার, যেখানে পিতৃতন্ত্রের কৌশল নারী-মনোলোকে সৃষ্টি করে ‘নারীত্বের’ স্বপ্নিল আবেশ ও মহত্ত্বতা। অথচ নারী বাল্যে-কৈশোরে পিতার, যৌবনে স্বামীর, প্রৌঢ়ত্বে-বার্ধক্যে পুত্রাধীন। পুরুষের সেবা ও অধীনতাই নারীজীবনের একমাত্র কৃত্য! আশ্চর্যের বিষয়, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও এসবের চর্চা ছিল; দেখছি এযুগেও। নারী চেতনাবাদের হাত ধরে পুরুষ ও নারীর সমতাবিধানের নানান তাত্ত্বিক

ভাবনায় নারীর সামাজিক স্থান, তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, পুরুষের পিপাসা নিবৃত্তির উপকরণ বা নারীকে সংসার গৃহকোণে আগলাবার মাধ্যম হিসেবে দেখবার স্বাভাবিক চিন্তাচেতনায় আপাত পরিবর্তন লক্ষিত হলেও; অন্তঃসলিলার মত সমাজ-মানসিকতায় পুরুষতন্ত্র আজও নিরঙ্কুশ। তিলোত্তমা মজুমদারের নারীকেন্দ্রিক গল্পগুলি এই তথ্যের সাহিত্যিক দলিল। সেখানে স্পষ্টভাবে দেখি, তুলনামূলক কমশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা কর্মজীবিনী- প্রত্যেকেই পীড়িতা। পুরুষতন্ত্রের কূটকৌশলে নারীর আত্মযন্ত্রণা, মানসিক ও শারীরিক পীড়নের বহুবিধ ছবি। সমাজ মানসিকতার কাঠামোয় সেখানে অস্বীকৃতই থেকে যায় নারীর কর্মনৈপুণ্য ও বৌদ্ধিক গুণবত্তা। তবে এই দৃশ্যের বিপ্রতীপে তিলোত্তমার গল্পের নারী চরিত্রগুলির বিশেষত্ব, তারা যুগ যুগ ব্যাপ্ত সামাজিক নিয়মের শিকার, পীড়িতা; কিন্তু তাতেই ক্ষান্তি দেয়না। প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো এবং অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণপণ প্রয়াসী। আধুনিক বিশ্বের পরিবর্তিত মানসিকতায় তারা এতকালের অব্যক্ততা কাটিয়ে অন্তরাত্মা উন্মোচনে সাহসী এবং সোচ্চার। গল্পের নারী চরিত্রগুলি যেন সমগ্র নারীজাতিরই প্রতিনিধি হয়ে সোচ্চার উচ্চারণে আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেঃ 'নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।/ পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে সে নহি নহি।/ হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।' পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিচিত্রধর্মী নারী-শোষণের বিপরীতে এই রণহুঙ্কারেরই এক একটি খতিয়ান তিলোত্তমা মজুমদারের 'ননদ-বউদির রান্নাঘর', 'জ্যোতির্লীনা', 'ছেঁড়া ছেঁড়া পাতা', 'মায়া', 'একটি গুপ্তহত্যার ইতিবৃত্ত', 'মণিকুন্তলা', 'ছবি', 'স্তনী' 'অ আ ক খ', 'আম্লান', 'গর্ভপাতকিনী', 'শর', 'নীল' ইত্যাদি গল্পগুলি। সবগুলি আলোচনার বিস্তৃত পরিসর এখানে অপ্রতুল। দরকারও নেই। আমরা শুধু প্রথমোক্ত কয়েকটির মাধ্যমেই লেখকের মানস প্রবণতা ও সমাজ-চেহারা অন্বেষণে প্রয়াসী হব।

'ননদ-বউদির রান্নাঘর' গল্পে স্বামী পরিত্যক্তা দুই নারীর স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার যে প্রয়াস তা সমাজনীতি ও রীতির বিপরীত স্রোতবাহী। বাস্তবের কঠিন কঠোর ভূমি থেকে সাহিত্যের পাতায় উঠে আসা নারীর জীবনযুদ্ধ লড়াইয়ের কাহিনি দুর্লভ নয়, কিন্তু এ গল্পে দুই পরিবার-ছিন্ন মহিলা, সম্পর্কে ননন-বউদি; পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে পুং-শাসিত সমাজে পুরুষনির্ভরতা কাটিয়ে উঠে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে, পুরুষের সঙ্গে সহবাস না করেও স্বাধীন জীবনযাপন করে দেখিয়েছে। কাকলির বর 'কাজ খুঁজতে যাচ্ছি' বলে বোম্বাই গিয়ে বহুবছর 'নিপাত্তা'। আর 'মিনতিকে বর নেয়না।' যূথবদ্ধতায় সূচনা হয় বউদি-ননদের নূতন সংসারের। গ্রিল কারখানার পেছনে এক চিলতে জমিতে ঘর; ভাড়া ছ'শো টাকা। পার্টির লোকাল কমিটির সহায়তায় এবং বুদ্ধিতে শুরু হয় রান্নার হোম ডেলিভারির কাজ। মিনিতির বয়স কম- কাজের ফাঁকে সময় বের করে সে পাড়ার শেষ প্রান্তে অভয়নাথের চায়ের দোকানে যায়। চা খায়, পরনিন্দা করে আধবুড়ো অভয়নাথের সঙ্গে। কাকলির তা পছন্দ নয়। মিনতির অনুপস্থিতি এবং ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে খাবার পৌঁছে দেওয়ার তাড়না তাকে ক্ষুব্ধ করে - "ভাল জৌর শুরু করেছে সকাল থেকে। কোথায় এসে কুটবে তা না। ঢলাচ্ছে।" মিনতি তখন ফিরতে ফিরতে তৃষ্ণার্ত মনে নিজের সম্পর্কে ভাবে- 'না হয় তার দাঁত একটা বড়। গায়ের রঙ কালো। তা সেই সোঁদরবনের গায়ে বড় হয়েছে। সেখানে কে কবে ফিট-ফরসা হয়। এ ছাড়া আর সব অন্য মেয়েমানুষের মতই তো! তা হলে নিল না কেন? বেশ একটা নিজের সংসার হত।' মানসিক কাঠিন্যে পুং-তন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করার সাহস যোগালেও সংসার যাপনের চিরন্তন বুভুক্ষা ও সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়না। তবু পরমুহূর্তেই সাজতে ভালোবাসা মিনতি ভেবেছে- 'জন্য এত সাজ? কার জন্য আবার? আমার নিজের জন্য। বর নেয়নি বলে সাজতে নেই নাকি?' ননদ-বউদি অশ্লীল ঝগড়ার শেষে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে একে অপরের সহায়ও হয়ে উঠেছে এই গল্পেই। মিনতির মনোলোকের গহীন ভাবনায় তা স্পষ্ট হয়েছে - 'কী বিষ কী বিষ। ঝগড়া করলে নেমে যায়। কিন্তু ঝগড়াটা শুধু কাকলির সঙ্গেই ভাল আগে কেন?' ভাল লাগে; সমবেদনা ও পারস্পরিক অবলম্বন হিসেবে আর্ত অসহায় দু'জনের মানসিক নৈকট্যের কারণে। তারা জানে, পুরুষসর্বস্ব সমাজে নারীর প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার কথা— জানে, লৈঙ্গিক তৌলে সমাজে তাদের স্থান নির্ণীত হওয়ার কথা। নারী শুধু ভোগ্যপণ্যই নয়, সংসারে পুরুষের যাবতীয় চাহিদা পূরণের উপকরণ। নারীর লৈঙ্গিক অবয়ব, দৈহিক সৌন্দর্যই তার মূল্য নির্ধারক। স্মর্তব্য, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে কমলাকান্তের জবানীতে বঙ্কিমের উক্তি - '...তার পরে মালা— এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা— কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়।'

> "কমলাকান্তের মতকে বঙ্কিমের মত ব'লেই ধরতে পারি, এতে প্রকাশ পেয়েছে উগ্র পুংতান্ত্রিক মনোভাব।"[২]

নারীর এই অবমাননা ও পুংতান্ত্রিক উগ্রতা অন্তঃসলিলার মত বহমান একবিংশ শতকের আধুনিক সমাজ মানসিকতায়। কাকলি-মিনতির উৎকট অশ্লীল ঝগড়া তাই তাদের শ্রেণিগত অবস্থান ও জীবনযুদ্ধের বিচারে গৌণ; বরং পুং-তন্ত্রের প্রথা ভেঙে সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করার প্রচেষ্টার অভেদতায় নৈকট্যেরই প্রকাশক। আবার, গল্পের পরিণতিতে মিনতি জেনেছে কাকলির স্বামীর মৃত্যু সংবাদ; কাকলি মিনতির স্বামীর। দু'জনেরই সে সংবাদ একে অপরের কাছে গোপন করার প্রয়াসে রয়েছে সহানুভূতি, সমবেদনা তদুপরি নারীর অন্তরাত্মার রক্তক্ষরণের সাযুজ্য। মিনতি ও কাকলির অনুভবে তা ধরা পড়ে -

> (১) "দাদার জন্য কাঁদলাম? নাকি অন্য কারণে? আগে অনেক কেঁদেছি ওর জন্য। আর জল ছিল না। এক-এক জন মানুষের জন্য এক-এক পরিমাণ জল। দাদার জন্য আর জল নেই। দাদা আবার বিয়ে করেছিল! ওই জন্যি ঘরে আসত নাকো। কেন? বউদির কী নেই? আর পাঁচটা মেয়ে মানুষের চেয়ে কম কীসে? দাঁত উঁচু নয়। দাদা মরেচে। আগেই কী মরেনি।"
>
> (২) "এ সংসারে বলরাম আগেই মরেচে। মিনুটার কী জীবন! আহা! সাজতে-গুজতে কত ভালবাসে। এবার একটা গয়না গড়িয়ে দেব। ধারটা শুধি। অভয়নাথের সঙ্গে মিনুর ভাব আচে। আচে ত আচে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে। অন্তত শরীলের জন্যও ত একটা বেটাছেলে লাগে।"

-স্নেহ, সহানুভূতি মিশ্রিত একটা justification-এ সামাজিক নিয়ম ও পুং-তন্ত্র পীড়িতা নারীর লড়াইকে প্রশ্রয়পূর্ণ ভালবাসায় আর্দ্রতাযুক্ত করেছেন গল্পলেখক। তবে গল্পের শেষে লেখকের চমক— পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধতায় তীব্র প্রতিবাদে কাকলি-মিনতির প্রথাভাঙা আচরণে। তার অনুল্লেখে এ গল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লক্ষণীয় স্বামীর মৃত্যসংবাদ প্রাপ্ত দুই নারীর রাত্রিকালীন আহার্যের সম্ভার। দু'জনের কথোপকথন -

> "তোর কই?"
> "আমি কাতলা খাব। হবে তো আবার।
> "একটু চিকেন খানা। আচে না? অত রাঁধিস। ভাল খা।"

সদ্য স্বামীহারার যুগকালব্যাপী দেশজ সংস্কার পালনের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তাদের বৈপ্লবিক জীবনচর্যা-রূপ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে।

> "পিতৃতন্ত্র নারীর জন্যে যে-পেশাটি রেখেছে, তা বিয়ে ও সংসার; এ-ই পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত নারীর নিয়তি। এরই মাধ্যমে নারীকে বিস্তৃত জীবন থেকে সংকুচিত ক'রে, তার মনুষ্যত্ব ছেঁটে ফেলে, তাকে পরিণত করা হয় সম্ভাবনাশূন্য অবিকশিত প্রাণীতে। নারীকে দেয়া হয়েছে বিয়ে নামের অনিবার্য স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যার মধ্য দিয়ে সে ঢোকে একটি পুরুষের সংসার বা পরিবারে; পালন করে পুরুষটির গৃহিণীর ভূমিকা, কিন্তু বন্দী থাকে দাসীত্বে। প্রথাগত স্ত্রীর ভূমিকা একটি প্রশংসিত পরিচারিকার ভূমিকা, যে তার প্রভুর সংসার দেখাশোনার সাথে কাম ও উত্তরাধিকার দিয়ে চরিতার্থ করে প্রভুর জীবন।"[৩]

নারীর জীবনকে ছেঁটে ফেলে, তার সম্ভাবনাকে পিষ্ট করা আস্ফালিত পৌরুষের কদর্য উদাহরণ চতুর্পার্শ্বে। তবু 'জ্যোতির্লীনা' গল্পে দেখি নারীর স্বপ্নবুনন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রাণপণ প্রয়াস ও সাহসী পদক্ষেপ। কমলজ্যোতি ও আকাশলীনা— দুই সহপাঠিনীর স্বপ্নডানায় ভর করে সামাজিক-পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে আপন আপন ইচ্ছেপূরণে পাড়ি দেওয়ার গল্প। নৃত্যকলা ও অঙ্কনে দুই প্রতিভা তারা। তবে আকাশলীনার কথায় বাস্তবসত্য ধরা পড়ে- 'ছোটবেলায় সবাই শেখে, নাচ, গান, ছবি আঁকা, টেবিল টেনিস, দৌড়, সাঁতার, যোগাসন- তারপর যেই বিয়ে হবে, সব শেষ। বাচ্চা হল ত আরও গেল।' নারী জীবনের সীমাবদ্ধতা গল্পসূচনাতেই লীনার কথায় স্পষ্ট হলেও কাহিনির গতিমুখ আরও প্রসারিত হয়েছে বক্তব্য বিষয়ের গভীরতায়। সেখানে রয়েছে বেপরোয়া লীনার সামাজিক নিয়মের ছকভাঙা সাহসী পদক্ষেপ। দেখি তার প্রেম প্রেম খেলা।

আর পরিচয় পাই প্রেমিক নীলাঞ্জনের কাপুরুষোচিত এবং matriarchy সুবোধ বালকসুলভ মানসিকতার। জ্যোতিকে লেখা লীনার চিঠিতে তার উল্লেখ রয়েছে - 'আমি নাকি দুশ্চরিত্র। নীলাঞ্জনের তো বাবা নেই। ও বলে, তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু মাকে দুঃখ দিয়ে বিয়ে করতে পারব না।' লীনা বিয়ে করে বসে অসভ্য, অভব্য 'মাঝারি উচ্চতার, কালো, খয়াটে চেহারার' অলককে। আসলে এও তার নির্বিকার বেপরোয়া প্রতিবাদ। অন্যদিকে নৃত্যকলায় উচ্চশিক্ষালাভে জ্যোতির কলকাতায় পাড়ি দেওয়া; স্বপ্নপূরণে ঘটিবাটি বিক্রির বাজি—সেখানেও রয়েছে বৈপ্লবিক মানসিকতা। আবার জ্যোতির বিয়ের পর উন্মোচিত হয়েছে শ্বশুরবাড়ির লুকোনো প্রাচীন মানসিকতা - মায়ের পছন্দ নয় বলে বরের তাকে নাচের বদলে গান শিখতে বলায়। জ্যোতি প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে - 'কিছু ভুল আছে তোমার ভাবনায়। তার সংশোধন প্রয়োজন। আমার বাবা-মা সর্বস্ব বিক্রি করে জলপাইগুড়ি শহর ছেড়ে কলকাতায় দীন-হীনের মত থেকেছেন, যাতে আমি গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে পারি। তোমার কি মনে হয়, এ আমার একটা কিছু নিয়ে থাকা? গান আমি গাইতে পারি না। গাইতে চাই-ও না। যদি চাইতামও, আমার শিক্ষক আমি নিজে নির্বাচন করতাম। এটা কি অষ্টাদশ শতাব্দী, যে চিকের আড়ালে বসিয়ে তুমি আমাকে মহিলা টিচারের কাছে গান শেখাবে?' অষ্টাদশ শতাব্দী নয়; তবু জ্যোতির অনড় অবস্থানে বরের পিতৃতান্ত্রিক অহং ধাক্কা খেলে জ্যোতির থেকে মুখ ফিরিয়েছে। জ্যোতি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসে গুরুর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তানকে বিয়ে করে আপন মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে স্বপ্নের বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে। এই গল্পেই জ্যোতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যময় চারিত্রিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে নারীসুলভ স্বাভাবিকতায় সংসার রক্ষার্থে ত্রুটিহীন চেষ্টাও দেখি। নাচের জগতে ফিরে যেতে স্বামীর কাছে কাকুতি-মিনতি বা স্বামী-সংসার-সন্তান সমস্ত কিছুকে ছন্দে বেঁধে রাখার, গৃহকে শান্তির আশ্রয়ে বন্ধনীকৃত করার শপথ, তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বরের পুরুষতান্ত্রিক অহমিকা স্ত্রীর মন ও স্বপ্নকে অস্বীকার করলে সে নিজ পছন্দ-অপছন্দ, স্বপ্নের অস্বীকৃতির উপলব্ধিতে সাংসারিক সমস্ত অর্গল স্খলন করেছে। অসম্মানিত দাম্পত্যের বেদনায় নারীসুলভ নীরব অশ্রুমোচন বা স্বপ্নের সঙ্গে আপোষ নয়; আপন স্বপ্নের স্বীকৃতি প্রয়াসেই 'জ্যোতি' প্রজ্বলিত হয়েছে।

নারীত্বের অবমাননা ও প্রতিবাদে উচ্চকিত দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় পাই 'ছেঁড়া ছেঁড়া পাতা' গল্পেও।

> "বিয়ের জন্যে দরকার পুরুষ ও নারী দুজনকে; তবে বিয়েতে তাদের ভূমিকা সমান নয়; পুরুষ বিয়ে করে, নারী বিয়ে বসে, নারীকে বিয়ে দেয়া হয়, নারীর বিয়ে হয়...। প্রতিটি পিতৃতন্ত্র বিয়ের যে-বিধান করেছে, তা সম্পূর্ণ পুরুষের স্বার্থে প্রস্তুত। নারীর স্বার্থ তাতে দেখা হয়নি; নারীকে ব্যক্তি হিশেবেই গণ্য করা হয়নি।"[৪]

এই অনিবার্যতাতেই চোখে পড়ে সমাজ নামক পুরুষ-কারাগারে বিবাহের কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ নারীর ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি ও তাকে নিপীড়নের ছবি। আলোচ্য গল্পেও বিবাহ-উত্তর নারীর দাম্পত্য সমস্যার চিত্রাঙ্কনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই নগ্নতা প্রকট। জৈবিক নিয়মের স্বাভাবিকত্বে মাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত, অথচ বর নিজ দৈহিক লালসা-নিবৃত্তির তাড়নায় কুণ্ঠাহীন নির্মম ভ্রূণহত্যার সঙ্গে নারী-আত্মাকেও হনন করেছে। চেঁছে চেঁছে বের করা হয় 'সন্তানের রক্ত মাংস ডেলা ডেলা'; নারীর তখন একমাত্র কাম্য হয় নিজের মৃত্যু! 'হোক হোক হোক, তার মৃত্যু হোক।' প্রৌঢ় ডাক্তারের কণ্ঠে উচ্চারিত সান্ত্বনাবাণীঃ 'কিছু হয়নি রে মা। এতে কোনও ক্ষতি নেই।' তাও আসলে প্রচ্ছন্ন পুরুষতন্ত্রেরই নির্বিকার উচ্চারণ; যা লাভ-ক্ষতির বাহ্যিক হিসেবে মাতৃত্বের অমোচনীয় অপূরণীয় ক্ষতি পরিমাপে অক্ষম। সেই পরিমাপে পীড়িতার 'ক্ষতি' ও ক্ষতের গভীরতা নগণ্য। থানার বড়বাবুর কাছেও অভিযোগ গুরুত্ব পায় পীড়িতার পিতার পেশাগত পরিচয়, তার নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আত্ম প্রতিপালনের সামর্থ্য-অসামর্থ্যের তৌলে! অতএব পুং-তন্ত্রের মাণদণ্ডে ডাক্তারেরই সুরে বড়বাবুরও পরামর্শ 'কিছু হয় না। ওতে কিছু হয় না। মারধর করে না যখন মানিয়ে নিন।' মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শে রয়েছে পুরুষতন্ত্রেরই সুচতুর কূটকৌশল, পুরুষতন্ত্রেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য! এই প্রোথিত নারী-আদর্শের ধারণায় নারী সেখানে সহনশীলতাকে মহৎ অনুভব করে! তবে পরাজয় নয়; প্রতিবাদে সংসার-শৃঙ্খল মোচন করে শেষে নারীত্বের জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে। শ্বশুরগৃহ নামক সমাজস্বীকৃত নিশ্চিত আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে মশলাওয়ালা পিনাকীর হাত ধরেছে; তার সংসারে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নেই, ফাঁক-ফোকর অনেক, কিন্তু সেখানে সে 'অন্য ধনে ধনী'। আগে 'দাসী-বাঁদির মত দিন কাটত'; পিনাকীর সংসারে সে রাজরানি!

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 176 - 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অতঃপর শ্বশুরগৃহের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার-পীড়নের প্রতিবাদে মুখরা হয়েছে- 'কত কষ্ট দিয়েছেন আমাকে। মুখযন্ত্রণা, বাপের অবস্থা তুলে খোঁটা, মুখে রক্ত তুলে খাটিয়েছেন। আপনাদের ঘেন্না করি আমি। বেশ করেছি চলে এসেছি। কীরকম মুখ পুড়িয়ে দিলাম আপনাদের। ...মুখে চুনকালি পড়ল তো। আপনার ছেলেকে দেখিয়ে এখন লোকে বলবে- ওর বউ একটা মশলাওয়ালার সঙ্গে পালিয়েছে।' 'পুরুষের স্বার্থসর্বস্ব' বিয়ে নামক সামাজিকতার যূপকাষ্ঠে শরীর ও মন গলিয়ে নয়; পিনাকীর 'মনের বিয়েই আসল' বিশ্বাসে ভর করে তার হাত ধরার মধ্যে রয়েছে হৃদয়ধর্মের প্রাধান্য, একই সঙ্গে নারীত্বের আরোপিত মাহাত্ম্যের শৃঙ্খল মোচন ও প্রতিবাদ। তাতেই এ গল্পের স্বীকৃতি।

নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, বংশ রক্ষার আধান; তবে বংশ রক্ষার গৌরবে অন্বিত হওয়ার শর্ত বিবিধ - 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'- পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া যে শর্তগুলোর অন্যতম। যুগ যুগ লালিত এই কামনায় রয়েছে পুরুষকে গরিষ্ঠতা দানের প্রচ্ছন্ন মানসিকতা; নারীত্বের প্রতি অবমাননা ও তার মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থাহীনতা। মজ্জাগত এই পুত্রলাভের বাসনা একবিংশ শতকেও শিক্ষিত অর্থবান অভিজাত সমাজে নগ্নভাবে প্রকট ও প্রবহমান, তারই নিদর্শন দেখতে পাই 'মায়া' গল্পে। বড়লোক ঘরের পুত্রবধূ আসন্নপ্রসবা সোনালি ও সেবাসদনের আয়া মায়া দু'জনই তাদের সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে সন্তানকেন্দ্রিক স্ব স্ব মানসিকতাকে মির্দেশ করেছে। সোনালি তার শাশুড়ির চাহিদা পূরণে 'ছেলে হবে' এই স্বপ্নকে লালিত করে শেষে কন্যাসন্তান প্রসব করায় পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। সন্তানকে স্তন্যদানে অনিচ্ছুক সোনালিও বলেছে- 'আমি চাই না ও বাঁচুক। আমি মেয়ে চাই না।' মাতৃত্বের এই অপমান বধূর মানসিকতায় আসলে প্রোথিত। যার মূলে রয়েছে সমাজ-নির্দিষ্ট কতগুলি সূত্র- সংস্কারের অর্গল। সোনালিকে তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর যে সান্ত্বনা, তাতেও রয়েছে সেই সূত্রেরই প্রচ্ছায়া - 'যোগ প্রক্রিয়ায় আছে জানো?'... 'নির্দিষ্ট লগ্ন ও পদ্ধতি মেনে সঙ্গম করলে ছেলে হয়'। অথচ, স্বামী হারা মাধ্যমিক পাস মায়া তুলনামূলক কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়ে একই সময়ে ভাবে- 'বংশরক্ষা ছেলে মেয়ে দুই মাধ্যমেই হয়। অষ্টম-নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বই পড়লেই তা জানা যায়। সোনালি কলেজে পড়া মেয়ে। দীপক ইঞ্জিনিয়ার। তারাও জানে। মায়ার চেয়ে বেশি জানে। কিন্তু মানে না। বিজ্ঞানের চেয়ে সংস্কার মানা অনেক সহজ।' মায়ার চোখে তাই সোনালির শ্বশুরবাড়ির প্রাসাদোপম বাড়ি 'পুরনো'- রক্ষণশীল। বড় বাড়ি, কিন্তু কার্নিশে বট-অশ্বত্থ শেকড় চারিয়েছে। 'মূল্যবান আসবাবে ভরা ঘর। পরিচ্ছন্ন। সাজানো।' অথচ নাকে এসে ঠেকে 'প্রাচীনত্বের গন্ধ'। প্রাচীনত্ব আসলে গোঁড়ামি। 'পরিচ্ছন্ন', 'সাজানো'- আধুনিকতার অন্তরালে সমাজের আদিমতা। গল্পকার যদিও নিরাশ নন। এই আদিমতার বিপরীতে দুই কন্যাসন্তানকে 'মানুষ' করার প্রচেষ্টায় আত্মবিশ্বাসী মায়ার লড়াইয়ে সেই আশাবাদ ধ্বনিত। বড় বাড়ি থেকে বেরিয়েই তার মনে পড়ে যায় - 'বড় মেয়েটা ঝোলা দুল পরতে ভালোবাসে। কিনবে একজোড়া...। ছোট মেয়ের জন্য নেলপালিশ আর দুটি খাতা। সকালেই বলেছিল, খাতা লাগবে।' সংস্কারের অর্গলমুক্তি ও শিক্ষার সোপান হয়ে ওঠে নারীচেতনার সমার্থক।

নারীর সার্বিক উন্নতিকল্পে বেগম রোকেয়া বলেছেন –

> "কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত - সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। এবং আমরা যে গোলামজাতি নই, এইকথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমক্ষতালাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।"[৫]

সময়ের হিসেবে যুগ পাল্টেছে, একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিক সভ্যতা পদার্পণ করেছে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান্তর ঘটেনি; তা মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতাতেই স্থির। নারী চেতনাবাদ, নবযুগীয় শিক্ষার পাঠ, বিশ্বায়নের আধুনিক হাওয়ার পরশ সত্ত্বেও যুগব্যাপী সংস্কার নারীকে যেন পরিবারে পুরুষের ইচ্ছাধীন পুতুল করেই রেখেছে। নারী জীবনের সার্থকতা নির্দিষ্ট সর্বদা তার মনিবের আজ্ঞাদেশ পালনে। সমাজ কেবল জানে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'; অথচ 'গুণবান পতি যদি থাকে তার সনে' বেমালুম ভুলে যায়। নারী টিকে থাকে তার স্বপ্ন অথবা নিপীড়ন-নির্যাতন-অবহেলা-প্রভুত্বের সঙ্গে সমঝোতা করে। এই প্রেক্ষিতে বেগম রোকেয়ার উপরোক্ত প্রশ্ন ও উত্তরণের প্রায়োগিক রূপ নিবন্ধে আলোচিত গল্পগুলি। স্বনির্ভরতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিবাদে যুগ যুগ লালিত সামাজিকতার শৃঙ্খল মোচনের মধ্য দিয়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 176 - 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে প্রত্যেকটি নারী চরিত্র তাই সেই পুরাতন প্রশ্ন - 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার?'-কেই নতুন করে উস্কে দেয়। তিলোত্তমা বলেছেন –

> "একজন নারীর স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠার পথ অমসৃণ পাথরের। কণ্টকময়। তার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য যেমন, তেমনি সম্পর্কগুলি সংজ্ঞায়িত ও মর্যাদাব্যঞ্জক করে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নারী তার লক্ষ্যে অনেকদূর এগিয়েছে। একজন পেশাদার মহিলার সম্পর্ক শুধু সমাজ-নির্ণীত প্রাচীন সম্পর্কগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার জীবনে পুরুষ সহকর্মী আছে, বন্ধু আছে, পেশাগত যোগাযোগ আছে, সহযাত্রী আছে, দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য যোগাযোগ আছে। সেই সবই একজন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের। এই ক্ষেত্রটি সহজে তৈরি হয় না!"[৬]

গল্পের নারী চরিত্রগুলি স্বোপার্জিত প্রয়াসে সেই ক্ষেত্র নির্মাণের লক্ষ্যে দৃঢ়। সামাজিক স্বাধীনতা বা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সঙ্গে যে যে সামাজিক সম্পর্কে পুরুষের সঙ্গে তারা সূত্রবদ্ধ, সেগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ তাদের লক্ষ্য। ছলনায় নারীর স্বাতন্ত্র্য বা সত্তাকে নেতিবাচকতায় আবরিত করা বা তাকে 'মহীয়সী', 'সর্বং-সহা' ইত্যাদির মিথ্যা-ভূষণে বিশেষায়িত করে তার চেতনাকে অ-তীক্ষ্ণ করায় পুং-তন্ত্র সিদ্ধ। তবে নারীর প্রতিটি পদক্ষেপকে শৃঙ্খলিত করার বা তার প্রতি অ-মর্যাদাব্যঞ্জক দৃষ্টির যে প্রক্ষেপণ বা পুং-তন্ত্র সৃষ্ট যুগবাহিত নারীর যে চর্যা, তাকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা ও নারীকে 'নর' থেকে অ-সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে, 'মানুষ'-সত্তায় তাকে সংজ্ঞায়িত করতেই তিলোত্তমার নারীরা সোচ্চার। নিজেকে শৃঙ্খল-ছিন্ন করার এই পথ অ-সুগম, অ-মসৃণ, কিন্তু 'কণ্টকময়'তাকে উত্তীর্ণ করার লক্ষ্যে তারা সাহসী।

লক্ষণীয়, স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীর অদম্যতা ও অনমনীয়তা- তিলোত্তমার বহু গল্পের প্রধান শর্ত ও সাযুজ্য। ভাষা ও বিষয়ের বৈচিত্র্যও গল্পগুলির বিশেষ সম্পদ। তবে স্বীকার্য, বিভিন্ন গল্পের নারী চরিত্রগুলি কখনও কখনও তাদের পুনঃপুনিক প্রতিবাদী ক্রিয়ায় গল্পকে একই খাতে প্রবাহিত করার অনুভব করায়। গল্পগুলি স্রষ্টার মনন ও সৃষ্টি কৌশলের মাপকাঠিতেই এ প্রসঙ্গে বিচার্য। গল্প, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল গল্পই নয়; চরিত্রের যে ক্রিয়া, তাতে রয়েছে গল্পকারের আ-প্রাণ বিশ্বাস। তাই গল্পের সীমা ছাড়িয়ে অনেকাংশে সেগুলি হয়ে ওঠে 'বক্তব্য'। স্মর্তব্য তিলোত্তমার উক্তিটি–

> "আমার বিশ্বাস, নারী সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। আমি এই জায়গা থেকে সব কিছু শুরু করতে পছন্দ করি বা চাই। তার কারণ হচ্ছে যে, আমি যদি এই বিশ্বাস নিজের মধ্যে না রাখি যে আমি স্বাধীন, তাহলে আমি আমার চারপাশের যে শৃঙ্গখলগুলো রয়েছে যা আমাকে দৈনন্দিনভাবে অতিক্রম করে যেতে হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে অতিক্রম যেতে হচ্ছে সেটা আমি পারব না। আমার আত্মবিশ্বাস প্রতিহত হবে। সবার আগে সেই জন্য প্রয়োজন এইটা বিশ্বাস করা যে আমি একজন স্বাধীন মানুষ।"[৭]

নারী-স্বাধীনতা, সচেতনতা বা আত্মনির্ভরতা বিষয়ক একবিংশ শতকীয় যে আন্দোলন বা আলোড়ন, লেখক তিলোত্তমা আসলে সেগুলিকে যাপন করেন তাঁর লেখার মধ্যে। তাঁর গল্পের নারীরা তাই অবিরাম পৌনঃপুনিকতায় লেখার পাতার তাত্ত্বিক গণ্ডি অতিক্রম করে বাস্তবের পুং-তন্ত্র শাসিত কঠিন জমিতে প্রায়শই যোদ্ধৃবেশে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। নারী মাত্রই পুরুষের ইচ্ছা ও আয়ত্তাধীন; অথবা মহত্ত্বতায় নারীত্বের সার্থকতা— যুগলালিত পুরুষতন্ত্রের এই সুকৌশলী ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করার সাহসী পদক্ষেপে গল্পের নারী চরিত্রগুলি নিবিষ্ট। গল্পের পাতা থেকে উঠে এসে কাকলি-মিনতি, কমলজ্যোতি-আকাশলীনারা নারীকে পুরুষের থেকে স্বতন্ত্র করে একবিংশ শতকের সাহসিকতায় ভর করে হয়ে ওঠে বাস্তবনিষ্ঠ। নারীর অধিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠা কেন্দ্রিক এই কাহিনিগুলি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি হয়ে ওঠে বহু নারীর প্রেরণার রসদ। গল্পের চরিত্রগুলির যে সঞ্চরণ, তা নিহিতার্থে গল্পকারেরই আন্তরিক বিশ্বাস।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 176 - 183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০৬, পৃ. ১০৪
২. আজাদ, হুমায়ুন, নারী; আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৩৩৩
৩. তদেব; পৃ. ২৩৩
৪. তদেব; পৃ. ২৩৪
৫. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, স্ত্রী জাতির অবনতি; মতিচুর, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ২০
৬. আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন; ৭ই মার্চ, ২০১৮, ২০:৪৯
লিংক - https://www.anandabazar.com/amp/society/international-society-s-day-some-realisations-of-writer-tilottama-majumdar-dgtl-1.767187
৭. YouTube Link : https://youtu.be/Mn3c4_fUeTE?si=aFP0hH_pu0xP59xx

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 184 - 189
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 – 0848

দ্রৌপদী : মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে এক প্রতিবাদী নারী

ড. শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা
Email ID: sipradg70@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Society, backward, simple, superstition, expose, rebellious, hypocritical.

Abstract

Mahasweta Devi in her novel presents the true picture of the happiness and sorrows of backward people of the society in front of the reader. In her short stories also, she reveals the stories of those who are completely separated from the mainstream urban population.

They don't demand luxury things or travelling to distant places like so-called civilized people. Their life is very simple, they want simple food to replenish their hunger. Mahasweta Devi wrote many novels and short stories explaining the problems of helpless, destitute and weak people to the common mass who are unaware off. She not only conveys the reader about their problems but also played a pivotal role by solving their problems. Most of the stories written by Mahasweta Devi is based on tribal life who are devoid of their fundamental rights. A selfish class of people has been purposefully depriving the tribals day after day by taking advantage of their weakness on the pretext of various superstitions and myths. Mahasweta Devi's sole aim was to expose the real face of those hypocritical deceivers. It will become clearer to us if we discuss the story of 'Draupadi'.

Discussion

'দ্রৌপদী' (১৯৭৬) নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত মহাশ্বেতা দেবীর একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়ে দ্রৌপদীকে লেখিকা প্রতিবাদী চরিত্র রূপে অঙ্কন করেছেন। 'মহাভারত' এ দ্রৌপদী যেমন রাজসভায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এক অসাধারণ প্রতিবাদী চরিত্ররূপে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। মহাশ্বেতা দেবী তেমনি এক আদিবাসী রমণীকে 'মহাভারত' এর এক অসামান্যা নারী দ্রৌপদীর মতোই অসাধারণ রূপে অঙ্কিত করেছেন। কারণ মহাভারতের দ্রৌপদীও ধর্ষিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম দুঃশাসনের উরু ভঙ্গ করে তার অপকর্মের শাস্তি দেয়। এই 'দ্রৌপদী' গল্পে সেই কৃষ্ণ অনুপস্থিত যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। তাই দ্রৌপদী তার উপর ধর্ষণের প্রতিবাদ সে নিজেই করে। সে নিজেকে নগ্ন করে সমস্ত রকমের বীরত্ব এবং বিক্রমের বর্ম খুলে পরে। দ্রৌপদী চরিত্রটি বহুদিনের জমে থাকা অত্যাচার উৎপীড়নের এক জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। দৌপদীর প্রতিবাদ যেন আমাদের পুরো নারী সমাজের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। যারা এতদিন মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারেনি, অর্থাৎ সেই বহুদিনের উপেক্ষিত মূক প্রতিবাদী কণ্ঠ ভাষা পায় এই দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দ্রৌপদী যার নাম দৌপদী মেঝেন। তার বয়স সাতাশ। তার স্বামীর নাম দুলন মাঝি। তাদের নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়া ঝাড়। মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অনেকটাই ফাঁক রয়েছে তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি নিবন্ধ করতে চেয়েছেন। গল্পটির শুরু আকস্মিক ভাবে। দ্রৌপদীর নাম, তার বয়স, স্বামীর নাম, নিবাস, থানার নাম ইত্যাদি পরিচয় জ্ঞাপক কথাগুলি ছোট ছোট বাক্যে আছে। তার পরই দুই তকমাধারী যুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ। এদের সংলাপে জানা যায় পুলিশের খাতায় অপরাধী হিসাবে তাদের নাম আছে। পুলিশ তাদেরকে ধরার জন্য দিনরাত খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুই তকমাধারীর মতে দ্রৌপদী, -

> "মোষ্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ানটেড ইন মেনি।"[১]

ওদের কথা অসমাপ্ত হলেও আমরা পাঠকেরা বুঝে নেই দ্রৌপদী মেঝেনকে রাষ্ট্রীয় শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গল্পে একটা প্রবল প্রতিবাদী চেতনা আছে যা প্রতিরোধে উদ্যত। গল্পটির কথনেও একটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিবৃতিমূলক বাক্য। তারপরই প্রত্যক্ষ সংলাপ। ড্যাসিয়ের সংলাপ থেকে জানা যায় দুলন ও দ্রৌপদী দাওয়ালী কাজ করত। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় ঘুরে ঘুরে কাজ করত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা স্বামী স্ত্রী মৃতের ভান করে পড়ে থাকে। ওদেরকে পুলিশ মনে করে 'মেইন ক্রিমিনাল'। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন খরার সময়ে 'অপার কাষ্টে'র ইদারা ও টিউবওয়েল দখল। সব কিছুতেই দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন মাঝির ভূমিকা প্রধান ছিল। দুলন ও দ্রৌপদী দীর্ঘদিন নিয়ানডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে। ওরা নিজেদের অসামান্য দক্ষতায় আত্মগোপন করে থাকে। ফলে বিশেষ বাহিনী তাদের অনুসন্ধান করতে ব্যর্থ হয়। যদিও পরে দুলনকে সেনাবাহিনীগুলি করে মারতে সক্ষম হয়। কিন্তু দ্রৌপদীর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আদিবাসী সাঁওতালদের ভূমিকা, তাদের নিজস্ব প্রতিরোধ, অসাম্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত প্রতিরোধের এক নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অকারণ ভীতি প্রতিবাদী সাঁওতালদের দমন করার জন্য যে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তারও বিবরণ পাওয়া যায় এই গল্পে। কৌশলে লেখিকা এই গল্পে প্রশাসনের রক্ষক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলেন। সকল জমানাতেই সসম্মানে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং সুবিধা ভোগ করার জন্য যা যা দরকার সবই তারা করেন। প্রতিবাদী, সংগঠিত ভূমিহীন অন্যের জমিতে মজুর খাটা আদিবাসী সাঁওতালদের দমন করার জন্য যত ধরনের নিপীড়নের দরকার তার আয়োজন করেন। আবার লেখিকার ভাষায়, -

> "ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালেখির বাসনা রাখেন।"[২]

পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এগুলি সবই তাদের লোক দেখানো। এই গল্পে কাহিনী কথনে একটি তির্যক ভঙ্গী আছে। সভ্য শিক্ষিত মানুষের কপটতা, দ্বিচারিতা আর ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। যদিও মহাশ্বেতা দেবী সবসময় সামাজিক কিংবা ধর্মীয় ভন্ডামির মুখোস উন্মোচনে বিশ্বাসী। দুলন মাঝির পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার বর্ণনা থেকে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

> "তল্লাস কালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সেই অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ৩০৩-র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দুহাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে 'মাহো' বলে সফেন রক্ত উদ্গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত দুলন মাঝি।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে অসহায় দরিদ্র এক আদিবাসী সন্তানের নির্মম মৃত্যু। যা পাঠকদের আহত করে না, হতবাক করে দেয়। আইনের রক্ষকরা ভাবে দুলন মাঝির মৃত্যুতে তারা নিষ্কন্টক হল। কিন্তু এ ভাবা বৃথা কারণ কোন নেতার মৃত্যুতে আন্দোলন শেষ হয় না, বরং তা জোরকদমে এগিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে দুলন মাঝি 'মাহো' বলে গর্জন করেছিল। এই শব্দটির মানে জানার জন্য "আদিবাসী বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কোলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয় এবং তারা হফম্যান জেফার গোল্ডেন পামার প্রমুখ মহাশয়দের রচিত অভিধান নিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকেন।"[৪] শুধু সেনানায়ক, পুলিশ প্রশাসন যন্ত্রের রক্ষকরা নয় বুদ্ধি জীবীর নির্মম ঔদাসীন্য অর্থহীন পান্ডিত্যের প্রদর্শনীকেও মহাশ্বেতা দেবী তীব্রভাবে আঘাত করতে চেয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। শেষপর্যন্ত জলবাহক সাঁওতাল চমরুকে ডাকা হয়। সে, "ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বটে। উটি লড়াইয়ের ডাক।"[৫]

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী ওরফে দৌপদি মেঝেন। দৌপদি মেঝেনকে পুলিশ ধরতে চায় কারণ তাকে আটকালে সেই অন্যদের ধরিয়ে দেবে। এই রকম ভাবনা হয়তো এই মতলবের পিছনে কাজ করে। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে এইরকম ঘোষণা দেওয়া হয়। তাই দ্রৌপদী ঠিক করে নেয় সে ধরা দেবে কিন্তু অন্য কেউ যাতে ধরা না পড়ে তার ব্যবস্থা করবে। অশিক্ষিত, দরিদ্র, মজুর দ্রৌপদীরা সংগঠিত হয়েছে। তাদেরকে সংগঠিত করেছে শহর থেকে আগত শিক্ষিত কিছু তরুণ। দ্রৌপদী তাদের মুখ থেকে শুনে শুনে শিখেছে কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। দ্রৌপদীর ভাবনায় ঘটে যাওয়া কতকগুলি ঘটনা ছায়া ফেলে। সে ঠিক করে কিছুতেই তাদের কাছে হার মানবে না, মাথা নত করবে না। কারণ –

> "দ্রৌপদীর রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কাল রক্ত। নির্ভেজাল চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ।"[৬]

দ্রৌপদী হেঁটে চলে। দ্রৌপদীর হাঁটা প্রতীকী হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা দেবীর বর্ণনায়, -

> "প্রৌঢ় সেনানায়ক দ্রৌপদীকে দেখতে পায়। দ্রৌপদী থমকে দাঁড়ায়। সে দেখে পুলিশের চর রোতোনী সাহুকে, দেখে সোমাই ও বুধনা কে অরিজিতের গলা যেন সে শুনতে পায়, যখন জিতেছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।"[৭]

দ্রৌপদী ধরা পড়ার আগে ঝাড়খানী জঙ্গলের মানুষগুলিকে সচেতন করে দিতে চায় সর্ব শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিয়ে। কারণ তাদের কাছে কুলকুলি হল মানুষকে জাগ্রত করার এক প্রধান অস্ত্র। তাই সে তিনবার কুলকুলি দিয়েছিল। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানি জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠে। সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেনডেড হয়। দ্রৌপদীকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং "ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীড ফুল।"[৮] এই নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে যান। এর পরের কাহিনী কথনে আমরা এমন এক বর্ণনা পাঠ করি যা শুধু মাত্র আমাদেরকে লজ্জাই দেয় না, পুরো মানব সভ্যতাকে ব্যঙ্গ তথা কালিমা লিপ্ত করে। সারা রাত ধরে অত্যাচার করার পর যখন সেনানায়ক দ্রৌপদীকে নিয়ে আসার আদেশ দেন তখন ঘটনাটা ক্লাইমেক্সে পৌঁছে যায়। সেনানায়ক দ্রৌপদীকে কাপড় পরার জন্য বললে সে কাপড় পরে না। উভয় উরু ও যোনীদেশে চাপ চাপ রক্ত নিয়ে সে সোজা ঘট ঘট করে সেনানায়কের দিকে এগিয়ে যায়। বলে, -

> "কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?"[৯]

তারপর চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী সেনানায়কের সাদা শার্টটি বেছে নিয়ে সেখানে থুথু ফেলতে ফেলতে বলে, -

> "হেতা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবে? লেঃ কাঁউটার কর, লে কাউটার কর?"[১০]

সেনানায়ক তখন সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, -

> "দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্রৌপদী-র এই প্রতিবাদী চরিত্র আমাদেরকে হতবাক্ ও চমকিত করে দেয়। তাই দেখা যায় যে, দ্রৌপদীকে নগ্ন ও ধর্ষণ করার ভেতর কিছু ব্যক্তি মানুষের শরীরী পাগলা ক্ষুধা-ই চরিতার্থ হয় না সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার নগ্ন চরিত্র ধরা পড়ে যায়। দ্রৌপদীর মতো আমাদের সমাজে অনেক মানুষ রয়েছে যারা প্রশাসক, জমিদার, মহাজনদের কামনা বাসনার স্বীকার। সভ্য সমাজে আইনের রক্ষকদের এমন অসভ্য আচরণ যা স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত ঘটে যায়। মহাশ্বেতা দেবী 'অগ্নিগর্ভ' গ্রন্থের ভূমিকাতে যা বলেছেন তা এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য, -

> "১৯৬৭-র মে জুনে নকশাল বাড়ি অঞ্চলে সংগঠিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনা, বিষয়টি পুনরালোচনার সহায়ক হবে। দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি, খড়ি বাড়িও ফাঁসি দেওয়া অঞ্চলের বেশিরভাগ অধিবাসী হলেন আদিবাসী তথা ভূমিহীন চাষী। তাদের মধ্যে আছে মেদি, লেপচা, ভুটিয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী এবং গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ। স্থানীয় জোতদাররা দীর্ঘকালীন 'অধিকার' ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখেন। এ ব্যবস্থার নিয়মানুসারে জোতদারেরা, নিভুই চাষীকে বীজধান, লাঙল, বলদ, খাদ্য ও সামান্য পয়সা দিয়ে নিজের খেতে কাজে লাগান। ফসলের সিংহ ভাগ ঘরে তোলেন। এর বিরুদ্ধেই চাষীর ক্ষোভও প্রতিবাদ।"[১২]

তাই দেখা যায় যে, ১৯৭৬ থেকেই নকশালবাড়ী অঞ্চল জ্বলতে শুরু করে। দ্রৌপদীর মতো হাজার হাজার নর নারী অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। শুরু হয় পুলিশের গুলির সঙ্গে আদিবাসীদের তীরের লড়াই। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যে, দ্রৌপদীদের আন্দোলন বার্থ হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। সেই আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছে আরও বৃহত্তর আন্দোলন। এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শেষ হয় 'দ্রৌপদী' গল্প। যাতে দ্রৌপদীদের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। সত্তরের জ্বলন্ত দিনগুলোর কথা 'দ্রৌপদী' গল্পে পাই। তবে এমন ঘটনা সে সময়ের অনেকের গল্পেই পাওয়া যায়। কিন্তু 'দ্রৌপদী'র মতো খুব কম গল্পই সাধারণের পর্যায় ছাড়িয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এখানেই মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের নানা স্তর সমকালের মধ্যে ব্যতিক্রমী হয়ে অন্য কালকে ধরে রাখে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যে বার বার নারীকে তুলে এনেছেন। যে নারী শুধুমাত্র তার মায়ের কোমল সত্তা নিয়ে অবস্থান করে না। যে নারীর কথা আসলে মানুষের অন্তরের কথা, মানবিকতার কথা, মনুষ্যত্ব বোধের অবক্ষয়ের কথা। তাই আমরা অকপটে স্বীকার করতেই পারি যে, মহাশ্বেতা দেবী জীবনের অনেক চরাই উৎরাই ভঙ্গুর পথ অতিক্রম করে যেখানে এসে তার ধারালো লেখনীকে সমাপ্ত করেছেন তা একদিনের পথ নয় অনেক বছরের সাধনা তথা তপস্যার ফসল। তার বলিষ্ঠ লেখনীর ভাষা অমসৃন বাক্যবন্ধ। সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনেও যেন নারী লেখিকার সীমিত গন্ডী ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর পূর্বসুরী লেখিকাদের জাতি কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন অনেক দূরে সেই খোলা আকাশের নীচে খেটে খাওয়া মানুষদের বিশেষভাবে অসহায়, অবলা নারীদের হৃদয় মন্দিরে। এমন কি বলা যায় মৈত্রেয়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, আশালতা সিংহ, সুলেখা সান্নাল এবং প্রতিভা বসুর মত বিখ্যাত লেখিকাদের নির্দিষ্ট সমাজ গন্ডী পার হয়ে নারী অবজ্ঞা তথা শোষণের আর এক কদর্য তথা কুৎসিত চেহারাকে সবার সামনে অকপটে তুলে ধরেছেন।

অতি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে জানার গভীর উপলব্ধি বা আগ্রহ থেকেই মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। সেই মানুষগুলি কে বা কারা? সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ, যারা তথাকথিত সভ্য মানুষের ভালাবাসা থেকে বঞ্চিত দরিদ্র কৃষক, কৃষি শ্রমিক, দাস মজুর, মহাজনের বাড়ীতে চিরদিনের জন্য বেগার খাটা শ্রমিক, ঠেলা চালক ইত্যাদি ছিল তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। চলতে চলতে নদীর মতোই লেখায় বাঁক নেয়। এই বাঁক থেকেই তিনি প্রবেশ করেন শোষিত, তথা ধর্ষিত নারীর আন্দরমহলে যে নারী শুধু বেঁচে থাকতেই চায় না। সে চায় নারী হয়ে জন্মানোর প্রকৃত যোগ্যতা বা মর্যাদা পাবার অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার। এর জন্যই তাঁর লেখনী গর্জে ওঠে, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। ফলে 'ধৌলী', 'দ্রৌপদী', 'শিকার' ইত্যাদি গল্পগুলি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা দেয়। যেখানে নারী এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পর্যবসিত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীদের অন্তরের গহনে প্রবেশ করে তিনি তাদের মনের কথা সুকৌশলে বের করে আনেন তখন তিনি অনুভব করেন তারা শুধু তাদের অধিকার থেকেই বঞ্চিত নয়, তারা সমাজের হায়েনাদের পাশবিক লোভ লালসার শিকার হয়ে সমাজে বেঁচে থাকে অথবা অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাই মহাশ্বেতা দেবী নারীদের তিলে তিলে অবলা থেকে সবলা করার ব্রত নিয়ে লেখনী ধারণ করেন। এরপরই আমরা দ্রৌপদী-র মতো প্রতিবাদী চরিত্র পাই। দ্রৌপদী-র প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিরুপমার মতো নীরব প্রতিবাদ নয়, সরব প্রতিবাদ। আজও সমাজে অনেক দ্রৌপদী ধর্ষিত হয়। মানুষরূপী মুখোশ ধারী হায়েনাদের জঘন্য অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্য বিচার পায় না। বিচারের বাণী নীরবে ক্রন্দন করতে থাকে। মহাশ্বেতা দেবী তার গল্প তথা উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন লোক লজ্জার ভয়কে উপেক্ষা করে, এমন কি অত্যাচারীর রক্ত চক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নারী সমাজ মাঠে নেমে বেরিয়ে গেলে একদিন না একদিন তারা সফল হবেই। প্রকৃতপক্ষে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং মানসিকতা-র বদল ঘটাতে হবে। তবেই সমাজ থেকে হায়েনার দল নির্মূল হবে।

মহাশ্বেতা দেবী রচিত বিশেষ করে আদিবাসী জীবন ভিত্তিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, লেখিকা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের জীবন ও সমস্যার ছবি তুলে ধরেছেন। আদিবাসীদের প্রতি সুদীর্ঘকাল ধরে জোতদার, মহাজন, আমাদের সমাজের রক্ষক তথা পুলিশ প্রশাসনের নানা ধরনের অত্যাচার শোষণ ও পীড়নের যথার্থ পরিচয় দান করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা অর্থাৎ তথাকথিত দিকু লোকেরা কিভাবে দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে সহজ সরল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে এসেছি। তারা যে কি দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে সমতলের তথাকথিত সভ্য মানুষরা তার কতটুকুই যা খোঁজ রাখে। শুধু শহরের সভ্যতা, শহরের মানুষকে দেখলে চলবে না। গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-টিলায় বসবাসকারী মানুষদের খবর রাখতে হবে। তাদেরকে সচেতন করতে হবে।

লেখিকার লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ক্ষুরধার রচনাভঙ্গী। ঘটে যাওয়া নির্যাতিত জীবনের কাহিনীর মাধ্যমে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে ও মমতায় চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় এক কাব্যময়ী আবেষ্টনী। হতদরিদ্র মানুষের কোনরকমে শুধু জীবস্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার লড়াইকে মহাশ্বেতা দেবী দেখান নি। তিনি দেখান গল্পের পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই এই বিশাল বিশ্বে মানমর্যাদা নিয়ে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার, মানব সমাজে স্ব-স্ব পরিচয় খুঁজে নেবার লড়াই করে থাকে। মহাশ্বেতা দেবীর একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করতে পারি, -

> “স্বাধীনতার পরেও আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ বেঠবেগারী কোনটা থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি পেতে দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।”[১৩]

তাই মহাশ্বেতা দেবী পাঠকের বিনোদনের জন্য বা আকৃষ্ঠ করার জন্য হয়তো বা রোমান্টিক কাহিনী উপহার দেবার জন্য সাহিত্য রচনা করেন নি। তাঁর গল্পের কাহিনী বিন্দুমাত্র পাঠকদের বিনোদনে সাহায্য করে না। কোনো রাজকন্যা বা রাজপুত্রের স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায় না। কিন্তু পাঠকদের জটিল কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও এই সব ঘটনা ঘটেই চলছে। আর তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই সভ্যতা, এই সমাজ, এত উন্নতি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে, সামনের দিকে না পিছনে? তা এখন আমাদের যেন স্বাধীনতার প্রায় আটাত্তর বছর পরেও ভাবতে হচ্ছে। একজন বিখ্যাত সমালোচক মহাশ্বেতা দেবীর রচনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, -

> “মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে তথাকথিত বঞ্চিত, শোষিত, মানুষজনের প্রসঙ্গ যেমন ঘুরে ফিরে আসে, তেমনই তীক্ষ্ণ শ্লেষে, বিদ্রুপের মোচড়ে উন্মোচিত হয় মানুষের ভিতরের চেহারা। এ যেন নিরন্তর ঘা দিয়ে চলা কোনো এক মুক, দায়বোধহীন, অবিবেকী সমাজ সত্তাকে। প্রতিকার? হয়তো আশা করেন, হয়তো আশাহত হন। তবু এ দায়কে মেনে নিয়েই তাঁর গল্প লেখা, যা গল্প ভালো লাগা পাঠকদের ভ্রূকুঞ্চনেরও হয়তো বা কারণ ঘটায়।”[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 184 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সবশেষে বলব, মহাশ্বেতা দেবী পাঠককে বিনোদনের তৃপ্তি দিতে ব্যর্থ হন কারণ তাঁর গল্পে রয়েছে শুধুই সাড়া জাগানো প্রতিবাদী ভাষা, প্রতিবাদী রং। মানুষেরা জলের অভাবে তৃষ্ণার্ত থাকে, জমির অভাবে খাদ্য পায় না, শস্য ফলাতে পারে না। উচ্চবর্ণের জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারে মেয়েরা রেন্ডী হতে বাধ্য হয়। আর এই মূঢ় ম্লান মুখে প্রতিবাদী ভাষা ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই শুধু মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে 'দ্রৌপদী' এক অনন্য সাধারণ প্রতিবাদী চরিত্র।

Reference:

১. দেবী মহাশ্বেতা, দ্রৌপদী, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন চতুর্থ মুদ্রণ- ২০০২, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ২৯
২. তদেব, পৃ. ৩০
৩. তদেব, পৃ. ৩১
৪. তদেব, পৃ. ৩১
৫. তদেব, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৭
৮. তদেব, পৃ. ৩৮
৯. তদেব, পৃ. ৩৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৯
১১. তদেব, পৃ. ৩৯
১২. দেবী, মহাশ্বেতা, অগ্নিগর্ভ (ভূমিকা) করুণা প্রকাশনী কোলকাতা ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২
১৩. তদেব পৃ. ৩
১৪. মুখোপাধ্যায়, সোমা, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন, (ভূমিকা অংশ) মডেল পাবলিশিং হাউস, প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ.১০

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 190 - 199
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ মানব মনস্তত্ত্ব

মো. জসিম উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID: jashim.bangla@du.ac.bd

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
The struggle, Human existential, crisis, Naturalism, Realism, Psychoanalytic theory, Social-reality.

Abstract
Manik Bandyopadhyay is a renowned artist of Bengali short stories. Along with novels, he has also written many short stories. The existential crisis of the lower and middle classes of society, the constant struggle for survival and the complex crises of the mind are depicted to the greatest extent in his stories. The present article discusses the complexity of the human psyche in Manik Bandyopadhyay's short stories.

Discussion

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এক অস্থির সময় পর্বে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের অস্থিরতা, হাহাকার, অস্তিত্বসংকট এবং মানব-মূল্যবোধের বিপন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যসত্তার উন্মেষ ও বিকাশ। ঔপন্যাসিক হিসেবে সর্বাধিক সুখ্যাতি অর্জন করলেও ছোটগল্পকার হিসেবেও তাঁর স্বীকৃতি সর্বব্যাপী। সাহিত্যজগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ মূলত ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই। সমাজের নিপীড়িত-নিগৃহীত সাধারণ মানুষের জীবনাচারণ, তাদের বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রভৃতি বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখা যায় মানিকের ছোটগল্পে।

মাত্র বিশ বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কসূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন ছোটগল্প 'অতসীমামি'। এটি *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে)। অতঃপর তিনি লিখেছেন অবিরাম এবং ২৮ বছরের সাহিত্যিক-জীবনে উপন্যাসের পাশাপাশি লিখেছেন প্রায় ২০০টি ছোটগল্প। এ-গল্পগুলো জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে ১৬টি গল্পগ্রন্থে এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিভিন্ন গল্প-সংকলনে। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পগ্রন্থসমূহ হচ্ছে - *অতসীমামি* (১৯৩৯), *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭), *মিহি ও মোটা কাহিনী* (১৯৩৮), *সরীসৃপ* (১৯৩৯), *বৌ* (১৯৪৩), *সমুদ্রের স্বাদ* (১৯৪৩), *ভেজাল* (১৯৪৪), *হলুদপোড়া* (১৯৪৮), *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬), *পরিস্থিতি* (১৯৪৬), *খতিয়ান* (১৯৪৭), *মাটির মাশুল* (১৯৪৮), *ছোট বড়* (১৯৪৮), *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* (১৯৪৯), *ফেরিওলা* (১৯৪৩) এবং *লাজুকলতা* (১৯৫৪)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমবিবর্তনবাদী প্রতিভা। জীবনের সৃষ্টিশীল সময়পর্বে প্রতিনিয়ত তাঁর সাহিত্যবোধে সাধিত হয়েছে রূপ-রূপান্তর। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া-সাপেক্ষে তাঁর ছোটগল্পসমূহকে দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের সময়সীমা ১৯২৮ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত; অর্থাৎ সাহিত্যপথে যাত্রারম্ভ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান পর্যন্ত সময়কাল। এ-পর্যায়ের গল্পসমূহে মূলত মানব-মনের জটিল গভীর রহস্য ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনাবসান পর্যন্ত। এ পর্যায়ের গল্পে মনোজটিল চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত প্রায় সকল গল্পেই মানব মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে। পাশাপাশি তাঁর অনেক গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা।

'অতসীমামি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প। এই গল্পটি মানিক লিখেছেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে। রোমান্টিক ভাবাবেগে আকীর্ণ এই গল্পে শরৎচন্দ্রের রচনার প্রভাব লক্ষণীয়। দারিদ্র্য এবং আত্মসম্মানবোধ- এই দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে নির্মিত হয়েছে এ-গল্পের ভাবলোক। অতসীমামি এবং তার স্বামী যতীন্দ্রনাথের জীবন চরম দারিদ্রব্যঞ্জক হলেও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনোভাবেই তাঁরা অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্য নিতে রাজি নন। লোকমুখে যতীন্দ্রনাথের বংশীবাদনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে গল্পকথক একদিন নিজেই উপস্থিত হন যতীন্দ্রনাথের বাঁশির সুর শুনতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে গল্পকথক উপলব্ধি করেন -

> "তাঁর বাঁশি বাজানর যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড় আর ভদ্রচেহারা একটা বাড়িতে বাস করেন এও একটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়িটা যে গলিতে সেটার কথা নয় হয় ছেড়েই দিলাম, এ যে ইট-বার করা তিন কালের বুড়োর মত নড়বড়ে একটা ইটের খাঁচা।" (অতসীমামি)

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশ থেকে উপলব্ধি করা যায় অতসীমামিদের আর্থিক দুরবস্থার স্বরূপ। এই দারিদ্রজীর্ণ পরিবেশে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গল্পকথকের মনে হল - 'ছাইগাদা নাড়তেই যেন একটি টকটকে আগুন বার হয়ে পড়ল।' চরম দুঃখ-দৈন্যময় জীবনযাপন সত্ত্বেও মন-প্রাণ এবং সমগ্র সত্তা দিয়ে বাঁশি বাজান যতীন্দ্রনাথ এবং বাঁশি বাজাতে বাজাতে তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় রক্ত। তবুও তিনি হাল ছাড়েন না; পরাস্ত হন না। তাঁর এই যন্ত্রণাকাতর সংগ্রামশীল জীবনযাত্রা সমকালীন মধ্যবিত্ত মানসের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমালোচকের মতে -

> "তিরিশদশকের রক্ত মুখে ওঠা কঠোর জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে যতীনমামার যন্ত্রণাকাতর জীবনের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে আর প্রতি পদে পদে মার খাওয়া জীবনচেতনার সঙ্গে পরাজিত নায়কের মর্মযন্ত্রণার অপূর্ব মিল আছে। সেজন্য তিরিশ দশকের মর্মান্তিক এই গল্প মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনবেদ হয়ে উঠেছিল।"[১]

রোগকাতর অতসীমামীর চিকিৎসার প্রয়োজনে যতীনমামা তাঁর প্রাণপ্রিয় বাঁশি এবং মাথা-গোঁজার ঠাঁই বাড়িটি বিক্রি করে দিলেও কারো কাছে হাত পাতেননি অর্থের জন্য; বিসর্জন দেননি ব্যক্তিত্ববোধকে। মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আমাদের সমাজে দুর্লভ নয়। যতীনমামার কাছ থেকে গল্পকথক বাঁশিটি কিনে নিলে অতসীমামি যেন প্রাণ ফিরে পান। কারণ বাঁশি বাজালে যতীনের আর বেশি দিন বাঁচার আশা নেই। তাই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ যতীনমামা শেষ তিন বছর আর বাঁশি বাজাননি, কিন্তু তাঁর প্রাণপ্রিয় বাঁশিটির জন্য প্রতিনিয়ত ভুগেছেন অন্তর্দাহে; মানসিক যন্ত্রণায়।

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের প্রাকপর্যায়ে মানিক লিখেছেন 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি। গল্পটি মূলত সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের নিরন্তর বেঁচে থাকার সংগ্রামের বাস্তব চিত্র। প্রথম গল্পসংকলন *অতসীমামির* অন্যান্য গল্প থেকে একেবারে আলাদা জাতের এক আশ্চর্য সার্থক গল্প এটি।[২] এ-গল্পে লেখক দেখিয়েছেন দুর্বিষহ অভাব-অনটন, গ্লানিজর্জর জীবনের মধ্যেও কিছু মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম; যাদের নেই আত্মহত্যা করার অধিকারও। তাইতো অসুস্থ-অসহায় নীলমণি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে প্রবল বর্ষণস্নাত রাতে ভগ্ন শতচ্ছিদ্রযুক্ত ঘরে কোনোমতে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং উপলব্ধি করে 'বেঁচে থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন'। নীলমণি তার পারিবারিক এই সংকটকে একান্তই তার ব্যর্থতা বলে মনে করে এবং কারও ওপর প্রতিশোধ নিতে না পেরে অসহায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে। অবশেষে নিজের ভগ্নপ্রায় জীর্ণ কুটিরে ঝড়ের তাণ্ডবে টিকতে না পেরে নীলমণি তার পরিবার নিয়ে কোনোমতে আশ্রয় নেয় সরকার বাড়ির কাছারিতে। কিন্তু বেঁচে থাকার এ-নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যেও তার মনোলোকে অবিরাম প্রতিধ্বনিত হয় -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্ত কাল? কাল কি করিবে? পরশু? তার পরদিন? তারও পরের দিন?" (আত্মহত্যার অধিকার)

নীলমণির মনের এই অভিব্যক্তি আসলে সমাজের বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিরন্তর ছুটে চলা সকল মানুষের। তাদের এই অস্তিত্ব-সংকট এবং সংকট থেকে উত্তরণের উপায় গল্পকারেরও জানা নেই। বেঁচে থাকার এ-সংগ্রাম অনিঃশেষ। এ সংগ্রাম যুগ-যুগান্তরের।

'প্রাগৈতিহাসিক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ভিখু। তার জীবন-জীবিকার উৎস দস্যুবৃত্তি। প্রাগৈতিহাসিক দুই প্রবৃত্তি 'উদরতাড়না' ও 'যৌনাবেগ' কীভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা চালিত করে তা এ-গল্পে প্রদর্শিত হয়েছে ভিখু চরিত্রের মাধ্যমে। একদা দলবল নিয়ে দস্যুবৃত্তি করতে গিয়ে বর্শার আঘাতে একটি হাত চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায় তার। তবু তার উদ্দাম প্রাণশক্তিতে একটুও ভাটা পড়ে না। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিলেও তার বিপুল জীবনোদ্যমে কোনো ঘাটতি দেখা যায় না -

> "সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরূদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না।...নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে। রাতে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।" (প্রাগৈতিহাসিক)

উদরের জ্বালা নিবৃত্ত হলেও এক পর্যায়ে ভিখুর যৌনক্ষুধা প্রবল হয়ে উঠে। তাই ভিখারিনী পাঁচীকে বিয়ে প্রস্তাব দেয় সে। কিন্তু পাঁচীর সঙ্গী বসির এতে অন্তরায় হিসেবে দেখা দিলে বসিরকে নৃশংস উপায়ে হত্যা করে গভীর রাত্রে পাঁচীকে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায় সে। গল্পশেষে ভিখুর এই প্রবৃত্তি-পরিণামকে অসাধারণ বাস্তবতামণ্ডিত করে প্রদর্শন করেছেন গল্পকার -

> "...যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।" (প্রাগৈতিহাসিক)

মূলত প্রাগৈতিহাসিক এই প্রবৃত্তিকে প্রত্যেকটি মানুষ তার অবচেতন চেতনাস্তরে লালন করে। এই প্রবৃত্তি সৃষ্টির ঊষালোক থেকেই মানব দেহের অভ্যন্তরস্তরে সংগুপ্ত। সিগমুন্ড ফ্রয়েড যেটিকে চিহ্নিত করেছেন 'লিবিডো' নামে। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড তথা জীবনীশক্তির মূল যে লিবিডো তথা যৌনাকাঙ্ক্ষা তাই যেন ভিখু চরিত্রের মাধ্যমে অসাধারণ শিল্পকৌশলে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে রূপায়িত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'টিকটিকি' মনোবিশ্লেষণধর্মী গল্প। এ-গল্পে মানিক নির্মম আঘাত হেনেছেন সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এই আধুনিক সভ্যযুগেও যে অনেকের সংস্কারমুক্তি ঘটেনি তা প্রদর্শিত হয়েছে এই গল্পে। জ্যোতিষী জ্যোতিষার্ণব - 'অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে', ঘটনাচক্রে তার মনে দৃঢ়মূল ভিত্তি পায় টিকটিকি-সংস্কার। সকালে স্ত্রীর মুখে মৃত্যুপ্রসঙ্গ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকির সম্মতিসূচক ডাক এবং বিকেলে স্ত্রীর মৃত্যু - এ কাকতালীয় বিষয়টিই জ্যোতিষার্ণবের মনে জন্ম দেয় প্রবল সংস্কারের। প্রকৃতপক্ষে সংস্কার যে একজন মানুষের সত্যদৃষ্টি লুপ্ত করে দেয় এবং তাকে বাস্তবতাবিমুখ করে তোলে তা লেখক প্রদর্শন করেছেন এভাবে -

> "অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কী। তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকির লেজ নড়তে আরম্ভ

> করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আর-একটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না।" (টিকটিকি)

টিকটিকি সম্পর্কিত কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, মানুষের অন্ধ বিশ্বাসমাত্র এবং এর পেছনে যে সুযোগসন্ধানীর অপউদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে - তা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ-গল্পে রূপায়িত করেছেন গল্পকার। সমাজ প্রচলিত এ-কুসংস্কার মানুষের মনকে কীভাবে বিকল করে দেয় তা ফুঠে উঠেছে মনোবিশ্লেষণধর্মী এ-গল্পের মাধ্যমে।

'শৈলজ শিলা' গল্পেরও কেন্দ্রীয় সমস্যা 'লিবিডো' কেন্দ্রিক। সিগমুন্ড ফ্রয়েড সর্বযৌনবাদমূলক যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা মানিকের অনেক রচনায় ব্যবহৃত হলেও এই গল্পে এ-তত্ত্বের ব্যবহার হয়েছে সার্থকভাবে। নিজের বাল্যবিধবা কন্যার গর্ভে ভ্রুণস্থাপনের ফলে জন্ম হয় শিলার। জন্মের পর থেকে শিলাকে যে আদর-যত্নে প্রতিপালন করেছে, সে-ই তার প্রতি যৌনানুভবে জেগে ওঠে। পঞ্চদশবর্ষীয়া শিলার রূপসৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তারই প্রতিপালক, যিনি এ-গল্পের কথক। এ প্রসঙ্গে তার আত্মভাষ্য লক্ষ করা যাক -

> "মেয়েটা যে এত সুন্দরী এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কি মনে হয়। পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াই, ওর ওই টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব গঠনতনু আমাকে সেইখানে আটকে রাখে।" (শৈলজ শিলা)

কিন্তু আশ্রয়দাতা প্রৌঢ়ের এই লিবিডোতাড়িত কামনা থেকে সযত্নে নিজেকে আগলে রাখে শিলা। আশ্রয়দাতার মনে হয় 'শৈলে যার জন্ম, শিলা যার নাম সে শিলার মত শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া উঠে।' স্পষ্টতই এ-ভাবনা ব্যক্তির অবচেতন স্তর-আশ্রিত 'ইদম' প্রবৃত্তিজাত; একান্তই প্রাগৈতিহাসিক। গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর অভিমত এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় -

> " 'শৈলজ শিলা' গল্পে পালক পিতা নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে যৌবনপ্রাপ্তা পালিতা কন্যার প্রতি যে উন্মত্ত কামনায় বিকৃত-বুদ্ধি হয়েছেন, তার মধ্যেও বিকৃত যৌন মনস্তত্ত্বের প্রতি লেখকের ঐকান্তিক প্রবণতাই সূচিত হবে।"[৩]

'সিড়িঁ' মনোবিশ্লেষণধর্মী প্রতীকাশ্রয়ী গল্প। গল্প-বর্ণিত তিনতলা বাড়ি, চৌষট্টি সিঁড়ি এবং বাড়ির মালিক মানব ও ইতির সম্পর্কের বিশ্লেষণ এই গল্পের মৌল ভিত্তি। বাড়িটিতে যে সব ভাড়াটিয়ার বসবাস তারা সকলেই নিম্নবিত্তভুক্ত এবং প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত। তাদের জীবন মানবেতর, হতশ্রীদশাগ্রস্ত, অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর। একটি দৃষ্টান্ত -

> "ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভাল না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটি মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে আর উচ্ছিষ্ট ভাল না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।" (সিঁড়ি)

এই ছেলেটিরই বোন ইতি। শারীরিক ভাবে পঙ্গু হলেও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সে প্রেমের অভিনয় করে বাড়ির মালিক অসমবয়সী মানবের সঙ্গে। প্রেমের বিনিময়ে মানবের কাছ থেকে কয়েক মাসের বকেয়া ভাড়া কাটিয়ে ঋণের অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ফন্দি আঁটে ইতি। ইতি রূপসৌন্দর্যহীন পঙ্গু; অস্তিত্বরক্ষার অনিবার্য তাগিদে সে বিকৃতরুচি বাড়িওয়ালার ফাঁদে পা দিয়েছে - এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, জীবনযুদ্ধে সে ছিল নিরুপায়। তাই ইতি তিনতলা বাড়ির চৌষট্টিটি সিঁড়ি পেরিয়ে ছাদের চিলেকোঠায় মানবের ঘরে দিনের প্রথম প্রহর কাটাতে অস্বস্তি বোধ করে না। চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দুজনের চেহারাতেই দেখা যায় পরিতৃপ্তির ছাপ। কিন্তু প্রণয়ের নামে ইতির এই ছলনা তার মা কিংবা প্রতিবেশীর দৃষ্টি এড়ায় না। তার প্রতিবেশি সুধা তাই ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে -

> "তুই মর ইতি, মর তুই, গোল্লায় যা। পা না তোর খোঁড়া? পায়ে তুই না সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না? সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না তো, যমের বাড়ি যাস না কেন তুই?" (সিঁড়ি)

আর্থিক অসামর্থের কারণেই মূলত ইতিকে প্রণয়ের অভিনয় করতে হয় বাড়িওয়ালা মানবের সঙ্গে। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে মানব। মানব ও ইতি দুজনেই তাদের অপউদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে করতে নীতি-নৈতিকতার সর্বনিম্ন সিঁড়িতে অবনমিত হয়। প্রতীকীভাবে এ-বক্তব্যই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে এই গল্পে। জনৈক সমালোচকের মতে -

> "ইঙ্গিতগর্ভ সংকেতময় ভাষায় প্রতীকীব্যঞ্জনার দীপ্ত সৃষ্টি, লেখকের স্নায়ু-টানটান নিরাসক্তি, স্বল্প পরিসরের কাহিনীবৃন্তে জীবনবোধের উজ্জ্বল প্রস্ফুটন প্রভৃতির মাধ্যমে মানিকের যেসব গল্প শিল্পসাফল্যের চূড়াস্পর্শ করেছে, 'সিঁড়ি' তার মধ্যে অন্যতম।"[৪]

মানিক রচিত মনোবিশ্লেষণধর্মী অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'সরীসৃপ'। অর্থলোলুপতা ও স্বার্থপরতা কীভাবে মানুষকে নিয়ে যায় বন-জঙ্গলের সরীসৃপ বা পশুদের কাতারে তার সফল চিত্রায়ণ ঘটেছে এই গল্পে। চারু-বনমালী-পরী এই তিনটি চরিত্রের অসুস্থ ও কদর্য জীবনচিত্র উন্মোচিত হয়েছে এই গল্পে। স্বামীর মৃত্যুর পর চারুর সমস্ত সম্পত্তি চলে যায় বনমালীর নিয়ন্ত্রণে। যে বনমালী এক সময় চারুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, আজ সেই বনমালীর আশ্রয়েই কোনোরকমে টিকে থাকতে হচ্ছে চারু আর তার একমাত্র সন্তান ভুবনকে। এমতাবস্থায় চারুর ছোটবোন অকালবিধবা পরীর আগমনে তাদের জীবনে শুরু হয় নতুন সংকট। পরী তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বনমালীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। ছোটবোনের এই অধোগতি মেনে নিতে না পেরে তাকে হত্যার চক্রান্ত করে চারু; কিন্তু তা বুমেরাং হয়ে যায়। চারুর মৃত্যুর পর বনমালী চারুর সন্তান ভুবনকে আপন করে নেয়। এই ব্যবস্থা মানতে না পেরে পরী ভুবনকে সরিয়ে দেয় দৃশ্যপট থেকে। অতঃপর ভুবন প্রসঙ্গে বনমালীর মনোভঙ্গি এবং গল্পকারের ভাষ্য আমাদের মনে নতুন ভাবনা উদ্রিক্ত করে -

> "...ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।" (সরীসৃপ)

মানুষের স্বার্থপরতা ও পাশবপ্রবৃত্তি উপস্থাপন সূত্রে গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ ও পশুদের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই। বোধকরি সরীসৃপের মতো হীন কুটিল মানুষের সঙ্গ বনের পশুরও কাম্য নয়।[৫] চারু ও পরীর বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণকে অনেক সমালোচক নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের মতে এর কারণ হচ্ছে নিতান্তই যৌনতা; কারো কারো মতে নিরাপত্তাহীনতা ও আর্থিক অনিশ্চয়তা।

> "আমার মনে হয় যৌনতা নয়, আর্থিক নিরাপত্তার অভাববোধ এই গল্পের দুটি প্রধান নারী চরিত্র চারুদর্শনা ও পরীরানীকে বিচিত্র আচরণে উদ্বোধিত ও চালিত করেছে।"[৬]

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যতীন এবং তার স্ত্রী মহাশ্বেতার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্প। বলদর্পী ব্যক্তির অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে বঞ্চিত-নির্যাতিতের মন থেকে যে হাহাকার-আর্তনাদ-অভিশাপ বেরিয়ে আসে, তা-ই একসময় অত্যাচারীর মনোব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তা বংশানুক্রমে উত্তর-পুরুষের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। যতীনের বিশ্বাস- তার বাবা অনেক মানুষের সর্বনাশ ও অত্যাচার নিপীড়ন করে যে অর্থোপার্জন করেছেন, সে অভিশপ্ত-অর্থই তার শরীরে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধির আকারে। নিজের রোগ নিয়ে যতীন সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের এককোণে গুটিয়ে রাখে নিজেকে। সকলের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কেবল মহাশ্বেতাকেই আঁকড়ে ধরে যতীন।[৭] ছোঁয়াচে ও দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়া সত্ত্বেও মহাশ্বেতা যতীনের সকল আবদার পূর্ণ করে নির্বিকারচিত্তে। কিন্তু মহাশ্বেতার এত যত্ন-আত্তি সত্ত্বেও -

> "সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমনা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ...কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।" (কুষ্ঠরোগীর বৌ)

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্যাধি মাত্রই যে শরীরের পাশাপাশি মানব মনেও বাসা বাঁধে তা যতীনের অব্যাহত আচরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুষ্ঠব্যাধি কেবল দেহ নয়, তার মনেও পচন ধরিয়ে দিয়েছে। দিনে দিনে মহাশ্বেতার প্রতি তার সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়তে থাকে, সন্তান হত্যার অভিযোগে সে তাকে অভিযুক্ত করে এবং মহাশ্বেতার পরিষ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বাভাবিক রূপসজ্জার মধ্যেও সে বিকৃতিকে প্রত্যক্ষ করে। যতীনের এই বিকারগ্রস্ত মন আস্তে আস্তে তাকে পাশব প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে। তার সঙ্গে ধর্মীয় স্থানে যেতে রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সে তার ব্যাধিগ্রস্ত হাত ঘষে দেয় মহাশ্বেতার শরীরে, যাতে মহাশ্বেতাও এ-রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে একসময় যতীনকে পুরোপুরিভাবে পরিত্যাগ করে মহাশ্বেতা। এতৎসত্ত্বেও যতীনের রোগমুক্তির জন্যে সে কালীঘাটে পুজো দেয় এবং পাঁচজন কুষ্ঠরোগীকে ধরে এনে প্রতিষ্ঠা করে কুষ্ঠাশ্রম। এই কুষ্ঠরোগীদের সেবা-যত্নের মধ্যেই মহাশ্বেতা খুঁজে ফেরে মানসিক প্রশান্তি। গল্পকারের মতে -

> "সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে। এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ যুক্তির অনায়াসবোধ্য কথা। মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বৌ।" (কুষ্ঠরোগীর বৌ)

প্রকৃতপক্ষে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যতীনের বিকারগ্রস্ততা ও পাশবপ্রবৃত্তিই যতীনের প্রতি মহাশ্বেতার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। তাই সে যতীন নয়, স্বামীর প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ পথের কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে কুষ্ঠাশ্রম। মধ্যবিত্ত জীবনের অপূর্ণ স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার প্রতীকী চিত্র 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্প। এ-গল্প প্রসঙ্গে গল্পকার মানিকের ভাষ্য -

> "ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদের' গল্পগুলি লিখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল।"[৮]

গল্পান্তর্গত স্বপ্নকাতর মেয়েটির সমুদ্র সন্দর্শনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল চোখের জলের নোনতা স্বাদে। ছোটবেলা থেকেই নীলার সখ ছিলে সমুদ্র দেখার। পিতার জীবদ্দশায় তার সেই সাধ পূর্ণ হয়নি; পিতার অবর্তমানে তো নয়ই। পিতা, মাতা কিংবা ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিয়ে হয় এক অর্ধোন্মাদ ব্যক্তির সঙ্গে। এই স্বামীও তার অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করেনি। এমতাবস্থায় সমুদ্রের কথা শুনলেই যেন তার দুচোখ দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রবান। দুঃখ, যন্ত্রণা আর অবিরাম অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে কেটে যেতে থাকে তার জীবন। 'গল্পটির বিষয় অভিনব। বর্ণনারীতি কবিত্বমণ্ডিত, রোমান্টিক বিষণ্নতা এর মুখ্য পাত্রী নীলা চরিত্রের ভিত্তি।...কাল্পনিক হলেও সমুদ্রের সঙ্গে একটা বিশাল মুক্তির ভাবানুষদ গড়ে উঠেছে তার মনে। নিজের অশ্রুর লবণ-সমুদ্রেই সমুদ্রের স্বাদ চরিতার্থ হল। গৃহবদ্ধ নারীজীবনে অনেক সাধই যে এমনি 'রাধাঁর পর খাওয়া আর খাওয়ার পর 'রাঁধা'য় জলাঞ্জলি যায়, তার সাংকেতিক কাহিনীরূপে এর স্বাদ স্বতন্ত্র।'[৯] স্পষ্টত নীলা মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। যাদের সাধ আর সাধ্যের কোন মিল নেই, সারাজীবন কেটে যায় দুঃখ-বঞ্চনায়, তাদের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও মুক্তির স্বপ্ন প্রতিভাত হয়েছে নীলা চরিত্রের মাধ্যমে।

সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস মানুষের মনে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'হলুদ পোড়া'য়। ভৌতিক কুসংস্কার একজন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষকে কীভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করে তার পরিচয় আছে এ-গল্পে। এই গল্পের শুরুটা খুবই নাটকীয়- স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত দুটি অপমৃত্যুর ঘটনায় গ্রামজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। 'একজন মাঝবয়সী যোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে'। নিহত বলাই চক্রবর্তী এবং শুভ্রার মৃত্যুকে ঘিরে গ্রামে নানা জল্পনা-কল্পনা ও রটনার মাঝেই একদিন উঠানে আছড়ে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দাঁতে দাঁত লেগে যায় বলাই চক্রবর্তীর ভাইপো নবীনের স্ত্রী দামিনীর। তখন গ্রামের সকলের বিশ্বাস হয় দামিনীকে ভূতে পেয়েছে। সবাই মিলে যখন ওঝা কুঞ্জ মাঝিকে খরব দেয় ভূত তাড়ানোর জন্য, তখন গ্রামের শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক ধীরেন এতে প্রবল আপত্তি জানায়। কিন্তু ওঝা এসে দামিনীর ভূত তাড়াবার উদ্দেশ্যে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে শক্ত করে বেঁধে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে নাকের সামনে ধরে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অমানুষিক নির্যাতন শুরু করলে সে স্বীকার করে যে, সে শুভ্রা এবং বলাই খুড়ো তাকে খুন করেছে। তার এ স্বীকারোক্তি গ্রামের মানুষের মাঝে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানমনস্ক ধীরেনের বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধও শিথিল হতে তাকে। স্কুলের ছাত্রদের পাঠদানের ক্ষমতাও সে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে থাকে। বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে প্রচলিত কুসংস্কারে সে আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তার বিশ্বাসের জগতে ঠাঁই করে নেয় অলৌকিক ও আধিভৌতিক বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার। এই পর্যায়ে গ্রামে আবারও ওঝা আসে, তবে এবার শুভ্রার জন্য নয়, ধীরেনের জন্য, ভূত তাড়ানোর জন্য -

> "...তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, কে তুই? বল তুই কে?
> ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী, শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।' " (হলুদপোড়া)

যুক্তিবাদী, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মনকেও যে সংস্কারব্যাধি আমূল গ্রাস করে নিতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধীরেন চরিত্র।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'আজ কাল পরশুর গল্প'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) বৃহৎবঙ্গে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি, হাহাকার, যন্ত্রণা ও অসহায়তাকে সম্বল করে এক শ্রেণির মানুষ কীভাবে অর্থবিত্ত অর্জন করেছে সে কাহিনি বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই গল্পে। দুর্ভিক্ষ শুরু হলে অর্থ ও খাদ্যের সন্ধানে গ্রামের উপার্জনশীল পুরুষ গ্রামত্যাগ করলে তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে গ্রামের বিত্তবানগোষ্ঠী। মানসুকিয়া গ্রামের রামপদ দুর্ভিক্ষের সময় অর্থের সন্ধানে গ্রামের বাইরে চলে গেলে তার স্ত্রী মুক্তার প্রতি কুদৃষ্টি পড়ে গ্রামের মোড়ল ঘনশ্যাম দাসের। কিন্তু খাদ্যের প্রলোভন দেখিয়েও মুক্তাকে বশীভূত করতে পারে না ঘনশ্যাম। অযাচিত লোভ-প্রলোভনের মধ্যে সম্ভ্রম রক্ষায় এ পর্যায়ে সমর্থ হলেও সাত মাসের শিশুপুত্রটিকে রক্ষা করতে পারে না মুক্তা। না খেতে পেয়ে মারা যায় তার শিশুপুত্র; সে চলে যায় সদরে। পরবর্তীকালে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে এই দুঃসহ পরিস্থিতির যে বর্ণনা প্রদান করে মুক্তা তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ -

> "খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে এক মুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মদ্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্য। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।" (আজ কাল পরশুর গল্প)

গ্রামে ঘনশ্যাম দাসের কাছ থেকে কোনো রকমে সম্ভ্রম রক্ষায় সমর্থ হলেও সদরে গিয়ে তাকে সেই অনিবার্য পরিণতিকেই বরণ করতে হয়। কেবল মুক্তা নয়, অনেক চাষাভুষার স্ত্রী-কন্যা জীবনরক্ষার তাগিদে এই অন্ধকার বৃত্তে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যারাই জীবনরক্ষার তাগিদে এই পথ বেছে নেয়, তাদের আর ফেরার উপায় থাকে না। সমাজের নানা প্রতিকূলতা সহ্য করে আপন পরিবারে ফিরে যেতে হলে তাদের সহ্য করতে হয় নানা প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। তাই দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পরে মুক্তা যখন গ্রামে ফিরতে চায় তখন বাধা দেয় ঘনশ্যাম দাস। গ্রামে এ-নিয়ে বিচারসভা বসায় ঘনশ্যাম। এ-সভায় সাধারণ মানুষ মুক্তার পক্ষ নিলে প্রতিবাদের মুখে টিকতে পারেনি ঘনশ্যাম। সরোজমোহন মিত্রের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য লক্ষণীয় -

> "মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি কিছু বৌ-ঝিয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে তা বলে সেই বৌ-ঝিরা এঁটো-কাঁটার মত পরিত্যক্ত হতে পারে না। তাদের নিয়ে আবার নতুন করে সংসার গড়ে উঠবে। নতুন আশায় ভাঙ্গা চোরা মানুষগুলো আবার বুখ বাঁধবে। দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে হতবল মানুষ আবার নতুন উদ্যমে জেগে উঠছে এই বলিষ্ঠ সুরই আজ কাল পরশুর বড় কথা।"[১০]

যুদ্ধ ও মন্বন্তর একদিকে যেমন সাধারণ মানুষকে পতিত করে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টে, অন্যদিকে এই মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির বিত্তবান-ব্যবসায়ী গড়ে তোলে সিন্ডিকেট; কালোবাজারি, মজুতদারি, নারী ব্যবসার মাধ্যমে তারা রাতারাতি গড়ে তোলে টাকার পাহাড়। 'আজ কাল পরশুর গল্পে' এই বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মানিক।

মন্বন্তর নিয়ে রচিত আরেকটি গল্প 'দুঃশাসনীয়'। ইতিহাসসূত্রে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের এই মন্বন্তর ছিল পুরোপুরিই মনুষ্যসৃষ্ট ও কৃত্রিম। এ-দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে লাখ লাখ মানুষ মারা গেলেও এ-নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা

ছিল না কালোবাজারিদের। সুযোগ বুঝে তারা চাল, তেল, নুন, কেরোসিন প্রভৃতি মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। বস্ত্রের অভাবে আব্রুরক্ষা কষ্টকর হয়ে ওঠে; লজ্জায় মানুষ দিনের বেলায়ও ঘর থেকে বের হয় না, প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য বের হয় রাতে। দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে নারীলক্ষ্মীরা তিনবেলা কোনোমতে খেয়ে-না-খেয়ে বেঁচে থাকলেও বস্ত্রাভাবে নিজেদের মৃত্যুকামনা করে। গ্রামের আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়া বিশ্বাসই করতে চায় না দেশে বস্ত্র নেই। তাই সে স্বামীকে প্রশ্ন করে -

> "কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ীর মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ী বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সাহেবের মেয়েরা চুমকি বসানো হাল্কা শাড়ীর তলায় মোটা আবরণ পায় কোথায়?" (দুঃশাসনীয়)

রাবেয়া বুঝতে পারে না বস্ত্রের এই সংকট কেবল সমাজের দরিদ্র-পীড়িত মানুষদেরই। বিত্তশালী-জমিদারদের বাড়ির বৌ-ঝিদের এই সংকট নেই। অবশেষে অনশনের জ্বালা সহ্য করে টিকে-থাকা রাবেয়া লজ্জা নিবারণের ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথে বেছে নেয়।

'মাসি-পিসি' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান-প্রসঙ্গ। স্বামীকর্তৃক নির্যাতিত পিতৃমাতৃহীন আহ্লাদী এবং তার দুই বিধবা মাসি-পিসিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে সারা ভারতবর্ষে এ-গল্পে দুর্ভিক্ষের এই চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার নিদারুণ সংগ্রাম ও বাস্তবতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় আহ্লাদীর পিতা আহ্লাদীর মাসি ও পিসিকে রক্ষার চেষ্টা না করলেও তারা নিজেদের চেষ্টাতেই বেঁচে যায় দুর্ভিক্ষ থেকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী পর্যায়ে মহামারীতে আহ্লাদীর বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই মারা যায়। স্বামীর অত্যাচার-নির্যাতন সইতে না পেরে পিতৃ-মাতৃহীন আহ্লাদী তখন এসে আশ্রয় নেয় মাসি-পিসির কাছে। দুই বিধবা মাসি-পিসি তখন মাতৃস্নেহে আশ্রয় দেয় আহ্লাদীকে। বেঁচে থাকার তাগিদে এবং সমাজের সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গ্রাম থেকে সবজি কিনে শহরে নিয়ে বিক্রি করে মাসি-পিসি। আবার আহ্লাদীকে গ্রামে জোতদার, দারোগা এবং সর্বোপরি অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তারা গ্রহণ করে কার্যকর উদ্যোগ। পুরুষশূন্য গৃহে বিভিন্ন সময় গ্রামের জোতদার হানা দিলেও মাসি-পিসির তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও সম্মিলিত প্রতিরোধে তারা পিছু হটে। দুর্ভিক্ষকালীন সংকট থেকে মাসি-পিসি যে প্রকৃতই বেঁচে থাকার প্রেরণা ও মন্ত্রণা গ্রহণ করেছে; এবং প্রতিবাদী সত্তায় উজ্জীবিত হতে শিখেছে তা-ই প্রদর্শিত হয়েছে এ-গল্পে। 'পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়, প্রয়োজনে প্রতিবাদ করতে হবে। গরীব বলে, স্ত্রীলোক বলে তারা দুর্বল নয়। অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে চাই সাহস, বুদ্ধি আর সংহতি। মাসি-পিসি একটি সাহসিকতার গল্প, প্রতিরোধের গল্প, আত্মনির্ভরশীলতার গল্প, জনজাগরণের গল্প।' [১১]

ইতিহাসখ্যাত তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরবর্তী সময়ে কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে কৃষকদের যে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিছু রাজনৈতিক নেতা। 'হারানের নাতজামাই' গল্পে ভুবন মণ্ডল সেই নেতা, যে কৃষকদের পক্ষ নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই পুলিশ ও জোতদাররা তাকে ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

> "কৃষকনেতাকে গ্রেপ্তারের জন্য রাতের অন্ধকারে গ্রামে পুলিশের আগমন, পুলিশি তৎপরতার বিরুদ্ধে কৃষকদের জোটবদ্ধ হওয়া, জনশক্তির কাছে পুলিশের ভীতিবোধ প্রভৃতি চিত্র অতি সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে এ-গল্পে।"[১২]

ময়নার মা এ-গল্পের উল্লেখযোগ্য একটি চরিত্র। তার দৃঢ়তার কারণেই কৃষকনেতা ভুবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য ময়নার মা ভুবন মণ্ডলকে নিজের মেয়ের জামাই বলে পরিচয় দেয়। তার এই বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার কারণেই রক্ষা পায় ভুবন মণ্ডল। তাছাড়া সাধারণ কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধের কারণেও পুলিশ ভুবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়। মানিকের এ-বর্ণনাতেই পাওয়া যায় জোটবদ্ধ মানুষের শক্তিমত্তার পরিচয় -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারানকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি, দলে দলে লোক ছুটে আসে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। ...রাত বেশি হয়নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। ...মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।" (হারানের নাতজামাই)

সাধারণ নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে কোন শক্তিই পারে না তাদেরকে আটকাতে। এই বাস্তবতাই প্রমাণিত হয়েছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পে।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটি রচিত হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'হারানের নাতজামাই' নামক যে-গল্পটি রচিত হয়েছিল, তারই পরবর্তী পর্যায়ে কারখানার শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় এই গল্পটি। কৃষকদের আন্দোলন-সংগ্রাম যখন দুর্বার হয়ে ওঠে, তখনই ছোট বকুলপুরের কারখানার শ্রমিকরা শুরু করে ধর্মঘট। ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে পুলিশ যখন কয়েকজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে চালান দেয়ার উদ্দেশ্য ট্রেনে তুলে, তখন সম্মিলিতভাবে শ্রমিকরা এতে বাধা দিলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। পুরো এলাকা হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। এরকম পরিস্থিতিতে হাওড়া থেকে স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছোট বকুলপুরের উদ্দেশ্য যাত্রা করে দিবাকর। তাদের কথা শুনে সহযাত্রীরা অবাক হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ভালো-মন্দ সংবাদ পেতে হলে ছোট বকুলপুর যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। কিন্তু ট্রেন থেকে নামার পরই তারা সশস্ত্র পুলিশদের তল্লাশির শিকার হয়। পুলিশ তল্লাশি করে দিবাকরের পানে মোড়া কাগজটা দেখে আঁতকে উঠে। এই নাটকীয় ঘটনার বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন এভাবে -

> "কাগজটা ভালে করে মেলে ধরে সে বিস্ফরিত চোখে বড় হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে। - 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি'।
> নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাওয়া গেছে। ইস্তাহার পাওয়া গেছে।'
> ইস্তাহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।" (ছোট বকুলপুরের যাত্রী)

নাটকীয়তায় ভরপুর এ-গল্পের শেষটা কৌতুকময়তায় পরিপূর্ণ। যারা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, সেসব জমিদার-জোতদার-পুলিশও ভীতির ঊর্ধ্বে নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পানের প্যাকেটে ইশতেহার দেখে তাদের চমকে ওঠা দেখে। সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যে শোষকদের মনে কীভাবে ভয়ের কাঁপুনি ধরাতে সক্ষম তার বাস্তব উদাহরণ এ-গল্পটি।

> "বাঁকা চোখে একটি নির্মম অভিজ্ঞতাকে অপূর্ব শিল্পায়নের যে মুন্সীয়ানা মানিক এই গল্পে দেখিয়েছেন তা এক কথায় অপূর্ব। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং নাটকীয়তায় গল্পটি চমৎকার হয়েছে।"[১৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রধান আকর্ষণ তাঁর ভাষাভঙ্গি। সহজ-সরল, ইঙ্গিতধর্মী, প্রতীকী-চিত্রকল্পময় ভাষাযোগে তিনি গল্পকে নিয়ে যান পরিণতির দিকে। অবশ্য তাঁর গল্পে প্রকরণের চেয়ে শেষাবধি বিষয়ই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভার, কবিত্বময় ও স্ফটিকস্বচ্ছ ভাষা ও অলংকার বিন্যাসে মানিকের ভাষা হয়ে উঠে ভিন্নস্বাদী ও চিত্তাকর্ষক।

সাধু এবং চলিত-দুই রীতিতেই গল্প লিখেছেন মানিক। প্রথম ও শেষ গল্পগ্রন্থ ছাড়া তাঁর প্রায় সব গ্রন্থই সাধুরীতিতে রচিত। অবশ্য সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন বাস্তবসম্মত চলিত, কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষা। যেমন -

> " 'পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ ইঠব পাঁচী'।
> পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'
> 'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।" (প্রাগৈতিহাসিক)

মানিকের ভাষা ব্যবহারের অন্যতম বিশেষত্ব সাংকেতিক ভাষার বহুল ব্যবহার। অনেক গল্পেই সংকেতময় ভাষা ব্যবহারে মানিক প্রদর্শন করেছেন অসাধারণ কৃতিত্ব। একটি দৃষ্টান্ত -

> “হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।” (প্রাগৈতিহাসিক)

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনে মানিক প্রায়শ স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাক্য ব্যবহার করেছেন। অবশ্য দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহারেও মানিক ছিলেন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। যেমন -

> “দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।” (কুষ্ঠরোগীর বৌ)

গল্পে অলংকার ব্যবহারে মানিক ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। বক্তব্য বিষয়কে জ্ঞাপনের প্রয়োজনে তিনি এমনকিছু অলংকার ব্যবহার করেছেন যেগুলো যথার্থই চমকপ্রদ। বিশেষ করে উপমার ব্যবহারে তিনি প্রদর্শন করেছেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য। যেমন -

১. দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম। (হলুদ পোড়া)

২. কচি ডাল ভাঙিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয়, কতকটা সেইরকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ-ভরা মুখের চামড়া কেমন মরা-মরা, চোখ দুটি নিষ্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। (সমুদ্রের স্বাদ)

৩. জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। (প্রাগৈতিহাসিক)

রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্প সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন করেছেন তার দ্বিতীয় তুলনা বিরল। বাস্তববাদী সাহিত্যের অসামান্য রূপকার তিনি। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সহযোগ-সন্নিপাতে যে গল্পভুবন তিনি নির্মাণ করেছেন তা যথার্থই দৃষ্টিনন্দন ও মনোগ্রাহী। তিনি স্বল্পজীবী হলেও তাঁর গল্পসাহিত্য চিরজীবী।

Reference:

১. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৯
২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি,* কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৩
৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩২৮
৪. হক, সৈয়দ আজিজুল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৬
৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা,* কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৪৬
৬. বসু, কৃষ্ণা, *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজজিজ্ঞাসা,* সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৬
৭. হক, সৈয়দ আজিজুল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৮১
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, লেখকের কথা, *সমুদ্রের স্বাদ,* দি বুকম্যান, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৫২
৯. গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা,* নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৩১
১০. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২
১১. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭
১২. হক, সৈয়দ আজিজুল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০
১৩. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 200 - 207
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সংকট

ড. চাঁদমালা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : khatun.chandmala@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Political instability, Manvantara, black market, erosion of values, crisis.

Abstract
Narayan Gangopadhyay, a renowned writer in the world of Bengali literature. He was born during a turbulent transitional period and the height of the Great War. His life was spent in extreme anarchy. His literary pursuits began amidst the crisis of the era, decline and instability. He is a professor by profession. Despite being devoted to his profession, he has shown considerable skill as a writer. His presence can be seen in every branch of Bengali literature. His immense glory is in every field of poetry, drama, short stories, novels, romances and essays. It is because of these works of his that he remains unforgettable in the Bengali reading community. He got the chalk in the hands of literature from his family environment. His literary practice began with writing poetry during his student life. Over time, he gained special fame by writing stories, novels, dramas, etc. His numerous works were published in newspapers and magazines such as 'Desha', ShanibarerChithi, Bharatvarsh, Bichitra. His notable works are Bitangsa, Top, Dushasan, Record, Haar, Bhangachashma, Banajyotsna, Simanta, Sainik, Tirthayatra short stories, etc. His novels include Opanibesh, Amavasya Gaan, Baitalik, Shilalipi, Padasanchar, Lalmati, Timirtirtha and plays like Barate Chai, Barobhute, Rammohan, Lagna, Agantuk. He also wrote screenplays for several films. Many of his songs have been adapted into films and records. World War II, crises and problems during the Manvantara period become the themes of his stories.

Discussion

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে কপিতয় কবি-সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরের বালিয়াডাঙিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মস্থান দিনাজপুর শহরে হলেও পৈত্রিক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার নলচিড়া গ্রামের বাসুদেব পাড়ায়। গ্রামের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাঠশালাতেই তাঁর বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ও ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তিনি মূলত চল্লিশের দশকেরই অন্যতম প্রধান গল্পকার। বাংলা সাহিত্যের ধারায় তাঁর প্রতিভা অভিনবত্বে, স্বাতন্ত্র্যে চির সমুজ্জ্বল।

> "হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে পাঠক চিত্তকে চকিত-বিস্মিত করে তাঁর আবির্ভাব নয়। তাঁর উদয়াচল নিশব্দ মহিমায় নতুন নক্ষত্রের ধ্রুবজ্যোতিতে ক্রমশ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পে বহুভারতী আজ ষড়ৈশ্বর্যময়ী এই বিরাট ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মহত্তর সমৃদ্ধির সম্ভবনাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। রূপে ও রসে ভাবনায় ও বেদনায় বিচিত্র তাঁর শিল্প লোক।"[১]

প্রথম দিকে তিনি মূলত কবিতা চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। এক সময় তিনি রাজনীতির সঙ্গেও প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন — পার্টি প্রোগ্রামই রাজনীতির শেষ কথা নয়। তাই তিনি রাজনীতির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজবাদও প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া মানব প্রীতিকে ব্রত বলে মনে করেন। রাজনীতি তাঁকে উত্তেজিত করে কিন্তু মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা আরও তীব্র ও গভীর। মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ সহজ আত্মীয়তাকে সাহিত্যে রূপ দিতে গল্প লেখা শুরু করেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'নিশীথের মায়া' প্রকাশিত হয়। সেই সময় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিক; যুগ ও সমকাল সচেতন গল্পকার। সমকালের নানা ঘটনায় তিনি বিচলিত হয়েছেন। ১৯৩৯-৪৫ সাল বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনের তাপ স্পর্শ করেছে। চল্লিশের দশক আমাদের জাতীয় জীবনে এক চরম সংকটকাল। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মন্বন্তরে গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের পথে পথে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মরেছে। তৎকালীন সময়ে অর্থনীতির ভিত, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর এই অস্থিরতার সময় শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থায় বাংলাদেশে নতুন এক শোষক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে— কালোবাজারি, ব্যবসায়ী মজুতদার ও মুনাফালোভী দালাল শ্রেণির। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে একদিকে মজুতদার, কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের দৌরাত্ম, অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিক শোষোণের তীব্রতা মানুষের জীবনকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে দিয়েছে। প্রভুত্ব-বিলাসী ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় নবোদ্ভূত এই ধণিক শ্রেণি অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করতে কালোবাজারি, মজুতদারী ইত্যাদির মাধ্যমে মন্বন্তরকে তরান্বিত করে তুলেছিল। আবার তার উপর ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে নির্মম অভিশাপ নেমে এসেছিল। স্বাধীনতা পূর্ববতী বিপর্যয়ের পটভূমি তথা মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতেই বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিকাশ। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁর গল্পকার মননকে নানাভাবে নতুন মাত্রায় চিহ্নিত করে —

> "রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত হওয়া, জীবন সম্পর্কে নতুন দীক্ষা তাঁর গল্পের উপকরণের মোড় ঘোরায়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণবিক্ষভ— এসবের যুদ্ধ সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই লেখক বিশুদ্ধ সময় সচেতনতা, জীবন প্রেম, মানুষকে ভালোবাসা— যা, বলা যায় তিরিশের দশকের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া— এসবকেই গল্পের ও উপন্যাসের উপকরণের মর্যাদায় দীপিত করেন।"[২]

যুদ্ধ সামাজিক সুস্থিতির ও সাবেকি মূল্যবোধের শিকড় ধরে টান দেয়। ফলে বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে যৌনতার মনোবিকারে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরতা হারিয়ে যায়। তার ফলে মানবিক মূল্যবোধের সংকট দেখা দেয়। কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন, অস্তিত্বের সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া তিনি চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত মানুষ হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সমকালীন যুগ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “এই কথাই তো বেশী করে মনে হয় আজ মধ্যবিত্ত সাহিত্যকেই আরো সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে— বোঝাতে হবে সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া বুদ্ধিজীবীরও নিস্তার নেই। ...লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না। ...তাই বলে একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে মজদুর কিষাণকে বাদ দিয়ে আজ শুধু মধ্যবিত্তের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হোক। আমাদের লেখা হয়ত গণ-মানসের কাছে পৌঁছায় না, ...তবুও এদের আশ্রয় করে গণসাহিত্য আমাদের রচনা করে যেতেই হবে। ...লিখতে হবে দেশের এই সর্বহারা শক্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্তকে সচেতন করে তোলবার জন্যই। ...আজ সর্বহারা বিপ্লব ছাড়া মধ্যবিত্তের বাঁচবার কোনো পথ নেই। আজ এই মাত্র আশার আলো যে তাকে বাঁচাতে পারে দুঃসহ বেকার ও ছাঁটাইয়ের বিভিষিকা থেকে নামমাত্র মূল্য বিনিময়ে বুর্জোয়াতন্ত্রের কাছে তার সর্বাধিক শক্তি, মেধা ও প্রতিভা বিক্রয়ের মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে, তার বুদ্ধি বিচারের দেউলিয়াপনা থেকে।”[৩]

তাই কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ ছোটগল্পেই মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের কথা উঠে এসেছে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল, তেমনি ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদের আবিষ্কার রুশ দেশের সাম্যবাদ বাঙালি মনকে নতুন ভাবনা রাজ্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই দু'য়ে মিলে বাঙালির ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ব্যবস্থাকে পাল্টে দিচ্ছিল। অর্থই এ সময়ে সময় সমাজ ও মানব চরিত্রে নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। এককথায় বলা হয় অর্থরূপ নিয়তির ফাঁদে আটকে পড়ে বাঙালি জীবন ধ্বস্ততা ও নতুন সম্ভবনার মাঝখানে দোলাচলতা তৈরি হয়। তার ফলে বাঙালি জীবনে দেখা দিয়েছিল মূল্যবোধের সংকট বা অবক্ষয়। কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সেই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিয়মান।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ‘হাড়’ গল্পটি। গ্রাম-গঞ্জের হাজার হাজার অসহায় বুভুক্ষ মানুষ সামান্য খাদ্যের আশায় শহরে আশ্রয় নিয়েছে। একদিকে কলকাতার ফুটপাত জুড়ে অসহায়, করুণ, অমানবিক জান্তব জীবন-যাপনের চিত্র, আর অন্যদিকে রায়বাহাদুরের মতো ধনীদের বিলাসী জীবন-যাপন ও বিলাসী জীবন কল্পনার খামখেয়ালী শখ পূরণে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়ের ছবি ধরা পড়ে। ‘হাড়’ গল্পে লেখক দুই বিপরীত শ্রেণির স্বপ্নিল ও রক্তিম চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

‘হাড়’ গল্পেসর্বহারা ও বিত্তবানদের মাঝখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ চাকুরিপার্থী এ গল্পের কথক। শিক্ষিত বেকার যুবক গল্পকথক মন্বন্তরকালীন বিপর্যস্ত সময়ে একটা চাকরির আশায় পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের বাড়িতে এসেছে। আসলে পিতৃবন্ধুত্বের ক্ষীণ সূত্রধরেই রায়বাহাদুরের দ্বারস্থ এ গল্পের কথক— যার একটি কলমের খোঁচায় হয়ে যেতে পারে তার চাকরিটা। প্রভাবশালীদের উমেদারি করেই সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ জীবিকার সমাধানে ব্রতী হয়। কিন্তু শিক্ষিত বেকার যুবকের জীবিকা-সংকটের গুরুত্ব রায়বাহাদুর অনুভব করতে পারে না। এমনকি কেরাণীর চাকরির গুরুত্ব কতটা তাও রায়বাহাদুর বোঝে না। উপরন্তু আবেগ দীপ্ত কণ্ঠে উপদেশের ভঙ্গিতে রায়বাহাদুর বেকার যুবক গল্পকথককে বলে —

> “চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এম এ পাশ করে কেরাণীগিরির উমেদারী করছ? বি এ ম্যাম ইয়াং ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে; চাকরি নাও অ্যাকটিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।”[৪]

যাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের উপায় নিয়ে ভাবনা থাকে না, তাদের পক্ষেই এমন আকাশ কুসুম কল্পনার সঙ্গে উপদেশ দানের মহত্ত্বে গর্বিত হতে পারে। এক চক্ষুহরিণ এই রায়বাহাদুর। নিজের আভিজাত্য ও শ্রেণি চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধু পুত্রের আবেদনের গুরুত্ব বোঝে না। বরং রায়বাহাদুরের সমস্ত আবেগ, উপদেশ বুভুক্ষ মানুষদের অসহনীয় চিৎকারের প্রেক্ষিতে হাস্যকর শোনায়।

মধ্যবিত্ত মানসিকতায় লালিত শিক্ষিত বেকার যুবক গল্পকথক চাকরির জন্য যেমন পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের উমেদারি করতে পিছুপা নয়, তেমনি আবার অসহায় নিরন্ন মানুষের আর্ত-চিৎকারে ব্যথিত হয়ে উঠে। গল্পকথক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ এবং নিজের পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই রায়বাহাদুরের কথা শোনাবার ধৈর্যও তাকে রাখতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়। রায়বাহাদুরের দেওয়া সুস্বাদু খাদ্যের পাশে নিরন্নদের ডাস্টবিন থেকে তুলে খাওয়া খাদ্যের স্মৃতি তাকে নানাভাবে পীড়িত ও তাড়িত করে। উমেদারির অসহায়তা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মী মানসিকতা মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকটকে ঘনিয়ে তোলে। রায়বাহাদুরের বর্ণনায় সে অভিভূত হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকাই একসময় রায়বাহাদুরের বাড়ির পরিবেশ তাকে বিরক্তকর করে তোলে। সেখান থেকে পালিয়ে আসতে চায় যুবক। নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গেই যে তার মানবিক আত্মীয়তা তা রায়বাহাদুরের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার মানসিক অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ পায়।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘টোপ’। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ গল্প সংকলন ‘কালাবদর’ এর প্রথম গল্প ‘টোপ’। গল্পটি উত্তম পুরুষের যবানীতে লেখা। মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ কলকাতামুখী হয়ে পড়ে। ‘টোপ’ গল্পে একদিকে সামন্ততন্ত্রের কুৎসিৎ দাপট, অন্যদিকে মধ্যবিত্তের মানসিক দোলাচলতার রূপায়ণ ঘটেছে। এই গল্পের লেখক একজন সাহিত্যিক চরিত্র। রাজপ্রশস্তি রচনা করে তিনি টেরাইয়ের রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুরের এন.আর. চৌধুরির নজরে পড়ে যান। তারই আমন্ত্রণে তিনি টেরাইয়ের জঙ্গলে শিকার দেখতে যান। টেরাইয়ের জঙ্গলের ভিতরে কাঠের তৈরি বাংলো, অত্যাধুনিক বাথরুম, বৈভবী ড্রেসিংরুম, লাউঞ্জে খানার প্রাচুর্য গল্প কথককে বিস্মিত ও তৃপ্ত করে। কিন্তু ঘন অরণ্যের ভয়াল সুন্দর পরিবেশে পরপর তিন দিন ও রাত্রি শিকারের সন্ধানে অরণ্যের মধ্যে ঘুরেও মনোমত শিকার না পাওয়ায় লেখক কলকাতায় ফিরে যাবার প্রস্তাব দিতেই রাজাবাহাদুর একটি রাত তাকে আটকে রেখে একটি অভিনব শিকারের আয়োজন করেন। এই শিকারই মাছ ধরার অভিনব বন্দোবস্ত নামে উল্লেখিত।

আলোচ্য গল্পে রাজাবাহাদুরের হান্টিং বাংলোর পিছন দিকে চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের হিংস্র জঙ্গল। গভীর রাতে রাজাবাহাদুর তাকে শিকারের সঙ্গী হতে বললে লেখক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার সঙ্গে যায়। রাজাবাহাদুর ঝুলন্ত সাঁকো থেকে আড়াইশ ফুট নিচে সাদা কাপড়ে মোড়া টোপকে ঝুলিয়ে দেয়। প্রতীক্ষায় থাকে কখন বড় জাতের বাঘ সেই টোপ গিলতে আসবে। শিকারের সময় লেখকের কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর রাজাবাহাদুর দেয় না। বরং বিনিময়ে ছুটে আসে ধমক। এক অজ্ঞাত ও রহস্যময় শিকারের সঙ্গী হয়ে ওঠেন লেখক। সাদা কাপড়ে মোড়া টোপটা নড়াচড়া করছে তা লেখক চাঁদের আলোয় দেখতে পান। এই সময় রাজাবাহাদুর এক হাতে টোপের উপর টর্চের আলো ফেলছেন, অন্য এক হাতে রাইফেল ধরে আছেন। শিকারের জন্য তিনি প্রহর গুনছেন। একসময় হঠাৎ রাজাবাহাদুরের রাইফেলটা বিকট শব্দে গর্জে ওঠে। চারশো ফুট নিচ থেকে বাঘের প্রচণ্ড গর্জন শোনা যায়। টর্চের আলোয় দেখা গেল ডোরাকাটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার সাদা পুটলির ওপর একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, এটাই রাজাবাহাদুরের মাছ ধরা ওরফে শিকারের অভিনব কৌশল।

আলোচ্য গল্পে দেখা যায় লেখক রাজাবাহাদুরের সঙ্গে যান মৃত্যুর শীতলতা খেলা করা রাত্রিতে ঝুলন্ত সাঁকোর কাছে। অন্ধকারে রাজাবাহাদুরের হাতে জ্বলে ওঠে হান্টিং টর্চের তীব্র আলো। কপিকলের দড়ির সঙ্গে শাদা পুঁটুলির মতো একটা জিনিস নামিয়ে দেওয়া হয়। ঝিঁঝির ডাক, শালপাতার মর্মর, দুরাগত হাতির গর্জন, ভাঙা জ্যোৎস্না, হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধে যখন টানটান উত্তেজনা তখন অরণ্য-আদিমতাকে কাঁপিয়ে গর্জন করে ওঠে রাইফেল। লেখক বারবার রাজাবাহাদুরকে মাছের টোপের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শিকারের জন্য ব্যবহৃত সাদা কাপড়ে মোড়া টোপের ভিতর থেকে মানব শিশুর কান্না ভেসে আসায় রহস্যের উন্মোচন ঘটে। শিশুশালের মতো তরতাজা সেই হিন্দুস্তানি কিপারের বাচ্চাগুলি, পয়সা ছড়িয়ে যাদের নিয়ে রাজাবাহাদুর অনুগ্রহের নির্মম খেলা খেলেন। তাদেরই একজনকে রাজাবাহাদুর তার এই শিকারের টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন তা লেখকের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। এককথায় রাজাবাহাদুর মাছধরা তথা শিকারের টোপ হিসেবে মানব শিশুকে ব্যবহার করেছে। শিকারের টোপের রহস্য জানার পর লেখক পাগলের মতো চিৎকার করে বললেন —

> “রাজা বাহাদুর কিসের টোপ আপনার, কি দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?”[৫]

লেখক ঐ একটি মাত্র চিৎকার ছাড়া কোনো কার্যকারী প্রতিবাদ করে উঠতে পারেননি। রাজাবাহাদুর 'চুপ' গর্জন করে রাইফেলের নল তার বুকে ধরেছেন। গল্পকথক একদিকে মানসিক দোলাচলতায় অস্তিত্বের সংকটে আবর্তিত হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে নিরীহ শিশুর অমানবিক হত্যায় যন্ত্রণাদীন ও ব্যথিত হয়েছেন।

'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর এক অহংকারী জমিদার। নিজের শিকারের বিলাসিতা, অহংকারকে দেখানো, প্রচারের জন্য তার কম ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষিত মোসাহেব দরকার ছিল। গল্পের কথককে খাতির করার জন্য অন্য কোনো কারণ তার ছিল না। আর ছিল না বলেই অতিথিকে অশালীনভাবে অকপট চিত্তে বলতে পারে —

"কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না"।[৬]

আবার অবলীলায় বন্দুকের নল অতিথির বুকের ওপর ধরতে পারেন। এক অদ্ভুত পদ্ধতির মাধ্যমে শিকার দেখানোর টোপ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর গল্পের কথককে টেনে এনে মধ্যবিত্ত মানুষের স্বাদ পেতে চেয়েছেন। গল্প কথক রাজা বাহাদুরের এই ভয়ংকার শিকার করার কৌশল কাউকে বলতে পারেননি। তারই পুরস্কার হিসেবে মানব শিশুর টোপ দিয়ে ধরা। প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া দিয়ে তৈরি ঝকঝকে জুতো উপহার পেয়ে খুশিই হন। গল্পের শেষে গল্প কথক নিজেকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা করেননি। মানবিকতার অপরাধে তার অন্তরাত্মাও ব্যথিত হয়ে ওঠে। 'টোপ' গল্পে বাচ্চা বাচ্চা শিশুদের 'বেওয়ারিশ মাল' হিসেবে ধরে নিয়ে গিয়ে শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মর্মান্তিক চিত্র ধরা পড়ে, তাতে মানবিক মূল্যবোধের সংকট ও অবক্ষয়ের দিকটি স্পষ্ট।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অপর একটি গল্প হল 'দুঃশাসন'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, মুনাফাখোর, কালোবাজারি ও মজুতদারের জন্ম দিয়েছিল। যুদ্ধের বাজারে এই শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে, বিবেক ও মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ সমাজে অন্ন-বস্ত্র সংকটকে আরো বেশি তরান্বিত করে সাধারণ জনজীবনকে বিপন্ন ও অসহায় করে তোলে। 'দুঃশাসন' গল্পটি হল বস্ত্র সংকটের গল্প। আলোচ্য গল্পের মধ্যে দিয়ে গল্পকার পৌরাণিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে যুগের দুঃশাসনকে যেমন বোঝাতে চেয়েছেন, তেমনি মানুষের দ্বারা সৃষ্ট অবক্ষয় ও অভাবের দিকগুলিও চিহ্নিত করেছেন।

'দুঃশাসন' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবীদাস। দেবীদাস ছোট গাঁয়ের ছোট্ট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী। কাপড়ের আড়তদার সে। আশে পাশের আট দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভরশীল। খুচরো পাইকারি সবই চলে। দেবীদাস একজন লোভী, অমানবিক ও স্বার্থপর ঝানু ব্যবসায়ী। যুদ্ধের বাজারে ব্যবসায়ী দেবীদাস থানার এল সি কানাই দে, দারোগাবাবু শচীকান্তকে হাতে রেখে গোপনে ব্যবসা করে যাচ্ছে। সরকার বস্ত্র সংকটের সময়ে কাপড়ের দাম বেঁধে দিলে তা দেবীদাসের পোষায় না। তাছাড়া এই দুঃসময়ে সাধারণ মানুষেরাও যথার্থ মূল্য দিয়ে বস্ত্র কিনতে পারবে না। আবার পরেও যে তারা টাকা শোধ করতে পারবে তারও কোনো ভরসা নেই। তাই দেবীদাসের মনে হয়েছে দোকানে তালা দিয়ে বসে থাকাই ভালো। অর্থাৎ অতিরিক্ত মুনাফালাভের জন্য দেবীদাস সব বস্ত্র গুদামজাত করে রেখেছে। তার উদ্দেশ্য দুর্মূল্যের বাজারে সেই সকল বস্ত্র চড়া দামে বিক্রি করা। দুঃশাসনের মতো সাধারণ মানুষের বস্ত্র দেবীদাসের মতো স্বার্থপর, লোভী, মজুতদাররা কেড়ে নিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়েই দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। এই দুঃসময়ে সাধারণ মানুষেরা অনাহারে, অর্ধাহারে, অর্ধনগ্ন হয়ে এবং অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে।

'দুঃশাসন' গল্পে দেখা যায় একজন অসহায় সাধারণ মানুষ ঘরের মান-সম্মান বাঁচাতে কাপড়ের আড়তদার দেবীদাসের দোকানের সামনে হত্যে হয়ে পড়ে আছে একফালি বস্ত্রের জন্য। কিন্তু নাছোড় বান্দা বস্ত্রহীন অভাবী মানুষ চোখের জলে বার বার কাতর অনুনয় জানালেও মজুতদার দেবীদাসকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। বরং লোকটি সম্পর্কে তার মনে আসে গোপন ভাবনা —

"লোকটাকে যেন একটা লাথি মারতে পারলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসলে দেবীদাস যেন এ যুগের দুঃশাসন। নিলর্জ্জ পাশব হাতে বস্ত্র হরণ করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত দেবীদাস অভাবী লোকটিকে বস্ত্র দেয় না। বরং যুক্তি দেখিয়ে বলে —

> "কাপড় পাওয়া যাবে কোথায়? চালান নেই। সব সাপ করে বসে আছি। ব্যাবসা বাণিজ্য গেল-লোকের দুর্গতির এক শেষ। ...কি করবি বল... সবই ভগবানের মার।"[৮]

মানুষের লজ্জাকে সে লোলুপ পৃথিবীর সামনে নিষ্ঠুর উপহাসে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু দেবীদাসের এই অমানবিক, পাশবিক আচরণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি গৌরদাসকে ভীষণভাবে অস্বস্তিতে ফেলে। গৌরদাস সম্পর্কে দেবীদাসের ভাইপো। গৌরদাসের সমস্ত খরচ চালায় দেবীদাস। এখনো সে সত্যিকারের ব্যবসাদার হয়ে উঠতে পারেনি বলেই কাকা দেবীদাসকে বলে —

> "কিন্তু এভাবে চলবে কদিন? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে-"[৯]

ভাইপো গৌরদাসের এই কথা শুনে কাকা দেবীদাস যুক্তি খাড়া করে বলে —

> "ক্ষেপেছিস তুই?... ওকে এখানা দিলে দুঘন্টার মধ্যে দৌড় গড়ায় উল্টো চণ্ডীর মেলা বসে যেত না? ও ব্যাটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তো আর বেশি নেবার উপায় নেই। পরপর কতগুলো মামলা হয়ে গে-দেখছিলিনা?"[১০]

দেবীদাসের সামনে বেশি কথা বলার সাহস গৌরদাসের নেই। কেননা সে কাকার আশ্রয়ে থাকে এবং তার সাহায্যে কলেজের পড়াশোনা চলছে। কিন্তু গৌরদাস দেবীদাসের লোভ ও অমানবিক আচরণকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে না। আবারমেনে না নিলেও প্রতিবাদ করার মত মানসিক দৃঢ়তাও তার মধ্যে নেই। এই দুই-এর সংকট থেকে বাঁচবার জন্য গৌরদাস বিজ্ঞাপনের পাতায় মুখ লুকোয়।

'দুঃশাসন' গল্পের অপর একটি চরিত্র দারোগা শচীকান্ত। সে একজন ঝানু প্রশাসক প্রতিনিধি। সে ভালোভাবে জানে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে অবহেলিত, অভাবী মানুষদের শান্ত করে রাখার কৌশল। তারই উৎসাহে গ্রামে যাত্রাপালার দল আনে দেড়শো টাকার বিনিময়ে। যুদ্ধের আকালে বস্ত্র সংকটের পাশাপাশি কেরোসিনের সংকটও দেখা দেয়। গ্রামকে গ্রাম গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকে। কারো ঘরে একটা ছোট্ট লম্ফ জ্বেলে রাখারও উপায় নেই। ঘরে ঘরে আলোর অভাব। আলোর অভাব মুচিপাড়ায়ও। রাতের বেলায় মুচিপাড়ার একটি শিশুকে শিয়াল ঘরের বেড়া ভেঙে তুলে নিয়ে গিয়ে কাছে বসেই খেয়েছে। লেখকের বর্ণনায় —

> "পরদিন সকালে বাড়ি থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না"।[১১]

যে আলোর অভাবে এক মা তার শিশু সন্তানকে বাঁচাতে পারল না। অথচ থানার দারোগাবাবু এই সংকটের দিনেও অনেকগুলি ডে-লাইট একসঙ্গে জ্বেলে শখ মেটাতে যাত্রাপালার আসর বসায়। এই পালার নাম 'দুঃশাসনের রক্তপান'। আসলে যাত্রাপালার আনন্দ দিয়ে নিতান্ত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের ভুলিয়ে রাখতে চায় এবং প্রায় বস্ত্রহীন, নিরন্ন মানুষদের উদ্দেশ্যে শচীকান্ত বলে —

> "ওরে বোস, বোস, তোরা—বসে পড়। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই ত গান—তোদের জন্য দেড়শ টাকা খরচ করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম।"[১২]

আসলে প্রশাসনিক লোকজন নিজেদের স্বার্থের জন্য সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ, বিলাসিতা বজায় রেখেছে।

'দুঃশাসনের রক্তপান' যাত্রাপালার অভিনয় দেখে গৌরদাসের মনে হয়—

> "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাংলাদেশে। সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রোপদীর মতো আর্তনাদ উঠেছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে।"[১৩]

এর উত্তর খুঁজে পায় না গৌরদাস। মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে পারেনি বলেই গৌরদাস ভয় পায়। তাই 'দুঃশাসনের রক্তপান' যাত্রাপালা দেখে গৌরদাস, দেবীদাসের সঙ্গে গিয়ে যা দেখেছে তা সত্যিই বীভৎস। গোটা মুচিপাড়া যেন শ্মশান হয়ে আছে। কোথাও কোনো জনমানব নেই। মানুষের কণ্ঠস্বর পেয়ে বিদ্যুৎ গতিতে অদৃশ্য হয়ে যায় এক ষোড়শী মেয়ে। লেখকের ভাষায় —

> "মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই। কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন পাশব হাতে বস্ত্র হরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১৪]

মহাভারতে দুঃশাসন যেমন সভার মাঝে সর্ব সমক্ষে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল তেমনি এ যুগের দুঃশাসন পাশব ও নির্লজ্জ হাতে নারী তথা বাংলাকে বিবস্ত্র করে তুলেছে। তাই মুচিপাড়ায় নগ্ন ষোড়শি মেয়েকে দেখে বিবেকী গৌরদাস দুঃশাসনের প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবে—

> "সে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে, তারও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে।"[১৫]

এই জিজ্ঞাসাই গৌরদাসকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। তবুও সে দেখে ভোর বেলায় ফসলহীন শূণ্য মাঠের ভাঙা আলের ওপর দিয়ে হেঁসো হাতে একদল লোক কাজ করতে চলেছে। কৃষকদের হাতে তীক্ষ্ণ ধারালো হেঁসোগুলিকে দেখে গৌরদাসের মনে অকারণে বড়ো বেশি ভয় হয়। লেখকের ভাষায়—

> "তাদের ধারালো হেঁসোগুলিতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে, অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগলো গৌরদাসের। অমন ঝকমকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?"[১৬]

গৌরদাসের এই ভয় মূলত পাপবোধ ও নীতিবোধ থেকে। 'অকারণ' শব্দটি লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবেই প্রায় পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সকারণেই তাদের মনে ভয় ধরেছে। 'দুঃশাসন' গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন।

কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন সময়ের চিত্রপটকে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ ও আর্থ-সামাজিক বিপর্যস্ততা মানুষের জীবনে যে সীমাহীন শূণ্যতা, অসহায়তা, অস্তিত্বের সংকট ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূমিকা অংশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫

২. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপনি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৮৩

৩. 'উজাগর' সম্পাদক উত্তম পুরকাইত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, হাওড়া, উজাগর প্রকাশন, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, বইমেলা ২০১৫, পৃ. ২৮১

৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, শ্রাবণ ১৪১৭, পৃ. ৩২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. তদেব, পৃ. ৭৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৯
৭. তদেব, পৃ. ৫১
৮. তদেব, পৃ. ৫১
৯. তদেব, পৃ. ৫২
১০. তদেব, পৃ. ৫১-৫২
১১. তদেব, পৃ. ৫৪
১২. তদেব, পৃ. ৫৫
১৩. তদেব, পৃ. ৫৭
১৪. তদেব, পৃ. ৫৮
১৫. তদেব, পৃ. ৫৮
১৬. তদেব, পৃ. ৫৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 208 - 216
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সামাজিক দৃষ্টিকোণে দলিত সম্প্রদায় : মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প

সন্দীপ ঘোষ
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email : sandipghosh9851@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Dalits, protest, exploitation, upper caste, lower caste, traitor, sexual abuse, fornication, superstition, remonstrate.

Abstract
The term 'Dalit' refers to an ethnic group that is often characterized as an oppressed, tortured, and backward caste. Generally a disenfranchised backward underdeveloped community in Indian Hindu society is known as Dalit. Upper caste people deprive them of all economic, social, political, religious rights. An Indian Bengali writer and human rights activist Mahasweta Devi took pen for their rights. He traveled to different states and worked for the rights and empowerment of Dalit communities like Lodha, Shabar, Santal, Onrao etc. In his writings, he has repeatedly portrayed the unspeakable oppression of the tribal and untouchable Dalit communities at the hands of powerful landlords, moneylenders and corrupt government officials and the silent and vocal protests of Dalits against it. In her short stories 'Draupadi' and 'Shikar' we see the sexual exploitation of the lower caste by the upper caste and their vocal protest against it. On the other hand, in stories like 'Bayen', 'Rudali', 'Dhauli' we see the social stigma given to Dalits due to superstition and vocal protest against it.

Discussion

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জাতিভেদ প্রথা। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজ জীবনে দুষ্ট ক্ষতের মত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আসলে আর্যরা ভারতে এসে দাস বানিয়েছিল ভারতের কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের। পরে এই দাসপ্রথাকে যুক্তিগাহ্য ও ধর্মসিদ্ধ করার জন্য তারা প্রবর্তন করে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার। ঋকবেদে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্যের এবং পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে। আর এই চার বর্ণের বাইরে পড়ে থাকলে তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য মানুষ, যারা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হত। সময়ের সারণিতে এই নিম্নজাতির সামাজিক মর্যাদাও এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তারা চতুবর্ণ ব্যবস্থার বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। সবশেষে এই নিম্নজাতিও অস্পৃশ্য জাতি বা দলিত হিসাবে পরিচিত হয়। তারা প্রতিনিয়ত উচ্চ জাতি দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হতে থাকে। সমাজ বহির্ভূত এই যে পরিচয় গড়ে উঠেছে তাতে তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছে অপবিত্র বলে গণ্য হয়। উচ্চ হিন্দু জাতবর্ণের লোকেদের কাছে দলিতদের স্পর্শ, ছায়া

মাড়ানো বা তাদের কণ্ঠস্বর শোনাও অপবিত্র বলে মনে হয়। মূলত বৈদিক সমাজে এই শ্রেণি শাসন ও শ্রেণি শোষণকে অব্যাহত ভাবে চালানোর জন্যই প্রচলন করা হয় চতুবর্ণ ব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথার।

প্রকৃতপক্ষে এই জাতিভেদ প্রথা শ্রেণিশোষণের ব্যবস্থাকে করেছিল আরও বেশি তীব্র, নিষ্ঠুর ও বর্বরাত্মক। সমাজের একটি বিশাল অংশ হওয়া সত্ত্বেও দলিতরা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের কাছে এতটাই অনাদর, অমানবিক আচরণ পেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে সেই সামাজিক অভ্যাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তার ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকেই দলিত সম্প্রদায় তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এই দলিত আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল অস্পৃশ্যতা। তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষদের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতার ভাবনাই দলিতদের মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে আন্দোলনের আকার ধারণ করে। সেই নিয়েই রচিত হয় দলিত সাহিত্য। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ প্রমুখ লেখক দলিতদের নিয়ে সাহিত্য লিখলেও মহাশ্বেতা দেবীর কলমে তা এক আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে অভিজিৎ সেন, স্বর্ণ মিত্র, শৈবাল মিত্র, দেবেশ রায়, অমর মিত্র, ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখ লেখক দলিতদের নিয়ে চর্চা করছেন এবং দলিত সাহিত্য রচনা করছেন।

এই দলিতদের অধিকারের জন্যই সাহিত্যে প্রতিবাদী কলম ধরেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর রচনার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই রয়েছে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা। মহাশ্বেতা দেবী (১৪ জানুয়ারী ১৯২৬ – ২৮ জুলাই ২০১৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি লেখিকা এবং একজন মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় বিভিন্ন রাজ্যের অন্ত্যজ বা দলিতদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেন লোধা, শবর, ওঁরাও ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায়, মহিলা এবং দলিতদের নিয়ে। তিনি বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের আদিবাসী গ্রামে বসবাস করেছেন। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন এবং কাছ থেকে লক্ষ করেছেন তাদের সংগ্রামকে। তাই আমরা দেখি তাঁর বিস্তৃত কথাসাহিত্যে তিনি অঙ্কন করেছেন ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য দলিত সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র। তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি বলেছেন –

> "আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলো যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানেনা। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলো। অন্য কথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলেই তাদের হাতে লেখা।"[১]

ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতিতে তার কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুতে এসেছে বিপুল বৈচিত্র্য। ইতিহাসচেতনা থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্বেষণ, আদিবাসী শোষণ ও তাদের নিরুচ্চার ও সোচ্চার প্রতিবাদ। তাঁর ছোটগল্প গুলিতে তিনি রেখে গেছেন অন্ত্যজ, দলিত শ্রেণীর মানুষদের জীবনযন্ত্রনার কথা, যেখানে তারা শোষিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত। তাঁর 'দ্রৌপদী', 'শিকার', 'বাঁয়েন', 'রুদালী', 'ধৌলি', 'বিছন' প্রভৃতি গল্পে দলিত শ্রেণির প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার যেমন দেখতে পাই তেমনি পাই সমাজের বিরুদ্ধে নিম্নজাতি বা দলিতদের সরব ও নীরব প্রতিবাদ।

মহাশ্বেতা দেবীর একটি শক্তিশালী গল্প 'দ্রৌপদী'। আদিবাসীদের প্রতি সভ্য সমাজের শোষণ এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই গল্পে আদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা, তাদের প্রতি নানান অত্যাচার, এবং তাদের প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা নগ্নতাকেই শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে সোচ্চার প্রতিবাদ তুলে ধরেছেন লেখিকা তাঁর শাণিত উচ্চারণে। গল্পের মূল কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র দ্রৌপদী। অনার্য সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহের প্রতিনিধি। অন্যদিকে মহাজন কারবারী ও শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি সূর্য শাহু। বিভিন্ন ভাবে এই অন্ত্যজ সমাজকে শোষণ করে চলেছে দিনের পর দিন। তাই সূর্য শাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও বিশেষ করে পুলিশ ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর কাছে দ্রৌপদী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেঝেন ও তার স্বামী দুলন মোষ্ট ওয়ান্টেড। গল্পে উল্লেখিত 'দুই তকমাধারী' পুলিশ ইয়নিফর্মের সংলাপে দ্রৌপদী সম্পর্কে জানা যায়-

"দ্য মোষ্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ান্টেড ইন মেনি...।"[২]

১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর প্রতিনিধিত্বে যৌথ বাহিনীর বাকুলি অপারেশনে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন। তাই দ্রৌপদী আর তার স্বামী পুলিশের কাছে কুখ্যাত অপরাধী রূপে গণ্য। পরবর্তীতে স্বজাতি দুখীরাম ঘড়ারীর সাহায্য নিয়ে পুলিশ দুলনকে খুঁজে বের করে এবং গুলি করে হত্যা করে এবং মৃতদেহকে টোপ হিসেবে রাখে তাদের শিকার দ্রৌপদীকে ধরার জন্য। কিন্তু সেই চক্রান্তে তারা ব্যর্থ হয়। বরং স্বামীর মৃত্যু হলেও দ্রৌপদী হাল ছাড়েনি একাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। স্বজাতির সহকর্মী সোমাই ও বুধনার বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদী বেশি দিন আত্মগোপন করতে পারে না। এক সময় ধরা পরে পুলিশের জালে। এর পরে দ্রৌপদীর উপর শুরু হয় অমানষিক ও অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। সেনানায়কের কঠোর নির্দেশ –

"ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো। ডু দি নীডফুল।"[৩]

দ্রৌপদীকে সাধ্যমত বানিয়ে নিয়ে আসে সেনাগণ -

> "তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দুহাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভিতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা।"[৪]

এক ঘন্টা ধরে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষিত হবার পরেও বিদ্রোহী চেতনায় ভাস্বর দ্রৌপদীকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যায় না। উলঙ্গ দ্রৌপদী আরও বিভৎস হয়ে উঠে সেনা নায়কের কাছে। দ্রৌপদীর নিরস্ত্র প্রতিবাদের সামনে ভিত হন সেনানায়ক পর্যন্ত -

> "কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? ...দ্রোপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[৫]

আসলে এই সেনানায়কেরা পারে মেয়েদের উলঙ্গ করতে, তাদের লালসা চরিতার্থ করতে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। সেই সম্মান দ্রোপদী নিজেই আদায় করে নিতে চেয়েছে, সেনানায়ক সেখানে পরাজিত। তাই মহাশ্বেতা দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন -

> "শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করা যায়, লালসা চরিতার্থ করা যায়, কিন্তু সম্মান দেওয়া যায় না। অথচ এই গল্পের শেষে সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে। এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক, কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য সম্মান।"[৬]

সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলিত সমাজ বিশেষত নারীরা যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই লক্ষ্যেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কাজ করে গেছেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই লেখিকা লিখেছেন 'রুদালী' গল্পটি। ব্যাপক বৈপরীত্য সমাজিক অবস্থান ও শ্রেণি বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'রুদালী' গল্পের কাহিনিকে লেখিকা বিন্যস্ত করেছেন। যেখানে উচ্চবর্ণের শোষক শ্রেণি প্রতিনিয়ত নিংড়ে নেয় দলিত নিম্নশ্রেণিকে। সমাজ সচেতন লেখিকা সেই অমোঘ সত্যকেই তুলে ধরেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গল্পটি রাজস্থানের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীদের নিয়ে লেখা যারা অর্থের বিনিময়ে মৃতের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করে যারা। এই 'রুদালী' গল্পের নায়িকা শনিচরী। শনিচরী, যে কিনা এই গল্পে অন্ত্যজ দুসাদ জাতির প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেও দুসাদ জাতির পুরুষদের সঙ্গে উচ্চবর্ণ রাজপুত জাতির মহাজনীয়ও শোষণে সমানভাবে বিপর্যস্ত। কয়েক বছরে একের পর এক মারা গেছে তার জা, শাশুড়ি, ভাসুর, স্বামী এবং তারপর মারা যায় একমাত্র ছেলে বুধুয়া। কিন্তু পেটের দায়ে, এত মৃত্যুর পরেও শুধুমাত্র নাতি হারোয়াকে বাঁচাতে ব্যস্ত থাকার কারণে শনিচরীর কাঁদা হয়ে ওঠেনি। একদিন হারোয়া ঠাকুমা শনিচরীকে ছেড়ে ম্যাজিসিয়ানদের দলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। অবশেষে এই নারীকে ভাগ্যের পরিহাসে প্রচুর কাঁদতে হয়। যে কান্না স্বামী, শাশুড়ি, ভাসুর, জা, বুধুয়া এদের মৃত্যুর জন্য নয়, তাকে কাঁদতে হয়েছিল পেট চালানোর দায়ে। সে পরবর্তীকালে হয়ে যায় রোনেবালি পেশাদার রুদালী অর্থাৎ পেশাদার ভাবে কাঁদিয়ে। সমাজে মালিক, মহাজনদের কেউ মারা গেলে কাঁদার লোকের অভাব ঘটত, তখন রুদালীদের দিয়ে কাঁদানো হত কারণ রুদালীরা যত উচ্চস্বরে রোদন করে, ততই রাজপুত ব্যক্তিমানুষের পার্থিব মহিমা কীর্তিত হয়, বর্ধিত হয়। সেই কারণেই রুদালীরা অর্থের বিনিময়ে এই কাজটি করে থাকত। অর্থাৎ তাঁকে অর্থ রোজগারের জন্যে এবাড়ি-সেবাড়িতে গিয়ে মাথা চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে হয়েছে। এই গল্পের সূত্র ধরে বলা যায় যে সমাজের হয়ে সামাজিক সত্যতা রক্ষা করাই ছিল এই সমস্ত রুদালীদের আসল ধর্ম এবং সত্য। বিনিময়ে তাদের স্থান ছিল বরাবরই মহাজন শ্রেণির পদতলে। সেখানে পেটের খিদের কাছে সবকিছু হার মেনে যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি বিখ্যাত গল্প 'শিকার'। গল্পে আমরা পাই ওঁরাও আদিবাসী উপজাতির মেরী নামক নারী চরিত্রটিকে, যে কিনা সোচ্চার প্রতিবাদের প্রতিভূ। তার জন্ম রহস্যের পিছনে রয়েছে সমাজ বহির্ভূত, অবৈধ এক অস্ট্রেলিয়ানের রক্ত। কাজের সুবাদে মেরীর মা ভিকনির সঙ্গে ডিক্সন সাহেবের ছেলের পরিচয় হয় এবং তার ফলস্বরূপ অবৈধ সন্তান মেরীর জন্ম। পরবর্তীতে ডিক্সন সাহেব ও মেরীর বাবা অস্ট্রেলিয়া চলে গেলে সেই বাংলো কিনে নেন প্রসাদজী। কিন্তু মেরী ও তার মা কে তাড়াবার কথা না ভেবে প্রসাদজী নিজের সুবিধার কথা ভেবে দুজনকেই বাংলোতে রেখে দেয়। বস্তুতপক্ষে, মেরী দুর্দম, দুর্দান্ত, কর্মঠ ও সাহসী। মেরী যেমন দেখতে সুন্দর, তেমন সুন্দর গাঁয়ের রং, তেমনি লম্বা। মেরী প্রথম থেকে তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। মেরীর কথাবার্তায় এবং কাজকর্মে ব্যাক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই মেরীর প্রণয়ী হতে চেয়েছে। কিন্তু মেরী প্রত্যাখ্যান করেছে। মেরী উন্নত সভ্য সমাজে বাস করার স্বপ্ন দেখেছে। সে মনে করে সমাজে থেকে উন্নত জীবন যাপন করতে পারবে না –

> "ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল-সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, অমন জীবন আমি চাই না।... প্রণয়ী হতে চেয়েছে বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে দেখিয়েছে। তারা বাইরের মানুষ। ভিকনির মতো, তাকেও পেটে বাচ্চা দিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতে পারে।"[৭]

উপরোক্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মেরী চরিত্রের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার পরিচয় আমাদের সামনে উঠে আসে। মেরী কারও কাছে করুণার পাত্রী হিসাবে থাকতে পছন্দ করেনা। যেমন করেই হোক সে নিজে পরিশ্রম করে পয়সা উপার্জন করবে। সেই অর্জিত পয়সাতেই সংসার গড়তে চায় মেরী। কিন্তু গল্পে দেখি প্রসাদজীর বাড়িতে যেদিন প্রথম তশীলদারের সঙ্গে মেরীর পরিচয় হয়, সেদিনই তার মধ্যে জেগে ওঠে মেরীর দেহের প্রতি অনুগ্র কামনা। যেকোন মূল্যেই মেরীর দেহসম্ভোগ করতে চায় সে। সেই লক্ষ্যকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমদিকে মেরীকে বস্তুগত প্রলোভন দেখায়। কিন্তু মেরী শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, তীব্রভাষায় তশীলদারকে ভর্ৎসনা করে, ভবিষ্যতে যেন এইরকম কাজ না করে তাও বলে দেয়। কিন্তু তবুও সে নাছোড়বান্দা, বিভিন্নভাবে মেরীকে বিরক্ত করতে থাকে। তাই বিরক্ত মনে মেরী একদিন রাজী হয়ে যায় তশীলদারের পূর্ব পরিকল্পিত স্থানে অভিসারের জন্য। বহু প্রতিক্ষায় প্রতিক্ষিত তশীলদার দৈহিক মিলনের আস্বাদে যখন টগবগ করে ফুটছে, তখনই তাকে মেরীর দা-এর কোঁপে নিধন হতে হয়েছে। মাংসলোলুপ মানুষবেশধারী পশু তশীলদারের নিধনকে মেরীর মনে হয় 'বড় শিকার'। তাই সে আনন্দিত, পরিতৃপ্ত -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়াল। রক্ত? জামায়? কাপড়ে? নালায় ধুয়ে নেবে... মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছ ও।"[৮]

অন্ত্যজ নারী জাতির প্রতি অবমাননা ও মাংসলোলুপ পুরুষবেশী পশুর প্রতি মেরীর এই সশস্ত্র প্রতিবাদ অবশ্যই আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে প্রতিবাদের স্থান অবশ্যই রয়েছে, তা সে নিরুচ্চার প্রতিবাদেই হোক, কিংবা সোচ্চার।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটগল্প *'বাঁয়েন'*-এ ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্র এঁকেছেন। গল্পের বিষয়বস্তুতে লেখিকা এক অভিনব অথচ শাশ্বত মানবতাবাদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। গল্পের কাহিনিতে লেখিকা শুরু করেছেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক গ্রামীণ পরিবেশের উপস্থাপনার মাধ্যমে। যেখানে নায়িকা চণ্ডী জাতিতে ডোম। চণ্ডীর বাবা ভাগাড়ের কাজ করত, অর্থাৎ কারও মৃত্যু হলে তার জন্যে গর্ত খুঁড়ে দিত। চণ্ডী তার বাবার মৃত্যুর পর সেই কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু তার চেতনায় ও বোধগম্যতায় সে বুঝে উঠতে পারে না শ্রেণি বিভক্ত ডোম সমাজের সৎকারের কর্মকে সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষজন কেন ঘৃণার চোখে দেখে? তার ভাবনায় প্রতিফলিত হয় চিরন্তন শ্রেণি বিভক্ত সমাজের শাশ্বত, চিরচারিত অবহেলিত, সামাজিক বৈষম্য বিভেদের রূপরেখা ও জ্বলন্ত প্রশ্ন -

> "তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ। কেন ভয় পায়।"[৯]

সেই শবদেহ সৎকারের সূত্র ধরেই ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মলিন্দরের সঙ্গে পরিচয় ও বিয়ে হয়। এক সন্তানের জননী হয় সে। কিন্তু একদিন অন্ধ কুসংস্কারে জরাগ্রস্ত ডোম সমাজের বিশ্বাসে হঠাৎ চণ্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন, নিষ্ঠুর-নির্দয় শিশুহন্তা। স্বামী, সন্তান পরিবার থেকে সমাজ তাকে বিচ্যুত করে সমাজের এককোণে, একঘরে করে রেখে দেয়। যেন সে আলাদা জগতের প্রাণী। নিয়ম শাসনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় তার পায়ে। এমনকি নিজের স্বামী সন্তানের পরিচয় দিতেও চণ্ডীকে নিষেধ করা হয়। তাই তার ছেলে ভগীরথ জ্ঞান হওয়া অবধি তার মাতৃপরিচয় জানতে পারে না। তাদের পুত্র ভগীরথের কখনও মনে হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কখনও কারও মা হতে পারে। কিন্তু পিতার থেকে মাতৃপরিচয় উদঘাটিত হবার পর ভগীরথের হৃদয় বিচলিত হয়। মা সমাজ স্বীকৃত বাঁয়েন হওয়া সত্ত্বেও মাতৃস্নেহের জন্য ভগীরথের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভগীরথকে দেখেও চণ্ডীর চিরন্তন মাতৃসত্ত্বা জেগে উঠেছে। যে সমাজ একদিন তাকে বলতে বাধ্য করেছিল -

> "আমি বাঁয়েন। আমি ঘরের ছেলে ফেলে, মরা ছেলেকে দুধ দেই, মরা ছেলে লিয়ে সোহাগ করি। আমি বাঁয়েন।"[১০]

সেই একদিন মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও রক্ষা করে 'ফাইভ আপ লালগোলা' মেলকে বৃহত্তর ক্ষতি সাধনের হাত থেকে। তখন সেই সমাজই চণ্ডীকে তার আসল পরিচয় ফিরিয়ে দেয়। নিজের জীবন দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হয় –

> "আমি বাঁয়েন লই গো, মোর বুকে কচি ছেলা, মোর বুক দুধে ফেটে যায়। বাঁয়েন আমি লই"[১১]

তাই শেষ পর্যন্ত অন্ধবিশ্বাসী সমাজকে আবার বলতে হয়েছে চণ্ডী তাদের সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে নারীর প্রতি অন্ধ কুসংস্কারে জীর্ণ সমাজের অত্যাচার ও তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়েই লেখকের সমাজ-সচেতন মন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। নিপীড়িত জনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দেখার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। তাদের সমস্যা অনুভবগম্য করে, তাদের মধ্যে স্বাধিকার বোধের সঞ্চার করতে চেয়েছেন। সামাজিক কুসংস্কারকে সামনে রেখে অন্যায় আর নিপীড়নের পটভূমি নির্মাণ করেছেন এই গল্পে।

পরবর্তী 'ধৌলি' গল্পে আমরা দেখতে পাই উচ্চবর্ণের রিরংসা ও তার ফলে অন্ত্যজ দুসাদ শ্রেণির এক নারীর সংকটময় জীবন কাহিনিকে। যেখানে রয়েছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার নিদারুণ চিত্র। কেন্দ্রীয় নায়িকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নামকরণ অনুসারে গল্পের নামকরণ করেছেন লেখিকা। কাহিনির প্রেক্ষাপট মানভূম, ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন অঞ্চল। অন্ত্যজ দুসাদ জাতির ধৌলি ভালোবেসেছিল উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ মিশ্রিলালকে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধৌলি একথা জানত, নিম্নবর্ণের সাথে উচ্চবর্ণের পরিণয়কে কখনই শ্রেণি বিভক্ত সমাজ মান্যতা দেয় না। তবু মিশ্রিলালের প্ররোচনায় ও কপটতার জালে ধৌলিকে ধরা দিতে হয়। জৈবিক চাহিদার পরিণাম স্বরূপ তাকে গর্ভবতী হতে হয়। কিন্তু মিশ্রিলাল তাকে সামাজিক পরিচয় দিতে চাইলে, তার পরিবার প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে। উচ্চবর্ণের বিকৃত কামনার বহ্নিতে অনেক অন্ত্যজ দুসাদ, গঙ্গু শ্রেণির নারীদেরকে আত্মহুতি দিতে হয়, জন্ম দিতে হয় জারজ সন্তানের। যেন সমাজের এক অলিখিত নিয়মে ও প্রতাপে অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের দেহসম্ভোগ করার ও অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা করার অধিকার সমাজের উচ্চবর্ণের পুরুষদের রয়েছে। তারা প্রতাপের দৌলতে অসংখ্য অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের উপভোগের বস্তু করে রাখতে পারে। গল্পে মিশ্রিলালের জননী কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের সামাজিক অবস্থান-

"দুসাদ- গঞ্জু মেয়ের পেটে এ বংশের ছেলে আগেও হয়েছে।"[১২]

উচ্চবর্ণের পুরুষদের অসংযত কামনা ও তার ফলাফলে অন্ত্যজ নারীদের জীবন বিনিষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে উচ্চবর্ণের নারীরা বয়েসের গরম-এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এই কারণেই মিশ্রিলালের মা ধৌলিকে মিশ্রিলালের স্ত্রী রূপে স্বীকার করতে চায়না, বরঞ্চ একজন খোরপোশ যুক্ত রক্ষিতা রূপেই দেখতে চায়। শুধু মিশ্রিলালের মা নয়, তার সমস্ত পরিবার তাদের সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ককে মান্যতা দিতে অস্বীকার করে। এর জন্যে তারা ধৌলির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ধানবাদে মিশ্রিলালের বিয়ের প্রচেষ্টা করতে থাকে। মিশ্রিলাল প্রথম দিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেও, পরবর্তীতে সে উচ্চবর্ণের আর পাঁচজন শান্ত ভাল ছেলের মতো বিয়ে করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে মিশ্রিলাল ধানবাদে চলে গেলে অন্তঃসত্ত্বা ধৌলির জীবনে অস্তিত্ত্বের সংকট ঘনীভূত হয় -

> "ধৌলি সবই জানত। ও প্রতিবাদ জানাবার কথা ভুলেও ভাবে নি। দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষই ধৌলির। এতে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার থাকায় ধৌলি স্বসমাজের কাছেও ব্রাত্য। স্বসমাজের ছেলেদের সে আমল দেয়নি। না দিক। মিশ্রিবাড়ির ছেলেদের জারজ সন্তান দুসাদ-গঞ্জু-ধোবি টলিতে অনেক থাকে। এক্ষেত্রে ধৌলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে। অমার্জনীয় অপরাধ।"[১৩]

সামাজিক স্বীকৃতি নয়, একজন রক্ষিতার জীবন যাপনের জন্য যতটা খোরপোষের দরকার সেই ততটুকু দাবীদারেরই প্রত্যাশা করেছিল ধৌলি। প্রাথমিক দিকে সে মিশ্রিলাল ও তার পরিবারের কাছে কিছু যৎসামান্য সাহায্য পেয়েছিল কিন্তু যত দিন এগিয়েছে খোরপোষের পরিমাণ কমতে কমতে এমন এক সময় আসে যখন মিশ্রিলালের পরিবার খোরপোষ দিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। শুধু পরিবারের দিক থেকেই নয়, মিশ্রিলালের নিজের দিক থেকেও ধৌলির প্রাপ্তি হয়েছে কপটতা। জীবন যুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাধ্য হয়ে দেহব্যবসায় নামতে হয়েছে তাকে। একদিকে নিজের অস্তিত্ত্বের জন্য সংগ্রাম, অন্য দিকে নিজস্ব সমাজের প্রাপ্ত অসহায়তায় ধৌলি 'বেওসা রাণ্ডীতে' পরিণত হয়েছে। এই পরিণতির জন্য সমাজব্যবস্থাও অনেকখানি দায়ী এবং এই ধরনের পথ নারীকে অবলম্বন করানোর জন্যে যে মিশ্রিলালরা দায়ী থাকেন, সেকথা সমাজে কখনওই বিবেচিত হয় না। সেই বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা তার কলমে।

'বিছন' গল্পের মূল অবলম্বন যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সে দুলন গঞ্জু। অন্যদিকে রাজপুত লছমন সিং। দুলন গঞ্জুর মতো ব্যক্তি যারা সমাজে অন্ত্যজ বলে পরিচিত, তাদের লড়াইয়ের চিত্র গল্পের প্রতিটি ছত্রে ফুটে ওঠে। সমাজে ব্রাত্য হবার কারণে কিভাবে জীবনের সাথে লড়াই করে বেঁচে থেকেছে তার চিত্র গল্পে ছড়িয়ে পরেছে। গল্পে সর্বোদয়ের নেতা-কর্মীদের চাপে লছমন সিং জমি দান করে, কিন্তু সে জমি অনাবাদী। এতে তার কোনো ক্ষতি নেই, বরং শোষিত শ্রমিকদের ধরে রাখতে সুবিধা হল-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। বাঁজা জমি বেরিয়ে গেল। গ্রহীতাদের কিনে রাখা গেল। সরকারের কাছে নিজেদের খুঁটি আরও শক্ত হল।"[১৪]

সেই সময় এরকমই একটি জমির মালিক হয় দুলন। কিন্তু ফসলি জমি না হওয়া সত্ত্বেও সরকারের কাছ থেকে আদায় করে টাকা, বীজ আর সার। যা বিক্রি করে সে আনে 'বিছন'। লছমন সিংয়ের চোখ রাঙানিতে সে বাধ্য হয় সাধারণ জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। গল্পটির মধ্যে বার বার শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা উঠে আসে। যে লড়াইয়ে হারিয়ে যায় দুলন গঞ্জুর আশেপাশের অনেক ব্যক্তি আর তাদের মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় দুলনকে। বাঁচার কোনো রাস্তা খুঁজে না পেয়ে ধীরে ধীরে মানুষের মনে জাগ্রত হয় স্বাধিকার লড়াইয়ের চেষ্টা -

> "লড়াই গড়ে ওঠাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। লড়াইয়ের প্রয়োজনে লড়াই গঠন।"[১৫]

শ্রমের পাওনার দাবি জানায় আসরফিরা। দুলনের ছেলে ধাতুয়াও এই দলে নাম লেখায়, প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা মাটিতে পড়ে যায় চাপা। লড়াইয়ে হারিয়ে যায় করণ, বুলকি। লছমন সিং তাদের মাটি চাপা দিয়ে যায় দুলনের জমিতে। জীবনে সত্যের সাথে লড়াইয়ে চিরকাল হারিয়ে যায় তারা। শোকে উন্মাদ দুলনের পরিশ্রমে কাঁকুড়ে জমিতেও বিছন ধানের ফলন হয়, কিন্তু এই ধান সে কাটতে দেয় না। কারণ -

> "করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংসমজ্জার সারে পুষ্ট।"[১৬]

এই ধানের রহস্য কথা কেউ জানে না। তাই চিরদিন যে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, সেও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে। এক রাত্রে লছমন সিংকে পাথর দিয়ে মেরে, পাথর চাপা দিয়ে দেয় দুলন। একথাও কেউ জানতে পারে না। অন্ত্যজ মানুষগুলি যেমন করে হারিয়ে যায়, লছমন সিংও তেমনি হারিয়ে যায়। এভাবে যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে টিকে আছে নিম্নবর্গীয় সমাজ। উচ্চবর্গীয় মানুষ তাদের অবিশ্রান্ত শোষণ করে চলেছে। আর এই শোষিত মানুষেরা করে চলেছে টিকে থাকার লড়াই। কারণ তাদের কাছে 'বিছন' মানে বেঁচে থাকার লড়াই। দুলনের কাছে তাই তার ছেলে বিছন হয়ে যায়। যে ছেলে বেঁচে থাকতে পিতার মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেনি, মরে গিয়ে সে ধান হয়ে জন্মায়। দুলনের মধ্যে তাই আশ্চর্য প্রসন্নতা –

> "দুলন আস্তে আস্তে মাচানে ওঠে। মনের মধ্যে একটা সুর। অবাধ্য। ফিরে ফিরে আসছে। ধাতুয়া গানটা বেঁধেছিল। 'ধাতুয়া'- বলতে গিয়ে দুলনের গলা কেঁপে গেল। ধাতুয়া তোদের হম বিছন বনা দিয়া।"[১৭]

'মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ' ছোটগল্পে দেখানো হয়েছে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, বেঁচে থাকার জন্য ভিখারি বৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না মানুষের। নওয়াগড়ের জমিদার রাজাসাহেবের সিপাহী ও পুলিশে মিলে দুসাদদের বকরা-বকরি কেড়ে নিয়ে যায় রাজাসাহেবের অতিথি অভ্যর্থনার জন্য। তখন বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত দুসাদ বুঝতে পারে-

> "ভিখারীর মৌল অধিকার যে বারবার ক্ষুন্ন হয়? রাজাসাহেবের ক্ষতিপূরণ মেলে, ভিখারীর মেলে না কেন?"[১৮]

তাহলে মৌল অধিকার শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য। সম্পত্তির অধিকারও তো মৌল অধিকার, তাহলে ভিখারি দুসাদ কেন ক্ষতিপূরণ পায় না? এই প্রশ্ন শুধু দুসাদদের নয়। দুসাদদের মতো প্রতিটি দলিত, ব্রাত্য মানুষের যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত, উচ্চবর্ণের শাসন-শোষণে জর্জরিত। দুসাদদের ক্ষত-বিক্ষত মুখে চিহ্ন থেকে যায়, মৌল অধিকার রক্ষার প্রথম ও শেষ প্রতিবাদের। লেখিকা তাই গল্পের শেষে ব্যঙ্গের ঢঙে বলেছেন -

> “ভিখারী দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, তিন নম্বর মৌল অধিকারের প্ররক্ষা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার। ও যাতে জন্ম-জন্মকাল ভিখমাঙাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান তা নিশ্চয় দেখবে।”[১৯]

তাই নির্যাতিত দুসাদ প্রতিকারের পথ খুঁজে না পেয়ে ভিখারী বৃত্তি অবলম্বন করে। আসলে উচ্চবিত্ত সমাজ কোনোদিনই নিম্নবর্গীয়দের উঠতে দেবে না, তাদের পথের বাধা হয়েই থাকবে এবং শোষণ করে যাবে। এই বাধার প্রতিকারের পথ না দেখালেও, লেখিকা সেই শোষণ যন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন এই গল্পে।

গল্পগুলির এজাতীয় পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়- অন্ত্যজ বা দলিত সমাজের কণ্ঠস্বর মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলিতে উঠে এসেছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্তিটাকে প্রতিফলিত করার জন্য। অলোক রায় তাঁর ‘ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন’ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন –

> “ছোটগল্প হিসেবে অনবদ্য কিন্তু শুধু গল্প শোনানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। আগুন জ্বালানো, পথ দেখানো, মানে খুঁজে বার করার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সাধনে এসব গল্প বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় কীর্তি।”[২০]

এই আগুন প্রতিবাদের আগুন, প্রতিরোধের আগুন। স্বাধীনতার পরও যখন দেশের মানুষ তাদের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে সূর্য সমান ক্রোধই বেরিয়ে আসে। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে বঞ্চিত মানুষের জীবনবাস্তবতা পাঠককে যেন এক অজানা মহাদেশে নিয়ে যায়। হতবিহ্বল পাঠক মানস জাগরনের তীব্র বেদনাকে ধারণ করে অনাবিষ্কৃত মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতিতে সিক্ত হয়।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথাগত গল্প লেখার পরিবেশকে দূরে সরিয়ে সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, দলিত মানুষের হৃদয়বিদারক কথা মহাশ্বেতা দেবী তার ছোটগল্পে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা ভিন্নমাত্রা দান করেছে বাংলা সাহিত্য জগতের ছোটগল্পকে। যে বাস্তব চিত্র আমরা অন্য কোন গল্পকারের গল্পে এতটা বিস্তৃতভাবে পাই না। তাই সমাজের পতিত, বঞ্চিত, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ইতিহাস জানতে হলে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প অধ্যয়ন আবশ্যক।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বই মেলা, ২০০১, পৃ. ৯৪
২. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ২৯
৩. ঐ, পৃ. ৩৮
৪. ঐ, পৃ. ৩৮
৫. ঐ, পৃ. ৩৯
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বই মেলা, ২০০১, পৃ. ১৫৭
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬
৮. ঐ, পৃ. ৫৮
৯. ঐ, পৃ. ৮৬
১০. ঐ, পৃ. ৮৮
১১. ঐ, পৃ. ৯০
১২. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র- ১০’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪০৬
১৩. ঐ, পৃ. ৪০৭
১৪. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ১০
১৫. ঐ, পৃ. ১৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. ঐ, পৃ. ২৮
১৭. ঐ, পৃ. ২৮
১৮. ঐ, পৃ. ১৩১
১৯. ঐ, পৃ. ১৩২
২০. রায়, আলোক, ‘ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন’, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৭, পৃ. ২৪৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 217 - 225
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প : জীবন ও বাস্তবতা

দিব্যেন্দু বেজ
Email ID : dibyendubej1404@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
life and values, existence, humiliation, complication, economic hardship, middle class.

Abstract

The socially conscious fiction writer of the seventies, Shyamal Gangopadhyay, has given space to the reality of the helplessness that second World War brought to people's lives. Important issues such as the crisis of the post-war period, doubts, the hard struggle caused by partition, economic hardship, the crisis of values of the middle class, etc. have emerged in his literature. Shyamal Gangopadhyay has seen people, understood the world and he discovered himself in various ways. Just as he wanted life and the world, people and nature appeared to him with diverse resources which he developed his own perspective. The pain, regret, mental inclinations, and complications of modern life were not avoided in his stories. This article has tried to discuss the way in which life narratives or life thoughts have emerged in his works by adopting the events of a few selected stories. The characters in the story seem to be alive in the author's own characteristics. The life story has been revealed through this. Some selected stories are like 'Sakshi Dumur Gacha', 'Urbarashakti', 'Dakhal', 'Pari', 'Nishithe Sukumar', 'Adbhut Baganer Chashi' etc. In the story 'Sakshi Dumur Gacha', we see how inhumane the behavior of sons towards helpless parents is in modern society. Shyamal Gangopadhyay talks about the terrible inhumanity and degradation in the story 'Sakshi Dumur Gacha'. In the story 'Urbarashakti', the story of a middle-class helpless man is told among the characters of welfare. Along with this, the reproduction of cats from the fox or tiger group and the birth of the grandson of one of the narrators from the monkey group bind animals and humans in a thread. In the story 'Dakhal', he has left the huge population of city life and chosen that part of the town where the wind of modernity has just blown. Shyamal Gangopadhyay has highlighted this changing human and non-human world in the story 'Dakhal'. The context of the story 'Pari' is the belief tendency of people. The belief that things match. The belief that Bipin Biswas brings down fairies. And the story revolves around the belief in bringing down fairies. The story is presented in the description of some small incidents. In this way, Shyamal Gangopadhyay has highlighted the life story in his various stories and has highlighted the existence, humiliation, and crisis of man in the weaving of the story, and this will be an attempt to reveal this in the article under discussion.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

"মন রে কৃষি কাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা" – (রামপ্রসাদ সেন)

সামাজিক দোলাচলতা, আর্থিক অ-স্বচ্ছলতা, রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা, তার মাঝে মানবরূপ 'জমিন' এ সোনা ফলানো। প্রায় সম্ভব না হলেও অনেকটাই সম্ভব। যদি ব্যবহারের কৌশল বা বিদ্যাটা জানা থাকে সঠিক। না হলে চাণক্য হয়তো বলবেন - 'অবিদ্যাজীবনং শূন্যং দিকশূন্যান চেদবান্ধবা'।[১] কিন্তু যে ব্যক্তি শিক্ষিত, যার বন্ধুর কোনো পরিসংখ্যান নেই, তার কি কোনো শূন্যতা বা অভাব থাকে না! আশা করি থাকে। কারণ মানুষের শূন্যতা তৈরি হয় তখনই, যখন মানুষ কী চায়, আর কী না চায়, সে সম্পর্কে থাকে অজ্ঞানতা। আসলে চাওয়া, না-চাওয়া এবং পাওয়া, না-পাওয়ার ভিড়ের কতটুকু ফাঁক দিয়ে নিজের কর্তব্যের পা ঠিক ঠিক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে জীবনের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকবে, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মানুষ। আর বুঝে উঠতে পারেনা বলেই এক শরীর বহু মন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। গ্রহণ করে ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত। মানুষ নিঃসঙ্গ, নিরুপায়। সমাজ পরিবারের বোঝা ঠেলতে ঠেলতে জীবন টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এই টুকরো হয়ে যাওয়া এক একটা জীবনের গল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব জীবন বিচিত্র। ১৯৩৩ সালের ২৫শে মার্চ বর্তমান বাংলাদেশের খুলনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কৈশোর থেকে জীবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বেশিটাই কেটেছে কলকাতায়। কলকাতায় এসে পড়াশোনা, পরে ছাত্র রাজনীতিতে যোগদান। রাজনীতি করার অপরাধে কলেজ থেকে বিতাড়িত হলে বেলুড়ে একটি ইস্পাত কারখানায় গা পুড়িয়ে আড়াই বছর চাকরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে আশুতোষ কলেজ থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হন। পরে সংবাদ প্রতিষ্ঠানে লেখালেখির পাহাড় গড়েছেন। প্রথমে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দেন ১৯৫৮ সালে। এই পত্রিকার 'ভূমিলক্ষ্মী'-র পাতায় 'বলরাম' ছদ্মনামে লিখতেন। পরে ১৯৭৭-এ আসেন 'যুগান্তর' পত্রিকায়। তারপর ১৯৯০ থেকে আমৃত্যু 'আজকাল'-এ। চম্পাহাটিতে বসবাসকালে কিছুদিনের জন্য ডেলিপ্যাসেঞ্জারের জীবন, তা না হলে জীবন ও জীবিকার সূত্রে কলকাতাতেই বাস। আবার কখনও তিনি মহানগরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে সুন্দরবনে জনপদের মধ্যে বসবাস করতে চলে গেছেন। নিজের হাতে চাষবাস করে, জোতদার চাষি হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি হয়ে গেছেন অক্ষরজীবী মানুষ। পত্রিকা সম্পাদনা, সাংবাদিকতা সব কিছুই তিনি করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে দেখেছেন। জগতকে বুঝেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যত খনন করেছেন তত তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন নানা ভাবে। তিনি যেমন ভাবে এই জীবন ও জগতকে চেয়েছিলেন, তেমন ভাবেই মানুষ ও প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিল তাঁর কাছে। যা নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। নিছক কলমজীবী না হয়ে থেকে তিনি জীবনকে ঘেঁটেছেন, বারবার ভেঙ্গেচুরে নতুন করে তৈরি করেছেন। যা করতে গিয়ে আধুনিক জীবন যন্ত্রণা, আক্ষেপ, আফসোস, মনের প্রবৃত্তি, জীবনের জটিলতা কিছুই এড়িয়ে যায়নি তাঁর গল্প-উপন্যাসে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেছেন -

"শ্যামলের গল্পে জীবনের গভীর গভীর রহস্যের কথা আছে, যাকে দর্শন বলা যায়।"[২]

নিবাচিত কয়েকটি গল্পের চরিত্র ও ঘটনা প্রসঙ্গ অবলম্বন করে, তাঁর রচনার মধ্যে জীবন আলেখ্য বা জীবন ভাবনার ছবি উঠে এসেছে তাই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে। গল্পের চরিত্রগুলি যেন লেখকেরই বিভিন্ন সত্তার বিভিন্ন রঙে হয়ে উঠেছে সজীব ও সরস। যা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের গল্পের জীবন আলেখ্য।

'সাক্ষী ডুমুর গাছ' শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি গল্প। বৃদ্ধ অসহায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের আচরণ যে কতটা অমানবিক, আধুনিক সমাজে তা আমরা দেখতে পাই। এমনকি সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেও তাঁদের বৃদ্ধাশ্রমে বা অজানা পথে ছেড়ে দেওয়ার মতো ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক ঘটনাও আমাদের অজানা নয়। যা সংবাদপত্র কিংবা খবরে প্রায়শই শোনা যায়। এই ভয়ঙ্কর অমানবিক ও সমাজের অবক্ষয়ের কথাই বলেছেন গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তাঁর 'সাক্ষী ডুমুর গাছ' গল্পে। 'সাক্ষী ডুমুর গাছ' এমনি একটি গল্প যেখানে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যক্তি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষের অসহায়তাবোধ, সমাজের অবক্ষয় এবং চরম জীবন সত্য। এক অসহায় বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যের সাক্ষী হল 'সাক্ষী ডুমুর গাছ'। গল্প কথকের মেসোমশাই একজন কমিশারিয়েটের ক্লার্ক। মেসোমশাইয়ের সংসারের প্রতি দায় দায়িত্ব যাবতীয় আচরণ কথকের মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কথকের মফঃস্বল জীবনের ভালোমন্দ মিশে থাকলেও মেসোকে তিনি কখনও ভোলেননি। মাসির মৃত্যুর পর মেসোকে জীবন নির্বাহের জন্য নির্ভরশীল হতে হয় তার ছেলে মেয়েদের উপর। মেয়ে লতিকা তার শ্বশুর বাড়িতে বাবাকে নিয়ে গেলেও, তার অর্থ লোভের দিকটি গল্পে স্পষ্ট হয়েছে। মেসোর অসহায় অবস্থার সাক্ষী ছিল ডুমুর গাছটি সঙ্গে গল্প কথক। মানুষের দীর্ঘতম শৈশব জীবন বাবা মায়ের প্রতি অধিক নির্ভরশীল হলে, মানুষের মনে জন্ম নেয় প্রতিশোধ স্পৃহা, পুত্র কন্যার তার সঙ্গে এরূপ অমানবিক আচরণে বৃদ্ধ মেসো তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ডুমুর গাছটির দিকে তাকিয়ে মেসো কথককে জীবন সম্পর্কে এক ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন -

> "অনেক দিন ধরেই জানি- আমরা কারও নই। তোর মাসি যে চলে গেছে দু'বছর – আর কি কোনো বন্ধন আছে আমাদের সঙ্গে তার? কিচ্ছু নেই। মায়ার বশে আমরা হাসি- কাঁদি।"[৩]

অর্থাৎ তাঁর জীবনেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই চেনা জীবন সত্য, সেই চিরবাণীই বয়ে চলেছে- 'পৃথিবীতে কে কাহার!' – তাই তো রতনকে ছেড়ে পোস্টমাস্টারের চলে যাওয়া। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। জীবন তৃষ্ণা শুধু মেসো কেন, সকল মানুষকে বাঁচতে শেখায়। সে জন্যই হয়তো খাদের পাশে চাঁদ এবং গঙ্গার ধারে চিতা কাঠ ডাকলেও শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন - 'যাবো কিন্তু, এখনি যাবো না'। কিন্তু শেষমেশ ছেলে মেয়ের কাছে বৃদ্ধ পিতা-মাতার মৃত্যুই কাম্য। যেটুকু আদরযত্ন, দেখভাল বা সৌজন্যবোধ পিতা মাতার প্রতি, শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভেই। আলোচ্য গল্পে বৃদ্ধ হলেন গল্প কথকের মেসো, যার অসহায়তাকে কাজে লাগাই তার সন্তানরা শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভে। এই অসহায়তা শুধু মেসোর একার নয় এ অসহায়তা সমগ্র বৃদ্ধ পিতার। মেসো তো শুধু প্রতীক মাত্র। বৃদ্ধ মেসোকে তার মেয়ে সমস্ত সম্পত্তি নিজের করে এক গন্তব্যহীন অচেনা দেশের উদ্দেশে ট্রেনে তুলে দেয়। অর্থাৎ মেসোকে যেন ঠেলে দেয় জীবনের অন্ধকারময় জগতে। যে জগৎ থেকে মেসোর ফেরার কোনও রাস্তা নেই। 'সোনালি দুঃখ'-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন -

> "একজন স্বাধীন মানুষের দু'রকম সম্পত্তি থাকে, নিজের শরীর আর তার জমি।"[৪]

আলোচ্য গল্পে অসহায় বৃদ্ধের 'শরীর' এবং 'জমি' এই দুই সম্পতি তার সন্তানরা এককথায় কেড়েই নিয়েছে। অর্থাৎ শেষ বয়সে পিতার জীবনের যে পরিণতি হয় বা হতে পারে মেসোর জীবন দৃষ্টি বা জীবন ভাবনার মাধ্যমে গল্প কথক তুলে ধরেছেন। সঙ্গে ছেলে মেয়েদের মোহকেও। আলোচ্য গল্পে সমকালীন দৃষ্টিকোণে যে সমাজের অবক্ষয়কে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তুলে ধরতে চেয়েছেন যা শুধুমাত্র সমকালীন সময়েই নয়, আজ একুশ শতকের ত্রিশ দশকেও সমান প্রাসঙ্গিক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উর্বরাশক্তি' অপর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। যেখানে তিনি নিরুপায় মানুষের কথা বলেছেন, যার মধ্যে কল্যাণ হল একজন। কল্যাণের মাধ্যমে গল্পের সূচনা হলেও, এটি মূলত একটি বিড়াল জুটির সম্পর্ক যাপনের গল্প। কল্যাণ সেখানে দর্শকমাত্র এবং আমরা কল্যাণের সহদর্শক। একটি বিড়াল নারী, অন্যটি হুলো পুরুষ বিড়াল। বিড়ালটি কল্যাণের বাড়ির আবাসিক বাসিন্দা হলেও, হুলোটি বহিরাগত। কল্যাণের বারান্দার বাগানেই তাদের আলাপ পরিচয়। বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় দুজনের দেখা হয় কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে। হুলো বহিরাগত হলেও আচরণে সে উদ্ধত এবং স্বাধীনচেতা। তার হাবভাব এমন 'পৃথিবীটা যেন ওদের দুজনের। মানুষজন সব আসলে বেড়াল'। কল্যাণের দৃষ্টিতে 'আহার, বিহার আর মৈথুনে পারদর্শী একজন উচ্চশ্রেণীর বিষয়ী'। সে হুলোটির নাম দেয় 'প্রিয়গোপাল বিষয়ী' আর বিড়ালটির নাম রাখে 'রাধারানী'। ওদের প্রথম দুটো বাচ্চা হয়, একটি পুরুষ ছানা, অন্যটি মেয়ে ছানা। দুটো বাচ্চাই দুর্ঘটর্ঘনায় মারা যায় দুজনের দুটো কার্যকারণে। একটা পুরুষ বাচ্চাকে হুলো খেয়ে ফেলেছিল। অন্যটি অর্থাৎ মেয়ে বাচ্চাটি মায়ের দাঁতের চাপে মারা যায় এঘর ওঘর করতে গিয়ে। কিন্তু হুলোর পুরুষ বাচ্চাকে খেয়ে ফেলার পেছনে কারণটি ছিল অন্য। হুলো জানত যুগের রীতি অনুযায়ী পুরুষ ছানা বড় হয়েই মায়ের সঙ্গে শুয়ে পরতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে গল্প কথক

আসামের চা বাগানের ম্যানেজার সি জি অ্যালেন-এর সঙ্গে কল্যাণের কিছু কথাবার্তা সংলাপ বদ্ধ করেন। তার কিছু অংশ তুলে ধরছি-

> "অ্যালেন আচমকাই মাঠের একপাল গরু দেখিয়ে বলল, আমি ওদের রেইজ করেছি। সব আর্টিফিসিয়ালি। গাভিন হবার পর ওদের আলাদা করে দিই। বাচ্চা হলেও আলাদা করি। পাহারায় রাখি।
> -কেন?
> -ছেলেই হয়তো বড় হয়ে মা-তে উপগত হলো। সেটা কি ভালো?
> -ওদের নরমস তো আলাদা।
> -আমি ওদের সিভিলাইজড করছি।
> পরে কল্যাণ এই সমস্যায় প্রিয়গোপালের বিবেচক ও তড়িৎ ভূমিকার একটা মানে খুঁজে পেয়েছে।"[৫]

অর্থাৎ গল্পকার এখানে কোথাও যেন ইদিপাস কমপ্লেক্স-কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যা সম্পর্কে হুলো এবং ম্যানেজার অ্যালেন দুজনই সচেতন, দুজনই বিজ্ঞ। ক্রমে কিছুদিন পর রাধারানীর পেট মোটা হয় আবারো। পনেরোই জুন রাধারাণীর আবার একটি খোকাও খুকি হয়।

> "সে কাউকে ছানা দেখাতে চায় না। তাই আলনার শেষ র‍্যাক থেকে বুকর‍্যাকে যায়। বুকর‍্যাক থেকে জুতোর বাক্সে!"[৬]

বাচ্চাদের জন্য সে খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়। ক'দিন পর বাচ্চারা একটু বড় হয়ে উঠলে দুটোতে মিলে খেলাধুলো করে। রাধারানী মাছের কাটা মুখে নিয়ে বাচ্চাদের ডাকাডাকি করে। মায়ের ডাক এমনি মমতাময়ী। কিন্তু পুরুষ চরিত্র! প্রিয়গোপাল মশাই বাচ্চা হবার পর থেকে রাধারাণীকে কাছে পাচ্ছে না। সে কল্যাণের বারান্দার লাগোয়া পাঁচিলে এসে রাধাকে ডাক দেয় 'এই রাধা। আয়। যাবিনে?' রাধারানী কোন জবাবই দেয় না। বাইরের লোকে হুলোর যে ডাক শোনে, সে ডাক আদেশের। যখন সে ডাক একটু খাদে নামে সেটা হলো আশাভঙ্গের। সে আবারো ডাকে আয় হৈমি ডাক্তারের বাড়ির ছাদে যাই। ও-বাড়ি আজ চতুর্থী। মৎস্যমুখী হচ্ছে। আয় বলছ- কাজ হলো না তাতেও। তারপর মাঝরাতে প্রিয়গোপাল একদম ঘরের ভেতর এলো। জানালা গলে। হিসেব নেওয়ার ভঙ্গীতে। ... প্রিয়গোপাল বাঘের ভঙ্গিতে মেঝেতেই বসলো। দু হাত দুরে রাধারানী একই ভঙ্গিতে বসা। মাঝখান খোকাখুকু খেলছে। রাধারানী মিনতি করে দীর্ঘ ম্যাঁও ধ্বনি দিয়ে অনুরোধ করছে এবার যেন বাচ্চাদের না খায়। অন্ধকারেও কল্যাণ দেখতে পায় চারজনের আট জোড়া চোখ। বাপ এবং খাদক হিসেবে প্রিয়গোপালের সহনশীলতা কল্যাণকে মুগ্ধ করে। কেননা প্রিয়গোপাল এদেশের ভোটার নয়। নাগরিক নয়। যদিও সে এখানকার জল হাওয়ায় বড় হয়েছে। আচার আচরণের জন্য সে দেশের আইনের কাছে দায়বদ্ধ নয়। সে চাইলে সবার সামনে রাধারানীর উপর উপগত হতে পারতো। এই বর্ণনাটুকু পড়তে পড়তে মানুষ হিসেব মানব সমাজের সাথে তুলনাটা আপনাতেই চলে আসে। লেখকও চেয়েছেন সেটাই। বাড়িতে একটি অতিথি আছে। কল্যাণের মেয়ে এসেছে। তারও বাচ্চা হবে। কল্যাণের স্ত্রী মেয়ের সেবা নিয়ে ব্যস্ত। বাচ্চা হবার আগে বেড়ালছানা দুটো পার করতে হবে। নইলে মানুষের বাচ্চার অনিষ্ট হবে। কল্যাণ তার নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবে। কোথাও কোথাও সে হুলোটার চেয়েও অসহায় পরাধীন। হুলোটি যতটা স্বাধীনভাবে রাধারানীর কাছে যেতে পারে, সে পারে না তার রাধারাণী বিজয়ার কাছে প্রত্যাখ্যানের দাপটে। তবু তার একটি মনোবেদনা প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনার ছাপ রেখে যায় গল্পের শেষাংশে পৌঁছে। অনন্য শংকর দেবভূতি তাঁর 'শ্যামলের গল্পের বিষয় আশয়' প্রবন্ধে বলছেন-

> "উর্বরাশক্তি' গল্পে কল্যাণ নামক এক মধ্যবিত্তের জীবনের পরিচিতি অসাধারণ মুন্সীয়ানায় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে বয়সে ঘুম কম আসে, রিটায়ারের বাকী থাকে তের বছর- স্ত্রী আলাদা শোয়, পেচ্ছাপ কম হয়, এমন একটা মানুষ, যে বেঁচে থাকে একই সমাজে নিরুপায় ও কিছু মনুষ্যেতর প্রাণির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সঙ্গে। একটা মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব নিকেশগুলো এত সহজ গদ্যে হয়তো অন্য কোন গল্পে লক্ষ করা যায় না।"[৭]

মানব সমাজ এবং বিড়াল সমাজের নিজস্ব যে জীবনবোধ বা জীবন আলেখ্য থাকে এবং তা থাকা দরকার, সেটা একটা তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আচরণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সরস এবং সহজ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

পরবর্তী আলোচনার গল্প 'দখল', অন্যতম গল্পগুলির মধ্যে একটি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নগরজীবনের বিপুল জনবসতি ছেড়ে, জনপদের সেই অংশকে বেছে নিয়েছেন, যেখানে সবে মাত্র লেগেছে আধুনিকতার হাওয়া। এসেছে বিস্বাদময় জীবনে একটু স্বাদ। একদিকে চিরাচরিত স্থির গ্রাম, অন্যদিকে নিঃশব্দে কলকাতার এগিয়ে আসা। ফলে বদলে যাচ্ছে জনপদের চেহারা ও তার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ। আর এই বদলে যাওয়া মানুষ ও মানুষেতর পৃথিবীর কথা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শুনিয়েছেন 'দখল' গল্পের শুরুতে। যেখানে আমরা দেখতে পাই - রেলষ্টেশন, রেল লাইন ন্যাশালাইজেশন, ব্যাংক। প্রধানত সুন্দরবনকে আমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু তেমনভাবে অভ্যাস করান নি। তিনি পুরাতনকে নতুনভাবে দেখিয়েছেন, নতুন করে চিনিয়েছেন। গল্পের কাহিনি বর্ণনা হয়েছে মূলত বাদা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। যেখানে পরিশ্রমই একমাত্র মূল মন্ত্র। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রম শেষ সন্ধ্যেয় নিয়ে আসে অবসাদ ও ক্লান্তি। যা ঘিরে তৈরি হয় অবসর। সেই অবসর ওদের জীবনে নিয়ে আসে 'এন্টারটেনমেন্ট'। আধুনিক নগর সভ্যতার ছোঁয়ায় তাদের আদব কায়দা, রীতিনীতি, আচারবিচার- সব কিছুর পরিবর্তন হতে দেখা যায়। যেমন 'লিভ টুগেদার', কথাটা বিদেশি হলেও, আমরা কমবেশি সকলেই এর সঙ্গে পরিচিত। 'দখল' গল্পের দাক্ষী আর ভবেন। এদের সম্পর্কটা আসলে কী? তা স্পষ্ট নয়। বাকদত্তা বা স্বামী-স্ত্রীও না। কিন্তু থাকে এক সঙ্গে। তাই হয়তো আধা ডাকাত, আধা চোর, সদ্য জেল ফেরত সন্তোষ টাকির অবাধ প্রবেশ দাক্ষীর জীবনে। যে আদিমতা পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে। যে আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'। আদিম সংঘাত, সংঘর্ষ, রক্তপাত। এক নারী দুই পুরুষ সভ্যসমাজের বিশ্বাসের বাইরে। সেজন্যই –

> "স্টেশনমাস্টারের বউ পোস্টমাস্টারের বউকে বলল, চলুন না দিদি- দুজন পুরুষ একজন মেয়েছেলের দখল নিচ্ছে কি করে, দেখে আসি একবারটি।"[৮]

দুই পুরুষ এক নারীর অধিকার, সাপের শঙ্খ লাগার প্রতীক। গল্পের দুই পুরুষ ভবেন ও সন্তোষ টাকি'র লড়াই আসলে সাপের শঙ্খ লাগার সংকেতকে বহন করে। লড়াইয়ে যে জিতবে তার অধিকার হবে স্ত্রী সাপের সঙ্গ লাভের। সেকারণে ভবেন ও সন্তোষ টাকির লড়াইয়ের দৃশ্য আমরা গল্পে দেখতে পাই। কারণ লেখকের জীবন ভাবনায় এটাই স্বভাব, এটাই আদিম। আর গল্পের যে সাপ, তার অর্থ সৃষ্টি। 'অজস্র বীজ থেকে যেমন ফসলের প্রাচুর্য, তেমনই অসংখ্য সাপের ছানা যেন এক উদ্যম সৃষ্টির সম্ভাবনা।' সেজন্যই বুড়োবুড়ি দুই সাপের কাছ থেকে সাপের বাচ্চা, নাতি নাতিন সকলকে বাঁচাতে আশু'র আগমন। লেখক যেন হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর ফিরে আসার সংকেত দিচ্ছেন। সংকেত দিচ্ছেন আদিম সমাজে ফেরার। না হলে সন্তোষ টাকি বারবার কেন বলবে 'তুই কে দাক্ষী, তুই আসলে কে?' দাক্ষী হল পৃথিবীর সেই আদি অংশ, সভ্যতার আলোর অংশটুকুও যেখানে পৌঁছায়নি। অন্যভাবে বললে পৃথিবীর সেই আলোকিত জগৎ যাকে আধুনিক সভ্যতা ছুঁতে পারেনি। আসলে লেখক বইয়ের মার্জিনের বাইরে দাঁড়িয়ে শনাক্ত করেন মানুষের আদিমতা লোভ, কাম, দখল, সংস্কার। যা ঘিরে তৈরি হয়েছে গল্পের জীবন ভাবনা।

পরবর্তী গল্প 'পরী'। 'পরী' গল্পের প্রেক্ষাপট মানুষের বিশ্বাস প্রবণতা। যে বিশ্বাস বস্তু মেলায়। যে বিশ্বাস বিপিন বিশ্বাসের পরী নামায়। আর পরী নামানোর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই গল্পের আবর্তন। কিছু ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনায় পরিবেশিত হয়েছে গল্পটি। লেখক এবং লেখকের পরিবার। লেখকের চাকরি জীবন। প্রতিবেশ-পরিবেশ। এইরকম কিছু চিন্তাশীল ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে গল্পে বিপিনের পরী নামানোর ঘটনাটি। গল্পের বিপিন বিশ্বাস একজন বেহালা বাদক। যা থেকে নিজের জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু পরী নামানোর ঘটনাটি তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন এবং চেষ্টাও করেন অন্যদের বিশ্বাস করানোর। গল্পে তিনটি শরীরী চরিত্র, একটি অশরীরী। বেহালাবাদক বিপিনবাবু, লেখক বা কথক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং লেখকের স্ত্রী মিলে তৈরি হয়েছে গল্পের 'একটিভ' চরিত্র। এবং পরী এক কল্পিত নারী চরিত্র। যে বিপিনের দৃষ্টিতে এক, লেখকের দৃষ্টিতে অন্য এক। যে বিপিন 'মাঘী পূর্ণিমায় সারারাত দিঘির পাড়ে বসে বাজাতে পারলে পরী নামানো যায়' - তে বিশ্বাসী। যা হয়তো কখনই সম্ভব না। কিন্তু অবাস্তবকে বাস্তব ভাবার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে বিপিন চরিত্রটির। যিনি প্র্যাক্টিকল কিন্তু অলৌকিক। তিনি বেহালাবাদক, কিন্তু যা পাওয়ার বিরুদ্ধ তাকেই পেতে চান। লেখক ঠিক বিপিনের বিপরীত। তিনি সৌখিন, কিন্তু স্বচ্ছল নন। তাঁর স্ত্রী তাই তো গঞ্জনা করেন –

> "কোনও কাণ্ড জ্ঞান যদি থাকে। ক'পালি চাল আছে ঘরে শুনি? রোজ রোজ লোক ধরে আনা চাই-।"[৯]

অন্যদিকে তিনি সচেতন, কিন্তু লোভী নন। তিনি বোঝেন ঠিক ভুলের পার্থক্য। কিন্তু ধরিয়ে দেন না, ঠিক কোনটা আর ভুল কোনটা। কারণ গল্পের শেষে বিপিন যে পরীকে দেখে, সে আসলেই কোনো পরী না, তা জানা সত্বেও বিপিনের ভুল তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেন। আসলে পরী আসে বিপিনের কল্পনায়, আরামদায়ক চিন্তা হিসেবে। 'আমার শ্যামল' গ্রন্থে ইতি গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন-

> "বেহালা বাজিয়ে জোছনা রাতে যিনি পুকুর থেকে পরির উঠে আসা আমাদের দেখিয়েছিলেন। আসলে বিপিনবাবু আমাদের দেখাতে পারেননি কিছুই। দেখেছিলেন উনি নিজেই, পরিকে কল্পনায়। কিন্তু তাঁর কল্পনার এত জোর ছিল যে শ্যামল নিজেই ওই 'পরী' গল্পে সেই রাতটিকে ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য হল।"[১০]

উদাসীন পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরী একটি উপশম। বিশেষত চেতনাগত সংঘাত, বিশ্বাসের সংঘাত বা লেখকের মানবিক দ্বন্দ্ব গল্পের বিষয়বস্তুকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। কারণ আমাদের সব কিছুতে বিদেশি স্পর্শ না থাকলে বুঝি বিশ্বাসের চৌকাঠ পার হতে পারে না। 'পরী' গল্পে বিপিন বিশ্বাস বেহালা বাজিয়ে পরী নামানোর কথা বললে, এটা শহুরে মানুষের কাছে হাস্যকর মনে হতেই পারে, কিন্তু বিপিনের কাছে এটা গভীর বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের ভিত বড়ো শক্ত। যে বিশ্বাসে কথকের প্রায় তরুণী বধু জড়িপাড় কালো শাড়ি পরে বাগানে জ্যোৎস্না রাতে নীলাম্বরী পরী হয়ে এসে দাঁড়াতেই বিপিনবাবুর বেহালার ছড়ের টানে বেহাল পরী ধুলোর বাস্তবতায় নেমে আসে। বিশ্বাসযোগ্য সেই আবির্ভাব, এমন কি তা সম্ভবপর বলেও প্রতীয়মান হয়।

'নিশীথে সুকুমার' গল্পে চাকুরীজীবী উদাসীন পুরুষের ছবি উঠে এসেছে। সুকুমার একজন মধ্যবৃত্ত চাকুরে। সারাদিনের ব্যস্ততা কাটিয়ে মানসিক চাপমুক্তির জন্য প্রতিদিনের মতোই নেশা করে বাড়ি ফেরা সুকুমারের অভ্যাস। কিন্তু নিত্য দৈনন্দিন এই অভ্যাসে তার পরিবার অশান্ত ক্লান্তও। সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে করতে জীবনের হাসি গম্ভীরতা অনেকসময় খুনি ও গরুর মতো নির্বোধতায় পরিণত হয়। সেকারণে তেতাল্লিশ বছরের সুকুমার সংসারে যেন এক পুতুলে পরিণত হয়েছে। তাই হয়তো আলমারির আয়নাটার সামনে উলঙ্গ হয়ে নাচ শুরু করে দেয়। নাচতে সুকুমারের ভালো লাগে। কারণ নাচ আমাদের ধর্ম এখন। এই নাচ সুকুমারের মতো আমরাও কি নিত্যদিন নেচে চলছি না? এই প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ –

> "ব্যক্তিমানুষের মনের শূন্যতাবোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করার দুর্নিবার বাসনা থেকেই পাশ্চাত্ত্যে অস্তিত্ববাদ নামের দার্শনিক তত্ত্বটি জন্ম নিয়েছিল উনিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধের মধ্য ভাগে। অস্তিত্ববাদ 'বেঁচে থাকা' অর্থাৎ অর্থহীন ভাবে জীবন যাপনের কথা বলে না, বলে 'অস্তিত্বশীল' হওয়ার কথা।"[১১]

ন'হাজার টাকা বেতন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব, পূর্বভারত, ব্রজেনশীল নিয়ে আলোচনা- শিক্ষিত মধ্যবৃত্ত পরিবারের বিচিত্র নিয়ম। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবন সংসার সন্তান জন্ম – এটা যেন একটা সিস্টেমের মধ্যে এসে পড়েছে। স্বামী স্ত্রীর শাসনে ঢোকার চেষ্টা করছে অবমাননা- গালিগালাচ। 'বেলার মুখে এসেছিল শুয়োর। কিন্তু স্বামীকে কোনোদিন এসব কথা বলেনি বলে আস্তে বলল, বিচ্ছিরি।' মেয়ের কাছ থেকে আসে মুখ গঞ্জনা। এই সমস্ত সহ্য করে নেওয়া সুকুমারের মতো সমস্ত পুরুষ জাতির ধর্ম হয়ে উঠেছে। সুকুমারের উলঙ্গ হয়ে নাচার মতো অস্বাভাবিক কাজকর্মে স্ত্রী হয়ে ওঠে প্রাচীনমূর্তি। যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাচীনমূর্তি – বাজার করে। সংসার করে। ছেলে মেয়ে পড়ায়। রেশন আনে। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল তার ধর্ম। একে অপরের সংস্পর্শে জেগে ওঠে সে বোধ। 'সে সুকুমারের ধর্ম নিতে পারে' কিন্তু বাইরের আলো এসে পড়তেই সে সরে যায়। অর্থাৎ স্বামীর নগ্ন নাচ তার সহধর্মিণীকে স্পর্শ করে কিন্তু জাগাতে পারে না। সুকুমার চাই তার এই ধর্ম সবাইকে দিতে, সে কারণে বন্ধু গণেশ ডাক্তারের বউকেও তার ধর্ম নিতে বলবে। অর্থাৎ -

> "অস্তিত্বের এই চূড়ান্ত অর্থহীনতার মধ্যেও শ্যামলের চরিত্রেরা কিন্তু থেমে যায় না। অনির্দিষ্ট গন্তব্যে হলেও তারা এগিয়ে যায় নিজেদের মতো করে। তারা হয়ে ওঠে মানব অস্তিত্বের চলমান ইতিহাসের দিশারী। (কাম্যুর সিসিফাসের কথা মনে পড়তে পারে এই প্রসঙ্গে)। অস্তিত্বের অর্থ তার চিরন্তন এই যাত্রা, কোনও নির্যাসরূপ লক্ষ্যবস্তু নয়।"[১২]

'অদ্ভুত বাগানের চাষি' শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি গল্প। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যা থাকে সুপ্তও। গল্পে তারই বহিঃপ্রকাশ অন্যভাবে। বড়োলোকের প্রবৃত্তিতে কাজের মেয়ের শরীর সমর্পণ। গল্পে সরলা, সিঙঘানি বাড়িতে কাজের মেয়ে হয়ে ঢোকে। সরলার জীবন সরল, হিসেবও সরল। স্বামী নাইট ডিউটি করে। ভীষণ বিড়ি টানে। সে গন্ধ সরলার গায়ে লেগে থাকে। অপর দিকে প্রায় বৃদ্ধ ভরতনারায়ণ যার কাপড়ের কারখানা আছে, উড়োজাহাজ আছে দুটো, আছে মাইনে করা চাকর। সরলা কাজ করে সে বাড়িতে। তার জন্য বাড়ির নিয়মিত পোশাক, যা তাকে এই বাড়ি থেকেই দেওয়া হয়। তাকে বেতন দেওয়া হয় কেটে রেখে তিন হাজার সাতশো। অর্থাৎ চাকর হলেও তাদের পোশাক এবং বেতন সিস্টেম অনেকটাই সরকারি চাকুরি জীবীদের মতো। উদাসীনতাও গল্পে লক্ষ করা যায়। তাই কাপড় কল পুড়ে গেলেও কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। বয়সের অবসরে দায়িত্ব থেকেও অবসরপ্রায়। বড়লোক প্রতিপত্তিশীল পরিবারের যে একটা চালচিত্র তারই প্রতিচ্ছবি গল্পে। সরলা বলে-

> "কত বড়লোক রে বাবা উড়োজাহাজ আছে তাও দুখানা। কারখানা তো আছেই। এবাড়িতে মোটরগাড়িগুলো সব দেদার খেলনার মতো। এত যে টাকা পয়সা কোনও হইহুল্লর নেই। মদ বিড়ি নেই।"[১৩]

কিন্তু সরলার স্বামী দোলের দিন দুপুর করে বাংলা খায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে। আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দুই দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে দুই পরিবারের জীবন ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। একদিকে সরলা ভরত নারায়ণের ভালো দিক এবং তার বড়লোকিয়ানাকে ভালো মানসালোকে ব্যক্ত করেছে। অপরদিকে ভরত নারায়ণ সরলার সহমতে, তার সরল মন ও শরীরের পিপাসী হয়েছে। সরলার সম্পর্কে ভরত নারায়ণের মুখে বেরিয়ে আসে-

> "বেসাহারা। ফুটে কৌড়ি। আনপঢ়। গাওয়ার। বদসকল।"[১৪]

কিন্তু তাতেও তার সরলাকে ভালো লাগে, সরলার শরীরকে ভালো লাগে। কারণ 'কতদিন অল্পবয়সী টনটনে মেয়ে' দেখেনি ভরত নারায়ণ। মানুষ প্রতিপত্তিতে যত বড়ই হোকনা কেনো, শারীরিক চাহিদা যে সর্বত্র লাভ করতে পারবে তা নয়। অনেক সময় সম্মানহানীর ভয়ে সে অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে থাকে। তাই সেসব ছাড়িয়ে সরলার উদ্দেশে ভরত নারায়ণকে বলতে শুনি-

> "আমরা বিয়ে করি চল- আবার নতুন করে জীবন হবে।"[১৫]

প্রয়োজনে সে সরলার স্বামীকেও সঙ্গে নিতে চাই। কারণ জীবনের শেষে ভরত নারায়ণের মনে হয়েছে 'পহলে ম্যায় এক ইনসান হুঁ।'

'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়' গল্পে দেখবো অসাধারণ অথচ আজব চরিত্র অমৃত দাশ পেশায় রিকশা চালক। নারকেলবেড়ে তার বাড়ি। কাজের মধ্যে থাকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে সে নির্জন জায়গায় ভগবানের খোঁজ করে এবং সে

নাকি দেখাও পায়। স্বাভাবিক ভাবে এটা সম্ভব নয় জেনেও কথক শ্যামল গাঙ্গুলি অমৃতের সঙ্গে ভগবান দেখতে বেড়িয়ে যান। সেখানে –

> "অমৃত দিব্যি দু'খানা মাচানের পাশ কাটিয়ে একটা ঢিবি মতন জায়গায় উঠে ডাকল আমায়, চলে আসুন- এখান থেকে ভগবানকে দেখার খুব সুবিধে-।"[১৬]

কিন্তু ব্যবসায়ী শ্যামলবাবুর চোখে ভগবান ধরা দেয় না।

> "অমৃত দেখল ভগবানের এখানে কোনো শেষ নেই। যতই এগোয় ততই বেড়ে যায়। মনটা কিসে ভরে যাচ্ছে... বাতাসে কিসের সুবাস। ...হলুদ ফুল। গুড়ো গুড়ো পরাগমাখানো কেশরগুলি... ভোরের বাতাসে দুলছে... কুঁচো পাখির চেয়েও ছোট দেখাচ্ছে শ্যামলবাবুকে।"[১৭]

অর্থাৎ এখানে ভগবান হল ভেতরের সৌন্দর্যরূপ, ভেতরের অসীমতা। ছোট আমি'র বড়ো আমি'তে উত্তরণ। ছোট আমি এবং বড়ো আমির দ্বন্দ্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এভাবেই বড়ো আমিকে তুলে আনেন। মাচানের পর মাচান ফেলে অমৃতর এগিয়ে যাওয়া বড়ো আমি'র রূপান্তর এবং অমৃতর এগিয়ে যাওয়াতে রিকশাখানা ছোট হয়ে যাওয়া আর রিকশার উপর ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসে থাকা শ্যামল বাবুকে কুচো পাখির চেয়েও ছোট দেখানো অন্তরের ছোট আমি'র বহিঃপ্রকাশ। সাইকেল রিকসা করে ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দিগন্ত প্লাবন করা নিসর্গ শোভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মনে হয় এই বুঝি ভগবান। যাকে অমৃত দেখতে পায়, শ্যামল বাবু নয়। অমৃতর যে বড়ো আমি'র রূপ বুঝতে পারে শ্যামল গাঙ্গুলি। সাধারণের মধ্যে অসাধারণের কারবার।

জীবনের এই গভীর আলেখ্য ও বাস্তবতাকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের পরতে পরতে তুলে ধরেছেন। পঞ্চাশ বা ষাট দশকের গল্পকারদের মধ্যে এইভাবেই একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করে অনন্য হতে পেরেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচিত মার্জিনের বাইরে গিয়ে আসল মানুষটা কেমন, বাস্তবতায় কীরূপ ধারণ করতে পারে, সেটা দেখাতে চেয়েছিলেন কথাকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের মধ্যে।

Reference:

১. কবিরত্ন, শ্রীতারাকুমার (সম্পাদিত), 'চাণক্যশ্লোক', জে, এন, বানার্জি এন্ড সন্, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ১৪
২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পের ভূমিকা' 'গল্পপাঠ', জুলাই-আগস্ট, ২০১৭
URL - https://www.galpopath.com/2017/07/blog-post_84.html
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৫৯
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সোনালী দুঃখ', লাইম্ বুকস্, ঢাকা, পৃ. ১১
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১২৭
৬. তদেব, পৃ. ১২৮
৭. দেবভূতি, অনন্য শংকর, 'শ্যামলের গল্পের বিষয় আশয়', 'গল্পসরণি', 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা এক', জয়শ্রী প্রেস, চতুর্বিংশতিতম বর্ষ বার্ষিক সংকলন ১৪২৬/২০২০, পৃ. ৩৫৮
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৩৯
৯. তদেব, পৃ. ১৭৪
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৩৯
১১. কুণ্ডু, সুরশ্রী, 'শ্যামল আখ্যানের অন্দর-বাহির', 'গল্পসরণি', 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা এক', জয়শ্রী প্রেস, চতুর্বিংশতিতম বর্ষ বার্ষিক সংকলন ১৪২৬/২০২০, পৃ. ৩৬৭
১২. তদেব, পৃ: ৩৬৮

১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৬৫

১৪. তদেব, পৃ. ২৬৫

১৫. তদেব, পৃ. ২৬৬

১৬. তদেব, পৃ. ১৬৪

১৭. তদেব, পৃ. ১৬৯

Bibliography:

ভট্টাচার্য বীতশোক, 'গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়', এবং মুশায়েরা, শারদীয়, ২০০০

হক সাজেদা, 'গল্প নিয়ে আলাপ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প—পরী, 'গল্পপাঠ', পৌষ ১৪২১

URL - https://www.galpopath.com/2015/01/blog-post_10.html

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 226 - 232
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পে নারীর অস্তিত্বের সংকট

অন্নপূর্ণা মাহাতো
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : annapurnamahato073@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Literature, Evolution, Narratives, Struggles, Modernization, Bureaucracy, Feminism, Social Issues, Tapan Bandopadhyay, Recognition.

Abstract
Are Women Truly Independent in the Era of Globalization? Can we confidently claim that women have achieved true independence in today's globalized world? The question remains open to debate. Even in contemporary times, women face existential crises, vividly depicted in Tapan Bandopadhyay's stories like Eklabya's Gurudakshina, Ruperhat, and Bibamisha. In society today, women are still expected to handle household chores, while men are groomed for external responsibilities. From childhood, girls grow up bound by numerous societal norms, a restriction rarely imposed on boys.

Literature, often regarded as a reflection of society, captures these realities. Writers consciously embed societal issues into their works, revealing how deeply ingrained these challenges are. As we progress through the 21st century, it is worth questioning whether our mindset has evolved alongside technological and cultural advancements.

Despite achieving higher education, women often find themselves powerless in the face of patriarchal systems. The exploitative tendencies of such societies continue to harm women, as seen in Rabindranath Tagore's Denapaona, where Nirupama becomes a victim of the dowry system. This tragedy resonates in modern incidents, such as the death of a female doctor in Kerala due to dowry-related violence.

Tapan Bandopadhyay's stories highlight various crises surrounding women's existence, shedding light on the struggles they face and the societal barriers they encounter. The focus of this discussion is to evaluate how these literary reflections align with the realities of present-day society.
The question thus remains: has globalization truly empowered women, or do traditional oppressions persist, masked under modern norms? This thought-provoking inquiry continues to challenge societal complacency.

Discussion

ভূমিকা : পরিবর্তনশীলতায় জীবনের ধর্ম। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাহিত্যের দোরগোড়ায় চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে সাহিত্য রচনার শুভ আরম্ভ হলেও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য নব নব রূপ লাভ করে। উনিশ শতকের প্রথমে গদ্য লেখার প্রচলন শুরু হয়, তারপর নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাসের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্য দিয়ে সাহিত্যের পালাবদল ঘটে। উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে মূলত গার্হস্থ্য সংসারে টানা পোড়েন, প্রেমের গল্প তা মূলত আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্যের নানান পরিবর্তন, পরিমার্জন দেখা যায়। একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় আরো কয়েকজন স্বতন্ত্র লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, অমিয় ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, অমর মিত্র, অভিজিৎ সেন, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত প্রমুখ কথা সাহিত্যিক। তাঁদের লেখায় সংগ্রামী জীবন চেতনা, প্রেম, প্রেম-হীনতার, যৌনতা, মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থপরতা, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জনজাতির কথা, আমলাতন্ত্রের কথা, জাদুবিদ্যার, শ্রমজীবী মানুষের কথা, রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতির কথা উঠে আসে। আধুনিক ছোট গল্পকারদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বনফুলের আরো গল্প' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের উপহারে লিখেছিলেন -

"বর্তমান যুগে সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায়ী থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার কাছে হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা, পরাগাছা, বনস্পতি সবকিছুতেই যে দৃষ্টি যে টান সে কৌতুকের দৃষ্টি। ...আগেকার সাহিত্য চোখ ভুলানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে, তাতেও যে রস আছে সে রস হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজ পড়ানো কনে দেখার মত করে প্রকৃতিকে দেখতে গেলে ঐ রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়; ...জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যই তাদের মূল্যবান করে দেখার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মত বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক।তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে-তোমাদের ভয় পাচ্ছে অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট করে ফেলো।"[১]

উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মনস্কের পরিচয় তাঁর ছোটগল্পগুলির পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসামান্য লেখনীর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ৭ জুন পূর্বতন পূর্ববাংলা খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কলারোয়া থানার দাদা মশায়ের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কলারোয়া থানার চাঁদা গ্রামে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাদেশের বহু হিন্দু তাদের জমিদারি বসতবাড়ি ভিটামাটি বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তপন বন্দোপাধ্যায় মাত্র তিন মাসের শিশু সেই সময় তাঁর ঠাকুরদা গরুর গাড়িতে করে সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে লেখকের বড় হওয়া অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করে বাদুড়িয়া লন্ডন মিশনারি স্কুল থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

লেখকের ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি প্রবল টান ছিল। তিনি সেই সময় থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কাকা সুজিত বন্দোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্যে সংস্কৃত মনস্ক ব্যক্তি। তিনি লেখক কে সাহিত্য রচনায় অনবরত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগান। ১৯৭০ সালে বাদুড়িয়া লন্ডন মিশনারি হাই স্কুলের শিক্ষকতা চাকরি নিয়ে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন, কিন্তু গ্রামের শিক্ষক মশাইদের বেতন ঠিকঠাক না দেওয়ায় সংসারের অভাব অনটন দূর হয় না। এ সময় তিনি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দেন এবং সফল হন। ১৯৭২ সালে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কেরানীপদে যুক্ত হন। এরপর বহরমপুরে কালেক্টর শিক্ষা নবিশ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি জেলা শাসকের আদেশে ভগবানগোলায় বিডিও হিসেবে বদলি হন। বিভিন্ন জায়গায় বদলের সুবাদে নানান অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ২০০২ থেকে ২০০৭ সময়কাল পর্যন্ত তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে সাংস্কৃতিক অধিকারে নিযুক্ত ছিলেন তখন একের পর এক পদোন্নতি হয়। তিনি বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন, যেমন – 'কথাসাহিত্য উৎসব' সূচনা করেন, 'শিশু সাহিত্য উৎসব', 'জীবনানন্দের জন্মদিন পালন', 'রাজ্যস্তরের লোকসংস্কৃতি উৎসব' ১০০টি নাট্য দলকে নিয়ে নাট্যমেলার মতো অনুষ্ঠান। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী' ও 'শঙ্খ সমুদ্র' এই দুটি আত্মজীবনী গ্রন্থ এই সময়ের রচনা করেন।

উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য রচনা করার জন্য ১৯৯৩ সালে 'সাহিত্য সেতু', পুরস্কার, ১৯৯৫ সালের 'সোপান পুরস্কার', ১৯৯৭ সালে 'অমৃত লোক' পুরস্কার পান। 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বঙ্কিম

পুরস্কারে' ভূষিত হন। শিশু সাহিত্যিক রূপে বইমেলার মঞ্চে কিশোর ভারতী পত্রিকার পক্ষ থেকে 'দীনেশচন্দ্র স্মৃতি' পুরস্কার পান এছাড়াও আরো বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন।

অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী তপন বন্দোপাধ্যায় প্রায় ৩০০টির বেশি ছোট গল্প, ৩০টির বেশি উপন্যাস, কিশোর উপন্যাস ১০টি, রহস্য উপন্যাস ১৫/১৬টি, প্রবন্ধ ১০০টির বেশি রচনা করেছেন। তাঁর নিজস্ব বয়ান ছিল –

"ভালো মানুষ হওয়া, ভালো লেখক হওয়া।"[২]

১৯৮৩-৮৪ সালে তপন বন্দোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'ব্যভিচারিনি' ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা প্রসঙ্গে সাহিত্যিক অমর মিত্র একটি মন্তব্য করেন -

"জীবনানন্দের গল্প উপন্যাসে কবি জীবনানন্দের ছায়া গভীর। ...কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গল্প লিখতে শুরু করেন, তার সঙ্গে কবির কোন ছায়াই চোখে পড়েনি আমার। তিনি তার কবি সত্যকে আড়াল রেখেই গল্প লেখা শুরু করেন।"[৩]

সাহিত্য সম্ভারে তপন বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্য রচনা এক বিরল অধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রথাকে ভেঙ্গে এক নতুন রূপ সংযোজন করেছেন। তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়, কীভাবে উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত হয় আর অন্যদিকে দেখা যায় সরকারি আধিকারিকরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কীভাবে নাস্তানাবুদ হন। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া, কর্তব্য পালন করা, সেই সম্পর্ক দেশের জনগণকে অবগত করানো যা বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে এই ধরনের সাহিত্যধারা প্রভাব যথেষ্ট।

গণতন্ত্রের যুগে আমলাতন্ত্রের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। সমাজের মানুষকে বিভিন্ন কাজের জন্য সরকারের অফিস আদালত কাছারি গুলিতে যেতে হয়। পঞ্চায়েত অফিসের বিভিন্ন কাজের সূত্রে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সচিব ও নেতাদের স্বার্থের কপালে পড়ে জর্জরিত হয়। ব্লক স্তরে বা মহকুমা স্তরে জেলা স্তরের বিভিন্ন কাজের শিথিলতা ও নিয়ম কানুনের জটিলতা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা নানান হয়রানের শিকার হন। নিরুপায় বঞ্চিত ব্যক্তি মানুষের অসহায়ের কথা উঠে এসেছে গল্প গুলোতে।

'ইয়োরস ফেথফুলি' গল্পে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র সাহেব। চাকরির সূত্রে তিনি শ্রীবাস নামক অর্ডারলি পিয়নকে পান। মিত্র সাহেবের বন্ধু রায় সাহেবের বিবেকহীন অমানুষিক চাহিদা পূরণের জন্য শ্রীবাসকে ঝড় বৃষ্টির রাতে একের পর এক ফরমাস দিয়ে যায়। জঙ্গল অতিক্রম করে গ্রামে গিয়ে পুকুর থেকে রুই মাছ ধরে আনা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'রণক্ষেত্রের দুটি শিশু' গল্পে দেখা যায় রোড এক্সিডেন্ট হয়ে একটি শিশুর প্রাণহানি হয়। গাড়ির ধাক্কা খেয়ে প্রথম দিকে জ্ঞান থাকলেও সে দিকে গুরুত্ব না দিয়ে স্থানীয় নেতা নিজের প্রভাব জাহির করা জন্য রাস্তায় অবরোধ ডাকে, রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। উত্তপ্ত জনতার রোষে পুলিশ প্রশাসন ও সামাল দিতে পারে না, যে শিশুটিকে হসপিটালে নিয়ে গেলে তার জীবন বেঁচে যেত, সেই শিশুর জীবনের পরিবর্তে জরিমানাটাই যেন তাদের কাছে বেশি হয়ে উঠেছে। এছাড়াও 'অবরোধ', 'প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা', 'জেলাশাসকের বাংলো', 'আমলা', 'মুখ্যমন্ত্রী শোকবার্তা', 'আই.আর. ডি.পি.', 'ইন্দুর', 'স্বর্ণপদক', 'দখল', 'দেশ' গল্পগুলিতে মানুষের কথা, নেতা-মন্ত্রীর কথা আমলা দিকের প্রসঙ্গ কীভাবে উঠে এসেছে। গোয়েন্দা কাহিনীতে ও তপন বন্দোপাধ্যায় এক অন্য মাত্রায় গল্পগুলি রচনা করেন। পূর্বে সাহিত্যিকরা গোয়েন্দা কাহিনীতে পুরুষ চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম কোন মহিলা চরিত্রকে গোয়েন্দা গল্পের প্রধান চরিত্র রূপে প্রতীকায়িত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন – নারীর পর্যবেক্ষণ শক্তি অনেক বেশি এই রকম ধারণা থেকে। এরপরেই তিনি 'বহে বিষ বাতাস' (১৯৯৬) নামে প্রথম গোয়েন্দা ধর্মী উপন্যাস রচনা করেন।

তিনি রবিবাসরীয়তে ধারাবাহিকভাবে লেখেন 'ধূসর মৃত্যুর মুখ' (১৯৯৭), 'নীলরক্ত নীলবিষ' (২০০৭)। বাষট্টি সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিকভাবে লেখেন দীর্ঘতম রহস্য গল্প '৭৭, সবুজ সরণি', (২০০৩)। গোয়েন্দা কাহিনীকে কীভাবে তপন বন্দোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব শৈলীতে নির্মাণ করেছেন।

হাস্যরস মূলত পান, উইট, আয়রনি, স্যাটায়ার, হিউমারের প্রয়োগ দেখা যায়। পান হল এক শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা। উইট এ থাকে বুদ্ধির দীপ্তি ভাব ও ভাষার স্বরস চাতুর্য। আয়রনিতে থাকে ব্যঙ্গক্তি ও ব্যঙ্গস্তুতি, নিন্দার

ছলে প্রশংসা, প্রশংসার ছলে নিন্দা। স্যাটায়ারে থাকে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা, বিদ্রূপ, উপহাস। হিউমার হল হাস্যরসের মধ্যে জীবনের দার্শনিকতা মিলেমিশে এক গভীর অনুভূতি। তপন বন্দোপাধ্যায়ের হাস্যরসের কাহিনী গুলিতে রয়েছে মধ্যবিত্তের যন্ত্রণার কথা। 'টেপ রেকর্ডার' গল্পে কচিরাম হালদার, 'হাড়িয়ার দেশের কবিতায়' প্রহ্লাদ হেমব্রম, 'বুমেরং' গল্পে রমলা ও 'প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা' গল্পে দুখু মুর্মুর জীবনের করুন কাহিনী এই গল্পগুলিতে হাস্যরসের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও 'টুপি', 'দন্তবর্গ', 'হাসপাতালের হাঁস', 'সাপ', 'শকট বৃত্তান্ত', 'স্বর্ণপদক' গল্পে তিনি স্যাটায়ার, হিউমার, উইট এর সার্থক প্রয়োগ করেছেন। আয়রনি ও পানের ব্যবহার তিনি একেবারেই করেননি। তিনি 'নির্বাচিত হাসির গল্প' গ্রন্থের মুখবন্ধনে বলেন - তিনি 'নির্বাচিত হাসির গল্প' গ্রন্থের মুখবন্ধনে বলেন -

এক দশকেরও বেশি আগে আমার প্রকাশিত শেষ গল্পের বইটি প্রচ্ছদে 'না হাসির গল্প' লেখায় সৃষ্ট হয়েছিল কৌতূহলের সেগুলো সবই স্যাটায়ার ধর্মী'।[৪] তিনি 'রাজ্যপালের অসুখ' গল্প লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, সেই গল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

"আশির দশকের মাঝামাঝি রাজ্যপালের অসুখ গল্প ও আচমকা লিখে ফেলার পর কিছু খ্যাতে হয়েছিল পাঠক মহলে। স্যাটায়ার লেখা সেই থেকেই শুরু।"[৫]

রাজ্যপাল তিন এই তিনটে মিটিং সেরে 'ছ গ্লাস জল খেয়ে শেষে দুপুরের মেনু চা পাতি আর ভেজিটেরিয়ান ঠিক মতো না হওয়ায় চাপাটি ছুরিতে ছুঁড়তে থাকলে ফুয়া বহুৎ থাকলে হুয়া বলতে এদিকং সাহেব রাজ্যপালের প্রেসার মাপার জন্য ব্যবস্থা করে ফেলে ডাক্তারকে ডাকা হলে ডাক্তার বলেন ডাক্তারকে তিনি বলেন ডোন্ট বহুৎ ডিস্টার্ব মি আই অ্যাম অফলি। টায়াইড এ নিয়ে এনে এডি সাহেব ডি এম এসপি মাথার টুপি খুলে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ডি এম এর অন্য সময় প্রবাল প্রতাপ গোটা জেলার কর্ণধার কিন্তু পুলিশ সুপারের এড়িয়ে যাওয়ার কথা শুনে তিনি বেশ ঘাবড়ে গেলেন বললেন আমি কি করব এমপি নিজেই তো প্রোগ্রাম করে আমাকে দিলেন বলেছিলেন গভর্নরের সঙ্গে ওর কথা হয়ে গেছে। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ দেখতে চান রাজ্যপালের ন্যূনতম তাহলে এর কথা শুনে বা কি কর্মচারীদের ব্যস্ত হওয়ার কথা গল্পে দেখা যায় কে সুস্থ করার জন্য একের পর এক ডাক্তারকে আনা হয়। রাজ্যপালকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লি থেকে হেলিকপ্টার আনার ব্যবস্থা করা হয়। হেলিকপ্টার আনার জন্যে হেলিপ্যাড তৈরি করতে হয়।এই হেলিপ্যাড তৈরি করার জন্য ইট ও খড়ের প্রয়োজন। তার থেকেও বেশি প্রয়োজন একজন ইঞ্জিনিয়ার। গভীর রাতে ইঞ্জিনিয়ার আসতে না চাইলে তাকে কাকুতি মিনতি করে নিয়ে আনেন। শেষে হেলিপ্যাড তৈরি হয়ে গেল চাল-ভাঙ্গা খড়ে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সিগন্যাল দিচ্ছে ও.সি.। এমন সময় সকালে রাজ্যপালকে গল্পে দেখা যায় তিন দিনের প্রোগ্রামে আসেন রাজ্যপাল। প্রোগ্রামে ঠিক হয় রাজ্যপাল সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপে মিটিং সেরে কলকাতা ফিরে যাবেন। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার জন্য সবকিছু রেডি হয় তখন এটি কম কিছু বলার আগেই ডাক্তার মাত্রে এগিয়ে গেলেন স্যার তাবিয়াত ঠিক হে প্রত্তরের দিনে জানান জরুরী ঠিক হে আজ তুম আজ তো সাগরদ্বীপ জানা হে ডাক্তার মন্ত্রী রাজ্যপালকে চেকআপ করার কথা জানালে তিনি বলেন - 'চেকআপ করনা পড়েগা মুজকো নেহি নেহি মে বিলকুল ঠিক হু, অপ রেস্ট লিজিও। ডাক্তার মাত্রে আমি অনেক ওয়ার্ক পার জাউঙ্গা।'[৬]

নারীর আস্তিত্ব সংকটের কথা প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে তার অন্যতম গল্প 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা' গল্পে। গল্পে দেখা যায় একলব্য সুন্দরবন এলাকার ট্রলার চালক। সমুদ্রে মাছ ধরে এনে কলকাতার বাজার এ বিক্রি করে। একলব্যের খুব ইচ্ছা টাকা জমিয়ে সে একটা ব্রান্ড গড়বে। অন্যদিকে একলব্যের প্রেমিকা লবঙ্গর প্রতি মুহূর্তে ভয়। তার বাবা তাকে কলকাতাই রাইস মিল এর আধিকরতা অঘোর বৈরাগী হাতে তুলে দিতে চায়। লবঙ্গ বার বার একলব্যকে জানায় – 'তুমি কবে যাতিছ তাই বলো। বাপের গতিক ভাল নয় কিন্তুক!'[৭] লবঙ্গ নিজের অভাববোধ করছে তাই সে কখন বাবার আশ্রিতা আবার কখন স্বামীর। তার জীবনে বারে বারে আস্তিত্বের সংকটের সমুক্ষীন হয়। লবঙ্গর সতেরো বছর বয়স ও হইনি, সরকারি আইনে সে নাবালিকা। গল্পের শেষে দেখা একলব্য লবঙ্গ সঙ্গে দেখা করতে এলে লবঙ্গর ভাই জানায় – 'দিদি আনেক দিন হল কলকাতা দেখার বায়না করছিল বাপের কাছে। তা সেদিন বাপ বলল, একটা গাড়ি যাচ্ছে কলকাতায় চল, তোকে কলকেতে দেখিয়ে নিয়ে আসি। ভোর ভোর যাব, সন্ধে সন্ধে ফিরে আসব।'[৮] মনের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তোয়াক্কা না করেই তাকে কলকাতা শহর দেখানোর অজুহাতে অঘোর বৈরাগীর হাতে তুলে দেয়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম গল্প 'বিবমিষা' গল্পে দেখা যায় প্রত্যন্ত গ্রাম খড়গেড়িয়া কতিপয় শহুরে যুবকের আগমন ঘটে। শুকদেব নামক এক ব্যক্তির সহায়তায়। যার বাড়ি ঐ গ্রামেই। যুবকরা ঐ গ্রামে গিয়ে দেখে কীভাবে মদ তৈরি হয়। সাঁওতাল রামনী দের নৃত্য ও তাদের নাচ গান। তাদের সঙ্গে যুবক দের অবাধ মেলামেশা নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। গ্রাম থেকে ফেরার পথে দেখা যায় গ্রাম সম্পর্কে তাদের দারুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরার সময় বিলাস বলছে - '...আমি যা পেয়েছি তা তোরা স্বপ্নেও অনুমান করতে পারবি না।'[৯] এই গল্পেও দেখা যায় সাঁওতাল নারী দের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। বাইরের থেকে মানুষ গিয়ে তাদের সরলতার অপপ্রয়োগ ঘটাচ্ছে। তাদের টি.বি. রোগ হলেও তা নির্মূল করার কারো কোন প্রচেষ্টা নেই। সেখানে সাঁওতাল রমনীদের সঙ্গে শহুরে পুরুষের মেলামেশা যেন একটি ভিন্ন পরিস্থিতি রং দিকে ইঙ্গিত দিয়েছে।

সভ্যতা আদি লগ্ন থেকে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বে আর্যদের আধিপত্য বিস্তার এবং অনার্য মুন্ডা, শবর, কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি নিম্ন শ্রেণীর রূপে আস্তিত্বের লড়াই করে আসছে। এইসব জাতির নারীদের কথা আধুনিক সাহিত্যে নানান ভাবে চর্চিত। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সাঁওতাল জনজাতির পাশাপাশি সুন্দরবন অঞ্চলের পাথরপ্রতিম, কাকদ্বীপ, গদামথুরার ঘাটের, নিম্নবর্গীয় মানুষদের কঠিন জীবন যাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'বিবিমিষা' গল্পে দেখা যায়।

তাঁর 'রূপের হাট' গল্পে দেখা যায় বৃতি ও ধৃতি দুই বোন ঋতমদের বাড়িতে ভাড়াটে আসে। ঋতম দশ হাজার টাকার ভাড়াটিয়া দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপনের সাঁইত্রিশ খানা খাম পোস্ট কার্ডের মধ্যে একটি খাম নির্বাচন করে সেই। সেই পরিবারের সদস্য বলতে তিনজন মা ও অবিবাহিত দুই মেয়ে। বৃতি ও ধৃতি দেখতে খুবই সুন্দর। দুই বোন পড়াশুনায় খুবই ভাল। কিন্তু তারা কেউ চাকরি না করে ব্রেবোন বোর্ড এ একটা কনসালটেন্সি ফার্ম খুলেছে। রীতিমতো শিক্ষিত মার্জিত ব্যবহার আচার আচরণে এমন আভিজাত্য যা প্রশংসার যোগ্য। পাড়ার লোকের কাছে যা ঈর্ষানীয়। বৃতি ও ধৃতির কাছে "মেয়ে দুটি রোজই খাওয়ার পর বেরিয়ে যায় তাদের নিজস্ব অফিসে, ফেরে সন্ধ্যে পেরিয়ে। কিন্তু তখনও তাদের ব্যস্ততা কমে না। এসেই রাত দশটা–এগারোটা পর্যন্ত তাদের ফ্ল্যাটের ব্রাঞ্চ অফিসে কাজকর্ম চালায়। কখনও কখনও গভীর রাত পর্যন্ত চলে কাজকর্ম। প্রায় রোজই নানান কোম্পানির লোকজন আসে তাদের কাছে। কখনও দামি দামি গাড়ি, কখনও প্রকাণ্ড আকারের মোটর বাইক দাড়িয়ে থাকে বাড়ির সামনে। যারা আসে তারা প্রায় সবাই বেশ বড়োলোক, ব্যস্ত সমস্ত মানুষ।"[১০]

কখনো সিরিয়ালের কথা বলছে আবার কখনো বিদেশী জিনিস ইমপোর্ট করার কথা বলে বাড়ির মালিক বৈশালীকে। তাদের কাছে ক্রমশ ভি আই পি থেকে ভি ভি আই পি মানুষদের আসাযাওয়া চলছে। কিন্তু গল্পের মধ্যেও দেখা যায় বৃতি ও ধৃতি তাদের পেশাকে ক্রমশ গোপন করার চেষ্টা করছে। গল্পের শেষে দেখা যায় ঋতমের বন্ধু ব্রতিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে জানায় বৃতি ও ধৃতি তাদের পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা চালায় তার বাড়ীতে তার জেরেই পাড়ায় এত লোকের আগমন।

ঋতম আরও অবাক হয়ে পাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে দেখল অ্যাডটা। বারদুয়েক পড়েও কিছু উদ্ধার করতে না পেরে ব্রতিনকে বলল, হঠাৎ এই বিজ্ঞাচালিতপড়তে বললি কেন? তোর কি আজকাল এইসব গুন হয়েছে নাকি? ব্রতিন হা হা করে হেসে বলল –

"আমার আশা খুব বড়। এত ছোট আশা নিয়ে কি করব। পোষাবে না... আমি এই টেলিফোন নম্বরে ফোন করেছিলাম একটু আগে, তাতে উত্তর পেলাম পঞ্চাশ হাজারের নীচে হবে না।"[১১]

গল্পে দেখা যায় এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর রক্ষিতা ছিলেন লাবণ্যময়ী। তারপর বিখ্যাত পাড়ায় দুই মেয়ে বড় হলে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসাটি খুলে বসেছেন।

বিশ্বায়নের যুগেও দেখা যায় তিনটি প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর অস্তিতের সংকট দেখা যাচ্ছে। নারীর তথাকথিত 'প্রাচীন ব্যবসা' চালাচ্ছে কিন্তু তাদের নিজের কোনো পরিচয় নয়। সেই নারীর কাছে বড় বড় বিজনেস ম্যানরা যাচ্ছে টাকার বিনিময়ে। তারা নিজেদের ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান কাজের অজুহাত দিয়ে বাড়ির মালিকের কাছে থাকছে। কিন্তু তাদের আসল পেশার কথা জানাতে পারছে না। মেয়েরা বর্তমান যুগেও যে পুরুষতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা গল্পে

বোঝা যাচ্ছে। তারা এখনো তাদের স্বাধীনতার কথা, যৌনতার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছে না। গল্পেও দেখা যায় তারা ভদ্র পাড়ায় ঐ ব্যবসা শুরু করেছে। যেখানে তাদের বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতির সন্মুখিন হতে হচ্ছে। গল্পে দেখা যায় বৃতি ও ধৃতি শহরের কল গার্ল। তাদেরও নিজের একটা জায়গায়, নিজের ঘরের, নিজেদের অস্তিতের টানা পোড়ানে পড়তে হচ্ছে।

তিনটি গল্পে দেখানো হয়েছে একবিংশ শতকের যুগেও গ্রাম, শহর ও মফঃস্বল এলাকায় কীভাবে এখনো নারীরা নানা টানাপোড়ানের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় – নারীকে আপনার ভাগ্য জয় করিবার কেহ নাহি দিবে অধিকার। বর্তমান যুগেও দেখা যাচ্ছে নারীরা নিজের ভাগ্য জয় করতে কোথাও না টিকিয়ে রাখার জন্য অদম্য লড়াই করে চলেছে। কোথাও বিপর্যস্ত হচ্ছে।

সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু সাহিত্য, গোয়েন্দা কাহিনী, প্রবন্ধ সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখায় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঈর্ষা-স্বার্থপরতা কীভাবে সমাজের নারীর জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে তার কথা দেখা যায়। উচ্চপদস্থ আধিকারিকের জীবনের সংকট রেখে কর্তব্য সম্পাদনের কাজে লিপ্ত থাকেন। উত্তপ্ত জনতার রোষ, গভীর জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুরনো বাংলো থাকা, নেতা মন্ত্রীদের কবলে পড়ে কীভাবে পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া হয় সেই কথাগুলি তাঁর গল্প উপন্যাসে উঠে এসেছে। হাস্যরসের মাধ্যমে যন্ত্রণার কথা, বেদনার কথা গল্পগুলিতে ও নারী দের আত্মকথা রয়েছে। তিনি মানুষকে মাকড়সার ঊর্ণনাভ থেকে বেরিয়ে এনে পৃথিবীর জগতকে বাইরের জগতকে জানাতে চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি রচনায় বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে গল্পের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাসে আগামীর পথকে মসৃণ বাণীভঙ্গীর নৈপুণ্যে, মনঃসমীক্ষণে, ব্যঞ্জনায় ছোটগল্পের যথার্থ শরীক হয়ে উঠেছে। রাসসুন্দরীজাব দাসী লেখা আত্মজীবন 'আমার জীবন' পড়ার পর যদি একবিংশ শতকে নারী অবস্থান নির্ণয় করার প্রয়াস করলে দেখা যাবে নারীর আস্তিত্ব নিয়ে বার বার প্রশ্ন থেকেই যাবে।

Reference:

১. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার,* মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭, পৃ. ৫৩৬
২. বৈদ্য, মাম্পি, *তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : আখ্যান তত্ত্ব নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে,* একুশ শতক, ২০১৮, পৃ. ৪৫
৩. মজুমদার, সমীরণ, *অমৃতলোক : ৮৭,* অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা ৯, ২০০০, পৃ. ২১১
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *নির্বাচিত হাসির গল্প,* আরুণি পাবলিকেশন, কলকাতা ৪৯, ২০০১, পৃ. ১৮
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *নির্বাচিত হাসির গল্প,* আরুণি পাবলিকেশন, কলকাতা ৪৯, ২০০১, পৃ. ১৮
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১),* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৬
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১),* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২২
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১),* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৪
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১),* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৮১
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১),* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৫
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১),* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৯

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১),* করুণা প্রকাশনী, ২০২২
বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র,* করুণা প্রকাশনী, ২০০২
বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *নির্বাচিত হাসির গল্প,* আরুণি পাবলিকেশন, কলকাতা ৪৯, ২০০১

সহায়ক গ্রন্থ :

বৈদ্য, মাম্পি, *তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস: আখ্যানতত্ত্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৮
ভট্টাচার্য, তপোধীর, *ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (উত্তরার্ধ)।* দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭, শ্রাবণ ১৪২৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সাহিত্য চলচ্চিত্র এবং...,* জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭, ২০১০
সরকার, প্রণব, *সুন্দরবনের আঞ্চলিক জীবন, বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি,* পদ্মনাভ ইম্প্রেশন, কলকাতা-৯, ২০১০
মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, *কালের প্রতিমা।* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১০
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পঞ্চম খণ্ড,* মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭
মণ্ডল, তপন, দীপঙ্কর মল্লিক, এবং তাপস পাল, *বাংলা সাহিত্য দেশ কাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে (নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন),* রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, দিয়া পাবলিকেশন, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রী কুমার, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭
চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার,* মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭

পত্র-পত্রিকা :

মজুমদার, সমীরণ, 'অমৃতলোক: ৮৭', *অক্ষর বিন্যাস,* কলকাতা-৯, ২০০০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 233 - 238
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকের কলমে ‘চিরাচরিত শিকল ভাঙার’ প্রতিবাদী স্বর

ইয়াসমিন বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কুলতলি ড. বি.আর. আম্বেদকর কলেজ
Email ID : biswasyeasmin@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Domestic space, Self dependent, Shariyat Laws, Polygamy, Child marriage, Sarcastic protest, Empowerment, Rebellion.

Abstract

In the fast-changing global scenario if the 21st century a considerable section of women of the Muslim community have left an indelible mark with their soul starting writings, revolutionary spirit and strong person. From the misuse of the Shariyat laws by the patriarchal society, the stifling and humiliating domestic space for Female to their journey towards self-realization of their worth, these female Muslim writers have time & again questioned, criticized and protested against the gender discriminatory paradigms of the society. Their objective have solely remained towards cherishing liberation for females holistically which reiterates the lives philosophy of Farjunnesha Chaudhuri, Begum Rokeya Sekhawat Hossain towards cherishing ‘Freedom for Women’ in the true sense of the term. The importance of being educated in Bengali alongside Urdu was pivotal step of the 19th century progressive Muslim women in their journey towards self-reliance, self-dependency and women empowerment. This legacy is further taken forward by Utsa Sarmin, Sulfia Kamal and Selena Hossain through their writings in the 21st century. My paper will close read selected fiction of the aboue trio and tend to explore the feminine world in their struggle towards empowerment. Utsa Sharmin’s ‘Cholo Banddhu Bangi’ explores Ayesha’s struggle against all odds to be ‘educated’ and use it as a weapon to usher in a change in society. Utsa Sharmin making Ayesha the precursor of the ‘Rokeya Nari Unnyan Samity’ is a her fictional representation of her ideology. Cholo Bandhu Bangi thus highlights on the power and impact of education, collective effort and the awakening of the inner voice to protect and resistance against the shackles of society binds a female individual with. In a similar vein Masuma of Sufia Kamal’s ‘Bijayani’ tends establish her individualidentity her self-worth in society. Malekha of Selina Hossain ‘Izrat’ questions the biased attitude of society regarding the ‘izzat’ of female. In the patriarchab society where

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

females are threated to be violated and lose their so called 'izzat' even at the slightest instance, polygamy by males & is an accepted and established norm. Malekha trough her questioning of the biased discriminatory Shariyat laws and societal framework become an epitome, a representative figure, a voice of the innumerable suffering Muslim women over the centuries. Thus, this paper will focus on the struggle, the protest, the defenced of the female characters and the seeds of empowerment they scatter through the selected stories of Utsa Sharmin, Sufia Kamal, Selina Hossain. The modernization of the female space in their fictional world will be the focus of this paper.

Discussion

।। ক।।

ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে গৃহস্থালি শিক্ষার মধ্যেই মুসলিম নারীরা সীমাবদ্ধ ছিলেন। সেই সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন কলকাতা বেথুন কলেজের (১৯২৩) প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলতুন্নেসা 'মুসলিম নারীর মুক্তি' প্রবন্ধে কামনা করে বলেছেন –

> "জগৎ পরিবর্তনশীল। তাই বিংশ শতাব্দীর ঝড়ো হাওয়া বহু-কাল সুপ্ত মুসলিম নারীর প্রাণেও বেশ একটু কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। তা'রা একটা প্রকান্ড ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ও জগতের অন্যান্য নারীর দিকে চেয়ে দেখছে; এবং তাদের তুলনায় নিজেদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন দেখে বিশেষ ভাবে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে, শুধু ভোগ্য বস্তু হয়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না। নারী এতকালনিজেকে মোহ-আবরণে ঢেকে রেখে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৌন্দর্য্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে-কিন্তু আজ অনুতপ্ত নারী-প্রাণ সেই কুৎসিত বিলাসের ফাঁসি ছিন্ন করে বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে চাচ্ছে। সমস্ত নারী মন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ করবার যে প্রধান অস্ত্র–শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তাদের নাই-আছে কেবল দারুণ একটা আত্মগ্লানি, মর্মভেদী একটা অনুশোচনা আর সর্ব্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্খা। ...মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা খুব বেশী হলে দুই- একটা বাংলা বই পড়া, একটু চিঠিপত্র লেখা, আর অর্থ না বুঝে তোতাপাখির মতো আরবী পড়া।"[১]

পুরুষের উপর নির্ভর না করে মেয়েদের নিজেদের শিক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই নেওয়ার কথা ফজিলতুন্নেসা বলেছেন। তাঁর এই বিদ্রোহী মানসিকতার পদক্ষেপ আগেই গ্রহন করেছিলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথিকৃত হলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। তৎকালিন সময় পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত দেশবাসীর কোন ভবিষ্যত নেই। সেহেতু তিনি কুমিল্লা শহরে দুটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৩) স্থাপন করেছিলেন। তবে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার আধুনিকায়নের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক পথপ্রদশর্ক ছিলেন বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া অবরোধে অভ্যস্ত, দাসত্বে শৃঙ্খলিত নারীর সার্বিক মুক্তি ও স্বনির্ভর জীবনের দাবিতে কলম ধরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দু'জন নারী নিজ জীবনের যন্ত্রণা, অসম্মান, বঞ্চনার অভিজ্ঞতাকে পরিস্ফুটিত করার উদ্দেশ্যে কলম ধরেছিলেন। সেখান থেকে উত্তরণে পথপ্রদর্শকের ভূমিকাও সমান্তরাল ভাবে পালন করেছেন অত্যন্ত সচেতন ও দায়িত্ব নিয়ে। সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম মেয়েদের আধুনিকায়নের জন্য এ দু'জন নারীর আমৃত্যু কর্মপ্রবাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অগ্রজ আলোকবর্তিকাদের আর্দশে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত মধ্যবিত্ত মুসলিম অন্তঃপুরে যে, শরিয়ত আইনের অপপ্রয়োগ, অসম্মানজনক দাম্পত্যজীবন, পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বলিষ্ঠ কণ্ঠে শ্লেষাত্মকভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধে তা তুলেধরার প্রচেষ্টা। বিশেষত মুসলিম লেখিকাদের ছোটোগল্পের আঙিনা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নারীদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিসত্তা, যুক্তিবাদীমনন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চিত্র। এককথায় নারী ক্ষমতায়নের ছবি কর্মে ও মর্মে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

।। খ।।

বেগম রোকেয়া সারা জীবন নারীদের 'শুখনিদ্রা', ভাঙনের, তাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার কাজে যে অক্লান্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তার ফলপ্রসূ রূপ আমরা দেখতে পায় উৎসা সারমিনের লেখা 'চলো বাঁধ ভাঙি' গল্পে। 'রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি'র এক জনসমাবেশ ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনির সূচনা। উক্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন আয়েশা খাতুন। সঞ্চালক আকিনা। অসহায়, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিতা, নারীদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। সেদিনের সমাবেশে নিজেদের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জীবনের কথা তুলে ধরেছিল বেশকিছু নারী। মাজেদা ও ফতিমা তাদের মধ্যে অন্যতম। মাজেদা তার অসম্মানিত দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু উনিশ বছর বয়সী ফতেমার কাহিনি মহাশয়াকে নিজ অতীত জীবনে নিয়ে যায়। অতীতের স্মৃতিতে তিনি এতটাই মগ্ন হয়ে যান যে বাস্তবতা থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়েন। ছোটো বয়সে আয়েশা অত্যন্ত মেধাবী ছিল। স্কুলের শিক্ষকেরা তাকে খুব স্নেহ করতো ও পড়াশোনার জন্য উৎসাহ দিত। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক কূপমণ্ডুকত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের বেশি শিক্ষা লাভ করাটা ছিল গর্হিত অপরাধ। তাদের কথায়— 'ইজ্জত খোয়া যাবে' কিংবা প্রতিবেশী মহিলার কথায়—

> "ওমা এত বড়ো আইবুড়ো মেয়ে বাড়িতে আর বাপের কোনো হুঁস নাই? এতবড়ো মেয়ে আবার পড়ে নাকি? আমাদের মেয়েদের তো এই বয়সে বিহ্যা হয়ে গিয়েছিল।"[২]

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনায় বাধ্য হয়ে আয়েশার পিতা তার বিয়ে দেন। কিন্তু মিথ্যাবাদী, গোঁড়ামতাদর্শী শাশুড়ীর অত্যাচার, বেকার স্বামীর মাত্রাতিরিক্ত গালাগালি, পাশবিক অত্যাচার আয়েশার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে। রাতের অন্ধকারে হাতুড়ি দিয়ে দরজা ভেঙে শ্বশুরবাড়ি থেকে সে পলায়ন করে। আয়েশা ভেবে ছিল, পিতার কাছে থেকে দুমুঠো ভাত খেয়ে লেখা পড়া করবে।কিন্তু সমাজের মাতব্বরদের শাসানির ভয়ে ভীতু পিতা পুনরায় বিয়ের আয়োজন করেন। আত্মপ্রত্যয়ী আয়েশার প্রথম প্রতিবাদ -

> "আবার বিয়ে? আমি কি একটা পুতুল? শুধু সবার হাতে হাতে ঘুরে বেড়াব? আমার পড়াশোনার ইচ্ছেকে কেউ কোনো পাত্তা দিচ্ছে না। আব্বা দায়মুক্ত হওয়ার জন্য আবার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। আমি মেয়ে বলে কি আমার কোনো মন নেই? ইচ্ছে-অনিচ্ছা, মান সম্মান নেই?"[৩]

পরবর্তীতে অসীম স্যারের সহযোগিতায় আয়েশা বাংলা বিষয়ে এম. এ পাশ করে স্কুলের দিদিমুণি হয়। দিদিমুণি আয়েশার মঞ্চে উঠেই প্রথম ভাষণ –

> "প্রথমে কাঁদলে পরে বুঝেছি যে কাঁদা খুব লজ্জাকর বিষয়। কান্না দিয়ে এই সংগঠনের সৃষ্টি।"[৪]

আয়েশার অঙ্গীকার –

> "আজ আমাদের চোখের জল যাতে আগুন হয়ে ওঠে তা দেখাই আমাদের কর্তব্য।"[৫]

অসহায়, সংশয়ান্বিত, সঙ্কুচিত, অবলা মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর তাগিদে তিনি এক গল্প তুলে ধরেন। শর্মিলা নামে এক ব্যক্তিত্বহীন নারীর গল্প। সংসারের বেড়াজালে জর্জরিত নারী কীভাবে ভুলে যায় তার প্রকৃত নাম কি ছিল। স্বামী, সন্তান, পাড়া প্রতিবেশী কারো কাছ থেকে সদুত্তর না পেয়ে পথভোলা পথিকের মতো হেঁটে চলে রাস্তায়। অবশেষে এক বন্ধুর সাক্ষাতে সে তার শর্মিলা নামটি উদ্ধার করে। আয়েশ খাতুন সে সব ব্যক্তিত্বহীন, আত্মবিশ্বাসহীন, আমিত্বহীন নারীদের উদ্দেশ্যে তীব্র জড়ালো আহ্বান –

> "অম্মুকের বউ, অম্মুকের মা, এই পরিচয় নিয়ে থাকবেন না। বেগম রোকেয়া আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এগোতে হবে। রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হবে, উপার্জন করবে। আর সেই উদ্দেশ্য সফল করার দিকেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। মুখ বুজে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা চলবে না। আসুন, চলুন মেয়েদের ওপর বিধি নিষেধের বাঁধ ভাঙি।"[৬]

।। গ।।

"কেন নিবে গেল বাতি/আমি অধিক যতনে ঢেকে রেখেছিনু তারে/ জাগিয়া বাসর রাতি/ তাই নিবে গেল বাতি।" বেগম রোকেয়া অত্যন্ত সচেতন ভাবে নারী সমাজকে বারংবার ব্যঙ্গের কষাঘাতে আঘাত করে করে তাদের জ্ঞানের জাগরণের প্রচেষ্টা করে গেছেন। সেই সঙ্গে পুরুষ সমাজের প্রতি আবেদন – "অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।"

অর্থাৎ তিনি মেয়েদের 'অচেতন পদার্থ', 'ভোগ্যপন্য' হয়ে নয়, নিজ বুদ্ধিতে নিজ কর্মে নিজ অধিকারে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন। বেগম রোকেয়ার এই আর্দশ্যবাদের বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পায় সুফিয়া কামালের লেখা 'বিজয়িনী' গল্পের। মাসুমা চরিত্রে। গল্পের সূচনা 'শরতের শেফালী ঝরা প্রভাত'। যা গল্পের নারী চরিত্র মাসুমার চরিত্রের গুণাবলীর ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প। শরতের আবহাওয়ার মতো যার সান্নিধ্য অত্যন্ত স্নিগ্ধ, শান্ত। শেফালির শুভ্রতার মতো চরিত্র পবিত্র, বিনয়ীচরিত্র। প্রভাতের আলোর মতো তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নিয়তির নির্মমতায় জেলার এস-ডি-ও আসমত আলী ও তার স্ত্রী হাজেরা বিবির কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছিল মাসুমাকে। ওস্তাদের মেয়ে মাসুমাকে বোনের পরিচয়ে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন আসমত আলী সাহেব। কিন্তু ঘটনাক্রমে অতীতের দিনগুলি বর্তমান ক্যানভাসে ভেসে ওঠে। রাস্তায় অসহায় অবস্থায় রুগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকা বাল্য বন্ধু আবুল কাসেম চৌধুরীকে ঘরে নিয়ে আসার ঘটনা। মূল কাহিনি সূত্রপাত সেখান থেকে। বাল্যকালের ভালোবাসা মাসুমাকে, মাস্টারআলীর স্ত্রীবেশে দেখে কাসেমের স্মরণে আসে স্ত্রী আসেমা এবং মাসুমার ব্যক্তিত্বের তুলনা –

> "আসেমা সযত্নে তৈরী কাট্ গ্লাসের জিনিস আর মাসুমা বহুমূল্য সাধারণ কাটের একখণ্ড হীরক।"[৭]

হীরকের দ্যুতির মতো অপরূপ দ্যুতির ছটা কাসেম বুঝতে পারে মাসুমার উত্তরে –

> "ইস! ভয় আমি কাউকেই করিনা, তবে বড়লোকের বাড়ি গেলে এতদিন পর দেখে যদি কেউ চিনতে না পারে সেই ভেবে যায় নি।"[৮]

আত্মাভিমানী, স্পষ্টবাদী মাসুমার কাথায় কাসেম নিশ্চুপ হয়ে যায়। অন্তঃসত্ত্বা মাসুমার পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। মাসুমা ও আলীর সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া এসে পড়ে টাইফয়েড জ্বরে আলীর মৃত্যুর পর। কর্তব্যনিষ্ঠায় রত মাসুমার চোখে মুখে তখনও কোনোরূপ শোকের ছায়া কাসেম দেখতে পেলো না। সে পরিস্থিতিতেও যেন জননীসত্ত্বা ও আলীর ছোটো ভায়ের অভিভাবক সত্ত্বায় মাসুমার মুখশ্রী আত্মবিশ্বাসে প্রজ্জ্বলিত। স্বাবলম্বী, আত্মাভিমানী নারীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা যায় কাসেমের দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাবে "আর একটি বিয়ে করবার ইচ্ছে আপনাদের হলেই স্ত্রী দোষ দেন। কিন্তু নিজের মনের দোষটা আপনাদের চোখে পড়ে না।"

কাসেমের ছোটোবেলা থেকে ভালোবাসার কথায় —

> "আমি জানি। কিন্তু যাকে ভালোবাসা যায় তাকে যে ভোগ করতেই হবে একথা কেন মনে করেন?"[৯]

অপর দিকে মনোক্ষুণ্ণ কাসেমের দেওয়া মিথ্যা চরিত্রের অপবাদ প্রসঙ্গে রুদ্ধ দেবর এমামের ব্যবহার প্রতি অগ্নিচোখে প্রজ্জ্বলিত মাসুমার শ্লেষাত্মক উক্তি –

> "এমাম! তুমিও কি পাগল হলে? ওঁর সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলে?"

পরক্ষণে— "ছি! লোকে কি কুকুরকে কামড়ায়? কুকুরই লোককে কামড়ায়?" [১০] ইত্যাদি।

মাসুমাকে ভোগ্যবস্তু ভেবে তাকে পাওয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয় কাসেম। মোহভঙ্গে অনুশোচনা গ্রস্ত আত্মগ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কাসেমের অন্তিম ইচ্ছে প্রকাশ করে বন্ধু আসমতের কাছে – "সে মহীয়সী। তার পা দুটি ধরে শুধু ক্ষমা চেয়ে নিতুম।"

মানুষ মাত্রই স্বতন্ত্র। সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। বৈচিত্রময় জীবনের উত্থান–পতনের সাথে নিজ বিচার-বিবেচনা-বুদ্ধি দিয়ে কর্ম করে যেতে হয়। তাতেই জীবনের সার্থকতা। কাসেমের ক্ষমার প্রর্থনায় স্নেহশীল, বিনয়ীভাব মাসুমার মন্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ প্রাসঙ্গিক -

> "ভলো করেছিলেন, দুঃখ দিয়েছিলেন — দুনিয়া চিনলুম। আমরা দুঃখ নেই-অপনিও দুঃখ রাখবেন না। দুনিয়া বেঁচে থেকে অনেক কিছু করবার আছে। শুধু একজনের অভাবে কিছু আসে যায় না।"[১১]

মাসুমার এই আত্মোপলব্ধিটি নারীদের "অচেতন পদার্থ', ভোগ্যবস্তু, পরাশ্রিতা, অবলা, ইত্যাদি অপবাদের যোগ্য জবাব, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গল্পের 'বিজয়িনী 'নামকরণের মতো গল্পের নারী চরিত্র মাসুমা কূপমণ্ডূক সমাজের নারী কেন্দ্রিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারকে জয় করে বিজয়িনী হয়েছেন।

।। ঘ।।

ধর্মের শরিয়তি বিধানের অপপ্রয়োগে বহুবিবাহ প্রথার প্রতি 'ইজ্জত' গল্পের মালেকা চরিত্রের যুক্তিবাদী প্রশ্ন -

> "যে লোক চার জন স্ত্রী নিয়ে এক বাড়িতে বাস করে সে চরিত্রবান, সে ভ্রষ্ট হয় না? এতে নাকি সম্মান বাড়ে বংশের ইজ্জত বাড়ে!"[১২]

'ইজ্জত' শব্দের গৌরব রক্ষার দায়ভার শুধু মাত্র নারী সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ পুরুষ সমাজ তা থেকে বর্হির্ভূত মানসিকতার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মালেকা। বহুপত্নীক স্বামীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নিজের মতো করে ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছে হয় মালেকার। তাতে বহুপত্নীক স্বামীর কাছে চরিত্রহীন অপবাদে লাঞ্ছিত হতে হয় মালেকাকে। যার অবধারিত শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যুর পর শবদাহ সৎকার কার্যে দুই ভায়ের ভূমিকায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে মালেকার ভয়ংকর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ –

> "চরিত্র হীন বোনের লাশ দাফন করতে ওদের আগ্রহ ছিল না। বোনের শরীর শেয়াল কুকুর খেলে কতটা ইজ্জত বাড়ে সেটা ওরা বোঝেনা! ধর্মমাফিক দাফন না হলে কতোটা ইজ্জত বাড়ে সেটাও ওরা বোঝে না! বোঝে শুধু মেয়ে মানুষের মিথ্যে অপবাদ!"[১৩]

বাকলজোড়া গ্রাম মলেকার জন্মভূমি। সে তার গ্রামকে খুব ভালোবাসে। তাই সেখানকার নারীদের অসাহয়তা, অবমাননা, তাকে ভীষণ ভাবে কষ্ট দেয়। অশরীরী হওয়ায় নারী নির্যাতনকারীদের সে শুধু ভয় দেখাতে পাড়ে। আর কিছু করতে না পারার যন্ত্রনা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। আগুনে জলন্ত লোহার শলাকার ছেঁকা দেওয়ার মতো মালেকার ইচ্ছে হয়। লেখিকার কথায় —

> "ঐ ইজ্জতের পাছায় লাথথি মারার জন্য আর একবার বাকলজোড়া গ্রামে ফিরে আসতে চায়।"[১৪]

মুসলিম নারীদের এ হেন শ্লেষাত্মকভাবে প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার নারী সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

।। ঙ।।

'অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনী' বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী আবেদন বাস্তবে নারী সমাজে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করে চলেছে। যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে 'চলো বাঁধ ভাঙি' গল্পে আয়েশা, 'বিজয়িনী' গল্পে মাসুমা, 'ইজ্জত' গল্পে মালেকাদের মতো নারীরা। সুতরাং বলা যেতে পারে অন্ত:পুরের প্রতিবন্ধকতার শিকল ভেঙে কর্মে ও মর্মে নারীর ক্ষমতায়নের তথা আধুনিকায়ন প্রতিক্ষণ ঘটে চলেছে। ভবিষ্যতে তার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে আমরা তাতে আশাবাদী।

Reference:

১. খাতুন, আফরোজা' বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৩
২. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫১
৩. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তেরবাইরেঅন্দরের গল্প' দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫৩
৪. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫৪
৫. তদেব, পৃ. ২৫৪
৬. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫৫

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩১৩
৮. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩১১
৯. তদেব, পৃ. ৩১৭
১০. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩১৯
১১. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩২২
১২. তদেব, পৃ. ২২৬
১৩. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২২৭
১৪. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৩০

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 239 - 245
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তেভাগা আন্দোলনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে সুন্দরবন অঞ্চলের বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়াত সম্পর্কের রূপরেখা : প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস

সুকন্যা পাঁজা
গবেষিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sukanyapanja181095@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Sundarban, Proletariat, Feudalism, Feudal tyranny, Communism, Tebhaga, Provincial Kishan Sabha.

Abstract

Sundarban is the land of sundari, gewa, goran, keora and tiger, crocodile. But the hunger for land has forced people to set foot there and that was not easy.Humans have conquered the jungle tigers, crocodiles and snakes and have established themselves there. By showing greed for own land, rich feudal lords engaged landless labourers to do this dangerous work. But later refused to give them land.That was the beginning of tussle of proletarian against the landlord of 'Lat'. Then the situation became more complicated regarding the share of crops of the sharecoppers. At the time of 1946 sharecoppers at Chirirbandar of Dinajpur district started a movement demanding 2/3 third of crop. Later it spread throughout the West Bengal and East Bengal. The Bengal provincial Kishan Sabha run by the Communist Party called for the Tebhaga Movement.In September, 1946 the oppressed farmers of Sundarban also joined with this movement. Tebhaga could not be fully successful due to the Government's repressive policies. However the strong impact of Tebhaga forced the Government to enact a land reform law. Above all, Tebhaga tought the proletariat to protest in an organised manner.

Discussion

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার 'তেভাগা সংখ্যা'য় প্রকাশিত 'অহল্যা মায়ের গান' কবিতায় বিনয় রায় বলেছেন -

"সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে ফলালো সে সোনা
তার মা বোনের রক্তে হল সোনার মাটি লোনা,"[১]

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ওই সংখ্যাতেই প্রকাশিত 'শোন কাকদ্বীপ রে' কবিতায় সাধন গুহ জানিয়েছেন -

"চোখের লোনা জলে সেথায়
সরস হইল মাটি
তারই মাঝে সোনার ফসল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফলায় আঁটি আঁটি
আহা সেই ফসল যায় পরের গোলায়
চাষি তো ধান পায় না।।"[২]

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই দুটি কবিতা থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রলেতারিয়েত - বুর্জোয়া সম্পর্কের সমীকরণটি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। জঙ্গল হাসিলের সময় থেকেই ঘনীভূত হওয়া অত্যাচার ও অসাম্যর আঁচ একসময় তেভাগার দাবানলে পরিণত হয়েছিল। তেভাগা পরবর্তী সময়ে এই পরিস্থিতির কতটা পরিবর্তন হয়েছিল সেই বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি রাখে।

সুন্দরবন বলতে বোঝায় নদী-খাঁড়ি-নোনাজল অধ্যুষিত প্রত্যন্ত দক্ষিণবঙ্গকে। পশ্চিমবঙ্গের দুই চব্বিশ পরগণা ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান। গঙ্গার মোহনা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্বীপ নিয়েই গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চব্বিশ পরগণার তৎকালীন কালেক্টর জেনারেল ক্লঁদে রাসেল সুন্দরবনের জঙ্গল ব্যক্তিবিশেষকে শর্তসাপেক্ষে ইজারা দিতে শুরু করেন। এই শর্ত বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হলেও কলকাতার ধন্যাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে লাটআবাদের অঞ্চল মুনাফার লোভনীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠতে থাকে। এই অভিজাত সম্প্রদায় গোমস্তা ও নায়বদের সাহায্যে জল-জঙ্গলের দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করেন। এইসব জঙ্গল হাসিল করতে লোক আনা হত যশোর, খুলনা, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা থেকে। তারা সাপ-কুমির-বাঘের সাথে লড়াই করে জঙ্গলকে কৃষিজমিতে পরিণত করেছিল নিজস্ব একখণ্ড ভূমির প্রলোভনে। কিন্তু ধনী থেকে আরও ধনী হবার আশায় বাবু ও তার গোমস্তারা জঙ্গল হাসিল করতে আসা এই হতদরিদ্র মানুষগুলিকে ঠকাতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই সামন্ত প্রভুদের শোষণকামী মনোভাবের বিপরীতে ক্রমশ প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। জমির ফসল বা গাঙের মাছ-সকল ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এইভাবেই সুন্দরবন অঞ্চলে দানা বাঁধে তেভাগা আন্দোলন। লাটাবাদের সূচনা পর্ব থেকে বসতিপত্তনের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা সর্বহারাশ্রেণীর কোণঠাসা হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে রচিত একাধিক উপন্যাসে।

সুন্দরবনের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জীব-বৈচিত্র্য ও জীবনমৃত্যুর সীমায় দাঁড়িয়ে সেখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহপ্রণালী সম্পর্কে মানুষ বেশ কৌতুহলী। তাই সাহিত্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে সুন্দরবন লেখক-পাঠক উভয়ের কাছেই বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু দুর্গমতার কারণে এই অঞ্চলের সাথে সম্যক পরিচিত হওয়া কিছুটা দুষ্কর। সেই জন্যই আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে সুন্দরবনকেন্দ্রিক রচনা প্রথমে কিছুটা ব্রাত্য ছিল। এরপর সেই প্রতিকূলতা যত কেটেছে ততই রচিত হয়েছে সুন্দরবন কেন্দ্রিক নানান সাহিত্য। ১৯৭৮ সালে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান' নামক উপন্যাসের মাধ্যমে সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্যের সূচনা হয়। এরপর একেএকে এসেছেন মনোজ বসু, শিবশংকর মিত্র, আব্দুল জব্বার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকরা।

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের বিষয় হিসেবে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এখানকার জনগণের বিপদসংকুল জীবনযাত্রাই প্রাধান্য পেয়েছে। মনোজ বসুর 'নিশিকুটুম্ব', 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' বা শিবশঙ্কর মিত্রের 'রয়্যাল বেঙ্গলের আত্মকথা', 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার', 'বনবিবি' উপন্যাসে সুন্দরবনের দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে করে মানুষের জীবনজীবিকার সংগ্রামই বড় হয়ে উঠেছে। আবার বেশ কিছু উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে নতুন উদ্ধার হওয়া ভূমি ও ভূমির ফসলের মালিকানার জন্য ধনীর হাতে দরিদ্রের শোষিত হওয়ার কথা, যা একসময় বঙ্গব্যাপী জ্বলে ওঠা তেভাগার আগুনে ঘৃতাহুতি করেছিল। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি', 'চরপূর্ণিমা', 'পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ' প্রভৃতি উপন্যাসে ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের তিনটি পর্বে রয়েছে সুন্দরবনের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে তেভাগার কাল পর্যন্ত খেটে খাওয়া মানুষের সাথে ঘটে চলা অত্যাচারের ক্রমান্বয়িক ইতিহাস। এইসব উপন্যাসগুলিতে ফসল ও ভূমির অধিকারকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ' উপন্যাসে রয়েছে নদীর মাছের অধিকারের দাবিতে খেটে খাওয়া মানুষের অসন্তোষের কাহিনী।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের প্রথম পর্বে সাম্য-অসাম্যর প্রসঙ্গ তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু 'মাটি বাপের নয় মাটি দাপের।' আর সভ্যতার ইতিহাস এই মাটি দখলেরই ইতিহাস। সুন্দরবনে লাট আবাদের সূচনাপর্ব থেকেই নবলব্ধ জমির দখলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল শোষণ ও বঞ্চনা। সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রথম পর্বে ভূমি ও ফসলের এই অসাম্যের কথা মুখ্য না হলেও কাহিনীসূত্রে এইসব প্রসঙ্গ কখনও কখনও চলে এসেছে। মনোজ বসুর 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য নরহরি চৌধুরী ও শিবনারায়ণ ঘোষের দ্বন্দ্বমধুর সম্পর্ক। কিন্তু শ্যামগঞ্জের প্রতিষ্ঠা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্যামগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামসুন্দর চৌধুরীর নির্লজ্জ সম্পত্তিসাধনা সেকালের জমিদারশ্রেণীর আসল রূপটি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করে। এই শ্যামসুন্দর চৌধুরী নিরীহ পথিককে হত্যা করে ধন-সম্পত্তি কুক্ষিগত করেছিলেন এবং সেই ধনসম্পদ রক্ষার মানসে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে গুম পর্যন্ত করেছিলেন। মনোজ বসুর অপর এক উপন্যাস 'বন কেটে বসত'-এ সুন্দরবনে এসে মাছের ভেড়ির কারবারে গগন দাসের মতো অনেকেরই অবস্থা ফিরে গিয়েছিল। এই ভেড়ি তৈরি বা রক্ষণাবেক্ষণ মাছমারাদের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু পশ্চিমাকুলিদের পেয়ে বড় বড় ভেড়ির মালিকরা মাছ মারাদের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দিতে ও তাদের বাস্তুচ্যুত করতে দুবার ভাবেনি-

> "মাঝ-মারাদের কথা তো? খাবে না। না খেতে পেয়ে উঠে যাবে তল্লাট ছেড়ে। আপদের শান্তি হবে। তাইতো স্বার্থ আমাদের।"[৩]

সুন্দরবনের গহীন জঙ্গল থেকে কাঠপাতা সংগ্রহ করে দিন গুজরান করে সেখানকার হতদরিদ্র মানুষগুলি। মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে দেখা যায় তাদের এই সামান্য রোজগারেও কিভাবে ভাগ বসায় 'পিটেলবাবু'রা। এই উপন্যাসেই সামান্য টাকার জন্য মেলার ইজারাদার টিকে সর্দার মেলার দেহোপজীবিনী আতরবালাকে চরমভাবে হেনস্থা করেছে। তাদের এই অপমান দরিদ্র গগন দাস বা উমেশের বুকে বাজলেও টাকার নেশায় অন্ধ বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার চ্যালাচামুন্ডাদের কাছে এই মানুষগুলির কোনও গুরুত্বই নেই। এই বুর্জোয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় ক্রুরতা। শুধু অর্থের প্রশ্নে নয়, স্বভাবতই যে তারা কত অমানবিক তার প্রমাণ রয়েছে 'নদী মাটি অরণ্য'র প্রথম পর্বে। সেখানে গোমস্তা লাটাবাদের দেশে নবাগত রামকে নৌকায় জায়গাটুকু দিতে চায়নি। সন্ধেবেলায় বাঘের মুখে, সাপের মুখে রেখে চলে যেতে চেয়েছে। শিবশঙ্কর মিত্রের 'বেদে মউলে' উপন্যাসে সামন্তপ্রভুর রূপ আরও ভয়ংকর। সাতজেলের সম্পন্ন চাষী কানাই মন্ডল এক বিধবাকে দু-বস্তা ধান কর্জ দেওয়ার বিনিময়ে বিধবার শিশুসন্তানকে খাটিয়ে নিত। নিতান্ত কচি শিশুটি একদিন কাজের চাপে হাঁপিয়ে পড়লে সময় নষ্ট করার অপরাধে শিশুটিকে মেরে রক্তাক্ত করে দেয় মন্ডল। অর্থপিশাচ নায়েব মহাজনরা চালাকি করে নোনা জল ঢুকিয়ে খাতকের জমিকে অনুর্বর করে তুলতো। নোনাজমিতে ফসল ফলাতে না পারার কারণে খাতকের ঋণশোধ হতো না। আর সেই জমিকে ঋণের পাকে জড়িয়ে গ্রাস করত নায়েবরা। 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' উপন্যাসের দুর্ধর্ষ আর্জানও এইভাবেই ভিটেমাটি হারিয়েছিল।এই নায়েবি কায়দা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। তাই নিজের জীবন বাজি রেখে বাঘ মেরেও সরকার ঘোষিত ন্যায্য পুরস্কার পায়নি আর্জান।

প্রথম দিককার সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে সবলের অত্যাচারের কথা নানা প্রসঙ্গে বর্ণিত হলেও দুর্বলের প্রতিবাদ সেভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। গগন দাস বা উমেশের মতন কিছু মানুষ অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের স্বরে প্রতিবাদের চেয়ে আকুতির সুরই যেন বেশি। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। যতই দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে ততই তাদের স্বর ফুটেছে। 'নদী মাটি অরণ্য'র প্রথম পর্বে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা ও সে সম্পর্কে বাবুদের উদাসীনতাকে নির্দেশ করে পচন বলেছে –

> "বাবুরা থাইকব্যে টোঙ্গে, মোরা থাকবু পোঙে।"[৪]

কিন্তু এই উদ্যত প্রতিবাদকে প্রতিহত করা হয়েছে লাঠির আঘাতে। এই সময়েই দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান লিগ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি এই লিগের আরেকটি লক্ষ্য ছিল দেশীয় জমিদারদের হাত থেকে গরিব প্রজাদের রক্ষা করা। 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের মহিমবাবু ছিলেন এই লিগের সদস্য। এই উপন্যাসের রাম মহিমবাবুর আদর্শের ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লাটের দেশে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেছিল। তাই অত্যাচারী মারীচ মাইতিকে মারতে তার হাত কাঁপেনি। সাম্যের মন্ত্র দীক্ষিত রাম অন্য নায়েবদের মতন জমি কুক্ষিগত না করে সমানভাবে বন্টন করে দিয়েছিল মুনিষদের মধ্যে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার এই মনোভাবে ছিল মার্কসবাদের প্রতিফলন। কিন্তু রামের এই ধরনের জনদরদী কার্যকলাপ বুনো সামন্তের মতো প্রভু সম্প্রদায়কে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। রামের অগ্রগতি রোধ করতে রামের লাটের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে রামরাজত্ব ছারখার করে দিতে চেয়েছিল সে। এই বুর্জোয়া শক্তিই রামের ছেলে কুশধ্বজকে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছিল, - কিন্তু বাবার আদর্শ থেকে তাকে টলাতে পারেনি। গরানকাঠের লাঠিকে সম্বল করে সে আজীবন সাম্যর জন্য লড়াই করে গেছে।

রামচন্দ্রের লড়াই ছিল নতুন হাসিল হওয়া ভূমির উপর বাস্তুহীনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার। আর কুশধ্বজের লড়াই ছিল ভাগচাষীদের ফসলের ন্যায্য ভাগের জন্য। ফসল কাটার পর যখন ধান ভাগাভাগি হত তখন আগে কর্জ নেওয়া চাল-ডালের দাম দেড়া সুদসহ কেটে নেওয়া হত ভাগ ফসলের পরিমাণ থেকে। তারপর নায়েববাড়ির দেবতার রক্ষণাবেক্ষণের নাম করেও টাকা কাটা হত। এছাড়া নানা অজুহাতে জরিমানা হিসেবেও টাকা কেটে নিত নায়েবরা। ফলে নতুন ফসল থেকে আয় তো দূরের কথা পুনরায় জমিদারের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তো কৃষকরা। আর তাদের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়েই মেঘু সামন্তের মতন নায়েবরা তাদের মেয়েদের ইজ্জতটুকুও কেড়ে নিত।

নায়েব গোমস্তারা শুধু টাকার লোভে নিশ্চিত বিপদের মুখে ঠেলে দিতে দরিদ্র মানুষগুলিকে। জঙ্গলকে কৃষিজমিতে পরিণত করে ভূমিলাভই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্যই 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসে কেউটে সাপ দেখে মুনিষরা ভীত হয়ে পড়লে কাজে ক্ষতির আশঙ্কায় ভিখু গোমস্তা বিষধর সাপকে 'মেট্যা সাপ' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এই ভিখু গোমস্তা এমনই নিষ্ঠুর যে, কাজের হিসাবে সামান্য কম হলে খোরাকির চাল পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। শোষণ যন্ত্রের পাক অজগরের পাকের মতই মজুরশ্রেণিকে নিঃশেষ করে দিত। হাসিল হওয়া জমির অর্ধেক হত জমিদারের, বাকি অর্ধেক হত নায়েবের। নায়েবের ভাগ থেকে গোমস্তারা কিছু পেত, আর মুনিসদের খোরাকের বরাদ্দ থেকে টাকা রেখে সেই অনুপাতে জমি পেত মুনিসরা। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মুনিষদের ভাগে ঢ্যারাই পড়তো। এইসব নায়েব গোমস্তাদের শুধু যে জমির খিদে ছিল তা নয়। শ্রমিকদের বউ-মেয়েদের প্রতি তাদের লোলুপতা ছিল আগ্রাসী রকমের। তাদের লাম্পট্য থেকে কালু বাউরির সদ্য বিধবা বউ রম্ভাও রেহাই পায়নি। সীতাবালার মতন একজন সাধারণ গৃহবধূকে মারীচ শুধু নিজেই ভোগ করে ক্ষান্ত হয়নি, তাকে করে তুলেছিল সর্বজনভোগ্যা। তাদের এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সীতাবালা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। লাটের দেশের এই অরাজক অবস্থা দেখে জাতীয়তাবাদী নেতা কুশ মিত্রও বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দেশকে স্বাধীন করার মতোই জরুরি দেশীয় পশুদের হাত থেকে দেশের সাধারণ নিপীড়িত জনগণকে রক্ষা করা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল দেশীয় জমিদারদের চটাতে চায়নি। কারণ জাতীয়তাবাদী দলের একটা বড় অংশ এই জমিদার ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাদের এই দোটানার কারণেই কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বেড়ে চলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই শ্রমিক ও মজুরদের পক্ষে কথা বলতো। কলকাতার রেলশ্রমিকদের আন্দোলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কুশ মিত্র সুন্দরবনে কৃষক সমিতি গঠনে ব্রতী হন। জমিদারপুত্র লবণনারায়ণ নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়েও এই আন্দোলনে সামিল হন। তাঁর স্ত্রী অহল্যা চাষীদের নিজেদের খলেনে ধান তুলতে অনুমতি দেন -

"অহল্যা-মা দিলেন হুকুম
চাষীর চোখে নেইকো ঘুম
ভোর না হতেই ধান কাটতে
ছুটলো মাঠের পানে
মাঠের পর মাঠ ভাসছে
সোনা রঙের ধানে।।"[৫]

কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টিও বিভিন্ন নেতাকে এই অঞ্চলে পাঠাতে থাকে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য। তারা বুঝতে পারে যে, অত্যাচারী নায়েব-গোমস্তাকে হত্যা করে সামন্তপ্রভুদের মনোবল ভাঙতে হবে। একাধিক সভা করে তারা কৃষকদের নিজেদের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে। ধর্ষিতাকে দিয়ে মামলা করানো হয় ধর্ষক মেঘু সামন্তের বিরুদ্ধে। মেঘু সামন্তর দখলীকৃত জমির ধান জড়ো হয় ভাগচাষীদের খামারে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জী চাষীদের আন্দোলন জোরদার করতে 'লাল পতাকা কমিটি' তৈরি করেন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অতিরিক্ত জমি গরিব কৃষক-মজুদদের মধ্যে বন্টন করার দাবি তোলা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতিও বিধানসভায় তাদের দাবি পেশ করে। ফলে কৃষকদের দুর্দশা অনুসন্ধান করতে ভূমিসংস্কার কমিশন গঠিত হয়। ইংরেজ সরকারও কৃষকের দুঃখমোচনে উদ্যোগী হন। হেমিল্টন সাহেব মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে জলজঙ্গলের দেশের মানুষগুলিকে বাঁচাতে সমবায় প্রথার প্রচলন করেন। তিনি গোসাবায় সমবায় ব্যাংক, সমবায় বিপণি, মাছের কো-অপারেটিভ স্থাপন করে হতদরিদ্র মানুষগুলিকে মহাজনের ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এরপর আসে তেভাগার কাল। ভাগচাষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে তৈরি হয়েছিল 'সুন্দরবন ভাগচাষী হিতৈষী কমিটি'। তাদের দাবি ছিল - জমিদারের প্রাপ্য উৎপাদিত ফসলের অর্ধের নয়, তিন ভাগের এক ভাগ। তাদের এই দাবিই বীজ বপন করে তেভাগার। এই আন্দোলন এতটাই তীব্র ছিল যে, পুলিশ চাষীর পরিবর্তে গোমস্তাদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। কৃষকরা 'কমরেড' আর 'ইনকিলাব' স্লোগান দিয়ে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে রয়েছে সুন্দরবনের নারীরা। যে প্রতিবাদের মশাল সীতাবালা, অহল্যা জ্বালিয়েছিল তা হস্তান্তরিত হয়েছিল অহল্যা, বাতাসীদের কাছে। গ্রামের সুরোপিসি বুদ্ধির খেলায় পুলিশকে হারিয়ে নিশ্চিত গ্রেপ্তারির হাত থেকে বাঁচান নেতা হেমন্ত ঘোষালকে। দারোগাকে নিয়ে রাইচরণ গ্রামে এলে বাতাসী আর অহল্যা রাইচরণকে ঝাঁটাপেটা করেছিল। গর্ভবতী অহল্যা আর বাতাসী - দুজনকেই হত্যা করে পুলিশ। তাতেও সরোজিনী, উত্তমীরা পুলিশের সাথে সম্মুখসমরে পিছপা হয়নি।

এই সময় কিছুদিনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হলে কমিউনিস্ট নেতারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। নায়েব গোমস্তারাও ধর্মীয় বিভেদতত্ত্ব দিয়ে চাষীদের মিলিত আক্রমণকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। এরপর বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী প্রভৃতির কারণে এ আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই রকম অরাজক অবস্থায় ধান ভাগাভাগি নিয়ে জোতদার-বর্গাদার সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। আদালতের রায়ে বহু চাষী জমিচ্যুত হয়। কিন্তু যেখানে চাষীদের মনের পরিবর্তন ঘটে গেছে সেখানে কোন ভয়ই আর ভয় নয়। আগে দেখা গিয়েছে প্রতিবাদীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার ঘটনা। কিন্তু 'নদী মাটি অরণ্য'র তৃতীয় পর্বে কার্তিক জানা ও পটলকে মারধর ও আটকের ঘটনা সমবেত চাষীকে ভীত তো করেইনি উল্টে তাদের আন্দোলনকে আরও ভয়ংকর করেছে। কৃষক সমিতির মিছিলে পুঁইফলের রঙে লাল ঝাণ্ডা বানিয়ে 'তেভাগা চাই, তেভাগা ছাড়া ধান নাই' স্লোগান দিতে দিতে অগণিত কৃষক সমবেত হয়। যতীন মাইতি, কংসারি হালদার, হেমন্ত ঘোষাল, রাসবিহারী ঘোষের মত কমিউনিস্ট নেতার কর্মসূচির মধ্যে নিজেদের অধিকার পূরণের স্বপ্ন দেখে তারা। কোনও জমিদার তাদের দাবি না মানলে কৃষকরা জমিদারকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয় ও কাছারির মরাইতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর ১৯৫০ সালের মধ্যে সরকারি দমননীতি ও দলীয় বিভাজনের কারণে তেভাগার প্রবলতা হ্রাস পায়। তাৎক্ষণিক লক্ষ্যে তেভাগা আন্দোলন হয়তো সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভূমি সংস্কারের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়। এই সংস্কারের মধ্যে ছিল জমিদারি প্রথার বিলোপ ও ও জমির পুনর্বন্টন। নিম্নবিত্ত কৃষকদের মধ্যে সংগঠিত ভাবে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস যুগিয়ে ছিল তেভাগা। পরবর্তীকালে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ বা নকশাল আন্দোলনের উপরেও তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। একেবারেই সাধারণ পরিবারের গৃহবধূরা যেভাবে তেভাগায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা সর্বস্তরের ভারতীয় নারীদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে দিয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলনের বিপুল সাফল্য ও সেই সূত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সুপ্রতিষ্ঠা লাট আবাদের দেশে শোষক ও শোষিতের মধ্যে কতটা সাম্য ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল এ আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসে। 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল যে, তৎকালীন ভারতে বড়লোকেরা কেবলমাত্র কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সবাই সমান। তাই গরীব বনবিহারীকে ভোটে জিতে পঞ্চায়েত সদস্য হতে দেখা গেছে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। কিন্তু তার এই জয় এলাকার পুরনো সামন্তপ্রভুরা ভালো চোখে নেননি। অন্যদিকে বনবিহারীকেও পেয়ে বসেছে 'বুর্জোয়া ভূত।' 'হঠাৎ বড়লোক' বনবিহারী 'হঠাৎ কলোনি'র পত্তন করে ভূমিহারা দরিদ্রদের থেকে পয়সা লুটতে শুরু করে দেয়। এই সময় রাজনৈতিক চালে ধর্মকে হাতিয়ার করে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার বহু মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল। 'চরপূর্ণিমা'র মিন্টু দাস বা 'সমুদ্রদুয়ার'-এর হাসেমদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে ধানমুড়ির খোঁজে চলে এসেছিল

পশ্চিমবাংলায়। কিন্তু সর্বহারাদের মাটি কোনোও দেশেই নেই। জীবিকার সম্বল চরটুকু পেতে নানা মহলে হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল মিন্টু দাসকে। আবার এই মিন্টু দাসই মাছের কারবারে যখন পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছে তখন তার রূপ গেছে বদলে। মাছের কারবারে লাখ লাখ টাকা কামালেও দরিদ্র মজুদদের এক টাকাও মাইনে বাড়াতে সে রাজি নয়।

তেভাগা আন্দোলনের সংগঠক কৃষক নেতারা পরবর্তী সময়ে অনেকেই জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে স্থান পেয়েছিলেন। কৃষক নেতা কংসারি হালদার কমিউনিস্ট পার্টির তরফে লোকসভায় প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু লাটের দেশের তেভাগার নেতারা যোগ্য সম্মান পাননি। স্বজনভূমির বিলাসের ক্ষোভ যে, ‘লাল পতাকাওয়ালা কমিউনিস্ট ছোকরা লুটেরা’দের জন্যই তারা লাটদার থেকে ভিখারি হয়ে গেছে। সতীশ মাইতি তার জমি ৮০-৮৫ বিঘা থেকে ২৫-২৬ বিঘা হয়ে যাওয়ার জন্য অতুল কামিল্যাকেই দায়ী মনে করেন। আবার দেবেনের মতন ছেলের কাছে তেভাগা সংগ্রামী বাবা গজেন বুড়ো গর্বের কারণ। কিন্তু অতুল কামিল্যার ছেলে শম্ভু ‘তেভাগা’ নিয়ে বাবার অনুভূতি-আবেগকে উপলব্ধিই করতে পারেনি। তাই তার মনে হয়েছে যে, বাবা তেভাগায় যোগ না দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলে পেনশন বেশি পাওয়া যেত।

‘পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ’ ও ‘স্বজনভূমি’ উপন্যাসে দেখা গেছে যে, পূর্বের লাটদারেরাই সিনেমা হলের মালিক, বাড়ির মালিক, জেনারেটর ব্যবসায়ী, খটিদারে পরিণত হয়ে জোতদারের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ‘পুবের মেঘ পশ্চিমের আকাশ’ উপন্যাসের রায়বাবু সময় পরিবর্তিত হলেও নিজের সামন্ততান্ত্রিক খোলস ছাড়তে পারেননি। তিনি তাঁর ভাড়াটেদের মধ্যে ভাগচাষীরই রূপ খুঁজে বেড়ান। বুর্জোয়াপন্থী মধ্যস্বত্বভোগীদের কালোবাজারি কারণেই বাংলায় এই সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়ে দিয়েছিল। ফড়েরা দেশের চাল মজুত করে বেশি দামে যুদ্ধের সৈনিকদের বিক্রি করত। নেটিভের পেটের দানা ফুটতো সৈনিকের ব্যারাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে ভদু মাইতির মতো লোকেরা চিত্রনাথের মতো অসহায় লোকের থেকে নামমাত্র মূল্যে জমি জমা কিনে তাদের ভূমিহীন, আশ্রয়হীন পথের ভিখারি করে দেয়। ধনীদের বিপুল সম্পত্তি ভাগচাষীদের মধ্যে বন্টন করা হয় তেভাগার কালে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পেটের দায়ে বহু ভাগচাষীই নিজের ভাগের জমি বন্ধক দিয়েছে মহাজনের কাছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসে লাট আবাদের দেশের ডাক্তারবাবুর সমবায় স্থাপনের স্বপ্ন খটিদার আব্দুল অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিয়েছে। শ্রীপদকে কো-অপারেটিভে মাছ বিক্রি করা থেকে নিরস্ত করতে না পেরে আব্দুল শেষপর্যন্ত শ্রীপদর মাছ অপহরণ করে নিয়েছে। ফলতঃ এইসব ক্ষেত্রে তেভাগার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এইরকম পরিস্থিতিতেই দানা বাঁধে খাদ্য আন্দোলন ১৭.৫০ টাকা মণ চালের দাম ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের অপসারণের দাবিতে সোচ্চার হয় কমিউনিস্ট পার্টি।

তেভাগা আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল বহু আশার - বহু প্রতিশ্রুতির। সব প্রতিশ্রুতি হয়তো বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তবুও তেভাগা যে সাম্যবাদের বাতাবরণ তৈরি করতে পেরেছিল তা সামাজিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ‘স্বজনভূমি’ উপন্যাসে দেখা গেছে তেভাগার চাপে পড়ে ২০০-২৫০ বিঘের মালিক আজ কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়। আর তাদেরই বাড়িতে মুনিশখাটা বংশের ছেলে লেখাপড়া শিখে মাস্টার হয়ে সচ্ছল জীবন যাপন করছে। এই উপন্যাসেই অহল্যার ছেলে রতিকান্তকে অটলবাবুর মত মানুষরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান ও স্কুল শিক্ষক অটলবাবু রতিকান্ত ছাড়া শহীদ দিবস পালন করতে চেয়েও ব্যর্থ হন। তেভাগাই মানুষকে শিখিয়েছে কালুবাবু - ভদুবাবুর মতো জোতদারদের চালাকির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একত্র হতে। সমাজের অবহেলিত মানুষদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে ভ্যানচালক সমিতি, মুটে মজদুর ইউনিয়নের মতো একাধিক সংগঠন তৈরি হয়। আর এইখানেই তেভাগা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

Reference:

১. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : তেভাগা সংখ্যা, ৪২-৪৬ সংখ্যা, বর্ষ-৩০, ১৯৯৭, পৃ. ৩০
২. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : তেভাগা সংখ্যা, ৪২-৪৬ সংখ্যা, বর্ষ-৩০, ১৯৯৭, পৃ. ৭০
৩. বসু, মনোজ, বন কেটে বসত, কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮, পৃ. ৪২০
৪. বন্দোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য (প্রথম পর্ব), কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৪১

৫. বন্দোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য (প্রথম পর্ব), কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, চরপূর্ণিমা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৫

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, সমুদ্র দুয়ার, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০১০

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, স্বজনভূমি, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪

চট্টোপাধ্যায়, সাধন, উপন্যাস সমগ্র (১ম খন্ড), কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৪১৮

বন্দোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী ১৯৯৮

বসু, মনোজ, জলজঙ্গল, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৮

বসু, মনোজ, নিশিকুটুম্ব, কলকাতা : গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬০

বসু, মনোজ, বন কেটে বসত, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮

বসু, মনোজ, শত্রুপক্ষের মেয়ে, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৩

মিত্র, শিবশংকর, সুন্দরবন সমগ্র, কলকাতা : সমকাল প্রকাশনী, ১৩৭১

সহায়ক গ্রন্থ :

চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাস বহুরূপে, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ১৪১৭

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, বন্দর, কলকাতা : প্রজ্ঞা, ১৯৫৯

চট্টোপাধ্যায়, সাধন, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯-২০

বসু, মনোজ, বনমর্মর ও অন্যান্য গল্প, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৩৯

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন, গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮

রায়, অলোক, সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০১০

শ', রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৮

সেন, মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯

সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খন্ড), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫

সহায়ক পত্রিকা :

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : তেভাগা সংখ্যা, ৪২- ৪৬ সংখ্যা, বর্ষ-৩০, ১৯৯৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 246 - 253
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সীমান্তের উর্ধ্বে জীবনাদর্শ ও জীবনযুদ্ধ : প্রসঙ্গ দেশভাগ কেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য

ড. মৌসুমী পাল
ফ্যাকাল্টি মেম্বার (বাংলা বিভাগ)
ভবন্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
আনন্দনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
Email ID : paulmousumi77@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Famine, partition, war, war of life, receiving independence, governmental immorality, lifestyle, culture, women's consciousness.

Abstract

Before the 20th century, Bengali society was predominantly village-based. Their slow life journey was suddenly brought to a high tide by a revolutionary event like the partition of the country. Apart from the fulfillment of our dream of independence, this is only one event which is the complete history – geography – literature of India. Along with the culture, the traditional sense of the people - belief-habits-glory, culture-society-ideals, etc., were not only influenced but also changed in a great way. Partition faced several crises in our society; Among these, the main crisis was the breakdown of the monogamous family and the disruption of social philosophies and lifestyles. Partition was largely due to violent and deeply shameful political dissensions, from which the northern generation in society has not recovered to this day. Since the artistic expression of the varied experiences of human life is the main source of literary creation, so brutal events like the partition of the country, the intense agony of bloodshed, have very naturally influenced our literature. As a result of the partition of the country, all the problems such as bi-ethnicity, refugee problem, enclave problem etc. became more acute in the Bengali society. But people create the beauty of literature in the urge of a priceless pleasure. Revolution of turbulent forties, war, famine, pandemic, independence, country partition, refugee crisis, nothing could destroy this beauty of literature. In the novelty of the content, in the structure and description of the story, in the variety of the background, in the uniqueness of the language or idiom, above all in the description of the country-time-society and the life of the common people, the partition and in describing the excruciating pain of emigration, the despicable history of humanity's grief and the scars of adversity, the literature of Deshbhag has become a timeless and contemporary history.

Discussion

> "বিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল মূলত গ্রামভিত্তিক এবং সেখানকার জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত মন্থর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাতে পরিবর্তন এসেছে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মতো, প্রায় অলক্ষে। কিন্তু এই পরিবর্তনের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় বিশশতকে। তার পেছনে ছিল অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ– যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবারের পুনর্বিন্যাস সমাজ সচলতা, শিক্ষা এবং অর্থনীতির বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং দেশবিভাগ-সহ যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনাবলী।"[১]

১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণের পাশাপাশি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতার চরম কলঙ্ক হিসেবে ভারতবাসীর জীবনে অভিশাপ রূপে নেমে আসে দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু সমস্যা; যা খুব স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন গ্রামভিত্তিক সমাজের অত্যন্ত মন্থরগতির জীবন যাত্রায় অতি তীব্রভাবে প্রভাব ফেলেছিল। কারণ এই একটিমাত্র ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূগোল-সহ যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষের চিরায়ত বোধ-বিশ্বাস-অভ্যাগ-গৌরব সর্বোপরি ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুই বিপর্যস্ত করেছিল বা পাল্টে দিয়েছিল। বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনে দেশভাগের করুন প্রভাব, মানুষের জীবনযুদ্ধ, জীবিকার অনিশ্চয়তা, নারী জাতির অপমান-অনিশ্চয়তা-লাঞ্ছনা, বিশ্বাস এবং আদর্শের ভাঙ্গন, ছিটমহলের বাসিন্দাদের এক ভিন্ন জীবনযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়গুলো হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি', সেলিনা হোসেনের 'ভূমি ও কুসুম', অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' এবং কয়েকটি ছোটগল্পের নিরিখে পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে যে, মানব জীবনে সমস্ত প্রতিকূলতা ও সীমান্তে কাঁটাতারের উর্ধ্বে মানুষের জীবনযুদ্ধ ও জীবনাদর্শের অবস্থান।

বিগত শতাব্দিতে বাঙালি সমাজকে যে দুটি প্রধান মানবিক বিপর্যয় বা সংকটের সন্মুখীন হতে হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন, অন্যটি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ। ব্যক্তির বা সমষ্টির মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে প্রথম মানবিক বিপর্যয়টি ঘটলেও, দ্বিতীয়টি কিন্তু ঘটেছিল মূলত হিংসাত্মক ও চরম লজ্জাজনক রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারণে। সমাজের উত্তর প্রজন্ম যায় ভয়ঙ্কর প্রভাব থেকে আজপর্যন্ত মুক্তি পায়নি, এক ভয়ঙ্কর ক্ষত রূপে যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজের হৃদয়ে এই যন্ত্রনাকে অতি যত্নে-গোপনে বহন করে চলেছে। এটা সত্য এবং অনস্বীকার্য যে, আমাদের উত্তরসূরী এই নীরব কান্না ভবিষ্যতেও বহন করে চলবে। শক্তি চট্রোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় এই নীরব আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এইভাবে -

> "নিজেদেরই দেশে থাকি না, পালাই দূরে
> কে আর শূন্য ভাঁড়ার দু-হাতে খুঁড়ে
> দেখবে রয়েছে স্মৃতি জুড়ে মৌমাছি!
> সাহস গিয়েছে, সব কিছু গেছে দূরে
> কে রাখবে বলো চিরকাল বুকে জুড়ে-
> দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি।"[২]
> ('দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি)

মানব জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতার শৈল্পিক প্রকাশই যেহেতু সাহিত্য, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে করুণ ও বেদনাদায়ক জীবন অভিজ্ঞতা ১৯৪৭ এর দেশভাগের। নির্দয় আঘাত ও তার রক্তক্ষরণের তীব্র যন্ত্রণা হাহাকার আমাদের বাংলা সাহিত্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এর জন্য বাঙালিদের দীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর এই বিষয় নিয়ে প্রথম বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। তারপর থেকে এই বিষয়ে বাঙালি পাঠকদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। দুই বাংলারই বিশিষ্ট্য সাহিত্যিকগন এই মহীরুহ তৈরিতে সহায়ক হয়েছেন। অতীন বন্দোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্লরায়, মিহির সেনগুপ্ত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হোসেন, শওকত আলী, আবুল ফজল, শহীদুল্লা কায়সার, রাজিয়া খান, আবু জাফর ও দুই বাংলাই আরো অনেক বিশিষ্ট্য সাহিত্যিকগণ এই মহীরুহ সৃষ্টির গৌরবময় অংশীদার।

তৎকালীন সমাজ, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা, রীতি-নীতি ইতিহাস, রাজনীতি-অর্থনীতি এবং সর্বোপরি দুভিক্ষ, মহামারি ও দেশভাগ নিয়ে এক সুরম্য শৈল্পিক কথন হল হাসান আজিজুন হকের 'আগুন পাখি' (২০০৬, ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী)। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের যেকোনো পাঠক মহলে অতি পরিচিত নাম। উপন্যাসটি গ্রামের একজন সাধারণ নারীর মুখের আটপৌরে ভাষায় বলা এক বুকভাঙ্গা কান্নার দেশভাগের গল্প, ফলত এখানে শহুরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশভাগের কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন নেই। আছে শুধু এক অদম্য আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি মানব জীবনের কিছু আদর্শের প্রতিহলনে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নতুন ভাবে জানার গল্প। এই গল্প আমাদের এক অন্য ধরনের জীবনযুদ্ধের জানান্ দেয়। উপ্ন্যাসে বর্ণিত গ্রাম্য জীবনে কীভাবে দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের সংকট প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই আলোচনার পূর্বে, 'আগুন পাখি' রচনার নেপথ্য কাহিনি সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া আবশ্যক, কারণ আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এই নেপথ্য কাহিনিতেই নিহিত। মা জোহরা খাতুনের জীবনী অনেকাংশেই প্রভাবিত করেছে হাসান আজিজুল হক্‌কে এই উপন্যাস রচনায়।

> "তাঁর মায়ের জীবনস্মৃতিই সেই উপন্যাসের বিষয়। - এবার লিখতে শুরু করলেন - ঠিক মায়ের জবানিতেই, বর্ধমানের ভাষায়। জোহরা খাতুনের জীবনকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস। ...এই জীবনের সঙ্গে অন্য আরো অনেক জীবনকে যুক্ত করেছেন। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশেল ঘটিয়েছেন। মায়ের জীবনের মধ্যে তিনি গাঁথলেন সাতচল্লিশ-পূর্ব অখন্ড ভারতের উত্থান-পতন-তৎকালীন রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশ গঠন ও সামাজিক অবক্ষয়ের নানা প্রসঙ্গ। আঁকলেন একটি পরিবারের উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে গোটা সমাজের উত্থান-পতনের চিত্র।"[৩]

'আগুপাখি' উপন্যাসের কথক বর্ধমান বাঁকুড়া অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মুসলিম পরিবারের সহজ-সরল গ্রাম্যবধূটি গতানুগতিক প্রথায় লেখা পড়া না শেখা একজন স্বশিক্ষিত নারী। সাংসরিক জ্ঞানহীন একটি কম বয়সের বাচ্চা মেয়ে, যার বিয়ের পর নিজের স্বামীকে নিয়ে মুগ্ধতার শেষ নেই, আবার শাশুড়ি মায়ের বলিষ্ট ব্যক্তিত্বে ও সংসারে নেতৃত্ব দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতায় বিস্ময়ের অন্ত নেই; সময়ের নিষ্ঠুর অভিঘাতে সেই সাধারণ মেয়েটি ধীরে ধীরে একদিন হয়ে উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে। সারল্য মাখা শব্দে এই গ্রাম্য নারীই উপন্যাসের শেষে বলে উঠে –

> "আমাকে আরো বোঝাইতে পারলে না যি ছেলে মেয়ে আর জায়গায় গেয়েছে বলে আমাকেও সিখানে যেতে হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।"[৪]

এখানেই এই অতি সাধারণ, গ্রাম্য মহিলাটি হয়ে উঠে অসাধারণ ব্যক্তিময়ী নারীরূপে. বহু উচ্চশিক্ষিতা নারীও এই 'আলেদা মানুষ' কথাটি বলতে বর্তমান সময়েও স্বচ্ছন্দবোধ করেন না। কিন্তু এই গ্রাম্য সহজ-সরল মহিলাটি পেরেছেন দ্বিধাহীন ভাবে এই কথাটি বলতে। করণ জীবনাদর্শই তার জীবনে বেঁচে থাকার মূলধন; কোনো সীমান এই আদর্শকে ভাঙ্গতে পারেনি।

স্বামী সন্তান নিয়ে ধনে-জনে, শস্যে-সম্পদে, আত্মীয়-আশ্রিতায় সমৃদ্ধ একান্নবর্তী এই পরিবারটিতেও দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে শুরু হয়েছে ভাঙ্গন। অবস্থাসম্পন্ন এই গ্রাম্য পরিবারটিতেও দুর্ভিক্ষের আক্রমনে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে শুরু করে।

> "সোংসারের ভেতরটো এইবার তাকিয়ে দেখতে প্যালম আর সোংসারের মধ্যে মানুষ কি তা-ও দেখলম। কুকুর-বেড়ালের ছেঁড়া ছেঁড়ি দেখে রাগ করি। কিন্তুক মানুষ কুকুর-বেড়ালের চাইতে কিসে ভালো? মূলে টান পড়লে সবাই সমান। সেই মূল হচ্ছে প্যাট।"[৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসটিতে গ্রাম্য এই সাধারণ নারীর মুখেই অর্থাৎ কথকের মুখেই বর্ণিত হয়েছে চারদিকের দুর্ভিক্ষের চিত্র, অজানা রোগে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যু মিছিল, বস্ত্রহীন মানুষের বর্ণনা, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা সর্বোপরি দেশ ভাগের কথা। সহজ-সরল এই কথকের নিদারুণ বেদনার কারণ হয়ে উঠে দেশভাগ –

> "তাইলে সব্বোনাশ কি এমনি করেই শুরু হয়? চুলের মতন সরু একটো চিড় কোথা যেন ছিল, চোখে দেখতেই পাওয়া যেত না। পেথম দিন দেখে মনে হল কই, আগে কুনোদিন দেখি নাইত, পরের দিন দেখছি, ওমা, তার পাশে আর একটো চিড়, তারপর দেখতে দেখতে অ্যানেক অ্যানেক চিড় সব জায়গায় কখন হলো, কি হল, কেমন করে হলো ভালো করে কিছু... বোঝার আগেই একদিন বড় বড় ফাটল ধরে জিনিশটো চৌচির হয়ে ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সোংসারেও কি তাই হতে যেচে?"[৬]

দেশভাগের মতো একটা বিশাল জটিল বিষয়কে এতো সহজ-সরল ভাবে সাধারণ মুখের ভাষা দিয়ে এমন সুন্দর ভাবে বণনা করার জন্যই হয়তো 'আগুন পাখি' উপন্যাসটি দেশভাগের দলিল রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে। সরল গ্রাম্য মানুষের মনে দেশভাগের কথা হঠাৎ করে শুনে কীরূপ সংকটের সৃষ্টি করেছিল, তারই বর্ণনা অদ্ভুদ সরল ভাবে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক কথকের মাধ্যমে – গ্রামে হঠাৎ করে রব উঠে যে দেশটা নাকি ভাগ হবে। কাহিনির কথক কিছুতেই বুঝতে পারে না, দেশ আবার ভাগ হয় কেমন করে? কিন্তু অবশেষে এই অবিশ্বাস্য ঘটনটি একদিন যখন ঘটল, মুসলিম পাড়া-প্রতিবেশীরা চলে যেতে লাগলো ভিটে – মাটি ছেড়ে, ঠিক তখনই এই সরল মনে কোথা হতে এত জোড় এল যে, তার স্বামী – সন্তান সকলের বোঝানোর পরও সে কিছুতেই নিজের দেশ ছেড়ে যাবে না মনস্থির করে বসল। শুধু তাই নয়, কথক অর্থাৎ মাটি সংলগ্ন এই নারী বসত ভিটে আগলে দেশত্যাগ অস্বীকার করে, হিংসার রাজনীতি, অসার দেশভাগ অস্বীকার করার পাশাপাশি সমাজের তথা কথিত শিক্ষিত সচেতন মানুষের প্রতি কিছু উত্তরহীন প্রশ্নও ছুরে দিয়েছে। যথা–

> ক. "আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না, যি সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়।"[৭]
>
> খ. "আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না, ক্যান আলেদা একটো দ্যাশ হয়েছে, ... (কেন) এই দ্যাশটি আমার লয়।"[৮]
>
> গ. "একই দ্যাশ, একই রকম মানুষ, একই রকম কথা, শুধু ধম্মো আলেদা সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটো জায়গা থেকে আলেদা আর একটো দ্যাশ হয়ে গেলই কি কুনোদিন হয়? এক লাগোয়া মাটি, ই দিকে একটি আম গাছ, একটি তাল গাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল?"[৯]

আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫ সাল, কলকাতা, নবযুগ প্রকাশনী) উপন্যাসটিও দুর্বিক্ষ ও দেশভাগের প্রেক্ষপটে গ্রাম বাংলার মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবিতে চিত্রিত হয়েছে।

> "১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় লেখক উপন্যাসটিতে হাত দেন। ...উপন্যাস রচনার পটভূমি আবু ইসহাক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর যাপিত জীবন থেকে। ... ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি নিয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে নারায়নগঞ্জ যেতে হয়। ...ঐ সময় ট্রেনে জয়গুনদের মতো অসংখ্য দুস্থ নারীকে তিনি দেখতেন। যারা ট্রেনে চড়ে ময়মনসিংহ যেতো এবং সেখান থেকে সস্তায় চাল কিনে ফিরে আসতো। ...এছাড়া নারায়নগঞ্জের স্টিমার ঘাটে এবং রেল স্টশনে হাসুর মতো অনেক নম্বরহীন কিশোর শ্রমিকও তিনি দেখেছেন।"[১০]

আবু ইসহাক তাঁর এই স্মরনীয় উপন্যাসে জয়গুন চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে অতি নিষ্ঠার সাথে দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের এক চরম সংকটময় বুভুক্ষার চিত্র এঁকেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক দুর্ভিক্ষের সংকটকে তুলে ধরেছেন –

> "আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই, বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পঞ্চাশের মন্বন্তরে হোঁচট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে। তাই দুই ছেলে-মেয়ের হাত ধরে জয়গুন আবার দিয়ে আসে গ্রামে, আশ্রয় নেয় গ্রামে এক 'সূর্য দীঘল বাড়ীতে'। কারণ –

> "অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। ...এক মুঠো ভাতের জন্য বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করেতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়।"[১২]

'সূর্য দীর্ঘল বাড়ী' – এই রকম বাড়ি গ্রামে খুব কম দেখা যায়। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী এই ছাড়া বাড়িতে ভূত-প্রেত বা নির্বংশ হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে গ্রামের লোকেদের বিশ্বাস, তাই জয়গুন এসে খুব সহজেই আশ্রয় পেয়ে যায় এই বাড়িটিতে।

ব্রিটিশ শাসন এবং শোষন থেকে বাংলার মানুষ মুক্তি পায় সাতচল্লিশে, তার পূর্বে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা বিভিন্ন বঞ্চনা ও অমানবীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিল। পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকের বাংলার গ্রাম মানেই ছিল কিন্তু দাপুটে অবস্থাসম্পন্ন মন্ডল – মাতব্বর আর বিভিন্ন কুসংস্কারের বেড়া জালে আবদ্ধ বসত ভূমি। গ্রামের এই সমস্ত অন্ধকার থেকে জয়গুণরা ভেবেছিল স্বাধীনতার পর মুক্তি পাবে। উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের বিপর্যস্ত ভাবনা ও দেশবিভাগের পটভূমিকায় জয়গুনের প্রতিচ্ছায়ায় নিম্নবর্গের মানুষের জীবন সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় গ্রামের সহজ-সরল মানুষের স্বপ্নের কথা অতি মনোরম ভাবে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক। স্বাধীনতা বা দেশভাগের জটিল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই সমস্ত অন্নহীন–বস্ত্রহীন মানুষেরা যেতে চায় না। তারা শুধু মাত্র বেঁচে থাকতে চায়, আর কিছু নয়, এই তাদের স্বপ্ন। জয়গুণদের বিশ্বাস দেশভাগ হলে পাকিস্তান হবে এবং সেখানে দু'মুঠো খেয়েপড়ে মাথা গুজে থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে, আর খাজনা লাগবে না, চালের মূল্য কমবে। কিন্তু দেশভাগের পর যখন তাদের সেই স্বপ্ন শুধুমাত্র অলীক কল্পনা হিসেবেই রয়েগেল, তখনই এই সরল খেটে খাওয়া মানুষগুলো ভেঙ্গে পড়ে হাতাশায়।

> "কত আশা-ভরসা আছিল। স্বদীন অইলে ভাত কাপড় সইয্য অইব। খাজনা মুকুব অইব, কিন্তু কি? বেবাক ফাঁটকি, বেবাক ফাঁটকি। আবার রেল গাড়ীর ভাড়াও বাইড়া গেল।"[১৩]

সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পরও জয়গুনরা হারতে জানে না, জীবনে বেঁচে থাকার যুদ্ধে পরাজিত হতে চায় না, তারা সবসময় শত কষ্ট বুকে চেপে জীবনের কঠিন পথে এগিয়ে চলে। তারা যেন কখনোই হারতে জানে না। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, করিম বকশের মৃত্যুর পর জয়গুনরা গ্রাম ছেড়ে 'সূর্য দীঘল বাড়ী' – ছেড়ে চলে যায়, এগিয়ে যায়, না জানা কোনো এক ভবিষ্যতের দিকে –

> "বহুদূর হেঁটে শ্রান্ত পাগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তারা গাছতলায় বসে। উচঁ তাল গাছটা এত দূর থেকেও যেন হাতছানি নিয়ে ডাকছে। আবার তারা এগিয়ে চলে..."[১৪]

এতো গেল স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশ ভাগের এক রকম দৃশ্যপট। কিন্তু এই দৃশ্যের পাশাপাশি অন্য আরেক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করে দিয়ে গেছিল ব্রিটিশরা। যা 'ছিটমহল' সমস্যা নামেই পরিচিত। তবে পরিচিত কথাটা বলা বোধ হয় যথাযথ হবে না, কারণ কিছুকাল আগে পর্যন্তও 'ছিটমহল' সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষজনেরা কিছুই প্রায় জানতো না বললেই ভাল। ছিটমহল নিয়ে গবেষনারত অমিতাভ ভট্রশালীর কথায় –

> "ভারত আর বাংলাদেশের ছিটমহলের সমস্যা সাড়ে ছয় দশকের পুরানো হলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সমস্যা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাহিত্যিক বা গবেষক বা চিত্র নির্মাতাদের কাছে ছিল অজানা। তাই ইন্টারনেটে সার্চ করলেও হাতে গোণা কিছু তথ্য পাওয়া যায়; আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা একেবারেই নগন্য।"[১৫]

শুধু তাই নয়, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত (ছিটমহল সমস্যা নিয়ে তথ্য চিত্র নির্মাতা)-র মতে –

> "বিদেশীদের কথা তো বাদই দিলাম, দিল্লি, মুম্বাই এমনকি কলকাতাতেও যখন আমার তথ্যচিত্রের প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতে গেছি, সবার কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকেছে যে, এক দেশের মধ্যে অন্য দেশ কীভাবে থাকে! অনেকে মনে করতেন আমি হয়তো বানিয়ে গল্প বলছি।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিটমহলের মতো একটি বৃহৎ মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত নগন্য – যা আমাদের কাছে সত্যি দুর্ভাগ্যের বিষয়। দেশভাগের এই অমানবিক ও জ্বলন্ত ক্ষতচিহ্ন সরূপ বয়ে চলা ৬৮ বছরের দুর্ভাগ্য 'ছিটমহল' সমস্যা নিয়ে বাংলা ভাষায় বর্তমান সময় পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র ছোটগল্প – প্রধাত অমর মিত্রের 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' ও 'চোখ আর নদীর জল' রয়েছে। নলিনী বেরার একটি গল্প 'মেখলীগঞ্জ তিস্তাপাড়ে' – গল্পটির বেশ কিছু অংশ জুড়ে ছিটমহল ও করিডরের প্রসঙ্গ ছিল। বার্ডরে পুলিশি অত্যাচারে কত নারী দারিদ্রের তাড়নায় সহজেই পুলিশের হাতে চলে আসতো গল্পটিতে সেই প্রসঙ্গই লেখক তুলের ধরেছেন। এছাড়া বাংলার সাহিত্যের আরও কিছু গল্পে ছিটমহল সম্পর্কিত কোনো আলোচনা বা পর্যালোচনা বা তথ্য কিছুই নেই, শুধুমাত্র ছিটমহল নামটাই উল্লিখিত হয়েছে। পাশাপাশি উপন্যাস মাত্র দু'টি এই প্রসঙ্গ বা পটভূমিতে রচিত হয়েছে। একটি হল বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'ভূমি ও কুসুম' (ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ্ন, ২০১০) এবং অন্যটি হল এপার বাংলার (পশ্চিমবঙ্গের) বিখ্যাত ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' (দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭)।

> "যথা বিহিত সন্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমার নিম্ন সাক্ষরকারী উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দা এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, গত শতাব্দীর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হইতে কি এক অজ্ঞাত কারণে ভারতীয় ভূ-খন্ডে অবস্থিতি উল্লেখিত মৌজগুলিকে পাকিস্তান বলিয়া দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে সেই পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পর আমরা উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দাগন বাংলাদেশি হইয়াছি। কেন হইয়াছি, তাহা আমাদিগের কপাল। কপাল না হইলে পাশের গ্রাম মনদাগুড়ি ইন্ডিয়া হয়, সেইখানে গ্রাম পঞ্চায়েত হয়, ভোটার কার্ড হয়, চিঠি হয়, কিন্তু আমাদের কিছুই হয় না।"[১৭]
> (যুদ্ধে যা ঘটেছিল/অমর মিত্র)।

বাংলাদেশে ও ভারতের ছিটমহল সমস্যা ছিটে বসবাসকারীদের অভিশপ্ত জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত অমর মিত্রের 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পটি কোচবিহারির (পশ্চিমবঙ্গ) জেলাশাসক মহোদেয়র নিকট বাংলাদেশী ছিটের বাসিন্দাদের একটি আবেদন পত্র লেখার ঠঙে গল্পটির এক ব্যতিক্রমী সূচনা হয়েছে। গল্পের বিষবস্তুর হচ্ছে স্বাধীনতার পূর্ববতী রাজন্য শাসিত ভারতবর্ষের কিছু কিছু অঞ্চলের বর্ণনা, স্বাধীনোত্তর সময়কালের ছিটমহল সমস্যা কেন্দ্রীক কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা। তারপর গল্পকার অমর মিত্র ইতিহাসের সাথে বাস্তবের ও বাস্তবের সঙ্গে নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়ে ছিটমহলের একেবারে সমকালীন বাস্তব চিত্রকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন এই গল্পে। গল্পটিতে অমর মিত্র দেখিয়েছেন মানুষের আদর্শ ও মানুষত্ববোধও কী ভাবে কাঁটা তারের কাঁটার মতো জীবনে শুধু দংশনই করে এবং নিজের দেহেই প্রতিবাদের স্প্রীহা কিভাবে বিষের মতো রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবনদর্শের মৃত্যু ঘটায়। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় একটি যুবতীকে কতগুলো যুবক ছিটে তুলে এনে তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করে, কত সুন্দর ভাবে নিজের অপরাধকে অনায়াসেই ধামাচাপা দিয়ে। নির্দোষ দুই ছিটের বাসিন্দার উপর সেই অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেয়, আর দেশহীন, নাগরিকত্বহীন, নিরপরাধ অসহায় এই সমস্ত ছিটের বাসিন্দাগন সত্যি জেনেও প্রতিবাদের সাহস বা ভাষা খুজে পায় না। শুধুমাত্র জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে সবাই বিবেকের নিষ্ঠুর দর্শন সহ্য করেও চুপ করে বসে থাকে।

ছিটমহল কেন্দ্রীক অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' উপন্যাসের আখ্যানও এক শেখর ছেড়ার দগ্ধ যুগসন্ধির চিহ্নবাহী দলিল স্বরূপ এই উপন্যাস আসলে সামাজিক অবক্ষয়ের ইতিহাসের অবিস্মরনীয় দলিল। ছিটমহলের এই বৃত্তান্ত লিখতে তিনি দীর্ঘ দিন ছিটমহল বাসিন্দাদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দীর্ঘ তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হল 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' উপন্যাসটি। উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত –

ক) 'কুমারী মেঘের দেশ চাই'- ৩১টি পরিচ্ছেদে ভারতের ভিতরে বাংলাদেশি ছিটের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।
খ) 'চোখ আর নদীর জল' – ২০টি পরিচ্ছেদে বাংলা দেশের ভিতরে ভারতের ছিটমহলের নিদারুণ রূঢ় বাস্তবচিত্র প্রস্ফুটিত করেছেন।

গ) 'কুমারী মেঘের দেশ নাই' – ৯টি পরিচ্ছেদে ছিটমহলে স্বাধীনতার ইতিহাসের বর্ণিত হয়েছে। ৬ই জুন চুক্তি হয় ঢাকায়, ২০১৫ সালের ১লা আগস্ট ছিটমহল স্বাধীন হয়েছিল; লেখক স্বয়ং সে ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, যার বর্ণনা আখ্যানের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মাধ্যে ঔপন্যাসিক প্রতিফলিত করেছেন।

সেলিনা হোসেনের 'ভূমি ও কুসুম' সম্ভবত ছিটমহল কেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এই প্রসঙ্গে ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন সংস্থার প্রকাশক মহাশয় নিজেই বলেছেন –

> "কিন্তু প্রকাশ হিসেবে খেঁজে নিয়ে জেনেছি, এখন পর্যন্ত এ বিষয়টি নিয়ে লেখা উপন্যাসের কথা এ দেশের অনেকেই জানেন না। বলার সাহস রাখি যে 'ভূমি ও কুসুম' এই বিষয়ের প্রথম উপন্যাস।"[১৮]

ছিটমহলে বসবাস-কারীদের জীবন সীমান্তরক্ষী, পুলিশ কিংবা সরকার নানান্ ভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে, এই উপন্যাসে সেলিনা হোসেন সেই বৃত্তান্ত নিখোঁত ভাবে বর্ণ্না করেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে উপন্যাসের রচিয়তা সেলিনা হোসেনের ছিটমহল সম্পর্কিত একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হল –

> "যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখনই শুনেছি ছিটমহলের কথা, তবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সে সময় ছিল না। আমার মাথায় সে সময় একটাই বিষয় ছিল – রাষ্ট্রের ভিতরে আরেকটি রাষ্ট্র কী অদ্ভুত ব্যাপার। নিজের রাষ্ট্র থেকে আবার নিজের রাষ্ট্রে আসতেই নাগরিকদের পাসপোর্ট – ভিসা লাগছে, অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভেতর বিপন্ন এই মানুষগুলো বেদনাহত করতে থাকে আমায়।"[১৯]

বিভাগোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে কথকতার এক নতুন অদ্ভুত সুন্দর ভুবন গড়ে উঠেছে।

> "মানুষের এই বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূতির ও আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে বিচিত্রত রূপ নিয়েছে। তার আনন্দলোক বৈচিত্রে ভরে উঠেছে। অবশেষে সভ্য মানুষ বলেছে, এই আনন্দলোকই তার শ্রেষ্ট সৃষ্টি। জৈব প্রয়োজনে তার মূল্য নেই, মনের প্রয়োজনে সে অমূল্য।"[২০]

মানুষ এই অমূল্য আনন্দের তাগিদেই সৃষ্টি করে সাহিত্যের নন্দন। উত্তাল চল্লিশের বিপ্লব, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, স্বাধীনতা লাভ, দেশ ভাগ, উদ্‌বস্তু সংকট কোনোকিছুই সাহিত্যের এই নন্দনকে নষ্ট করতে পারেনি। বিষয়বস্তুর নতুনত্বে, কাহিনির গঠন ও বর্ণায়, পটভূমির বৈচিত্রে, ভাষা বা বাগধারার স্বাতন্ত্রতায় সর্বোপরি দেশ-কাল-সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধ বর্ণায়, দেশভাগ ও দেশত্যাগের নিদারুণ যন্ত্রনার বর্ণায়, মানুষ্যত্বের গ্লানি ও দুঃসময়ের ক্ষতচিহ্নগুলির ঘৃণ্য ইতিহাস বর্ণনায় কালজয়ী ও তৎকালীন সময়ের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেশভাগের সাহিত্য সম্ভার। আর সেই সমৃদ্ধ বিশাল সাহিত্য সম্ভারকে সাক্ষি রেখেই বলা যায় যে, মানুষের জীবনে যতবারই আঘাত এসেছে, নিজের উপর বিশ্বাস, ও জীবনাদর্শই মানুষকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করেছে বার বার।

Reference:

১. মুরশিদ, গোলাম, 'হাজার বছরের বাঙালির সংস্কৃতি', অবসর প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৬, একাদশ মুদ্রণ – ২০১৯, পৃ. ১৫৫

২. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮, পৃ. ৭৬

৩. পত্রিকা 'কালের কন্ঠ', বাংলাদেশ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ – তে প্রকাশিত স্বকৃত নোমানের 'আগুনপাখির নেপথ্য গল্প' রচনা সংগ্রহের তারিখ - ৫/১০/২০২৪

৪. হক্, হাসান আজিজুল, 'আগুন পাখি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. শেষ পৃষ্ঠা।

৫. তদেব, পৃ. ১৯০

৬. তদেব, পৃ. ১৮৫

৭. তদেব, পৃ. ২৫২

৮. তদেব, পৃ. ২৫২

৯. তদেব, পৃ. ২৫২

১০. রাইজিং বি ডি. কম আচার্য, অঞ্জন, 'সূর্য দীঘল বাড়ী' গ্রামীন সমাজবাস্তবতার আখ্যান', প্রকাশ – ২০১৭
১১. ইস্‌হাক, আবু, 'সূর্য দীঘল বাড়ী', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা প্রথম সংস্করন – ১৯৫৫, ঢাকা বাংলাদেশ, পৃ. ৯
১২. তদেব, পৃ. ৯
১৩. তদেব, পৃ. ১৪
১৪. তদেব, পৃ. ১৩২
১৫. www.bbc.com/bengali, ছিটমহল নিয়ে তৈরি হচ্ছে গবেষনা কেন্দ্র', অমিতাভ ভট্রশালী, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ২০১৫, সংগ্রহের তারিখ - ১৫/০৭/২০২৪
১৬. ঐ, ছিটমহল নিয়ে তৈরি গবেষণা কেন্দ্র।
১৭. www.bbc.com/2016/11/, কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র সংকলন সংগ্রহের তারিখ - ১৫/০৭/২০২৪
১৮. হোসেন, সেলিনা, 'ভূমি ও কুসুম', ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১০, ঢাকা, পৃ. প্রকাশকের বক্তব্য অংশ।
১৯. দৈনিক প্রথম আলোর শিল্প ও সাহিত্য পাতা থেকে সংগৃহীত করেছে 'মধ্যবিত্ত', তারিখ – ১৪ জুন ২০১৯ ১২.৪১ P.M, www.facebook.com সংগ্রহের তারিখ – ২৫/০৭/২০২৪
২০. রহমান, মিজান হক, আবুল, কাসেম ফজলুল, সঙ্কলন ও সম্পাদনা, 'বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'মানুষ ও সংস্কৃতি', কথা প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্র প্র – ২০০৯, পৃ. ১৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 254 - 264
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিফলন : একটি বিশ্লেষণ

মানস কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : manasdas725@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Communalism, Secularism, Communal Award or MacDonald Award, Hindu-Muslim Unity, Religious Intolerance, Religious Fanaticism, Two-Nation Theory.

Abstract

Sarat Chandra Chattopadhyay is one of the legendary authors in Bengali literature, whose works consistently address socio-economic disparities, the establishment of women's rights, and above all, the promotion of humanitarian values and communal harmony. A closer analysis of his writings reveals that during the first half of the 20th century, when British imperialism exacerbated communal tensions and disrupted life in India, Sarat Chandra endeavoured through his literature to foster Hindu-Muslim unity, religious tolerance, and mutual respect.

His personal life and his novels and short stories show him as a devout humanitarian who believed that service to the nation was the true religion, transcending narrow religious divisions. His anti-communal stance and mind-set are evident in every aspect of his literary work. He sensitively discussed communal conflicts and emphasized the urgent need to resolve them. However, it is surprising that certain so-called "progressive" literary critics of our country did not recognize his worth. Instead, they labelled him as "conservative," a "staunch Hindu," "anti-Islam," or even "Muslim-hater" and "communal." These critics cited various statements by Sarat Chandra to support their claims.

The purpose of this research paper is to examine from a historical perspective how justified it is to accuse Sarat Chandra of being 'communal' or 'anti-Muslim' and to assess the validity of such statements within the political context of his time. Furthermore, this research will explore how Sarat Chandra's literary works reflected communal harmony, the historical context behind his writings, and how he encouraged people to transcend religious boundaries and embrace unity through his literary creations.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমন্বয় ঘটেছে। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করে। যা কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়। প্রথমেই বলে নেওয়া উচিৎ 'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে আমরা মূলত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকেই বুঝি। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝায় পরস্পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানি। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রিস্টান প্রভৃতি নানা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বাস হলেও যেহেতু সংখ্যাগত দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য বেশি তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারায় মূলত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রসঙ্গটিই অধিক গুরুত্ব পায়। আবার সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি কেবলমাত্র ধর্মের সাথেও সম্পর্কিত নয় - জাতিভেদ, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা এর অন্তর্ভুক্ত। ড. বিপান চন্দ্রের মতে, -

> "Communalism is the belief that because a group of people follow a particular religion they have, as a result, common social, political and economic interests. It is the belief that in India Hindus, Muslims, Christians and Sikhs from different and distinct communities which are independently and separately structured or consolidated."[১]

অর্থাৎ -

> "সাম্প্রদায়িকতা হল এমন এক বিশ্বাস যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল সেই বিশ্বাস, যা অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান ও শিখরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যারা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত।"[২]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও এই সকল বিরোধের মূলে ছিল ভ্রান্তবুদ্ধি ও অতিশয় ধর্মোন্মাদনা, তথাপি এই বিরোধ যে আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, রাজনীতি ও সমাজ জীবনকে পুনঃপুনঃ পঙ্কিল করে তুলেছে, অগণিত নিরাপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে, সাময়িকভাবে প্রচুর সংখ্যক সুস্থ মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে, অত্যাচারী ও লুণ্ঠক বিদেশী শাসক শ্রেণির হাত শক্ত করেছে এবং পরিণামে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানকে চরমতম দুর্ভাগ্যের অতলগর্ভে নিক্ষিপ্ত করেছে— এ এক নিষ্ঠুর অবিতর্কিত ও যন্ত্রনাদায়ক সত্য।

বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্কই থাকে না। কিছু স্বার্থপর মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সরল, সল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ও ধর্মোন্মোদনা-প্রবণ মানুষকে অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে তাদের বারুদের স্তূপে পরিণত করে এবং এক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, কোন রকমে আগুনের একটি স্পর্শ পেলেই তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তাই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রথমেই দরকার মানুষের মধ্যে থেকে ধর্মান্ধতার অবসান ঘটানো। 'সব ধর্মের সারকথা যে একই, পার্থক্য কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠানের' মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধির সঞ্চার করতে পারলে তবেই এই ধ্বংসাত্মক বিপদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করা অনেকাংশে সম্ভব হবে। আর এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য রাষ্ট্রনায়ক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সকলেই চিন্তিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর বিরামহীন সংগ্রাম সকলের স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথও 'হিন্দু-মুসলমানের সমকক্ষতার মধ্যে মিলন'[৩]-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে স্বপ্নের সার্থক বাস্তবায়ন আজও হয়নি। তাই এই বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মানবতার পূজারী শরৎচন্দ্র ছিলেন সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হলেও কখনোই অপর ধর্মের মানুষকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। তিনি দেশ সেবাকেই প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ।"[৪]

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই জাতি-ধর্মকে বড় করে দেখা নয়, মানুষের অভ্যন্তরে থাকা মানবিক সুকুমার বৃত্তির সুপ্রকাশই তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। চিন্তায়, দর্শনে তিনি ছিলেন এদেশের বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আমাদের দেশের কিছু 'প্রগতিবাদী' সাহিত্য সমালোচক[৫] শরৎচন্দ্রকে সে মূল্য দেননি বরং তারা তাঁকে 'রক্ষণশীল', 'গোঁড়া হিন্দু', 'ইসলাম ধর্ম বিরোধী', 'মুসলমান বিদ্বেষী', এমনকি 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (এক), 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (দুই) এবং 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' — শীর্ষক বক্তৃতা ও প্রবন্ধে উল্লেখিত বেশকিছু মন্তব্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেন। যেমন 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন, -

> "বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে— হিন্দুর সঙ্গে মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন", বা "একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই", অথবা "হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে— এ দেশে তাহার চিত্ত নাই" ইত্যাদি।[৬]

কিন্তু এগুলি যে শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য সাধনার মূল ধারণা নয়, বরং তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার ব্যতিক্রমী কিছু মন্তব্য তা যেমন তাঁরা বিচার করেননি, তেমনি এই রচনাগুলির প্রেক্ষাপট ও তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থারও বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। আর সেই কারণেই এই ভাষণ বা রচনায় শরৎচন্দ্রের পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাধারার মূল সুরের বিরোধী কিছু মন্তব্যের মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত কথা রয়েছে তার অর্থ অনুধাবন করতে এনারা সক্ষম হননি। এখন প্রশ্ন হল, এইভাবে একজন মানুষের শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কোনও মন্তব্যের ভিত্তিতেই কি তাঁর সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা বা মূল্যবোধের মূল্যায়ণ করা যুক্তিসঙ্গত?

যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এত বিতর্কের সূত্রপাত শরৎচন্দ্র 'বর্তমান হিন্দু–মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক সেই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে[৭] এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দু সংঘ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। তাছাড়া ঐ একই সংখ্যায় সজনীকান্ত দাসের 'শুদ্ধি অন্দোলন' নামেও অপর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। বস্তুত এই দুটি রচনা প্রকাশের জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লবী অনুজাচরণ সেনগুপ্তের ছয় মাসের কারাদন্ড হয় এবং পত্রিকাটিকে বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।[৮] এখন যদি ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে শরৎচন্দ্রের আলোচ্য উক্তিগুলির প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। মনে রাখা দরকার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট-এ একটি উগ্র হিন্দুবিরোধী বিক্ষোভ হয়, এতে ১৫৫ জন নিহত হন। কোলকাতায় ১৯২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে পর পর তিনবার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়। ঐ একই বছরে ঢাকা, পাটনা, রাওয়ালপিন্ডি ও দিল্লীতে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ছিল যুক্ত প্রদেশে। এখানে ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে প্রায় ৯১টি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[৯] খ্রিস্টোফ জেফ্রেল্ট (১৯৯৬) এই পর্বের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, খিলাফতের ছত্রছায়ায় মুসলমানদের যে সমাবেশ ঘটেছিল তারই ফলে হিন্দুদের মধ্যে হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ জেগে ওঠে। তাই হিন্দুরা আক্রমণাত্মক মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাল্টা সমাবেশে নামে।[১০] পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে আর্য সমাজ শুরু করে উগ্র শুদ্ধি অভিযান এবং হিন্দু মহাসভা আরো সক্রিয় হয়। ঐ সময়েই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। আর এই সব বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সমাবেশের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে

১৯২০-র দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।[১১] এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বন্ধের উদ্দেশ্যে মহাত্মাগান্ধী দীর্ঘ একুশ দিন (১৮-ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ৮-ই অক্টোবর ১৯২৪) অনশন করেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি শান্ত হল না। বরং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক দিনের পর দিন আরও তিক্ত হয়ে উঠলো। সাম্প্রদায়িকতার বলি হলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। আততায়ীর হাতে তিনি প্রাণ হারান। এই সময় দুই সম্প্রদায়েরই কিছু নেতা এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ মেটাতে সচেষ্ট হন। ডাঃ আনসারী ও লালা লাজপৎ রায় এই উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয় চুক্তিপত্র' (Indian National Pact) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' সম্পাদন করেন। তিনি ঐকান্তিকতার সাথেই চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান মিলন। কিন্তু তা ছিল নিছক রাজনৈতিক সমঝোতা। তাই তো ১৯২৫ খ্রিঃ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে (২২-২৩শে মে, ১৩২৬ খ্রিঃ) 'হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট' বা 'সিরাজগঞ্জ প্যাক্ট' বাতিল হয়ে যায়। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে পুনরায় চিড় ধরে। দেশের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। মদন মোহন মালব্য, লালা লাজপত রায় প্রমুখ 'হিন্দু মহাসভার' সঙ্গে যুক্ত হলেন, অপরদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি 'তনজীম' ও 'তব্‌লীগ' আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। এই পর্বে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যেন ইংরেজদের মনেও নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। হারকোর্ট বাটলার উল্লসিত হয়ে রিডিংকে লেখেন—

> "Hindu and Mussalman hate each other so much that they have not much time to hate us."[১২]

এই অবস্থায় ১৯২৬ সালে গান্ধীও রাজনীতি থেকে সরে যান। চর্তুদিকে হতাশা ও অবসাদ লক্ষ্য করে এবং একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অন্যদিকে হিংসাশ্রয়ী ঘটনার বাড়াবাড়ি দেখে গান্ধীজী দুঃখ করে লিখলেন—

> "My only lies in payer and answer to prayer."[১৩]

সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই রচনা প্রকাশের বহু আগে থেকেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণে ভারতবর্ষে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আর তিনি বিশ্বাস করতেন পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও ঐক্যকরণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ব্যতীত কেবলমাত্র সমঝোতা করে হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্ভব নয়। সেকারণেই তিনি খেদের (দুঃখের) সাথেই বলেছেন—

> "হিন্দু-মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোনো কাজেই আসে নাই।"[১৪]

কেবল তিনি নন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই জোড়াতালি দিয়ে যে ঐক্যের প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে সেদিন অনেকেই মত প্রকাশ করেছিলেন। মহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব বলেছেন, -

> "যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদের টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হল। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি বিনিময় হল না। একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে। সভায়, সমিতিতে, কংগ্রেসে, কনফারেন্সে, গোলটেবিলে, মিলন বৈঠকে এদের যে ঐক্য সাধনা, বস্তুতঃ সেটি হল সান্নিধ্য সাধনের প্রয়াস; তাতে অঙ্কের যোগ-বিয়োগের হিসাব প্রচুর, মনের যোগ-বিয়োগের, চিত্তের লেন-দেনের কথা সেখানে নেই।"[১৫]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, সত্য ছিল না।"[১৬]

শুধু তাই নয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা ছাড়া অধিকাংশ মুসলমানেরা[১৭] ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী জাতিয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বহুলাংশে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কংগ্রেসের মাত্র ৬.৫৯ শতাংশ প্রতিনিধিরা ছিলেন মুসলমান। এমনকি সৈয়দ আহমেদ খানের মত মুসলমান নেতারা জাতীয় কংগ্রেসকে একটি 'হিন্দু প্রতিষ্ঠান' বলেই মনে করত।[১৮] এমনকি স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে ও কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'The Loyal Mohammedans' নামক পুস্তিকায় ইংরেজ

শাসকদের প্রতি তাঁর একান্ত আনুগত্য ও অগাধ আস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও পুনরুজ্জীবনে সৈয়দ আহমেদ-এর ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয়; তবে তিনিই যে প্রথম হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ বপণ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন— হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। এমনকি হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন—

> "Now suppose that all the English were to leave India, then who would be rulers of India? Is it possible that under these circumstances two nations, the Mohammedan and the Hindu, could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not, …To hope that both could remain equal is to desire impossible and inconceivable."[১৯]

উইলিয়াম হান্টারের বক্তব্যেও উপরিউক্ত মন্তব্যের সমর্থন মেলে।[২০] এমনকি সেই সময় শিক্ষা এবং নবজাগরণের ভাবধারার সঙ্গে যাদের প্রথম সংযোগ ঘটেছিল, যেকোনও কারণেই হোক তাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় মতো হাত বাড়াতে না পারায় তারা আরো পিছনে পড়ে যেতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায়, প্রধানত প্রাগ্রসর হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান অপেক্ষা সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে নিজেদের সংগঠিত করে সরকারের আনুকূল্যলাভ তাদের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশী গ্রহণীয় বলে মনে হয়। আধুনিক কালের অনেক চিন্তাবিদও এই বক্তব্যকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।[২১] এমনকি আলি ভ্রাতৃদ্বয় (মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি) মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁরা প্রথমে মুসলিম, পরে ভারতীয়। তাই তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সমাজের অধিকাংশ ভারতের মুক্তিকে নিজেদের মুক্তি বলে মেনে নিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন –

> "ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনোদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে-কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।"[২২]

শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার যে তাঁর মধ্যে কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতাবোধ ছিল না বরং ধর্মের গোঁড়ামি থেকে বেড়িয়ে এসে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সকলকে একত্রিত ভাবে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যের হলেও একথা সত্য যে, এই ধর্মীয় অন্ধতার বশবর্তী হয়েই ভারতীয় মুসলমান সমাজের একটা বিরাট অংশ ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে যোগ না দিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের সুলতান খলিফার হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনকারীরা জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে শর্ত আরোপ করে যে, তারা বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করতে পারে, যদি কংগ্রেস মধ্যযুগীয় এই ইসলামিক রীতিনীতি পুনরুজ্জীবনের এজেন্ডা নিয়ে গড়ে ওঠা খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করে।[২৩] দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশায় গান্ধীজী এই প্রতিক্রিয়াশীল খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বহু মানুষ এর প্রবল বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্রও এই খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহও খিলাফৎ আন্দোলনের নিন্দা করে বলেছিলেন —

> "এই আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধী একদল ধর্মান্ধ মোল্লা ও উলেমাকে রাজনীতির প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা এবং খলিফার পুনর্বাসন অপেক্ষা আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতি সমর্থন অনেক বেশি সময়োপযোগী পদক্ষেপ হত।"[২৪]

কিন্তু চৌরিচোরা ঘটনার (১৯২২ খ্রিঃ ৫ই ফেব্রুয়ারি) পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে খিলাফৎ নেতাদের ভেতর সমঝোতাও দূর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে কামাল আতাতুর্ক বা মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে খালিফাদের শাসনের বা খিলাফৎ এর অবসান হলে ভারতেও খিলাফৎ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই খিলাফৎ আন্দোলনের নের্তৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে এসে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। তারই সাথে সাথে গান্ধীজীর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে গেল। সেই দিক থেকে দেখলে "মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে— এ দেশে তাহার চিত্ত নাই" শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে অতিশয়োক্তি কোথাও নেই বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন–

> "The Hindu-Muslim unity brought about by Gandhi in 1920-21 was artificial in character and did not produce any real change of heart."[২৫]

শুধু দুঃখের বিষয় এটাই যে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ধর্মীয় অন্ধতাকে অপসারণের যে প্রয়াস কামাল পাশা চালিয়ে ছিলেন প্রগতিশীল তুর্কীরা সেই প্রয়াসে নিজেদের নিয়োজিত করলেও মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় মুসলমান সমাজের একটা অংশ ধর্মীয় অন্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এ কারণেই হয়ত শরৎচন্দ্র দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—

> "খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। ...যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এতবড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। ...আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। ...এ ব্যাপারে বেশী খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এত খানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এত বড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই।"[২৬]

বাস্তবিক পক্ষেই খিলাফৎ আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে গান্ধীজি মস্ত ভুল করেছিলেন। এর ফলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং খিলাফৎ আন্দোলন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ধর্মীয় চেতনার সঞ্চার করেছিল তারই পরিণামস্বরূপ পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠতে পেরেছিল।

শরৎচন্দ্রের অপর যে বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল সেটি হল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এবং ১৭-ই জুলাই কলকাতার টাউন হলে[২৭] প্রদত্ত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (এক)' এবং 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (দুই)' শীর্ষক দুটি ভাষণের কিছু মন্তব্যকে ঘিরে। শরৎচন্দ্রের বক্তব্যকে উল্লেখ করেও অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান বিরোধিতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করার আগে আমাদের দেখতে হবে এই দুটি সভা আহূত হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত ভারত শাসন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই আইনে প্রাদেশিক আইনসভালগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এমনকি অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের জন্যও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মূলত ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখতেই ব্রিটিশ সরকার এই নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩২ সালের ১৬-ই আগষ্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি' গ্রহণ করে এই আইন ছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন। ১৯৩২ সালে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি অনুযায়ী মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আইন সভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দান করেছিলেন। এই নীতির মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মধ্যেও (বর্ণ হিন্দু ও নিম্ন হিন্দু) বিভেদ ঘটানোর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। এই নীতি ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের এই সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন (২০ শে সেপ্টেম্বর থেকে)। শরৎচন্দ্রও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাঁরই উদ্যোগে কলকাতার টাউনহলে বাঁটোয়ারা বিরোধী এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ এই দুই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যাখান করেন। কিন্তু তাঁদের সমবেত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' স্বীকার করে নিয়ে ভারত ভাগ ও ধর্মভিত্তিক দুটি রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হয়েছে। দেখা গেল শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাই যথার্থ। তিনি দুই সম্প্রদায়ের মিলন চাননি তা নয়, কিন্তু তিনি একে 'দুষ্প্রাপ্য বিধি' বুঝেছেন এবং এই নিধি একা হিন্দুর গরজে মিলবে না, মুসলমানদেরও গরজ চাই— দু'দশজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নয়— সমগ্র মুসলিম জনতার চেতনায় এই ঐক্যের বাসনা চাই। এখানে শরৎচন্দ্র যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন, ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য প্রথম থেকেই প্রয়োজন মতো হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই তোষণ করে গেছে। এই উদ্দেশ্যে মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা হিন্দুদের কাছে টেনে নেয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করলে শুরু হয় মুসলিম তোষণ। এক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখার যে কূটনীতি অনুসরণ করে গেছে শরৎচন্দ্র তার বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি অভিভাষণে শরৎচন্দ্র মূলতঃ সুকৌশলে ইংরেজদের বিভেদ সৃষ্টি করার চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। দেশে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ দৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার যে সুদক্ষ এবং হিন্দু-মুসলমান কোন অংশের জনসাধারণের যে এতে লাভ নেই— এ কথাগুলিকেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় উত্থাপন করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত দুটি নিবন্ধে শরৎচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক নয়, বরং অনবদ্য অসাম্প্রদায়িক মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে কেবল তৎকালীন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা উদ্ভবের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তাই নয়, অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে তিনি এই সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়েও আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করতেন ধর্মের মোহ থেকে মুক্তি ছাড়া এবং ধর্মীয় সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে এগিয়ে আসা ছাড়া প্রকৃত অর্থে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, -

> "ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনোদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে— কোনো ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এত বড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।"[২৮]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি যেকোনো ধর্মের গোঁড়ামি ও ধর্মের প্রতি মোহকে লজ্জাজনক ও বর্বরতা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে আপাতভাবে মুসলিম বিরোধিতার সুর শোনা গেলেও তিনি কোনও ধর্মের বিরোধিতা করেন নি, বরং মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান সমাজের সংঘর্ষের আভাসরূপে তিনি সমস্যাটাকে দেখাতে চেয়েছেন এবং এই সমস্যার সমাধানকল্পে শরৎচন্দ্র মূলত মুসলিম সমাজের গোঁড়ামিমুক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন।[২৯] সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে এই ধর্মান্ধতা (ধর্মতন্ত্র) ও ধর্ম কি একই না স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখনীই আমাদের বড় দিগ্‌দর্শন –

> "ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ...ধর্ম বলে মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে, ধর্মতন্ত্র বলে মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার কথা। মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"[৩০]

তবে তিনি যে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির বিরোধিতা করেছেন তা নয়, হিন্দু ধর্মে আচারের নামে মিথ্যা কুসংস্কার ও হিন্দু সমাজপতিদেরও ধর্মীয় শাস্ত্রাদির অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও শাণিত আঘাত হেনেছেন। যাঁরা শরৎচন্দ্রকে 'ইসলামধর্ম বিদ্বেষী', 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' বা 'রক্ষণশীল' ও 'গোঁড়া হিন্দু' বলে সমালোচনা করেন তারা হইতো সকলেই একটা সহজ প্রশ্ন এড়িয়ে যান যে, তিনি যদি রক্ষণশীলই হতেন তাহলে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এত শরৎচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন কেন? তিনি কোনোরকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা পরিচালিত হননি; হিন্দু বা মুসলমান বা ব্রাহ্ম সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি কশাঘাত করেছেন। এমনকি শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্যচ্যুত হননি। একথাও অজনা নয় যে, গোঁড়া হিন্দুসমাজ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এতদূর পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে, এমনকি তাঁকে 'একঘরে' করা হয়েছিল। তাঁর ধোপা, নাপিত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩১] সুতরাং ধর্মের গোঁড়ামিকে যিনি বর্বরতা ও লজ্জাকর বলেন, তাঁকে আমরা কি করে সাম্প্রদায়িক বলতে পারি?

শরৎচন্দ্র মনে করতেন একমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় প্রভেদ তাদের কখনও এক হতে দেয়নি। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। তাঁর মতে— 'হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের'।[৩২] তাই রীতি-নীতি, চাল-চলন, আদব-কায়দা, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি অনেক বিষয়েই হিন্দু মুসলমানে মিল থাকলেও ধর্ম তাদের ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর একমাত্র শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমেই মানুষের মধ্য থেকে এই ধর্মীয় সংকীর্ণতা দূরীভূত করা সম্ভব।[৩৩] এতদসত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হওয়ার জন্য তিনি আক্ষেপও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন কারোর একার প্রচেষ্টায় এই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যলাভ সম্ভব নয় এর জন্য সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকতে হবে। তাঁর ভাষায়—

> "জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়ত একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।"[৩৪]

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে আস্থাশীল ছিলেন এবং সমস্ত রকম ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ঘটিয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে একে অপরকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলে তবেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন সাহিত্যিক হিসাবেও শরৎচন্দ্র তাঁর দ্বায়িত্ব সম্পর্কেও যথেষ্ঠ সচেতন ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সাহিত্যই একমাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করতে পারে। এ কারণে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে যে সভা আহূত হয় তাতে তিনি বলেন—

> "হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ক্ষেত্রে সাহিত্য চাই। কেননা সাহিত্যিকের কোন ধর্ম নেই। সাহিত্যসেবকরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীশ্চান হোক তবু তারা পর নয়, আপনার জন।"[৩৫]

ধর্মান্ধ উগ্র মুসলমানদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি কিছু অসহিষ্ণু ও কটু মন্তব্য করেছিলেন। আবার মুসলিমদের মধ্যে যারা এসব উগ্রতার চর্চা করেন না তাদের প্রশংসাও করেছেন। হয়তো শরৎচন্দ্রের এই সমালোচনায় শিক্ষিত মুসলমানরা দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু সেই সময়ে বলা তো দূরের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেননি যে শরৎচন্দ্র মুসলিম বিদ্বেষী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেছেন। তাই যদি হত তাহলে ঐ ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে মুসলিম সাহিত্যিক ও সাহিত্য অনুরাগীরা পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যেতেন না।[৩৬] সম্ভবতঃ সেই সময়ে তিনিই একমাত্র অমুসলিম সাহিত্যিক যিনি এই সুযোগ পেয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে শরৎবাবু সম্পর্কে এতটুকু বিরুদ্ধতা বা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে কি এটা সম্ভব হতো! সর্বোপরি এই সাহিত্য অধিবেশনে তিনি অন্নদাশংকর রায়ের একটি উক্তিরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন যে, "অস্থির সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কখনও হবে না। আপস হতে পারে, জাতীয় ঐক্য, আত্মীয়তা কখনও হবে না।" এই নেতিবাচক উক্তি শরৎচন্দ্রের মনে নিরতিশয় যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল এবং তিনি এর প্রতিবাদও করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনন জগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুতরাং হিন্দু-মুসলিমের মিলনের প্রশ্নে তাঁর কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা এখানে উপলব্ধি করা যায়।

শরৎচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যেমন কোনও কোনও মুসলমান সাহিত্যিক কর্তৃক সমালোচিত হতে হয়েছে, তেমনি বেশ কিছু উদার-পন্ডিত সাহিত্যসেবী মুসলমান বন্ধু কর্তৃক তিনি প্রশংসিতও হয়েছেন। শুধু তাই নয় কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, জাহান-আরা-চৌধুরী প্রমুখ শরৎচন্দ্রকে মুসলিম সমাজ, তার সমস্যা, দৈন্যদশা নিয়ে সাহিত্য রচনার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে এই অভাব থাকায় তাঁরা অভিমানও করেছিলেন। আর কোনো সাহিত্যিককে নয়, শরৎবাবুর কাছেই এই আবেদন জানিয়েছিলেন। কতটা আপন মনে করায় তাঁরা এটা করতে পেরেছিলেন। শরৎবাবু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন এবং মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবকে বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, যদি বেঁচে থাকেন এরপর তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে তিনি লিখবেন। এমনকি ব্যক্তিগত ভাবেও জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তিনি বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের কথা লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত তাঁর ডি. লিট. উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে সমাবর্তন উৎসবে যোগদানের জন্য ঢাকায় উপস্থিত হলে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যার জন এণ্ডারসন্ যখন তাকে হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য দূর করার জন্য মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনা করার পরামর্শ দেন, তখন সেই প্রস্তাব তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এবং ঢাকার বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক

জীবনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবে ঢাকায় থাকাকালীনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আর ঢাকা থেকে ফেরার এক বছরের মধ্যেই তিনি প্রয়াত হন।[৩৭] এইভাবে আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর সেই আশা ও প্রতিশ্রুতি অপূরিত থেকে গেছে। এটা শুধু মুসলিম সমাজেরই ক্ষতি নয়, সমগ্র দেশেরই ক্ষতি। সুতরাং মুসলমান সমাজ ও মুসলিম সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকার সামগ্রিক মূল্যায়ণ না করে, দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন সেই সময়কার বিচ্ছিন্ন কিছু মন্তব্যকে ভিত্তি করে শরৎচন্দ্রকে 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' বলে অভিহিত করা হয়ত যুক্তিসঙ্গত নয়।

তবে একথাও অনস্বীকার্য, যে কারণই থাকুক না কেন শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য অপ্রত্যাশিত। তবে তিনি যে মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন না বা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তনে কোনও অনুদারতা ছিল না তা তাঁর নিজ লেখাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

> "হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষন যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এই নয় যে, এই দুই প্রতিবেশীর জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাততঃ চোখে না পড়ে এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না।"[৩৮]

সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য চাইতেন না বলে শরৎচন্দ্রকে যারা সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেন, তাঁদের সে ধারণা সত্য নয়।

যদিও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সাম্প্রদায়িক বা মুসলমান বিদ্বেষী বলা যুক্তি সঙ্গত কিনা তা আলোচনা করার সময় এটা নয়। তার মতাদর্শকে সামনে রেখে আমাদের পরস্পরের জাতিগত-ধর্মগত বিদ্বেষ ভুলে ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কোনরকম ধর্মীয় উগ্রবাদ বা স্থূল জাতীয়তাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে না ওঠে পরস্পরকে ভাই বলে জ্ঞান করে একদল কুচক্রী, উভয়ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী গুটিকয়েক মানুষের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই আমরা এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিসম্বাদের অবসান ঘটিয়ে কবি কাজি নজরুল ইসলামের স্বপ্নকে পূরণ করতে সক্ষম হব - "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান,/ মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।/ এক সে আকাশ মায়ের কোলে যেন রবি-শশী দোলে।/ এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।/ মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।"

Reference:

১. Chandra, Bipan. Communalism in Modern India, New Delhi, Vani Educational Books, 1954, p.1

২. চন্দ্র, বিপান. আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কলকাতা-১২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৯, পৃ. ১

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, প: ব: সরকার, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ২৪০

৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৮৪

৫. প্রাগুক্ত

৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬০

৭. Chatterjee, Joya. Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition (1932-1947), Cambridge, Cambridge University press, 1994, P. 271

৮. শারদীয় নন্দন, ১৩৮২

৯. সরকার, সুমিত. আধুনিক ভারতঃ ১৮৮৫-১৯৪৭, কলকাতা-১২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪, পৃ. ১৯৯

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর. পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, দিল্লী, ২০০৪, পৃ. ৩৯৭

১১. Pandey, Gyanendra. The Construction of Communalism in Colonial North India, Oxford University Press, Delhi, 1992, p. 234
১২. ত্রিপাঠী, অমলেশ. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ১৩৩
১৩. Sarkar, Sumit. Modern India (1985-1947), Delhi, Mackmillan, 1983, p. 237
১৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'বর্তমান হিন্দু মুসলিম সমস্যা', শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬০
১৫. 'বুলবুল', মাসিক পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৪৩
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. লোকহিত, 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী (12-শ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৫৬৩
১৭. ব্যতিক্রম ছিলেন বদরুদ্দীন তায়েবজী, আর. এস. সায়ানি, এ. ভিমজি, হামিদ আলি খাঁ প্রমুখ। তাঁরা জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তায়েবজী ১৮৮৭ সালে এবং সায়ানি ১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর. পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, দিল্লী, ২০০৪, পৃ. ৩৯৬
১৯. Sen, Sachin. The Birth of Pakistan, General Printers & Publication, 2007, p. 42
২০. Hunter, William Wilson. The Indian Musalmans, London, Trubner and Company, 1876, p. 70-82
২১. এই মতবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ W. C. Smith, Modern Islam in India, London, 1943; A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism, Bombay, 1948; Abdul Hamid, Muslim Separatism in India : A Brief Survey, Lahore, 1967 ইত্যাদি।
২২. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬১
২৩. দেবদাস, ননীগোপাল. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী (১৬০০-১৯৪৭), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯. পৃ. ৪৫-৫২
২৪. গুহ, রায়, সিদ্ধার্থ. ও চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন. আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৬৪, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৬৯৪
২৫. Majumdar, Dr. R.C. History of the Freedom Movement in India (vol. III), South Asia Books Publishers, 1988, P. 424
২৬. বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৫৮
২৭. এলবার্ট হলে সভাপতির ভাষণ: 'বাতায়ন' ১৫-ই শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. সেন, সুজিত. 'সাম্প্রদায়িকতা রবীন্দ্র ভাবনার একটি দিক', সুজিত সেন (সম্পা.), ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, প্রগতিশীল প্রকাশন, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৬৮
৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. কালান্তর, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ৬-৮
৩১. রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩
পৃ. ১৬৫ [শরৎচন্দ্র ২৯-৬-১৯১৬ তারিখে তাঁর পুস্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন— "... জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে' আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়...।" ওই সময়ই শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে দিদি অনিলা দেবীর বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। এখানে চিঠিতে 'দেশে আমি একঘরে' বলতে লেখক তাঁর দিদিদের গ্রাম এবং তার আশে পাশের গ্রাম গুলির কথাই বলেছেন।]
৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, প: ব: সরকার, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ৩৬৪
৩৩. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬১

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

---

৩৪. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬১

৩৫. এলবার্ট হলে সভাপতির ভাষণ: বাতায়ন ১৫-ই শ্রাবণ ১৩৪৩

৩৬. ঘোষ, প্রভাস. 'স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লববাদ ও শরৎচন্দ্র', মণ্ডল, তরুণ. (সম্পা.) শরৎচন্দ্র: অনুপম শৈলীতে ভাস্বর মনীষা, সারা বাংলা ১২৫ তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃ. ৩০৭

৩৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ. 'শরৎচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ', বিশ্বনাথ দে (সম্পা.), শরৎস্মৃতি, কলকাতা ৭৩, সাহিত্যম, ১৩৮৪, পৃ. ২৮৫

৩৮. প্রাগুক্ত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 265 – 272
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নুড়ি বাঁদর : প্রকৃতি-পরিবেশ ও ‘অবিশেষ’ মানুষের গল্প

ড. অতনু শাশমল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : atanumukul@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Monkey (Bandar), Small pebble, Brahma, Mahabharata, Woman, Globalization, Earthly Environment, Uniqueness, Metaphor.

Abstract
Manindra Gupta (1926-2018) is better known as a poet. He has written approximately sixteen books of Poetry: 1. Amra Tinjan, 2. Nil Pathorer Akash, 3. Moupokader Gram, 4. Lal Schoolbari, 5. Chhatrapalash Chaitye Dinsesh, 6. Sharatmegh o Kashfuler Bandhu, 7. Manindra Gupter Kabita, 8. Kabita Sanggraha, 9. Nameru Mane Rudraksha, 10. Tungtang Shabdo NihShabdo, 11. Shreshtha Kabita, 12. Bone aj Kancherto, 13. Mouchushi jay Chhadnatalay, 14. Kabita Sanggraha, 15. Barir Kapale Chand, 16. Asurder Meye. His first book of poetry was published in 1949. From 1949 to his death (31 January 2018), his literary career spanned about 67-68 years. However, during this extensive period, he wrote a novel at the beginning of the second half of the 20th century, called 'Anupama'. After that, Manindra wrote four novels (1. Prem, Mrityu Ki Nakshtra, 2. Nuri Bandar, 3. Altamosi, 4. Nengti) in the first two decades of the 21st century and in the last part of his life. The second novel out of these four novels is 'Nuri Bandar'. Although he was a poet, Manindra showed special skills as a novelist in the novel 'Nuri Bandar'. In this novel, a monkey is seen, whose birth story is miraculous. Although he was born from a small pebble, his life experience is extraordinary. His curiosity about 'Brahma', his attempt to compare life with the Mahabharata, his curiosity and search for the various forms of women, his apprehension about globalization, and above all his concern and resistance about the earthly environment, have given this novel its uniqueness. In fact, various dimensions of life have been reflected in this novel through metaphor. Thus, it can be seen that through various actions and diverse experiences, he has finally adopted a life like an ordinary human being, including a house, wife and daughter, in a natural environment. Therefore, this novel is also extremely human despite being apparently about a monkey.

Discussion

মানুষের তৈরি সমতলের পথ হঠাৎ বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়েছে উত্তরের পাহাড়মালা আর তার অরণ্যে। ওই পাহাড় আর নিবিড় গভীর হয়ে আসা বনানীর স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্নতায় অনেক প্রকার পোকার বিচিত্র আওয়াজের মাঝে পাহাড়ি চড়াই পথের আচমকা শুরু। পাহাড়ের শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ক্রমশ ঊর্ধ্বগত সেই পথ, তার বিপরীতে হাঁ-করা গভীর শূন্য খাদ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শৈলশ্রেণির পাদদেশ থেকে শুরু করে সাত-আট হাজার ফুট ওপরের পার্বত্য অরণ্যানী ক্রমাগত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর উচ্চতায় আরোহণ করে অমলিন সূর্যালোককে ধরে রাখবার জন্য তাদের ডালপালা ও সুগহন ঘন পাতার অপূর্ব প্রাকৃতিক আধারকে মেলে ধরেছে সেখানে। পাহাড়তলির জংলা নাম না জানা গাছ অহোরাত্র ভাসমান মেঘকে কাছে ডেকে নিয়ে এসে অঝোর বর্ষণে সিক্ত করে দেয় বনাঞ্চলকে। সামান্য ওপরে দেবদারু পাইনের বসতি, আরোওপরে ছবির মতো তুষাররেখায় পপলারের শ্রেণি। নীচে ঘন অরণ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, শেয়াল, অন্ধকারের ময়াল পাইথনদের বসবাস। পাচ-ছয় হাজার ফুট ওপরে যেখানে অরণ্য হাল্কা হতে শুরু করেছে— সেখানকার ফুল, মৌমাছি, মৌচাক আর কুয়াশা বড় মনোরম ! হিম ভাঙা পাহাড়ি নরম রোদ্দুরে মধুলোভী ভালুকদের অলস বিচরণ, আর পাহাড়ের ধাপে ধাপে, নীচ থেকে উঁচু পর্যন্ত বিচিত্র সব পাখিদের নীড়। সবচেয়ে নীচে টুনটুনি দোয়েলের মতো পাখি, তার ওপরে থাকে টিয়া ময়না পায়রা ফেজেন্ট কাক জাতীয় পাখি। এদের ওপর ধাপে থাকে চিল বাজ প্যাঁচা। আর খুব ওপরে যেখানে চতুষ্পদ প্রাণীরা যায় না, সেখানে বৃক্ষের মাথায় বা পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে থাকে সোনালি ঈগলেরা। তারপর কয়েক হাজার ফিট জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতাহীন শীত কুয়াশা মেঘ রোদ্দুরে জড়াজড়ি করা খাদ আর পাহাড়ের উঁচু শিখর। এভাবে ২৯ হাজার ফিট উচ্চতায় একেবারে পর্বতের শীর্ষচূড়া। সেখানে আবহাওয়ার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। প্রখর তুষারপাত ঝঞ্ঝা যেন দক্ষ পর্বতারোহীকে উড়িয়ে অদৃশ্য করে দেবে। আর বারো হাজার ফিট উঁচুতে বসবাস করে পার্বত্য আইবেক্স ছাগল ইত্যাদি।

মণীন্দ্র গুপ্তের *নুড়ি বাঁদর* উপন্যাসের সূচনার *দেশকাল* অংশকে অনুসরণ করে এই দেশের উত্তরের পর্বতমালার একটি বিরল বিবরণ উপস্থাপন করলাম মাত্র। বিরল এই কারণে উত্তরের এই পর্বতমালা অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তবে এরও অনতি অব্যবহিত পূর্বে *নুড়ি বাঁদর* উপন্যাসের সূচনা-বাক্যে রয়েছে একটা ঝাঁকুনি। বাক্যটি এরকম: *এই দেশের উত্তরে ছিল পর্বতমালা*। উপন্যাসের সূচনায় অতীতকালবাচক 'ছিল' ক্রিয়াপদ দেখে মনে হবে যেন অনেক পরবর্তী সময়ের ফ্ল্যাসব্যাক। প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। অতীত কালবাচক ক্রিয়া 'ছিল' প্রথমেই আখ্যানের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করছে, যে অবশ্যম্ভাবী ভাবী ভয়াল স্বভাবের অনিবার্য আখ্যান আর বিবৃত হবে না, তাকে কল্পনা করে নিতে হবে। আসলে এটা ঠিক anticipatory summary[১] নয়। এর প্রকৃতিটা অনেকটা ফ্ল্যাস ফরোয়ার্ডের[২] ধরনের হয়েও শেষপর্যন্ত তার মতো নয়। ফ্ল্যাসফরোয়ার্ডে সচরাচর গল্পটা বলা হয় বা হবে। কিন্তু *নুড়ি বাঁদর*-এ তা নয়। এখানে কবি-ঔপন্যাসিকের ভবিষ্যৎ কল্পনাশক্তির ঘোর অসামান্য! পরমুহূর্তেই নিজ কল্পনাকে সামলে নিয়েছেন তিনি। বলেছেন - ' ছিল কেন? এখনও তো আছে। আজ আছে, কাল থাকবে না— আমার মনে সেই না-থাকার ছায়া পড়েছে।'

অর্থাৎ উপন্যাসের সূচনা-বাক্যে ভয়ংকর আশঙ্কার কথা উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃতি-পরিবেশের বিনষ্টি ও তার অনিবার্য ফল সম্পর্কিত দুর্ভাবনা উদ্বেগের চিন্তাই আরম্ভে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

এরপরেই ঔপন্যাসিক যেন অতীতে ফিরে গেছেন। সে-ই অতীত যেন তা প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। আবার আসলে যা আজও আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তা থাকবে না। বলতে হচ্ছে আবারও, সে-ই সময়টা নেইও বটে, আবার আছে এটাও সত্য। যেন এক আশ্চর্য মায়াবিশিষ্ট জগৎ। এখানে ঔপন্যাসিকের সময়ের হিসেবনিকেশ বড় বিস্ময়কর! অতীত ও বর্তমানকে স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করেও ঔপন্যাসিক উভয়কেই একই সমতলে রেখে বিবৃত করে যান, তার সঙ্গে ভবিষ্যৎকেও আবার অবলোকন করেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যেন একই সঙ্গে এই উপন্যাসে পরবর্তীতে বলা 'স্ফটিকের বিশাল এক ডুডেকাহেড্রনে'র[৩] মতো, যার একাধিক তল (বারো) ত্রিমাত্রিক বা থ্রিডাইমেনশনাল সমস্ত-কিছু 'স্বচ্ছ হয়ে মায়া আয়নার মতো দৃশ্যমান হয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তারা ঘষা কাচের মতো ঝাপসা হয়ে গোপন থাকে।' ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতেও তাই তাদের মধ্যের সেই ভেদরেখাকে আর দেখা যায় না। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্ত একাকার হয়ে যায়।

এখানে বলতে হয়, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষবেলায় পরপর অন্ততপক্ষে চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, যে উপন্যাসগুলিতে সময়ের বিচিত্র মাত্রার অভিনব অনাদিম প্রয়োগ লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রকাশকালের ব্যবধানে চারটি উপন্যাস হল -

১. *নুড়ি বাঁদর* (অক্টোবর ২০১৬) ২. *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা, অতীশ দীপংকরের পৃথিবী* (নভেম্বর ২০১৭) ৩. *চৌথুপীর চর্যাপদ* (২৫ ডিসেম্বর ২০১৭) এবং ৪. *সুধাশ্যামলিম তুমি* (জানুয়ারি ২০১৯)। এর মধ্যে চতুর্থ উপন্যাসটির (*সুধাশ্যামলিম তুমি*)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২০১৩-র মে মাস থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে দুটি পত্রিকায় নানা পর্যায়ে বিভিন্নভাবে ২০১৫-র আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়া সম্পন্ন হয়। আর প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় উপন্যাস *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* 'উত্তরবঙ্গের' একটি পত্রিকায় (মধ্যবর্তী) একটা সময়ে (আনুমানিক ২০১৫-র সংলগ্ন সময়ে, যে-সময়ে *সুধাশ্যামলিম তুমি* উপন্যাসের পরিশিষ্ট-অংশ *কোন সুধাশ্যামলিম* নাম নিয়ে ওই একই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল) 'প্রতি মাসে বেরোতে শুরু করেছে এক-একটা কিস্তি।'[৪] তবে গ্রন্থরূপ পাওয়ার দিক থেকে সর্বাগ্রে *নুড়ি বাঁদর*-এর স্থান আসবে। প্রায় অদূরবর্তী একই সময়ের চারটি পৃথক উপন্যাসে সময়ের জটিল গতিপ্রকৃতির নির্মাণ-বৈচিত্র গবেষকের আলোচনার কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় হতে পারে।

যাই হোক, মণীন্দ্র গুপ্ত কবি বলেই বেশি স্বীকৃত। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের অন্তিমে (গ্রীষ্ম ১৩৫৬/ ১৯৪৯) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ (*আমরা তিনজন*) প্রকাশিত হয়। এরপর কবিতার বইয়ের প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে পরবর্তী শতাব্দী অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দুই দশক পর্যন্ত। *অসুরদের মেয়ে* (জানুয়ারি ২০১৬) তাঁর জীবিত অবস্থায় (১৯২৬ - ২০১৮) প্রকাশিত সম্ভবত শেষ কাব্যগ্রন্থ। অর্থাৎ প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৪৯ থেকে শুরু করে তাঁর জীবনাবসানকাল (৩১ জানুয়ারি ২০১৮) পর্যন্ত প্রায় সাতষট্টি-আটষট্টি বছরের সুবিস্তৃত সাহিত্য-জীবনে (যার মুখ্যাংশ জুড়ে রয়েছে কাব্যচর্চা) আনুমানিক বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে (মহালয়া, ১৩৫৭) *অনুপমা* নামে একটি 'বই' - এরপর জীবনের একেবারে শেষ লগ্নে তিনি হাত দিয়েছিলেন উপন্যাস রচনায়। মোট চারটি উপন্যাসের (১. *প্রেম, মৃত্যু কি নক্ষত্র* : মে ২০০৫, ২. *নুড়ি বাঁদর* : অক্টোবর ২০১৬, ৩. *আলতামসী*, ৪. *নেংটি*। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বই হয়ে বেরোয়নি। ডিসেম্বর ২০১৮-তে *উপন্যাস সংগ্রহ*-তে প্রথম দুটির সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয়।) সবগুলোই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। চারটি উপন্যাসের দ্বিতীয় উপন্যাস *নুড়ি বাঁদর* আমাদের আলোচ্য।

তবে কেবল পরিবেশ-চেতনাই এই উপন্যাসের একমাত্র বিষয় ও লক্ষ্য নয়। বক্ষ্যমাণ লেখার সূচনাতেও পরিবেশের সঙ্গে বিরল প্রজাতির সময় ব্যবহারেরও সামান্য ইঙ্গিত করেছি আমরা। কিন্তু শুধু এই নয়, এ সমস্ত কিছুর সঙ্গে আরো অনেক বিষয় প্রসঙ্গও রয়েছে, যেমনটা অন্যান্য উপন্যাসেও লক্ষ করা যায়। এরকমই রয়েছে এই উপন্যাসে প্রাচীন সময়ের পুরাণের ব্যবহার এবং রূপকের অপূর্ব প্রথা ভাঙা তাৎপর্যগত প্রয়োগ।

এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় (নাম: দেশকাল)-এর অন্তে পাহাড়ি আইবেক্সদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হতে দেখি। কিন্তু *নুড়ি বাঁদর* নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আইবেক্স ছাগলের দল বিশেষত তাদের দলপতির সক্রিয়তায় এই উপন্যাসের পুরাণ প্রসঙ্গের জাগরণ ঘটল বলা যায়। পাহাড়ের কোলে একটি প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসা 'প্রাণ সঞ্জীবনী অথবা ম্যাজিক খনিজ' বহনকারী প্রস্রবণের সংস্পর্শে ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। পাহাড়ি আইবেক্স 'ছাগলদের দলপতির খুরের চাট খেয়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুতদর্শন নুড়ি লাফিয়ে উঠে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে।' আর তারপরেই 'প্রাচীন এলিক্সার অফ লাইফ বা সঞ্জীবনী জলধারা'র স্পর্শে জেগে উঠল এক প্রাণ। আশ্চর্য সেই সলিল প্রবাহের স্পর্শে নুড়ি বদলে হয়ে গেল বাঁদর অর্থাৎ 'নুড়ি বাঁদর'। *নুড়ি বাঁদর*-এর জন্মেতিহাসকে বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মহাভারত নামক আদি পুরাণের শরণাপন্ন হলেন।

সামান্য বিশদ করে বলা যেতে পারে বিষয়টিকে। মণীন্দ্র গুপ্তের *নুড়ি বাঁদর* এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত *সম্পূর্ণ মহাভারত* অনুসরণে দেখতে পাই, প্রাচীন খ্রিস্টপূর্বকালে মহাভারতের আখ্যানের একেবারে আদিলগ্নে চেদি দেশে পুরু বংশে উপরিচর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অন্য এক নাম বসু। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিধন্য এই রাজা ইন্দ্রপ্রদত্ত দিব্য স্ফটিকনির্মিত আকাশগামী রথে শূন্যে বা ওপরে ভ্রমণ করতেন বলে তাঁর নাম উপরিচর। উপরিচরের রাজ্যের রাজধানীর কাছে ছিলেন এক নদী (নারী), তাঁর নাম শুক্তিমতি। ওই সময় এক সচেতন পর্বত কোলাহল কামান্ধ হয়ে স্রোতস্বতী শুক্তিমতী নদীর প্রতি সম্ভোগাভিলাষী হলে রাজা উপরিচর কোলাহলের মস্তকে পদাঘাত করায় বিদীর্ণ পর্বত কোলাহলের মস্তকের প্রহারমার্গ থেকে স্রোতবহা শুক্তিমতী নির্গত হলেন। এই নদীর গর্ভ থেকে জাত হলেন এক পুত্র ও কন্যা। শুক্তিমতি নদী প্রীতমনে সেই পুত্র ও কন্যাকে রাজার নিকট অর্পণ করলেন। রাজা উপরিচর গিরিকা নাম্নী সেই কন্যাকে রানি করে নিলেন। যদিও গিরিকা নন, অদ্রিকা নামের এক মৎস্যরূপা অপ্সরার উদর থেকেই এই পুত্র ও কন্যার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উদ্ভব[৫], তবুও 'সেকালের প্রথাগত বংশধারা অনুযায়ী', সম্ভবত রানি গিরিকাই 'হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের দিদিমা।' এভাবে ঔপন্যাসিক বলতে চাইলেন: 'মহাভারতের সময়ে যদি এসব ঘটতে পারে তবে এখনই বা ঘটবে না কেন?' দেখা যাবে, ঔপন্যাসিক তাঁর বক্তব্যকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে পুরাণের উদাহরণ (পর্বত ও নদীর মিলনে মানুষের উৎপত্তি)-কে অবলম্বন করলেন শেষপর্যন্ত।

এই উপন্যাসের ৭ নং অধ্যায়ে (শিরোনাম : *রানিমা*) যে আদিবাসী রানিমা ও পঞ্চস্বামীকে দেখি, তাঁরাও প্রায় পুরাণের অনুবর্তী। মহাভারতের স্বর্গারোহণে পথযাত্রী দ্রৌপদী ও তাঁর বিখ্যাত পঞ্চস্বামীদের কথা মনে করাবে। উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে 'নদী-উপত্যকার দাঁতাল'কে বাঁদর 'ঐরাবত বানিয়ে' ডাকলেও (৩ নং অধ্যায় : *সাধু মহাত্মা*) উপন্যাসের আখ্যানে কিন্তু অতি প্রাচীন সময়ের জাম্ববান (রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়কার 'রামের মন্ত্রী'। *গোল টেবিল বৈঠক* শিরোনামাঙ্কিত ১৬ নং অধ্যায় দ্র.) ও জাম্ববতীর (উপন্যাসে যথাক্রমে জাম্ববানদা ও জাম্ববতীদি) প্রসঙ্গ কেবল উল্লিখিতই হয়নি, গল্পদেহে তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, *রানিমা* অধ্যায়ে অন্ততপক্ষে দু-বার জাম্ববতীর প্রসঙ্গ রয়েছে। একবার তো জাম্ববতীদিকে তাঁর সহচরীদের (ভল্লুকী, বাঁদরী ও গোপ তরুণী প্রভৃতি) ও বাঁদরের অবাধ মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার পর বিদায়বেলার রোরুদ্যমান সহচরীদের সম্পর্কে বলতে শুনি, 'আমার হয়েছে জ্বালা, যাবার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজবে আর ঝুপ ঝুপ করে কেঁদে ভাসাবে।'[৬] অন্যত্র জাম্ববতীর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে কৃষ্ণের মৃত্যু ও রাজপ্রাসাদসমেত দ্বারকা-র আরবসাগরে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় *প্রত্যাবর্তন* শিরোনামাঙ্কিত ১২ নং অধ্যায়ে রয়েছে।

আগেই বলেছি, এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সময়ে সময়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের বিভাজনরেখাকে লুপ্ত করে দিয়ে গল্প বলতে থাকেন। একটা ভিন্ন সময় অন্য আর একটা পৃথক সময়ের ঘাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাই বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের অতিপ্রাচীন কোনো চরিত্রও তার অনেক পরবর্তী বর্তমান সময়ের চরিত্র-জগতে 'সুপার ইমপোজ'[৭]-এর মতো এসে উপস্থিত হন। যেমন এই উপন্যাসের *রানিমা* শিরোনামাঙ্কিত ৭ নং অধ্যায়ে যে স্বর্গারোহণে মহাপ্রস্থান পথে এক আদিবাসী রানি ও তাঁর পঞ্চস্বামীকে দেখি, তাঁরা সকলেই বর্তমান সময়ের মানুষ। রানিমা তাঁর হাতের কুঁড়োজালি থেকে সাদা ট্যাবলেট বের করে জিভের তলায় রাখেন, তাঁর হাতের দামি আধুনিক মোবাইলে ' বিপন্ন বরফ'-এর কথা ফুটে ওঠে। তাঁদের হাজার একর জমি, দিঘির পাড়ের রাজপ্রাসাদ, শীত-বসন্তে সাহেব-মেমদের সঙ্গে বিলাসবহুল মেলামেশা ও পোলো খেলার মাঝেও কিন্তু বাদ পড়েনি জ্ঞাতিশত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ খুনোখুনি ও পাঁচ পুত্র সন্তানের মৃত্যু-কথা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে মহাভারতের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তাঁদের দারুণ রকমের মিল। এক জায়গায় প্রথম স্বামীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে চিহ্নিত করা যায় নিমেষে। রানি মা বলছেন, 'ওই দ্যাখ, ওঁরা চলেছেন মহাপ্রস্থানের দিকে। বাঁদর দেখে, কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ আরও পেকে গেছে— লম্বা যুধিষ্ঠির আরও একটু ঝুঁকে পড়েছেন, কাঁধে একখানা দেহাতি গামছা। যুধিষ্ঠিরের ওই চেহারার সঙ্গে সুপার ইমপোজ করছে এক নম্বর সিংদেওয়ের কৃশ দেহ, কাঁধের দেহাতি গামছাটা তিনি পেঁচিয়ে নিয়েছেন মাথায়।' স্পষ্টতই বর্তমান সময়ের বিশেষ জীবনরূপের সঙ্গে পুরাকালের জীবনস্বরূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এমন একাকার সমীকৃত হয়ে যাওয়া রূপকের অব্যর্থ প্রয়োগ উপন্যাসে বহুক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, সমগ্র উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বাঁদর, সে বাঁদর হয়েও বারংবার বাঁদর এবং মানুষ, দু-ই— এক রূপ থেকে অন্য রূপে তার ক্রমাগত যাওয়া-আসা এবং শুধু এই নয়, তাকে ঘিরে রূপকের অপূর্ব কারিকুরি একই গল্পদেহে অন্য যে অনন্য এক আখ্যানকে পরিস্ফুট করে : শেষ পর্যন্ত তা হল 'পার্থিব বস্তু-পরিবেশ'[৮]-এ লালিত সাধারণ অবিশেষ মানুষেরই গল্প।

এই উপন্যাসের বাঁদরকে আরো দেখি, তার জন্ম যেমনই হোক, বাঁদর হয়েও সে প্রথম থেকেই মানবোচিত অভিপ্রায় (human interest)-এ সিক্ত। আদিম মানুষেরই মতো আত্মরক্ষার্থে তুষার চিতার থাবা ও দাঁতকে প্রতিহত করেছে সে। আবার ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ও ইন্দ্রিয়-অগোচর অনুভবের পার্থক্যকে সে প্রায় মানুষিক চেষ্টা দিয়ে আয়ত্ত করেছে। সাধু মহাত্মার আচারসর্বস্ব ব্রহ্মচর্য তথা ব্রহ্মতত্ত্বের অসারত্বকে সে ভেদ করেছে গড়পড়তা বা অ্যাভারেজ মানুষের মতো করেই। এরকমই আদিবাসী রানিমায়ের স্নেহ ভালোবাসায় জীবনের সারল্য সত্যকে জেনেছে সে, আবার রিণু (হরিণী হয়েও নারী), ফ্রেয়া-পিপি-টেরাসু পর্বতারোহিণী তিন নারীর সংস্পর্শ তাকে জীবন বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলেছে। বিশেষত ত্রয়ী নারীর কাছ থেকে পশু হয়েও সে মানুষের মতো করে নরনারীর সম্পর্কগত চেহারাকে স্পষ্ট বুঝেছে। বয়কাট মেঘবরন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চুলের বাঙালি পুতুলপ্রতিমা পাল কিংবা পিপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে তার আধুনিক বয়ফ্রেন্ড সত্তা, লৌহমানবী হলেও নরউইজান ফ্রেয়া বডিবিল্ডারের সঙ্গে তার রক্তমাংস সম্পর্কের অনায়াস অবাধ যৌন অভিজ্ঞতা, জাপানি আমা টেরাসুর সঙ্গে তার সহোদর-সহোদরার সম্পর্ক তাকে আপ্লুত করেছে, তার মধ্যে মনুষ্য সত্তার জাগরণ ঘটেছে ক্রমশ।

উপন্যাসে আরো দেখি, রিণু, সে কেবল হরিণী নয়, সে যেন তার প্রেমের প্রতিমা। উপন্যাসে নারীকে এরকম বিচিত্র রূপকে (Metaphor) বলার চেষ্টা রয়েছে। হরিণ (হরিণী), ছাগল (ছাগলী), বাঘ (বাঘিনি)-এর মতো 'মাকড়সা মেয়ে', 'পাহাড়ি বিছেদের মেয়ে', কী 'পাছাপেড়ে শাড়ি পরা সোনার বরন রানি মৌমাছি' যার 'বিড়ে খোঁপা আঁট করে বাঁধা', এমনকী জাম্ববতীদির সহচরী ভল্লুকী, বাঁদরী, গোপিনী এবং পরবর্তী সময়ের 'প্রতিবেশিনী ভাল্লুকী', 'বাঁদরিণী' প্রভৃতির কথা থাকলেও হরিণী (নারী)-র দিকেই তার পক্ষপাতিত্ব। বিশেষত পর্বতারোহী তিন নারী তার কাছে 'তিন প্রজাতির হরিণী'[৯]। 'ছোটখাটো টেরাসু নাচুনে রঙ্কু হরিণী, পিপি কৃষ্ণসার' (উপন্যাসের একজায়গায় এরকমও রয়েছে : যুবতী কৃষ্ণসার হরিণরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। বারশিঙ্গা হরিণরা বেশি মোহময়ী হলেও, বনের মায়া আর লাবণ্য কৃষ্ণসার মেয়েদেরই বেশি।[১০]), 'ফ্রেয়া হচ্ছে একটি বল্গা হরিণী'।

উপন্যাসে আরো দেখা যায়, পর্বত অভিজানে 'অ্যাভালানশ' বা ধস নামক সাক্ষাত-মৃত্যুর হাঁ-মুখ থেকে অঘটন-ঘটন পটীয়সী বাঁদর সহোদরাপ্রতিম টেরাসুকে রক্ষা করবার পর পর্বতশৃঙ্গ কে-ফাইভ বিজয় একরকম সম্পন্ন হল। তারপর নাগরিক পর্বতারোহী আকাদেমি আয়োজিত সংবর্ধনা উৎসবে টেরাসুর জন্যে আমন্ত্রিত হল অরণ্যবাসী বাঁদর। শহুরে-সভ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য পোশাক বাধ্যতামূলক। জাপানি টেরাসুর ইচ্ছেতে বাঁদর গায়ে 'ঢিলে, বোতামহীন লাল রঙের একটা দামি কিমোনো' পরেছে, 'ঢাকা জুতো তার লম্বা আঙুলের পায়ে ঢোকে না' বলে 'স্ট্র্যাপ দেওয়া স্যান্ডেল' পরেছে সে। সভায় তার মতো 'একজন আশ্চর্য বর্ণাঢ্য ব্যক্তিকে' দেখে প্রায় সবাই অভিভূত। একমাত্র ব্যতিক্রম সুদর্শন দীর্ঘকায় আমেরিকান জ্যাক বয়ফ্রেন্ড, যে কিনা পর্বতারোহিণী ফ্রেয়ার প্রেমিক। ইতিপূর্বে উপন্যাসে রিণু হরিণী প্রসঙ্গে রিণুর জনৈক বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক 'দ্বৈরথ'[১১] কে বাঁদর এড়িয়ে গেলেও এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হল না। ফ্রেয়ার প্রেমিক 'অহংকারী' জ্যাক 'নির্গুণ হওয়ায় তার অহংকার' 'সুরার প্রভাবে' 'মাত্রাছাড়া' 'ফেনিল হয়ে পড়ার উপক্রম।' অযাচিত ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্যে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাযোগ্য 'রিসাস বাদর'-এর 'বেখাপ্পা গল্প'-এর প্রসঙ্গ অবতারণা করে বসল সে। শহুরে সভ্যতার দাঁত নখ মেলা তথাকথিত মার্জিত পোশাকধারী নাগরিক মানুষের স্পর্ধায় সে (বাঁদর) বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। জ্যাক বয়ফ্রেন্ডকে সমুচিত শাস্তি (লাথি) দিয়ে সে পোশাকী সভ্যতাকে পরিত্যাগ করল এভাবে: 'ঘর থেকে বেরিয়ে গা থেকে কিমোনোটা খুলে ভাঁজ করে রেখে দিল পথের পাশে। তারপর রাস্তার গাছে গাছে লাফিয়ে অন্ধকার রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন সে একজন সাধারণ বাঁদর। কে তাকে চেনে, কে তাকে ধরে!' আমি একে বলতে চাইছি একটি রূপের পোশাক (তথাকথিত শহর-সভ্যতা)-কে ছেড়ে অনাড়ম্বর রূপের আদি অকৃত্রিম পোশাকে একেবারে 'সাধারণ' হয়ে ফিরে যাওয়া। একে কি রূপক বলব না?

যাইহোক। এরপর *প্রত্যাবর্তন* (১২ নং অধ্যায়)-কে ধরে 'বাঁদরের জীবনসংস্কারের প্রথম ভাগে পূর্ণ'তার দিকে আবার যাত্রা শুরু। সময় পাল্টাচ্ছে, এসেছে নতুন তাৎপর্যবাহী কাল। উপন্যাসের একেবারে সূচনায় প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ে যে আশঙ্কার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, এমনকী উপন্যাসের মধ্যে মধ্যেও (যেমন রানিমার আধুনিক মোবাইলে অবিরাম দূষণ ও উষ্ণতায় হিমবাহের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় বসুন্ধরা-পরিবেশের সার্বিক ভারসাম্যের বিনষ্টির প্রসঙ্গ) যে অপ্রতিরোধ্য নৈরাশ্যজনক ক্ষত বিক্ষত আবহ উপন্যাসের আখ্যানের কণ্ঠস্বরকে ব্যথিত ও পীড়িত করেছিল, তা এই পর্যায়ে এসে যেন তার সার্বিক সংহার রূপ ধারণ করল। উপন্যাসের পটভূমি পার্বত্য ব্রহ্মপুর এখন অন্যরকম। 'হিমবাহের এলাকা যেখানে ছিল সেখান থেকে ওপরে উঠে গেছে। কে একটা লোক ওই উচ্চতায় আপেলবাগান করবে বলে তোড়জোড় করছে। জায়গাটা এবং জীবজন্তুদের জীবন অনেকটাই পাল্টে গেছে।' 'হিমবাহ' ও 'আপেলবাগান' দুটি শব্দের ভেতরে নিদারুণ অর্থবহ গল্প যেন লুকিয়ে রয়েছে। প্রথমটি পরিবেশসংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি পরিবেশকে ধরে নতুন প্রজাতির 'trade', যা শুধুই 'বাণিজ্য' নয়, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে 'multidimensional concept'[১২] (এর মধ্যে বাণিজ্য বা 'trade' গুরুত্বপূর্ণ)-ও এবং আসলে যা 'Globalisation' বা 'বিশ্বায়ন' নামক বহুঅর্থদ্যোতক শব্দ হিসেবে পরিচিত। ১৯৬০-এ সম্ভবত এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শব্দের উৎপত্তি। তবে মুখ্যত নব্বই-এর দশকে সমগ্র বিশ্বের নানা দিক পরিবর্তন-রূপান্তর (যার ভেতরে trade, technology, industry এবং economy প্রভৃতির একটি সার্বজনীন দিক রয়েছে)-কে অবলম্বন করে সম্মিলিতভাবে একটা সাংস্কৃতিক প্রকৌশল হয়েও বিশ্বায়ন খুব নির্দিষ্টভাবে মুখ্যত পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলির বিশ্বজোড়া বাণিজ্য-'Mechanism' দ্বারা প্রভাবিতই নয় কেবল, নিয়ন্ত্রিতও। সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিশ্বায়ন পৃথিবীর সংক্ষেপণ (Compression) এবং সমগ্র বিশ্বচেতনার তীব্রতা (intensification of the consciousness of the world as a whole) এই দুটো ব্যাপারকেই বোঝায়। বিশ্বায়ন নামক কর্মকৌশল কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠানকে নিজের মতো করে আধুনিক সার্বজনীন হতে দিকনির্দেশ করে। সহিংসপন্থার (violence) নজরদারি (surveillance)-ব্যবস্থায় মুখ্যত পুঁজি (capital) আর শিল্প (Industry)-কে একচেটিয়া করে রাখার (monopolisation) প্রয়াসী হল বিশ্বায়ন নামক বিশেষ প্রকৌশল।

বিশ্বায়নের কথা বলতে গিয়ে আমরা সামান্য উপন্যাসের আখ্যান থেকে সরে এসেছি। আবার ফিরে আসছি উপন্যাসের 'হিমবাহ' ও 'আপেলবাগান' প্রসঙ্গে। বলতে চাইছি, কবি-ঔপন্যাসিকের এও নিজ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত রূপকের আবরণে গড়া আর এক অনন্য আখ্যান। প্রসঙ্গত মনে করতে চাইছি অলংকারের সে-ই পুরনো প্রসঙ্গ-কথা। অলংকরণ বা মণ্ডনের মূল উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি, তার চমৎকারিত্ব নির্মাণ, সাধারণ বিষয়ে অসাধারণত্ব সন্ধান। আবার বস্তুর যথাযথ রূপ নির্মাণ অসম্ভব, তাই তার যথাসম্ভব প্রতিরূপ নির্মাণই স্রষ্টার উদ্দেশ্য। উপমা সেই ধরনের সাদৃশ্য নির্মাণের ফল। সাদৃশ্য নির্মাণে উপমান-উপমেয়র নিহিত সাদৃশ্য বা সম্পর্কটিকে আবিষ্কার করে যে সাদৃশ্যবাচক অলংকার নির্মিত হয় তা বহুবিচিত্র। সাধারণত উপমান-উপমেয়র মর্যাদা রক্ষা করে অথবা তাদের একটিকে বেশি মর্যাদা দিয়ে এই বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়। একটু প্রথা ভেঙে বলতে পারি, রূপক হল একধরনের লুপ্তোপমা। আবার এখানে বিদ্যমান উপমান উপমেয়র সাদৃশ্যে অভেদের আরোপ। আমরা এ লেখায় প্রথা অসিদ্ধভাবে লুপ্তোপমা অর্থে এই রচনার রূপককে দেখতে যাচ্ছি। বলতে চাইছি, বিষয় বা উপমেয় এখানে দৃশ্যমান, আর যার সঙ্গে তুলনার কথা বলা হচ্ছে, অভেদের আরোপ-এ তা কিন্তু উহ্য নয়, একান্ত নিঃশব্দ তার উপস্থিতি। তাই নিয়ম বা প্রথা ভেঙে এই রচনার 'হিমবাহ' ও 'আপেলবাগান'-এর গভীরে সূক্ষ্ম অনুভবের সাদৃশ্যবোধে জেগে ওঠে যথাক্রমে 'ইকোক্রিটিসিজম'[১৩] ও 'গ্লোবালাইজেশন'-এর নিঃশব্দ ধারণার পদচারণা। হিমবাহ-এর পূর্বস্থান ছেড়ে ঊর্ধ্বস্থান আরোহণ বা হটে যাওয়া পশ্চাদপসারণ হল প্রকৃতি-পরিবেশের বিনষ্টির সূচনা-মুহূর্ত, আর আপেলবাগান নামক নতুন সময়ের ট্রেড বা বাণিজ্য বিশ্বায়নের প্রস্তুতিমাত্র। এর মধ্যে সময়োচিত পুরাতন পন্থী 'বুড়ো' শ্রীবাস্তব সাবেকি সামন্তপ্রভুদের কথা ক্ষণেকের জন্যে মনে করালেও 'বড়' শ্রীবাস্তবের 'প্রগাঢ় ব্যবসাবুদ্ধি' বিশ্বায়নের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে উপন্যাসে বাতাসে পোড়া ধোঁয়া, পাহাড়ের গোড়ায় ফাটল, সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান স্ফীতিকর হিংস্র উল্লাস, পশুদের ষষ্ঠ বিলুপ্তকালের শবানুগমন, আসন্নমৃত্যু সিংহদের নিশ্চিহ্ন হবার পালার কথা ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, থাকবে হয়তো কোনোক্রমে ম্যাগট, মানুষ আর আরশোলা। এই সঙ্গে উপন্যাসের পট ব্রহ্মপুর পাল্টেছে। তার স্থানিক মাহাত্ম্য (পরিবেশ-পটভূমিগত)-ই নয় কেবল, তার চরিত্র-স্বভাবও পরিবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য এরকম: 'হিমবাহ গলে গলে সরে গেছে, নদীর উৎসের স্রোত আর তত প্রখর নয়, তুষাররেখা পিছিয়ে গিয়ে আপেলবাগানের সম্ভাবনা আর সীমারেখা বাড়িয়ে দিয়েছে।' এখানে আবার স্মরণ করাই, এই আপেলবাগান কেবল মামুলি শখের আপেল বাগানের গল্প নয়। এখানে দেখানো হচ্ছে কীভাবে পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ফেলে নতুন ট্রেড ব্যবস্থার 'সম্ভাবনা' উঁকি দিচ্ছে কেবল। সেই বিশ্বায়ন নামক ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক প্রসিদ্ধ দাদাগিরি (violence): 'নীচের বনে কারা যেন গণ্ডারদের ছেলে নিস্তারণকে খুন করে তার শিং কেটে নিয়ে গেছে। এ তল্লাটে এসব এই প্রথম। শ্রীবাস্তব অ্যান্ড শ্রীবাস্তব বাগান কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা ব্রিচেস পরে, হাতে হান্টার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো-সখনো দু-একটা লোককে দেখা যায় স্লিংয়ে বন্দুক ঝুলিয়ে যাতায়াত করছে।'

প্রাথমিকভাবে পাল্টা প্রতিবাদ এসেছে অবশ্য, যেমনটা হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে আইবেক্সদের পাড়ার 'বেতাল নামের তরুণ ছেলেটা' ভগ্নীপতি শ্রীবাস্তবের বাড়িতে বেড়াতে আসা ছোট শালাকে খুন করে বসল। ঘটনা হিসেবে বিষয়টা বিক্ষিপ্ত হলেও এর সুদূরপ্রসারী ফল হল পরিবেশ নিধন এবং সংঘর্ষ ও যুদ্ধ। প্রতিরোধ গড়ে উঠল, যুদ্ধশেষে বসল বিশ্রুত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গোল টেবিল বৈঠক-এর অনুকরণে আলোচনাসভা। সন্ধি ও যৌথ উদ্যোগ একটা আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বছরে তার সমূহ সম্ভাবনা বিসর্জিত হল। ততদিনে জাপানি নাবিকের হাতে একশো শুশুক খুন, য়ুরোপে ভাল্লুক ও নেকড়ের এবং আমেরিকান প্রেইরির কোটি কোটি মোষ চির অবলুপ্তির পথে, পশুরাজ সিংহেরও দিন শেষ।

কিন্তু সহনশীল ধরিত্রীর বিনষ্টি এই উপন্যাসের প্রার্থনা নয়। একাধিক ভূমিকম্পও তাকে শেষপর্যন্ত টলাতে পারে না। 'কদিন আগে পাহাড়ে আর সংলগ্ন সমতলে কয়েক বার ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পৃথিবীর ভিতরে শিলাসন মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করে, একটু-আধটু ধাক্কাটাক্কা লাগে। এটাই ভূমিকম্পের কারণ, বেশি উদ্‌বেগের কারণ নেই।'[১৪] কীভাবে যেন এক 'বাঁদরিণী' 'ভূমিকম্পে ছিটকে এসে পড়েছিল এই বনে', বাঁদর যেখানে থাকে। দুঃখিত বিমর্ষ গল্প নতুন সম্ভাবনায় জেগে ওঠে আবার। 'তারা একটা গাছে সংসার পাতল।' ইতিপূর্বে 'বাঁদরের পুংস্ত্ব হরিণী মানুষী ছাগলী সবার মধ্যে'[১৫] নিজের নারী বাঁদরিটিকে অনুসন্ধান করে ফিরে অবশেষে অকস্মাৎ এই প্রার্থিত নারী 'বাঁদরিণী'[১৬]-কে খুঁজে পেয়ে গেল। বাঁদরের স্বীকারোক্তি : 'আমি, বাঁদরিণী, জাম্ববানদা, শ্রীবাস্তব, যারা আছে, যারা অবলুপ্ত সবাই আছি এই দাউ দাউ করে ছুটে চলায়। মদ মাংস মধু পুড়ছে, মিষ্টি গন্ধ অগুরু চন্দন পুড়ছে। দুর্গন্ধ পুড়ে পুড়ে গন্ধহীন হচ্ছে। পুড়ে সব হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফুরোচ্ছে না। কোনোদিন ফুরোবে না।' এভাবে বাঁদরের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অফুরান ('এই অফুরন্তই ব্রহ্ম।'[১৭]) উপলব্ধিতে তৃপ্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে অরণ্য-পরিবেশই হয়ে ওঠে তার একান্ত কাঙ্ক্ষিত ঘর। 'ইকোলজি' নামক চিন্তা ভাবনায় 'ইকোস' শব্দের মানেও হল ঘর[১৮]। এই অরণ্য-পরিবেশ মণ্ডিত ঘরই তার একান্ত প্রাপ্তি শেষপর্যন্ত। ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা, করুণাময়ী রানিমা, রিণু, পিপি-ফ্রেয়া-টেরাসু সকলকেই পশু হয়েও সে স্ব-অর্জিত মানুষী সত্তা দ্বারা আবিষ্কার করেছে। রিণু, ফ্রেয়া, পিপি, টেরাসু কোনো নারী-সত্তা তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। পোশাকি শহুরে সভ্যতার মায়াও তাকে বিবশ করতে পারেনি, চরম অবহেলা ভরে সে একে প্রত্যাখ্যান করেছে। সর্বোপরি সর্বংসহা বসুন্ধরাকে আরক্ষা দেওয়ার জন্য তার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং এই বিষয়ে ব্যর্থতাবশত তার একাকিত্ব নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা তাকে আরো মানবিক করে তুলেছে। বিশেষ সময়ের 'একজন বর্ণাঢ্য ব্যক্তি' (সংবর্ধনা সভা স্মরণীয়), পর্বতারোহিণী 'ফ্রেয়া বডিবিল্ডারের সুইট হার্ট' কিংবা এই উপন্যাসের 'গোল টেবিলের গাঁধীজি' হওয়া সত্ত্বেও এসব কোনোকিছুই তাকে স্পর্শ করল না আর। প্রকৃতিকে ঘর ভেবেই সেখান থেকেই সে বেছে নিল তার ঘরনিকে। প্রকৃতির কোলে আশ্রয়ে নিতান্তই অনাড়ম্বর অকৃত্রিম পিতৃস্নেহে কন্যা সন্তানকে পেয়ে আনন্দে সাধারণ অবিশেষ হয়ে রইল সে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, অলোক, আখ্যানের তত্ত্বভুবন, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২২৩

২. ক. দাস, অমিতাভ, আখ্যানতত্ত্ব, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০, পৃ. ৪১

খ. চক্রবর্তী, অলোক, পূর্বোক্ত আখ্যানের তত্ত্বভুবন, পৃ. ২১১, ২২২ - ২৩২

৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র, উপন্যাস সংগ্রহ, নুড়ি বাঁদর, অবভাস, কলকাতা-৮৪, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৯১

৪. সন্মাত্রানন্দ, নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা, ধানসিড়ি, কলকাতা-৫০, তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭), পৃ. ১৯৪

৫. ক. বসু, রাজশেখর, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত/ সারানুবাদ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রা. লি., কলকাতা-১২, ষষ্ঠ মুদ্রণ : ১৩৭৮, পৃ. ২১-২২

খ. ভট্টাচার্য, সুখময়, মহাভারতের চরিতাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৯, পঞ্চম মুদ্রণ: কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ৩১১

৬. গুপ্ত, মণীন্দ্র, পূর্বোক্ত উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ১১৬

৭. তদেব, পৃ. ১১২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. চক্রবর্তী, সুমিতা, প্রাক্কথন, দ্র. কবিতা নন্দী চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা/ রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮

৯. গুপ্ত, মণীন্দ্র, পূর্বোক্ত উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ১২৭

১০. তদেব, পৃ. ১০০

১১. তদেব, পৃ. ১১৪

১২. P.N. Pandey, Globalisation, Cultural Change and the Issue of Global Uniformity, Globalisation, Development and Culture; Rawat Publication, Satyam Apts, Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 (India), p. 224

১৩. চক্রবর্তী, সুমিতা, প্রাগুক্ত প্রাক্কথন, দ্র. পূর্বোক্ত কবিতা নন্দী চক্রবর্তী রচিত বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা, পৃ.৮

১৪. গুপ্ত, মণীন্দ্র, পূর্বোক্ত উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ১৫১

১৫. তদেব, পৃ. ১২৫

১৬. তদেব, পৃ. ১৫২

১৭. তদেব

১৮. কবিতা নন্দী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা, পৃ. ২২৩

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 273 - 278
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘বিনদনি’ ও ‘মাকচক হরিণ’ : এক কৌম ভাষা ও কৌম জাতির ক্রমবিলীয়মান অস্তিত্বের আখ্যান

ড. অর্পিতা রায় মৌলিক
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, বজবজ কলেজ
Email ID : amiatri123@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Rava Language, Heritage, Ethnicity, Culture, Existence.

Abstract
Amiya Bhushan Majumdar, a renowned and exceptional writer of Bengali literature. In most of his works, North Bengal is colourfully portrayed in its multi-varied aspects. He brings North Bengal, the nature and people’s life there, into the landscape of his works and presents their forest-centric life story also. However, it would be bit unfair to call his works only nature-centric. In many cases, shades of Scandinavian literature can be found in Amiya Bhushan’s works. Makchak Harin and Binodoni are his two such creations. Here, the story of a tribal community called Rava and the many crises that are looming over them find their exposure. One such crisis is the crisis of language. The Rava language is rapidly declining. Though the Rava language has a rich cultural heritage, it is currently classified as a ‘vulnerable language’ by UNESCO due to declining number of its speakers and the increasing influence of the other dominant languages. When a community loses its language, its survival is at stake and the roots of its very existence are cut off. This is exactly what happened to the Rava tribe. This discussion will attempt to address this issue and emphasise on the reasons lurking behind this tragedy.

Discussion

রাভা ভাষা চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) ভাষা পরিবারের তিব্বতি-বার্মান (Tibeto-Burman) শাখার অন্তর্গত। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাভা ভাষা প্রচলিত। এক গভীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও এই ভাষা আজ অনেকাংশেই বিপন্ন। আসলে যেকোনো জাতির কাছেই তার ভাষা হল এক অনন্য সম্পদ। কিন্তু সেই মাতৃভাষাই যদি কখনো বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন খুব সঙ্গত ভাবেই সেই গোষ্ঠীর অস্তিত্বের শেকড়েই যেন আঘাত পড়ে। আর ঠিক সেটাই হয়েছে রাভাদের ক্ষেত্রে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার প্রভাবে রাভা জনজাতি আজ তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলছে। আর ঠিক এই কারণেই জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁর ‘Linguistic Survey of India’ গ্রন্থে (৩য় খন্ড, ২য় পর্ব) রাভা ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই ভাষাকে দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু এক ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৬১ সালের জনগননা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ৬০০০ জন রাভা জনজাতির মানুষদের মধ্যে ৫০০০ জন তাদের মাতৃভাষা হিসেবে রাভা ভাষা ব্যবহার করত। অথচ ২০০১ সালের জনগননার তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে রাভা জনজাতির মানুষের সংখ্যা ১৫০১৪ জন হলেও তাদের মধ্যে মাতৃভাষা হিসেবে রাভা ভাষাকে বেছে নেওয়ার সংখ্যাটা অনেকটাই কম। নিঃসন্দেহেই এই তথ্য বেদনাদায়ক। ভাষার এই বিপন্নতা কিভাবে এক জাতিসত্তার বিপন্নতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও প্রতিফলিত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস সেকথাই তার পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

বহু জাতি ও উপজাতির মানুষদের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ। মেচ, ভুটিয়া, লেপচা, রাভা, টোটো, কোচ, লিম্বু, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, রাজবংশীসহ বহু মানুষের সহাবস্থান উত্তরের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এক নিজস্বতা দান করেছে। এইরকমই এক উপজাতি সম্প্রদায় হল রাভা। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতই মূলত তাদের আবাস স্থল। কর্ম তথা জীবিকার ভিত্তিতে রাভারা মূলত পাঁচটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। সেগুলি হল রংদানিয়া, পাতি, দাহুরী, মাইতোরী এবং কোচ। এদের মধ্যে কোচদের বাদ দিলে বাকী চারটি উপগোষ্ঠীর নামের উৎস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা অনেকটা এরকম - রাভাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে রঞ্জন দ্রব্য জোগাড়ের দায়িত্ব যাদের ওপর ছিল তারাই রংদানিয়া রাভা নামে পরিচিত। অন্যদিকে লম্বা আঁকশির সাহায্যে কাক তাড়ানোর দায়িত্ব যাদের ওপর ছিল তারা দাহুরী রাভা নামে পরিচিত। অন্যদিকে উৎসব অনুষ্ঠানে রান্না-বান্না ও পরিবেশনের ভার ছিল মাইতোরী রাভাদের ওপর। পাতি রাভাদের কাজ ছিল পাতা সরবরাহ করা। তবে কোচ রাভাদের নামকরণের উৎস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকের মতে 'কম্বোজ' শব্দটি থেকেই কোচ শব্দটির উৎপত্তি। আবার অনেকের বক্তব্য 'কুবাচ' অর্থাৎ দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলার কারণেই এদের নামের সঙ্গে 'কোচ' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। তবে 'কম্বোজ' শব্দটি থেকেই 'কোচ' এর উৎপত্তি বলেই অধিকাংশ পণ্ডিত মত পোষণ করে থাকেন। তবে এরা ছাড়াও চুঙা, বিটালিয়া, টোটনা, হানা নামেও রাভাদের বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠী আছে।

অন্যান্য সাধারণ জাতি ও উপজাতির মানুষদের মতো রাভাদেরও রয়েছে নিজস্ব ভাষা, যা তাদের স্বকীয়তার পরিচয়বাহী। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে রাভা জাতি ও তাদের ভাষা সমনামে পরিচিত। এই আলোচনায় একথা আগেও বলা হয়েছে যে পারিপার্শ্বিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে রাভা ভাষা তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। এই বিষয়ে ড. সুধীর কুমার বিষ্ণুর মূল্যবান একটি মন্তব্য অবশ্যই উল্লেখ্য -

> "উত্তরবঙ্গের রাভা ভাষাভাষীরা তাদের জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ, তেমনি তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কেও তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমনকি তারা এখন নিজেদের মাতৃভাষায় বাক্ বিনিময় না করে প্রতিবেশী রাজবংশীদের ভাষা ব্যবহার করে। বিশেষ করে গ্রামবাসী রাভারা তাদের মাতৃভাষা প্রায় বিস্মৃত হয়েছে। ...প্রবীন রাভাদের মধ্যে অনেকে পিতৃপুরুষদের কাছে শুনেছিলেন যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিন কামাখ্যাগুড়ি, বাকলার পাড়, কোচবিহার জেলার বোচামারি, বড় শালবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সংখ্যক রাভা বসবাস করত এবং তারা প্রত্যেকেই মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলত। সেই সময় এই অঞ্চলে বহু সংখ্যক রাভা জনজাতির লোকেরা বসবাস করত। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে অনেকেই পার্শ্ববর্তী গোয়ালপাড়া জেলায় চলে গিয়েছিলেন। কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তবে গ্রামবাসী রাভাদের মতো অরণ্যবাসী রাভারা তাদের মাতৃভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়নি বা পরিত্যাগ করেনি। দুর্গম অরণ্যের মধ্যে বাস করার ফলে তাদের সঙ্গে অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায়ের আদান-প্রদান কম হয়েছিল। ভাষা সংশ্রবের প্রভাব থেকে তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজেদের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বর্তমানে অরণ্য বস্তীগুলিতেও বহিরাগতদের কাছে সুগম হয়ে উঠেছে এবং রাভারাও জীবিকার প্রয়োজনে লোকালয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। কিছু কিছু অরণ্যবস্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা এবং শিক্ষকরা অধিকাংশই বাঙালী। ফলে রাভা ভাষার যে অবক্ষয় গ্রিয়ার্সন লক্ষ্য করেছিলেন সেই অবক্ষয় প্রান্ত উত্তরবঙ্গে রাভা ভাষাকে দ্রুত অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।"[১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট রাভা কবি ও প্রাবন্ধিক সুশীল কুমার রাভা ও দয়চাঁদ রাভার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ডিপসিং' পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু প্রবন্ধ রাভা ভাষা তথা রাভা জাতিসত্তার বিপন্নতার কথা খুব বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরে। উদাহরণ হিসেবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষীরোদ চন্দ্র রাভার 'কিছু কথা' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবন্ধটির একটি অংশে তিনি বলেছেন -

> "পশ্চিমবঙ্গবাসী রাভাদের সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল ভাষা সম্পর্কিত সমস্যা। বনবস্তিবাসী রাভারা মাতৃভাষা (রাভা) ব্যবহার করলেও অপরাপর অঞ্চলের রাভারা তা করে না। বয়ঃজ্যেষ্ঠ রাভারা রাভা ভাষা জানলেও তা ব্যবহার করেন না। অপর দিকে বর্তমান প্রজন্ম (বেশীর ভাগই) এই ভাষা জানে না। এককথায় বলা যায় এরা সাধারণত স্থানীয় রাজবংশী নয়তো বাংলা ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত।"[২]

একই ভাবনারই প্রতিফলন দেখা যায় এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত আরও একটি প্রবন্ধে, যেখানে বলা হয়েছে -

> "পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন তাদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রয়েছে ঠিক তেমনি রাভা জনগোষ্ঠীরও নিজস্ব ভাষা, কলা-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বর্তমান। রাভারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাকে বলা হয় 'কোচা-ক্রৌ'। রাভারা নিজেদের মধ্যে ভাব পরিচয়, আলাপ-আলোচনা এই ভাষায় করে থাকে। ...মাতৃভাষা মাতৃ-দুগ্ধসম বিবেচিত হলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রাভা ভাষার প্রচলন বা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় অনেকটা কমে গেছে। জলপাইগুড়ি জেলার বনবস্তি এলাকাগুলোতে রাভা ভাষার প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলায় এই ভাষার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। কোচবিহারে বসবাসকারী রাভা জাতির মানুষজন বিভিন্ন এলাকাতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করায় নিজস্ব ভাষা, কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভুলে ধার করা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত। এটা বড়ই লজ্জার।"[৩]

নিঃসন্দেহেই এই সংক্রান্ত তথ্য রাভা ভাষা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট যখন সেই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের কলমেই উঠে আসে তখন তার সত্যতা অনস্বীকার্য। তবে এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র রাভা ভাষার বিপন্ন অস্তিত্বকে তথ্যসূত্রে গেঁথে তুলে ধরা তা কিন্তু নয়, বরং এর পাশাপাশি সাহিত্যেও তার রেখাপাত কিভাবে ঘটেছে সেই বিষয়টিকেও এই আলোচনায় ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। সেই সূত্রধরেই এই আলোচনায় উঠে এসেছে অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা দু'টি অনবদ্য উপন্যাস – 'বিনদনি' ও 'মাকচক হরিণ'। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমাদের এই লেখকের ছিল এক আত্মিক যোগ। দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারে বসবাসের সুবাদে উত্তরবঙ্গের, বিশেষত এই প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলকে তিনি তাঁর হাতের তালুর মতই চিনতেন। এ বিষয়ে আশির দশকে আকাশবাণীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ নিজেই বলেছিলেন যে দীর্ঘকাল ধরে এখানে বসবাসের সুবাদে এই অঞ্চলের সবকিছুকেই তিনি অনেক বেশি চেনেন। তাই লেখার প্রেক্ষাপট বা বিষয় সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে অনুষঙ্গ হিসেবে সেসবই তাঁর মনে আসে আর কাগজে বসে যায়। 'বিনদনি' ও 'মাকচক হরিণ' লেখকের এমনই দুই সৃষ্টি যেখানে তিনি এই রাভা জনজাতির মানুষদের কথা তাঁর পাঠককে শুনিয়েছেন।

উপন্যাস দু'টিতে রাভাদের বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, চিন্তা-চেতনার কথা যেমন উঠে এসেছে ঠিক তেমনি তাদের অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটের কথাও উঠে এসেছে। ভাষার সংকট এমনি এক সংকট। ক্রমবিলুপ্ত এই ভাষা কিভাবে রাভা জাতিসত্তার বিপন্নতাকে তুলে ধরেছে তার দৃষ্টান্ত এই উপন্যাস দু'টিতে বহুবার বহুভাবে উঠে এসেছে। 'বিনদনি' উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র জেন ম্যাডামের ভাবনায় সে কথাই যেন প্রকাশ পায় —

> "অহোমদের আগে, মেইতেইদের আগে তারা, রাভারা, এই দেশে ঢুকেছিল। আর্যদেরও আগে হয়তো। কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আর্যরা পূর্বদিকে এগোতে পারে নি। অহোমদের, দেখো, নিজেদের ভাষা আর নেই। আর রাভা কোচদের দেখো নিজেদেরই ভাষা যা আর্যদের সংস্কৃত-অর্ধমাগধি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। অথচ সেই ভাষা দেখো, লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ভাষা গেলে সংস্কৃতি থাকে, সংস্কৃতি গেলে ভাষা?"[৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সত্যিই এ এক অনস্বীকার্য সত্য। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়লে সেই জাতিসত্তার স্বকীয়তাও বিপন্ন হতে বাধ্য। উপন্যাসে খুব সুন্দর ভাবে জোন ম্যাডামের কথার মাধ্যমে বিষয়টি উঠে এসেছে -

> "ভাষা কি করে একটা জাতির বাসস্থান, আবহাওয়া, নদ-নদী, পাহাড়, বন, আকাশ, শস্যক্ষেত্র, সামাজিক আচার, রুচি, অরুচি, সমাজের মানুষগুলোর পরস্পর সম্বন্ধ ধরে রাখে, ভাবলে অবাক হতে হয়। চিন্তার নিজের চেহারা নেই, চেহারা দিতে গেলে জাতির চারপাশে ওইগুলি থেকে ছবি তুলে আনা হয়। সুতরাং ভাষা শুধু চিন্তাকে ধরে রাখে না, জাতির ব্যক্তিত্ব আর কোথায় সে ব্যক্তিত্বের অবস্থান তাও ধরে রাখে। বলা যায় একটা জাতির মৃত্যু ও একটা ভাষার মৃত্যু প্রায় একই কথা।"[৫]

রাভা ভাষার এই ক্রমবিলুপ্তির চেহারাটা 'বিনদনি' উপন্যাসের জেন ও জোন ম্যাডামের সমীক্ষাতেও উঠে আসতে দেখা যায়। রাভা ভাষা শেখার জন্য তল্লিগুড়ি নামের একটি গ্রামকে নির্বাচন করে তাঁরা দেখেন যে সেখানে প্রতি দশ বছরে লোকগণনায় রাভাদের সংখ্যা কমেছে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি এতোটাই ভয়াবহ যে সম্পূর্ণ গ্রামে একশো ঘর রাভাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যারা আছে তাদের ভাষার কথা যদি বলা যায় তবে দেখা যায় যে সেখানে বসবাসকারী রাভাদের মধ্যে যাদের বয়স কুড়ির নীচে মাতৃভাষার সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয়ই নেই, একটি রাভা শব্দও তারা হয়তো জানে না। বাংলা ভাষাই তাদের কথা বলার মাধ্যম। অন্যদিকে যাদের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে তারা রাজবংশী ভাষার সঙ্গে দু'চারটে রাভা শব্দও ব্যবহার করেন। তবে চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিরা কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে রাভা ভাষায় কথা বলেন। ভাষাটির এই ক্রমবিলুপ্তির কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক মূলত দু'টি বিষয়কেই এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন। একটি হল, রাজার ভাষাই একমাত্র ভাষা। তাই রাজার পরিবর্তন ঘটলে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে যায়। আর অন্য কারণটি হল রাজ্যহীন জাতি কখনোই নিজের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি রাভা শব্দের একটু ব্যখ্যা প্রয়োজন। শব্দটি হল 'হাওরীয়া'। রাভা ভাষায় এই 'রীয়া' শব্দটির অর্থ 'নাই'। তাই এই ভাষায় কাউকে 'মায়রীয়া' বললে তার মা না থাকাকে বোঝায়। অন্যদিকে 'হা' শব্দটির অর্থ পৃথিবী অর্থাৎ মাটি, জমি। তাই 'হাওরীয়া' বলতে বোঝায় ভূমিহীন। 'বিনদনি' উপন্যাসের কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য –

> "মায়রীয়া আর হাওরীয়া একই জাতের শব্দ বটে, আগে হয়তো শব্দ দুটোতে সমবেদনা থাকতো। এখনও বিনদনির মুখে মায়রীয়া ব্যাটায় ভালবাসা। কিন্তু হাওরীয়ার এমন কিছু আছে যাতে সমবেদনা নেই, বরং তিরস্কার আছে, যাতে হাওরীয়াকে হাওরীয়া বললে সে রাগে খেপে যাবে। আর তার কারণ কি এই যে রাজার ভাষাই ভাষা, রাজা বদলালে ভাষা বদলাবে। আগের ভাষা তখন মরে যায়, সে আর বাঁচে না। কিংবা কোনো জাতের যদি রাজ্য না থাকে, ভাষাও থাকে না।"[৬]

ভাষার এই বিলুপ্তি যেকোনো জাতির বিপন্ন অস্তিত্বেরই যেন বার্তাবাহী। আর তাই রাভা জনজাতি একদিকে যেমন কয়েকটি প্রধান ধর্মের তলায় চাপা পড়ে গেছে, ঠিক তেমনি রাভা মানুষেরা অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের নাম বা পরিচয়টাকেও আর ধরে রাখতে পারে নি। বক্তব্যটির সমর্থনে 'বিনদনি' উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, তারা হল জনাদন, বমভোলা ও প্রদ্যুম্ন। নিজেদের কৌম পরিচয়কে মুছে ফেলে তারা কেউ হয়েছে খ্রিস্টান, কেউ মুসলমান, আবার কেউবা হিন্দু। রাভা জনু হয়ে ওঠে জন কেইঝ, বমভোলা হয়ে উঠল বিষাদু মিঞা আর প্রদ্যুম্ন দলো পরিণত হল প্রদ্যুম্ন সিংহে।

'বিনদনি' উপন্যাসের পাশাপাশি অন্য যে উপন্যাসটির নাম এই আলোচনায় উঠে আসে সেটি হল 'মাকচক হরিণ'। আসলে 'বিনদনি' লেখার পরেও রাভা জনজাতি সম্পর্কে অমিয়ভূষণের আগ্রহ ও অনুসন্ধান শেষ হয় নি। তাদের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর এক প্রবল আগ্রহ বরাবরই ছিল। আর সেই আগ্রহেরই ফসল হল 'বিনদনি' ও তারপর 'মাকচক' নামের গল্প এবং অবশেষে এই 'মাকচক হরিণ'। 'বিনদনি'র মতো এই উপন্যাসেও উঠে এসেছে রাভাদের ওপর ঘনিয়ে আসা বহুবিধ সংকটের কথা, যার মধ্যে এক অন্যতম সংকট হল ভাষার সংকট। বলাই বাহুল্য যে এই দু'টি উপন্যাসই হল একে অপরের পরিপূরক। বলা যেতে পারে যে 'বিনদনি' উপন্যাসেরই ক্রমবিস্তার হল 'মাকচক হরিণ'। ভাষার বিপন্নতা কিভাবে একটি জাতিসত্তার বিপন্নতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার এক বাস্তব রূপ 'মাকচক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 273 - 278
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরিণ' উপন্যাসেও খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরাজি, বাংলা ও রাজবংশী- মূলত এই তিনটি ভাষার তলায় চাপা পড়ে গেছে রাভা ভাষা, হারিয়ে ফেলেছে নিজের সতেজ অস্তিত্ব। নিজের ভাষাকে হারিয়ে ফেলার থেকে বড় সাংস্কৃতিক সংকট একটি জাতির কাছে বোধ হয় আর কিছুই হতে পারে না। উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র শ্যামচাঁদের ভাবনার সূত্র ধরে সেই অবলুপ্তির চেহারাটাই যেন এই কহিনিবৃত্তে উঠে এসেছে -

> "আগৎ রাভা ভাষার উপর রাজবংশী ভাষা চাপছে। এখন তার সেই রাজবংশীর ভাষার উপর ফিন রেডিওর ভাষা। তার উপর খানিক ইংরাজি। এখন একজনা যুবক-যুবতী নাই যে রাভা ভাষার একটা শব্দ জানে।"[৭]

রাভা ভাষার এই ক্রমবিলুপ্তি সম্পর্কে লেখকের নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রমান এই দুটি উপন্যাস ছাড়াও তাঁর 'মাকচক' গল্পটিতেও পাওয়া যায়। এখানে রাভা ভাষা নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সভার কথা বলা হয়েছে। আর সেই সাহিত্যসভার প্রসঙ্গ ধরেই এই ভাষার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কথা আরও একবার লেখকের কলমে উঠে এসেছে –

> "বেবাক রাভা ক্রৌরাং রুঞ্চুম অর্থাৎ অখিল রাভা সাহিত্য সভা। ...কথাটা ছিল রাভা ক্রৌরাং, কিন্তু দেখা যাচ্ছিল, সব বক্তাই 'কোচ-রাভা' ভাষা বলে উল্লেখ করছে। আর তা শুনে মনে হচ্ছিল, কোচ ভাষা ও রাভা ভাষা এক, আর সে ভাষা বাংলা নয়, অহমিয়া নয়, এমনকি কামরূপে প্রচলিত রাজবংশী ভাষাও নয়, যে ভাষায় অধিকাংশ বক্তা বক্তৃতা দিল। বোঝা যাচ্ছিল কোচ-রাভা ভাষা, বক্তারা যেমন বলছিল, অর্ধ বা পূর্ণ মাগধির সঙ্গে, অথবা প্রাকৃত অথবা সংস্কৃতর সঙ্গে কোনোভাবেই কিছুমাত্র সংযুক্ত নয়। যদিও হয়তো বোড়ো গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে, পুরনো তিব্বতের ভাষার সঙ্গে একাত্মতা আছে। এটাও বোঝা যাচ্ছিল, শ্রোতাদের অধিকাংশ সেই ভাষা সম্বন্ধে খুব কমই জানে। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের প্রথাগুলোর সঙ্গে যুক্ত দুচারটে শব্দ হয়তো কারো কারো জানা থাকতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে একটা পুরো বাক্য কি কেউ বলতে পারে এই মৃত ভাষায়? যদি ভাষাটা মৃতপ্রায় না হত, বক্তারা অহমিয়া-মিশানো কামরূপীতে, বাংলা-মিশানো কামরূপীতে, এমনকি জোন স্মিথসন কেনই বা রাভাশব্দ-মিশানো ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবে?"[৮]

এই সঙ্গত প্রশ্নই আলোড়িত করেছিল নৃতত্ত্বের ছাত্র প্রদ্যুম্ন দলোকে। আর তাই সেই সাহিত্য সভায় যখন রাভা ভাষায় অভিধান লেখার প্রস্তাব ওঠে তখন তার মনে বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন জাগে একথা ভেবে যে –

> "একটা অভিধান লেখা যেতে পারে, এত শব্দ কি কোচ-রাভা ভাষায় আছে"?[৯]

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তীর একটি মূল্যবান মন্তব্য অবশ্যই উল্লেখ্য, যেখানে তিনি বলেছেন -

> "যার ভাষা নেই তার অস্তিত্বও নেই। যে মূক, ইতিহাসের পাতায় তার সাক্ষ্য থাকে না। এমনি করে বহু অলিখিত ইতিহাস আজ মুছে গেছে মানব সভ্যতার তথাকথিত সমুন্নত জাতি-গোষ্ঠীগুলির আগ্রাসনে। ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া তার বিলুপ্তির অন্যতম স্তর। জনজাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে স্বাধীন ভারতবর্ষে অনেক বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। জনজাতি-গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে, বিশ্বায়নের খরগতিতে অনেক জনজাতির অস্তিত্ব এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অমিয়ভূষণের *মাকচক হরিণ* তারই অভ্রান্ত রূপায়ণ। এইভাবে দেখা যায় যে 'রাভা' মানুষেরা তাদের নামও হারিয়ে ফেলেছেন। একজনের নাম জন কেইব্‌- সে খ্রিস্টান; এক ব্যক্তির নাম প্রদ্যুম্ন সিংহ— সে হিন্দু; আবার এক ব্যক্তির নাম বমভোলা— কিন্তু এই হিন্দু ঘেঁষা নামটি যার সে মুসলমান। আসলে গৃহীত ভাষা থেকে আগত নাম রাভাদের কাছে একটা ব্যবহারযোগ্য পরিচিতি মাত্র, সংস্কৃতির জ্ঞাপন নয়।"[১০]

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে একটা কথাই বলতে হয় যে একটি জাতির কাছে তার ভাষা হারিয়ে ফেলার মত সংকট আর হয়তো কিছুই হতে পারে না। ভাষা যে কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম তা তো নয়, ভাষা একটি জাতির মৌলিকতারও পরিচয়বাহী। তাই রাভা ভাষার এই ক্রমবিলুপ্তি তাদের জাতিসত্তার মূলে, তাদের অস্তিত্বের মূলেও যেন কুঠারাঘাত করে।

তাছাড়া লিপিহীন ভাষা অনেকটা বল্গাহীন ঘোড়ার মতো। আর রাভা ভাষারও নিজস্ব কোনো লিপি নেই। এটাও তার স্বকীয়তার ক্ষেত্রে একটা অন্তরায়। অমিয়ভূষণ মজুমদার এই ধরণের বহু তথ্যকে সাহিত্যপযোগী কল্পনার সাহায্যে তাঁর রচনায় তুলে এনেছেন। একটি জাতির নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতির ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার যে করুণ কাহিনি তিনি তাঁর পাঠককে শুনিয়েছেন তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

Reference:

১. বিষ্ণু, সুধীর কুমার, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ভাষা-উপভাষা, বইওয়ালা, কলকাতা,২০০৯, পৃ. ২৭৯-২৮০
২. রাভা, ক্ষীরোদ চন্দ্র, কিছু কথা, ডিপসিং পত্রিকা,দয়চাঁদ রাভা(সম্পাদিত), ২০১২, পৃ. ৩৪
৩. রাভা, কলিনচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাভা জনগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, ডিপসিং পত্রিকা, দয়চাঁদ রাভা (সম্পাদিত), ২০১২, পৃ. ৪২-৪৩
৪. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদনি, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৭ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১১৭
৫. তদেব, পৃ. ১১৮
৬. তদেব, পৃ. ১২২
৭. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক হরিণ, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৮ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৫৫
৮. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৮ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৮৩
৯. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৮ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৮৪
১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, অমিয়ভূষণ মজুমদার ও আদিবাসী চেতনা, দিবারাত্রির কাব্য (অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা), আফিফ ফুয়াদ (সম্পাদিত), কলকাতা, ২০০৩ পৃ. ২৮১-২৮২

Bibliography:

সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯
রমাপ্রসাদ নাগ, স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০২
রমাপ্রসাদ নাগ, অমিয়ভূষণ ট্রমা চিহ্নিত এপিক, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮
প্রমোদ নাথ, প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫
প্রমোদ নাথ, উত্তরের আদিবাসী উৎসব, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 279 - 286
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান : বাংলা উপন্যাসে বৌদ্ধদর্শনের রূপায়ণ

কনক মণ্ডল
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kanakmondal0@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Atish Dipankar Srigyan, Buddhism, Novel, Abul kasem, Sanmatrananda, Comparative discussion, New direction, Buddhism Philosophy.

Abstract
According to Buddhism, the term 'Dharma' is used in ten different senses, one of which is 'Path'. When analyzed, the word Dharma signifies upholding the purity of the mind. For centuries, the people of Tibet have revered and recognized the Bengali Buddhist scholar Atish Dipankar Srigyan as 'Dewo Chenpo' or the Great Lord. His extensive body of work and contributions can be traced in the Buddhist scriptural collections 'Tanjur' and 'Kanjur'.

Even a thousand years later, Atish Dipankar remains a luminous figure for Bengalis. Several novels have been written about him, capturing his philosophy and contributions to Buddhism. Abul Kasem's 'Atish' and Sanmatrananda's 'Nastik Panditer Bhita' (The Atheist Scholar's Abode) are two such novels that document his thoughts and perspectives on Buddhism. Atish was a proponent of the Mahāyāna tradition. Abul Kasem's 'Atish' vividly portrays the historical context, the ideological conflict between Mahāyāna and Hīnayāna, and the life of Atish Dipankar.

On the other hand, Sanmatrananda's 'Nastik Panditer Bhita' is structured across three different time periods— the present day, the 13th century focusing on Chag Lo-tsā-ba, and the 11th century of Atish Dipankar. The novelist skillfully interweaves these three epochs, balancing them while giving prominence to philosophical discourse over historical details. Time itself takes center stage in his novel. In contrast, Abul Kasem follows a different path, presenting Atish's biography in a modern narrative style.

Reading these two novels side by side offers a deeper understanding of Atish Dipankara's Buddhist philosophy. It also sheds light on why, even after all these years, his ideas and teachings continue to be relevant and worthy of scholarly attention.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

'ধর্ম' শব্দ 'ধৃ' ধাতু থেকে নির্মিত, ধারণ অর্থযুক্ত।[১] কী ধারণ করবে? নিজের স্বভাবকে। এই 'ধর্ম' শব্দটা শুধু বৌদ্ধ ধর্মকে বোঝায় না, বরং জগতে বিদ্যমান সমস্ত ধর্মকে বোঝায়। এছাড়াও কখনও কখনও দায়িত্ব, পরম্পরা আদিকেও ধর্ম হিসাবে অভিহিত করা হয়। তবে বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী এই 'ধর্ম' শব্দটি দশটি অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হল 'পথ'। এখানে 'ধর্ম' শব্দ পথ-অর্থে বোঝায়, কেননা পথরূপী ধর্ম দ্বারা চিত্তের নির্মল অবস্থাকে কলুষিত হতে না দিয়ে তাতে স্থিত হতে হয়। সেই স্বভাবকে ধারণ করাই হল বাস্তবিক ধর্ম বা সদ্ধর্ম। যে বাণী অর্থ (হিত) এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, ক্লেশের নিবারণ করে আর শান্তি নিয়ে আসে, সেটাও বুদ্ধবচন। বিশ্লেষণ করলে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হয় 'চিত্তের শুদ্ধতাকে ধারণ করা।'[২]

তিব্বতি ভাষায় জেবো, জেবোজে অর্থে প্রভু, জেবো ছেনপো অর্থে মহাপ্রভু।[৩] গত একাদশ শতক থেকে বিশ শতক— এই হাজার বছর ধরে তিব্বতের মানুষ জেবোজে, জেবো ছেনপো বলতে প্রধানত যাঁকে জেনেছেন ও মেনেছেন, তিনি আমাদের বাঙালি বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি মাটির ঢিবিকে 'অতীশের ভিটা' বা 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' বলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এই বিক্রমপুরই অতীশ দীপংকরের জন্মস্থান বলে গবেষকরা দাবি করেন। অতীশ দীপংকরের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায় তিনি সুবর্ণদ্বীপে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এক যুগেরও বেশি। সুবর্ণদ্বীপ থেকে ভারতে এসে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ডাক আসে সুদূর তিব্বত থেকে। তিব্বতের রাজা লাহ্ লামা এশেওদ-এর আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করে ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সে তিনি যেতে রাজি হন তিব্বতে।[৪] তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাস, রাজকাহিনি, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রগাঁথা ও সর্বোপরি তাঞ্জুর[৫] *ও* কঞ্জুর[৬] নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ-সংকলন— সে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রায় সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মহৎ ও বিপুল কর্মজীবন সম্পর্কে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ তা তিব্বতি সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ভারত ও তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। সেই যুগে কয়েক শতক ধরে ভারতবর্ষ থেকে যে-সব বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিল, দীপংকর তাঁদের মধ্যে প্রথম নন। কিন্তু তিব্বতের ধর্মীয় ইতিহাসের খ্যাতি ও সম্মানে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর মানবমুখী ধর্মের উদাত্ত আহ্বানে অতীশ দীপংকর তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মজীবনেও সাধারণভাবে তিব্বতের সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। অতীশ দীপংকর বৌদ্ধদর্শন নিয়ে লিখেছেন বেশকিছু গ্রন্থ— 'বোধি-পথ-প্রদীপ', 'সত্যদ্বয়-অবতার', 'মধ্যমকোপদেশ', 'গর্ভ-সংগ্রহ', 'বোধিসত্ত্ব-মণ্যাবলি', 'শরণ-গচ্ছামি-দেশ', 'বোধিসত্ত্বাদিকর্মিক-মর্গাবতার-দেশনা', 'চর্যা-সংগ্রহ-প্রদীপ', 'মহাযান-পথ-সাধন-বর্ণ-সংগ্রহ' ইত্যাদি।

হাজার বছর পরেও অতীশ দীপংকর বাঙালির উজ্জ্বল চরিত্র। লিখিত হয়েছে আবুল কাসেম-এর *অতীশ*, সন্মাত্রানন্দ-এর *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা*-র মতো উপন্যাস। বৌদ্ধদর্শন নিয়ে অতীশের যে ভাবনা তা এই উপন্যাসগুলিতে রূপায়িত হয়েছে।

বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করলে আমরা হীনযান, মহাযান, সহজযানের প্রসঙ্গ পাই। কিন্তু কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলা হয়, আর মহাযানকে কেন 'মহা' বলা হয় এ প্রশ্ন মনে উদিত হয়। তার আগে আমাদের জানতে হবে 'যান' শব্দের ব্যাখ্যা।

> "'যান' শব্দের অর্থ হল বাহন, রথ এবং পালকি। কারণ এঁরা ভার বহন করে। কালচক্রের টীকা বিমলপ্রভা অনুযায়ী 'এর মাধ্যমে কোথাও যাওয়া যায়, অতঃ এটি হল যান। সংক্ষেপে, 'যান' শব্দের অর্থ যার মাধ্যমে কোনও এক স্থানে যাওয়া যায় বা পৌঁছনো যায় অর্থাৎ এর মাধ্যমে সাধক ধর্ম পালনের পরিণামস্বরূপ ফল অবস্থাতে পৌঁছায়। অতএব এটি হল যান। কোনও উৎস-তে এর অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করা আছে 'যার মাধ্যমে উত্তরোত্তর যাওয়া যায় অথবা সেখানে পৌঁছানোর বাহন সাদৃশ্য; অর্থাৎ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> দুর্গতি বা সাংসারিক দুঃখকে অতিক্রম করে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেস্‌রূপী নির্বাণ অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া মার্গসত্যে অন্তর্ভুক্ত ধর্মই হল যান।"[৭]

এই 'যান' নামক শব্দকে যুক্ত করে অন্য শব্দেরও গঠন করা হয়, যেমন— গোযান, অজযান, ধর্মযান, ব্রহ্মযান, দেবযান, পিতৃযান ইত্যাদি। উৎস অনুযায়ী, 'যান' শব্দের ব্যুৎপত্তি এইভাবে হয়েছে, 'যায়তে অনেনেতি যানং' অর্থাৎ যার দ্বারা যাওয়া যায়, সেটি হল যান।[৮] এই বিগ্রহ অনুযায়ী মার্গ, যার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাওয়া যায়, সেটি হল যান। এই হল যান শব্দের বাচক। পূর্বে হীনযান বলে কোনও যান ছিল না। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলত। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। নিজে উদ্ধার অর্থাৎ নির্বাণ লাভ হলেই হল, এঁরা জগতের কথা ভাবে না। এই কারণেই মহাযানরা এঁদের আখ্যায়িত করলেন 'হীন' বলেছেন। যাঁরা আখ্যায়িত করলেন তাঁরা হলেন মহাযান।

আবুল কাশেমের *অতীশ* উপন্যাসে লেখেক বলছেন—

> "অতীশ যখন এ বিহারে ছাত্র ছিলেন, সকল বিষয়ে তাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তবে সব বিষয় তাঁকে আজ আর টানে না। তিনি এখন বুদ্ধের শিক্ষার যেসব মূলনীতি আছে, বিশেষ করে মহাযানী বৌদ্ধ মতবাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। নীতিগত দিকের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি। আদর্শের প্রশ্নে অটল থাকছেন।"[৯]

অর্থাৎ অতীশ দীপংকর মহাযান দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। *অতীশ* উপন্যাসের মধ্যে একজন আচার্য অতীশ দীপংকরকে জিজ্ঞাসা করেন— শ্রীজ্ঞান আপনার কাছে জানতে চাইছি মহাযান এবং হীনযান এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তন্ত্রমন্ত্র সাধনা, পৌরাণিক কাহিনির প্রভাবও বৌদ্ধ ধর্মে বিস্তার লাভ করছে। তাতে বৌদ্ধধর্মের জন্য কোনো সংকট সৃষ্টি হচ্ছে কি?

অতীশ এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—

> "বৌদ্ধ ধর্ম একটি আধুনিক ধর্ম।
>
> বৌদ্ধ ধর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক বোধের গভীরতা। এ ধর্মের প্রচারের শুরু থেকে এত উঁচুদরের দার্শনিক চিন্তাবিদ, পণ্ডিত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন যে, অন্য কোনো ভারতীয় ধর্মের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন নালন্দা, বিক্রমশীল মহাবিহার যেমন শ্রীভবদেব মহাবিহার, ওদন্তীপুর বিহার, আমরা যেখানে বসে কথা বলছি সোমপুর মহাবিহার প্রভৃতি স্থানে অন্যান্য বিষয় যেমন বেদ, অধিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ধ্যান-সাধন ইত্যাদির সঙ্গে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও নানা মতবাদ নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে। এত পণ্ডিত-মহাপণ্ডিত এতে যুক্ত হয়েছেন যে তাতে হতাশ না হয়ে বরং গৌরব করার বহু কিছু আছে।
>
> ...ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে একবার দেখুন বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানতাত্ত্বিক সবাই বৌদ্ধধর্ম দর্শনকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান তাঁদেরই উদ্ভাবন। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। আধুনিক চিন্তা সব সময়ই অগ্রসরমান; পশ্চাদগামী নয়।"[১০]

বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযানীদের মত অনুসারে নির্বাণের তিনটি অবস্থা— শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতার পরম জ্ঞান নির্বাণ। শূন্যতত্ত্বের স্রষ্টা নাগার্জুন বলেন, দুঃখ কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য। বজ্রযানীরা নির্বিকল্প জ্ঞানের নামকরণ করলেন নৈরাত্মা। বললেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ করলে এই নৈরাত্মাতেই বিলীন হয়। নৈরাত্মা দেবীরূপে কল্পিত। বজ্রযানীদের মতে মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরমানন্দময় ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান, তাই বোধিচিত্ত। মিথুনাবস্থার অনন্দোদ্ভূত বিভিন্ন দেব-দেবী সাধকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে এসে অধিষ্ঠিত হয়ে এক একটি ধ্যানমণ্ডল তৈরি করেন। এই মণ্ডলের নিঃশব্দ ধ্যান করতে করতেই বোধিচিত্ত স্থায়ী এবং স্থির বজ্রের মতো কঠিন হয় এবং ক্রমে বোধি লাভ ঘটে। নির্বাণ লাভের পথ অতি কঠিন, তাই এক দল বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ সহজযানের কথা বললেন। যার মাধ্যমে গুরুর দেখানো পথে নির্বাণ লাভ করা যাবে সহজে। *অতীশ* উপন্যাসে আবুল কাসেম চমৎকার ভাবে ভুসুকু চরিত্রকে এনেছেন। এই চরিত্রটির জন্য

বৌদ্ধদর্শন বুঝতে আরও সহজ হবে পাঠকের। ভুসুকুর বজ্রযান থেকে সহজযানে উত্তরণ ঘটলে লেখন সহজযানের মত ব্যাখ্যা দেন —

> "সহজযানীরা বলেন, 'দেহস্থিতংবুদ্ধত্ব; দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই। এরাও মনে করেন, শূন্যতা হল প্রকৃতি, করুণা হল পুরুষ, শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ নারী-পুরুষের মিথুন মিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দ, তাই মহাসুখ। এ মহাসুখই ধ্রুবসত্য।"[১১]

আবুল কাসেম অতীশ দীপংকরের জীবনী হুবহু বর্ণনা করে যাননি উপন্যাসের মধ্যে। তাঁর জীবনের ইতিহাস যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই বর্ণনা করেছেন বৌদ্ধ দর্শন। তিব্বত গমনের পর পোন ধর্ম ও বন ধর্মের অধিকর্তাদের সঙ্গে অতীশের কথোপকথন গল্পের ছলে দারুণ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। রিংছেন সাংপোর মুখ থেকে জানা যায়—

> "প্রাচীন পোন ধর্মের ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, তান্ত্রিক তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক বিষয়গুলোকে মিলিয়ে ফেলাতে ধর্মবিশ্বাসের স্থানীয় বলে তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি রাজশক্তির মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছে।"[১২]

ফলে তিব্বতের রাজা ভীত হয়ে পড়েন। এই প্রাচীন পোন ধর্মের মানুষের বিশ্বাস পরবর্তীকালে রাজ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। আবার বন-রাও বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী নয়, তারা স্থানীয় তন্ত্রমন্ত্রে বেশি প্রভাবিত। ধর্মের শৃঙ্খলার জন্য অতীশ দীপঙ্করকে বহু চেষ্টার পর তিব্বতে নিয়ে যাওয়া হয়। উপন্যাসে পোন মতাবলম্বী মানুষদের বৌদ্ধধর্মের সঠিক দর্শনে ফেরাতে অতীশ একটি সুন্দর কৌশল উপস্থাপন করেন। মানুষের বিশ্বাসকে সম্মান না দিলে তাকে নিজের মত বোঝানো কঠিন এ কথা অতীশ দীপংকর জানতেন। তাই অতীশ পোনদের বিশ্বাসের দেব-দেবীদের বসিয়েছিলেন থোলিং বিহারের বিভিন্ন স্থানে। তিনি বললেন—

> "মানুষ শ্রদ্ধা করে যাকে দেবতা বানিয়েছে তার সম্মান সকল ধর্মের মানুষের কাছে থাকা উচিত। আপনারা যদি আমাদের ধর্ম এবং দেবতাকে সম্মান করেন, আমিও আপনাদের দেবতাকে সম্মান করব। পরমত এবং পরধর্মসহিষ্ণুতা আজকের পৃথিবীতে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। হিংসা, বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা-অসম্মান আমরা চাই না। তবে মানুষের অমঙ্গল এবং মানবতার অসম্মান হতে পারে, ধর্মীয় রীতি-নীতির নামে আমরা এরকম আচরণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকব। আমরা নিজেরাও জানি অমঙ্গল কিসে, ক্ষতি কিসে, বিপর্যয় কিসে। ধর্ম ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তবে কিছু কিছু ধর্মীয় মূল্যবোধ অকল্যাণ ছড়াচ্ছে। মানব হত্যা কিংবা মানবের সম্ভ্রম ও অধিকার হরণের কোনো অধিকারই কোনো ধর্মীয় অনুশাসনে দেয়া হয়নি। আমার বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্ম দেয়নি, পোন ধর্মও দেয়নি। বরং নিষেধ করেছে।"[১৩]

পোন ধর্মসম্প্রদায়ের একজন নেতা বললেন, আমরা আমাদের আদিম রীতিনীতি, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পরিত্যাগ করব কী করে?

অতীশ দীপংকর তখন বলছেন,

> "যা অশুভ তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। নর হত্যা, নারী নির্যাতন, জুলুম ইত্যাদি কোনো অবস্থায় মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন ধর্মাচার কৃষ্টি সংস্কৃতি সংস্কার এসব ছাড়তে বলছে কে আপনাকে? ধর্মবিশ্বাস সামাজিক অপরাধ নয়, এ বিশ্বাসকে জোর করে প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া অপরাধ। তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান।"[১৪]

আরেকজন পোন ধর্মীয় নেতা বললেন, মহাচার্য, আমরা যদি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে চাই তাহলে তো আমাদের বাবা-দাদার ধর্ম, দেব-দেবী, এত দিনের বিশ্বাস সংস্কৃতি সব ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। আমি তা চাই না।

এই প্রশ্নের উত্তরে অতীশ বললেন—

> "ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের লোকজন নানা দেব-দেবীর পূজা করে। এরা নানা সংস্কারে আবদ্ধ, সে সব সংস্কার, বিশ্বাস এবং দেব-দেবীদের নিয়েই এরা নতুন নতুন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ধর্মে দীক্ষা লাভ করছে। ... আমরা কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা ভেবে পরস্পর শ্রদ্ধাশীল হব। এ বার্তাটা বনদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে অহিংসা পরম ধর্ম।"[১৫]

এই ধর্মে ধর্মে মিলনের কথা এর আগে কেউ বলেনি। *অতীশ* উপন্যাসে আবুল কাসেম যেমন বৌদ্ধ দর্শনের রূপায়ন করেছেন, একটু লক্ষ করলে আমরা বুঝতে পারব অতীশ দীপংকর যে বৌদ্ধ দর্শনচর্চার নতুন অভিমুখ দেখালেন তাও এখানে স্পষ্ট।

উপন্যাসের মধ্যে ভূমিগর্ভের সঙ্গে অতীশের কথোপকথনে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ভুলের কথাও তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। দশম শতকের ভারতবর্ষের বৌদ্ধ মতবাদের বিশেষ করে মহাযান পন্থার যে বিবর্তন, তার সঙ্গে হোশাংদের ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনের দারুণ মিল রয়েছে। চীনা হোশাংরা হিউয়েন সাঙ কিংবা সেঙচিদের মত ভারতে আসা ধর্মীয় পর্যটকদের কাছ থেকে মহাযানী বৌদ্ধ দর্শনের দীক্ষা লাভ করেছিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বিবর্তনটা প্রায় একই বিষয়কে অবলম্বন করে।

অতীশ এই বিষয়ে বললেন—

> "মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে শতবর্ষ আগে নতুনতর তান্ত্রিক ধ্যান কল্পনার স্পর্শ লেগেছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে গুহ্যসাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি এবং পূজা আচার অনুপ্রবেশ করেছে। ...ভারতীয় বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আছে পর্বতকান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম সমাজের লোকেদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যোগিনী-ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীকে মহাযান দেবায়তনে স্থান দেয়া হয়। নানা গুহ্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ধারণা প্রভৃতিও তাদের সঙ্গে আসে।"[১৬]

পণ্ডিত ভূমিগর্ভ বললেন, এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে। লৌকিক দেব-দেবী এবং তন্ত্রমন্ত্র হোশাংদের বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসে একইভাবে প্রবেশ করেছে, পোন এবং বনদের লৌকিক ধর্মবিশ্বাস থেকে। কালে পরিবর্তিত রূপে তাই প্রধান হয়ে উঠেছে— গৌণ হয়ে গেছে বৌদ্ধ ধর্ম।

অতীশের ব্যক্তব্য—

> "ভুলটা করেছেন আমাদের মতো পণ্ডিতেরা। ...সাধারণ বৌদ্ধদের পক্ষে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, নানা উচ্চমার্গীয় যোগাচার অনুসরণ সম্ভব ছিল না, বুঝতও না। তাদের কাছে যাদুশক্তি, মন্ত্র প্রভৃতি সহজ ছিল। আর তাই অবলম্বন করে নিল নিজস্ব লৌকিক ঐতিহ্যে।"[১৭]

অতীশ দীপংকর কেবল অন্য প্রাচীন ধর্মের সংস্কারে করেছেন তিব্বতে গিয়ে তেমনটি মোটেই ঔপন্যাসিক দেখাননি। এর পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের দুর্বল দিকগুলিও নির্দেশ করে গেছেন। পুরাতন বৌদ্ধ দর্শনকে সামনে রেখে সংযোজিত নতুন বৌদ্ধ দর্শনের কথা বলবার চেষ্টা করে গেছেন।

সন্মাত্রানন্দ অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে রচিত *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* উপন্যাসটি তিনটি কালের ব্যবধানে রচনা করেছেন। বর্তমান কাল, ত্রয়োদশ শতকের চাগ্ লোচাবার কথা ও একাদশ শতকের অতীশ দীপংকর। তিনটি যুগের অভিমুখ ঔপন্যাসিক রেখেছেন কিন্তু অতীশ জীবনের ওপর। তিনটি যুগকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যালেন্স করে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

মহাযান মতবাদ ব্যাখ্যা *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* উপন্যাসে ধর্মকীর্তির সঙ্গে অতীশ দীপংকরের কথোপকথনে উঠে আসছে—

> "...বুদ্ধশিষ্যগণ প্রায়শই তাঁদের নিজ মুক্তির সাধন করলেও তথাগত যে সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে উরুবেলায় ধ্যানস্থ হ'য়েছিলেন, তাতে কিন্তু কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে কী থেরবাদী হীনযান, কী মহাযান সকলেই একমত। আর এই সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির আদর্শ, যা বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর নিজ জীবনে অনুষ্ঠান ক'রে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেটিই মহাযান মতের আদর্শ।"[১৮]

নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রগুলির কথোপকথন এবং চিন্তনের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন— অদ্বয়বজ্রের উপদেশে বজ্রযানমত (অধ্যায়-৬); অতীশের ভাবনায় বৌদ্ধদর্শনের মূলসূত্র, বৌদ্ধদের বিভিন্ন শাখার দর্শন, বাৎসীপুরীর মত, পুদ্গলবাদী মত, সম্মিতীয় মত, সময়ের তত্ত্ব, সর্বাস্তিবাদীগণের প্রাপ্তি-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অপ্রাপ্তিতত্ত্ব, এদের বিরুদ্ধপক্ষ সৌতান্ত্রিক মত, স্থবিরবাদী বৌদ্ধদিগের ভবাঙ্গতত্ত্ব, নির্বাণতত্ত্ব (অধ্যায়-১২), পঞ্চশীল (অধ্যায়-১৩); বজ্রাসনের বিচারসভায় নাস্তিক্যবাদের আলোচনা (অধ্যায়-১৯) ইত্যাদি।

নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা-র কেন্দ্রে রয়েছে সময়— তিব্বতীয় জপযন্ত্রের মতো ঘূর্ণ্যমান। আবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয় মানুষের জন্মান্তরব্যাপী অন্বেষণ। এই উপন্যাসে প্রায় ঊনচল্লিশটি চরিত্র আছে। তার মধ্যে মাত্র বারোটি যাদের মধ্যে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান নেই, যাদের সাধারণ মানুষ বলা যায়। এর মধ্যে অমিতায়ুধেরই যা একটু বিস্তার আছে। বাকিরা সবাই আখ্যানের চালচিত্রের অংশ।

কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র অতীশের অন্বিষ্ট প্রেম; যা মাতৃহৃদয়ের বৎসলতা দিয়ে জগতের সব দুঃখ সব ভেদাভেদ দূর করে দিতে চায়। কিছু চরিত্র নির্মিত হয়েছে যাদের সংযোগে বা সংঘাতে অতীশের বোধের বিকাশ বা উত্তরণ ঘটেছে। একই সঙ্গে লেখক তাদের মধ্য দিয়ে আখ্যানের প্রেক্ষাপটে থাকা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ incidents একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে 'illustration of character' এবং 'exploration of the individual personality'। মহর্ষি জিতারি চন্দ্রগর্ভের (পূর্বাশ্রমের অতীশ) সত্যান্বেষণ মার্গের দিশারী—

> "নিখিল জীবের বেদনার উৎস এই ভেদবুদ্ধি, যার আধারশিলায় গড়ে ওঠে অহমিকার প্রাসাদ।"[১৯]
>
> "এই ভেদবুদ্ধি পরমা আপ্রাপ্তির প্রবেশপথে প্রবল ও ভয়ালদর্শন প্রহরী, যাকে অতিক্রম না করলে মুক্তির পথ চিরাবরুদ্ধ থাকে।"[২০]
>
> "অহমিকা পরিত্যাগ কর। সেই উৎসের অনুসন্ধান কর। সেই অনুসন্ধানে নিজেকে বিপন্ন কর।"[২১]

অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্র গুহ্যজ্ঞানবজ্রের (তন্ত্রসাধক অতীশ) কাছে বজ্রযানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুহ্যজ্ঞানবজ্র বাৎসল্যের আধার বাল্যসঙ্গিনী কুন্তলাকে সাধনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারলেন না। কারণ তাঁর সাধনার পথ সংসারের প্রতি নির্মমতায় নয়। তাই বজ্রডাকিনী তন্ত্রের (চক্রসাধনা, আসবপান, মদ্য-মাংস-মৈথুন) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'নির্মুক্ত শ্রামণ্য— উদাসীন ভিক্ষুচর্যা'র[২২] পন্থায় অগ্রসর হলেন। এরপর ওদন্তপুরী মহাবিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে শ্রামন্তে দীক্ষিত গুহ্যজ্ঞানবজ্র হলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। শীলরক্ষিতের সঙ্গে অতীশের আলোচনার সূত্রে লেখক বিস্তৃত করেছেন বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার তুলনামূলক ভেদসীমা— সৌতান্ত্রিকদের বীজতত্ত্ব, স্থবিরবাদীদের ভবাঙ্গতত্ত্ব, মহাযানমতের আলয়বিজ্ঞান, সর্বাস্তিবাদী মত ইত্যাদি। আচার্যের তত্ত্বব্যাখ্যার উপস্থাপন কৌশলের অভিনবত্ব অতীশের চিত্তকে সমুদ্ভাসিত করেছে, তীব্রতর করেছে তাঁর সত্যান্বেষণের তৃষ্ণা। সুবর্ণবিহারের আচার্য ধর্মকীর্তির প্রবল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসবোধ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার উৎস-অনুসন্ধিৎসা ও তা দূরীকরণের আন্তরিক প্রয়াস অতীশকে আরও পরিণত করে তুলল। বৌদ্ধ শ্রমণের লক্ষ্য 'অর্হত্ত্ব' নয়, সমস্ত মানুষের মুক্তি— আচার্য ধর্মকীর্তির এই বিশ্বাস ও জীবনব্যাপী সাধনায় তার প্রয়োগ অতীশের জীবন-অন্বেষায় প্রতিফলিত হয়েছে। অতীশের শ্রমণ জীবনের আরও দুটি বাঁক হল তান্ত্রিক ও কবি ভিক্ষু মৈত্রীর বিক্রমশীল বিহার থেকে অতীশের বহিষ্কার এবং পাল ও চেদীরাজ্যের মধ্যে কূটনৈতিক দৌত্যপালন। পাল ও চেদীরাজ্যের সংঘাতের মধ্যে ঢুকে অতীশ একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বিক্রমশীল মহাবিহারকে পৃষ্ঠপোষক রাজা নয়পালের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, সেই সঙ্গে রাজশক্তির উর্ধ্বে একজন সন্ন্যাসী/ আচার্যের ক্ষমতাকে প্রমাণিত করা। নয়পাল প্রদত্ত 'রাজভিক্ষু' বিশেষণ অতীশের অন্তরে নিজের অহংচেতনা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়েছে। বিক্রমশীল মহাবিহারের নীতি বিরোধী তন্ত্রসাধনার কারণে ভিক্ষু মৈত্রীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত অতীশের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল। কারণ তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস— ধর্ম ও জীবনচর্যা সঙ্ঘ দ্বারা নয় একমাত্র সত্য দ্বারাই নিয়মিত। অথচ সত্যের অন্বেষণে ব্যক্তি ও সঙ্ঘের বিরোধে সত্যান্বেষীকে বহিষ্কৃত হতে হল। 'সংঘ তার ভাবকে আরও বিস্তৃত করুক তাহলে যাকে আজ বিপত্তি মনে হচ্ছে, ভাবীকালে তা সম্পত্তিরূপে প্রতিভাত হবে।'[২৩] — ভিক্ষু মৈত্রীর এই উক্তি দীপঙ্করের মনে অনুশোচনার মধ্য দিয়ে সত্যের পথ চিহ্নিত করেছে। অতীশ ভ্রান্তি ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে সত্যের সন্ধানে চলমান চিন্তার প্রতীকীরূপ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'নাস্তিকের তর্কযুদ্ধ'-এ (উনিশ অধ্যায়) অতীশকে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত খণ্ডন করতে দেখা যাচ্ছে। নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরছেন। শূন্য তত্ত্ব নিয়ে একজন পণ্ডিত তার এই শূন্য তত্ত্বকে অর্থশূন্য বললে অতীশ তার জবাব দেয় জলদগম্ভীর স্বরে—

> "নাহ্, আমি কোনও মতবিশেষকেই নিরঙ্কুশ মনে করি না। এই বিশ্বজগতের কোনও বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সকলই পরস্পর নির্ভরশীল, সকলই পরতন্ত্র। এ জীবন একটা স্বপ্ন, আদিতে এ স্বপ্ন ছিল না, অন্তিমেও থাকবে না। অতএব, বর্তমানে যে এই জীবন অনুভব করছি, তারও কোনও সারবত্তা নাই। বন্ধন নাই, তাই নির্বাণও নাই। নির্বাণ যদি প্রাপনীয় বস্তু হয়, তবে তার আরম্ভ থাকবে। আর যার আরম্ভ আছে, তার অন্তও আছে। ওইরূপ আরম্ভ ও অন্তযুক্ত নির্বাণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবারণ নয়। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি, নিবৃত্তির উপায় কোনও কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাই চতুরার্য সত্যকেও চরম বলা যায় না। পরমার্থত সংঘ নাই, ধর্ম নাই, বুদ্ধও নাই। এমনকি তথাগতও পরমার্থত সত্য নন। নির্বাণলাভের পূর্বে ও পরে তথাগত আছেন, তথাগত নাই, তথাগত এককালে আছেন এবং নাই, তথাগত অস্তি-নাস্তি-অনুভয়— ইত্যাকার কোনও কিছুই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই সমস্ত জগৎ স্বতন্ত্রসত্তারহিত, শূন্য।"[২৪]

স্থবির রত্নাকর এই কথা শুনে বলেন, তাহলে এ সমস্তই যদি শূন্য হয়, এ জীবন, জগৎ, শ্রামণ্য, সাধনা, বুদ্ধ, ধর্ম, এই সভা, এমনকি আপনার ওই যুক্তির দ্বারা শূন্যতা-প্রতিপাদনও নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়াবে।

অতীশ বলেন—

> "আমি শূন্য বলেছি, মহাস্থবির, নিরর্থক বলিনি। এ জগতের কোনও কিছুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সকলই স্বতন্ত্রতাশূন্য এই মাত্র বলেছি। আমি কখনও বলিনি, এ জগৎ বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অলীক বা অর্থহীন। এ জীবন একটা আপাতত কার্যনির্বাহের ব্যবস্থা। এর একটা ব্যবহারিক বা সাংস্কৃতিক সত্তা আছে। আর সেই লৌকিক সত্তাকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রা, আধ্যাত্মিক সাধনা, বুদ্ধগণের আবির্ভাব, সদ্ধর্মদেশনা, সংঘপ্রতিষ্ঠা, চতুরার্যসত্য, বোধিলাভ প্রভৃতি নির্বাহ হয়। কিন্তু এসব কোনওকিছুই চরম সত্য নয়। যা পরম, তাতে জগতের অনুপ্রবেশ নাই, বুদ্ধিনিরূপিত কোনও সংজ্ঞা বা অভিধার অণুমাত্রও স্পর্শ নাই। মরুভূমির বালুকারাশির উপর ভ্রমবশত মরীচিকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু মরীচিকায় দৃষ্ট সেই মায়াসরোবরের মিথ্যা জলরাশি মরুভূমির একটি বালুকাকণাকেও ধৌত করতে পারে না। পরম সত্য তদ্রূপই প্রপঞ্চরহিত, প্রপঞ্চশূন্য। তা উৎপন্ন হয় না, তা শাশ্বত নয়, অশাশ্বতও নয়, একপ্রকার নয়, নানাপ্রকারও নয়, তাতে আগম নাই, নির্গমও নাই।"[২৫]

বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে অতীশের যে চিন্তন তা আবুল কাসেমের *অতীশ* ও সন্মাত্রানন্দের *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* উপন্যাস দুটির মধ্যে ঔপন্যাদিকদের দৃষ্টি অনুযায়ী উঠে এসেছে। তবে সন্মাত্রানন্দ কাহিনি ও বৌদ্ধ ধর্মমত বিশ্লেষণের জন্য সময়কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সময়ের এই ব্যবধান সন্মাত্রানন্দ প্রতিটি অধ্যায়ে উল্লেখ করলেও পাঠকের কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়তে হতে পারে। আবুল কাসেম কিন্তু সে পথে হাঁটেননি, তিনি অতীশের জীবনীকেই আধুনিক ভাষায় রচনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন অতীশের দর্শন। তবে দুটো উপন্যাস পাশাপাশি রেখে পড়লে অতীশ দীপংকর যে বৌদ্ধ দর্শনের নতুন অভিমুখ দেখিয়েছিলেন তা বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে।

Reference:

১. দাস, সঞ্জীব কুমার (২০২০), *বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শাসন,* কলকাতা : তথাগত, পৃ. ৫৭
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, অলকা (২০১৭), *অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান,* ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, পৃ. ১২
৪. রাহুল সাংকৃত্যায়ন (২০১৫), *তিব্বতে সওয়া বছর,* কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, পৃ. ১৩৮
৫. তাঞ্জুর— তিব্বতে বুদ্ধবাণীর ব্যাখ্যা ও মহান ভারতীয় এবং তিব্বতি আচার্যদের রচিত শাস্ত্রগুলি *তঞ্জুর* নামে সংকলিত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 279 - 286
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. কঞ্জুর— অতীশ সংগৃহীত বুদ্ধবাণীর সংগ্রহটি *কঞ্জুর* নামে পরিচিত।

৭. দাস, সঞ্জীব কুমার (২০২০), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯
৮. পূর্বোক্ত
৯. আবুল কাশেম (২০১৫), *অতীশ,* ঢাকা : অ্যার্ডন পাবলিকেশন, পৃ. ৩৯
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯
১৩. পূর্বোক্ত
১৪. পূর্বোক্ত
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯
১৬. পূর্বোক্ত
১৭. পূর্বোক্ত
১৮. সন্মাত্রানন্দ (২০২০), *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা,* কলকাতা : ধানসিড়ি, পৃ. ১২০
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২০
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 287 - 296
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আনোয়ার পাশার উপন্যাস ‘নিষুতি রাতের গাথা’ : সময়, সমাজ ও রাজনীতিবীক্ষা

সোহাগ মিয়া
প্রভাষক (বাংলা বিভাগ)
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিস
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি
ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID : shohagmia9919@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Communal Riot, Contemporary Era, Society, politics, History, Humanity, Crisis of Humanity, Division, Conflict.

Abstract
The novel serves as an artistic representation of the continuous flow of time and the evolving dynamics of society, intricately interwoven with the depths of human existence. As society progresses, the novel captures its multifaceted complexities, contradictions, and conflicts, along with their possible resolutions. Fundamentally, the novel reflects human experiences—joy and sorrow, hope and despair, love and brutality—all shaped by the inexorable passage of time. In Anwar Pasha's fiction, contemporary socio-political upheavals are depicted with stark realism, where human struggles, historical consciousness, political turmoil, and the natural world converge in an authentic and compelling narrative. As a writer committed to the truth of life, Pasha constructs the framework of his novels by blending personal experience with creative imagination. His second novel, Nishuti Rater Gatha, vividly portrays the socio-political landscape of post-Partition India, particularly the struggles of Muslims in West Bengal, the horrors of communal riots, and the broader political climate. Beneath the narrative lies the anguish of shattered dreams, the crisis of love and humanity, and the moral dilemmas faced by individuals amidst chaos. The novelist presents a harrowing depiction of communal violence, exposing its brutal and monstrous nature, while also subtly hinting at the presence of secular and humanist forces—however faint their resistance may be. Through his exploration of time, society, and politics, Pasha does not merely document the history of riots but crafts a deeply moving human account that underscores the fragile yet persistent resistance against communalism. Simultaneously, the novel offers a nuanced portrayal of women, highlighting their individuality and political awareness, thereby providing a broader reflection of the socio-political realities of the time.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

কথাসাহিত্যের সর্ববৃহৎ শিল্পমাধ্যম উপন্যাস নানা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান। সমাজ ও মানবজীবনের নানা গ্রন্থি উন্মোচন তার মূল কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে লেখকের বাস্তববোধ, বিশ্বাস ও মতাদর্শ আন্দোলিত হয় সমসাময়িক সমাজ আদর্শে। একজন শিল্পী সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্মকে যেভাবে নবরূপ দিতে পারেন সে প্রসঙ্গে মাও সে তুং-এর অভিমত –

> "শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমাজকে অধ্যয়ন করতে হবে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থা, তাদের চেহারা এবং তাদের মনস্তত্ত্ব শিল্পী সাহিত্যিকদের পর্যালোচনা করতে হবে। এ-সব বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারলে তবে আমরা অন্তর্বস্তুতে সমৃদ্ধ শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব এবং শিল্প সাহিত্যকে সঠিকভাবে নবরূপ দিতে পারবো।"[১]

আনোয়ার পাশা এ শ্রেণির সাহিত্যিক যিনি সময় ও সমাজকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তারই বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সাহিত্যকর্মে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসগুলো অনেক ক্ষেত্রে আত্মজৈবনিক শিল্পভাষ্যে রূপ নিয়েছে। উপন্যাস যে সমকালীন বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারে এবং সেই সাথে সমাজের নানাবিধ সমস্যা ও সংকট এবং রাজনৈতিক যে অভিঘাত জনমানসের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তারই পরিপূর্ণ ও বাস্তবোচিত রূপায়ণ হয়ে উঠেছে আনোয়ার পাশার উপন্যাস। সময় সমাজ রাজনীতির প্রবল অভিঘাতে ভাস্বর তাঁর তিনটি উপন্যাসই।

আনোয়ার পাশার দ্বিতীয় উপন্যাস *নিষুতি রাতের গাথা* (১৯৬৮)। প্রথম উপন্যাস *নীড়-সন্ধানী*র ন্যায় এ উপন্যাসেও সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প কলুষিত আবহাওয়ায় আর্তমানবতার হাহাকার নিয়ে উপন্যাস রচনার যে সূচনা লেখক তাঁর প্রথম উপন্যাস *নীড়-সন্ধানী*তে করেছেন, নিষুতি রাতের গাথা সেই একই পটভূমিতে রচিত। প্রথম উপন্যাসে সরাসরি দাঙ্গার উল্লেখ না থাকলেও এ উপন্যাসে দাঙ্গার বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে এবং সেই বহ্নিতে একটি সুখী পরিবার জ্বলে পুড়ে গেছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, উপন্যাস দু'খানি পরস্পরের পরিপূরক। তবে, পটভূমি এক হলেও নিষুতি রাতের গাথা স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে একধরনের রোমান্টিকতা ও বিষণ্নতা আছে। এর উপজীব্য জীবনের অন্তর্গত বিষণ্নতার উৎসটি সামাজিক। সুদীপ্ত শাহিন বিষণ্নতা, দাঙ্গায় তার বোন সুফিয়া নিহত হয়েছেন, মা আহত হয়েছেন এবং সে হয়েছে গৃহহারা। একটি গীতিকবিতার সুরে ঔপন্যাসিক তাঁর মর্মযন্ত্রণার কথা এ উপন্যাসে বর্ণনারূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সুদীপ্ত শাহিনের মর্মের বেদনা ও আনন্দের চিত্র অংকন করতে চেয়েছেন-আশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, প্রেমের নির্মল আনন্দ। এ উপন্যাস সম্পর্কে রাশীদুল হাসান 'পরিক্রম'-এ 'একটি নিভৃত মনের কথকতা' শিরোনামে একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

> "নিষুতি রাতের গাথা মনে হবে এক কবিতার নাম অথবা এক স্বগতোক্তি। কোনো কবিতার নাম নয় হয়তো স্বগতোক্তির মতোই রাতের গভীরে বেদানার মতো বেজে উঠা অশ্রুশিক্ত কাহিনি এই 'নিষুতি রাতের গাথা'।"[২]

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সৃষ্ট দাঙ্গায় একটি বিপর্যস্ত ও পতিত পরিবারের বেদনাময় রাত্রির কাহিনি থেকেই এ উপন্যাসের নামকরণ করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের পট-পরিবেশও যেন বিষণ্ন, থমথমে নিষুতি রাতের মতো। যার দরুণ নামকরণের দিক থেকে নিষুতি রাতের গাথা একটি সার্থক সাহিত্যকর্ম।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের প্রথম বাক্যই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দ্যুতিমান। এ উপন্যাসের পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র শহর। যে গ্রামের একটি সম্পন্ন পরিবার ধর্মে মুসলমান, কিন্তু চেতনাদর্শে ভারতীয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির ধর্মীয় উন্মত্ততা ও রাজনৈতিক শোষণ-পেষণে ক্ষতবিক্ষত এই পরিবারের মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারতীয় এলাকার স্থায়ী মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি ধর্মীয় বিরুপতাকে চিত্রিত করেছেন শ্রেণিচেতনার আলোকে এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাসের কাহিনিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির পৈশাচিক বর্বরতার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী শক্তির একটি ক্ষীণ ধারাও প্রবাহমান থাকতে দেখা যায়। উপন্যাসের মূল বিষয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উগ্র রূপের বীভৎস বর্বরতায় মানবতার অবমাননা ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিনষ্টি। উপন্যাসের প্রথম বাক্যে সমন্বয়ের বীজ উপ্ত হলেও সমগ্র উপন্যাসে তা পরিণত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে। সাম্পদায়িকতা এর শেষপৃষ্ঠা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত শুভবোধের জারকরসে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। গবেষক ড. মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী এ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন-

> "এই উপন্যাসের ভেতর দিয়ে সমকালীন পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের জীবন-বিশ্বাস ও জীবন-যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সমকালীন ইতিহাসের দলিল হিসেবে উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ।"[৩]

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের কাহিনির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে উন্মত্ত মানুষের দানবিক রূপ এবং দাঙ্গায় আহত নায়ক সুদীপ্ত শাহিনের মনোজগত ও তার চারপাশের ঘটনা এবং মানুষজন নিয়ে এ কাহিনি বিকশিত। ঔপন্যাসিক কখনও বিচরণ করেছেন সুদীপ্ত শাহিনের চেতনাজগতে আবার কখনও অন্তর্লোকে। উপন্যাসের ভূমিকাংশে ক্ষুদ্র পরিসরে লেখক একটি পরিবারের পরিচিতি এবং সেই পরিবারের সদস্যদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন উদার মানবতাবোধের উজ্জ্বল নিদর্শন। সে একদিকে দেখেছে স্বার্থপর ধনিক মিল মালিক ও তাদের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডা বদমায়েশ, অপর দিকে দেখেছে বিনয়দা, মন্দিরা, সুতপার মতো অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষ। কিন্তু কাহিনির পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কবলে পরে শ্রমিকের পোশাক পরে সুদীপ্তকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ এ উপন্যাস সুদীপ্ত শাহিনের বিধ্বস্ত পরিবারের কাহিনি এবং সেই সঙ্গে তার জীবনের স্বপ্নভঙ্গেরও।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে বিষময় পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কয়েকটি তরুণ তরুণীর বুর্জোয়া শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনিই এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেছে। উপন্যাসের কাহিনিতে লেখক মানুষের বসবাসযোগ্য স্বাভাবিক পৃথিবী কামনা করেছেন, প্রেমের ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিশেষের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে চেয়েছেন। চরিত্র চিত্রণেও লেখক এই ভাব পাঠক মনে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। সুফিয়ার বান্ধবী ঈপ্সিতা তাই নিজে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী তার সহপাঠীকে দীপ্ত ভাষায় সুফিয়ার সপক্ষে জবাব দিতে পারে, 'সুফিয়া আমার বোন, আমার আত্মীয়'। তার কাছে 'আমি মানুষ' এই পরিচয়টি সবচেয়ে বড়। ঈপ্সিতা মানুষের মধ্যকার সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্পর্কে দেশের হিন্দু-মুসলিম স্থায়ী সমস্যার সমাধান হিসেবে বিশেষ এক ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আগ্রহী এবং তা হচ্ছে কম্যুনিউজমের শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ। এছাড়াও আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনিসূত্র হিসেবে দেশের তরুণ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, সুদীপ্ত-মন্দিরা-সুতপাকেন্দ্রিক জটিল প্রেম-ভাবনার কথা, ষড়যন্ত্রকারী কূটবুদ্ধিসম্পন্ন একটা শ্রেণির ঘৃণিত কার্যকলাপ স্থান পেয়েছে। এ উপন্যাসের কাহিনি ও ঘটনার পর্যবেক্ষণ সূত্রে সমালোচক ড. সুধাময় দাস তাঁর বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ গ্রন্থের '১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত লিখিত উপন্যাস' অংশে বলার প্রয়াস পান –

> "পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে লেখকের মনোভাব নমনীয়। অবশ্য এখানেও লেখক উপলব্ধি করেন যে, ভারতের বুর্জোয়া শাসক এবং তাদের সহযোগী শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দ্যেশের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ নিহিত। এবং এর মূল উৎপাটনের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। ...লেখক ও পাকিস্তান ও স্বধর্মপ্রীতির পাশাপাশি হিন্দু মুসলিম মিলন কামনা, জীবন ও সমাজ গঠনে মার্কসবাদী ধ্যান ধারণা প্রভৃতি দ্বন্দ্বে দোলায়িত হয়েছেন ও তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।"[৪]

আনোয়ার পাশা এ উপন্যাসের কথাবস্তুকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন এবং নতুন প্রজন্মের দাঙ্গা প্রতিরোধে পরিকল্পিত চেষ্টার সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে। সবমিলিয়ে যে বিষয়কে ধারণ করে তিনি এ উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তা কাহিনির আকারে অত্যন্ত সুনিপুণ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় বিন্যাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সমাজসন্ধানী শিল্পী আনোয়ার পাশার প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্ম সমাজের নানাবিধ সমস্যা ও সংকটকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। সমাজ রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি এটাও স্পষ্টতর করেছেন যে, সামাজে যে সকল সংকটের সৃষ্টি হয় তার নেপথ্যে কারা কীভাবে এবং কোন স্বার্থে ইন্ধন যোগায় এবং এর পরিণতিতে সমাজে কতটা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে এবং মানুষের জীবন কতো দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। লেখক এটাও দেখিয়েছেন কীভাবে সংকট কাটিয়ে উঠতে পারা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আনোয়ার পাশা রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথাতেও লেখকের সমাজমনস্ক মনোভাবের পরিচয় পাই। যেখানে প্রথম উপন্যাসের মতো সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে সমাজে কতটা বিষময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে এবং মানুষে মানুষে শুধু ধর্ম ভিন্ন হওয়ার কারণে দূরত্ব কতোটুকু বাড়তে পারে তারই সুশৃঙ্খল রূপায়ণ ঘটিয়েছে। সেই সাথে সমাজের নারী ও পুরুষ উভয়েই যে কালের ধারাবাহিকতায় রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠছে এবং প্রতিবাদী মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠছে তারই প্রকাশ পাশার দ্বিতীয় উপন্যাস।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের সূচনাতেই আমরা সমাজের মানুষ সম্পর্কে একটা ধারণা পাই যেখানে মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের এক ভদ্রলোক তার চার ছেলেমেয়ের নাম রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী শব্দের সঙ্গে একটি করে বাংলা শব্দ জুড়ে নাম রাখে। তার এ কাজকে সমাজের মানুষ নেতিবাচক দৃষ্টিতে বিচার করে। উপন্যাসে তারই প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত সংলাপে –

> “তাঁর মুসলিম আত্মীয়-স্বজন অনেকেই তাঁকে কাফের হয়ে গেছে ভেবে বয়কট করেছিল, যদিও সত্যকার কাফের তিনি ছিলেন না।”[৫]

একটা সমাজ কতটা ধর্মাচ্ছন্ন হলে শুধু সন্তানের নামকরণ বাংলা শব্দে করার দরুণ তাকে কাফের বলে বয়কট করতে পারে। এখানেই অর্থাৎ উপন্যাসের শুরুতেই সাম্প্রদায়িকতার দিকটি উন্মোচন করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহিনের মা যার পৈতৃক বাড়ি ছিল এলাহাবাদ, তিনি অল্প বয়সে রবীন্দ্রসংগীত শুনে বাংলাভাষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। পিত-মাতার অমতে বাঙালি স্বামী মনোনীত করেন। তার এ স্বামী মনোনীত করার দিক থেকে নারীর ব্যক্তিত্বের দিকটি পাই, যেখানে সমাজে নারীর একটা আলাদা অবস্থান তৈরি হয়। এছাড়া আলোচ্য উপন্যাসে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় রূপ দেখতে পাই সুদীপ্তের বোন অলকা সুফিয়ার মাধ্যমে। যে রাজনীতির ব্যাপারে উৎসুক্য। উপন্যাসে পাই –

> “বিতর্ক প্রতিযোগীতায় নেমে প্রায়ই প্রথম হ’ত এবং ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিত।”[৬]

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তখনকার সমাজের মানুষের সচেতনমূলক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

উপন্যাসে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলে সরকার কারফিউ জারি করে। এতে করে সাধারণ মানুষের জনজীবনে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। বিনয়ের বোন সুতপা যে কিনা অন্যসকল দিন নদীতে স্নান করে কিন্তু কারফিউ জারি হবার ফলে এখন নদীতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তেমনি সুদীপ্ত বাইরে বের হতে চাইলে কারফিউয়ের কারণে বিনয় বাধা প্রদান করে।

এছাড়াও সমাজে হিন্দু-মুসলিম দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ভিন্নতা লক্ষ করা যায় এবং সে ভিন্নতা পোশাক পরিচ্ছদ থেকে খাওয়া-দাওয়া সকল আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। উপন্যাসে সুফিয়া আর ক্ষণিকার মাঝে চলমান কথাবার্তায় রয়েছে তারই পূর্ণ প্রতিফলন –

> “একদিন তোমাদের বাড়ি মুরগীর মাংস খাওয়ানা ভাই, খুব করে পেয়াজ মসলা দিয়ে রান্না ক’রে।
> বেশতো, মুসলমানের ঘরের বৌ হয়ে আয়। কতো পেঁয়াজ আর মুরগী খেতে পারিস তখন দেখব।”[৭]

সম্প্রদায়গত খাবারের এ ভিন্নতা উপর্যুক্ত আলাপের মধ্যেই হিন্দু সমাজের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথাও উঠে এসেছে। সেটি হচ্ছে পণ বা যৌতুক প্রথা। যখন সুফিয়া ক্ষণিকাকে মুসলমানের ঘরের বৌ হয়ে আসার কথা বলে তখন ক্ষণিকা বলে —

> “সত্যি বলেছিস। মন্দ হয় না। বাবার হাজার পাঁচ সাতেক টাকা বাঁচে।’
> ‘না রে, টাকা আজকাল মুসলমানের মেয়ের বিয়েতেও কম খরচ হচ্ছে না।”[৮]

যৌতুক প্রথা শুধু হিন্দু সমাজেই নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে তার প্রচলন ছিল তা সুফিয়ার কথাতে স্পষ্ট।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে যে সমাজের কথা বলা হয়েছে সে সমাজের মানুষের মধ্যকার উদাসীন মনোভাব ও নিষ্ক্রিয়তার কারণেই দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিনয়, অনুপম, ঈপ্সিতা, সুফিয়া ও প্রদীপকুমার মৈত্র এর মধ্যকার আলোচনাতেই সেদিকটি উঠে আসে –

> "পরিস্থিতি যে ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিল সেটা প্রত্যেকটি সাধারণ নাগরিকও টের পাচ্ছিল। অথচ কেন যে কেউ সেই একটা মানবতার কলঙ্কজনক পরিস্থিতির সম্ভাবনা রোধে যত্নবান হচ্ছিল না সেটা বোঝা যায়নি। শহরের মধ্যে দাঙ্গা চায় না এমন নাগরিকের সংখ্যা খুব নগণ্য ছিল না, কিন্তু তাদের সীমাহীন ঔদাসীন্য এবং বেদনাদায়ক নিষ্ক্রিয়তা পরক্ষে দাঙ্গাবাজদের উৎসাহিতই করছে।"[৯]

আলোচ্য উপন্যাসে সুদীপ্ত ও অনুপমের কথায় দেখতে পাওয়া যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন লোক সমাজে মাথা উঁচু করে বিচরণ করে অথচ যারা অসম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন এবং ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে গিয়ে মানুষ হওয়ার সাধনায় ব্রতী তারা সমাজে নিগৃহীত ও শোষিত এবং তাদের আবাসস্থল হয় জেল-হাজত। অনুপমের বেদনা বিধুর কণ্ঠস্বরে সে দিকটি অর্থাৎ সমাজের অসঙ্গতির চিত্রটি উঠে এসেছে –

> "আমার কি অপরাধ ছিল বলতে পারেন শাহিন দা, আমি হিন্দু না হয়ে মানুষ হ'তে চেয়েছি, মানুষকে দুর্গতিমুক্ত দেখতে চেয়েছি- এই কি আমার অপরাধ? আর যারা মানুষ মারার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়।"[১০]

সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সচেতনতার পরিবর্তে ধর্মীয় কুসংস্কারের বোধ প্রবল ছিল। তারা মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখে ধর্ম দ্বারা বিবেচনা করে। তেমনি এ উপন্যাসে সুফিয়া ও ঈপ্সিতা কলেজ থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে সাম্প্রদায়িকবোধ সম্পন্ন ছেলেরা ঈপ্সিতাকে বলে যেন সুফিয়া নামক যবনীটাকে সাথে নিয়ে না ঘুরে। তখন ঈপ্সিতা বলে তাদের ইচ্ছায় চলতে হবে নাকি। এখানে নারীর সক্রিয় অবস্থানটিকে চিহ্নিত করা যায়। সেই সাথে ছেলেদের কথায় প্রবলভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ছেলেরা বলে –

> "না, কেবল আমাদের ইচ্ছে নিয়ে কথা হচ্ছে না। সমগ্র হিন্দু সমাজের এ হচ্ছে মনের কথা। হিন্দুর ঐক্যের যুগ এখন। মুসলমানেরা চিরকাল আমাদের শত্রু, আমাদের মন্দির ভেঙেছে, আমাদের ধর্ম নাশ করেছে, তাদের সঙ্গে আবার এতো মাখামাখি কিসের?"[১১]

হিন্দু-মুসলিমকে বিভাজন করার মানসিকতাসম্পন্ন এসকল ছেলেরাই দাঙ্গার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলিম যে বিভেদপূর্ণ পরিস্থিতি এবং সে দ্বন্দ্বের জেরে এক ধরনের মানুষকে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য করে তুলেছে সে দিকটি সুদীপ্তর মা সালমা বিবির কান্নামাখা কণ্ঠেও প্রকাশিত হয়েছে –

> "হিঁদুরা আর দেশে থাকতে দেবে না মা। আল্লা, আমাদের কি হবে গো।"[১২]

সমাজের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিবর্গের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও করে রেখেছে। যা সমাজের মানুষের মধ্যকার সচেতন মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। ঈপ্সিতা একটি পরিত্যক্ত বাল্বের ভেতর এসিড ভর্তি করে মুখটা বন্ধ করে সুফিয়াকে দিয়ে বলল –

> "এইটে কাছে রাখ। পথে ঘাটে বিপদে পড়লে কাজে লাগবে। ঠিক মুখের উপর ছুঁড়ে মারবি। যতো বড়ই বীরপুরুষ হোক, আর কাছে ঘেঁষতে হবে না।"[১৩]

দাঙ্গার কারণে মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেউ একটু কোথাও শব্দ করে উঠলেও মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এমনকি দাঙ্গা সৃষ্টিকারী মানুষরা এমন ষড়যন্ত্র করেছিল যেন কেউ বেঁচে থাকতে না পারে। সুদীপ্তকে পুলিশে নিয়ে গেছে শুনলে তাদেরই এক পক্ষের বক্তব্য এমন –

> "তাই নাকি। তাতো হতে পারে না। এই সময় কোনো নেড়েকে তো হাজতে রাখা যায় না। তাহলে তো সে বেঁচেই গেল।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এছাড়া ক্ষণিকার বাবা গৌর বাবুর মধ্যে আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিষয়টি দেখতে পাই। দাঙ্গাকে পাপের ফল হিসেবে তিনি দেখেছেন। তাই তিনি সুদীপ্তকে বলেছেন –

> "তোমরা নতুন যুবকেরা আজকাল কি ভাবো জানিনে, কিন্তু আমরা মনে করি এই দাঙ্গা আমাদের পাপের ফল। ভগবানকে ভুলে গেছে জন্যই পরস্পরে ঝগড়া করে মরছে।"[১৫]

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে নাগরিকজীবন অধ্যুষিত যে সমাজের কথা বলা আছে সেখানে আচারনিষ্ঠ হিন্দুদের সন্ধান মেলে। মন্দিরার বিধবা জেঠিমা সুদীপ্তকে পছন্দ করেন না কারণ সে মুসলমান। আবার সুফিয়াকেও তিনি পছন্দ করেন না। জেঠিমার ধারণা, মুসলমানদের ছোঁয়া লাগলে জাত যায়। সুফিয়া ছোটবেলায় মন্দিরাদের বাড়ি গেলে জেঠিমা বলেছেন–

> "এই খুকী, ওদিকে যেও না। যা, যা- সব ছুঁয়ে দিল।... যত রাজ্যির অজাত-বেজাতের লোক এনে ঘরে ঢুকাবে। জাত বলে কিছু থাকলো আর।"[১৬]

কলকাতা শহর হলেও সেখানে যে মুসলমানরা বসবাস করতো তাদের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। সুদীপ্তের স্মৃতিচারণে সুফিয়ার মৃত্যু কাহিনিতে এ খবর জানা যায় –

> "মুসলমান পাড়ার অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তিরই পাকা দালান বাড়ি নেই, বাঁশের অথবা কঞ্চির বেড়া দিয়ে তার উপর খড়ের অথবা টালির ছাদ। সেই সব তখন চারপাশে পুড়ছে, শুধু পুড়ছে। শেষ পর্যন্ত সুফিয়াকে ধরে সে আগুনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।"[১৭]

এছাড়াও এ উপন্যাসে সে সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনও যে বিরাজমান ছিল তা সুদীপ্তর অসহায় অবস্থায় বিনয় ও সুতপার ক্লান্তিহীন সেবা ও আন্তরিক আতিথেয়তার ঘটনায় জানা যায়। তাই সুদীপ্ত দেশত্যাগ করে ঢাকা গিয়েও তাদের ভুলে যায়নি। সে বলে –

> "যে দেশ ছেড়ে এলো সে দেশের ঘৃণাকে সে সঙ্গে আনবে না। সত্য হয়ে থাক বিনয়দা-সুতপা-মন্দিরা, অক্ষয় হয়ে থাক ক্ষণিকা-সুকান্ত-ঈপ্সিতা-অনুপম।"[১৮]

এ উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে যখন সুদীপ্ত ও সুকান্ত শ্রমিকের পোশাক পরে দেশত্যাগে উদ্যোগী হয় তখন একটা থার্ডক্লাস রেস্টুরেন্টের ভাঙা বেঞ্চে বসে সকালের চা পর্ব সেরে নেওয়ার সময় একজন মজুরকে কেন্দ্র করে অন্য একজন ব্যক্তির মন্তব্য সেখানে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণ্য মানসিকতা এবং মুসলমানদের হীন ও নীচ ভাবার যে সমাজ সেটাই পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসে পাই –

> "এই রে, ভোলা এইচে। দ্যাখ ভোলা, যতো গালাগাল ছিল সব তোকে দিইচি। তোকে হারমজাদা-জানোয়ার ব'লেও আর কিছু হবে না। তোকে এবার থেকে মুচলমান বলতে হবে।'
> 'ঠিক বলেচিস- সঙ্গে সঙ্গে আর একজন অন্য কোন থেকে বলে উঠল- 'ও শালাকে চামার বললেও মান দেখানো হয়। ওকে মুচলমানই বলা উচিত।"[১৯]

সমাজের নানা অসঙ্গতি এবং মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন ভাবনা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে। সমাজের সূত্র চিত্র রূপায়ণে সদা তৎপর কথাসাহিত্যিক আনোয়ার পাশা এ উপন্যাসে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আনোয়ার পাশা সাহিত্যকে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। কেননা তিনি যে সময়কার সাহিত্যিক তখন সমাজে নানা সংকট ও বিরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল, তাকেই তিনি সাহিত্যে নিজের মতো রূপদান করবেন এমনটাই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। উপন্যাসে তিনি জীবনের ও সমাজের নঞর্থক কুৎসিত চিত্র অঙ্কন করেন, যা আমাদের বিবেককে শিহরিত করে, ঘৃণা করতে শেখায় - স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদকে এবং উদ্বোধন ঘটায় সদর্থক চিন্তা চেতনার।

১৯৪৭ পরবর্তী সমাজ-রাজনীতির জটিল পটভূমিকায় রচিত আনোয়ার পাশার নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসটি। এ সময়পর্বে সদ্য স্বাধীন হওয়া দুটি দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-মুসলিমের মাঝে সম্প্রদায়গত নানা সংকট বিরাজ করতে থাকে। এ সংকট এক সময় দাঙ্গায় রূপ নেয়। এ দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ সময়কেই পটভূমি হিসেবে তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের কাহিনি হিসেবে যেসব ঘটনার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে সেখানে সমাজ বাস্তবতার যে রূপ ও রাজনীতির বিভিন্ন অভিঘাত উঠে এসেছে তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বিরুদ্ধ প্রতিবেশ সম্পর্কে আঁচ করতে পারা যায়। সময়ের যথার্থ রূপায়ণ এ উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। একটি পত্রিকাও যে একটা সময়কে চিনিয়ে দিতে পারে তা এ উপন্যাসে 'যুগানন্দ' পত্রিকার মাধ্যমে দেখতে পাই। দাঙ্গা সৃষ্টির পেছনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এ পত্রিকা। সমকাল এ পত্রিকা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর পক্ষে দালালি করেছে। অনুপমের ভাষায় –

> "যুগানন্দ যে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারে এতো তৎপর তার কারণই হচ্ছে তারা দেশের গণশক্তিকে অবান্তর সাম্প্রদায়িক কলহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।"[২০]

উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখতে পাই, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সুদীপ্তর বাবা সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন বলে ধর্ম নিয়ে মাঝে মাঝে কথা বললেও কখনো রাজনীতি সম্পর্কে কোনো কথা বলতেন না বলে লেখকের অনুমান। অর্থাৎ সরকারী চাকুরিজীবীরা যে সবসময়ই রাজনীতিনিরপেক্ষ মনোভাবকে পোষণ করে তারই ধারক সুদীপ্তর বাবা। এটা একালের সমাজেও দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া উপন্যাসে যে দাঙ্গার কথা এসেছে এবং যে দাঙ্গায় সুদীপ্ত হারিয়েছে তার বোন অলকা সুফিয়াকে, নিজে হয়েছে বাড়ি ছাড়া সেই দাঙ্গা বৃটিশ রাজত্বের কালেও হয়েছে। কিন্তু তখনকার দাঙ্গার সাথে এখনকার দাঙ্গার ব্যবধান রয়েছে। সুদীপ্তের ভাবনায় উপন্যাসে উঠে এসেছে –

> "১৯৪৬ এর দাঙ্গার কথা তার মনে পড়ল। সেই দাঙ্গা কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, এদিকে ছড়ায়নি। তা না ছড়ালেও তাদেরকে দাঙ্গার আতঙ্ক পোয়াতে হয়েছে পুরোপুরি। সে ছিল বৃটিশ রাজত্বের কাল। তখন দাঙ্গা হলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই জীবনের সুবিধা অসুবিধার জোয়ার ভাটা সমানভাবে খেলত। কিন্তু আজ?"[২১]

সুদীপ্তের এ হতাশার সুর দিয়ে প্রকাশ পায় তখনকার দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব ফেললেও আজকের যে দাঙ্গা তা শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছে। এ সকল কাহিনি থেকে সময়ের ধারণা সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

আলোচ্য উপন্যাসে দাঙ্গা পরবর্তী সময়ের চিত্র উঠে এসেছে। তখন দেশব্যাপী নানা রকম আইন প্রয়োগ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তেমনি একটি আইন হিসেবে সান্ধ্য আইনের উল্লেখ পাই। ক্ষণিকার বাড়ি থেকে সুদীপ্ত বিনয়দের বাড়ি যখন পৌঁছল তখন সূর্য ডুবে গেছে। যে সান্ধ্য আইন দেওয়া হয়েছিল সে আইন উঠিয়ে নিলেও শহরের বুকে থমথমে ভাব বিরাজমান ছিল। মূলত প্রথম উপন্যাস নীড়-সন্ধানীতে দাঙ্গা হওয়ার মতো যে উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথায় সে দাঙ্গার বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং সুদীপ্তের পরিবারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ সময়কে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সুচারুরূপে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আনোয়ার পাশা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেননি। তাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরাও সক্রিয় রাজনীতি করে না। কিন্তু তিনি তাঁর উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মুখে রাজনীতির কুৎসিত দিক উদঘাটন করে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের বিনয় চরিত্রের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসী রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির কথা বলেছেন। বিনয়ের 'কংগ্রেসী রাজনীতির ধাপ্পাবাজি' প্রবন্ধ পাঠ শেষে সুদীপ্ত বলে –

> "বিনয়দা আমি রাজনীতি বুঝিনে, তবে বই প'ড়ে যা শিখেছি তাতে মনে হয়-হিন্দু জাতীয়তাবাদ কথাটা যেন সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক।... ঈপ্সিতা এখানে প্রশ্ন করেছেন-আচ্ছা বিনয়দা আমাদের দেশে সত্যকার জাতীয়তাবাদের জন্ম না হয়ে ঐ ধরনের তথাকথিত জাতীয়তাবাদ জন্ম নিল কেন?"[২২]

ঈপ্সিতার কথা থেকে আমরা সত্যিকার জাতীয়তাবাদ বলতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকেই বুঝি, হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক জাতীয়তা নয়। ঔপন্যাসিক আনোয়ার পাশাও এই বাঙালি জাতীয়তাবাদই চাইতেন।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে। সেই সাথে তিনি অতিরিক্ত সংযোজন ঘটিয়েছেন বুর্জোয়া শোষক ধনিক শ্রেণি ও প্রতিবাদি শান্তিকামী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তরুণ তরুণীর মধ্যে বিরোধ। শোষক-

বুর্জোয়া শ্রেণি পাকিস্তানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ ছড়িয়েছে। এ শ্রেণি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করেছে এবং উদারপন্থি, মানবতাবাদি ও অনান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিককর্মীদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে, হত্যা করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধ্বংসযজ্ঞে পতিত হয়েছে সুদীপ্ত শাহিনের পরিবার। সে হারিয়েছে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী বোন অলকা সুফিয়াকে, হয়েছে পরিবারবিচ্ছিন্ন ও নীড়হারা। সমকালীল রাজনীতির আলেখ্য এ উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে সুস্পষ্টরূপে।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে সুদীপ্ত শাহিনের মধ্যে সরাসরি রাজনীতিতে সক্রিয়তার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকলেও তার মধ্যে যে তীব্র দেশাত্মবোধ ছিল সে বিষয়টি উপন্যাসের প্রথমেই লক্ষ যায় –

> "সুদীপ্তর সংকল্প ছিল যেকোনো প্রকারে এই দেশেই জীবন কাটাবে সে।"[২৩]

তার বড় ভাই সুশোভন হাবিব দেশত্যাগ করে পাকিস্তান চলে গেলেও সে দেশে থাকার সংকল্প করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কালো স্পর্শ তাকেও দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সুদীপ্তের বোন অলকা সুফিয়া ছাত্র-ফেডারেশনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিত, তার বড় ভাইয়ের বন্ধু, বিপদের দিনে যার আশ্রয় সুদীপ্ত নিয়েছে সেই বিনয়কে আমরা অত্যন্ত রাজনীতিপ্রবণ মানুষ হিসেবে পাই। সেই সাথে অনুপম, সুকান্ত, ঈপ্সিতাদেরকে রাজনীতিতে সক্রিয় মানুষ হিসেবে দেখতে পাই। এতে করে সমকালীন রাজনীতিতে নারী পুরুষের যুগপৎ অংশগ্রহণের দিকটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। কংগ্রেসী রাজনীতির বিরুদ্ধে তারা সর্বদা সজাগ থেকেছে। এক রাত্রের ঘটনাতে সে বিষয়টি স্পষ্টতা পায় –

> "সুফিয়ার কাছে গিয়ে সে দেখে, একখন্ড বড়ো কাগজে তুলি বুলিয়ে মোটা মোটা হরফে সুফিয়া লিখছে- কংগ্রেসী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন।"[২৪]

অনুপম, সুফিয়া, ইপ্সিতা, বিনয় এরা নিয়মিত তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে উপন্যাসে আলাপ চালিয়ে গেছে। তাদের ফেডারেশনের জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। তাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে স্থানীয় ভকতরাম জুটমিলে শ্রমিক আন্দোলনের কথা, যারা কিনা শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগাবার চেষ্টা করেছে।

পত্রিকাগুলোতে পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচারের কাহিনি যেভাবে ছড়াচ্ছে সে প্রসঙ্গে অনুপম যে কথা বলে তার মধ্যে উন্নত রাজনৈতিকবোধ ও সচেতন মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুপম বলে –

> "পাকিস্তান একটা অছিলা। যে কোনো প্রকারে এখানকার বুর্জোয়া শ্রেণি চাচ্ছে, এখানকার প্রোলেটারিয়েট হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখতে।"[২৫]

তাদের আলোচনায় বুর্জোয়া শাসকদের অপরাজনীতির চিত্রও উঠে আসে। ফেডারেশনের সভা শেষে ঈপ্সিতা যখন অনুপমের কাছে জানতে চায় দাঙ্গার পেছনে কর্তৃপক্ষ দায়ী কিনা, তখন অনুপম উত্তর দেয় কোন বুর্জোয়া শাসক তা না চায়? অর্থাৎ প্রত্যেকটা বুর্জোয়া শাসকই চায় সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। উপন্যাসের এক পর্যায়ে ক্ষণিকাদের বাড়ি গিয়ে সুদীপ্ত ক্ষণিকার বাবা গৌরবাবুর সঙ্গে আলোচনায় যখন বলে –

> "জাতীয়তার প্রশ্নে এককালে আমরা খুব একটা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি, যার জন্যে হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের থেকে অনেক দূরে স'রে গেছে- এটাও বোধ হয় দাঙ্গার একটা কারণ।"[২৬]

তার এ কথাতে দাঙ্গার অন্যতম কারণ যেমন উঠে আসে সেই সাথে জাতীয়তা সম্পর্কে তার যে বোধ সেখানে মূলত রাজনৈতিক চিন্তা চেতনারই প্রকাশ লক্ষণীয়। একই সাথে তার চেতনায় যখন কাজ করে এ ভারতে কেবল হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে কেবলই মুসলমান হওয়ার অপরাধে, অথচ তাদের কোনো অপরাধ ছিল না। সে ভাবে, পাকিস্তানের কোনো মুসলমান যদি কোনো হিন্দুর ওপর অত্যাচার ক'রেই থাকে সেজন্য ভারতের নিরীহ মুসলমানটির তো কিছু করার থাকতে পারে না। তাই তার মনে হয় –

> "এখানকার মুসলমানেরা পাকিস্তানের হিন্দুদের জানমালের গ্যারান্টিস্বরূপ।"[২৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার এসব বিবেচনায় পরোক্ষভাবে রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে দেখি মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রকাশ পায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ একজন লোকের মুখেও। যে কিনা বলে –

> "ও শালাকে চামার বললেও মান দেখানো হয়। ওকে মুচলমানই বলা উচিত।"[২৮]

এখানে একটা দেশের সমকালীন রাজনীতি কতটা বিরূপ থাকলে সাধারণ মানুষের মুখেও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ এতটা তীব্র হতে পারে তা স্পষ্টতা পেয়েছে এ উপন্যাসে।

আনোয়ার পাশা নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাস নভেলার আকারে লিখলেও এখানে তিনি সময়, সমাজ ও রাজনীতির সূত্ররূপ উপস্থাপন করে তৎকালীন সময়ের অপরাজনীতি ও শোষক শ্রেণির মনোভাব, উদারপন্থী রাজনীতির চর্চাকারী মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণের চিত্র দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। সময়ের পটভূমিকায় বিধৃত মানুষের বহুকৌণিক রূপ-রুপান্তর এ উপন্যাসে সাবলীল রূপ পেয়েছে। এতে করে তাঁর ক্ষুদ্র এ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন হয়ে আছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঔপন্যাসিকের সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি চেতনা ও মনোভাব।

আনোয়ার পাশার দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথা শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকেও একটা বিশিষ্ট সংযোজন। এক্ষেত্রে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য –

> "কি ভাষা ব্যবহারে, কি গল্পের সংগঠনে 'নিষুতি রাতের গাথা'র লেখক 'নীড়-সন্ধানী'র লেখকের তুলনায় পরিণত। মনে হয় এই বইতে পাশা তার নিজস্ব রীতিটি খুঁজে পেয়েছেন। গল্প বলার ধরনটিও অধিক স্বচ্ছন্দ। সর্বোপরি এ উপন্যাস বাহুল্যবর্জিত, এর গল্প সুসংগঠিত।"[২৯]

অর্থাৎ *নিষুতি রাতের গাথায়* তিনি টেকনিকের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তা আয়ত্তে আনতে পেরেছেন বলে আমাদের মনে হয়। এটি সার্থক উপন্যাসের চরম দৃষ্টান্ত না হলেও তথ্যকে তথ্যমাত্র না রেখে একে জীবনায়িত করে যে শিল্পরূপ তিনি দিয়েছেন তাতে নিপুণতা আছে। এখানেই তিনি শিল্পী হিসেবে এক ধাপ ওপরে উঠে এসেছেন। একজন উদীয়মান লেখক হিসেবে আনোয়ার পাশার জন্য এটা খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। এদিক থেকে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথা বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একটি বিশিষ্ট সংযোজন হয়ে আছে।

Reference:

১. তুং, মাও সে, দ্বিতীয় সংস্করণ, পিকিং, ১৯৭৭ [দ্বৈতীয়িক উৎস-বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ, ড. সুধাময় দাস, ২০১৫, মনন প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২০৭]
২. ইকবাল, ভূঁইয়া, ২০২১, *শহীদ বুদ্ধিজীবী জীবনী গ্রন্থমালা: আনোয়ার পাশা,* কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫১
৩. ফারুকী, মুজাহিদ বিল্লাহ, ২০২০-২১, *বাংলাদেশের উপন্যাসে পুরাণ ও ইতিহাস,* ন্যাশনাল পাবলিকেশ, ঢাকা, পৃ. ১২৯
৪. দাস, সুধাময়, ২০১৫, *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ,* মনন প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৭৮
৫. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), ১৯৮৩, *আনোয়ার পাশা রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৫
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৯. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), ১৯৮১, *আনোয়ার পাশা রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৯

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 297 - 305
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যা

অসীমা সাহু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর
Email ID : sahooasima.1990@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword

Narayan Sanyal, Partition, Bakultala P.L. Camp, Balmik, Aranyadandak, Refugees, Political Upheaval, Humanity, Rehabilitation.

Abstract

The Partition of India in 1947 was a cataclysmic event that uprooted millions, forcing them to migrate across newly drawn borders. This mass displacement not only resulted in the loss of homeland but also led to a profound crisis of identity, culture, and survival. The trauma of forced migration and the struggle for rehabilitation have been central themes in many literary works, particularly in Bengali literature. Among the notable voices, Narayan Sanyal's novels- Bakultala P.L. Camp, Balmik and Aranyadandak - offer a nuanced and multidimensional portrayal of the refugee experience, capturing both the grim realities of displacement and the resilience of the human spirit.

Sanyal does not merely document the deplorable living conditions of refugees in camps and colonies but also emphasizes their agency, determination, and indomitable humanity. His works explore the psychological and emotional struggles of those who lost everything, yet managed to reconstruct their lives with perseverance and self-respect. Bakultala P.L. Camp presents a stark yet deeply human portrayal of refugee rehabilitation centers, highlighting not only the suffering within but also the extraordinary strength and solidarity among the displaced. Balmik delves deeper into the questions of exile, alienation, and the search for identity, portraying how individuals redefine themselves amidst socio-political turmoil. In Aranyadandak, Sanyal depicts the adversities faced by displaced people as they attempt to build a new life in unfamiliar surroundings.

What distinguishes Sanyal's approach is his refusal to portray refugees merely as victims of political upheaval. His narratives challenge conventional perceptions of displacement by illustrating how refugees, despite their losses, contribute to the social and economic fabric of their adopted communities. Through these stories, Sanyal provides a literary testimony to the resilience of the human spirit, showing how individuals can overcome even the most devastating circumstances through sheer determination and a profound sense of humanity.

This paper seeks to explore how the select novels of Narayan Sanyal redefines the discourse on displacement, survival, and self-reconstruction. By

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

examining his portrayal of the refugee experience, this study aims to highlight the significance of his works in understanding the long-term impact of Partition on the Bengali refugee psyche.

Discussion

ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগ — উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যেন এক সূত্রে গাঁথা। দেশভাগের অনিবার্য ক্ষত রূপেই দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে হঠাৎ করেই তাদের মাতৃভূমিটা বিদেশ হয়ে গেল, বহুকালের বন্ধু প্রতিবেশীরা শত্রু হয়ে গেল। নিজের জন্মভূমি থেকে ছিন্নমূল হতে বাধ্য হল অসংখ্য মানুষ। শরণার্থী হিসেবে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান তথা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রবল মানবিক সংকটের সম্মুখীন হল তারা। শরণার্থী শিবিরে অথবা তথাকথিত পুনর্বাসনের পর তাদের সামগ্রিক জীবনচর্যার চিত্র ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছিলেন লেখক নারায়ণ সান্যাল। পেশায় তিনি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কর্মসূত্রেই তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে যুক্ত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প’ (১৯৫৫)। পরবর্তীকালে লেখা ‘বল্মীক’ (১৯৫৮) এবং ‘অরণ্যদণ্ডক’ (১৯৬২) উপন্যাস দুটিতেও আছে সেই উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের জীবনযাপনের ছবি। এই তিনটি উপন্যাসেই লেখক নারায়ণ সান্যাল উদ্বাস্তু সমস্যার কথা লিখেছেন। ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’-এ লেখক উদ্বাস্তু মানুষদের ‘ভূতপূর্ব মানুষ’ বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি সেই ভূতপূর্ব মানুষদের ক্যাম্পজীবনের কথা বলেছেন। সরকারি ডোল (Dole) নির্ভর ক্যাম্পবাসী মানুষরা কীভাবে কর্মবিমুখ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, বিরুদ্ধ প্রতিবেশে কীভাবে তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে— এই উপন্যাসে সেই ছবি রয়েছে। পুনর্বাসনের নতুন গড়ে ওঠা কলোনিগুলিতে রাজনৈতিক অশুভ আঁতাতের কারণে অসহায় ছিন্নমূল মানুষগুলো কীভাবে আরো বিপন্ন হয়ে পড়ছে— সেই ছবি আছে ‘বল্মীক’ উপন্যাসে। এই উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের প্রেক্ষিতে লেখক দেখিয়েছেন ওপার বাংলায় ঠিক যে মানুষগুলো বাস করত এপার বাংলায় চলে আসা মানুষগুলো যেন ঠিক তারা নয়, তাদের প্রেতচ্ছায়া। আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাদের স্বভাবে এই বিরূপ পরিস্থিতির অভিঘাতে। ‘অরণ্যদণ্ডক’ উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন পেয়ে উদ্বাস্তু মানুষেরা সেই ঊষর ভূমিতেই সোনার ফসল ফলানোর প্রয়াস করছে। আবার নতুন প্রজন্ম তাদের পৈতৃক পেশার পরিবর্তে যুগোপযোগী পেশা বেছে নিয়ে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার ঐকান্তিক প্রয়াস করছে। নারায়ণ সান্যালের তিনটি উপন্যাসেই মানুষের অসহায়তা-যন্ত্রণা-বঞ্চনার কথা থাকলেও সেটিই উপন্যাসের মূলকথা নয় বরং প্রতিটি উপন্যাসেই সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠে আশার আলোকবর্তিকা উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসগুলির চরিত্রেরা যেন তাদের দুর্ভাগ্যের বিপরীতে প্রতিস্পর্ধী হয়ে মাথা তোলে। সমস্যা নয়, সংকট নয়, প্রেম আর মানবতাই জয়লাভ করে।

লেখক নারায়ণ সান্যালের প্রথম উপন্যাস ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’ প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। শিবপুর বি. ই. কলেজের পাঠ শেষ করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। সে সময় দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে। ওপার বাংলা থেকে সর্বহারা মানুষ দলে দলে এপার বাংলায় আসছে আশ্রয়ের খোঁজে। ডা: বিধানচন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশে, উদ্বাস্তুদের থাকবার জন্য বাড়ি তৈরির বন্দোবস্ত করতে হবে। সেই কাজেই যোগ দিলেন তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার নারায়ণ সান্যাল। লেখক নারায়ণ সান্যালের প্রথম উপন্যাস ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’-এ সেই উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের জীবনের গল্প স্থান পেয়েছে। তাই উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লেখা আছে—

> “সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যারা—
> মানবিকতার পূর্ণমর্যাদা পেল না,
> সেই সব হতভাগ্য ভূতপূর্ব মানুষের উদ্দেশ্যে”[1]

উপন্যাসের নায়ক ঋতব্রত বোস, উপন্যাস-লেখকের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। লেখক এ উপন্যাসে উত্তম পুরুষে নিজের কথা বলেছেন, তিনিও উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তবে উপন্যাসে তাঁর নামের উল্লেখ নেই। লেখক এ কাহিনির

রসদ সংগ্রহ করেছেন বন্ধু ঋতব্রত-এর ডায়েরি থেকে। এছাড়াও ঋতব্রত ও তার স্ত্রী-র সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে শুনেছেন কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা, কখনো বা ঋতব্রতের স্ত্রী— মিসেস বসু কিছু কথা জানিয়েছেন, যা তাঁর স্বামীর ডায়েরিতে স্থান পায়নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে লেখক তাঁর বন্ধু ঋতব্রত-র কর্মজীবনের প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন— এমনটাই লেখক নারায়ণ সান্যালের প্রথম উপন্যাস 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প'-এর বিষয়।

উপনাসের কাহিনি অনুযায়ী ঋতব্রত বোস সরকারি এঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলো। কর্মস্থল বাংলা বিহার সীমান্তের কাছাকাছি একটি পি.এল. ক্যাম্প— নাম 'বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প'। পি.এল. বা পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি, অর্থাৎ সরকারের স্থায়ী পোষ্য। কারা এই পি.এল.? দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার স্বাধীন ভারতে এসে আশ্রয় পেয়েছিল এই উদ্বাস্তু শিবিরে। তারপর কেউ বা সরকারি সাহায্যে, কেউ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলে গেল, নতুন করে জীবন শুরু করলো। এরপরও যারা রয়ে গেল তারা পঙ্গু অথবা অশক্ত। এরাই হল সরকারের স্থায়ী পোষ্য পি.এল.। এদের বাসস্থান, ক্যাম্পের ব্যারাকগুলি মেরামতির কাজেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতের এই ক্যাম্পে আসা। ক্যাম্পের মানুষের জীবনচিত্র যেভাবে ঋতব্রতের চোখে ধরা পড়েছে, তা-ই এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্যাম্পের জীবনটা বৈচিত্র্যহীন। ক্যাম্পবাসী মানুষরা ডোলভুক, তাই ভিড় হয় ডোল অফিসের সামনে। ডোল অফিস থেকে প্রাপ্তবয়স্করা পনেরো দিনের জন্য মাথাপিছু চার টাকা নয় আনা করে পায়, ছোটরা পায় তিন টাকা দুই পয়সা। এখানে আট বছর বয়স হলেই এরা সাবালক পি.এল., তাই আট বছর বয়স হয়েছে কি না সেটা অনেক সময় বাক্-বিতণ্ডার বিষয় হয়ে ওঠে। ক্যাস-ডোল অফিসের সামনেই রয়েছে রেশনের গুদাম। কার্ডে লিখিয়ে রেশন নিয়ে যেতে হয়। পনেরো দিনের জন্য রসদ দুই সের চাল, দুই সের আটা আর চৌদ্দ ছটাক ডাল। বয়স আট বছরের কম হলে অর্ধেক রেশন। ক্যাম্পের জীবন মন্থর গতিতে চলে যায়।

> "দুপাশে দুঃস্থ নরনারীর সংসার-যাত্রা নির্বাহের সাধারণ দৃশ্য। দেওয়ালময় ঘুঁটে। টিনের চালে উঠিয়ে দিয়েছে লাউ-কুমড়োর ডগা। কাঁথা কাপড়, বড়ি শুকোচ্ছে রোদ্দুরে। তেল মাখিয়ে পিঁড়ি পেতে বারান্দায় শুইয়ে দিয়েছে সদ্যোজাত শিশুকে। দড়ির উপর একটা কাপড় টাঙিয়ে রৌদ্র থেকে মাথাটা বাঁচিয়ে রেখেছে। পিটপিট করে নবাগত অতিথিটি দেখছে আজব দুনিয়াকে। এদের দেখলে মনে হয় না। এগুলো এদের ঘর নয়, এরা এখানেই মানুষ হয়নি; ...এরা এখানে প্রবাসী। বরং মনে হয়, এরা যেন এখানে এমনিভাবে আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছে।"[২]

ক্যাম্পবাসীর মনে কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, পেটভরা ভাত নেই, পরনের কাপড় নেই, ঘরবাড়ি নেই, কিন্তু ঋতব্রতের মনে হয় সবচেয়ে বড় 'নেই' টা হচ্ছে এদের ভবিষ্যতের চিন্তা। এরা যেন এদের সমস্ত দায়ভার সরকারের ওপর সমর্পন করে বসে আছে। তার মনে হয় অতি দীন মানুষেরও থাকে ভবিষ্যতের চিন্তা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কিন্তু এদের তা নেই, যে বালক আট বছর বয়সে মায়ের হাত ধরে ক্যাম্পে এসেছিল, আজ সে পনেরো-ষোলো বছরের তরুণ, অথচ আজও সে নিশ্চিন্তে পি.এল. হয়েই আছে। যে শিশুর জন্ম হয়েছে এই ক্যাম্পে সে ও পি.এল.। ঋতব্রত একবার কয়েকজনকে ক্যাম্পের মেরামতির কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু কেউ কাজে আসেনি। কারণ হিসেবে সে জানতে পেরেছিল যে এরা যদি একবার কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয় তবে আর অশক্ত হিসেবে পি.এল. বলে গণ্য হবে না। ফলে নিশ্চিন্ত ডোলভুক জীবনের অবসান ঘটে যাবে। তাই কোনো কাজে ওরা যোগ দেয় না।

ক্যাম্পের এই নিস্তরঙ্গ জীবনেও মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য দেখা যায়— যেমন দেখা দিয়েছিল বিধবা কুসুমকে কেন্দ্র করে। ক্যাম্পের বাসিন্দা কুসুম বিধবা, সে ঋতব্রতর বাসায় রান্নার কাজ করত। কুসুম কলঙ্কিনী, তারাপদর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে— এই ধারণা থেকে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ক্যাম্পের অসংখ্য মানুষ তৎপর হয়ে উঠল। অপরাধীর শাস্তি বিধানে সকল দর্শকই তখন বিচারক। পুরুষ অপরাধীকে যথেচ্ছ শাস্তি দেওয়ার পর নারী অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে পথে বের করে দেওয়ার বিধান হল। ঋতব্রতর হস্তক্ষেপে তখনকার মত উৎসাহী শাস্তিদাতারা নিরস্ত হতে বাধ্য হল। পরিণামে ঋতব্রতকেও নানা কটূক্তি শুনতে হয়েছে।

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্যাম্পের এক একটি ব্যারাকে পাশাপাশি বাস করে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। এরকমই একটি ব্যারাকে থাকে ভদ্রঘরের যুবতী মেয়ে কমলা ও তার বিধবা মা। তাদের পাশেই থাকে বড়খোকা নামধারী এক যুবক, কমলার প্রতি তার কুনজর রয়েছে, কমলার মা তাই একটা পার্টিশনের জন্য আবেদন করে ঋতব্রতর কাছে। ক্রমশ ঋতব্রত এই পরিবারটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কমলা তার বাসাতেই রান্নার লোক হিসেবে আশ্রয় পায়। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। উপন্যাসের একেবারে শেষে দেখা যায় কমলা ও ঋতব্রত দুজনেই বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে। পরিশিষ্ট অংশে লেখক জানিয়েছেন যে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

'বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ঋতব্রত। বকুলতলা ক্যাম্পে তার কর্মজীবনের ঘটনাই এই উপন্যাসের বিষয়। ক্যাম্পের অধিবাসীদের মধ্যে নানা ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। কর্মসূত্রে যারা ক্যাম্পবাসী তাদের মধ্যে তফাদার সাহেব এই সর্বহারা মানুষগুলোকে ভালোবাসেন। তাদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন। ক্যাম্পজীবনে তিনিই ছিলেন ঋতব্রতর একমাত্র বন্ধু। অপরদিকে ছিল ডাক্তারবাবু, ভৈরবচন্দ্র, বড়খোকাদের দল— ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে তারা সর্বদাই ঋতব্রতর ক্ষতির চেষ্টা করে গেছে। কুসুম দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন নিজের মনে চেপে রেখে ক্যাম্পে এসে আশ্রয় পেয়েছে। কুসুম-বিশ্বনাথের উপকাহিনি থেকে ক্যাম্পবাসী এই 'ভূতপূর্ব মানুষ'-দের দেশভাগের পূর্ববর্তী জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছে রামশরণ ঠিকাদারের কথা। সে ক্যাম্পের ব্যারাক তৈরির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতর সঙ্গে প্রথম দিকে সে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। অসৎ ব্যবসায়ী রামশরণ ঠিকাদার, অনভিজ্ঞ ঋতব্রতকে ঠকিয়ে নিম্নমানের দ্রব্য সরবরাহ করে বেশি মুনাফা লাভই তার উদ্দেশ্য। ক্রমশ ঋতব্রতও সে বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠল। ঠিকাদারের সঙ্গেও তার বিবাদ বাঁধলো। উপন্যাসের শেষে এসে দেখি রামশরণের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। সঞ্জীব চৌধুরী এ উপন্যাসে ঋতব্রতর ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তার পিতৃস্থানীয়, তার বন্ধুর বাবা। ঋতব্রতর জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান তিনি করে দিয়েছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি বেশিরভাগই 'টাইপ' চরিত্র। বেশিরভাগ চরিত্রের কোনো বিবর্তন দেখ যায়নি।

উপনাসের গঠনশৈলী গতানুগতিক নয়, স্মৃতিকথায় ঘটনার ঘনঘটা যেমন পারম্পর্য মেনে চলে না তেমনি এ উপন্যাসেও ঘটনার বর্ণনা কালানুক্রম মেনে চলেনি, গঠনকাঠামো যেন কিছুটা অগোছালো। ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতের একটা কবিসত্ত্বা আছে। সে কবিতা লেখে। চিঠি লেখে আড়ালে থাকা কোনো এক 'রেখা মিত্তির'কে। এই রকম চিঠি থেকেই কুসুমের পূর্বজীবনের কথা জানা যায়।

উপন্যাসের ভাষা সরল, স্বাভাবিক, সাবলীল। প্রতিটি চরিত্রের মুখের ভাষা তার চরিত্রানুযায়ী, অবাঙালি রামশরণ ঠিকাদারের ভাষাও তার চরিত্রের অনুরূপ। চলিত গদ্যে লেখা এই উপন্যাসের ভাষা বেগবান। লেখকের প্রথম উপন্যাস হয়েও 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প' পাঠককে আনন্দ দিয়েছে, চিন্তার খোরাক দিয়েছে, গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'বল্মীক' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা এটি লেখক নারায়ণ সান্যালের দ্বিতীয় উপন্যাস। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রিয় 'মেজদি'কে। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প'-এ চাকরিসূত্রে ক্যাম্পে আসা ঋতব্রতর চোখে ক্যাম্প জীবনের ছবি ধরা পড়েছিল। এই উপন্যাসে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া একটি একক পরিবারের ছবি এঁকেছেন লেখক। 'বল্মীক' উপন্যাসের নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী। 'বল্মীক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ উইঢিবি। নানা কারণে উইপোকার বাসস্থান বারবার ভেঙে যায়। তারা আবার নতুন করে ঘর গড়ে, বাস করে। উদ্বাস্তু মানুষগুলিও যেন উইপোকারই মতন। দেশভাগের অভিশাপ মাথায় নিয়ে সাতপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে অন্য দেশে। তারপর এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে, কেউ কেউ পুনর্বাসন নিয়ে চলে গেছে অন্য কোথাও— এভাবেই বারবার তাদের ঘর ভেঙেছে, আবার নতুন ঘর গড়েছে। সেই মানুষদের কথাই বলেছন এ উপন্যাসে। তাই উপনাসটির নাম 'বল্মীক'।

'বল্মীক' উপন্যাসের কাহিনি মতিগঞ্জের বাসিন্দা হরিপদ চক্রবর্তীর পরিবারের গল্প। সেই সূত্রেই উঠে এসেছে নতুন গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনির আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথা। হরিপদ মাস্টারমশাই ছিলেন উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপন্ডিত। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার তাদের, সমৃদ্ধ গৃহস্থ তারা। উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া হরিপদ চক্রবর্তী স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের হাত ধরে

সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে চললেন এপারের উদ্দেশে। ওদের মত আরো সারিসারি মানুষ দলে দলে চলেছে। এপারের উদ্দেশে। তাদের সকলেরই কোলে শিশু, বগলে প্যাঁটরা, মাথায় মোট আর বুকে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। নিরবচ্ছিন্ন জনপ্রবাহ দেখতে দেখতে হরিপদবাবুর মনে হয়েছিল—

> "মানুষ চলেছে গায়ে গায়ে লেগে, প্রশস্ত রেলপথের উপর চাপ ভিড়। ঠেলা-ঠেলি, হুড়াহুড়ি—দীর্ঘ ক'মাইল বিস্তৃত যেন জীবন্ত মানুষের একটা চলন্ত অজগর! বিনা চশমায় একটা মানুষের থেকে আর একটা মানুষকে তফাত করে দেখতে পারছিলেন তিনি। যেন প্রতিটি মানুষের কোন পৃথক সত্তা নেই। ওরা যেন সন্ত্রাসিত পালায়নপর একটি অভীপ্সার উপাদান। অজগরটা চলেছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই। ওর লেজটা দেখা যায় না— কিন্তু কে বুঝি সঙ্গিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছে সেই লেজে। ভয়ত্রস্ত সরীসৃপটা ছুটে চলেছে দর্শনা থেকে বানপুর!"[৩]

দেশভাগের পর সাত বছর কেটে গেছে। হরিপদ মাস্টারমশাই ও আরো অনেকের ঠিকানা এখন উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনি। মাস্টারমশায়ের পরিবারে আছে স্ত্রী বিন্দুবাসিনী, বড়ছেলে অনিমেষ, বৌমা কামিনী, নাতি গোরা, বড়মেয়ে নমিতা, ছোটমেয়ে লতু ও ছোটছেলে বাবলু। ওপারের স্কুলের হেড পণ্ডিত এপারে এসে আর চাকরি পাননি। অনিমেষ বি.এ. পাশ, তাকে ওকালতি পড়ানোর ইচ্ছে ছিল বাবার। বর্তমানে সে রিক্সা চালায়, সে-ই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। নমিতাও মেধাবী ছাত্রী, ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে পাত্রস্থ করা যায়নি। কলোনিতে একটি কামরার মধ্যেই সপরিবারে বাস করেন হরিপদবাবু। পরিবারের মানুষগুলি দেশভাগের আগে মতিগঞ্জে যেমন ছিল এই সাতবছর পর তারা আর তেমন নেই, অবস্থার পরিবর্তন মানুষগুলোকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। বাবলু এগারো বছরের বালক, পরিবারের সবার আশা সে-ই লেখাপড়া করে চাকরি করে পরিবারের দুর্দশা ঘোঁচাবে। অনিমেষের স্ত্রী কামিনী তার বাবা-মায়ের খুব আদরের সন্তান, অভিমানী মেয়ে সে। অনিমেষ অসুস্থ হওয়ার পর সংসারটাকে সচল রাখবার জন্য বাবলুকে দিয়ে সে ট্রেনে চানাচুর বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছে। পরিবারের সকলের কাছে সে কথা সে গোপন করেছে কারণ পণ্ডিত পরিবারের ছেলে লেখাপড়া করে চাকরি করবে, এটাই সবার আশা। এই গোপনীয়তা থেকেই পরিবারের সদস্যরা কামিনীকে ভুল বোঝে। অভিমানী কামিনীও সে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেনি। ফলস্বরূপ পরিবারটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। হরিপদবাবু তার দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র বাস করেন। নমিতা চাকরি করে সে সংসারের হাল ধরে। অসুস্থ অনিমেষ আর কামিনীর সংসার অচল হয়ে ওঠে। কামিনীর একমাত্র লক্ষ্য অনিমেষকে সুস্থ করা। বাবলু ঘরছাড়া হয়ে স্টেশনেই থেকে যায়। কয়লা কুড়িয়ে রোজগার করতে থাকে সে। মাত্র এগারো বছর বয়সেই সংসারের দুর্দশা দূর করার জন্য এভাবেই টাকা রোজগার করতে থাকে সে। নমিতাদের সংসারে একটি ত্রিকোণ প্রেমের জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয় ভূষণকে কেন্দ্র করে। ভূষণ ও নমিতার পারস্পরিক ভালোলাগা ও ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে লতুর আকস্মিক প্রবেশ ঘটে। সেই সঙ্গে ভূষণের পিসিমা, নমিতার বাবা-মা সেই আবর্তকে আরো জটিল করে তোলে।

এই একক পরিবারটির পাশাপাশি কলোনির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ছবিও তুলে ধরেছেন লেখক নারায়ণ সান্যাল। বছর পাঁচেক আগে কলোনির ডোলভুক মানুষেরা কাজের দাবী জানিয়ে ঘেরাও করেছিল জেলা সমাহর্তার বাড়ি। সমবেত জনতার মধ্য থেকেই পাঁচজনকে তাদের মুখপাত্র হিসেবে পাঠানো হয়েছিল কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এই ঘটনার কিছুদিন পর কলোনিকে পাঁচটি ব্লকে ভাগ করা হল। পাঁচটি ব্লকের সেক্রেটারি হল সেই পাঁচজন যাদের ওরাই একদিন মনোনীত করে পাঠিয়েছিল আলোচনার জন্য, সেই গোকুল-বিষ্টু-নবীন। তারপর থেকে—

> "ব্লক সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত কর— তিনি রেকমেন্ড করলে পেতেও পার স্টারভেশন ডোল। ট্রাকে করে বড় বড় ড্রাম এসে পৌঁছাল— গুঁড়ো দুধ ভর্তি তাতে। পিচবোর্ডের গোলাকৃতি আধার। তার গায়ে লেখা আমেরিকার দেশবাসীরা এগুলি উপহার দিচ্ছে ভারতবাসীকে। সে উপহারও কিঞ্চিৎ লাভ করতে পার যদি ব্লক সেক্রেটারিরা অনুগ্রহ করেন। র‍্যাশানের চাল, ধুতি শাড়ি বিতরণ করা হয় এই সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। কিছু লোক কাজ পায়; কিছু পায় ডোল, ফ্রি র‍্যাশান। গোকুলদাস পায় কয়লার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডিপো খোলার অনুমতি— বিষ্টুর জয়হিন্দ কেবিন মাথা তোলে— নবীন পতিতুণ্ডি মহাজনী ব্যবসা শুরু করেন। এঁরা মূলধন কোথায় পেলেন সে প্রশ্নটা করবার সাহস হল না কারও।”[৪]

বছর পাঁচেক পর আবার কলোনির যুবক যুবতীরা একত্রিত হয়েছে, বেকারত্বের জ্বালায় তারা জর্জরিত। এবার তাদের নেতা নিতাই কবিরাজ। নিতাই কবিরাজ বয়স্ক মানুষ, সবাই তাকে ‘ঠাকুর্দা’ বলে ডাকে, পেশায় তিনি কবিরাজ। তাঁর ছত্রছায়ায় কলোনির ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ে উঠল ‘গণকল্যাণ সমিতি’। নমিতাও এই গণকল্যাণ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পুরনো ব্লক সভাপতিদের সরিয়ে নতুন গণকল্যাণ সমিতি কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। উদয়নগর কলোনির বাসিন্দাদের জন্য প্রকৃত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই সময় নতুন করে আরো উদ্বাস্তু মানুষের দল এসে পৌঁছায় উদয়নগর কলোনিতে। দুর্ভিক্ষপীড়িত এই মানুষগুলো খবর পেয়েছে উদয়নগর কলোনিতে গেলে কাজ পাওয়া যাবে, খাবার পাওয়া যাবে। শ’য়ে শ’য়ে মানুষ এসে ভিড় করে কলোনিতে। ফলে কলোনির উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়, পূর্ববর্তী পরিকল্পনা মত আর এগোনো যায় না। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গণকল্যাণ সমিতির মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়। ভূষণ, যোগেন— এদের মত তরুণেরা এই নতুন মানুষদের স্থান, দিতে চায় না, তারা এদের আসা বন্ধ করতে চায়। অপরদিকে নিতাই ঠাকুর্দা মনে করেন এই নিরন্ন মানুষগুলো তাদের অতিথি। এদের তিনি এখানেই আশ্রয় দিতে চান। নমিতাও ঠাকুর্দাকেই সমর্থন করে।

নিঃসম্বল কামিনী অনেক চেষ্টায়, অনেক প্রলোভন অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত তার অসুস্থ স্বামী অনিমেষকে সুস্থ করে তোলে। নিতাই ঠাকুর্দার সাহায্যে সে অনিমেষকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অনিমেষ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বাবলু-হরিপদবাবু-কামিনী সকলের পুনর্মিলন হয়। কিন্তু উপন্যাসটির শেষ অংশটি মিলনান্তক নয়, বিয়োগান্তক। নতুন আসা উদ্বাস্তু মানুষদের দলটাকে হঠিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশ-গণকল্যাণ দলের সদস্যদের মধ্যে লড়াই বাঁধলো। নমিতাও সেখানে উপস্থিত ছিল। গণ্ডগোলের মধ্যে এক বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে নমিতার ওপর নেমে এলো চরম আঘাত। সে পড়ে গেল মাটিতে, আর উঠলো না। এভাবেই বোধহয় ত্রিকোণ প্রেমের জটিল আবর্ত থেকে সে সরে গেল। তার প্রিয় লতুকে ভূষণের হাতেই দিয়ে গেল সে।

‘বল্মীক’ উপন্যাসটির মধ্যে একটি একক পরিবারের ছবি রয়েছে। সে ছবির প্রেক্ষিতেই উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদি’ (১৯৫৩) নাটকের কথা মনে আসে। সেখানেও একটি একক পরিবারের মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষের কথা বলা হয়েছে।

‘অরণ্যদণ্ডক’ উপন্যাসটি লেখক নারায়ণ সান্যাল রচনা করেছেন ১৯৬০-৬১ কালপর্বে। প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ সালে। প্রথম প্রকাশকালে এ উপন্যাসের নাম ছিল ‘নৈমিষারণ্য’। লেখকের নাম ছিল ‘বিকর্ণ’। ‘মহাভারত’-এর প্রতিবাদী চরিত্র ‘বিকর্ণ’, সেই ‘বিকর্ণ’ নামের আড়ালেই প্রথম দিককার কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন সরকারি চাকরিজীবী লেখক নারায়ণ সান্যাল। উপন্যাসটির কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘নৈমিষারণ্যের ডাক’ নামে।

পি. এল. ক্যাম্পের পরনির্ভরশীল জীবন এবং আর্বান-রুরাল-জবরদখল কলোনিতে উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রামের কথা লেখকের পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাস ‘বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প’ ও ‘বল্মীক’ উপন্যাস থেকে জানা যায়। ‘অরণ্যদণ্ডক’ উপন্যাসটিতে লেখক বাস্তুচ্যুত সেই মানুষগুলির অরণ্যবাসের ছবি তুলে ধরেছেন। তাই পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটির কয়েকটি চরিত্র এ-উপন্যাসেও স্থান পেয়েছে। তবে কাহিনি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তাই ঐ উপন্যাস দুটি পড়া না থাকলেও এই উপন্যাসটির রসাস্বাদনে কোনো অসুবিধে নেই।

উপন্যাসটি আটটি কাণ্ডে বিভক্ত— অরণ্যকাণ্ড, আদিকাণ্ড, অযোদ্ধাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড, কিস্কিন্ধাকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড। নামগুলি ‘রামায়ণ’-এর অনুরূপ হলেও ‘রামায়ণ’-এর ক্রমটি অনুসৃত হয়নি। উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হওয়া মানুষগুলো পুনর্বাসন পেয়ে দণ্ডকারণ্যে পৌঁছেছে। তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের কাজে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েছেন বহু সরকারি অফিসার। তাঁদেরই মধ্যে আছেন— ঋতব্রত, বীরেন মৈত্র, রেখা মিত্তির প্রমুখরা। এই চরিত্রগুলির মধ্যেই কয়েকটি আমাদের পূর্বপরিচিত। ঋতব্রতই ধীরে ধীরে এই উদ্বাস্তু ‘ভূতপূর্ব মানুষ’-এর ইতিহাস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয় কাণ্ড থেকেই উপন্যাসের কাহিনির সূত্রপাত। গ্রামের নাম কমলপুর। সময়টা তেরশো বাহান্ন সাল। জমিদার কমলাপতি বাবুর সঙ্গে গ্রামবাসীর মিশ্র সম্পর্ক, প্রজাদের অনেক ইচ্ছে-অনিচ্ছে, সুখ-দুঃখকে যেমন তিনি নিজের ইচ্ছের তলায় চাপা দেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তিনি গ্রামবাসীর মাথার ওপর ছাতা হয়ে দাঁড়ান। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দিবাকর পণ্ডিত বা দেবু পণ্ডিত এই গ্রামেরই বাসিন্দা। আঠারো বছর বয়সে তারুণ্যের তেজে সে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছিল। বিচারের সময় কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধ অস্বীকার করেছিল। সজ্ঞানে সেই তার প্রথম মিথ্যাভাষণ। তারপর কারাদণ্ড। জেলে থাকার সময়ই তার আলাপ হয়েছিল জেলারের ছেলে বীরেণের সঙ্গে। বীরেণের কথার সূত্রেই পাঠকের সঙ্গে দেবু পণ্ডিতের প্রথম আলাপ। পরিবার-পরিজনহীন দেবু পণ্ডিত, কারোর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই, আবার কেউ তার শত্রু নয়। কমলপুর গ্রামের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর সামাজিক জীবন উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। গ্রামের অন্ত্যজ পল্লী বায়েন পাড়া, প্রহ্লাদ বায়েনের পরিবারের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। গ্রামের তাঁতী, কুমোর, কামার, চাষী সকলেরই জীবন-যাপনের ছবি রয়েছে এ উপন্যাসে। গ্রামের আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের পূজারি শিরোমণি মশায়ের চিন্তাভাবনা পরিবর্তনের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের নায়ক দেবু পণ্ডিত গ্রাম্য টোলের পণ্ডিত। জমিদার কমলাপতিবাবুর দাদার মেয়ে উমা দেবু পণ্ডিতের ছাত্রী। যৌবনের প্রথম পর্বে উমা তার মাস্টারমশাইকে প্রেম নিবেদন করে। দেবুরও উমার প্রতি মুগ্ধতা থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে দেবু তাকে প্রত্যাখ্যান করে। উমার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয়নি। অল্পদিন পরেই উমা গ্রামে ফিরে আসে, আনন্দময়ী মায়ের মন্দিরের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে। একথা দেবুর জানা ছিল না। উমার সঙ্গে সে অকারণ বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। তারপর দেশভাগ। শ্বশুরবাড়িতে উমার ঠাঁই হল না। সে আর তার মা এপারে এসে কলকাতায় আশ্রয় নেয়। সেখানেই একদিন দেখা হয় দেবুর সঙ্গে। উমা আর দেবু বিয়ে না করে বিবাহিত দম্পতির পরিচয়ে চলে যায় পি. এল. ক্যাম্পে। ততদিনে উমা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। তাই তার প্রিয় মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি সে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় ক্রিশ্চান মিশনারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসা করছেন। তিনি তাকে সুস্থ করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

কমলপুর গ্রামের অসংখ্য মানুষ এ উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে। সতীশ ও রাধার উপকাহিনীটিও উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে। কমলপুর গ্রামের দ্বিজপদ কুমোরের ছেলে সতীশ আর ঐ গ্রামেরই নবীন তাঁতির মেয়ে রাধা। গ্রামে দেবু পণ্ডিতের টোলে পড়ার সময় থেকে তাদের বন্ধুত্ব যৌবনে প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু রাধার বাবার জাত্যাভিমানের কারণে তাদের প্রেম পরিণতি পাচ্ছিল না। উপন্যাসের শেষে এসে দেখি দণ্ডকারণ্যের নতুন সমাজে তাদের বিয়ে হয়েছে। গ্রামে থাকলে মন্দিরের পুরোহিত শিরোমণি মশাই এ ঘটনাকে অনাচার বলতেন। দণ্ডকারণ্যে এসে তিনিও নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেছেন। বস্তুত উপন্যাসে তাঁর চরিত্রেরই সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে। দেশভাগের পর এপারে আসবার সময় তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েন। অসহায় শিরোমণি মশাইকে তারাপ্রসন্ন মশাই আশ্রয় দেন। তারপর দণ্ডকারণ্যে এসে যখন নতুন কলোনি গড়ে উঠল তখন মায়ের মন্দিরও তৈরি হল। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সে মন্দিরে পূজার দায়িত্ব আর শিরোমণি মশাই পেলেন না। অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তারপর তাঁকে দেখা যায় ক্রিশ্চান মিশনারি হাসপাতালে। সকল ধর্মের সারবস্তু এক—এই উপলব্ধি থেকে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে ক্রিশ্চান হয়ে গেছেন।

উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রত্নাকর ঘোষ। জাতে সে গোয়ালা। জাত ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সে কৃষক। এছাড়াও তার আরেকটি পরিচয় দুর্দান্ত লাঠিয়াল সে। কমলপুর গ্রামে তার একটি বিশেষ স্থান ছিল। উদ্বাস্তু হয়ে দণ্ডকারণ্যে আসার পরেও সকলে তাকে মান্যতা দিত। তার নাতি মনুয়া বালক বয়সে গ্রাম ছেড়ে এপারে এসেছিল। দণ্ডকারণ্যেই সে তরুণ কৃষক হয়ে উঠল।

জমিদার কমলাপতির চরিত্রে তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' গল্পের জমিদারের ছাপ আছে। দুজনেই সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি। কমলাপতিবাবু জমিদারি লাভ ও রক্ষা করার জন্য নানাবিধ পাপকার্যও করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের কিছু জমিদারসুলভ চিহ্নও ছিল তাঁর চরিত্রে। কিন্তু নিজের ছেলে কুপথে গেলে পুত্রস্নেহ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি। শেষপর্যন্ত ছেলের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ দান করে যান গ্রামে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 297 - 305
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাঁর সেই মহতী দান পূর্ণতা পাওয়ার আগেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা করুণ গল্প বলে বায়েন পাড়ার প্রহ্লাদ বায়েন আর তার মেয়ে পদ্ম। বায়েন পাড়া গ্রামের অন্তজ পল্লী। তারা সবাই দরিদ্র। মৃত পশুর চামড়া, মাংস, শিং ইত্যাদি নিয়ে তাদের কারবার। এছাড়া তারা বাজনদার। বছরে একবার, জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজায় বাজনা বাজিয়ে তারা দুটো পয়সা রোজগার করে। প্রহ্লাদ, বায়েন পাড়ার সর্দার, দশাসই চেহারা, গায়ে তার আসুরিক বল। অথচ সেই প্রহ্লাদই তার কিশোরী মেয়ের কাছে শিশুর মত কোমল। মেয়ে পদ্মকে সে বড় ভালোবাসে। পদ্মও বাবা অন্ত প্রাণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নরপিশাচেরা প্রহ্লাদকে বেঁধে রেখে তার সামনেই পদ্মকে ধর্ষণ করে খুন করে। এই দুর্ঘটনার পর প্রহ্লাদ পাগল হয়ে যায়। কিছুদিন পর রেললাইনে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

তারাপ্রসন্ন মশাইও কমলপুর গ্রামের লোক। পুনর্বাসন পেয়ে তিনি ওদেরই প্রতিবেশী। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তিনি। গ্রামেও তিনি সকলের অভিভাবকের মত ছিলেন, এখানেও তাই। জনাবালি শেখ ছিল জমিদারের লাঠিয়াল। লাঠিখেলায় তার অসামান্য ব্যুৎপত্তি। অথচ লাঠি ধরায় তার আশ্চর্য অনীহা ছিল। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানেই সে বেশি আগ্রহী ছিল। বন্ধু রত্নাকর ঘোষকে একবার বলেছিল এসবকিছু ছেড়ে সে অনেক দূরে চলে যাবে, চাষ করবে ভাত খাবে। দাঙ্গার সময় জমিদার পরিবারের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে সে নিজে আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। তার পরিবারও ভেসে গেছে। পুনর্বাসনের পর নতুন পাওয়া চাষের জমির সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ রত্নাকরের মনে পড়ে বন্ধু জনাবালির কথা। দিগন্তবিস্তৃত ঊষর কৃষিক্ষেত্রে বর্ষণের পর প্রথম কর্ষণ করেছে নতুন প্রজন্মের নতুন কৃষকেরা— রত্নাকরের নাতি মনুয়া, রসময়ের ব্যাটা ট্যানা, যাদের অনেকের জন্মই হয়েছে ক্যাম্পে এসে। অভিজ্ঞ কৃষকেরা তাদের কৃষিকাজের পাঠ দিয়েছে। কিন্তু বীজধানটা এখনো এসে পৌঁছায়নি। রত্নাকর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়, আশ্বস্ত করে নিজেকে— সুদিনের আশ্বাস।

লেখক নারায়ণ সান্যাল ঋতব্রত চরিত্রটি তাঁর নিজের আদলেই গড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পূর্তবিভাগ থেকে ডেপুটেশন নিয়ে তিনি দণ্ডকারণ্যে চাকরি করতে গিয়েছিলেন ১৯৬০ সালে। দুই বছর পর সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতার চাকরিতে যোগদান করেন। তার প্রায় কুড়ি বছর পর তিনি আরেকবার কর্মসূত্রেই দণ্ডকারণ্যে যান। সেখানে গিয়ে যা দেখেছেন তা লিখেছেন এই উপন্যাসের 'নববই-দশকের কৈফিয়ৎ' অংশে—

> "বিশ বছর পরে গিয়ে দেখেছিলাম ভাস্কল ড্যাম সুসম্পন্ন হয়েছে। খালের জলে মধ্যপ্রদেশের অনুর্বর জমি সোনা ফলাচ্ছে। কিন্তু সে ফসল কেটে কেটে ঘরে তুলছে মধ্যপ্রদেশের কৃষক— কোনও বাঙালী উদ্বাস্তু পরিবার নয় (আমরা কিন্তু ভাস্কল ড্যাম ও সেচের খাল খনন করেছিলাম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে)।
>
> প্রসঙ্গত, যে গ্রামটির চিত্র ষাটের দশকে এঁকেছিলাম— যার বর্ণনা পাবেন এ গ্রন্থশেষে— সেই বাস্তব গ্রামটিতেও আমি গিয়েছিলাম আশীর দশকে। যে বাস্তব মানুষের ছায়া দিয়ে গড়েছিলাম কিছু কাল্পনিক চরিত্র— তাদের চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি। তারাপ্রসন্ন বা রত্নাকর ঘোষকে জীবিত দেখব না, এ আশঙ্কা ছিলই; কিন্তু বাদবাকি জোয়ান মানুষগুলো? ঐ যগন্দ, রাখহরি, ছিদেম, নবীন যুগীর জামাই-বেটা রসময় আর আনন্দ? বিশে, পাঁচু, ছিনাথ, সুধাময়, অর্জুন, মাধো? দেবু পণ্ডিত আর উমা? — নেই, নেই, কেউ নেই সে-গ্রামে। গ্রামটা আছে— বাস করে মধ্যপ্রদেশের মানুষ। কেউ আমাকে জানাতে পারল না এ গাঁয়ের সেই ছিন্নমূল মানুষগুলো শেষপর্যন্ত কোথায় গেল— সুন্দরবন, মরিচঝাঁপি ... নাকি দুনিয়ার বাইরে!"[৫]

Reference:

১. সান্যাল, নারায়ণ, 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ, ২০১৬, পৃ. উৎসর্গ পত্র।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৩. সান্যাল, নারায়ণ, 'বল্মীক', (প্রথম প্রকাশ- বেঙ্গল পালবিশার্স, কলকাতা), বর্তমানে– দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ১৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৫. সান্যাল, নারায়ণ, 'অরণ্যদণ্ডক', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭, পৃ. 'নববই দশকের কৈফিয়ৎ'।

Bibliography:

চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাস বহুরূপে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১০

চট্টোপাধ্যায়, হীরেণ, বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২

দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, এস. পি. পাব,কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯১৮

ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের আলো-আঁধার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪

ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাব, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪

সান্যাল, নারায়ণ, 'অরণ্যদণ্ডক', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭

সান্যাল, নারায়ণ, 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ, ২০১৬

সান্যাল, নারায়ণ, 'বল্মীক', (প্রথম প্রকাশ- বেঙ্গল পালবিশার্স, কলকাতা), বর্তমানে– দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, আগস্ট ২০১৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 306 - 312
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আঞ্চলিক গতিপথের ভিন্নতা : কবি ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

মৌসুমী মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mousumimondal128@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
ঝুঁজকি, ব্রেক্ষদত্যি, কালারুদ্দ, কত্তাবাবা, মাতব্বর, অহর্নিশি দ্বন্দ্ব, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, ভূমিসাৎ, কোঁড়া।

Abstract
Tarashankar Bandyopadhyay is known as a fiction writer, novelist, essayist and story writer. In his novel 'Kabi' (1944), which is an exception in Bengali literature, we see the diverse vibrations and mental intentions of the lower-class society of our country, the history of countless fragments of dreams and dream-breaks and the application of folk media in folk life. The novel's protagonist, Nitai, a son of the Dom community, abandons his family's caste business and takes up the profession of a poet, realizing the ultimate truth. Mahadev Kabiyal sarcastically says, 'আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা-স্বপ্নে যাবার আশা গো!'. Nitai's social experience and position can be understood in the historical background, who is the first hero in a Bengali novel. Where he lives on the narrow fringes of society. Although we know that the first regional novel is Shailjanand Mukhopadhyay's 'Koyla Kuthir Desh'. Nevertheless, in the novel under discussion, the author has shown that the background of the harsh Bengali, the level of mastering the Vaishnava culture and the level of searching for a hero of the lower class - everything is one. Where people have tried to find themselves through the vibrant flow of time and changing times. It can be said that the poet's pursuit of Nitai and the story of 'Hansuli Banker Upokatha' have taken the form of a story. The novel 'Hansuli Banker Upokatha' (1946) is set in Birbhum. In the middle of the 'Kopai' river in Bolpur, where the river takes a bend like the Hansuli, there is the village of Banshwadi. About thirty houses of the Kahards, who are palanquin bearers by profession, live on about two and a half bighas of land. The novel describes the life of the Kahars and their struggles; where Tarashankar has adorned them with the special marks of being in close contact with nature and the special marks of being in close contact with nature. In the novel we see the stories of those social people who are deprived of the symbols of civilization and the attractions of the world. Tarashankar's genius seems to shine with the power of omniscience, which can see the waves of this human resource neglected by the world. Besides, characters like Nasubala, Nimtele Panu etc. are brought to life through their names and the quality of the regional language. Where the language of West

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Birbhum is West Radhi and the language of East Birbhum belongs to East Radhi. In the novel, Banwari wants to follow past customs or traditions that have existed for a long time and wants others to follow them, and Karali questions these issues. Karali is modern, he believes in rationalism, scientific mind and individualism. Banwari feudalism prevails in the environment and Karali in capitalism. Tarashankar has highlighted such things of a harsh society in his novel that have no echo. It is through such helpless decline and extinction of culture that our country's modernity has emerged.

Discussion

বাংলা ভাষার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গল্প লেখক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক জীবন ভাবনার পাশাপাশি সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির একদেশদর্শিতার কথনবিশ্ব জুড়ে অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের প্রগাঢ় ছায়া দেখতে পাই তাঁর লেখায়। অবশ্য সাহিত্যচর্চার আগে কিছুদিনের জন্য তিনি রাজনীতি করেছিলেন। তবে ১৯১৭ সালে অন্তরীণ হওয়া এবং ১৯৩৩ এ জেলে যাওয়ার সময়কালীন বেশ কিছু ঘটনায় তিনি আঘাত পান এবং বিতৃষ্ণায় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেন –

> "এই আন্দোলনের পথ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। এ পথে নয় ...আমি সাহিত্যের পথে যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।"[১]

এপ্রসঙ্গে ড. নিতাই বসুর মন্তব্য –

> "জেলখানায় রাজনীতিসর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হলেন তিনি। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে যখন তিনি কারামুক্ত হলেন তখন তাঁর বিদায়-সংবর্ধনা সভায় তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন তাঁর সুদৃঢ় সংকল্প সাহিত্য সেবার পথেই দেশের সেবা।"[২]

ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২৮ সালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' নামক উপন্যাসটি প্রকাশের মাধ্যমে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিবেশে জন্মেছিলেন এবং যেভাবে তাঁর জীবনপথ অতিবাহিত করেছিলেন, তাতে তাঁর প্রায় প্রতিটি সংঘটন তাঁর সৃজনশীল চিত্তকে উত্তেজিত করেছিল; যা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে। রাঢ়বঙ্গের প্রাকৃত বৃত্তকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন; কেননা তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান ছিল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা দেখতে পাই অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আমাদের উপন্যাসের যে শ্রেণীবিভাগ আছে সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, রূপকধর্মী ও আঞ্চলিক প্রভৃতি ভাগ আমরা দেখতে পাই। আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি যেখানে একটা বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতিকে বোঝানো হবে। কিন্তু আমি মনে করি যে কোন উপন্যাসই তো সামাজিক, কেননা উপন্যাস মাত্রই সেখানে সমাজের একটা ছবি থাকবে। যেমন আমরা দেখি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস হল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লা কুঠির দেশ'। যেখানে কয়লা খনি অঞ্চল ও শ্রমিকদের সেই সমসাময়িক আঞ্চলিকতার ছবিই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক তাঁর কলমের মাধ্যমে। আবার মহাশ্বেতা দেবী'র 'অরণ্যের অধিকার'-এ দেখতে পাই বিরসা মুণ্ডার সেই সময়ের আঞ্চলিকতা কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'কে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলি; সেখানেও কিন্তু দেখতে পাই মোঘল ও রাজপুতানার অঞ্চলের সেই সময়ের সামাজিক একটা ছবি। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা উপন্যাসেই সমাজটা কিন্তু প্রতিফলিত হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ব্যতিক্রম উপন্যাস 'কবি'তে (১৯৪৪) দেখতে পাই বীরভূমের ওই অঞ্চলের ডোম সম্প্রদায়কে; যা একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেখানে ডোম সমাজের কথায় বলা হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অঞ্চলভিত্তিক যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন তাঁর মধ্যে আছে 'কবি', কালিন্দী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য; অবশ্য আরও আছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে ভৌগলিক পরিবেশ সুনির্দিষ্ট যেখানে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুটি প্রতি তুলনায় এনে স্পষ্ট করে এঁকেছেন। রাঢ়ের আঞ্চলিক সংস্কৃতির গভীর গোপন ব্যাপ্ত ও বিচিত্র উপাদান আমরা দেখতে পাই তাঁর উপন্যাসে। লেখক সম্পর্কের গুরুত্বের তুলনায়, রাঢ়ের নিম্ন বর্গের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনের অভিজ্ঞতার চালচিত্র এবং বিচিত্র লোক-মাধ্যমের মিশ্রণকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। যেখানে রাঢ় বাংলার বিশেষ এক জনপদে নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনজীবন ভিত্তিক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রতিটা নিদর্শন রয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস যদি বলি তাহলে বলব 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'; যেখানে উপন্যাসটি মহাকাব্যিক বিশালতা লাভ করেছে। অবশ্য জনপ্রিয়তার নিরিখে 'কবি'ও আঞ্চলিক উপন্যাসই; এবং ভীষণই ভালো লাগার একটি উপন্যাস হল 'কবি'। কেননা উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে অঞ্চল ভিত্তিকতা ছাড়িয়েও মানবতাবাদ ও সমাজধর্মী এক উপন্যাস হয়ে উঠছে। যা একটা বিশেষ অঞ্চলের সমাজকে তুলে ধরছে এবং সেখানে সেই অঞ্চলের সেই সমাজের কথাই বলা হচ্ছে। এই অর্থে 'কবি' এক অসামান্য রচনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের; এবং 'কবি' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই দুটো আলাদা ধারা কবির মধ্যে নিহিত আছে। একটা হচ্ছে ডোম সম্প্রদায় ভুক্ত এবং আরেকটা হচ্ছে ঝুমুর দল। ঝুমুর দল এক ধরনের নাচ ও গানের একটা দল। যেরকম বাউল এক ধরনের সেরকমই। বহু পূর্বে গ্রামাঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল ঝুমুর। অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে এক ধরনের গান করত, সেখানে আদি রসাত্মক গানের ছোঁয়াচ ছিল সুতরাং তা জনপ্রিয় ছিল। কারণ তখন থিয়েটারের প্রচলন ছিল না। অঞ্চলভিত্তিক এই ছবি দুটোই 'কবি' উপন্যাসে দেখতে পাই। ডোম সম্প্রদায় ও ঝুমুর দল; যার সঙ্গে যোগ রয়েছে উপন্যাসের নায়ক নিতাই চরণের।

নিতাই ডোম সম্প্রদায়ের ছেলে এবং যার পারিবারিক জাতব্যবসা হল চুরি করা। কিন্তু নিতাই কখনোই চুরি করে না; সে কবিয়ালের বৃত্তি গ্রহণ করে এবং উপলব্ধি করে পরম এক সত্যকে। এরপরে তাকে দেখতে পাই ঝুমুর দলের গান বাঁধার কবিয়াল হিসেবে। এই দুটোর প্রভাবে কীভাবে প্রভাবিত হবে নিতাই, সেটাই উপন্যাসে দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাই বিশ্বাস করে তার গান বাঁধার ক্ষমতা আছে এবং তা গাইবার গলাও যথেষ্ট ভাবে আছে। কেননা নিজস্ব প্রতিভা সম্পর্কে নিতাইয়ের মন খুব সচেতন। যদিও মহাদেব কবিয়াল ব্যঙ্গ করে বলেন –

> "আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা-স্বগ্গে যাবার আশা গো!"[৩]

কথাটা সত্যি হলেও মহাদেবের বলার ধরনটা ঠিক রুচি সংগত বলে মনে হয় না। কেননা নিতাই তো শুধুমাত্র আস্তাকুঁড় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল একজন কবি হিসেবে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়াই কিন্তু তার একমাত্র কাম্য ছিল না; আসলে সে জাতিগত ভাবে নিম্ন জীবন থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখতে পাই যে আস্তাকুঁড়ে নিতাই জন্মেছিল, সেখান থেকে ভাগ্য তাকে আরেক আস্তাকুঁড়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের বুকে অস্পৃশ্যতার করুণ ও নির্মম যে ছবি এঁকেছেন; তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই নিতাইকে সমাজের অস্পৃশ্যতার অভিশাপ অনুভব করার মাধ্যমে, তার প্রিয়জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে। যেখানে বসনের শব দাহ করে নিতাই –

> "কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল।"[৪]

ফলে নিতাইকে ব্যাকুল হতে দেখি উদ্ধারের জন্য - 'আমার কর্মফল, দয়া করে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল'। এরপরে নিতাইকে দেখতে পাই সে দল ছেড়ে কাশী চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে সে উপলব্ধি করে জীবনের জন্য খেদ করতে না পারলে তার যেন চলছে না। আসলে নিতাই আঁধার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল, জীবন থেকে নয়! সেই জন্য তার দেশে ফেরার যে আবেগময় ও উল্লসিত বর্ণনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন; তা নিতাইয়ের চরিত্রের সঙ্গে সংগত এবং সেখানে কালের কোন প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। কারণ সমগ্র বাংলা হল নিতাইয়ের দেশ। আর সেই জন্য নিতাই আবার ফিরে আসে অট্টহাস গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, এখানের ধুলোমাটির স্পর্শের জন্য। নিতাই দেখতে পাচ্ছে কবিগান ও ঝুমুরের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরম্পরার সংস্কৃতি ও বিকৃতির দুটো দিকই কীভাবে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তার জীবনে। নিতাইয়ের যে আকুলতা বাংলার জন্য, সেরকমই আকুলতার পরিশীলিত প্রকাশ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতি লেখকের রচনায়। ঝুমুর দলের বর্ণনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন –

> “বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে। ...যন্ত্রীদের মধ্যে নিতাইয়ের ধরনের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মতো কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়।”[৫]

এই ঝুমুর দল সম্পর্কেই আবার ড. সত্যব্রত দে বলেছেন –

> “প্রথমদিকে এই ঝুমুরের দল পালাগানই করত। ...এক সময় এই পালা গাওয়ার ধারাটি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল-কিন্তু ‘ঝুমুরের দল’ নামটি রয়ে গেল। তখনই দলের মধ্যে পাঁচমিশেলি নাচ গান ইত্যাদি অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর যে সমস্ত বিভিন্ন কবিসঙ্গীত নাগরিক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য গঠিত হয়েছিল, তাদের দলছুট লোকদের নিয়ে এই বিবর্তিত ঝুমুরের দল গঠিত হত।”[৬]

ঝুমুর দলের এই সব মেয়েরা সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে উঠে আসে। তাছাড়া ঝুমুরদলের পুরুষ চরিত্র বাদেও মাসি, ললিতা ও নির্মলা প্রভৃতি নারী চরিত্র গুলোকে বলতে পারি সজীব এবং যথাযথভাবে পটভূমির পরিপূরক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ এমনই এক উপন্যাস, যেখানে বস্তুনিষ্ঠার সাথে সংযম ও সুরুচির কোন বিরোধ দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য আমরা জানি, রাঢ় বাংলার যে সমস্ত মানুষ শিল্পী জাতীয়, তারা কখনোই আর্থ-সামাজিক জটিলতার কোনরকমের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে থাকেও না। রাঢ় বাংলার লোকজীবনের উদাসীন মনোভাব ও আত্মসচেতনতায় মিশ্রিত উপন্যাসের নায়ক হল নিতাই; যা একজন মহৎ শিল্পীর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। নিতাইয়ের সামাজিক অভিজ্ঞান ও অবস্থান ইতিহাসের পটভূমিতে দেখলে বোঝা যায় এমন নায়ক বাংলা উপন্যাসে প্রথম। যেখানে সমাজের এক সংকীর্ণ প্রান্তে তার জীবনযাপন। ‘কবি’ উপন্যাসটি বিশেষ অঞ্চলের এক স্বভাবকবির কবিজীবনের কাহিনী হলেও; সেখানে দেখতে পাই প্রেমের আবেদন সব জায়গায় পরিলক্ষিত। তবে নিতাইয়ের প্রেমে বিশিষ্টতা আছে, যা যৌনতা মুক্ত ও মানবীয়। বলা বাহুল্য এই প্রেমই তার কবিজীবনের প্রেরণা ও উৎসাহদাত্রী। সেখানে কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা না থাকায় তার জীবন সরল স্বভাবী মানুষের সাথে সাথে হয়ে উঠেছে স্বভাবকবিরও জীবন। কদর্য এই জগতকে নিতাই আত্মবলে, চরিত্রবলে ও কবিত্ববলে জয় করেছে। এছাড়াও বসনের মাধ্যমে নিতাই ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতের ঐতিহ্যের পরিচয়ও লাভ করেছে। লেখকের বর্ণনায় –

“বসন্ত তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড়ো ভালো লাগে। ...টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয়। এই না হইলে গান!

‘তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে?’

কিংবা -

‘ভালবাসিবে ব’লে ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে’।”[৭]

উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন রাঢ় বাংলার পটভূমির মাত্রা, বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে অধিগত করার মাত্রা এবং নিম্নবর্গের নায়ক সন্ধানের মাত্রা কীভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে। যেখানে মানুষ খুঁজে পেতে চেয়েছে নিজেকে স্পন্দমান কালপ্রবাহ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ও বিবর্তমান পটের মাধ্যমে। যেভাবে বলা যায় ‘কবি’ উপন্যাসের নায়ক নিতাই এবং ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের করালী’র সাধনা একটি অবয়ব পেয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম এক স্মরণীয় এবং বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (১৯৪৬)। এটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা সৃষ্টি আঞ্চলিক জীবনের রূপকার হিসেবে। যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার’ লাভ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের অনুষ্ঠানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসকে স্বাগত জানিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন –

> “আধুনিকতম সৃষ্টি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘হাঁসুলী বাঁক’।”[৮]

যেখানে নিম্নশ্রেনীর সংবাদ আমাদের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয় তাই হল হাঁসুলী বাঁকের ইতিহাস। কেননা একটা বিচিত্র সংস্কৃতির এরকম অসহায় পতন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছে আমাদের দেশের আধুনিকতা। অবশ্য এর আগে ইংরেজ সভ্যতার শুরুতে আমাদের ঔপনিবেশিক যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক কেন্দ্র, রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র বা আমাদের জীবনের সার্বিক কেন্দ্র সবই প্রতিস্থাপিত হয়েছে গ্রাম থেকে শহরের দিকে। যাকে আবার বলতে পারি সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের দিকে পরিবর্তন। আলোচ্য ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাস সম্পর্কে ড. অমরেশ দাশে’র মন্তব্য –

> “উপকথা শব্দে তারাশঙ্কর সম্ভবত উপন্যাসটির উপকরণ ও রূপকরণ-দুইয়েরই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। উপকরণ থেকেই উপন্যাসটির রূপকরণ করেছেন তিনি। উপকথার একটা বৈশিষ্ট্য হল, সেটা শোনা ‘কথা’ অর্থাৎ গল্প। শ্রুতিপরম্পরায় লব্ধ লোককথা এখানে আছে, আছে কথকতাও।”[৯]

আমরা জানি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসটি বীরভূমের একটা পরিবেশ। আমরা বোলপুর গেলে দেখব সেখানে ‘কোপাই’ নামে একটি নদী আছে; যার মাঝামাঝি একটা জায়গায় নদীটি হাঁসুলীর মতো একটা বাঁক নিয়েছে, সেখানেই হচ্ছে বাঁশবাদি গ্রাম। প্রায় আড়াইশো বিঘা জমির ওপরে মোটামুটি তিরিশ ঘর মত কাহারদের বসবাস, যারা পেশাগতভাবে পাল্কিবাহক। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই কাহারদের জীবনযাত্রা ও তাদের সংগ্রামের কথাই বর্ণিত হয়েছে; যেখানে তাদেরকে প্রকৃতির নিবিড় যোগে আঞ্চলিক আবহাওয়ার গুণে এক একটি বিশেষ চিহ্নে বিভূষিত করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কেননা উপন্যাসের সময় কাঠামোটাকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, উপন্যাসের শেষে একটা বন্যার কথা বলা হয়েছে, যা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী। সুতরাং, সেইসময় জমিদারীপ্রথা সেভাবে না থাকায় কাহারদের পাল্কির ব্যবহারও স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। ফলত দেখা যায় তাদের কেউ বাঁশবাদি গ্রামেই কৃষিজীবি হয়ে পড়ছে; তো আবার কেউ কর্মসূত্রে জায়গার পরিবর্তন করে চন্দনপুরের মতো জায়গায় চলে যাচ্ছে। ‘কবি’ উপন্যাসেও এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়, নিতাইয়ের কবিয়াল হয়ে ওঠার মাধ্যমে। আবার শরৎচন্দ্রের সামাজিক গল্প ‘মহেশ’-এ দেখতে পাই মহেশের জীবনের যে করুণ পরিণতি তাকে ঘিরে তার প্রতিপালক গোফুরের করুণ অবস্থা ও তার পরিবর্তন। যেখানে শেষপর্যন্ত গোফুরও বাধ্য হয় চলে যেতে গ্রাম ছেড়ে শহরে চটকলে কাজ করতে।

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে দেখা যায় সেইসব সামাজিক মানুষের কথা; যারা সভ্যতার পিলসুজ এবং সংসার যাত্রায় ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন। এই ব্রাত্য অবজ্ঞাত মানব সম্পদের তরঙ্গভঙ্গটি দেখার মতো সর্বদর্শিতার ক্ষমতায় উজ্জ্বল ও দীপ্যমান মনে হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে। এছাড়াও নসুবালা, নিমতেলে পানু, হেদো মণ্ডল প্রভৃতি চরিত্রগুলো প্রাণ পেয়েছে তাদের নামকরণে ও আঞ্চলিক ভাষার গুণে। তাছাড়া সুচাঁদ, বনওয়ারী ও করালী প্রভৃতি চরিত্রকে পরম্পরাগত দিক থেকে তিন প্রজন্মের বলতে পারি; যাদের কর্মে ও মননে গঠিত হাঁসুলী বাঁকের আঞ্চলিক আবহ। যেখানে পশ্চিম বীরভূমের ভাষা পশ্চিম রাঢ়ী, আর পূর্বের ভাষা পূর্ব রাঢ়ীর অন্তর্গত। গীতা’য় বলা হয়েছে - ‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহ’ - গীতার এই অমর বাণীই বনওয়ারী মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। ফলে উপন্যাসে দেখতে পাই বনওয়ারী আবহমান কালের সংস্কার বা রীতি রেওয়াজ মেনে চলতে চায় এবং অন্যকেও মানাতে চায়; আর করালী এসবের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে, কেননা সে আধুনিক। তাছাড়া করালী যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান মনস্কতা ও ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রে বিশ্বাস করে। বনওয়ারীকে

দেখতে পাই সামন্ততন্ত্র পরিবেশে বিরাজমান আর করালী ধনতন্ত্রে। নতুন বনাম পুরনো বা মিথ বনাম রিয়ালিটি তারাশঙ্করের অন্যান্য অনেক গল্প উপন্যাসে দেখতে পেলেও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। কেননা এই অহর্নিশি-দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে হাঁসুলী বাঁকের বাসিন্দাদের আদিম প্রবৃত্তির সংস্কার ও রূপকথার মেলবন্ধন।

উপন্যাসে রাঢ় সমাজের এমন কথা তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যার কোন অনুরণন দেখা যায় না। সংস্কৃতির এরকম অসহায় পতন ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছে আমাদের দেশের আধুনিকতা। যেখানে রেললাইনের উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয় 'কবি' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। কেননা 'কবি' উপন্যাসে দেখতে পাই রেলস্টেশনের পটভূমি; যেখান থেকে দ্রুত যানবাহনের কল্যাণে আশেপাশের প্রায় সব খবরই স্টেশনে বসেই পাওয়া যায়। সেজন্য কবিয়াল হতে চাওয়া নিতাই রাজার সহায়তায় স্টেশনেই তার বাসস্থান ঠিক করে, ফলে সে জানতে পারে কোথায় হচ্ছে কবিগান। আর রাজা যখন নিতাইকে উদ্দেশ্য করে বলে- 'ফাইভ মিনিট ওস্তাদ', তখন আমরা 'সময়' বা 'time' এর সঙ্গেও কিন্তু পরিচিত হতে পারি। তাছাড়া করালীর মুখে উচ্চারিত 'টায়েম' ও বনওয়ারীর মুখে 'টায়েন' এই শব্দ দুটি ইংরেজি 'time' এর অপভ্রংশ রূপ, যা ব্যবহারের মাধ্যমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন বীরভূমের আঞ্চলিক রূপ'কে। আবার চন্দনপুরে রেললাইন গড়ে উঠলে করালী সেখানে কুলির কাজ করতে চলে যায় এবং নানারকমের বিচিত্র সব উপকরণ নিয়ে আসে। যার মধ্যে দেখতে পাই - শালের কড়াইয়ে যেদিন গুড় জ্বাল দিচ্ছিল বনওয়ারী ও অন্যান্য কাহাররা, হঠাৎ উপস্থিত হল করালী রেল-ইস্টিশনের 'তেরপল' নিয়ে। এমনকি পাথর কাটার জন্য জংশন থেকে চারটে গাঁইতি এনে দিয়েছে বনওয়ারীকে, যার মাধ্যমে কাহারেরা পাথর কাটবে। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসেও দেখতে পাই রেলপথ দেখে কেমন ভাবে অপুর মনে সুদূরের রোমাঞ্চকর এক ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে সে দেখছে নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী এবং সেখান থেকে মানসপোতা হয়ে কলকাতা যাবার যে পথ; তা আসলে গ্রাম্য যজমান পরিবারের বৃত্তিচ্যুতি ঘটিয়ে, নতুন বৃত্তি গ্রহণের টানাপোড়েনের এক ইতিহাসকেই ব্যক্ত করছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে আঞ্চলিক লোকবিশ্বাসের এক প্রতিচ্ছবিও ভেসে উঠছে বিভিন্ন ধরনের কথার মাধ্যমে। যেমন লেখকের বর্ণনায় –

> "চারিদিক জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লম্বা কালো প্রলয়স্তম্ভের মতো বিরাট এবং গোল--দেবহস্তির সে শুঁড় ঘুরপাক খেতে খেতে এক ভীষণ সোঁ-সোঁ-সোঁ ডাক ছেড়ে চ'লে আসছে- পালাও পালাও। এসে পড়েছে সেই প্রলয় জলস্তম্ভ। গোঁ-গোঁ গর্জন ক'রে আসছে। সমস্ত লোক মাটিতে শুয়ে প্রণাম জানাচ্ছে। বনওয়ারীর খেয়াল হল, সে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম জানালে— নমো-নমো-নমো, হে দেবতার বাহন! তুমি কি এসেছ প্রভু বাবাঠাকুরের বাহনের মৃত্যুর শোধ নিতে? আগুন জ্বালিয়ে তাকে মেরেছে--তুমি জল ঢেলে তার শোধ নিতে এলে? সে ধীরে ধীরে শুধু মাথাটি তুললে।"[১০]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কোপাই নদী তীরবর্তী হাঁসুলী বাঁকের যে বাঁশবাদি গ্রাম; সেখানকার কাহারদের বহুদিনের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, তাদের জন্ম-বিয়ে, প্রেম-ভালবাসা, হাসি-কান্না প্রভৃতির একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছবি এঁকে, সমাজের বুকে বেড়ে ওঠা নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় করালী একটা বিশাল চন্দ্রবোঁড়া সাপ মেরে প্রমাণ করে যে, সেখানে অলৌকিকতার কিছু নেই। তবুও কাহারপাড়ার আর সবাই তা মানতে চায় না; সকলের একই কথা যেহেতু কত্তাবাবার বাহন করালী মেরেছে, সেহেতু প্রতিবিধান করা দরকার। সেই মতো রবিবার ভোরবেলায় এক অমাবস্যা তিথিতে বাবাঠাকুর তলায় 'ঝুঁজকি' অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই বাদ্যি বাজনা বাজিয়ে পূজাচার শুরু করে সকলে। পাশাপাশি সংস্কৃতিক চিত্র এবং সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার ও আঞ্চলিক সংগীত প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ আঞ্চলিক বাস্তবতার অখণ্ড ছবি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দিষ্ট ভৌগলিক, সামাজিক ও গোষ্ঠী চেতনার দ্বারা আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাকালের মাধ্যমে এই উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই পুরনোর অবসান ঘটিয়ে নতুনের আগমনকে। যেখানে বন্যায় হাঁসুলী বাঁকের

সর্বস্ব ভূমিসাৎ হয়ে যায়, তবুও তারা বেঁচে থাকে। কেননা কর্মসূত্রে তারা চন্দনপুরে গিয়েছিল; যেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। ফলত তারা সিদ্ধান্ত নেয় ফিরে যাবে তাদের সেই বালিভরা হাঁসুলী বাঁকে। এমনকি করালীও ফিরে যেতে চায়, যা আশ্চর্য বলে মনে হয়, তবে অসংগত ও অবিশ্বাস্য নয়। কেননা করালী ফিরে যেতে চাইছে সেই শিকড়ের টানে মাটির খোঁজে। কারণ উন্মূলিত কাহারদের সামাজিক সত্তার পূনর্বাসন চাইছে করালী। ফলে উপন্যাসের শেষে দেখা যায় করালী আবার ফিরে আসছে হাঁসুলী বাকে এবং গাঁইতি চালিয়ে বালি খুঁড়ছে সেইখানে; যেখানে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে এবং ঊষর বালির বুকে কচি কচি ঘাসগুলো যেন অপরাজেয় প্রাণের হাসি হাসছে। কেননা সে মাটি খুঁজছে, নতুন কাহারপাড়া তৈরি করবে বলে। এভাবেই এক যুগের অবসানে নতুন যুগ সূচনার ঐতিহাসিক যে পদধ্বনি শোনা যায়; তাতে কাহার সমাজের আঞ্চলিকতার রসাবেদন পৌঁছে গিয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। ফলে একটা সমগ্র জনজাতির ভৌগলিক বিশাল প্রেক্ষাপট উত্তরণে সংস্কৃতির নব ইতিহাস বিবৃত হয়েছে ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে। এভাবেই মূলত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় দুটি আঞ্চলিক উপন্যাস ‘কবি’ ও ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ শীর্ষক উপন্যাসের আঞ্চলিকতার গতিপথের ভিন্নতায় সাফল্য দেখিয়েছেন।

Reference:

১. আমার কথা, ‘শনিবারের চিঠি’, আষাড়, ১৩৭১, পৃ. ২০৯
২. বসু, ড. নিতাই, ‘তারাশঙ্করের শিল্পীমানস’, দে’ জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রচ্ছদ: অজয় গুপ্ত, পৃ. ৩১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ‘কবি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সাইত্রিশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৬, প্রচ্ছদপট অঙ্কন: অনুপ রায়, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৩
৪. তদেব, পৃ. ১৪৬
৫. তদেব, পৃ. ৬৬
৬. দে, ড. সত্যব্রত, ‘বিতর্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যলয়, ২৭ নভেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ৫৭
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ‘কবি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সাইত্রিশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৬, প্রচ্ছদপট অঙ্কন : অনুপ রায়, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১২৯
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ‘তারাশঙ্কর রচনাবলী’, গ্রন্থ পরিচয়, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭
৯. দাশ, ড. অমরেশ, ‘তারাশঙ্করের উপন্যাস’, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৯৮, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৪০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’, করুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণঃ আষাঢ় ১৩৫৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ২৫২, ২৫৩

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ‘আমার সাহিত্য জীবন’, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, ‘তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা নানা চোখে’, গ্রন্থবিকাশ, প্রকাশক বিকাশ সাধুখাঁ।
বসু ড. নিতাই, ‘তারাশঙ্করের শিল্পীমানস’, দে’ জ পাবলিশিং, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে।
দাশ ড. অমরেশ, ‘তারাশঙ্করের উপন্যাস’, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রকাশক বিকাশ সাধুখাঁ।
বিশ্বাস অচিন্ত্য, ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি, রত্নাবলী, প্রকাশক সুমন চট্টোপাধ্যায়।
ভট্টাচার্য দেবাশিস, ‘তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
ভট্টাচার্য দেবাশিস, ‘উপন্যাসের বিনির্মান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 313 - 322
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

'হৃদয়ে রাইমা' : হারাধন বৈরাগীর গল্প কিংবা উপন্যাস নয়, এক স্মৃতি আখ্যান গ্রন্থ

অমর্ত্য দাস
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
সরকারী মহাবিদ্যালয় পানিসাগর
পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত
Email ID: amartyadas269@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tripura, Haradhan Bairagi, Nature of Tripura, Beauty of Tripura, Raima-Saima, Hills, Culture, Tribal, Traditional Food, Dhalai District.

Abstract
Tripura is a small state in northeastern India. This state, surrounded by mixed culture, natural beauty and mountains, is home to various ethnic groups. Bengalis live in the plains of the state and hill tribes live in the hills. Although the two nations come from different backgrounds, the hill Bengalis of this state seem to complement each other. The spirit of literary pursuits was quite strong throughout this state of mixed settlement. The history of Bengali language and literary pursuits is long in this state. One such personality in this background of literary pursuits and literary writing is Haradhan Bairagi. He has engaged himself in literary pursuits in various ways. The hills, mountains, nature and tribal society of Tripura have repeatedly touched the writings of Haradhan Bairagi. Nature easily blends into the background of the public life of Tripura. As a result, tribal communities and nature have repeatedly become one in the creations of those who have dedicated themselves to the worship of literature. And with these captivating mountains and natural beauty in the background, one after another, the literary world of Tripura has been written in a beautiful style. One of the writers of this genre is Haradhan Bairagi. In his literary creations, the struggle for life, the struggle for survival, and the food and clothing of the tribal tribes living in the hills of Tripura can be observed to a great extent. As a result, the mountain-loving and jungle-loving writer Haradhan Bairagi has not only given a touch of innovation in his writings, but also has expressed them fluently. He has tried to bring his writings to the highest peak of richness from real life experiences. He has spent most of his life wandering around the hills and forests, and the reality and experience he has gained while wandering around has been tried to express in the form of the book 'Hridoye Raima', (2021) one of his life's literary works. As he wandered around the hills, in the jungle, he has also extracted various problems of the tribal communities, their lifestyle, culture, etc. As a result, all

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

the books are truthful in their events. His language, wordplay, and other skills have become extremely fluent in this work.

Discussion

পাহাড়-পর্বত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটি ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা উত্তরপূর্ব ভারতের একটি প্রত্যন্ত রাজ্য হলেও রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে শিল্প সাহিত্য চর্চার একটি বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল অনেক কাল আগে থেকেই। আর এই সাহিত্যচর্চার তথা ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে এক অন্যতম নব্য সংযোজিত নাম হল হারাধন বৈরাগী। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট জেলার দিরাই থানার জটি গ্রামে লেখক হারাধন বৈরাগী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল বনমালী দেবনাথ এবং মাতা ছিলেন প্রভাষিনী দেবী। দেশভাগের যন্ত্রণায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি চলে আসেন ভারতের এই ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার উত্তর জেলায়। সেখানে এসেই তার অক্ষরজ্ঞান ও হাতেখড়ি হয়। পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগে তিনি বিষয় শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্তি পান। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক হারাধন বৈরাগী পেশায় একজন শিক্ষক হলেও বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্য রচনার সাধনায় তিনি সর্বদা নিজেকে সমর্পণ করে রেখেছেন। শিক্ষকতার কাজের সাথে সাথে তিনি রচনা করেছেন বহু কাব্যগ্রন্থ। তবে হারাধন বৈরাগী শুধুমাত্র কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নিজেকে আটকে রাখেননি কবিতা রচনার পাশাপাশি রচনা করেছেন বহু গল্প, সমালোচনা গ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ এবং উপন্যাস। তার রচনায় উঠে এসেছে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাস করা উপজাতি অংশের জনজাতিদের দৈনন্দিন জীবন। জঙ্গল, পাহাড় এবং উপজাতি অংশের মানুষের প্রতি তার যে টান, যে অনুরাগ তা-ই উঠে এসেছে তার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে। আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধনটিতে লেখক হারাধন বৈরাগীর স্মৃতি আখ্যানমূলক গ্রন্থ ‘হৃদয়ে রাইমা’ (২০২১) সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি লেখক হারাধন বৈরাগী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে এক গবেষণাধর্মী আলচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

জন্মসূত্রে লেখক হারাধন বৈরাগী বর্তমান বাংলাদেশের হলেও বিভিন্ন কারণ যেমন দেশভাগ, উদবাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে প্রথমে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরের লালজুরী রিজার্ভ ফরেস্টে বসবাস করলেও পরবর্তী সময়ে চলে আসেন কাঞ্চনপুর শহরের দ্বিতীয় বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে। কর্মসূত্রে হারাধন বৈরাগী ঘুরে বেড়িয়েছেন ত্রিপুরার নানা স্থানে। ঘুরে বেড়িয়েছেন জঙ্গলে জঙ্গলে। জঙ্গলের প্রতি লেখক এর টান ছিল অন্যরকম। এই জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই লেখক হারাধন বৈরাগী লিখেছেন তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ ও গল্পগ্রন্থ। তার সমস্ত কবিতা, গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় জঙ্গল ও পাহাড়ি জনজাতিদের গন্ধ। তারই রচিত এক অন্যতম রচনা সমগ্র হল ‘হৃদয়ে রাইমা’ (২০২১)। এই গ্রন্থের নামকরণ স্বয়ং লেখক করলেও এটি কি জাতীয় রচনা সেটির দায়িত্ব দিয়েছেন পাঠক সমাজকে। গ্রন্থটির গৌরচন্দ্রিকায় লেখক লিখেছেন—

> “ ‘হৃদয়ে রাইমা’কে উপন্যাস, গদ্য বা স্মৃতিআখ্যান কি বলা যাবে জানিনা। এ নির্বাচনের দায়িত্ব পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। সময়কে জানি ভাগ করা যায় না। তবু সময়ের সাথে সাথে তো কিছু ঘটনা ঘটে যায়। কারো কারো মনে অসম্ভব দাগ কাটে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। সেই দাগ থেকে কিছু লেখা হয়ে যায়।”[১]

‘হৃদয়ে রাইমা’ (২০২১) গ্রন্থটিকে অনেকেই আত্ম উপন্যাস বলেই মনে করেছেন। গ্রন্থটিতে লেখক হারাধন বৈরাগী তার জীবনের একটি বিশেষ সময়কালকে অত্যন্ত নিপুন দক্ষতার সাথে শব্দ চয়নে নিবন্ধন করেছেন। গ্রন্থটিকে তিনি ঊনআশিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদে তিনি তার জীবনের সেই বিশেষ একটি সময়কালের নানা অভিজ্ঞতা, তার সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনী সমূহকেই তুলে ধরেছেন। তিনি যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তাকেই গ্রন্থের কাঠামোয় রূপ দিয়েছেন। তুলে ধরেছেন পাহাড়ি আদিবাসীদের জীবন যাপনের নানা চিত্র। তাদের সামাজিক অবস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়কে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখক ছিলেন পেশায় একজন শিক্ষক। শিক্ষকতার চাকরির সুবাদে তিনি প্রথমে লালজুরী স্কুলে চাকরি করেন কিছুদিন। পরবর্তী সময়ে লালজুরী থেকে তার বদলি হয় ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার জগবন্ধু পাড়ায়। জগবন্ধুপাড়ায় বদলির খবর কানে আসতেই একদিকে তিনি যেমন কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন কেননা তিনি জানতেন—

> "গন্ডাছড়া ত্রিপুরার ধলাই জেলার সর্বাপেক্ষা প্রত্যন্ত মহাকুমা। সর্বাঙ্গে তার কুহকময় জঙ্গলের ঘ্রাণ। মোঙ্গলীয় জনজাতিদের আদিম বাসস্থল। রাইমা সাইমার ভালোবাসার কুঞ্জবন। অনির্বাচনীয় বুনোগন্ধ যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানে আমার কর্মস্থল হবে, ভাবলেই মনটা চনমনিয়ে উঠত।"[২]

জঙ্গলের প্রতি নিশিটান লেখকের কাছে নতুন নয়। লেখক আজীবন দেওভ্যালির পাহাড় জঙ্গল একাকার করেছেন। রাতের অন্ধকারে লেখক যৌবন বয়সে বন্ধুর সাথে রাতের আঁধারে জঙ্গলের টানে বেরিয়ে পড়তেন, খুঁজতেন ভূত-প্রেত। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতেন, প্রায়দিন রাত কাটাতেন আদিবাসীদের ঘরে। আদিবাসীদের কাছ থেকে শুনতেন জঙ্গলের কুহকময় জীবন কথা।

লালজুরী স্কুল থেকে জগবন্ধুপাড়ার স্কুলে যোগদানের দিন কাঞ্চনপুর থেকে গন্ডাছড়া যাওয়ার যাত্রাপথের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন গ্রন্থের মধ্যে। কাঞ্চনপুর থেকে মনু মাত্র ২৫ কিমি যাত্রা করে লেখক পৌঁছে যান এক জনশূন্য রাস্তায়। এ রাস্তার সবথেকে জনবিরল স্থানে গড়ে উঠেছে মিজোরাম থেকে আসা শরণার্থীদের গ্রাম। সেই গ্রামে ঢুকতেই লেখক জানতে পারেন অতীত ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তি কয়েকের বাসস্থান ছিল এই গ্রামেই—

> "পথে পড়ে অসংখ্য চড়াই উৎরাই গিরিখাত আর অনেকগুলি পুল। এই পথেই ত্রিপুরার খ্যাতনামা কথাকার শ্যামাচরণ ত্রিপুরার জন্মস্থান ঈশাণ রোয়াজাপাড়া, ১৯৪২ এর রিয়াং বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মাংছল রিয়াং ও হান্দাইসিং রিয়াঙের অগস্ত্য বাসস্থল।"[৩]

তৎকালীন ত্রিপুরায় উগ্রবাদীদের উপদ্রব ছিল ব্যাপক। প্রত্যেকদিন কোনো না কোনো স্থানে কেউ না কেউ উগ্রবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত কিংবা নিখোঁজ হয়েছে সেই খবর পাওয়া যেত। লেখক হারাধন বৈরাগীও তার শিকার হয়েছিলেন। পেঁচারতল থেকে একটি মালবোঝাই ট্রাকে করে গন্ডাছড়ার পথে যাওয়ার সময় লংতরাই পাহাড়ে এসে গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ে। লেখক গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় যখন হাঁটাহাঁটি করছেন তখন হঠাৎ শুনতে পান কয়েকজন লোকের কথা। তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে ওরা আদিবাসীদের ভাষায় বলংবরক (উগ্রবাদী)। প্রাণ রক্ষার জন্য লেখক ছুটে চলেন পাহাড়ের উপরে থাকা একটি জুম ঘরের দিকে। সেই জুম ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তি এবং তার মেয়ে। তিনি তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তারা বলেন—

> "উদ্দিষ্ট মামা আমাকে চটজলদি হাতে ধরে গাইরিঙে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল- ভাগিনা, তুই বাছবো। কোন চিন্তা করবো না। তরে কি বলংবরক ধরেছিলো রে, তুই ভাগছসনি ভাগিনা? বলংবরক দেখলে আমারেও তর সাথে কাটবো"[৪]

সেই রাতটি তিনি সেখানে কাটান। পরদিন সকালে সেই যুবতী তাকে পথ দেখিয়ে দেয় জাতীয় সড়কের। তিনি আবার গাড়ি ধরে শুরু করেন যাত্রা আর পৌঁছে যান জগবন্ধুপাড়ায়। জগবন্ধুপাড়ায় আসার আগে লেখকের এক প্রতিবেশী শিক্ষক তাকে বলেছিল তার এক আত্মীয় জগবন্ধু পাড়ায় থাকে। তিনি যেন এখানে এসে তার সাথে দেখা করেন। তিনি তাকে একটা ভাড়া ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। সেই মত জগবন্ধু পাড়ায় আসার পর লেখক তথা শিক্ষক তার কলিগ হারানকে সত্যেন পালের কথা বলতেই সে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। সত্যেন পালের ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান। তিনি তাদেরই অপেক্ষা করছিলেন। দোকানের পাশে যেতেই তিনি হাত নাড়িয়ে তাদের ডাকতে লাগলেন। কিন্তু লেখক তার স্ত্রীর বারন থাকায় সত্যেন পালের বাড়িতে ঘর ভাড়া রাখেননি। কারণ—

> "ভোরবেলা মন কিছুটা ভালো হলে বলেছিলেন, সাক্ষীদের বাড়িতে ঘর ভাড়া করা যাবে না। ওর বরের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, বাবার কাছে আছে। দেখলে না কেমন বেপরোয়া মেয়ে। এমন মেয়েদের আমার বিশ্বাস নেই। আসতে না আসতেই তোমাকে আপন জামাই বাবু বানিয়ে ফেললো, কী না আমার বোনেরে। পরে কিনা..."[৫]

অবশেষে ঘর ভাড়া রাখেন গন্ডাছড়ার সুবোধ বিশ্বাসের বাড়ি। সেই বাড়িতেই লেখকের নতুন কলিগ দীপঙ্কর চক্রবর্তী ভাড়া থাকতো। সেখানে মাস খানেক থেকে পরে চলে আসেন জগবন্ধুপাড়ায়। কেননা গণ্ডাছড়া থেকে জগবন্ধু পাড়ার দূরত্ব খুব বেশি না হলেও গাড়ি ভাড়া অনেক বেশি। জনজাতি অধ্যুষিত সেই গ্রামে ঘর ভাড়া রেখে তিনি চলে আসেন। মনে মনে ভয় থাকলেও তিনি সাহসের জোগান করেছেন। কেননা ভয় থাকলেও তাকে সেখানে থাকতে হবে।

জগবন্ধু পাড়ার সেই গ্রামে এসে লেখক প্রথম মৌরলা মাছের চচ্চড়ির প্রেমে পড়েছেন। এখানে আসার পর মরশুমে লেখকের খাদ্য তালিকায় রোজ মৌরালা মাছ ছিল। লেখক শিখেছেন সেই রান্না। আবার আদিবাসীদের অতি প্রিয় খাদ্য বাঁশকুড়ুল যা বর্তমানে সমতল বাসীদেরও অত্যন্ত প্রিয় একটি খাদ্য। লেখকের স্ত্রী বাঁশকুড়ুল একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু লেখকের ছেলেবেলা থেকেই বাঁশকুড়ুলের সাথে অত্যন্ত মাখামাখি। তিনি বলছেন—

> "গোদকের সাথে আমার ছেলেবেলা থেকেই মাখামাখি, যেমন ছোটবেলা থেকেই আমার মাখামাখি জনজাতি মানুষের সাথে। বড় হয়েছি জাতি উপজাতি মিশ্র পরিবেশে। জনজাতি বন্ধুদের সাথে নাওয়া-খাওয়া করতে গিয়ে গোদকের প্রেমে পড়েছি।"[৬]

ষোল নং পরিচ্ছেদে এসে লক্ষ্য করা যায় ত্রিপুরার এক বিখ্যাত কবি আপাংশু দেবনাথ এর কথা। লেখককে এক মুখবইবন্ধু দূরভাষে বলেছেন—

> "আপনি কি আগামীকাল জগবন্ধু থাকছেন হারাধন দা? আমি আপাংশু দেবনাথ, আগামীকাল আপনার কাছে আসতে চাইছি।"[৭]

আপাংশু দেবনাথ লেখকের সাথে দেখা করবেন সে কথা তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। লেখক মনে করেন এমন কবির দর্শন যেন তার সাত জন্মের পূণ্য ফল। কবির হঠাৎ মনে পড়ে গেল ত্রিপুরার আরেক কবিতা পুরুষ সেলিম মুস্তাফার একটি কবিতার কথা। তিনি সেই কবিতার লাইন তুলে ধরেছেন তার একটি পরিচ্ছেদের মধ্যে –

> "কবিরা স্বর্গের পাখি, এরা যতদূর যায় স্বর্গ ততদূর ছড়িয়ে পড়ে –। আপাংশুদের মত কবি দর্শন তো আমার কাছে স্বর্গ দর্শনের মতো।"[৮]

আপাংশু দেবনাথের সঙ্গে যিনি এসেছেন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে তাকে লেখক যেন চিনেও চিনতে পারছেন না। হঠাৎ মগজে জুড়ে চাপ দিতেই লেখকের মনে পড়ে উনি তো কবি গোবিন্দ ধর। যার সাথে প্রায় বছর পাঁচেক আগে লেখকের দেখা হয়েছিল বর্তমান উনকোটি জেলার অন্যতম শহর কুমারঘাটে, এরপর আর দেখা হয়নি তার সাথে। গোবিন্দ ধর হলেন ত্রিপুরার এক সাহিত্য প্রকাশনা স্রোতের কর্ণধার। লেখক নিজেকে আউলা বৈরাগী বলে আখ্যায়িত করছেন। আবার জগবন্ধু পাড়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও স্বীকার করছেন –

> "আমি সাধারণ এক আউলা বৈরাগী, শুধু বাঁশ খেতে খেতে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ঘুরছি। মনে মনে বললাম, –জয় জগবন্ধু, আজ আমাতে তোমাতে, তোমাতে তোমাতে দেখা. জানিনা তোমার যে আর কত লীলা প্রভু।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখক, লেখকের গিন্নি এবং দুই কবির সাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেল হলে দুই কবিকে নিয়ে লেখক ঈশ্বরাই পাড়া হয়ে ডুম্বুরের পথে পথে ঘুরে আসেন। লেখক এর গিন্নির আবদার ছিল ডুম্বুরের চিংড়ি মাছ। লেখকের গিন্নির বাঁশকুড়ুল চোখের বালি হলেও ইদানিং তিনিও বাঁশকুড়ুল প্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেন। তিনি বলেন –

"গিন্নি বললেন – রাতের খাদ্য তালিকায় চিংড়ি বাঁশকুড়ুল চচ্চড়ি আর চিংড়ি বড়া।"[১০]

এখানে লেখক হারাধন বৈরাগী অত্যন্ত নিপুন দক্ষতার সাথে ত্রিপুরার পার্বত্য জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রিয় খাদ্য তালিকার বর্ণনা যেমন করেছেন তেমনি পাহাড়ি জনজাতি অংশের মানুষের সঙ্গে সমতলে বসবাসকারী মানুষের এক অপার সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন যেন। তার লেখনী সত্তায় বারাবরই জাগ্রত হয়েছে জাতি উপজাতির মেলবন্ধন।

আপাংশু দেবনাথ এবং গোবিন্দ ধরের মতো সুনামধন্য কবিরা কবি হারাধন বৈরাগীর মুখে কবিতা শুনতে চান। এখানেও তিনি অনেক পুণ্যের কথা বলেন। তিনি ভাবছেন তার মতো অধমের মুখ থেকে এমন দু'জন মানুষ কবিতা শুনতে চায়, সেটা তার ভাগ্যের ব্যাপার। শুরু হয় কবিতা পাঠ। কবি আপাংশু দেবনাথ বললেন—

> "জুমপোড়া ছাই শরীর থেকে ধুবো বলে সাইমার মায়াতরলে ছড়িয়ে দিয়েছি গা। পেরিয়ে আসা জিগজাগ পথের ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেল। আর সঞ্জয় নয়নে স্পষ্ট দেখতে পেলাম কোভিদ হাসমত সৌররঙ মেখে কৌতুহলী হরিণীর মতো সাঁকো পেরিয়ে ধীরে নেমে আসছে জলে। শিকারি বকের মতো পা ফেলে আমার গা ঘেঁষে উজানমুখী হল। তাকিয়ে থাকি নির্ণীমেষ। হৃদয়ের পাশে থাকা ফকিরকেও বলতে পারিনি কিছু। কিছুদূর এগিয়ে সাইবার জলে শরীর ভিজিয়ে, জল মাটির পাড়ে হাত গলিয়ে কি যেন তুলে রিয়ার কোচড়ে ভরছে হাসিমতি।"[১১]

জটলবাঁধা টংঘরের সমাহারে গড়ে ওঠা ঈশ্বরাইপাড়া। ত্রিপুরা হল জনজাতিদের গা। বিকালের রুশোণায় টংঘরগুলি মায়ার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন পড়ে। কবি আপাংশুর চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। তিনি ধরিত্রীর প্রথম শব্দের মত গমগমিয়ে বলতে লাগলেন –

> "হয়তো কোন এক অদ্ভুৎ ত্বরণ, আমাদের বোধের রন্ধ্রপথ ধরে ঘুরেফিরে শূন্য বিন্দুতে এসে মেশে। আর আপনি ও আমাতে তখন কোন তফাৎ থাকে না। সময়ের সীমারেখা পেরিয়ে মেঘ নদী হয়ে নামে আকাশ থেকে। ত্বরণ বিন্দু মিশে আলো হয়ে জ্বলে। বৃষ্টি তুই আকাশেই থাকিস মেঘের বুকে। আমি জরুরী জঙ্গলে এসেছি হারানো সুখে।"[১২]

এর থেকে অনায়াসেই বোঝা যায় লেখক হারাধন বৈরাগী কতটুকু প্রকৃতিপ্রেমী হিসাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন। তিনি লেখনিতে যে তত্ত্ব কিংবা ভাষাগুলোর প্রয়োগ করেছেন তাতে প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য যেমন ফুটে ওঠে তেমনি লেখকের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনারও এ যেন এক নিপুন আত্মপ্রকাশ। তিনি ত্রিপুরার পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে বিষয়গুলোকে তার লেখায় উঠিয়ে এনেছেন তাতে পাহাড়ি রাজ্য এই ত্রিপুরার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যতাই উঠে আসে বারংবার। লেখক তার হারানো সুখের প্রত্যাশায় কিংবা তার হারানো সুখকে খোঁজে পেতেই যেন তার এই জঙ্গল ভ্রমণ।

লেখক বিমুর্ত কবিদের ছবি বন্দি করতে লাগলেন আপ্লুত আবেশে। কবি গোবিন্দ ধর বললেন –

> "হাসমতি তুমি তো সকল কবির মানসকন্যা। তোমার চোখের ট্যারা ইশারা থেকেই কি ঈশ্বরাইর জন্ম কাহিনী। অসংখ্য টিলার খাজ আর হাসমতির বুকের মতো টিলাগুলোর রহস্য মায়া বিকেল ডিঙিয়েই কী আমরা হাতকুটা জুমের চালের ঘ্রাণ শরীরে মেখে সাইমা_নাকি হাসমতির জলেই স্নিগ্ধ হয়েছি।"[১৩]

হারাধন বৈরাগী দেখতে পান কবি যুগল উদ্দাম প্রকৃতির বুকে বরকিনীর রসাম ও রমোর ধান কুটার মাঝে মিলেমিশে একাকার। ঈশ্বরাই পাড়া থেকে ফেরার পথে কবি আপাংশু লেখককে এক রহস্যময় বৃক্ষের ছবি তুলে উপহার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেন। অবশেষে পাহাড়ের ঢালে ঢালে জুমঘরের উদ্দাম হাতছানি উপেক্ষা করে তারা এগিয়ে চলেন গন্ডাছড়া হয়ে ডুম্বুরের পিচ্ছিল ঘাটের পথ ধরে। পথের ধারে এক রহস্যময় বটগাছ তার ঠেশমূল প্রায় অর্ধকানি জায়গা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। লেখক এর মতে এমন বট বৃক্ষ ত্রিপুরায় আর দ্বিতীয় আছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং লেখক এর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ত্রিপুরায় অবস্থিত সবথেকে বড় বটবৃক্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং তার সন্ধান লেখক হারাধন বৈরাগীর কথায় উঠে এসেছে।

বটগাছ পেরোতেই হঠাৎ নেমে আসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। পথের দুপাশে ছিল জেলেদের আস্তানা। কবিদের নিয়ে তিনি ঢুকে পড়েন জেলেদের ঘরে।

উনিশ পরিচ্ছদের শুরুতেই দেখা যায় তাদের কবিতার আড্ডা বেশ জমে ওঠে। লেখকের মুখে কবিতা পাঠ শুনে কবি গোবিন্দ ধর বলেন—

> "আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম হোক — হাসমতি ত্রিপুরা "[১৪]

কবি গোবিন্দ ধরের এই উক্তিটির মধ্যে থেকে জানা যায় লেখক হারাধন বৈরাগীর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাসমতি ত্রিপুরা'র নামকরণ করেছিলেন ত্রিপুরার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কবি গোবিন্দ ধর। তবে গোবিন্দ ধরের মুখে এই কথাটি শুনে লেখক হারাধন বৈরাগীর মনে সাহিত্য সৃষ্টির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যে আগুন জ্বলে ওঠে তা থেকেই তার এই অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টির গতিপথ যে নির্ধারিত হয়েছিল তা অনায়াসেই বলা যায়। কবি মনে মনে গোবিন্দ ধরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন — 'তাই হোক'। চলতে থাকে কবিতার মাধ্যমে নানান বার্তালাপ।

ঘরে ফিরে আসার পর আপাংশু দেবনাথ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– 'মৃত্তিকাঋন মেঘমিতাকে' – এর একটি কপি লেখক হারাধন বৈরাগীকে দিয়ে বললেন এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করে এটির জন্য একটি আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে হারাধন বৈরাগী জানতে পেরে গিয়েছেন যে —

> "জানলাম এটি আলোচনা করেছেন বাংলাদেশ ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঘা বাঘা কবিজন, কবি সন্মাত্রানন্দ কৃষ্ণার্পিত, কবি পীযূষ বিশ্বাস, কবি সঞ্জিত বণিক, ইসরাত আফতাব অনন্যা, কবি রীতা শিব, কবি বিদিশা সরকার। ভূমিকা লিখেছেন এ রাজ্যের অন্যতম কবি ও লোক গবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন।"[১৫]

আপাংশু বলেন এই কাব্যগ্রন্থটি মাত্র তার পঞ্চাশ মিনিটের লেখা একটি পত্র কাব্য। তখন হারাধন বৈরাগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে এই কাব্যের আলোচনা কি তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে। মনে মনে তিনি জগবন্ধুকে ডাকতে লাগলেন। বলে উঠেন 'জগবন্ধু আমাকে এবারের মত রক্ষা করো প্রভু!'

তেইশ পরিচ্ছেদে লেখক ত্রিপুরার বর্তমানে বহু প্রচলিত কিংবা সকলের মুখে মুখে যে বিষয় উঠে এসেছে সেটি হলো ১০ হাজার ৩২৩, এই ১০ হাজার ৩২৩ বিষয়টির বিষয় নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষেরই জানা যে আদালতের নির্দেশানুসারে ১০ হাজার ৩২৩ জনের শিক্ষকতার চাকরিতে অবসান ঘটে। এরপর উচ্চ আদালতের রায়কে আপত্তি জানিয়ে রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেছিল। কিন্তু সর্বোচ্চ ন্যায় আদালতও উচ্চ আদালতের রায়কে বহাল রাখে এবং বলে ১০ হাজার ৩২৩ এর চাকরি ৩১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। লেখক এই বিষয় সম্পর্কে বলছেন —

> "এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই নবনিযুক্ত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাজার সর্বদা সরগরম থাকতো। হাটে মাঠে-ঘাটে এই নিয়ে আলোচনা মুখরোচকে পরিণত হল। ফলে ১০৩২৩ কিছুদিনের মধ্যেই যেন শিক্ষাবিভাগের অঘোষিত দূতে পরিণত হল। আর সারা রাজ্যে ভিলেন হয়ে গেল মামলাকারীরা। এই সুবাদে কেশরিও জগবন্ধুতে।"[১৬]

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জগবন্ধু পাড়ায় এসে লেখক ভাবছেন তিনি সেখানে এসে যে পাগলের পাল্লায় পড়বেন সে কথা ভাবতে পারেননি। পাগল দেখলেই লেখক এর স্নায়ু শক্ত হয়ে যায়। যেমন গাড়ির চালক দেখলে। চলার পথে যদি কোন চালক বড় রকমের কোন ক্ষতি করে দেয় তাকে তিনি কিছু বললেন না মুখ ফুটে। সহসাই তিনি পাগল দেখলে আগে থেকেই সমঝে চলেন। আর যদি বিপদে পড়ে যান তখন বোলতা আক্রমণের মুখে পড়ার মতো মূর্তি হয়ে থাকেন।

স্কুলবেলা লেখক ধর্মনগর বি.বি.আই - তে পড়ার সময় একদিন উপাহার কালে অফিসটিলা থেকে একটি দ্বিচক্রযানে চড়ে স্কুলে ফিরছেন তখন এক পাগল তার সামনের দিকে সেন্ট্রাল রোড ধরে হাত উড়িয়ে খিস্তি দিতে দিতে আসছিল। তখন কাছে এসেই লেখকের গালে সজোরে এক থাপ্পড় কষিয়েছিল। লেখক তখন অন্ধকার দেখতে লাগলেন। কানে যেন তার তালা লেগে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি পাগল দেখলেই ভয় কেঁপে ওঠেন। আর গাড়ির চালককে তিনি কেন ভয় করেন সেই বৃত্তান্তও তিনি দিয়েছেন –

> "আর গাড়ির চালক। কিশোর বেলা তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াইর পথে এক সপ্তাহ একটি ট্যাক্সি গাড়িতে সহকারীর কাজ করেছিলাম। সওয়ারি বেশি হলে চালক আমাকে গাড়ির লটবহর বাক্সে ঢুকিয়ে দিত। আর আমিও পোটলার মত চলে যেতাম খোয়াই শহরের কাছাকাছি। চালক তখন আমাকে আসবাব বাক্স থেকে বের করে যাত্রীর সাথে চেপে বসাতো। একদিন মোটর স্ট্যান্ডের মুখে যেতে যেতে হঠাৎ আমার পাশের দরজাটা খুলে যায়। আর গাড়ি থামিয়ে চালক আমাকে এমন এক থাপ্পর দিল, পেচ্ছাপ ছুটে গিয়েছিল। অন্ধকার দেখলাম।"[১৭]

কাপড়ের ঘোর কেটে গেলে লেখক দেখেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন খোয়াই দ্বাদশ স্কুলের সামনে। আর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখককে অবাক চোখে দেখছে। এর থেকেই হারাধন বৈরাগী পাগল আর গাড়ির চালক এই দুইটিই তিনি অত্যন্ত ভয় করেন।

পরিচ্ছেদ সংখ্যা সাতাশে দেখা যায় লেখক জঙ্গলের প্রতি যে তার নিবিড় টান সেই কথাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জঙ্গলের সঙ্গে লেখক এর যে আত্মিক সম্পর্ক সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন –

> "জঙ্গলের সাথে আমার আজন্ম সখ্য। জঙ্গল দেখলেই এক কুহকময়ী নারী মনে হয়। সে প্রতিদিন আমার সম্মুখে রূপ পাল্টায়। আমার সাথে পরকীয়া করে। প্রেমিকার মতো মান অভিমান করে। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমার ঘোর লেগে যায়।"[১৮]

জঙ্গল, জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি প্রবৃতের প্রতি ছিল লেখক এর অত্যন্ত টান। কিন্তু আজ বন-দস্যুদের তাণ্ডবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বন জঙ্গল, আর এই ধ্বংসের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে বনের নানা রকম পশু পাখিরাও। লেখকের তাতে ভীষণ আক্ষেপ। তিনি বলেছেন শৈশবে তিনি যে দেওভ্যালির জঙ্গল দেখেছেন তা যেন ছিল একটি প্রাকৃতিক চিড়িয়াখানা। হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, সজারু, শুকর, বনরুই, হরিণ, সাপ, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি বিচিত্র প্রজাতির পশু পাখি, উদ্ভিদ লতা গুল্ম নিয়ে অসম্ভব রকম জীবন্ত ছিল এই বনতট। তখন মানুষ মানুষের কাছে আশ্রয় চাইতো। কিন্তু আজ এই উদোম পাহাড় দেখলে জঙ্গলের প্রাণীদের কথা ভেবে লেখক অসম্ভবভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি মানুষের অধিকারের পাশাপাশি প্রাণীদের অধিকারকে অস্বীকার করতে পারেন না। মানুষের সাথে আজ পশুদের লড়াইয়ে তারা অসম্ভব পেছনে চলে যাচ্ছে। এ কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তিনি যেন যন্ত্রনা অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন –

> "এই অধিকারের লড়াইয়ে মানুষগুলো যেন এক এক জন স্বপর্যক্ষ যার মৃত্যুর পর নাগাটুয়ারিতে আবিষ্কৃত হয়েছে অজস্র মণি মানিক্য বা বিজ্ঞান নামক অমূল্য রত্ন যার অব্যবহার – অপব্যবহারের ফলে তাকে চলে যেতে হচ্ছে। সে বুদ্ধিতে প্রাণীকুলের শিরোমণি। তবু সে সবচেয়ে বোকা কালিদাস সেন। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে।"[১৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখক হারাধন বৈরাগী মনে করেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আজ অহংকারে মাটিতে পা ফেলতে পারছে না। তারা কেবল কিছু গৃহপালিত পশু নিয়ে ছটফট করছে আর ঢলে পড়ছে বন্ধ্যা মাটির বুকে। তাই লেখক মনে করেন এর জন্যই হয়তো অম্ল জানের হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, বাতাস বাড়ি হয়ে উঠেছে আর অসহায় হয়ে পড়েছে লেখক এর আত্মজ অর্থাৎ বন্য জঙ্গল, বনের পশু পাখিরা।

মানুষকে লেখক স্বার্থপরতার নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন পৃথিবীতে যত প্রাণী আসে তারা সকলে তাদের নিজ নিজ বুমেরাং সাথে নিয়ে আসে কিন্তু মানুষ যাদের এত বড় একটা মস্তিষ্ক আছে এবং মানুষ নাম যাদের একটাই প্রজাতি, যাদের মগজ একটা এবং তা সম্পূর্ণ তার একার, আর কোন প্রাণীতে তা বন্টিত নেই যা এই প্রকৃতির একটি বিরলতম ব্যতিক্রম।

লেখকের চোখের সামনে ভেসে উঠে এক বান্ধ্যা পৃথিবী। যার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে, তার কোন মূল্য নেই। লেখক মনে করেন পৃথিবীটা আজ এমন হয়েছে যে দেখলে মনে হয় যেখানে মানুষ থাকে না সেখানে শুধু আবর্জনা ওঠে কেন।

> “যেখানে মানুষ নেই। চারপাশে শুধু আবর্জনা – ক্যান। ফাঁকে ফাঁকে কিছু ওয়াটার বিয়ার আর অর্কিড। এইসব ভাবতে ভাবতে আমার নাভীশ্বাস ওঠে, শ্বাস উঠে লংতরাইর বিড়িপাতা ছড়াটির মতো।”[২০]

লেখক হারাধন বৈরাগী বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি অর্থাৎ তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সমগ্র পশুকুল নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। আর একজন প্রকৃতিপ্রেমী লেখক এর এই চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় এই যে ত্রিপুরা রাজ্য নামটি মুখে আসলেই প্রথমে তার অরণ্য বেষ্টিত জঙ্গল পাহাড় পর্বত আঁকাবাঁকা পথের চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বর্তমান ত্রিপুরার সামগ্রিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ত্রিপুরার বন জঙ্গল বনদস্যুদের আক্রমণের শিকার প্রতিনিয়ত। আর হারাধন বৈরাগীর মতো একজন প্রীতি প্রেমিক জঙ্গল প্রেমিক কথাকারের প্রকৃতির এই ধ্বংসাত্মক অবস্থা দেখে আহত হাওয়াই স্বাভাবিক।

বত্রিশ নং পরিচ্ছেদে লেখক হারাধন বৈরাগী পাহাড়ি জনজাতিদের সমাজ ব্যবস্থা নৈতিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। পাহাড়ি জনজাতিরা আদিকাল থেকেই একটু সহজ সরল। তারা জীবন কাটায় পাহাড়ের জুমঘরে, খাদ্য সংগ্রহ করে জঙ্গল থেকেই। কিন্তু তাদেরও চাওয়া-পাওয়ার হিসাব থাকে। কিন্তু শহরের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাদের ফারাক তাকে দিনরাত। তারা শিক্ষার দিক থেকে বঞ্চিত, বিদ্যুৎ নেই, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি উঠে আসে তাদের ঘরে, কিন্তু পরিস্থিতির বদল হয় না। সারা রাজ্যের সাথে পাহাড়েও যখন ভোটের বাজনা বাজে তখন আদিবাসীদের মনের মধ্যে বইতে থাকে আশার চোরা স্রোত। তবে তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা ঘরে তুলে সেই ভোটের ফসল। সাময়িক হলেও সে কিছুটা স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পায়। আর তারাই জুমিয়া জীবন অর্থাৎ পাহাড়ি জীবন ত্যাগ করে ছোট ছোট বাজারে বসবাস করতে থাকে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পাল্লায় পড়ে এরাই পরিণত হয় দালালে। তারা তাদের স্বজাতি যুবকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাদন বিলিয়ে তাদের আওতায় নিয়ে আসে। ভোটের দাদন হিসেবে ভোটের দিন শুকর, মোরগ, চুয়াক অর্থাৎ এক ধরনের দেশীয় নেশা জাতীয় পানীয় তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে। যে যাতে খুশি হত তাকে তাই দেওয়া হত।

রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মধ্যে থেকেই তৈরি করে নেতা। নির্বাচনে জয়ী হলে শিক্ষিত ব্যক্তিকে করা হয় চেয়ারম্যান। এই কৃতজ্ঞতা থেকে নিজেদের বিবেক ও দালালদের স্বার্থে নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়। দাদন বিলি করেও যদি বিরোধীদের হাতে আনতে অক্ষম হয় তাহলে ভোটের আগের দিন রাতে স্পর্শকাতর পাড়ায় শূকর আর চুয়াকের মহাভোজনের আয়োজন করা হয়। যত বিরোধীই হোক না কেন সেই আমন্ত্রণ কেউ উপেক্ষা করতে পারত না। পুরো রাত চলতে থাকে তাদের মহাভোজ। পরের দিন তারা ঘুম থেকে উঠে আর বুথ কেন্দ্রে যেতে পারে না। আর তাতেই ফায়দা তুলে নেয় তাদের মধ্যে থাকা সেই সুবিধাভোগীরা।

কথাকার হারাধন বৈরাগী তার লেখনীতে সামাজিক সেইসব মানুষগুলোকে নিয়েই আলোচনা করেছেন যারা জন্মসূত্রে সামাজিক অবক্ষয়, সামাজিক লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্বীকার। যাদের সহজ সরলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের সুবিধাভোগী

মানুষেরা নিত্যদিন ফায়দা তুলতে ব্যস্ত থাকে। পাহাড়ি আদিবাসীরা শুধুমাত্র দুবেলা দুমুঠ অন্ন আর মাথার উপরের ছাদটুকুর জন্য লড়াই করে আজীবন নিজেদের সাথেই, আর সুবিধাভোগীরা তাদের আশার বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত থাকে।

লেখক হারাধন বৈরাগী বলছেন এই সুবিধাভোগীদের নিয়েই ত্রিপুরার অর্থনৈতিক মানদন্ড বিচার করা হয়। এরা যুবক হয়েও যুবকদের হর্তা কর্তা বিধাতায় পরিণত হয়। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শহরে রেখে পড়াশোনা করাতে থাকে। তারা ধীরে ধীরে গাড়ি বানায়, বাড়ি বানায়, রাবার বাগানের মালিক হয়ে শহর মুখী হয়ে ওঠে। আর একটা বৃহৎ অংশের মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য আগের সেই জুম চাষ প্রথাকেই আঁকড়ে ধরেন। লেখক সম্মান করেন সেই অবহেলিত, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত জুম চাষীদের। তিনি মনে করেন এরাই জঙ্গলের পাহাড়ের পর্বতের প্রাণ। এরাই টিকিয়ে রাখবে লেখকের প্রাণের জঙ্গলকে।

জুমে ফসল ফলে বিচিত্র রকমের। যেমন – ধান, তিল, কার্পাস, মরিচ, কাকলু, খামতা, মামরা, চিনার, চাকুমারা, মাইক্রো, মকই, ধনেপাতা। এই ফসলগুলি তুলেই জুমিয়ারা তাদের বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়। তাদের জীবন এবং জীবিকা নির্বাহের প্রধান রসদই হল জুম চাষ। লেখক আলোচ্য পরিচ্ছেদে বলতে চেয়েছেন যে এই রাজনীতির কারণে আদিবাসীরা আজীবন যেমন বঞ্চিত হয়ে আসছেন আজও তার তেমন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু তারা যেখানে জুম বা জঙ্গলেই টিকে থাকার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে এর জন্যই হয়তো তার অতি প্রাণের স্থান বন জঙ্গল আজও কিছুটা টিকে আছে।

লেখক হারাধন বৈরাগীর রচিত 'হৃদয়ে রাইমা' গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান জুড়ে এভাবেই রয়েছে পাহাড়ের গন্ধ, মাটির গন্ধ, আদিবাসী জনজাতিদের জীবনের নানান বিচিত্র কাহিনী। তিনি তাদের দেখেছেন একেবারে সামনে থেকে, রাত কাটিয়েছেন তাদের ঘরে, আহরণ করেছেন তাদের অতীত ইতিহাস, অতীতে ঘটে যাওয়া নানান কাহিনী, তাদের খাদ্যাভ্যাসের তালিকা, তাদের বেশভূষা, তাদের অলংকার প্রভৃতিকে তিনি তার এই গ্রন্থের আঙিনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

একটি নির্দিষ্ট যাপন কালকে অবলম্বন করে হারাধন বৈরাগী আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে লেখকের ব্যক্তি জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা কাহিনী আর আদিবাসী জীবন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পাহাড়ে বসবাস করা জনজাতি আদিবাসীদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল প্রখর। তিনি তার জীবনের প্রায় বেশিরভাগ সময়টাকেই কাটিয়েছেন সেই জনজাতিদের সঙ্গে। তাদের খাবারের প্রতিও লেখকের লোভ ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি পেশায় শিক্ষক হলেও সাহিত্য সাধনা তাকে পৌঁছে দিয়েছে এক অন্য মাত্রায়। ফলে তার সমগ্র লেখনী জুড়ে দেখা যায় এক অন্যতম সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট। শহুরে বাতাস লেখককে ছুঁতে পারেনি, তিনি তার সাহিত্যে তুলে এনেছেন মানুষের একেবারে ঘরের কথাকে, বন জঙ্গলের পশু পাখিদের কলরবকে। তুলে এনেছেন পাহাড়ি আদিবাসীদের ঘরের উনুন থেকে শুরু করে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক পরিস্থিতি সর্বোপরি তিনি জঙ্গল এবং জঙ্গলে বসবাসকারী জনজাতিদের জীবন কথাকে যেভাবে গ্রন্থের মাঝে তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অনস্বীকার্য।

Reference:

১. বৈরাগী, হারাধন, হৃদয়ে রাইমা, স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৫
২. তদেব, পৃ. ১২
৩. তদেব, পৃ. ১৩
৪. তদেব, পৃ. ১৪
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ২৫
৭. তদেব, পৃ. ২৯
৮. তদেব, পৃ. ২৯
৯. তদেব, পৃ. ২৯
১০. তদেব, পৃ. ৩২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. তদেব, পৃ. ৩৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪
১৪. তদেব, পৃ. ৩৭
১৫. তদেব, পৃ. ৪৪
১৬. তদেব, পৃ. ৪৫
১৭. তদেব, পৃ. ৫৩
১৮. তদেব, পৃ. ৫৪
১৯. তদেব, পৃ. ৫৫
২০. তদেব, পৃ. ৫৬

Bibliography:

বৈরাগী হারাধন, হৃদয়ে রাইমা, স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, জানুয়ারি, ২০২১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 323 - 330
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারীর স্বতন্ত্র স্বর : প্রসঙ্গ কমল চক্রবর্তীর ‘সত্য-ব্রতী’

অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sunimaghosh70@gmail.com
ও
ইমাদুল আলি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : emadulali2013@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Novelist Kamal Chakraborty, Feminism, Satyabati, Satya-Brati, Mahabharata, deconstruct, Feminist.

Abstract
Since, Nineteenth century world literature was introduced to new thoughts and ideology. Bengali literature has also adapted these new ideologies and shaped around it. Beginning with social consciousness to nature consciousness then to feminism. These topics have been incorporated into various Bengali literature. If we solely focused on Bengali fiction, we can find numerous examples. From the works of Bankim, Rabindranath and Sharatchandra to contemporary novelist Kamal Chakraborty has been influenced by those new ideas and there is no end to the curiosity about women in the thought process of a novelist. Focusing on women, K. Chakraborty wrote the novel, Satya-Brati. At its core, Satya-Brati revolves around the life and thoughts of an ancient intellectual woman named Satyabati. Chakraborty portrays her as the world's first feminist who raises her own voice and expresses her thought in her own words. The novel explores how a simple village fisher-woman from Vedic era adapted to that civilization of that time and become a key figure in the Great Epic Mahabharata. Novelist Kamal Chakraborty reconstructs this ancient figure Satyabati with a distinctly feminist perspective. This paper aims to analyse how Kamal Chakraborty deconstruct Feminism in this novel according to the modern world.

Discussion

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বহুল চর্চিত বিষয় হল নারী স্বাধীনতা। আর এই মতবাদকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিশ্বে তৈরি হচ্ছে একাধিক নারীবাদী আন্দোলন। প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নর-নারীর মধ্যেকার যে লিঙ্গ বৈষম্য তারই অবসান এই আন্দোলনগুলির মুখ্য বিষয়। এখানে ‘পিতৃতন্ত্র’ শব্দ দ্বয়ের ‘তন্ত্র’-এর অর্থ করা হয়েছে শাসন, যার সঙ্গে যুক্ত হয় ক্ষমতা। যদি সমগ্র শব্দের আক্ষরিক অর্থ করি তাহলে দাঁড়ায় ‘পিতার শাসন বা পুরুষের শাসন’। স্পষ্টত নারীবাদ পিতৃতন্ত্রের

বিপরীত কোনো তন্ত্র বা নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিতা নয়, তার প্রধান লক্ষ্য পিতৃতন্ত্রের বিনির্মাণ করে তাতে কেবল লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করা বা নারীকে স্থান দেওয়া। প্রসঙ্গত বলতেই হয়, আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য; যেখানে পুরুষ সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে আর নারীরা একই সমাজে বসবাস করে শুধুই বঞ্চিত হচ্ছে। বাধ্য হচ্ছে তারা নিঃস্ব ও অসহায় জীবনযাপন করতে। ফলে তাদের হাল সৌভাগ্যবান পুরুষের বিপরীতে অবস্থিত। সর্বোপরি তারা বিরাজ করে পুরুষের প্রথম স্থানের পরের স্থান দ্বিতীয়তে। তাই তো নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা, দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ কিংবা নাগরিক। এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত অবস্থানকে বিশিষ্ট নারীবাদী ফরাসি মনীষী সাইমন দ্য বেভোর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' বলে চিহ্নিত করেছেন। সমাজে নারীর এই দ্বিতীয় লিঙ্গে বা শ্রেণিতে পরিণত হওয়াই তার উৎপীড়ন-নিপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়াই। এমনকি তারা ধীরে ধীরে গৃহবন্দী রূপে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ার 'Feminism' (ফেমিনিজম) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বাংলায় এই 'Feminism' (ফেমিনিজম) শব্দের প্রতিশব্দ করা হয়েছে নারীবাদ। পশ্চিমা দেশগুলিতেই প্রথম Feminism বা নারীবাদ কেন্দ্রিক তত্ত্বগুলির উদ্ভাবন হয়। আর এই তত্ত্বগুলি ফলপ্রসূ হতে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর একেবারে দ্বিতীয় দশক থেকে। সারাবিশ্ব যখন বিশ্বযুদ্ধের আবহে ত্রাহিত্রাহি করছে তখন আমেরিকাতে একদল সচেতন সুশিক্ষিত নারী 'ন্যাশনাল উইমেনস্ পার্টি' (National Women's Party) গঠন করে ভোটাধিকারের দাবীতে 'হোয়াইট হাউস' (White House) —এর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশের বর্বরোচিত অত্যাচার সত্ত্বেও তারা সেদিন আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলে ফলস্বরূপ তারা পেয়েছে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভোটাধিকার। এইটাই ছিল তাদের তথা নারীবাদের প্রথম সাফল্য। পরবর্তীকালে নারীবাদীরা কেবল ভোটাধিকারের মধ্যে নিজেদের আর সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ তথা অর্থনীতি সর্বত্রই অধিকারের দাবী নিয়ে হাজির হলেন। ফলে নারীবাদ তত্ত্বে সংযুক্ত হয় লিবারাল নারীবাদ তত্ত্ব ও মার্কসীয় নারীবাদ তত্ত্ব। আর তখন থেকেই নারীবাদ জনমানসে একটা জায়গা নিতে শুরু করে। বিশেষ করে মার্কসীয় নারীবাদ তত্ত্ব নারীবাদকে উন্নতির চরম শিখরে উত্তীর্ণ করেছিল। কিন্তু এই দু'টি তত্ত্ব নারীবাদ তত্ত্বকে যতই সমৃদ্ধ করুক না কেন ১৯৬০-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নারীবাদ তত্ত্বের ভাবনাগত কিছু পরিবর্তন দেখা যায়; যা নারীবাদী তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায় রূপে বিবেচিত। এই সময় পর্বে অনেক নারীবাদী বিবাহ, পরিবারকেই নারী শোষণের জন্য দায়ী করেন আবার অনেকে মুক্ত যৌনতার কথা বলেন। এই প্রক্ষিতে নারীবাদ দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়— র‍্যাডিকাল নারীবাদ ও লেজবিয়ান নারীবাদ। মতান্তর কিংবা মতানৈক্যের পর নারীবাদীরা (১৯৭১-১৯৮০) আটের দশকে ফ্রডেয়ীয় মনঃসমীক্ষণের সাহায্য নেন। উদ্ভাবন ঘটে মনঃসমীক্ষণ নারীবাদের। তারা দেখালেন নারী ও পুরুষের লিঙ্গ পরিচিতি যে সম্পূর্ণ মনের তৈরি তার সঙ্গে শারীরিক প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ উত্তর নারীবাদে (Post-Feminist) চিরাচরিত আইডেনটিটিগুলি দুর্বল হতে থাকে। লিঙ্গ ও যৌনতা সম্পর্কে সমাজ জীবনের চিরাচরিত ভাবনাগুলি প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে। এই পর্যায়ের নারীবাদে উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-গঠনবাদ এবং বিনির্মাণমূলক ভাবনারও প্রভাব দেখেতে পাওয়া যায়। তবুও নারীবাদীরা যেন আজও মুক্তির স্বাদ পায়নি। তাই এখন নারীবাদী তাত্ত্বিকদের নিকট বড় প্রশ্ন হয়েছে উঠেছে— তাদের তত্ত্বের ভবিষ্যৎ কী?

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে আমরা নারীবাদের যে পরিচয় দিয়েছি তার ভিত্তি ভূমিতে রয়েছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ। বর্তমান অনুচ্ছেদে প্রাচ্যের তথা ভারত বিশেষ করে বঙ্গে নারীবাদের ভিত্তি কীভাবে প্রস্তুত হল তারই বিবরণ থাকবে। আমরা প্রায় সকলেই অবজ্ঞাত আছি যে— আমাদের দেশ ভারতে নারীরা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধর্মের নিয়মকানুনের দ্বারা দীর্ঘদিন শোষিত হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে নারীবাদ বা ফেমিনিজম তাই নারীকে সমাজের এতদিনের গৃহবন্দী, অসহায়, অপদস্থ থেকে উদ্ধার স্বরূপ এসেছে। নারীবাদ হয়েছে নারী মুক্তি বিষয়ক চিন্তার দর্শন। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে তাদের অর্থাৎ নারীদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং পুরুষের সঙ্গে একাসনে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই এই তাত্ত্বিকের প্রয়াস। ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যেও এর কিছু প্রভাব সূচিত হতে দেখা যাচ্ছে; সেই দিক থেকে কমল চক্রবর্তীর *সত্য-ব্রতী* উপন্যাস তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ঔপন্যাসিক *সত্য-ব্রতী*-র প্রচ্ছদেই ঘোষণা করেছেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
OPEN ACCESS *A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কয়েক হাজার বছর আগে লেখা মহাভারতের অন্যতম চরিত্র সত্যব্রতী। তিনিই পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী। সত্যবতীর জীবন ও ভাবনা নিয়ে এই উপন্যাস সত্য-ব্রতী।"[১]

শারদীয়া এই সময় পত্রিকাতে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সময় ২০১৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১ বৈশাখ ১৪২৮ (২০২১), প্রকাশনী অভিযান পাবলিশার্স। *সত্য-ব্রতী* নারীবাদী উপন্যাস বলেই হয়তো তিনি উপন্যাসটিকে উৎসর্গ করেছেন একজন নারীকে, তিনি শ্রীমতী জয়তী চক্রবর্তী। যার সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "যিনি বনসৃজনকে আমার প্রিয় পথে বিদ্যালয়, চিকিৎসা, পাঠাগার, চাষবাসের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং সম্পূর্ণ নিবেদন করেছেন।"[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই উপন্যাসের আখ্যান *মহাভারত* থেকে গৃহীত। এই *মহাভারত* সম্পর্কে কমল চক্রবর্তী বলেছেন—

> "এই পৃথিবী একবার 'একটি গ্রন্থ' রচনা করেছে। যাবতীয় রমা, রমেশ, লায়লা মজনু, রাধাকৃষ্ণ, দেবদাস, ইন্দ্রনাথ, জয়সিংহ, রোহিণী, নবকুমার, রোমিও জুলিয়েট, আর কী বলছি, সব ওই আকারে। কী একখানা 'অভিধান' হে! পৃথিবীর ইতিহাস, মানুষের, খুবই কয়েকদিনের। তাতে একটা গ্রন্থ ভালোভাবে পড়লেই হয়। অনুসারী, মেঘদূত বা মেঘনাদ কাব্য ভালো! নিশ্চয়ই আমার টেমপেস্ট বা ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট পড়ব! পড়তে হবে, জাঁ ক্রিস্তফ, মাদাম বোভারি, পুতুলনাচ, পঞ্চগ্রাম, আরণ্যক, ঢোঁরাই, ডলস হাউস, থ্রি পেনি অপেরা, ওয়েটিং ফর গোডো, হ্যাঁ ওই গ্রন্থজাত। বাইপ্রোডাক্ট!"[৩]

হায়দ্রাবাদে চোখের হাসপাতালে চোখ দেখাতে গিয়ে মাত্র ১০/১২ দিনে *সত্য-ব্রতী*-র রচনা করেন কমল চক্রবর্তী। *মহাভারত*-এর আখ্যান যেমন পর্বের বিভাজনে গড়ে উঠেছে তেমনই 'পর্ব'-এর উল্লেখ্য আছে *সত্য-ব্রতী*-র আখ্যানেও। সর্বমোট এগারোটি পর্ব ('আদি পর্ব', 'লোল পর্ব', 'বসু পর্ব', 'নির্জন পর্ব', 'ধ্বংস পর্ব', 'মদন পর্ব', 'অন্ধকার পর্ব', 'সিংহাসন পর্ব', 'অস্ত পর্ব', 'শূন্য পর্ব', 'শ্মশান পর্ব') এতে রয়েছে। এখানে পর্বের উল্লেখ থাকলেও মহাভারতের বিশালতা নেই, কাহিনির পরিসমাপ্তিতে ঔপন্যাসিক খরচ করেছেন মাত্র ৮৬ পৃষ্ঠা। *সত্য-ব্রতী* আখ্যানের মূল কেন্দ্রে রয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত *মহাভারত* প্রধান মহীয়সী সত্যবতী।

কমল চক্রবর্তী বহির্বঙ্গের শহর জামশেদপুর থেকে প্রকাশিত *কৌরব* লিটল ম্যাগাজিনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কবি তথা গদ্যকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আমাদের মনে ঈর্ষা জাগায়। শক্তি, সাধন, সুনীল প্রমুখরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো কমল চরিত্রকে স্মরণীয় করেছেন *মহাজীবন* উপন্যাসের মাধ্যমে। তাছাড়া সুবোধ সরকার লিখেছেন—

> "একদিন আমি তাঁকে কফি হাউসের যুবরাজ হিসেবে দেখেছি। একদিন আমি তাঁকে পার্ক স্ট্রিট শাসন করতে দেখেছি। একদিন আমি তাঁকে সন্দীপন শক্তি সুনীলের সঙ্গে চাঁদ ধরতে দেখেছি।"[৪]

এই ব্যক্তিত্বের আরও একটি বিশেষ দিক তিনি ব্যতিক্রমী সমাজসেবী। অরণ্যের সেবা থেকে শুরু আদিবাসীর পরিচর্যায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পূজিত দেবতা 'বৃক্ষনাথ'। তিনি নিজেকে 'ফরেস্টার' নামে পরিচিত করাতে ভালোবাসেন। তাই তাঁর অসংখ্য রচনায় অরণ্য চিত্রমালার ভূমিকায় অবতীর্ণ। বৃষ্টিহীন ভূমির দগ্ধ কংকাল, আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপন, ডাইনির সন্ধান। ইঁদুর ও সাপের মাংস পুড়িয়ে নুন মেখে খাওয়ার বর্ণনার পাশে সংস্কৃতি-গৌরবী সভ্যতার বিরোধিভাসী প্রতিন্যাস।[৫] জীবনের বস্তুনিষ্ঠ ছবি যেন তাঁর রচনায় সমান্তরাল এগিয়ে চলেছে তাতে কোন অতিরঞ্জিত করার চেষ্টাও নেই। এই জাতীয় রচনার সঙ্গে ছয়ের দশকের বাঙালি পাঠককূল একেবারেই অপরিচিত ছিল কিন্তু সাতের দশকে কিছু কিছু শিল্পীর রচনায় তার নমুনা পাওয়া যায়। যাঁর মুখ্য রচয়িতা আমাদের কমল চক্রবর্তী। পত্রিকার প্রয়োজনে কমল চক্রবর্তীর গদ্য বা উপন্যাসের চর্চা। *আমার পাপ* উপন্যাস দিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে তাঁর উপন্যাস সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনচল্লিশটি। সর্বশেষ উপন্যাস *মেঘলা টেবিল*, বোধন শারদীয়া ১৪৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

আমরা জানি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত *মহাভারত-এর* আদিপর্ব, শান্তিপর্ব ও অশ্বমেধ পর্বে সত্যবতীর প্রসঙ্গ আছে। আদি পর্বের কাহিনিতে সত্যবতীর জন্মকথা, রাজা শান্তনুকে বিবাহ করে সত্যবতীর রাজরানি হওয়া, ভীষ্মের আজীবন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রহ্মচারীর শপথ; আর শান্তিপর্বে সত্যবতীর জীবনের খণ্ডচিত্রসহ শান্তনু ও ভীষ্মের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা এবং অশ্বমেধ পর্বে রয়েছে সত্যবতীর বংশধরদের প্রসঙ্গ। কমল চক্রবর্তী এই পর্বগুলির কাব্য-কাহিনিকে *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। প্রাচীন এই কাব্য-কাহিনিকে উপন্যাসের রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। প্রথমত তিনি এই ধ্রুপদী সাহিত্যের বিনির্মাণ করেছেন আধুনিক সময়ের আলোকে। *সত্য-ব্রতী-তে মহাভারত-এর* পটভূমি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক দিকের বিশ্লেষণ থাকলেও নারীবাদ অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। ঔপন্যাসিকের দীর্ঘ দিনের *মহাভারত*-এর পাঠ *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসের কাহিনি রচনাতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর কাছে *মহাভারত* নব নব রূপে উন্মোচিত—

> "ছোটোবেলায় যখন পড়া তখন, কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ। যৌবনে, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব। প্রৌঢ়ে, কৃষ্ণপ্রেম এবং ধর্মের জয়! আদতে একটি ধর্মগ্রন্থ। ...আসলে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ, এক আশ্চর্য নির্মাণ!"[৬]

হয়তো *মহাভারত*-এর প্রথম পর্বের নাম অনুসারে তিনিও *সত্য-ব্রতী*-র প্রথম পরিচ্ছেদের নাম করেছেন 'আদিপর্ব' আর বাকি দশটি পর্বের নাম তাঁর কল্পনাপ্রসূত। *মহাভারত*-এর আদিপর্বের কাহিনি আর উপন্যাসের আদিপর্বের কাহিনিতে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে যে ধীবরপাড়ার কর্মব্যস্ততা, শান্তনুর স্ত্রী-বিরহ ও তার নিজ রূপের বর্ণনা, মীন উৎসবের যে চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন *মহাভারত*-এ তা অনুপস্থিত। এছাড়া এই পর্বে আরও এমন অনেক বিষয়কে ঔপন্যাসিক আনয়ন করেছেন যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত *মহাভারত-এ* নেই। পাঠকের কাছে এই পর্বের পাঠ কেবলই নায়ক-নায়িকার পরিচিত পর্ব বলে পরিগণিত হবে। কমল চক্রবর্তী নারীবাদের কথা এই পর্বে নেই। বরঞ্চ তিনি বেশ কিছু সমাজ প্রচলিত নারী বিদ্বেষের কথাকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন, -

> ১. বয়স্করা রাজা শান্তনুকে বিয়ে করার প্রসঙ্গে বলেছেন—
> "শান্তনু! সোনার আংটি বাঁকা হয় না। ভাগ্যবানের বউ মরে। তুমি আবার বিয়ে করো।"[৭]
> ২. রাজা শান্তনুকে গঙ্গার ছেড়ে যাওয়ায় গঙ্গাকে সমাজ —
> "...যত্তসব অলবট্টে, দুষ্টু! বউ, না মাছের কাঁটা!"[৮] বলে সম্বোধন করেছেন।

কমল চক্রবর্তী *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম করেছেন 'লোল পর্ব'। 'লোল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হল অস্থির, চঞ্চল, লোভী বা কামুক। কমল চক্রবর্তী এই উপন্যাসে লোল শব্দটির ব্যবহার করেছেন কামুক অর্থে। এই পর্বে ঋষি পরাশরের কামুকতার সঙ্গে নারীবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যবতী, জয়শীলা ও ভদ্রার কথোপকথনে নারীবাদী ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যবতী জয়শীলাকে নির্দ্বিধায় বলেছেন—

> "জানিস তো পুরুষ মানুষ আমার অপছন্দ। পুরুষদের অনেক খুঁতখুঁতানি। অনেক চাহিদা। মেয়েরা, চাকর। মেয়েদের ব্যবহার করো আর ছুড়ে দাও। ...পুরুষের স্বভাব, কস্তুরী মাখো, রেণু মাখো, চন্দন মাখো। কানে দুল, নাকে ফুল, গলায় হার। তারপরও বলবে, হল না। পান্তির মতো হয়নি, কাঞ্চির মতো পারো না। আমি কোনো দিনও বিয়ে করব না। পুরুষদের ঘৃণা করব, শেষ করব। দেখিস। পায়ে, ঢেলায় আঘাত! ...বুঝিয়ে ছাড়ব, পুরুষ কত কাঙাল, ভিখিরি, পৃথিবীর অযোগ্য সন্তান। নারী শ্রেষ্ঠ।"[৯]

এমনকি গভীর তপস্যার জন্য নারী থেকে হাজার হাত দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও সত্যবতীর সৌন্দর্যে ঋষি পরাশর মোহিত হয়েছে। তিনি জানেন - "নারী গমনে, যাবতীয় সাধনা, সৃজন, ঈশ্বর-মিলন, নষ্ট, ভ্রষ্ট"[১০] হয়। তবুও সত্যবতীর নশ্বর শরীরে পরাশর বিভোর হয়ে বংশধর চায়। হাজার বছরের পুণ্যকে সত্যবতীর শরীরে আহুতি দিয়ে পরাশর তাতে কাছে পাওয়ার আবেদন জানালে সত্যবতী বলেন—

> "পুরুষেরা এক-একজন ভণ্ড, শঠ, প্রতারক, নষ্ট, ক্লেদ।... —ছিঃ! আমি পুরুষ সমাজ ঘৃণা করি। আমাকে ছোঁবেন না! পা ছাড়ুন, ছিঃ! যদিও উপরিচর বসু আমার পিতা, ...কুৎসিত, কামুক, নষ্ট পুরুষপিতা, যিনি পুত্রসন্তানকে গ্রহণ করেছেন। কন্যা হওয়ার কারণে আমাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছেন। বড়ো হয়ে জানতে পেরে, ওই পুরুষজাতি আমার শত্রু!... পুরুষপ্রধান সমাজ আমি ছিন্নভিন্ন করে, ধ্বংস করব।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> একা, এই হীন, চক্রান্তকারী, কামুক, লোভী, পরস্বাপহারিণী পুরুষকে সারমেয় তুল্য করে ছাড়ব, আমি সত্যবতী।”[১১]

এসব বলা সত্ত্বেও সত্যবতী শেষপর্যন্ত পরাশরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণের মূল্যে মৎস্যগন্ধা নাম ঘুচে গিয়ে হয়েছে যোজনগন্ধা, জন্ম দিয়েছেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের দ্বৈপায়নের তবুও তার কুমারীত্ব, সতীত্ব অটুট। আর এই দ্বৈপায়নই *মহাভারত*-এর রচয়িতা; নারীত্বের শ্রেষ্ঠ উপহার বা উপচার। দ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই দ্বৈপায়ন নাম হয়। বিদায়লগ্নে ঔপন্যাসিক পরাশরকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তা নারীবাদী ভাবনারই প্রকাশ করে—

> “শোনো, সত্যবতী একটা কথা বলছি। প্রভু নয়, ঋষি নয়, নাথ নয়, তুমি আমাকে একবার পরাশর নামে ডাকো। ...নারীবাদী রমণীর চোখে চোখ।”[১২]

—বর্তমান সমাজ এখনও একজন নারী একজন পুরুষকে নাম ধরে ডাকবে এটা ভালো চোখে দেখে না। কিন্তু কমল চক্রবর্তী সমাজ প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

সত্য-ব্রতী উপন্যাসের ‘বসু পর্ব’-এ সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্তের একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত কৌতূহলজনক হলেও সমগ্র *মহাভারত* তথা উক্ত উপন্যাসে এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু কমল চক্রবর্তীর *সত্য-ব্রতী* সেহেতু এখানে মহাভারত-এ জন্মবৃত্তান্তের তাৎপর্য যে কী সেটা উহ্য থাকবে। ঔপন্যাসিকের সাবলীল বর্ণনায় মহারাজা বসু তথা উপরিচর বসু–গিরিকা, অপ্সরা অদ্রিকা মতো চরিত্ররা মহাভারতের গুরুগম্ভীর পরিবেশ থেকে যেন মুক্তি পেয়েছে। তাদের সংলাপ সমসাময়িক যুগের সাধারণ নর-নারীর সংলাপ। ঋতুস্নান গিরিকা সন্তান কামনায় প্রস্তুত কতক্ষণে উপরিচর আসবেন এবং মিলন হবে, সার্থক হবে তার নারী জন্ম কিন্তু সে জানেনেই না ভাগ্যের পরিহাস; যে ইহজন্মে তার মা হওয়ার আশা পূর্ণ হবে না। অন্যদিকে মিলনে উৎকণ্ঠিত উপরিচরে পিতৃলোকের নির্দেশে মিলন অসমাপ্ত করে মৃগয়ায় যেতে হয়। এই অসমাপ্ত মিলন ঔপন্যাসিক মেনে নিতে পারেননি; গিরিকার হয়ে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন তা তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করে—

> “রাজপ্রাসাদে, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, নির্যাতিত, কামনায় ছারখার, অপমানিত শরীর, গিরিবালা! নারী-জন্মের দুর্মর অভিশাপ! কেন রাজা, এই রভসপ্রত্যাশীকে প্রত্যাখান! কেন মৃগয়া! আজই, চরম লগ্নে। ছিঃ। না, আদতে উপরিচর, গিরিবালার প্রতি উপগত। ...নারীর মর্যাদা, পুনর্বার লঙ্ঘিত ও অবহেলিত! সেই ‘পুরুষ’! এবার প্রত্যক্ষ নয়, পূর্ব।”[১৩]

অপরপক্ষে মৃগয়ায় গিয়ে যৌনকাতর উপরিচরের মানস-সংগমের ফলে বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য গিরিকার প্রাপ্য ভেবে এক শ্যেনপক্ষীকে বীর্য প্রেরক রূপে নিয়োগ করে উপরিচর কিন্তু নিয়োজিত শ্যেনপক্ষী আর এক শেন্যপক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় বীর্য গিরিকার কাছে পৌঁছায় না। শালপাতায় আবৃত মূল্যবান বীর্য যমুনার জলে পতিত হয়। শাপভ্রষ্ট অপ্সরা অদ্রিকা উপরিচরের বীর্য গিলে দশ মাস দশ দিন পর যমজ সন্তানের জন্ম দেয়। এই যমজ সন্তানের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র সন্তানকে উপরিচর গ্রহণ করলেও কন্যা সন্তানকে দাস ধীরবকে প্রাপ্তি স্বরূপ দেওয়া হয়। এই প্রাপ্তির কারণ ধীবরের জালে অপ্সরা অদ্রিকার ধরা পড়া। অদ্রিকাকে ইন্দ্র বলেছিলেন তোমার গর্ভ থেকে মানবশিশু জন্মালেই তোমার শাপমোচন হবে এই বলা আমাদের আপেক্ষিক মনে হলেও ঔপন্যাসিকের কাছে তা নারীমুক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন। এই নারীমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> “ঈশ্বর, নারীকে যেমন শারীরিক শক্তিতে কিছু ঘাটতি, তেমন এক অপার সুধা, মূর্ছনা, মর্মবাণী, অফুরন্ত লোধ্ররেণু, অধরা মাধুরী, আকুল পরান, আপ্লুতলাবণ্য দিয়েছেন। ...ঈশ্বর ইচ্ছে করে নারীর ছলায়, কলায়, মোহজাল, রং, রোশনাইয়ে এমন একটা প্রতিরোধ, যে মানুষ, ছিঁড়ে ঢুকতে পারে না। যাঁরা পারেন, তাঁরাই, ভুবনজয়ী। শুধু নারীকে মুঠো করতে পারলেই ভুবন নয়। নারীকে বুঝতে পারলেই, অমৃত। যাঁরা, যেসব মহাপুরুষ, দার্শনিক বলেছিলেন, নারী নরকের দ্বার, তাঁরা অসুস্থ। নারীকে ভোগ্যপণ্য, ভেবেছেন! ঠিকঠাক সফল যৌনতা না হওয়ায়, ওই দুঃস্থ ভাবনা। ভয়ে নয়, কামনায় নয়, লোভে নয়, আনন্দে, আহ্লাদে, চামুণ্ডা, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কোনো সেরা দার্শনিকের।”[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এমনকি এই পর্বে অদ্রিকার কণ্ঠেও নারীবাদী স্বর উচ্চারিত হয়েছে। উপরিচর যখন কন্যা সন্তান বলে সত্যবতীকে রাজপ্রসাদে তুলেনি তখন অদ্রিকা আহত হয়েছে। বেদনার্ত হয়ে অদ্রিকা তাই রাজা উপরিচরকে বলতে পেরেছেন—

> "এ অন্যায়। কন্যাসমাজের অপমান! হায় দুস্থ পুরুষ। রাজা হয়েও এ তোমার কী অসুস্থ প্রস্তাব।"[১৫]

'নির্জন পর্ব' ও 'ধ্বংস পর্ব' দু'টিতে ঔপন্যাসিকের নারীবাদী ভাবনার চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে। 'নির্জন পর্ব'-এ দেখা যায়, সত্যবতী পরাশর সংগমে আনন্দিত, গর্বিত। কিন্তু উপরিচরের প্রত্যাখ্যান সত্যবতীকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছে। কিছুতেই সে মেনে নিতে পারেনি–এক মায়ের আরেক সন্তান সহোদর রাজ আর সে কীভাবে সাধারণ জেলেনি? সহোদর রাজার বিরুদ্ধে নেই কোন অভিযোগ। তাকে কেউ বলে না — "রাজার গায়ে গন্ধ /রাজা ভারি মন্দ"[১৬] বরঞ্চ তাকে সবাই সমীহ করে। অন্যদিকে সত্যবতীকে দেখলে যুবকরা বলে - "ওই আসছে আঁশচুবড়ি।"[১৭] এই আঁশচুবড়ির জন্য কে দায়ী উপরিচর, প্রেতলোক, গিরিকা, শ্যেনপক্ষী, ব্রহ্মশাপ না-কি অপ্সরা অদ্রিকা। সত্যবতী কিন্তু সব সমস্যার জন্য পিতা উপরিচরকে দায়ী করেন। তাই পিতার প্রতি তার বিদ্বেষ স্বর ধ্বনিত হয়েছে যা নারীবাদী স্বরের সমগোত্রীয়—

> "কে পিতা? জন্ম দিলেই পিতা! আমি মানি না! ঘৃণা করি! পিতা নয়, সমাজের শত্রু! কলঙ্ক! পিতা নয়, রাক্ষস। যে নিজের রক্তের কন্যাকে প্রথম দিনেই আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে, সে পিতা! না, পিশাচ।"[১৮]

সত্যবতীর উপরিউক্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুধু পিতার প্রতি লক্ষিত হয়েছে তা নয়, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ঋষি পরাশরের নিকটেও সমভাবে প্রকটিত। বিদায়লগ্নে পরাশরের প্রতি সত্যবতী সম্ভাষণ—

> "তোমার বীর্য আমার গর্ভে? তাই তো? ভুলে যাবে না তো? বলো পুরুষ, ভুলে যাওয়া তোমাদের চরিত্র। কোথায়, কখন বীর্যস্থলন করো, মনে থাকে না!"[১৯]

'নির্জন পর্ব'-এ ঔপন্যাসিক নারীবাদ ভাবনা ছাড়াও সত্যবতীর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সৌন্দর্য স্বর্গের অপ্সরাদের হার মানাবে। কিন্তু ঔপন্যাসিক 'ধ্বংস পর্ব'-এর বিষয়কে দ্ব্যর্থক করে প্রকাশ করেছেন। এখানে রাজা শান্তনুর কামে ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে নারী স্বরও মূখ্য হয়েছে। সত্যবতী বয়স্যা বা সহচরীদের (সুললিতা ও অনুমিতা) বলেছেন—

> "সোনার আংটি বাঁকা হয় না। ঋষি নারীসঙ্গ করেও ফের ঋষি। আর আমরা পুরুষ-সঙ্গ করা মাত্র ধর্মচ্যুত, অসতী, কলঙ্কিনী, কুলটা। এই হল পুরুষ সমাজে নারীর মূল্যায়ন।"[২০]

অনুরূপ স্বরের প্রকাশ ঔপন্যাসিক কমল চক্রবর্তীও করেছেন—

> "নারী, যৌনতার পর অপ্রয়োজনীয়। নারী, শরীরের পর বিদায়। নারীর, একাধিক পুরুষসঙ্গ করার অধিকার নেই। নারী, সর্বদা পুরুষের আশ্রিতা। পরাধীন।...নারীর নিজস্ব কোনো প্রতিভা নেই, সন্ন্যাস নেই, ঋষিত্ব নেই। পুরুষের শিল্প, সৃজন, নির্মাণের হলুদ গুঁড়ো। যা দিলে রান্না রঙিন হয় মাত্র। হলদে। স্বাদে, তারতম্য হয় না।"[২১]

'মদন পর্ব' *সত্য-ব্রতী* উপন্যাসের সর্ববৃহৎ পর্ব বা পরিচ্ছেদ। পর্বটি সংলাপের আকারে রচিত হয়েছে। সংলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে সত্যবতী ও রাজা শান্তনু; আর সহ সংলাপকারিণীর ভূমিকায় দেখা যায় দাস ধীবর ছাড়া সুললিতা, মধুলিকা, অনুমিতা ও ভদ্রা নামক সহচারিণীদের। পঞ্চ নারীর কণ্ঠের দ্বারা নির্মিত এই পর্বে ঔপন্যাসিক পুরুষশাসিত সমাজকে এক প্রকার তুলোধোনা করেছেন। মেয়েরা যে পুরুষের ভোগ্যপণ্য ও অবসার বিনোদনের উপাদান নয় একথা ভদ্রা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে। রাজা শান্তনু পুষ্পের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যমুনাতীর আসে। তিনি জানেন না এই অদ্ভুত সুগন্ধ পুষ্প কিংবা পুষ্পবৃক্ষের নয় সত্যবতীর। রাজার এই হন্যে হয়ে পুষ্পের ঘ্রাণ সন্ধানকে সখীরা পুরুষের 'ঘ্রাণ-রোগ' বলে সম্বোধন করেছে। অবশেষে রাজা শান্তনু তিনদিন পর যখন ঘ্রাণের বা সত্যবতীর সন্ধান পেয়েছে তখন সত্যবতী কর্মব্যস্ততার অছিলায় রাজাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। শান্তনু ভাবতে পারেননি এ দেশে এমন কোন নারী আছে যাকে এতটা অনুরোধ করতে হবে সহধর্মিণী রূপে পাওয়ার জন্য। ভাবতে পারেননি যে সত্যবতী তার বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবে। এমনকি রাজার উপঢৌকনাদিকে সত্যবতী সাগ্রহে গ্রহণও করেননি। বাড়ি ফিরে সত্যবতী পালক পিতা দাস রাজকে বলেছেন—

> "রাজা শান্তনু আজ এসেছিলেন। প্রাসাদে নিয়ে যাবেন। বিয়ে করবেন। কাল হয়তো আপনাদের কাছে আসবেন। স্পষ্ট বলে দেবেন, হবে না। আমি বিয়ে করব না। বিয়ে করে সারা জীবন দাসী হতে পারব

> না। পিতা আমি স্বাধীন। নদীর মতো, আকাশ, দখিনার মতো। পিতা আমাকে বিয়ে দেবেন না! ...আর যদি জানতাম ওর ছেলেপুলে নেই, অকৃতদার, সে এক কথা! ওর, এক যোগ্য ছেলে, বড়ো। দেবব্রত। রাজা সে-ই হবে। আমার ছেলেরা তার মাথায় চামর দোলাবে। ফলে এই বিয়ে হবে না। বলে দেবে, হবে না।"[২২]

প্রত্যুত্তরে পিতা ধীবর বলেছেন—

> "আচ্ছা, আচ্ছা আমি বলব, যদি সত্যবতীর ছেলে রাজসিংহাসনে বসে, দেবব্রত বঞ্চিত হয়, তবেই ভাবা যাবে। নতুবা মেয়ে অনড়। দুঃখিত, মহারাজাধিরাজ! এই তো কথার মতো কথা!"[২৩]

কথামতো রাজা শান্তনুকে সত্যবতীর দেওয়া এই শর্ত নারী অধিকার বা সচেতনতার চরম প্রকাশ হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের কাহিনির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো 'অন্ধকার পর্ব', 'সিংহাসন পর্ব', 'অস্ত পর্ব', 'শূন্য পর্ব' ও 'শ্মশান পর্ব' নামক পর্বের সৃষ্টি করেছেন। পর্বগুলিতে সত্যবতীর শর্তকে মান্যতা দেওয়া, সত্যবতীর প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া থেকে দেবব্রত'র আজীবন ব্রহ্মচারী থাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। 'শূন্য পর্ব'-এ শান্তনুর বৃদ্ধ হওয়া থেকে দ্বিতীয় সন্তানের পিতা এমনকি সত্যবতীর মাতা অপ্সরার জন্মবৃত্তান্তের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসের শেষপর্ব অর্থাৎ 'শ্মশানপর্ব'-এ হাহাকার শোনা গেলেও সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিক সত্যবতীকে দৃঢ়-বলিষ্ঠ চরিত্র রূপে উপস্থাপন করতে সফল হয়েছেন। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য সামাজিক বৈষম্যকে দেখানো নয় বরং এসবের ঊর্ধ্বে উঠে নারীর নিজস্ব সত্তাকেই প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য। বর্তমান নারীর আত্মমর্যাদা, স্বাধীন চিন্তা এবং সর্বোপরি নারীর নারী রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে অদম্য আকাঙ্খা তা তিনি ব্যক্ত করেছেন সত্যবতী এবং অন্যান্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আর এখানেই *সত্য-ব্রতী* উপন্যাস পাঠের সার্থকতা।

Reference:

১. চক্রবর্তী, কমল, *সত্য-ব্রতী,* অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৪২৮, কলকাতা-০৯, পৃ. ব্যাক কভার
২. প্রাগুক্ত, পৃ. উৎসর্গ পত্র
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৪. চক্রবর্তী, মানস, *আর্যপত্র* (বইমেলা ২০২০) কমল চক্রবর্তী ৭৫ সম্মাননা সংখ্যা, সি ৪০৪, ভি আই পি এনক্লেভ, কলকাতা-৫৯, পৃ. ২০১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৬. চক্রবর্তী, কমল, *সত্য-ব্রতী,* অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৪২৮, কলকাতা-০৯, পৃ. ৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৮
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 330
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 331 - 339
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রফুল্ল রায়ের ‘যুদ্ধযাত্রা’ উপন্যাস : সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ ও নিম্নবর্গীয় চেতনা

পল্লবী ঘোষ
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
তিলকামাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার
Email ID : pallabighosh1741995@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Subaltern, Socio Economic Condition, Human consciousness, Aristocracy, Exploitation, Helplessness, Poverty, Human Right.

Abstract
Our society is divided into several strata. The people at the bottom of the social inequality of economic and racial high-low, strong-weak are identified as the 'lower class.' For a long time, the lower class of society has been trampled by the upper class. Even though the elites represent themselves as compassionate representatives of the people in the workplace, they become violent and cruel when their interests are harmed. Inspired by Sarvodaya leader Vinobaji, in the 'Bhumidaan Yagya', landowners donated their fallen, barren lands to the homeless and destitute people of the lower classes in the hope of gaining merit and fame. When that land became fruitful due to the hard work of the untouchables, feudal lords came forward with their claim to ownership. They committed unspeakable atrocities to helpless people. They started harvesting the crops of the land under the supervision of their own soldiers and land soldiers. When the poor resisted, they unhesitatingly used machetes to shoot and kill 18 poor farmers indiscriminately in the presence of the police, and 11 women were gangraped and forced to die. Again, they are proven innocent to the end through the power of empowerment. They are eager to present themselves as great to the public by handing over the police their hired wrestlers. Despite realizing the harsh social reality of the manipulations of the feudal lords, lower-class people are forced to remain silent in the face of fear and helplessness of poverty. However, inspired by compassionate, selfless people like Rakesh, Devarati, and freedom fighters, who have compassion for the lower class, they realize their human rights. Conquering fear and helplessness a humane spirit begins to awaken in them. Overcoming all obstacles, they come forward in the fight for justice and accelerate the progress of civilization. Based on novelist Prafulla Roy's novel 'Juddha Yatra', this article will discuss the harsh reality behind the scenes of the social system and the awakening of the human spirit of fighting for the rights of the lower-class people.

Discussion

পরিবার ছাড়িয়ে মানুষ তার পারস্পরিক প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে সমাজ। প্রাত্যহিক জীবনে সমাজের আনুগত্য মেনে চলায় অবশ্যকর্তব্য বলে সামাজিক মানদণ্ডে সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের এই সমাজ পরিকাঠামোর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে বৃহৎ-ক্ষুদ্র, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ। বাস্তবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব। আর্থিক ও জাতিগত ক্ষমতার শীর্ষে থাকা মানুষের কাছে ক্ষমতা ও মর্যাদা এককেন্দ্রীভূত হয়েছে। রক্ত মাংসের শরীরে এক হয়েও সামাজিক বৈষম্যের রূপভেদে সমাজ নামক মানদণ্ডে নীচের সারিতে অবহেলিত, শোষিত মানুষদের চিহ্নিত করা হয় 'নিম্নবর্গীয়' নামে। এই 'সাবলর্টান' শ্রেণীর বিপরীতে অবস্থিত বুর্জোয়াশ্রেণি, শুধুমাত্র সমাজ পরিকাঠামোর শীর্ষে থেকে তারা প্রভুত্বই ফলায় না, সঙ্গে সঙ্গে নিজ কর্তৃত্বে সমাজকে এমনভাবে গাইড করে যাতে 'সাবলর্টান' শ্রেণী শোষিত হয়েও বুর্জোয়াশ্রেণীর কতৃর্ত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ইতালীয় দার্শনিক আন্তেনীয় গ্রামশীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী-

> "বুর্জোয়া শ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই, প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেগেমনি'। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'হেগেমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি 'সাবলর্টান' শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়।"[১]

সমাজের বৃহৎশক্তির ক্ষমতার কাছে নিজেদের পরাভবকে মেনে নিয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীরব থাকলেও, মাত্রাতিরিক্ত বঞ্চনা, শোষণের শিকারে তারা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর শাসকরা শাসনের নামে নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার, বলপ্রয়োগ ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে নিম্নশ্রেণীর জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। সবলের চাতুরির কাছে হেরে যায় সাধারণ মানুষ। তাদের পাতা ফাঁদের অমোঘ টানে বন্দী হতে হতে হারিয়ে ফেলে নিজের স্বাধীন ব্যক্তিগত চিরন্তন সত্তাকে। সমাজের প্রতিভূশ্রেণী আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য খেয়ালখুশি মতো সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। মানুষ যখন থেকে তার যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে শুরু করেছে তখন থেকেই সামাজিক বৈষম্যের সূত্রপাত। স্বাধীনোত্তর কালেও তা বিরাজমান। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পাতায় সর্বসাধারণের সমতার কথা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীতমুখী ক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই। তবে দুর্বলের প্রতি সবলের আগ্রাসী মনোভাবের প্রভাবে দুর্বলরা যে সবসময় চুপ থেকেছে এমন নয়, অপরিসীম লাঞ্ছনায় হৃতসর্বস্ব অসহায় মানুষগুলি নিজেদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাহসে ভর করে নিজেদের দাবিগুলো পূরণের জন্য সচ্চোর হয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিয়েছি নিজেদের প্রাপ্য। কখনো একক প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দুর্বলের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তির জয়গান ঘোষণা করে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক অবস্থানকে কয়েক গুণ ত্বরান্বিত করেছে। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে সামাজিক ভেদাভেদের বাস্তবিক চিত্র সংবেদনশীল লেখকহৃদয়কে শুধু মর্মাহত করেছে এমনই নয়, তাদের লেখনীতে তা পেয়েছে ভিন্নমাত্রা। সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা, অধিকার পাবার লড়াইয়ের পরিশীলিত দ্বান্দ্বিক রূপ, সাহিত্যকে করে তুলেছে ঐশ্বর্যমন্ডিত।

বাংলা সাহিত্যচর্চার শুরু থেকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের চালচিত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সাহিত্যের পাতায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এর ধর্মীয় তথ্যের পরিবেশনে রূপকের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে নিম্নশ্রেণীর সমাজ জীবনের বাস্তবতা। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, লোককথা, আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সমস্ত লেখকের লেখনীতেই উঠে এসেছে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা, দৈনতা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, লড়াইয়ের ইতিহাস। যুগে যুগে যারা দিয়ে গেল, পেল না কিছুই। সমাজের সেই বৃহত্তর কান্ডারীকে অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য তো সমাজ বাস্তবতারই আরেক রূপ। নিম্নশ্রেণীর চর্চার ইতিহাস তাই সুদূরপ্রসারী। এই চর্চার এক সাহিত্যপ্রতীম ব্যক্তি প্রফুল্ল রায়। তিনি তাঁর বোহেনিয়াম জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর তার এই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের শৈল্পিক পরিসরে তুলে ধরে বাংলা সাহিত্যে যোজন করেছে এক অনবদ্য রূপ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূর্ববাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ১৯৩৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নদীমাতৃক পূর্ববাংলা শস্য-শ্যামল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার ঐশ্বর্য থেকে ছিন্নমূল হয়ে পঞ্চাশের দশকে ভারতে এসে উপলব্ধি করেন জীবনের এক কঠিন বাস্তবরূপ। ভারতে এসে উত্তর বিহারের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতায়নের একাধিপত্য। উপন্যাস সংকলন 'মানবজীবন' গ্রন্থের 'লেখকের কথা'তে প্রফুল্ল রায় বলেছেন –

> "বৃহৎ জমিদারেরা প্রদেশটি শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর ভাগ জমি দখল করে রেখেছে। এমনও দেখেছি এক রেল স্টেশন থেকে আর এক রেল স্টেশনের মাঝখানের সমস্ত শস্যক্ষেত্রের মালিক একটি মাত্র উচ্চবর্ণের পরিবার-- হয় ব্রাহ্মণ, নতুবা কায়াত কি রাজপুত ক্ষত্রিয়। বাকি বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশরই এক 'ধুর'ও জমি নেই।"[২]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের এই দুরবস্থা দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। ভারতের অন্তর্ভুক্ত উত্তর বিহারের এই প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে তখনও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মিথ্যা ঋণের জালে জড়িয়ে বংশ পরম্পরায় বেগার খাটানো, শ্রমিক শ্রেণীর উপর নির্মম অত্যাচার, জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষের পদদলিত করার চিত্র। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের পতন হলেও নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাদের গতানুগতিক চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি সহজে। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার এই উপলব্ধি জাগরণে নিম্নশ্রেণীর মানুষের অনেকটা সময় কেটে যায়। স্বাধীনতার নামে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতার হাত বদল হয় মাত্র। ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেলেও জাতিগত, অর্থগত, রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাতবর্গের কাছে পদদলিত হতে থাকে নিম্নশ্রেণী। স্বাধীনতা আসে, শোষণ কমে না। শুধুমাত্র তার রূপ বদল হয়। স্বাধীনতা বিষয়টির যথার্থ মর্মার্থ কি? চিরশোষিত মানুষদের কাছে এই সত্যের যথার্থতা চিরকাল অধরাই থেকে যায়। শোষণের এই রূপ বদল যুগে যুগে অব্যাহত, শুধুমাত্র নামকরণের ভিন্নতায় সাধারণ মানুষ হয় বিব্রত। সমাজ বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক পটভূমিকে সত্যসন্ধানী লেখক গভীরভাবে অনুধাবন করে। সত্য-মিথ্যা বেড়াজালকে স্পষ্ট করে সাহিত্যকে করে তোলে সমাজের দর্পন। যে দর্পণে মানুষ নিজ স্বরূপকে দর্শন করে। আপাতদৃষ্টির আড়ালে বাস্তবকে জানতে, কল্পনা ও রূপকের অন্তরালে প্রকৃত সত্যের উদঘাটনে, চেতনার বিনির্মাণে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক রাজনৈতিক জটিলতায় মানুষের জীবনের গতিধারাগুলি যখন দ্রুততই বাক নিচ্ছিল, তখন দেশভাগের প্রভাবে ছিন্নমূল সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় বিহারের প্রত্যন্ত এলাকায় ঠাই পেয়ে সামন্তশ্রেণীর আধিপত্যের বর্বর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সঙ্গে সেখানকার প্রান্তিকবর্গের মানুষের 'টিকে থাকা'র লড়াইয়ের বাস্তবরূপ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তারই প্রভাব পড়েছে আশির দশকের লেখা রচনাগুলিতে। বিশেষত বিহারের প্রান্তিকবর্গের মানুষের জীবনের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে 'ভাতের গন্ধ' (১৯৮১), 'আকাশের নিচে মানুষ' (১৯৮১), 'মানুষের যুদ্ধ' (১৯৮৩), 'ধর্মান্তর' (১৯৮৪), 'দায়বদ্ধ' (১৯৮৬), 'প্রস্তুতিপর্ব' (১৯৯০), 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৯১) মতো উপন্যাসগুলিতে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ছোটগল্পগুলি 'সাতঘড়িয়া', 'মানুষ', 'চুনাও', 'ভোজ', 'কার্তিকের ঝড়', 'শনিচারীর ইচ্ছাপূরণ' ইত্যাদিতে রয়েছে এর প্রভাব। বিহারের প্রান্তিকবর্গের জীবনের প্রেক্ষাপটকে নিয়ে লেখা হলেও নিম্নশ্রেণীর মানুষের দুরবস্থা কোন স্থানিক দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর বিভীষিকাময় রূপ সর্বকালে, সর্বস্থানে একই রকম।

স্বার্থান্বেষী মানুষের বাহ্যিক রূপের আড়ালে স্বার্থসিদ্ধি করার অভিসন্ধিপরায়ণ বাস্তবতা এবং এর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের উপরিক্ত রচনাগুলিতে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে এরকমই একটি রচনা 'যুদ্ধযাত্রা' উপন্যাসটি আলোচনা করা হবে। যেখানে অভিজাতবর্গ নিজ স্বার্থকায়েম করতে কিভাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাজে লাগিয়েছে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের উপর চালিয়েছে যথেচ্ছাচার শোষণ। এই মাত্রাতিরিক্ত শোষণকে প্রান্তিকবর্গ সবসময়ই নির্বিরোধী ভাবে মেনে নেননি। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে তাদের চেতনার স্ফূরণ হয়েছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তারা গর্জে উঠেছে। উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতার কাছে পদানত না হয়ে আপন সাহসিকতার সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লড়াই করে যুগে যুগে থেকেছে অপরাজেয়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রফুল্ল রায়ের 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৯১) উপন্যাসের পটভূমি উত্তর বিহারের দোসাদ, গাঙ্গোতা, চামার, ধাঙর, এমন নানা জাতের জল-অচল অচ্ছুতের ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরা গ্রাম। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিং সেখানকার সবচেয়ে বড় জমিমালিক। ত্রিলোকী সিং সেখানকার স্বাধীন ভারতের নির্বাচিত এম এল এ। জনবল ও অর্থবলে দেশের আইন-প্রশাসন তাদের হাতের মুঠোয়। সাংবিধানিক রায়কে অস্বীকার করে নিজস্ব কানুনে চালায় রাজত্ব, মধ্যযুগীয় বর্বরতা। বৃহত্তম গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ত্রিলোকী সিং। ভোটের আগে তাকে নির্বাচিত করার জন্য ধারাবনী, বারহৌলি মতো গ্রামগুলিতে গিয়ে হতদরিদ্র নিঃস্ব মানুষগুলিকে খুন, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে প্ররোচিত করার চিত্র ফুটে উঠেছে রাকেশকে বলা ধনুয়ার অসহায় উক্তিতে। রাকেশ যখন ধনুয়াকে বলে তোমরা ইচ্ছে করলেই একজন ভালো লোককে ভোট জিতিয়ে ত্রিলোকী সিংয়ের ক্ষমতাকে নস্যাৎ করতে পারো। রাকেশের এই কথা শুনে ধনুয়া চমকে ওঠে। কারণ ধনুয়ার মত নিঃস্ব মানুষগুলি জানে এর পরিণতি কত ভয়াবহ –

> "ফি বার চুনাওয়ের আগে আগে ত্রিলোকী সিংয়ের পহেলবানেরা এবং ভূমিসেনারা লাঠি এবং বন্দুক কাঁধে করে অচ্ছুৎদের গাঁগুলোতে ঘুরে ঘুরে বলে যায়, সবাই যেন সিংজির প্রতীকে মোহর মারে। যদি কেউ তা অমান্য করে অন্য প্রতীকে ছাপ মারে এবং ত্রিলোকী সিংয়ের বদলে অন্য কেউ চুনাওতে জিতে যায়, গাঁককে গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। পুরুষদের এমন মার দেওয়া হবে যে সারা জীবনে তারা ভুলবে না, আওরতদের নাঙ্গা করে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হবে।"[৩]

সাংবিধানিক আইনে 'ভোট' প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় এর পৃথক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। উত্তর বিহারের ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার মতো অনুন্নত জীবনে 'ভোট' কোন স্বাধীন মতামত জানানোর প্রক্রিয়া নয়। ক্ষমতাপিপাসুদের জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক জনবিরোধী কর্মসূচি।

প্রফুল্ল রায়ের 'যুদ্ধযাত্রা' উপন্যাসে ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার এই তিনটি গ্রামে দিনের আলোয় বিনাদোষে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ৩০ জন হতদরিদ্র, নিঃস্ব কৃষকদের নির্বাচনের গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। ১১ জন মেয়েকে গণধর্ষণ করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। এর পিছনেও রয়েছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার। আবহমানকাল ধরে সবলের হাতে দুর্বলের পরাজয়, লাঞ্ছনা, প্রতিনিয়ত অপমানে সজীব প্রাণগুলির মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হতে থাকে। হীনমন্যতার শিকার হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারে না। হতাশাগ্রস্তে মানুষগুলি আজন্ম লালিত সংস্কারকে আকড়ে নিয়তিকে সম্বল করে বেঁচে থাকে। তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের অভিজাতবর্গ, নিজ স্বার্থসিদ্ধি করতে পালোয়ান ও ভূমি-সেনাদের লেলিয়ে দিয়ে অচ্ছুৎ গাঁগুলিতে ত্রাস ছড়িয়ে দেয়।

উত্তর বিহারের নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলি পুরুষানুক্রমে সামন্তপ্রভু ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝার জমিতে কাজ করে তাদের জীবিকা ধারণ করেছে। সর্বোদয় নেতা বিনোবাজি, হতদরিদ্র, নিঃস্ব মানুষগুলির মঙ্গলের জন্য তার মহৎ উদ্দেশ্য 'ভূদান যজ্ঞ' কর্মসূচি নিয়ে বিহারের গ্রামগুলিতে পদযাত্রায় আসেন। বড় বড় জমির মালিক, জমিদারের কাছে প্রার্থনা জানাই ভূমিহীন মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর। চারিদিকের 'ভূদান যজ্ঞ' নামে এই পুণ্যকর্মের আলোড়নে দেশ যখন আলোড়িত। তখন নিজেদের মহত্বকে প্রকাশ করতে উত্তর বিহারের দুই জমিমালিক ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝা শপথ নিলেন তাদের পড়তি জমি বিলিয়ে দেবেন ভূমিহীন অচ্ছুৎদের। এই স্বতঃস্ফূর্ততা যতটা না আন্তরিক, তার চেয়েও বেশি পুণ্য অর্জনের লোভ, শাস্ত্রীয় মতে 'ভূমিদান' একটি বৃহৎ পুণ্যকর্ম। নিজেদের মহত্ত্ব প্রকাশের অভিপ্রায়ে বারহৌলি গ্রামে বিশাল জনসভার আয়োজন করে পাহাড়ের গায়ের অনুর্বর, রুক্ষ পাথুরে, অনাবাদি পড়তি জমি অচ্ছুৎদের দানপত্র করে দিয়েছিলেন ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝা। চিরকালের অবহেলিত শোষিত, বঞ্চিতরা এক টুকরো নিজস্ব অনুর্বর জমি পেয়ে পরম উৎসাহে অনুর্বর ভূমিকে ফলবতী করার জন্য চালায় এক কঠিন লড়াই। পাথুরে জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে নিজের শেষ জীবনীশক্তিটুকুও উজার করে দিয়েছে এই হতভাগ্য মানুষগুলি। অপূর্ব এক উন্মাদনায় তারা বছরের পর বছর জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে, পরতে পরতে মাটি তুলে, জৈব সার মিশিয়ে, মাটিকে চৌরস করে সোনার ফসল ফলায় কাঁকুরে মাটিতে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পড়তি জমি ফলবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিমালিক ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর মানুষগুলি পুণ্যার্জন ও মহৎ হবার আশায় পরিত্যক্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করতে পারে, কিন্তু লাভের গন্ধ পেলে নিজেদের দান করা জিনিসে ভাগ বসাতেও দ্বিধাবোধ করে না। যেকোনো উপায়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে তৎপর হয়। অছুৎদের প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে জমিমালিকরা ধারাবনী, বারহৌলি গ্রামের নিম্নশ্রেণী মানুষদের উপর চালিয়েছে নির্মম অত্যাচার।

অচ্ছুৎটোলার মানুষগুলি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাথুরে জমিতে সোনার ফসল ফলালে মালিকানার দাবি নিয়ে সে ফসল কাটতে এসেছে ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝার ভূমিসেনারা। পুলিশ ও পালোয়ানের তত্ত্বাবধানে এ অন্যায়কার্যে হতদরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের অক্ষমতাকে জেনেও নীরবে বসে থাকতে পারে না। ভূমিসেনাদের ফসল কাটতে বাঁধা দেয়। কিন্তু জমিমালিকদের সশস্ত্র পালোয়ান ও প্রশাসনিক পুলিশ বাহিনীর কাছে তারা নিতান্তই নিরুপায়। পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে নিরপরাধ মানুষগুলিকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের থেকে মুক্তির জন্য ধনুয়া থানাদারের পা জড়িয়ে ধরে কাতর আর্তি জানালে, থানাদারের ব্যবহার আমাদের বুঝিয়ে দেয় ক্ষমতা যার, প্রশাসনিক ন্যায়-অন্যায় বিচার করার কর্তৃত্বও তার। তাই তো ধনুয়ারা ন্যায়বিচার পাবার পরিবর্তে পেয়েছে অবিচার। পুলিশের দারোগা লাথি হাকিয়ে ধনুয়াকে দশ হাত দূরে ফেলে দিয়ে বলে –

"শুয়োরকা বচ্চে, তোদের বাপের জমি! বাপের ফসল!"[8]

জমি মালিকদের পোষা পালোয়ানের সঙ্গে সরকারি জনসেবামূলক কাজের কর্মকর্তা পুলিশের ব্যবহারের কোন পার্থক্য নেই। কার্যক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মীরাও উচ্চশ্রেণীর মানুষের ইশারার 'পুতুল মাত্র'।

চিরকাল যারা অবহেলিত হয়ে আসছে তাদের মধ্যেও থাকে মানবিক চেতনা। পাহাড়তলীর জমি থেকে নিজেদের কষ্টোপার্জিত ফসল চোখের সামনে জমিমালিকদের ভূমিসেনারা কেটে নিয়ে যেতে থাকলে তারাও আর হাত-পা গুটিয়ে নীরবে বসে থাকতে পারে না। আজন্ম ভীরুতাকে জয় করে ধনুয়ার নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভূমিসেনাদের উপর। কিন্তু এর পরিণতি বড় করুন। প্রকাশ্য দিনের আলোয় পুলিশের উপস্থিতিতে এই তান্ডবে ১৮ জন হতদরিদ্র মানুষকে নির্বিচারে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। ১১ জন নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করে তাদের উপর চালানো হয় অকথ্য অত্যাচার, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় গ্রামগুলিতে। তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার এই কেস কোর্টে উঠলে সাক্ষ্য দেবার মত একজন কেউ পাওয়া যায় নি। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে পাঁচজনকে দোষীসাবস্ত করে হাজতে চালান দেওয়া হলেও, সাক্ষীর অভাবে তাদের শাস্তি দিতে অপারগ রাকেশের মতন আদর্শবান সৎ ম্যাজিস্ট্রেটও। এর পেছনের বাস্তবতাকে তলিয়ে দেখলে দেখতে পাবো পুলিশ সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি এমন নয়। সামন্তপ্রভুদের অর্থবল, জনবলের ক্ষমতায়নের জোড়ে তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে নিজস্ব আদর্শ থেকে। যে পাঁচজন খুনীকে হাজতে রাখা হয়েছে তারাও প্রকৃত দোষী নয়। এই ষড়যন্ত্রের আড়ালে রয়েছে সমাজের প্রতিভূ শ্রেণী। যারা অন্তরালে থেকে অর্থলোভ দেখিয়ে সমাজের কিছু বিবেকহীন মানুষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে। অপরাধমূলক কাজের কর্ণধার হয়েও জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে অন্তরালে নিজের আখের গোছাতে তৎপর হয়।

ধনুয়ার মতো সাধারণ মানুষরা এই ক্ষমতাবান প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে পারলেও তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বার বার নিজের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলতে ভয় পায়। সাহস করে এগিয়ে গিয়ে নিজেদের দাবি জানাতে পারে না। জঙ্গলে লুকিয়ে পশুর মতন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারাও নিজস্ব চেতনার আলোড়নের তাড়নাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। ধারাবনীর নির্যাতিত নারী, পুরুষরা কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার দেবারতি ও উচ্চপদস্থ সরকারি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশের সহানুভূতিতে নিজেদের মনবেদনা ব্যক্ত করে ন্যায়ের দাবি করে। ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার অচ্ছুৎদের উপর হওয়া নির্মম হত্যাকাণ্ড ও নারী নির্যাতনের কথা উঠলে সেখানকার চায়ের দোকানদার, পি ডব্লু ডি বাংলোর ম্যানেজার অবোধনারায়ণ, ধারাবনী গ্রামের গরীব গনপৎ, লছমি সহ সেখানকার অনেক মানুষ সামন্তপ্রভুদের রোষের মুখে পড়ার ভয়ে মুখ খুলতে না চাইলেও ধনুয়া দুসাদ, পতিয়া, কুঁদরী নির্দ্বিধায় তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবারতির কাছে ধনুয়ার মনের গভীর হতাশাও ব্যক্ত হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"এই খুন, আগুন, আমাদের ঘরের মেয়েদের বেইজ্জতি কোনদিন বন্ধ হবে না মেমসাব।"[৫]

আবহমানকাল ধরে চলে আসা দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের নির্মম বাস্তবতার স্পষ্ট উক্তি ধনুয়ার মতো আমাদেরও অবসাদগ্রস্থ করে তোলে।

নৈরাশ্যের শেষ সীমাই দাঁড়িয়ে তাদের হারাবার আর কিছুই নেই। দেবারতি ও রাকেশের মতো শুভাকাঙ্ক্ষীকে কান্ডারী হিসেবে পেয়ে ধনুয়া জঙ্গলে আশ্রিত ধর্ষিতা লাজো, পতিয়াকে তার নারী জীবনের যন্ত্রণাদায়ক বিড়ম্বনার কথা রিপোর্টার দেবারতিকে জানাবে কিনা বললে, লাজো লজ্জায় নিজের যন্ত্রণার ইতিহাস রিপোর্টার দেবারতিকে জানাতে না চাইলেও, পতিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়।

> "জরুর কহুঙ্গি। আমার সবই তো ওরা খতম করে দিয়েছে। ডরনেকা কুছ নেহী, শরমানেকা ভি কুছ নেহী।"[৬]

লাঞ্ছিত পতিয়া স্বামীর অনুপস্থিতিতেও নিঃসঙ্কোচে তাদের উপর হওয়ার সমস্ত নির্যাতনের ইতিহাসকে জানাতে দ্বিধাবোধ করে না। মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েও সবসময় নিজের যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। গরিব হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে আত্মসম্মানবোধ, ভালোভাবে বাঁচার প্রেরণা, যা তদের সাহস যোগায় অন্যায়ের প্রতিরোধে। পতিয়া, কুঁদরী, লাগুর মত নারীরা চায় তাদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিকার হোক। শাস্তি হোক অন্যায়কারীদের। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা এগিয়ে আসে অন্যায়ের প্রতিরোধে। সাহসী নারীদের এই জাগরণে বদলায় সমাজ। সর্বসমক্ষে আসে স্বার্থন্বেষী অভিজাতবর্গের প্রকৃত স্বরূপ।

ত্রিলোকী সিং, গিরিলাল ঝার মতো মানুষেরা নিজেদের রং বদল করে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। সহজভাবে দেবারতি ও রাকেশকে তাদের দলভুক্ত করতে না পেরে, প্রতিনিয়তই প্রশাসনিক ও বাহুবল দ্বারা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। চার বন্দুকধারীকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে দেবারতিকে বারহৌলি গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এসে গিরিলাল ঝার বাড়িতে আটক করে রাখা হয়। দেবারতি গ্রামের ধর্ষিতা নারী ও পুরুষদের উপর হওয়া সমস্ত অত্যাচারের বর্ণনা স্টেটমেন্ট হিসেবে টেপ রেকর্ড এবং প্রমাণ স্বরূপ তাদের ছবি ক্যামেরাবন্দি করলে, নিজেদের বিপদমুক্ত করতে গিরিলাল ঝা ও ত্রিলোকী সিং এর লোকেরা টেপ রেকর্ডার ও ক্যামেরায় সংরক্ষিত সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দেয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির গোষ্ঠীবদ্ধ অভ্যুত্থানে ভীত সন্ত্রস্ত সামন্তপ্রভুরা এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করে ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার নির্যাতিত মানুষদের আর ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা যাবে না। নিজেদের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে কূটকৌশলী মানুষগুলি দ্রুতই তাদের হিংসার রণনীতি বদলে তোষামোদের পথ ধরেছে। ভুখা, গৃহহারা, অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করেছে। তোষামোদকারী প্রতিভূশ্রেণী নিজস্বার্থে বাহ্যিকভাবে অনুতপ্ত হৃদয়ের ক্রন্দন প্রকাশ করে নতুন ভাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের আস্থা অর্জন করার অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে সহজেই অনুধাবন করেছে ধনুয়া। অসহায় নিরন্ন মানুষগুলি নিজেদের দারিদ্র্যের অসহায়তার কাছে হেরে গিয়ে গিরিলাল ঝা ও ত্রিলোকী সিং এর অভিসন্ধি বুঝেও তাদের দেওয়া আটা, ডাল, সবজি, নতুন করে অগ্নিদগ্ধ বাড়ি মেরামত করে দেওয়া হবে এই আশ্বাস নিয়ে, সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিরোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সেখানকার তেজী পুরুষ ধনুয়া এবং আনোখি পারেনি নিজেদের আত্মমর্যদাকে বিসর্জন দিতে। গিরিলাল ঝাদের অনুগ্রহ গ্রহণ করে আবার গ্রামে ফিরে এসে সামন্তপ্রভুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি তারা। অন্যায়ের প্রতিকারে শত দারিদ্রতাকেউ তুচ্ছ করে এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে –

> "ভূচ্চরের ছৌয়া খুনীদের ছাড়া হবে না। ওদের ফাঁসিতে চড়াতেই হবে। কুত্তাগুলো এত্তে আদমীর জান নিয়েছে, এতে অওরতের ইজ্জৎ নষ্ট করেছে।"[৭]

ধনুয়ার অপমানবোধ তীব্র, দারিদ্র্যের অসহায়তার কাছে সে সহজে হার মানেনি। আনোখিকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ-সাত মাইল দূরের নৌপুরায় গিয়ে হাঁটিওয়ালাদের মালপত্র বহন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। রাকেশদের পাশে থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার লড়াই চালিয়ে গিয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিম্নশ্রেণীদের প্রতিনিধি ধনুয়া নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েও তার সমগোষ্ঠীর মানুষদের নিরুপায়তাকে উপলব্ধি করেছে। তার প্রতিবেশীরা সামন্তপ্রভুদের কথা মেনে নিয়ে জঙ্গল ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে এর পেছনেও রয়েছে বাস্তবতার এক রূঢ় রূপ। অভাবের তাড়নার কাছে সমস্ত অপমান, অত্যাচার, গ্লানিবোধ তুচ্ছ হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবেই মনের জোর স্থিমিত হয়ে আসে। ধনুয়া তাদের করুণ পরিস্থিতি উল্লেখ করে যা বলেছে তাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির অসহায় পরিস্থিতির এক চরম রূপ পরিস্ফূট হয়েছে।

> "না গিয়ে কি আর করার, এই জঙ্গলে পড়ে থাকলে ভূখাই মরতে হবে। গরিব আদমী সব- ক্ষেতি নেই, পয়সা নেই, মন তো এমনিতেই দুবলা হয়ে যায়।"[৮]

এক মুঠো অন্য সংস্থানের জন্য যাদের গিরিলাল ঝা এবং ত্রিলোকী সিং এর মতো উচ্চশ্রেণীর মানুষদের করুনার উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের পক্ষে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে আর কতক্ষণ বা নিজের ও পরিবারের জৈবিক চাহিদার কাছে মেরুদন্ড সোজা রেখে লড়াই করা সম্ভব। ক্ষমতায়নের জোরে হতদরিদ্র মানুষগুলিকে যারা জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তাদের একবারের ডাকেই সমস্ত আত্মমর্যদাকে বিসর্জন দিয়ে আবার সেই সামন্তপ্রভুদের জমিতে লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে হাতে ছুটতে হয় ভুখা মানুষের দলগুলিকে। মনের সমস্ত গ্লানিবোধ মুছে ভুখা মানুষগুলি পেটের দায়ের কাছে পরাজিত হয়ে সামন্তপ্রভুদের বাড়ির ভাত, ডাল, সবজি, মিষ্টির 'বাড়িয়া ভোজন' তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে। কেননা ক্ষণিকের আত্মমর্যদা বজায় রেখে তাদের তোষামোদকে আজ উপেক্ষা করলেও, পেটের দায়ে একদিন বাধ্য হয়েই তাদের পদতলে সামান্যতম কাজের জন্য মিনতি করা ছাড়া কোন উপায় নেই মানুষগুলির। সমাজের নীচের তলার এই মানুষগুলির নিরুপায়তা, দুরবস্থাকে রাকেশ, রামলখনদের দলটি সহজেই উপলব্ধি করেছে। তাই বারবার ব্যর্থ হয়েও নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির মনে প্রতিবাদী চেতনার জাগরণে চেষ্টা তারা চালিয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির শিকার মানুষগুলির উচ্চশ্রেণির পদাশ্রয়ে থেকে মুখ বুঝে সকল যন্ত্রণা সহ্য করে জীবনধারণ করার আসল রূপ ব্যক্ত হয়েছে লেখকের ভাষায়।

> "কেঁচো বা কৃমিকীটের মত পিঠ বাঁকিয়ে মুখ বুজে চিরকাল তাদের চলতে হয়। তাদের নারীদের সম্মান বা পুরুষের খুন হওয়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়।"[৯]

'তাদের' (নিম্নশ্রেণী) নারীর সম্মান, পুরুষদের খুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। কেননা বাস্তবতা তাই বলে, যেখানে এলিট শ্রেনীর মধ্যে কোনো তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও মাতামাতি, উন্মাদনার শেষ নেই সেখানে একই দেশের সমান আইনব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণীরা চিরকালই বঞ্চিত। নিঃস্ব মানুষগুলির মধ্যে অপমানবোধ, গ্লানিবোধ, লাঞ্ছনার চাপা ক্রোধ থাকলেও হতাশা আর অসহায়তার কাছে তারা পরাজিত। লোকচক্ষুর আড়ালে তাদের অন্তঃকরণের রাগ, অভিমান, আত্মসম্মান, হতাশা, লাঞ্ছনার রেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বলতে গেলে বেঁচে থাকাটাই যাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে জৈবিক চাহিদার ঊর্ধ্বে ন্যায়-অন্যায়, অপমানবোধ, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধগুলি বড়ই তুচ্ছ। সমাজের শোষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত হতে হতে তাদের এই বোধটাই হারিয়ে যায় সমাজের উঁচুতলার মানুষের মত তারাও রক্তমাংসে গড়া এক একটি জীবন্ত মানুষ। সমাজজীবনে তাদের অস্তিত্বেরও যথার্থ মূল্য আছে। নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যহীন ধারাবনী গ্রামে শহরের ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশবাবু ও তার সঙ্গীরা থাকতে চাইলে তাদের থাকতে অসুবিধা হবে বলে গনপৎ কুণ্ঠাবোধ করলে, রাকেশ মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে গনপৎকে যখন বলে তোমরা এতগুলো মানুষ থাকতে পারলে আমরাও পারবো। তার উত্তরে গনপৎ এর উক্তি আমাদের যে সত্যের সামনে দাঁড় করায়, তাই প্রকৃত বাস্তব।

> "আমরা আবার মানুষ। জানবারের মতো যেখানে হোক মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারি। কোথায় আমরা আর কোথায় আপনারা!"[১০]

ধনুয়া ও আনোখির আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতার তুলনা দিয়ে রাকেশ ধারাবনীর মানুষদের জাগরণ ঘটাতে চাইলে, ধারাবনী গ্রামের নৈরাশ্যপীড়িত মানুষগুলির প্রতিনিধি স্বরূপ গন্নাও সেই একই কথা বলে –

> "গিরিলালজিদের মতো বড় আদমীর সঙ্গে আমাদের কি লড়াই চলে? ওরা যা-ই করুক, আমাদের মুখ বুজে সইতে হয়। আমরা নালিয়ার গান্ধা পোকা হুজৌর--আদমী নেহী।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই পার্থক্য সভ্যজগতের তৈরি। যার কুফল ভোগ করছে ‘ওরা’ অর্থাৎ ‘নিম্নশ্রেণী’রা। চিরদিনের অবহেলায় তাদের মনে যে পার্থক্যের সংস্কার তৈরি হয়েছে তার থেকে সহজে তাদের মুক্তি নেই। মিথ্যা সংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে অবলীলায় সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশে ‘ওরা’ সমকক্ষ হয়ে উঠুক তা ভাবার মত সচেতন, শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের বড়ই অভাব আজও। তবে সভ্যতা প্রগতিমুখী, তাই যুগে যুগে রাকেশ, দেবারতি, রামলখন, ভগবতের মতো মানবতাবাদী, বিবেকবান, জনস্বার্থে আত্মত্যাগী মানুষের আবির্ভাব আমরা দেখেছি। মহানুভব এই মানুষগুলির সান্নিধ্যে ধনুয়া, আনোখির মতো চরিত্রগুলি চিনে নিতে পারে নিজেদের অন্তরআত্মার চাহিদাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় নিজেদের অধিকারকে।

সময় যত গড়িয়েছে, নিঃস্ব মানুষগুলিকে ন্যায় পাইয়ে দেবার লড়াই ততই সংঘটিত হয়েছে।ধারাবনী ও তার আশেপাশের গ্রামগুলির অত্যাচারিত মানুষগুলি তাদের ভীতি কাটিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ল্যান্ডলর্ড ও পলিটিশিয়ানদের সমস্ত কৌশল নিরর্থক করে দিয়ে ধারাবনী, বারহৌলি, মধিপুরার কুঁদরী সহ পাঁচটি ধর্ষিতা নারী তাদের স্বীকারোক্তি দিয়েছে, গ্রামের লোক খুনীদের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে সম্মত হয়েছে। পরিস্থিতির চাপে নিজেদের চারিত্রিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গিরিলাল ঝা ও ত্রিলোকীর সিং ন্যায়ের ঝান্ডা উড়িয়ে ডি এম অফিসে উপস্থিত হয়ে খুনীদের শাস্তি দাবি করে নিজেদের অবস্থানকে রেখেছে নিরাপদ। এর দু-দিন পরেই মানকালালসহ সাত জন দোষীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এদের আড়ালের প্রকৃত দোষীদের শাস্তি সম্ভব হয়নি। ক্ষমতায়ানের জোরে ত্রিলোকী সিং ও গিরিলাল ঝা নিজেদের চারিত্রিক স্বচ্ছতাকে বজায় রাখলেও নিপীড়িত মানুষগুলির কাছে নিজেদের আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তারাই যে আসল দোষী তা চিনতে ভুল করেনি গ্রামের সাধারণ মানুষ। ক্ষমতার জোরে ভয় দেখিয়ে মানুষের চেতনাকে ক্ষণিকের জন্য দাবিয়ে রাখা সম্ভব। আগ্রাসী প্রতাপ এর কাছে মানুষ চিরকাল পদানত থাকে না। ধারাবনী ও আশেপাশের গ্রামের অক্ষর পরিচয়হীন মানুষগুলি আজ আসল জনদরদী নেতাকে চিনতে ভুল করেনি। রাকেশের স্বার্থত্যাগ, নিঃস্ব মানুষগুলিকে ন্যায় পাইয়ে দেবার কঠিন লড়ায়ে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার দৃঢ়চেতা মনোভাব, নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির মধ্যে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার চেতনার স্ফূরণ ঘটিয়েছে। অভিজাতবর্গের পরিচালিত সামাজিক কঠিন বাস্তবতার উর্ধ্বে সমস্ত ভয়কে জয় করে রাকেশের ত্রিলোকী সিং এর বিরুদ্ধে ভোটে জনপ্রতিনিধি হওয়ার প্রস্তাবকে, ধনুয়ার নেতৃত্বে সাদরে গ্রহণ করেছে মানুষগুলি। সত্যের জয় সর্বদা, নিম্নবর্গীয় চেতনার স্ফূরণে উচ্চশ্রেণীর প্রতাপের জাল ছড়ানো থাকলেও, প্রগতিশীল কান্ডারীর হাত ধরে ‘ওরা’ ফিরে পাই ভরসা, অর্জন করে সংগ্রাম করার মানসিক জোর। মানবিক চেতনাকে বজায় রেখে সভ্যতার অগ্রগতিতে নিয়ে আসে আলোকের বর্ণময় ছটা।

Reference:

১. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ৩
২. রায়, প্রফুল্ল, ‘মানবজীবন’ (উপন্যাস সংকলন), দে’জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৪, ‘লেখকের কথা’
৩. রায়, প্রফুল্ল, ‘যুদ্ধযাত্রা’ উপন্যাস, (‘জীবনধারা’ উপন্যাস সংকলন), দে’জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২১, পৃ. ১১৫
৪. তদেব, পৃ. ১০১
৫. তদেব, পৃ. ৯৭
৬. তদেব, পৃ. ১১১
৭. তদেব, পৃ. ১৮৫
৮. তদেব, পৃ. ১৮৩
৯. তদেব, পৃ. ১৯৩
১০. তদেব, পৃ. ১৮৯
১১. তদেব, পৃ. ১৯৪

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

ভদ্র গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৪

রায় প্রফুল্ল, ‘মানবজীবন’ (উপন্যাস সংকলন), দে’জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৪, ‘লেখকের কথা’

রায় প্রফুল্ল, ‘যুদ্ধযাত্রা’ উপন্যাস, (‘জীবনধারা’ উপন্যাস সংকলন), দে’জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 340 - 350
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সৃজনশীল লোকপুরাণের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ সোহারাব হোসেনের ‘গাঙ বাঘিনি’ উপন্যাস

সৌরভ মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: souravmajum995@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Soharab Hossain, Novel, Gang Baghini, Sundarban, Creative Myth, Folktales, Taboo, Socio-Political Background, Refugee, International Border, Illegal Activities.

Abstract
People living in extreme geographical regions tends to be dependent on the geological and ecological forces of their native land for the very sake of maintaining their existence. Those uncontrollable forces become godlike entities, which the people fear. Gradually, they weave lore about the wraths and boons of those gods, exercise taboos and make sacrifices to keep those heavenly or hellish bodies content. This myths become an essential part of their lives and their sustenance—which, sort of, defines the people in their entirety. Sundarbans, the southern part of West Bengal and Bangladesh, is one of such extreme locations where maintaining life means continuous struggle with the unpredictable sea-weather, vicious wild-life and severe lack of enough food, drinking water and means of earning. Turbulent sea-waves or hurricanes destroy their homes, their family members get killed by ferocious tigers, crocodiles or snakes while collecting honey, wax or timber from the jungle. Thus, these entities become Gods in their fear-induced mythologies—for example, the tiger becomes ‘Dakshinray’, the emperor and sole owner of the honey and wax of ‘Bhati’ area. ‘Banabibi’ and ‘Shahjanguli’ are the godsend saviours of the oppressed. The myth-believers implement these larger-than-life figures as the symbol of eternal oppressors and recurrent saviours even in present time as well. Since the time of Independence, the socio-political-economic consequences of being an international coastal border area disturb the peacefulness and simplicity of the life of inhabitants. The poachers, weapon dealers, pirates, illegal immigrants along with the coastguards, foresters, politicians, military and the middlemen such as ‘aratdars’ or ‘khatidars’ leech on the lives of the helpless locals. These greedy, evil entities seen as incarnations of ‘Dakshinray’, while some wise or brave locals believed to be avatars of ‘Banabibi’ or ‘Kapil Muni’ create the base of ever-enriched seedbed of ‘Creative Myth’—which is newer and creative iterations of old mythical lore. Eminent Bengali novelist Soharab Hossain’s novel ‘Gang Baghini’ is

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

centred round the life and situation of Sundarbans. How the novelist implemented a newer version of the local myth, is the object of our discussion.

Discussion

একদিকে গভীর বাদা, জলজঙ্গল, বাঘ-সাপ-কুমির, অন্যদিকে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, লোকপুরাণের বিরামহীন কিন্তু সদা-পরিবর্তনশীল ধারাস্রোত— এই দুই দুনিয়ার মাঝে অবস্থানরত সুন্দরবনের মানুষ যেন এক অসীমান্তিক দয়াহীন বিরাটত্বের সামনে "পিঁপড়ে মাত্র, অন্য কিছু নয়"[১] — পিঁপড়ের মতই তারা তুচ্ছ, অসহায়ও। নশ্বর ও অবিনশ্বর এই দুই জগতের সঙ্গে মানুষের আশ্চর্য মিথস্ক্রিয়ার নির্মাণ 'সুন্দরবন' ভৌগোলিকভাবে দ্বৈত অস্তিত্বে উদ্ভাসিত— একদিকে 'লাট' অঞ্চলের ১০৯০টি গ্রামের অজস্র মানুষ ও সংশ্লিষ্ট বনভূমি নিয়ে গড়ে ওঠা 'মানুষবন' অংশ, যা 'মানষেলা' নামেও পরিচিত; আর অন্যদিকে আছে যথার্থ সুন্দরবন, যেখানে সুদরী, গরান, হেঁতাল, পাশুর, ধুন্দুল গাছের শামিয়ানার নীচে আঁধার বনের আলোছায়ায় গা মিশিয়ে ঘুরে বেড়ায় ডোরাকাটা 'বনের বাবু' কেঁদোবাঘ বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার— যেখানে মানুষের পা পড়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ— সভ্য জগতের সীমানার বাইরে আশ্চর্য গোপনতায় যা দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা করে এসেছে 'আঠারো ভাটির সম্পদ'-কে। কবির কল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠে এই সুন্দরবন— যেখানে জল-জমিন-আশমানে পরিব্যাপ্ত আদিম বন্য প্রকৃতির মাঝে কেবল নিজের বাপ-পিতেমোর থেকে পাওয়া লোকবিশ্বাস, মিথ, একরাশ ভয় আর একপেট খিদে নিয়ে হাজির হয় কিছু মানুষ— কাঠ কাটতে, মধু আনতে, মাছ কিংবা কাঁকড়া মারতে—

> "এইভাবে পড়ে আছি
> নদী-খাল-জঙ্গলের দেশে
> আমি তো লাটের ছেলে
> নোনামাটি মানুষের কাছে
> আমারো রয়েছে দায় জন্ম-সুবাদে
> তাই আমি বিজিয়ারা-বনবিবি
> আর সেই কলস জঙ্গলে
> যেখানে পেটের দায়ে
> মানুষেরা চলে আসে কাঠের সন্ধানে
> কিংবা সেই জম্বুর চড়ায়
> দল বেঁধে সাবাড়ের কাজে
> শীতের সমুদ্র থেকে
> ধরে আনে রকমারি মাছ
> আমিও তাদের সঙ্গে
> মিলে মিশে এক হয়ে যাই..."[২]

"...সেই জীবনটা, বনচারী জীবনটা কেমন। তাঁদের আচরণ বিশ্বাস কেমন। তাঁরা ভিতরে ভিতরে কতখানি সৎ। তাঁরা ভিতরে ভিতরে কতখানি বড়। তারা এই গহন অরণ্য ও গহীন সমুদ্রের মধ্যে থেকেও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে Interact করছে"[৩] কীভাবে— এ সমস্তই সোহারাব হোসেন (১৯৬৬-২০১৮) তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর নবম উপন্যাস 'গাঙ বাঘিনি' (২০১১)-তে। প্রকৃতি-মানুষ-মিথ— এই তিনভুবনের পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফসল এ উপন্যাস। সমসময়ের জটিল, জটিলতর সমস্যাগুলিকে কীভাবে চিরকালীন প্রকৃতি ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে অম্বিত করেন এই মানুষগুলি, কীভাবে স্থির করেন নিজেদের অভিমুখ— বেঁচে থাকার, আত্মজনদের বাঁচিয়ে রাখার অভিমুখ— সেই অন্বেষণই বোধহয় 'গাঙ বাঘিনি'-এর গোড়ার কথা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথম উপন্যাস থেকেই ভীষণভাবে 'আঞ্চলিক' সোহারাব হোসেন। বসিরহাটের ভূমিপুত্র, আদ্যন্ত কৃষক পরিবারের সন্তান সোহারাব খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষগুলিকে, জেনেছেন তাঁদের ভাষা, কৃষ্টি, লোকবিশ্বাসকে— কোনও বিত্তগত বা চিত্তগত দূরত্ব তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করেনি। কথাকার বাস্তবের অন্তর্বর্তী মায়া পরিসর খনন করতে করতে বাড়ির পাশে আরশি নগর এবং সেই নগরে বসত করা পড়শির সাথে পরিচিত হয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন চেনা মানুষের অচেনা আদল। সোহারাবের উপলব্ধি এরকম -

> "পরিচিত হয়ে বুঝি তারা সব অচিন মানুষ। কতদিন ধরে, বছর বছর ধরে, দেখছি অথচ তারা কত অচেনা। খাঁচার ভিতর লুকিয়ে থাকা সেই যে অচিন সত্তার সঙ্গে আমার মোকাবিলাটি কখন যেন গল্প হয়ে যায় উপন্যাস হয়ে যায়।"[৪]

একইসঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক সচেতনতার কারণেই হয়তো নাগরিক ব্যক্তি-মানুষের বৃদ্ধ মননগত বা যাপনশৈলীগত দ্বন্দ্ব বা নরনারী সম্পর্কের টানাপোড়েন-এর পরিবর্তে গ্রাম্যজীবনের বৃহত্তর কিন্তু মরণবাচনের প্রশ্ন তুলে দেওয়া সমস্যাগুলিই ব্যক্ত নয় কেবল, সামগ্রিকভাবে যা সমষ্টিকে প্রভাবিত করে, বিপন্ন করে— সেগুলিকেই বিষয় করে তোলেন তিনি তাঁর উপন্যাসের। আঞ্চলিকতা বা সমসাময়িকতাতেই আবদ্ধ নন তিনি, সীমার মাঝেই অসীমকে ধরার চেষ্টা অব্যাহত তাঁর গল্প-উপন্যাসে— বরাবরই। ইতিহাস, গূহ্য-ধর্মীয়তত্ত্ব, জাদুবাস্তবতা, লোকবিশ্বাস, মহাকাব্য —এ সমস্তই তাঁর উপন্যাসগুলির মূল কাহিনিসূত্রের সঙ্গে খাপে খাপে এঁটে থাকে, জড়িয়ে থাকে ওতপ্রোতভাবে। কিন্তু সে সংযোজন নির্ভার, কাহিনিকে হোঁচট খেতে হয় না সেজন্য। 'মহারণ', 'মাঠ জাদু জানে', 'সরম আলির ভুবন', 'দ্বিতীয় দ্রৌপদী' ইত্যাদি উপন্যাসে এভাবেই মিলে মিশে গেছে আঞ্চলিক পরিবেশ, সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে কখনও ইতিহাস, কখনও ধর্মতত্ত্ব, কখনও লোকসংস্কৃতি, কখনও আবার জাদুবাস্তবতা। কিন্তু এ সমস্ত কিছুকে স্থান দেওয়ার জন্য থান ইটের আকারে মহা উপন্যাসের অবতারণা করেন না লেখক। বস্তুত, "তাঁর অন্বিষ্ট বিকল্প জীবনবোধের প্রস্তাবনা এবং ওই সূত্রে বিকল্প আখ্যান প্রকল্প ও প্রকাশ পদ্ধতি।"[৫] মাত্র ১৬৬ পৃষ্ঠার উপন্যাস 'গাঙ বাঘিনি'-র ভূমিকা 'বলার কথা'-য় তাঁর সপ্রতিভ উচ্চারণ—

> "উপন্যাসের বিষয় উপস্থাপনের নানা রীতি (।) কোনও ভূখণ্ডে (র) আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় জীবনে (র) সুবিস্তৃত কাহিনি রচনাই উপন্যাসের একমাত্র শিল্পপথ নয়। এ-কালের পদ্ধতি, সম্ভবত, রূপক-প্রতীক ও সাংকেতিকতার মাধ্যমে তুলনায় স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট কাহিনিতে কালের মহাইঙ্গিতটিকে মূর্ত করা। ব্যাপারটা অনেকখানি অ্যাটমবোমের মতো। ছোট্ট অ্যাটমবোমা যেমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি আজকের উপন্যাস সাংকেতিক ও ব্যঞ্জনাবদ্ধ ঘটনায়, চরিত্রের কথায় ও কর্মে, মিথে ও পরমাণু পরিমাণ মননের চিত্রণে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের চালচিত্রকে প্রতিফলিত করে। ...সেই রীতি মেনে 'গাঙ বাঘিনি'র পরিকল্পনা ও রূপায়নের প্রয়াস করেছি।"[৬]

স্পষ্টতই, 'গাঙ বাঘিনি' সোহারাবের উপন্যাস রচনার মূলধারাটি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও প্রয়াস নয়।

'গাঙ বাঘিনি'-র মূল কাহিনিসূত্রটি গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের কাঠকাটানিয়া, বাউলে, সাবাড়ে প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ এবং কোস্টগার্ড তথা সামগ্রিকভাবে প্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। কাহিনির সূত্রপাত মাছমারা ট্রলারে জলদস্যুদের আকস্মিক আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সংবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে। এই আক্রমণের কারণে হলধরদের কাঠকাটানিয়া দলটি কাঠ কাটতে যাওয়ার অনুমতি পায় না। কোস্টগার্ড অধর ও বঙ্কিমকে সীমান্ত পাহারার জন্যে যেতে হয় বাংলাদেশ-সীমান্তের মনুষ্যবর্জিত 'ছোটো চামটে' দ্বীপে। বাদার 'জ্যান্ত বনবিবি' সাবাড়ে রমণী কাজলার প্রতি অধরের আকর্ষণকে ব্যবহার করে হলধর ও হানিফ সাঁইদার বেআইনিভাবে ছোটো চামটেতে কাঠ কাটার অনুমতি আদায় করে অধরের কাছ থেকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় খানসেনাদের অত্যাচারে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসা অধর, সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় রোমন্থন করে চলে সেই অন্ধকারময় উচ্ছিন্ন দিনগুলির স্মৃতি। কোনও এক বাঘিনির যুবতী-গন্ধে আকুল পুরুষ-বাঘের সীমান্তের কাঁটাবেড়া পেরিয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অধরের রক্তক্ষয়ী স্মৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে থাকে কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। বাঘের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পেটে স্বামী হারানো, সাতজেলের বিধবা পাড়ার বাসিন্দা কাজলার ঘর-ভাঙার বেদনাময় স্মৃতিও মাঝে মাঝেই কান্নার সুরে ভরিয়ে তোলে ছোটো চামটের আকাশ-বাতাস-নদী-সমুদ্র। ছিন্নমূল অধর শিকড় চারিয়ে এক নতুন দ্বীপ সৃজন করতে চায় কাজলার শরীরে —কিন্তু লৌকিক বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে এগোতে পারে না কিছুতেই। ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্যহীনতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে অধর। হলধর-হানিফরা চায় কাজলাকে ব্যবহার করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অধরকে ভুলিয়ে রাখতে। কিন্তু ঘটনাক্রম তাদের আশা পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আড়তদারে আড়তদারে রেষারেষির ফলে তাদের কাঠবোঝাই নৌকা আটক হয়। বনভূমির গভীরে মাওবাদীদের উপস্থিতির চিহ্ন আবিষ্কার করে হানিফ। অন্যদিকে জম্বুদ্বীপে বসতি উচ্ছেদের খবর, বাদার মাওবাদী-জলদস্যু-খটিদারে যোগসাজশ, সমুদ্রপথে অস্ত্র-পাচার, কোস্টগার্ডদের বিরুদ্ধে বেআইনি কাঠপাচারে সহায়তার অভিযোগ ক্রমেই বিপন্ন করে তোলে অধরকে, পায়ের তলা থেকে মাটি হারিয়ে যেতে থাকে তার, আবার। সীমান্ত পেরোতে চাওয়া বাঘটির মৃত্যু সংবাদ তাই যেন নিজেরই পরাজয়ের বার্তা হয়ে পৌঁছয় তার কাছে। কাজলাকে সে গুলি করে পায়ে। নিজেদের পিঠ বাঁচাতে কাঠকাটানিয়া দলটিকে মাওবাদী বলে চিহ্নিত করে ফোর্স চেয়ে পাঠায় বঙ্কিম। মৃতপ্রায় কাজলাকে নিয়ে ছোটো চামটের মৃত্যু উপত্যকায় বনবাসে রয়ে যায় হলধর-নিতাই-মন্টারা।

বাঘ-কুমির-সাপের সঙ্গে নিত্য লড়াই সুন্দরবনের জল-জঙ্গলের অধিবাসীদের—বিশেষত বাউলে-মউলে-মাছমারা-কাঠকাটানিয়াদের। এই সমস্ত পশুর 'মান্যা'-ই টোটেম, অর্ধপশু-অর্ধমানবরূপী-দেবতার স্তর অতিক্রম করে পরিণত হয়েছে ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায় বা বনবিবি, কুমিরবাহন কালু রায়, বড়খাঁ গাজি প্রভৃতি লোকদেবতায়। এই সমস্ত দেবতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের কল্পনায় এদের উপকারী ও ক্ষতিকর রূপ— এ সমস্ত নিয়েই গড়ে উঠেছে সুন্দরবন অঞ্চলের নিজস্ব মিথজগৎ — যা মানুষের জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি স্তরকেই নিয়ন্ত্রণ করে। জল-জঙ্গল-আকাশের মাঝে মানুষের অসহায় অনিশ্চিত অস্তিত্ব একুশ শতকেও তাকে বাধ্য করে বাদায় নেমে বনবিবি-দক্ষিণরায়ের নামে জয়জয়কার দিতে, গড়বন্দি-বনবন্দি-দেহবন্দি করতে, চালানমন্ত্র পড়তে। আজও বাদায় নামলে মউলে বা কাঠকাটানিয়ার জীবনমরণ জমা থাকে বাউলে বা সাইদারের হাতে। একমাত্র তার মন্ত্রেই তফাৎ হটে বাঘ-সাপ, দাঁতকপাটি লাগে হাঁ-মুখ বাঘের। বনের 'মান্যা'-দের সন্তুষ্ট করতে নানা 'ট্যাবু'-র প্রকোপ মাথা পেতে মেনে নেয় মানুষ— কী বাদায়, কী বসতিতে। সুন্দরবনের মানুষের জীবনচর্যার অবিচ্ছেদ্য শুধু নয়, অতিপ্রয়োজনীয় অংশ এই 'মিথোম্যানিয়া', মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-বিশ্বাস, ট্যাবু— এসমস্ত কিছুকে সোহারাব হোসেন তাঁর উপন্যাসের অলংকার রূপে কেবল ব্যবহার করেননি, কাহিনি ও প্লটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন। বস্তুত বলা যায়, তাঁর গোটা উপন্যাসটির প্লটের আধার হিসেবেই তিনি ব্যবহার করেছেন বনবিবি-দক্ষিণরায় সংক্রান্ত মিথটিকে। কিন্তু এই প্রচলিত মিথটিকে তিনি যথাপ্রাপ্তরূপে গ্রহণ করেননি তাঁর উপন্যাসে। কাহিনির প্রয়োজনে তাকে ভেঙে-চুরে নিয়েছেন, নানা সংযোজনক বিয়োজন ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন মিথের এক নবরূপ। আর—

> "নতুন করে এই মিথরচনার ফলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সমাজবিজ্ঞানীর চোখে তাই হল Creative Myth বা সৃজনশীল লোকপুরাণ। এই সৃজনশীলতার মধ্যে একটি নিজস্বতা থাকে যা একই বিষয় সম্পর্কে অন্যের দেওয়া বর্ণনার তুলনায় সেই সৃষ্টিশীল বর্ণনাকারীর প্রদত্ত বিবরণটিকে স্বকীয় করে তোলে। অর্থাৎ মিথ শুধু বর্ণনাই নয়, নবরূপ দেওয়ার জন্য সৃষ্টিশীল বর্ণনা।"[৭]

এক্ষেত্রে সহজেই প্রতিতুলনায় এসে যায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বা 'নাগিনীকন্যার কাহিনি'-র মত উপন্যাস, যেখানে প্রচলিত মিথের সঙ্গে কল্পনার মিশেল ঘটিয়ে নিচুজাতের কাহারদের চড়কের পাটায় চড়ার অনুষঙ্গে লেখক সৃষ্টি করেন বাণগোঁসাই-শ্রীহরির যুদ্ধ কাহিনি, কিংবা মনসামঙ্গলের মিথের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে দেন বিষবেদে সমাজের নাগিনীকন্যার কাল্পনিক কাহিনির।

সুন্দরবনের ক্রমউন্মোচনশীল অতীত গরিমার ইতিহাস নয়, লাট অঞ্চলের মানুষের জীবনের হাসি-কান্নার রোজনামচা নয়— 'গাঙ বাঘিনি'-তে সোহারাব হোসেন তুলে ধরতে চেয়েছেন সমসাময়িক নানা সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাগুলি কীভাবে এখানকার মানুষগুলির জীবনের সহজ ছন্দকে বেসামাল করে দিচ্ছে, তার বিবরণ। বাঘের সঙ্গে নয়, সাপ কিংবা কুমিরের সঙ্গেও নয়, আজ সুন্দরবনের মানুষের প্রকৃত লড়াই যে মানুষেরই সঙ্গে— এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে উপন্যাসটির কাহিনিবৃত্তে। মানুষে মানুষে এই শত্রুতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে স্পষ্ট করতে লেখক শুনিয়ে যান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সজীব কিন্তু মৃত্যুগন্ধী বর্ণনা— যার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে উদ্বাস্তু মানুষের, পলায়মান মানুষের ছিন্নমূলত্বের বেদনা। এই বেদনাকেই লেখক বিশেষ থেকে নির্বিশেষের পর্যায়ে উন্নীত করে দেন। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি মানুষই যে কোনও-না-কোনওভাবে অন্য কোনও মানুষের কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে, জীবনের মূলস্রোত থেকে শিকড়বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, অন্য কোনও জীবনক্ষেত্রে শিকড় গাড়তে চাইছে কিন্তু বারবার ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে নানা বাধাবিপত্তি বা দুর্বিপাকের কাঁটাতারে— জীবনের এই সাধারণ সত্যটিকেই সোহারাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। আর যে বিষয়কে আশ্রয় করে তিনি এই জীবনবীক্ষাকে রূপদান করেছেন, সেই বিষয়কে ধারণ করেছে সুন্দরবনের মানুষের আবহমানকালের জীবনাভিজ্ঞতাজাত মিথ— যাকে নবরূপ দিয়েছেন লেখক, সেই সঙ্গে তাকে দিয়েছেন এক অসামান্য প্রতীকী তাৎপর্য। যদিও ড. দেবব্রত নস্কর বলেন, -

> "বনবিবির পালাগানে বনবিবি, নারায়ণী, দক্ষিণরায় প্রমুখ চরিত্র প্রতীকী বা 'সিম্বলিক' বলেই মনে হয়"[৮]

— তবু তার প্রতীকী রূপটি যে অনেকটাই আচ্ছন্ন ছিল মূল মিথটিতে, তা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। সোহারাব হোসেনের 'গাঙ বাঘিনি'-তে বিনির্মিত মিথটির প্রয়োগে তার প্রতীকীধর্মিতা ও প্রাসঙ্গিকতা পাঠকের বোধের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ধরা দেয়।

মাছমারা, কাঠকাটানিয়া, বাউলে, মউলেদের অনিশ্চিত জীবনযাপনে আশ্রয়ের খুঁটি বনবিবি, শাহজঙ্গুলি, বড়খাঁ গাজি বা কালুরায়ের উপর বিশ্বাস, যে এঁরা তাদের বাঘ-কুমির-সাপ বা অন্যান্য আরণ্যক অথবা সামুদ্রিক বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যেমন ধোনা-দুখের পালায় মা বনবিবি রক্ষা করেছিলেন অসহায় দুখেকে, বাঁচিয়েছিলেন বাঘরূপী দক্ষিণরায়ের করালগ্রাস থেকে, তেমনভাবেই। কিন্তু আজ আর বাঘ-কুমির-সাপ হয়ে বিপদ আসে না, আসে মানুষের রূপ ধরেই। আসে জলদস্যুর রূপ ধরে, মাওবাদীদের রূপ ধরে, আড়তদার-খটিদারের রূপ ধরে— আসে কোস্টগার্ড বা ফরেস্টারের রূপ ধরেও। আজ সুন্দরবনের মানুষ বাঘ-কুমিরের চেয়েও বেশি ভয় পায় এইসব মানুষগুলোকে, কারণ—

> "বাঘ-কুমিরে আমাদের প্রাণ কেড়ে নেয় যখন-তখন, এটা কষ্টের। কিন্তু কোস্টগার্ডে-নেভিবাবুতে-ফরেস্টারে আমাদের ইজ্জত নেয়। এটা দুঃখের বাবু, বড় দুঃখের।"[৯]

বাঘ তথা দক্ষিণরায়ের মতই আচমকা হানায় জলদস্যুরা লুঠ করে নিয়ে যায় ইলিশভরতি ট্রলার।

> "গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া সুন্দরবনের রায়দীঘি, কুলতলি, কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং-এর মৎসজীবীদের প্রধান আতঙ্ক জলদস্যু।"[১০]

অত্যাচারী শাসকের মতই বাদার যুবতী নারীর ইজ্জত লুটে নিতে চায় সর্বশক্তিশালী ফরেস্টার-কোস্টগার্ড-নেভিবাবুরা। 'হাংরি টাইড'-খ্যাত অমিতাভ ঘোষ স্পষ্টই জানান, -

> "...বন-বিভাগের কর্তাদের হাতে এখন এত ক্ষমতা যে তাদের মর্জির উপর সুন্দরবনবাসীদের বাঁচা-মরাটা নির্ভর করছে।"[১১]

সাধারণ মানুষের টিকি বাঁধা যাদের কাছে, সেই সাবাড়ে ম্যানেজার, খটিদার, আড়তদাররা চূড়ান্ত শোষণ চালায় এদের অধীনে থাকা সাবাড়ে, মউলে, কাঠকাটানিয়া, মাছমারাদের উপর। আবার, নিজেদের পারস্পরিক রেষারেষির কারণে কখনও জলদস্যু, কখনও মাওবাদীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অন্য খটিদার বা আড়তদারের ইলিশবোঝাই নৌকো বা কাঠবোঝাই ট্রলার লুঠ করায়, কখনও ধরিয়ে দেয় পুলিশের হাতে। গরিবের বন্ধুর ভেক ধরে হাজির হয় মাওবাদীরা, কিন্তু ক্রমশ দেখা যায়, -

> "গরিবই ওমানকের মদতে গরিবরে মেরে ফেলতেছে।"[১২]

আর তাই ক্রমশ সুন্দরবনের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে—

> "মানুষিই তো আসল বিপদ! বনের পশু পোষ মানে, মন্ত্রে বশ হয়। কিন্তু মানুষ হয় না। ওরাই বাদার আসল শত্তুর!"[১৩]

তাই একালের সাইদার সাধনা করে মানুষ-বন্দির মন্তরের। মানুষই হয়ে ওঠে বাঘ-কুমির, মানুষই হয়ে ওঠে "... দক্ষিণরায়-বড়খাঁ গাজি খাঁর কালুয়ারা! ...ওরা মা বনবিবির ভাই শাহজঙ্গুলি আর বাবা কপিলমুনির শত্তুর!"[১৪] ইলিশবোঝাই ট্রলারে জলদস্যুর হানা তাই বাদাবনের মানুষের মিথোম্যানিয়ায় পরিণত হয় দক্ষিণরায়ের হানায়। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের অভিনয়ে 'ধোনা-দুখের পালা'-য় সংযুক্ত হয় নতুন আখ্যান— যেখানে দক্ষিণরায় তার সহচর বড়খাঁ গাজিকে হালুম-হুলুম কামনায় বলতে থাকে—

> "শুনছি রোজরোজ কালা জঙ্গলে ইলিশ উঠতেছে ভালো
> কোথা লুকাবি তারে রাক্ষস বাউলে আর যত আছে মালো
> স্পিড বোডেতে গিয়ে ত্বরা ত্বরা আজ হানিব আক্রমণ
> লুটিয়া ফিরিব উড়িয়ে নিশেন বাদার অজুত ধন।।"[১৫]

মাওবাদীরাও দক্ষিণরায় বলে চিহ্নিত হয়ে যায়, কারণ মিথের দক্ষিণরায়ও "যেরাম পেথমে বাদার বাইরির হানাদারের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা কোরেলো আর পরে হোয়েলো নরখাদক, ওনারাও তেমনি।"[১৬]

এই দক্ষিণরায়ের সঙ্গে মূল মিথের দক্ষিণরায়ের চরিত্রগত পার্থক্য বিস্তর। এই দক্ষিণরায়ে লেখকের কল্পনার প্রলেপ রয়েছে অনেকটাই। বস্তুত কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল', মরহুম মুনশী মহম্মদ খতের রচিত 'বোনবিবি জহুরানামা' ইত্যাদিতে দক্ষিণরায় বনবিবির যে মিথ পাওয়া যায়, তার থেকে লেখক সরে এসেছেন অনেকটাই। মিথের এই পরিবর্তন লোকমানসের স্বাভাবিক চরিত্রের কারণে ঘটতেও পারে কিন্তু 'গাঙ বাঘিনি'-তে মিথের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাহিনিগত গুরুত্বই বেশি। এই নতুন মিথে মক্কানিবাসী বেরাহিম গাজি পরিণত হয় বসিরহাটের বেনিয়াতে, যে ময়ূরপঙ্খী নৌকো ভাসিয়ে এসে লুঠপাট করে নিয়ে যায় কেবল বাদার মোম-মধু-মাছ নয়, বাজার নারী গুলাল-বিবিকেও— যে গুলাল বিবিও মূল মিথে মক্কারই কন্যা। এই হানাদার বেরাহিম গাজির হাত থেকে বাদার মানুষের বেঁচে থাকার সম্বল মোম-মধু-মাছ-কাঠ রক্ষা করতে সুন্দরবনের দ্বীপ-দ্বীপান্তরের ভূমিপুত্র পুণ্ড্রক্ষত্রিয়রা— যাদের "নগুরে সভ্য মানুষরা... রাক্ষস বলে বিদ্রূপ করত"[১৭] তারা একত্রিত হল, এবং তাদের দলের নেতা নির্বাচিত হল দণ্ডাবক্ষ-নারায়নীর পুত্র দক্ষিণরায়। স্থানীয় মানুষদের নিয়ে তৈরি এই বাহিনির সাহায্যে বেরাহিমকে পরাস্ত করে দক্ষিণরায়। বেরাহিমের দলবল ডুবে মারা যায়, সে নিজে পালিয়ে যায় তার বড়ো স্ত্রী ফুলজানকে নিয়ে, পিছনে ফেলে যায় তার 'বাদার প্রেমিকা' গুলাল বিবিকে— যার সন্তান বনবিবি ও শাহজঙ্গুলি। বিজয়ী দক্ষিণরায় বাঘকে নিজের বাহনে পরিণত করে— যে বাঘকে লেখক বলেছেন "পুণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী দল,"[১৮] আর গুলাল বিবিকে পরিণত করে নিজের দাসীতে। বনবিবি-শাহজঙ্গুলি পালিয়ে গেলে তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে সে। বীরত্বের কারণে দ্বীপে দ্বীপে মানুষ তার পুজো করতে শুরু করে। কিন্তু ক্রমশ "মানুষের ভক্তি পেয়ে, গরিবের বন্ধু আখ্যা পেয়ে"[১৯] যখন রাজা হয়ে, বিলাসবাসনে অভ্যস্ত, "কামে কামনায় মত্ত"[২০] হয়ে উঠল দক্ষিণরায়, সাধারণ মানুষের ধনসম্পদ লুটেপুটে 'ধনের পাহাড়' বানিয়ে তুলল, তখন সাধারণ মানুষ সাহায্য চাইল কপিলমুনির কাছে, যিনি ছিলেন "বিরাট মাপের প্রতিবাদী মানুষ"[২১]। বিপদ বুঝে দক্ষিণরায় তার সমস্ত ধনসম্পদ বন্ধু বড়খাঁ গাজির সাহায্যে লুকিয়ে ফেলল আঠারো ভাঁটির দেশে, নদী মোহনায়। আর কপিলমুনির বরে বলীয়ান বনবিবি-শাহজঙ্গুলি ধোনামৌলের ফেলে যাওয়া দাসীপুত্র দুখেকে বাঁচানোর অছিলায় দক্ষিণরায়কে শায়েস্তা করল। দক্ষিণরায়-বড়খাঁ গাজি বশ্যতা মানল বনবিবি আর কপিলমুনির।

মূল মিথে বেরাহিম গাজির হানাদারি বৃত্তির কোনও উল্লেখ যেমন নেই, তেমনি উল্লেখ নেই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য জনসাধারণের দক্ষিণরায়কে নেতা বলে নির্বাচনেরও। বেরাহিম গাজি ও দক্ষিণরায় সম্পূর্ণত সংযোগহীন সেখানে— বেরাহিম মক্কার এক বণিক, আর দক্ষিণরায় বা 'রায়সনাতন' ভাটির শাসক দণ্ডাবক্ষ আর নারায়ণীর পুত্র— শক্তির উপাসনা করে যে নরবলি দিয়ে তার মাংস খেত। বনবিবি-শাহজঙ্গুলি সেখানে দৈবপ্রেরিত অবতারকল্প মানুষ, যারা মক্কা থেকে খোদার নির্দেশে ভাটিদেশ দখল করতে আসে। কপিলমুনির কোনও উল্লেখ নেই, বরং পাওয়া যায় ভাঙ্গরপীরের নাম, যার কাছ থেকে নবাগত বনবিবি-শাহজঙ্গুলি জানতে পারে যে দক্ষিণরায় হল 'ভাটির ঈশ্বর'— মোম-মধুর অধীশ্বর সে। তাছাড়া বনবিবি-দক্ষিণরায়ের প্রত্যক্ষ যুদ্ধেরও কোনও উল্লেখ নেই— লড়াই হয় বনবিবি-নারায়ণী এবং শাহজঙ্গুলি ও দক্ষিণরায়ের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যে। ধোনা-মোনার পালায় দক্ষিণরায় ভাটির মোম-মধুর অধিকারী এক লোকদেবতা— যে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতই ভয় দেখিয়ে পুজো আদায় করতে চায়।

সামগ্রিকভাবে কাহিনিটির চরিত্রগত বদল ঘটিয়েছেন লেখক। মূল মিথের রাজপুত্র বা জমিদারনন্দন দক্ষিণরায় এখানে যেন সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি— যে সমস্যার হাত থেকে মানুষকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা করে ঠিকই, কিন্তু ক্রমশ নিজেই বৃহত্তর সমস্যায় পরিণত হয়। বাদার সামান্য নারী গুলাল বিবির জন্মগতভাবে দৈবশক্তিহীন পুত্রকন্যা শাহজঙ্গুলি-বনবিবি পরিণত হয় অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিতে— যাদের দ্বারা কপিলমুনি স্বৈরাচারী দক্ষিণরায়ের শাসনের অবসান ঘটান। মূল মিথের চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করে রচিত এই নতুন মিথকে একালের সমাজজীবনের দর্পণ করে তোলেন যেন লেখক, গোটা লোকপুরাণটিকেই নিম্নবর্গের অত্যাচারিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্লিখিত করে পরিণত করেন শোষিতের নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার আখ্যানে। তাই লোকদেবতা দক্ষিণরায় এ আখ্যানে পরিণত হয় 'নরখাদক বাঘের দেবতা'য়— আর এই লোকপুরাণ-আশ্রয়ী সাধারণ মানুষের চোখে যে কোনও অত্যাচারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তি অথবা সমষ্টি একীভূত হয়ে যায় দক্ষিণরায়ের সঙ্গে।

পাশাপাশি, একই লোকপুরাণের মধ্যেকার অন্য একটি অভিমুখকেও উপস্থাপন করেন লেখক। সমগ্র লোকপুরাণটির মধ্যে দক্ষিণরায়ই কেবল বাদার ভূমিপুত্র— বনবিবি, শাহজঙ্গুলি, কপিলমুনি প্রত্যেকেই বহিরাগত। কিন্তু এদেরই হাতে বাস্তুহারা হয় দক্ষিণরায়— হারায় তার অখণ্ড মাটির অধিকার। বাদায় তার চলাচলের সীমানা নির্দিষ্ট করে দেন কপিলমুনি। কেড়ে নেওয়া হয় তার আঠারো ভাটির সম্পদকে। বাউলে-কাঠকাটানিয়াদের চোখে দক্ষিণরায়েরই আরেক রূপ যে কোস্টগার্ড অধর রায়, সে উন্মূলনের নিজস্ব বেদনায় অনুধাবন করতে পারে দক্ষিণরায়ের যন্ত্রণার স্বরূপটি। তার সেই বেদনার্ত সত্তার কল্পনায় ঐতিহাসিক প্রতিবেশ, মিথ আর সমকালীন বাস্তব হাত ধরাধরি করে চলে। যে বাঘ সাধারণের চোখে প্রাণঘাতক, দক্ষিণরায়ের মূর্ত প্রতিরূপ— সেই বাঘই অধরের চোখে ছিন্নমূল প্রাণের প্রতীক হয়ে ওঠে, যখন সে বাঘ দীর্ঘপথ-নদী-সাগর সাঁতরে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসে পৌঁছয়। দুই বাংলার মাটিকে বিভাজিত করে রাখা কাঁটাবেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেও হয়ে ওঠে এক "শিকড় আলগা পুরুষ বাঘ"[২২] — ফেলে আসা মাতৃভূমির কথা মনে করে তার বুকের খাঁচায় কান্নার তুফান ওঠে। একদিকে নেহরু, প্যাটেল, জিন্নারা মিলে দুই দেশের মাঝে ওই কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে দেয়, ছিনিয়ে নেয় যেন সাধারণ মানুষের নিজস্ব আঠারো ভাঁটির সম্পদকে— যে সম্পদ নিহিত ছিল সম্প্রদায় নির্বিশেষে স্নেহপ্রেমপ্রীতির সম্পর্কে, ছিল অখণ্ড জল-মাটি-আকাশে; অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান-ভুট্টো-খানসেনারা মিলে ছিনিয়ে নিতে চায় তাদের শেষ-সম্বল ভাষা আর বাস্তুভিটেটুকুও। দক্ষিণরায়ের চোখে, অধরের চোখে এরাই বহিরাগত শত্রু— কপিলমুনি, বনবিবি, শাহজঙ্গুলি— যারা একদিন কেড়ে নিয়েছিল তার সর্বস্ব। তাই মুদ্রার অন্য পিঠটাও সে দেখতে পায়, বলে—

> "বাঘ শুধু মানুষ খায় না কাজলা। মানুষেও তারে খায়।"[২৩]

শিকড় আলগা বাঘটা নদী-বাদা সাঁতরে এসে পৌঁছয় ছোটো চামটেতে। কোনও এক ঋতুমতী বাঘিনির দেহদিগরের আতপ গন্ধই নয় কেবল— তার বাস্তুহারা প্রাণকে তাড়িত ক'রে মাটি পাওয়ার বাসনা, শিকড় গাড়ার স্বপ্ন। একটা আশ্রয় পাওয়ার উত্তুঙ্গ বাসনায় সে বারবার ঝাঁপ দেয় কাঁটাবেড়ায়, ব্যর্থ হয়, আহত হয়— কিন্তু লড়াই ছাড়ে না। লড়াই ছাড়েনি অধরও।

> "ধ্বজি থেকে বেনাপোল-পেট্রাপোল, সেখান থেকে বনগাঁ। কতবার যে আছড়ে পড়েছি। ক্ষতবিক্ষত হয়ে(ছি)। তার কি ইয়ত্তা আছে!"[২৪]

সীমান্তের বস্তুগত কাঁটাবেড়া শুধু নয়— জীবনের সর্বত্রই তার সামনে কোনও-না-কোনও কাঁটাবেড়া এসেছে, যখনই সে শিকড় গাড়তে চেয়েছে। কাঁটাতারে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে তাকে বারবার। সীমান্ত পেরিয়ে আসা আশ্রয়প্রত্যাশী অধরের কাছে কাঁটাতার হয়ে উঠেছে এপারের মানুষের অসহযোগ, মমত্বহীনতা, উদ্বাস্তু বলে দূরে সরিয়ে রাখা, বিশ্বাসহীনতা। পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার জন্য তাকে লড়তে হয়েছে দীর্ঘ দশ বছর—

> "দশটা বছর আমিও অমন লাফ মেরেছি রে পুরুষ। একবার দুবার নয় শতবার হাজার বার।"[২৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর তারপর সে পেয়েছে কোনো এক বাঘিনির শরীরের আতপ্ত প্রাণ— যুবতী নারী শরীরের ঘ্রাণ। ছিন্নশিকড় অধর শিকড় চারিয়ে দিতে চেয়েছে যেখানে-সেখানে, বারবার। কিন্তু সেখানেও কাঁটাবেড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে। কখনও বিবাহিত স্ত্রী অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ে মূলোচ্ছেদ করেছে তার, কখনও আবার সাবাড়ে রমণী কাজলার শরীরে শিকড় গাড়তে চেয়ে বাধা পেয়েছে প্রচলিত লোকবিশ্বাসে। জীবনের পরতে পরতে এভাবেই কাঁটাতার পেরোনোর মর্মান্তিক চেষ্টায় দেহমনের অজস্র ক্ষতে রক্ত ঝরেছে তার।

আর তাই অধর আজ আর মেনে নিতে পারে না কোনও উচ্ছেদকের অস্তিত্ব, সইতে পারে না কাঁটাবেড়া। লোকপুরাণের পরস্বাপহারক স্বৈরাচারী দক্ষিণরায়ের উদ্বাস্তু রূপটিই কেবল তার চোখে বড় হয়ে ওঠে। দক্ষিণরায়েরই অনুষঙ্গ কোথাও চলে আসে বেড়া পেরোতে চাওয়া বাঘ কেবল নয়, পাচারকারী, জলদস্যু, মাওবাদী এমনকি বেআইনি কাঠকাটানিয়াদের ক্ষেত্রেও। তাই তার মনে হয়, কাঁটাবেড়া কেটে দেওয়া উচিত, যাতে সে-বেড়া পেরোতে গিয়ে আর কেউ রক্তাক্ত না হয়। কিন্তু এই জলদস্যু, মাওবাদীদের ক্রিয়াকলাপে যে অশুভত্ব আছে, যে অশুভবোধ ছিল মিথীয় দক্ষিণরায় চরিত্রের মূলেও— সে সম্পর্কে অধর অসচেতন নয়। সমাজের উচ্চবর্গীয় ক্ষমতাবান মানুষগুলিও ওই অশুভশক্তির প্রতিনিধি মাওবাদী-জলদস্যুদেরই দোসর আজ। তাই তার বক্তব্যে প্রকাশিত হয় দ্বৈত তাৎপর্য—

> "বললাম তো এটা দক্ষিণরায়ের যুগ। ওর সম্পদ কপিলমুনি, বনবিবি আর শাহজঙ্গুলি মিলে কেড়ে নিয়েছিল! সব ফেরত দেওয়ার সময় এসেছে বুঝলে?"[২৬]

মিথীয় আবহে সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেন লেখক। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ ঘোষণা কেবলমাত্র একদেশদর্শী হয়ে থাকে না, অধরের চোখে বনবিবি-শাহজঙ্গুলিই হয়ে যায় উচ্ছেদক, অত্যাচারী। এ যেন লোকপুরাণের পাল্টা বয়ান— বলা যায় দক্ষিণরায়ের বয়ান।

ছিন্নমূলত্ব আর শিকড় গাড়তে না পারাই অধর চরিত্রের মূলগত বেদনা। তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় ওই বেদনার দ্বারাই। আর সেকারণেই শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে সে তার পক্ষ স্থির করতে পারে না। যে-কোনও উচ্ছেদক— সে সামাজিকভাবে ন্যায় বা অন্যায় যে পক্ষধারীই হোক না কেন— অধরের দৃষ্টিতে সে অন্যায়কারী। তাই জম্বুদ্বীপে জলদস্যুদের আক্রমণ, লুঠপাট ঠেকাতে পুলিশ-কোস্টগার্ডের মিলিত অভিযানে বেআইনি বসতি উচ্ছেদের খবর শুনে তার বাস্তহীনতার ক্ষতে রক্ত ঝরে। কী পুলিশ কী জলদস্যু— কাউকেই সে তাই ঘেঁষতে দিতে চায় না ছোটো চামটের কাছে। একইভাবে, তার আর বঙ্কিমের বিরুদ্ধে বেআইনি কাঠ পাচারের অভিযোগ ওঠায় যখন তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখন আরেকবার ছিন্নমূল হতে বসে অধর। আর এ জন্য মূলত দায়ী যারা, সেই কাঠকাটানিয়া দল, কাজলা, হানিফ— এরাই তার চোখে শত্রু হয়ে ওঠে— তার ভিটে হারানোর, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাঁটাতারের জন্য মূলত যারা দায়ী সেই নেহরু, জিন্না, প্যাটেলদের সঙ্গে এক হয়ে যায় এরা— তার দৃষ্টিতে। তাই কাজলার পায়ে গুলি চালায় অধর, বন্দুক তাক করে সমগ্র দলটির দিকেই। কাজলার মুখে সীমান্ত পেরোতে চাওয়া বাঘটির মৃত্যুসংবাদ শুনেই তার এই প্রতিক্রিয়া হয়। বাঘটি তার কাছে জীবনের কাঁটাতার পেরোতে চাওয়া এক লড়াকু সত্তা ছিল, ছিল তার নিজেরই এক প্রতিমূর্তি। বাঘটির পরাজয় তাই অধরের আত্মিক পরাজয়েরই সামিল। সম্ভবত লেখকেরই কল্পনার নির্মাণ যে সৃষ্টিবিষয়ক মিথটি উপন্যাসের প্রথমাংশ থেকেই উল্লিখিত হয় বারবার— সহবাসেচ্ছু বাঘের ব্যর্থসংগমে স্খলিত পুরুষবীর্য সাগরের বুকে নতুন দ্বীপের জন্ম দেয়— সেটিও জড়িয়ে ছিল বাঘটির সঙ্গে। নিজস্ব চেতনায় অধর মিথটিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে নিয়েছিল, শরীরে গর্ভপুজোর মাধ্যমে পুরুষ বাঘের বীর্যে নতুন সন্তান সৃষ্টিকেই সে নতুন চরার সৃষ্টি বলে মনে করেছে। বাঘটির মৃত্যু তার কাছে সেই চরা জাগবার সম্ভাবনার বিনষ্টির, তার শিকড় গাড়ার স্বপ্নের মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠেছে।

স্পষ্টতই ইতিহাস ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অধর চরিত্রটির অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে থাকলেও সে ইতিহাস কেবল অধরের যন্ত্রণার পটভূমি নির্মাণ করে গেছে। সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে তার উচ্ছিন্নতার বেদনা আর শিকড় গাড়তে না পারার যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছে মিথ আর প্রতীক। শিকড়হীনতার বেদনা আর নতুন করে শিকড় গাড়ার স্বপ্নের রূপায়ন ঘটিয়েছেন লেখক কাজলার চরিত্রেও। বাঘের পেটে স্বামী হারিয়ে সামাজিকভাবে যেমন সে ছিন্নমূল, তেমনি ছিন্নমূল সে পেশাগতভাবেও—

"সাবাড়ের জীবনে কুনো শিকড় নাই।"[২৭]

শিকড়হীন এই জীবনের অবসান ঘটানোর তাগিদেই হানিফ-হলধরদের সঙ্গে তার ছোটো চামটেতে যাত্রা— অধরকে নিজের দেহের যুবতী-গন্ধে মাতিয়ে-ভুলিয়ে রাখতে। পুরুষের লোলুপ কামনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সে বনবিবি সেজেছিল, নিজের চারপাশে ঘেরাটোপ দিয়েছিল নানা বিধি-নিষেধের, ট্যাবুর। কিন্তু সেই ট্যাবুই যেন তার শিকড় গাড়ার পথে কাঁটাতার হয়ে দাঁড়ায়। অধর-রূপী পুরুষ বাঘের আহ্বানে আকৃষ্ট হয় সে, কিন্তু ট্যাবুর বেড়া ডিঙিয়ে মিলিত হতে পারে না বাঘের সঙ্গে— ফুঁসে উঠেও বেড়া ডিঙোতে পারে না। শেষবারের মত বেড়া ভাঙতে গিয়েই রক্তাক্ত হয় কাজলা, অধরের গুলি খায়। দক্ষিণরায় আর বনবিবি এক আসনেই যেন বসে থাকে— অধর আহত হয় মানসিকভাবে, আর কাজলা শরীরে। কাজলার এই বেড়া ডিঙোতে চাওয়ার বিষয়টি লেখক প্রত্যক্ষভাবে কখনোই তুলে ধরেননি। পাঠককে কাহিনি ও চরিত্রের এই দিকটি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে মূলত বইটির প্রচ্ছদ— যেখানে নারীর মুখ-হাত-পা এবং বাঘিনির শরীর বিশিষ্ট 'গাঙ বাঘিনি' ঝাঁপ দেয় কাঁটাবেড়ায়— যে বেড়ার কালো রং বাখিনির ছোঁয়ায় লাল— যে লাল রং বাঘিনির রক্তের রক্তিমা। কাঠকাটানিয়া দলটিও চেয়েছিল শিকড় গাড়তে, প্রতিষ্ঠিত হতে।

> "দশটা দিনে পাঁচবার কাঠবোঝাই ট্রলার, কলসে-ঠাকরানে-হ্যালিডের পারে বদল কইরতে চাই। তা যদি পারি দিদি ... হলধর চাটনি খাওয়ার ভঙ্গিতে মুখের জল ভিতরে টানে—"[২৮]

কিন্তু তাদের এ আশাও পূর্ণ হয় না। বস্তুত গোটা আখ্যান জুড়েই বারবার বেজে ওঠে ছিন্নশিকড় সত্তার হাহাকার, আর শিকড় গাড়তে না পারার আর্তস্বর।

কাজলা আর হানিফ সাঁইদার এ উপন্যাসে অনেকটা যেন বনবিবি আর কপিলমুনির প্রতীক। 'দক্ষিণরায়ের যুগ' বলেই হয়তো এই সাধারণ মানুষগুলিও ছলনা আর অন্যায়ের দ্বারস্থ হয়। লেখকসৃষ্ট নতুন মিথের বনবিবিকে কপিলমুনি ব্যবহার করেছিলেন দক্ষিণরায়কে শায়েস্তা করতে, আর আজকের 'কপিল' হানিফ কাজলাকে ব্যবহার করে অধর তথা দক্ষিণরায়কে প্রলুব্ধ করতে, নিজেদের কাজ হাসিল করতে। সেদিনের কপিল-বনবিবি সাধারণ মানুষের সম্পদ বাঁচাতে চেয়েছিল কিন্তু আজকের কপিল-বনবিবি সে-সম্পদ পাচারকারী। বস্তুত উপন্যাসের শুরুতেই দক্ষিণরায়-বনবিবির একাসনে পুজো হতে দেখা গিয়েছিল— কাহিনিতেও বনবিবির দল আর দক্ষিণরায়ের মধ্যে তফাৎ থাকে খুব সামান্যই। তবু শেষপর্যন্ত লেখক ভরসা রাখেন সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবোধের উপরেই। চারিদিক থেকে দক্ষিণরায়ের নানা মূর্তির আকস্মিক হানায় পর্যুদস্ত দলটিকে তাই সাহসে যোগায় হানিফ—

> "দরকার হলে লড়াই দিতি হবে! ...মা বনবিবি মহাযুদ্ধের আখ্যান মনে পড়ে তোমার? ...তব্যে? বাদায় তো এটাই রীতি হলধর!"[২৯]

সমকালকে চিরকালের পটে স্থাপন করে নতুন এক মিথ সৃজনের পথে এগিয়ে যান লেখক। এ মিথ এ যুগের, এ কালের মিথ। মিথ, কল্পনা, সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের সুচারু মিশ্রণে স্বল্পাকৃতি এই উপন্যাসটিতে লেখক 'কালের মহাইঙ্গিতটিকে মূর্ত' করতে অনেকখানিই সফল হয়েছেন— এ কথা তাই স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

Reference:

১. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল এবং অন্যান্য, 'সাক্ষাৎকার: সোহারাব হোসেন', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ৬২৯

২. আলি, ওয়াজেদ, 'জঙ্গলের ভয়াল নিসর্গে', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০) : পৃ. ৫০৫-৫০৬

৩. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল এবং অন্যান্য, 'সাক্ষাৎকার : সোহারাব হোসেন', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ৫৩১

৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'সরম আলির ভুবন : বাস্তব ও মায়ার যুগলবন্দি', স্মারক : ৫০-শে পাসোহারাব হোসেন, (২৫ নভেম্বর ২০১৫) : পৃ. ৮৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. ঐ, পৃ. ৮৮
৬. হোসেন, সোহারাব, 'বলার কথা', গাঙ বাঘিনি প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭
৭. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০১, পৃ. ১১৫
৮. নস্কর, ড. দেবব্রত, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ৩৭২
৯. হোসেন, সোহারাব, গাঙ বাঘিনি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৬
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, 'জলদস্যুদের হাত থেকে সুন্দরবন কতটা সুরক্ষিত', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন : সমস্যা ও সম্ভাবনা-১, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫), পৃ. ২৪১
১১. ঘোষ, অমিতাভ, 'ভূমিকার বদলে', সুন্দরবনের গপ্পোসপ্পো, তুষার কাঞ্জিলাল, কলকাতা, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬, পৃ. ৬
১২. হোসেন, সোহারাব, ঐ, পৃ. ১৪৫
১৩. ঐ, পৃ. ১৪
১৪. ঐ, পৃ. ১৪০-১৪১
১৫. ঐ, পৃ. ৩২
১৬. ঐ, পৃ. ১৪৫
১৭. ঐ, পৃ. ২৮
১৮. ঐ
১৯. ঐ, পৃ. ২৯
২০. ঐ
২১. ঐ
২২. ঐ, পৃ. ৬১
২৩. ঐ, পৃ. ১২৫
২৪. ঐ, পৃ. ১০৪
২৫. ঐ, পৃ. ১২৪
২৬. ঐ, পৃ. ১২৬
২৭. ঐ, পৃ. ২৩
২৮. ঐ, পৃ. ১১৩
২৯. ঐ, পৃ. ১৬৬

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :
সোহারাব হোসেন, গাঙ বাঘিনি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, প্রকাশিত।

সহায়ক গ্রন্থ :
চন্দ্রমন্ত্রী সেনগুপ্ত, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১, প্রকাশিত।
ড. দেবব্রত নস্কর, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, প্রকাশিত।
পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১০, প্রকাশিত।

পত্রিকা :

নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত, সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০), প্রকাশিত।

নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত, সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১), প্রকাশিত।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 351 - 356
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘অপরাজিত’, ‘দেয়াল’ এবং ‘কুলি’ উপন্যাসে গ্রামীণ যুবকদের শহর নিরীক্ষা

ড. শান্তনু প্রধান
Email ID : pradhansantanu89@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Social structure, City life, Social norms, Relationships

Abstract
Just as Bibhutibhushan created Apu in the novel 'Aparajita', the evolution of that can be discerned in the character of Ranjit in Jaya Gowala's novel 'Deyal'. Ranjit also realized the same meaninglessness of lifeless relationships that Apudid when he came to Kolkata. On the other hand, in Mulk Raj Anand's novel 'Coolie', Munnu also went from Shyamnagar to different cities in search of work, and he also experienced the same. Although the perspectives of the three heroes are different, they are troubled by the same problems of city life. Before portraying the problems of city life, it is necessary to look at some features of socio-logical aspects of the city. Eminent sociologist S.C. Dube, in his book 'Bharatiya Samaj' states-

1. In urban life, the traditional social structure becomes somewhat loose and the old social norms become much weaker. As a result, the bonds between family, relatives, and different castes become looser.

2. Human-human relationships become much more impersonal, grooved, and systematized.

3. In urban areas, cold calculations of the advantages that would follow begin to take precedence in the exchange of relationships between individuals and groups. The observance of old rituals and ceremonies and contact with relatives begin to decline.

It is easy and imperative to explore how these attributes of city life are embodied in the three novels.

Discussion

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিভূতিভূষণ ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে যেমন অপুকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি সেই সৃষ্টির বিবর্তন যেন দেখা গেছে জয়া গোয়ালার ‘দেয়াল’ উপন্যাসের রণজিৎ চরিত্রের মধ্যে। অপু শহর কলকাতায় এসে প্রাণহীন সম্পর্কের যে মর্ম উপলব্ধি করেছে, সেই একই উপলব্ধি করেছে রণজিৎ-ও। অন্যদিকে, ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যে মুলক রাজ আনন্দের ‘কুলি’ উপন্যাসে মুন্নুও কাজের সন্ধানে শ্যামনগর থেকে বিভিন্ন শহরে গেছে এবং সেও একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তিন নায়কের জীবনের প্রেক্ষিত স্বতন্ত্র হলেও শহর জীবনের একই সমস্যায় তারা বিপর্যস্ত ও বিঘূর্ণিত হয়েছে। এই শহর

জীবনের সমস্যার চিত্র তুলে ধরার পূর্বে শহর সমাজতত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়া প্রয়োজন। সমাজতাত্ত্বিক S.C. Dube তাঁর 'ভারতীয় সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন—

১. শহর জীবনে সনাতনী সমাজ কাঠামো কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং পুরনো সামাজিক অনুশাসনগুলিও
অনেক দুর্বল হয়ে যায়। ফলে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও জাতপাতের বন্ধন আলগা হয়ে হয়ে যায়।[১]
২. মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয়ে ওঠে অনেক বেশি ব্যক্তি-সম্পর্কহীন, কেতামাফিক, নিয়মানুগ।[২]
৩. শহরাঞ্চলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্কের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ঠান্ডা মাথায়
আখেরের হিসাব বেশি করে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। পুরনো সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানের পালন এবং
আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ কমতে থাকে।[৩]
৪. সংস্কৃতি, শিক্ষা, মনোরঞ্জন ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট রসদ নগর জীবনে থাকে এবং তাকে
প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেওয়া হয়।[৪]
৫. বড় শহরের বস্তি ও ঝুপড়ির বাসিন্দারা সচেতনভাবে শহরের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলেও প্রধানত
গ্রামের আচার ব্যবহার ও নিয়ম-রীতি সেখানে কর্তৃত্ব করে।[৫]

শহর জীবনের এইসকল লক্ষণ তিনটি উপন্যাসে কীভাবে রূপলাভ করেছে তার নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসটি ১৩৩৬, পৌষ থেকে ১৩৩৮, আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রথম খণ্ড, ১৩৩৮, মাঘ (১৯৩২, জানুয়ারি), দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৩৮, ফাল্গুন (১৯৩২, মার্চ) মাসে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের আখ্যানে রয়েছে অপু কাশী থেকে মনসাপোতায় ফিরেছে। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরের মত প্রকৃতি এখানে আর খুঁজে পায়নি। এখানেই সে অন্যের বাড়িতে পূজার্চনা করে মায়ের সঙ্গে দিন কাটায়। কিন্তু পড়াশোনার তাগিদে গ্রামের পাঠশালা শেষ করে কলকাতা যাওয়ার জন্য সে মন স্থির করে। আর সেই কলকাতা যাওয়াতেই তার (অপুর) শহরের রূপ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয়। অপু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় পড়তে আসে। কলকাতা যাওয়ার আনন্দে সে আগের দিন সারারাত্রি ঘুমতে পারেনি। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে হ্যারিসন রোড, আমহার্স্ট স্ট্রীট ঘুরে পঞ্চানন দাসের গলির মেসে উপস্থিত হওয়ার সময় তার চোখে জেগে থাকে শুধু বিস্ময়। এমনকি মোটর গাড়ি, ট্রাম, ইলেকট্রিক পাখা তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। টিউশনি করে পনেরো টাকা আয়ে মেসে থাকতে থাকতে অপু এই শহর সম্পর্কে উপলব্ধি করেছে —

"কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়, এখানে কেউ কাহাকেও পোছে না।"[৬]

শহরে হঠাৎই একদিন শিয়ালদার মোড়ে নিশ্চিন্দিপুরের নীলমণি জ্যাঠার ছেলে সুরেশের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে তাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে গিয়ে এই কলকাতা শহরের প্রাণহীন সম্পর্কের মর্ম উপলব্ধি করে।[৭] প্রথম আলাপেই সুরেশ গ্রামের ছেলে অপুর সঙ্গে শহরের আদব-কায়দায় কথা বলেছে। পরে একদিন তাদের বাড়িতে জ্যাঠিমা ও অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে অপু বুঝতে পারে শহরের নিয়ম-নীতির বেড়াজালে মানুষ থাকলে কীভাবে দিনদিন পাল্টে যায়। একদা যে গ্রামে মানুষদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, শহরে বাস করা এইসব গ্রামীণ আত্মীয়দের কাছে আজ অপু লেশমাত্র খুঁজে পায় না। এদিকে দিনদিন যেন শহরের মেসের জীবনের একঘেয়েমি অপুকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রথম দিকে শহরের এই অভিজ্ঞতা তাকে হতাশ করেনি বলেই গ্রামের আত্মীয় সুরেশদের কলকাতার বাড়ির সাজানো পরিবেশ তার ভালো লাগে। ক্রমশই গ্রামীণ ও আদর্শবাদী অপু কলকাতা শহরের বাস্তব জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই পরে সুরেশদের বাড়ি যাওয়ার সময়ে তার পোশাকে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু সেখানে কারণে-অকারণে তার যাতায়াতে জ্যাঠিমা বিরক্ত হয়েছে। অপুর মনে কষ্ট হয়েছে কিন্তু কাউকে একথা বলেনি, এমনকি তার মাকেও নয়। অপু কিছুদিন গ্রামে কাটানোর পর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কলকাতায় ফিরে এসে এই শহরকে ভালো লাগে। একদিকে নাগরিক মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অন্যদিকে, শহরের পরিবেশ তাকে শহরের বৈপরীত্যের সন্ধান দিয়েছে। অপুর কলকাতা চেনার জগৎ সংক্ষিপ্ত। পূর্ব পরিচিত বন্ধুদের খুঁজে না পেয়ে সে তার একাকিত্ব মোচনের জন্য শহরে একা একা ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে সে কলকাতার নানা রূপ দর্শন করে। এই শহরের মানুষের জগৎ ও জীবন তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে দেখা দেয়। অপর্ণার সঙ্গে সাংসারিক জীবন শুরু করার পর ভাড়াটে বাড়িতে উপরতলার ভাড়াটের অনুদার, সংকীর্ণ কথাবার্তা তাকে আঘাত করে। অপুর মূল সমস্যা হল শহর জীবন তার ভাল লাগে না, তাকে মানিয়ে চলতে হয়।

কলকাতায় জীবিকার জন্য টিউশনি, খবরের কাগজের বিক্রি, লোহার জিনিসের দালালি করে সে বুঝেছে, এই শহরে সবকিছুতেই একটা প্রতিযোগিতায় চলতে হয়। চাকরি জীবনেও অপু নিদারুণ একঘেয়েমির স্বীকার হয়। তাই সময়ে-অসময়ে অপুর মন কলকাতা থেকে গ্রামে ফেরার জন্য বিদ্রোহ করত। কিছুদিন পরে সে কলকাতার চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এদিকে তার স্ত্রী অপর্ণা হঠাৎ মারা যাওয়াতে সে আরো ভেঙে পড়ে। যদিও সে পরে আবার কাজলকে নিয়ে এই কলকাতা শহরে এসেছে কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। সে আবার পল্লী প্রকৃতির টানে কলকাতাকে ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে গ্রামে চলে এসেছে। যদিও অপু গ্রামে নিজে থাকেনি। তার প্রতিনিধি কাজলকে রেখে গেছে। অর্থাৎ অপু নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে দিলেও অপুকে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি মাধুর্যময় জীবন প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

ত্রিপুরার জনজীবন এবং তাদের সমস্যা নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে একজন জয়া গোয়ালা। জয়া গোয়ালার জন্ম[৮] ত্রিপুরার চা বাগানের এক শ্রমিক পরিবারে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। জন্মসূত্রে তিনি হিন্দিভাষী হলেও বাংলা ভাষাই ছিল তাঁর মূল অবলম্বন। সংসারে দরিদ্রতার কারণে একাদশ শ্রেণির বেশি পড়াশোনা এগোয়নি। তাঁর প্রথম গল্প ‘পলাশপুরের মেয়ে’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ‘দেয়াল’ উপন্যাসটি তাঁর ‘অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ’ গ্রন্থের অন্তর্গত। যেটি প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। এই উপন্যাসটিতে রণজিৎ গ্রাম থেকে শহরে গেছে এবং কীভাবে শহরের নানা রূপ দর্শন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারই কথা বারে বারে উঠে এসেছে। উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রণজিৎ-এর উত্থান এবং শহরে টিকে না থাকার ব্যর্থতার কথাই বারে বারে বর্ণিত হয়েছে। রণজিতের জীবনে আমরা তিন ধরনের পর্যায় লক্ষ করেছি—

প্রথম পর্যায় : রণজিতের গ্রাম থেকে পড়াশোনা এবং সাংসারিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য শহরে আসা;

দ্বিতীয় পর্যায় : শহরের মেয়েকে বিবাহ এবং নাগরিক শিক্ষিত সমাজে মেলামেশার চেষ্টা;

তৃতীয় পর্যায় : নাগরিক সমাজে টিকতে না পারার ইতিবৃত্ত।

আমরা জানি, মানুষেরা জীবন-জীবিকার সন্ধানে, ভাগ্যান্বেষণে, উচ্চশিক্ষা লাভ, সুচিকিৎসার প্রয়োজনে নগরের বিলাস-বৈভবময় স্বচ্ছল জীবনের আকর্ষণে বিভিন্ন মানুষ গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে চলে আসে। তেমনি এই উপন্যাসের নায়ক রণজিৎ গ্রামীণ চা শ্রমিকের বাড়ির ছেলে হয়েও পড়াশোনা এবং স্বচ্ছল জীবন অন্বেষণের তাগিদে শহরে এসেছে। অতি কষ্টে বন্ধু শাশ্বতর সহচর্যে শহরে একটি স্থান করে নিয়েছে। ছুটির দিনে রণজিৎ তার গ্রামের বাড়িতে গেলে বাবাকে ব্যঙ্গ করে বলতে শোনা গেছে ‘শহরিয়া’।[৯] এই কথায় রণজিৎ কিছু মনে না করে সে বলেছে—

> “এই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কী জন্য! আমি কি পিকনিক করতে গেছি শহরে? তোদের জন্যই তো। তোদের খুশী করার জন্য, সুখে রাখার জন্যই তো, নাকি!”[১০]

শুধু তাই নয়, ছোটবেলাকার সঙ্গী ছমিয়াও রণজিতের ওপরে শহর থেকে কিছু নিয়ে আসেনি বলে রাগান্বিত হয়েছে। গ্রাম থেকে ফিরে এসে রণজিৎ নিজের অফিসের কাজের দায়িত্বের পাশাপাশি একটি নিজস্ব ঘর ভাড়া করে নিজের মতো করে থাকবার চেষ্টা করেছে। সে তার দায়িত্ববোধের প্রতি সর্বদা সচেতনশীল এবং বাবা-মা ও ভাইকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদিও সেই বাবা-মাকে না জানিয়ে হঠাৎই ওই ভাড়া বাড়িওয়ালার নাতনি মিনতিকে সে বিয়ে করেছে। পরে অবশ্য শাশ্বত রণজিতের কষ্ট বুঝতে পেরে হঠাৎ-ই সে (শাশ্বত) তার বাবা-মাকে শহরের ভাড়া বাড়িতে এনে উপস্থিত করেছে। শাশ্বতর এই আচরণে বন্ধু রণজিৎ খুশি হয়েছে, কারণ তার দুঃখের জায়গা শুধু শাশ্বতই বুঝতে পেরেছে। মিনতিকে দেখে তার (রণজিতের) বাবা-মার খুব পছন্দ হয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য শাশ্বত বলেছে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কত মহান, কত উদার ওঁরা! কত না সহজেই মিনতিকে আপন করে নিলেন। শুধু শুধুই তুই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিল। অহেতুক আত্মপীড়ন।"[১১]

গ্রামের মানুষরা যতটা সহজে শহরের মানুষকে আপন করে নেয় শহরের মানুষেরা গ্রামের মানুষকে এত তাড়াতাড়ি আপন করতে পারে না। মা মিনতির কাছে গল্প বলতে গিয়ে 'ছিলোমিলো' শব্দটির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে ত্রিপুরার চা বাগানকেন্দ্রিক ইতিহাস এবং তাদের ভাষায় কথা উঠে এসেছে—

> "সেই কবে ত্রিপুরায় এসেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। এই ভারতেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মানুষ এসেছিল ত্রিপুরার চা বাগানে কাজ করার জন্য। শ্রমিক হয়ে। নিজেদের দেশ-গাঁয়ে প্রত্যেকের-ই একটা ভাষা ছিল, যেমন আমাদের ছিল মুণ্ডারি। এখানে এসে ওরা দেখল চা বাগানে কেউ বলছে ওড়িয়া, কেউ ভোজপুরী, হিন্দি, কেউ বা সাঁওতালি কিংবা বাংলা। একসময় দেখা গেল সব ভাষা মিলেজুলে একটা খিঁচুড়ি ভাষা তৈরী হয়ে গেছে, ছিলোমিলো!... ভারতের ভিনভিন্ রাজ্য থেকে চালান হয়ে আসা এই মানুষগুলোই এখানে হিন্দুস্তানী নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে যে ভাষাটি সবচেয়ে বেশী চলে, সেটা এই ছিলোমিলোই। যদিও আমাদের আসল ভাষাটা মুণ্ডারি। তবু ছিলোমিলোই আমার মা।"[১২]

রণজিৎ এই ভাষা জানলেও চা-বাগানকেন্দ্রিক মানুষের কথা লিখেছে বাংলা ভাষাতেই। এই লেখার জগতের সঙ্গে মেতে ওঠার প্রেরণা তাকে অবশ্য শাশ্বতই দিয়েছে। শাশ্বত নিজেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে জড়িত। রণজিৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে চাইলেও তাকে অফিসে বারে বারে শুনতে হয়েছে শহরের অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত মানুষদের পরিহাস—

> "বার বার কানে বাজছিল 'চা বাগানের ছেলে কথাটা। চা বাগানের ছেলে কী কোন আলাদা মানুষ। কিংবা আদৌ মানুষ নয়! অন্যদের যা আছে সবই তো আমারও আছে! এতে এত আশ্চর্যের কী আছে।"[১৩]

এই পরিহাসের কারণ সময়ের ব্যপ্তিতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদিকে আবার মিনতি আস্তে আস্তে করে নিজেদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে রণজিতকে তার বাবা-মা-ভাই-এর থেকে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করে। যে মিনতিকে রণজিতের বাবা-মা অতিসহজেই মেনে নিয়েছিল সেই গ্রামীণ বাবা-মাকে সময় কালপর্বে নাগরিক মিনতি আর মেনে নিতে পারছে না। শুধু তাই নয়, একদিকে মিনতি এবং রণজিতের সংসার অন্যদিকে শাশ্বত ও তুলি বৌদির সংসারের চিত্র দেখলে মনে হয় যেন দুই নাগরিক পরিবার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে—

প্রথম পরিবার রণজিৎ ও মিনতি	দ্বিতীয় পরিবার শাশ্বত ও তুলি
১. রণজিৎ ও মিনতির একটি মেয়ে রয়েছে যার নাম হিয়া। ২. গ্রামীণ মানুষ শহরের মেয়েকে বিয়ে করে দাম্পত্য সংকটে পড়েছে। ৩. মিনতি শাশ্বতর সংসারের প্রসঙ্গ এনে রণজিতকে কথা শোনায়। ৪. রণজিৎ নিজে ভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনে এত জটিলতা নেই যতটা রয়েছে এই শহর জীবনের অন্দরমহলে। ৫. মিনতি তার এক বান্ধবীর কথা মতো হিয়াকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইলেও রণজিৎ প্রথমে তাতে রাজি হতে চায়নি। শুধু তাই নয়, মিনতি আরো চায় নিজেদের খরচ বাড়াতে রণজিৎ যেন গ্রামের বাড়িতে বেশি টাকা না পাঠায়।	১. শাশ্বত ও তুলি বৌদির কোনো সন্তান হয় নি। ২. শাশ্বতর বিলাসিতার জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনে সংকটের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। ৩. মিনতির কানের পাশা কেনার জন্য তুলি বৌদির উদ্দীপনা লক্ষণীয়। ৪. শাশ্বত চায় এই জটিল নাগরিক জীবনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে জীবন অন্বেষণ করতে। ৫. তুলি বৌদি শাশ্বতর বাইরের জগতটাকে পছন্দ করে না। সে চায় অজয় মাস্টারের মত শাশ্বত টিউসান করুক এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

	প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জীবনের গতি বদলে দিক।

লেখিকা এই দুই পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে তপনবাবু ও শর্মিলার সাংসারিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে তপন বাবুর অবৈধ সম্পর্কের কারণে ডিভোর্স দেওয়ার কথাও উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। রণজিৎ একদিকে অফিস অন্যদিকে, লেখালেখি জগতের সঙ্গে মিশতে গিয়ে অবসর সময় বেশি পায় না। এদিকে শাশ্বতর মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া এবং খামখেয়ালিপনার কারণে রণজিতকে শাশ্বতর জন্য সময় ব্যয় করতে হয়। শাশ্বত যেমন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সময় কাটায় তেমনি নাগরিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠতে রণজিৎ প্রত্যক্ষ করেছে। সময়ের প্রেক্ষাপট যত বদলেছে ততই রণজিৎ আপন ভালাবাসার মানুষদেরকে পর হতে দেখেছে। 'মুণ্ডা' হওয়াতে অফিসে তাকে নিয়ে পরিহাস করতে শোনা গেছে। যে শাশ্বত এত কাছের বন্ধু সুখ-দুঃখের ভাগীদার সেও তার বাড়ির বিছানায় রেখেছে রণজিতের জন্য সীমারেখা। পাশের বাড়ির কুকুর সুইটি বিছানায় উঠতে পারলেও সেখানে স্থান হয়নি বন্ধু রণজিতের। এদিকে মানসিক অবসাদ এবং শহরের একাকিত্ব গ্রাস করতে থাকে রণজিতের জীবনে। আজ সে ভুগতে থাকে জীবনের নিঃসঙ্গতায়। রণজিতের এই শহর একাকিত্বের চিত্র দেখলে প্রসঙ্গত আমাদের 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপু এবং মুলক রাজ আনন্দের 'কুলি' উপন্যাসের মুন্নু চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে অপু এবং মুন্নু দুজনেই স্বাচ্ছন্দ্য জীবনকাটাতে শহরে এলেও তারা শহরের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে পারেনি। কেউ বা শহর ত্যাগ করেছে আবার কেউ করেছে মৃত্যুবরণ। পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। রণজিৎ যে বাবা-মার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল তা রক্ষা করতে সে আজ অপারক। নিজের লোকেদের সঙ্গে শুধু সম্পর্ক নয়, মিনতি চায় রণজিৎ যেন তার 'মুণ্ডা' পদবি কোর্টের মাধ্যমে পরিবর্তন করে 'মণ্ডল' হয়ে যাক—

> "মণ্ডল হবো গো আমি। মুণ্ডা-তে তোমার বড্ড লজ্জা কিনা! একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের একটা সই, আমাকে ফার্স্ট ক্লাস মানুষ বানিয়ে দেবে গো। এই ক্লাসটাই তো আসল। এ দিয়েই তো সব সম্পর্ক গো।"[১৪]

অর্থাৎ, সম্পর্ক আর ভালোবাসার থাকে না, হয়ে যায় পুরোপুরি অর্থভিত্তিক। তাই রণজিতের মনের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। তার আর সংসার ভাল লাগে না। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে সে আজ হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তার লেখার ধরনও গেছে পাল্টে। লেখায় নেই মাটির সেই গন্ধ। তার মনে পড়ে যায় অফিসের প্রথম দিনে বিমলদার মতো লোকের মুণ্ডা রণজিতকে না মানার প্রচেষ্টা—

> "বার বার বলছিলেন বাগানের ছেলে। ওঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না নীচুতলার ছেলেটা ওঁদের মতো লিখতে পারে কিংবা পারবে। বিশ্বাস হচ্ছিল না যতটা, মেনে নিতে পারছিলেন না তার চেয়েও বেশি।"[১৫]

একদিকে শ্রেণিচেতনা এবং অন্যদিকে, শহরের মানুষদের স্বার্থান্বেষী মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তাই তারা সবসময় প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করে। এইভাবে রণজিতের জীবন থেকে একে একে ভালোবাসার জিনিসগুলি উধাও হয়ে যাওয়াতে সে আজ পশুতে পরিণত হয়েছে। সে ঘরে হিয়ার সামনে মদ খেয়ে মাতলামি করে। এমনকি মিনতির শরীরকে সে জোর করে পাওয়ার চেষ্টা করে। তাতেও সে খুশি না হওয়াতে চলে গেছে নগরের এক প্রান্তীয় বস্তিতে। মিটিয়েছে সে তার উগ্র কামনাকে। যদিও রণজিতের মনে হয়েছে সে আজ জানোয়ার হয়ে গেছে। মিনতি রণজিতের এই দশা দেখে তাকে মুক্তির জন্য বিষ খাইয়ে দেয়। শেষ দৃশ্যে রণজিৎ তার সারা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্বার স্মৃতিতে যেন দেখতে পাচ্ছে—

> "এই মাঝি-আন্ধার সাঁঝে সত্যিই নিশান্তের রক্তভোর আলো দেখছি-আমি বাঁচব গো বাবা...।"[১৬]

অন্যদিকে, মুলক রাজ আনন্দের 'কুলি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই উপন্যাসের নায়ক মুন্নু গ্রাম থেকে কাজের জন্য তার কাকা দয়ারামের সঙ্গে শ্যামনগরে আসে। এখানে এসে সে দেখেছে অধীনস্থকামী মানুষের মানসিকতা। এখানে সে বেশিদিন টিকতে না পেরে কাজের সন্ধানে শ্যামনগর থেকে দৌলতপুরে হাজির হয়। সেখানে সে ভাল মালিক প্রভুদয়ালকে পেলেও তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সে স্থানেও মুন্নু স্থায়ী আশ্রয় গড়তে পারেনি। এরপর সার্কাস দলের মাহুতের সহায়তায় সে বোম্বাই শহরে গিয়ে হাজির হয়। এই বোম্বাই শহরেই সে হরি নামক এক বৃদ্ধের সহায়তায় স্যার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 351 - 356
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জর্জ হোয়াইট কটন মিলে কুলির কাজ পায়। কিন্তু ভাগ্যের অমোঘ পরিহাসে সে এখানেও স্থায়ী হতে পারেনি। একদিকে মিলের ধর্মঘট এবং দাঙ্গার পরিবেশে ছোটাছুটি করতে গিয়ে মিসেস মেনওয়ারিং-এর গাড়ির সামনে এসে পড়ে মুন্নু। মিসেস মেনওয়ারিং তার বাড়ি সিমলায় নিয়ে যায় মুন্নুকে এবং সেখানে সেবা শুশ্রূষার পর সুস্থ হলে সেই বাড়িতেই চাকরের কাজ করায়। পরবর্তীতে সে (মুন্নু) রিক্সা করে মেমসাহেবকে পাহাড়ে ঘোরাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ভর্তিও হয়। কিন্তু সঠিক দেখাশোনার অভাবে মুন্নু সেখানেই মারা যায়। এই দীর্ঘ একাকীত্ব-জীবনে সে অনুভব করে জীবন বীক্ষার দোলাচলতা। এই দোলাচলতা হয়ত এসেছে সময়ের কথকতার বয়ানে। ফলে কখনো 'অপরাজিত' উপন্যাসের অপুকে কখনো 'দেয়াল' উপন্যাসের রণজিৎ-কে, কখনো 'কুলি' উপন্যাসের মুন্নুকে এই সময় ও শহর সমাজ ব্যবস্থার মায়াজালের ঘেরাটোপে আমরা পর্যুদস্ত এবং বিপর্যস্ত হতে দেখেছি। এই তিনজন গ্রামীণ যুবক তিন জায়গার হলেও জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শহরে স্থায়ী আশ্রয় গড়তে চাইলেও সেই আশ্রয় তারা গড়তে ব্যর্থ হয়েছে— কেউবা প্রাণ দিয়ে, কেউবা শহরকে ত্যাগ করে। জীবনের অনন্ত বাসনা তাদের থেকে গেছে মনের অন্তরালে।

Reference:

১. দুবে, এস. সি., *ভারতীয় সমাজ,* (অনুবাদ : রায় রজত), ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১২, পৃ. ৪৪
২. তদেব, পৃ. ৪৪
৩. তদেব, পৃ. ৪৪
৪. তদেব, পৃ. ৪৪
৫. তদেব, পৃ. ৪৪
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত,* দ্বাদশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৬৪
৭. চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় উপন্যাসে কলকাতা সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ,* প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৭১
৮. চক্রবর্তী, জয়শ্রী, *লেখিকাদের সমাজ ভাবনা পূর্বাঞ্চলীয় কথাসাহিত্যে,* পুনর্মুদ্রণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২১১
৯. গোয়ালা, জয়া, *অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ (দেয়াল),* প্রথম প্রকাশ, অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা, ২০০৩, পৃ. ১৪
১০. তদেব, পৃ. ১৪
১১. তদেব, পৃ. ২৭
১২. তদেব, পৃ. ২৮
১৩. তদেব, পৃ. ৩১
১৪. তদেব, পৃ. ৬৭
১৫. তদেব, পৃ. ৬৩
১৬. তদেব, পৃ. ৭১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 357 - 362
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' : নাবিক পরিবারের অন্দরমহলের খোঁজ

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anisurrahaman1988@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Embracing the inherent responsibility, Contemporary Time and Society, Subaltern, Disintegration, Muslim Society.

Abstract
Shahidulla Kaisar was a distinctive storyteller of the 1930s in the twentieth century. He entered the literary world by embracing the inherent responsibility an artist has toward his contemporary time and society. Naturally, in the works of this little-known narrative artist, the voices of the illiterate, the impure, and the downtrodden have come to the forefront. He took up the pen for those who have no roof over their heads—for those who are boatmen, slum dwellers, and laborers.

One of his notable novels centered on the life cycle of the downtrodden is Sareng Bou. In Sareng Bou, Shahidulla Kaisar skillfully portrays the life stories of the boatmen cast out from the Brahmin community — those known to us as 'Subaltern' The decline, disintegration, and subsequent reconstruction of coastal families[5] form the central theme of Sareng Bou. Alongside this, the narrative also reveals the tale of the self-struggle of the Sareng Bou bride. Through his reportage in Sareng Bou, the novelist Shahidulla Kaisar has artistically rendered the lives of Muslim women and the women of Muslim society with a focus on personal experience and sensitivity.

Discussion

আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ওরফে শহীদুল্লা কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আরবি-ফারসি ও উর্দু ভাষা-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতার কাছ থেকেই তিনি অর্জন করেন মানবতার আদর্শ। দেশবিভাগ, উদ্‌বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মূল্যবোধকে তলানিতে নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময়েই তাঁর সাহিত্যজগতে আবির্ভাব। স্বভাবতই তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি মায়া-মমতা-ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা। তিনি নিজের অন্তরের তাগিদেই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের শোষিত মানুষের জন্য এবং অবহেলিত নারীদের জন্য কলম ধরেছেন,

> "প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় শহীদুল্লা কায়সার বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তাঁর লেখনীশক্তি, বক্তৃতা দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা,

> মানুষকে প্রভাবিত করার কৌশল তাঁকে পার্টির মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। অবিভক্ত বাংলা'য় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন।"[১]

'সারেং বৌ' সেই ধারারই বলিষ্ঠ আখ্যান। উপন্যাসের ন্যারেটিভে নোয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রাম বামনছাড়ির মুসলিম নাবিকদের জীবন এবং জীবনসংগ্রামের কাহিনি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে এক সারেং বৌ নবিতুনের আত্মসংগ্রাম ও আত্মনির্মাণের কাহিনি। মুসলিম জীবন ও মুসলিম সমাজের নারীকে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় ও সংবেদনশীলতায় শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার তাঁর 'সারেং বৌ' উপন্যাসের প্রতিবেদনে।

উপন্যাস শুরু হয়েছে নাবিক বৌ নবিতুনের নিত্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। যারা সমুদ্রের মানুষ, সমুদ্র যাদের জীবিকা, সমুদ্র যাদের জীবনের গান, সাগরের বুকে ডিঙি ভাসিয়ে যারা মাছ ধরে, সাগরের তরঙ্গে চড়ে যারা চলে যায় দূরদেশে সেইসব নাবিক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচেই। নবিতুনের জীবনকাহিনিই তার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। নবিতুনের স্বামী কদম গ্রাম থেকে নদী পেরিয়ে জীবন-জীবিকার সন্ধানে তথা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের পথ খুঁজতে সাগর দেশে পাড়ি দেয়। বাড়িতে রেখে যায় বউ নবিতুন এবং একমাত্র মেয়ে আককিকে। জমিজিরেত যে নেই তা কিন্তু নয়। তারা চাষও করে। তবু তারা সমুদ্রের মানুষ। সমুদ্রের মায়াবী নেশার মানুষ তারা। কদমও সেই মায়ায় আটকে পড়ে।

কদম প্রতি তিনমাস অন্তর যা টাকা পাঠাত তাতেই নবিতুনের ছোট্ট সংসার কোনোরকমে চলে যেত। মাঝেমধ্যে রঙিন শাড়ি, ফুলের তেল, গন্ধ সাবান আরও কত কী নিয়ে আসত কদম বৌ-মেয়ের জন্য। এমনই হয়ে আসছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। কিন্তু, -

> "...এবার কি হল। গেছে সেই যেবার মুরগির মড়ক লাগল গ্রামে–সেই বছর। তারপর দু'বছরের জায়গায় তিনটি বছর কেটে গেল, না একটা খবর, না একখানা চিঠি। এমন তো হয়নি কখনো?"[২]

এহেন অবস্থায় গ্রামের কেউ কেউ ধরে নেয় কদম আর ফিরবে না। সে মারা গেছে। কিন্তু নবিতুন প্রাণে একরাশ আশা নিয়ে সংসারের চাকাকে একাই গড়িয়ে নিয়ে যায়। অন্যের বাড়ি থেকে ধান নিয়ে এসে ঢেঁকিতে চাল তৈরি করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় নবিতুন। কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু বিকল্প আয়ের উৎস না থাকায় নবিতুন সেটাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়,

> "বারা বান্দা পরিশ্রমের কাজ, মেহনতের কাজ। অত বড় আর ভারি ঢেঁকিখানাকে টলাতে পায়ের জোর গায়ের জোর সবই ঢেলে দিতে হয়। আড়ায় মুখ রেখে ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয় নবিতুন। দূর করে ক্লান্তিটা। ওর কপালে আর নাকের ডগায় মুক্তোর মতো সাদা-সাদা ঘামের বিন্দু।"[৩]

শুধু ধান থেকে চাল তৈরি নয়, মুরগি পালা, হাঁস পালা, চাটাই বোনা, কোরা বানানো, ডুলা বানানো নানান কাজে লিপ্ত থেকে সংসারের চাকাকে গড়িয়ে নিয়ে যায় নবিতুন।

এদিকে দীর্ঘসময় স্বামী ফিরে না আসায় গ্রামের দুশ্চরিত্র মানুষ সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়। তারা নবিতুনকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশে আনতে চায়। পুবপাড়ার লুন্দর শেখ অসহায় নারী নবিতুনকে ভোগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। গুঁজাবুড়ি তার শাগরেদ। এই গুঁজাবুড়িই বর্তমানে নবিতুনের গায়ের জ্বালা ও গলার বিষ। কেননা সে-ই নানান ছুতোনাতায় নবিতুনের কাছে এসে লুন্দর শেখের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলে, -

> "ভেবে দেখরে নবিতুন, আমার কথাটা ভেবে দেখ। পালংকে বসে পায়ের উপর পা তুলে খাবি, থুবি, হুকুম চালাবি। হু করবি অমনি হ্যাঁ করে ছুটে আসবে এক গন্ডা দাসীবান্দী। হাত টিপবে, পা টিপবে বান্দী। চুল আঁচড়াবে, গোসল করাবে বান্দী। এরি নাম না ঘর করা।"[৪]

কিন্তু নবিতুন বাইজি নয়, সে সহজ-সরল গ্রাম্য বধূ। তার মধ্যে রূপের বাহার, যৌবনের জ্বালা, সর্বোপরি নিজের ছোট্ট পরিবারে আর্থিক অভাব-অনটন থাকলেও নিজের সতীত্বকে বিক্রি করতে রাজি নয়। আত্মসম্মানবোধে সজাগ-সচেতন ও সতর্ক নবিতুন। তাই সে গুঁজাবুড়ির লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মানুষের লোলুপদৃষ্টি এবং দীর্ঘসময় স্বামীর অনুপস্থিতি

একজন নাবিক বধূকে কতটা কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয় সেই বিষয়টিকে এখানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার।

উপন্যাসের নাম ‘সারেং বৌ’ হলেও ন্যারেটিভে সারেং তথা একজন নাবিকের জীবনকাহিনিও বাস্তবসম্মত ভাবে উঠে এসেছে। আমরা ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাস পাঠ করে জেনেছি জেলেদের জীবনকাহিনি; জীবনের স্বাদ যেখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে তারা কালাতিপাত করে। বছরের অধিকাংশ সময় তাদের দু-মুঠো অন্ন জোটে না। কোনোরকমে দিনযাপনের গ্লানিতে নির্বাহ হয় তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, -

> “জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোন দিন সাঙ্গ হয় না। ...ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে পুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।”[৫]

ঠিক তেমনই নাবিকদের জীবন। তাদের জীবনও নানান সমস্যাপীড়িত। সমুদ্রের মাঝে জাহাজে আগুন লেগে গেলে তাদের অকালেই প্রাণ ঝরে যায়। সর্বনাশা আগুন গ্রাস করে নেয় গোটা জাহাজকে। দেখতে দেখতে ছাই হয়ে যায় কোটি কোটি টাকার পণ্য। সওদাগরি জাহাজ ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় আটলান্টিকের অতলে। তখন ক্লান্ত-ব্যর্থ নাবিকের দল প্রাণটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাসাগরের অজানায়। কেউ সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে আনতে পারে, কারও বা জীবন সমুদ্রেই গিলে খায়। তেমনই এক ঘটনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়েছেন ঔপন্যাসিক এবং নাবিকদের জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে আমরা দেখি রুতুন্দা জাহাজে আগুন লেগে গেলে নাবিকরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছায়। কিন্তু দক্ষ নাবিক তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনকে তারা আয়ত্তে নিয়ে আসে, -

> “রুতুন্দা তলীর কান্ডারী, ওরা হুঁশিয়ার। ঝড়-ঝঞ্ঝায় ওরা নির্বিচল। দুর্যোগের মুখে দুঃসাহসী। সবাই মিলে ওরা আগুনটাকেই ঘিরে ধরেছে। সক্রিয় হয়েছে পাম্পগুলো। হাতে হাতে পাইপের মুখগুলো নিবদ্ধ আগুনের দিকে। অগ্নিনির্বাপী শত সহস্র তীরের মতো পানির ধারা ছুটে পড়ছে আগুনের ওপর। কিছুক্ষণের ভেতর আয়ত্ত হয়ে গেল আগুনটা। অক্ষত রইল জাহাজ। পুড়ে গেছে কিছু পণ্য। তা নিয়ে মাথা ঘামায় না নাবিকের দল। ওদের মায়া জাহাজের জন্য।”[৬]

আগুনের সঙ্গে লড়াই করে তারা নিজেদের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারলেও সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হওয়া খুব কঠিন, -

> “কান্নার রোল পড়েছে রুতুন্দা জাহাজে। যে শিশু রক্ষা পেল, বাবা তার এখনো ডুবন্ত জাহাজে। যে বধূ পৌঁছল নিরাপদ আশ্রয়ে, মাত্র কয়েক হাত দূরেই স্বামী তার তলিয়ে চলেছে জলের অতলে ওরই চোখের সুমুখে। তাই শিশু আর মেয়েরা কান্না জুড়েছে। ওদের আকুল কান্না ছাপিয়ে যায় সমুদ্রের গর্জন।”[৭]

এ তো গেল সমুদ্রের সঙ্গে নাবিকদের মরণপণ লড়াই। ডাঙায়ও তাদেরকে খুব সাবধানে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়। কেননা সেখানে আছে যৌনকর্মীদের সঙ্গসুখের প্রলোভন। তাদের কষ্টার্জিত ধন এক রাতেই উধাও হয়ে যায় যৌনকর্মীদের সঙ্গে আদিম খেলার মত্ততায়, -

> “গভীর হয়েছে রাত। গাঢ় হয়েছে বন্দরের নেশা। নাবিক আর ওদের ক্ষণপ্রেয়সীরা জোড়ায় জোড়ায় বার রেস্তোরার হল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে একটুখানি নিভৃতির খোঁজে। যারা এখনো রয়ে গেছে তাদের বোধহয় শক্তি নেই দু’পায়ে উঠে দাঁড়াবার। ওদের নেতিয়ে পড়া মাথাগুলো কাঁধের উপর ধরে রেখেছে বন্দর মেয়েরা।”[৮]

তেমনই এক নাবিক হল মন্তু নাবিক। বুড়ো হলেও ফুর্তির হাটে পিছিয়ে নেই সে। ঠিক সময়েই জুটিয়ে নেয় এক শ্বেতাঙ্গিনী সখী। মন্তু সারেং যেন খেলার পুতুল। খেলনা পুতুলের মতো বিনা প্রতিবাদে আপনাকে সঁপে দেয় মেয়েটির হাতে। কিন্তু নবিতুনের স্বামী কদম নবিতুনকে ছুঁয়ে করা প্রতিজ্ঞার কথা ভোলে না। সে বিশ্বস্ত থাকে স্ত্রীর প্রতি।

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জাহাজের অনেক নাবিক আবার নানা রকম অকাজ-কুকাজের সঙ্গেও জড়িত। বিশেষ করে চোরাচালানি করে অনেকেই ধনী হয়, অনেকে বিত্তবান হওয়ার স্বপ্নও দেখে। মন্তু সারেং ও কদম সারেং-এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বিষয়টিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মন্তু সারেং সেই দলেরই লোক যারা চোরাচালানি করে বড়লোক হয়। কিন্তু কদম সারেং?,

> "কদম সারেংয়ের মনে পড়ে বাপজানের কসম। বাপজানের সাথে একই জাহাজে কদমের প্রথম সমুদ্রযাত্রা। আসরের নামাজ পড়ছিল বাপজান। জায়নামাজটার এক পাশে বসিয়েছিল কদমকে। কদমকে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়ে এক রকম কসম খাইয়ে নিয়েছিল বাপজান। বলেছিল, বাবা, হারামের রুজিতে কখনো হাত দিবি না। হারাম খাবি না। হারাম ছুঁবি না। হারামের রুজিতে কখনো বরকত নেই। তারপর হাত তুলে নামাজ অন্তে মোনাজাতটা শেষ করেছিল মজল সারেং। জায়নামাজটা গুটোতে গুটোতে বলেছিল আবার, যদি এসব করিস তবে আমার ব্যাটা নস তুই।"[৯]

তা ছাড়া, জব্বর সারেং-জন্য তাকে বিনা অপরাধে তিন বছর জেল খাটতে হয়েছে বলে সে এসব অপরাধের সঙ্গে জড়ায় না। শত প্রলোভনেও সে সৎ থাকে। ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার এরকম ছোটো ছোটো ঘটনার মাধ্যমে নাবিকদের জীবনবৈচিত্র্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে এক নাবিক বৌ-এর জীবনকাহিনি শোনানোর দিকেই ঔপন্যাসিকের ঝোঁক বেশি। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিধিবিধান এবং অধঃপতিত মুসলিম সমাজের দৈন্যদশা দূর করে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়াস তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে দেখা যায়। যে সময়ে মুসলমান মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, অবরোধবাসিনী, সেই সময় শহীদুল্লা কায়সার নারীদের মুক্তির কথা বলেছেন, যা আমাদের ভাবিত করে। নারীদের তিনি কেবলমাত্র সন্তানের প্রসূতি ভাবেননি, ভেবেছেন সকল সৎকার্যের প্রসূতি হিসেবে।

উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনে দেখা যায়, নবিতুন স্বামীর দীর্ঘকালীন প্রবাস জীবনে স্বামীকে নিয়ে মনে মনে উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মনোবল হারিয়ে ফেলেননি। অভাব তাকে প্রতিনিয়ত কামড় মারে ঠিকই, কিন্তু সেই অভাবের কাছে মাথানত না করে একাই সংসারের হাল ধরে। অন্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান এনে সেই ধান থেকে চাল তৈরি করে সে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু গঞ্জে ধানের কল বসার দরুন ঢেঁকি ছাঁটা চালের কদর অনেকটাই কমে যায়। তখন যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসী রূপের কাছে আরও অসহায় হয়ে পড়ে নবিতুন। কিন্তু কায়সারের নায়িকারা যেন বাংলা উপন্যাসের সমাজ সংস্কারের বেড়াভাঙা নারী। নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের দয়া নিয়ে বেঁচে থাকার নারী নবিতুন নয়। তাই তো নিজের বাঁচার পথ সে নিজেই ঠিক করে নেয়। অন্যের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতে সম্মানে বাধে তার। তবু বেঁচে থাকার তাগিদে এবার চৌধুরি বাড়িতে গৃহস্থালির কাজ করতে থাকে নবিতুন। চৌধুরি বাড়ির ছোটো বউ তাকে নানাভাবে সাহায্য করে। কিন্তু সেখানেও বিপদ। দুশ্চরিত্র ছোট চৌধুরি, তার দিকে লোভের হাত বাড়াতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, -

> "সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো ক'রে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলচে-দান-পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?"[১০]

নারী দেহলোভী লুন্দর শেখের মোকাবিলা করেছে নবিতুন। বলপূর্বক নবিতুনের সতীত্ব নষ্ট করতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হাতে নিয়ে পালায় লুন্দর শেখ। লুন্দর শেখকে নিয়ে নবিতুনের ভয় কেটে গেছে। কিন্তু দুশ্চরিত্র ছোট চৌধুরির ভয় তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায়। সেই ভয়ে সে চৌধুরি বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

এরই মাঝে গ্রামে আগমন ঘটে নবিতুনের স্বামী কদমের। নবিতুন ফিরে পায় তার পুরোনো জীবন। স্বামীর সঙ্গে আদর-সোহাগে তার আনন্দে দিন কেটে যায়। মেয়ের বিয়ের কথা বলে। সন্তানসম্ভবাও হয়। খুশিতে তার মন নেচে ওঠে। কিন্তু যার কপালে সুখ লেখা নেই সে সুখী হবে কী করে? যারা তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শয্যাসঙ্গী করতে পারেনি তারা নবিতুনের নামে মিথ্যা রটায়। কদমের কাছে নবিতুনের চৌধুরি বাড়ির কাজে যাওয়ার কথা বলে। অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং নবিতুনের সন্তান মারা যায়, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বুঝি গলার আওয়াজ পেয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে যায় নবিতুনের! ঘুম ভেঙ্গে গায়ের উপর শাড়িটা ঠিক করে নেয় ও। তারপর মরা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ধীর পায়ে চলে আসে ঘরে।"[১১]

বউকে গালিগালাজ করে কদম আবার জাহাজের কাজে চলে যাবার জন্য মনস্থির করে। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। কেননা প্রকৃতি আঘাত হানে বামনছাড়ির জনপদের ওপর। সাইক্লোন ধেয়ে আসে উপকূলীয় অঞ্চলে। প্রবল ঝড়ে ও বানে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষের গড়া সভ্যতার যাবতীয় চিহ্ন। সাগরের পানি যেমন দু-পুরুষ আগে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বর্তমানে বামনছাড়ি গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের পিতামহদের, তারও আগে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ঠিক তেমনই এবারও ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের সবকিছু–ঘরবাড়ি, বৌ, প্রেয়সী, শিশু সন্তানকে, -

> "ওদের পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল, কিন্তু ডুবিয়ে গেল বামনছাড়ি গ্রামটা। ভাসিয়ে নিল ঘরবাড়ী। ভেসে গেল গরু ছাগল মোষ আর কিছু মানুষ। কদম নবিতুন, ওরা চোখ মেলে দেখল লুন্দর শেখের দোমালা দালান ছাড়া আর কোন ঘর অবশিষ্ট নেই বামনছাড়িতে।"[১২]

শেষ পর্যন্ত প্রবল ঝড়ে ও বানে ভেসে যায় কদম ও নবিতুনও। মৃত্যু হয় একমাত্র মেয়ে আককির।

জনমানব শূন্য চরে স্বামী কদমের অবস্থাও তথৈবচ। একটু পানির জন্য তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মৃতপ্রায় স্বামীর আপন স্তনদুগ্ধ দিয়ে প্রাণ বাঁচায় নবিতুন। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হাহাকার করে ওঠে কদম এবং বলে, -

> "একি করেছিস? একি করেছিস নবিতুন? পর করে দিলি? এমন দুষমনি করলি?"[১৩]

কারণ মুসলিম সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্ত্রীদুগ্ধ পান করা হারাম। যদিও এ ব্যাপারে কোরানে স্পষ্টভাবে কোনোকিছু উল্লেখ নেই। 'সূরা বাকারা'-তে উল্লিখিত আছে যে, মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু-বছর দুধ পান করাবে।'[১৪] নবিতুন গ্রাম্য নারী। পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও সে জানে বিপদে মানুষের জান বাঁচানো ফরজ। সব প্রতিকূলতাকে জয় করা সাহসী নারী নবিতুন ভেঙে দেয় প্রচলিত ঘুণে ধরা সংস্কারের বেড়াজাল। সামাজিক অন্ধ অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে স্বীয় বিচারবুদ্ধি ও মানবীয় গুণের অধিকারী নবিতুন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক নারীচরিত্র।

আসলে শহীদুল্লা কায়সার তাঁর 'সারেং বৌ' উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনে অন্ত্যজ জীবন তথা নৌজীবীদের জীবনকথাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে সমুদ্র-তীরবর্তী পরিবারের অবক্ষয়, ভাঙন এবং পুনর্নির্মাণই 'সারেং বৌ' উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। এ ছাড়াও শহীদুল্লা কায়সার নারীর প্রশ্নেও অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। কাজেই নারী চরিত্র নবিতুনের মাধ্যমে সমাজের যৌনতা, পুরুষতন্ত্র ও নৈতিকতার দ্বিমুখী মানদণ্ডকেও প্রকাশ করেছেন ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে।

Reference:

১. আলমগীর, শাহ (সম্পা.), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫, পৃ. ৩৪-৩৫
২. কায়সার, শহীদুল্লা, সারেং বৌ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮৮, পৃ. ১৬
৩. তদেব, পৃ. ১৪
৪. তদেব, পৃ. ১০-১১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪১৮, পৃ. ১৪
৬. কায়সার, শহীদুল্লা, সারেং বৌ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮৮, পৃ. ৮৯
৭. তদেব, পৃ. ১০২
৮. তদেব, পৃ. ৬২
৯. তদেব, পৃ. ৭৮
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে-বাইরে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯১৫, পৃ. ১১
১১. তদেব, পৃ. ১২৯

১২. তদেব, পৃ. ১৪৪

১৩. তদেব, পৃ. ১৫০

১৪. https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=240. Access on 29.03.2025 at 02:49 AM

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 363 - 370
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘শবরচরিত’ উপন্যাসে আদিবাসী নারীদের কর্মজীবন ও সমাজজীবন

মন্দিরা মুর্ম্মু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)
Email ID : mandmurmu@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tribal women, jangalmahal's women, multidimensional life, lodhashabar women,career, Namal,forest rights, social life.

Abstract
Tribal communities can be observed living on the southwestern border of west bengal. The social life of these tribals is deeply connected with the natural environment. Fiction writer Nalini Bera has published many works in the Bengali literary world, focusing on the so-called non-Aryan Bharatvarsha, i.e. the unexplored marginal regions. The novel 'Shabarcharit' is written around the daily events of that marginal region. The novel can be called the history of the Lodha Shabar nation. In this novel, just as the identity of the lives of tribal women is found, so too is the picture of their constant struggle to survive with their own society and the outside society. They simultaneously fight for gender, caste, education and food. These women who survive by working constantly suffer from self-criticism and job-criticism. They are determined to break the traditional social customs that deprive tribal women of their freedom. Various elements related to the multidimensional life of tribal women are seen in the novel. Women of the Lodha Shabar caste continue to handle the overall responsibility of the family throughout their lives. Therefore, while collecting various necessary materials in the forest and jungle, girls and old people can be seen in groups. In this society, women of all ages have equal responsibilities. This class of people, who are not used to farming, depend on the forest and jungle for their livelihood. Therefore, they enter the deep forest in groups in rows to search for vegetables, mahul, chhatus, etc. But there they have to be oppressed by the guards. When their rights over the forest and jungle are reduced due to the Forest Act, they become helpless and go east to work. There too, the evil eye of the outside world falls on the Lodha Shabar women, resulting in the downfall of the 'trees' of the society, i.e. the girls. Even in educational institutions, lower class girls have to suffer various kinds of harassment. A Lodha girl has tried to reach the source of light from this dark society. The hope of the entire Lodha society is on her. It remains to be seen how far this stubborn, courageous girl can take their society forward. This article is written keeping in mind the daily incidents that happen to Lodha,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Shabar, and Santal women. The issues mentioned in the novel are the main basis of this article.

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলকে জঙ্গলমহল নামে অভিহিত করা হয়। টাঁড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ রুখা–সুখা কাঁকুরে লালমাটি দিয়ে আবৃত অঞ্চলে বাস করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীরা। এখানে বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও আদিবাসীরাই সংখ্যায় বেশি। তারা ঘন জঙ্গলময় প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বেছে নেয় বসতি স্থাপন করার জন্য যেখানে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে দিন যাপন করতে পারে। সকলের অগোচরে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রতিপালন করে বেঁচে থাকাই যেন তাদের মূল লক্ষ্য। বৃহত্তর সমাজের থেকে বহুযোজন দূরে বসবাসের জন্য সভ্যতার ঢেউ তাদের কাছে পৌঁছাতে সময় নিয়েছে অনেকটা। এই প্রসঙ্গে বক্তব্যটি যথার্থ –

> “একমাত্র ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যেই আঞ্চলিক সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছিল। কারণ ইহার পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপিয়া আদিবাসী সমাজের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে উড়িষ্যার সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অনুভব করা যায় এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ইহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছেন। নানাদিক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন একটা বিশেষ রূপ লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। কারণ, এই অঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ বলিয়া বহির্জগতের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে।”[১]

কথাশিল্পী নলিনী বেরার কথাসাহিত্যে জঙ্গলমহলের কন্যারা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। তাঁর লেখার জগতে কিংবা নিজ জগতে আদিবাসী নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নলিনী বেরার লেখায় আদিবাসী নারীরা বৃহৎভাবে আলোচিত না হলেও, বিশেষ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। গ্রাম ঘরের নারীদের দিন যাপনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর লেখায়। এই নারীরা কোন দেবী সুলভ গুণে গুণান্বিত নয়, এরা একেবারে আটপৌরে সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ যাদের মধ্যে রয়েছে মানুষের সব রকমের লোভ, পাপ, লিপ্সা, দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম ও বিদ্রোহ। যাদের রূপ বদলায় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই। ‘শবরচরিত’ উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে নলিনী বেরা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, -

> “লোক উপাদান বিশেষত আমি যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো আমি যেখানে জন্মেছি, সেই স্থানটি হল সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলটা এবং এটা উড়িষ্যা সংলগ্ন। এর মধ্যবর্তী অঞ্চল মূলত ‘শবরচরিত’ উপন্যাসের আধার। এই অঞ্চলের যে সমস্ত লোধা, শবর সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করত মূলত তাদের জীবনকে আধার করেই এই উপন্যাস...।”[২]

কথাকার নলিনী বেরা বহু জায়গাতে স্পষ্ট করেছেন ‘শবরচরিত’ ও অন্যান্য রচনাগুলোর পটভূমি সম্পর্কে। লেখক নিজের জবানিতে যা যা উচ্চারণ করেছেন তাঁর সবটাই তার যাপিত জীবনের অংশ। আশেপাশে স্থিত সমাজ ও জীবনের অকৃত্রিম গাঁথা কথা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রদান করেছেন। সমাজ, ইতিহাসের সাথে সাথে ভৌগলিক বিচিত্র অনন্য রূপে ধরা পড়ে তাঁর লেখনীতে। দলিত ও আদিবাসী সমাজের নানান ধরনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কথাশিল্পী নলিনী বেরা। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের বিশিষ্ট জনপদ লোধা-শবর জাতির সমাজ চিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন সুবৃহৎ উপন্যাস ‘শবরচরিত’ (২০০৫)। সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ জীবনকে নিকট থেকে দেখেছিলেন বলে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন তাদের জীবনযাত্রা। তাঁর সাথে এই সমাজে স্থিত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আদিবাসী নারীদেরকে রচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আদিবাসী নারীদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিকগুলোকে সামনে রেখে কাহিনীর গতি নির্ণয় করেছেন। শিক্ষা, কর্ম, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও মূল স্রোতের সাথে জটিল সম্পর্ককে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন নিজ গুনে। উপন্যাসটি পাঠ করলে জঙ্গলমহলের লোধা-শবর নারীদের বাস্তব চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ‘শবরচরিত’ উপন্যাসে লোধা নারীদের জীবন সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে উপন্যাসের কয়েকটি লাইন দেখলে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"শোচনীয় শালবনে আলুথালু টিলার আড়ালে
লোধাশবর ললনার কণ্ঠে ক্ষুধিত দিনের পদাবলী
মাথায় কাঠের বোঝা নবজাত শিশুটি আঁচলে
শুকনো ডালের সাথে মলিন লতার কোলাকুলি –"[৩]

আদিবাসী সমাজের নারীরা আদিকাল থেকেই স্বাধীন (অনেকাংশে) ও স্বনির্ভরশীল। শ্রমজীবী এই নারীরা সংসারের গুরুভার নিজ কাঁধে তুলে নিতে অভ্যস্ত। লোধা সমাজের নারীদের বিবাহ লগ্নেই স্বামীর খাওয়া পরার দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। এই প্রথা নারীর উপর সামাজিক চক্রান্ত ও অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি বলে মনে হয়। কেননা, এই দিন থেকেই স্বামী ও সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সারা জীবনের জন্য আমৃত্যু বহন করতে হয়। তবে অন্যদিক থেকে দেখলে এই প্রথা মন্দ নয়, কারণ এর ফলে নারীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে তোলে। তাই আদিবাসী সমাজে তাদের গুরুত্ব কখনোই আবছা হয়ে যায় না। আদিবাসী নারীরা অর্থের দিক দিয়ে কতটা উন্নতি করেছে তা এখানে অর্থের লাভ ক্ষতির গণনা গাণিতিক নিয়মে করা যায় না। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি বোঝাতেই এত কথার উদ্রেক করতে হয়। আদিবাসী নারীরা সাধারণত স্বাধীন ও স্বনির্ভরশীল হয়েই বাঁচতে পছন্দ করে। এরা কর্মঠ ও চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। ছোটোকাল থেকে দারিদ্র্যের তাড়নায় বাবা-মায়ের সাথে হাতে হাতে কাজ করতে করতে অর্থকরী শ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলে। এমনকি বাড়িতেও বিনা শ্রম বিনিয়োগে অন্নগ্রাস পর্যন্ত করতে পারে না, ছোটো থেকেই স্বনির্ভরশীল হওয়ার মনোভাব গঠন করে বাড়ির অভিভাবকেরা। এই মনোভাব তৈরির পেছনে অবশ্যই দারিদ্রতা কাজ করে। এই পর্যায়ের মানুষেরা কোন না কোনোভাবে পারিবারিক ছোটখাটো কাজে শ্রম প্রদান করে থাকেই। নলিনী বেরার 'শবরচরিত' উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, একদঙ্গল লোধা মেয়ের সাথে রাইবু লোধার বোন সোমবারি বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলে। যেখানে বনআলু, ফলমূল, শাক–পাতা, ঝাঁটি, ছাতু, কুরকুট পাওয়া যায়। সেগুলো আনার পরে হয়তো কারোর উনুনে আগুন জ্বলবে আর তাতে চড়বে হাঁড়ি। তারপর পেট ভরাবে বাড়ির পুরুষদের। তারা বাড়িতে লোধানীদের পথ চেয়ে বসে থাকে। জঙ্গলমহলের অধিকাংশ আদিবাসী নারী বন-জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল ছিল। কর্মজীবন বলতে শুধুই পরিবারের পেট চালানোর জন্য শ্রমদান এর বাইরে গিয়ে কোনো রকম শ্রম করে অর্থ সাশ্রয় করার ভাবনা তাদের ছিল না। কারণ মূলত বস্ত্র, খাদ্য ও বাসস্থান ছাড়া অন্যান্য চাহিদা তাদের কাছে এসে পৌঁছাতে পেরেছিল না বহুদিন। পুঁথিগত শিক্ষা যেহেতু পেট ভরাতে পারে না তাই তাদের কাছে শিক্ষার কোন মূল্য ছিল না, কেবলমাত্র ক্ষুধা মেটাবার জন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে নানান রকম প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করাকেই নিজেদের জীবনে বেশি দরকারী মনে করত। এখানে ব্যতিক্রমী হিসেবে দেখানো হয়েছে কুমারী লক্ষ্মীরানী মল্লিক চরিত্রকে যে বাকি লোধা মেয়েদের মত ঘুটে, ধানের টুঙ, চুন বানিয়ে জীবনযাপন করার কথা ভাবতে পারেনি। তার ভাবনা ছিল আকাশের মতো অসীম, লেখাপড়া করে সমাজের মূল স্রোতে পৌঁছানো তার স্বপ্ন ছিল। যেখান থেকে আলো এনে তার সমাজের আঁধার ঘুচিয়ে দিতে পারবে। তবে নেহাতই যে লোধানারীদের শখ, আহ্লাদ, চাহিদা ছিল না তা বলা যায় না! নিত্য দারিদ্র্যতাকে সঙ্গী করে একসময় তাদের শরীরে মনে ক্লান্তি এসে যেত তাই মুদি দোকানী বঙ্কা মাহাতোর বউ ভেবে ক্ষণিকের জন্য সুখ হরণ করত শিশুবালা। সে মনে মনে ভাবতো –

> "আচ্ছা সে যদি বঙ্কার বউ হত? বঙ্কা মাহাতোর বউ? তার খুবই সুখ হত। হত কী? বনে জঙ্গলে সাপখোপের ভিতর এটা - ওটা ঢুঁড়তে হত না, দিব্যি খেতে পেত, সরু সরু চিকন 'চাউড়ের' ভাত। শাড়ি ব্লাউজ কত কী পরতে পেত কাপড়-চোপড়। ভরপেট খেয়ে দুপুরে ভাতঘুম, রোদে - রোদ্দুরে ঘুরতে হত না। আড়বেলায় রুপার গাড়ু থেকে এক খিলি সাজা পান, দত্তা মিশানো মুখেপুরে এবাড়ি - সেবাড়ি ফুরফুর ঘুরে বেড়ানো। খালি যা রাত হলে তুলোর তুল্য বিছানায় বঙ্কার দরুণ শুয়ে থাকা।"[৪]

একঘেঁয়ে কর্মব্যস্ততার জীবনে অন্য স্বাদ পেতে বহু লোধা রমনীরা জড়িয়ে পড়ে বঙ্কা মাহাতোর মত স্বচ্ছল জীবন যাপনকারী ব্যক্তিদের সাথে।

এই অঞ্চলের আদিবাসী নারীদের কর্মস্থান, কর্ম সবই জঙ্গলকেন্দ্রিক। মরশুম অনুযায়ী জঙ্গলের নানা উপাদান সংগ্রহ করে থাকে, যা তাদের নিত্য দিনের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। লোধা পুরুষেরা দিনের আলোয় জঙ্গলে প্রবেশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করতে না পারলেও নারীরা ঠিক সিঁধিয়ে যায়। জঙ্গল থেকে কাঠ-পাতা, ছাতু, বুনো ওল, আলু, মহুল, শাক প্রভৃতি সংগ্রহ করে। এছাড়াও এগুলো বিক্রি করে চালের জোগাড় করে পরিবারের অন্ন সংস্থান করে এবং বন জঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস মেয়েরা খুঁজে আনে আর তা অনেক সময় পুরুষেরা বাইরের হাটে বাজারে বিক্রি করে আসে। লোধাদের দৈনন্দিন জীবনে নারী-পুরুষের কাজ বলতে জঙ্গল থেকে নানা রকম জিনিস সংগ্রহ করা। এভাবেই প্রতিদিনের অন্ন ও অর্থ সংস্থান করতে হয় তাদের। এরকম একটি সমাজে দৈনিক চাহিদা ছাড়া জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন রকম চাহিদা বোধ করেনা। নারী পুরুষ কাউকেই এই সমাজ থেকে শিক্ষার আঙিনায় আসতে খুব একটা দেখা যায় না। যে সমাজের পুরুষেরা নিরক্ষর সেই সমাজে নারী শিক্ষা এক বিপ্লব। ভুবন ফুলটুসীর বড় মেয়ে নুকু একমাত্র যে লেখাপড়ার জন্য হোস্টেলে থাকে। ফুলটুসি তাকে লেখাপড়ার জন্য উৎসাহ দেখালেও ভুবন দেখাতে পারেনি। সে কুট কুট করে হেসে ভাবে, লোধা জাইতে উসব করে কে? ফুলটুসি নিরক্ষর লোধানি হলেও তার মধ্যে আধুনিক চেতনা লক্ষ্য করা যায়। তারা যে সমাজে বাস করে সে সমাজের সমস্ত কিছুকে যে সমর্থন করে এমন নয়! ভুবন ধান্দার জন্য জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে অভিমানে ঘুমন্ত নুকুকে গভীর ক্ষোভে মারধর করতে করতে বলে ওঠে চোর লোধাদের বাচ্চা চোর ছাড়া কি বা হবে!

জঙ্গল মায়ের জঙ্গল সন্তানরা নিজ মায়ের কাছে খেয়াল খুশি মতো যেতে পারে না। প্রতিনিয়ত তাড়া করে বিপদ; সে কখনো পুলিশের বেশে কখনো গার্ড বাবুদের বেশে। তাই চোরের মতই প্রয়োজনে সিঁধাতে হয় জঙ্গল মায়ের গর্ভে। মাছ, কাঠ, শাক-পাতা তুলতে গেলে এই ভয়ানক বিপদকে মোকাবিলা করতে হয় রীতিমত। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। শুধু যে জঙ্গলে ঢুকলে অপরাধ তা নয়, কখনো মনে হয় লোধা জাতে জন্মানোই তাদের অপরাধ!কেন না যেখানেই চুরি হোক না কেন তল্লাশি চলে লোধা গ্রামে। ক্ষমতাধারীরা গ্রামে ঢুকে বাড়ি-ঘর জিনিসপত্র ভাঙচুর করার পাশাপাশি লোধানীদের উপরেও হামলে পড়ে জুলুমি চালায়। প্রাণভয়ে লোধা পুরুষরা প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলে চলে গেলে বাড়িতে পড়ে থাকে শিশুবালার মতো নারীরা যারা দারোগার শিকারে পরিণত হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলতে চলতে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। দারোগার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নোংরা স্বর —

> "ছিঃ দুষ্টু করে না, ছিঃ! বলতে বলতে দারোগা শিশুবালাকে বুকের ভিতর জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করল, একসময় নাজেহাল হয়ে বলল, ইডিয়েট বুঝিস না আমার ঔরসে তোর পেটে লোধা বাচ্চা হবে না, হবে বামন বাচ্চা, - এসব ভেবেও তোর সুখ হচ্ছে না, সুখ?"[৫]

উচ্চবর্ণের মানুষদের নিজেদেরকে সর্বেসর্বা ভাবার যে প্রবণতা তা সূক্ষ্মাকারে গ্রন্থন করা হয়েছে। থানার বাবুরা যখন গাঁয়ে তল্লাশি চালায় গাঁ এফোঁড়-ওফোঁড় করে তখন ডরপুক লোধা পুরুষেরা জঙ্গল মায়ের গর্ভে আঁটারি-চুরচু কইম–কুড়চি বহড়া–পড়াশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে বসে থাকে। ব্যতিক্রমী রাইবু ছাড়া কারোর সচেতনা নেই। বাড়ির মেয়ে বউয়ের নিরাপত্তা নিয়ে ভাববার অবকাশ থাকে না, আপন প্রাণ বাঁচাতে লোধা পুরুষরা লুকিয়ে পড়ে। বাড়িতে পড়ে থাকে লোধনীরা। কেউ কেউ বাবুদের নজরে পড়লে ভোগ হয়ে হয়ে যায় নিমেষে। থানার বাবুরা গাঁ লন্ডভন্ড করে ছাড়লে তখন তারা ধীরগতিতে বাসায় ফিরে আসে। এসে ভুবনের মতো লোকেরা বউকে সন্দেহে কিল মেরে মিটিয়ে নেয় নিজের ক্ষোভ। বাইরের পুরুষ বাড়ির পুরুষ সকলের থেকে অত্যাচারিত লোধানী হুঙ্কার ছাড়ে —

> "অও যদি সন্দেহ মনে, জঙ্গলে নাই সেধাঞে ঘরে বসে বহু পাহারা দিলি নাই কেনে? কেন্নে? কেন্নে? কেন্নে?'[৬]

লোধা পুরুষেরা ক্ষমতাহীন, দুর্বল ও অসহায়ত্বের অবয়ব ছাড়া আর কিচ্ছু নয়! না পারে নিজেকে রক্ষা করতে আর না পারে স্ত্রীকে রক্ষা করতে! তাই সব ক্ষোভ-রাগ মিটিয়ে নেয় নিজের স্ত্রীকে শাসন করে।

জঙ্গলমহলের আরেক কন্যা মরণী সাঁওতালিনীকে কে বা কারা ধান কাটার বিলে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে দেয়। জঙ্গল মায়ের গর্ভেও রেহাই পায়নি মরণী, তার ইজ্জতকে হরণ করা হয়। বেলকুঁড়ি কাঁটা, রুপার পানপাতা সামনের উনিশ বছরের 'সহরায়' পরবে তার আর পরা হলো না। অত্যাচারীরা তাকে নিঃশেষ করে দেয়। আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যা যা বাধা আসে সেগুলো বেশিরভাগ আদিবাসী মেয়েরাই কাটিয়ে উঠতে পারে না। সামাজিক, অর্থনৈতিক বাধা ছাড়াও বাইরের জগতের অর্থাৎ তথাকথিত মূল স্রোতের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো জটিল বিষয় ও এসে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যায় বাধা হিসেবে। উপন্যাসে লোধা কন্যা নুকু হোস্টেলে থাকাকালীন নানা রকম ঠাট্টা, তামাশা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হয়। অন্য এক সাঁওতাল মেয়ে তাকেও এই একই রকম মানসিক পীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বড় জাতের মেয়্যারা, লোকেরা হামেশাই এই ধরনের উৎপীড়ন চালায় তথাকথিত নীচু জাতির মানুষদের উপর। এরপরও দমে যায়নি যে, সে হল নকু ওরফে কুমারী লক্ষীরাণী মল্লিক। যে অশিক্ষিত সমাজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পা দিয়েছে মূল স্রোতে। নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। সে আর পাঁচটা লোধা মাইয়ার মতন নয় নুকু, যে রাত থাকতে উঠে পাছিয়া নিয়ে গুরুর নাদি, ধানের টুঙ কুড়োতে বেরিয়ে পড়বে বাসিমুখে। আর নয়তো জঙ্গলে যাবে পাতা ছিঁড়তে ঝাঁটি কুড়োতে। খালধরে যাবে পচা শামুক কুড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে কলিচুন বানাতে। যা গেছে গেছে, আর নয়। তার মা এসব কাজ করতে আর পাঠায় না। গর্বিত ফুলটুসির অনেক আশা তার মেয়ে একদিন লোধাদের নাম উজ্জ্বল করবে বলে। তাই কলম-ধরা হাত আর যাবে না কাঁকড়া কি খঙ্গা খুঁজতে। নুকু পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতা লেখে ফাংসানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতা মহলে নাম প্রশংসা কুড়োয়। কঠিন বাংলাকে ছেড়ে নিজ মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাতে নিজের ও নিজেদের অধিকারের কথা জানায়। ভুলে যায় না সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।

"বনে জনম বনে মরণ   বন লোধাদের হকের ধন
কহে দে রাণী কহে দে মুনু, বন হামাদের মা বঠে।"[৭]

কিশোরী নুকু নিজেদের হক সম্পর্কে সচেতন তার সাহস ও অদম্য জেদ দেখে দিদিমণিরা ও রাইবু ফুলটুসিয়ারা আশা রাখে একদিন এই নুকু ওরফে কুমারী লক্ষীরানী মল্লিক লোধাশবরদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

উচ্চবর্ণীয় মানুষদের মতোই কিছু নিয়মকানুন মেনে চলে লোধা শবররাও। বেজাতে বিয়ে তাদের সমাজে গ্রাহ্য হয় না সহজে। লোধাদের মেয়ে লোধাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। যদি বেজাতের লোককে বিয়ে করে তো, বেজাতের লোকটা লোধা পাড়াতেই আসুক। আসুক, থাকুক লোধা হয়ে যাক আপত্তি নেই, তবে সমাজের মেয়ে নিজ সমাজ ছেড়ে অন্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে তা গ্রহণীয় নয়। সন্তোষ কুমহার ও সাবিত্রীর বিয়েতে নানা জনে আপত্তি জানাতে থাকে তবে শেষঅব্দি দমিয়ে দিতে পারেনি সমাজের মানুষেরা। আধপাগলি মেয়েটাই সামাজিক বেড়া জাল ভেঙ্গে নিজের ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়েছে প্রেমকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছে। অন্যদিকে দেখা যায়, একসময় সাঁওতাল সমাজে 'ইতুৎ-সিঁদুর' বাপলার চল ছিল এবং তা সামাজিকভাবে স্বীকৃতিও পেয়েছিল। তবে বর্তমানে এই বিবাহ রীতিকে রদ করা হয়েছে একে আর মান্যতা দেওয়া হয় না। কেননা এই বিবাহের নিয়ম হল কোন পুরুষ তার ইচ্ছেতে তার পছন্দ করা নারীকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে সিঁদুর পরাতে পারে।আর একবার সিঁদুর দিলে তা মুছে ফেলা যায় না, পছন্দ না থাকলেও তার সাথে সংসার করতে হয় আজীবন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যুক্তিহীন এই রীতিকে বর্জন করে নারীর ইচ্ছেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উপন্যাসে দেখা যায় কুসমি নামের সাঁওতাল যুবতীকে ছোটরাই নামক যুবক সিঁন্দুর পরাতে এলে সে রুখে দেয়।সেখানে উপস্থিত রাবণ টুডুর উক্তিতে স্পষ্ট হয় বর্তমান সমাজের রূপ –

> "এ বাবু, মেয়্যা যখন রাজি লয় তখন কাঁহাতক জোর জবরদস্তি!"[৮]

> "বিশ শতকের শেষে তথাকথিত অস্পৃশ্য বালক-বালিকাদের এখন আর বিদ্যালয়ের বারান্দায় বসে শিক্ষকের পড়ানো শুনতে না হলেও দরিদ্র দলিত ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে বর্ণহিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মতো সমান ব্যবহার পায় না। দলিত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহপাঠী বর্ণ হিন্দু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার ঘৃণা সূচক অবমানবিক ব্যবহার তাদের বিদ্যালয়ের দিনগুলিকে বিষময় করে তোলে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সত্যি। ফলে অনেক দলিত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করে অপমান থেকে মুক্ত হয়।"[৯]

শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়িত নাবালিকা পুনোই 'ছ্যারকানো' বেতটাকে 'গিরগিতি'কে ভুলে যাওয়ার জন্য তার যা যা পছন্দ সেগুলো করে যাচ্ছিল। বনে-বাদাড়ে মাঠে ঘাটে ঘুরছিল আর গেঁড়ি-গুগলি, স্মরন্তি-নাহাঙা-ঘলঘসি-চ্যাঁকা-ঘোড়াকানাশাক তুলছিল। মহুলের গুড় খাচ্ছিল। গোটা স্কুল ঘরটাকে ভুলতে চাইছিল সে। অসুস্থ সমাজের কাছ থেকে ছোট্ট প্রাণরাও রেহাই পায় না; যেখানে সমাজ গড়া হয়, গড়া হয় সমাজের আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বয়ং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজ ও মানুষ গড়ার কারিগরের কটু দৃষ্টি, নোংরা মানসিকতা গ্রাস করতে থাকে পুনোই-এর মতো বহু আদিবাসী নারীদের। সামাজিক বৈষম্য, জাতি ও গোষ্ঠীগত বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের কঠিন যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। হাটুয়া ঘরের ছুআরা পুনোই-এর অবর্তমানে স্কুলে বসবার চট্ পা দিয়ে 'ম্যাচড়ে' নোংরা করে দেয়। মাস্টার মশাই সদ্য কিশোরী পুনোই-এর ছেঁড়া ফ্রককে বেতের ডগা দিয়ে আরও ছিঁড়ে দেন, দারিদ্রতা যাদের নিত্য সঙ্গী তাদের কাছে লেখাপড়া করা অর্থহীন। মানুষের সর্বপ্রথম প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য ও পোশাক। অতি নিম্নবিত্ত মানুষদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়াটাই তাদের সমাজের বিরুদ্ধে বড় এক লড়াই, যে লড়াইয়ে নুকু ওরফে কুমারী লক্ষী রানী মল্লিকের মত মেয়েরা জয়ী। এমন সমাজ থেকে উঠে আসা এক কিশোরীর প্রতি স্কুল মাস্টারের এই হীন আচরণ ও অমানবিক মন্তব্য খুবই দৃষ্টিকটু। উক্ত ব্যবহারের ফলে বহু আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুল বিমুখ হয়ে ওঠে বর্তমানেও লক্ষ্যণীয় জাতি, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে পড়ে সাধারণ প্রান্তিক পরিবারের সন্তানরা। পুনোইয়ের মনে হয় – "কত কী সুখ পড়ে আছে এখন মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে, আর পুনোই কী না ইস্কুল ঘরে পড়ে 'গিরগিতি' খাচ্ছে 'গিরগিতি'! লেখা পড়া লোধাদের জাতে অসম্ভব ব্যাপার। সারাদিন বনে বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো বাচ্চাদের কি আর ভালো লাগে স্কুলে একটানা বসে থাকতে? তবে নুকুটার হয়েছে। সে লেখাপড়া করার জন্য শহরে থাকে। লোকেরা আশঙ্কা করে তার বিয়ে নিয়ে কেননা তার যোগ্য পাত্র নিজ সমাজে পাওয়া দুষ্কর। জট্টাবুড়ির কথায়— "অতি বড় সুঁদ্ রী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর?" বর্তমান সময়েও আদিবাসী গ্রাম গুলিতে জট্টা বুড়ির উক্তি শুনতে পাওয়া যায়। পীড়িত পুনোই চিরকালের জন্য স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার মতে, ইস্কুলটা খারাপ, ইস্কুলের মাস্টাররা খারাপ, ইস্কুলের হাটুয়াছুয়ারা খুবই পাজি কিন্তু তবু... কোথাও যেন মায়া থেকে যায় স্কুলের প্রতি। কিছুদিনের স্কুলের স্মৃতি তাকে আবেগে অভিভূত করে দেয়। বহু আদিবাসী শিক্ষার্থীরাই এইসব পরিস্থিতিকে সামাল দিতে না পেরে স্কুল ত্যাগ করে কিংবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দেয়।

তৃতীয় পর্বের শেষে দেখা যায়, লোধা শবরদের জীবন অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। তথাকথিত জীবন যাপন ও জীবিকাকে অন্য রূপ দিয়েছে ইতিমধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় লোধা শবররা বনজঙ্গল থেকে অধিকার হারিয়েছে। নরসিঙা খেদিয়েছে লোধাদের। অরণ্য আইনের আওতায় এখন বন জঙ্গল। জঙ্গলমায়ের উপর জঙ্গল সন্তানদের কোন অধিকার নেই আর। অন্যদিকে দেখা যায় গেঁড়াশবরের মৃত্যু। যার মৃত্যুতে একটা গোটা প্রজন্মের সমাপ্তি ঘটেছে। তার সাথে ধ' গাছটাও শেষ হয়ে গেল। যা ছিল এতদিনের সঙ্গী, রাইবু সোমবারিকে হারানোর পর ধ' গাছটিকে নিজের বোন ভেবে ছিল। দুঃখে-কষ্টে যার তলায় গিয়ে কষ্ট নিবারণ করত সেই গাছটিকে গুরভা কেটে ফেলে গেঁড়েশবরের চিতায় দেওয়ার জন্য। যে গেঁড়েশবর কিনা বলত, 'মানুষের থিক্যে গাছ অনেক বড়।' আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। বন জঙ্গল থেকে নানা উপাদান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়াও গাছপালাকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে থাকে। বেশিরভাগ পূজা-পার্বণে বিভিন্ন গাছের ডাল পাতা ছাড়া আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। বিশেষত শালগাছ, আমগাছ, নিমগাছ ও মহুলগাছকে এরা অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে। তাই বন-জঙ্গল তাদের জীবন ও সমাজের জন্য অতিব প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে চর্চা করলে দেখা যায় ব্রিটিশদের কিংবা বর্তমান ক্ষমতাশালীদের হাতে বন জঙ্গল যত না সুরক্ষিত তার চেয়ে বেশি সুরক্ষিত ছিল আদিবাসীদের হাতে। গাছপালা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও একেবারে নিঃশেষ করে কখনোই ব্যবহার করত না। যেহেতু প্রজন্মের পর প্রজন্ম বন জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে তাদের দিন কাটাতে হয় এই কথা মাথায় রেখেই তারা প্রকৃতিকে নিজের কাজে ব্যবহার করত। শবর রাজা রাইবু ও গুড়গুড়িয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে বিপুল পরিবর্তন আসে লোধা শবরদের জীবনে। অরণ্য আইনের ফলে বন জঙ্গল থেকে তাদের অধিকার খর্ব হয়ে যায়। বন জঙ্গলে ঢুকতে না পারায় তাদের প্রত্যেকদিনের জীবনযাপনে গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের জীবনে ভাটা পড়ে যায়। উপায়ান্তর খুঁজতে গিয়ে তারা নিলু ও গুরভার পরামর্শ মেনে 'নামাল' যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। এই পর্বের শেষে দেখা যায় জঙ্গলমায়ের গর্ভ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা পূবে 'নামাল' যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। যারা কখনো জঙ্গল জীবন ছাড়া অন্য জীবন ভাবতে পারেনি তারাই একদিন জীবন সংকট ও কর্ম সংকটে পড়ে পূবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেখানে তারা কামিন খেটে নতুন জীবন শুরু করবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 363 - 370
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোধা শবর নারীদের জীবনেও বদল আসে চতুর্থ পর্বে।যে নারীরা বন জঙ্গল থেকে কাঠ, পাতা, ছাতু, মহুল নানা রকম শাক পাতা তুলত; জমি-জলা থেকে মাছ, শামুক তুলে জীবিকা নির্বাহ করত। পাশাপাশি ঘুঁটে 'গঁইঠা' বানিয়ে গঁইঠা দিয়ে শামুক – শামকা পুড়িয়ে কলিচুন বানানো গোবরের নাদি জমিয়ে চাষের মরশুমে চাষীদের খত্ বিক্রি করা চাঁদবদনীর ও তার মায়ের আরেক কাজ! দোরখুলিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে রোজগার করত। চাষের কাজে অনভ্যস্থ সেই মেয়েরাও নামালে গিয়ে চাষের কাজে নাম লেখালো। এই নামালে শুধুই ধান চাষের কাজে এসেছে তারা কিন্তু রাইবু কখনো সমর্থন করত না লোধা মেয়েদের কামিন খাটতে যাওয়ায় তার আপত্তি ছিল। রাইবুর অবর্তমানে গুরভার কথায় সকলে আসতে রাজি হয় তাছাড়া জঙ্গল থেকে অধিকার হারানোর পর আর তাদের কোন উপায় ছিল না রোজগারের। কেননা চাষবাস তাদের জাতেও নেই ধাতেও নেই। পূর্বপুরুষ থেকে তারা এই যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। আজ তারা সব হারিয়ে পুবাল এসেছে নামাল খাটতে। নারী-পুরুষ সকলেই হাজির হয়েছে 'নামালে' তার সাথে হাজির নারী-পুরুষের কিস্ সা চাঁদবদনীর প্রতি নীলুয়ার আসক্তি, আবার চাঁদবদনীর প্রতি স্বপন ভাতুয়ার নজর উপন্যাসে উপস্থাপিত করা হয়েছে। জোৎস্না রাতে বামনদার বিলে সঙ্গমক্রীড়ারত এক নারী-পুরুষ যুগলকে দেখে স্বপন ভাতুয়া আশঙ্কা করেছে তারা হয়তো চাঁদ বদনী ও নিলুয়া। স্বপন ভাতুয়ার সাথে মেলামেশা করায় ঈর্ষান্বিত নীলুয়া এই রাতে চাঁদ বদনীকে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে এতদূর এনেছে হয়তো! –

> "ব্যাধের জাত। সিনেমা ভিডিওয় স্বপনভাতুয়া কতই তো দেখেছে - জাতের মেয়ে যদি বেজাতের ছেলের সঙ্গে পালাতে চায়, কোন রকম ফষ্টিনষ্টি করে, তবে সে-মেয়েকে তারা ছেলেটার সঙ্গে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে! নতুবা ছেলেটাকে গুম করে দেয়।"[১০]

বর্ণবৈষম্য যে শুধুই উচ্চবর্ণে লালিত হয়, তা নয় আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়েও বর্ণবৈষম্যের ভয়ংকর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদিবাসী মেয়েদের প্রেম বিবাহ স্বীকৃতি হলেও, বেজাতে বিবাহ কখনো স্বীকৃত হয় না। কুমহার সন্তোষকুমারের ও সাবিত্রীর বিবাহে গলযোগ তার উদাহরণ। আবার প্রসঙ্গ এসেছে এক রাজু এক লোধা ছুকরিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পেট বাঁধিয়ে ভিকা ভক্তার কাছে কী দণ্ডটাই না পেয়েছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ে বহু দৃষ্টান্ত এমন রয়েছে যেখানে বেজাতে বিবাহ করার ফলে ভয়ানক পরিস্থিতির কবলে পড়তে হয়েছে উভয় প্রেমিক যুগলকে। নিজেদের সমাজ সংস্কৃতিকে বহিরাগতদের সাথে মিশিয়ে ফেলতে চায় না। কেননা এতে সমাজের ঐতিহ্য বজায় থাকে না। সংমিশ্রণের ফলে সমাজে অনেক রকম পরিবর্তন আসে যা তারা চায় না। নিজেদের সংস্কৃতিকে অমিশ্রিত রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

রাইবুর মতে 'নামালে' গেলে মেয়েদের মানহানি হয়। তারা পর পুরুষের সংস্পর্শ আসার সুযোগ পাওয়ায় চরিত্র নষ্ট হয়। তবে খেতে না পেয়ে মরার চেয়ে গতর খাটিয়ে রোজগারের পথকেই বেছে নিয়েছে তারা। কামিল্লার সাথে ঢলাঢলি করে চা পানির ব্যবস্থা করে, গয়না লোভে দিশেহারা হয়ে নিজেদের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা; কামিল্লার ঘনিষ্ঠ হবার জন্য। লোধানীরা পেটের জ্বালার কাছে বশ মেনে যায়, বক্কা, কামিল্লা, গিরিহা অদ্বৈতর মতো পরপুরুষের কাছে। ফুলকাটা চক্রাবক্রা শাড়ির লোভে নিয়তি লোধানীর চোখ লকলক করে ওঠে। নিজেদের শখ, স্ফূর্তি ও খাদ্যের জন্য তারা বিক্রি হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে লোধানীরা মান-ইজ্জত। শরাবণ লোধার মেয়ে মেলায় ঘুরতে গিয়ে আর ফেরেনা, হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য কে বা কারা চাঁদবদনীকে ইটভাটায় তুলে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেয়। এখন ঘরের মেয়েকে ভাসান দিয়ে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে, রাইবুর বহিনটা গেল, গুড়খার বহিনটা গেল, তোর বিটিটাও গেল, ভুবনার মেয়্যাটাও যাব যাব করছে— সেদিন দেখলি নাই একটা বেজাতের পরপুরুষের সঙে— একের পর এক স্বজাতির মেয়েদের হারিয়ে তারা নিঃস্ব। আশঙ্কায় কাটায় জীবন। নিজেদের সমাজ জীবনকে হাজার চেষ্টা করেও সচল রাখতে পারে না এই মানুষগুলো। উপন্যাসের দুই নারীচরিত্র সোমবারি ও চাঁদবদনী স্পষ্টবাদী প্রাণচঞ্চল মেয়ে ছিল। রাইবুর বোন সোমবারিকে হরণ করে এক সাধু। উপন্যাসে দুই নারীকেই লোধা সমাজ হারিয়ে ফেলে। উচ্চবংশীয়দের লোলুপ দৃষ্টি দুই লোধা মেয়েকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

> "— গাছগুলাই যদি মরে যায় সব ফল ধরবে কুথায়? আর ফল নাই ধরলে লোধাবংশ নির্বংশ হবে নির্ঘাত। হঁ কী নাই? – গুরভা।"[১১]

লোধাশবর জাতির সমাজজীবনে যে বিশৃঙ্খলার করাল থাবা দেখা যায় তার উৎস কোথাও না কোথাও গিয়ে একটা বাঁধা ধরা অপবাদ। যেই তকমার দরুণ আজও আর পাঁচটা কাজ থেকে তাদের দূরে রাখা হয়। চরম জীবন সংকটে নীতি আদর্শ ভুলে তাই গাছ চুরির ধান্দায় জড়িয়ে পড়ে। আর আদিবাসী সমাজের মেয়েরা বিচিত্র সব কাজের জগতে প্রবেশ করে। নতুন জগতে এসে সেখানকার চোখ ধাঁধানো আলোয় হকচকিয়ে উঠে। গ্রাম, সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে গা ভাসিয়ে দেয় জোয়ারে। সুযোগ পেয়ে ঠিক ভুলের বিচার না করে মেলামেশা করতে শুরু করে বেজাতে পুরুষদের সাথে। সেই মায়াজাল ছিঁড়ে কেউ বা ফিরে আসে কেউ অতলে তলিয়ে যায় চাঁদবদনীর মতো। তবে সচেতন বুদ্ধিমতী কিশোরী নুকু ওরফে কুমারী লক্ষীরাণী মল্লিক উপর সমগ্র লোধাশবরদের আশা আছে সে একদিন তাদের মুখ উজ্জ্বল করবে, সে বাকিদের মতো হারিয়ে যাবে না...।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, 'জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১২, পৃ. ৩৮
২. https://dwaipayaan.blogspot.com/2014/10/blog-post_22.html?m=1 (নলিনী বেরার সাক্ষাৎকার, গ্রহীতা অন্তরা চৌধুরী)
৩. বেরা, নলিনী, 'শবরচরিত', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, পৃ. ৭৩৬
৪. তদেব পৃ. ২৫
৫. তদেব, পৃ. ৫২
৬. তদেব পৃ. ৬১
৭. তদেব পৃ. ১৫৬
৮. তদেব পৃ. ২৪৭
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, 'নারী শ্রেণী ও বর্গ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান', মিত্রম, কলকাতা ৭৩, (প্রথম মিত্রম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৯), পুনমুদ্রণ জানুয়ারি, ২০২৩, পৃ. ১০
১০. বেরা, নলিনী, 'শবরচরিত', করুনা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, পৃ. ৫১৯
১১. তদেব পৃ. ৭৩১

Bibliography:

ঘোষ, শাশ্বতী, 'ভারতীয় সমাজ ও নারীশ্রম', অনুষ্টুপ, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৩
ঘোষ, শাশ্বতী, 'সমতার দিকে আন্দোলনে নারী : প্রথম পর্ব', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭৩, (প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯৯) পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি, ২০০৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, 'নারী শ্রেণী ও বর্গ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান', মিত্রম, কলকাতা ৭৩, (প্রথম মিত্রম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৯), পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০২৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, 'জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১২
রাণা, কুমার, বাস্কি, বড়ো, 'আদিবাসী ভারত', অনুষ্টুপ, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০২৪
সরকার, সুনীতি, 'নলিনী বেরার উপন্যাস প্রান্তবাসীর বিশ্বায়ন', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০২৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 371 - 377
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 371 - 377
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' : রুহিতন কুরমির অন্তঃশ্বাস

অনামিকা মজুমদার
প্রাক্তন ছাত্রী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : putuanamika@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Samaresh Basu, Mahakaler Rather Ghoda, struggle for existence, imprisoned life, stream of consciousness technique, intolerance.

Abstract
In Bengali literature the renowned fiction writer is samaresh Basu. His works reflect nearly four decades of political, economic, and social conditions. In his novels he has portrayed society with honesty from an impartial standpoint. By depicting familiar realistic social scenes in his writing, he has won the hearts of readers. One of the central themes of Samaresh Basu's novel is the socio-economic condition of contemporary society, the spirit of resistance, the decline of moral values, the inner world of the individual, and the interplay of nation, time, and society. The novelist has portrayed various aspects emerging from different layers of the individual and their inner world. In many cases, the novels are centered around human struggle and protest. As a socially consious writer, he has highlighted the contemporary turbulent situations as central. themes in his novels. In novels characters and settings are extremely important elements because they bring the narrative to life. Many novels have been written based on various movements in literature, and the success of these works has played a leading role in the development of Bengali literature. In the 1960s and 70s a major upheaval swept across Bengal centered around the demand for farmers' rights in the Naxalbari region. The Naxalite movement not only impacted Bengal's politics and economy, but also left a significant mark on its literature, many writers used this movement as a foundation to construct their narratives, incorporating its themes and influences into their literary works. Samaresh Basu also wrote novels set against the backdrop of the Naxalite movement. In his novel Mahakaler Rother Ghoda, he vividly portrayed the movement through his unique perspective. Numerous novels have been written focusing on the Naxalite movement, which can be seen as a time of both struggle and crisis. During this turbulent period, people joined the movement in search of true freedom and liberation. Similarly, in Samaresh Basu's narrative, the character Ruhitan kurmi also participated in the movement, driven by the vow to eliminate class enemies. Through such charaters and stories, Basu captured the spirit, chaos, and idealism of the era.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 371 - 377
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

প্রতিটি আন্দোলনই যখন শুরু হয়েছিল, তা একটি সুস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা, অরাজকতা, বা শ্রেণিদ্বন্দ্বের কারনে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা আন্দোলনের সাথে যুক্ত বহু মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলস্বরূপ, তাদের জীবন এমন এক গভীর সংকটে পড়েছিল, যা তারা কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এমনকি এদের সাথে জড়িত মানুষগুলিও সমাজে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনে সক্ষম হয়নি। পরবর্তী প্রজন্মকেও অনেক সময় সেই পরিণতির হিসাব দিতে হয়েছে। তেমনই উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলনও পুরো ভারতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> "নকশালবাড়ি শুধু একটি এলাকার নাম নয়, একটি রাজনীতির প্রতীক। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে এই নাম একটি রাজনীতির সমার্থক হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও।"[১]

সমরেশ বসু কমিউনিস্ট আন্দোলনের যখন শরিক ছিলেন তখন তার মনে দুটো ভাব সক্রিয় ছিল। প্রথমটা ছিল এডভেঞ্চারিজমের প্রতি টান তথা ভদ্র, শান্ত, পোষ মানা ধারনার প্রতি ঘৃনা এবং দ্বিতীয় মানুষের অপরাজেয়তার প্রতি বিশ্বাস ও আগ্রহ। এই দুই ভাবনাই একত্রিত হয়ে সূচাগ্র তীক্ষ্ণতা তার লেখায় ফুটে উঠেছে।[২]

১৯৭০ দশকের নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে রচিত একটি উপন্যাস হল সমরেশ বসুর *মহাকালের রথের ঘোড়া*। তাঁর রচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন -

> "যদিও রিপোর্তাজ লেখার অভিপ্রায়েই কালকূট কলম ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনা রিপোর্তাজ নয়, ভ্রমণকাহিণী নয়, উপন্যাস।"[৩]

উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই রুহিতন কুরমির অন্তঃশ্বাস। রুহিতনের চেতনায় বার বার উঠে এসেছে তার জীবনকাহিনী। চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা এই উপন্যাসে রুহিতনের স্মৃতি ও সংলাপ থেকে জানা যায় তার অতীত ও বর্তমান জীবনচিত্র। প্রাধান চরিত্র রুহিতন কুরমি, একজন আদিবাসী, নকশালবাড়ি লাগোয়া এক গ্রামের ভুমিহীন কৃষিশ্রমিক, যে নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। সমরেশ বসুর উপন্যাস *মহাকালের রথের ঘোড়া* নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা একজন সক্রিয় কর্মীর স্বপ্নভঙ্গের করুণ কাহিনী।

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসে রুহিতন কুরমির যন্ত্রণাময় জীবনকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। রুহিতন কুরমি সাত বছর ধরে জেলে রয়েছে। এক জেল থেকে আরেক জেলে সে স্থানান্তরিত হয়ে সাত বছর কাটিয়েছে। রুহিতনের চিন্তায় বারবার উঠে এসেছে তার অতীত জীবনের কথা। রুহিতনের পূর্বপুরুষ ছিল চা বাগানের শ্রমিক। তার বাবা পেশাপত কুরমি চা বাগানের কাজ বাদ দিয়ে কৃষিকাজ শুরু করে। জোতদারের জমি চাষ করে সংসার চালায়। রুহিতনের ঠাকুরদারও আকাঙ্খা ছিল ঘর তৈরি ও স্থায়ীত্বের, কিন্তু তা সে পেরে ওঠেনি। পেশাপত কুরমী কঠোর পরিশ্রম করে বন্ধ্যা জমিতে চাষ করে। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পেশাপত কুরমি সাহসিকতার পরিচয় দেয়। কারন - সাঁওতাল ও কুরমীদের বিয়ে প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও সে বিয়ে করেছে গজেন সাঁওতালের মেয়ে গঙ্গাকে। তরাই অঞ্চলে এ কাজ খুবই দুঃসাহসিক। তাইতো রুহিতনের কথায় -

> "এটা একটা ব্যতিক্রম। কুরমির ছেলের সঙ্গে, সাঁওতাল মেয়ের বিয়ে। কিন্তু জায়গাটা ধলভূম বা মানভূমগড় না, সাঁওতাল পরগনাও না। সেখানে সমাজ সামাজিকতার চেহারা কিছু আলাদা, জাতিগত বৈষম্য অনেক কম।"[৪]

এই পেশাপত কুরমি ও গঙ্গারই সন্তান রুহিতন কুরমি। সে ছোটবেলা থেকেই সাহসী।তার পোষ্য পায়রার জন্য নিজের বাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে ছাড়েনি। তার ছোটবেলার বন্ধু ছিল জোতদার মোহন ছেত্রীর ছেলে বড়কা ছেত্রী। শিকার করা, গান শোনা, জুয়া খেলার একমাত্র সাথী ছিল সে। রাজনীতিতে যোগ দেবার পর বড়কা তার সাথে আর যোগাযোগ রাখেনি। রুহিতনের হাতেই বড়কা মারা যায়। বড়কা যখন তাদেরই জোতের মজুর, বাড়ির চাকর গোবরা সাঁওতালের মুখ

থেকে কথা বের করার জন্য বন্দুক নিয়ে আঘাত করে তখন রুহিতন বড়কাকেও আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। নকশাল রুহিতনের লড়াকু মানসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় শ্রেণিশত্রুর খতমের ঘটনা।

রুহিতন এরপর আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় গিয়ে সে শ্রমিক-কৃষকদের সভায় যোগদান করে। নতুন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে সে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। নকশালবাড়ি অঞ্চলে ফিরে এসে গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলা সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রুহিতন যখন আট বছরের বাবার কাছে শুনতে পেয়েছিল বিপ্লবীরা লেবং এ বাংলার লাট বাহাদুর জন অ্যান্ডারসন যিনি গভর্নর জেনারেল ছিল তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। তখন থেকেই রুহিতনের 'শত্রু নিধনঃ শ্রেয়ঃ'[৫] কথাটা রক্তের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে সে লেবং গিয়েছিল। তার কিছু বছর পরেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রভাবে গোটা পাহাড় থমকে গিয়েছিল। মহাজন, কোম্পানির সাহেব, জোতদারেরা ক্ষেপে উঠেছিল। রুহিতনের নিজেকে এতদিন অচেনা ছিল কারন গরিব মানুষের শত্রুদের হারে তার রক্ত ঝলকে উঠেছিল। দিবা বাগচি সমাজকে বদলানোর স্বপ্ন তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। এছাড়াও তার সাথী ছিল মোহন ছেত্রী, রুকনুদ্দিন আহমেদ শনিলাল, শুকু পোঙানি। জেলে বসে রুহিতন ফিরে গিয়েছিল সাত বছর আগে দার্জিলিং জেলার মিরিক থানার নিচুতে অবস্থিত বন অঞ্চলে, যেখানে এক রাত্রে পুলিশের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে এবং দলের অন্তর্দ্বন্দ্বে গ্রেফতার হয় রুহিতন কুরমি। খুন, লুঠ, আগুন লাগানো, অরাজকতা, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল, দেশের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের অভিযোগে সে গ্রেপ্তার হয়। জেলে থাকার সময় তার মনে এক প্রশ্ন জাগে -

> "বন্দিরা সকলেই তার জেলের বাইরের পরিচিত ছিল না, দু জন ছাড়া। কিন্তু সকলের ওপর একই শ্রেণীর অভিযোগ ছিল। খুন জখম লুট আগুন লাগানো অরাজকতা সৃষ্টি করস। এবং সর্বোপরি রাজদ্রোহিতা, বলপূর্বক রাস্ট্রক্ষমতা দখল। সকলের উদ্দেশ্য এক, অতএব তারা সমধর্মী। যদিও রুহিতন এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না সকলেই তারা সমধর্মী। সকলেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেই দলের।"[৬]

জেলে সে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। মর্মান্তিক অত্যাচার চালানো হয় তার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। জেলে বসে পুরানো দিনের কথা মনে আস্তে থাকে রুহিতনের। সে ফেলে আসা জীবনের কথা মনে আনতে চায় না কিন্তু পুরানো মানুষ আর পুরানো কথা ফল্গুধারার মত যেন বয়ে চলেছে। তাইতো -

> "পুরানো দিনের কথা মনে করে তার কষ্ট হয়। সে চায় না, পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে। যে জীবন তার পিছনে পড়ে রয়েছে, সে জীবনের কথা সে মনে করতে চায় না। ভাবতে চায় না। অথচ আজকাল প্রায়ই পিছনের জীবনটা মনে পড়ে যায়। পিছনের জীবন আর সেখানকার মানুষ। মনে পড়লেই অদেখা শুকনো ঝোরার জলের মতো কোথায় যেন কলকলিয়ে ওঠে। এ বড় বিষাদ।"[৭]

শরীরের আঘাতের যন্ত্রনা তার মনকে ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু ক্রমেই দেখতে পাই দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দলীয় কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতা তার মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। তাইতো ঔপন্যাসিক বলেছেন -

> "রুহিতন মনে মনে বিভ্রান্ত হলেও স্থির বুঝেছিল তাদের সেই জতের নানান জায়গায় ভাঙচুর ফাটল ধরেছে। নিজেদের মধ্যে ঘৃণা আর রাগ, সেই প্রথম জানতে পেরেছিল। বড় যন্ত্রণা বোধ হয়েছিল তার। শ্রেনীশত্রু কাকে বলে? কাদের?"[৮]

উপন্যাসের শুরুতেই দেখতে পাই রুহিতনকে এক জেল থেকে অন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিন রাত্রি ধরে এই যাত্রা চলেছে। যাত্রা আরম্ভ হওয়ার দিন সাতেক আগেই জেল ওয়ার্ডার জানায় অন্য জেলে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। খবর পেয়ে একদিকে তার মনে যেমন মুক্তির আশা জাগে অন্যদিকে জাগে সন্দেহ। কারন অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশ অন্য জেলে নিয়ে যাবার সময় এনকাউন্টার করে দেয়। রুহিতনের মনে -

> "ভয় না, একটা তীক্ষ্ণ সন্দেহ ঝলকিয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা আশা! যত সামান্য হোক, তবু অসামান্য সেই আশা। সেই আশার নাম মুক্তি। অথবা পলায়ন। অথবা একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ! সেই জন্যই চোখগুলো ঝিলিক হেনে উঠেছিল। আর সন্দেহের কারন খতম। অন্য জেলে নিয়ে যাবার নাম করে, চিরদিনের জন্য লোপাট। পুলিশি খতমের একটা পদ্ধতি।"[৯]

রুহিতনকে নিয়ে আসা হয় কলকাতার জেলে। মহাত্মা গান্ধীও এই জেলেই একসময় বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন। রুহিতন গান্ধীজীর প্রার্থনার জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবে সে জানেনা প্রার্থনা করলে কি হয়। সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

> "সমরেশ বাবুর ইঙ্গিতটা, 'গান্ধীপন্থা গ্রহণই শ্রেয়' – এদিকেই যেন ধাবিত হয়। রুহিতন একটু একটু করে হেরে যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলজীবন, সাথীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অমানবিক ব্যবহারই তাকে হারিয়ে দিচ্ছে। এখন তার বুক তোলপাড় করে ওঠে।"[১০]

সমরেশ বসুর ভাবনায় গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদ দুয়ের মতের পার্থক্য থাকলেও দুয়েরই মূল লক্ষ্য মানুষ তথা মানবতাবোধ। রুহিতনের দলের অনেকেই এই জেলে ছিল। যাদের নেতৃত্বে সে দলে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল খেলু চৌধুরী, তার সাথে জেলে দেখা হয়ে যায়। তার মন আনন্দে ভরে ওঠে। এমন মানুষদের দেখা সে বহুদিন ধরে পায়নি। এদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে সে নতুন সমাজ গড়ার কাজে নেমেছিল। বাকি বন্দীদের কাছ থেকে রুহিতন অভর্থনা পেয়ে খুশি হয়েছিল -

> "রুহিতনের নিজেরই ইচ্ছা হল, সে সবাইকে শান্ত করে। সকলের এই প্রাণের উচ্ছ্বাস তার ভালো লেগেছে।"[১১]

প্রসঙ্গত রুহিতন জানতে পারে দিবা বাগচি মারা গেছে। রুহিতনের কষ্ট হয় কারন একদিন দিবা বাগচি তাকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিল। তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল স্বাধীন জীবনযাপনের। কিন্তু খেলু ও বাকি সহকর্মীরা দিবা বাগচির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলে রুহিতন দুঃখিত হয়। দিবা বাগচি ধনী জোতদারের ছেলে তাই তার পরিবার সুখে দিন কাটাচ্ছে। এমন কথার প্রতিবাদে রুহিতন বলেছে -

> "কিন্তু ভাই সাথীরা, দিবাবাবু যে মস্ত বড় জোতেরবমালিকের ব্যাটা, সেই কথা তো তাবৎ সংসার জান্ত। কিন্তু বাপের জোতের তাবৎ জমিন তো সে কোরফা রায়ত আর আধিয়ারদের বিলি বাঁটোয়ারা করে দিছিল! দ্যায় নাই?"[১২]

কিন্তু তবুও খেলু চৌধুরী ও তার সাথীরা তা মেনে নেয়নি। খেলুদের দিবা বাগচির উপর ক্রোধকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি সে। দলীয় বিশ্বাসে ঘুন ধরার চিত্র ধরা পড়েছে এই কাহিনীতে। কিন্তু দিবা বাগচি সম্পর্কে তার মনে যে ধারনা ছিল তা থেকে বোঝা যায় যে সহকর্মীদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। তাই দিবা বাগচির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রুহিতন আঘাত পেয়েছে। তাইতো -

> "তার সবথেকে পুরনো সংগ্রামী বন্ধু, যে তাকে প্রথম নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। নতুন জীবনের সেই স্বপ্ন কদাপি বিফল হবার না। সেই সফল স্বপ্নে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। বোবায় কথা কয়। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। ভুমিহীনে ভুমি পায়। জন্মজুরে রাজ্য চালায়!... রুহিতন কুরমির সাবালক এই জীবনে এই প্রথম শোকের আঘাত।"[১৩]

রুহিতন জেলে অসুস্থতা বোধ করে। খেলুবাবুরা সুযোগ বুঝে রুহিতনকে আলাদা করে দেয়। কুষ্ঠ রোগের কারণ হিসাবে খেলু বড়কার সঙ্গে গান শুনতে যাওয়া, জুয়া খেলা, মদ, হাঁড়িয়া, লুবু খাকড়ির সাথে ফূর্তি করার কথা বলে। যা শুনে রুহিতনের অবাক লাগে। তারা সকলেই আন্দোলন শুরু করেছিল একদিন শ্রেণিহীনতার আদর্শে অবিশ্বাসী ছিল বলেই। কিন্তু খেলু চৌধুরী তাকে নীচু শ্রেণির বলে অবজ্ঞা করেলে রুহিতনের অবাক লাগে। প্রতিবাদ জানিয়ে সে বেড়িয়ে আসলেও প্রাণের মধ্যে যন্ত্রণা, দুঃখ এবং অপমানে তার কষ্ট হতে থাকে। তাইতো লেখক লিখেছেন -

> "আগুন জ্বলছে তার বুকের মধ্যে। রাগের থেকে এ আগুনে বুকের পোড়ানি বেশি। এই আগুনে বুকের ঝোরার জল ঝরে।"[১৪]

অসুস্থ অবস্থায় তার মনে পড়েছে স্ত্রীর কথা, পরিবারের কথা, পুরানো ফেলে আসা দিনের কথা। রুহিতনের বারবার সেসব কথাই মনে এসেছে -

> "কী করবে রুহিতুন? এই সব কথাই এখন তার বারে বারে পনে পড়ে। অসুস্থ বিচ্ছিন্ন এই জেল-জীবনে এ সব কথা মনে হলেই আরও কিছু কিছু ইচ্ছা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে। শিশু

> যেমন মায়ের গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে, মঙ্গলার গায়ের গন্ধে তারও সে রকম হত। এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে, তবু গন্ধটা চিনে উঠতে ভুল হয় না। এখন রুহিতন কুরমির জীবনে এটা কি দুর্বলতা না? বুধুয়া করমা দুধিকে দেখার ইচ্ছায় বুকটা টনটনিয়ে ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ প্রাণটা উদ্বেগে চমকিয়ে ওঠে, অন্ধ মা ঝোরার কাছে গিয়ে আলগা পাথরের ওপর পা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে না তো?”[১৫]

জেলের বন্দী জীবনে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জেলের ডাক্তারের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। কুষ্ঠের জন্য সে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সে সময় তার বন্ধুনী টেঁপড়ির কথা মনে আসে। তারপর তার জীবনে আসে মঙ্গলা। দুজনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একজন চঞ্চল, অন্যজন অত্যন্ত সরল সাদাসিধে। টেঁপড়ি তাকে বিয়ে করতেও চায় নি। কিন্তু মঙ্গলা মন ভোলানো হাসি জানত না। রুহিতন তাকে মণি কুন্ড ভেবেছে, যা মাতৃকূপের প্রতীক। মানুষ সেই প্রতীককে মাতৃরূপে পূজা করে এসেছে। এখানে রুহিতনের নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে -

> “হ্যা, ঝোরার জলের ধারা যেখানে গভীর কূপের মতো কুন্ডকে ভরিয়ে তোলে, তখন তার নাম হয়ে যায় মণি। সেই কুন্ড তখন হয়ে ওঠে মাতৃকূপের প্রতীক। আর সেই প্রতীককে মানুষ পূজা করে। জলের প্রাচুর্যের প্রার্থনায়।”[১৬]

রুহিতন কিছুতেই ভুলতে পারে না তরাইয়ের জঙ্গলের মানুষের উত্তেজনা আর সাহসের কথা। তাদের জীবনে আমল বদল এসেছিল। মেয়েদের গায়ে হাত তোলা বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের স্বপ্ন ছিল শত্রুমুক্ত স্বাধীন এলাকা গড়ে তোলা। কিন্তু রুহিতনের মনে প্রশ্ন ছিল যে তারা নতুন জীবন পেয়েছিল কিনা। তাইতো -

> “রুহিতন ভুলতে পারে না, সেই সময় তরাইয়ের জঙ্গলে গ্রামে গ্রামে মানুষদের কী আশ্চর্য উৎসাহ আর সাহস। সে নিজে সব গ্রাম বা বিভিন্ন আস্তানায় ঘুরে ঘুরে দেখেছে। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ, সকলের চোখমুখের চেহারা বদলিয়ে গিয়েছিল। সত্যিই কি তারা একটা নতুন জীবন পেয়েছিল?”[১৭]

অসুস্থ বিচ্ছিন্ন জেল জীবনে কিছু কিছু কথা তাকে ভাবিয়ে তোলে। কিছু কিছু চিন্তা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। তেমনই স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝেই তীব্র কৌতুহল হয় মুক্তাঞ্চলের চেহারা এখন কেমন হয়েছে। অনেক খবর সে জেলে বসেই পেয়েছে, সত্যি মিথ্যা তা সে জানে না, তবে সব খবরই ছিল ব্যর্থতায় ভরা আশাহীন কাহিনী। উদ্বেগ জাগে -

> “হত্যা জখম লুট, ক্ষেত্রবিশেষে আগুন লাগানো, আর অস্ত্রাগার তৈরি, সবই সত্যি। মিথ্যা না। এ সবই ঘটেছিল, আর একটা নতুন জগৎ তৈরি করার জন্য। রুহিতন অস্বীকার করে না। কিন্তু এই এলাকার মানুষেরা ছিল শুধু খুনি দাকাত অপরাধী, নিজেদের সম্পর্কে এ কথা সে কোনও দিন শুনতে চাইবে না।”[১৮]

রোগের কিছুটা উপশম হতেই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরিবার ও সংসারের উদ্দেশ্যে রুহিতন রওনা দেয় এক নতুন জীবনের আশা নিয়ে। গ্রামে গিয়ে সে দেখতে পায় গ্রামের পরিবেশ, বাড়িঘর, মাটি এবং সেখানকার মানুষ সবই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। পুলিশের চেকপোস্ট, মিলিটারি ঘাঁটি, ছাউনি দিয়ে ছেয়ে গেছে গ্রাম। বর্তমান সময়ে রুকনুদ্দিনের ভাই কাছিমুদ্দিন এলাকার নেতা হয়েছে, যে কিনা একসময় ছিল শ্রেণিশত্রু। গ্রামের স্বচ্ছল মানুষেরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেও এলাকার সাধারন মানুষ তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেনি।

সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন এসে ধরা দিয়েছে তার নিজের বাড়িতেও। তার পুরানো বাড়িকে পেছনে ফেলে বড় জোতদারদের বাড়ির আদলে তার ছেলেরা বাড়ি তৈরি করেছে। যা রুহিতন তার পরিবারকে দিতে পারেনি তা তার সন্তানেরা করে দেখিয়েছে। শাক সবজি চাষ থেকে শুরু করে সাইকেল কেনা, ঘড়ি কেনা, বোনকে বিয়ে দেওয়া, এক কথায় সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে তারা। যে স্ত্রীর গায়ের গন্ধ সে আট বছরেও ভুলে যায়নি সে স্ত্রী তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তার ব্যবহারে রুহিতন মর্মাহত হয়ে পড়ে। জেল বন্দী জীবনে সবসময় তার একটা ভয় কাজ করেছিল যে, তার স্ত্রী, সন্তান, ও মা কে হয়তো মেরে ফেলা হবে। তাইতো রুহিতন মঙ্গলাকে বলেছে -

> “আমার খুব ভয় ছিল, তোমাদের কারোকে আর কখনও হয়তো দেখতে পাব না।”[১৯]

কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার উল্টো ঘটনা ঘটেছে। স্ত্রীই তাকে সন্ধ্যার পর ছেলেদের কথা মত পরিত্যক্ত ঘরে পৌছে দেয়। মঙ্গলা দূরত্ব বজায় রেখেই চা, খাবার এবং পরিবারের সমস্ত খবর সে রুহিতনকে পৌছে দেয়। মঙ্গলাকে রুহিতন রোগ সেরে যাবার কথা বললেও বিশ্বাস করেনি। ছেলেদের প্রতি তার বিশ্বাস থাকলেও রুহিতনের কথা সে বিশ্বাস করেনা। এই ভয়ংকর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে রুহিতন খুব একাকিত্বে ভুগতে থাকে। ভাঙা ঘরে কুকুরের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। সাহিত্যিক বলেছেন -

> "ঝরে একটা গাছ ভেঙেচুরে যে রকম চেহারা হয় অনেকটা সেই রকম তার অবস্থা। আগের মতো খসে যাওয়া ডালপালা তার নতুন করে গজাবে না।"[২০]

রুহিতন বুঝতে পারে আন্দোলন তাকে রুহিতন কুরমি বানালেও তার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে। তার কাছের মানুষগুলোর জীবনেও সে এখন অতিরিক্ত। মঙ্গলা বিয়ে করেনি ভেবে সে সুখী হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলা তার স্পর্শ তো দূরের কথা তার দিকে তাকিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে রাজি নয়। মঙ্গলার প্রত্যেকটি কথাই বুঝিয়ে দিয়েছে অস্পৃশ্যতার যন্ত্রণা।লেখকের কথায়-

> "মঙ্গলাও অবাক চোখেই তাকাল, ঠিক যেন সেই স্নেহময়ী গাভীটার মতোই। কিন্তু ও যেন আগের মতো আর নেই।"[২১]

মানসিক এই যন্ত্রণায় তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা হারিয়ে গেছে।মঙ্গলার মুখে অবিশ্বাস আর বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট -

> "রুহিতন বিশ্বাস করত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা যায়। যারা করত, অটল বিশ্বাসেই তারা সব চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু বুকের বোঝায় একি প্রবল বেগের ধারা?"[২২]

তার মনে পড়ে মঙ্গলার মুখে শোনা এক গল্প। স্বামীকে মন্ত্রপড়া জলে কুমিরে পরিণত করে এক স্ত্রী। সে আর স্বামীকে মানুষে পরিণত করতে পারেনি। কুমিরের ক্ষুধার জন্য দিঘিতে নেমে যেতে হয়। স্ত্রী এসে দিঘির পারে দাঁড়িয়ে থাকতো স্বামীকে দেখার জন্য। কুমিরের চোখের জল গড়াত দুঃখে, কিন্তু কথা বলা হত না। দু'জনেই মনের কথা প্রকাশ করতে পারতো না।

দু'জনের জীবনই দুটি পথে বেঁকে গিয়েছে যেমন গিয়েছে মঙ্গলা রুহিতনের জীবন। নিজেকে রুহিতন অভিশপ্ত কুমির হিসাবে দেখেছে। কুমির যেমন তার স্ত্রীকে দূর থেকে দেখতো, স্পর্শ করতে কিংবা কাছে যেতে পারবে না তেমনই রুহিতন এক অস্পৃশ্য রোগী যাকে স্পর্শ করা বা ভালোবাসা যাবে না। কুমিরের স্ত্রী যেভাবে তাকে দূর থেকে দেখতো তাতে বোঝা যেত দয়াবশত সে কুমিরকে দেখতে দিঘির পারে এসে দাঁড়াত। মঙ্গলাও হয়তো দয়া করেই তার কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। বেশিক্ষন শোক না করে রুহিতন ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিল বেদনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার নিজের হাতে পোঁতা বন্দুকের সন্ধানে। যে বন্দুক দিয়ে সে অন্যায় বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সেই বন্দুক দিয়েই সে অন্তঃশ্বাসের দহন ও বেদনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। এই মৃত্যু সর্বহারা মানুষের আত্মার আত্মহত্যা।

সমরেশ বসু *মহাকালের রথের ঘোড়া* যখন লিখেছিলেন তখন তার সৃষ্ট রুহিতন কুরমির সেই দীপ্ত আবেগ; যে ঠিক বা ভুল - যাই হোক, একটা শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন সে দেখেছিল। তাকে মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তার সহকর্মী, বন্ধু, পরিবার তথা স্ত্রী, সন্তান কেউই তাকে গ্রহণ করেনি। ফেলে আসা দিন ও মানুষগুলির কথা চিন্তা করলেও কেউই তাকে মনে রাখেনি। রুহিতন লক্ষ্য করেছে নিজে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেললেও কারো জীবনই তার জন্য থেমে নেই। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা হয়তো এই আত্ম-উৎসর্গ করা, রুহিতন কুরমির জীবনের ট্র্যাজেডি।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমর, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামান্য তথ্য সংকলন, কলকাতা: নয়া ইশতেহার প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৪০
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন, কলকাতা: র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, মে ১৯৮৮, পৃ. ২১
৩. ঘোষ, প্রসূন, বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন: আত্মকথনরীতির উপন্যাস, কলকাতা: আশাদীপ, ২০২২, পৃ. ২২৩
৪. বসু, সমরেশ, মহাকালের রথের ঘোড়া, কলকাতা: আনন্দ পাব্লিশার্স, জুলাই ২০১৪, পৃ. ৩২
৫. তদেব পৃ. ৫৩

৬. তদেব, পৃ. ৯
৭. তদেব, পৃ. ৫০
৮. তদেব, পৃ. ৬৪
৯. তদেব, পৃ. ১১
১০. সেন, কিশলয়, মহাকালের রথের ঘোড়া: এক অনুভব, কলকাতা: এবং জলার্ক, অক্টোবর- নভেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৫৬
১১. বসু, সমরেশ, মহাকালের রথের ঘোড়া, কলকাতা: আনন্দ পাব্লিশার্স, জুলাই ২০১৪, পৃ. ৫৪
১২. তদেব, পৃ. ৬৩
১৩. তদেব, পৃ. ৬১
১৪. তদেব, পৃ. ৬৭
১৫. তদেব, পৃ. ৮২
১৬. তদেব, পৃ. ৬৯
১৭. তদেব, পৃ. ৮১
১৮. তদেব, পৃ. ৮৩
১৯. তদেব, পৃ. ৯৭
২০. তদেব, পৃ. ৯৪
২১. তদেব, পৃ. ৯৮
২২. তদেব, পৃ. ৯৯

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 378 - 384
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : অরণ্যকথায় 'আরণ্যক'

ড. শ্রীকান্ত কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার
Email ID : srikantakarmakar05@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bibhutibhushan Bondhyopadhyay, Aranyak, Bihar, Aranyajibon.

Abstract
Bibhutibhushan Bandyopadhyay is one of the best nature-loving writers in Bengali literature. One of the examples of his love for nature is 'Aranyak'. 'Aranyak' is written on the besis of his experience living in Bihar. This novel satisfies the author's hunger for love of nature. Along with nature, the people of here, their culture, religion, food and drink, sorrows and hardships all appear before us as a living document. By reading 'Aranyak', we can reach the remote forest land of Ismailpur, fifteen miles away from Bhagalpur, Bihar. It depicts the landscape of Ismailpur, Narha, Boihar-Lobtulia, Mohanpura of hundred years ago. The first part of the essay has tried to talk about the culture there. The second part has highlighted the socio-economic context and the last part has tried to portray the nature, visualised by the author.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বিভূতিভূষণ। তাঁর 'আরণ্যক' আমাদের সামনে মেলে ধরে সাহিত্যের একটা অন্য জগত। উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৩৯-এ। ১৯৩৯ সালে 'আরণ্যক' প্রকাশিত হলেও এই উপন্যাসের ঘটনা ১৯২৪ সালের জানুয়ারি থেকেই লেখকের স্মৃতিপটে লেখা শুরু হয়ে যায়। ১৯২৪ সালে জানুয়ারিতে লেখকের বিহার যাওয়ার বারো বছর আগে অর্থাৎ ১৯১২ সালে বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১২ সালের আগে বিহার বাংলার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। প্রকৃতির প্রতিকূলতার জন্য এখানে মানুষের বসতি ছিল কম।

বিভূতিভূষণ ছোট থেকেই প্রকৃতি প্রেমী ছিলেন। ছোট বেলায় যখন তিনি ইস্কুলে যেতেন তখন সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে বন-জঙ্গলে ঘেরা রাস্তা দিয়ে যেতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড় হয়েছেন। কলকাতায় কলেজে ভর্তি হয়েছেন। বিএ পাশ করার আগে ১৯১৭ সালে গৌরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ১৯১৮ সালে বিএ পাশ করে এম এ-য় ভর্তি হন। এরপর জীবনে হটাৎ দুঃখ নেমে আসে। পত্নী বিয়োগ হয় তাঁর, কয়েক বছরের ব্যবধানে মা এবং প্রিয় বোন মারা যান।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর যেমন একটা মোহ ছিল তেমন অর্থ কষ্টে জর্জরিত ছিলেন, আর তার সাথে ছিল স্বজন হারানোর ব্যাথা। এই সব কিছুর থেকে মুক্তি দিয়েছিল পাথুরেঘাটার জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষের ভাগল পুরের জঙ্গলের ইজারার কাজে যোগ দেওয়া।

উপন্যাসের প্রস্তাবনাতেই লেখক বলেছেন, -

> "সমস্ত দিন আপিসে হাড় ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেষিয়া বসিয়া ছিলাম।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> নিকটেই একটা বাদাম গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদাম গাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউ খেলানো জমিটা দেখিয়া হটাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডির ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি।”[১]

লেখকের বিহারের কর্মক্ষেত্রের অবস্থান ছিল ভাগলপুর থেকে পনেরো ক্রোশ দূরে ইসমাইলপুরে। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেনপুর। পূর্ব দিকে ফুলকিয়া, লবটুলিয়া, নাড়াবইহার থেকে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলা পর্যন্ত ইসমাইলপুরের এলাকা। বিরাট অরণ্যভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদী ঘেরা এই বিস্তৃত এলাকা। উপন্যাসে এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, গয়া, কিষাণগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার নাম আছে।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ অরণ্যেই বাস করত। মানুষ বর্তমানে অনেক সুযোগ সুবিধা আরাম বিলাসের মধ্যে বাস করে।

> “...প্রাচীন যুগের প্রস্তর-যুগের ভারতের রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আমার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম...।”[২]

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সালে ‘স্মৃতি রেখা’য় তাই বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন - “এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো – একটা কঠিন, শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি।” বিভূতিভূষনের অরণ্য-কথাকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করব – সাংস্কৃতিক কথা, আর্থসামাজিক কথা আর প্রকৃতির কথা।

এই অরণ্য অঞ্চলে আলাদা কোন সংস্কৃতি নেই। এর সংস্কৃতি এক মিশ্র সংস্কৃতি। বিহারের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে এসে বসতি শুরু করেছিল।

> “সদাচারী মৈথিল ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গোতা ও দোসাদ পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের লোকই আছে।”[৩]

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু পার্বনীর কথা পাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছট্ পরব। এই এলাকার সব থেকে বড় উৎসব। কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয় এই পরব। এর পর আমরা দেখি দোল বা হোলি খেলার কথা। আর আছে রাজা দোবরুপান্নার রাজদানীতে ঝুলন উৎসবের কথা। দোবরুপান্নার রাজধানী চকমকি টোলাতে অবস্থিত ঝনঝরি পাহাড়ে খুব ধুমধাম করে ফুলের মালা, ফুলের গহনা পড়ে, মাদলের তালে তালে নাচ গানের সঙ্গে ঝুলন উৎসব পালন করা হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমে কাছারিতে পালন করা হয় পুন্যাহ উৎসব। এই রকম আরো কিছু পার্বনী বিহারের এই সমস্ত এলাকায় পালিত হয় যাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য মেলা বসে। যেমন শিবরাত্রিতে অখিল কুচার মেলা। পৌষ সংক্রান্তির মেলা। মানুষের বিনোদনের একটা সুযোগ আনে এই মেলা। বাইরের জগতের সঙ্গে এখানের মানুষের যোগাযোগ খুবই কম থাকে। এই মেলার দ্বারা কিছু কিছু নতুন নতুন বিলাস সামগ্রীর স্পর্শ পায় এখানের মানুষেরা।

এই অঞ্চলে অন্যান্য উচ্চ সম্প্রদায়ের সাথে সাথে গাঙ্গোতা বা ভুইহার জাতির কথা আছে তার সাথে আছে দোসাদ জাতির কথা। গাঙ্গোতাদের পূজা বা সমাজের ভালো কাজে হাত লাগানোর অধিকার ছিল না। মটুকনাথ নিজে পণ্ডিত তাই দ্রোণ মাহাতো কাছারির শিবকে পুজো করতে বা জল ঢালতে পারবে না। সে সত্যচরণের কাছে নালিস করে বলেছে –

> “একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?”[৪]

উপন্যাসে দোসাদ জাতির প্রসঙ্গে পাটোয়ারী সত্যচরণকে বলেছেন –

> “ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ, ছত্রী কি গাঙ্গোতা সে জিনিস খাবে না।”[৫]

লোক দেবতার মধ্যে যাঁর কথা একাধিক বার এসেছে এই উপন্যাসে তা হল ‘টাড়বারো’ লোক দেবতার কথা। বুনো মহিষের দেবতা টাড়বারো। সত্যচরণ গনু মাহাতোর মুখে এই নামটি প্রথম শুনেছিলেন। দ্বিতীয়বার এই নামটি শোনেন দশরথের মুখে। এরপর সত্যচরণ এই টাড়বারোর শিলামূর্তি দেখেন রাজা দোবরুপান্না রাজধানী চকমকি টোলাতে। রাজা দোবরুপান্নাদের কুল দেবতা এই টাড়বারো। জঙ্গলে চোরা শিকারীদের হাত থেকে যে কোনো বিপদের হাত থেকে

মহিষদের রক্ষা করে এই টাড়বারো লোক দেবতা। পায়রা আর মুরগি বলি দিয়ে এই দেবতার পূজা করা এই অঞ্চলের একটি বিশেষ রীতি।

উপন্যাসে দুই শ্রেণীর লোক নাচের কথা জানতে পারি এক 'হো হো' নাচ আর দ্বিতীয় 'ছক্করবাজি' নাচ। ধাতুরিয়া ছক্করবাজি নাচে পটু। সে এই নাচ শিখেছিল গয়া জেলার এক গ্রামে ভিটলদাস নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে। ভিটলদাসের সাতপুরুষের এই নাচ পরবর্তী প্রজন্ম শিখতে আগ্রহী নয়। একমাত্র ধাতুরিয়া এই নাচ শিখেছিল।

গনু মাহাতোর মুখে লেখক কিছু কিছু অদ্ভুত কথা শুনেছেন তার মধ্যে হল উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হেটে বেড়ানোর কথা। এর সঙ্গে সঙ্গে আছে কিছু কুসংস্কারের কথা। রাজু পাড়ের মুখে শোনা যায় যে সূর্য উদয় পাহাড়ের গুহা থেকে ওঠে এবং পশ্চিম সমুদ্রে অস্ত যায়। রাজু বলেছে –

"রামধনু যে দেখছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিপি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"[৬]

দশ হাজার বিঘা জংলী জমির বিলি বণ্টনের কাজে নিযুক্ত সত্যচরণ। জঙ্গল মহল এই এলাকার মধ্যে আছে ডিহি কাছারি লবটুলিয়া, ফুলকিয়া কাছারি, ডিহি কাছারি আজমাবাদ এবং ইসমাইলপুর। এই এলাকার মানুষের কথা লেখক বলেছেন। তাতে আর্থিক অবস্থার কথা যা ফুটে উঠেছে তা হল এখানের মানুষ খুব গরিব। লেখক নিজেই বলেছেন –

"শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরিব। এত গরিব তাহা জানিতাম না।"[৭]

সত্যচরণ প্রথমে লবটুলিয়া যান সেখানে সাধারণ মানুষের ভিড় হয়। এরপর ডিহি আজমাবাদ যখন যান তখন সেখানেও মানুষের ভিড় লেগে যায় দূর দূর থেকে মানুষ এসে পৌঁছায় সেখানে। এর কারণ পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করলে পাটোয়ারী বলেছেন –

> "হুজুর, এরা বড় গরিব; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়।"[৮]

ভাত খেতে পাওয়াটাকে এরা ভোজের সমান মনে করে। সত্যচরণ বাঙালি বাবু তাই সকলে আশা নিয়ে এসেছিল ভাত খাওয়ার জন্য। এদের খাবারের তালিকায় আছে –

> "খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর জঙ্গলে বথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ আর একটু নুন, এই খায়। ফাল্গুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, নুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে - ...সে সময় এক মাস এ অঞ্চলের যত গরিব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়।"[৯]

এখানের মানুষ "চীনা ঘাসের দানা, আর নুন, বড় জোর তার সঙ্গে... জংলী গুড়মি ফল-ভাজা, নয়ত বথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুধুল ভাজা"।[১০] মকাই সেদ্ধ কে স্থানীয় ভাষায় বলে 'ঘাটো'। এই জঙ্গলের মধ্যেই থাকে গোড় পরিবার। গৃহকর্তার মুখে শোনা যায় –

"শুধু আতা খেয়ে আমরা মাস-দুই কাটিয়েছি। আতার লোভেই এখানে থাকা।"[১১]

জঙ্গলের মধ্যে থাকা এক সাধুবাবা বলেছেন –

> "বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে একরকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়।"[১২]

লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় খাদ্য। এছাড়াও আছে কাঁচা পেপে শুকনো কুল কেঁদ-ফল পেয়ারা ও বুনো শিম।

এখানে সারাবছর যে সমস্ত ফসলের চাষ হয় সেই ফসল শহর থেকে লোক এসে কিনে নিয়ে যায়। এখানে আসা ব্যবসায়ীরা একরকম এই সহজ সাধারণ মানুষ গুলিকে ঠকিয়ে নিয়ে নিজেদের মুনাফা করে। এর সাথে সাথে আসে নানান দ্রব্য বিক্রেতারা তারাও সামান্য জিনিসের বিনিময়ে অধিক ফসল তুলে নেয় এদের কাছ থেকে।

এই অঞ্চলে সেই সব মানুষকে বড়লোক হিসেবে দেখা হয় যার বাড়িতে অধিক গরু বা মহিষ থাকে।

"গরু, মহিষ এদেশে সম্পদের বড় মাপকাঠি, যার যত মহিষ, সে তত বড়লোক।"[১৩]

আবার -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"মিছরি খাইয়া জলযোগ যে করে, সে এ-দেশে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয় – বড়লোকের উহা আর একটি লক্ষণ।"[১৪]

এই অঞ্চলের অতিথি বরণের রীতির বেশ কিছু নিদর্শন আছে। ঝুলন উৎসবে সত্যচরণ এই এলাকার পুরাতন শাসক রাজা দোবরুপান্নার রাজ্যে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে "শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও অন্যান্য পানের মশলা"[১৫] দিয়ে অতিথি বরণ করা হয়। হোলির নিমন্ত্রণে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন এলাকার বর্তমান শাসক রাসবিহারী সিং এর বাড়িতে। সত্যচরণ রাসবিহারী সিং এর বাড়িতে পৌঁছালে বন্ধুকের আওয়াজ করে তার অভ্যর্থনা করা হয়। একটা বড় থালায় "আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা ও মিছরিখণ্ড, এছাড়া ফুলের মালা"[১৬] দিয়ে অতিথি বরণ করা হয়। এছাড়াও মহাজন নন্দলাল ওঝার বাড়িতে সত্যচরণ অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। নন্দলাল ওঝার বাড়িতে প্রবেশের পর দুবার বন্ধুকের আওয়াজ করে অভ্যর্থনা করা হয়। এরপর সত্যচরণ বলেছেন, -

"...দশ-এগারো বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল" সেই থালায় রয়েছে "গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মতো ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, শুষ্ক খেজুর; ...।"[১৭]

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে নেই। জড়িবুটি দিয়ে চিকিৎসা করা একমাত্র অবলম্বন। হাসপাতাল যেটা আছে সেটা পূর্ণিয়া জেলায় যা ৫৫ কিমি দূরে অবস্থিত। পোষাক পরিচ্ছদ তেমন নেই। শীতকালে শীতের বস্ত্র নেই। কলাইয়ের ভূষির ভিতরে থেকে এখানের মানুষ শীত পার করে। নক্‌ছেদী বলেছে –

"কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে, আমরাও কলাইয়ের ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই।"[১৮]

এই সব অঞ্চলে লেখাপড়া জানা বা শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। ছাত্র পড়ানোর জন্য টোল খুললে সেই টোলে ছাত্র হয় না। থাকা খাওয়ার সুবিধা পেয়ে কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে আসে টোলে। মটুকনাথ পণ্ডিত উৎসাহের সঙ্গে টোল খুলে খুব নিরাশ হয়েছে। তবে পরে ধীরে ধীরে বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের সংখ্যাও কিছু কিছু বেড়েছে। পরবর্তী সময়ে গনোরীকেও একটা টোল খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ সত্যচরণের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আছে কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, রাজু পাড়ে। 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে স্থানীয় এক সভা বা মুসায়েরাতে এসেছিলেন। সেখানে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমন্ত্রিত ছিল তার কবিতা শুনে ঈশ্বরীপ্রসাদ খাতির করেছিলেন।

সত্যচরণ বিহারের অরণ্য অঞ্চলে এসেছেন উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে শীতকালে। উপন্যাসের পরবর্তী বেশ কিছু পরিচ্ছেদ ঋতুর কথা উল্লেখ করে শুরু হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ গ্রীষ্ম, চতুর্থ বর্ষা, পঞ্চম শীতের শেষ, সপ্তম অষ্টম বসন্তকালে। বিহারের শীত সম্পর্কে লেখক বলেছেন –

"এমন যে শীত এখানে তা না জানার দরুন উপযুক্ত গরম কাপড় ও লেপ-তোশক আনি নাই। কলিকাতায় যে কম্বল গায়ে দিতাম সেখানাই আনিয়াছিলাম – শেষরাত্রের শীতে সে যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যায় প্রতিদিন। যে-পাশে শুইয়া থাকি, শরীরের গরমে সে দিকটা তবুও থাকে এক রকম অন্যকাতে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখি বিছানা কন্‌কন করিতেছে সে পাশে-মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পুকুরের জলে পৌষ মাসের রাত্রে ডুব দিলাম।"[১৯]

চরম শীতের পর গ্রীষ্মের দাবদাহের এবং জলকষ্টের কথা লেখকের কলমে উঠে আসতে দেখি –

"...সারা জঙ্গল মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল – সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না – যদি বা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, এক বালতি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার ওপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পড়িয়ে গিয়াছে।"[২০]

এমন পরিস্থিতিতে জঙ্গলের মধ্যে দাবানল লেগে গিয়ে জঙ্গল মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সিপাহিরা ভয়ের সঙ্গে বলে ওঠে –

"আগ তো আ গৈল হুজুর।"[২১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আরণ্যকের মধ্যে লেখক বার বার কুশী নদীর কথা বলেছেন যা মহালের পূর্বপ্রান্ত থেকে ৭-৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই কুশী নদী সম্পর্কে জানা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে নেপালে প্রবেশ করেছে তার পর নেপাল থেকে ভারতের বিহার রাজ্যে প্রবেশ করেছে। কুশীকে 'বিহারের শোক' বলা হয়। কারণ এর প্রচন্ড রূপ আছে। সাতটি নদী এই কুশীতে মিলিত হয় তাই একে সপ্তকোশী বলা হয়। কাটিহারের ক্রুসেলাতে এসে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়। এই কুশী নদী এবং কুশী অঞ্চল নিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'কুশী-প্রাঙ্গনের চিঠি' রচনা করেছেন ১৯৬৫ সালে। দুটো মহকুমা ষোলোটা থানা নিয়ে চার হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বিরাট কুশী প্রাঙ্গণ। পূর্বে ভাগলপুরের সাথে ছিল পরে সাহারসাকে কেন্দ্র করে আলাদা জেলা হয়। অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিহারে অবস্থান করেছিলেন তখন এই এলাকা কুশী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এই কুশী এলাকা তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে - ১. সাহারসা, ২. মধেপুরা, ৩. সুপোল। বিহারের এই অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে কুশী নদী ছাড়াও কারো নদী, মিছি নদী এবং কলবলিয়া নদীর নাম আছে।

এই অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে আছে কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ। যেগুলো ভদ্র সমাজে ভিত্তিহীন বা কুসংস্কার মনে হলেও বিহারের নির্জন অরণ্য প্রকৃতিতে এর গুরুত্ব অন্যরকম। বোমাইবুরুর জঙ্গলে ডামাবানু বা জীনপরিদের কথা আছে। এই ডামাবানুর কথা আমীন রামচন্দ্র সিং এবং আসরফি টিণ্ডেল, বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলের মুখে শোন যায়। সাদা কুকুরের রূপ ধরে ঘরের মধ্যে ঢোকে আবার কখনো নারী রূপ ধরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কোন মানুষ সেই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলে পরে তার চরম ক্ষতি হয়।

অরণ্য প্রেমের কথা রাজুর মুখে শোনা যায়। সে গাছ কাটার পক্ষে নয়। সে বলেছে –

> "এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভালো জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটেছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার যেখানে চলে সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে।"[২২]

লেখক বিহারের নিসর্গকে চর্মচক্ষেই নয়, অনুভব করেছেন মর্মচক্ষু দিয়েও। প্রকৃতি তাঁর কাছে একটি সত্ত্বা যেন, তার জন্যই তাঁর কলমে উঠে এসেছে –

> "প্রকৃতি তার নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না।"[২৩]

প্রকৃতির রূপের অদ্ভুত সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে সরস্বতী কুণ্ডীর চারিধারে। যেন স্বর্গের উদ্যান। এই প্রকৃতির রূপের পাগল প্রেমী হল যুগল প্রসাদ। বীজ রোপন করে সুন্দর গাছ লাগিয়ে অরণ্য অঞ্চলকে সাজিয়ে তুলেছে। অরণ্য অঞ্চলের রূপ যেন ছবির মত সুন্দর।

এই প্রকৃতির অভিন্ন অংশ এখানের বসবাসকারী মানুষজন। উপন্যাসের এক এক পর্বে এক এক চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এবং তাতে আমরা মুগ্ধ হয়। গনু মাহাতো, নন্দলাল ওঝা, ধাওতাল সাহু, জয়পাল কুমার, কুন্তা, ধাতুরিয়া, রাজুপাড়ে, যুগলপ্রসাদ, মটুকনাথ, নকছেদী ভকত, মঞ্চী, দশরথ, ভানুমতী, দোবরু পান্না, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, গনোরী প্রভৃতি। প্রকৃতির মতোই উদার এবং মুক্ত মনের অধিকারী এই অরণ্য অঞ্চলের মানুষজন। লেখক তাই বলেছেন,-

> "এদেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা – ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এঁদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে – এদের ভালোবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালোবাসাও বড়।"[২৪]

এখানের প্রকৃতির যেমন কোমল এবং বীভৎস দুই রূপ আছে। এখানে সেরকম দুই রূপের মানুষও আছে। কোমল মানুষের পরিচয় আগে দিয়েছি। উপন্যাসের বীভৎস মানুষ রাসবিহারী সিং।

> "এ-অঞ্চলের যত গরিব গাঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরিবকে মারিয়া তাহাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে।"[২৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এলাকার পুলিস, সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার সকলেই তার অনুগত থাকেন।

লেখক বিহারের অরণ্য প্রকৃতির প্রতি প্রেম এবং এখানের মানুষের সরল মনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মনের মধ্যে যে গোপন কথা ছিল তা প্রকাশ করেছেন –

> "এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোতস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত – আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম।"[২৬]

সত্যচরণ ভালোবেসেছিলেন দক্ষিণ বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর সংলাপকে।

বিভূতিভূষণ অরণ্য অঞ্চলে এসেছিলেন প্রকৃতির টানে। কিন্তু তিনি যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বা তাঁর উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা প্রকৃতি ধ্বংসের কাজ। তার জন্য তিনি যথেষ্ট অনুশোচনা করেছেন। কষ্ট পেয়েছেন এবং প্রকৃতির কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছেন। এই পাপ কার্যের জন্য যে অপরাধ তিনি করেছেন সেই অপরাধ থেকে কিছুটা মুক্ত হওয়ার জন্যই এই উপন্যাসের সৃষ্টি বলে তিনি জানিয়েছেন –

> "এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনীর অবতারণা।"[২৭]

তারাদাস বন্দোপাধ্যায় 'আরণ্যক' সম্পর্কে বলেছেন, -

> "একটি ধীরলয়ে বয়ে যাওয়া কাহিনী একটি শান্ত বাঁশির সুরের মত পটভূমিকে অবলম্বন করে ক্রমশ পাঠককে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে সৌন্দর্যোপলব্ধির অমরাবতীতে।"[২৮]

একটি উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণ প্রতিভার গুণে একাধিক দিককে তুলে ধরেছেন আর প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক পৃথক উপন্যাস লেখার যোগ্য। উপন্যাসের কোন অংশই আরোপিত নয়। বড় সজীব। বড় প্রাণবন্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে শিরোনাম অনুযায়ী যা বিশ্লেষিত হল তাতে সর্বাংশে মুগ্ধতা জড়িয়ে আছে, এ-কথা একেবারেই অস্বীকার করার নয়। পাঠক আমরা-র সৌভাগ্য 'আরণ্যক' সর্বার্থেই আমাদের। বিভূতিভূষণের ভাবনা জগতের স্বরূপ সত্যচরণ। সত্যচরণের সঙ্গে চরণ মিলিয়ে আমরাও ঘুরে বেড়িয়েছি অরণ্যপথের অলিগলিতে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯২, পৃ. ৩
২. ঐ, পৃ. ১১৯
৩. ঐ, পৃ. ১৪৫
৪. ঐ, পৃ. ১৪৯
৫. ঐ, পৃ. ২৭
৬. ঐ, পৃ. ১০৪
৭. ঐ, পৃ. ৯
৮. ঐ, পৃ. ১২
৯. ঐ, পৃ. ১৭
১০. ঐ, পৃ. ৪১
১১. ঐ, পৃ. ১০৮
১২. ঐ, পৃ. ১০৯
১৩. ঐ, পৃ. ১১৭
১৪. ঐ, পৃ. ৫৭
১৫. ঐ, পৃ. ১১৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. ঐ, পৃ. ৫৭
১৭. ঐ, পৃ. ১৯
১৮. ঐ, পৃ. ৮৫
১৯. ঐ, পৃ. ১৩
২০. ঐ, পৃ. ২২
২১. ঐ, পৃ. ২৬
২২. ঐ, পৃ. ৪৮
২৩. ঐ, পৃ. ৬০
২৪. ঐ, পৃ. ১১৬
২৫. ঐ, পৃ. ৫৬
২৬. ঐ, পৃ. ১৬০
২৭. ঐ, পৃ. ৪
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯২, পরিশিষ্ট-ক, পৃ. ৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 385 - 394
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুধ্যানে আরণ্যক : প্রকৃতি ও অরণ্যচারী মানুষ

ড. মনোয়ার আলী
শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়
Email ID : monowaralimail@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nature, Extraordinary, Night, Beauty, Fullmoon, Strange, Mysterious, Forest, Environment, Village.

Abstract
In Bibhutibhushan Bandyopadhyay novel Aranyak nature and men are standing side by side. If the hero of this novel Satyacharan, then the heroine must be nature. The extraordinary description of day and night there against the background of secluded nature surely fascinated the reader. Although the author himself describes that the beauty of fullmoon night in forest cannot be described in pen and few words. Must be seen to enjoy. The picture of an extraordinary beauty of nature has been thoroughly described by the author in every chapter of Aranyak novel. Bibhutibhushan's nature consciousness is so deep that while describing him form, he has developed the forest as a living human form. He realised that this is not the world, this is the Dreamland that I knew so far, this horizon-wide astrological beings come here let at night. We find such a description in most of Bibhutibhushan's works. In the beautiful green sea we saw a floating sailor Satyacharan. On the one hand, Nada Boihara on the other hand, the impression of Mohanpura forest is in the novel detailed up to the vague blue boundary line.

In the novel I Arañyak, the characters of aranyachari are introduced to the narrator through simple yet strange mysterious each one like nature. Aranyachari Dhawtal Sahu is as simple and innocent as the forest or nature. The people of Bibhutibhushan in the novel Aranyak come from the simple environment of the village. And his natural sympathy towards them is a little more prejúdiced then that of the educated gentry of the city. These ordinary people have become an invitable part of the forest. Dhawtal Sahu, Raju pade, Ganu Mahato, Ganori, Jugal Prasad, Dobru Panna, Bhanumati are half forest and half human. The secret of their words is like the language of the forest. Out of the forest Kunta, Manchi, Dhaturia, Matuknath pade, Rajput, Ras bihari Singh is character is glowing with self-glory. The vastness of nature deeply affects the human mind, benevolent. So it can be said that in this novel nature and forest people Compliment each other.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 385 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বাংলা উপন্যাসের জগতে অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা খুব কম নয়। মনোজ বসুর লেখা 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত', সমরেশ বসুর লেখা 'দুই অরণ্য', মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'অরণ্যের অধিকার', বুদ্ধদেব গুহ'র লেখা 'পারিধী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আরণ্যক' ইত্যাদি। বাংলা উপন্যাসে অরণ্যকে তার প্রসার, গভীরতা ও তার অস্তিত্বকে মনে প্রাণে ধরে রেখেছেন অরণ্য উপাসক ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কর্মসূত্রে অরণ্যের খুব কাছাকাছি আসেন এবং এই অরণ্যই ঔপন্যাসিকের জীবন সম্পন্ন রূপে বদলে দেয়। বিভূতিভূষণ ১৯২৩ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এর জমিদারের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন পদে নানা সময়ে নিযুক্ত থেকেছেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজে ভাগলপুরে যোগদান এবং সেখানকার কাছারি বাড়িতে থাকতেন; — যেটা ভাগলপুরের 'বড়বাসা' বলে পরিচিত ছিল। সেখানকার স্থানীয় ভাষায় বলা হত 'বড়িবাসা'। এই বাড়ির দোতালায় থাকতেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিই প্রকৃতি কেন্দ্রিক।

প্রকৃতি অবশ্যই সাহিত্যের আনুষঙ্গী বিষয়। সবধরনের সাহিত্যেই প্রকৃতির চিত্র নানাভাবে উঠে আসে। কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই পাশ্চাত্য সাহিত্যে শেলী, কিটস, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সৃষ্টিতে প্রকৃতি নানা ভাবে ধরা দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতির অপূর্ব চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। কলকাতা শহর থেকে দূরে ভাগলপুর, পূর্ণিয়ার প্রকৃতির অপূর্ব সান্নিধ্য ও আত্মমগ্নতা ঔপন্যাসিকের মন এখানে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। ঔপন্যাসিক 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রস্তাবনায় প্রকৃতির রূপ বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন —

> "কলিকাতা শহরের হৈ চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূধূ ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়হীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খর রৌদ্র মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুন্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙ্গিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্ত পলাশের ঘন অরণ্যের কথাভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্য ভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।"[১]

একদিকে লবটুলিয়া বইহার, নাঢ়া বইহার এর বিরাট অরণ্যানী, সরস্বতী কুন্ডির স্নিগ্ধ জলরাশিও তার মনোমুগ্ধকর বনভূমি, অন্যদিকে মোহনপুরা বিরাট ফরেস্টের বিশাল ধূসর সীমারেখা, কুশি নদী, সাঁওতাল রাজ্যের ধনঝরি পাহাড়ের শৈলশ্রেণি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসপটে প্রভাব ফেলেছিল তারই প্রকাশ পেয়েছিল 'আরণ্যক' উপন্যাসটি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "বিশাল অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রহস্যময় যোগাযোগের নিবিড় অনুভূতি বিভূতিভূষণ এর এক প্রকার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেই রহস্যময়তা অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করেছে আরণ্যকে।"[২]

এই অরণ্য সংকুল বিস্তীর্ণ ধরিত্রী তো নিতান্ত কল্প নয়। ভাগলপুরের গঙ্গা অতিক্রম করে নৌগাছিয়া, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, গয়া পর্যন্ত বিস্তারিত। সত্যি, সত্যি বিভূতিভূষণ-এর প্রকৃতিপ্রেমিক অকৃত্রিম; — কল্পনার অতীত। তাঁর সৃষ্টিতে দেখা যায় আটকামানের প্রকৃতি যেমন স্বয়ং আলাদা, তেমনি নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া, আজমাবাদেরও প্রকৃতির স্বাদও ভিন্ন ধরনের। নির্জন পটভূমিতে যেখানে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে দিনের পর আসে রাত। এখানে সেই দিন এবং রাতের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এই অসাধারণ চিত্র বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা মানুষের কাছে তা কোনো মতোই দেখা দেয় না। তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য লেখকদের মতো কোনো 'ইজম' এর ধার না ধেরে নিজের জীবন দর্শনের দোয়াতে কলম ডুবিয়ে এই জগতের মধ্যে যে প্রকৃতির অপূর্ব চিত্র, যে অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের রচনা করলেন, পাঠক সমাজের কাছে আজও সমান বিভায় বেঁচে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও বলা যায়, অন্যান্য লেখকরা যেখানে প্রকৃতির বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোকে উত্তরণের জন্য প্রাত্যহিকতার দায়বন্ধন এড়াতে সর্বদা ব্যস্ত, সেখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত দায় অঙ্গীকার করে মনে প্রাণে প্রকৃতিকে লক্ষ করেছেন — তার অনন্ত সৌন্দর্য, তার বীভৎতার সবরকমের পরিপ্রেক্ষিতে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 385 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তারই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় আরণ্যকের মতো উপন্যাসের; — যা সৌন্দর্যবোধের নতুন পরিচয় উদ্ভাসিত করে পাঠকের অন্তরে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্নপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যের চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যান তন্ময়তায় মগ্ন করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।"[৩]

বিভূতিভূষণের আরণ্যকের মতো সৃষ্টি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যেও সত্যিই পাওয়া যায় না। লেখকের মন মানস সর্বদা প্রকৃতি প্রেমে আবদ্ধ তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে আরণ্যক উপন্যাসের প্রতিটি পরতে পরতে। যদিও এটাও উপন্যাস তবুও এখানে কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই। এ প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

> "আরণ্যক উপন্যাসে সুদীর্ঘ কোন কাহিনী বা উপকাহিনী নেই।"[৪]

বলা যেতে পারে ঔপন্যাসিকের মনোজগতের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বাণীটির সঙ্গে আধ্যাত্ম মিলন ঘটেছে। আর লেখক তার মাঝে মাঝে সমাজের অন্ত্যজ মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের, হাসি কান্নার টুকরো টুকরো ছবির প্রতিফলন অঙ্কন করেছেন। হাজার হাজার বিঘা ঘন অরণ্যের পটভূমিতে লেখা আরণ্যক উপন্যাসে কোনো নায়ক নেই। তবে এখানে নায়িকা স্বয়ং প্রকৃতি। 'আরণ্যক' উপন্যাসটি ম্যানেজার সত্যচণেরর জবানিতে উত্তম পুরুষে রচিত। কলকাতার যুবক সত্যচরণের শহুরে মন মানসিকতা ভাগলপুরের এই বিশাল বিস্তীর্ণ অরণ্য দর্শন করে প্রথমদিকে বিরক্ত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পরে যত দিন যায় ক্রমশ সত্যচরণের এই মন প্রকৃতির সম্মোহনি শক্তির টানে ধীরে ধীরে যেন সেখানে বাধা পড়ে যায়।

সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন —

> "বিভূতিভূষণকে সাধারণভাবে প্রকৃতির শিল্পী বলে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বর, প্রকৃতি মানুষ— এই তিন নিয়েই তাঁর শিল্পলোক এবং সে ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতির অধীন: এভাবেই তাঁকে দেখা হয়। এবং তাঁকে তিনি শান্ত গ্রাম বাংলার নিসর্গ প্রেমী বলে বর্ণনা করা হয় সেখানে তিনি মুখ্যত পথের পাঁচালী লেখক। অথচ তিনি যে ভয়াল নিষ্ঠুর মানুষের সুখ দুঃখ সম্পর্কে উদাসীন প্রকৃতিরও শিল্পী, তা সবসময় মনে রাখিনা। আরণ্যক উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল।"[৫]

'আরণ্যক' উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছেন বারবার। দিগন্ত বিস্তৃত লবটুলিয়ার অরণ্যের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, ফুলুকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নার অর্ধ রাত্রির মায়াময় পরিবেশ, সরস্বতী কুন্ডীর ঘন পুষ্পপল্লবী আর পাখির কিচিরমিচির শব্দ যেন এক অপূর্ব ও ইন্দ্রজালিকের রচনা করেছে। সর্বদা সত্যচরণের মনে হতো এটি পরীরাজ্য, পরীদের আস্তানা। কখনো ঘোড়া নিয়ে ছুটতো মিশর নির্জন, নি:শব্দ রাত্রিতে সত্যচরণ। দুই দিকে ঘন অরণ্য। তার উপরে চন্দ্রতাপ বিছানো। সেই আলোকে লক্ষ করছে নীলগাই ও হায়েনার বাচ্চারা কুন্ডীর জলে মুখ ডুবিয়ে জল পান করছে। আবার কোনো কোনো দিন সত্যচরণ সরস্বতী কুন্ডির নদীর ধারে বিস্তীর্ণ তরুতলে শান্তভাবে শুয়ে পৃথিবীকে বার বার অবলোকন করেছে। এই কুন্ডীর প্রায় তিনটি দিক ঘন অরণ্যে মোড়া আর যেদিকে কিছুটা ফাঁকা সেদিকে নীল আকাশ বহুদূর প্রসারিত এবং কিছুটা দূরে আপছা শৈলমালা বনপ্রেমিক সত্যচরণের মনকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে দিক দিগন্তে কোনো এক স্বপ্ন রাজ্যে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরণ্যক উপন্যাসের প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

> "জনহীন, বিশাল অরণ্য প্রান্তরের জ্যোৎস্না রাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে— ইহা কখনও পরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্নসৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে।তেমনি নিস্তব্ধ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে— যাহাকে বলে Cosmic imagination তাহাকেই— স্ফুরিত করিয়াছে; কল্পনাকে সৃষ্টি রহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টি ক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দ শিহরণ ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি পরিচয়কে উদঘাটিত করিয়াছে।"[৬]

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "প্রাকৃতিক এবং অতিপ্রাকৃত জীবনের ভেদরেখা যে অরণ্যভূমিতে মিলেমিশে রয়েছে সেখানকার বর্ণনাভঙ্গিতে গদ্যের ঋজুতার সঙ্গে কাব্যের নমনীয়তা প্রয়োজন।"[৭]

বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায় অশরীরী বেশে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় বোমাইবুরুর জঙ্গলে। এই প্রথম বহুব্যাপ্ত নির্জন বনভূমিতে বহির্জগতের সম্মুখীন হয়েছে। এই অনধিকার প্রবেশে সে খানিকটা রুষ্টা। তার কারণ এরা সতর্ক নিষেধবাণী অনেক সময় উপেক্ষা করেছে। কলকাতার শিক্ষিত ম্যানেজার সত্যচরণ এইসব অলৌকিক ব্যাখ্যায় কখনোই মনে প্রানে বিশ্বাস করেন না। রামচন্দ্র আমিনের ছেলে অনেক রাত এক অসম্ভব দৃশ্য দেখে শেষমেষে দুলঙ্ঘ্য নিয়তির হাতছানিতে ঘর থেকে বেরিয়ে মারা গেছে। সত্যচরণ সেখানে গিয়ে দেখলেন —

> "তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়ে। মুখে তার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন কি একটা বিভীষিকা দেখে আঁৎকিয়ে যেন মারা গেছে।"[৮]

সত্যচরণকে এই ঘটনা ভাবতে বাধ্য করায়। এইসব জনহীন অরণ্য ও ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায় সত্যচরণ। চাঁদ সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে রাতের প্রকৃতির তেমন কোনো মিল নেই এখানে। শীতকালের ছোটোদিনে এই অরণ্যের মধ্যে চতুর্দিকে যেন শূন্যতা। এখানকার মানুষের মতো প্রকৃতি ও খানিক শূন্যতাবোধে আক্রান্ত। চারদিকে খোলা প্রান্তর, বনফুল ও কেঁয়োঝাঁকার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে সত্যচরণ ভাবেন —

> "যে কথাটা বারবার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন মতেই ঠিকমতো বুঝাইতে পারতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্য, বিরাটত্বের ভয়াল গা ছম-ছম করানো সৌন্দর্যের দিকটা।"[৯]

এই বনপ্রান্তরের বিরল সৌন্দর্য বিভূতিভূষণের সৃষ্টি যেন কোলরিজের কবিতার প্রকৃতি চেতনার কথাকে বারবার স্মরণ করায়।

লেখকের প্রকৃতিচেতনা ঠিক গতানুগতিক পথে পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর মরমি সত্তা; — যা প্রজ্ঞার চেয়েও অনুভববেদ্য। বাস্তবের মাটিতে পা রেখেও রোমান্টিকমন যার মধ্যে সর্বদা বিরাজ করে। আর এই রোমান্টিকতার জন্যেই জগৎ-জীবন-প্রকৃতি হয় আলোকিত। কারো নদীতে যাওয়ার আগেই সত্যচরণের মনে হয় — এই মুক্ত জ্যোৎস্না শুভ্র বন প্রান্তর সবাইকে আকর্ষণ করে না। যারা বারমখা-খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষ সে তাদেরকেই কাছে ডাকে। সেই সময় অরণ্যে জেগে ওঠে এক নবলোক। মনে হয় —

> "এ সে পৃথিবী নয়, এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে। তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু। বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনেনা, দিগ্বলয় রেখা যাদের কখনো হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোনো কালেই।"[১০]

কিন্তু লেখকের এই প্রকৃতির নানা রূপ বারে বারে ধরা পড়েছে। সত্যচরণ প্রকৃতির অরণ্য দেখে মোহিত হয়ে তার মনে হয়েছে –

> "যতদূর দৃষ্টি চলে, এদিকে নাঢ়া-বইহার ওদিকে মোহনপুরা অরণ্যের অস্পষ্টনীল সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে। এই সবুজের সমুদ্রবর্ষা সচল হাওয়ায় মেঘকজ্জ্ব আকাশের নিচে এই দীর্ঘ মরকত শ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। আমি যেন একা এ অকূল সমুদ্রের নাবিক কোনো রহস্যময় স্বপ্ন বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছি।"[১১]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসে গৌরব তাহা এই উপন্যাসের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন অরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে।"[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 385 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকে প্রকৃতির যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে লেখক কারো দ্বারা প্রভাবিত হননি বরং বলা যায় অন্যকে প্রভাবিত করেছেন। এই উপন্যাসের নরনারীর একান্ত আশ্রয় হিসেবে অবস্থান করে প্রকৃতি অর্থাৎ যারা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই আরণ্যকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন মানুষের থেকেও প্রকৃতির স্থান অনেক উপরে। সত্যচরণ যে প্রকৃতি উপাসনা করেন তার সঙ্গে মিলে আছে গভীর আধ্যাত্মবোধ। সত্যচরণ মনে মনে দুঃখিত হন এই রম্যভূমিতে যারা বাস করেন সেইসব অরসিকদের জন্য তিনি বলেন —

> "এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, রম্যভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবনযাপন করিতে। অন্য দেশ হইলে আইন করিয়া এমন সব স্থান সৌন্দর্য পিপাসু প্রকৃত রসিক নর নারীর জন্য সুরক্ষিত করিয়া রাখিত...।"[১৩]

সত্যচরণের আধ্যাত্মজগৎ একটু অন্য ধরনের। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তাকে খুঁজে পান। লেখক এর মিষ্টিক চেতনা প্রকৃতি অবলম্বনে নবরূপ লাভ করেছে আরণ্যক উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক বলেছেন —

> "কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্ত মেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবারণী সুর সুন্দরীর সাজে হিম স্নিগ্ধ কুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশ ভরা তারার মালা গলায় অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।"[১৪]

সত্যচরণ প্রকৃতির অনন্ত অসীম প্রেক্ষাপটে নিজের মনের কথার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে —

> "ফুলকিয়ার সেই জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যালোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া উপলব্ধি করা যাইবে না... জীবনে একবারও সেই জ্যোৎস্না রাত্রি দেখা উচিত, যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির অপরিচিত রহিয়া গেল।"[১৫]

প্রকৃতির পাশাপাশি 'আরণ্যক' উপন্যাসে যত্রতত্র অরণ্যচারী মানুষের বাস। এই মানুষরা হলেন কুন্তা, নন্দলাল ওঝা, ধাঁওতাল সাহু, গণু মাহাতো, গিরিধারী লাল, রাজু পাঁড়ে, ধাতুরিয়া, রাসবিহারী সিংহ, ছোটু সিং, যুগলপ্রসাদ, মোটুকনাথ পাঁড়ে, বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, দোবরু পান্না, ভানুমতী, মঞ্চী, নকছেদী ভগৎ, সুরতিয়া ত্ররা যেন অর্ধেক অরণ্য, অর্ধেক মানুষ। এদের কথার রহস্য যেন অরণ্যেরই ভাষা। এরা প্রকৃতির উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। তবে এই সাধারণ স্থানীয় দেহাতী মানুষ, রাজপুত মহাজন, সাঁওতাল রাজা ও তার নাতনী উপন্যাসের কাহিনীতে যেমন মূল্য পেয়েছে, তেমনি অতি মানবীয় গুণে তাদেরকে সাধারণের ধোঁয়াছোঁয়ার বাইরেও রাখেননি ঔপন্যাসিক। প্রকৃতির বিশালতা মানুষের মনকে উদার করে, তাদেরকে প্রভাবিত করে। কলকাতা শহরে মানুষ যেখানে ডাল ভাত মাছ মাংস ছাড়া নিজের জীবনের একটা দিনও ভাবতে পারেনা সেখানে লেখক অরণ্যচারী মানুষের জীবন অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন যে বছরের পর বছর মানুষ কীভাবে কেবলমাত্র চীনা ঘাসের দানা খেয়ে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছে।

'আরণ্যক' উপন্যাসে দেখা যায় যে সভ্য শহুরে সমাজের মানুষ একটু আয়েই নিজের জীবনকে কাটাতে চায় আরাম ও আয়েশের সঙ্গে। সেখানে দেখা যায় ধাওতাল সাহুর মতো চরিত্র যে অরণ্যের মধ্যে নিজের জীবন কাটাচ্ছে কেবলমাত্র কলাইয়ের ছাতু খেয়ে। অথচ সে এলাকার একজন লক্ষপতি মানুষ। এই ধাওতাল সাহু কত টাকা মানুষকে ধার দিয়ে তা আদায়ের জন্য কোন তাগাদা করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেন —

> "টাকা ধার দিয়া সে জোর করিয়া কখনো তাগাদা করিতে পারে না। কত লোক যে তাহার টাকা ফাঁকি দিয়াছে।"[১৬]

সত্যচরণের মতে, তার মহাজন বৃত্তি করা একেবারেই ঠিক না। তার কারণ ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবে না না জেনেও মোট মোটা সুদের আশায় সমাজের অসৎ লোকদের টাকা দেয়। সবসময় এই অদ্ভুত মানুষটি উড়নিতে বেঁধে রাখে পুরনো সব দলিলপত্র। এইসব কাগজপত্রগুলো সে সত্যচরণকে দেখায় এবং সেই সঙ্গে সতচরণ তাকে বোঝাতে চায় কঠিন মানুষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 385 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না হলে মহাজনবৃত্তি করা যায় না। এই সৎ মানুষটি জীবনে খুবই কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করেছে। তাই সে সত্যচরণকে জানায় —

> "রাঁইচি আর রেড়ি বীজ বিক্রি করে টাকা করেছিলাম হুজুর, নয়তো আমার পৈত্রিক আমলের একটা ঘষা পয়সাও ছিল না। আমি করেছি আবার আমিই লোকসান দিচ্ছি।"[১৭]

এই ধাওতাল সাহুর কাছে একবার সত্যচরণ নিজে টাকা ধার চেয়েছিল। দশ হাজার টাকার রেভিনিউ দাখিলের জন্য তহশীলদার বনোয়ারী লালের পরামর্শে সে টাকা চায়। তার বাড়িঘর ও সাদামাটা জীবনযাপন দেখে সত্যচরণ অবাক হয়ে বলে —

> "বাড়িঘর আসবাবপত্র দেখিয়া কে বলিবে ইহা লক্ষপতি মহাজনের বাড়ি।"[১৮]

অরণ্যচারী মানুষদের মধ্যে মঞ্চী বিভূতিভূষণের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। ফুলয়ারকির আবাদি জমির ফসল কাটার আগত কাটুনি মজুরের বুড়ো নকছেদী ভগৎ এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সে। তার বয়স চব্বিশ পঁচিশ, স্বাস্থ্যবতী, গায়ের রং কালো, নিটোল গড়নের মেয়েটি। সত্যচরণ তারই কাছে শোনেন তাদের জীবন যাত্রার কাহিনি। তারা বাঘকে ভয় করে না, বড় বড় জীবজন্তু দেখে ভয় পায় না। ধানের সময় বুনো হাতির উপদ্রব বাড়ে। সে জানায় —

> "সে আমরা অখিল কুড়া পাহাড়ে নিচে ছিলাম। একদিন রাতে এক খুপরীর বাইরে রান্না করছি। চেয়ে দেখি পঞ্চাশ হাত দূরে চার-পাঁচটা বুনো হাতি কালো পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে অন্ধকারে— যেন আমাদের খুপরির দিকেই আসছে। আমি ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে বড় মেয়েটাকে হাত ধরে রান্না ফেলে খুপরির মধ্যে তাদের রেখে এলাম।"[১৯]

সে দক্ষিণ বিহারের দেহাতি 'ছিকাছিনি' ভাষায় সুন্দর কথা বলতে পারে। আমোদ আহলাদ ভালোবাসে সে, সঙ্গে ভীষণ শৌখিন মেজাজের মানুষ। কিন্তু দারিদ্র্য জীবন তার শখ পূরণে অনেকটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিরান্নব্বই বছরের বৃদ্ধ সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না আজ যার রাজত্বের চিহ্নমাত্র নেই। দারিদ্রই তার নিত্য সঙ্গী। এই সাঁওতাল রাজাকে দেখে সত্যচরণ মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। দোবরু পান্নার নাতির মেয়ে ভানুমতীর গায়ের রং কালো, তার অপূর্ব শরীরের গড়ন ও মুখ দেখে সত্যচরণের মনে হয়েছে —

> "এদেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরন্যানি, মেঘমালা শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কচহীন সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক।"[২০]

দোবরু পান্না বহির্জগতের কোন খবর রাখেন না। এই অরণ্যই তার পৃথিবী। শিকার করা ও গোচারণই এই রাজ পরিবারের একমাত্র বৃত্তি। তবুও রাজাকে তার প্রজারা শ্রদ্ধা করে। বিচারের জন্য তারই দ্বারস্থ হয় তারা। বয়স হলেও অটুট তার মনোবল ও দৈহিক শক্তি। ভানুমতী বিভূতিভূষণের আর একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি। এই মেয়েটির ব্যবহার ঠিক যেন অরণ্যভূমির স্বাভাবিক জল বাতাসের মতো বলে মনে হয়েছে সত্যচরণের। তার মনে এই কন্যার ব্যবহার সত্যচরণকে মনে প্রাণে আকর্ষণ করেছিল। ভানুমতী তার পিতামহের নির্দেশেই যথার্থ আতিথ্য করেছিল সত্যচরণের। তার সম্পর্কে সত্যচরণের মনে হয়েছে —

> "ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ সরল, মর্যাদা জ্ঞান।"[২১]

দোবরু পান্নার মৃত্যুর পর ভানুমতী সত্যচরণকে তার সমাধি দেখাতে নিয়ে যায় পাহাড়ের উপরে। সেখানে যাওয়ার বিশেষ কারণ দোবরু পান্নার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই। সত্যচরণকে ভানুমতীর সহজ সরল ব্যবহার ও নির্মল ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, আরণ্যক উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক।দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক। লেখক সৌন্দর্যের মর্যাদা এবং মর্যাদার সৌন্দর্য উভয়কেই নিঃসংকোচে রূপায়িত করেছেন।"[২২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 385 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আজমাবাদের কাছারির মুহুরী যুগলপ্রসাদ সেন বিভূতিভূষণের এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। কিসের টানে মুহুরীর সমস্ত কাজ ফেলে বহুদূর সরস্বতী কুন্ডীর বন্যপ্রকৃতিকে যুগলপ্রসাদ সাজিয়ে দিতে ছুটে আসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা ধরনের ফুল, লতার বীজ এনে সে বনে পাহাড়ে লাগায়। সেই বীজ থেকে যখন গাছ হয়, ফুল হয় অনায়াসে লতার ঝাঁক বেড়ে ওঠে তখন এইসব দেখে যুগলপ্রসাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। অরণ্য প্রকৃতিকে গাছ দিয়ে সাজালেই তার আনন্দ। একদিকে মানুষ যখন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বনের পর বন কেটে ফেলেছে অন্যদিকে বিভূতিভূষণের সৃষ্টি এই ব্যতিক্রমী চরিত্র যুগলপ্রসাদ বনের মধ্যে আরও নতুন নতুন বীজ বপন করে তার সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টা করেছে। যেন সাধারণ মানুষ থেকে তিনি বিপরীতধর্মী সত্তা। আরণ্যক উপন্যাসের কথক সত্যচরণ ক্রমশ অরণ্যবাসীর জীবনধারণ সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হয়ে যান। এখানকার মানুষের দারিদ্রতা দেখে তিনি বলেছিলেন —

> “শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইলো।”[২৩]

কথকের এই মায়া ও বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কুন্তার কথা শুনে। কুন্তা হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে প্রতিরাতে অন্ধকারে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতো কেবল ম্যানেজার বাবুর পাতের এটোঁ ভাত নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর ক্রমে যখন কুন্তার পরিচয় সত্যচরণ জানতে পেরেছেন তখন আরও অবাক হয়ে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ধনী রাজপুত মহাজন দেবী সিংহ কাশী গিয়ে বাইজী কন্যা কুন্তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন এবং বিয়ে করেন। কিন্তু রাজপুত সমাজের অন্যান্য লোকেরা মনে প্রাণে তাকে কোনোদিনও মেনে নিতে পারেনি। তাই দেবী সিংহের মৃত্যুর পর যে কুন্তা —

> “লবটুলিয়া থেকে কিংখারের ঝালর দেওয়া পালকী চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেতো, বিকানের মিদুরী খেয়ে জল খেতো – আজও ওর এই দুর্দশা।”[২৪]

যদিও লবটুলিয়ার সর্বস্তরের মানুষ কুন্তাকে ঘৃণার চোখে দেখে তবুও কুন্তা নিজের আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে যেন দেবীসিংহের প্রেমের স্মৃতিকে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে নিজের মতো। সেই অরণ্য সমাজের মধ্যেই মানুষ জাতিভেদের সংকীর্ণতা নিয়ে যখন নিজেদের সর্বদা ব্যস্ত রেখেছে লেখক এই কুন্তাকে যেন সেই সমাজের এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবেই সৃষ্টি করে তুলেছেন। তাই দীর্ঘদিনের পরেই কথক সত্যচরণ কুন্তাকে মনে রেখেছে।

'আরণ্যক' উপন্যাসে লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা শ্রেণির মানুষকে দেখিয়েছেন। নকছেদী ভগৎ চরিত্রটি এক যাযাবর শ্রেণির মানুষ, যাকে অরণ্যের ম্যানেজার সত্যচারণ নাঢ়া বইহারের প্রজা হিসেবে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছিলেন। সত্যচরণ নকছেদীর সম্পর্কে বলেছেন —

> “নকছেদী প্রথমে জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল হুজুর দিন মানে বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে— বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর করি।”[২৫]

নকছেদী ভগতের স্ত্রী ছিল দুটি। একজন তুলসী অপরজন মঞ্চী। আসলে এই মঞ্চী তার মেয়ের বয়সী ছিল। তাই অনেক সময় মঞ্চীর বিভিন্ন ধরনের অন্যায় আবদারও নকছেদীকে মেটাতে হত। অসমবয়সী সম্পর্ক হলেও মঞ্চীর প্রতি নকছেদীর বর্বরতা প্রকাশ পায়নি কোনদিনও। তবে নকছেদী অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন অরণ্যচারী মানুষ ছিলেন। তাই তারই জেদের কারণে মঞ্চীর ছেলে বসন্ত রোগের টিকা না পেয়ে মারা গিয়েছিল এবং সম্ভবত সে কারণেই মঞ্চী তাকে ছেড়ে চলে যায়। পরবর্তীতে সন্তানের প্রতি নকছেদীর উদ্বেগ প্রকাশ পেলেও সত্যচরণ তাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি মঞ্চীর চলে যাওয়ার কারণেই। অরণ্যচারী মানুষদের মধ্যে সুরতিয়া আর একটি অন্যতম চরিত্র। নকছেদী ভগতের মেয়ে সুরতিয়া। লেখক যাযাবর পরিবারের এক উপযুক্ত কন্যা হিসেবে সুরতিয়াকে উপস্থাপিত করেছেন। সুরতিয়া নকছেদীর মেয়ে হলেও সে নকছেদীর মতো বিবেকহীন নয়। মঞ্চী ও তার বয়সের পার্থক্য খুবই কম ছিল। মঞ্চীর প্রতি সুরাতিয়ার মনে মায়া ও মমতাও ছিল যথেষ্ট। সুরাতিয়া এমন এক চরিত্র যে জন্তুকে ভালবেসেছে শিশুর মতো। তাই যখন ভালুক নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরতে এসেছে তখন সে বলেছে —

> “আমি একা বুকের মধ্যে ওকে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে – ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম।”[২৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 385 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুধু তাই নয়, শিকারেও পটু ছিল সুরতিয়া মেয়েটি। অভিনব কৌশলে পোষা পাখি দিয়ে বুনো পাখিকে শিকার করতো অনায়াসেই। দরিদ্র হলেও পয়সার মূল্য অপরিসীম হয়ে ওঠেনি সুরাতিয়ার কাছে। তাই সহজেই কথক সত্যচরণের জন্য একটি গুড়গুড়ি উপহার হিসেবে কিনেছে সে। সে কারণে সত্যচরণও তাকে ভালবেসেছে অতি সহজেই। কথক সত্যচরণকে প্রথম পরিচয়েই অবাক করে দেয় মোটুকনাথ পাঁড়ে। সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শুধু সের খানেক ছাতু খেয়ে হেঁটে আসে সত্যচরণের কাছে। আজমাবাদ ও নাঢ়া বইহারের জনশূন্য প্রান্তরে কিছু রোজগারের আশায় সত্যচরণের কাছে এসেছে সে। তার অসহায় হৃদয় আবেদন সত্যচরণের মনকে স্পর্শ করে। সে একজন অতি সাধারণ সহজ সরল মানুষ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছাড়া আর কোনো কাজ সে করে না। সত্যচরণের উপর তার গভীর আস্থা। সত্যচরণকে সে 'টোল' খুলে দেওয়ার জন্য আবেদন জানায়। অবশেষে টোল খোলা হয়। মিছি নদীর উত্তরপাড়ে জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভের উদ্দেশ্যে সত্যচরণ যে সময় তাবু ফেলে বাস করছেন সেই সময়ে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। সত্যচরণকে সে 'বাবুজি' বলে নিজের পরিচয় দেয়। তার বাড়ি পাটনার বিহারশরীফ। লোকটির আত্মসম্মানবোধের সঙ্গে মিশে আছে তার শিক্ষিত সত্তা। তার মুখের ভাষা ভদ্র ও পরিমার্জিত হিন্দি। সে যেখানে মাইল তিনে হেঁটে এসেছে সত্যচরণকে শুধু মাত্র কবিতা শোনানোর জন্য এবং বেঙ্কটেশ্বরের মনে হয়েছে সত্যচরণ বাঙালি, তাই বাঙালিরা বিদ্যার বড় কদর জানে। তারা বিদ্বান হয়। কিন্তু সাধারণ গ্রাম্য মানুষ তাকে পাগল ভাবে। বেঙ্কটেশ্বরের স্ত্রীর নাম রুকমা। সত্যচরণ মনে মনে ভাবে —

> "গভীর প্রেম গভীর বেদনার মতো। বেঙ্কটেশ্বরের হৃদয় সেই সত্যের পানেই ইঙ্গিত করে।"[২৭]

রাজু পাঁড়ে 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক উজ্জ্বলতম চরিত্র। তার দৈহিক গঠন দেখে সত্যচরণের মনে হয়েছে সে বয়সে বৃদ্ধও নয়, আবার তরুণও নয়। প্রচন্ড আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এই মানুষটি নিজের দুঃখের কষ্টের কথা অন্যকে বিশেষভাবে বলতে পারে না। ধরমপুর থেকে জমির উমেদারীতে আসা দু'বিঘা জমি রাজুকে লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দেন সত্যচরণ। তার প্রথম দু-বছর খাজনা দিতে হবে না, তৃতীয় বছর বিঘা পিছু চার আনা দিলেই হবে। কিন্তু জমিচাষে রাজুর মন বসে না। সে খুবই অলস প্রকৃতির। তাই তার জীবনে অভাব অনটন সর্বদাই লেগে থাকে। দিন যাপনের গ্লানি, এতটুকুও প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে তাকে দূরে সরে যেতে দেয়নি রাজু নিজের শিল্পী সত্তার অবসান ঘটাতে পারেনি। তাই সত্যিকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ হিসেবে রাজু পাঁড়েকে চিনতে ভুল হয়নি সত্যচরণের। রাজু খানিক চিকিৎসাবিদ্যাও জানতো। তবে যেবার শুয়োরমারির বস্তিতে কলেরা মহামারীর রূপ নেয় সেখানে রাজু অকুতোভয়ে রোগীদের চিকিৎসা করে। এই নিঃস্বার্থ পরহিতকারী মন তাকে উৎসাহিত করেছে এদের সেবায়। রাজুর জীবনেও প্রেম এসেছিল। কিন্তু প্রথম প্রেমের স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে বেঁচে আছে বাহান্ন বছরের রাজুর হৃদয়ে। সেই মেয়েটি যে রাজুকে সাহস যুগিয়ে ছিল বাপকে সমস্ত কথা খুলে বলতে। গভীর ভালোবাসা মানুষকে চিরদিন সাহস যোগায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের মতো শক্তিশালী লেখকই তা প্রমাণ করেছেন। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন —

> "ওখানে ইহার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্যে মন মুগ্ধ হইল। দুইটি নরনারী কি করিয়া পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল তাহাদের জীবনে, এই ইতিহাস যে কতখানি রহস্যময়, তাহা বুঝিয়াছিলাম সেদিন।"[২৮]

ধাতুরিয়া চরিত্রটি বিভূতিভূষণের অনন্য সৃষ্টি। সত্যচরণের সঙ্গে তার দেখা হয় রাসবিহারীর সিংহের বাড়িতে। ধাতুরিয়া এক কিশোর নর্তক। জানা গেছে সে হো-হো নাচ আর ছক্কারবাজী নৃত্য দেখাবে। এই দলে ধাতুরিয়াও আছে। তবে এই নাচ সভ্য জগতের মানুষজনের জন্য অপাঙক্তেয় হলেও বোদ্ধা সত্যচরণ মন দিয়ে অনুভব করেন —

> "এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্যজগৎ হইতে বহু দূরে অবস্থিত নিভৃত বণ্য আবেষ্টনীর মধ্যে এই দিগন্ত পরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গান ই চমৎকার খাপ খায়।"[২৯]

এই অনাথ ছেলেটি চিনা ঘাসের দানা সিদ্ধ খেয়েই অপূর্ব স্বাস্থ্য এবং লাবণ্যভরা মুখে কি পরিতৃপ্তির হাসিই না হাসে। তার সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতে সত্যচরণের মনে হয় —

> "সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, এই বয়সে নাচিয়া গাইয়া পরের মন যোগাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়। তাও রাসবিহারী সিংহের মতো ধন গর্বিতের অরসিকের গৃহে।"[৩০]

বিভূতিভূষণের সৃষ্ট একটি খল চরিত্র রাসবিহারী সিং। তার দাপটে গরীব প্রজা থরথর করে কাঁপে। লাঠিয়াল, পুলিশ সমস্ত কিছুই তার দখলে। মানুষ খুন করাটা তার কাছে খুবই সাধারণ বিষয়। মুনেশ্বর সিং সত্যচরণকে রাসবিহারী সম্পর্কে বলেছে —

> "রাসবিহারী অতিভয়ানক মানুষ, কত খুন করেছে জীবনে, তার লেখা জোখা আছে হুজুর? ওর অসাধ্য কাজ নেই খুন ঘর জ্বালানি মিথ্যে মোকদ্দমা খাড়া করা, ও সবটাতেই মজবুত।"[৩১]

রাসবিহারী সত্যচরণকে হোলির নিমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সত্যচরণ নিমন্ত্রণ স্বীকার করে না। তার কারণ সত্যচরণ সেও যে কাপুরুষ নয় তা দেখানোর জন্য। সংস্কৃতিবিহীন বর্বর হলেও রাসবিহারীর আছে ধনের গর্ব। ছোটু সিং রাসবিহারীর মতোই এক হৃদয়হীন পাষণ্ড রাজপুত। দুর্বল গঙ্গোতাদের নিয়ন্ত্রিত করে তার শক্ত লাঠির শাসন। সে সত্যচরণকে সতর্ক করেছিল যেন তিনি তার শক্তি বুঝে কোনো কাজেই তার বাধা না দেন। এই অরণ্য অঞ্চলের সবকিছুকেই সে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা সাধারণ মানুষের জমি দখল করেছে কিছু লাঠিয়াল দিয়ে ছোটু সিং। প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঠকের কাছে সাক্ষাৎ হয় অশিক্ষিত গনু মাহাতোর। এই অরণ্য অঞ্চলের লোকবিশ্বাস, সামাজিক ক্রিয়া, প্রাত্যহিক জীবন কাহিনি গণু মাহাতোর মুখ থেকে জানা যায়। এই অরণ্য অঞ্চলে গঙ্গোতা বলে গঙ্গার দিয়ারা বা চরে যারা চাষবাস এবং গরু মহিষ চরিয়ে সারা জীবনধারণ করে তারা সাধারণত মাহাতো পদবী ব্যবহার করে। গনুদের জীবন সম্পর্কে সত্যচরণ বুঝেছিলেন তাদের জীবনধারার গঠনটাই আলাদা। ভালো খাবার থেকে তারা বঞ্চিত, জীবনের সুখভোগ থেকে তারা শতযোজন দূরে। অথচ এ নিয়ে গণু মাহাতোর কোন নালিশ নেই। গিরিধারীলালের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই সত্যচরণের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। সে বড় গরীব, জাতিতে মাহাতো। ব্রহ্মা মাহাতোর মেলায় মাশুল আদায়কারী এক কর্মচারী সে। চরম দারিদ্র্য একজন মানুষকে কতটা নিচে নামাতে পারে সে তারই উদাহরণ। চার আনা তার প্রতিদিনের পারিশ্রমিক। রোগকাতর গিরিধারী লাল সত্যচরণকে বলে —

> "...নাম হুজুর গিরিধারী লাল, বাড়ী তিনডাঙ্গা। পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত সুরে মিনতি, প্রার্থনা এবং বিকারের রোগীর অসঙ্গত আবদারের সুর এই কয়টি মিলাইয়া একধরনের সুরে বলিল, — একটু জল খাব জল।"[৩২]

ঈশ্বর সৎ, ন্যায় মানুষকেই বেশি কষ্ট দেন। কিন্তু অবশেষে নেই পেয়েছিল গিরিধারী লাল। সত্যচরণ তাকে কিছু জমি দিয়ে লবটুলিয়ায় বসবাস করান। পাঁচ বিঘা জমি নিজেই পরিষ্কার করে সে। পরিশ্রম করে সে নিজের জীবন ধারণ করে। যে অরণ্য প্রান্তরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব চরিত্রদের আবিষ্কার করেছিলেন সেই অরণ্য শেষপর্যন্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাই পরিশেষে বলতে হয় আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতি ও অরণ্যচারী মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করেছে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৫, দ্বাবিংশ মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৩, পৃ. ৩

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫ ২০০৬, পৃ. ৫৫৯

৩. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩-৬১৪

৪. চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ, বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৬শে আগস্ট ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫, পৃ. ৪৩৫

৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৪ চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ৭৪

৬. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ২৬৮
৮. বাগচী, ড.শর্মিলা, বিভূতিভূষণের মর্মলোক এবং আরণ্যক, একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ৪৪
৯. তদেব, পৃ. ৪৩
১০. তদেব, পৃ. ৪৪-৪৫
১১. তদেব, পৃ. ৪৫
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম পুনর্মমুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩
১৩. বাগচী, ড.শর্মিলা, বিভূতিভূষণের মর্মলোক এবং আরণ্যক, একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ৪৬
১৪. তদেব, পৃ. ৪৮
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭
১৬. তদেব, পৃ. ৬২
১৭. তদেব, পৃ. ৬২
১৮. তদেব, পৃ. ৬৩
১৯. তদেব, পৃ. ৬৯
২০. তদেব, পৃ. ৭৩
২১. তদেব, পৃ. ৮৮
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ২৭০
২৩. বাগচী, শর্মিলা, বিভূতিভূষণের, মর্মলোক এবং আরণ্য, একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০, পৃ. ৫৭
২৪. তদেব, পৃ. ৫৭
২৫. তদেব, পৃ. ৯৫
২৬. তদেব, পৃ. ৯৫
২৭. তদেব, পৃ. ৮৩
২৮. তদেব, পৃ. ৮১
২৯. তদেভ, পৃ. ৭২
৩০. তদেব, পৃ. ৭২
৩১. তদেব, পৃ. ৭৫
৩২. তদেব, পৃ. ৬৬

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 395 - 409
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার প্রকৃতি রূপায়ণে আল মাহমুদের কবিতা

ড. ফজলুল হক তুহিন
সহকারি অধ্যাপক, ডেমনস্ট্রেশন ইউনিট
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : dr.fhtuhin@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nature, Al Mahmud, Poetry, Aesthetic, Philosophy, Rivers, Rain, Soil, Jibanananda Das, Jasimuddin.

Abstract
The flow of portraying Nature with delight and fascination has been running for long days in Bengali poetry. Al Mahmud, one of the greatest poets of Bangladesdh, portrayed the real and independent picture of Nature. He portrayed the aesthetic, philosophical, social and political identities, firstly, in the total perspectives of Nature and secondly, in the imageries of different components of Nature—rivers, rain and soil. The sectors he was devoted to are the novel world created in the relentless flow of the Padma, the Meghna and the Jamuna and the ancient destroying Nature of Bengal. The Nature portrayed in Jibanananda's and Jasimuddin's poetry is quite different from that of Al Mahmud. The poet's adolescence was passed during the British imperialistic rule, riot, violence, the Second World War, Bengal Division, and Famine. He did not behold the Bangladesh of Jibananda and Jasimuddin. That is why, he cannot call his country the 'golden Bangladesh because he saw the Bangladesh breaking the banks of rivers. The distinct shape of Al Mahmud's philosophy of Nature in depicting the Bengal replete with breakage has been revealed in this essay.

Discussion

ভূমিকা : প্রকৃতি জীবন ও প্রাণের উৎস ও আশ্রয়। মানুষের অস্তিত্বের সূচনা থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক ওতপ্রোত। উৎপাদন ব্যবস্থা, মানুষের জীবনধারণ, বিবর্তন, আর্থিক ভিত্তি নির্মাণ, সমাজ কাঠামো, পারস্পরিক লেনদেন, প্রাণ ও পরিবেশ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মৌল উপাদান ও ভিত্তিতে প্রকৃতি অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখে। প্রকৃতি ব্যক্তিমানুষ ও সংস্কৃতির বহুবিধ নির্মাণ ও অভিব্যক্তির আধার। দৃষ্টিপথের ভূদৃশ্য, আবাদ ও জীবিকার ক্ষেত্র, রাজনীতির জায়গা, জাতির ভূখণ্ড, ধর্মের পুণ্যভূমি, পর্যটনের কেন্দ্র, সাহিত্যের উপাদান, চিত্রকলার মটিফ, অলঙ্করণের কৌশল, নৈতিকতার মানদণ্ড বা আচরণের নির্দেশক হিসেবে প্রকৃতির উপস্থাপন ও উদ্ভাসন অনেক মানবীয় কর্মকাণ্ডের কয়েকটি দিক। মননচর্চা থেকে শুরু করে জীবিকার বিরাট আয়তনে প্রকৃতি সব সময় তার প্রাকৃতিকতা ও বস্তুময়তা দিয়ে সফলতা-বিফলতা পরিমাপে সাহায্য করে। ফলে শিল্পে, বক্তব্যে, লিখনে, পাঠ্যে ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে প্রকৃতির ঋণ অনস্বীকার্য। দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে প্রকৃতির প্রসঙ্গ সংকট ও সমাধানের বিষয় হয়ে দেখা দেয়।[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষ তাই প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সন্তানরূপে বিরাজমান। তবে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, দর্শন, লক্ষ্য, সৌন্দর্যবোধ, মূল্যবোধ, নৈতিকতাবোধের নির্মাণে প্রকৃতির অবদান স্বীকার করেও বলা যায়, সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তন, মতাদর্শের মেরুকরণ প্রকৃতি-মূল্যায়নে স্থিরতা দেয়নি। বিভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তন হয়েছে নানাভাবে। জীবনাচরণে-শিল্পে-সাহিত্যে তাই প্রকৃতির উপস্থিতি অনিবার্য।

গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা : সাহিত্য বিচারের বা গবেষণার বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বিশেষভাবে কবিতা বিচারে একটিমাত্র পদ্ধতির অবলম্বন যথেষ্ট নয়। সেজন্য আল মাহমুদের কবিতার বিচার-বিশ্লেষণে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে - ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method), পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Method) ও তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)। এইসব রীতি-পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি দেখার বিচিত্রতা পরিলক্ষিত। ঔপনিবেশিক আমল থেকে বাংলাদেশ পর্বে এই দৃষ্টির রূপান্তর দৃশ্যমান। বাস্তব ও নান্দনিক উভয় ভঙ্গিতে কবিতায় প্রকৃতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কবি আল মাহমুদের কবিতার পথ বিবেচনার দাবি রাখে। কবিকৃতি ও স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ে বাংলার প্রকৃতি অঙ্কনে তাঁর বিশেষত্ব অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

কবিতায় প্রকৃতির রূপায়ণ : সৃষ্টিশীল ও সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে একজন কবির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক আরো ব্যাপক ও গভীর। সেজন্যে কবির সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতির সামগ্রিক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদের রূপকল্প বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এক অর্থে কবিকে প্রকৃতির সাধক বলা হয়ে থাকে। কারণ কবিতা সৃজনে প্রেরণা ও ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃতি ও প্রকৃতিলগ্নতা কাজ করে। কোনো কোনো কবিকে 'প্রকৃতির কবি'ও বলা হয়। যেমন ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) 'প্রকৃতির কবি' হিসেবে চিহ্নিত। কেননা তাঁর কবিতায় সমগ্র জীবনানুভব প্রকৃতিকে অবলম্বন করে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকৃতির জীবন্ত ও আন্তরিক রূপ অন্যদের চেয়ে তাঁর কবিতায় অনেক বেশি প্রকাশিত।

বাংলা কবিতা প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতিলগ্ন। 'চর্যাপদে'র অধিকাংশ পঙক্তিই প্রকৃতি আশ্রিত। মধ্যযুগের বিশাল কাব্যজগৎ প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। আধুনিককালে প্রকৃতির সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় প্রকৃতি। তাঁর অধিকাংশ কবিতা ও গান সরাসরি ঋতুসংক্রান্ত। তাছাড়া তাঁর 'জীবনদেবতা'র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে হয়েছে। এসব কারণে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে তাকেই 'প্রকৃতির কবি' হিসেবে প্রধান বলেছেন। এরপর বিশেষ অর্থে 'প্রকৃতির কবি' বলেছেন জীবনানন্দ দাশকে (১৮৯৯-১৯৫৬)।[২] কারণ এ-জাতীয় কবি সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রযুগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলার মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) কবিতায় প্রকৃতির উপস্থিতি আপনাপন ভঙ্গিতে অঙ্কিত। অন্যদিকে 'পল্লীকবি' হিসেবে খ্যাত কবিদের কাব্যে প্রকৃতির রঙ-রেখা-রূপ সামগ্রিক রূপকল্পে বর্ণিলরূপে চিত্রিত। বিশেষভাবে জসীমউদ্দীনের (১৯০৩-৭৬) কবিতায় প্রকৃতি ও প্রকৃতি আশ্রিত বাস্তব জীবনের শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আঁকা প্রকৃতির সঙ্গে তিরিশোত্তর আধুনিক কবিগোষ্ঠীর অঙ্কিত প্রকৃতির সাদৃশ্য নেই। কেননা তিরিশোত্তর কবিরা প্রকৃতিকে নান্দনিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন; কিন্তু জসীমউদ্দীন প্রকৃতি বলতে সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জীবিকার বাস্তব ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন।

নিসর্গ সম্বন্ধে ব্রিটিশ মতাদর্শ উপনিবেশিক বাংলায় অবিকল কাজ করেনি। বাংলার কিংবা বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি উপনিবেশিক কালের নির্দিষ্টতা আছে - প্রথমটি ব্রিটিশ, দ্বিতীয়টি পাকিস্তানী। সেজন্য ব্রিটেনের বিবর্তিত ইতিহাস এক্ষেত্রে কার্যকর নয়। উপনিবেশিক বাংলায় প্রকৃতির দুই স্বরূপই ক্রিয়াশীল। একটি হচ্ছে নৈতিক-নান্দনিক; অপরটি হচ্ছে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক। উপনিবেশিককালে শ্রেষ্ঠ নান্দনিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দুই স্বরূপই কাজ করেছে; কিন্তু অধিকতর ক্ষমতা লাভ করেছে প্রথম স্বরূপটি। তিনি প্রকৃতিকে নীতিসম্পন্ন ও কামনাময় করেছেন, তার মধ্যে পুরাণকল্পের শক্তি খুঁজে পেয়েছেন এবং একই সঙ্গে বাস্তব অতিক্রমী বোধ যুক্ত করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি প্রকৃতির মধ্যে নান্দনিক এক

বোধ আবিষ্কার করেছেন।[৩] কিন্তু বাংলায় তিনি প্রকৃতি ভয়ঙ্করভাবে সামাজিক এবং বাস্তব, জমি হচ্ছে ভাড়া খাটানোর বিষয়, ঋণগ্রস্ত হওয়ার ইতিহাস, ধান-পাট উৎপাদনের ক্ষেত্র এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার প্রক্রিয়া। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকতা কিংবা নিসর্গ থেকে উৎসারিত নান্দনিকতার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নান্দনিক আদর্শায়িতকরণের সঙ্গে তাঁর সমাজবোধের দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করার নয়। তিরিশের দশকে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উত্থানপর্বে তাঁর নান্দনিক বোধ কিংবা সাংস্কৃতিক বোধ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়; বিপরীতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে সংস্কৃতির সমাজবোধ। এই বোধটাই চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-৭৬), এস. এম. সুলতান (১৯২৩-৯৪) এবং কামরুল হাসানের (১৯২১-৮৮) কাজে সোচ্চার হয়েছে। কবিতায় জসীমউদ্দীন ও আল মাহমুদের কৃতিতে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

আল মাহমুদের প্রকৃতি-দৃষ্টি : বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনোত্তর কালে বাংলাদেশের কবিতায় প্রকৃতির বিবিধ রূপ-রঙ-স্বাদ নানা আঙ্গিকে কাজ করেছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) কাব্যযাত্রা আজীবন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। একদিকে প্রকৃতির প্রাণ-চাঞ্চল্য, সৌন্দর্য, বিশালতা, বর্ণবৈভব অর্থাৎ নান্দনিক রূপ; অন্যদিকে প্রকৃতি জীবন-জীবিকার অবলম্বন, ধ্বংসাত্মক হিংস্রতা বা বাস্তবরূপে বিরাজমান। এই দুই রূপ তাঁর কাব্যে বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কারণ কবির প্রধান বিষয় নারী; তারপরেই প্রকৃতি। কবির ভাষায় -

> "আমার কবিতার আরেক প্রধান বিষয় হল প্রকৃতি। আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগৎ রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়। এক ঝাঁক পাখি যখন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে পতঙ্গ ও পিঁপড়ের সারি আর মৌমাছিরা ফুল থেকে ফুলে মধু শুষে ফিরতে থাকে আমি তখন শুধু এই আয়োজনকে সুন্দরই বলি না বরং অন্তরালবর্তী এক গভীর প্রেমময় রমণ ও প্রজননক্রিয়ার নিঃশব্দ উত্তেজনা দেখে পুলকে শিহরিত হই। মনে আদিম মানুষের মত অতিশয় প্রাথমিক এক দার্শনিক জিজ্ঞাসা জাগে- কে তুমি আয়োজক? তুমিও কবি? না কবিরও নির্মাতা? তবে তুমি যে অনিঃশেষ সুন্দর আমি তার সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করো প্রভু।"[৪]

সমুদ্র, পর্বতচূড়া, দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, নৈসর্গিক দৃশ্য, নদী অর্থাৎ ভৌগোলিক বিচরণক্ষেত্র কবিকে যেমন অভিভূত করে; তেমনি প্রকৃতির বাস্তবতাও তাকে সমানভাবে ভাবায়। তবে এই প্রকৃতি পশ্চিম বাংলার নয়, পূর্ব-বাংলার। হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) নির্দেশিত পদ্মা-মেঘনা-যমুনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংসময় পূর্ব-বাংলার৫ প্রকৃতি তাঁর আরাধ্য। আবার জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদ্দীনের কবিতায় অঙ্কিত প্রকৃতি আর আল মাহমুদের প্রকৃতি একরূপ নয়। কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষের সময় কবির কৈশোর কেটেছে। জীবনানন্দের ও জসীমউদ্দীনের বাংলাদেশ তিনি দেখেননি; সেজন্যে এ দেশকে কবি 'সোনার বাংলাদেশ' বলতে পারেন না। কেননা তিনি 'নদীর পাড়ভাঙা বাংলাদেশ' দেখছেন -

> "আমি এমন এক গ্রাম বাংলাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যে গ্রামবাংলা ভেঙে পড়া। ঠিক জসীম উদ্দীনের বাংলাদেশেও না। আবার জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশও না। জসীমউদ্দীন এবং জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশে এক ধরনের রূপকথা আছে। একটা স্বপ্ন আছে। কিন্তু আমার দেখা বাংলাদেশ একদমই রূঢ়। এ বাংলাদেশ নদীর পাড়ভাঙা বাংলাদেশ। গ্রামকে গ্রাম বিলীন হওয়া বাংলাদেশ। এইগুলো আমার কবিতায় প্রথম এসে যায়।"[৬]

অন্যদিকে কবি আকৈশোরিক কাল অতিবাহিত করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামের নদী ও নিসর্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এই স্থান-কালের অভিজ্ঞতা তাকে প্রকৃতিপ্রেমিক ও নির্মাতা করে তোলে। অবশ্য কবি নিজেই তাঁর কবিতার বিষয়রূপে নারীর সঙ্গে প্রকৃতিকে উল্লেখ করেছেন -

> "আমার বিষয় তাই, যা গরিব চাষীর বিষয়
> চাষীর বিষয় বৃষ্টি, ফলবান মাটি আর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কালচে সবুজে ভরা খানা খন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।”
[‘কবির বিষয়’, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না]

কবি নিজেকে একজন চাষীর সমগোত্রীয় মনে করেন; যার অন্যতম প্রধান বিবেচ্য হল প্রকৃতি : বৃষ্টি, বৃষ্টিসিক্ত প্রাণময় ফলবান মাটি; যে মাটি সবুজ সীমাহীন ফসলের মাঠ ও জীবন-জীবিকার ভিত্তি গড়েছে। সেজন্যে কবি ‘একটি চাষীর মত’ ‘সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত’ শিখেছেন। এখানেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক কবির স্বতন্ত্র মনোভাব প্রকাশিত। সমকালীন একজন কবির মতে, -

> “আল মাহমুদ-এর কবিতার ধর্ম নিসর্গ প্রেম। তাঁর প্রায় সব কবিতাই এই ধারাবাহিক অনুভূতি থেকে জায়মান। কোন কবিতাই এই বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।”[৭]

আল মাহমুদের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় ও প্রকরণে প্রকৃতির নান্দনিক ও বাস্তব, উভয় দিকই প্রতিফলিত।

বাংলার প্রকৃতি রূপায়ণে আল মাহমুদের কবিতা : বাংলা কবিতায় বহুদিন থেকে মুগ্ধ ও আবিষ্ট চোখে প্রকৃতি বর্ণনার যে ধারা চলে আসছিল, তার সঙ্গে আল মাহমুদ প্রকৃতির বাস্তব ও স্বাধীন রূপের চিত্র আঁকেন।

প্রথমত, নান্দনিক-দার্শনিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্বরূপকে কবি প্রকৃতির সামগ্রিক রূপকল্পে;
দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান- নদী, বৃষ্টি ও মৃত্তিকার চিত্রকল্পে প্রকাশ করেন।

১

আল মাহমুদ সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেছেন। প্রথমত প্রকৃতির নান্দনিক ও দার্শনিক দিকটির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। প্রকৃতি সৌন্দর্য, মুগ্ধতা, অবসর, সূক্ষ্ম অনুভূতি, বোধ ইত্যাদির আধার; রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের কাব্যসৃষ্টি ও ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম পর্যায়[৮] কবির মাঝে এ-ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘লোক লোকান্তরে’ মূলত এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। প্রকৃতির মাঝে প্রকাশিত ও উৎসারিত সৌন্দর্য ও ধ্বনির প্রতি কবি মুগ্ধ হয়ে নিজেকে ‘ধ্বনির যাদুকর’ ও ‘জলপানশব্দের শিকারি’ রূপে চিহ্নিত করেন।

“নিসর্গের ফাঁকে ফাঁকে যখন বিষণ্ন হাওয়ার রোদন
দুঃখের নিশ্বাস ফেলে, আমি সেই
ধ্বনির যাদুকর।
চিতল হরিণী তার দ্রুতগামী ক্লান্তির শেষ যামে
যখন প্রস্রবণে পিপাসায় মুখ নামায়,
আমি সেই জলপানশব্দের শিকারি।”
[‘পিপাসার মুখ', লোক লোকান্তর]

প্রকৃতির মাঝে বিরাজমান সৌন্দর্য, ধ্বনি ও শব্দ কবির কাব্যপ্রকৃতির প্রধান অবলম্বন। এক অর্থে কবি নিজেকে প্রকৃতির কবি হিসেবে উপস্থাপন করেন। নাগরিক ক্লান্তি-অবসাদ-ব্যস্ততা থেকে মুক্তির জন্যে নিসর্গে আশ্রয় ও অবসর কবির কাম্য।

কবি মনে করেন নিসর্গ নগর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জায়গা, বসবাসের নয়। ফলে কবি অরণ্যের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে এবং অরণ্যের জীবন, প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সঙ্গে সহজ আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারেননি। অরণ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার স্বাভাবিক পবিবেশে কবি বিস্ময় ও ক্লান্তি অনুভব করেন। তাঁর চিন্তায় দার্শনিক ভাবনা ও জীবনযাপনে নান্দনিক বোধের প্রকাশ ঘটেছে। ‘অরণ্যে ক্লান্তির দিন’ কবিতায় কবি তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা অবলোকন করে নিজেকে বেমানান ও অসুখী ভেবেছেন।

“কিন্তু তবু ঘটে না কিছুই, আকাশ তেমনি থাকে,
কী করে যে ভোর হয়, আসে যায় ঋতুর পাখিরা

বসন্তের কত ফুল অলক্ষেই ফল হয়, পাকে;
গভীর অরণ্য ছেড়ে উড়ে আসে বুনো মুরগিরা,
বানরের চেঁচানিতে ভরে যায় শেগুনের শাখা।"
['অরণ্যে ক্লান্তির দিন', লোক লোকান্তর]

বনের পরিবেশের সঙ্গে কবি একাত্ম হতে পারেননি। প্রকৃতি যে একটা বিশেষ প্রাণব্যবস্থায় (Eco-system) পরিচালিত হয়, তার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যে নাগরিক মনের কবি নির্বিকার। হঠাৎ কিছু না ঘটার বৈচিত্র্যহীন ও উত্তেজনাহীন দিনযাপনে কবি অবসাদে ভোগেন। কেননা 'লোক লোকান্তর' কাব্য সৃষ্টিকালে অর্থাৎ ষাটের দশকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কাব্যান্দোলনে অনুরক্ত কবি নাগরিক ও বোদলেয়ারীয় মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে 'অরণ্যে অসুখী' কবিতায় কবি বনের জীব-জন্তু-বন্যবৃক্ষ-উদ্ভিদ, ফুল-পাহাড় অর্থাৎ সবকিছুরই স্বাধীন, সহজ ও স্বতন্ত্র সত্তার অনভবে আনন্দিত; নিজেকে শুধু অলস ও অসুখী ভেবেছেন, কিন্তু দূরের পাহাড় ও কবি 'পরস্পর বৃদ্ধ দুটি' সত্তা বেঁচে থাকতে চেয়েছেন চিরকাল। অবশ্য তখনই কবির মনে হয়েছে - 'অরণ্যে সবই সদ্য ফোটা প্রথম মাতাল'। কবি প্রথম পর্যায়ে এক ধরনের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

কবির দার্শনিক চিন্তা ও বাঙালির কৃষিজীবনের ঐতিহ্যিক ভাবনার কেন্দ্র 'সোনালি কাবিনে'র 'প্রকৃতি' কবিতাটি। এখানে কবি প্রকৃতি ও নারীকে অভিন্ন কল্পনা করেন। তাই বর্ষণে ভেজা মৃত্তিকাকে কবির মনে হয় 'প্রিয়তমা কিষাণী'। প্রকৃতির সৃজনক্ষমতা ও নারীর সৃষ্টিশীলতাকে অভিন্নরূপে দেখেছেন।

"ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।"
['প্রকৃতি', সোনালি কাবিন]

প্রকৃতিকে নারীর প্রতিরূপ হিসেবে দেখার মধ্যেই কবি সীমিত থাকেননি। এই প্রকৃতি প্রাণ, প্রাণবৈচিত্র্য, বাস্তুসংস্থান, খাদ্য-শৃঙ্খলা, প্রাণের সৃষ্টি-বিকাশ-বিনাশ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ধারণ করে আছে। প্রকৃতি তাই কবির কাছে 'মৃন্ময়ী' পৃথিবী- যেখানে মাছ, পাখি, পশু ও মানুষের জন্ম বা জীবের উৎসস্থল। যেখানে প্রাণী ঘাস বা তৃণ খেয়ে বাঁচে; আবার সেই প্রাণীকে ভক্ষণ করে বাঁচে অন্য প্রাণী, সেই প্রাণীকে আরো শক্তিশালী প্রাণী গ্রাস করে জীবন ধারণ করে এবং অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মাটিতে মিশে যায় তার দেহাবশেষ। প্রাণী ও জীবজগৎ উভয়ে মিলে এক প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এভাবে একটা বাস্তুসংস্থান (Ecology) গড়ে ওঠে প্রকৃতিতে। জগতে প্রাণের বিবর্তনধারার কেন্দ্রে কবি নারী ও প্রকৃতিকে স্থাপন করেন নিজস্ব ভাষা, প্রতীক ও চিত্রকল্পে।

"বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে আইল বাঁধা জমিনের ছক
বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য জাদুমন্ত্রবলে
অকস্মাৎ পাল্টে গেলো। ত্রিকোণ আকারে যেন
ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।
আর সে জ্যামিতি থেকে
ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার।"
['প্রকৃতি', সোনালি কাবিন]

প্রকৃতির মধ্যে জীবজগতে পরস্পর যে বিরোধ তা অবলোকন করে কবি আত্মচেতনার মাঝেও দ্বন্দ্ব অনুভব করেন। জগতে প্রাণের সৃষ্টি, বিকাশ ও বিনাশের কার্যকারণ শৃঙ্খলা বা দার্শনিক সূত্র কবি প্রকৃতি ও নারীর অভিন্নতায় প্রকাশ করেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তবে কবি প্রকৃতি ও নারীর মাঝে যে সম্বন্ধসূত্র আছে তাকে উপলব্ধি করতে চান। প্রকৃতির ভেতরদেশে পাস্পরিক সম্পর্ক, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সৃষ্টিতত্ত্বের প্রমাণ কবি চোখের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পেতে চান। এ জন্য কবি প্রকৃতি ও নারীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখেন।

"চোখ বড় সাংঘাতিক রক্তের প্রান্তর ছুঁয়ে থাকে-
নিসর্গ নিবদ্ধ করে দেখে নেয় নারী আর নদীর নিতল।
ধরে রাখে মাছ পাখি পশু আর পতঙ্গের প্রসঙ্গ সকল
সমস্ত সম্বন্ধসূত্র ভেদ করে চায় তীব্র চাক্ষুস প্রমাণ।"
['আভূমি আনত হয়ে', সোনালি কাবিন]

অনুসন্ধিৎসু মন থেকে কবি এ-ধরনের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছাতে চান। মানব-মানবী এবং বৃহৎ প্রকৃতিতে প্রাণীকুলের মধ্যে পরস্পর যে সম্পর্ক তার মাঝে একটা গূঢ় ঐক্যসূত্র কবি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

প্রকৃতি বিষয়ে 'কালের কলস' থেকে আল মাহমুদের নান্দনিক দৃষ্টির অবসান ঘটতে থাকে এবং বাস্তবতার দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সময়কালে স্বদেশের উপর দিয়ে দুঃশাসনের যে দুর্যোগ বয়ে যায়, তাকেই কবি প্রকীকায়িত করেছেন প্রকৃতির বিবর্ণ ও ধূসর দৃশ্যের বর্ণনায়। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় কবি অন্ধকার 'উত্থান রহিত' 'বঙ্গদেশে'র 'নিষ্ফলা' চিত্র আঁকেন। এলিয়টের Wast Land-এর পোড়ো-পরিত্যক্ত নিষ্ফলা ভূমির ছবি এ কবিতায় প্রতিফলিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের জীবনধারার ধূসরতা-অবক্ষয়-অফলার ভিত্তিতে এলিয়ট এ কাব্য রচনা করেন; অন্যদিকে আল মাহমুদ ষাটের দশকের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে (১৯৫৮-৬৮) সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে নিষ্পেষিত দেশকে সেই দৃষ্টিতে বিচারে আনেন। এ-কবিতায় বর্ণিত চিত্রে ডালে আর পাখি বসে না, নদীগুলো দুঃখময়, পতঙ্গহীন মাটিতে কোন সবুজ জন্মায় না, শ্যামলতাহীন মাটিতে কেবল ব্যাঙের ছাতা গজায়; কবির প্রশ্ন এই বাংলায় কীভাবে রবীন্দ্রনাথ পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এখন সবাই পুনর্জন্মের বিরোধী। তাই কবি বলেন -

"শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এ রকম নিষ্ফলা, ঠাকুর।"
['রবীন্দ্রনাথ', কালের কলস]

এমন এক প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘেরা দেশে কেবল অবিশ্বস্ত হাওয়া আছে, তবে কোনো শব্দের দ্যোতনা নেই; শুধু দু'একটি পাখি ভয়ে ভয়ে সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে বৃষ্টিহীন বৈশাখ মাসের পঁচিশ তারিখে বাক্যালাপ করে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেও এ-দেশ রাবীন্দ্রিক স্নিগ্ধ প্রকৃতি বিরোধী। গ্রামীণ বাংলায় বৈশাখ মাসে প্রকৃতির যে চেহারা ফুটে ওঠে তারই নিখুঁত দৃশ্য এঁকেছেন দেশের বিশেষ অবস্থা বোঝাতে। প্রকৃতির সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটির প্রতি কবি দৃষ্টিপাত করেন।

বাঙালির জীবন ও জগৎ ভাবনার কেন্দ্রে প্রকৃতি কার্যকর। তাই বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূলে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থা বর্তমান। এদেশের কৃষক প্রকৃতি বলতে কৃষিক্ষেত্রকেই বোঝে। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃতির ভূমিকার সঙ্গে খনাকে কবি উপস্থাপন করেন। কৃষিভিত্তিক প্রকৃতির রহস্য ও শৃঙ্খলা জ্যোতিষী খনা নিখুঁতভাবে গণনা করতে পারতেন। বিশেষভাবে ঋতু ও আবহাওয়ার সঙ্গে ফসল উৎপাদনের নির্ভুল সূত্র তাঁর বচনে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কবি প্রকৃতি-অভিজ্ঞ খনাকে সামনে আনেন। কবির মতে, প্রকৃতির ছদ্মবেশ বা রহস্য ব্যাখ্যা করেন বিদূষী নারী খনা। প্রথম পর্বে 'সোনালি কাবিন' কাব্যের 'প্রকৃতি', দ্বিতীয় পর্বে 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না'র 'কবির বিষয়' এবং তৃতীয় পর্বে 'দ্বিতীয় ভাঙনে' 'খনার বর্ণনা'য় কবি খনাকে প্রকৃতি ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিরূপে উপস্থাপন করেন। কবি খনাকে 'প্রকৃতির ছায়া' রূপে অভিহিত করে তাঁর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

"খনা তো অনার্য কন্যা প্রকৃতির ঠোঁট কাটা কবি
জমিনের গন্ধ শুঁকে ফসলের ভবিষ্য বাখানে;"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

['খনার বর্ণনা-৪', দ্বিতীয় ভাঙন]

অথবা -

"নিসর্গের নীতি মেনে এসো পতি, মেঘবৃষ্টি গণি
জগতের উপকার জ্যোতিষের শাস্ত্রে লেখা নাই;
ঋতুর বৈচিত্র্যে কাঁপে লীলাবতী খনার ধমনী
মাটির মাহাত্ম্য গেয়ে এসো দোঁহে লাঙলে দাঁড়াই।"

['খনার বর্ণা-৫', দ্বিতীয় ভাঙন]

প্রকৃতির অসংবাদিত লোকবিজ্ঞানী, কবি ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হল খনা। প্রকৃতির রহস্য ব্যাখ্যার জন্যে মানুষ খনার বচন স্মরণ করে। সেজন্যে কবি প্রকৃতির অন্তরালে ও রহস্যে প্রবেশের জন্যে খনার আশ্রয় নেন। জমিনে ফসল উৎপাদনকারী বৃষ্টির উপমা দিতে কবি খনার বচনের সঙ্গে তুলনা দেন। এ-ক্ষেত্রে কবির লোক ঐতিহ্যমুখিতার পরিচয় মেলে।

আল মাহমুদের কবিতায় বারবার একই সঙ্গে প্রকৃতি ও নারীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতির নান্দনিক-দার্শনিক রূপের অপর পিঠে আছে প্রকৃতির বাস্তব চিত্র। কৃষকদের চাষাবাস করার এবং চাষবাসের মধ্যে জীবনযাপনের করার অধিকার আছে। সেজন্য প্রতিটি কৃষকের সঙ্গে প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি কৃষকের ঘরনীর সঙ্গে প্রতিটি কৃষক পুরুষ, তার হালবলদের সঙ্গে তার জমিজমা যুক্ত। এই যুক্ততা একই সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়ে আছে কৃষকের জমি ও জমির ফসল দখলের কাহিনীতে। বৌদ্ধযুগের অবসানে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য শাসন, শোষণ, বর্ণপ্রথা, বিভেদ ইত্যাদি মানবতাবিরোধী কার্যক্রমের কারণে সমাজজীবনে শান্তি, সাম্য ও নিরাপত্তা ছিল না।[৯] কৃষকের উৎপাদিত শস্য লুণ্ঠিত হয়ে যেতো। নারীর চেয়ে শস্যের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন সেই সময়ের বাঙালি কৃষকের আর্তি শোনা যায় 'সোনালি কাবিনে'র ৯ নম্বর কবিতায়-

"ললিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বারবার:
বর্গীরা লুটেছে ধান, নিম খুনে ভরে গেছে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ।"

['সোনালি কাবিন: ৯', সোনালি কাবিন]

প্রকৃতি ও নারীর ভাবনা ইতিহাসের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। উপনিবেশে, ব্রিটিশ বাংলায় এবং পাকিস্তানী বাংলায় নিসর্গ, যেখানে জমি অবস্থিত, জমির অভিধা সেখানে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক, জমি চূড়ান্ত পর্যায়ে মালিকানা, খাজনা, স্বত্ব, রায়তী সম্পর্ক, বীজ, পানি, শ্রমের আধার। জমির পক্ষে তাই নিসর্গ হওয়া সম্ভব নয়। নিসর্গ অর্থাৎ ভাবনা, দর্শন, সুন্দর, দিগন্ত কিংবা বিস্তৃতি, যেখানে নদীর বাঁক, বনের শ্যামল, ধানের হলুদ-সোনালী রঙ, নারীর অবাক নয়ন কিংবা পশুর বিচরণ অবস্থিত। যেক্ষেত্রে নিসর্গ জমি সেক্ষেত্রে নান্দনিকতা বিরল কিংবা ন্যূনতম; নিসর্গ যেক্ষেত্রে উধাও, দিগন্ত সেক্ষেত্রে নান্দনিক। সেজন্য ঔপনিবেশিক প্রভু, জমিদার, শিল্পপতি, বুর্জোয়ারা শিল্পের কথা প্রথম ভেবেছে, জমির কথা পরে।[১০] বঙ্গীয় ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে নিসর্গের নান্দনিক সমঝদারি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই সমঝদারি ও উন্নয়নের ভিত্তি থেকে তৈরি হয়েছে গ্রামীণ নান্দনিকতা - প্রশস্ত জীবন, অবসর, আরাম আয়েশ। অথচ এই জীবনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জমিনকেন্দ্রিক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা ও নারীর ভূমিকা। আল মাহমুদ ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয়। কবি রাম বসুর (জ. ১৯২৫) মতে -

> "নিজের জীবনের অনুষঙ্গ থেকে দেশের সামগ্রিক সংবাদকে তিনি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কবিতায় বিধৃত করতে পারেন। অনাবিল নির্মলতায় নিয়ে আসেন নিসর্গ। তখন মানুষ ও প্রকৃতির কৃত্রিম কলহ আর থাকে না। এক আনন্দময় স্তব্ধতা আমাদের আপ্লুত করে। এ-কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, নিসর্গ সম্বন্ধে ইয়োরোপের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অসাধারণ। ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করলে হিন্দু ও মুসলিম মানসিকতায় এই নিসর্গ বাইরের কোনো আরোপিত জিনিস নয়, বিশ্বচেতনার সঙ্গে তা অঙ্গীভূত।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আল মাহমুদ শেষপর্যন্ত প্রকৃতি বলতে দেশজননী বুঝেছেন। প্রথম পর্বে প্রকৃতি কবির কিষাণী নারী আর তৃতীয় পর্বে দেশ হল কবির মা; মায়ের অঙ্গ-প্রতঙ্গ হল প্রকৃতি। তাই তাঁর দেশ আর দেশের প্রকৃতি অভিন্ন। বঙ্গজননী আর প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিরূপে বিরাজমান -

"তোমার নদীগুলো আবার সমুদ্রের দিকে ধাবমান হবে। চিম্বুক পাহাড়
হবে তোমার স্তনাগ্রচূড়ার মত মাতৃত্বের গৌরব।"
['দেশ মাতৃকার জন্য', দ্বিতীয় ভাঙন]

কবি প্রকৃতি ও মায়ের শরীরী অভিন্নতায় দেশ প্রেমকে জাগ্রত করেন। স্বদেশের স্বার্থে কবি যেহেতু উচ্চকিত, সেহেতু প্রকৃতি মায়ের অস্তিত্ব রক্ষায়, প্রাণের স্বাভাবিক গতি ও বিকাশে এবং বিনাশ প্রতিরোধে কবি প্রত্যয়দীপ্ত।

আল মাহমুদের নারী ভাবনা, স্বদেশচেতনা ও প্রত্যাবর্তন, সমাজচেতনা ও ঐতিহ্যমুখিতা অর্থাৎ মৌলিক বিষয়াবলির পটভূমি হল প্রকৃতি। আবার প্রকৃতি তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয় হবার কারণে তিরিশের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিক অনুভব এবং তৎসংশ্লিষ্ট হতাশা-নির্বেদকে পাশ কাটিয়ে আল মাহমুদ ফিরে যেতে চেয়েছেন আবহমানকালের গ্রাম নিসর্গের ভেতর[১২] গ্রামের চাষা-হালবলদ, লাউয়ের মাচায় সিক্ত নীল শাড়ির নিশান, দূরের নদী-হাটের নাও-মাঠ, জোনাক পোকা, ধান ক্ষেত, ফুল-বসন্তের পাখি, নারীর ধান ঝাড়া, ধানের ধুলোয় ম্লান শাড়ি, গায়ে ও শাড়িতে শস্য মাড়ায়ের গন্ধ ইত্যাদির মাঝে কবির বসবাস। তাই কবি বলেন: 'মানুষের বাসস্থান, লাউমাচা, নীলাম্বরী নিয়ে আমরা থাকতে চাই'। নদীর নাচের ভঙ্গি, পিতলের ঘড়া, হুঁকোর আগুন, চুড়ুইয়ের বাসা, নিমডালে বসে থাকা হলুদ পাখি, পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ, মাছের আঁশটে গন্ধ, কুরুলিয়ার পুরনো কই ভাজা, সোনালি খড়ের স্তুপ, কলাপাতায় মোড়া পিঠার মতো হলুদমাখা চাঁদের জোছনাময় প্রকৃতির মাঝে কবি বসতি গড়ে তোলেন। এক কথায়, কবির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল প্রেরণা স্বদেশের আজন্ম লালিত প্রকৃতি।

আল মাহমুদ কবিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে রোমান্টিক ও দার্শনিক সত্য থেকে ক্রমান্বয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখেন। প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা, জনজীবনের বাঁচা-মরার লড়াই এবং জীবনের বিকাশ ও প্রকাশের প্রেরণা তাঁর কবিতায় প্রাণবন্ত। জসীমউদ্দীনের কবিতায়, আব্বাসউদ্‌দীনের লোকজ সঙ্গীতে, রমেশ শীলের গীত, কবির লড়াইয়ে এই দিকটি প্রবলভাবে উৎসারিত হয়েছে। আল মাহমুদ এই ধারাকে কবিতায় ধারণের মাধ্যমে নিজস্ব শিল্পভুবন সৃষ্টি করেন।

২

আল মাহমুদ প্রকৃতি বলতে জমিনকে ভেবেছেন। তাঁর কবিতায় একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে এই জমিন। জমিন বা মাটিই পৃথিবীর প্রধান উপাদান। জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন এই মাটি। নিসর্গ, ফসল, প্রাণবৈচিত্র্য, খনিজ সম্পদ সব কিছুই মাটিকেন্দ্রিক। তাঁর কবিস্বভাবের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক বিবেচনা করে অগ্রজ কবি সৈয়দ আলী আহসান বলেন -

"মাটির প্রশ্রয়ে থেকে মাটিকে ছুঁয়েছ অবিরাম
শীতল সকাল বেলা অথবা দুপুর যদি হয়
অথবা সন্ধ্যার ছায়া স্নিগ্ধতায় নয়নাভিরাম-
সকল সময়ে তুমি মাটিতেই চেয়েছ আশ্রয়।"[১৩]

সে কারণে এই কবি মৃত্তিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। মাটির আশ্রয়ের জন্যে ভাটি বাংলায় কবি হাহাকার করেন। 'কালের কলসে' 'ফেরার পিপাসা'য় মায়ের স্মৃতিতে নদী ভাঙনে ছিন্নমূল কবি-পরিবার একটু মাটির আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছে।

"প্রবল হাওয়ার মধ্যে আদিগন্ত শোকের কিনারে
নিঃশব্দে উড়তে থাকি ঢেউয়ে ঢেউয়ে, যদি কোনদিন,
আদিম উদ্ভিদ রেখা দেখা দেয়- কোমল কৌশিক
দারুণ বালুর বেগ, দিগি¦জয়ী মাটির মহিমা।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

['ফেরার পিপাসা', কালের কলস]

কবি মাটি বা আশ্রয়হীন হয়ে 'শোকের কিনারে' ঢেউয়ের উপর ভেসে যেতে থাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। তবু অস্তিত্বের আশায় অপেক্ষার প্রহর গুনেগুনে কবি দিন অতিবাহিত করেন - 'মাটির মহিমা' কবে তাদের ঢেউয়ের গ্রাস থেকে রক্ষা করবে। এই কবিতায় মৃত্তিকাকে ঘিরে কবি মাটিকেন্দ্রিক চেতনাকে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করেছেন।

কবি মৃত্তিকা বলতে ফসলের মাঠ বোঝেন। মৃত্তিকার ছবি আঁকতে তাই দৃষ্টিনন্দন কোনো দৃশ্যের কথা তাঁর মনে আসে না। কর্ষণের জায়গা, ফসল উৎপাদন ও ফসলভরা জমিনকে কবির মনে আসে। 'নগরীর কথা নয় চাষবাসের গল্প' (২০০৭) কাব্যের নাম কবিতায় প্রকৃতি বলতে কবি সমগ্র পৃথিবীর জমিনকেই ভেবেছেন এবং তা কর্ষণের ক্ষেত্র হিসেবেও দেখেছেন।

"তাহলে বলো আমি চরণ বাড়ালেই কেন মায়াজালের মতো
সারা পৃথিবীটাকে মনে হবে আমার লাঙ্গলের অপেক্ষায়।
আমি আমার কৃষি ক্ষেত্রে একদিন খুব ভোরবেলায়
কুয়াশায় ভিজতে ভিজতে হাজির হবো নাকি?"
[নগরীর কথা নয় চাষবাসের গল্প]

এই কারণেই কবি ফলবতী নারীর সঙ্গে কর্ষিত ও শস্যভরা মাটির তুলনা করেছেন বারবার। 'প্রকৃতি' কবিতায় কৃষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কবি মৃত্তিকাকে ভেবেছেন প্রিয়তমা নারী - 'কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে ভাবলাম/ এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।' আসলে কবি নিজেকে ভাবেন একজন বাঙালি কিষাণ, যে কিষাণ জমিন কর্ষণ করে নারী ও সন্তানের জন্যে ফসল ফলায়; যেমন নারীদেহের জমিনে আবাদ করে সন্তান উৎপাদন করেন। শস্য ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র যথাক্রমে জমিন ও নারী। প্রাচীন কৃষিব্যবস্থা ও বিশ্বাসে নারী ও জমিনের উর্বরতাকে সমান্তরাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই নারীর দেহজমিনে কবি রহস্যের বীজ বা জন্মকণা বুনতে চান, চাষাবাদ করে ফসল ফলাতে ইচ্ছুক।

ক "পুরুষ চালায় হাল, আল ভেঙে ঠেলে যায় ফাল
মাটিকে মাখন করে গোঁজে বীজ, গোঁজে জন্মকণা
নারীর কোষের মাঝে রাখে কীট
কালোত্তীর্ণ প্রাণের কীটাণু।"
['কবির বিষয়', অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না]

খ "মাঝে মাঝে মনে হত মাটি চাই।
অন্তহীন দিগন্ত বিস্তৃত কোনো শূন্য মাঠ।
যেখানে ফলবে ধান, কাউনের সোনা আর
ছোট কলসির মতো টই টই তরমুজের রক্তভরা রস।
একটি কিষাণী চাই। সেও হবে অস্পৃষ্ট মাটির মতো
অন্যসব কৃষকের স্পর্শের অচেনা
দু'টি শূন্য মাঠে আমি বুনবো বীজ
ভরাবো ফসলে।"
['ছিন্নভিন্ন স্মৃতিসূত্র: ৬', প্রহরান্তের পাশফেরা]

কবির এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তৃতীয় পর্বের কবিতায়ও দৃষ্ট হয়। নিজেকে প্রকৃত ও বিশ্বস্ত কৃষক হিসেবে উপস্থাপন করে কবি বলেন -

"অবিশ্বস্ত চাষা যদি বীজ বুনে তোমার আবাদে
বিস্বাদ শস্যের আঁটি নিতে হবে ফ্যাসাদে, বিবাদে।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

['স্তব্ধতার চাষী', নদীর ভিতরে নদী]

কবি তাই প্রিয় নারীকে শুধুমাত্র তার জন্যে প্রস্তুত হতে অনুরোধ করেন। এর ব্যতিক্রমে জন্ম নেবে আগাছা এবং ঘটে যেতে পারে সংঘাত, সে-কারণেই কবির আকুতি: নারী যেন দেহ জমিনে শুধু তাকে আবাদ করতে দেয়।

আল মাহমুদ গর্ভধারিণী হিসেবেও মাটিকে চিহ্নিত করেন। 'এক চক্ষু হরিণ' কাব্যে 'জন্মদিন' কবিতায় মৃত্তিকাকে কবি 'ফেটে যাওয়া মায়ের উদর'রূপে অভিহিত করে আষাঢ়ের বর্ষণে 'প্রথম পুত্রকে' মনে পড়ে কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন। আর প্রসবের কাঁপা কান্নাকে কবির মনে হয়েছে 'বাংলার ঝিঁঝির ঝংকার'। যে-মাটির উদর থেকে কবির জন্ম সেই জমিনের স্তনের লবণ, আঠাদুগ্ধ আর ক্লান্তি শুষে নিয়ে কবি গাছের মতো বেড়ে ওঠেন। অতঃপর নদীর কিনারে কবি যেন কদম্বের ডাল হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে, কবি জন্মদিনে নিজের উৎসের সন্ধান মাটিতেই খুঁজে পেয়েছেন। সেজন্যে কবির জিজ্ঞাসা -

"হে গর্ভিণী মাটি, ফেটে যাওয়া মাংসের উদর
হঠাৎ কি মনে পড়ে ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া অসহায় শিশুর রোদন?"
['জন্মদিনে', একচক্ষু হরিণ]

কবি জন্মমুহূর্তের ঘটনা স্মরণ করে নিজের অর্থাৎ 'অসহায় শিশুর রোদন' মনে আছে কিনা সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অর্থাৎ কবি অস্তিত্বের উৎসানুসন্ধানে কৌতূহলী। আত্মআবিস্কার ও আত্মপরিচয় জানার ব্যাপারে আগ্রহী। মাটির দ্বারা সৃজিত মানুষের আদি পিতা আদমের প্রথম পুত্রের সাথে কবি নিজেকে একই সূত্রে উপস্থাপন করেন। কেননা একই পিতা ও মাতার গর্ভ থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি।

৩

নদী আল মাহমুদের আশৈশব অন্তরঙ্গ সঙ্গী। নদীর সৌন্দর্য-ভাঙন-আগ্রাসন-মৃত্যু-নারীর সাথে প্রতিতুলনা ইত্যাদি তাঁর কবিতায় স্বকীয় শিল্পদৃষ্টিতে দৃশ্যমান। 'তিতাস' তাঁর শৈশবের নদী। তাঁর অঙ্কিত নদীগুলো তিতাস নামে একটি নদীরই অভিসারী ও প্রতিচ্ছায়া। তাঁর যে কোন নদী তিতাস। মায়াবী এ নদী তীর ভাঙে, ঘোলাস্রোত পাক খায়, নৌকার পালে বাতাসে গতিশীল হয় যৌবনের প্রতীকের মতো, সলিমের বউ মাটির কলসে করে ভিজে পায়ে পানি নিয়ে যায়; পানকৌড়ি-মাছরাঙা-বক পাখায় জলের ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায়; এবং জনপদে 'অধীর কোলাহল' নিয়ে আসে। কিন্তু কবি সে সবের কিছুই এখানে খোঁজেনি। যতবার নদীর কাছে এসেছেন, ততবারই নীরব তৃপ্তির জন্যে আনমনে ঘাসে বসে নির্মল বাতাসে বুক ভরেছেন; অতঃপর একটি কাশের ফুল আঙুলে ছিঁড়ে নদীর পথ ধরে হেঁটে চলে গেছেন আপন ঠিকানায়। আসলে এ নদীর সবকিছুই কবির চেনা-জানা, এর সাথে সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। সেজন্যেই 'তিতাসে'র সান্নিধ্যই তার তৃপ্তির জন্যে যথেষ্ট। আবার কবি জীবিকার প্রয়োজনে যখন শহরে বসবাস শুরু করেন, তখনও ঘুমের অবসাদে স্বপ্নের মধ্যে 'তিতাস' তাঁর হৃদয়ে গভীর জলধারা ছড়িয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় সোনার বৈঠার আঘাতে 'পবনের নাও', যে নাও তিনি একা বয়ে নিয়ে যান 'অলৌকিক যৌবনের দেশে'[১৪]। অর্থাৎ চেতনে এবং অবচেতনে এ নদী কবির কাছে নিত্যসঙ্গী- জীবনানুভব, তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের অবলম্বন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন প্রবাসজীবনে গিয়ে 'কপোতাক্ষে'র প্রতি তীব্র প্রেমভাব ও আত্মীয়তা অনুভব করেন, আল মাহমুদও নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নগরবাসী সেই রকম উপলব্ধি করেন।

কবি নদীর সাথে ঘুরেফিরে প্রিয়তমা নারীর সাজুয্য অনুসন্ধানে মনোযোগী। কাব্যচর্চার শুরুর দিকে 'কালের কলসে'র 'বেহায়া সুরে' তিনি বলেন, "তুমি আমার তিতাস, কালো জলের ধারা।" অতঃপর 'সোনালি কাবিনে' প্রিয়তমার মুখ স্মরণ করলেই নদী কবির বুকে জলের ঢেউ খেলে যায়।

"তোমার মুখ ভাবলে, এক নদী
বুকে আমার জলের ধারা তোলে।"
['এক নদী', সোনালি কাবিন]

এই নদীকে শুধু তুলনা দিয়েই কবি ক্ষান্ত হননি, নদীকে নারীতে এবং নারীকে নদীতে একাকার করেন-

"নদীর ভিতরে যেন উষ্ণ এক নদী স্নান করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিতাসের স্বচ্ছজলে প্রক্ষালনে নেমেছে তিতাসই।”
['নদীর ভিতরে নদী', নদীর ভিতরে নদী]

কবি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে বহু সাগরের বেলাভূমি, সমস্ত স্নানঘর দেখেও সেই তিতাসে তাঁর প্রিয় নারীর স্নানের দৃশ্যের সাথে তুলনা পাননি কোথাও। তাই প্রিয় নদী আর প্রিয় নারী তার কাছে অভিন্ন। সে কারণে কবির মনে হয়েছে, এই নারীর অর্থাৎ সমস্ত নারীর ভেতর বয়ে চলেছে এক অচেনা নদী। আবার নদীকে কবির কখনো মনে হয়েছে 'আমাদের প্রাণ' অর্থাৎ বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রতীক এ নদী।

“নদী, নদী-
সন্তানের উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন
দেখো সেই পুণ্যতোয়া
যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে।”
['স্বপ্নের সানুদেশ', সোনালি কাবিন]

কবি নদীকে বাঙালি জাতির সংস্কৃতির মূলে প্রতিস্থাপন করেন। এই নদীকে কেন্দ্র করে বাংলার বিশাল এক জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে, দুই পাড়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে ফসল ফলে, এর স্রোতের নকশায় নারীরা শাড়ি বোনেন এবং নদীর কুলুকুলু ঢেউয়ের স্বর সাঙ্গীতিক মুর্ছনায় আমাদের মুগ্ধ করে। অন্যদিকে কবি স্বপ্নের যে সানুদেশে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবেন, তার বাম দিকে বয়ে যাবে রূপালি নদী। এক কথায়, কবির কাছে বাঙালি ঐতিহ্য, দৈনন্দিন জীবনাচরণ ও স্বাপ্নিক অভিপ্রায়ের সাথে এই নদীর সংযোগ ওতপ্রোত। একজন সমালোচকের মতে, “আল মাহমুদের অন্তর্জগতেই নদীকেন্দ্রী নৌকোময় গ্রামবাংলা প্রবেশ করে তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে।”[১৫] সে কারণে নদী ও নদীকেন্দ্রিক জনপদের অর্থাৎ ভাটি বাংলার চিত্ররূপময় জীবন তাঁর কাব্যে প্রাণবন্ত।

আল মাহমুদের কবিতায় নদীর ভাঙন ও আগ্রাসন বিশেষত্বপূর্ণ। নদীবিধৌত বাংলাদেশে নদীর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম জনপদের পর জনপদকে বিলীন করে দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে করে তোলে নিঃস্ব, ভূমিহীন-উদ্বাস্তু।

“চড়ুয়ের বাসা, প্রেম, লতাপাতা, বইয়ের মলাট।
দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে। মেঘনার জলের কামড়ে
কাঁপতে থাকে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার।
ভাসে ঘর, ঘড়া-কলসী, গরুর গোয়াল
ববুর স্নেহের মতো ডুবে যায় ফুলতোলা পুরোনো বালিশ
বাসস্থান অতঃপর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না
জলপ্রিয় পাখিগুলো উড়ে উড়ে ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বাতাসের ফেনা।”
['বাতাসের ফেনা', সোনালি কাবিন]

নিঃস্ব-উন্মূল হয়ে নিরাপদে আশ্রয় নেয়া মানুষের সাধ জাগে নিজের গ্রামে ফিরে যাবার। কিন্তু মনে প্রশ্ন উঁকি দেয় নদী ভাঙা সেই গ্রাম ফিরে পাবে কি না-

“ফিরলে আজো পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙা সে এক গ্রাম?
হায়রে নদী খেয়েছে সবকিছু

জলের ঢেউ ঢেকেছে নাম-ধাম।''
['এক নদী', সোনালি কাবিন]

সেই নদী জীবনের সবকিছুকেই গ্রাস করে নিয়েছে, এমনকি নাম-ধামও মুছে ফেলেছে। কবি সেজন্যে নদীর আগ্রাসনে উদ্বিগ্ন ও অসহায় বোধ করেছেন। পল্লীকবির মতো ছায়াঢাকা ঘন সুনিবিড় প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করতে এই কবি দ্বিধান্বিত। কবি বরং নদী ভাঙনে ছিন্নমূল মানুষের করুণ পরিণতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। তাই কবির চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়, তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় নিজেদের গ্রাম কীভাবে নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, কীভাবে নদীভাঙনে ছিন্নমূল পরিবার বসতভিটা ত্যাগ করে গ্রামান্তরে ছিটকে পড়ে আত্মীয় সজনের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে। সেই দুঃসহ স্মৃতি কবিকে আজীবন তাড়িত করে ফেরে।

একদিকে নদীর ধ্বংসযজ্ঞ, অন্যদিকে নদীর মৃত্যুতে কবি যুগপৎ ভাবে আলোড়িত। নদীর আগ্রাসন মানুষকে যেমন নিঃসম্বল করে, নদীর মৃত্যুতেও তেমনি সবুজ প্রান্তর ধূসর ও বালিময় হয়ে যায়। উভয়ই মানুষের জীবনধারণের জন্যে সমূহ ক্ষতি, অশনি সংকেত। নদীময় এদেশ যদি নদীহীন হয়ে যায় তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেবে, সেদিক বিবেচনা করেই কবি শঙ্কিত। কবি তাই 'নদীর মরণ' দেখে প্রিয়নারীকে 'জীবনের জল' হতে বলেন। বসনকে উদ্ভিদ ও অলঙ্কারকে শৈবাল হবার প্রত্যাশা করেন। কেননা নদীর মৃত্যুর সাথে সাথে নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত জনজীবন, জীবিকা, শস্যক্ষেত্র, নদীকেন্দ্রিক জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদেরও মৃত্যু ঘটে। কবি সেজন্যে নদীর নাম নিতে ও নদীকে স্বনামে ডাকতে দ্বিধাজীর্ণ-

''ইচ্ছার মৃত্যুর মতো পড়ে আছে জরাজীর্ণ যমুনার নাম
তোমাকে কী বলে ডাকি, করতোয়া? সস্তা লাগে বড়ো,
মাছের কঙ্কাল দেখে ও ললাটে জমেছে কি ঘাম?''
['খরা সনেটগুচ্ছ-১', দোয়েল ও দয়িতা]

কবি শুধু যমুনা ও করতোয়ার মৃত্যুতে শোকাহত নন, পদ্মার মরণেও একই সাথে ক্ষুব্ধ ও সোচ্চার। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে চিত্রিত উত্তাল যৌবনবতী পদ্মা নদী কিংবা অদ্বৈত মল্ল বর্মনের (১৯১৪-৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ বর্ণিত তিতাসকে কবি আর দেখতে পান না। কারণ ভারত সঞ্জীবনী পদ্মা নদীর উজানে 'ফারাক্কা বাঁধ' দিয়ে এর প্রবহমানতাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।[১৬] অথচ এই পদ্মা বা 'মা-গঙ্গা'র সাথে বৃহত্তর বাংলার প্রকৃতি, প্রাণবৈচিত্র, মানুষ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যোগাযোগ সুনিবীড়। এই নদীর মরণে কবি উদ্বিগ্ন অর্থাৎ প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

''কখনো ডেকেছি যারে যমুনা, জাহ্নবী, সদানীরা
মানুষের ধর্মে কর্মে, রূপকে, গাথায় চলমান
হে পদ্মা প্রলঙ্করী, কীর্তিনাশা, ভৈরবী সুন্দরী;
এখন সে নিদ্রা যায় শামুকের খোলের ভিতর,
যেন এক অজগরী মন্ত্রবলে হয়ে গেছে দড়ি,
যারে নিয়ে মজা করে গুটি কয় ব্রাহ্মণ ইতর।''
['খরা সনেটগুচ্ছ-৫', দোয়েল ও দয়িতা]

যে পদ্মা বহু নামে খ্যাত, সেই পদ্মার খুনীদের প্রতি কবি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। কেননা এই নদীকে কেন্দ্র করেই মানুষ জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। নদীর মরণে মানুষের অস্তিত্বের সংকটে তাই কবি মর্মাহত। মহাভারতের 'অন্যায় পাহারা' ছিন্নকারী জুহ্নমুনিকে[১৭] আহ্বান করেন এই নদীর প্রবাহ ফিরিয়ে দেবার জন্যে। যে নদীর গর্জন শুনে প্রাণ ফিরে পাবে এ দেশের বিরাণ অঞ্চল, এবং খরার ফাটল বেয়ে সকলের কাঙ্ক্ষিক্ষত জল পুনরায় নেমে আসবে- জীবন ও প্রকৃতি হয়ে উঠবে প্রাণ-চাঞ্চল্যে গতিশীল ও উর্বর। এইভাবে আল মাহমুদ কবিতায় নদীকে বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করেন। এ-দেশে বিরাজমান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাণ-প্রবাহ, প্রাণ-বৈচিত্র্য, জীবন-জীবিকার নির্ভরতা, লৌকিক সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রে রয়েছে নদী। এই নদীর সামগ্রিক রূপকল্প নির্মাণে আল মাহমুদ দায়বদ্ধতা ও শিল্প কুশলতার পরিচয় দেন।

৪

বৃষ্টির জলের সাথে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, প্রকাশ ও বিকাশের সম্পর্ক একই সূত্রে আবদ্ধ। জীবন-সন্ধানী কবি মাত্রই বৃষ্টির কার্যকারিতা ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট। আল মাহমুদের কবিতায় বৃষ্টির কার্যকারণ আগাগোড়া গুরুত্ব পেয়েছে। 'লোক লোকান্তরে' কবি 'বৃষ্টির অভাবে' জীবনের সজীবতার প্রতীক 'চালের লতানো ফুল' মরে যাবার জন্যে শঙ্কিত এবং শুষ্ক দেশে কীভাবে প্রিয় নারী সন্তান প্রসব করবে সে বিষয়ে কবি চিন্তিত। তবে 'কালের কলসে', 'প্রথম বৃষ্টির' ধারায় কবি আনন্দিত। ফাগুনের প্রথমে আকাশে সাহসী দৈত্যের মতো মেঘের আসর কবির শহরে নেমে আসলে সকলে আনন্দে উদ্বেল হয়ে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রথম বৃষ্টির গন্ধ অনুভব করে। প্রথম পানির ফোঁটায় ঘাস, নদীর জল কেঁপে ওঠে, উলঙ্গ ছেলের দল জলের কাদায় মাতামাতি করতে থাকে। তাই হঠাৎ বৃষ্টির আগমনে প্রকৃতির সবকিছু প্রাণবন্ত হয়ে যায়।

"অকস্মাৎ বৃষ্টি পেয়ে মত্ত হলো সমস্ত অঞ্চল
কড়ির খেলায় বসে মেয়েরাও জুড়লো কাড়াকাড়ি।"
['প্রথম বৃষ্টির', কালের কলস]

বৃষ্টিধারায় একদিকে প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য, অন্যদিকে লোকজীবনেও আনন্দ আসে, সেই সত্যই কবি ব্যক্ত করেন।

'সোনালি কাবিনে' কবি 'আঘ্রাণ' কবিতায় হেমন্তের বৃষ্টির সাথে প্রিয় মানবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই বৃষ্টিতে কবি মানুষীর গন্ধ অনুভবে আকুল। কবি জলদ হাওয়ায়, জলের ঢেউয়ে এবং দু'হাতের কোষের জলে সেই নারীর সঞ্চরণ মনে করে তার 'আতর' ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গ্রহণ করেন। আর সে জন্যেই 'বায়ু', 'বরুণ' ও 'পর্জন্য দেবতা'র উদ্দেশে কবির আর্তি:

"হে বায়ু, বরুণ, হে পর্জন্য দেবতা
তোমাদের অবিরল বর্ষণে ঘর্ষণে
যখন পর্বত নড়ে, পৃথিবীর চামড়া খসে যায়
তবু কেন রমণীর নুন, কাম, কুয়াশার
প্রাকৃতিক গন্ধ লেগে থাকে? হে বরুণ, বৃষ্টির দেবতা!"
['আঘ্রাণ', সোনালি কাবিন]

পৌরাণিক মতে 'বরুণ' হল সমুদ্রের অধিপতি বা জলের দেবতা এবং 'পর্জন্য দেবতা' গর্জনকারী জলবর্ষী মেঘের বা ইন্দ্রের দেবতা। কবি প্রিয়ার ঘ্রাণের উৎসানুসন্ধানে বৃষ্টি ও মেঘের দেবতাদের এবং বায়ুর স্মরণাপন্ন হয়েছেন। এতে কবি একদিকে মানবীর ঘ্রাণের খোঁজে চঞ্চল; অন্যদিকে বৃষ্টির উৎসের কাছে জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল। বৃষ্টিকে ঘিরে কবির এক বিশেষ দার্শনিক সত্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টা- পৃথিবী তথা মানুষের আদি উৎসের অনুসন্ধানে কবি সন্ধিৎসু।

ষাটোর্ধব বয়সে প্রকাশিত 'নদীর ভিতরে নদী' (২০০১) কাব্যগ্রন্থের 'বৃষ্টি' কবিতায় আল মাহমুদের ব্যক্তিগত অনুভবে বৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধের কথা মনে আসে। কবির মনে হয়; 'বৃষ্টি মানেই মনে মনে জায়গা বদল করে অন্য কোথাও যাওয়া'। প্রবল বর্ষণে যখন জমিন ভিজতে থাকে তখন কবির মাঝে সৃজনের সংগুপ্ত বীজ একসাথে অঙ্কুরিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যায়। দৃষ্টি ও স্পর্শের অনুভূতি ক্ষয়ে গেলেও কবি বৃষ্টির সময় অনুভব করেন - 'কাঁচা মাটির উঠোনে সেই উদোম, উদ্ভিন্নযৌবনা এক পৃথিবী'। এক কথায়, কবি বৃষ্টির জলের সঙ্গে প্রকৃতির মাঝে প্রাণের সৃজন-আনন্দ উপলব্ধি করেন।

বৃষ্টি ভাবনায় কবি চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছেন 'বিরামপুরের যাত্রী'র 'বৃষ্টির বিজয়' কবিতায়। এ কবিতায় কবি বৃষ্টির বিজয় গাঁথা উচ্চারণ করেন। আষাঢ়ের বর্ষণরত রাতে বৃষ্টির বিবরণকে কবির মনে হয়েছে 'পৃথিবীর উদ্ভবের গান'। চারপাশে রহস্যের বীজ ফাটার অনুভবে কবির প্রাণ কাঁপতে থাকে। কবি বুঝতে পারেন অঙ্কুরের মুখ স্পর্শ

করে বৃষ্টি ও জলজ বাতাস। পৃথিবীর আদিম এই ধারা হাজার হাজার বছর ধরে মাটিকে সিক্ত করে তোলে অঙ্কুরোদগমের জন্যে। কবির ভাষায় -

"বৃষ্টি তবে সৃষ্টির রোদন মাত্র- আর কিছু নয়।
চাই শুধু সিক্ত হওয়া, ভিজে গিয়ে কাদা হয়ে যাওয়া
তবেই উত্থিত হয় প্রকৃতির ভেতরে পুরুষ,"
['বৃষ্টির বিজয়', বিরামপুরের যাত্রী]

আদিম এই জলধারায় প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রকাশ, বিকাশ ও উৎসব সম্পন্ন হয়। কবি এই বৃষ্টিকে শুধুমাত্র 'বৃষ্টির রোদন' বলতে ইচ্ছুক; সেই রোদনে প্রকৃতিতে সৃষ্টির পুরুষ জন্মের আয়োজন শেষ করে থাকে। সে জন্যে কবির ঘোষণা -

"পানির প্রভুত্বে হাসে পৃথিবীর প্রাণের সঞ্চয়
বলে জয়, জয়, জয়, জলময় বৃষ্টির বিজয়।"
['বৃষ্টির বিজয়', বিরামপুরের যাত্রী]

বৃষ্টির এমন ক্ষমতা যে তা কোনো বাধা মানে না, শুষ্ক জমিন সিক্ত ও প্রাণের সঞ্চার করে এবং সজীবতা ও সবুজের উদ্ভব সম্ভব করে তোলে। জড়, প্রাণহীনতা ও অজন্মার মধ্যে প্রাণের বিজয় ঘোষণা করে। নিজের সৃষ্টিশীল সত্তার সঙ্গে বৃষ্টির সাদৃশ্য উপলব্ধি করে কবি বৃষ্টির আধিপত্য কামনা করেছেন।

আল মাহমুদের প্রকৃতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পশৈলীর প্রবণতাকে এভাবে দাঁড় করানো যায় -

ক. প্রথম পর্যায়ের কবিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির নান্দনিক-দার্শনিক মনোভাবের প্রাধান্য লক্ষণীয়।
খ. প্রকৃতি বাঙালির জীবনে প্রবলভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।
গ. প্রকৃতি ও নারীকে অভিন্ন কল্পনা এবং শেষ পর্যন্ত দেশজননী হিসেবে কবি প্রকৃতিকে উপস্থাপন করেন।
ঘ. নগরজীবন থেকে প্রত্যাবর্তনের জায়গারূপে কবি প্রকৃতিময় গ্রামসভ্যতাকে নির্বাচন করেন।
ঙ. প্রকৃতি বাঙালি জীবনের উৎপাদন ব্যবস্থা, জীবিকা, প্রাণবৈচিত্র, সাংস্কৃতিক দিক নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত।
চ. প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান- জমিন, নদী ও বৃষ্টিকে জনজীবন, নন্দন, দর্শন, নারী, কল্পনা, আবাদ-বিবাদ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্ররূপে কবি দেখেছেন।

উপসংহার : আল মাহমুদ প্রকৃতির সামগ্রিক বোধ নিজের মাঝে ধারণ করে আপন শিল্পশৈলীতে প্রকাশ করেন। বাংলা কবিতায় প্রকৃতিকেন্দ্রিক নান্দনিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব ও কৃষক জীবনলগ্ন করে তোলেন এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিজস্ব ভাবনায় উপস্থাপন করেন। আবহমান বাংলার জনজীবনের স্বপ্ন, বাস্তবতা, সংগ্রাম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে কবি প্রকৃতিকে স্থাপন করেন মৌলিক চিন্তাস্রোতে।

Reference:

১. ইমাম, মুহাম্মদ হাসান, ইমাম, 'প্রকৃতি : সদরে-অন্দরে', শহীদ ইকবাল (সম্পা.), চিহ্ন (রাজশাহী: চিহ্ন, আগস্ট ২০০৯), পৃ. ৬৪-৬৫
২. বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল (৩য় সং; কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৯৭), পৃ. ২৭-২৮
৩. জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৫-৫৬
৪. মাহমুদ, আল, 'আমি ও আমার কবিতা', উপমা, আল মাহমুদ সংখ্যা (চট্টগ্রাম, ১৯৯৪), পৃ. ৫
৫. কবির, হুমায়ুন, বাংলার কাব্য (২য় সং; কলকাতা: চতুরঙ্গ, ১৩৬৫), পৃ. ৩১
৬. মাহমুদ, আল, সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), আল মাহমুদ : সাক্ষাৎকার (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৩), পৃ. ২৭-২৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. চৌধুরী, বেলাল, 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' (ঢাকা, ১৯৭৬), দ্র. সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), স্বল্পদৈর্ঘ্য, আল মাহমুদ সংখ্যা-২ (বগুড়া: ২০০২), পৃ. ১৭৬-৭৭

৮. আল মাহমুদের সমগ্র কাব্যকে তিনটি পর্বে বা পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা:

প্রথম পর্যায় : 'লোক লোকান্তর' থেকে 'সোনালি কাবিন' (১৯৬৩-৭৩)

দ্বিতীয় পর্যায় : 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' থেকে 'দোয়েল ও দয়িতা' (১৯৭৬-৯৬)

তৃতীয় পর্যায় : 'দ্বিতীয় ভাঙন' থেকে 'পাখির কথায় পাখা মেললাম' (২০০০-২০১২)

৯. ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, 'বাংলাদেশ : প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার', মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশ: বাঙালী, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ৬৯

১০. জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ, পৃ. ৫৩

১১. বসু, রাম, 'পরিচয়' (কলকাতা, পৌষ-মাঘ, ১৯৭৮), দ্র. উপমা, পৃ. ১৮৭

১২. হোসেন, খোন্দকার আশরাফ, বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২৯-৩০

১৩. আহসান, সৈয়দ আলী, 'আল মাহমুদ', উপমা, পৃ. ১৮৯

১৪. মাহমুদ, আল, "তিতাস", 'লোক লোকান্তর', কবিতাসমগ্র ১ (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭), পৃ. ২৯

১৫. সৈয়দ, আবদুল মান্নান, 'আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা', উপমা, পৃ. ৬৯

১৬. দ্র. রহমান, সরদার আবদুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ (রাজশাহী: পরিলেখ, ২০০৬), পৃ. ৮-১৭

১৭. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, পৌরাণিকা, প্রথম খণ্ড (২য় সং, কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা.লি., ১৯৮৫), পৃ. ২২১-২২৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 410 - 422
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠে প্রকৃতির শিক্ষা

সুজয় চন্দ্র বিশ্বাস
ডিস্ট্রিক্ট পেডাগজি কোঅর্ডিনেটর
সমগ্র শিক্ষা মিশন, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : -sujaychandrabiswas@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
জীবনানন্দ, পৃথিবী, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক উপাদান, ঋতু, অরণ্য, আকাশ, চেতনা জগৎ, শিক্ষা।

Abstract
জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি, বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর কোলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। কবির প্রকৃতি ভাবনার মধ্যে এসেছে নদ-নদী, গাছ, ফুল, ফল, পশু, পাখি, আকাশ, মাটি, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন জীব ও জড়ো উপাদান। তিনি তার বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন - প্রকৃতি যেমন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার বদল ঘটায়, তেমনি মানব মনের মধ্যেও আলাদা আলাদা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে। এক একটি ঋতু মানব মনের মধ্যে এক এক রকমের অনুভূতির সৃষ্টি করে তিনি তার কবিতার প্রতিটি মুহূর্তে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত ও বসন্ত প্রতিটি ঋতুর রূপ, রস, গন্ধ ও বৈচিত্র লক্ষ্য করে কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন তার লেখনীর চিন্তা ভাবনার মধ্যে। প্রতিটি ঋতুর ক্ষণ ও সময়কে তিনি নানা উপমা দিয়ে তার কবিতায় তুলে ধরেছেন, অর্থাৎ বলা যায় কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সহজেই জ্ঞানলাভ করা যায় এবং এর সাথে সাথে গ্রাম বাংলার সামগ্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে সহজেই সুস্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়। জীবনানন্দের কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিশুরা তার শিশু পাঠের উপযোগী ঋতু গত বৈচিত্র, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে, এর মাধ্যমে শিশু তার শিক্ষা অর্জনের পথ আরো সহজ হয়ে উঠে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকরা জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠ দানের মাধ্যমে সহজেই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন শিশুদের মধ্যে অনাবিল আনন্দের মাধ্যমে।

Discussion

১. ভূমিকা - "জীবনানন্দ প্রকৃত কবি এবং প্রকৃতির কবি"[১] – একথা সকলের আগে উচ্চারণ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে প্রবোধ সান্যাল বলেছেন, - 'The greatest poet and philosopher of the age.'[২] ক্লিনটন বি. সিলির ভাষায় - 'জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে সাধারণ ছিলেন না, কবি হিসাবে নন বা মানুষ হিসাবে নন। তিনি সোজা কথায় অসাধারণ নির্জনতম একজন কবি'। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় 'ব্রহ্মবাদী' কাগজে তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন জীবনানন্দকে "বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনাই হতে পারে না"[৩]। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তার 'শ্রেষ্ট কবিতা' একাডেমি পুরুস্কারে পুরুস্কৃত হয়। মৃত্যুর পরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার 'রূপসী বাংলা'এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বেলা - অবেলা - কালবেলা' কাব্য। তার অন্যান্ন রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'কবিতার কথা' (১৯৫৬), প্রথম ছোটগল্প 'ছায়ানটি' (১৯৩২ সালে রচিত), জীবনানন্দের প্রথম উপন্যাস 'সুতার্থ' (১৯৪৮ সালে) রচিত প্রভৃতি। কবি জীবনানন্দ দাশের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল 'ঝরা পালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা' (১৯৫৪), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১), 'আলোপৃথিবী' ইত্যাদি।

২. কবি জীবনানন্দ দাশের চেতনা জগৎ ও প্রকৃতি : কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ বর্ণনার মাধ্যমে মানবতাকে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার চেষ্টা করেছেন, যা আধুনিক মানব জীবনের দুঃখ ও হতাশাকে কাটিয়ে কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গী হয়ে ওঠার মাধ্যমে অনাবিল আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু পরিবেশগত গুরুত্বকেই তুলে ধরেনি তার কবিতার মাধ্যমে, বরং তিনি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন, মানব আত্মার এবং আধ্যাত্মিকতার নিখুঁত উন্নতি। উদাহরণস্বরূপ, তার কবিতা 'বনলতা সেন'-এ প্রকৃতির যে ছবি তিনি একেছেন, তা একধরনের পরিবর্তনশীলতা, একাকীত্ব, এবং ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত। এখানে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল আলো, সময়ের গতি, এবং জীবনের অবিরাম চলাচল আমাদের শেখায় যে, মানবজীবন কখনো এক স্থানে থেমে থাকে না, তা আমাদের মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হয়।

"গোলাপী বিকেল বেলায়/ তুমি অমাবশ্যার চাঁদের মতো..."

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতিতে, যেমন ঋতু পরিবর্তন হয়, দিন-রাতের উঠানামা হয়, বৃষ্টির আসা-যাওয়ালক্ষ করা যায় এই সকল বিষয়ের মতো আমাদের জীবনেও অস্থিরতা, পরিবর্তনশীলতা এবং অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে থাকি। এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে একটি শিক্ষা লুকিয়ে থাকে, যেমন— মানুষের জীবন কখনও স্থির থাকে না, সসময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তন হয় অর্থাত এই পরিবর্তন শীলতাকে মানিয়ে নিয়ে চলাই হল প্রকৃত জীবন এবং এর মধ্যেই জীবনের সঠিক উপলব্ধি নিহিত থাকে। জন কীটস, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পার্সি বিসি শেলীকে বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃতির কবি বা রোমান্টিক কবি বলা হয়। উল্লেখিত এই তিন কবিদের কবিতায় সবুজ তৃণভূমি, বনাঞ্চল, বিভিন্ন ফুল ও ফল, পাহাড়-পর্বত, নদীর বিভিন্ন রূপ, সাগর, গ্রামীণ দৃশ্য, বিভিন্ন প্রকার বায়ু, সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়, সমুদ্রের সৈকত ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তেমনি প্রকৃতির প্রায় সকল উপাদানের উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। তার কবিতায় কার্তিকের রূপ, জ্যোৎস্না, শালিক, চিল, সহ দেশীয় পাখি, ধানসিঁড়ি, সহ বিভিন্ন নদী, লজ্জাবতী, দখিনা বাতাস ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতির উপাদান উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় শব্দবুনন, এবং নান্দনিক চিত্রকল্প নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই সব বৈশিষ্টের জন্য জীবনানন্দকেও আমরা প্রকৃতির কবি বলতে কোনো দ্বিধা বোধ করি না কারণ তার কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, রোমাঞ্চ, সৌন্দর্য প্রভৃতির ছোয়া। তার কবিতায় বৈচিত্রময় প্রকৃতির রূপ পাঠকের মনে এক দোলা দেয়, যা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে চিত্রকল্প নির্মাণে কবি জীবনানন্দ দাশের পঞ্চইন্দ্রিয় সত্তাকে সক্রিয় করে তোলে। 'বাঙালী নারীর কাছে-চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,/

হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়, -ডাঁশা আম কামরাঙা ফুল', 'কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা সাদা উঠানের গায়' ইত্যাদি প্রকৃতির উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় তার কবিতায়। অঘ্রান-কার্তিক মাস কবির প্রিয় সময়। বিভিন্ন উপকরণে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে বিভিন্নরূপে তা প্রকাশ পেয়েছে তার কবিতার মধ্যেদিয়ে। চিল-হরিণ-জোনাকি-বেড়াল-বাদুড়, চাঁদ-নক্ষত্র-আকাশ-সাগর-নদী, ডানা-লতা-ঠাং-শরীর-পালক, ঘ্রাণ-ঘুম-নির্জনতা, হিজল-ঝাউবন, লেবু-আমলকী-দেবদারু, পাতা-ঘাস-ধান, বালি-শিশির-হাওয়া-রোদ-জ্যোৎস্না, ঝড় ঢেউ, নীল-সবুজ হলুদ ইত্যাদি ধরা দিয়েছে জীবনানন্দের কবিতাগুলোতে। বিভিন্ন পাখির প্রসঙ্গ এসেছে তার কবিতায়। বিভিন্ন রঙের শালিক, চিল, খঞ্জনা, চড়ই, বিভিন্ন পেঁচা, শঙ্খচিল, বিভিন্ন কাক, ফিঙে, বউ-কথা-কউ, বক, দোয়েল, শ্যামা, খঞ্জনা, ঘুঘু, কাঠঠোকরা প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির রূপ দিয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন পাখি সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা আমাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি শিশু মনে এবং পাঠকের মধ্যে পাঠের আগ্রহ জন্মায়।

কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় অরণ্যের সামগ্রিক বৈশিষ্টকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন গাছপালা, জীবজন্তু ও প্রাণীর নামকরণের মাধ্যমে। তার কবিতায় রয়েছে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু, গাছপালা এবং পতঙ্গের নাম, যেমন-নীলগাই, চিতা, সাপ, বাঘিনী, হরিণ, শম্বর, ঝিঁ ঝিঁ। বিভিন্ন প্রকারের গাছ-গাছালি, ফুল-ফল, কীটপতঙ্গ, ঘাস ইত্যাদির পাশাপাশি ইঁদুর, বেড়াল, বিভিন্ন প্রকারের মাছ, বিভিন্ন ফড়িং, কাঁচপোকা, মৌমাছি ইত্যাদি। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যে সকল গাছ এবং ফলের নাম পাই সেগুলো হল - কাঁঠাল, জাম, আনারস, ডুমুর, জারুল, হিজল, অশ্বত্থ, শিমুল, নারিকেল, লিচু, দারুচিনি, তেঁতুল, শিশু, পলাশ, চালতা প্রভৃতি গাছ। কবি তার কবিতায় এই সকল বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের বর্ণনার মাধ্যমে কবিতাকে এক অপুরূপ নান্দনিকতার পরিচয় দিয়েছেন - যা পাঠকের চোখের পাশাপাশি অন্তরে দারুণ সব ছবি এঁকে দেয়, যা মনে থাকে অনেকদিন। জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিশুশিক্ষার পথ সহজ হয়ে উঠে। শিশু আনন্দের সাথে কবিতা পাঠ করার মাধ্যমে প্রকৃতি জগৎ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানার্জন করতে পারে।

৩. কবি জীবনানন্দ দাশের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের আলোকে প্রকৃতির শিক্ষা :

৩. ১. জীবনানন্দের প্রথম সংকলন 'ঝরাপালক' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ : এই কাব্যগ্রন্থে খুব সুন্দর ভাবে নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন এবং প্রকৃতির এক অপুরূপ জগৎ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন কবি তার কবিতা গুলির মধ্যে। এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে সকল বিষয় বস্তু রয়েছে সবেই গ্রাম বাংলার পরিচিত দৃশ্য, যেমন - গ্রীষ্মের কালবৈশাখী, ডাহুকী পাখির আকুল গান, রৌদ্রতাপে অবনতমুখী মালঞ্চ কিংবা বর্ষার বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি আঁধারে, অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য এ কাব্যের মধ্যে রয়েছে। হেমন্তের হিম, বাসন্তী - উৎসব, শ্রাবণের মেঘ, ভাদ্রের ভিজা মাঠ, এমন সহজ সৌন্দর্য রচনা করেছেন কবি এই কাব্য গ্রন্থের মধ্যে।

'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের 'নাবিক', 'সিন্ধু', 'দেশবন্ধু' ও 'ডাহুকী' এই চারটি কবিতায় কবি গ্রীষ্ম ঋতুর উষ্ণ, তপ্ত পরিবেশের বর্ণনা করেছেন এই বর্ণনার মাধ্যমে মানবমনে আলাদা অনুভূতির সুর বেজে উঠে এবং গ্রীষ্ম কালের সামগ্রিক ধারণা জন্মায় আমাদের মধ্যে যা শিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠে।

কবি **'বেদিয়া'** কবিতায় শরৎ ঋতুকে রূপবতী রানীর মতো করে সাজিয়েছেন। এই কবিতায় শরৎ ঋতুর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, এর মাধ্যমে শিক্ষাত্রী শরৎ কালের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং এর ফলে শরৎ কালের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা জন্মায় শিক্ষাত্রীর মধ্যে। 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় একাধিক ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কবি প্রিয়ার সন্ধানে পথ-যাত্রা করে প্রকৃতির সুন্দর্য্যকেই যেন একান্তভাবে অনুভব করেছেন। কবি তার এই কবিতায় মালতি লতার বন, কদমগাছ, কেয়া ফুল, শেফালীফুল এবং কামিনী ফুলের বর্ণনা করেছেন। হেমন্ত কালের অসাধারণ একটি চিত্রকলা বর্ণনা করেছেন 'কবি' কবিতায়। হেমন্ত ঋতুর প্রতি কবি যে বিশেষ অনুরাগী - একবিতা তারই অন্যতম পরিচয় রেখেছে। 'কবি' কবিতায় কবিমন প্রসারিত হয়েছে হেমন্তের হিম মাঠ থেকে সীমাহীন আকাশ পর্যন্ত।

"হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের অবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূতির মতো কুয়াশায় সাদা ডানা যায় তার উড়ে।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩.২. 'ধূসর পান্ডুলিপি' কবি জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ : এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ভারতে প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ এই বইটি কবি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কুড়িটি (২০) কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি তার প্রিয় ঋতু হেমন্ত রিতুর কথা বলেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে তার প্রিয় ঋতু হেমন্ত কখনও মৃত্যুর প্রতীক, কখনো জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে কবির কাছে। কবি জীবনানন্দ দাশ তার 'ধূসর পান্ডুলিপি' গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যে সকল প্রাকৃতিক পরিবেশের যে চিত্র তুলেধরেছিলেন সেগুলো হল - হেমন্তের ঝড়ের কথা, শিশিরের জল, নীলাকাশের বর্ণনা, সমুদ্রের জলের কথা, নক্ষত্রের বর্ণনা, চাঁদের বর্ণনা, ফসল কাটার সময়ের কথা, মাঠের ফাটলের কথা, নিশীতের বর্ণনা, জলের উচ্ছাস, সন্ধ্যার মেঘের বর্ণনা ইত্যাদি। জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্য 'ধূসরপাণ্ডুলিপি' তে রয়েছে ঋতু চিত্রনের অভিনবত্ব। এখানে শহরের পরিবেশের ঠিক উল্টোপিঠের চিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ শুধু গ্রাম্য প্রকৃতির চিত্রকল্প এখানে এঁকেছেন কবি। এ কাব্যের কবিতাগুলির নতুনত্ব দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন,.. 'তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে'। শুধু ঋতুর উপস্থিতি নয়, ঋতুর প্রতি অনুরাগ এবং ঋতুর মধ্য দিয়ে কবিমনের আবেগ প্রকাশ জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায়। এক আশ্চর্য্য অনুভূতি দিয়ে কবিতায় ঋতুর রঙের সঙ্গে জীবনের রঙকে পরিস্ফুট করেছেন জীবনানন্দ দাশ। একাব্যের রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শের ইন্দ্রঘন অনুভুতি ইয়েটসের লেখাতেও পাওয়া যায়। ইয়েটসের 'The Falling of the Leaves' এর 'Yellow the leaves of the rowan above us and yellow the wet wild strawberry leaves'[৪] এর সঙ্গে তুলনীয় -

"দেখেছি সবুজপাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ।"[৫]

'মাঠের গল্প' কবিতায় প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে মিশেছে প্রতীকী অনুষঙ্গ। যেমন - মেঠো চাঁদ ও পোড়ো জমি। 'মাঠের গল্প' কবিতার 'মেঠোচাঁদ', 'পেঁচা', 'পঁচিশ বছর পরে', এবং 'কার্তিক মাসের চাঁদ' - এই কবিতাগুলিতে প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে uncanny। 'মাঠের গল্প' কবিতাংশের দ্বিতীয় অংশ পেঁচাতে সৌন্দর্যের পাশা পাশি পৃথিবীর মলিন চেহারার বর্ণনা রয়েছে। কার্তিক কিংবা অঘ্রানের রাতের আকাশে কবি যেমন দেখেছেন চাঁদ ও তারার ছবি, তেমনি পাশাপাশি বাঁশপাতা, মরাঘাস, ধোঁয়াটে, কুয়াশা এবং ঘুমন্ত পৃথিবীর ছবিও দেখেছেন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় কবি কুয়াশা, ফুল, নদী, চাঁদ ও জোনাকি পোকার এবং ঋতুচক্রের কথা বর্ণনা করেছেন। শীতের নদীতে ধূসর কুয়াশার, সূর্য ডোবার পর সন্ধ্যার আবছা অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন কবি। 'অনেক আকাশ' কবিতায় কবি শীত ঋতু ও হেমন্ত ঋতুর কথা বলেছেন। এই দুই ঋতুতে নদীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে এই কবিতায় কবি সুন্দর ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এর ফলে আমরা সহজেই জানতে পারি কোন ঋতুতে নদী কি রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ কি বৈশিষ্টের অধিকারী হয়।

৩.৩. 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থ : এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় জীবনানন্দ লিখেছেন, - 'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ বঙ্গাব্দের ভিতরে রচিত হয়েছিল। এখানে কবি ইতিহাস ও সময়ের বুকে হাত রেখে হেমন্তের কুয়াশার ভেতরদিয়ে এক অদেখা সৌন্দর্যের জগতে পাড়ি দিয়েছেন। 'হাওয়ার রাত' হল মহাপৃথিবী কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবির গভীর ভাবে ভালোলাগা এক রাতের স্মৃতিচর্চা এই কবিতায় আছে। হওয়ার রাত হল চমৎকার রাত, ভালোলাগার রাত, অসংখ্য নক্ষত্রের রাত। 'হওয়ার রাত' সৃষ্টির রাত, জীবনের রাত, আনন্দের রাত। 'শিকার' হল 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের তেমনই আরএক গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। বিচিত্র এক শিকার কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কবিতা। ভোরের হালকা নীল আকাশে যখন একটি মাত্র তারা মিটিমিটি জ্বলছিল, যখন চারপাশের পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়া পাখির পালকের মতো সবুজ হয়েছিল, তখনেই এক সুন্দর বাদামি হরিণকে শিকার করা হয়েছে। সবুজ অরণ্যে লেগেছে রক্তের দাগ। এই কবিতায় ভোরবেলার অপরূপ সৌন্দর্যকে বর্ণনা করেছেন কবি এবং বনের এক সুন্দর পরিবেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কিভাবে আধুনিক সভ্যতা দিনদিন বিনাশ করে চলেছে তার এক সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। কয়েকজন সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানো টেরিকাটা মানুষ বন্দুকের গুলি দিয়ে হরিণটাকে শিকার করার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে ভোরের সৌন্দর্যকে হত্যা করেছেন। কবি তার এই কবিতায় আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক অরণ্যের এবং অরণ্যের সকল জীব-জন্তুকে রক্ষা করার বার্তা দেবার চেষ্টা করেছেন।

'মহাপৃথিবী'র কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা গুলি হল – 'নিরালোক', 'সিন্ধুসারস', 'ফিরে এসো', (ফিরে এসো সমুদ্রের ধরে), 'শ্রাবনরাত' (শ্রাবনের গভীর অন্ধকার রাতে), 'মুহূর্ত' (আকাশে জ্যোৎস্না - বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রান), 'শীতরাত', (এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে), 'সূর্যসাগরতীরে' (সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার), কবি এই সকল কবিতার মধ্যে রাতের আকাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন এবং সূর্যের আলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান এই বার্তা দিয়েছেন কবি মানব সমাজের মধ্যে। প্রাকৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম মানব সমাজে তিনি তার মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের বর্ণনার মাধ্যমে।

৩.৪. 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ (১৯৫৭) : এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, কবির মৃত্যুর তিন বছর পর। গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবির মনে যে অনুভূতি সঞ্চার করেছে তারই কাব্যিক রূপায়ণ হল 'রূপসীবাংলা' কাব্য। সমস্ত কবিতাতেই কবি তার লেখনির মাধ্যমে পল্লিবাংলার গৌরব ও সৌন্দর্য বর্ণিত করেছে। কবিতাগুলি সনেটের আকারে লেখা। ইয়েটস যেমন বলেছেন - 'I am of Ireland and the Hyland of Ireland' জীবনানন্দ তার এই কবিতায় নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন এই রূপসী বাংলার সন্তান বলে।

> "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
> চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
> ভোরের দোয়েলপাখি - চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
> জাম-বট-কাঠালের-হিজলের-অশত্থের করে আছে চুপ;
> ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
> এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ।"[৬]

বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ইতিহাস, বাংলার নদীর কাছে তিনি তার মনপ্রাণ শরীর বিকিয়ে দিয়েছেন। কৃষিভিত্তিক অবিভক্ত বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় জীবনানন্দ তার কাব্যে রেখেছেন তার তুলনা মেলা ভার। শঙ্খচিল, শালিখ, ভোরের কাক, কার্তিকের নবান্ন, কুয়াশা, কাঁঠাল ছায়া, হাঁস, কলমীর গন্ধ ভড়াজল, জলাঙ্গীর ঢেউ, নদী-মাঠ-ক্ষেত প্রভৃতি উপকরণ তার কবিতায় স্থান পেয়েছে, শিশুরা তার শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুকে অর্থ্যাৎ পাঠের বিষয়কে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করতে পারে সহজেই এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে। শঙ্খচিল কিংবা শালিখ অথবা ভোরের কাক হয়ে কার্তিক মাসের সকালে কুয়াশা ভেজা নবান্নের দেশে কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা শান্ত বাংলায় ভেসে বেড়াতে চায় কবি। বাংলার নদী, মাঠ, জাম-বট-কাঁঠাল-হিজল এর বন সর্বদাই আকর্ষণ করেছে কবিকে। কবির মনে পড়েছে চম্পা, বেহুলা, চাঁদ-সদাগরের মধুকর ভিভার কথা। অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থে গ্রামবাংলার সামগ্রিক বিষয় বস্তুকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কবি। জীবনানন্দ দাশ তার এই রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে এক সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন যা গ্রামবাংলার প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে সহজেই জ্ঞানলাভ করতে পারে শিক্ষার্থীরা।

৪. কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির শিক্ষা সম্পর্কে মূলত দুটি দিক ফুটে ওঠে :

৪.১. প্রকৃতির সৌন্দর্য ও তার প্রতি শ্রদ্ধা : কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে এক উজ্জল ও বিশুদ্ধ সত্তা হিসেবে চিত্রিত করেছেন তার কবিতায়। প্রকৃতির মাঝে অস্থায়ী সৌন্দর্য, সঠিকতা, এবং পরিপূর্ণতা রয়েছে যা মানব জীবনের অনিশ্চিত ও অস্থায়ী

অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। কবি এই সৌন্দর্য থেকে শিক্ষা নেন যে, জীবনের অস্থিরতার মাঝেও সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, যা দেখার চোখ ও উপলব্ধি শক্তি অর্জন করতে হয়।

৪.২. প্রকৃতির মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা : 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রকৃতির মধ্যে ধৈর্য এবং সহনশীলতার ধারণা স্পষ্টভাবে উঠে আসে। যেমন, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নদী কখনো শান্ত, কখনো ক্ষিপ্ত, আবার কখনো নিরব থাকে। এই বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে তিনি জীবনের নানা আবেগ, সংগ্রাম, এবং সহিষ্ণুতা বুঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতি শেখায় যে, জীবনে অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তন অনিবার্য, তবে সেগুলিকে সহ্য করার এবং সম্মান করার মনোভাব থাকতে হবে উদাহরণ স্বরূপ - 'বাঁশবাগানের পথ' কবিতায় কবি বাঁশবাগানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মানব জীবনের অন্তর্নিহিত শূন্যতা ও একাকীত্বের কথা তুলে ধরেছেন। 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় প্রকৃতির এই বিশালতা এবং তার অস্থিরতা মানব জীবনের সীমাবদ্ধতা এবং পরিমিতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতাগুলি প্রকৃতির মাধ্যমে জীবনের গভীর শিক্ষা এবং তাৎপর্য তুলে ধরে, যা আমাদের প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ধৈর্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

৫. জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঋতু, মাস এবং ঋতু বাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির শিক্ষা :
ভাবুক কবি প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ তার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যে সকল ঋতু, মাস, ঋতু বাচক সংকেত এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক একটি শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। সময়, কাল ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির, প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের পরিবর্তন হয় এই বিষয়ে আমরা সহজেই জ্ঞান অর্জন করতে পারে শিক্ষাথীরা, জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করার মাধ্যমে। জীবনানন্দ দাশ তার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যে সকল ঋতু, মাস, এবং ঋতু বাচক সংকেত ব্যবহার করেছেন তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হল –

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
'ঝরাপালক' (১৯২৭)	'নাবিক'		বৈশাখ	টাইফুন, দামিনী-বৈশাখী।
	'কবি'	হেমন্ত	পৌষ	কুয়াশা, শিশিরের জল, ঝরাপাতা, মরা নদী, জলডাহুকী, হলুদ পাতা, ইত্যাদির বর্ণনা পাই।
	'সিন্ধু'	শীত		নষ্ট নীড়, ঝরাপাতা, শীতের কুয়াশা, শিশিরের নিশা, আলেয়ার ভিজা মাঠ।
	'সেদিন এধরনীর'	হেমন্ত	ফাল্গুন, পৌষ	কুয়াশা, হিমমাস, ধূধূমাঠ, কাশফুল।
	'মেঠোচাঁদ'			খড়-নাড়া, মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, ঝরা শস্য, ফসল কাটার সময়।
	'অবসরের গান'	শীত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম	কার্তিক	শিশিরের ঘ্রান, পেকে ওঠে ধান, নুয়ে পড়া ফসল, শিশিরের জল, কার্তিকের মিঠা রোদ, সবুজ ঘাস হয়ে গেছে সাদা।

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	'জীবন'	শীত, হেমন্ত	ফাল্গুন	সবুজ পাতা হলুদ হয়, ঘূর্ণির মতো বাতাস, বৃষ্টি পরে, ছোঁড়া ছোঁড়া কালোমেঘ, শস্য ফলে গেছে মাঠে, ফুল ঝরিয়া গেছে।
	'পিপাসার গান'	হেমন্ত	কার্তিক, অঘ্রায়ন, পৌষ	ঝরা শিশিরের গান, অন্ধকারে শিশিরের জল, কুয়াশা, হিম হাওয়া, জুঁই, মুকুল, কুয়াশার ছুরি।
'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬)	'মেঠো চাঁদ'			মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, ঝরাশস্য, ফসলকাটার সময়।
	'পেঁচা'	হেমন্ত	অঘ্রায়ন, কার্তিক	হলুদ পাতার ভিড়।
	'পরস্পর'	বসন্ত, শীত, হেমন্ত	মাঘ, ফাল্গুন	কাঁচের গুড়ির মতো শিশিরের জল, উত্তর সাগর, চাঁপাফুল, বকুল।
	'অবসরের গান'	শীত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম,	কার্তিক	শিশিরের ঘ্রান, পেকে ওঠা ধান, নুয়েপড়া ফসল, শিশিরের জল, ফলন্ত ধান, হেমন্তের নরম উৎসব, কার্তিকের মিঠা রোদ, ঝরা মরা শেফালী, সবুজঘাস হয়ে গেছে সাদা, ঝড়া শিশিরের জল, গ্রীষ্মের সমুদ্র।
	'মৃত্যুর আগে'	শীত	পৌষ, অঘ্রাণ, বৈশাখ	নির্জন ঘড়ের মাঠ, কুয়াশা, মাঠে ফসল নাই, বহুদিন-মাস-ঋতু।
	'হায় পাখি একদিন'	আষাঢ়		বাদলের কোলাহল, মেঘেরছায়া, কালিদহের ঝড়।
	'আবার আসিব ফিরে'		কার্তিক	নবান্ন, কুয়াশা, রাঙা মেঘ।
'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪)	'নিরালোক'	ফাল্গুন		নক্ষত্রের আলোকে বাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন, সন্ধ্যার আকাশ, সন্ধ্যার নক্ষত্র, জোৎস্না,

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	'সিন্ধুসারস'	শীত, হেমন্ত	অগ্রায়ন	কুয়াশা, ঝরা সোনার ধান, হলুদপাতা, মেঘের দুপুর, সবুজ ঘাস, পাহাড়, পাখি, হিজল বন, নদীর ঢেউ, সমুদ্র, সাগর, তৃণ, ধান,
	'ফিরেএসো'			সমুদ্রের ধার, ঝাউ গাছ, ঝরণা
	'শ্রাবনরাত'			বঙ্গোপসাগরের কথা, বর্ষারকথা, কালোআকাশ, ধূসর মেঘ,
	'মুহূর্ত'			বাঁকা চাঁদ, বনের চিতাবাঘ, হরিণ, শস্য কেটেছে,
	'শব'			সোনালী মাছ, নীল মশা, নদীর জল, মেঘ,
	'আট বছর আগের একদিন'	হেমন্ত, শীত	ফাল্গুন	প্যাঁচা, মাছি, ইঁদুর, চাঁদ, ব্যাঙ,
	'শীতরাত'		পৌষ	শীতের রাত, প্যাঁচার গান, হলুদ পাতার মতো, কোকিল, সিংহ, অরণ্য, পাহাড়, কুয়াশা,
	'ফুটপথে'			গভীররাত, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, ঠান্ডা বাতাস, শিশির, জোনাকি, সবুজ ঘাস, নক্ষত্র,
	'প্রার্থনা'			কালপুরেষের গতি,
	'মনোবীজ'		অঘ্রান	ঘন বন, জ্যোৎস্না, রৌদ্র, বালিহাঁস, সূর্যের শিখা, নদী,
	'সেইদিন এই মাঠ'			চালতা ফুল, শিশিরের জল, খেঁয়া নৌকো, লক্ষীপেঁচার গান।
'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭)	'বাংলার মুখ আমি'			রাতের অন্ধকার, ডুমুরের গাছ, দয়েলপাখি, পল্লবের স্তূপ, জাম-বট-কাঁঠাল-হিজলের গাছ, ফণীমনসার ঝোপ, হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া, কৃষ্ণা দ্বাদশীর জোৎস্না, নদীর চড়া, সোনালী ধান প্রভৃতির বর্ণনা বর্ণনা করেছেন কবিতায়।

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	‘একদিন জলসিড়ি নদীটির’		শ্রাবন	বাঁকা চাঁদ, নদীর জল, কলমীর দাম, আকন্দ, বাসকলতা গাছ, বটের ঝরা লাল ফল, ভাসানের গান, লক্ষীর গল্প ইত্যাদির বর্ণনা আছে কবিতার মধ্যে।
	‘আকাশে সাতটি তারা’	শীত		কামরাঙা ফল, লালমেঘ, গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে, বাংলার নীল সন্ধ্যা, হিজল-কাঁঠাল জামের গাছ, নরম ধানের গন্ধ, হাঁসের পালক, পুকুরের জল, চাঁদ ও সরপুঁটি মাছ এর বর্ণনা পাই কবিতায়।
	‘কোথাও একদিন’			গঙ্গাফড়িং এর নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপ্রতি, শ্যামাপোকা, বেতের নরম ফল, ধুন্ধল বীজ, বক, শালিখ, ঘোড়ার কেশর, ইত্যাদির বর্ণনা আছে কবিতায়।
	‘হায় পাখি, একদিন’		আষাঢ়	মেঘের ছায়া, গাংশালিখের ঝাঁক, ফণীমনসার বনে মনসার কথা, কালীদহের ঝড়ের বর্ণনা।
	‘জীবন অথবা মৃত্যু’	হেমন্ত	কার্তিক	চাঁপাফুল, হিজলের পাতা, শালিখ পাখি, ভোমরা, ভেরেণ্ডা ফুলের উল্লেখ আছে কবিতায়।
	‘পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত’			তেঁতুলের বন্, কদম গাছ, লক্ষীপেঁচা, জোৎস্নারাত, টুপ টুপ করে শিশির ঝরা, বৈশাখ মাসের মেঘের বর্ণনা কবিতায় পাওয়া যায়।
	‘একদিন’	শরৎ		হলুদ বোটার শেফালিফুল, রোদ ও মেঘের বর্ণনা আছে কবিতায়।
	‘আবার আসিব ফিরে’		কার্তিক	কুয়াশা, নবান্ন, কাঁঠাল গাছ, কলমীর গন্ধ, বাংলার নদী-মাঠ-ক্ষেতের কথা, জলাঙ্গীর ঢেউ, লক্ষীপেঁচার কথা, ধানের কথা বর্ণনা করেছেন কবি তার কবিতায়,

কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাসের নাম	কবি তার কবিতায় যেসকল ঋতুবাচক সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।
	'যদি আমি ঝরে যাই'		কার্তিক	নীলকুয়াশা, কাঁঠালী চাঁপা, হলুদ পাতা, খয়েরিপাতা, শিশিরের গন্ধ, বাংলার ক্ষেত, শামুক ও গুগলির কথা, শ্যাওলার মলিন সবুজ এর বর্ণনা, শালিখ পাখির কথা, কথা বর্ণনা করেছেন কবি তার কবিতায়।
	'কোথায় চলিয়া যাব'	শরৎ		রাত্রির আকাশ, অসংখ্য নক্ষত্রের কথা, পেঁচা, রাঙা লিচু, ডুমুর, পরথুপি-মধুকূপী ঘাসের বর্ণনা আছে কবিতায়।
	'একদিন যদি আমি'	শীত		সমুদ্রের জল, শীতের রাত, নক্ষত্র, চালতা গাছের বর্ণনা।

৬. জীবনানন্দ দাশের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত ঋতু এবং ঋতু বাচক মাসের নাম উল্লেখিত কতগুলি পংক্তির উল্লেখ করা হল এর মাধ্যমে আমরা সহজেই ঋতু গত চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবো সহজেই।

৬.১. 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলী, (নবনবীনের লাগি)
- ✓ হেমন্তের বিদায়- কুহেলি, (পিরামিড)
- ✓ রৌদ্র-ঝিলমিল, ঊষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল, ... (নীলিমা)
- ✓ ধুধু মাঠ, -ধানক্ষেত, -কাশফুল, -বুনোহাঁস, -বালকার চর, (সেদিন এ -ধরণীর)
- ✓ ধবল কাশের দলে, অশ্বিনের গগনের তলে, (কিশোরের প্রতি)
- ✓ পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী-বৈশাখী! (নাবিক)
- ✓ হেমন্তের হিম মাঠে, (কবি)
- ✓ - শীতের কুয়াশা।
- ✓ ...বৈশাখের বেলাতটে সমুদ্রের স্বর-(সিন্ধু)
- ✓ - হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড়!
- ✓ ...পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া! (সেদিন এ ধরণীর)

৬.২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ, (মৃত্যুর আগে)
- ✓ শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, (বোধ)
- ✓ রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে-, (নির্জন স্বাক্ষর)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 410 - 422
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ✓ শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে, (অবসরের গান)
- ✓ বনের ভিতরে আজ শিকারিরা আসিয়াছে, (ক্যাম্পে)
- ✓ ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার মুছে/ গেছে কতবার-কতবারফসল - কাটার, (মাঠের গল্প)
- ✓ বাঁশপাতা -মরা ঘাস-আকাশের তারা, (পেঁচা)

৬.৩. 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে কোন ঘরে যাবো! (নিরালোক)
- ✓ ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো সাদা ডানা, (সিন্ধুসারস)
- ✓ এইখানে ফাল্গুনের ছায়া মাখা ঘাসে শুয়ে আছি, (নিরালোক)
- ✓ মেঘের দূপুর ভাসে-সোনালী চিলের বুক হয় উন্মন
  মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে, (সিন্ধুসারস)
- ✓ শ্রাবনের গভীর অন্ধকার রাতে
  ধীরে-ধীরে ঘুম ভেঙ্গে যায়
  কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে? (শ্রাবনরাত)
- ✓ যত দূরে যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
  শেষ সোনালি হরিণ-শষ্য কেটে নিয়েছে যেন, (মুহূর্ত)
- ✓ রাঙা মেঘ-হলুদ- হলুদ জোৎস্না, চেয়ে দ্যাখো যদি; (শব)
- ✓ উড়ে গেলো কুয়াশায়, - কুয়াশার থেকে দূরে-কুয়াশায় আরো; (স্বপ্ন)
- ✓ সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি। (আটবছর আগে একদিন)
- ✓ সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
  পাবে না আর
  পাবে না আর। (শীতরাত),
- ✓ সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার : (সূর্যসাগরতীরে),
- ✓ তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা; (প্রেম-অপ্রেমের কবিতা)

৬.৫. 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ব্যাবহৃত পংক্তি :

- ✓ সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাক জানি-, (সেই দিন এই মাঠ)
- ✓ চালতাফুল কি আর ভিজবে না শিশিরের জলে, (সেই দিন এই মাঠ)
- ✓ খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে- (তোমরা যেখানে সাধ)
- ✓ জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের অশথের ক'রে আছে চুপ; (বাংলার মুখ আমি)
- ✓ কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়- (বাংলার মুখ আমি)
- ✓ হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই এই কার্তিকের নবান্নের দেশে (আবার আসিবো ফিরে)
- ✓ সারা দিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে; (আবার আসিবো ফিরে)
- ✓ দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে- (আবার আসিবো ফিরে)
- ✓ যখন চড়াই পাখি কাঁঠালীচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুজে, (যদি আমি ঝ'রে যাই)
- ✓ যার ডাক শুনে আজ ক্ষেতে-ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরির ধান; - (যদি আমি ঝ'রে যাই)
- ✓ পেঁচা ডাকে জোৎস্নায়; হিজলের বাঁকা ডাল করে গুঞ্জরণ; (যদি আমি ঝ'রে যাই)

- ✓ আর তারা আসে নাকো; সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুল-জুল (যে শালিখ মরে যায়)
- ✓ গান গায়-পাশ দিয়ে খল খল খল খল বয়ে যায় খাল, (যে শালিখ মরে যায়)
- ✓ আসন্ন সন্ধ্যার কাক-করুন কাকের দল খোড়া নীড় খুঁজি (কোথাও চলিয়া যাব)
- ✓ ডুবে যায়, -কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে -দিকে রূপশালী ধান (তোমার বুকের থেকে)
- ✓ উড়ে যায় -মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে; (গোলপাতা ছাউনির)
- ✓ ছেড়ে গেছে মৌমাছি; -কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে, (ভিজে হয়ে আসে মেঘ)
- ✓ সেইসব নোনা গাছ, করমচা, শামুক গুগলি, কচি ততালশাঁস, (খুঁজে তারে মরো মিছে)
- ✓ ঝরে গেছে বলে তারে ভুলে গেছে নক্ষত্রের অসীম আকাশ, (কখন সোনার রোদ)
- ✓ কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল; (এই পৃথিবীতে এক)

Reference:

১. জীবনানন্দের চেতনা জগৎ, প্রকাশক - শ্রী তপনকুমার ঘোষ, মুদ্রক-জয়দুর্গা প্রেস, ৫৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা - ৯, প্রথম মুদ্রণ - অগ্রাহন, ১৩৫৯, পৃ. ৭

২. জীবনানন্দ, দাশ : প্রেম ও প্রকৃতির বিশ্বজনীন কবি, সৈয়দা আইরিন জামান, প্রকাশনা - সমকাল, প্রকাশ (অনলাইন), ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১২:০০, পৃ. ১, সহায়ক লিঙ্ক - https://samakal.com/kaler-kheya/article/97280/

৩. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (সম্পাদনা), আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগের সূচনা থেকে ২০০০ খ্রী: পর্যন্ত), প্রকাশনা - প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করন, আগস্ট -২০১১, পৃ. ৪৩৮

৪. A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry, Radha Publishing House; Calcutta, Indian Edition-2008/Page No. 85

৫. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান (সংকলিত ও সম্পাদিত), কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ, অবসর প্রকাশনা; ঢাকা-১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫, পৃ. ১১২

৬. দাশ, জীবনানন্দ, রূপসী বাংলা, রচনাকাল মার্চ ১৯৩২, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৫৭, প্রকাশক - দিলীপ কুমার গুপ্ত, প্রকাশনা - সিগনেট প্রেস, কোলকাতা - ২০, পৃ. ১২

Bibliography:

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা, পঞ্চম পরিমার্জিত সংস্করন : শারদীয়া ১৪১৮ (অক্টোবর ২০১১), অমিতানন্দ দাশ, কোলকাতা

আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ/ অবসর প্রকাশনা; ঢাকা-১১০০/ তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫

জীবনানন্দ, দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খন্ড)/বেঙ্গল প্রা. লি. কলিকাতা-৭৩/পঞ্চম মুদ্রণ: ভাদ্র, ১৩৮৬

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগের সূচনা থেকে ২০০০ খ্রী: পর্যন্ত), সম্পাদনা-তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনা- প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯/চতুর্থ সংস্করন, আগস্ট – ২০১১

ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশক - দিলীপকুমার গুপ্ত,/ প্রকাশনা - সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিনরোড, কলকাতা -২০/, প্রকাশনার সময় - ফাল্গুন -১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

মহাপৃথিবী, জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশক নীলিমা দেবী, প্রকাশনা- সিগনেট প্রেস, ২৫/৪ একবালপুর, কোলকাতা-২৩, প্রথম প্রকাশ-১৩৫১

মহাপৃথিবী, জীবনানন্দ দাশ, সংগ্রহ ও সম্পাদনা-নাবিউল আফরোজ, প্রথম অন্তর্জালিক সংস্করণ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলাদেশ

জীবনানন্দ দাশ, রূপসী বাংলা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা - নাবিউল আফরোজ, প্রথম অন্তর্জালিক সংস্করণ, ৩১ মার্চ ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলাদেশ

জীবনানন্দ দাশ : প্রেম ও প্রকৃতির বিশ্বজনীন কবি, সৈয়দা আইরিন জামান, প্রকাশনা - সমকাল, প্রকাশ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি, অনলাইন পত্রিকা - দৈনিক জনকণ্ঠ, লেখা - আবু আফজাল সালেহ, প্রকাশনার সময়কাল - ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

জীবনানন্দ সমগ্র (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা - দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ-১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৭

জীবনানন্দের চেতনা জগৎ, প্রকাশক - শ্রী তপনকুমার ঘোষ, মুদ্রক-জয়দুর্গা প্রেস, ৫৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা - ৯, প্রথম মুদ্রণ - অগ্রাহন, ১৩৫৯

রূপসী বাংলা, জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশক-দিলীপকুমার গুপ্ত, প্রকাশনা-সিগনেট প্রেস, কলকাতা - ২০, প্রথম সংস্করন, আগস্ট ১৯৫৭

কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২৩, দশম সংস্করন, মাঘ, ১৪১৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলিকাতা, ১৯৯৩, প্রকাশক-গোপীমোহন সিংহরায়

রায়, সুশান্ত, জীবনানন্দ দাশ: কবিতায় প্রকৃতি ও মানবতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য একাডেমী, ২০০৫।

সাহা, প্রিয়ন্তী, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সিম্বলিজম ও প্রকৃতির ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১০

দাশ, জীবনানন্দ, বনলতা সেন, কবিতা সংগ্রহ, ১৯৪২

সাহা, প্রিয়ন্তী, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির আধ্যাত্মিক ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১০

সেন, অরুণ, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিসর্গ ও মানবিক সম্পর্ক, কলকাতা, সৃজন প্রকাশন, ২০১২

আবু আফজাল সালেহ, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি, প্রকাশিত-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বাংলাদেশ

সহায়ক ওয়েবলিওগ্রাফি :

www.dailyjanakantha.com

epaper.dailyjanakantha.com

pbba.wbicad.in, Paschimbanga Bangla Akademi (PBBA)

https://samakal.com/kaler এবং samakal.com

https://www.dailyjanakantha.com/literature/news/

https://www.jagonews24.com/m/literature/article/644324

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 423 - 434
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে বিবর্তনবাদ

মো: আবু বকর ছিদ্দিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : abubakarsiddiquecut@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
evolution, amoeba, human, Africa, Neolithic, modernism, poems, new stream.

Abstract
Jibanananda Das was a modern poet who followed western esthetics deeply. He used evolution theory of Darwin in many of his poems. But any critic doesn't explain him according to evolution theory. I have found him as an evolutionist poet in this article. My research is qualitative research and all information are collected by secondary sources. In his poems Jibanananda Das supported that mankind is the result of evolution. At first, life being produced in water of sea as bacteria then they increased themselves as amoeba. Poet feels that he was lived in the water of sea that time. In course of time amoeba toke visible body. Poet and his darling were stayed as two pearls in the belly of mother oyster. He saw the horse of Neolithic age in field of present earth. Thus he applied the evolution theory in his poems. It makes a new area in history of Bangla literature.

Discussion

জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় বিবর্তনবাদকে নন্দনতত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি স্যুরিয়ালিস্ট কবি। স্যুরিয়ালিজমের মাধ্যমে এ প্রয়োগ সম্ভব হয়। মানুষের উদ্ভবতত্ত্বের এ আধুনিক প্রত্যয় বাংলা সাহিত্যকে মধ্যযুগীয় কাল্পনিক সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্তি দেয়। প্রায় সকল মধ্যযুগীয় সাহিত্যেই সৃষ্টিতত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। বিশ্বসৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, শ্রষ্টা বন্দনা প্রভৃতি ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অংশ। আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এ ধারাকে একটু পরিশীলিত করে প্রলম্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন। নজরুল ইসলাম একক নামে ঈশ্বরকে সম্বাধন করেননি। তার ঈশ্বর সকল ধর্মে বিরাজমান। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছেন বিবর্তনবাদেকে। মানুষ সৃষ্টি হয়নি, প্রাণের বিবর্তন ধারায় মানুষ উন্নত শ্রেণির জীব; এটিই জীবনানন্দ দাশের অনুসৃত মানুষের উদ্ভবতত্ত্ব। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ সৃষ্টিতত্ত্বে নয় মানুষের উদ্ভবতত্ত্বে বিশ্বাসী। তার কাব্যসমগ্রে পর্যায়ক্রমে তার এ চিন্তা শৈল্পিক রূপ পেয়েছে।

জীবনান্দ দাশ ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী। বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা দিয়ে যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন ভাববাদীরা, অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সে ঈশ্বরকে খুঁজে পাননি। তিনি পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো-বাতাস, জল নিয়ে নিরীক্ষা করে এর মধ্য থেকে উত্তর পেতে আগ্রহী। তার মতে, "গভীরভাবে জেনেছি যে সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে/ তারি ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়ে রয়।" ('আজকে রাতে', বেলা অবেলা কালবেলা) তিনি নিজের মধ্যে একটি ক্ষমতাও অনুভব করেন। তা দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ফলাফল পেতে চান।

"আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি, — তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা!
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু— ব্যর্থ— চমৎকার!
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার—বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায়!"

('অনেক আকাশ', ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন কবর, ফসিল এ সবের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। কবি এসব থেকে মানুষের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করতে চান। তিনি বলেন, -

"মাটির নিচের থেকে তারা/ মৃতের মাথার স্বপ্নে ন'ড়ে ওঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা!"

('অবসরের গান', ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে কবি বিবর্তনবাদকে মানুষের উদ্ভবতত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং কবিতায় তার শৈল্পিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বিবর্তনবাদ তার সৃষ্টিকর্মে, তার নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে মধ্যযুগীয় ধারা থেকে মুক্তির পথ পেয়েছে বাংলা সাহিত্য।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রাণ, অ্যামিবা, ডাইনোসর, প্রস্তরযুগ প্রভৃতি শব্দ, চিত্রকল্প ও পরিবেশের ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে, জীবনানন্দ দাশ কি বিবর্তনবাদী? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে চলমান প্রবন্ধে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা হয়নিই বলা যায়। এ দিকটি আজও পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। জীবনানন্দ দাশের দর্শন নিয়ে স্বল্প পরিসরে যে আলোচনা হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য নয়। আহমদ ছফার প্রবন্ধ 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে' জীবনানন্দ দাশের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিষয়ক চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ। যতীন সরকার জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুদর্শন বিষয়ক একটি নিবন্ধ লিখেছেন 'জীবনের দর্শন, 'মৃত্যুর আগে' ও আস্তিক কবি জীবনানন্দ' শিরোনামে। সাবঅল্টার্ন তত্ত্ব দিয়ে জীবনানন্দ দাশকে ব্যাখ্যা করেছেন ক্লিন্ট বুথ সীলি 'জীবনানন্দের সাবঅল্টার্ন ইতিহাস' প্রবন্ধে। 'জীবনানন্দ : উত্তর—আধুনিকতার দিকে' প্রবন্ধে ফয়সাল শাহরিয়ার জীবনানন্দ দাশের প্রগতিশীল ভাবনার দিকে আলো ফেলেছেন। মাসুদ খানের 'জীবনানন্দ, তাঁর নিজস্ব প্রাচ্য' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশের প্রাচ্যদর্শন উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিবর্তবাদের আলোকে জীবনানন্দের বিচার আজো আড়ালে রয়ে গেছে। সুতরাং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বিবর্তনবাদের অন্বেষণ সম্পূর্ণ নতুন অনুসন্ধান।

এ অনুসন্ধানে আমি গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। আমার সকল উপাত্তই মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) থেকে সংগৃহীত। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য পৌঁছার চেষ্টা করা হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্রের একটি অনুদ্ঘাটিত দিকে আলো ফেলাই আমার উদ্দেশ্য। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদের সহজ উপলব্ধি ঘটবে। সৃষ্টিতত্ত্বের কাল্পনিক ব্যাখ্যা ও এ সংক্রান্ত কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। আমার মূলপাঠ (Text) *প্রকাশিত— অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ,* আবদুল মান্নান সৈয়দ কতৃর্ক সম্পাদিত। অবসার প্রকাশনা সংস্থা এটি ১৯৯৪ খ্রি. ঢাকা থেকে প্রকাশ করে।

১৮৫৯ খ্রি. চার্লস ডারউইনের প্রজাতির উদ্ভবতত্ত্ব *(Origin of Species)* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে পৃথিবীব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে। এত দিনের প্রতিষ্ঠিত কাল্পনিক মতবাদে চরম আঘাত হানে বইটি। এতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডারউইন মানুষের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। মানুষ বর্তমানে যে রূপে আছে অতীতে সেরূপে ছিল না। অর্থাৎ একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীব জগৎ এগিয়ে চলেছে। ডারউইনের মতে, -

> "পৃথিবীর জীবজন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, শুরুতে সে অবস্থায় ছিল না। এক আদিম সরল অবস্থা থেকে ক্রমিক বিবর্তন— প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা বর্তমানের অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থায় উপনীত হয়েছে।"[১]

এতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায় ভীষণ ক্ষ্যাপে যায়। ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ধর্মীয় মতবাদ প্রবল নাড়া খায়। কবি বলেন, -

> "বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে— ন'ড়ে চলে ধীরে।"

('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

বিবর্তনবাদের মতে সবকিছু প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কোন ঈশ্বর সচেতনভাবে মানুষকে তৈরি করেনি এবং মানুষকে নিয়ে তার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও নেই। মানুষ প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কবি বলেন, -

> "আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
> দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
> আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
> নিবিড় নিয়মাধীন।"

('আজকে রাতে', *বেলা অবেলা কালবেলা*)

ভারত, লন্ডন, রোম, নিউইয়র্কও হারিয়ে যাওয়া ম্যামথের মতই প্রকৃতির অধীনস্থ। ডারউইন বলেন, -

> "জগতে মানুষের কোনো বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান নেই, এবং জাগতিক ব্যাপারে বিধাতার হস্তক্ষেপেরও প্রশ্ন ওঠে না।"[২]

ডারউইনের পর বিবর্তনবাদ নিয়ে শত বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংযোজন-বিয়োজন, সংশোধন-পরিবর্ধন চলছে। বর্তমানের বিজ্ঞানীদের হাতে বিবর্তনবাদ একটি সরল কাঠামোয় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রাণের উৎপত্তির বিচারে সময়কে কয়েকটি মহাকালে ভাগ করা হয়। যথা –

১. হ্যাডিয়ান মহাকাল
২. আর্কিয়ান মহাকাল
৩. প্রোটেরোজোইক মহাকাল
৪. ফ্যানেরোজোইক মহাকাল

হ্যাডিয়ান মহাকালে (৪৬০-৪০০ কোটি বছর আগে) পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। আর্কিয়ান মহাকালের ইওআর্কিয়ান কালে (৪০০-৩৬০ কোটি বছর আগে) পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি ঘটে।[৩] এ সময় প্রাণ উদ্ভবের পরিবেশ ছিল পৃথিবীতে। গোটা পৃথিবীই ছিল একটি গর্ভাশয়ের মত।

> "পৃথিবীর উপরিভাগে তখন ছিল জল ও পাহাড় ও তাকে ঘিরে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন ও জলীয় বাষ্পের বায়বীয় আবরণ। তারই মধ্যে ঘটে যাচ্ছিল আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড অগ্ন্যুৎপাত ও বজ্রপাতের বিদ্যুৎচমক আর সূর্য থেকে অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ। এই অবস্থার মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণ শুরু হওয়ার আয়োজন চলছিল।"[৪]

কবির ভাষায় –

> "মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
> জন্ম নিয়েছিলো কবে;
> পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
> কুয়াশার যে ইঙ্গিত ছিলো—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> সেইসব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
> পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে আলো জল আকাশের টানে;
> কেন যেন কাকে ভালোবেসে।"
>
> ('যাত্রী', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

কবির মতে, প্রাণ উৎপন্ন হওয়ার আগে জন্মহীন, মৃত্যুহীন, চিহ্নহীন, কুয়াশাময় ছিল পৃথিবী। আলো, জল, আকাশের টানে, কাকে যেন ভালোবেসে ধীরে ধীরে প্রাণের উদ্ভব ঘটে। অমল দাস গুপ্ত বলেন, -

> "একদিকে রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড, অন্যদিকে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার মূল দুটি উপাদান- শর্করা ও ক্ষার। অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে জলের অণু বিয়োজিত হয় এবং সেটি হয়ে ওঠে প্রোটিন। শর্করা ও ক্ষার থেকে দুটি ধাপ পার হয়ে পাওয়া যায় নিউক্লিক অ্যাসিড-আর-এন-এ ও ডি-এন-এ। প্রথম ধাপে নিউক্লিয়োসাইড, তার সঙ্গে ফসফেট যুক্ত হবার পরে দ্বিতীয় ধাপে নিউক্লিয়োসাইড, তার থেকে জলে অণু বিয়োজিত হবার পরে তৃতীয় ধাপে আর-এন-এ ও ডি-এন-এ। পরিশেষে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড মিলে গিয়ে সৃষ্টি হয় প্রাণ।"[৫]

কবি বলেন, -

> "নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
> ফসল উঠিছে ফ'লে, — রসে রসে ভরিছে শিকড়;
> লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ!"
>
> ('জীবন', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

কবিতায় কবি অ্যাসিড, ডিএনএ, আরএনএ না বলে, বলেছেন, রসে রসে ভরেছে শিকড়। অন্ধকারে এসবের মিশ্রণ যেন বাসর ঘরের মত কবির কাছে; তাই নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহ।

প্রাণের সূচনালগ্ন, আর্কিয়ান মহাকাল মোট চারটি ধাপে বিভক্ত।

১. ইওআর্কিয়ান (৪০০—৩৬০ কোটি বছর পূর্বে)
২. প্যালিওআর্কিয়ান (৩৬০—৩২০ কোটি বছর পূর্বে)
৩. মেজোআর্কিয়ান (৩২০—২৮০ কোটি বছর পূর্বে)
৪. নিওআর্কিয়ান (২৮০—২৫০ কোটি বছর পূর্বে)

ইওআর্কিয়ান কালের ৪০ কোটি বছরে প্রাণের উদ্ভব। প্যালিওআর্কিয়ান কালে প্রাণে বিবর্তন দেখা দেয়। ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, স্ট্রোমোটোলাইট, বেগুনী ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি বিভাজন দেখা দেয় প্রাণে। সায়ানোব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষণের করে পৃথিবীতে অক্সিজেন উৎপন্ন করতে শুরু করে। প্যালিওআর্কিয়ান কালের বিবর্তনের ধারাবাহিকতা মেজোআর্কিয়ান কালেও চলতে তাকে। এ কালের প্রাণীরা ছিল অক্সিজেন বিরাগী।

> "নিওআর্কিয়ান কালে আজকের দিনের বড় মহাদেশগুলির জন্ম হয়। সায়ানোব্যাটেরিয়ারা বর্ধিত মাত্রায় অক্সিজেন উৎপাদন করতে থাকে।"[৬]

আর্কিয়ান মহাকালে ব্যাকটেরিয়া পর্যন্তই প্রাণের অগ্রগতি হয়। এরপর প্রোটেরোজোইক মহাকালে প্রাণের আরো উন্নতি ঘটে।

প্রোটোরেজোইক মহাকাল ২৫০-৫৪ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাণের অগ্রগতির নিরিখে একে তিনটি কালে ভাগ করা হয় -

১. প্যালিওপ্রোটেরোজোইক কাল
২. মেজোপ্রোটেরোজোইক কাল
৩. নিওপ্রোটেরোজোইক কাল

এ দীর্ঘ সময়ে প্রাণের বিবর্তন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। প্রারম্ভিক অক্সিজেন বিরাগী প্রাণ থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অক্সিজেনগ্রাহী প্রাণে রূপান্তর ঘটতে থাকে। প্রোটেরোজোইক মহাকালের শেষের দিকে নিওপ্রোটেরোজোইক কালে কোষকেন্দ্রহীন প্রাণ থেকে প্রধানত কোষকেন্দ্রযুক্ত প্রাণ, এককোষী থেকে বহুকোষী প্রাণ এবং জটিল থেকে জটিলতর প্রাণের উদ্ভব ঘটতে থাকে।[৭] ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাণ অ্যামিবায় রূপান্তরিত হয় এ প্রোটেরোজোইক মহাকালে। কবি বলেন,

> "পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
> সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
> গূর্ঢ়সাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্তুতিরা চিনে নেবে কারে।"
>
> ('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

আজ আর অ্যামিবারা নেই, কালের পরিহাসে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রাণের অগ্রগতিতে তারা জননীর মতই ভূমিকা রেখেছে। পৃথিবীকে তারা ধাত্রীবিদ্যা শিখিয়েছে প্রায় দুইশ কোটি বছর যাবৎ।

ফ্যানেরোজোইক মহাকালে প্রাণ অ্যামিবা থেকে দৃশ্যমান প্রাণীতে উন্নতি লাভ করে। এ ক্রমোন্নোতি অনুসারে মহাকালকে তিনটি কালে ভাগ করা হয়।

১. প্যালিওজোইক কাল
২. মেজোজোইক কাল
৩. সেনোজোইক কাল

প্যালিওজোইক কাল আবার ৬টি যুগে বিভক্ত।

১. ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ (৫৪-৪৮ কোটি বছর)
২. অর্ডোভিসিয়ান যুগ (৪৮-৪৪ কোটি বছর)
৩. সিলুরিয়ান যুগ (৪৪-৪১ কোটি বছর)
৪. ডেভোনিয়ান যুগ (৪১-৩৫ কোটি বছর)
৫. কার্বনিফেরাস যুগ (৩৫-২৯ কোটি বছর)
৬. পার্মিয়ান যুগ (২৯-২৫ কোটি বছর)

ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ প্রাণের ইতিহাসে একটি রোমান্টিক যুগ। এ যুগে প্রাণ দৃশ্যমান জীবে রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়। কবি বলেন, -

> "সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
> অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
> আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ, —
> সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!"
>
> ('জীবন', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

এ সময় প্রাণ ছিল কেবল জলে। স্থলভাগ ছিল শুষ্ক উষর মরুভূমি। সেখানে কোন প্রাণের ছোঁয়া ছিল না। জলে প্রাণের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। কবি সেকালে জীব রূপে সমুদ্রে বিদ্যমান ছিলেন। নিজের দেহে কবি আজও সেকালের জীবদেহের ঘ্রাণ অনুভব করেন। কবি সেকালে সমুদ্রে বাস করতেন এবং আজও যেন শরীরে সেকালের সমুদ্রের ফেনার গন্ধ লেগে আছে। প্রাণের বিবর্তনের ধারায় ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ একটি বিপ্লব। "ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে অতি সাধারণ প্রাণরূপ ছিল হরেক রকমের ট্রাইলোবাইট। ৫৩ কোটি বছর আগে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে, প্রথম শক্ত খোলসের প্রাণীদের দেখা যায়। সন্ধিপদ গোত্রের বর্তমানে বিলুপ্ত প্রাণী ট্রাইলোবাইট। আরো ছিল প্রথম 'ক্রাস্টাশিয়ান' অর্থাৎ সন্ধিপদ চিংড়ি কাঁকড়া উপগোত্র ও মোলাস্ক অর্থাৎ স্কুইড, অক্টোপাস থেকে শামুক, ঝিনুক পর্যন্ত জলজ প্রাণীরা।[৮] কবির উপলব্ধি –

> "একদিন এ জীবন সত্য ছিলো শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;
> কোনো নীল নতুন সাগরে
> ছিলাম— তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।”

(‘রাত্রি দিন’, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

সাগরে যখন প্রাণ শামুক, ঝিনুক হয়ে জন্মেছিল তখন কবি ও কবির প্রিয়া এক ঝিনুক মাতার ঘরে জোড়া মুক্তা হয়ে বিরাজিত ছিলেন।

অর্ডোভিসিয়ান যুগে স্থলভাগে প্রথম উদ্ভিদের অভিযোজন ঘটে। এগুলি ছিল কাণ্ড ছাড়া ছত্রাক ও শেওলা জাতীয়। সিলুরিয়ান যুগে বড় বড় বৃক্ষ সমস্ত স্থলভাগ ছেয়ে ফেলে। ডেভোনিয়ান যুগে বীজ সম্পন্ন উদ্ভিদ বা সত্যিকারের বৃক্ষের আবির্ভাব ঘটে। সারা পৃথিবী গভীর অরণ্যে ঢেকে যায়।

‘মনোসরণি’ কবিতায় কবি অতিসংক্ষেপে আধুনিক মানুষ থেকে ক্রমে নানা ধাপ বর্ণনা করে অ্যামিবা পর্যন্ত পৌঁছেছেন। সেখানে এক অংশে অরণ্য জীবনের কথা রয়েছে। কবি বলেন, -

“হয়তো বা—
ফলেছিলো সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে,
যে বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,
যে বনানী সুর পায়, —”

(‘মনোসরণি’, *সাতটি তারার তিমির*)

ডেভোনিয়ান যুগের এ অরণ্যময় পৃথিবীতে প্রথম স্থলভাগে প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। সার্কপ্টেরিজিয়ান মাছই হল প্রথম স্থলভাগে অভিযোজনকারী প্রাণী। জাহিদ মনজুর বলেন, -

“‘সর্কপ্টেরেজিয়ান’ গোত্রের মাংসল বিভক্ত পাখ্না যুক্ত পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট উপকূলীয় ফুসফুসধারী কোনো টেট্রাপড বা প্রাথমিক চতুষ্পদ প্রাণী বা অগ্রসর মাছ থেকে প্রথমে উভয়চর এবং পরে স্থলভাগের সমস্ত মেরুদণ্ডী চতুষ্পদ প্রাণীর বিবর্তন হয়েছে।”[৯]

স্থলভাগে প্রাণের আগমনকে কবি স্বাগতম জানিয়েছেন।

“যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীতরাতে, —মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন!
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকার গাহিতেছে গান! —
তুমি সেইখানে!
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে, —”

(‘সহজ’, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

গভীর অন্ধকার অরণ্যে প্রাণ অতিসন্তর্পণে, ভীরুপদে, বিবর্তনের ধীর পথ ধরে নিশীথের বাতাসের মত একদিন এসেছিল। সে থেকে স্থলভাগে জীবের সূচনা। কবি সেদিনের বন্দনায় মুখর।

ডেভোনিয়ান যুগে পোকামাকড়েরও ব্যাপক বিকাশ ঘটে। জাহিদ মনজুর বলেন, -

“ঐ উদ্ভিদ, মাটি আর পোকা মাকড় মিলে ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিকে স্থলভাগে স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর বসবাসের উপযুক্ত প্রাচুর্যময় পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।”[১০]

কার্বনিফেরাস যুগে বাতাসে অক্সিজেনের আধিক্যের দরুন পোকামাকড়ের আকার দানবাকৃতির হয়ে ওঠে। পার্মিয়ান যুগের ৯০ ভাগ প্রাণী ছিল আরশোলা জাতীয়। উড়ন্ত পতঙ্গের মধ্যে ছিল প্রায় ২ ফুট লম্বা ফড়িং। এ সময় গোবরে পোকা ও মাছির আবির্ভাব ঘটে। কবি বলেন, -

"সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,
মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাশার প্রগলভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে,
তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,"

('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

প্রাণের বিবর্তন ধারায় প্যালিওজোইকের পর মেজোজোইক কাল। এ কাল তিনটি যুগে বিভক্ত।

১. ট্রায়াসিক যুগ (২৫—২০ কোটি বছর)
২. জুরাসিক যুগ (২০—১৪ কোটি বছর)
৩. ক্রেটাশাস যুগ (১৪—৬.৬ কোটি বছর)

পার্মিয়ান যুগের ব্যাপক গণবিলুপ্তির পর ট্রায়াসিক যুগে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। প্রাণীজগতে এটি একটি বড় অগ্রগতি। জুরসিক যুগ ডাইনোসরের যুগ। এ যুগে ডাইনোসরেরা সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াতো। বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর ছিল তখনকার যুগের প্রধান প্রাণী : থেরোপডা (জন্তু পা, দ্বীপদ, মাংসাশী), সরোপডোমর্ফা (টিকটিকি পা ও শরীর, উদ্ভিদভোজী, ছোট মাথা, লম্বা গলা, লম্বা লেজ), অ্যাঙ্কাইলোসরিয়া (আঁশটে হাড়ের বর্মাবৃত, কারো বা মুগুরের মত লেজ), স্টেগোসরিয়া (কাঁটা ও আঁশের মত বর্মাবৃত), আর্নিথোপডা (দ্বীপদ ও চতুষ্পদ, অনেক দাঁত ও খুলির নমনীয়তার সাহায্যে চিবানোর একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে)। যাইহোক ডাইনোসরের আবির্ভাব প্রাণীজগতের এক রোমান্টিক অগ্রগতি। প্রাণীদের অনেক বৈশিষ্ট্য ডাইনোসরের দান। ক্রেটাশাস যুগের মৃত্যুর ঠিক আগে আগে ডাইনোসরদের মধ্যে ব্যাপক বিবর্তন ঘটে যা প্রাণীকে অনেক অগ্রগতি দেয়। এই সময়েই আমরা প্রথম বারের মত অনেক পতঙ্গ গোষ্ঠী; আধুনিক স্তন্যপায়ী গোত্র, পাখি এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবাশ্মের সাক্ষাৎ পাই।[১১]

এ যুগে পাখিদের অবির্ভাব ঘটে। জাহিদ মনজুর বলেন, -

"জুরাসিক যুগের আর এক উল্লেখযোগ্য বিবর্তন সংক্রান্ত ঘটনা হল সিলুরোসরিয়ান শাখার ম্যানিরেপ্টোরান গোত্রের ডাইনোসর থেকে সত্যিকার পাখিদের উদ্ভব হওয়া।"[১২]

অমল দাস গুপ্তের মন্তব্যও এ ব্যাপারে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, -

"পৃথিবীর প্রথম পাখিও এই জুরাসিক কালেই। উড়ন্ত সরীসৃপ নয়, পাখি। আমরা আগে বলেছি, সরীসৃপ থেকে পাখিরা এসেছে।"[১৩]

'মনোসরণি' কবিতায় প্রাণের ধারাবাহিকতায় পাখি জীবনের প্রতীক হয়ে এসেছে সারস দম্পতির চিত্রকল্প। কবির ভাষায়-

"তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে সারস—দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে—"

('মনোসরণি', *সাতটি তারার তিমির*)

ক্রেটাশাস যুগে ৬.৬ কোটি বছর আগে ডাইনোসরের বিলুপ্তি ঘটে। পৃথিবীর বাহির থেকে ১০-১৫ কি. মি. চওড়া একটি গ্রহাণু মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে এসে আছড়ে পড়ে। এতে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অংশে দাবানল সৃষ্টি হয়। গাছপালা পুড়ে গিয়ে ব্যাপক কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় যা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলে। প্রবল তাপ ও খাদ্যের অভাবে ডাইনোসরেরা মৃত্যুবরণ করে। দক্ষিণ আমেরিকার মরুভূমিতে, অস্ট্রেলিয়ায়, ভারতে, চীনে ডাইনোসরের বহু জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি সেই দিনের সে পরিস্থিতিকে নান্দনিক রূপ দিয়েছেন 'মরুবালু' কবিতায়। আজকের দিনে ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া যায় বিভিন্ন মরুভূমিতে। তাদের সদর্প বিচরণ ও বিপর্যয় দুয়ের সম্মিলন ঘটেছে 'মরুবালু' কবিতার একটি চিত্রকল্পে।

"তোদের সনে 'ডাইনোসুরে'র লড়াই হলো কত, —
আলুথালু লুটিয়ে বালুর ডাইনী ছায়ার তলে

আজকে তারা ঘুমিয়ে আছে, — চুল্লি শত শত
উঠলো জ্বলে তাদের হাড়ে, তাদের নাড়ের বলে;
কাঁদছে খাঁ খাঁ কাফন — ঢাকা বালুর চাকার নিচে
মণ্ডু তাদের, — মড়ার কপাল ভৈরবেরি গলে!"

('মরুবালু', *ঝরা পালক*)

ক্রেটাশাস গণবিলুপ্তির পর সেনোজোইক কালের প্যালিওজিন যুগে প্রাণ আবার নতুন করে জেগে ওঠে। বিজ্ঞানীরা বলেন, -

"পাখি আর স্তন্যপায়ীর মত প্রাণীরা উদ্ভিদ নির্ভর খাদ্যচক্র ধ্বংস হওয়া সত্বেও বেঁচে গিয়েছিল কারণ তারা পঁচাগলা খেতে পারতো!"[১৪]

মানুষের ইতিহাসের সূচনা হয় এ কালে। এ সময়কে সেনোজোইক বা নতুন প্রাণের কাল বলা হয়। সেনোজোইক কাল তিনটি যুগে বিভক্ত।

১. প্যালিওজিন যুগ
২. নিওজিন যুগ
৩. কুয়ার্টানারি যুগ

প্যালিওজিন যুগকে আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়।

১. প্যালিওসিন পর্ব (৬.৬-৫.৬ কোটি বছর)
২. ইওসিন পর্ব (৫.৬-৩.৩৯ কোটি বছর)
৩. অলিগোসিন পর্ব (৩.৩৯-৩.৩০ কোটি বছর)

প্যালিওসিন পর্বে প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাইমেট এর আবির্ভাব ঘটে। এরা এপ, বানর, মানুষের পূর্বপুরুষ। এরা স্তন্যপায়ী ছিল। যদিও প্রথম স্তন্যপায়ী নয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রথম আবির্ভাব হয় ট্রায়াসিক যুগে ২৫-২০ কোটি বছর আগে। এ পর্বে এসে এরা প্রাইমেটে উন্নীত হয়। জাহিদ মনজুর বলেন, -

"কাঠবিড়ালীর মত ২.১ কেজি ওজনের প্লেসিয়াড্যাপিস ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র 'প্রাইমেট' যাদের থেকে শেষ পর্যন্ত হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছে।"[১৫]

ইওসিন পর্বে প্রাইমেটের আরেকটু উন্নতি ঘটে। এদের নাম ইওসিমিয়া।

"ইওসিমিয়া ছিল মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ প্রারম্ভিক প্রাইমেট।"[১৬]

অলিগোসিন পর্বে এসে ইওসিমিয়া মানুষের আকার ধারণ করতে থাকে।

"আড়াই কোটি বছর আগে অলিগোসীন পর্বে বনমানুষ-মানুষ ধারার বিবর্তন শুরু হয়। এরা ছিল হোমিনয়েড প্রাইমেট। হোমিনয়েড প্রাইমেটদের থেকে মানুষের পূর্বপুরুষ এবং বৃহৎ-বনমানুষের ধারা যথা: শিম্পাঞ্জী, গরিলা আর ওরাংওটাং, এবং ক্ষুদ্র-বনমানুষের ধারা যথা: গিবন ও সিয়াম্যাং ইত্যদির উদ্ভব হয়।"[১৭]

অমল দাস গুপ্ত বলেন, -

"উচ্চতর প্রাইমেটদেও মধ্যে আছে তিনটি বড়ো দল : নতুন জগতের বানর, পুরনো জগতের বানর ও হমিনয়েড (এপ্ ও মানুষ)।"[১৮]

একটি দুর্বল অবস্থা থেকে তারা ধীরে ধীরে হোমিনিয়েড অর্থাৎ বন মানুষের পর্যায়ে এসে পৌঁছে। মানুষের এ প্রারম্ভিক পর্ব সম্পর্কে কবির অভিমত -

"গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভিতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়, —
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,

কী ক'রে এ প্রকৃতিতে— পৃথিবীতে, আহা
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব— অনুভব করেছি সকলি।"

('অন্ধকার থেকে', *বেলা অবেলা কালবেলা*)

প্রাইমেট থেকে মানুষের বিবর্তনকে কবি মানুষের ছায়াচ্ছন্ন অসহায় অবস্থা হিসেবে দেখেছেন। কারণ প্রকৃতির কোলে মানুষ তখন ছিল খুবই অসহায়। এ নতুন প্রাণের নিওজিন যুগ দুটি পর্বে বিভক্ত।

১. মায়োসিন (২ কোটি ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার - ৫৩ লক্ষ ৩৩ হাজার বছর)

২. প্লায়োসিন (৫৩ লক্ষ ৩৩ হাজার - ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বছর)

মায়োসিন পর্বে মানুষের বিকাশ চোখে পড়ার মত। "মায়োসীন পর্বে আফ্রিকায় আর ইউরেশিয়ায় হরেক রকম হোমিনিড প্রজাতির বসবাস ছিল।"[১৯] প্লায়োসিন পর্বে মানুষ আরো উন্নত হয়। "প্লায়োসীন পর্বে মানুষের পূর্বপুরুষসহ সব হোমিনিডরা আফ্রিকায় গিয়ে জড়ো হয়।"[২০]

কবি তখনকার মানুষের এ অবস্থায় বেশ প্রফুল্ল। তার ভাষায় -

"—শিশু মানব গড়েছিল ঐ সাহারায় বাসা;
—সে সব গেছে কবে ঘুমের চুমার ধোঁয়ায় ধূমি!
অটল আকাশ যাচ্ছে জরির ফিতার মতো ফেঁড়ে,
জবান তোদের জলছে যমের চিতার গেলাস চুমি!"

('মরুবালু', *ঝরা পালক*)

মানুষের উদ্ভবের এ তত্ত্ব প্রচলিত ধর্মমতের তত্ত্বকে জরির ফিতার মতই ছিঁড়ে ফেলেছে। মরুভূমিতে মানুষের ফসিল যেন জবান খুলে কথা বলতে পারছে, যে তারা এক সময় পৃথিবীতে ছিল।

সর্বশেষ কোয়ার্টানারি যুগ দুটি পর্বে বিভক্ত।

১. প্লিস্টোসিন (২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার - ১১ হাজার ৭ শত বছর)

২. হলোসিন (১১ হাজার ৭ শত-বর্তমান)

"প্লিস্টোসিন পর্বেই হোমিনিড পূর্বপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছিল।"[২১]

হোমা স্যাপিয়েন্স রূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে তাদের বেশ কয়েকেটি প্রজাতি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশে মানব প্রজাতির মেলা বসেছিল। কবিও বার বার মানুষের উদ্ভবের কৃতিত্ব আফ্রিকাকেই দিতে চেয়েছেন। আফ্রিকা মহাদেশেই মানুষ কোটি কোটি বছরে বিবর্তিত হয় এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিবর্তনের একটি রূপরেখা নিম্নরূপ -

প্যারাপিথেকাস : "মিসরের ফায়ুম মরু এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর আগেকার একটি প্রাণীর নিচের চোয়ালের হাড় ও দাঁতের ফসিল (পাথরে পরিণত অবস্থা) পাওয়া গেছে। ...এদের প্যারাপিথেকাস নাম দেয়া হয়েছে।"[২২]

অমল দাস গুপ্ত বলেন, - "অলিগোসিন সময়ে (প্রায় চার কোটি বছর আগে) পুরনো জগতে প্রাইমেটের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে মিশর থেকে। মিশেও তখন ট্রপিক্যাল আবহাওয়া, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ঘন অরণ্য।"[২৩]

প্রোপ্লায়োপিথেকাস : "এরা মিসরের ফায়ুম এলাাকাতেই চার থেকে সাড়ে তিন কোটি বছর আগে বাস করতো।"[২৪]

প্লায়োপিথেকাস : আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতেই এদের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রোকন্সাল : প্রায় দুই কোটি বছর আগে প্রোকন্সালরা পৃথিবীতে বাস করতো। "১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার কেনিয়া থেকে প্রোকন্সালের ফসিল প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল।"[২৫]

রামাপিথেকাস : রামাপিথেকাসদের ফসিল প্রথম হিমালয়ের শিবালিক পাহাড়ে পাওয়া যায়। "১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় ফোর্ট টের্নানে আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের নিচ থেকে যে রামাপিথেকাসের ফসিল পাওয়া গেছে তার বয়স ১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোটি ৪০ লাখ বছর।”[২৬]

জিনজানথ্রপাস : “আফ্রিকার টাঙ্গানিকার ওলদোভাই গিরিখাদ থেকে লুই লিকি ও মেরি লিকি **১৯৫৯** খ্রিস্টাব্দের **১৭** জুলাই প্রথম জিনজানথ্রপাসের ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন।”[২৭] অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস : অস্ট্রালোপিথেকাসের সাথে মানুষের চেহারার মিল খুবই কাছাকাছি পর্যায়ের। এরা ৪০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বাস করতো। “প্রথমবারের মতো অস্ট্রালোপিথেকাসের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছিল দক্ষিণআফ্রিকা থেকে।”[২৮] অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাসটাস, অস্ট্রালোপিথেকাস বয়জাই আফ্রিকাতেই আবিষ্কৃত হয়। ২০ লক্ষ থেকে **১৫** লক্ষ বছর আগের সময়ের মধ্যে দেখা দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এরা।[২৯] ডোনাল্ড জোহানসন এর মতে, অস্ট্রালোপিথেকাস হোমো হাবিলিসের পূর্বপুরুষ। হোমো হাবিলিস থেকে হোমো ইরেক্টাস এবং হোমো ইরেক্টাস থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স এর উৎপত্তি।[৩০]

হোমো হাবিলিস : এরা প্রস্তর যুগের মানুষ। “**১৯৬০** সালের ওলদোভাই (আফ্রিকা) এলাকা থেকে প্রথম এদের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছিল।”[৩১] এরা বুদ্ধিমান ছিল। অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে এরা মানুষের অনেকটা নিকটতর। বিজ্ঞানী লুই লিকি বলেন, “রামাপিথেকাস আর আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণীটিই হলো হোমো হাবিলিস।”[৩২]

হোমো ইরেক্টাস : এরা খাড়া মানুষ। সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখে। সারা পৃথিবীতে এদের বিচরণ থাকলেও “আদিতে এরা আফ্রিকার বাসিন্দা ছিল।”[৩৩] এরা জাভা মানব হিসেবেও পরিচিত। **১৭** লক্ষ বছর আগে এরা পৃথিবীতে বর্তমান ছিল।[৩৪]

নিয়ন্ডারথাল মানব : এরা আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স এর বেশ কাছাকাছি। “আফ্রিকা ইউরোপ ও এশিয়া থেকে নিয়ন্ডারথালের বহু ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে।”[৩৫] এরা পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ। পাথরের ছুরি, রেঁদা, বাটালি প্রভৃতির ব্যবহার এদের আয়ত্ত্বে ছিল।

উপযুক্ত আলোচনায় দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশেই মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের বিবর্তন ধারার একটি প্রতিষ্ঠান হল আফ্রিকা মহাদেশ। কবি সেজন্য মানুষের উৎপত্তির সকল যশ আফ্রিকাকে দিয়েছেন।

> “অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানব প্রাণ,
> গড়িয়া উঠিল কাফ্রির মতো সূর্যসাগরতীরে
> কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাশবুননিটি ঘিরে।”
>
> (‘সুর্যসাগর তীরে’, *মহাপৃথিবী*)

কবির মতে, কাল চামড়ার আফ্রিকাবাসীই অ্যামিবা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ রূপ লাভ করে। তাই বিবর্তনের ইতিহাসে আফ্রিকা হল মানুষের আঁতুড় ঘর। কবি আফ্রিকার নারীদেরকে কৃষ্ণ জননী বলে সম্বোধন করেছেন।

> “সূর্য সাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ম ইতিহাসে
> কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ’ল রক্তে— উপেক্ষায়;
> বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজো আসে।”
>
> (‘মনোসরণি’, *সাতটি তারার তিমির*)

বন্যদশা মানুষের জীবনের প্রাথমিক দিক। এ সময় মানুষ কুড়িয়ে খেত। পরে তারা শিকার করতে শিখে। এক সময় পাথরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তখনকার সময়কে ঐতিহাসিকেরা প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করেন। প্রস্তর যুগ তিনটি ভাগে বিভক্ত।

১. পুরাপ্রস্তর যুগ
২. মধ্যপ্রস্তর যুগ
৩. নব্যপ্রস্তর যুগ

কবি প্রস্তর যুগের ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পান পৃথিবীর মাঠে। মহীনের ঘোড়াগুলোর সাথে যেন তারাও ঘাস খায়।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
... ...
প্যারাফিন— লণ্ঠন নিভে গেলে গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ— স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।"

('ঘোড়া', *সাতটি তারার তিমির*)

মানব সমাজের বিবর্তন ধারায় মানুষ এক সময় সভ্য সমাজ গড়ে তোলে। পাথরের পর আসে ধাতব যুগ। উদ্ভব হয় নগর, রাষ্ট্র। ক্রমে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এসে মানুষকে পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রদান করে।

নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে মানুষ আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। জীবনান্দ দাশ একজন বিবর্তনবাদী চিন্তাবিদ। মানুষের উদ্ভবের পিছনে কোন ঈশ্বরের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও হস্তক্ষেপ নেই। প্রাণের বিবর্তন ধারায় মানুষ উৎকৃষ্ট প্রাণী। জীবনানন্দ দাশ তার কাব্যসমগ্রে প্রাণের উদ্ভবের শুরু থেকে ধাপে ধাপে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত আলোকপাত করেছেন। সমুদ্রের জলে ব্যাকটেরিয়া রূপে প্রাণের উদ্ভব। পরের স্তরে অ্যামিবা রূপে উন্নতি লাভ করে। এরপর ক্রমান্বয়ে জীবের আকৃতি ধারণ, উদ্ভিদ জীবন, পতঙ্গ, পাখি, পশুজীবন তারপর ছায়চ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব জীবনের ঊষাকাল, আফ্রিকায় কৃষ্ণ জননীর কোলে মানুষ হিসেবে জন্ম নেয় প্রাণ। মানব জীবনে বন্যযুগ, প্রস্তরযুগ পার করে সমাজবদ্ধ সভ্য জীবনে প্রবেশ পর্যন্ত তার নানা কবিতায়, স্তবকে, বাক্যে কখনো বড় আকারে, কখনো শুধু ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতি অসংখ্য অলংকারের গাঁথুনিতে বিবর্তনবাদ সরস সুষমা পেয়েছে। বিবর্তনবাদকে তিনি নন্দনতত্ত্বের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্বে এ স্থানে ছিল সৃষ্টিতত্ত্ব। বাংলা সাহিত্যে এ ধারাটিকে বিজ্ঞানের অধিকারে আনেন জীবনানন্দ দাশ। সৃষ্টিতত্ত্বকে উদ্ভবতত্ত্বে রূপান্তর করে জীবনানন্দ দাশ সাহিত্যকে মধ্যযুগীয় কুসংসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে উদ্ধার করেছেন।

Reference:

১. ইসলাম, ড. আমিনুল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২১০
২. তদেব, পৃ. ২১২
৩. মনজুর, ডা. জাহিদ, *প্রকৃতি ও মানুষের ক্রমবিকাশ,* রোদেলা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৫৮
৪. দাসগুপ্ত, অমল, *প্রাণের ইতিবৃত্ত,* হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩২
৫. তদেব, পৃ. ৩৫
৬. মনজুর, ডা. জাহিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০
৭. তদেব, পৃ. ১৭২
৮. তদেব, পৃ. ১৯৪
৯. তদেব, পৃ. ২০৩
১০. তদেব, পৃ. ২০৪
১১. তদেব, পৃ. ২৪২
১২. তদেব, পৃ. ২২৮
১৩. দাসগুপ্ত, অমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
১৪. মনজুর, ডা. জাহিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬
১৫. তদেব, পৃ. ২৫৫
১৬. তদেব, পৃ. ২৫৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 423 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. তদেব, পৃ. ২৬১
১৮. দাসগুপ্ত, অমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
১৯. মনজুর, ডা. জাহিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬
২০. তদেব, পৃ. ২৬৬
২১. তদেব, পৃ. ২৭৪
২২. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, *যেমন করে মানুষ এলো,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭৮
২৩. দাসগুপ্ত, অমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
২৪. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
২৫. তদেব, পৃ. ৮০
২৬. তদেব, পৃ. ৮১
২৭. তদেব, পৃ. ৮২
২৮. তদেব, পৃ. ৮২
২৯. ইব্রাহীম, মুহাম্মদ, *আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৯
৩০. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
৩১. তদেব, পৃ. ৮০
৩২. তদেব, পৃ. ৮৮
৩৩. তদেব, পৃ. ৮৯
৩৪. ইব্রাহীম, মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৩৫. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 441
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 435 - 441
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নিরঞ্জনের উষ্মা : পাঠে-পাঠান্তরে

ড. শোহিনি ভট্টাচার্য
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : sohiniwbes@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ramai Pandit, Shunyapurana, Mangalkavya, Niranjaner Ushma, Dharmathakur, Jalali Kalima, Saddharmi, Islam, Brahmin, Bengal's society.

Abstract

Niranjaner Rushma (or Ushma) by Ramai Pandit is an integral part of Shunyapurana. The mythological, historical and social significance of this particular section stands as a cornerstone in the pre-modern Bengali Mangalkavya literature. There is no concrete etymology for the word 'Rushma'. It can happen that while reading or listening, there were some errors in comprehending; Or else there is a possibility that, this new term was strategically coined to imply the fiery wrath of Dharmaraj! In essence, Niranjaner Ushma is a fragment of the 'Jalali Kalima', vividly depicting the Turkic conquest of Jajpur in Odisha. Here, the story unfolds the torture of rapacious Brahmins for honorarium and the exploitation of the common folks which are beyond words. Into this turmoil, Dharmathakur emerged in the disguise of a Yavana who strategically put them in their places and hence justice prevailed.

Many celebrated historians of literature had framed the context of this piece as an era of conflict between Hindu-Buddhist ideologies. And so, in the fading twilight of Buddhism, we witnessed that Brahmanical culture rose to ultimate dominance and tyranny and as an expected outcome, persecuted Buddhists (Saddharmi) dived into the open arms of Islam. This chapter, stained with both power and pain, lingers in the annals of literature as a silent witness. Literature remembers this not as history, but as confession.

Perhaps scholars like Haraprasad Shastri, Nagendranath Basu or Dineshchandra Sen would delve into the political history of 10th–12th century of Bengal and dig up evidence—tracing the rise of royal dynasties (the Sens, Varmans, Chandras, Devas or Khargas). These kingswere devoted patrons of Brahminical culture. So, regionally the rise of the Brahmin community as the economic and religious superiors in Bengal's society was the real driving force behind this phenomenon.

Not only West Bengal, esteemed historian of the East Bengal, Ahmed Sharif has also declared 'Bada Jalali & Chhota Jalali' Kalima as a burning evidence of the seething rage and bitter defiance of an near-extinct Buddhist community against the expanding, oppressive Brahminical order. According to the author of "Bangla Sahitya Kosh", Mr. Wakil Ahmed also interpreted that 'Niranjaner Rushma' is nothing but a literary historic instance of the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 441
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

desperate surrender of the oppressed Buddhists who are trying their best to escape from the pathetic tyranny of Brahmins. In his words, this persecuted community maintained a safe distance and enjoyed the conquest of Turks and the shameful downfall of the Brahmins. As a token of gratitude towards Muslims, they worshipped Niranjan dharma infused with Islamic monotheism. In 'Niranjaner Rushma' there is a subtle hint of socio-religious shift where the oppressed Buddhists started to get converted in Islam in a large number.

On the other contrary, historian of Bengali Language, Dr. Sukumar Sen will emphasis that 'Jalali Kalima' is nothing but a reminiscence of the rapid raid of Delhi Emperor Badshah Firoz-Shah-Tughlak in Bengal and Odisha during the 14th centuries.

Moreover, entirely refuting the imagined periodization of Hindu-Buddhist conflicts, Shashibhushan Dasgupta would shift the focus and add: The residues of Buddhism, the framework of Hindu popular thought, certain indigenous non-Aryan ritual practices, and the ethos of Islamic ideology formed into an entirely new tapestry of folk 'Dharma'.

But we'd argue that interpreting this from such scattered, fragmentary angles misses the bigger picture. Take the Ramai Pandit's scripture on Dharma worship rituals (Vishwabharati MS No. 129)—when we piece together the stories before and after 'Niranjaner Ushma,' a fascinating narrative unfolds. Here, the Dharma worshippers' belief system describes the cosmic creation process of Dharma-Raja himself, where diverse human races emerge—and right there eventually, the almighty Niranjan (in his form as Khoda) was creating the Muslim community.

Dharmapandit Ramai had replaced Hindu deities like Karticka, Ganesha, Brahma, Vishnu, Maheshwara, Chandi Mata, Manasa etc with Kaji, Gaji, Khoda, Pekambar, Baba Adam, Fakir, Nurbibi etc. This is nothing but Hindu mythological pattern. A hallmark of Hindu mythic tradition is its syncretic impulse—assimilating disparate beliefs by refracting them through the prism of its own deities. In the ecumenical vision of devout seekers, Gods and Goddesses of all faiths converge under one roof; where Khoda, Ishwar, and Dharmathakur had unified into one entity and created this cosmos. In the alchemy of converging divinities, 'Niranjaner Ushma' kindles into scripture where all faiths dissolved into a single syllable.

Discussion

রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' (উষ্মা) - যে কাব্যাংশের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রাগাধুনিক বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার একটি বহুচর্চিত বিষয়। 'রুষ্মা' শব্দটির কোনও তৎসম ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না, শব্দটির পাঠে বা শ্রবণে কিছু প্রমাদ থেকে গেছে; হয়তো ধর্মরাজের উষ্মা-জনিত রোষ কল্পনা করেই এই নতুন শব্দটির জন্ম! প্রকৃতপক্ষে, 'নিরঞ্জনের উষ্মা' হল 'জালালি কলিমা'-র অংশবিশেষ, তুর্কি-কর্তৃক উড়িষ্যার জাজপুর-বিজয়ের ছবি এতে বর্ণিত। জাজপুরবাসী বেদ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের দল অতিরিক্ত দক্ষিণার দাবীতে সাধারণ প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলে সেখানে যবন-রূপী ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব ও কৌশলে তাদের ধর্মান্তরিত করে শায়েস্তা করার কাহিনি হলো 'নিরঞ্জনের উষ্মা'।

সাহিত্যের প্রথিতযশা ইতিহাসকারেরা অনেকেই হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বান্দ্বিকতার যুগ হিসেবে এর প্রেক্ষাপটকে বিচার করেছেন। ফলত, বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার যুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তি এবং অত্যাচারিত সদ্ধর্মীদের মুসলিমপ্রীতির স্মারক হিসেবেই সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় এর অবস্থান আমরা লক্ষ করেছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বা পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন এর কারণ হিসেবে খ্রিষ্টীয় ১০ম-১২দশ শতকের

রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করে হয়তো প্রমাণ করবেন তৎকালীন বাংলার নানান প্রান্তে এমন কিছু রাজবংশের (সেন, বর্মণ, চন্দ্র, দেব বা খড়্গ) আগমনের ইতিবৃত্ত, যাঁরা ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ আঞ্চলিকভাবে বাংলার সমাজে অর্থ ও ধর্মানুশাসক পুরোহিত হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানই মূলত এর জন্য দায়ী।

প্রসঙ্গত যেকথা না বললেই নয় - ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’-এর প্রথম সংস্করণকালে চর্যাপদ আবিষ্কৃত না হলেও, শাস্ত্রীমশাইয়ের চর্যা আবিষ্কার-প্রকাশ এমনকি তা নিয়ে তুমুল সাহিত্যিক বিতর্ক ঘটে যাওয়ার পরেও আচার্য সেন তাঁর জীবৎকালে এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে চর্যাপদকে স্বীকৃতি দেন নি; ‘হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ’ অধ্যায়ে চর্যা-বিষয়ে আদ্যন্ত থেকেছেন নিশ্চুপ! ৮০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের প্রেক্ষিতে ক্রমানুসারে শূন্য-পুরাণ, মানিকচাঁদের গান, নাথগীতিকা, কথাসাহিত্য এবং ডাক ও খনার বচনের আলোচনাক্রমে তিনি দেখিয়েছেন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রসঙ্গটি। যাই হোক, এই অধ্যায়েই আচার্য সেনের আলোচনায় ‘নিরঞ্জনের রুস্মা’ শব্দবন্ধের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই; এ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মত -

> “শূন্য-পুরাণে একান্নটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী। ...‘নিরঞ্জনের রুস্মা’ শীর্ষক অধ্যায়টি পরবর্তী যোজনা। ... কোন ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।”[১]

শুধু এপার বাংলা নয়, পূর্ববঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ মহাশয়ও তাঁর গ্রন্থে ‘বড় জালালী ও ছোট জালালী’ কলিমাকে প্রসারমান প্রবল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি নিপীড়িত বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘৃণা-ক্ষোভ ও তীব্র বিদ্বেষের নজির হিসেবে বিবেচনা করেছেন -

> “বিপন্নঅস্তিত্ব বৌদ্ধেরা তাই তুর্কীবিজয়কে ধর্মের তথা তথাগতের আশীর্বাদরূপে জেনে হিন্দুর পরাজয়ে ও দুর্দশায় উল্লাস বোধ করে এবং পরোক্ষে প্রতিশোধবাঞ্ছা চরিতার্থ করে।”[২]

‘বাংলা সাহিত্য-কোষ’ - প্রণেতা শ্রদ্ধেয় ওয়াকিল আহমেদ-এর দৃষ্টিভঙ্গিতেও ‘নিরঞ্জনের রুস্মা’ হল অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসকদের ছত্রছায়ায় বৌদ্ধ সদ্ধর্মীদের আশ্রয় নেওয়ার ঐতিহাসিক দলিল। সেন আমলের এই নির্যাতিত নিপীড়িত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তুর্কির বিজয় ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির পরাজয় দেখে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অক্ষম প্রতিহিংসাপরায়ণের মতো নিশ্চিন্ত ও উল্লসিত হয়েছিল; মুসলিম-প্রীতিবশতই আরাধ্য দেবতা বর্ণহীন নিরঞ্জন-ধর্মকে তারা ইসলামের আলোয় একেশ্বরবাদের আদর্শে পুজো করেছে। পরবর্তীকালে দলিত ও অবহেলিত এই বৌদ্ধরাই অধিকহারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, সমাজ পরিবর্তনের সেই ইঙ্গিতটি আমরা ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’য় দেখতে পাই। হিন্দুদের পৌরাণিক চরিত্রের বিপরীতে মুসলমান পৌরাণিক-ঐতিহাসিক যেসমস্ত চরিত্রকে প্রতিস্থাপিত করেছেন রামাই, সাহিত্য-কোষকার তা সযত্নে তুলে এনে দেখিয়েছেন[৩] -

হিন্দু দেবদেবী	মুসলিম চরিত্র
ধর্ম	খোদা (<খুদা, ফা.)
ব্রহ্মা	মহামদ (হজরত মহম্মদ স.)
বিষ্ণু	পেকাম্বর (<পয়গম্বর, আ.)
শূলপাণি(শিব)	আদম (আদি পিতা)
গণেশ	কাজী (বিচারক)
কার্তিক	গাজী (মুসলিম ধর্মযোদ্ধা)
মুনি (সাধক ঋষি)	ফকির (ধার্মিক পুরুষ)
নারদ (শিবের অনুচর)	শেক (<শায়খ, আ.; শাস্ত্রজ্ঞানী)

পুরন্দর(ইন্দ্র)	মলনা (<মওলানা, আ.)
চণ্ডিকা	হায়াবিবি (আদি মাতা)
পদ্মা(মনসা)	বিবি নূর (কাল্পনিক মুসলিম নারী)

অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেন নিশ্চিতভাবে বলবেন যে ১৪দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ্ তুঘলক বাংলা ও উড়িষ্যায় যে বিদ্যুৎগতি অভিযান চালিয়েছিলেন, তারই স্মৃতি এই 'জালালি কলিমা'; ধর্মপূজার বিধিবিধান সম্পর্কে তাঁর মতামত অবশ্য কিছুটা অন্যরকম -

> "শিক্ষিত-সমাজে ধর্ম-ঠাকুরের পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুমান এখন আর সমর্থন করা যায় না। ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সর্ব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর নেওয়া হইয়াছে।"[৪]

আর হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বান্দ্বিকতার যুগবিভাজন-কল্পনাকে সম্পূর্ণ অসার প্রমাণ করে আরও কিছুটা সরে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলবেন - বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ, হিন্দু লৌকিক চিন্তাধারা, স্থানীয় অনার্য কিছু অনুষ্ঠানরীতি ও ঐসলামিক বিশ্বাসের সমন্বয়েই লৌকিক 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের জন্ম। এই ধর্ম-উপাসকদের প্রধান আরাধ্য এক এবং অদ্বিতীয় শ্রীধর্মরাজ -

> "আসলে সেটা বৌদ্ধধর্মও নয়, প্রচ্ছন্ন হিন্দুধর্মও নয়- সেটি বাঙলা সমাজের শোষণশক্তির ফলে রূপান্তরিত একটি মিশ্র-রঙ এবং মিশ্র-প্রকৃতির নূতন ধর্ম। জনগণের টানা-হেঁচড়ায় পড়ে বুদ্ধদেব কখনও শিবঠাকুরের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছেন- কখনও পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে গলাগলি করে একেবারে একদেহ-একাত্মা হয়ে উঠতে চেয়েছেন; আবার কখনও সেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবঠাকুর একসঙ্গে মিশে গেছেন।"[৫]

কিন্তু আমরা বলতে চাই এরূপ বিবিধ আঙ্গিক থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ হল বিচ্ছিন্ন, আংশিক। কারণ ধর্মপূজার বিধিবিধান-সংক্রান্ত রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত পুথিটি (বিশ্বভারতী. ১২৯ নম্বর) সম্পাদনা-সূত্রে 'নিরঞ্জনের উষ্মা'র পূর্বে ও পরে এমন কিছু গল্প আমরা পাচ্ছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে ধর্ম পূজকদের বিশ্বাস মতে বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সামগ্রিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গেই নানান মনুষ্যজাতির জন্ম হয়েছে; সেই সৃজন ক্রিয়াতেই কালচক্রে মুসলমান জাতির জন্ম দিচ্ছেন পরমেশ্বর নিরঞ্জন তথা খোদারূপী ধর্মরাজ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজের এই বিশেষ অংশ তথা ধর্ম সাধকদের চিন্তাভাবনা এইবিষয়ে ইসলামিক-দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। হিন্দু সমাজের এই একাংশের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এইরকম যে, ধর্ম পূজকদের আরাধ্য দেবতাই আসলে অন্যরূপে মুসলমানদের খোদা; সুতরাং অন্যান্য সমস্ত মনুষ্যজাতির মতো মুসলমানরাও শ্রীধর্মরাজের সৃষ্টিপত্তনের ফলে জন্ম নেওয়া এক জাতিবিশেষ। ধর্মপণ্ডিত রামাই এই অংশে যে কাজী, গাজী, খোদা, পেকাম্বর, বাবা আদম, ফকির বা নূরবিবির মতো পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক চরিত্রদের প্রতিস্থাপিত করছেন কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা চণ্ডী-মনসার মতো হিন্দু দেবদেবীদের স্থানে- তা আদতে হিন্দু পৌরাণিক প্যাটার্ন। নিজ ধর্মের দেবদেবীর আদলে এইসব ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন টুকরো ধর্মবিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা হিন্দুপুরাণ-কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্ম সাধকদের এই ঐকতানিক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল ধর্মের দেবদেবীরা এসে পড়েছেন এক ছত্রছায়ায়; আরাধ্য খোদা, ঈশ্বর ও ধর্মঠাকুর একীভূত হয়ে সৃষ্টি করছেন এই বিশ্বসংসার। সেই প্রসঙ্গেই 'নিরঞ্জনের উষ্মা'র পাঠগত অবতারণা।

ধর্মঠাকুরের এই বিশ্বসৃষ্টির কাহিনিটি রামাই বর্ণনা করছেন এইভাবে - সৃষ্টির আদিতে ধর্মঠাকুর ছিলেন অব্যক্ত নিরাকার নিরঞ্জন রূপে। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম আবেগের ফলে সেই শূন্যমূর্তি দ্বিধা হলেন নীল ও অনিল সত্তায়; উভয়ের সম্মিলনে অনাদ্য স্বরূপ ধর্মসাকার রূপে আবির্ভূত হলেন। মহাশূন্যের মধ্যে নিজেকে একাকী দেখে তিনি দুঃখিত হন এবং তখন তাঁর জৃম্ভণ বা হাই থেকে জন্ম হয় উলূকপক্ষীর। তার পিঠে চড়ে তিনি বিশ্বভ্রমণ করতে লাগলেন। বাহন উলূক ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 441
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়ে জল চাইলে ধর্মরাজ তাকে যে মুখামৃত দিলেন, তার এককণা বাইরে পড়তেই ব্রহ্মাণ্ড হল জলমগ্ন আর ধর্মরাজের একবিন্দু অঙ্গমল সেই জলে ফেলতেই সৃষ্টি হল মেদিনীর। এভাবেই বিশ্বচরাচর তথা ত্রিভুবনের সৃষ্টি। তখন ধর্মরাজের কোনও প্রতিশরীর না থাকায় সঙ্গিনীর চিন্তা করলেন তিনি- সেই ইচ্ছাশক্তিবলেই আদ্যাদেবী কেতকার জন্ম হল। উলূকের ঘটকালিতে তাঁদের বিয়ে হল। প্রজাসৃষ্টির মানসে ধর্মরাজ বল্লুকানদীর তীরে গেলেন তপস্যা করতে আর আদ্যাশক্তির গর্ভসঞ্চার হলে যথাকালে জন্ম নিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। তাঁরাও জন্মের পর বল্লুকার তীরে তপস্যায় বসলেন। গলিত ভাসমান শবরূপে ধর্ম এলেন তাঁর পুত্রদের পরীক্ষা নিতে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহকে দ্রুত দূরে ভাসিয়ে দিলেও মহেশ্বর ঠিকই বুঝেছিলেন এ পরমপিতা নিরঞ্জনের ছলনা। তিনি সাদরে সেই শবদেহকে মাথায় তুলে নৃত্য করেছিলেন। এরপরেই তুষ্ট ধর্মরাজ তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করে জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহারের ভার দিলেন। অযোনিসম্ভবা আদ্যাশক্তিকে নখচিহ্ন দিয়ে ভগবিদীর্ণ করে প্রকৃতিস্বরূপা সৃষ্টির আধার করে তুলেছিলেন নিরঞ্জন। সেই আদ্যাশক্তিই কয়েকবার ইচ্ছামৃত্যু নিয়ে পরবর্তীকালে শিবপত্নী সতীরূপে আবির্ভূতা হন এবং রামাই-এর বর্ণনায় শিব ও সতীর মিলনের ফলেই হয়েছিল জগত-সংসারের সৃষ্টি। মাণিক গাঙ্গুলির সৃষ্টিপত্তন মোটামুটি শূন্যপুরাণের মতোই। নাথসাহিত্য অথবা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের আদিকথায় বর্ণিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এই বর্ণনার বেশ কিছু মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে।

বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংরক্ষিত ওই পুথিতে (১২৯ নম্বর) ঠিক এরপরের অংশেই রয়েছে আর একটি গল্প- জাজপুরের অত্যাচারী ব্রাহ্মণ ধর্মরক্ষক পাসা সিংহ বা পাসান সিংহের গল্প। ধর্মঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক পাশাখেলায় পরাস্ত করে পাসান সিংহকে ধর্মান্তরিত করছেন। ধর্মপূজা-বিধানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, বৌদ্ধ-সদ্ধর্মীদের ওপর ব্রাহ্মণদের অতিরিক্ত দক্ষিণা-আদায়, জোরাজুরি ও অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে থাকলে ক্রুদ্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠে নিরঞ্জন খোদা-রূপ ধারণ করেন এবং 'যবন-অবতার'রূপে জাজপুরে উপস্থিত হন। তারপর অভিজাত অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের গোমাংস ভক্ষণ করিয়ে কৌশলে ধর্মান্তরিত করে শায়েস্তা করছেন ধর্মঠাকুর এই অংশে।

এখন লোকসংস্কৃতির কিছু টুকরো উপাদান আলোচনাসূত্রে আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন রূপে বুঝে নিতে চাইবো এই পাঠান্তরকে, যেখানে শূন্যপুরাণের সৃষ্টি বর্ণনের সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে 'নিরঞ্জনের উষ্মা'- প্রথমেই আসি, রাঢ়বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস-সন্ধানী অন্যতম গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক মাণিকলাল সিংহের বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' বিষয়ক একটি ছড়ায়। ছড়াটি এইরকম –

"বামনা যবনা ডোমনা/ তিনের পুরুত আপনা আপনা।"[৬]

এর পিছনের গল্পে আছে তিন ঋষির গো-মেধযজ্ঞের প্রসঙ্গ; তাঁরা সম্মিলিতভাবে গরুকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে যজ্ঞ করতেন এবং যজ্ঞশেষে মৃত গরুটিকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবন দান করতেন। একসময় এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঋষি গোমাংসের প্রতি লোভাসক্ত হয়ে একদিন সকলের অলক্ষ্যে একখণ্ড হাড় ও মাংস চুরি করে শালপাতায় মুড়ে সেটি পুকুরের পাঁকে পুঁতে রেখেছিলেন। ফলে যজ্ঞ শেষে যখন গরুটির প্রাণদান করা হল, তখন দেখা গেল গরুটি খুঁড়িয়ে হাঁটছে এবং তার জঙ্ঘা বা ঊরুর কিছুটা মাংস নেই। এদিকে ধ্যানযোগে কনিষ্ঠ ঋষি জানতে পারলেন সত্য ঘটনাটি। পুষ্করিণীর পাঁকে ডোবানো শালপাতার মোড়ক খুলতেই দেখা গেল গরুর হাড়টি রসুন এবং মাংসখণ্ডটি পেঁয়াজে পরিণত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ঋষিকে তিনি অভিশাপ দিলেন- 'তুমি যবন হও'। এরপর তাঁদের মধ্যে শুরু হয় তুমুল দ্বন্দ্ব-কলহ; ক্রোধের মুহূর্তে কনিষ্ঠ ঋষি অগ্রজের পৈতে টেনে ছিঁড়ে দিতেই তাঁর ক্রোধাগ্নিতে হলেন অভিশপ্ত- 'তুমি নীচজাতির মানুষদের যজাইয়া জীবিকা অর্জন করবে'। স্বয়ং ধর্মরাজ এলেন তাঁদের বিবাদ থামাতে। তিন ঋষিকে পৃথক ধর্মের পুরোহিত করে দিলেন তিনিই। দশ দণ্ডী পৈতে দিলেন মেজ ঋষিকে, যিনি হলেন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এগারো দণ্ডী পৈতে দিলেন কনিষ্ঠ ঋষিকে, যিনি বিশেষভাবে তাম্রধারণ করবেন একমাত্র রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের পূজাধিকারী ডোম-পুরোহিত হিসেবে (ধর্মঠাকুরের পুজো কোনও ব্রাহ্মণ করতে পারবেন না)। আর অভিশপ্ত সেই জ্যেষ্ঠ ঋষি গোমাংস ভক্ষণের লোভের কারণে হলেন যবন। ব্রাহ্মণ, ডোম ও চণ্ডাল এই তিন দলভুক্তির মাধ্যমে উক্ত জাতিবিষয়ক ছড়াটিতে এভাবেই গোমাংসভক্ষণ-এর কারণে যবন-পুরোহিতে পরিণত হওয়ার গল্পটি বর্ণিত হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 441
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখন 'নিরঞ্জনের উষ্মা' সংলগ্ন গল্পটিতে আমরা দেখবো, জাজপুরের নিপীড়ক ব্রাহ্মণ পাসানসিংহকে পাশা খেলার পূর্বে ধর্মরাজের শর্ত মেনে তাঁর গোয়ালের দশটি উন্নতমানের গাভী বাজি রাখতে হয়েছিল। আর কৌশলে তাঁকে পরাস্ত করার পর সেই দশটি গরুর রান্না করা মাংসই পাসানসিংহ ও তাঁর অনুগত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে খেতে বাধ্য করেছিলেন ধর্মরাজ। এভাবে গোমাংস ভক্ষণের ফলে ধর্মান্তর এবং মুসলমান জাতিতে পরিণতির কাহিনি রামাই-এর রচনাতেও ধরা পড়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং ধর্ম ঠাকুরের ছলনায় পড়েই তাঁর ইচ্ছেতে সংসারে সাত-আট প্রজাতির মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্ম হচ্ছে। প্রশ্ন জাগে- 'নিরঞ্জনের উষ্মা'র পূর্ব ও পরবর্তী সপ্রসঙ্গ গল্পপাঠের পর এখনও কি আমরা একে বলবো, এ কাব্যাংশ নিছক মুসলমানদের বন্ধু ভাবার গল্প? অথবা, ধর্মঠাকুরের আশ্রয়ে গিয়ে অত্যাচারিত বৌদ্ধ-সদ্ধর্মীদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের কাহিনি? এটি আদতে বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সামগ্রিক বর্ণনা, নানান মনুষ্য জাতির জন্ম বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয়ত আমরা উল্লেখ করবো, রাঢ় বাংলার মেদিনীপুর জেলার ঠেকুয়াচকের পটশিল্পী অজিত চিত্রকরের তৈরি একটি পটের গান-

> "হাবিল পড়িল শাস্ত্র কাবিল কোরান।
> তাহা হতে সৃষ্টি হল হিন্দু-মুসলমান।।"[৭]

গানটির ব্যাখ্যায় যে গল্পটি আমরা পাই- হাবিল ও কাবিল দুই ভাই। কোনও কারণবশত তাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হলে হাতাহাতিতে ছোটো ভাই কাবিলের মৃত্যু ঘটে। তখন তার দেহসৎকার নিয়ে চিন্তায় পড়ে হাবিল, কারণ পৃথিবীতে তখনও শবদেহ সৎকারের কোনও উপায় বলা ছিল না। এমন সময় এক জোড়া সংঘর্ষরত কাক তার চোখে পড়লো। তাদের মধ্যে মারামারিতে একটি কাকের মৃত্যু হলে অন্য কাকটি তার ঠোঁটে করে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে মরা কাকটিকে শুইয়ে মাটি চাপা দিলো। সেই দেখে হাবিলও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে মাটি খুঁড়ে মৃত কাবিলকে কবর দিলো। দুই ভাইয়ের দুই পুত্র সেখানে উপস্থিত হলে পরমপিতা তাদের একজনকে দিলেন পুরাণ, অন্যজনকে কোরান- সেই থেকেই একজন পেলো দাহ করার অধিকার, অন্যজন কবর। আলোচ্য গানে অজিত পটুয়া বলছেন, পুরাণ-কথা নিয়ে পটের গান বাঁধি আমরা ঠিকই, কিন্তু আমরা আদতে কোরান ধর্মী মানুষ অর্থাৎ ওই বড়ো ভাইয়ের বংশধর। এভাবেই পটুয়া সমাজে এইসব প্রচলিত কাহিনির মধ্যে দিয়ে চলে তাদের সামাজিক অবস্থানকে যুক্তিসিদ্ধ করে নেওয়ার প্রয়াস।

সম্পাদনাসূত্রে প্রাপ্তপুথিটিতেও 'নিরঞ্জনের উষ্মা' সংলগ্ন কাব্যাংশে আমরা একটি চাবি-পয়ারকে বারবার আবর্তিত হতে দেখবো- যেখানে ধর্মরাজ 'হিন্দুকে দিলেন পুরাণ, যবনকে দিলেন কোরান'। রামাই পণ্ডিতের এই রচনার উৎস কোনও নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসজাত চিন্তা ভাবনা তো নয়ই, বরং বলা ভালো বিভিন্ন ধর্মীয় উপকথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই একই কাহিনির সূত্র। একদিকে হাদিসে এই কাহিনির সমর্থন যেমন মিলবে, তেমনই আরও প্রাচীনকালের দিকে চোখ রাখলে আদিপুস্তক বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আদম-ইভের সন্তান হ্যাভেল ও কাইনের গল্প প্রসঙ্গেও এমন কাহিনির অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে। এমনকি হাদিস অনুসরণে বাংলাদেশে রচিত বেশ কিছু লোকনাট্যেও হাবিল-কাবিলের পালা হিসেবে গল্পটিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে, যেখানে হিন্দুর পুরাণপ্রাপ্তি ও মুসলমানের কোরান প্রাপ্তির কাহিনি বর্ণিত।

সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলাই যায় যে, রীতিমতো ইসলামিক সংস্কৃতি বাংলায় ছড়িয়ে পড়ার পর ধর্মমঙ্গলের কাহিনির সূত্রে রামাই-এর এই কাহিনির জন্ম। তা যদি হয়, তবে তো একে কিছুতেই আচার্য সেনের যুক্তি মতো হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে সদ্ধর্মীদের মুসলিম-প্রীতির ঐতিহাসিক আখ্যান হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। 'নিরঞ্জনের উষ্মা' প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সংসারের সৃজনক্রিয়ায় মুসলমানদেরও মনুষ্যজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির একটি প্রয়াস হিসেবে বিচার্য, যেখানে পক্ষান্তরে ধর্মসাধকদের সৃষ্ট বিবৃতি অনুসারে আরাধ্য খোদা, ঈশ্বর ও ধর্মঠাকুরকে একীভূত করে দেখানোর প্রবণতাই শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিগত ঐক্যে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা থেকেই এমন চিন্তাধারার জন্ম। তাঁদের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় ছিল না এমনটা তো নয়ই, বরং জাতিভেদে খাদ্যগ্রহণের ট্যাবু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল বলেই সনাতন হিন্দুধর্মের গোমেধ-যজ্ঞ ও গরুটির পুনর্জীবনদান প্রসঙ্গটিও তাঁরা জানতেন; সেইসূত্রেই গোঁড়া ব্রাহ্মণ পাসানসিংহকে শায়েস্তা করার জন্য বলপূর্বক গরু খাইয়ে কলেমা পড়িয়ে সুন্নৎ করানোর মতো গল্পের জন্ম। ফলে, অভিনিবেশপূর্বক পাঠ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 435 - 441
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করলে বোঝা যায় এহেন ঐকতানিক চিন্তাভাবনা আদতে ধর্মপূজকদের একান্তই নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস- যা মুসলমানদের সঙ্গে দীর্ঘদিন একত্রে মিলেমিশে থাকার ফলাফল ও অভিজ্ঞতাকে বিনিময় করতে চাইছে।

পরিশেষে বলা যায়, রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কাব্যাংশের যে ব্যাখ্যা প্রথাগতভাবে চলে এসেছে, তার পুনর্বিবেচনার আশু প্রয়োজন। লক্ষণীয়, এ কাব্যের বাকি অংশে কোথাও কিন্তু খোদার নামোচ্চারণ পর্যন্ত নেই, ধর্মপূজা-সংক্রান্ত আচরণীয় নানান বিধিবিধানই সেখানের মূল আলোচ্য। কাব্যদেহে আধা-সংস্কৃত, আধা-বাংলায় ধর্মপূজার্চনার নিয়মাবলীই মূলত বর্ণিত হয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-সহ বাংলা সাহিত্যের সকল স্বনামধন্য ঐতিহাসিকরাই তাঁদের রচনায় 'নিরঞ্জনের উষ্মা' বলতে পূর্বোক্ত ওই বিশেষ মধ্যবর্তী পাঠ্যাংশটিই রামাই পণ্ডিতের ভণিতাসহ উল্লেখ ও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সপ্রসঙ্গ এর পূর্বের ও পরের গল্প দুটি হয়তো খেয়াল করেননি। এ রচনার একটি শুরুও আছে, শেষও আছে; যা বিচ্ছিন্ন ভাবে পাঠ করা হয়তো যুক্তিযুক্ত নয়। ফলত, পূর্বাপর কাহিনিসূত্র বিচার করে বলা যায় আমাদের আলোচ্য 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কাব্যাংশটি মুসলমানদের প্রতি বন্ধুতা বা বৈরিতার আখ্যানমাত্র নয়; অত্যাচারিত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মের ধ্বজাধারী হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ এবং তার পরিণতিতে মুসলমান প্রীতি– এমন সিদ্ধান্তও নিছক বিচ্ছিন্ন কল্পনাজাত মান্যায়ন। আবার একে সমগ্র সদ্ধর্মী সম্প্রদায়ের জীবন ভাবনার পরিচয়বাহীও বলে দেওয়া চলে না। বর্ণহিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ভেদযুদ্ধ ও তার ফলাফল এতে আছে একথা সত্য, কিন্তু সেটাই এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয় এমন চিন্তাধারা খণ্ডিত। ধর্মপূজকদের বিশ্বাসদৃষ্টিতে, বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সমগ্র সৃজন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটা খণ্ড বা সৃষ্টির অংশ মুসলমানরা; তাই ধর্ম রাজকর্তৃক সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ক্রিয়ায় মনুষ্যজাতি হিসেবে মুসলমানদেরও অন্তর্ভুক্তির একটা প্রচেষ্টা বরং এখানে খুঁজে পাই আমরা। বিচ্ছিন্ন ভাবে কেবলমাত্র জাতিগত শত্রুতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরঞ্জন-ধর্মরাজের উষ্মার প্রকাশকে চিহ্নিত না করাই শ্রেয়।

Reference:

১. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড-৯ম সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ৫৪-৫৭

২. শরীফ, আহমদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [প্রথম খণ্ড], নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ৪৩০

৩. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলা সাহিত্য কোষ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৯৯

৪. সেন, শ্রীসুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড - সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী), ধর্ম-ঠাকুর-কথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃ. ১১০

৫. দাশগুপ্ত, শ্রীশশিভূষণ, বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা, গোপীমোহন সিংহরায় অনূদিত, ভারবি, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ১৫২

৬. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ২১৭

৭. চট্টোপাধ্যায়, সুমনা দত্ত, পূর্ব ভারতের পটচিত্র, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ৯

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 442 - 449
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শঙ্খ ঘোষের কবিতা ও বাংলা কবিতার আন্তর্জাতিকতা

ড. পীযূষ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : pijushpoddarkalyani@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
international, poetry, context, boundaries, crisis, limits.

Abstract
Regardless of the era in which the term cosmopolitan is used, the people of the modern world increasingly want to transcend the geographical boundaries of a limited country and reach out to the court of the world. A special level of internationalism can be seen in the goodwill of all in accepting people from all over the world. Due to the improvement of communication system and internet system, the whole world has become a bog country today. Language or literature is reaching the people of the world very quickly across the borders of the country. Through translation and public relation, we are getting the literature of any country within our limits.

Rabindranath Tagore is the main representative of international consciousness in Bengali poetry and literature. As a man of subjugated India, he did not think only about the people of India or Bengal, but thought about the present and future of the people of the whole world, about their crisis and solution. In the context of the global circulation of Bengali language and poetry, the international sense in the poetry of Shankha Ghosh, a prominent poet of fifties, demands a special introduction.

Discussion

বিশ্বচারী শব্দটি যে যুগেই ব্যবহৃত হোক না কেন, আধুনিক বিশ্বের মানুষ অনেক বেশি করে সীমায়িত দেশকালের ভৌগোলিক সীমা পার হয়ে ব্যপ্ত হতে চায় বিশ্বের দরবারে। সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সমদৃষ্টিতে গ্রহণ করার মধ্যে সকলের শুভচেতনার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বোধের একটি বিশেষ মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আর ইন্টারনেট ব্যবস্থার ফলে সমগ্র বিশ্বই আজ এক বৃহৎ দেশে পরিণত হয়েছে। ভাষা বা সাহিত্য দেশকালের সীমা পেরিয়ে বৃহৎ বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে খুব দ্রুত। অনুবাদ আর জনসংযোগের মাধ্যমে যে কোন দেশের সাহিত্যকেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের সীমায়।

বাংলা কবিতা তথা ভারতীয় সাহিত্যে আন্তর্জাতিক চেতনার প্রধান প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষ বা বাংলার মানুষকে নিয়েই ভাবনা চিন্তা করেননি, ভেবেছেন সমগ্র বিশ্বের মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে, তাঁদের সংকট ও সামাধান নিয়ে। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবজাতির অভিন্ন প্রতিনিধি রূপে সকল মানুষের বিস্তারের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশ্বভারতীকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অভিন্ন প্রতিষ্ঠান রূপে। তাঁর ভারততীর্থে অবিরাম স্রোতধারায় ভিন্ন ভিন্ন দেশকালের মানুষেরা এসে জড়ো হন, সকলের পরশে ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে মহামানবের মিলনক্ষেত্র।

এই প্রসারিত মানব-জমিনে রবীন্দ্র উত্তরকালের কবিরা আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন খুব কম সংখ্যায়। রবীন্দ্র স্নেহধন্য অমিয় চক্রবর্তীকে বলা হয় আন্তর্জাতিক কবি। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ চার মহাদেশের মানুষের জীবন, দর্শন ও ভূগোলকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৩৩ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপ এবং আমেরিকার নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন। রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ড ভ্রমণের সূত্রে তিনি বিশ্ব নাগরিক। ১৯৪৬-৪৮এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি ও বিহারের কিছু জায়গায় গিয়েছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে। রাশিয়ায় গিয়ে দেখা করেছেন বোরিস পাস্তেরনাক-এর সঙ্গে। তাঁর কাব্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতার কথা থাকলেও কাব্যের মূল সুর বিশ্ব নাগরিকতা। ভৌগলিক ভেদরেখাকে বড়ো করে না দেখে নানা দেশের বিচিত্রধর্মী মানুষের নানা অসঙ্গতি, সংকটকে মমতার চোখে দেখেছেন তিনি। পৃথিবীর সকল পীড়িত মানবের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার যোগাযোগ। সব দেশের মানুষের প্রতিই তার ভালোবাসা অবারিত।

বাংলা কবিতাচর্চায় অমিয় চক্রবর্তী ছাড়াও জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা আন্তর্জাতিক চেতনাকে অনুভব করেছেন। বিশ্ব সংস্কৃতির নানা ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ও মানবিক সংকটের কথা বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি তারা তুলে ধরেছেন। বিদেশী কবিদের মধ্যে ইয়েটস, বোদলেয়ার, এলিয়ট, পো, র‍্যাঁবো, পল ভালেরী, জেরল্ড ম্যানলি হপকিন্স মালার্মে, এজরা পাউন্ড, লরেন্স, রিলকে, লোরকা, পাবলো নেরুদা প্রমুখের কাব্যের প্রভাব বাংলা কবিতায় সুবিদিত। বাংলা কবিতায় আধুনিক কালের কবিরা অনেক বেশি পরিণতি দেখিয়েছেন আন্তর্জাতিকতার চর্চায় ও উচ্চারণে। এই চেতনার প্রসারেই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা পত্রপত্রিকা 'প্রবাসী', 'ঠিকানা', 'বাঙালি', বাংলা 'পথিক'। লিটল ম্যাগাজিনেরও উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটেছে— 'অভিবাস', 'অবিনাশী', 'শব্দরাজি', 'গাংচিল' নামের ম্যাগাজিন ছাড়াও 'উত্তর আমেরিকার বাংলা কবিতা', 'ইংল্যান্ডের বাংলা কবিতা' নামে সংকলন বের হচ্ছে। সুইডেন থেকে বের হচ্ছে বাংলা পত্রিকা 'পরিক্রমা', জাপান থেকে বের হচ্ছে 'মানচিত্র'।

বাংলা ভাষা ও কবিতার এমন বিশ্ব পরিক্রমার প্রেক্ষিতে পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিক বোধ বিশেষ অভিনিবেশ দাবী করে। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিক চেতনাকে আমরা দুই দিক থেকে গ্রহণ করতে পারি - কবিতার মধ্য দিয়ে এবং অনুবাদের মধ্য দিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁর কবিতার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আবেগ, মনন চিন্তনকে উপলব্ধি করা এবং অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভিন্ন দেশকালের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও সেই সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংশ্লেষ সাধন করা।

১৯৬৩ সালে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত' সম্পাদনার মধ্য দিয়ে শঙ্খ ঘোষের বিশ্ব কবিতা চর্চার প্রকাশ। পরবর্তীতে জার্মানি, ফরাসী, ইতালি, স্পেন, ইরাক, আফ্রিকার বিভিন্ন কবির কবিতার অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ সূত্রে ভিন্ন ভূখন্ডের ভিন্ন রুচির মানুষের সংস্কৃতি ও রুচির সঙ্গে গ্রহণে-বর্জনে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতার জগৎ। এলিয়ট, নীৎশে গেয়র্গ হাইম, পাবলো নেরুদা, হো-চি-মিন, নিকোলাস গিয়েন, আন্তনিও মাচাদো, গুন্টার গ্রাস, জুসেপ্পে উনগারেত্তি, হুয়ান রামোন হিমেনেথ, আনা আখমোতোভা, রিয়ুচি তামুরা, শাকির আল সয়াব, আবদুল ওয়াহাব আল বয়াতি, সাদি ইউসুফ প্রমুখের কবিতার অনুবাদ সূত্রে শঙ্খ ঘোষের নিজের কবিতার ভুবনও হয়ে উঠেছে বিশ্বচারী। 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' সংকলনে শঙ্খ ঘোষের অনুদিত কবিতা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারি—

কবি	দেশ	অনুদিত কবিতার নাম
ক্লাউস গ্রোথ	জার্মান	বিদায়
ফ্রীডরিশ	জার্মান	পথিক, তার ছায়া
স্টেফার্ন গেয়র্গে	জার্মান	প্রত্যাবর্তন

হুগো ফন হোফমানস্টাল	জার্মান	বহির্জীবনের গাথা
কার্ল ক্রাউস	জার্মান	বসন্ত
গেয়র্গ হাইম	জার্মান	যুদ্ধ
বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট	জার্মান	শয়তানের মুখোস
আন্তোনিও মাচাদো	স্পেনীয়	কবিতা
নিকোলাস গিয়েন	স্পেনীয়	ছোট্ট একটি গাথা
পাবলো নেরুদা	স্পেনীয়	সাঁজাই
আর্তুরো প্লাজা	স্পেনীয়	বসন্ত
টি. এস. এলিয়ট	ইংরেজ	দি ড্রাই স্যালোয়েজেস

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে জার্মান কবির সংখ্যা সাত, স্পেনীয় কবির সংখ্যা চার, ইংরেজ কবির সংখ্যা এক। কবিতার অনুবাদে কবি শঙ্খ ঘোষের একটি বিশেষ পছন্দ বর্তমান। তবে 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' অনুবাদের সময় শুধু বিশেষ প্রবণতা বা পছন্দ থেকে নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও অনুবাদ করতে হয়েছিল। এই সংকলনে নটি দেশের কবিদের কবিতার অনুবাদ ছিল। তাই অনুবাদকের অভাবে প্রবণতা বিরুদ্ধ ভাবেও কবিতার অনুবাদ করতে হয়েছে। উচ্চকিত কবিতা বা কবিতার চড়া স্বনন শঙ্খ ঘোষ অনুবাদের ক্ষেত্রেও এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। ক্লাউস গ্রোথের 'বিদায়' কিংবা নীৎসের 'পথিক, তার ছায়া', আন্তনিও মাচাদোর 'কবিতা', আর্তুরো প্লাজার 'বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায় অনুবাদে শঙ্খ ঘোষের মৃদু উচ্চারণ ও সংযত বাচনকে বুঝতে পারা যায়। নিকোলাস গিয়েনের কবিতার অনুবাদের মধ্যে ব্যথা মিশ্রিত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্তে'র পর শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ কবিতার সংকলন 'বহুল দেবতা বহু স্বর' (এপ্রিল ১৯৮৬, নাথ পাবলিশিং) প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি পরবর্তীতে দে'জ পাবলিশিং থেকে (জানুয়ারি ১৯৯৭) বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়, সে সময় এই সংকলনে তেইশ জন কবির কবিতার অনুবাদ ছিল। জার্মান কবি বের্টোল্ট বেখটের কবিতার অনুবাদ সবথেকে বেশি ছিল। বেল্টের চোদ্দটি ফরাসী কবি জাক প্রেভের পাঁচটি, ইতালীয় কবি জুসেপ্পে উনগারেত্তির পাঁচটি কবিতার অনুবাদ আছে। রুশ কবি আনা আখমোতোভা ও স্পেনীয় কবি পাবলো নেরুদার দুটি করে কবিতা আছে। নিকোলাস গিয়েনের 'চিড়িয়াখানা এবং অন্যান্য কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের সব কবিতাই মুদ্রিত হয়েছে এই সংকলনে। অন্য সকল কবিদের একটি করে কবিতা আছে। অনুবাদ করতে গিয়ে ভিন্ন দেশীয় কবিদের সঙ্গে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সামান্যতা বোধ করলে শঙ্খ ঘোষ তাঁদের কবিতার অনুবাদে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই সামান্যতা বোধ থেকেই ভিয়েতনামের জনপ্রিয় জননেতা হো-চি-মিনের 'জেলখানার ডায়েরী' অনুবাদ করেছেন। কারাবাসের দিনগুলির বিবর্ণতা, নিদ্রাহীন রাত, খাদ্যহীন জেলের প্রকোষ্ঠ হো-চি-মিনের ভিতরকার কবি স্বভাবকে ধ্বংস করতে পারেনি। গরাদের বাইরে স্বাধীন আকাশ দেখবার সাধ তাঁর হৃদয়ে রয়ে গেছে। তাই বাহ্যিক বন্ধন কঠোরতার পরেও প্রকৃতির মধুক্ষরা আস্বাদের অনুভব পেয়েছেন হৃদয়ে—

> "হাতপা আমার বেঁধেছে কঠোর বাঁধে।
> পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফোটে আর পাখিরা গায়।
> কে বাঁধবে এই শব্দের মধুগন্ধের আস্বাদে?
> একার ক্লান্তি মুছে নেয় এরা দীর্ঘ এ যাত্রায়।"
>
> (পথে/ জেলখানার ডায়েরী)

জেলখানার মধ্যে থেকেই চাঁদ, ফুল, তুষার, বাতাস, কুয়াশা, পাহাড়, নদীর স্বপ্ন ও বাস্তব মিলেমিশে গেছে। হাজার জনতার স্বপ্ন সঙ্গে নিয়ে হো-চি-মিন শ্রান্তিহীন পথ চলবার কথা বলেন, পথের বাধা তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। আবার ডেভিড দিয়োপের কবিতায় আফ্রিকার শ্রমজীবী মানুষের কথা উঠে আসে। বেল্টের 'পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন' কবিতার জিজ্ঞাসা সব দেশের মানুষের জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে। মহামানব আর পৃথিবীর সব মহাকীর্তির প্রেক্ষাপটে রয়েছে অসংখ্য

শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের অবদান। ইতিহাস রাজাদের কথা লেখে, যুদ্ধ জয়ের কথা বলে সাধারণ মানুষের অবদানকে ভুলে যায়।

ফরাসী কবি জাক প্রেভের পাঁচটি কবিতার অনুবাদ আছে 'বহুল দেবতা বহু স্বর' সংকলনে। প্রতিদিনকার জীবনযাপন, জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কিত এক দার্শনিক বোধ জড়িয়ে আছে এই কবিতাগুলিতে। মৃদু স্বরের উচ্চারণে শঙ্খ ঘোষ জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুর মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়েছেন। ব্যবসা, প্রেম, জীবিকা নানা কর্মব্যবস্ততার মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই। আমাদের জীবনের বহুবর্ণের স্বপ্ন ও সাধ অপূর্ণ থেকে যায়, যে যার কাজ নিয়ে আমরা সকলেই মহাব্যস্ত। আমাদের ভাব-ভাবনা বিনিময়ের অবসর ও ক্রমে কমে আসে। তারপর হঠাৎই একদিন পৃথিবী থেকে আমাদের চলে যেতে হয়। যে অবসর বস্তু পৃথিবীতে মেলেনি, চিরঘুমের দেশে হয়তো সেই অবসর মেলে—

জীবন চলছেই বুননে যুদ্ধে ব্যবসায়
ব্যবসা যুদ্ধ বুনন যুদ্ধ
ব্যবসা ব্যবসা ব্যবসা
কবরে মিলছে জীবন।[১]

(পারিবারিক/ বহুল দেবতা বহুস্বর)

জীবনের দুর্ভাগ্যের উপর আমরা আপাত সুখের এক মুখচ্ছবি গড়ে নিয়ে জীবনের সঙ্গে আপোস করে এগিয়ে চলি। কবিতার এই জীবনভাষ্য সব দেশের সব কালের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। ভাবনার এই আন্তর্জাতিকতা শঙ্খ ঘোষ অনুবাদের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করেছেন।

অনুবাদের সূত্রে শঙ্খ ঘোষের কবি মনন বিশ্বচারী। 'বহুল দেবতা বহু স্বর' সংকলনের পরে 'মুখ জোড়া লাবণ্যে' গ্রন্থে আমরা পাচ্ছি চিনুয়া আচিবি, মার্গারেট অ্যাটিউড, ডিক অ্যালেন, নিকি গিয়োভান্নি, স্টেফানির কবিতার অনুবাদ। ইরাকি কবিতার অনুবাদ নিয়ে একটি সংকলন 'ইরাকি কবিতার ছায়ায়'। শঙ্খ ঘোষ সংযত বাচনে মৃদু স্বরের কবিতার বিষয়ে তার অভিব্যক্তির কথা বললেও অনুবাদে অনেক সময়ই তিনি এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নিজের কবিতার ক্ষেত্রে তিনি উচ্চভাষী নন, উচ্চকিৎ বিদ্রোহ বিপ্লবের কবিতার সংখ্যাও কম। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ বিপ্লব বা সংগ্রামী কবিতার মধ্যে নিজের কবি প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন। 'ইরাকি কবিতার ছায়ায়' সংকলনে পঁচিশজন কবির ষাটটি কবিতার অনুবাদ আছে। শাসক ও স্বৈরাচারী শাসকের উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ইরাকের ইতিহাস। ইরাক-ইরানের সংঘাত, আমেরিকার মুনাফার সূত্রে ইরাকের মাটিতে বারেবারেই রক্তের দাগ কালো হয়ে গেছে। কবি সাহিত্যিকরা দেশ থেকে বিতাড়িত বা দন্ডিত হয়েছেন। বদর-শাকির আলসয়াব নির্বাসিত হয়েছেন, আবদুল ওয়াহাব আল বয়াতিকে যেতে হয়েছে দামাস্কাসে, বুলান্দ আল হায়দারি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পর্যন্ত হয়েছিলেন। আদনান আল সাইঘ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে পালিয়ে যান সুইডেন, পরবর্তীতে লন্ডন। সন্ত্রাস আর অবিচ্ছন্ন অন্তর্ঘাতের নিরন্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে যে কবিরা বড়ো হয়ে উঠেছেন তাদের কবিতা তাই অনিবার্যভাবে সময়ের সকল ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে আছে। প্রেম, মৃত্যু, নির্বাসনকে অবধারিত নিয়তি জেনেও কবিরা তাদের সময়কে কবিতায় তুলে ধরেছেন। যুদ্ধ, ধ্বংস, প্রতিরোধের কথা বারবার উঠে আসে তাদের কবিতায়।

সংকলনটি শুরু হয়েছে বদর শাকির আল-সয়াবের 'বৃষ্টির গান' কবিতা দিয়ে। কবিতাটিকে এই সংকলনের মুখবন্ধ বলা যায়। জন্ম, মৃত্যু, আলো, অন্ধকারে গড়া ইরাক ভূখণ্ডের এক ইতিহাসকেই যেন ধরে আছে এই কবিতা। ক্রীতদাসদের রক্তবিন্দু, ক্ষুধিতের কান্না, আশ্রয়হীন-আচ্ছাদনহীন দিশেহারা মানুষের জমাট বিষাদ ধারণ করে আছে কবিতাটি। আগামী দিনের প্রতীক্ষা, নবজাতকের মুখে হাসির আভা, স্বাধীন যুবমানসের স্বপ্নে শেষ হয়েছে কবিতাটি। আবদুর রজ্জাক আবদুল ওয়াহিদের 'আগুন-ফোয়ারা' কবিতার অনুবাদে শঙ্খ ঘোষ তুলে ধরেছেন সেই মৃত্যু শাসিত সময়কে—

"আমার সিসায় ঠাসা বুক।
নারকী ফোয়ারা, তুমি নিয়ে গেছ এই স্বর;
বসন্তে হাজার ফলা তুলে দিয়ে গেছ তুমি আমার ভিতরে,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দংশন চিৎকার ছাড়া আর সবকিছু আজ হারিয়ে গিয়েছে
কোনোই প্রলেপ নেই ক্ষতে
পৃথিবীর সব জল মুখে নিয়ে শান্তি নেই তবু।"[২]

শান্তিহীন, প্রেমহীন বসন্ত দিনে বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বিপন্ন দেশকালের শূন্য কাফের নিশিডাকে এক ঘাতক সত্তা গভীর ক্ষত তৈরী করে। আবদুল ওয়াহাব আল বয়াতির 'ছোটো বক্তৃতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা' কবিতায় অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকতা আর সস্তা মিথ্যার প্রসঙ্গে তুলে ধরেন চারপাশকে। 'ফেরার' কবিতায় কবির স্বপ্নে অন্যদেশের নেকড়েরা হানা দেয়। এই নেকড়ে হল বিদেশী শত্রু। কবির স্বপ্ন আসলে ইরাকের প্রবল বাস্তব। দেশ থেকে বিতাড়িত বা দণ্ডিত কবি সাহিত্যিকদের বিধুরতার বুননে অনেক অম্লস্বাদ আছে। তবু দেশের মাটি, নদীর অমোঘ আকর্ষনে ইরাকের ভূখণ্ডই তাদের কাছে পরম কাম্য ও রম্য। বেশীরভাগ সময়েই দেশের অভাব, দারিদ্র্য, সংকট থাকলেও দেশের মাটি, আলো, বাতাস, নিসর্গ কবি সাহিত্যিকের কাছে শ্রেয় মনে হয়।

অনুবাদের মধ্যে দিয়ে দেশ-দেশান্তরের কাব্য চর্চার সূত্রে শঙ্খ ঘোষের আন্তর্জাতিক মনন অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ্বকাব্য পরিক্রমার সূত্রে দেশকালের সীমায়িত সংকট থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর মানুষের শুভ চেতনা ও নান্দনিক বোধের সঙ্গে সমন্বয়ের সুযোগ ঘটেছে। দেশ কাল পেরিয়ে ভিন্ন দেশের তথা বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক চেতনার সঙ্গে আমাদের দেশীয় চেতনার পার্থক্য আবার পীড়িত মানুষের সঙ্গে সংযোগ শঙ্খ ঘোষের আন্তর্জাতিক চেতনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। শঙ্খ ঘোষের কাব্যচর্চা মানুষের প্রতি মমতায় সিক্ত। যে কোন ভূখণ্ডের মানুষের প্রতিই তিনি সহমর্মী। ক্ষতচিহ্নময় সময়ের পীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অবারিত। ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ না হয়ে দেশাতীত ও কালাতীত ভাবে তিনি মানুষের পাশে। পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির প্রতি সমানুভূতির নিদর্শন পাওয়া যাবে তার বিভিন্ন কাব্যের কবিতার পঙ্‌ক্তিতে।

শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬) থেকে 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে' (২০১২) কাব্য পর্যন্ত ২০টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যটি কবি-র ব্যক্তিগত দিনযাপনের দিনলিপি থেকে কাব্যজগতে উত্তরণের কথামালা। এই ব্যক্তিগত কথার পরিসরেও কবি ছুঁয়ে থাকেন দৈনন্দিনের সাধারণ মানুষের জীবনকে। অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের মর্মবিদারী ভাষ্য রচিত হয় 'যমুনাবতী' কবিতায়। খাদ্য আন্দোলনের সূত্রে এক নিরপরাধী তরুণীর পুলিশের গুলিতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে বিষাদ গাথা শঙ্খ ঘোষ নির্মাণ করেন তা আমাদের বুঝিয়ে দেয় শঙ্খ ঘোষ সর্বাগ্রে নিপীড়িত মানুষের কবি। তাঁর কবিতা সব সময়েই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের পক্ষে কথা বলে। আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে তিনি ভবিষ্যত মানুষের কাজে লাগতে চান। মহাকাব্যিক শপথে তিনি বলেন—

"নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিও হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গড়ো, আমায় করো ক্ষমা।"[৩]

তবে মনে রাখতে হবে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা থাকলেও উচ্চকিত বিপ্লব বা সংগ্রামের কথা তিনি কম বলেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ স্বভাব বৈশিষ্ট্যে মৃদুভাষী। তাঁর মনোগঠনে উত্তেজনার পরিবর্তে স্থিরতাই বেশি প্রতিবাদের ধরণও সংযত। শুধু দেশের মাটিতে নয় বিদেশেও সব রকম অন্যায় ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আমেরিকার আয়ওয়া শহরে ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রনে ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে যোগ দিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। সেখানে রেডিওর এক অনুষ্ঠানে ফাদার ভিক্টর পাওয়ারের জাতপাত নিয়ে ভারতবর্ষের সম্পর্কে অবমাননার মন্তব্যের প্রতিবাদে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছিলেন জাতপাত, সাদা-কালোর সমস্যা সব দেশের পক্ষেই লজ্জার বিষয়। এই সূত্রেই আমরা 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কাব্যের 'শাদা কালো' কবিতাটিকে পেয়ে যাই—

"তখন আমার সামনে কেঁপে দাঁড়ায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওয়াশিংটনের আরেক মস্ত বুড়ো
থুত্থুরে
ছেঁড়া বুকে ঢিল খেতে খেতে
তবু যে আঙুল তুলে বলেছিল শোনো
আই অ্যাম ব্ল্যাক
ও ইয়েস, আই অ্যাম ব্ল্যাক
বাট্ মাই ওয়াইফ ইজ হোয়াইট!"[৪]

সব দেশের, সব কালের পীড়িত মানুষে প্রতি সমানুভূতি শঙ্খ ঘোষের আন্তর্জাতিক চেতনার এক বিশেষ বিশিষ্টতা। আফ্রিকার দুর্গতদের জন্য জুরিখের পথে পথে প্রতিবাদী ছেলেমেয়েদের ভিক্ষার ছবি, রোমের কালোসিয়াম, প্যারিসের লুভর, লুভর থেকে সোরবন, কিংবা কলকাতায় রাস্তার সংঘর্ষ এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেন কবি শঙ্খ ঘোষ। পূর্ব-পশ্চিম সব মিলে যায় ভূমধ্যসাগরে—

"আমাদের দেখা হলো আচম্বিতে
অধিকিন্তু শীতে
পশ্চিম প্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী
দুই প্রান্ত থেকে ফিরে আমাদের দেখা হলো ভূমধ্য সাগরে।"[৫]

আন্তর্জাতিক চেতনার শরিক কবি মাত্রেই বিশ্বচারী চেতনায় সম্পৃক্ত। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিকতা রবীন্দ্রনাথ বা আমিয় চক্রবর্তী থেকে ভিন্ন অর্থে। রবীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী বিশ্ব ভ্রমণের সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা তাদের সাহিত্যচর্চায় উঠে এসেছে। শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে বিশ্ব ভ্রমণের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে ভিন্ন দেশের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত সম্পর্কে আন্তরিক অনুরাগ এবং গভীর জ্ঞান। এই বৌদ্ধিক দীপ্তি আর অত্যাচারিত, পীড়িত, সাধারণ মানুষের প্রতি সমব্যাথী হওয়ার শুভ ইচ্ছায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা বিশ্বে প্রসারিত হয়ে যায়। বিশ্বমানবতা বোধ থেকেই কবির উপলব্ধি 'জেগে থাকাও একটা ধর্ম' আর এই বোধ থেকেই বিশ্বের সকল মানুষকে কবি জেগে থাকতে বলেন, সচেতন থাকতে বলেন।

কবি হিসাবে শঙ্খ ঘোষ বিশ্ব নাগরিক নন। তাঁর কবিতায় (অনুবাদ কবিতা বাদ দিয়ে) ভিন্ন দেশের মানুষের জীবন চিত্র, যাপন চিত্রের ছবিও খুব বেশি নেই। বিপন্ন সমকালে দাঁড়িয়ে তাঁর উচ্চারণে আছে অন্ধকার থেকে আলোতে অভিসারের কথা, আছে স্বপ্ন - রাত্রির অন্ধকারের বৃন্ত থেকে সকালকে ছিনিয়ে আনবার কথা, ভুবন তিনি অমিয়য় ভরিয়ে দিতে চান। তবে সেই পথে অনেক বাধা, বিঘ্ন, সংকট। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে বিশ্বের যে যে ভূখণ্ডের মানুষরা সংগ্রাম করছে, জীবন বাজী রাখছে কবি তাদের সকলের পাশে দাঁড়াতে চান। এই পাশে দাঁড়ানোয় তিনি কোনো আপোসরফায় রাজী নন। শুধু কবিতাচর্চা নয়, বিপন্ন সময়ে তিনি নানা মিছিলে, প্রতিবাদে অন্যদের সহযাত্রী। বামফ্রন্টের বুদ্ধিজীবী সমাবেশে সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিবাদ কিংবা নন্দীগ্রাম গণহত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে (১৪ মার্চ, ২০০৭) তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে রাস্তায় নামা সব ক্ষেত্রেই তিনি মানুষের পক্ষে মানুষের হয়ে কথা বলতে চেয়েছেন। এই চেতনাকে আমরা বলেছি সমানুভূতি। এই সমানুভূতি থেকেই তিনি বিশ্বের সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করেন, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন তীব্রভাবে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে নিজের চেতনাকে প্রসারিত করেন বিশ্বময়। জার্মানী, ইতালি, ইরাক, স্পেন, জাপান, ইংল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে জেনে নেন তাদের উত্থান-পতন-বিষাদ-প্রেম-মৃত্যু পরিকীর্ণ জীবনচর্যা। ব্যক্তির সঙ্গে দেশের, দেশের সঙ্গে বিশ্ব মিলে তৈরি হয় বিশ্ব ইতিহাস। শঙ্খ ঘোষ জানেন বিশ্ব ইতিহাসে বর্তমান সময় সংকটের কাল। এই সংকটকালে আমাদের স্বপ্ন, আমাদের বাস্তব সব গুলিয়ে যাচ্ছে 'স্বপ্নবাস্তব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বাণীতে কবি শঙ্খ তাই আমাদের জানিয়েছে—

"একটাই শুধু কথা -
তোমার স্বপ্নে কোনো বাস্তব নেই, বাস্তবে নেই কোনো স্বপ্ন।"

বাস্তবে স্বপ্নহীন মানুষের সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার কথাও উচ্চারিত হয় কবিতায়— 'যা ছিল, যা আছে, আর থাকবে যা, সব এক হয়ে ভরে থাক মুহূর্ত তোমার'। স্মৃতি-সুধায়, আনন্দে-বিষাদে, প্রেমে-বিক্ষোভে প্রতি মুহূর্তই পূর্ণ হয়ে আছে, হাজারো হতাশা আর মৃত্যুর চোরাবালি পেরিয়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় উচ্চারিত হয় জীবনের বীজমন্ত্র— 'রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।'

বিদেশী কবিতা অনুবাদের মধ্যে তিনি অনেক সময় খুঁজেছেন ভারতীয় ঐতিহ্য। টি.এস.এলিয়টের 'দি ড্রাই স্যালোয়েজেস' কবিতার একশো ষাট পঙ্ক্তি অনুবাদে দেখা যাচ্ছে গীতার কথা আছে ভিন্ন রূপে 'কর্মের ফলের কথা ভেব না কখনো।' আবার এই কবিতারই একশো তেইশ পঙ্ক্তিতে আছে কৃষ্ণের উল্লেখ, এলিয়ট লিখেছেন—

> "I sometimes wonder if that is what Krishna meant—
> Among other things or one way of putting the same thing
> That the future is a faded song, a Royal Rose or a lavender spray
> Of wistful regret for those who are not yet here to regret."[৬]

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে পঙক্তিগুলি হল—

> "মাঝে মাঝে মনে হয় কৃষ্ণও কি তা-ই বলেছেন—
> অন্যসব, তার মধ্যে এও এক-কিংবা একই কথা ঘুরিয়ে বলার ভিন্নরূপ
> ভবিষ্যত যেন কোনো মুছে যাওয়া গান, রাজসী গোলাপ, অগুরু ছটায়
> তাদের সবার জন্য পরিতাপ, শোচনার জন্য যারা এখনো এখানে নেই।"[৭]

'Lavender Spray' -এর অগুরুছটায় রূপান্তরে আমাদের দেশীয় স্বাদ অনুভূত হয়। ইতালীয় কবি জুসেপ্পে উনগারেত্তির 'যন্ত্রণা' নামক কবিতার মধ্যে আমরা পাচ্ছি ভরতপাখি, মুনিয়া ও তিতিরের কথা—

> "ভরত পাখির মতো তৃষ্ণা নিয়ে মরে যাওয়া
> মরীচিকা ঘোরে
> কিংবা তিতিরের মতো
> সাগর পেরিয়ে এসে
> প্রথম ঝোপের মধ্যে মরে যাওয়া
> কেননা ওড়ার আর
> ইচ্ছে নেই কোনো
> অন্ধ মুনিয়ার মতো বিলাপের ভারে
> বেঁচে থাকা কখনোই নয়।"[৮]

এই অনুবাদ অবশ্য শঙ্খ ঘোষ দেশীয় প্রেক্ষিতে করেছেন। ভিনদেশীয় অপরিচিত শব্দের দেশীয়করণ ঘটেছে।

অনুবাদের মধ্যে অন্য দেশের মানুষের যে পীড়িত অভিজ্ঞতা, শপথ, বিদ্রোহ, ত্যাগের কথা উঠে এসেছে তা সব দেশের প্রেক্ষিতেই সত্য বলে মনে হয়। ইরাকের কবি সাইদা আল-মৌসবি যখন বলেন 'স্বদেশের নাম নিয়ে শপথ ঘোষণা করা/ এ-মাটিরই জন্য বেঁচে থাকা/ অথবা না থাকা' — তখন আমাদের দেশের সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুর তার সঙ্গে মিলে যায়। আয়ওয়াতে নানা দেশের কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থেকে বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের প্রবণতা ও রুচি সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। সে সময়ে যুগোশ্লাভিয়ার কবি মার্ট ওগেন, তুর্কি কবি বিয়ার্শন কিয়ো, ইরানের কবি তাহেরে সাফরজাদে, জাপানের কবি রিয়ুচি তামুরা, তাইওয়ানের হুআলিং এবং ওয়ান চিং-লিন প্রমুখ কবিদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আয়ওয়ার এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'-এ। ভিনদেশীয় পরিবেশে সকলের সঙ্গে মিলে আন্তর্জাতিক লিখন সূচিতে শঙ্খ ঘোষ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অনেক উদারপন্থী। গ্রহণে বর্জনে বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধকে অনুধাবন করে হন্যমান বিশ্বে তিনি আলোর অভিযাত্রী। তাঁর শুভ চেতনায় তিনি কালো রঙের কুঁজোতে সকলের জন্য আলো ভরতে ভরতে চলেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"...একা-একাই হাঁটছি আমি
হাতে একটা ঘোর কালো রঙের কুঁজো
দরকার হতে পারে ভেবে তাতে আলো ভরতে ভরতে চলেছি।"[৯]

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে এই আলোর অভিব্যক্তিই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। হনন মেরুর পৃথিবীতে সব দেশের সবকালের মানুষের পাশেই তিনি আছেন। স্বার্থান্ধ রাজনীতি আর বেনিয়া মুনাফার খোলা বাজারে তাঁর আন্তর্জাতিক মনন আমাদের শুভ চৈতন্যে জাগরিত হতে বলে।

Reference:

১. ঘোষ, শঙ্খ, বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১১৩
২. ঘোষ, শঙ্খ, ইরাকি কবিতার ছায়ায়, তালপাতা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬২
৩. ঘোষ, শঙ্খ, 'কবিতা সংগ্রহ-১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৩
৪. ওই, পৃ. ১৭৮
৫. ওই, পৃ. ১১৭-১১৮
৬. T. S.ELIOT, The Complete Poems and Plays', Faber and Faber, London, 1969
৭. ঘোষ, শঙ্খ, 'বহুল দেবতা বহু স্বর' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১২৬
৮. ওই, পৃ. ১৪২
৯. ঘোষ, শঙ্খ, প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 450 - 459
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যু প্রসঙ্গ

জুলিয়েট দীপা বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID : biswasjulietdeepa@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
বোহেমিয়ানিজম, গোরস্থান, ট্রামলাইন, অন্ধকার, টিউকল, স্বেচ্ছাচারী, দীপ্যমান, মাইলপোস্ট, পরশুরাম, চন্দ্রবোড়া।

Abstract

The poet of the 50th century, shakti chattapadhyay. Though he was the poet of 50th century but his poetic genius blossomed in the 60s and 70s. He was a highly acclaimed and well known poet. He was born in 1933 in bohudu near jaynagar, south 24 pargana district. In childhood he lost his father so he was raised under the care of his grandfather. After dwelling in bohudu, in his childhood, he came to kolkata as a young man and began a new chapter of his life. He studied there. He was a very intelligent student. while studying honors in bengali at presidency college, his career path gradually changed. He entered the literary word not through any small piece but with a whole novel. then inspired by his friends he composed a sonnet sequence. Which he named 'yam'. After that he wrote enormous number of poetry and poems. his first published poetry collections were 'he prem he noishabda' (1961), 'Dharme acho jirafeo acho' (1965), 'Hemanter aranye ami postman' (1969), 'Jete pari kintu keno jabo' (1982), etc. However he received sahitya academy award for his poetry collection 'Jete pari kintu keno jabo'.

The seed of death was embedded in from his incipience. So perhaps the description of death has come back again and again in his poetry in various ways. In his first poem 'yam' he portrayed death as krishnarupmoyee, revealing his love for death. The dual portrayal of life and death is seen in shakti chattapadhyay's poetry after jibananda Das. we have never before witnessed such a poignant celebration of death by any other poet. He used extraordinary symbolism, imaginary and metaphor in his poetry to depict the various aspect of death. he was a playful poet so he didn't want to die, or yet go alone or untimely. That's why we hear him to say 'not to go alone untimely'. Expressing his complex views on death sometimes fearing it, sometimes accepting it as forthcoming. Sometimes ha has seen death in a playful way and sometimes, as a pilgrim on the path. There is a detail description in the main topic. My discussion topic is 'the notion of death in the poem and poetry of shakti chatttapadhay'. But we cannot say that he only wrote about death. Infact

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

he established with great honor in the branches of bengali literature and will remain so.

Discussion

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশের দশকের কবি হলেও তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে ষাট ও সত্তরের দশকে। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন তিনি। জন্মগ্রহণ করেন ২৫ এ নভেম্বর ১৯৩৩ এ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরের নিকটবর্তী বহুড়ুতে। তাঁর দাদামশাইদের পুরোনো শিরিকি বাড়ির সার্বজনীন কোনো আঁতুড়ঘরে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাল্যকাল কেটেছে পিতৃমাতৃহীন বহুড়ুতে দাদামশাইয়ের তত্ত্বাবধানে। কবি নিজেই বলেছেন—

> "বাবা মারা গেলেন যখন আমার নামমাত্র বয়স, তারপর থেকেই মামার বাড়ির গলগ্রহ - মা আর ছোট ভাই মামার বাড়ির সংসারে - কলকাতায়। আর আমাকে দাদু রেখে দিলেন তাঁর কাছে একাকী, মানুষ করবার জন্যে। সে বাড়িতে মানুষ ছিল তিনজনই। দাদু আমি আর আমার এক বালবিধবা মাসি।"[১]

বহুড়ুতে ছেলেবেলা কাটিয়ে জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয় কলকাতা থেকে। সেখানেই পড়াশোনা করেন। পড়াশোনায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা নিয়ে অমল গঙ্গোপাধ্যায় 'আমাদের দাদাভাই' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন-

> "শক্তির ম্যাট্রিক ও আই এর ফলও খুব উজ্জ্বল। সিটি কলেজে সে ছিল নিষ্ঠাবান ছাত্র। ...প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলায় অর্নাস নিয়ে পড়তে শুরু করার পরই সম্ভবত শক্তির রোজনামচায় পরিবর্তন এল। এই সময় থেকেই রাতে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পিছনে লোহার সিঁড়ি দিয়ে ফেরা শুরু হল, ওর জন্য বরাদ্দ হল ঢাকা দেওয়া খাবার— তাও কোনদিন খেয়ে কোনদিন না খেয়ে শুয়ে পড়ত ও। ...বহির্মুখী জীবনচর্যার সূচনা-লগ্নটি এখানে সহজেই চিহ্নিত হতে পারে। মফসসলে বড় হওয়া মেধাবী ছেলের, প্রেসিডেন্সির জাঁক সামলাতে না পেরে, কিছুটা বেপথু হয়ে যাওয়ার শৌখিন বোহেমিয়ানিজম, এটি ছিল না। নিজের মধ্যেকার ভাঙচুরকে, যাপনে এবং সৃজনে ছড়িয়ে দিতে চাওয়ার, এটিই ছিল শুরুর পদক্ষেপ।"[২]

কবির প্রথম সাহিত্যকর্ম শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে, গল্পটল্প নয়, একেবারে গোটা একটা উপন্যাস দিয়ে। তবে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে তর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পদ্য লেখা শুরু করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে হিসেব মিলিয়ে একটা সনেট খাড়া করি। পরেরদিন সুনীলের বাসায় যাই। লেখাটা অতি সাধারণ যম, ওর কাছে থেকে কবিতা-র ঠিকানা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে পাঠাই। সামান্য সংশোধিত হয়ে সে লেখা প্রকাশিত হয়; আর বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি–জ্ঞাপক চিঠির প্রেরণাতেই 'সুবর্ণ রেখার জন্ম' আর 'জরাসন্ধ' নামে আরো দুটি গদ্য কবিতার জন্ম হয়। 'সুবর্ণ রেখার জন্ম' কৃত্তিবাসের জন্য রেখে দিয়ে পরের ডাকেই 'জরাসন্ধ' বুদ্ধদেবের কাছে পাঠাই, পদ্য লেখার আকস্মিক জন্ম; প্রকৃতপক্ষে সেদিনই। কোনো প্রেরণা না কোনো সনির্বন্ধ ভালোবাসায় না– শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি এসে এইসব পদ্য লেখা।"[৩]

এরপর থেকেই তিনি একের পর এক কাব্য কবিতা লিখে চলেছেন। অজস্র কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৬১), 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (১৯৬৫), 'তিন তরঙ্গ' (১৯৬৫), 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' (১৯৬৯), 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' (১৯৮২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। তবে তিনি 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯৮৩ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমার আলোচ্য বিষয় 'মৃত্যু প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়'। মৃত্যু কবির চোখে সেই বালক বয়স থেকেই ধরা পড়েছে। কবির যখন সাত বছর বয়স, তখন কবির বাবার মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু কবির মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। কবি তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মৃত্যুবোধের কথা ব্যক্ত করেছেন—

> "বাবার কথা তেমন বিশেষ মনে পড়ে না - শুধু যেখানে ঐ বড়ুর বিশ্বজাঙ্গালে তাকে পুড়িয়ে এসেছিলো এক শিশু – সেখানে গেলে তার পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে পার হতে পারিনি কোনোদিন।"[৪]

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'যম' সেখানে তিনি নিজেই কৃষ্ণরূপময়ী মৃত্যুর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা লিখেছেন। জীবন ও অস্তিত্বের অনিবার্য পরিনাম হল মৃত্যু। এই মৃত্যু প্রসঙ্গ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার এসেছে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রূপে। জীবন ও মৃত্যুর এমন মিশ্র আলেখ্য জীবনানন্দ দাশের পর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই। শঙ্খ ঘোষ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে বলেছিলেন—

> "শক্তির কবিতা হলো জীবনের ভিতর দিয়ে মৃত্যু মোহনার দিকে যাত্রা।"[৫]

আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে বলেছেন—

> "মৃত্যুচেতনা তার কবিতার বিশেষত্ব হতে পারে, মৃত্যু বাসনা তার কখনও ছিল না... আসলে সে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মৃত্যুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আবার তার রহস্যময়তার প্রতি অপার কৌতুহল। কোনও কোনও সময় আবার সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। জীবনকে ভালোবেসে তার কবিতা।"[৬]

কবির তো জন্মলগ্ন থেকেই মৃত্যুবোধের বীজ নিহিত ছিল। জন্ম আর মৃত্যু যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। অস্তিত্ব রক্ষার দুই মেরুবিন্দুর এক অলক্ষ্য রহস্যসূত্রে বাঁধা—

> "In my beginning in my end"[৭]

এই পংক্তিতিটির সঙ্গে মিল আছে বহু কবিতায়—

> "হাঁটতে-হাটতে হাঁটতে-হাটতে
> একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে
> পৌঁছতে পারি পথ তো একটা নয়
> তবু সবগুলোই ঘুরেফিরে শুরু আর শেষের কাছে বাধা
> নদীর দুপ্রান্তেই কূল। একপ্রান্তে জনপদ অন্যপ্রান্ত জনশুন্য
> দুদিকেই কূল, দুদিকেই এপার-ওপার, আসা-যাওয়া
> টানাপোড়েন। দুটো জন্মই লাগে
> মনে-মনে কম করে দুটো জন্মই লাগে।"

কবির প্রথম কাব্যের পাতায় মৃত্যু ও বিপন্নতার অজস্র চিত্র ও অনুষঙ্গ ছড়ানো রয়েছে। ঐ কাব্যের 'জরাসন্ধ' কবিতায় দেখি—

> "আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"

কবিতার শেষ স্তবকে দেখি -

> "তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে
> অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।"

কোনো কবির আত্মপ্রকাশ এমন কাতর বিহ্বলতায় তা এর আগে আর কখনো শুনেছি বলে তো মনে হয় না।

জীবন ও মৃত্যু কবির কবিতায় পরস্পরের সহযোগী বা পরিপূরক হিসেবে ওঠে এসেছে, তা আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই তিনি একদিকে 'অপরূপ পৃথিবীর' কথা বলেছেন আবার অন্যদিকে সুদীর্ঘ জীবনের উদ্বৃত্ত উপভোগের লোভে আসক্তি জনিত যন্ত্রণার শিকার হতে না চেয়ে 'চতুরঙ্গ' কবিতায় বলেছেন—

> "আহা বেশিদিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
> কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি?
> অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি
> প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।"

কবির কবিতায় মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। শ্মশান, চিতাকাঠ, চিতাগ্নী, শবযাত্রী ইত্যাদি প্রসঙ্গকে চিত্রকল্প হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ দক্ষতার সাথে। তিনি তো প্রায় খেলাচ্ছলেই মৃত্যুকে দেখেছেন—

> "মৃত্যু, তুমি খাপছাড়া ইস্কুলের টিফিনের ছেলে/ কেউ কাছে কেউ দূর
> টিউকল, গোলপোস্ট, গোরস্থান, বাদুড়, দেবদারু
> মৃত্যু, তুমি অঙ্গভঙ্গি/ মৃত্যু, তুমি রাসবিহারীর ট্রামলাইন
> মৃত্যু, তুমি মেয়েদের চুল-ভরা নীল কাঁচপোকা
> আমার বারোটা রোদ, আমার ঘোর আঁধার!"

'শবযাত্রী সন্দিগ্ধ' কবিতায় দেখি কবি এক জনৈক শবযাত্রীর মৃত্যুর কৃষ্ণরূপ দর্পণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে। তাই তো কবিকে বলতে শুনি—

> "মরা পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ আমরা কি মরবো না
> খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া
> কালরাতে যে সাতপহর গাওনা হলো... কেউ ডেকেছে। কেন।
> আমরা কেউ ম'রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি করবো না।"

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জানতেন জীবন ও মৃত্যুর অপরূপ বোঝাপড়াই মানব জীবনের অস্তিত্ব। জীবনের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে মৃত্যু। কথাতেই তো আছে 'জন্মিলেই মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?' সে কথা তিনি ভালো ভাবেই জানতেন। সেই জন্যই তো তাঁর মনে হয়েছে মৃত্যুবোধ ব্যাতিরেকে জীবনবোধেরই বা অর্থ কী? মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কখনও রেহাই পায়নি এবং পাবেও না অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে জীবিত কোনো প্রাণীরই রেহাই নেই। মৃত্যু তার কাছে জীবনাকাঙ্ক্ষারই নামান্তর যেন—

> "জীবনের কোলে বসে মরণের এই অবসাদ কবে শেষ হবে?"

'আমি স্বেচ্ছাচারী' কবিতাটিতে দেখি সাধারণ মানুষ এক অপরিচিত মৃতদেহ নিয়ে শুরু হয়েছে নানান জিজ্ঞাসা, কিন্তু সমুদ্র তার কল্লোলের অবাধ্য ধ্বনিময় সেসব জিজ্ঞাসার কোনো তোয়াক্কা করে না। সেখানে মৃত্যুই যেন এক সর্বগ্রাসী নিয়তি—

> "তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
> জলে ভেসে যায় কার শব
> কোথা ছিল বাড়ি?
> রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়– 'আমি স্বেচ্ছাচারী'

কবি ছিলেন মদ্যপায়ীয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"মদের অনুপ্রেরণা ছাড়া কবিতার জন্ম দেওয়া যে অসম্ভব এমন একটা ধারণা তিনি প্রায়শই ব্যক্ত করেছেন।"[৮]

এক নিশীথ রাতের মদ্যপায়ীর টালমাটাল আপাত অসংলগ্ন স্বগত কথনে মৃত্যুর কথার বা জীবনরূপ মৃত্যুর এক অসাধারণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন—

"সারবন্দী জানালা, দরজা, গোরস্থান- ওলোটপালট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে মৃত্যু—সুতরাং
মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়!"

আবার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় জানতেন প্রকৃতির নিয়মে উত্তরাধিকারীর হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে একদিন চিরবিদায় নিতে হবে। আবার তিনি একাকীত্বও বড় একটা পছন্দ করেন না। তাই যাওয়ার সময় তিনি সকলকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যেতে চান। তবে অসময়ে নয়। এই জীবন রসিক কবিই আবার মৃত্যুর কথা ভাবেন। না ভেবে উপায় নেই, তাই ভাবেন—

"মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি-মৃত্যুর হাত থেকে পার নেই,
যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে।
বড়ো ফাঁদ ছোট হবে, করতল-মুষ্টিতে এসে জমে যাবে।
ভাগ্য রেখাগুলোর মতনই হয়ে যাবে স্বাধীনতাবিহীন, বন্দী।"

তিনি আবার মৃত্যুকে ভয়ও পেয়েছেন মৃত্যুভয় প্রসঙ্গে লেখা একটি কবিতা—

"মৃত্যুরে পেয়েছি ভয়। মরে যাবো তোমাকেও ছেড়ে?
একাকী, সমাজহীন। মানুষের করাঘাতে আর উঠি না জেগে এ কী ঘুম,
অলক্ষণ, এ কী ভার স্মৃতির মৃত্যুর আগে, স্মৃতি কি বস্তুত যাবে ছেড়ে!
তোমারে পেয়েছি ভয়, তুমিও তো মৃত্যুর পোশাক পরে নেবে..."

কবির জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই এই মৃত্যুভয়ের জন্ম হয়েছে। ভালোবাসা থেকেই জন্ম হয় সৌন্দর্যবোধের। আর সকল সৌন্দর্যের মর্মমূলে লুকিয়ে থাকে মৃত্যুর বীজ; সুন্দরের শরীরে তাই সর্বদাই বিষাদের স্পর্শ লেগে থাকে—

"সকল সুঠাম বৃক্ষে মৃত্যু ও স্তব্ধতা ঢাকা আছে।"

আবার জীবন রসিক তথা প্রেমিক কবি মৃত্যু সম্পর্কে ভয়ের পাশাপাশি কিভাবে মৃত্যুকে খারিজ করে দেওয়া যায় না বলে নিরুপায় হয়ে বলেছেন—

"শ্মশানের কোনো দরজা নেই—তাহলে বন্ধ করে দিতুম
শ্মশানের নেই তালাচাবি – তাহলে হারিয়ে ফেলতুম।"

মানুষখেকো চকিত বাঘের হানাদারির চিত্রকল্প হিসেবে চিতাগ্নির গ্রাস করার বিবরণ দিয়েছেন কবি। অগ্রজ কবি নবেন্দুর স্মৃতিতে লিখেছেন -

"বিষণ্ণ বাঘের মতো অগ্নি এসে তার নীল ঝোপে কবিকে টেনেছে আজ।"

আবার উপমার চিত্রকল্পের সাহায্যেও মৃত্যুর ছবি এঁকেছেন কবিতার মধ্যে —

"মৃত্যু এসে দাঁড়াবে এখানে
পুলিশের মতো স্পষ্ট।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মৃত্যুর অনিবার্যতা, জীবনের সীমা ছাড়িয়ে মৃত্যুর ব্যপ্তি। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষ ফিরে যায় তার উৎসমুখে, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এইসব ভাবনার মূল্যবান বিবৃতি দিয়েছেন—

> "সমস্ত মানুষ, শুধু আসে বলে যেতে চায় ফিরে।
> মানুষের মধ্যে আলো, মানুষেরই ভূমধ্য তিমিরে
> লুকোতে চেয়েছে বলে আরো দীপ্যমান হয়ে ওঠে—
> ...যে যায় সে দীর্ঘ যায়, থাকা মানে সীমাবদ্ধ থাকা।"

কবির কবিতায় 'যাত্রা'র কথা পাই, তবে সে যাত্রা জন্ম থেকে জীবনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর দিকে যাত্রা। মৃত্যুই ঐ পথযাত্রীর অবশ্যম্ভাবী গন্তব্য। আর সেই কারণেই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে। এই জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্তবিন্দুর যাত্রাপথের অবিরাম চলার বৃত্তান্ত শুনি 'পরশুরামের কুঠার' গ্রন্থের 'তুমি আছো ভিতের ওপর আছে দেয়াল' কবিতায়—

> "মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা
> জন্মের আগে মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ
> পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের। সেখানে মাইলপোস্ট নেই,
> নেই টেলিগ্রাফ-তার। মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ-পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের।"

কবির মনে হয়েছে মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। যাওয়ার সময় মানুষ জীবনের প্রতি সহজ মায়া ও মমতা ত্যাগ করা উচিৎ তাহলে জীবন অত্যন্ত সহজ হবে। মৃত্যুর প্রসঙ্গ জীবনবোধের সূচক হিসেবে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়—

> "যাবার আগে বোঝা হালকা রাখাই রীতি
> নইলে যে বাহকদেই কষ্ট।।"

মৃত্যু জীবনের এক অনিবার্য পরিনাম। মৃত্যু তো প্রতিটা জীবেরই ঘটে। তা বলে কী মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে? তাই কিন্তু একদমই নয়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুকেই জীবনের পরিসমাপ্তি বলে মনে করেননি। এজন্যই তো তাঁর ঘোষণা– 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি'। মৃত্যু তাঁর কাছে ভীতিপ্রদ হলেও সুন্দর এক মৃত্যুর কথাও তিনি বলেছেন—

> "মৃত্যুর কাছে আমার মৃত্যুর বিকল্প কিছু দেবার ইচ্ছে বহুকালের। বিকল্প সে মৃত্যুর চেয়ে কঠিন আর ভয়ঙ্কর কিছু হবে। আমি যে মৃত্যুর কথা বলি— সেই মৃত, তথাকথিত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে। ভূত হয়ে নয়। বিভীষিকা হয়ে নয়। এও এক ধরনের সুন্দর।"[৯]

মৃত্যুর রহস্য মণ্ডিত সৌন্দর্যের হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে কবি বলেছেন 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো'র পূর্বাভাস আগেই ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর এই আত্মকথনের মধ্য দিয়ে—

> "কেন অবেলায় যাবে? বেলা হোক, ছিন্ন করে যেও
> সকল সম্পর্ক।"

কবি ছিলেন বোহেমিয়ান জীবনযাপনে মগ্ন। তাই মৃত্যুও কবির কাছে ভ্রাম্যমাণ পথিকের নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—

> "যেতে যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
> তখনই ছেড়ে দেওয়ার সব আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে
> তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব
> হয়তো তুমি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না- শুধু যাওয়া।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রিয়বন্ধু বা অগ্রজ কবি সাহিত্যিকদের স্মরণে বেশকিছু শোককবিতা লিখেছেন যাকে এক কথায় এলেজি বলা যেতে পারে। যা নিয়ে একটি সংকলনও গড়ে ওঠেছে। এই সংকলন সম্পর্কে কবি পত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "মৃত্যু কবিকে খুব সহজেই স্পর্শ করতো, এবং প্রিয়জনের মৃত্যুতে খুব সাবলীলভাবে একটি একটি কবিতা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিবেদন করে তিনি স্মৃতিতর্পণ করতেন।"[১০]

মৃত্যুর নিঃসঙ্গতা থাকলেও শক্তির এলেজিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে মৃত্যুর কবিতা নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন তারই বেদনাদায়ক অনুভব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে বারবার পথিক ও তাঁর যাত্রার চিত্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেছেন। ঐ সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে এক অনবদ্য এলেজি রচনা করেছেন—

> "মানুষ তোমারি বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্ফিয়ুস তুমি জেনে গেলে সব
> তোমার মৃত্যুর পর আমাদের ফুলে- ভরা টব
> লুণ্ঠনের দাগ মেখে আজো তো ছাদেই পড়ে আছে
> ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে/ ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে।"

এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো ব্যক্তি পরিচয় দেননি। এবং তাঁর প্রতি এলেজি লেখকদের মতো কোনও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও নেই। বরং বলা যায় কবির নিজস্ব মৃত্যুভাবনা থেকেই এ রচনার জন্ম হয়েছে। আবার মৃত্যু নিয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সত্যি কথাকে অকপটেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি' কবিতায় বলতে শুনি।

> "মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের জন্যে তার শোক
> পড়ে থাকে কিছুদিন, ব্যবহৃত জিনিসেরা থাকে
> জামা ও কাপড় থাকে, ছেঁড়া জুতো তাও থেকে যায়
> হয়তো বা পা-দুখানি রাঙা হলে পদচ্ছাপ থাকে"

যে যায় সে চলে যায় ফেলে যায় শুধু জীবৎকালের কিছু এলোমেলো স্মৃতি চিহ্নমাত্র। সেই সমস্ত নিয়েই বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা চলতে থাকে নামমাত্র। মৃত ব্যক্তিটির সমগ্র দিক নিয়ে কখন ও আলোচনা হয় না, বা হতে পারে না। আমারা আরও বেশি শিহরিত হই যখন পড়ি।

> "দক্ষিণ-দুয়ারে এসে দাঁড়াবে নির্ঘাৎ
> চতুর্দোলা নিয়ে যম-
> অপমান লাগে...
> মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি।।"

আসলে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না যে এগুলো মৃত্যুর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা জীবনের প্রতি গভীর মমতা ও দায়বদ্ধতার এক বিস্ময় অভিমান ছাড়া কিছুই নয়। জীবনের প্রতি প্রবল মায়া ও মমতা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম মূলমন্ত্র। তাই তো তিনি মৃত্যুর পরেও মানুষের ফিরে আসার কথা বলেছেন—

> "মানুষের কিছু কাজ বাকি থাকে, মৃত্যুর পরেও
> তাকে ফিরে আসতে হয়, বাসা খুঁজে মানুষের মতো।"

'পথ' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রাত্যহিকতার দুঃখ বেদনা ভুলে এক মৃত্যুরূপ মোহনার দিকে বা অনন্ত ঐক্যের দিকে ভেসে চলার নামই তো জীবন, যা কবি 'হেমন্তের অরণ্যের আমি পোস্টম্যান' গ্রন্থের 'কোন পথে' কবিতায় দেখি সেই চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার।
কোন পথে? কোন পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না
আমরা যারা একবার বেরিয়ে এসেছি। তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না
পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে, নদী বেরিয়ে সমুদ্র— এই তো নিয়ম।
আমরা নিয়ম মাফিক পথ, পথ থেকে প্রান্তরে গিয়ে হাজির,
নদী থেকে সমুদ্রে।"

কবি একসময় বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। নকশালবাড়ি আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাল হাওয়া ও আগ্নেয়ময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল চারিদিকে। সেই পরিস্থিতির মধ্যেও কবির কাছে মৃত্যু এক স্বতন্ত্র তাৎপর্যে ধরা দিয়েছিল। 'হত্যা-সন্ত্রাস-ক্লান্তিও স্থবিরতা' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে দেখেছিলেন এক ইতিবাচক ব্যঞ্জনায়; যেমন -

ক) "বিমূঢ়তা থেকে ওঠে মৃত্যুর মহান জাতিস্মর।"
খ) "অন্যেরা ঘুমায় আজ ক্লান্ত শুধুমাত্র বেঁচে থাকে
মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারু বীথি।"
গ) "দিন যাচ্ছে, যাবে
প্রকৃত কি যাচ্ছে দিন? থেমে নেই? স্থবিরতা নেই?
মৃত্যুর মহান আসে জীবনের তুচ্ছতার কাছে।"

প্রথম দিকে কবির জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেও শেষের দিকে আসক্তি ও উদাসীনতার দ্বৈরথ হিসেবে কবিতায় ঘর ও বাহির, বন্ধন ও মুক্তির আশ্চর্য লীলাক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন তাও ছড়িয়ে আছে কবির কবিতার মধ্যে— 'মন্ত্রের মতন আছি স্থির' গ্রন্থের নাম কবিতায় কবি ঘরে ফেরার কষ্ট, নিজেকে নষ্ট করে ফেলার যন্ত্রণা, শ্মশান চিতার স্বাগত সংকেত, সন্তানদের জন্য অনুতাপ সবকিছু মিলেমিশে খুব বাজে অনুভুতি তৈরি হয়েছে, যা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"জীবনের উপরে ক্রোধ নিজেই জানি না
সে কারণে কষ্ট বেশি, নষ্ট হতে কষ্ট বেশি লাগে
...স্বাগত জানায় দূরে শ্মশানের ধোঁয়া
ক্রমশ পোড়ায় গন্ধ...
গঙ্গানদী, মন্ত্রপাঠ, চেলাকাঠ আর/ পরম কর্তব্যরত সন্তানের মুখ...
কষ্ট, যা ওদেরি জন্যে, নষ্ট হয়ে গেলে
কষ্ট যা ওদেরি জন্যে... বড়ো অভিমান।"

সংসারবিমুখ বোহেমিয়ানার মধ্যে দিয়ে মধ্যবয়স পেরোনো কবি যেন আসন্নসম্ভব মৃত্যুর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পরম মমতাময় কর্তব্য নিয়ে তাকাতে চাইছেন আত্মজদের দিকে। অনির্দিষ্ট কিছুর প্রতি পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে কবি তাঁর সব পিছুটানকে হারাতে বসেছিলেন, ঠিক তখনই কেউ যেন প্রত্যাবর্তনের সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনায়—

"শুধু প্রায় স্পষ্ট ঘূর্ণি, কথা বলে-
মৃত, দাগী তুমি/ পোড়া কাঠ ছুঁয়েছে কপাল...
ফিরে যাও/ এখনও সময় আছে, ফিরে গেলে সুসময় পাবে।"

পরিণত বয়সে এসেও শক্তির ভেতরে সর্বদাই ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি, বালক বয়েসের এক প্রতিমূর্তি। মৃত্যুকে তাই তিনি দেখেছেন বালকের মতো, বাল্যখেলার চিত্রকল্পে মৃত্যুকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"মৃত্যু যেন কানামাছি খেলে।
চোখবন্ধ ছেলেমেয়েদের খেলা এই ভূবনডাঙায়
কখনো আমাকে ছোঁয়, কখনো তোমাকে ছুঁয়ে দেয়...
...ভেতরে রয়েছে তারও প্রিয় ও অপ্রিয় বেছে নেবে, বিদায় জানাবে"

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'মৃত্যু' সম্পর্কে ক্ষোভ কিংবা অভিমান কিছুই নেই; জীবনের সমস্ত লাভ-ক্ষতি ও আশাহীনতা থেকে চিতার কোলে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন—

"নদীতে অনেক স্রোত, এ বয়সে তার সঙ্গে যোঝা খুবই শক্ত,
দেহকূপে অবাধে ঢুকছে
ঘুণ কুরে কুরে খায়...
যমেও নেয় না তাকে, আমাদের বুড়ী ঠাকুরমাকে
নেয়, দিতে পারলে নেয়, চিতা মাতৃমুখী।"

একদা স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রাম্যমাণ চঞ্চল কবি চিরপ্রণম্য অগ্নির তাপস্পর্শ পেতে জীবনের আবেদন ব্যক্ত করেছেন 'চন্দন'এর প্রতীকে—

"পায়ের নখর থেকে জ্বালিও না শিখর অবধি
আমি একা, বড়ো একা, চন্দনের গন্ধে উতরোল।"

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কবিতায় কবি বলেছিলেন 'একাকী যাবো না অসময়ে...সন্তানের মুখ ধরে চুমু খাবো' অথচ সেই কবি অকপটেই আবার স্বীকার করে নিয়েছেন কঠিন সত্যকে। সন্তানের মুখচুম্বন ফেলে রেখে তাঁকে ঠিক চলে যেতেই হবে এবং সে যাত্রায় নিঃসঙ্গতাই একমাত্র সঙ্গী। এ কথা ভেবে তিনি আবার বলেছেন—

"আমি যাবো সঙ্গে নিয়ে যাবো না কারুকে
একা যাবো।"

দীর্ঘ রোগশয্যার বিষণ্ণতার ও মৃত্যু ভাবনা ছড়িয়ে আছে 'আমাকে জাগাও' সংকলণের মধ্যে। আর সেই কারণেই দহন, চিতাগ্নি ও জীবনের সাথে মিশে থাকা বিভিন্ন উপকরণকে মৃত্যুর প্রসঙ্গ হিসাবে পাই 'হারায় না' কবিতাটির মধ্যে—

"তুমি গোটা জীবনে যা জ্বলতে পারতে আমিও জ্বলেছি
জ্বলেছি বলেই আছি, জ্বলন্ত সংসারে এক স্তব,
স্তবের মতন আছি, মৃত্যুময় বহু অনুভব
স্পর্শ করে, চিতা নম্র, তবুও তো চিতায় জ্বলেছি।"

অগ্রজ লেখক সন্তোষকুমার ঘোষকে রোগগ্রস্থ অবস্থায় দেখে একটি এলেজি কবিতা লিখেছেন—

"কীভাবে মুহূর্তে করছো, বিলাপ করছো না
হেসে হেসে বলছো, দ্যাখ জীবনে একবারই মৃত্যুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি!
কে যে কার সন্নিকট বলাও মুশকিল..."

বার্ধক্যজনিত শারীরিক ক্ষয় ও দূর্বলতার সংকেত পেয়েছেন তিনি এবং অপেক্ষায় আছেন অন্তিম যাত্রার—

"গায়ের চামড়া হয়েছে লোল, মুখের ভাঁজে বলিরেখা,
স্থবিরতার বাতাস বইছে দেহজোড়ের সমস্ত দিক...

...সময় হয়ে আসছে এখন নদীর জলে ভেসে যাবার
...পারান্ত কই? সেই যেখানে কিছুক্ষণের শান্তি পাবো।"

এখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার শুধুমাত্র মৃত্যু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হলেও বাংলা কবিতার জগতে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে গেছেন এবং আগামীতেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, পদ্য সমগ্র, এই সব পদ্য, যুগলবন্দী, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১১

২. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২৫৮

৩. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২৫৮

৪. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২৫৬

৫. ঘোষ, শঙ্খ, 'এই শহরের রাখাল', দেশ ২০ মে ১৯৯৫, পৃ. ২৭

৬. বিচিত্রা বিনোদন, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ৫১-৫২

৭. এলিয়ট, টি এস, ইস্ট কোকার (ফোর কোয়াবটেটস), অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৪৪, পৃ. ২০

৮. মিশ্র, ড.অশোক, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০২০), পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর ২০২০, আশ্বিন ১৪২৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৬১

৯. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, পদ্য সমগ্র (৩), আমিও শীর্ষক কবিতার টীকা অংশ, পৃ. ২০৯

১০. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, পদ্য সমগ্র (৫), পৃ. ৩০৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 460 - 470
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সময়ের ছায়াপথে জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে : কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ ও চিত্রশিল্পের প্রভাব

সঞ্চারী ভৌমিক
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sancharibhowmik33@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
Jibanananda Das, Bishnu Dey, Poetic imagery, Historical consciousness, Influence of colour, Modern poetry, Creative, Metaphor.

Abstract
Poetic imagery is quite popular throughout the history of world poetry. In the modern era, a turning point in Bengali poetry occurred during the 1930's. Starting from this period, poets extensively referred to imagery and art to garner a better understanding of their abstract ideas. Here we discuss how the two poets, Jibanananda Das and Bishnu Dey, successfully materialized their imaginative world by the contextual utilization of imagery and art, although with varied extents. Time consciousness has been identified as one of principal aspects of Jibanananda's poetry. His journey through time consciousness traverses the physical to the metaphysical realm. This journey from beginning to eternity can be divided into three stages.The diversity of rural Bengal, together with folk and mythological elements such as the 'Mangalkabhya' largely influenced the use of imagery in Jibanananda's works. The poetic use of metaphors to aptly convey his imagination and thoughts allow his works to be interpreted freely by the readers from different societal backgrounds. Influences from surrealism to impressionism can also be seen upon a more critical observation. On the other hand, Bishnu Dey wanted to express wisdom in poetry. Bishnu Dey's poetry brings out aspects of nature from contemporary situations. Just as paintings are created by collecting materials from literature, literature may also be influenced by the idea and thoughts of a painter. In his poetry, Bishnu Dey portrays the visibility of colour and the influence of painters like Pablo Picasso and Paul Cezanne are clearly notable. However, both the poets gave us poetic fragrance and helped transform the vision of a poem according to the intellect of the modern reader. Therefore, it can be said that the use of imagery in poetry and the influence of painting are interrelated.

Discussion

এক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সময়ের ঘষা লেগে হয়তো শিলালিপি ক্ষয়ে যায় কিন্তু কবিতার প্রতিটা অক্ষর হাতে মশাল নিয়ে জ্বলজ্বল করে সাহিত্যের দরবারে। এককালে কবিতা ছিল গানের প্রজা। পদাবলীসহ বিভিন্ন কাব্য পরিবেশিত হত সুরের মাধ্যমে। যদিও তখন যে কোনো সাহিত্যকেই কাব্য বলা হত। বস্তুত যা ছিল গেয়-সাহিত্য। রাজ-রাজাড়াদের সভাতে সুরেলা আবৃত্তি করে তা পরিবেশিত হত। কিন্তু কবিতা মূলত পাঠকের কাছে এক নিভৃত পাঠ, নিবিষ্ট পাঠ যা পড়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক ছবি – যে ছবি মনের ভিতরে সৃষ্টি করে সূক্ষ্মবোধ। শব্দ দিয়ে মালা গাঁথতে গাঁথতে কবি জন্ম দেন তাঁর ক্যানভাসে এক ছবির। তাই কবিতায় চিত্রকল্প এবং চিত্রশিল্পের ভূমিকা থেকেই যায়। চিত্রকল্পই কবিতাকে পাঠকের মনের গভীরে আধিপত্য বিস্তার করতে যে বহুল ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে খুব একটা সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই। আবার রঙ–তুলিতে আঁকা ছবিও তো কবিতা হয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও। তাই চিত্রশিল্পে, চিত্রশিল্পীর প্রভাবও কবিতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। চিত্রশিল্পী যেমন কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্য– কবিতা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন – তেমনই কবি ও নিজের ক্যানভাসে চিত্রশিল্প এবং শিল্পীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জন্ম দিয়েছেন শব্দের ছবি। কবিতার চিত্র। বাংলা কবিতায় যে অসীম রত্নভাণ্ডার রয়েছে তাতে খুঁজলে কবিতায় চিত্রকল্প ও চিত্রশিল্পের মনি-মুক্ত খুঁজে পাওয়া খুব একটা অসম্ভব নয়। এই আলোচনার মূল বিষয় হল বাংলা কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ এবং চিত্রশিল্পের প্রভাব।

অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে অ্যারিস্টটলের গুরু প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল দুইজনেই শিল্পকে অনুকরণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ হল এই যে প্লেটো বলেছেন শিল্প তথা সাহিত্য সত্যের ছায়ার ছায়া এবং কবিরা মিথ্যাচারী তাই আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করা উচিত। এই অভিমতের বিরোধিতায় অ্যারিস্টটল বলেন অনুকরণ হলেও শিল্প বা সাহিত্য আসলে পূরণকারক সত্য। কবি তো মিথ্যাচারী নন বটেই বরং তিনি দ্রষ্টা, যিনি ইতিহাসের তথ্যের মধ্যেকার অসম্পূর্ণতা গুলো, তাঁর দৃষ্টির দর্শণের মধ্যে (কল্পনার মানসী) দিয়ে পূরণ করেন।

অ্যারিস্টটল 'অনুকরন'-এর মধ্যে তিনটে জিনিস দেখিয়েছেন – ১। বিষয়
২। মাধ্যম
৩। পদ্ধতি

এই আলোচনায় মাধ্যম হিসেবে সাহিত্য সংরূপ কবিতা এবং বিষয়ের দিক থেকে কবিতার চিত্রকল্পের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা এবং তা করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম। একজন কবির স্মৃতিলোক বা তার অভিজ্ঞতার জগতকেই পাঠক তাঁর শিল্পকর্মের দ্বারা অনুভব করে থাকে। অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির মেলবন্ধনে কবির সৃষ্টি, তাঁর কবিতা আরও বেশি করে প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাঠক মহলের দরবারে। স্মৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ এইসবের প্রেরণায় কবির কল্পনালোক সৃষ্টি করে চিত্রকল্পের কুঞ্জবনকে। অনুভূতির পুষ্পমালা বিকশিত হয় কবিতায়, কবিতার চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। তাই কবির প্রতিটি চিত্রকল্প কবির অভিজ্ঞতার নিদর্শন। জীবন এবং জগতকে তিনি যে ভালোবাসার এবং অনুভবের অনন্যমূল্যকে উপলব্ধি করার জন্যই কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পের আলোচনার প্রয়োজন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা কবিতার কালান্তর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বড় কবিদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আকার এবং প্রকার, বিপুল এবং জটিল বলেই তার প্রকাশের বহুধা কষ্টসাধ্য। তথাপি এ পথেয় কষ্টভারও পদে পদে কবি– কীর্তির প্রসাদেই লাঘব হয় বলে, পথের প্রলোভন কখনও হ্রস্ব নয়।"[1]

স্মৃতির কাজই হল অনুষঙ্গ– সৃজন। অনুষঙ্গ সৃজন ব্যাতিরেকে চিত্রকল্প গঠিত হয় না। কবির জীবনের অভিজ্ঞতাকে সূত্রবদ্ধ করতে চিত্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবেগ এবং মননের সুসমঞ্জস সমন্বয়ের অনুকূল পরিবেশে অনুষঙ্গ সৃজন ক্রিয়ার স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছন্দতা রয়েছে। শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার প্রয়োজনীয় পূর্বাবস্থা তখনই গঠিত হয় যখন মন অব্যর্থ শৃঙ্খলায় শিল্পলক্ষ্য হয়ে নিজের সমগ্রতাকে বেঁধে ফেলতে পারে।"[২]

মনের অনুষঙ্গ সৃজনী – ক্ষমতার স্বাচ্ছন্দ্য এবং বলা যেতে পারে এই দ্বৈতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের জন্ম হয়। মনের উপরিতল যখন একটা নির্দিষ্ট শিল্পলক্ষের দিকে কেন্দ্রীভূত, তখন অবচেতন মন নেপথ্যে ব্যস্ত অনুষঙ্গের পরম্পরা সৃজনের জন্যে। সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এবং উপলব্ধি তাঁর চেতনার বিকাশকে উজ্জীবিত করেন। তাই চিত্রকল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি আবশ্যিক ভাবে এসে যায়। এবং বোঝা যায় শুধুমাত্র উদাহরণ সরবরাহ করা চিত্রকল্পের কাজ নয়। যেহেতু এটা সমগ্র মানসের সৃজনী ক্রিয়ার অনিবার্য প্রকাশ, তাই এর বিচারও হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। স্মৃতি, আবেগ এবং মুক্তি ন্যায়ের ত্রি-ধাতুতে কল্পনা গঠিত; তাই, মনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই শক্তির যোগাযোগ এবং সহযোগ ঘতে কল্পনার সাহায্যে। সুতরাং, চিত্রকল্প কল্পনার বস্তুরূপায়ণ। জীবন সংক্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তনে এই রূপায়ণের ও পরিবর্তন ধ্রুব।

সে কারণে প্রাচীন মহাকাব্যের কবিরা যখন সাদৃশ্য বিবৃত করতে গিয়ে উপমামূলক চিত্র রচনা করেছেন, তখন তাঁদের ব্যবহৃত উপমা রাশিতে আভাসিত হয়েছে জীবনের বহুধা বৈচিত্র।

> "সিংহ তুল্যগতি, নগেন্দ্র তুল্য বিক্রম, কাশ্মিরী তরুঙ্গমীর ন্যায় সুন্দর' – প্রভৃতি উপমা যখন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তখন এগুলি জীবন ও জগত সমন্ধে কবির বাস্তব আগ্রহকে ধারণ করেছিল, জীবনের ঐশ্বর্যের বিপুলতাকে ব্যক্ত করাই ছিল এদের কাজ।... সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, অরণ্য জীবনের অকস্মাত সংস্পর্শে উদ্ভূত বিষয় অপেক্ষা, সার্বজনীন অরণ্য – স্মৃতিই মহাকাব্যের জুগের এবম্বিধ চিত্রকল্প সৃজনের মূলে।"[৩]

বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের বা বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সুপ্রকাশ সাদৃশ্য রচনার ভিতর দিয়ে জীবনের বিশাল বিকল্প রচনার চিত্রপটকে কবি পূর্ণ করেন না। তাঁর লক্ষ বস্তুরূপের পরিভাষায় নিজের আত্মভাবনাকে ব্যক্ত করা। বিষয়ের আপাত সাদৃশ্যের প্রয়োগ একান্ত ভাবেই বহিরঙ্গ ব্যাপার। চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবির অনুভূতিকে ব্যাখ্যার উপক্রম হিসাবে দেখা হয়। কী ভাবে দেখছেন, ভাবছেন, অনুভব করছেন, আধুনিক কবির কাছে চিত্রকল্প সেই তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। তাই কবিতার সমগ্রতার টানে এর প্রস্ফুটন, আবার সেই প্রস্ফুটিত চিত্রকল্প তার বিনিময়ে কবিতার সমগ্রতাকেই সমৃদ্ধ করে। বাস্তবতার গভীরকে সন্ধান করাই এর উদ্দেশ্য।

> "তাই কীটস যখন পাঠকের কাছে রসসিদ্ধ কবিতার সার্থক চিত্রকল্পের প্রসঙ্গে তাকে সূর্যোদয় মধ্য সূর্যের কিরণ সম্পাত এবং অস্ত সূর্যের উত্তর গরিমার সঙ্গে উপমিত করেন তখন কবি মানসে চিত্রকল্প প্রস্ফুটনের ব্যাপারটা কতটা হৃদয়ঙ্গম হয়।"[৪]

প্রকৃত পক্ষকে কবির অভিজ্ঞতা কি আকারে রূপ গ্রহণ করে, কবি নিজে কী ভাবে ব্যাপারটাকে অনুভব করেছেন সেইটাই চিত্রকল্পের মূলে রয়েছে।

> "রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'রাত্রে ও প্রভাতে'র শেষ স্তবকে – 'দেবী তব সিঁথি মূলে লেখা নব অরুণ সিঁদুর রেখা। তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয় তরুণ ইন্দুলেখা' – এই চিত্রকল্পে শঙ্খবলয়ের আভাসের প্রসঙ্গে তরুণ ইন্দুলেখার কল্পনা বাংলা কাব্যধারায় বৈষ্ণব পদকারদের দৌলতে আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু এই পূর্বপরিচিতির জন্য চিত্রকল্পটি পাঠকদের কাছে তার তাৎপর্য হারায় না।"[৫]

এর থেকেই বোঝা যায় সমগ্র কবিতায় মৌলভাব প্রেরণার আকর্ষণে চিত্রকল্পএর ভূমিকা রয়েছে। চিত্রকল্পের সার্থকতায় পাঠের পরিসমাপ্তিতেও মনে রয়ে যায় প্রভাব, যার আলকে কবিতা আরও বেশি করে আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠে এবং সেটাই কবিতার উদ্দিষ্ট রস – লক্ষ্য।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দুই

জীবনানন্দ দাশ এমন একজন কবি যিনি শুধুমাত্র তাঁর সময়কালের বাঁধনে সীমাবদ্ধ নন, তাঁর কবিতা সেই মশাল হাতে নিয়ে যাত্রা করে সৃষ্টির আদি থেকে অনন্তের পথে। তাঁর যাত্রা সময়চেতনার থেকে মহাসময়চেতনার দিকে, যার ব্যাপ্তি কাল থেকে মহাকালের দিকে। শিল্পী যখন শিল্প সৃষ্টি করেন তখন তাঁকে জীবনের প্রবাহমান ধারা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। মানব সভ্যতার সেই অস্তিত্বের সন্ধান শিল্পের মধ্যে নিয়ত কাজ করে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার দিকে তাকালে একটা যাত্রা লক্ষ করা যায়। সমকালের ক্ষয়ের দ্বারা পীড়িত, ব্যথিত কবি আশ্রয় নিতে গেছেন প্রেমের কাছে কিন্তু প্রেম তাঁকে শান্তি দেয়নি তখন তিনি আশ্রয় নিতে গেছেন মৃত্যুচেতনার কাছে। এই চেতনাবোধের শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চিত্রকল্পের নির্মাণ।

"সব ভালোবাসা যার বোঝা হল, দেখুক সে মৃতুকে ভালোবাসে" কিন্তু মৃত্যুচেতনাও তাঁকে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি দিল না তখন তাঁর চূড়ান্ত গন্তব্য হয়ে দাঁড়াল মহাকাল চেতনা। জীবনানন্দ দাশের এই সময়চেতনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে –

১. পরিপার্শ্বগত সময় চেতনা – যা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'রাত্রি', 'তিমির হননের গান', '১৯৪৬-৪৭' ইত্যাদি। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের 'তিমির হননের গান' এবং 'রাত্রি' কবিতাটির সুর প্রায় এক যেখানে মহানগরীর রাত উঠে এসেছে কবির কলমে।'তিমির হননের গান' কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ১৯৪২ সালের শেষ দিকের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ইংরেজদের 'পোড়া মাটি নীতি' যার ফলে হাজার হাজার গ্রামের নিরন্ন মানুষ মহানগরীতে ছুটে আস্তে বাধ্য হয় খাদ্যের জন্যে। কবি লেখেন –

> "আরো বেশি কালো কালো ছায়া
> লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
> মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
> নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
> নর্দমায় নেমে –
> ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুতপাথে গিয়ে
> নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।"

কবি এই কবিতায় 'মধ্যবিত্তমদির জগতে'র কাছে একটা প্রশ্ন যা তাঁর আত্মজিজ্ঞসাও – 'আমরা কি তিমির বিলাসী?'

২. পরিপার্শ্বের অভিঘাতে তৈরি হওয়া আত্মগত সময়চেতনা – এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল 'বোধ', 'আটবছর আগের একদিন', 'শিকার' ইত্যাদি।

রক্তাক্ত মানবতার আর্তনাদ জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বোধ' কবিতায় যে তীব্র ভাবে এসেছে তা আর অন্য কোথাও আসে নি। কবি সমকালীন অস্থিরতার গভিরতর কেন্দ্রে প্রবেশ করেছিলেন। সময়ের ক্রান্তি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ক্রান্তির সঙ্গে একই বিন্দুতে মিলে গেছে। মানুষের জীবন থেকে যে সহজতা হারিয়ে যাচ্ছে সেই কাথা উঠে এসেছে। কবি এই কবিতায় লেখেন – 'সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!' এবং 'হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?' – এর মধ্যে সময়ের, সমাজ এবং জীবনের সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবনের জটিলতা এক হয়ে গাছে। একদিন যা সহজ ছিল ,সহজতা ছিল মানুষের মধ্যে তা বর্তমান সময়ে জটিল হয়ে গাছে। 'স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে' – স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে আগামী আর বোধের মধ্যে রয়েছে অতীত ও আগামী উভয়ই, এই 'বোধ' শান্তি দেয় না। কবিকে তাই লিখতে হয় –

> "সকল লকের মাঝে বসে
> আমার নিজের মুদ্রাদোষে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমি একা হতেছি আলাদা?’

৩. সময়চেতনার তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় ‘বড় আমি’র সময়চেতনাকে। চলে আসছে কালের নদীতে ভেসে যাওয়া সেই নৌকা ইতিহাস চেতনার কাছে। মানবের সময়চেতনার মূলবক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে এখানে – ইতিহাস, ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে সময়ের মানচিত্রকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, ‘বনলতা সেন’ হল যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কবি এডগার অ্যালান পো এর ‘হেলেন’-এর প্রতিচ্ছবি যার মধ্যে উঁকি মেরে যায়। প্রাচীন ও আধুনিকের মেলবন্ধন যেন কাঠামো গড়ে তোলে জীবনানন্দের কবিতার। যেখানে এক প্রেমিক হৃদয় এখানে হাজার বছর ধরে পথ হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় ইতিহাসের কাছে। সিংহলের সমুদ্র, মালয় সাগর, আশোক সবাইকে ছেড়ে আসতে চায় তার কাছে যে তাকে ‘দু দণ্ডের’ জন্যে শান্তি দিয়েছিল, সেই ‘নাটোরের বনলতা সেনে’র কাছে যে নিজেই সাক্ষাৎ ইতিহাস প্রতিমা – তার চুল ‘অন্ধকার বিদিশার নিশা’ আর ‘মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য’। তাই কবি সব শেষে লেখেন –

> ‘সব পাখি ঘরে আসে – সব নদী, ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন’।

এই ইতিহাস চেতনা, যাত্রাপথ সম্পর্কে কবি নিজেই লেখেন—

> “মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।”[৬]

> “সকলেই কবি না। কেউ কেউ কবি।”[৭]

এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন যিনি সমগ্র পাঠককুলকে তিনি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পাঠকের চিন্তনে পৌঁছানো। কবিতার নিভৃত পাঠ পাঠক হৃদয়ে তৈরি করেছে মুগ্ধতা। তাঁর কবিতায় শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা ও চিত্রকল্পের মাধুর্য নির্মিত হয়। বিষন্ন হেমন্তের সন্ধ্যার মতন যার জীবন নদী প্রবাহিত হয়েছে তাঁর কবিতায় জীবন বোধ যে গাঢ় ভাবে ফুটে উঠবে এ তো ভীষণই স্বাভাবিক। তাঁর কবিতার চিত্রকল্প হয়ে ওঠে জীবনের দলিল। এখানে কবির ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’, ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘শিকার’, এবং ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত আরও একটি কবিতা ‘শব’ এর চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হল।

> “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাই না আর ...
> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
> এমনই হিজল – বট – তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
> দেখেছিল; ...”

মফঃস্বল থেকে শহরে আসা কবির কবিতায় যে গ্রামবাংলার কথা, তার পরিবেশের কথা উঠে আসবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, বাংলার পল্লিগ্রামের প্রতি। ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ পুরোনো দিনের বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করা – চাঁদ সদাগরের প্রসঙ্গ তুলে, বেহুলার প্রসঙ্গ তুলে। এই কবিতায় প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায় রয়েছে একটি পাখি, দুটি চরিত্র এবং স্বয়ং কবি নিজে। এছাড়াও শ্যামার গান, ছিন্ন খঞ্জনার নাচের প্রসঙ্গ এসেছে। ডুমুর গাছের ‘ছাতা’ র মতো বড় পাতার নিচে এক দোয়েল পাখির বসে থাকা কিংবা চাঁদ সওদাগর সমুদ্রে দেখতে পেয়েছিল বাংলার গাছ-গাছালির ‘নীল ছায়া’। বেহুলা নদীর চড়ায় ‘কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে’ তখন ‘সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট’ দেখেছিল এবং ‘শ্যামার নরম গান’ শুনে ছিল। সেই বেহুলাকেই পরিস্থিতির চাপে ‘ছিন্ন খঞ্জনা’ র মতো নাচতে হয়েছিল ইন্দ্রের সভায়। তার পায়ের ঘুঙ্গুরের শব্দে কেঁদে উঠে ছিল ‘বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল’। প্রথম ছয় লাইনে কবিকে দর্শক হিসেবে পাওয়া যায়, যিনি সব তা দেখছেন আর পরের দিকে দর্শক ‘চাঁদ’ – প্রশ্ন উঠতে পারে এ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোন চাঁদ? কোন বেহুলা-ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁদের তুলে আনা হয়েছে। যেহেতু এখানে আলোচনার মূল বিষয় চিত্রকল্প তাই পল্লি বাংলার প্রকৃতি-ই হয়ে উঠেছে এর মূল বিষয়।

ভোরের দোয়েলকে গাছের পাতার মধ্যে বসে থাকতে দেখা যায় কিন্তু কবি এখানে 'ছাতা' শব্দটি ব্যবহার করে এর গভীরতা কে আরও বৃদ্ধি করেছেন। 'ছাতা' এখানে আশ্রয়, যে আশ্রয়ের নিচে নিশ্চিন্তে বসা যায় আবার মঙ্গল কাব্যের মনসামঙ্গল থেকে চাঁদ সওদাগর, বেহুলার প্রসঙ্গকে তুলে এনে বাঙালির অতি পরিচিত চরিত্রদের স্থান দিয়েছেন। তারা চিত্রকল্পের সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে উঠেছে বাস্তব। চাঁদ সওদাগর মধুকর ডিঙা নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করলেও হিজল–তাল–তমালের নীল বন দেখেছেন, নাকি এ কবির মনের মাধুরি মেশানো তা স্পষ্ট হয় না কিন্তু পাঠকের কাছে তাল–তমাল বনের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। বঙ্গ-প্রকৃতির রূপের বর্ণনাতে রোমান্টিক চেতনাও যে উজ্জীবিত হয় পাঠক মনে সে কথাও বলা যায়। পৃথিবীর রূপ খুঁজে খুঁজে অবশেষে যিনি পরিতৃপ্ত হতে চান বাংলার মুখ দেখে, সেই কবির চোখে সমুদ্রে ধরা পড়ে বাংলার পত্রপল্লবের নীল ছায়া। বেহুলার মধ্যে ফুটে উঠেছে বাঙালি গৃহবধূর চিত্র; স্বভাবে, নিষ্ঠায়, পতিব্রতা ধর্মে যে বাঙালি মননকে ছুঁয়ে যায়। বেহুলা গাঙুড়ের জলে ভেলা ভাসিয়ে স্বর্গে গিয়েছিল, মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে। বেহুলা যদি এই কবিতার নায়িকা হয় তাহলে তাকে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন কবি। তার যন্ত্রণা, দুঃখ, স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্যে দেবসভায় নাচ – এই সবটায় ছুঁয়ে যায় বাঙালি পাঠকের হৃদয়। খঞ্জনা, যে মুক্তির প্রতীক তার ডানা কেটে নেওয়ার সঙ্গে, ছিন্ন খঞ্জনার সঙ্গে বেহুলার যন্ত্রণাকে কবি একাত্ম করেছেন, বাংলার নদী নালা মাঠ ভাঁট ফুল ও যে মর্মাহত তার প্রসঙ্গও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রকল্পের মধ্যে।

কবি ছবির পরে ছবি এঁকেছেন। বাংলার রূপ যে অপরূপ সেই অপরূপ রূপের বিস্ময় ফুটে উঠেছে এবং সঙ্গে রয়েছে মুগ্ধতা। কবিতার অনেকটা জুড়ে অন্ধকার–ছায়াচ্ছন্নতা রয়েছে। ভোরের আবছা অন্ধকারের কথা দোয়েল পাখির প্রসঙ্গে কিছুটা বোঝা যায়। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই 'পল্লবের স্তূপে' – শুধু ভোর – রাত মেশানো রঙে আঁকা আবার জাম বট কাঁঠাল হিজল অশ্বত্থ এর প্রসঙ্গ আছে। যাদের রঙ একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। শটি বনের ছায়া এসে মিশে সমুদ্রে, নীল ছায়া রয়েছে – রঙ হালকা কালো এবং কোমলতাময়। চিত্রকল্পের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ভাবে শব্দগুলি বিন্যস্ত তাতে নদীর চড়া কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় কখনও উজ্জ্বল ছিল, তবে বর্তমানে তা মৃত – এ এক অদ্ভুত আবেদন সৃষ্টি করে। মরে যাওয়া জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে 'সোনালি' ধানের উজ্জ্বল চমক এবং তারপরেই 'অসংখ্য অশ্বত্থ বটে'র আরণ্যক গহনতা। সোনালি রঙ কি আশার স্বপ্ন? গহন বন কি দৃঢ় সীমাহীন বাধার প্রাচীর? ছবির মেজাজ আর কোমল নেই – অন্ধকারে জ্বলে উঠেছে 'জ্যোৎস্না' আর 'সোনালি' শব্দ দুটি। কবিতার ভাষাচিত্রগুলি বোধগম্য এবং কবিতার ভাব প্রকাশে চিত্রকল্পের প্রয়োগ যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই কবিতার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে বাঙালি আবেগের দলিল। এখানে গাঙুড়ের স্রোত বয়ে আনে বাংলার গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্যকে যেখানে বারে বারে উঠে আসে বেহুলার মতন নারীর অসহয়তার কাঁদন।

একটা ভোর এবং একটা রাতের দৃশ্যকে একটার পর একটা করে রেখে সাজিয়ে তোলা হয়েছে 'শিকার' কবিতার অবয়ব। কবিতার প্রথম অংশে একটি গ্রামের ছবি এঁকেছেন যার প্রকৃতির চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে চমৎকৃত। কবি ভোরের আকাশকে যেভাবে তুলনা করেছেন 'ঘাসফড়িঙের দেহের মতন কোমল নীল' এবং চারিপাশের সবুজের বিশেষণ হিসেবে, পেয়ারা ও নোনার গাছ কতটা সবুজ তা বোঝানোর জন্যে 'টিয়ার পালকের মতো' শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছেন। এসেছে পাড়াগাঁর গ্রাম্য কিশোরীর কথা। শীতের রাতের যে চিত্রকল্প কবি অঙ্কন করেছেন তাতে শরীরের উষ্ণতা বাড়ানোর জন্যে যে আগুন জ্বালিয়েছেন গ্রামের মানুষেরা তার লাল রঙকে 'মোরগফুলের' মতন বলে তুলনা করেছেন। উপমাতে অভিনবত্ব যা চিত্রকল্পের ভিতকে মজবুত করে তুলেছে।

> "সূর্যের আলোয় তার রঙ কুসুমের মতো নেই আর;
> হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইছার মতো।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপমা প্রয়োগের অভিনবত্ব চিত্রকল্পকে যে মাধুর্য দান করেছে তা বোঝা যায় দেশোয়ালীদের মনের ভিতর জ্বলে থাকা নিভন্ত আগুনকে রোগা শালিকের বিবর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে, যার রং পরেরদিন সূর্যের আলোয় আর কুসুমের মতো নেই। কবি এখানে এক হরিণের জীবনে দেখিয়েছেন, যেখানে শীতের রাতে হরিণ বাঘের থাবা থেকে নিজের প্রাণকে বাঁচাতে পারলেও সভ্য-শিক্ষিত মানুষের লোভের হাত থেকে নিজের প্রাণকে বাঁচাতে পারেনি। আসলে জঙ্গলের প্রত্যক্ষ শত্রুর কথা হরিণ জানে তাই শৈশব থেকেই বাঁচার কৌশল তার রপ্ত কিছু গুপ্ত শত্রুর তীক্ষ্ণ, ধূর্ত চাতুরী কৌশল সম্পর্কে হরিণের জ্ঞান ছিল না তাই মৃত্যু হয়ে ওঠে অনিবার্য। হরিণের মৃত্যু। শহুরে শিক্ষিত মানুষেরা গ্রামে গিয়ে হিংস্র লালসার উল্লাসের চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে কবিতার দ্বিতীয় অংশে। যেখানে কবিতার শুরুতে গ্রামবাসীদের হিমের রাতে নিজেদের শরীর গরম রাখার জন্যে জ্বালানো আগুনের লাল রঙকে মোরগ ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন আবার পরেরদিন সকালে নদীর জল হরিণের রক্তে লাল হয়ে ওঠাকে মচকাফুলের পাপড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন – রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে চিত্রকল্পের ভিতর ফুটে উঠেছে ইমপ্রেশানিজমের ছাপ। শহুরে মানুষের নির্লজ্জ উল্লাস, উচ্ছ্বাস এবং উন্মাদ-উদ্দাম মত্ততা তা বুঝিয়ে দিয়েছে কবিতার শেষ তিন পংক্তি। এই শেষ তিন পঙক্তি তে যে চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে তাতে ঘটেছে উল্লম্ফন রীতির প্রয়োগ –

> "সিগারেটের ধোঁয়া;
> টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
> এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক – হিম – নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।"

'শব' কবিতায় উঠে এসেছে একটু অপরিচিত অন্য ছবি। প্রকৃতিরই রূপ কিন্তু কোথাও কোনো বিরূপতা নেই। এমন একটা জায়গা যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না শরের ভিতর ভেজে। কিন্তু সেই জায়গার চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি অন্য ভূমিকা পালন করেছেন–মশারা শরের ভিতর নিজেদের ঘর বানিয়েছে, যা অন্যরকমের ছবিকে তুলে ধরে। স্থানটিতে রুপালি চাঁদের আলোয় জলে শরবনে যে খেলা তার সঙ্গে মশার আড্ডাকে মেশাতে কবির রূপ চিত্রকল্প কল্পনার ক্ষেত্রে বাধেনি। শব্দ দিয়ে নিজের ক্যানভাসে তিনি চাঁদের আলোয় জলে শরবনের যে খেলা আর তার সঙ্গে মশাকে মিলিয়ে দিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। আবার এসেছে সেইসব 'নীল' মশাদের প্রসঙ্গ, রুপালি জ্যোৎস্না আর নীল মশা। এই রঙে ডুব দিয়েছেন কবি বিশেষত সেই নীল মশা গুলিকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে সোনালি মাছের দল। সোনালি মাছ আর রুপালি জ্যোৎস্নার মধ্যে চিত্রকল্পের ঘনঘটা বয়ে চলেছে। মশাকে কবিতায় জায়গা ছাড়তে আপত্তি থাকলেও রঙিন মাছেদের জলক্রীড়াতে কারোর মানসিকতার সমস্যা হয় না। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে কবিতার যে শান্তি তা ভঙ্গ কে করছে? – মশার দল নয়, সোনালি মাছ। তারা শুধু যে সোনালির মধ্যে নীলকে ঘিরে এক বর্ণাঢ্যতা তৈরি করতে চাইছে তাই নয় পরম আকাঙ্ক্ষায় খুঁটে খুঁটে মশা খাচ্ছে মাছেরা।

> "নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হয়ে আছে চুপ
> পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ;"

মাছগুলি নির্জন, নদী একাকী, মাছেদের মৌনের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'গাঢ়' শব্দে এই নদীতে এক গাম্ভীর্য ও গভীরতা এসেছে। পৃথিবীর একপাশে যে নদী তা আবার কান্তারের এক পাশেও। পৃথিবীর এক পাশে একটা বড় ও অলৌকিক ভাব আনে, যেন এ বৈতরণী। কবি সম্ভবত 'অন্য' নদীর কথা বলতে আকাশ-নদী কে বলেছেন। যে নদীতে বিকেলে রাঙা মেঘের ছায়া পড়ে এবং সন্ধ্যার রাতে হলদে জ্যোৎস্না মাখামাখি করে সেই রূপের নদীর চিত্রকল্প কবি অঙ্কন করেছেন। আলো অন্ধকার ফুরিয়ে যাবার মধ্যে অপার্থিবতা আছে। এইসব আলো, এইসব অন্ধকার যা চেনা নয়, এবং সে জগৎ ও দুরূহ কল্পনায় স্নায়ুকোষে ভরে নিতে হয়, যেখানে আলো ও অন্ধকার নেই – সেই সময়ে মাছেদের মেঘেদের জ্যোৎস্নার নানা রঙ ধরা পড়ে। এই কবিতা যেমন রঙের তেমনি নীরবতার বর্ণাঢ্য নীরবতা এবং অনন্ত মৃত্যু প্রসঙ্গের চিত্রকল্প নির্মিত হতে দেখা গেছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিন

সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহ করে যেমন ছবি আঁকা হয়েছে তেমনই চিত্রশিল্প থেকে রসদ গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিকেরা। সাহিত্যের একটি বিশেষ সংরূপ হল কবিতা। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতার শরীর নিয়ে নানারকম ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চিত্রকর যেমন রঙ তুলি দিয়ে ছবির কবিতা লেখেন ঠিক তেমনই কবি ও তাঁর শব্দ বীজের বুননের মধ্য দিয়ে ছবি আঁকেন। এবং সেক্ষেত্রে চিত্রশিল্প এবং শিল্পীর প্রত্যক্ষ প্রভাবও কবিতার উপরে লক্ষ করা যায়।

উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো সত্তর পর্যন্ত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের মূল ছবিটির তাৎপর্য বুঝতে ভুল হয়না। এই সময়ের প্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ। বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কমবেশি এই ধারার অনুবর্তী। মুখ্যত এটা প্রতীকী কবিতার ধারা। অন্য আর একটি ধারার প্রধান কবি বিষ্ণু দে। জীবনানন্দ চেয়েছেন সময়ের সঙ্গে মানুষের অন্তরের মধ্যে চিরকালীন হয়ে থাকতে। বিষ্ণু দে কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। প্রতীকী কবি; প্রসঙ্গত ইয়েটসের কথা উঠে আসে, তাঁর চিত্রকল্প গুলিকে ব্যবহার করেন নিজের মতন করে। আধুনিক কবি চিত্রকল্পকে ব্যবহার করেন তাঁর প্রাত্যহিকের প্রতি মুহূর্তের দৃঢ় ও সজাগ সচেতনতার প্রতিচিত্র রূপে। বাংলা কাব্য সাহিত্যে বিষ্ণু দে অনন্য সাধারণ সচেতনতার অধিকারী বলেই তিনি এই যুগের আধুনিক কবি। তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে দেশের এবং বিদেশের চিত্রশিল্পীদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে বহুবার বহু চিত্রশিল্পীর কথা, আঁকা এবং শিল্পের ধরনকে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় বিদেশি প্রায় সব শিল্পীদের কথায় পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। তিনি ইউরোপের ফোবিষ্ট আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন তাঁর 'অন্বিষ্ঠ' কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। 'ইমপ্রেশানিজম' এর প্রবক্তা পিসারো তাঁর কথাও এসেছে বিষ্ণু দে-র কবিতায়। অঁরি মতিজ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'শ্রাবণ সন্ধ্যার এক মাতিজ আকাশ'। পল সেজান, পাবলো পিকাসো প্রমুখের কথা ও ছবি তাঁকে বারবার স্পর্শ করেছে যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। যামিনী রায় ছিলেন তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ। তিনি যামিনী রায়কে নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন। যামিনী রায় তাঁর 'পূর্ব লেখ', 'সাত ভাই চম্পা', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি বইয়ের প্রচ্ছদও এঁকে দিয়েছিলেন।

চিত্রকলার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রেনেসাঁর সূচনা পর্ব (১৪০০ থেকে ১৫০০) যুগেই শিল্পীরা প্রথম ছবিতে কাছের ও দূরের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার শুরু করেন। রেনেসাঁ যুগের পর থেকে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রকলায় ইম্প্রেসানিস্টদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ সময়ে ইউরোপীয় চিত্রকলায় একের পর এক নতুন ইজম বা শিল্পধারার অভ্যুদয় শুরু হয়। এ ধারার শিল্পীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ মনে করত 'মুক্ত হাওয়ার শিল্পী', যারা চার দেওয়ালের বাইরে মুক্ত হাওয়ার সজীব প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবি আঁকত এবং ছবিতে আলোর খেলা নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলার দিকে নজর বেশি দিত।

বিষ্ণু দে-র কবিতা ও পল সেজান : ইমপ্রেশানিজমের পরবর্তী ধারাতেই আসছেন পল সেজান, তাঁকে এই ধারার জনক বলা হয়। তাঁর মতে –

> "ইমপ্রেশানিস্টরা ছবির পোশাকি দিকটা অর্থাৎ বাহ্যাড়ম্বরের উপর বেশি নজর দিচ্ছেন; ছবির গভীরতা, ওজন, অস্থিমজ্জা বা কঙ্কালের কথা ভাবছেন না। কঙ্কাল বা চামড়ার উপর রঙ মাখিয়ে কি হবে? শুধু শূন্যতা ঢাকার চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।"[৮]

এতো গেল তত্ত্ব এবং তথ্যের কথা কিন্তু ও তথ্যের বাইরেও আরও ভীষণ জীবন্ত ভাবে শিল্পী সেজান থেকে গেছেন। বাংলা কবির কবিতা তথা বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্পষ্টত প্রত্যক্ষ ভাবে উঠে এসেছেন শিল্পী পল সেজান। বিষ্ণু দে তাঁর 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৫ – ১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকূট'টে শিল্পী পল সেজানের শিল্পমাধুর্য এবং স্বয়ং শিল্পীকে নিয়ে এসেছেন। বিষ্ণু দে-র কবিতার মধ্যে যেমন দক্ষিণের মন্দির গাত্রের কাঠিন্য রয়েছে তেমনই রয়েছে রঙের মিশেল। পূর্ব ভারতের শ্রাবণ আকাশের বর্ণনা এঁকেছেন কবি এখানে এবং সেই বর্ণনার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে শিল্পী সেজানের

হাতে আঁকা প্রিয় পাহাড়ের চিত্র। পূর্ব ভারতের ত্রিকূট পাহাড় এবং তার প্রাচীন পাথরের নানান খোদাই করা চূড়ার প্রসঙ্গ এসেছে, এখানে উঠে এসেছে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। শ্রাবণের আকাশ আলো ছায়ায় জমাট বেঁধেছে। আসলে কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য শিল্প চিত্রকলার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। পল সেজানের ছবি এবং স্বয়ং শিল্পীকেই কবি বিষ্ণু দে এই কবিতায় উল্লেখ করেছেন –

> "আগাইয়া তাই ভাবে : পল কিবা দেখতেন?
> আর আঁকতেন কার রূপ শতবার?"

এই কবিতায় যেমন রাম, মহাবীর প্রসঙ্গ এসেছে তেমন ভাবেই শ্রাবণ আকাশে পাহাড়ের কোণায় রঙের যে খেলা তাকেও কবি উল্লেখ করেছেন।

বিষ্ণু দে-র কবিতা ও পাবলো পিকাসো : ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ছবির ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে শিল্পী পাবলো পিকাসো এবং জর্জ ব্যাঙ্ক দেন কিউবিজমের ধারণা। আশোক মিত্রের ভাষায়,

> "পিকাসোর মতো বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী এখন আর নেই। তাঁর খ্যাতি হল এমন এক শিল্পরীতি প্রবর্তন করে, যা তাঁর আগে কেউ ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙায়নি।"[৯]

পিকাসোর 'দাভিনিঁয়র নারীরা' (১৯০৭) এবং 'গোয়ের্ণিকা' (১৯০৭) বিখ্যাত ছবি। ১৯৪৪ সালে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। কবিতার রসদ এবং বিষয় হয়ে ওঠে তা বিষ্ণু দে-র 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের 'আমরাও অন্বিষ্ট তাই' কবিতায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে কবি স্বয়ং পাবলো পিকাসোর-ই উল্লেখ করেছেন কবিতার অন্দর মহলে। 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে স্বাধীনতার সমসময়ে এবং কবিতাগুলি সেই সময়ের হওয়ার কারণে তার ছাপ স্পষ্ট ভাবে কবিতার ওপরে রয়েছে। যুদ্ধের পরিবেশ, 'সাইরেনের গান', 'ধমনীতে শালের আবেগ লালমাটি রক্ত বয়', 'শিরস্ত্রাণ' ইত্যাদি গভীর শব্দ যেমন উঠে আসছে তেমনই সেই সময়ের বাংলার প্রকৃতি পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন –

> "শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে – আবেগে
> পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
> রঙের সে – মুক্তি কেবা রোখে"

পরিবেশ পরিস্থিতি এবং মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কোথাও গিয়ে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ত্রিমাত্রিকভাবে পিকাসো যেমন করে নিজের রঙ তুলিকে ব্যবহার করতেন শিল্পসৃষ্টি করতে, কবি বোধহয় এখানে নিজের কবিতার ক্ষেত্রেও সেই ইঙ্গিত-ই দিয়েছেন পিকাসোকে উল্লেখ করে।

এছাড়াও বিষ্ণু দে-র কবিতার ওপর অঁরি মাতিস এর মতন ফোবিষ্ট শিল্পীদেরও প্রভাব রয়েছে। ১৯০৫-এ মাতিস, ব্রাক, ভ্রামিঙ্ক প্রমুখ শিল্পীরা মিলে প্যারিসে একটি চিত্র প্রদর্শনী করেছিলেন তা দেখে সমালোচকরা রেগে গিয়ে তাঁদের নাম দেন 'ফোবস'। এই একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ বন্য জন্তু। ফোবিজমের মূল ভিত্তি ছিল গাঢ় রঙের খেলা। বিন্দু বিন্দু রঙ দিয়ে জমি তৈরি করেছেন তাঁরা, কড়া রঙ এবং তুলির কড়া পোঁচ ছিল ফোবিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আর কবি বিষ্ণু দে তাঁর কবিতাতেও স্থান দিয়েছেন ফোবিজমকে। তাঁর 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'প্রতীক্ষা' তে যার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

চার

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ শুধুমাত্র তিরিশের দশকের কবি নন, তিনি যুগকে ছাপিয়ে গিয়েও থেকে গেছেন পাঠকের হৃদয়ে। তাঁর কবিতায় জ্ঞানের, প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ সোচ্চারে ঘোষণা না থাকলেও, তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কবিতা। তাঁর কবিতায় শব্দ প্রয়োগের দক্ষতা তৈরি করেছে এক অন্য জীবনের ছবি, মানুষ ভাবতে শিখেছে

জীবনকে নিয়ে আরও বেশি করে। কবিতার ছবিকে নিজেদের যাপনে মাখিয়ে ফেলেছে পাঠককুল। ইন্দ্রিয়ঘনত্ব তথা চিত্রধর্ম জীবনানন্দের কবিতাকে আরও বেশি অবয়বত্ব দান করেছে। তাঁর এই বিশেষত্ব কিটস ও প্রির‍্যাফেলাইট কবিদের মনে করিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি –

> "ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শের ও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শেরা।"[১০]

জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়তে পড়তে ইমপ্রেশানিস্টদের ছবির কথা মনে পড়তে পারে। যে দৃশ্য শিল্পী আঁকছেন তা যেন তিনি ঝলকে দেখে নিয়ে রং, আলো, ছায়া যেমন ভাবে দেখেন তেমন ভাবেই আঁকতে চান। এই কারণে ছবিগুলির একক ভাবে কোনো প্রকাশ না করলেও, সব মিলিয়ে আবেদন তৈরি করতে সক্ষম হয়। ইমপ্রেশানিস্ট ছবি যেমন কাছ থেকে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও দূরে গেলেও দূরে গেলেই তার আদ্যন্ত রূপটি অকস্মাৎ ভেসে ওঠে আর তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় একটা আলো– যা কখনও স্নিগ্ধ, কখনও বিষাদাচ্ছন্ন, জীবনানন্দের কবিতার স্বরূপটিও ঠিক তেমন।

তিরিশের দশকে এসেছে একাধারে যেমন জীবনানন্দকে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই তাঁর পাশাপাশি আরও একজন সমৃদ্ধ কবি বিষ্ণু দে–র প্রসঙ্গ এসে যায়। রবীন্দ্রনাথ এর ঘরানাকে বাদ দিয়ে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিষ্ণু দে। তাঁর শিক্ষা, দক্ষতা, মেধার ভাণ্ডার মণিমুক্ত সম্বলিত, ফলত তাঁর কবিতায় প্রজ্ঞার সোচ্চারে প্রকাশ হতে দেখতে পায় পাঠকবর্গ। তাঁর ছবির প্রতি ভালোবাসা এবং আগ্রহ তাঁর কবিতাকে প্রাণ দান করে। তিনি যেহেতু দেশীয় এবং বিদেশি চিত্রশিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাই তাঁর কবিতায় যেমন তাঁদের প্রভাব লক্ষ করা যায় তেমনই প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের প্রসঙ্গকেও লক্ষ করা যায়। বিষ্ণু দে-এর কবিতার ভাষার কাঠিন্য আলাদা করে অঙ্কন অপেক্ষা চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত ছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বেশি।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইমপ্রেশানিজম, স্যুররিয়ালিজম ইত্যাদি এই ইজমগুলোর প্রভাব থাকলেও তাকে পাঠকদেরই আত্মীকরণ করতে হয়, স্পষ্টভাবে তা বোঝা যায় না কিন্তু বিষ্ণু দে–র কবিতা যেহেতু সরাসরিভাবে চিত্রশিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত তাই সেখানে ইমপ্রেশানিজম, ফোবিজম, কিউবিজম ইত্যাদির স্পষ্ট প্রয়োগ এবং শিল্পীদের নামের উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণু দে-এর কবিতাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রজ্ঞা, বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে দেশের এবং বিদেশের যে সকল চিত্রশিল্পী ও শিল্পের প্রভাব রয়েছে তাকে নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কবিতার হৃদস্পন্দন পাঠকবর্গের হৃদয়ের ক্যানভাসে যে ছবি ফুটিয়ে তুলবে সে বিষয়ে আশাবাদী হওয়াই যায়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা কবিতার কালান্তর', "রবীন্দ্রকবিতায় চিত্রকল্প", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৫৮

২. তদেব, পৃ. ৫৮

৩. তদেব, পৃ. ৫৯

৪. তদেব, পৃ. ৬০

৫. তদেব, পৃ. ৬০

৬. দাশ, জীবনানন্দ, 'কবিতার কথা', 'কবিতা প্রসঙ্গে', নিউ স্ক্রিপ্ট, এ-১৪, কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃ. ৩৭

৭. দাশ, জীবনানন্দ, 'কবিতার কথা', 'কবিতার কথা', নিউ স্ক্রিপ্ট, এ-১৪, কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃ. ৭

৮. চন্দন, রহমান, আজাদুর, চিত্রকলা: সংবাদ ৩, 'বিশ শতকের সেরা ঘটনা সেরা মানুষ', ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. চন্দন, রহমান, আজাদুর, চিত্রকলা: সংবাদ ৩, ‘বিশ শতকের সেরা ঘটনা সেরা মানুষ’, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৯
১০. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫, আগস্ট ১৯৫৮, পৃ. ১২৭

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 471 - 477
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধুসূদন দত্তের প্রহসন : নারী চরিত্রের আলোকে পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন

পীযূষ কান্তি মণ্ডল
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mandalpiyushkanti@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Farce, female character, Renaissance, sociography, social problems, conservative, Hypocrisy,

Abstract
Madhusudan Dutta first appeared in Bengali literature as a playwright. It was through his hand that Bengali readers got the first taste of a successful Bengali tragedy. Within just three years of theatrical practice, he wrote several full-length plays, including two successful farces. The two farces he wrote are - 'Ekei ki bole sabhyata?' (1860) and 'Buro Saliker ghara row' (1860). If we judge the two farces in terms of their content, it will be seen that Michael Madhusudan Dutta has painted two opposite poles in the two farces. Just as in the first, he has shown the hypocrisy of the English-educated new community, in the second, he has highlighted the hypocrisy and characterlessness of the old conservative society. Madhusudan Dutta has depicted two different forms of society in his two farces. The playwright has tried to portray the broken form of this hypocritical society mainly through male characters. And the female characters are introduced to reveal the nature of these male characters.

Through the characters of Barbilasini, Payodhari and Nitambini mentioned in the farce, the playwright has shown the addiction of the radical modern youth society to drinking, dancing, singing and barangana women. Again, through the character of Harakamini, he has highlighted the sorrows and sufferings of the wives of the young men of the modern new community educated in the so-called English education. Again, the playwright has also given a language of protest through this Harakamini character, from which he did not hesitate to rebuke the Babus like Nabakumar. Also, in the character of the housewife blinded by her son's love, the playwright has shown that the housewife has tried to hide the faults and shortcomings of her son. That is, the character of the main character of this farce, Nabakumar, has somehow emerged through these female characters. That the character of Harakamini is used to highlight the fact that characters like Nabakumar have no responsibility towards their wives, the character of Prasannamayi is used to highlight the fact that in a foreign culture, they kiss their sister on the cheek, and the character of the housewife who is blinded by her love for her son directly reveals the character of Nabakumar.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

In the farce "Buro Saliker Ghara Row" the playwright has created several female characters including Fatema, Puti, Bhagi, Panchi to reveal the character of the old landlord Bhaktaprasad. Although the female characters in this farce represent their respective levels, the real purpose of creating the female characters is to reveal the character of the false Bhaktaprasad. The character of the woman-loving Bhaktaprasad is revealed through his desire to enjoy Fatema. Through the character of Puti, the playwright has shown that Womanizer people like Bhaktaprasad have been ruining the lives of many women for a long time. They do not take up religious activities when they find female company. The playwright is creating the character of Bhagi to highlight how opportunistic the Womanizer Bhaktaprasad is. Again, after seeing Bhagi's daughter Panchi, Bhaktaprasad is fascinated by her appearance and plans to enjoy her. The playwright has created the character of Panchi to highlight the Womanizer mentality of the landlord. In other words, the playwright has created the female characters in the play to highlight the hypocrisy of the main character of the play, Bhaktaprasad.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের দ্বারোদঘাটনের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩)। তিনি একাধারে নাট্যকার ও কবি, অন্যদিকে আবার তাঁরই হাত ধরে সমকালীন সমাজ সমস্যা ও সমাজ চিত্রায়ণের প্রয়োজনে প্রথম সার্থক প্রহসন বাঙালি পাঠক উপহার পায়। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু যথার্থই বলেছেন -

> "যতদিন বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন বঙ্গসাহিত্য হইতে 'শ্রীমধুসূদন' নাম বিলুপ্ত হইবে না।"[১]

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব সর্বপ্রথম নাট্যকার রূপেই। আর প্রহসন হল নাটকেরই একটি শাখা, এই সত্যটি মধুসূদন দত্তের প্রহসনের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গোলোকনাথ দাস(?) জোডরেলের – 'The Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রহসনধর্মী রচনার নিদর্শন।[২] ১৮৫৩ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক প্রহসন কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটিকাটি।[৩] এরপর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' প্রহসনটি অনেকাংশে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত ও ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মধুসূদন দত্তের প্রহসন দুটি সব দিক থেকেই সাফল্যতা অর্জন করেছে। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত মধুসূদন দত্তের প্রহসন সম্পর্কে বলেছেন -

> "মধুসূদনের প্রহসনের পথ ধরেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাট্যসাহিত্য সংস্কৃত নাট্যজগতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করল।"[৪]

অর্থাৎ আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ নির্মাণ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনই হল প্রহসন সৃষ্টির মূল কারণ। মূলত সমকালীন ঘটনা অবলম্বনে শাণিত রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভাষায় প্রহসন রচিত হয়। প্রহসনের উদ্দেশ্য মূলত নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করা। প্রহসনের চরিত্রগুলি টাইপধর্মী হলেও তাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি তাদের নিজ নিজ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, আর প্রহসনে ব্যবহৃত সংলাপগুলি আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় তীর্যক রঙ্গ-ব্যঙ্গে হয়ে থাকে। প্রহসনের সংজ্ঞা হিসেবে ড. অশোককুমার মিশ্র মহাশয় বলেছেন—

> "টাইপধর্মী চরিত্রগুলি তাদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ও পরিবেশের সীমারেখায় সমকালীন বহু আলোচ্য ঘটনাবলীকে যখন এক থেকে দুই অঙ্কের সীমায়ত নাটিকায় জীবন্ত করে তোলে, তখন হাস্যরসাত্মক সেই নাটিকাকে বলা যায় প্রহসন।"[৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধুসূদন দত্ত মাত্র দু'খানা প্রহসন রচনা করেছিলেন। যথা 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। প্রহসন দুটিকে বিষয়বস্তুর নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রহসন দুটিতে দুই বিপরীত মেরুর চিত্র অঙ্কন করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে দেখা যাচ্ছে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্য-বিলাসী ভাবধারার 'নবকুমার'রা কীভাবে সমাজকে আধুনিকতার নামে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের চাইতেও সমাজকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তৎকালীন রক্ষণশীল প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভিত্তিহীন প্রথা ও কু-ব্যবহার— যা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মধুসূদন দত্ত তাঁর এই প্রহসনে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ নাট্যকার দেখিয়েছেন সমাজের দুই শ্রেণীর মানুষকে, যারা কখনও নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার তাড়নায় সমগ্র সংস্কৃতিকে পদাঘাত করছে। আবার কখনও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে নিজেদের কাম-বাসনাকে পূর্ণ করতে ধর্ম-কর্মকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। সমাজের এই ভণ্ড চিত্রগুলি মধুসূদন মূলত পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আর এই পুরুষ চরিত্রগুলির স্বরূপ উন্মোচন করতেই নারী চরিত্রগুলির অবতারণা করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে মধুসূদন দত্তের প্রহসনে নারী চরিত্রের আলোকে পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন কীভাবে হয়েছে তার আলোচনায় অংশ নেব।

প্রহসন দুটিতে নারী চরিত্রগুলি বীরাঙ্গনা নয় ঠিকই কিন্তু তারা প্রত্যেকেই কুশলী বা বুদ্ধিমতী। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) প্রহসনে যেসব নারী চরিত্রগুলি রয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুজন বারবিলাসিনী, প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, হরকামিনী, গৃহিণী। উল্লেখিত প্রত্যেকটি নারী চরিত্র তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে নিজ নিজ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। প্রথমে আসা যাক দুজন বারবিলাসিনীর কথায়। এই বারবিলাসিনীদ্বয়ের কথায় হাসির খোরাক যেমন আছে, তেমনি রয়েছে তৎকালীন সমাজের বারাঙ্গনা নারীর চিত্র। টাকার বিনিময়ে প্রাত্যহিক জীবনচর্চার প্রেক্ষাপট হাস্যকৌতুক ভঙ্গিতে সহজেই উঠে এসেছে। বাবাজীকে উদ্দেশ্য করে প্রথম ও দ্বিতীয় বারবিলাসিনীকে বলতে শোনা যায়–

> প্রথম : "আহা, বাবাজী তোমার কি বষ্টুমী হারয়েচে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল? –কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?"
> দ্বিতীয় : "কেন পার্‌ব না? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কি বল, বাবাজী?"[৬]

আবার হাস্যরস সৃষ্টিতেও চরিত্র দুটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের কাহিনির সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, জ্ঞানতরঙ্গনী হল এমন একটা সভা, যেখানে 'ইয়ং বেঙ্গল' ভাবাদর্শী নব্য ইংরেজি শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় সমাজকে আধুনিক করে তোলার জন্য উৎসাহ প্রদান করে এবং মদ্যপান ও বারবিলাসিনীদের নৃত্য দিয়ে সভার কার্য্য সম্পন্ন করে। এখানে সভার নামকরণ যেন আধুনিকতারই ব্যাঙ্গাত্মক প্রতিফলন।

'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে অন্যান্য নারী চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হরকামিনী চরিত্রটি। এই চরিত্রটি নিদারুণ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। উগ্র আধুনিক ইংরেজি আদব কায়দায় অভ্যস্ত তার স্বামী নবকুমারের সব কু-কীর্তি তার জানা। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে গিয়ে মদ-মাংস-গান-বাজনা আর বারাঙ্গনা বিলাসে অভ্যস্ত তার স্বামী। হরকামিনী নিজের মুখে তার দুর্দশার কথা স্বীকার করে বলেছে—

> "...হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজ কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?"[৭]

অর্থাৎ নাট্যকার এই হরকামিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বা উগ্র আধুনিক যুবকদের স্ত্রীদের দুঃখ ও যন্ত্রণার কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার হরকামিনীর মুখে প্রতিবাদী ভাষাও শোনা যায়। তাকে কখনো বলতে শোনা যায়—

> "...বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খেয়্যে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? —একেই কি বলে সভ্যতা?"[৮]

অর্থাৎ নাট্যকার তৎকালীন সমাজের ভণ্ডামির প্রতিবাদ জানিয়ে হরকামিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সমাজের নবকুমারদের মতো পাশ্চাত্য বিলাসী ভাবধারায় ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের ভণ্ডামিকেই তুলে ধরেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রসন্নময়ী অন্যতম একটি নারী চরিত্র। নাটকে সে নবকুমারের বোন, স্বামী পরিত্যক্তা। সে তার বৌদি হরকামিনী এবং নৃত্যকালী ও কমলার সাথে তাস খেলে বাড়ির অন্দরমহলেই সময় কাটায়। প্রসন্নময়ী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তার দাদা নবকুমার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় এসে প্রসন্নকে চুমু খাওয়া বা অসংলগ্ন কোন কথাবার্তার প্রসঙ্গ তুলে ধরে, প্রসন্ন তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া প্রসন্ন জানে যে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে কী কী হয়ে থাকে। তাই সে তার বৌদিকে বলে—

"তা এ আজ আর নতুন দেখিলি নাকি? জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে এইরকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।"[৯]

অর্থাৎ নাট্যকার এই প্রসন্নময়ী চরিত্রটিকে একটি বুদ্ধিমতী নারী প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যে চরিত্রটির সৃষ্টির মূলে ছিল তৎকালীন সমাজে যারা সাহেবি কালচারে অভ্যস্ত তারা সাহেবদের মতো বোনের গালে চুমু খাচ্ছে যেটি আমাদের বাঙালি সমাজ একেবারে মেনে নিতে পারছে না।

নৃত্যকালী ও কমলা এই প্রহসনের অন্যতম দুটি নারী চরিত্র। নবকুমারের খুড়তুতো বোন নৃত্যকালী। সে প্রসন্নময়ী ও হরকামিনীর তাস খেলার সঙ্গী। আর কমলা তাদের প্রতিবেশী। নাটকে দেখা যায় নৃত্যকালী তাস খেলায় পটু হলেও কমলা অনেকটাই কাঁচা। কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরলে তা বোঝা যাবে।

"কমলা : বস, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা?
নৃত্যকালী : তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।"[১০]

অর্থাৎ, আধুনিকতার প্রতিফলন শুধু পুরুষ চরিত্রের মধ্যেই নয়, নারী চরিত্রগুলিকেও আধুনিক করে তুলতে নাট্যকার তাস খেলার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও নাট্যকার সম্ভবত এই নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন নারীর অন্দরমহলের বর্ণনার সুবিধার্থে।

গৃহিণী চরিত্রটি নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। গৃহিণী হল নব কুমারের মা। গৃহিনীর অত্যাধিক পুত্র স্নেহ তার পুত্রের পতনের পথকে প্রশস্ত করেছে। বাঙালি সমাজের প্রত্যেকটি মা তার ছেলেকে যেমন অত্যাধিক বিশ্বাস করে, স্নেহ করে, তেমনি গৃহিণী চরিত্রটিকেও তৎকালীন বাঙালি মায়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গৃহিণী পুত্রের দোষ ত্রুটিকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। মদ্যপ অবস্থায় জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা থেকে ফেরার পর যখন নবকুমারের মাটিতে লুটিয়ে পড়া দেখে তার মায়ের অতিরিক্ত সন্তান বাৎসল্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুরুষ গৃহিণীর কাছে এখনও 'দুধের বাছা'। নবকুমারের মায়ের বিশ্বাস তার ছেলে কোনো অন্যায় করেনি, দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পড়ে সে এসব করেছে। ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে তার স্বামীর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবকুমারকে তার স্বামী 'দুরাচার', 'নরাধাম', 'কুলাঙ্গার' বলে গালিগালাজ করলে গৃহিণী সরোষে বলে ওঠে –

"বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন কইর্‍্যে বকচো কেন?"[১১]

আবার নৃত্যকালী নবকুমারের মুখের বদ গন্ধের কথা গৃহিণীকে জানালে গৃহিণী বলে ওঠে—

"উঃ ছি! তাই তো লো। ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ। আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা আমার কি হবে!"[১২]

এই বলে ক্রন্দন শুরু করে দেয়। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে গৃহিনী তার ছেলের দোষ ত্রুটি ধরতে পারলেও তাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, যা নবকুমারের পতনের পথকে আরো একধাপ এগিয়ে দিচ্ছে।

অসাধারণ নাট্য প্রতিভার অধিকারি মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসনটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই প্রতীকী নাম ব্যবহারের আসল গূঢ়ার্থ হল— রোঁয়া হল যৌবনের প্রতীক। শালিক পাখি যখন বৃদ্ধ হয় তখন তার ঘাড় রোঁয়া বিহীন হয়। অর্থাৎ যৌবনকাল নিঃশেষিত হয়। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনের মূল চরিত্র ভক্ত প্রসাদের আচরণে তার বৈপরীত্য দেখা যায়। এই জমিদার ভক্ত প্রসাদের চরিত্রের উন্মোচনের জন্যই নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন ফতেমা, পুঁটি, ভগী, পঞ্চীসহ একাধিক নারী চরিত্র। এই প্রহসনে নারী চরিত্রগুলি নিজ নিজ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেও ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের উন্মোচন-ই নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথমেই আসা যাক, এই প্রহসনের মূল নারী চরিত্র ফতেমার কথায়। হানিফের স্ত্রী ফতেমা। পূর্বে তার বিবাহ হয়েছিল কিন্তু বিধবা হলে তাকে হানিফ নিকা করেছে। ফতেমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। প্রহসনে ফতেমার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ভক্ত প্রসাদের চাকর গদাধরের মুখ থেকে। ফতেমার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে গদাধর বলে–

> "মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো' বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয় নি, আর রঙ্ যেন কাঁচা সোনা।"[১৩]

নারীলোলুপ ভক্তপ্রসাদ নিজেকে হিন্দুত্বের শিরোমনি বলে মনে করে এবং মুসলমানদের ঘৃণা করে। যদিও তা ভক্তপ্রসাদের চাহিদার উপর নির্ভর করে। ভক্তপ্রসাদকে বলতে শোনা যায়- "মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজ্যের গন্ধ ভক্ ভক্ করে বেরোয় তা মনে হলে বমি এসে।" কিংবা "মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো!" আবার পরক্ষণেই বলতে শোনা যায়—

> "হাঁ, স্ত্রীলোক— তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; —'বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ'।"[১৪]

কারণ নারীলোলুপ ভক্তপ্রসাদের ছলে বলে কৌশলে যেকোনো মুল্যে নারীদেহ প্রয়োজন। আর এই কাজে তাকে সাহায্য করে গদাধর। ভক্তপ্রসাদ গদাধরকে বলে যে –

> "দেখ্ টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।"[১৫]

গদাধর তো এটাই চাইছিল। এভাবেই চাকর-বাকররা মনিবের সমস্ত অসৎকর্মে সহায়তা করে চলে। এই প্রহসনে গদাধর চরিত্রটিও ভক্তপ্রসাদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তার পিসি পুঁটিকে হাত করে ফতেমাকে ভক্তপ্রসাদের হাতে তুলে দেওয়ার ছক কষে। তবে ফতেমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তাই সে সুকৌশলে ভক্তপ্রসাদের থেকে টাকা হাতানোর জন্য ছক সাজিয়ে রাখে। সে তার স্বামী হানিফকে এ বিষয়টি জানিয়ে রাখে। অবশেষে যখন পুঁটি ফতেমাদের বাড়িতে আসে টাকা দেওয়ার জন্য, তখন দেখা যায় যে, ফতেমাকে এ কাজের জন্য ২৫ টাকা দেওয়ার কথা কিন্তু পুঁটি ৬ টাকা কম ১৯ টাকা দিয়ে বাকি ৬ টাকা তার কমিশন হিসেবে কেটে নেয়। তারপর ফতেমা তার থেকে আরও ২ টাকা আদায় করে নেয়। ফতেমার মধ্যে তির্যক ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদের ভাষাও শোনা যায়। পুঁটি যখন ফতেমাকে জাত তুলে অপমান করে তখন ফতেমাকেও বলতে শোনা যায়—

> "মোরা রাঁড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস বল্ দেখি।"[১৬]

ফতেমার মধ্যে সামাজিক ভয়ও ছিল। তাই ভক্তপ্রসাদকে আসতে দেখে ফতেমা পুঁটির কাছে অনুরোধ করে তাকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে। পরে ভক্তপ্রসাদ হানিফের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বাচস্পতি ও হানিফের কাছে ধরা পড়ে যাই। নাটকে দেখা যাচ্ছে, জমিদার ভক্তপ্রসাদের মতো গোঁড়া হিন্দুত্বের শিরোমণিদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে ফতেমা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। ফতেমা দরিদ্র হলেও সে তার সম্মান রক্ষা করেছে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা।

নাটকের অন্যতম একটি নারী চরিত্র হল পুঁটি। যে চরিত্রটিকে আমরা সাধারণত কুটিল চরিত্র হিসেবেই দেখি। এই চরিত্রটিকে মাঝখানে রেখে জমিদার নানা অসৎকার্য সিদ্ধ করে। এই পুঁটিকে দিয়েই জমিদার ফতেমাকে ভোগ করতে চেয়েছে। এবং ভোগ করেছে। পুঁটি মুসলমানদের ঘৃণা করলেও টাকার জন্য ফতেমাদের বাড়িতে এসেছে। আবার এই পুঁটির স্বগতোক্তি থেকেই জমিদারের চরিত্রের আসল দিকটি উন্মোচিত হয়। পুঁটিকে বলতে শোনা যায়—

> "...আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার ঠিকানা নাই। বাবু এদিকে আবার পরম বেষ্টম, মালা ঠক্‌ঠকিয়ে বেড়ান...।"[১৭]

পুঁটি নিজেও তার পরকাল খুইয়েছে জমিদার ভক্তপ্রসাদের কুনজরে পড়ে। অর্থাৎ, এই ভক্তপ্রসাদের মতো নারীলোলুপরা নারীসঙ্গ পেলে আর ধর্ম কর্মের ধার ধারে না। পুঁটির কাছ থেকেই হানিফ্ গাজীর শারীরিক বর্ণনার একটা আভাস পায়, সে যেন 'যমের দূত'। অর্থাৎ হানিফ্ গাজী যে প্রচন্ড শক্তিমান তা বোঝা যাচ্ছে। পুঁটি যখন ফতেমাকে নিয়ে ভগ্ন শিব মন্দিরের কাছে যায় তখন ফতেমা ভয়ে থাকতে পারবে না বলে পালিয়ে যেতে চাইলে পুঁটি স্বগতোক্তি করে বলে –

> "হায়, আমার কি এখন আর সেকাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়?"[১৮]

উক্তিটি থেকে পুঁটির যৌবনকাল শেষ হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। প্রহসনের শেষে পুঁটি ও গদাধরের কথোপকথন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পুঁটি একাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছে। স্বীকার করেছে যে, এ কাজ ছেড়ে দেওয়ায় ভালো।

"গদাধর : (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো তোমার পেশা উঠ্‌লো!

পুঁটি : "উঠুক বাছা ; গতর থাকে তো ভিক্ষা মেগে খাবো।"[১৯]

এছাড়াও এই প্রহসনে আরো তিনটি নারী চরিত্রের দেখা মেলে। তারা হল— ভগী, পঞ্চী, এবং ইচ্ছা। ভগী আর তার মেয়ে পঞ্চী জল আনতে যাওয়ার সময় জমিদার ভক্তপ্রসাদের কুনজরে পড়ে পঞ্চী। পঞ্চী বিবাহিত। ভগী তার কন্যাকে বিত্তবান ছেলের সাথে বিবাহ দিয়ে গর্ব অনুভব করেছে। ভগীকে তার জামাই সম্পর্কে বলতে শোনা যায়—

"আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর কল্‌কেতায় লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন, আর বছর বছর একখানা বই দিয়ে থাকেন।"[২০]

ভগী গ্রাম্য সরল গৃহবধূ। তাই সে সুযোগ সন্ধানী ভক্তপ্রসাদের মতলব বুঝতে না পেরে তার স্বামী পীতাম্বর কেশবপুরের হাটে নুন আনতে গেছে বলে জানিয়ে দেয়। ভক্তপ্রসাদ এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য মতলব আঁটে পঞ্চীকে ভোগ করার। ভগী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার ভক্তপ্রসাদের সুযোগ সন্ধানীর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকে পঞ্চী চরিত্রটির একটি মাত্র উক্তি রয়েছে। নারীলোলুপ লম্পট জমিদার ভক্তপ্রসাদ তার স্বভাবসিদ্ধ কামনার তাড়নায় পঞ্চীকে একবার দেখেই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। পঞ্চী তার মায়ের নির্দেশে যখন ভক্তপ্রসাদকে প্রণাম করতে যায় তখন তার চোখের চাহনি দেখে পঞ্চী বুঝতে পারে যে ভক্তপ্রসাদ তাকে কুনজরে দেখছে। পঞ্চীর স্বগতোক্তি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট—

"ও মা! এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। একি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা! ছি! ও কি গো! এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্‌!"[২১]

অর্থাৎ জমিদার ভক্তপ্রসাদের নারীলোলুপ মানসিকতাকে চিত্রিত করতে গিয়েই পঞ্চী চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। এছাড়াও এই নাটকে ইচ্ছা ভট্টাচার্য নামে এক নারীর প্রসঙ্গ রয়েছে। যদিও নাটকে তার কোন সংলাপ নেই। ভক্তপ্রসাদের ভৃত্য গদাধরের মুখে ইচ্ছার নামটি শোনা যায়। ইচ্ছার থেকেও ফতেমা দেখতে ভাল— এটি বোঝানোর জন্যই গদাধর ইচ্ছার নামটি ব্যবহার করেছে। জমিদার ভক্তপ্রসাদ ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেওয়ার পর কসবার বেশ্যালয়ে গিয়ে স্থান হয়েছিল তার। অর্থাৎ, নারীলোলুপ ভক্তপ্রসাদের কামনার শিকার হয় ইচ্ছা। আর এই ভক্তপ্রসাদের এই ভণ্ডামিকে তুলে ধরতেই ইচ্ছা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন নাট্যকার।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, আলোচ্য দুটি প্রহসনেরই প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণে এবং এই তথাকথিত ভদ্র সমাজের স্বরূপ উন্মোচনে নারী চরিত্রগুলিকে স্বমহিমায় দেখা গেছে। প্রহসন দুটির কাহিনি সম্পূর্ণ বিপরীত। একটিতে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অপব্যবহারের চিত্র, অপরটিতে তেমনই রয়েছে প্রাচ্য সংস্কৃতির ভণ্ডামির চিত্র। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে দেখা যাচ্ছে বাবু কালচারে অভ্যস্ত নবকুমারের মতো চরিত্রদের পরিবারের প্রতি বা স্ত্রীর প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আর এই চিত্রকে তুলে ধরতেই হরকামিনী চরিত্রটি, আবার বিদেশি কালচারে বোনের গালে চুমু খাওয়ার ঘটনাকে তুলে ধরতে প্রসন্নময়ী চরিত্রটি, আবার সচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে চিত্র তুলে ধরতেই নৃত্যকালী ও কমলা চরিত্রের অবতারণা। এছাড়াও গৃহিণী চরিত্রটি পুত্রস্নেহে অন্ধ এমন মাতৃত্বের পরিচয় বহন করে চলেছে। অনুরূপভাবে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের মূল চরিত্র ভক্তপ্রসাদের ভণ্ডামিকে তুলে ধরতেই নাটকে নারী চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। প্রতিটি নারী চরিত্রই স্বমহিমায় উজ্জ্বল থেকে পুরুষ চরিত্রগুলির স্বরূপ উন্মোচন করে সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলিকে চিত্রিত করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

Reference:

১. বসু, যোগীন্দ্রনাথ, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ দে'জ সংস্করণ : ২০১১, পৃ. ৪৪১

২. মিশ্র, ড. অশোককুমার, 'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস', গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০১৪, পৃ ৪০

৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'নাট্যকার মধুসূদন', গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৬ ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ ১৩৭

৪. তদেব, ১৪২

৫. মিশ্র, ড. অশোককুমার, ‘বাংলা প্রহসনের ইতিহাস’, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০১৪, পৃ ৩১

৬. মণ্ডল, ড. তপন, ‘মধুসূদনের প্রহসন : কালের দর্পণ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১০, পৃ. ১৩১

৭. তদেব, পৃ. ১৪৬

৮. তদেব, পৃ. ১৪৬

৯. তদেব, পৃ. ১৪৬

১০. তদেব, পৃ. ১৪২

১১. তদেব, পৃ. ১৪৫

১২. তদেব, পৃ. ১৪৫

১৩. তদেব, পৃ. ১৪৯

১৪. তদেব, পৃ. ১৪৯

১৫. তদেব, পৃ. ১৫১

১৬. তদেব, পৃ. ১৫৫

১৭. তদেব, পৃ. ১৫৪

১৮. তদেব, পৃ. ১৬৩

১৯. তদেব, পৃ. ১৬৭

২০. তদেব, পৃ. ১৫২

২১. তদেব, পৃ. ১৫৩

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 478 - 484
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রহসনকার মধুসূদনের সামাজিক প্রাঞ্জলতার অকৃত্রিম নিদর্শন দুই প্রহসন

সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গলসী মহাবিদ্যালয়
Email ID : sampriyaas@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nineteenth Century, Comedy, Society - Awareness, Society - Search, Women's Freedom.

Abstract
Michael Madhusudan Dutt is a notable name in the history of Bengali literature. He has taken the Bengali literary field to an immense height in a phased manner of prosperity. His achievements are universally known today. However, in the literary field 'Akei Ki Bole Savyata?' (1860); Buro Saliker Ghare Roe' (1860); he was intimately associated with the mentality of the people, regardless of wealth. From that social awareness he wrote the true meaning of civilization. He built a picture of the helplessness of the lower community of the same society. This experience of Madhusudan has been reflected in the farce. HaraKamini, NrityaKali or Fatema are one of the most popular characters of the time. The statistics of their lives and the demands of their lives are almost the same. The difference is just in financial comfort. The need for women's rights is needed - it has been caught in various writings of Madhusudan at various times. It can be said that the rise of these women at the beginning of the later 'Birangana'. These two renowned farces are the way of a social reformation to the reader.

Discussion

উনিশ শতকের একজন নক্ষত্রপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর জন্মদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে নতুন করে তাঁকে ঘিরে চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। তবে তাঁর মতো অসাধারণ তীক্ষ্ণধী ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে বড়ো অপ্রতুল। উনিশ শতকের নবজাগরণের কালপর্বে নবচেতনাকে নব্য উপায়ে গঠনাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন মধুসূদন। সামাজিক চেতনার যেসব দিক তাঁর লেখায় উঠে এসেছে ; সেগুলি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কাব্য, পত্রসাহিত্য, নাটক, প্রহসন - এসব রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। মহীয়ান লেখকের সব সৃষ্টিই সুন্দর। তবে তাঁর লেখার মধ্যে থেকে প্রহসন দু'টিকে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করে নেওয়া হল এ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। সাহিত্যলোকের রসগত বিচারে শুধু নয়; তাঁর লেখা দু'খানি প্রহসন সবদিক থেকে এখনো চিরন্তন হয়ে আছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। *একেই কি বলে*

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সভ্যতা? এবং *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা দু'টি সুবিখ্যাত প্রহসন। এই দুই প্রহসন ব্যক্তি মধুসূদনের সমাজজ্ঞানের পরিধিকে পরিচায়িত করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন -

> "প্রহসন সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নিদর্শক। যখনই কোন সমাজ কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই তাহাতে প্রহসন বা ব্যাঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে।"[১]

উনিশ শতকের বাবু কালচার, নব্য ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মানুষের সামাজিক কথকতা, প্রতীকায়িত হয়েছে এই দুই প্রহসনে। *একেই কি বলে সভ্যতা!*-র প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ। প্রহসনটির প্রথমে লেখক চরিত্রগুলির উল্লেখ করেছেন। প্রহসনটি দু'টি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নবকুমার বাবুর বাড়িতে দৃশ্য শুরু হয়েছে। নবকুমার এবং কালীনাথ উভয়েই আলোচনা করছেন নবকুমার বাবুর বাড়ির কর্তা ফিরে আসায় তিনি আর সভায় যোগদান করতে পারছেন না। এই দৃশ্য দর্শক তথা পাঠকের মনে তৎকালীন সময়ের অন্তঃসারশূন্য সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উনিশ শতকীয় সমাজে মদ্যপান একটি কুব্যাধির মতো তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সমস্যা থেকে নবকুমার আর কালীনাথের মতো নব্য যুবকদের উত্থান। এই প্রহসনের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে মদ্যপানের প্রসঙ্গ। কালীনাথ মদ্যপ হয়ে পড়ায় কর্তার বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে সেই অবস্থায় দেখা করতে চান। একই রকম চিত্র প্যারীচাঁদ মিত্রের *মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়* বা কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-র মধ্যে উঠে এসেছে। মদ্যপান একালের সামাজিক বিকৃতিগুলির মধ্যে অন্যতম। ফলে সেই বিকৃতি রূপায়িত হয়েছে অন্যতর অভিধায়। নব্য ইংরেজি শিক্ষিত মধুসূদন বাঙালি সমাজের অবক্ষয়িত রূপটিকে অনুধাবন করেছিলেন প্রকৃত অর্থে। সেই ক্ষয়ীভূত, কদর্য রূপটিই প্রহসনগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। কর্তার আগমনের পর কালীনাথ তাঁর খুড়োমহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের নাম করেন। কর্তা পরম বৈষ্ণব। ফলে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। কৃষ্ণপ্রসাদবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রও যে পরম বৈষ্ণব সে বিষয়ে সন্দেহাতীত হন। প্রকৃত অর্থে সমকালীন সমাজে এমন ভণ্ড বৈষ্ণব ভক্তের দেখা প্রায়শই মিলতো। পারিবারিক ভক্তিময়তার তোয়াক্কা না করে তাঁরা নানানভাবে *নব্যবঙ্গ* বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। মদ্য, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, পতিতালয়ে গমন ছিল এদের মূল কাজ। বলাই বাহুল্য প্রহসনের কালীনাথ সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার উল্লেখ করেছে কালীনাথ। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় সংস্কৃত ভাষা নিয়ে আলোচনা হয় এবং নানাবিধ বঙ্গীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই নিয়ে কালীনাথ একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কর্তা স্বাভাবিক অর্থে সন্দেহ করেন না। সামাজিক সংস্কারশীলতার মাঝে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান সমস্যাবলী এভাবেই যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল - তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম গর্ভাঙ্কের মধ্যে প্রহসনের মূল বিষয়টি ধরা পড়েছে। প্রকৃত অর্থে এই নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের অর্জিত শিক্ষার মাপকাঠি শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছে মদ্যপানের আধারে। কর্তামশাই সঙ্গত কারণে সিকদারপাড়ার গলিতে পাঠান বাবাজীকে। সেখানে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা খুঁজতে গিয়ে বাবাজীকে যথেষ্ট হয়রান হতে হয়। পতিতালয়ের মধ্যে মদ্যপ ব্যক্তির সান্নিধ্য এড়িয়ে, পতিতাদের খর ও বাক্যবাণ সহ্য করার পর শেষপর্যন্ত বাবাজী সার্জেন ও চৌকিদারের খপ্পরে পড়েন। সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় তার থাকে না। ঘুষ দিয়ে তিনি সে যাত্রায় পরিত্রাণ পান। বাবাজীর বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

> "ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল আর সারজন বেটারও হাতাপাতা রোগ আছে তাই রক্ষে - নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হত, না কি হত, কিছু বলা যায় না।"[২]

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় মুটের দল বাক্স ভর্তি করে মদের বোতল পৌঁছে দিচ্ছে। সেই চিত্র দেখে বাবাজী বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু অনুধাবন করতে পারেন না। বেলফুলওয়ালা, বরফওয়ালা এবং নিতম্বিনী, পয়োধরীর প্রবেশে বাবাজী ক্রমশ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে পারেন। নবকুমার আর কালীনাথের কথোপকথনের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে বাবাজীকে কিছু ঘুষ দিয়ে নিজের লাঞ্ছনা এড়ানো যায় কিনা - সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন নবকুমার। কালীনাথ উদ্ধত এবং কটুভাষী। সে বাবাজীকে নিয়ে চিন্তিত নয় মোটেই। প্রহসন লিখতে

গিয়ে সামাজিক অসামঞ্জস্যের দিকটি মাইকেল সুন্দর উপায়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সে দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জানাচ্ছেন -

> "বাংলা ভাষায় কাব্য লেখার আগে তিনি প্রথমে যা লিখেছিলেন, তা হল নাটক - এবং ঐ নাটক লিখতে গিয়ে তাকে ঐ নাটকের সংলাপ উপযোগী ভাষা ও প্রয়োগরীতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল নিজের মত করেই।"[৩]

প্রহসনটির দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে লেখক তুলে ধরেছেন সামাজিক বিকৃতির চিহ্নসমূহ। এই প্রহসনের মূল নির্যাসে যে পরিবেশের কথা মধুসূদন ব্যক্ত করেছেন; তিনি নিজেও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা প্রকৃত অর্থে মাতালদের আড্ডাখানা। সেখানে মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ এবং পতিতা সংসর্গ এসব অবাধে চলে। সামাজিক অবক্ষয়ের এমন নিদারুণ চিত্র পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র তুলে ধরেছেন তার 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রের মাধ্যমে। নবকুমার ও কালীনাথ সভায় এলে সেখানে সকলে মদ্যপানে রত হয়। নবকুমারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

> "জেন্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিষ্টনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মনে এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।"[৪]

ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, আচরণে আধুনিকতা, বাগ্মীতা, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন, আত্মীয়-বন্ধু নির্বাচন - সবকিছুতেই আধুনিকতার সন্ধান সমকালীন সময়ের মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে এক অতল অন্ধকারে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের অর্থ এরকম নয় বা হতে পারে না। সেই বিষয়টি বোঝার সময় আগত। সেই স্থানেই মানুষের অবমূল্যায়ন ঘটেছে সর্বস্তরে। কর্তা নবকুমারের গমনপথের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে দেখেছেন। তারপর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে অনুধাবন করেছেন প্রকৃত সমস্যার কথা। বাবাজীকে পাঠিয়েছেন এর প্রতিকারার্থে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার প্রকৃত রূপ ভয়াবিষ্ট করে তুলেছে বাবাজীকে। যেকোনো সাধারণ মানুষ এই এই ধরনের সমস্যায় পড়লে আশঙ্কায় উপনীত হয়। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। নবকুমার ও কালীনাথের গড্ডালিকা প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে যাবার ঘটনাটি চিত্রায়িত হয়েছে প্রহসনের এই অংশে। বর্ণবিদ্বেষ ঘুচিয়ে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করে, বিধবাবিবাহের প্রবর্তন করে সমাজের রূপান্তর ঘটানো সাধু উদ্যোগ নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার সঙ্গে এসেছে সামাজিক বিকৃতি। মদ্যপান নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ পতিতাসঙ্গ, অকাতরে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের অপচয় ইত্যাদি।

প্রহসনটির দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নবকুমারের বাড়ির অন্দরমহলের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনীকে দেখতে পাওয়া গেছে এখানে। তারা তাস খেলছে। প্রহসনটির মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অন্তঃপুরের মধ্যে দেখা যায় যে, নবকুমার মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাঁকে সামলানো দায় হয়ে পড়ে চাকরদের পক্ষে। পাশ্চাত্য পারিবারিক রীতির অনুসরণ করতে চায় নবকুমার। তাঁর স্ত্রী, বোন তাঁর এরকম কাজকর্মে রীতিমতো বিরক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত নবকুমারের চিৎকারে ঠাকরুণ ও কর্তা দু'জনেই নবকুমারের অবস্থা দেখতে আসেন এবং কর্তা নবকুমারের প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করতে পারেন। কর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা এখানে আর থাকবেন না। হরকামিনী সখেদে প্রসন্নময়ীর কাছে তার মনের দুঃখ ব্যক্ত করে। তার বক্তব্য উল্লেখ্য -

> "বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি।... মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? - একেই কি বলে সভ্যতা?"[৫]

নারী চরিত্রগুলির পারস্পরিক কথোপকথন পাঠক-পাঠিকাকে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একটি কুশ্রী দিকের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় এমনিতেই সেকালে হত ছাদনাতলায়। তার ওপরে যখন সামাজিক দিকগুলি এইভাবে তাদের সম্পর্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করতো; তখন তার পরিণতি গিয়ে দাঁড়াতো হরকামিনীর উক্তির

মতো। *সধবার একাদশী* নাটকে দীনবন্ধু মিত্র এরকম সমাজ-ব্যবস্থার পরিচিতি দিয়েছেন স্বচ্ছন্দে। সামাজিক দিকগুলি এরকম ভাবেই সাহিত্যের প্রকরণসমূহের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। সেই রূপটিই এই প্রহসনের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য -

> "বঙ্গরঙ্গমঞ্চ যে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বড় মাধ্যম, তাও তাঁর কিছুমাত্র অজানা ছিল না।"[৬]

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একজন সফল ও সার্থক শিল্পী রূপে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে চিহ্নিত করার জন্য বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর প্রহসন দু'টি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের পরিধি অনেকাংশে গাঠনিক পূর্ণতা পেয়েছে এই দুই প্রহসনে। বাঙালি জনসমাজের বুকে চর্যার সময়পর্ব থেকে যে নাটকীয় পরিবেশ - পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল; তা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল মধুসূদনের সমাজমনস্কতায়। উনিশ শতকের সামাজিক মানসিকতা মানব সমাজকে পরিবর্তনের পরিচিতি দিয়েছে। মাইকেল তাঁর *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসনে জমিদারি ব্যবস্থার কুপ্রথা সম্পর্কে বিশদে জানিয়েছেন। জমিদারের জমিদারির মধ্যে খাজনা আদায়ের বিষয়ে হানিফ গাজীর ভূমিকা অত্যন্ত সপ্রতিভ। জমিদার ভক্তপ্রসাদের চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রহসনে হানিফ গাজীর ভূমিকা জমিদারের কাছে কর্মচারী রূপে। ফসল না হলেও তাদের খাজনা দিতে বাধ্য করা হয়। ভক্তপ্রসাদের জমিদারিতে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের। লোভী, কুরুচিপূর্ণ মানসিকতার বলি হয় সাধারণ প্রজারা। গদা এই প্রহসনের অপর তোষামোদকারী ব্যক্তি। হানিফ গাজীর স্ত্রী ফতেমা অপূর্ব সুন্দরী। সেই খবর ভক্তপ্রসাদের কাছে দেওয়ার অর্থ হল জমিদারের ভোগলালসা চরিতার্থকরণের ব্যবস্থা করা। হানিফ গাজীর খাজনা বাকি পড়ে যাওয়ায় সে অসহায়। আর সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ভক্তপ্রসাদের মতো ব্যক্তি তাকে লাঞ্ছিত করে। এককথায় তার সুযোগ নেয় পরিস্থিতি অনুযায়ী।
ভক্তপ্রসাদের বক্তব্য থেকে উল্লেখ্য তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থান - প্রসঙ্গটি -

> "দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হা, স্ত্রীলোক - তাদের আবার জাত কি?"[৭]

এ ধরনের মূল্যায়ন নারীজাতিকে অবদমিত করে। তাদের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে দেয়। মনুসংহিতা অনুযায়ী নারীর প্রতি পুরুষের ভোগবাসনার উপস্থিতির স্বীকৃতি এ প্রহসনকে যথার্থতা দান করেছে। নারী কোনো না কোনো পুরুষের অধীনে সঠিকভাবে বিচরণ করতে পারে - এই দাবিকে এরকমভাবেই তৎকালীন সময়ে উপস্থাপিত করা হত। বাচস্পতি মহাশয় তাঁর মায়ের তিরোধানের সংবাদ জানিয়ে তাঁকে কিছু টাকা ধার দেবার কথা বললে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না ভক্তপ্রসাদ। তাঁর লোভাতুর মস্তিষ্কে খেলা করে চলে নারীমাংসলোলুপতা। সম্পত্তির বিষয়টি আগলে রেখে বৃদ্ধ বয়সে তিনি তরুণী নারীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অর্থের বিনিময়ে যে কোনো অসদুপায়ে তিনি তৎপর হয়ে উঠেছেন বিবাহিতা, সুন্দরী নারীদের ধর্মনাশ করার জন্য। পুঁটি এ প্রহসনে বিগতযৌবনা বৃদ্ধা। সে দূতীর কাজ করে। সে ভক্তপ্রসাদের নির্দেশে ফতেমাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে ভক্তপ্রসাদের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দিতে এসেছে। পুঁটির বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উথলে পড়ে।"[৮]

এ প্রহসনের প্রকৃত সার্থকতা চিত্রটি এভাবেই ধরা পড়েছে। হানিফ আর ফতেমার ষড়যন্ত্রের ফলে ভক্তপ্রসাদের রসগর্ভ অত্যাচার শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে সেই বিষয়টি পাঠক অনুমান করতে পারেন। মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য কাঠ কাটতে আসা বাচস্পতিকে এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত করে হানিফ। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয় এভাবে। এই সঙ্গবদ্ধ প্রতিরোধ ক্রমাগত জোরালো হয়ে ভক্তপ্রসাদের আসল রূপ উন্মোচিত করবে দর্শকদের সামনে এমন সূত্র পাওয়া যায় প্রহসনে। প্রকৃত অর্থে বাঙালি জনতার মানসিকতাটিকে সর্বজন সম্মুখে এই প্রহসন দু'টির মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন মধুসূদন। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী বুড়ো শালিকের ঘাড়ে নতুন পালক গজালে তাকে ধরা হয় বয়স্কের ভীমরতি রূপে। সেই প্রচলিত প্রবাদের সার্থকতাকে প্রমাণ করা যায় এই প্রহসনের নামকরণের মাধ্যমে। নারী এই প্রহসনে শুধুমাত্র ভোগ্যা নয়। ফতেমার অগ্রসরগামিতা যুগের অনুপাতে যুগান্তকারী। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার উক্তি -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।"[৯]

ফতেমার ভূমিকা নারীর সমাজসচেতন মানসিকতাকে এক অভূতপূর্ব অথচ স্বাভাবিক দৃষ্টান্তে নিয়ে গেছে।

প্রহসনের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভক্তপ্রসাদ অপেক্ষা করেন দিন শেষ হয়ে রাত্রি হওয়ার জন্য। সমাজে ধনী জমিদারের ভূমিকা কতখানি তীব্র অত্যাচারের ছিল; সেই বিষয়টি প্রহসনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। এ সময় আনন্দবাবু তাঁর কাছে আসেন। রাত্রির অন্ধকারে ভক্তপ্রসাদের মতো ব্যক্তিরা সমাজের চরম সর্বনাশ করতে পিছপা হয় না। সাধারণভাবে দিবালোকে বর্ণবৈষম্যকে মান্যতা দিলেও নারীর দেহভোগের সময় সেই বর্ণবৈষম্যের ভাবনা সমাজপতিদের মাথা থেকে সরে যায়। এ নির্মম সত্য চর্যার যুগ থেকেই প্রমাণিত। ভক্তপ্রসাদের ছেলে অম্বিকাপ্রসাদ কলকাতায় পাঠরত। পুত্রের সংবাদ আনন্দবাবুর কাছে গ্রহণ করেন ভক্তপ্রসাদ। তার বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "ভাল, আমি শুনেছি যে কলকেতায় নাকি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালী,তাতী, জোলা, তেলী, কলু সকলই না কি একত্রে উঠে বসে আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?"[১০]

কলকাতার বাবু কালচার প্রসঙ্গে শঙ্কিত ভক্তপ্রসাদ বর্ণবৈষম্য লোপের প্রসঙ্গে তটস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিজাতীয় নারীর সংগলাভে তিনি আপত্তিহীন। সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের পরিস্ফুট চিত্রটি তুলে ধরেছেন লেখক। দ্বিচারিতা তথা বহুগামিতা দোষে দুষ্ট ভক্তপ্রসাদ নানাবিধ প্রসাধন শেষে ফতেমার সঙ্গলাভের জন্য একান্ত উন্মুখ হয়ে ওঠেন। প্রকৃত অর্থে সামাজিক দুরাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, নিম্নরুচিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া - এসবের মাধ্যমে ক্ষমতাশালী তথা ধনশালী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন বিষয়গুলি নিয়ে রচিত হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা *সধবার একাদশী* প্রহসন। তিনি এই প্রহসনে অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন সুশিক্ষিত বাঙালি যুবকের মানসিক শূন্যতার দিকটি। ভক্তপ্রসাদ নিজে প্রলোভন থেকে, একাধিক নারীসঙ্গ থেকে বিরত না থাকতে পারলেও; ছেলের প্রতি তিনি ভীষণ সচেতন। গদা আর রাম দু'জনে উপভোগ করে ভক্তপ্রসাদের দ্বিচারিতা। প্রসাধন সেরে ফতেমার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ভক্তপ্রসাদ। এই গোপন অভিসারের সময় কেউ তার খোঁজ করলে তিনি জপরত আছেন - এই বার্তা তিনি দিয়ে যান চাটুকারদের কাছে। প্রহসনের পরবর্তী অংশে পুঁটি ফতেমাকে নিয়ে অপেক্ষা করে ভক্তপ্রসাদের জন্য। এদিকে শিব মন্দিরের কাছে অশ্বত্থ গাছের ওপরে বাচস্পতি আর হানিফ লুকিয়ে থাকে। নিম্নবর্গীয় তথা নিম্নবিত্তীয় প্রজাদের জন্য জমিদারের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। প্রজারা শুধু শোষণের শিকার হয়ে থেকে গেছে। এমনকি তাদের পারিবারিক সম্মান বিনষ্ট হয়েছে জমিদারের অত্যাচারে। মধুসূদন প্রসঙ্গে প্রথিতযশা সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় –

> "তাঁর অনেক সমালোচক ধারণা দিয়েছেন যে, তিনি নিজের সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রহসন দুটি পড়লে বোঝা যায়, খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও অথবা আপাতদৃষ্টিতে জীবনযাত্রায় হিন্দু সমাজ থেকে দূরে সরে গেলেও, এই সমাজকে একেবারে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা উভয়ই তাঁর ছিলো।"[১১]

ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে নানান সময়ে এই সুবিখ্যাত দুই প্রহসনেই মাইকেল প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর সমাজ - মনস্কতার। কিন্তু সমকালীন সমাজে মাইকেল প্রহসন দু'টির জন্য তীব্র নিন্দার শিকার হয়েছিলেন। *একেই কি বলে সভ্যতা?* -তে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি যুবক অপমান অনুভব করলেন। অন্যদিকে *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* -তে বয়স্ক সমাজপতিরা ক্ষুব্ধ হলেন। সামাজিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই প্রহসনদ্বয় তাদের যথার্থ সম্মান না পেলেও পরবর্তীকালে তাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণিত হয়েছিল। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে প্রহসন দু'টি কেবল মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু অভিনীত হয়নি। মাইকেল গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন সেসময়। দেশিয়, প্রচলিত, পরিপূর্ণ সংস্কৃতগন্ধী নাটক থেকে লেখক প্রথম মুক্তির স্বাদ দিতে পেরেছিলেন বাঙালি পাঠককে। প্রহসনের শেষে তেমার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা করতে গেলে পূর্বপরিকল্পনামতো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাচস্পতি ঈশ্বরের মতো অভিনয় করেন। প্রাচীনপন্থী, ধর্মভীরু ভক্তপ্রসাদ ভয় পান। বাচস্পতিকে অনুরোধ করে কৃতকর্মের দণ্ডস্বরূপ তিনি বেশ কিছু অর্থ দেবার কথা বলেন। জাতিগত বিচারে পতিত হবার আশঙ্কা থেকে ভক্তপ্রসাদ এসব করেন। প্রহসনের শেষে স্বমুখে তিনি স্বীকার করেন যে, ফতেমার প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া তাঁর পক্ষে গর্হিত কাজ হয়েছে। জীবনে আর কোনো নারীকে তিনি এভাবে অসম্মান করবেন না; করবেন না তাদের প্রতি অত্যাচার।

নবজাগরণের কালে বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধিমান করে তুলেছিলেন মধুসূদন। রেনেসাঁর প্রধান ভাব হল মানবতা। মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তার অবস্থান পরিবর্তন করার ফলে উনিশ শতকের সমাজ মানসিকতায় উপস্থিত হল মানবতাবাদী ইতিবাচক জোয়ার। জীবনকে প্রাধান্য দিতে গেলে তা বসুন্ধরা ব্যতীত অসম্ভব বুঝতে পারলো আপামর জনতা। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ অগ্রদূতেরা জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত করতে সাহায্য করেছিলেন। যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রভাবে মানুষের চিন্তাবিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। ভাবাদর্শগত দিক থেকে মানবমনের ব্যাপক পরিবর্তন সমাজ মানসিকতাকে এক অন্যতর পর্যায়ে নিয়ে গেল। দার্শনিক মতবাদগুলির প্রভাবে মানুষের মানসিক গুণাবলী পরিবর্তিত হতে শুরু করল। যুক্তিবাদী, প্রাগ্রসর মানসিকতা মানুষের বোধশক্তিকে চিরচঞ্চল সত্তায় রূপান্তরিত করল। রেনেসাঁর ফলে সমাজে প্রাচীন সাহিত্যগুলির যথার্থতা আলোচিত হয়েছে নানাবিধ আঙ্গিকে। ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রসঙ্গ এসময়ের সাহিত্যে ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বঙ্গদেশের নবজাগরণের বাণী যেভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল; তার সদ্যলব্ধ কুফলগুলি সামাজিক ভিত্তির স্তর পর্যায়ে নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করেছিল সেইসঙ্গেই। স্বাধীনতার চেতনা, স্বদেশভক্তি মানুষের অন্তঃকরণকে নতুন আবেগে প্লাবিত করেছিল এই সময়। জাতীয় চেতনার সঙ্গে মানুষের মনে আশ্রয় নিয়েছিল নবজাগৃতিবোধ। নবজাগরণের প্রকাশ্যমান যুগে জাতীয় চেতনার দ্বিধা ক্রমশ প্রকাশ পেল। শিক্ষা, বুদ্ধি, বাস্তববোধ, মানবিক দিকগুলির জাগরণ, নবায়মান অনুভবের কলকল্লোলিত স্পন্দন মানবজীবনকে প্রাপ্তির মগ্নতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে। বঙ্গদেশের ধর্মান্দোলনগুলি এ সময় লাভ করেছিল চরম ব্যাপকতা। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ধ্যানগম্ভীর তথা ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। সেই ভাবরূপ নতুনভাবে ধরা দিল এ সময়। প্রহসনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হাস্যরস প্রকৃত অর্থে উনিশ শতকের বঙ্গজনজীবনকে দর্শক তথা পাঠকের সম্মুখে সগৌরবে উপস্থিত করতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য -

> "বাংলা সাহিত্যের কালবদল, জাতবদলের পুরোধা তিনিই।"[১২]

সেই পথ ধরেই সামাজিক পরিবর্তনের রূপচিত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন অসীম প্রতিভার অধিকারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। *একেই কি বলে সভ্যতা?* এবং *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* সমকালীন সময়ের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দু'টি প্রহসন। হাস্যরস, সমাজচিত্র, বর্ণবৈষম্য, উচ্চ-নিচ শ্রেণিবৈষম্য, অন্দরমহলের মহিলাদের অন্তরমহলের প্রসঙ্গ - এ সব কিছুই অনবদ্য ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছে প্রহসন দু'টিতে।

Reference:

১. বসু, যোগীন্দ্রনাথ, *জীবনচরিত,* ১৩০০, পৃ. ২৯৮ – ২৯৯
২. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *একেই কি বলে সভ্যতা?, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৪২
৩. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ, *বীরাঙ্গনা কাব্য,* ১৯৯৯, পৃ. ৬ – ৭
৪. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *একেই কি বলে সভ্যতা?, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৪৭
৫. তদেব, পৃ. ২৫১
৬. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, *মাইকেল মধুসূদন ও* তাঁর *কাল, দেশ,* ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ২২
৭. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৫৪
৮. তদেব, পৃ. ২৫৭
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় খণ্ড *(রবীন্দ্র রচনাবলী),* ১৩৯৩, পৃ. ২৪১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৬১

১১. মুরশিদ, গোলাম, *আশার ছলনে ভুলি,* ১৯৯৪, পৃ. ১৭১

১২. গুপ্ত, ক্ষেত্র, *মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প,* ১৩৭৭, পৃ. ১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 485 - 496
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কালিদাসের শকুন্তলা-ছায়াপটে নবরূপায়িত আধুনিক বাংলা সাহিত্য : অনুভব ও অভিনবত্ব

সমীপেষু দাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজ
Email ID : sam.1992.july@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Kālidāsa, Śakuntalā, Adaptation, Modern Bengali Literature, Inspiration, Reinterpretation, Rajsekhar Basu, Selim-Al-Din, Women's Empowerment.

Abstract

Kālidāsa's timeless masterpiece, Abhijñānaśākuntalam, has inspired numerous adaptations and reinterpretations in modern Bengali literature. Authors like Michael Madhusdin Dutt, Saradindu Bandyopadhyay, Rajsekhar Basu, and Selim-Al-Din have woven their own narratives around the classic tale.

Sharadindu Bandyopadhyay's 'Bahni-patanga' (Byomkesh Series) is a notable example. Although the story has a unique plot, the characters of Shakuntala and Inspector Ratikanta mirror the intense romance and all-consuming passion of Kālidāsa's protagonists Śakuntalā and Duṣyanta.

Rajsekhar Basu's 'Bharater Jhumjhumi' incorporates contemporary themes, allegorically depicting the 1947 Partition of India through the toy 'jhumjhumi' hidden by Durvasā Muni.

Selim-Al-Din's play 'Shakuntala' not only adapts Kālidāsa's narrative but also explores the protagonist's struggles in the hermitage of Maharṣi kaṇva. As the daughter of an apsara, Śakuntalā faces societal contempt, highlighting the need for women's empowerment and respect.

These works demonstrate Kālidāsa's ancient masterpiece remains relevant in modern society, offering fresh perspectives and insights. The timeless themes and emotions woven into Abhijñānaśākuntalam continue to inspire new generations of writers and artists, ensuring the classic tale's enduring influence on literature and art.

Through these adaptations and reinterpretations, Kālidāsa's work proves its ability to transcend time and cultural boundaries, speaking to universal human experiences and emotions. As a result, Abhijñānaśākuntalam remains an integral part of India's rich literary heritage, continuing to inspire and influence contemporary creative works.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে অতিসামান্য জ্ঞানার্জন করলেও সেখানে মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর বিষয়গত সারসংক্ষেপ অজ্ঞাত থেকেছে এমন দৃশ্য বিরল। বাল্মীকীয় রামায়ণ এবং বৈয়াসিক মহাভারতের পরেই জনপ্রিয়তার দিক থেকে সংস্কৃতে যে সৃজনশীল সন্দর্ভ সর্বাধিক সুবিখ্যাত, তা *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* যা সাধারণ লোকসমাজে 'শকুন্তলা' ব'লেই বিদিত। মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি একটি নাটক। সাতটি অঙ্ক সেখানে বর্তমান। তবে নাটকটি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যেমন অনূদিত হয়েছে, তেমনই তার স্বরূপেরও বদল ঘটেছে। অর্থাৎ নাটকটি যে সর্বদাই অভিনয়োপযোগী নাটকেই রূপায়িত হয়েছে এমন নয়; বরং তার বহুবিধ রূপান্তরণও ঘটেছে। এই প্রবন্ধের শিরোনামেই ব্যবহৃত হয়েছে 'শকুন্তলা-ছায়াপট' শব্দবন্ধ। সুতরাং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শকুন্তলার অনুবাদ ও পুনর্নির্মাণ এখানে বক্তব্য বিষয় নয়। সেই নাটকাশ্রিত নব সাহিত্যনির্মিতির রূপরেখাঙ্কনই এখানে উপজীব্য। যেহেতু কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকটিও বৈয়াসিক মহাভারতোক্ত একটি ঘটনার আলেখ্য রচনা, তাই প্রথমেই দেখা নেওয়া যাক কোনও রচনাশ্রয়ী সাহিত্যের পদ্ধতি কীরূপ হওয়া উচিত।

মহাভারতের আদিপর্বের ৮১তম অধ্যায় থেকেই শুরু হয়েছে পূরুবংশানুক্রমিক বিবরণ। ৮২তম অধ্যায় থেকে শুরু ক'রে ৮৮তম অধ্যায় জুড়ে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্মন্ত ও পত্নী শকুন্তলার আখ্যান পাওয়া যায়। তবে ৮২তম অধ্যায়টির গ্রন্থনা যে উদ্দেশ্যে সাধিত হয়েছে, তার প্রয়োজন কালিদাসের নাটকে অপ্রয়োজনীয়। সেখানে রাজা দুষ্মন্তের বাহুবল, শৌর্য-বীর্য-ঔদার্যের মহত্তর চিত্র উল্লিখিত হয়েছে -

> "স্বধর্ম্মে রেমিরে বর্ণা দৈবে কর্ম্মণি নিঃস্পৃহাঃ।
> তমাশ্রিত্য মহীপালমাসংশ্চৈবাকুতোভযাঃ।।
> কালবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ শস্যানি রসবন্তি চ।
> সর্ব্বরত্নসমৃদ্ধা চ মহী পশুমতী তথা।
> স্বকর্ম্মনিরতা বিপ্রা নানৃতং তেষু বিদ্যতে।।"[১] (১/৮২/৮-৯)

রাজা দুষ্যন্তের সময়ে সকল বর্ণের প্রজারা স্বধর্মপালনকরতঃ নিরাপদে বসবাস করত, রাজাকে পেয়ে তারা অত্যন্ত অকুতোভয়ে দিনাতিপাত করতে পারত, মেঘ যথাসময়ে বর্ষ করত, রাজ্যে কৃষিসম্পদের প্রাচুর্য ছিল, নানা রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ ছিল, গবাদি পশু ছিল হৃষ্টপুষ্ট এবং ব্রাহ্মণেরা নিজ কর্ম পালন করতে পারত। এর ব্যত্যয় ঘটত না। কুরুকুলনৃপতি দুষ্যন্তের সমসাময়িক রাজতন্ত্র এবং শাসনপ্রণিধির সুব্যবস্থার দিকটির প্রতি কালিদাসের একপ্রকার ঔদাসীন্য ছিল বলা চলে। তার কারণ মহাভারতের মধ্যে দুষ্যন্তের কাহিনির প্রয়োজনীয়তা রাজবংশের গৌরবগাথার প্রচার কিন্তু কালিদাসের নাটকটিতে বর্ণিত বিষয় মোহ থেকে প্রেমের পথের জয়স্তুতি। তাই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমোপাখ্যানে যতটুকু দুষ্যন্তের রাজকার্য ব্যবস্থার অবকাশ থেকেছে, ততটুকুই নাট্য পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে। একই ভাবে শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদাসহ একাধিক চরিত্র কালিদাসের কল্পনা। তাই মহাভারতের একটি ক্ষুদ্রাংশ তাঁর লেখনীতে হয়েছে বৃহত্তর। ঋষি দুর্বাসা অভিশাপবৃত্তান্ত থেকে শুরু ক'রে শাপমোচন এবং শেষে স্ত্রী ও পুত্র সর্বদমনের সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলনের সুদীর্ঘ ঘটনা নবতর সাহিত্যগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে স্বয়ং কালিদাস মহাভারতাশ্রয়ী কাহিনির ভাষান্তর ব্যতিরেকে সেই যুগেরই অনুক্ত ভাষ্যের প্রস্ফুটন ঘটিয়েছেন। স্থান-কাল-পাত্র একই বৃত্তে পুনরাবর্তিত হয়েও একটি জীবন দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকে। তাই এই নাটকের ছায়াপটে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যনিদর্শনগুলি বর্তমান, সেগুলির মধ্যেও দ্রষ্টব্য যে নবীন-প্রবীণের সেতুবন্ধন কীভাবে ঘটেছে এবং পৌরাণিক যুগের আধুনিকায়ন সেখানে ক'তখানি কাঙ্ক্ষিত থেকেছে অথবা আধুনিক সময়ে পৌরাণিকতার পরিমার্জনা কীরূপে ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের প্রথম অনুবাদ করেন রামতারক ভট্টাচার্য। সেই নাটকের নাম *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। এরপরেই আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যে অনুবাদ ক'রে কালিদাসের দেওয়া নামটি পরিবর্তন করে রাখেন *শকুন্তলা* (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। এখানে ঘটনাক্রমের সংযোজন-বিয়োজন না ঘটলেও দৃশ্যকাব্যের গণ্ডি অতিক্রান্ত হয়ে সুখপাঠ্য এক কথাসাহিত্যের জন্ম হয়েছে। হরলাল রায়ের *অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকং* (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ)-এ মূল সংস্কৃত নাটকটির অবয়ব অবিকল থেকেছে। সেখানে শুধুমাত্র সংস্কৃত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার ব্যবহার ঘটেছে। এরপরে এই নাট্যানুবাদে এগিয়ে আসেন হরলাল রায়। তিনি কালিদাসের অনুসরণে রচনা করলেন *কনকপদ্ম* নাটক (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর সময়ের পূর্বেকার নাট্যগ্রন্থগুলি 'শকুন্তলা' নামটি পরিহার করার দুর্জয় সাহসিকতার পরিচয় দেননি। তিনিই প্রথম বাঙালি নাট্যকার যিনি ওই নামটির পরিবর্তে এক ব্যঞ্জনাধর্মী নতুন নামকরণ করেন। সপ্তাঙ্কপদ্ধতির কলেবর হ্রাস এবং নতুন চরিত্রের চিত্রায়ন দ্বারা একাধিক গর্ভাঙ্কসজ্জিত মোট ছয়টি অঙ্কে তিনি *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর সারবস্তুর উপস্থাপন করেছেন। মারীচ, সানুমতী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। বরং প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তিনি মিশ্রকে ও বনদেবীর বাক্যালাপের অংশ সংযোজন করেছেন যাকে মূল নাট্যবস্তুর প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। তাই সেই সময়ের সাপেক্ষে এই কনকপদ্ম নাটক অনুবাদমূলক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তে এক উল্লেখ্য পদক্ষেপ। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের সাহিত্যসম্ভারেও এই নাটকের অনুবাদ দেখা যায়। তার নাম *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* নাটক (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই নাটকাশ্রিত *শকুন্তলা* (১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) নামক একখানি গদ্যরচনা করেন গ্রামবাংলার প্রকৃতির সান্নিধ্য বজায় রেখে এবং রূপকথার মোড়কে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর *অভিজ্ঞান-শকুন্তলা* নামেও পুরাতন সংস্কৃত নাটকটির অনুবাদ করেন এবং এখানে ভাষাগত পরিবর্তন ব্যতীত অপর কোনও সংস্কার দৃষ্টিগোচর হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-ও *শকুন্তলা* অভিধায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন এবং এখানেও তিনি কালিদাসের অনুগমন করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'অভিজ্ঞানশাকুন্তল' এই নামটির ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে গদ্যানুবাদের ক্ষেত্রে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নে এই কালজয়ী নাটকটির অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চাভিনয়। যেহেতু সংস্কৃত ভাষা সকলের বোধগম্য ছিলনা, তাই বাংলা ভাষায় সেই বিষয়বস্তুকে সহৃদয় দর্শকদের সম্মুখে নান্দনিক কৌশলে পরিবেশনা করার বাসনা থেকেই বারংবার একাধিক নাট্যকার এই নাটককে বাংলা ভাষার ছন্দে ললিত লাবণ্যময় ক'রে তুলেছেন।

আদর্শ ও আশ্রয় : বাংলা সাহিত্যে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের আশ্রয়ে যদি কোনও সাহিত্যকর্ম হয়, তবে তার আদর্শ কী হবে? এর উত্তরে বলতে হয় M. Winternitz এর *History of Sanskrit Literature : Vol III* তে Goethe-র এই নাটক সম্পর্কে উক্তিটি একবার স্মরণ করে নিতে হয়। তিনি বলেছিলেন –

> "In case you desire to rejoice in the blossoms of early years, the fruits of the age advanced, In case you want to have something that charms, something that is enchanting. In case you want to call both the heaven and hearth by a common name, I refer you to Śakuntalā. And thus I describe these all."[২]

বাংলায় অর্থ হয় যে কবি কোকিল কালিদাসের এই রচনাটি এমনই অনন্য সুন্দর যে এখানে ফুল-ফল, শরৎ-বসন্ত এবং স্বর্গ-মর্ত্যকে একই সঙ্গে অনুভব করা যায়। এখানের মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় উপমার মধ্যেই যথার্থরূপে *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের অনূদিত হওয়ার মূলসূত্র অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে। 'ফুল'-এর যেমন সহজাত সৌন্দর্য রয়েছে, তেমনই ফলের ভোগ্যতা রয়েছে। তাই ফুল 'উপভোগ্য' কিন্তু ফল 'ভোগ্য'। সুতরাং অভিজ্ঞানশাকুন্তল নাটকের আশ্রয়ে কোনও নতুন আলেখ্যের জন্ম হলে তার মধ্যেও সেই ফুল ও ফলের নিসর্গ সৌন্দর্যের অনাঘ্রাত রসাস্বাদ যেন পাঠক পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রাচীন সাহিত্য*-এর প্রবন্ধমালার মধ্যে 'শকুন্তলা' নামের একটি প্রবন্ধ করেছিলেন। সেখানে তিনি কালিদাসীয় কাব্যটির অন্তঃস্থ নির্যাসের কথা বলেছেন যেটি একই সঙ্গে ফুল ও ফলের নিবেদনকে হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলতে পারে। তিনি বলেছেন –

> "স্বর্গ ও মর্তের এই যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে না।"[৩]

বা অন্যত্র তিনি এও বলেছেন যে –

> "তপোবন স্থানটি এমন যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য ও সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ বিশেষ থেকে সাধারণীকরণের দিকে গেলে বোঝা যায় যে 'সৌন্দর্য' উপভোগ তখনই সম্ভব যখন ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাম্য বিরাজ করবে। স্থিতধী মন-ই পারে বাহ্য আড়ম্বর থেকে শান্তসুন্দরের সংযত সৌন্দর্যকে অনুধাবন করতে। অর্থাৎ শকুন্তলাকেন্দ্রিক যে সাহিত্য রচনা-ই হয়ে থাকুক না কেন; সেখানে যেন প্রস্তুতি থেকে প্রগতির দিকে অনায়াস যাত্রার মঙ্গলধ্বনি শ্রুত হয়।

শকুন্তলা-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য : অনুবাদ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যে শকুন্তলা বিষয়ে দ্বিতীয় ধারাটি হল এমন এক সাহিত্যচিন্তন যা কালিদাসের রচনার অংশবিশেষের দ্বারা প্রভাবিত বা কোনও অনুষঙ্গের আপেক্ষিক অনুপাতে গড়া এক বাঙ্ময়। এর মধ্যে আসেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এবং সেলিম-আল-দীন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কবি মধুসূদনের *বীরাঙ্গনা* কাব্য প্রকাশিত হয়। এটি পত্রসাহিত্যবিশেষ। এখানে একাধিক পত্রাবলির মধ্যে প্রথম সর্গটি দুষ্যন্ত-শকুন্তলা-কেন্দ্রিক ('শকুন্তলা পত্রিকা')। সেই কাব্যাংশটির নাম 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'। এখানে শকুন্তলার মননে দুষ্যন্তের প্রতি বিরহতাড়িত প্রেম অভিব্যক্ত হয়েছে। এরপর আসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশের গল্পসংগ্রহে 'বহ্নি-পতঙ্গ' নামে একটি গল্প রয়েছে (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। সেই গল্পের নায়িকা শকুন্তলা নামের এক নারী। রাজশেখর বসু-র ছোটগল্পের সংকলন *ধুস্তরী মায়া ইত্যাদি গল্প*-এর একটি গল্প 'ভরতের ঝুমঝুমি'। এই গল্পের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা পরবর্তী খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি। শুধুমাত্র দুর্বাসা ঋষি ও শকুন্তলার পুত্র ভরতের প্রসঙ্গের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই গল্পের বিন্যাস। এছাড়া সবশেষে বলতে হয় বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম-আল-দীনের কথা। তাঁর শকুন্তলা দৃশ্যকাব্য (নাট্য) শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের বিড়ম্বনাধর্মী। বাংলাদেশের জনপ্রিয় বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে সেলিম-আল-দীন (১৯৪৯-২০০৮) যশস্বী নাট্যব্যক্তিত্ব। *শকুন্তলা* ১৯৭৮ সালের (খ্রিস্টাব্দ) রচনা। বর্তমানে সেলিম-আল-দীনের নাটক সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে এই নাট্যরচনাটি মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম-আল-দীনের শকুন্তলা একটি 'দৃশ্যকাব্য'। অর্থাৎ কালিদাস তাঁর নাট্যকৃতিটিকে 'নাটক' জাতীয় রূপকবিশেষ ব'লে আখ্যায়িত করলেও সেলিম-আল-দীন তাঁর এই রচনাটিকে 'নাটক' বলেননি। শকুন্তলা দৃশ্যকাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত - 'স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র খণ্ড' এবং 'শকুন্তলা খণ্ড'। প্রথম খণ্ডভাগে রয়েছে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডভাগে রয়েছে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের প্রকাশ। প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায় বিশ্বামিত্র, মেনকা, অর্করূপী নারদ, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাভিষ, উতঙ্ক, লৌহিত্য, পত্রলেখা এবং ইন্দ্রলেখার চরিত্র। দ্বিতীয় তথা 'শকুন্তলা খণ্ড'-এ রয়েছে শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্ব, গৌতমী, শারঙ্গ, শারদ্বত, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, চণ্ডালগণ এবং ভিষক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি একমাত্র দ্বিতীয় খণ্ডটির মধ্যে চণ্ডাল এবং ভিষক ব্যতীত প্রতিটি চরিত্রই কালিদাসাশ্রিত। তবে প্রথম খণ্ডের মধ্যে বিশ্বামিত্র এবং মেনকা এই চরিত্রদুটি শকুন্তলার মাতাপিতা। কালিদাসের নাটকে এদের নাট্যবৃত্তে অবস্থান না থাকলেও প্রথম অঙ্কেই উক্তিতে বিশ্বামিত্র ও মেনকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি পঞ্চম অঙ্কেও মেনকার উল্লেখ রয়েছে। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তার উপস্থিতি যে তার ব্যক্তিজীবনকে ক'তখানি দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিল, তারই বিবৃতি দেয় এই দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে এ কাহিনির সবিশেষ যোগসূত্র না থাকার দরুণ এটিকেও দ্বিতীয় ধারাতেই নির্বিবাদে অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

এই দুটি বহমান ধারার মধ্যে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় প্রকার ধারাটিই; কারণ এখানে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের অনুবাদে একাধিক নাট্যকার এবং গদ্যকারের শব্দচয়ন বিষয়ক তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। নাটকাশ্রয়ী কোনও ঘটনা বা ঘটনাংশের আধুনিকায়ন, বাস্তব প্রেক্ষিত এবং কবিমননের তারতম্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কথা বলে। তাই এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে মূল বিষয়টি যদি কোথাও নিষ্প্রভ হয়ে অন্য আরেকটি দ্বার উন্মোচিত করে, তবে তাই তুলে ধরা হোক।

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কাব্যে যে ভঙ্গিমায় শকুন্তলার পত্রলিখনের কথা তুলে ধরেছেন, তার প্রাথমিক পরিচয় তা অমিত্রাক্ষর ছন্দনৈপুণ্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক অংশে যেখানে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথোপকথনে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ এবং দুষ্যন্তের পুনরায় রাজধানীগমনের তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে শকুন্তলার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কালিদাস দেখাননি। দুর্বাসার কঠোর অভিশাপবাণী থেকে জানা যায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই সময় শকুন্তলা ছিল 'অনন্য মানসা'। দয়িতের বিরহে সে যেন উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। মধুকবি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে। সংস্কৃত নাটকটির প্রথমাঙ্কে শকুন্তলার কাছে ভ্রমরের আগমন ও দংশনেচ্ছার রূপকটিকে কবি এখানে যথা সুন্দর প্রয়োগ করেছেন –

"ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি, 'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা 'পুরু-কুল-নিধি!"[৫]

এখানে সমাজতত্ত্বের দিকটি লক্ষণীয়। উক্ত পঙক্তিসহ কাব্যের শুরুতেই শকুন্তলা নিজেকে পরিচয় দিয়েছে 'বননিবাসিনী দাসী' ব'লে। এটি তৎকালীন বঙ্গসমাজের অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূদের আকুতি। স্বামীর সেবাই স্ত্রীর ধর্ম এই আদর্শবাদিতা থেকেও কবি যেন মুক্ত হতে পারেননি। তাই কালিদাসের কবিত্বে এরূপ বিশেষণ না থাকলেও মধুসূদন দত্ত এখানে বাঙালি সংস্কৃতির ছাপ রেখেছেন। তাই শকুন্তলা এখানে অবিরত বিরহযাপিতা একাকিনী এক কুলবধূর প্রতীকী ব্যঞ্জনা। এখানেই যুগসন্ধির অন্তরঙ্গতা। পৌরাণিক কালের ক্ষণিক নির্যাসে সমকালের রূপ তুলে ধরাই কবিধর্ম। আবার কবির উৎপ্রেক্ষা এমনই যে শকুন্তলা যেন ভুর্জপত্রে দুষ্যন্তের জন্ পত্ররচনা করছে। তাই তিনি বলেছেন –

"কহি পিকে, - 'কেন তুমি পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?
মদনের দাস মধু; মধুর অধীনে
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে?'
অলির গুঞ্জন শুনি ভাবি – মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!"[৬]

সুতরাং, শকুন্তলার উতলা মনের সামান্য ইঙ্গিত থেকেই যে নতুন অলংকৃত কাব্যসৌন্দর্যরস পাঠকের কাছে উপহাররূপে এসেছে, তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকতেই হয় কবির কাছে। তাই অনুক্ত বিষয়ের অনুমান এবং অশ্রাব্য বাণীর প্রকাশ এই দুদিক থেকেই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত উত্তীর্ণ। তাঁর পারঙ্গমতা শুধু ব্যবহারিক দিক থেকেই নয়; কবিকল্পনার অবকাশ যাপনেরও।

শকুন্তলা ও শকুন্তলা : এই পর্বে দেখা যাক কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শকুন্তলার মৈত্রী সম্বন্ধ ক'তখানি রয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি সাহিত্যিক। তাঁর ব্যোমকেশ সমগ্র এবং অন্যান্য রচনায় কালিদাসের প্রসঙ্গ এসেছে। কুমারসম্ভবের কবি যেমন কালিদাসের জীবনসত্যের উপলব্ধি, তেমনই ব্যোমকেশের 'অমৃতের মৃত্যু' গল্পে তিনি "আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা"[৭] শব্দবন্ধের উপমা দিয়েছেন যা *রঘুবংশ* মহাকাব্যের প্রথম সর্গের রাজা দিলীপের বর্ণনা। সুতরাং এ থেকেই পরোক্ষ প্রমাণ মেলে যে 'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পটিও তাঁর এক গভীর সমীক্ষা। পাটনা নিবাসী বিহারের জমিদার সন্তান দীপনারায়ণ সিংয়ের স্ত্রী শকুন্তলা। গল্পের বর্ণনায়–

> "সুন্দরী এবং বিদুষী। কলানিপুণা, নাচতে গাইতে জানেন, ছবি আঁকতে জানেন, তার ওপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজস্বিনী ছাত্রী, বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।"[৮]

স্বামীর সঙ্গে ছিল তার বয়সের ব্যবধান অধিক। তাই তার দেহজ বাসনার তীর এসে বিদ্ধ করে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরীকে। সহজেই চরিতার্থ হয় তাদের নিষিদ্ধ পরকীয় কামনা। কিন্তু রতিসুখ তাদের চিরস্থায়ী হয়না। দীপনারায়ণ

সিংহয়ের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে তারা উভয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ইতিবৃত্তটির কাঠামো এরূপ হলেও তাদের সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান ধরা পড়ে বুননের চাতুর্যে যা কালিদাসের অভিজ্ঞানশাকুন্তল নাটকের মূলীভূত শাশ্বত সত্যচেতনা। প্রথম রিপু কামের বশবর্তী নায়ক-নায়িকার গান্ধর্ব বিবাহ হলেও সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। তার জন্যই কর্মফলজন্য অভিশাপ নেমে আসে শকুন্তলার জীবনে। যখন সেই নিরন্তর বিরহ এবং আত্মোপলব্ধির বোধোদয় হয়, তখন সেই মোহবেশী কামের কলি পরিণতি পায় প্রেমের পুষ্পল শোভা। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ পঞ্চ তন্মাত্রের জাগতিক সুখভোগের ঐকান্তিকতা একইভাবে সীমায়িত করে রেখেছিল 'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পের রতিকান্ত-শকুন্তলাকে। রতিকান্তের পরিচয় –

> "ওর পূর্বপুরুষেরা প্রতাপগড়ের মস্ত তালুকদার ছিল। প্রায় রাজরাজড়ার সামিল। এখন অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে, তাই রতিকান্তকে চাকরি নিতে হয়েছে। ...খাসা চেহারা ছোকরার! যেন রাজপুত্তুর!"[৯]

ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারের যুবক সুপুরুষ রতিকান্তের মধ্যেও সেই ক্ষত্রিয়ত্বের ছায়া রয়েছে যা দুষ্যন্তের সঙ্গে কোথাও যেন একীকৃত হয়ে যায়। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর প্রথমাঙ্কে দুষ্যন্তের কথায় উঠে আসে –

> "ভবতি, যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ সো'হমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্মারণ্যমিদমাযাতঃ।"[১০]

পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত রাজা হওয়ায় সে বনে যজ্ঞাদিক্রিয়া ধর্মপথে সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছে। এই বাক্যটি দুষ্যন্তের বংশমর্যাদা এবং তার রাজোচিত গুণের সমাদর জানায়। আবার ষষ্ঠ অঙ্কে সে শোকতাপকে অনুগত ক'রেই দেবাসুরের যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। তাই ক্ষত্রিয় পুরুষরূপে দুষ্যন্তের চরিত্রচিত্রণ হয়েছে বহুমুখী। এদিকে রতিকান্তের পেশা নগর ও নাগরিকদের সুরক্ষাপ্রদান। তাই ক্ষত্রিয় বংশজ রাজোচিত পরিচয়ের সঙ্গে কুরুকুলনরেশ দুষ্যন্তের মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার তার নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আদি রস শৃঙ্গারের স্থায়িভাব 'রতি'-র দীপ্ততা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তদনুযায়ী নামকরণ সাহিত্যের এক কর্তব্য। তাই শকুন্তলার প্রতি তার অভিসন্ধি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত, তা পাঠকের অজানা থাকেনা। কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে দেখিয়েছিলেন শিবের নেত্রাগ্নিতে কামের দহন তথা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই কামের উত্তরণ ঘটে বিশুদ্ধ নির্মল প্রেমে যা নিরাকার এবং অনন্ত। তাই শকুন্তলাসহ রতিকান্তের মৃত্যু এক আলংকারিক ব্যঞ্জনা। রতিসর্বস্ব আত্মসুখ নিজ কামাগ্নিতেই দগ্ধ হয়ে গেছে। এখানেই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনের প্রতিলিপি অনুভব করা যায়।

শকুন্তলা ও মহামুনি দুর্বাসা : তৃতীয় যে সাহিত্যরচনাটির নামোল্লেখ করণীয়, তা রাজশেখর বসু তথা পরশুরামের ছোটগল্প 'ভরতের ঝুমঝুমি'। এই গল্পে যা প্রত্যক্ষ উপস্থিতি রয়েছে, তিনি মহামুনি দুর্বাসা। হরিদ্বারে দেখা লেখকের উক্তিতে তিনি–

> "একজন বৃদ্ধ সাধুবাবা। রংটা বোধহয় এককালে ফরসা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। লম্বা, রোগা, মাথার জটাটি ছোট কিন্তু অকৃত্রিম, গোঁফ আর গালের ওপর দিকের দাড়ি ছেঁড়া ছেঁড়া, যেন ছাগলে খেয়েছে। কিন্তু থুতনির দাড়ি বেশ ঘন আর লম্বা, নিচের দিকে ঝুঁটির মতন একটি বড় গেরো বাঁধা। দেখলে মনে হয় গেরোটি কোনও কালে খোলা হয় না। পরনের গেরুয়া কাপড় আর কাঁধের কম্বল অত্যন্ত ময়লা। সর্বাঙ্গে ধুলো, গলায় তেলচিটে পইতে, হাতে একটা ঝুলি আর তোবড়া ঘটি। রুদ্রাক্ষের মালা, ভস্মের প্রলেপ, গাঁজার কলকে, চিমটে, কমণ্ডলু প্রভৃতি মামুলী সাধুসজ্জা কিছুই নেই।"[১১]

কালিদাস প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিধি মেনেই দুর্বাসাকে মঞ্চের নেপথ্যেই রেখেছিলেন। শুধু শোনা যায় শকুন্তলার প্রতি তার ঘোর অভিসম্পাত। অথচ এই গল্পে তিনি সশরীরে উপস্থিত। লেখক ও তার দোসরদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথোপকথনের পরে জানা যায় তিনিই সে পুরাপ্রসিদ্ধ স্বভাবকোপন মহামুনি দুর্বাসা। শকুন্তলাকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে একদা তিনি যখন গঙ্গোত্রী তীর্থে পুণ্যব্রত হয়েছেন, তখনই একদিন শকুন্তলা জননী অপ্সরা মেনকার আগমন ঘটে এবং পরুষ বাক্যে জানায় যে শকুন্তলা বিনা দোষে দুরূহ শাস্তিভোগ ক'রে চলেছে। তাই মহাদেবের ক্রোধবর্ষণ হতে পারে দুর্বাসার প্রতি। তাই দুর্বাসা যদি শকুন্তলার পুত্র ভরতকে গিয়ে মেনকার উপহার ঝুমঝুমি দিয়ে আসে, তবে তিনি দেবাদিদেবের কৃপাধন্য হতে পারেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই বিনা বাক্যব্যয়ে দুর্বাসা চলে যায় শকুন্তলার কাছে কিন্তু ভাগ্যদোষে সেই ঝুমঝুমি খুঁজে পাননা। সেই থেকেই দুর্বাসার মন অশান্ত হয়ে রয়েছে। এমনই সময় দুর্বাসার সঙ্গে লেখক ও তাঁর সহযাত্রীদের ধ্বস্তাধ্বস্তিতেই তার অপরিচ্ছন্ন শ্মশ্রুজালের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে সেই ঝুমঝুমি কিন্তু তার শেষ রক্ষা হয় না। দীর্ঘদিন ধরে থাকা ঝুমঝুমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এই গল্প তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমির অনুপাতে ছিল এক জীবন্ত দলিল। শকুন্তলার রাজচক্রবর্তীলক্ষণযুক্ত পুত্র ভরত এবং তৎপরবর্তী যুধিষ্ঠির থেকে শুরু ক'রে পরীক্ষিত রাজার যুগ কালের গতিতে নিঃশেষিত হয়েছে এবং অন্ধ্র, মুঘল শাসনের পরেও অক্ষত থাকা ভারতবর্ষ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি দেশের জন্ম হয় – ভারত এবং পাকিস্তান (পূর্ব-পশ্চিম)। গল্পকার পরশুরামের সাহিত্য প্রতিভার বলিষ্ঠতা এতই প্রখর যে তিনি এখানে পূর্ণাঙ্গ রূপকের উপমায় দেশভাগের চিত্রকল্পকে তুলে ধরেছেন। ভরত বংশ থেকেই 'ভারত' দেশের নামকরণ এই ঐতিহাসিক তথ্যকে স্মরণে রেখে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে শকুন্তলার পুত্র ভরতের স্নেহসম্পদ ভারত দেশ নানা ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা ক'রেও অবিভক্ত ছিল কিন্তু সেই ঝুমঝুমি ম'তই ভারতভূমিও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। দেশভাগের যন্ত্রণা এবং খেদ-ই এই গল্পের প্রণোদনা। তাই একটি রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারতবাসীর হাহাকারের করুণ রস এই গল্পে ধ্বনিত হয়েছে। তাই দুর্বাসা এখানে ভারতবাসীর সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং ভরতের ঝুমঝুমি হ'ল উত্তরে হিমাদ্রি থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষ। সুতরাং একটি অপ্রত্যক্ষ চরিত্রকে লক্ষ্য ক'রে এবং প্রতীকী সাহিত্যগুণে এই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পটি *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর যেন উত্তর প্রজন্ম হয়ে উঠেছে। মায়ের গর্ভ থেকেই যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তেমনই কালিদাসের নাটকটি থেকে প্রসূত হয়ে স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে এই গল্প।

স্বর্গ ও শকুন্তলা : সেলিম-আল-দীনের এই *শকুন্তলা* দৃশ্যকাব্য কতখানি মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটককে অনুসরণ করেছে এবং কতখানি স্বাধীন থেকেছেন, তার জন্যই এই আলোচনা। আধুনিক যুগে শকুন্তলাশ্রিত রচনাবলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা স্বাধীন ও সচেতন। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তকে অনুসরণ করেই নাট্যকারের মনে যে প্রশ্নগুলি তৈরি হয়েছে, তা-ই দর্শক বা পাঠকের কাছে জিজ্ঞাসা হয়ে উঠে এসেছে। মেনকা একজন সুরাঙ্গনা। রমণীয় ছলাকৌশল তার প্রাণ। তাই মেনকার কন্যা হওয়ার গোপন তথ্যপ্রকাশ যদি কখনও তপোবনের আশ্রমে প্রকাশ পায়, তবে তাকে কী ধরণের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হত, তারই আভাস এ দৃশ্যকাব্যে ভাস্বর। 'স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র' অংশে দেখা যায় যে বিশ্বামিত্র এবং ইন্দ্রের যুদ্ধ আসন্ন। তাই স্বর্গ-মর্ত্যের এই যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্যই ইন্দ্রের নির্দেশে অর্কের ছদ্মবেশে নারদ মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়। বিশ্বামিত্রের জন্য সে সন্ধান করে 'কামবৃক্ষের রস' যা সেবনে বিশ্বামিত্রের রতি জাগ্রত হবে। ইন্দ্রের রাজনৈতিক কূটনীতি জয়লাভ করে। বিশ্বামিত্র সেই রস সেবন করে এবং অপ্সরা মেনকার সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। ফলতঃ মেনকা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। 'শকুন্তলা' অংশটির নাট্যক্রিয়ার আধার মহর্ষি কণ্বের তপোবন। সেখানে বয়সের ঔচিত্যানুযায়ী শকুন্তলা ঋতুমতী হয়। এমনকি রক্তক্ষরণের ম'ত উপসর্গ দেখা দিলে ভিষক এসে উপস্থিত হয়। অন্যদিকে কণ্ব এবং গৌতমী চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। ভিষক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে শকুন্তলার রোগনির্ণয়েই সন্দেহপ্রকাশ করে যে শকুন্তলা কোনো মর্ত্যবাসী মানবীর সন্তান হতে পারেনা। আশ্রমের আবহাওয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা তাদের প্রিয়সখী শকুন্তলার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। এমনই সময়ে দুঃসংবাদ এসে পৌঁছায় যে চণ্ডাল কর্তৃক আশ্রমমৃগ নিহত হয়েছে। শোকে জর্জরিত শকুন্তলা তখনই জানতে পারে যে মহর্ষি কণ্ব তার জন্মদাতা নয়। গৌতমী তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও শকুন্তলা এই সত্যশ্রবণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। বিষণ্ণ শকুন্তলা নিজেকে অশুদ্ধ মনে করে। আত্মগ্লানি ও মানসিক পীড়ায় ধীরে ধীরে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

এই দৃশ্যকাব্যটি কতখানি কালিদাসীয় অনুষঙ্গকে আত্মস্থ করেছে তা উল্লেখ্য। কাহিনি অনুসারে বলা যেতে পারে যে নাট্যবস্তুগত সাযুজ্য অপেক্ষা চরিত্রের অবস্থানগত সাযুজ্য লক্ষ্য করা গেছে। তাই এখানে বিচার্য হল কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকটির প্রভাবে সেলিম-আল-দীনের *শকুন্তলা* নাটকটির প্রতিক্রিয়া কীরূপ হয়েছে। অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যটির দ্বিতীয় খণ্ডে শকুন্তলা-কণ্ব-গৌতমী-শারঙ্গ-শারদ্বতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কালিদাসের প্রভাবে মূর্ত হয়েছে। *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার পরিগৃহীত যাত্রাকালে যেভাবে অপত্যস্নেহে গৌরব ও ভারবত্ব

লাভ করেছে, তার প্রতিলিপি এখানে না থাকলেও উভয়ের সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব সমতা রক্ষা করেছে। মূল নাটকে কণ্ব পিতৃস্নেহে শকুন্তলাকে বলেছে –

> "যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
> কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
> বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
> পীড্যন্তে গৃহিনং কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।।"[১২] (৪/৮)

অর্থাৎ মহর্ষি কণ্ব আর্দ্র চিত্তে বলেছে যে একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তার বিগলিত অশ্রু বাধা মানেনি। সুতরাং শকুন্তলা পালিতা কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিও পিতা কণ্বের বাৎসল্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই দৃশ্য সেলিম-আল-দীনের দৃশ্যকাব্যেও লক্ষণীয়। শকুন্তলার জন্মেতিহাস প্রকাশ পাওয়ার আগেই সে আশঙ্কা করে –

> "তার জন্ম তাকে নিঃসঙ্গ করে দেবে – লোকালয়ে থেকে লোকাতীত ঘৃণা ও ব্যবহার পাবে। -এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো।"[১৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কণ্ব-শকুন্তলার সম্পর্কের অঙ্গিরস বিপথে যায়নি। এছাড়াও আশ্রমমৃগের প্রসঙ্গও সেলিম-আল-দীন নাট্যে এনেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে চণ্ডালদের দ্বারা তার হনন হয়েছে যা কালিদাসের রচনা থেকে স্বতন্ত্র সংযোজন। মূল সংস্কৃত নাটকটির চতুর্থ অঙ্কে দেখি "উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ।"[১৪] শকুন্তলা যখন আশ্রম পরিত্যাগ করছে, সেই শোক বহন ক'রে চলেছে আশ্রমের হরিণশাবকরা। তারাও শকুন্তলার সঙ্গে সমব্যথী। এছাড়াও প্রথমাঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ার্থে হরিণবধোদ্যত হলে বৈখানস বলে ওঠে সেই চিরন্তন শ্লোক –

> "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যো'যমস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।"[১৫] (১/১০)

এখানে হরিণের প্রতি শরনিক্ষেপ না হলেও তার সম্ভাব্য ফল জানিয়েছে বৈখানস। সাহিত্যিক পরিভাষায় ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে এই মৃগের পেলব শরীর শকুন্তলার হৃদয়ের সুকোমলতা। তাই সেখানে আঘাত হলে তার পরিণাম যে তীব্র বেদনাময় হতে পারে, তার আভাস দিয়েছেন কালিদাস। সেলিম-আল-দীনের *শকুন্তলা*-য় মৃগবধেরই উল্লেখ রয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলেছে – "হায় প্রিয় বোন - মৃতের অভিজ্ঞান নিয়ে বুকের ভিতরে তুমি কেবলই শোকার্ত হবে।" নাট্যকার এখানে 'অভিজ্ঞান' শব্দেরও ব্যবহার দেখিয়েছেন। এখানে 'মৃতের অভিজ্ঞান' হ'ল বিগত স্মৃতিসম্পূট। অতীতের স্মৃতিভার বা স্বর্গীয় চক্রান্তে তার জন্মের কথা যে তাকে আহত করতে পারে, তারই সুস্পষ্ট দ্যোতনা প্রিয়ংবদার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মূল নাটকে 'অভিজ্ঞান' ছিল ক্ষুদ্রার্থে অঙ্গুরীয়ক এবং বৃহদর্থে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র সর্বদমন। তার রেশ এই নাট্যপরিধিতে না আসায় এই স্মারক বা 'অভিজ্ঞান' শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে তার সঙ্গে ভোগলোলুপতার সম্বন্ধ। অর্থাৎ যেহেতু সে মেনকার সন্তান, তাই তার মধ্যেও যেন সেই লালসার চিহ্ন রয়ে যেতে পারে এমনই নাট্যকারের বক্তব্য। এর কারণ এখানেও এটি রূপকার্থে প্রযোজ্য। তার জন্মের ইতিবৃত্ত শ্রবণে প্রকৃতির সহজন্যা শকুন্তলা যে কতখানি আহত হতে পারে, তারই আভাস। তাই নাট্যকার এখানেও পূর্বজ কালিদাসের কাছে ঋণী। এছাড়াও প্রথম খণ্ডে তিনি 'চীনাংশুক' শব্দের উল্লেখ করেছেন। কৌশিকী নদীর কাব্যিক বর্ণনায় অর্করূপী নারদের কথনে রয়েছে –

> "আজ সে পরেছে ক্রৌঞ্চ মিথুন আঁকা শাড়ি। এত লাজুক এ নারী যে – ওই চীনাংশুক তার কেউ যদি তর্জনীতে তুলে নেয় লজ্জায় কিছু বলবে না।"[১৬]

এই শব্দবন্ধ ব্যবহারে যথার্থ কারণ অনুমান করা যায়না। 'চীনাংশুক' একপ্রকার মসৃণ পট্টবস্ত্র। *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের প্রথমাঙ্কের শেষ শ্লোকে এর উল্লেখ পাওয়া যায় – "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীযমানস্য"[১৭] (১/৩৬) হিসেবে। রথের শিরোস্থানে উড্ডীয়মান পতাকাটি চীনাংশুক পট্টের। তাই নদীর জলের স্বচ্ছতার দ্যোতকই এই শব্দব্যবহারের হেতু।

তাই সেলিম-আল-দীনের এই নাটকের উপজীব্য বিষয় *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাকি স্বয়ং শকুন্তলা; সেটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ইতিবৃত্তের মধ্যে দুষ্যন্তের চরিত্র অনুপস্থিত। এমনকি দুষ্যন্তের চরিত্রের অনুপ্রবেশের মতো কোনো উপযুক্ত ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেননি নাট্যকার। তাই এই দৃশ্যকাব্য মূল *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের প্রথমাঙ্কের সূচনারও প্রাককথন বলা যেতে পারে। শকুন্তলা বা একজন কন্যা সন্তান যদি তার পিতামাতার অবৈধ সন্তান হয়, তাহলে সেকথা জানার পরে তার মনোগতি ক্রমঃস্পন্দিত রূপের প্রতিলিপি তৈরিই এই দৃশ্যকাব্যে বিষয়বস্তু। শকুন্তলার মধ্যে যে খেদ সঞ্চারিত হয়েছে, তার কথা কালিদাসের নাটকে দৃশ্য নয়। এমনকি পালিত পিতা কণ্ব এবং মাতাস্বরূপা গৌতম সঙ্গে তার সম্পর্কের গতিবিধিও কালিদাসের কাব্যে অভিধেয় রূপে বাচ্য হয়নি। অর্থাৎ সেলিম-আল-দীনের এই দৃশ্যকাব্যকে কবিকল্পিত বিষয়াশ্রয়ী নাট্যসন্দর্ভই বলা না গেলেও বলা যায় যে এটি নাট্যবিষয়গত নবীন সমীক্ষণ। এখানে নাট্যকাহিনির একাংশের অনুসরণ ঘটেছে।

কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থান কণ্বের আশ্রমের তপোবন। সেখানে পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে। তবে তার সঙ্গে বাক্য বিনিময় না ঘটলেও অপর দুই আশ্রমতনয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সঙ্গে রাজার মধুরালাপ চলতে থাকে। সেই সময় শকুন্তলার পিতৃপরিচয় জানতে উদ্গ্রীব দুষ্যন্তকে অনসূয়া বলে –

> "শৃণোতু আর্যঃ। গৌতমীতীরে পুরা কিল তস্য রাজর্ষেরুগ্রে তপসি বর্তমানস্য কিমপি জাতশঙ্কৈঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরা প্রেরিত নিয়মবিঘ্নকারিণী। ...ততঃ বসন্তোদারসময়ে তস্যাঃ উন্মাদযিতৃ রূপং প্রেক্ষ্য।"[১৮]

অতএব পুরাকালে কোনো এক সময়ে রাজর্ষির (বিশ্বামিত্র) ধ্যানভঙ্গহেতু দেবতারা মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে মর্ত্যে প্রেরণ করে। অতঃপর বসন্ত কালোচিত মদনতাপিত হয়ে রাজর্ষি-অপ্সরার কন্যাসন্তান জম্মায়। অনসূয়ার বাক্যশ্রবণেই রাজা বুঝতে পারে তার পরিণামের কথা এবং তার বোধ জন্মায় যে শকুন্তলা সেই বিশ্বামিত্র-মেনকার সন্তান। অনসূয়া এও বলে –

> "উজ্ঝিতাযাঃ শরীরসংবর্ধনাদিভিঃ তাতকাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা।"[১৯]

অর্থাৎ শকুন্তলা পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে তখন মহর্ষি কণ্বই তার লালনপালন করেছে। যেহেতু বিশ্বামিত্র-মেনকার আখ্যানভাগটি কালিদাসের নাটকে মঞ্চায়িত হওয়ার সুযোগ নেই, তাই নাট্য কৌশলরীতিতেই কালিদাস এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন এবং সেলিম-আল-দীন এই তথ্যটির ওপর ভিত্তি ক'রেই তাঁর *শকুন্তলা* দৃশ্যকাব্যের আদর্শ চিত্ররূপকল্প নির্মাণ করেছেন। 'শকুন্তলা খণ্ড' অংশে গৌতমী বলে ওঠে –

> "স্বর্গের নীল নটনটী গৌতমীর অভিশাপ নাও। একজন জননী সে মা হতে পারে নি – আর একজন মা – সে শুধু জননী নয় বলে মা হতে পারলো না।... শকুন্তলা বিশ্বমিত্রের তপোভঙ্গের ফল। নটী মেনকার গর্ভজাত সন্তান সে।"[২০]

এরপরই শকুন্তলার বর্তমান জীবন আন্দোলিত হয়। সে বর্তমানকে অতীতের দর্পণে দেখতে চায়। তাই তার আর্তস্বর জানায় –

> "আমি শকুন্তলা নই। এ তোমাদের দেয়া নাম। এ নাম তোমাদের বানানো – আমার, জন্মের মতো বানানো। আমার নাম আসবে ওই নীলাভ্র থেকে – আমার জননীর উদর থেকে – পুষ্পল সুন্দর নাম।... ওই শোনো বনমর্মরে আমার মা বলে – অভ্রের ডানা দেবো তোকে। খাদ্যনালী ছিঁড়ে ফেললেই তুই অমল উজ্জ্বল হবি। - আজ আমি পবিত্র হবো।"[২১]

শকুন্তলার এই স্বগতোক্তি কালিদাসের নাটকে মূর্ত হয়নি। যদিও পঞ্চম অঙ্কে রাজার শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের পরে শার্ঙ্গরবের থেকে সরোষভাষণ শ্রুত হয় –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলযা ত্বযা।
অথ তু বেৎিস শুচি ব্রতমাত্মনঃ
পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্।।"[২২] (৫/৩০)

শার্ঙ্গরবের উক্তি থেকেই সহজে বোঝা যায় যে (গান্ধর্ব) বিবাহোত্তর কালে তার স্বাতন্ত্র্য খর্বিত হয়েছে এবং স্বামীর থেকে লাঞ্ছিত হওয়ার পরেও স্ত্রীধর্মানুসারে তার দাসীবৃত্তি করাই শ্রেয়; কারণ সে কুলের কলঙ্কভাজন হওয়ায় মহর্ষি কণ্বের কোনো সাত্ত্বিক কার্যে তার সহায়তার প্রয়োজনও থাকবেনা। তাই একদিকে স্বামীপরিত্যক্তা এবং অন্যদিকে তার সহ-আশ্রমিকদের তার প্রতি অনীহাপ্রকাশে সে বলতে বাধ্য হয় "ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্।"[২৩] কোনো নারী যখন সম্পূর্ণতঃ সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়ে, তখনই ধরিত্রীকে বিদীর্ণ হতে অনুনয় প্রকাশ করে। ঠিক তারই পরে নেপথ্যে একটি অত্যাশ্চর্যমূলক ঘটনা ঘটে এবং কুলপুরোহিতের থেকে পাঠক বা সহৃদয় দর্শক জানতে পারে যে কোনো এক সুরপ্রভাসজ্জিতা জ্যোতির্ময়ী অঙ্গনা শকুন্তলাকে আকাশমার্গে নিয়ে চলে যায় যখন শকুন্তলা ভাগ্যবিড়ম্বিতা হয়ে ক্রন্দনরত চিত্তে বিবশা হয়ে পড়েছিল –

"দেব, পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু
সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।
স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরতীর্থমারাদুৎথাপৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম।।"[২৪] (৫/৩৩)

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে শকুন্তলার চরিত্রটি যেভাবে লিখিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে শকুন্তলার মধ্যে দুষ্যন্তজনিত উৎকণ্ঠা এবং বিপ্রলম্ভাত্মক রতির অভিব্যক্তি। প্রথম অঙ্কে সে সলজ্জ ভঙ্গিমায় নাট্যপরিসরে আবির্ভূত। আশ্রমবৃক্ষে জলসেচনাদি নিত্যকর্মে সে অভ্যস্ত। সেই নিস্তরঙ্গ জীবনে সহসা রাজা দুষ্যন্তের প্রবেশ। রাজা ও শকুন্তলা উভয়েই অনুরক্ত হয় যা পূর্ণতঃ উন্মেষিত হয় তৃতীয় অঙ্কে। সেখানেও শকুন্তলার চরিত্রটি আবর্তিত হয়েছে নায়ক দুষ্যন্তকে কেন্দ্র ক'রেই। এরপর চতুর্থ অঙ্কে বোঝা যায় তার নিসর্গপ্রেমের আবিলতা। চেতন-অচেতনের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাট্যকার অসাধারণ প্রতিভায় ব্যক্ত করেছেন। তাই বনজ্যোৎস্না, আশ্রমমৃগ সকলেই শকুন্তলার বিদায়ে ব্যথিত ও মথিত হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা দুষ্যন্তকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও মঞ্চে সময়ব্যয় করেনি। এরপর শেষ বা সপ্তম অঙ্কে তার দুষ্যন্তের সঙ্গে মিলনকালে সে একজন জননীসুলভ নারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই কালিদাসের রচনাভণিতি তাকে একমাত্রিক ক'রে তুলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা-ই নায়িকা শকুন্তলার লক্ষ্য। অন্যদিকে দুষ্যন্ত ষষ্ঠ অঙ্কে স্ত্রীর জন্য বিলাপ করেছে। কালিদাসের নাট্যরচনায় শকুন্তলা তার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত ছিল কিনা সে বিষয়েও কোনো মন্তব্য করেননি কালিদাস। তাহলে এক্ষেত্রে সন্ধিৎসু পাঠকের জিজ্ঞাসা থাকতে পারে যে সেলিম-আল-দীন শকুন্তলার চরিত্রবর্ণনায় কতখানি প্রাচীনতার অবলম্বন করেছেন এবং তা কীভাবে বজায় রেখেছেন। তাহলে এখানে বলতে হয় যে তিনি যেভাবে মহাকবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তা হল শকুন্তলার চরিত্রের আন্তরিক সৌকুমার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূর্বোক্ত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়-বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"[২৫]

সেকথারই প্রতিফলন দেখা যায় এই শকুন্তলা দৃশ্যকাব্যে। যখন শকুন্তলা জানতে পারে তার প্রকৃত জননী অপ্সরা মেনকা, তখনই তার মধ্যে থাকা স্বর্গ-মর্ত্য তথা বদ্ধতা-মুক্ততার দ্বন্দ্ব নাট্যকে অধিকতর নাট্যায়িত করে তুলেছে। শকুন্তলা বলে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মা বলেছেন শুদ্ধ হও মেয়ে। এইসব নোংরা শরীর ফেলে চলে এসো। মা আমি আজ ধূপ জ্বালবো – পায়ে পরবো সোনার নূপুর। মানুষ – মানুষ। ছি ঘেন্না। তারা এক পেট বমি নিয়ে স্বর্গের গান করে। আমি এই নখে কুয়াশা মেখে সাঁঝের আকাশ দেখবো। আমার নাচে নদী চলে আসবে ভুল পথে।"[২৬]

অর্থাৎ এই দৃশ্যকাব্যের 'স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র' খণ্ডভাগে যে কামলোলুপতার প্রসঙ্গ এসেছিল, তা হ'ল আত্মরতিবিলাস এবং 'শকুন্তলা' খণ্ডভাগ প্রমাণ করে যে শকুন্তলা একজন রঙ্গোপজীবিনী অপ্সরার কন্যা হয়েও সে বাসনাকে করতে পারে রিক্ত। তাই কালিদাসের নাটকে যে সত্য কথিত হয়েছে পাঠকসম্মুখে, সেই সত্যই পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে সেলিম-আল-দীনের মাধ্যমে। দুষ্যন্তের সঙ্গে তার পরিচয় এবং তদাবস্থায় তার মধ্যে অনুরণিত হয়েছে কাম এবং যখন দুর্বাসার অভিশাপে স্বামীর সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদে বিরহের জ্বালা তাকে দগ্ধ করেছে, তখনই সে হয়েছে শুদ্ধ। তখন দুষ্যন্তের প্রতি জাগ্রত হয়েছে তার প্রেমসত্তা। এভাবে শকুন্তলার চিত্তের শুদ্ধীকরণ যেমন মহাকবির বৈদগ্ধ্যে আলোকিত হয়েছে, তেমনই আধুনিক সময়ের বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম-আল-দীনের *শকুন্তলা*-ও সেই ভাবকে পরিমিতিজ্ঞানেই ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন দৃশ্যকাব্যের।

অনুভবে ও অভিনবত্বে শকুন্তলা : কালিদাসের স্নিগ্ধ ছায়াতলে যত সাহিত্যিক-ই আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের সেই আশ্রয়টি নিজস্ব আলয় হয়ে উঠেছে কিনা তার ভাবনা প্রয়োজন। রবীন্দ্রবচনকে অনুসরণ করলে দেখতে হবে যে সেই সৌন্দর্য এবং সংযমের মিশেল ক'তখানি ঘটেছে। 'অনুভব' অর্থাৎ যা ছিল নির্বাক, তা-ই হ'ল সবাক। অন্যদিকে 'অভিনবত্ব' তখনই আসে যা সম্পূর্ণতঃ আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাষার সৌজন্যে নতুনের প্রাপ্তি। প্রথমটি কোনও এক রূপ থেকে অপরূপের দিকে যাত্রা এবং দ্বিতীয়টি রূপের মধ্যেই অপরূপের সন্ধান। *বীরাঙ্গনা* কাব্যটিকে প্রথম প্রকারে সামিল হতে পারে। সেখানে শকুন্তলার গহীন মনের অস্ফুট বাক্যকেই কবি প্রস্ফুটিত ক'রে তুলেছেন। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার এহেন স্বগতোক্তি সংযোজিত হলেও মূল নাট্যক্রিয়ায় কোনও পরিবর্তন হবে না। তাই এটি আশ্রয় পর্যায়েই রয়ে গেছে। অযথা ভাবগম্ভীর কোনও নাট্যীয় উপাদান যুক্ত করেননি। ফলে এখানে শকুন্তলার মধ্যে কেবলই কামের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছে যা অনুপম কাব্যিক হলেও কালিদাসের দর্শন উঠে আসেনি। বহ্নিপতঙ্গ গল্পটির সঙ্গে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল* নাটকের সম্পর্ক সমানুপাতিক। দুইয়ের মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব বর্তমান। তাই এখানেও মূল নাটকের কোনও ভাবান্তর ঘটছে না। এখানে ফুল ও ফলের অপার্থিব সৌন্দর্যের আস্বাদ অনুভাবিত করে। কীভাবে একটি প্রাচীন সাহিত্য বর্তমানের যুগেও একই চেতনা উদ্রিক্ত করে, তার জন্য এই গল্প এক আদর্শ উদাহরণ। 'ভরতের ঝুমঝুমি' এক অভিনব সৃষ্টিচাতুর্য। সেখানে মূল গল্পটির কাঠামো তদ্বৎ রয়ে গেলেও তত্ত্বব এক আধুনিক বা সমকালীন ভাবনার উদ্রেক ঘটিয়েছে। কোনও এক অংশবিশেষ যে একটি সমগ্র চিত্রপট রচনা করতে পারে, তা দেখিয়েছেন পরশুরাম। এখানে গল্পকারের কালিদাসের বার্তাকে তুলে ধরার কোনও প্রয়াস ছিল না। এমনকি তার প্রয়োজনও থাকেনি। তাই গল্পটি তার নিজস্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সবশেষে আসে *শকুন্তলা* দৃশ্যকাব্যের কথা। সাহিত্য সংরূপের দিক থেকে এর সঙ্গে *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-এর ভেদ নেই। দুটিই দর্শনযোগ্য নাট্য রচনা। এখানে নারীদের জীবনে ঘটা বিভিন্ন প্রতিকূলতার কথাই উঠে এসেছে। স্বর্গ ও মর্ত্যের মেলবন্ধন ঘটেছে তবে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ও বিশ্ব মানবতার প্রীতির মধ্যে কোনটি উত্তম, তার বিচারের অবকাশ থাকেনি। এই দৃশ্যকাব্য শকুন্তলার মায়াময় ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে পরে তা নিজের ঠিকানা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আধুনিক যুগের এই চারটি সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরে একথাই বলতে হয় যে 'বহ্নি-পতঙ্গ' গল্পটিই নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরম ফল। নতুন প্রেক্ষাপটে এবং নতুন প্রেক্ষিতে এক অনির্বচনীয় দার্শনিক বোধসম্পন্ন সাহিত্যের সৃজন হয়েছে। কালিদাসের *অভিজ্ঞানশাকুন্তল*-কে বলা হয় নাট্য সাহিত্যের মধ্যে অতি রমণীয় এক নাট্যগ্রন্থ। তাই সেই নাটককে কেন্দ্র করে কখনও গল্প, কখনও উপন্যাস, কখনও কাব্য, কখনও দৃশ্যকাব্য বা কখনও প্রবন্ধ লেখার চর্চা যেমন অব্যাহত, তেমনই প্রতিটি সাহিত্যই রসোত্তীর্ণ।

Reference:

১. *মহাভারতম্ : আদিপর্ব্ব*. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু.), কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৬৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 485 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. Winternitz, M. *History of Indian Literature : Vol III*, Delhi : Motilal Baranasidass, 1967, PP. 237-238
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *প্রাচীন সাহিত্য*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪
৪. তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬
৫. দত্ত, মধুসূদন. *বীরাঙ্গনা কাব্য*, কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বউবাজার ১২৭ নং ভবনের ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে যান্ত্রিত, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩-৪
৬. তদেব, পৃ. ৩
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু. *ব্যোমকেশ সমগ্র*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ৬২০
৮. তদেব, পৃ. ৫১৩
৯. তত্রৈব
১০. কালিদাস. *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু.), কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, ১৮৬০ শকাব্দ, পৃ. ৩১
১১. বসু, রাজশেখর. *ধুস্তরী মায়া ইত্যাদি গল্প*, কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) : এম সি সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ, (প্রকাশকাল অপ্রাপ্ত), পৃ. ৪০-৪১
১২. কালিদাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬
১৩. আল-দীন, সেলিম, *সেলিম আল দীন নাটকসমগ্র ১*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ৪১০
১৪. কালিদাস. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮
১৫. তদেব, পৃ. ২৩
১৬. আল-দীন, সেলিম. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮
১৭. কালিদাস. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
১৮. তদেব, পৃ. ৩৬
১৯. তত্রৈব
২০. আল-দীন, সেলিম. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১০
২১. তদেব, পৃ. ৪১১
২২. কালিদাস. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪-৪১৫
২৩. তদেব, পৃ. ৪২০
২৪. তদেব, পৃ. ৪২১
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২৬. আল-দীন, সেলিম. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 497 - 503
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আচার ধর্ম ও হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব : রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী’

ড. শুভেন্দু মণ্ডল

Email ID : shubhendumondal90@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Brahma Dharma, Buddhism, Poetic Drama, Buddhist Philosophy.

Abstract

Although the propagation and spread of Buddhism have changed in the present day, many were initiated into this religion in ancient times. Due to various conflicts, people were attracted to Brahma Dharma, and Buddhism began to decline rapidly. Although the practice of Buddhist thoughtwas revived in Bengal in the 19th century, it is still going strong even now. Maharishi Debendranath Tagore, Brahmananda Keshavachandra and their followers did not ignore the philosophy and ideals of Buddhism. Satyendranath Tagore wrote a valuable book named 'Buddhism', and on the other hand, Rahul Sankrityayan wrote a book called 'Mahamanav Buddha' on the biography of Buddha. Rabindranath was also deeply moved by the ideology of Buddha. Therefore, he not only tried to re-expand Buddha's intellectual thoughts in a new context through various studies but also created many works.

The narrative of the Malini play is created by mixing the Malini episode of 'Mahabastu-Avdan' ('Malinya Bastu'-The Story of Malini) with this dream tale. The story of 'Malinya-Avdan' of Mahavastu-Avdan is very extensive. At the request of RajendraLalMitra, HaraprasadShastri (then a young man) abridged the entire 'Mahabastu-Avdan'. Based on this extensive anecdote, Rajendralal Mitra published "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal."(Cal,1882). Rabindranath became familiar with Buddhist stories through this abridged version. As a result, Rabindranath composed the poetic drama 'Malini'.

Discussion

বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কিছুটা বিবর্তন ঘটলেও প্রাচীনকালে এই ধর্মে অনেক মানুষ দীক্ষিত ছিলেন। তবে পরবর্তীতে নানা দ্বন্দ্বের ফলে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি মানুষরা আকৃষ্ট হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত অবক্ষয়িত হতে থাকে। যদিও বাংলায় বুদ্ধ ভাবনাকে নিয়ে উনিশ শতকে পুনরায় চর্চা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানেও তা ক্রম প্রবাহিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরাও সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের ভাবনা ও আদর্শকে উপেক্ষা করেননি।[১] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বৌদ্ধধর্ম’[২] নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ ও অন্যদিকে, রাহুল সাংকৃত্যায়ন বুদ্ধের জীবনী নিয়ে ‘মহামানব বুদ্ধ’[৩] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথকেও বুদ্ধের ভাবাদর্শ ও মতাদর্শ গভীরভাবে চিন্তাশীল মননকে নাড়া দিয়েছিল। আর তাই তিনি একদিকে বুদ্ধদেব সম্পর্কে নানা ধরনের অধ্যায়ন এবং অন্যদিকে, বিভিন্ন রচনা সৃষ্টির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাধ্যমে পুনরায় বুদ্ধের বৌদ্ধিক ভাবনাকে নব আঙ্গিকের প্রেক্ষাপটে পরিস্ফুট করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এই মননশীল চর্চা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন—

> "ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বুদ্ধদেবই একমাত্র মনীষী যাঁর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে আজীবন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম জীবনে সমালোচনা বইয়ের অন্তর্গত 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১২৯০ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শরীরাংশ (দন্ত) দেখে, শিলায় তাঁর পদচিহ্ন দেখে মুগ্ধ হবার কথা লিখেছিলেন। পরে 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থে বুদ্ধদেবকে 'সর্বজনীন সর্বকালীন' মানবরূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।... বৌদ্ধসাহিত্য ও শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ উপকরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় খুব অল্পই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (1882) বইটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় বইটির প্রকাশের পর থেকেই। ছিন্নপত্রাবলী-র একটি চিঠিতে দেখেছি (১৮৯৩ মার্চ ৩), বইটি তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর ব্যবহৃত বইটি এখন রবীন্দ্রভবনে রয়েছে। বইটির মলাট ও আখ্যাপত্রের মাঝখানে সাদা পাতায় যে কাহিনিগুলি তিনি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন তাদের নাম ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিজের হাতে লিখে রেখেছেন। তার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তা জানেন। সব কবিতাগুলি ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে রচিত এবং কথা কাব্যের অন্তর্গত। মালিনী, চণ্ডালিকা এবং রাজা নাটকের কাহিনিও এই বই থেকে নেওয়া।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল লেখনীর অন্যতম 'মালিনী' নামক কাব্যনাট্যটি। যেটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। এই কাব্যনাট্যটির উৎস মূল লণ্ডন প্রবাসী কবির এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন—

> "...স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।... অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেকদিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।"[৫]

এই স্বপ্নোতিহাসের সঙ্গে 'মহাবস্তু-অবদান'-এর মালিনী উপাখ্যান ('মালিন্যা বস্তু' - 'The Story of Malini') মিশিয়ে মালিনী নাটিকার আখ্যান বস্তু গড়ে উঠেছে। 'মহাবস্তু-অবদানে'র 'মালিন্যা-বস্তু'র কাহিনিটি অত্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত কাহিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (তখন তরুণ বয়স) সমগ্র 'মহাবস্তু-অবদান' সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। তারই উপর নির্ভর করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'The Sanskrit Buddist Literature of Nepal.' (Cal, 1882) প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সংক্ষিপ্তসার বৌদ্ধ কাহিনিগুলির সঙ্গে পরিচিত হন। আর তার ফলেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নামক কাব্যনাটক রচনা করেন এবং প্রেম-মৈত্র-করুণা[৬]র বাণী প্রচার করেন। সমগ্র অবদান সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ নেই। যাই হোক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বৌদ্ধ[৭] মূল কাহিনি[৮]র সঙ্গে যেটুকু অংশের 'মালিনী' নাটিকার যোগ আছে তার কথাবস্তু সংক্ষেপে এইরূপ—

বারানসীর মহারাজ কৃকির (Kriki) রুচিরা কন্যা মালিনী ব্রাহ্মণদের সেবা করতেন। এক সময়ে তাদের অশ্লীল আচরণের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ভিক্ষু ভগবান কাশ্যপের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ হয়। একদিন মালিনী কাশ্যপকে রাজ অন্তঃপুরে অন্ন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করে। মালিনীর সহানুভূতি দেখে কাশ্যপ তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ফলে, সেই রাজ্যের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে চক্রান্ত করে এবং মালিনীকে মেরে ফেলতে চায়। তারা মালিনীকে পরিত্যাগ করে এবং তাদের হাতে সমর্পণের জন্য রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আসন্ন উপপ্লবের ভয়ে দেশ রক্ষার স্বার্থে রাজা কন্যাকে বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দেয়।

অন্যদিকে, 'মালিনী' নাটকের প্রথমে দেখা গেছে কাশী রাজকন্যা মালিনী কাশ্যপের কাছে নব ধর্মের বা বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো সুখ-আশা,
দুঃখভয়; দূর করো বিষয়পিপাসা, ...
ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
রাত্রিদিন-মোহশোক পরাভূত হোক।"[৯]

মালিনীর সঙ্গে কাশ্যপের এই সম্পর্ক দেখে নগরের ব্রাহ্মণ প্রজাগণ বিদ্রোহী হয় এবং মহারাজের কাছে রাজকন্যা মালিনীর নির্বাসন দাবি করে। প্রজাদের কথা শোনা মাত্র মালিনী নিজেই রাজপুরী ছেড়ে ব্রাহ্মণদের সভায় উপস্থিত হয়। প্রেম-মৈত্রী-করুণার মূর্ত আধার মালিনীকে দেখে বিদ্রোহীরা শান্ত হয়। মালিনী তাদের বলে যে সর্বজীবে দয়া এবং প্রেম-মৈত্রী-করুণার বাণী প্রচারের জন্য তিনি রাজপুরী ছেড়ে চলে এসেছেন। এখানে বিদ্রোহীরা প্রশমিত হয়ে মালিনীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

মহাবস্তু অবদানে আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মণরা মালিনীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করলে মালিনী দান পুণ্য কাজের উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহের জন্য জীবন ভিক্ষা করে। ব্রাহ্মণ পরিষৎ তার অনুরোধ রাখে। এখন মালিনী সেই সাতদিন ধরে আবার শ্রাবকসংঘসহ ভগবান কাশ্যপের সেবা ও দানরূপ পুণ্য কাজ করতে থাকে। সেই সাতদিনে ভগবান কাশ্যপ মহারাজ (কৃকি) রাজ আমত্য প্রধান সেনাপতি, অন্তঃপুরজন এবং পৌর জনদের বিনয় ধর্মে দীক্ষিত করে। আর্য ধর্মে বিনীত তাদের মনে তখন এইভাব জাগে যে মালিনী তাদের কল্যাণকামী বন্ধু। তাই তারা নিজের জীবন দিয়েও মালিনীকে রক্ষার সংকল্প করে। এদিকে বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ সমবেত হয়ে মালিনীকে হত্যার জন্য অপহরণ করতে চায়। অন্যদিকে, 'মালিনী' নাটকে বিদ্রোহী প্রজাদলের নেতা ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষেমংকর। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারের দিকটি তাকে ব্যথা দিলেও সে ছিল সংস্কার ধর্মের অনুগত, তারই বন্ধু ছিল সুপ্রিয়। সে ছিল সংস্কার ধর্ম অপেক্ষা হৃদয়ধর্ম বা প্রেমধর্মের প্রতি অনুরাগী। নব ধর্মের প্রবক্তা মালিনী ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় বাদে সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রেম-মৈত্রী-করুণার বাণীতে মুগ্ধ করেছিল। সুপ্রিয়ও মনে মনে মালিনীকে শ্রদ্ধা করত। এদিকে রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণকে মালিনীর নব ধর্ম গ্রহণ করতে দেখে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহের তাগিদে ক্ষেমংকর বাইরে যায়। এদিকে রাজউপবনে রোজ সুপ্রিয় ও মালিনীর মধ্যে ধর্মালোচনা চলত। ক্রমশ অজ্ঞাতসারে দুজনের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এমন সময় বিদেশ থেকে ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে পত্র লেখে যে বিদেশ থেকে সৈন্য এনে সে নবধর্মকে বিলুপ্ত করে বাহুবলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে এবং মালিনীকে প্রাণদণ্ড দেবে।

মহাবস্তু অবদানের কাহিনির সমাপ্তি অংশে দেখা গেছে রাজ সেনা মালিনীকে অগ্রবর্তিনী করে সসৈন্যে ব্রাহ্মণদের বাসস্থানের দিকে এগিয়ে গেলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। তখন তাদের কোপ গিয়ে পড়ে ভগবান কাশ্যপ এবং ভিক্ষুদের ওপর। শ্রাবকসংঘসহ কাশ্যপকে হত্যা করার বার বার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তারা সফল হয় না। অবশেষে ভগবান কাশ্যপ অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাদের সকলকে আর্য ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর কাশ্যপ আর্য ধর্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদের নিয়ে ভগবানের গান করতে থাকে। তখন সেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ মিথ্যাত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা সকলে মিলে দণ্ড ও লগুড় নিয়ে ভগবান কাশ্যপের দিকে এগিয়ে আসে। তা দেখে কাশ্যপ পৃথিবীর দেবতাকে আহ্বান করেন এবং পৃথিবীর দেবতা তালবৃক্ষ দিয়ে সেই দুষ্টু ব্রাহ্মণদের বেদম প্রহার করতে লাগল। তখন ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণেরা পালিয়ে গেল—

"তে ব্রাহ্মণা নাশনষ্টাঃ"[১০]

অন্যদিকে, 'মালিনী' নাটকের শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় ভাবনায় ইতি টেনেছেন। মালিনীর প্রাণের আশঙ্কা দেখে সুপ্রিয় রাজার কাছে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। রাজা গোপনে সসৈন্যে অতর্কিত আক্রমণে ক্ষেমংকরকে পরাজিত ও বন্দি করেছে। মালিনীর অনুরোধে ক্ষেমংকরকে মুক্তি দিতে চাইলে, সে মুক্তির প্রত্যাখ্যান করে বলে—

"পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার-
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।"[১১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাজা তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলে এবং মৃত্যুর আগে তার কোনো প্রার্থনা থাকলে তা পূরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ক্ষেমংকরের ইচ্ছা প্রার্থনায় শেষবারের মতো তার বন্ধু সুপ্রিয়কে আলিঙ্গনের জন্য ডেকে আনা হয়। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে আলিঙ্গনের ছলনায় হাতের শিকল দিয়ে বন্ধু সুপ্রিয়ের মাথায় আঘাত করে, সুপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করে, উমত্ত ক্ষেমংকর আহ্বান করে বলে—

"এইবার
ডাকো, ডাকো ঘাতকেরে।"[১২]

মহারাজ চিৎকার করে ওঠে—

"কে আছিস, ওরে!
আন খড়্গা।"[১৩]

তখন মালিনী বলে—

"মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমংকরে।"[১৪]

তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে মালিনী অর্থাৎ মূর্ছিত হওয়ার আগেও নবধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের মূল কথা প্রতিষ্ঠার-ই চেষ্টা করেছে।

কাহিনি-উপস্থাপনায় রচনাচাতুর্যে, ভাবে ও ভাষায় বৌদ্ধ অবদান শতকের কাহিনির 'মালিন্যাবস্তু'র সঙ্গে 'মালিনী' কাব্যনাট্যটির পার্থক্য লক্ষণীয়—

১। সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর চরিত্রদ্বয় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি।

২। সুপ্রিয়ের প্রতি মালিনীর প্রেমানুরাগ রবীন্দ্র কল্পনার সংযোজন।

৩। কাব্যনাট্যটি কবির বিশেষ আদর্শ প্রচারের অনুকূল হয়ে উঠেছে।

৪। সংস্কার ধর্ম বা আচার ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা বহুবিদিত। আচার ধর্মের সঙ্গে হৃদয়ধর্মের বা বৃহৎ সত্যধর্মের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে সত্যধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে নাটিকাটিতে।[১৫]

৫। মালিনী বৌদ্ধধর্মানুগ প্রেম-মৈত্রী-করুণার মূর্তিমতী প্রতিমা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৬। ক্ষেমংকর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিনিধি। সুপ্রিয়ের মধ্যে একধারে নব ধর্ম ও সংস্কার ধর্মের দ্বন্দ্বটি[১৬] সুপরিস্ফুট হয়েছে। নবধর্ম হৃদয়ের ধর্ম, প্রাণের ধর্ম, সেবার ধর্ম এবং তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই সত্য ধর্ম।

এই বিশ্বখ্যাত মানবধর্মই যথার্থ সত্যধর্ম যার শাশ্বত মহিমা মানবীয় আধারে আধেয়। বুদ্ধের জীবন ও বাণীতে পরিপূর্ণ 'মালিনী' কাব্যনাট্যটি রবীন্দ্রনাথের সেই বোধ ও আদর্শেরই মূর্ত ফসল।

Reference:

১. ঘোষ, ড. তারকনাথ, *ভারতসংস্কৃতি পুরুষ রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৪

২. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, *বৌদ্ধধর্ম*, তৃতীয় মুদ্রণ, করুণা প্রকাশনী, ১৪০৫, কলকাতা, পৃ. ৯

("বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি কোটি এসিয়াবাসীর ধর্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চিন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশসকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থসকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভ করেছি।")

৩. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *মহামানব বুদ্ধ* (অনুবাদ: ভট্টাচার্য, অভিজিৎ), তৃতীয় মুদ্রণ, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২০, পৃ.৯০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

("বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় যে অসাধারণ জীবনাদর্শ রেখে গেছেন-তা আপামর জনসাধারণের জন্য কল্যাণপ্রদ হয়ে উঠেছে। তিনি যে আচরণগত, দর্শনগত বা তত্ত্বগত এবং স্থৈর্যগত শান্তি দেখিয়েছেন, তার দ্বারা জনমুক্তির ও শান্তির দুয়ার আগলমুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসে স্বাধীনতার পর যে 'পঞ্চশীল' শব্দটি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে এত প্রচলিত সেটিও বুদ্ধেরই কথিত। অবশ্য বুদ্ধ রাষ্ট্রের জন্যে নয়-ব্যক্তির জন্যে এটা অধিক ব্যবহার করেছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য কখনও রাজনৈতিক আগ্রাসনকে মূল্য দেওয়া হয়নি। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধরা নিজের বিচারকেই শ্রেষ্ঠ মানতেন এবং সেটাকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না।... ধর্মের ব্যাপারে বুদ্ধ এবং তাঁর অনুচরদের লক্ষ্য মানসিক শক্তির বিকাশের দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর জন্য তাঁরা গভীর অনুচিন্তন এবং যোগের সাহায্য নিয়েছিলেন দেবতার ব্যাপারেও বৌদ্ধরা সমধিক উদার ছিলেন।")

৪. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, *রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা,* প্রথম সংস্করণ, পারুল, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭-১৮

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মালিনী,* পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৮৯, পৃ. ৫-৬

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্র, *রবীন্দ্র রচনাবলী (উৎসবের দিন,* ত্রয়োদশ খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৩৯৬-৯৭

("বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে-বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থ-প্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।।
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতসিদ্ধো।
এতং সতিং অধিটঠেযং ব্রহ্মমেতং বিহার মিধবাহু।।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে-ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে-আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না-এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।")

৭. চৌধুরী, ড. বিনয়েন্দ্র নাথ, *বৌদ্ধ সাহিত্য,* (সম্পাদক: চৌধুরী, ড. সুকোমল), প্রথম প্রকাশ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ- মুখবন্ধ অংশ

("গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত অজস্র বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম যেমন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ও বিবর্তিত হইয়াছে, তেমনি বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। খ্রিস্টপূর্ব যুগে পালি ত্রিপিটক ভারতবর্ষে সংকলিত হইলেও পরবর্তীকালে সিংহল (শ্রীলংকা), ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থাইল্যান্ড ও কম্পোডিয়ায় শত শত পালি টীকাগ্রন্থ, অনুটীকা, সারগ্রন্থ, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি রচিত হইয়াছে।... সংস্কৃত ভাষায় যে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তিব্বতী ও চিনা ভাষায় অনূদিত ও সংরক্ষিত গ্রন্থাদির তালিকা হইতে যাহাদের মধ্যে বহু মূল সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।")

৮. Mitra, Rajendra Lal, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 121

দ্র: জানা, ড. রাধারমণ, *পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৬-১০৭

("A Pratyeka Buddha entered the city of Vārānasi for alms, but got nothing. A girl finding his alms-bowl empty, brought him home, and gave him a hearty meal. When he died a stūpa was erected on his remains, and the girl decorated the stūpa everyday with flowers and aromatics. She desired that she may be born with a garland of flowers in every one of her future existence; her desire was fulfilled. In her next existence she was born a Devakanyā with a garland of flowers round her neck. From heaven she descended on earth, and was born in the same way as Mālini, the daughter of Kriki, king of Vārānasi. Mālini invited lord Kāsyapa and his retinue, and entertained them with a sumptuous meal. The Brāhmans, numerous and influential at the court of her father, taking umbrage at her conduct, induced the king to order her banishment. Mālini humbly begged for a week's respite, which was granted. During those seven days, five hundred of her brothers, the ministers and officers of the Bhatta army, and the citizens were all converted to the Ārya Dharma. The converts regarded Mālini as the saviour of their souls. Angry at the wicked machinations of the Brāhmans, they proceeded in a body to remonstrate with them. The Brāhmans took refuge with the king. They revoked the sentence of Mālini's banishment; but induced the king to send ten armed men to kill Kāsyapa, the roof of all their woes. These armed men were easily converted by the great sage. They next deputed a larger number of men, but with the same result. They saw that by sending armed men they only added to the already overwhelming number of the perverts. They, therefore, determined to despatch the business themselves. Armed with clubs, maces and other weapons they marched in martial array to the hermitage of Kāsyapa. Kāsyapa invoked the goddess Prither, and desired her to show her powers against these Brāhmans. She rooted up a stout palm tree, harled it at the Brāhmans and crushed them to death.")

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মালিনী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

১০. জানা, ড. রাধারমণ, *পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১১০

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মালিনী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 497 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১২. তাদেব, পৃ. ৭১

১৩. তদেব, পৃ. ৭১

১৪. তদেব, পৃ. ৭১

১৫. ঘটক, কল্যাণী শঙ্কর, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০০, পৃ. ৩১৮

১৬. সিংহ, বিবেক, *রবীন্দ্র মননে মালিনী,* প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১, পৃ-৪৪

(“ ‘মালিনী’ নাটকে নবধর্ম ও আর্যধর্মের দ্বন্দ্ব-বিরোধ বাহ্যত মালিনী ও ক্ষেমংকরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও, প্রকৃতপক্ষে এ দ্বন্দ্বের চালকের আসনে মালিনী ছিল না, ছিল সুপ্রিয়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সুপ্রিয়র সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘাতে এ দ্বন্দ্বের সূচনা; চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমাংশে সুপ্রিয় নিজে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে, পরে ক্ষেমংকরের সঙ্গে সে ধর্মদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবশেষে তার আত্মবিসর্জনেই এ দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। ‘মালিনী’ নাটকে তাই নবধর্ম ও আর্যধর্মের যে দ্বন্দ্ব, তার দুই মেরু মালিনী ও ক্ষেমংকর হলেও এ ধর্মদ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থ শক্তি সুপ্রিয়।”)

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 504 - 508
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে প্রবাদের ব্যবহার : আধুনিক নাটকে লৌকিক উপাদান

বিমান দাস
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
এবং
সহকারী অধ্যাপক
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশিপাড়া
Email ID : dasbiman703@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Proverb, Drama, Professional Theatre, Group Theatre, Situational, Satire, Humar, Folk Literature.

Abstract
Soumitra Chattopadhyay is a famous film actor. In addition to acting on film, he acted on plays in stage. He wrote the Drama because, he did not get Original Drama from the famous dramatist of that time that satisfied him. He adopted and staged the plays by transforming Foreign Drama into the Bengali Drama. He is the intermediate man between Professional Theatre and Group Theatre. Basically, he wrote the play for Professional Theatre. But the Professional Drama stage closed for many regions. Then he forced to act and direct the play in Group Theatre. His drama specialty, he used the proverbs in these plays. The proverb is the element of Bengali folklore Literature. The use of proverb in Modern literature is inadequate. Soumitra Chattopadhyay used proverb in the drama to entertain the audience who came from most likely the village and semiurban society in the Professional Theater. Proverbs are not used in his Group Theater episode Drama. In our article, we have discussed how well the use of the proverb in his drama appropriately.

Discussion

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি সংস্কৃতির আইকন। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার অভিনেতা হিসাবেই তাঁর অধিক পরিচিতি। কিন্তু সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি শিল্পের অন্যান্য বেশ কিছু মাধ্যমের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হল থিয়েটার। থিয়েটার জগতে তাঁর আগমন ধূমকেতুর মতো হঠাৎ করে নয়। ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক ভাবে তিনি থিয়েটার করা শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে যার পরিণতি ঘটে শিশির ভাদুড়ীর সান্নিধ্য লাভের মধ্যে দিয়ে থিয়েটারকেই জীবনের সর্বস্ব করে তোলার মধ্য দিয়ে। থিয়েটার তাঁর প্রথম ভালোবাসা। থিয়েটারে অভিনয় করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় অভিনয় তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলে। চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি হয়ে ওঠেন একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। সেদিক থেকে বলা যায় চলচ্চিত্রে আগমন তাঁর

ধূমকেতুর মতো। সিনেমায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরেও তিনি কখনো থিয়েটারকে ভুলে যাননি। অভিনয়ের পাশাপাশি নির্দেশক হিসাবে তিনি পেশাদারি মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করেন। কিন্তু নিজের মনের মতো নাটক না পাওয়ায় নিজেই বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণে হাত দেন এবং একে একে ত্রিশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। এইসব নাটকগুলির প্লট বিদেশি হলেও তিনি এই বঙ্গের জল-মাটির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নিজের ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই নাটকগুলির মধ্যে। ফলে নাটকগুলির বাইরের খোলস বিদেশি হলেও এর অন্তর্নিহিত সত্তা সম্পূর্ণ বঙ্গজ। ফলে বাংলার দেশীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই এই নাটকগুলির মধ্যে এসেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল প্রবাদ প্রবচন। আধুনিক বাংলা নাটকে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার বিরল। অন্যান্য নাটককাররা তাদের নাটকে প্রবাদের ব্যবহার করলেও এত অধিক পরিমাণে প্রবাদের ব্যবহার বিরলই বলা যায়। নাটককার হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এখানেই অনন্যতা।

প্রবাদ প্রবচন বাংলা লোকসাহিত্যের অংশ। প্রবাদ শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায়- প্র-√বদ (বলা) + অ (ঘঙ্)-ভা। অর্থাৎ পরম্পরা বাক্য, জনরব, লোককথা, জনশ্রুতি। প্রবাদ প্রবচনের স্রষ্টা সাধারন মানুষ। এটি লোকসমাজে গৃহীত। এটি সর্বকালের ও সর্বজনের। এটি বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি। রূপক ও বক্রোক্তি মূলত প্রবাদের প্রধান অবলম্বন। প্রবাদের মধ্যে সত্য ও রসের আবেদন থাকে। মৌখিকভাবেই এর উৎপত্তি, পরবর্তীকালে লিখিত রূপে তার আত্মপ্রকাশ। প্রবাদের প্রাচীনত্বের সময়কাল এই কারণে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সমাজ-সংস্কৃতির চালচিত্র উঠে আসে প্রবাদের মধ্যে দিয়ে। প্রবাদ বাক্যের ব্যঞ্জনা ইঙ্গিতময় লক্ষ্য বহন করে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার উপেক্ষিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের প্রাচুর্য দেখা গেছে। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, হুতোম, টেকচাঁদ ঠাকুর, দাশু রায়ের লেখায় প্রবাদের ব্যবহার দেখা গেছে। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসুর নাটকেও প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে যখন আধুনিক নাগরিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিক্য দেখা গেল তখন আধুনিক সাহিত্যিকরা প্রবাদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি মনে করেননি। কারণ তাঁরা 'শ্লীল', 'অশ্লীল'-এর বিভাজনে প্রবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। ফলে আধুনিক নাটকেও মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্রের পর বাংলা নাটকে প্রবাদের ব্যবহারের প্রাচুর্য দেখা যায় না। কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবার তাঁর নাটকে প্রবাদের ব্যবহার ফিরিয়ে আনলেন আধিক্যের সঙ্গে। কেন প্রবাদের ব্যবহার করলেন তাঁর নাটকে সেটি এখন দেখা যাক।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হলেন পেশাদারি থিয়েটার এবং গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যবর্তী একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব। পেশাদারি মঞ্চের জন্যই তিনি মূলত নাটক লিখতে শুরু করেন। যার সূচনা 'রাজকুমার' নাটকের মধ্যে দিয়ে এবং সমাপ্তি 'ন্যায়মূর্তি' - নাটকের মাধ্যমে। কিন্তু পেশাদারি থিয়েটার হলগুলি বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়, যেমন – দীর্ঘদিন ধরে ভালো নাটক না করা, থিয়েটারবোদ্ধা ও ভালো নির্দেশকের পেশাদার থিয়েটারের বাইরে গ্রুপ থিয়েটার করা, ভালো প্রতিভার প্রবেশ পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের না হওয়া, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় দীর্ঘদিন ধরে হলগুলির সংস্কার না হওয়া, থিয়েটারকরিয়েদের হাতে থিয়েটার হলগুলির মালিকানা না থাকা, অ্যাড-হক ভিত্তিতে কর্মচারী এমনকি শিল্পীদের নিয়োগ করা, সিনেমার তারকাদের আনতে প্রযোজকের বহু টাকা ব্যয় করা, বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের চলে আসা, বিখ্যাত অভিনেতাদের গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে যাত্রা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। এর জন্য তাঁকেও গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনায় নাটক নির্দেশনা এবং অভিনয় করতে হয়েছে। যেহেতু পেশাদারি মঞ্চের দর্শক ছিল গ্রাম ও মফস্বল থেকে আগত সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষজন এবং তারা বিনোদনের জন্যই কেবল থিয়েটার দেখতে আসতো তাই তাদের কথা ভেবেই তিনি নাটকের মধ্যে প্রবাদ প্রবচন নিয়ে আসেন। প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দর্শককে দীর্ঘ সংলাপের ক্লান্তিকর শ্রবণের মধ্যে হঠাৎ একটি রসিকতার আবহ নিয়ে আসে, তারফলে দর্শকেরও কিছুটা ড্রামাটিক রিলিফ ঘটে। আবার অন্যদিকে প্রবাদের মধ্য দিয়ে অনেক দীর্ঘ কথাকে সংক্ষিপ্ত ও রসসিক্ত ব্যাঙ্গাত্মকভঙ্গিতে প্রকাশ করাও সহজ। কোনো ঘটনা বা চরিত্রের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় ব্যাঙ্গাত্মকভঙ্গি হিসেবে প্রবাদের ব্যবহার তুলনারহিত। পেশাদারি পর্বের নাটকে যেসব চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি এইসব প্রবাদের ব্যবহার করেছেন তারা সকলেই প্রায় গ্রামীণ বা শহুরে বস্তিসমাজের প্রান্তিক বা নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের অর্ধ-শিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষ। 'বৃহন্নলা' নাটকে প্রাণকৃষ্ণ, ষষ্ঠী ও রাধিকার মুখ দিয়ে যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবাদের ব্যবহার ঘটেছে প্রত্যেকেই তারা অর্ধ-শিক্ষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। 'নামজীবন' নাটকে নমিতা, বাসনা, বিশ্ব, নেপাল- এরা বস্তিতে বাস করা যথাক্রমে- দেহ ব্যবসায়ী, মোটর মেকানিকস ও কারখানার শ্রমিক। 'ফেরা' নাটকে কাশীনাথ, মজা-ধ্বজা হল যথাক্রমে - গ্রামের মুদির দোকানদার, চাকর। 'নীলকণ্ঠ' নাটকের নাম চরিত্র হল বাড়ির কাজের লোক। 'ঘটক বিদায়' নাটকে দামোদর, মলয়া হল অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ। 'আরোহণ' নাটকে তারক, বামনদি হল যথাক্রমে অল্পশিক্ষিত, চাকর। 'ন্যায়মূর্তি' নাটকে গুরুপদ, আবুল, হেলা, ফণী - গ্রামের মস্তান।

লোকমুখে জনপ্রিয় বিভিন্ন প্রবাদ উঠে এসেছে এই নাটকগুলিতে। 'রাজকুমার' নাটকে একটি, 'নামজীবন' নাটকের পাঁচটি, 'ফেরা' নাটকের কুড়িটি, 'নীলকণ্ঠ' নাটকে তিনটি, 'ঘটক বিদায়' নাটকে নয়টি, 'ন্যায়মূর্তি' নাটকে এগারটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল -

গোপাল : হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল?[১] ('রাজকুমার')
নেপাল : যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।[২] ('নামজীবন')
কাশীনাথ : কথার নাম মধুবাণী যদি কথা কইতে জানি![৩] ('ফেরা')
নীলকণ্ঠ : সব পাখিতে মাছ খায় মাছরাঙার কলঙ্ক হয়।[৪] ('নীলকণ্ঠ')
দামোদর : ছুঁচোর গু ঔষধে লাগে, ছুঁচো গিয়ে পর্বতে হাগে।[৫] ('ঘটক বিদায়')
গুরুপদ : আগুন কোথাও আদা, পুলিশ কোথাও দাদা।[৬] ('ন্যায়মূর্তি')

অপরদিকে পেশাদারি মঞ্চের পর গ্রুপ থিয়েটার পর্বে তিনি যেসব নাটক রচনা করেন, সেই নাটকগুলিতে প্রবাদের ব্যবহার খুবই কম। 'টিকটিকি' নাটকে একটি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। 'আরোহণ' নাটকে পনেরোটি প্রবাদ, 'সবজান্তা' নাটকে চারটি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। এই পর্বের আর অন্য কোনো নাটকে প্রবাদের ব্যবহার নেই। এর মধ্যে 'টিকটিকি' ও 'আরোহণ'- নাটক দুটি তাঁর পেশাদারি মঞ্চ পর্বে লিখিত কিন্তু সেই সময় বিভিন্ন কারণে নাটক দুটি তিনি মঞ্চস্থ করতে না পারায় পরবর্তীকালে তিনি গ্রুপ থিয়েটার পর্বে নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। স্বাভাবিকভাবে তাই নাটক দুটিতে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে এই পর্বের নাটকের দর্শকরা হলেন শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। নাটক তাদের কাছে বিনোদনের থেকেও শিল্পের রসাস্বাদনের আধার। একটি নাটকের শিল্পায়িত দার্শনিক রূপই তারা মঞ্চে দেখতে চায়। ফলে এই পর্বের নাটকে শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, সম্পর্কের টানাপোড়েনের চিত্র উঠে এসেছে অনেক বেশি। ফলে এই পর্বের নাটকে প্রবাদের ব্যবহার তিনি করেননি সেটা বলাই যায়। এই নাটকগুলিতে যেসব প্রবাদ উঠে এসেছে সেখানে গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তে যেসব প্রবাদে মানব সম্পর্কের কথা আছে সেই ধরণের প্রবাদই ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে নাটকের সংলাপে প্রবাদের ব্যবহার হল - সিচুয়েশনল। অর্থাৎ সময়, পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে ব্যবহার করতে হয়।নাটকের স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রবাদের ব্যবহার না করলে স্বাভাবিকভাবেই নাট্যপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রবাদের ব্যবহারও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। যেমন - 'বৃহন্নলা' নাটকে বিশু হঠাৎ করে প্রাণকৃষ্ণকে দেখে বলে সে কী করতে এসেছে? অযথা আলাপচারিতায় বিশুর আগ্রহ নেই। প্রাণকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলে বিশু এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয় যে, তাকে মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। নিজেকে সে যেন কেষ্ট-বিষ্টু মনে না করে। আর সেটাই ব্যাঙ্গাত্মকভঙ্গিতে প্রবাদের মধ্যে দিয়ে সে বলেছে -

"মিছে ডুমুর গুমুর করে, পাকলে ডুমুর মাটিতে পড়ে।"[৭]

'নামজীবন' নাটকে নমিতা একজন দেহ ব্যবসায়ী। তার খদ্দের কোনোরকম শ্রমমূল্য না দিয়ে রাগ করে চলে যাচ্ছে। সেটা দেখে নমিতার মনে হয়, এক কড়ার মুরোদ নেই আবার রাগ দেখিয়ে চলে যাচ্ছে। সেটাই সে প্রবাদের ভঙ্গিতে বলে –

"ভাত দেবার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।"[৮]

'ঘটক বিদায়' নাটকে ৫৫/৬০ বছরের দামোদর সিং কলকাতার এক নারীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে বিয়ের আশায়। তাই সে নাপিতকে বলে চুল-দাড়ি কামিয়ে ভালো করে কলপ করে দিতে। কারণ কলপ করলে তাকে যুবক লাগবে। আর সেই প্রসঙ্গেই প্রাচীন প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে সে বলে –

"সাজালে গোছালে ঘর, কামালে জোমালে বর।"[৯]

'ন্যায়মূর্তি' নাটকে পুলিশ, পার্টির নেতা আবুলকে বলে গুন্ডাদের কাছ থেকে তার প্রাণ সংশয় আছে, তাই পুলিশ তার নিরাপত্তা দিতে এসেছে, পুলিশের একথা আবুল বিশ্বাস করে না। কারণ পুলিশ কখনোই নেতার ভালো চাইতে পারে না, তা সে মুখে যতই নেতার নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলুক না কেন, তাই আবুল উর্দু মিশ্রিত প্রবাদ বাক্য বলে-

"মুখমে শেখ ফরিদ
বগলমে ইট।"[১০]

'টাইপিস্ট' নাটকে অনিরুদ্ধ ও ইন্দ্রানী তাদের বন্ধুত্বের মাঝে অভিমান হলে তারা পরস্পরকে হিংসুটে বলে এবং পরস্পরকে আক্রমণ করতে থাকে প্রবাদ বাক্য বলার মধ্যে দিয়ে -

"ইন্দ্রানী : সমান কেউ ঠাকুর হয় এই দুঃখ কি গায় সয়?"[১১]
"অনিরুদ্ধ : পেঁয়াজ ধোঁয়া নষ্ট নারী চক্ষে আনে অশ্রুবারি।"[১২]

এইরকম সিচুয়েশনাল প্রবাদ বাক্য ব্যবহারে নাটককে করছে সংলাপের দীর্ঘ ব্যবহারের ক্লান্তিকর পরিবেশ থেকে সাময়িক মুক্তি এবং একই সঙ্গে মজাদার।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকের মধ্যে বারে বারে তাঁর সমসাময়িক সমাজ, শ্রেণিশোষণ এবং শ্রেণিবৈষম্যের কথা বলেছেন। এছাড়া সম্পর্কের টানাপোড়েনের চিত্র উঠে এসেছে তাঁর নাটকে। কিন্তু আঙ্গিকগত দিক থেকে তিনি নাটকের মধ্যে গান, কবিতার ব্যবহার করেছেন। এর পাশাপাশি প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার তাঁর নাটকে এনেছে অনন্যতা। এই প্রবাদের ব্যবহার নাটককে দর্শকের কাছে উপভোগ্য করে তোলার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে সে কথা আমরা বলেছি। তাই নাটককার হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে এই প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ১', জানুয়ারি ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৫২
২. তদেব, পৃ. ৩৩১
৩. তদেব, পৃ. ৪১২
৪. তদেব, পৃ. ৫০৪
৫. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ২', এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ৩০২
৭. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ১', জানুয়ারি ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৬৯
৮. তদেব, পৃ. ২৯১
৯. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ২', এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. তদেব, পৃ. ৩২৭
১১. তদেব, পৃ. ৪৬৬
১২. তদেব, পৃ. ৪৬৬

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ১', জানুয়ারি ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ২', এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ৩', এপ্রিল ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
দে, শ্রীসুশীলকুমার (সম্পা.), 'বাংলা প্রবাদ : ছড়া ও চলতি কথা', আশ্বিন ১৩৫২, রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস ২৫|২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য প্রথম খণ্ড : আলোচনা', ১৯৬২, ক্যালকাটা বুক হাউস ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 509 - 517
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরাণ প্রয়োগে মনোজ মিত্র : ‘অশ্বত্থামা’ ও ‘তক্ষক’

রঞ্জিত আদক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার ও গবেষক
বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)
Email ID : ranjitadak.1990@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
Myth, Puran, Ashwathama, Takshak, Salyaparva, Sauptikaparva, Mahabharata, Naxalite Movement, Kripacharya, Kritavarma.

Abstract

The term ‘Puran’ is commonly understood in Bengali as synonymous with ‘Myth’. While traditional Puranic texts narrate cosmic events and divine conflicts, noted Bengali playwright Manoj Mitra reinterprets these narratives to reflect contemporary socio-political realities. His plays Ashwathama and Takshak exemplify this approach, offering modern perspectives on ancient myths.

Ashwathama, inspired by the Salyaparva and Sauptikaparva of the Mahabharata, parallels the socio-political unrest of the Naxalite movement in Bengal. The play explores the internal turmoil of Ashwathama, whose impulsive violence, manipulated by Duryodhana, mirrors the frustration of Naxalite youth misled by political leaders. His misplaced rage, culminating in the tragic killing of the Pandavas’ sons, reflects the unintended consequences of revolutionary fervour. The characters of Kripacharya and Kritavarma further symbolize contrasting governance ideologies, subtly critiquing state suppression of dissent. Takshak, drawn from the Adiparva of the Mahabharata, delves into the inevitability of death through the story of King Parikshit, who is cursed to die within seven days from a serpent’s bite. Mitra transforms this myth into a meditation on human mortality, as Parikshit, gripped by fear, is guided by his charioteer, Tantripal, to embrace life despite its transience. The play’s philosophical depth reinforces the idea that true fulfilment lies in living wholeheartedly, even in the face of death.

Through these reinterpretations, Mitra skillfully bridges mythology with modern concerns, transforming ancient narratives into powerful reflections on contemporary socio-political struggles and timeless existential questions. Mitra conveys a universal truth- that death is inevitable, but life must be cherished. His use of Puranic narratives thus serves not just as historical storytelling but as a profound exploration of contemporary socio-political issues and eternal human anxieties. His plays not only challenge conventional Puranic interpretations but also offer profound insights into human emotions,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

governance, and mortality. In this research article, I will attempt to show how he has used mythology in the context of the present era.

Discussion

রবীন্দ্র পরবর্তীকালে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়কে হাসির আড়ালে রেখে নাটক লিখেছেন মনোজ মিত্র। তাঁর নাট্য তালিকা দীর্ঘ। ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসেছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর ৬ খণ্ডের নাটক সমগ্র। প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ৭০। যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক— ৩৫টি, একাঙ্ক নাটক— ৩৩টি, ছোটদের নাটক— ২টি। এতগুলি নাটকের মধ্যে সরাসরি পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে ১২টি নাটকে। নাটকগুলি হল— 'পুঁটিরামায়ণ' (প্রথম খণ্ড), 'অশ্বত্থামা', 'রাজদর্শন', 'শিবের অসাধ্যি', 'চোখে আঙুল দাদা' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'নরক গুলজার', 'তক্ষক' (তৃতীয় খণ্ড), 'যা নেই ভারতে', 'জয়বাবা হনুনাথ', 'সত্যিভূতের গপ্পো' (পঞ্চম খণ্ড), 'ভেলায় ভাসে সীতা', 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি' (ষষ্ঠ খণ্ড)। এই নাটকগুলির বিষয় যেমন বৈচিত্র্যে ভরা তেমনি কাহিনি বিন্যাস, সংলাপ রচনা, চরিত্র রূপায়ণ ও গানের সংযোজন নাট্যকারের মৌলিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় দেয়।

এই ১২টি নাটকের মধ্যে আমি আমার আলোচনায় শুধুমাত্র 'অশ্বত্থামা' ও 'তক্ষক' নাটকে পুরাণ প্রয়োগের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এই দুটি নাটকে পুরাণ প্রসঙ্গ ব্যবহার করলেও, পুরাণকে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়— 'পুনর্জন্ম' দিয়েছেন। আসলে নাট্যকার বলেছেন তাঁর যুগের মানুষের কথা। অর্থনৈতিক, সামাজিক অসহায়তার কথা, রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা। তাঁকে ঘিরে থাকা এই সমাজের বিচিত্র মানুষ, তাদের সরলতা তাদের কপটতার ভাষাই নাটকগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। যে প্রসঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন পুরাণকে। তবে কোনো বিদেশি পুরাণ নয় নিজের ভারতে প্রচলিত সবথেকে জনপ্রিয় দুই পুরাণ— রামায়ণ ও মহাভারতকে। এ দুই পুরাণ গ্রহণে নাট্যকার সক্ষম। কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে পরিচিত। তাই সেই পৌরাণিক যুগকে একালের যুগপোযোগী ভাবতে মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না।

তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারত, ভারতবর্ষের প্রাচীন দুই মহাকাব্য। পুরাণ এই দুই মহাকাব্যের অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভক্তরা তাদের আরাধ্য দেবতাকে ঘিরে গড়ে তুলেছেন পুরাণ কাহিনি। এই যে আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ— এসবেই দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথার বর্ণনা আছে। কিন্তু আদি দুই মহাকাব্যে আছে জীবনের স্পর্শ। কোনো ধর্ম কথা নেই তাই মানুষের প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে তা আকর্ষণ করে। আর পুরাণকে নিয়ে এই যুগে যেসব সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা রামায়ণ-মহাভারত কেন্দ্রিক। বলা যেতে পারে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির নবনির্মাণ চলছে। হ্যাঁ, যুগের তাগিদেই এমন নবনির্মাণ, এমন সৃষ্টি। মনোজ মিত্রও সেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাটকে। পুরাণকে নতুনভাবে তিনরকম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে—

> এক. পুরাণের ঘটনাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেওয়া।
>
> দুই. পুরাণ কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনও কোনও ঘটনাকে নতুন ভাবে উদ্ভাবন করা যা পুরাণে বলা হয়নি।
>
> তিন. পুরাণকে সমকালের করে পুনর্বিচার করা।

মনোজ মিত্র বিশেষত শেষ দুই প্রকারকে এই দুটি নাটকে প্রয়োগ করেছেন। এখানেই নাটকগুলির শিল্পগত গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

'অশ্বত্থামা' নাটকটির রচনা— ১৯৬৩। পুনর্লিখন ১৯৭২-'৭৩। প্রথম প্রকাশ— 'বহুরূপী' শারদ সংখ্যা ১৯৭৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— 'অশ্বত্থামা' ও তিন একাঙ্ক' নামে ১৯৮৬ খ্রিঃ। প্রথম অভিনয়— রঙ্গনা, ২ মে ১৯৭৪। উৎসর্গ— প্রয়াত নাট্যকার অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়কে। নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে যদিও একাঙ্ক নাটকের নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় নাটকটিতে। নাটকের কাহিনি এবং চরিত্র সম্পূর্ণ মহাভারতের। নাটকটির কোনো অঙ্কভাগ বা দৃশ্যভাগ নেই। সম্পূর্ণ নাটকটি দুটি পর্বে বিভক্ত— গোধূলি পর্ব ও নিশীথ পর্ব। চরিত্র মাত্র তিনটি— অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং কৃতবর্মা। নাটকটি থিয়েটার ওয়ার্কশপ এর প্রযোজনায় যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন কৃতবর্মা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। বীর অশ্বত্থামার এক রক্তক্ষয়ী হৃদয়ের পরিচয় রয়েছে নাটকটির মধ্যে। ড. জগন্নাথ ঘোষের মন্তব্য—

> "এই নাটক এক নতুন মহাভারত রচনার করুণ মধুর প্রয়াস।"[১]

নাটকটি সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকারের বক্তব্য—

> "রানিগঞ্জে বসে ১৯৬২ সালে 'অশ্বত্থামা' নাটকটা লিখেছিলাম। বাংলার অধ্যাপক ড. রামদুলাল বসু, ইতিহাসের ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা দু'জন মিলে নাটকটা মঞ্চস্থ করেছিলাম সেবার কলেজের সামনের মাঠে। ...নাটকটা বর্তমান চেহারায় আসে গত শতকের ১৯৭২-'৭৩ নাগাদ। অতীত ভুলে গিয়ে আবার লিখি 'অশ্বত্থামা'। বিভাস চক্রবর্তী তখন থিয়েটার ওয়ার্কশপে। একদিন সারারাত্রি লিখে নাটক শেষ করে ভোরবেলা ছুটলাম দমদম নাগেরবাজারে। শুনল অশ্বত্থামা। পছন্দের নাটক পেয়ে বিভাস অশোক রই রই করে কাজ শুরু করে দেয় দেখেছি— এবারেও তাই হল। তাপস সেন বলেছিলেন, 'কোন আলোয় সমন্তপঞ্চকের হ্রদের পাশে দুর্যোধনের ভাঙা রথখানা দেখাব, সেটাই আমার চ্যালেঞ্জ!' এক একটা নাটক ওই শিল্পীর চোখে ছিল স্বপ্নের মতো। ডাকা হল পুতুল সাম্রাজ্যের সম্রাট রঘুনাথ গোস্বামীকে। দৃশ্যপট, সাজপোশাক, অলংকার থেকে পাদুকা সবকিছুর দায়িত্ব পেয়ে এক দুপুরে চিৎপুরের ট্রামলাইন ধরে লালবাজার পর্যন্ত দু'পাশের মনোহারী মণিহারী দোকানগুলো চুঁড়ে বের করা হল যতরকমের শাঁখ, কড়িমালা, মোষের শিং, হরিণের চামড়া, ফকিরবোষ্টমের মালা বালা— কত কী! থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'চাকভাঙা মধু'র হইচইয়ের মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল নাটকটা। সুদীপ্ত বসু (অশ্বত্থামা), অশোক মুখোপাধ্যায় (কৃপাচার্য) ভাল অভিনয় করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি কৃতবর্মা হয়েছিলাম আমি। একমাসের মধ্যে দূরদর্শনে চাকরি নিয়ে বিভাস ছুটল পুণায়। বন্ধ হল 'অশ্বত্থামা'।[২]

নাট্য ঘটনার কাহিনি মহাভারতের শল্যপর্ব ও সৌপ্তিক পর্ব থেকে গ্রহণ করেছেন মনোজ মিত্র।

এই দুই পর্বের কাহিনিটি আগে জেনে নিই। শল্য পর্বের একেবারে শেষে অশ্বত্থামার অভিষেক হয়েছে সেনাপতি পদে। কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিন যুদ্ধের শেষ দিনে ভীমের গদাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ হয়েছে। কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা দূতমুখে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ শুনে ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে। অশ্বত্থামা বললেন, মহারাজ পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছে, কিন্তু তার জন্য আমার তত শোক হয়নি, যত তোমার জন্য হচ্ছে। আমি শপথ করছি, কৃষ্ণের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাঞ্চলদের যমালয়ে পাঠাব। তুমি আমাকে অনুমতি দাও। দুর্যোধন খুশি হয়ে অশ্বত্থামাকে আলিঙ্গন করলেন এবং সেনাপতির পদে তাকে অভিষিক্ত করলেন। তারপর কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বত্থামা সেখানে থেকে চলে গেলেন আর দুর্যোধন পড়ে রইলেন স্ব-স্থানে।

সৌপ্তিক পর্বের প্রথমে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা সেখান থেকে কিছুদূর এসে এক ঘর বনে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বটবৃক্ষে সুপ্ত কাকের প্রতি পেঁচার আক্রমণ দেখে স্থির করলেন তিনিও সেই রাত্রিতেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করবেন। কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাকে তাঁর সংকল্প জানালেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা লজ্জিত বোধ করলেন। তাদের অনুমতি ছিল না এই কাজে, কিন্তু বাধ্য হয়। অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডব শিবিরের অভিমুখে রওনা হচ্ছে তখন তারাও নিজে নিজে রথে চড়ে অনুগমন করলেন। শিবিরের দ্বারদেশে থাকলেন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা; আর শিবিরের প্রবেশ করলেন অশ্বত্থামা। প্রবেশ করে একে একে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রদের, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, সমস্ত পাঞ্চাল, হস্তী, অশ্ব সবকে বধ করলেন। যারা পালাতে চাইল তারা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের দ্বারা নিহত হলেন। অর্থাৎ বেঁচে রইলেন কেবল পাণ্ডবদের সাতজন— পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি আর কৌরবদের তিন জন— কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা। হত্যাকাণ্ডের শেষে অশ্বত্থামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন শীঘ্র রাজা দুর্যোধনের কাছে চলুন, তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে প্রিয় সংবাদ দেব। এই পর্যন্ত কাহিনি নাট্য কাহিনির খাতিরে আলোচনা করা হল, বাকি অংশ অপ্রাসঙ্গিক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মনোজ মিত্র নাটকের গোধূলি পর্বের শুরুতে যে বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তিনজন নয় কেবল ভোজরাজ কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য বসে আছেন দুর্যোধনের ভাঙ্গা রথের কাছে। কৃতবর্মা জানাচ্ছেন— ভগ্নোরু মহারাজ সিংহাসনে বসে ভারতবর্ষ শাসন করবেন। কৃপাচার্য পরাজয় মেনে নিয়েছেন কিন্তু কৃতবর্মার আশা তিনি অশ্বত্থামাকে সঙ্গে নিয়ে আবার যুদ্ধে নামবেন—

> "...অনন্ত সংগ্রাম! মহারাজ আমৃত্যু সংগ্রামী নেমেছেন! যতক্ষণ এতটুকু শ্বাস... ততক্ষণ প্রয়াস! জয় চাই... চাই বিজয়মাল্য!"[৩]

মহাভারতের কৃতবর্মা এরকম কথা বলেননি, বরং সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেন। নাটকে কৃতবর্মাই অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে বরণ করতে চেয়েছেন। বলেছেন তিনি—

> "কাল প্রাতে অশ্বত্থামা, তুমি হবে কৌরব সেনাপতি! পঞ্চম কৌরব সেনাপতি! ভীষ্ম দ্রোন কর্ণ শল্য... অশ্বত্থামা! বীর অশ্বত্থামা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য! পঞ্চপাণ্ডবের বিজয়হাসি মুছে দিতে হবে অশ্বত্থামা... চাই পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্ন শির।"[৪]

মহাভারতে এই প্রসঙ্গ অশ্বত্থামার। সম্পূর্ণ নতুন কথা বললেন মনোজ মিত্র। মহাভারতে এই প্রসঙ্গে অমত হয়েছিলেন স্বয়ং কৃতবর্মা। আর এখানে অশ্বত্থামা নিজে। অশ্বত্থামা জানিয়েছেন— 'আমায় ক্ষমা করো দুর্যোধন...।' কিন্তু কৃতবর্মা শেষপর্যন্ত পেরেছে আগুনে ঘি সংযোজন করতে। কৃপাচার্যের কথা মত অশ্বত্থামা রাজি হয়েছিল অস্ত্র পরিত্যাগ করে সন্ধি স্থাপন করতে, পাণ্ডবদের কাছে ক্ষমা চাইতে। চেয়েছিল সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে। যেখানে কোন ভোগ তৃষ্ণা থাকবে না। কিন্তু কৃতবর্মা তা হতে দেয়নি। উত্তেজিত করেছে অশ্বত্থামাকে পাণ্ডব শিবিরে শোকরজনীতে পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যা করতে। মহাভারতের কৃতবর্মা ছিল সহৃদয় মানুষ। এখানে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন নির্দয় রূপে। অশ্বত্থামাকে ইন্ধন দিয়েছেন—

> "ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, পাণ্ডব পাঁচজন একঘরে! ওরা ছাড়া আর কেউ নেই! ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, নির্ভুল লক্ষ্যভেদের সুযোগ..."[৫]

নিরস্ত্র, ধ্যানমগ্ন পাণ্ডবদের কথা শুনে রাজি হয়েছে অশ্বত্থামা। জীবনের শেষ যুদ্ধের জন্য। অশ্বত্থামা দুর্যোধনের কাছে গেলে কৃতকর্মা বলে—

> "ওঃ! ওঃ! অপূর্ব দৃশ্য! বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা শায়িত মহারাজের কণ্ঠলগ্ন।"[৬]

কুটনৈতিক চাল চেলেছে কৃতবর্মা। তাইতো অশ্বত্থামা একসময় কৃপাচার্য, যে তার মাতুল তাকেও বধ করতে উদ্যত হয় সে। আবার কৃপাচার্যের সাহায্য ছাড়া পাণ্ডবের শিবিরে প্রবেশ করা যাবে না একথা জানে কৃতকর্মা। তাই কৃপাচার্যকে উৎসাহিত করে সে -

> "দেখবে, দেখবে, এখুনি সর্বাগ্রে ওঁর ঘোড়াটাই ছুটবে আমাদের আগে আগে! (কৃপকে) আসুন আচার্য, মঙ্গল অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন!"[৭]

নিশীথ পর্বে কৃতবর্মাই দুর্যোধনের রথের সামনে ছুটে এসে পাণ্ডবদের নিহত হওয়ার খবর দেয়। আনন্দে মেতে ওঠে। যদিও হত্যা হয়নি পাণ্ডবদের। কৃতবর্মা চরিত্রটি নিয়ে মহাভারত-এর মতো করে একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, তাঁর 'মহাভারতের প্রতিনায়ক' গ্রন্থে।

অশ্বত্থামা চরিত্রটি মহাভারত থেকে নিলেও তাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন নাট্যকার। দুর্যোধনের করুন অবস্থা দেখে দুঃখ করছে, অনুশোচনা করছে। দুর্যোধনের সেনাপতির পদ সে গ্রহণ করতে পারবে না। কেন না এতদিন যখন সময় ছিল সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধে জয়লাভ করার, তখন সে পায়নি। আর আজ এই সূর্যাস্তের সময় যখন সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে তখন তাকে বরণ করতে হবে সেনাপতির পদ— এটা সে মানতে পারেনি। তাছাড়া তার শত্রু মাত্র পাঁচজন কিন্তু সে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করেছে হাজার হাজার সৈন্য। তার বিবেক তাকে দংশন করে। সারা জীবন কাদের মারতে কাকে মেরেছে সে। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে অশ্বত্থামা—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"মহারাজ, আঠারো দিনের আঠারো হাজার মানুষ মেরেছি। তারা কেঁদেছে-ছুটেছে-বাঁচাও বাঁচাও-বাঁচতে দিইনি! অথচ যাদের মরার কথা- সেই পঞ্চপাণ্ডব কিন্তু বেঁচে আছে! তারা জয়ী!... দুর্যোধন ক্ষমা করো।"[৮]

এই অনুশোচনা মহাভারতে নেই বরং সেখানে আছে তার প্রতিশোধ স্পৃহা। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এই বিষয়টি দেখিয়েছেন তাঁর 'মহাভারতের প্রতিনায়ক' গ্রন্থে। এই যে চরিত্রের নবরূপায়ণ— এখানে মনোজ মিত্রের বিশেষত্ব। তাই অশ্বত্থামা চায় স্বাধীন জীবন, মামা কৃপাচার্যকে নিয়ে গড়তে চায় সুখের নীড়। এই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে বাস করবে সে। সমস্ত সুখকে, ভোগকে জীবন থেকে সরিয়ে মামার পায়ের কাছে বসে শুনতে চায় সে ভূলোক দ্যুলোক গোলোকের কথা। জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তে সে শেষপর্যন্ত অটল থাকতে পারেনি। কৃতবর্মা তাকে শেষপর্যন্ত নিয়ে গেছে পাণ্ডব শিবিরে। শত্রু চিনিয়েছে আবার নতুন করে। শোকরজনীতে যখন সবাই ত্যাগ করেছে অস্ত্র তখনই অশ্বত্থামার হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র। রাত্রির অন্ধকারে চিনতে ভুল করে জীবনের সবথেকে বড় ভুল করে ফেলেছে অশ্বত্থামা। পঞ্চপাণ্ডবের পরিবর্তে সে হত্যা করেছে পঞ্চপাণ্ডব শিশু। হাহাকার করেছে নিজের কৃতকর্মের জন্য—

"ভুল! ভুল! আবার ভুল করেছি আমি... কাদের মারতে কাদের মেরেছি! অন্ধ! অন্ধ! আমি ভীষণ অন্ধ!"[৯]

কৃপাচার্যকে নাট্যকার এখানে অশ্বত্থামার অভিভাবক রূপে যেন অঙ্কন করেছেন। একথা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীও বলেছেন 'মহাভারতের ছয়প্রবীণ' গ্রন্থে। সে এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তে আসেনি দুর্যোধনের জন্য! এসেছে ভাগ্নে অশ্বত্থামার জন্য। অশ্বত্থামাকে নিয়ে সে যেতে চায় পাণ্ডবদের কাছে ক্ষমা স্বীকার করতে। বাঁচতে চায় নতুন করে। কিন্তু পরিস্থিতি বাধ সাধে। অশ্বত্থামাকে বোঝাতে চায় যে পাণ্ডবেরা আমাদের শত্রু নয়। আমাদের ভুল শত্রু চিনিয়েছে দুর্যোধন। রাজা দুর্যোধন এমনি আশ্রয় দেয়নি আমাদের। বিপরীতে সে তৈরি করেছে বাহুবল। রাজা কোনো অভিসন্ধি ছাড়া কাউকে সাহায্য করে না। কৌরবদের মতো নয় পাণ্ডবেরা। যুদ্ধ জয়ের আনন্দোৎসব তারা করবে না। কেননা তারা জানে কত প্রাণের বিনিময়ে তাদের এই জয়! তাই পাণ্ডব শিবিরে আজ শোকরজনী! —

"ওরা নিষ্ঠুর নয়! ওরা জানে কতো অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই জয়লাভ! আনন্দ করার মতো নির্বোধ ওরা নয়! ওদের শিবিরে আজ শোকের রজনী!"[১০]

আরও বলে— আমরা হলে জয়োৎসব করতাম। পাণ্ডব জানে এটা তাদের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল। দুর্যোধনের হাতে নির্যাতনের দিনগুলিকে তারা স্মরণ করে আজ নিভৃতে অশ্রুপাত করবে। ওরা জানে প্রাণের মূল্য! তাই আমরাও আজ চলো শোকরজনী পালন করি। নরহত্যার অভিশাপ থেকে মুক্ত হই। ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমা করবে। মহাভারতে ব্যাসদেব, কৃপাচার্যকে এত মানবিক করে আঁকেননি। যা নাট্যকার দেখিয়েছেন। প্রার্থনা করেছে কৃপাচার্য পাণ্ডবেরা যাতে নতুন ভারত গড়তে পারে। যেখানে হত্যা থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না, পাপ থাকবে না। কিন্তু নাটকের নিশীথ পর্বে ঘটনার পরিবর্তন ঘটে। অশ্বত্থামাকে ফেরাতে পারেনি হিংসা থেকে। পঞ্চপাণ্ডবের শিবিরে বাধ্য হয়েছে অশ্বত্থামা কৃতকর্মার সঙ্গে যেতে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল আলাদা—

"ভেবেছিলাম ঐ ঘাতক শিবিরের ঢুকলে আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে একটা আর্তনাদ করব... ভীষণ আর্তনাদ... পাণ্ডবদের সতর্ক করে দেব!"[১১]

পাণ্ডবদের জীবন রক্ষা করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত একটা চিৎকারও করতে পারেনি। তাই পঞ্চ পাণ্ডবদের পরিবর্তে পঞ্চপাণ্ডব শিশু হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে অশ্বত্থামা।

অশ্বত্থামাকে বলেছে—

"পিশাচ! পিশাচ! জগতের নিকৃষ্টতম হত্যাকারী!"[১২]

ক্রুদ্ধ হয়ে হত্যা করতে গিয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় অশ্বত্থামাকে—

"পৃথিবী তুমি মুখ লুকাও, আজ আমি এই নরঘাতী যৌবন ধ্বংস করব!"[১৩]

রক্ত মাংসের চরিত্র যেন এই কৃপাচার্য। কোনো পৌরাণিক চরিত্র নয়! জীবন্ত প্রাণবন্ত এক মানুষ। যার আছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধহীন এই সমাজে বার্তা পাঠাতে মনোজ মিত্র হয়তো এরকম চরিত্র গঠন করেছেন— নতুন ভঙ্গিতে, নতুন আমেজে! এখানেই নাট্যকারের মৌলিকতা।

এই নাটক পুনর্লিখিত হয়েছিল ১৯৭২–'৭৩ এ। অর্থাৎ দেশে যখন নকশাল আন্দোলনের হত্যা ও প্রতিহত্যা চলছে। শাসকদের সঙ্গে বিপ্লবী তরুণদের দ্বন্দ্ব। তবে শুধু তাই নয়, যারা বিপ্লবী নেতা তারা তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তরুণদের বিভ্রান্ত করেছে, তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নাটকের সেই তরুণ, অশ্বত্থামা আর দুর্যোধন বিপ্লবী নেতা। সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এইসব তরুণদের বিভ্রান্ত করেছে। সমকালীন রাজনৈতিক আধিপত্য সহজেই দেখতে পাই। যুবক অশ্বত্থামা যে যুদ্ধে সেনাপতিত্ব বরণ করছে, সেই যুদ্ধ, তার কোনো উপকারে আসবে না। দ্রোন তার পিতা— যে আশ্রয় পেয়েছিল, সম্মান পেয়েছিল কৌরবদের কাছে। সেই আনুগত্য থেকে গেছে অশ্বত্থামার মধ্যে। অকৃতজ্ঞ নয় সে। তাই হয়তো এই যুদ্ধে নিজেকে সমর্পণ করেছে। যুগ যুগ ধরে, বংশ-পরম্পরায় এমন আনুগত্য প্রকাশ সহজেই দেখা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এটাই নীতি যে, বাবা যেদিকে থাকবে ছেলেও সেদিকে। অশ্বত্থামা সেই কর্তব্য সেই আনুগত্যের শিকার। রাজনীতির খেলায় যেমনটা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে— তরুণ প্রজন্মকে, শাসক দলের ব্যবহার— তেমনটাই এ নাটকে দেখি।

নাট্যকারের অন্য দুটি চরিত্র— কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের মধ্য দিয়ে শাসনতন্ত্রের দুটি বিপরীত ভাবধারাকে তুলে ধরা হয়েছে। কৃপাচার্যের যুদ্ধ শেষে শান্তি কামনা করতে চেয়েছে। পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনায় ও সন্ধিতে রাজী। কিন্তু কৃতকর্মা তা নয়। অশ্বত্থামাকে যুদ্ধমুখী করেছে সে। একজন রাজনৈতিক চক্রান্তকারীর মতো তার ব্যবহার, কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে চাইলে কৃতবর্মা তাকে উত্তেজিত করেছে, তার প্রতিশোধ স্পৃহাকে বাড়িয়ে তুলেছে। একই রাজনৈতিক মতাদর্শে যেমন দু'প্রকৃতির মানুষ থাকে তেমনি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। একজন নরমপন্থী আর একজন চরমপন্থী।

পুরাণকে নতুন করে সৃষ্টি করতে গিয়ে লেখক পুরাণ কাহিনি ও চরিত্রকে অবলম্বন করে তাঁর নিজের কালের নৈতিকতাকে, ঘটনাকে রূপকের আড়ালে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন এদিক থেকেই অশ্বত্থামার সৃষ্টি।

'তক্ষক' নাটকটি লেখা হয়েছিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম প্রকাশও ঐ বছর। পুনর্লিখন— ১৯৮১। প্রথম অভিনয়— ১৯৭৯, ২৫ জুন। প্রযোজনা— থিয়েটার ওয়ার্কশপ। নাটকের শুরুতেই ঘোষকের কণ্ঠে শোনা যায়— পুরাকালের কথা। এখানে প্রধান যে তিনটি পৌরাণিক চরিত্র তা হল— রাজা পরীক্ষিত, ঋষি শমীক এবং ঋষিপুত্র শৃঙ্গী। তক্ষকও পৌরাণিক। তক্ষক সম্পর্কে পৌরাণিক অভিধানে বলা আছে— প্রধান অষ্টনাগের মধ্যে তক্ষক অন্যতম। পুরাণ মতে অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক— এই তিনজন প্রধান। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতা এবং অনন্তনাগ নামেও প্রসিদ্ধ।

তক্ষককে কেন্দ্র করে পৌরাণিক কাহিনিটি এরূপ— অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত মৌনী তপোরত মহর্ষি শমীকের কাঁধে মৃত সাপ নিক্ষেপ করলে, শমীকের পুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক অভিশপ্ত হন যে, সপ্তরাত্রির মধ্যে তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। শমীক পরীক্ষিতকে অভিশাপের বিষয় জ্ঞাত করে সতর্ক করে দেন। পরীক্ষিত এক সুরক্ষিত প্রাসাদে বিষ-চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সাবধানে বসবাস করতে থাকেন। সাতদিনের দিন কাশ্যপ নামে এক দক্ষ বিষ-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের কাছে গমনরত ছিলেন। তক্ষকও ঐদিনে অভিশাপের বিবরণ জ্ঞাত হয়ে অর্জুনের বংশধরকে দংশনেচ্ছায় যাত্রা করেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, তক্ষকের কাছে অর্জুন শত্রুপদবাচ্য। কেননা খাণ্ডবদাহনকালে অর্জুনের শরে তক্ষকের স্ত্রী-পুত্র বিদ্ধ হন। তাই অর্জুন এবং তাঁর বংশধরেরা তক্ষকের শত্রু। সে যাইহোক, ঐ কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ এবং তক্ষকের পথে সাক্ষাৎ হয়। কাশ্যপের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তাঁর শক্তি পরীক্ষার্থে তক্ষক এক বটবৃক্ষকে দংশন করে ভস্মীভূত করলে, কাশ্যপ মন্ত্র বলে তাকে পুনরায় জীবিত করেন। এতৎদৃষ্টে তক্ষক কাশ্যপকে বলেন যে, রাজার আয়ু ক্ষয় হয়ে এসেছে। অতএব তাঁকে এখন চিকিৎসা করা বৃথা। সুতরাং কাশ্যপ যেন আশাতিরিক্ত ধন তক্ষকের কাছ হতে গ্রহণ করে বিদায় হন। কাশ্যপ ধ্যান বলে তঙ্গকের কথা সত্য বলে জ্ঞাত হয়ে তাঁর কাছ হতে অভীষ্ট ধন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর তক্ষক কয়েকজন ব্রাহ্মণবেশী নাগের সাহায্যে রাজার কাছে কিছু ফলমূলাদি প্রেরণ করেন। রাজা উক্ত ফল গ্রহণ করে খাওয়ার উপক্রম করলে ফল মধ্যে তিনি একটি কৃষ্ণবর্ণ কীট দর্শনে বলেন যে তাঁর আর কোন ভয় বা দুঃখ নেই— শৃঙ্গীর বাক্যই সত্য হোক। এই কীট তক্ষক রূপ ধারণপূর্বক তাঁকে দংশন করুক। এই উক্তি করে তিনি সহাস্যে কণ্ঠদেশে সেই কীটটি স্থাপন করেন। তখন তক্ষক নিজ মূর্তি ধারণ করে পরীক্ষিতকে দংশন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তার পুত্র জনমেজয় রাজা হন। এই কাহিনি মহাভারতের। মনোজ মিত্র এই কাহিনি গ্রহণ করলেও ঘটনার পরিবর্তন করেছেন। কাহিনিকেই তিনি এখানে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

তক্ষক এর কাহিনিটি এরূপ— পরীক্ষিত মৃগয়াকালে এক বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণ করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে জঙ্গলে পথ হারান। সেই লতা-গুল্ম ভরা জঙ্গলে শমীক নামক এক ঋষি গভীর ধ্যানে আচ্ছন্ন। ঋষিকে দেখতে পেয়ে রাজা পরীক্ষিত নানাভাবে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হয়। তখন রাজা বিরক্ত হয়ে মৃত সাপকে তাঁর ধনুকের মাথায় জড়িয়ে ঋষি শমীকের গলায় পরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরও ঋষি মৌন থাকেন। কিন্তু পিতার অবমাননা দেখে ঋষিপুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দেন— সাত দিনের মাথায় তক্ষকের কামড়ে সে প্রাণ হারাবে। রাজা চলে যাওয়ার পর ঋষি শমীকের ধ্যান ভাঙ্গে। সে পুত্রকে তিরস্কার করে। জীবনধারণের জন্য রাজা যা করেছে তাই স্বাভাবিক কিন্তু শৃঙ্গী যা করল তা অপরাধ। কেননা তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল দান না করে তাকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছে। পুত্রকে ঋষি শিখিয়েছে— পুণ্যার্জনই সব নয়, পুণ্য রক্ষা করতে হয়। এরপর ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয়। সে রাজাকে যেতে বারণ করে দূর থেকে তাকে আহ্বান করছে সে যেন তার জলপাত্র ভরে নিয়ে যায়। এই অনুশোচনা পুরাণ বহির্ভূত। শৃঙ্গী অনেকটাই মানবিকগুণ সম্পন্ন এখানে। শৃঙ্গী পিতাকে অনুরোধ করেছে রাজাকে রক্ষা করার জন্য। এ ঘটনাও মহাভারতে নেই। কিন্তু ব্রহ্মশাপ অনিবার্য। মৃত্যু হবেই রাজার। তবে পিপাসার্ত অবস্থায় যেন সে প্রাণত্যাগ না করে এই ইচ্ছা শৃঙ্গীর। পুত্রের কথামতো মায়া সরোবর, মায়া ঝর্ণা সৃষ্টি করল ঋষি। কিন্তু সবেই রাজা তক্ষককে দেখতে পেল। দেখতে পেল বিশাল ফনা ধারণ করে তক্ষক তাকে দংশন করতে ছুটছে। এরূপ মায়া সরোবর বা মায়াঝর্ণা সৃষ্টির কথা পুরাণ বহির্ভূত। শেষে শৃঙ্গী নিজেই পরীক্ষিতকে জানিয়েছে যে, সে ব্রহ্মশাপ তুলে নেবে। সেই অভিশাপ তার নিজের ওপর বর্তাবে। সাতদিনের মাথায় পরীক্ষিতের জায়গায় শৃঙ্গী নিজে মরবে। কিন্তু পরীক্ষিত জীবনের অর্থ বুঝেছে। মৃত্যু জীবনের-ই পরিণতি। সে তাই আর মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যুকে সে জয় করেছে। সাতদিনের মাথায়ই তাঁর মৃত্যু হবে তবে মৃত্যুর পূর্বে যে ছ'দিন আছে সেই ছ' দিন সে বাঁচবে, বিরাট হয়ে বাঁচবে। পুরাণে কাহিনিটি ঠিক উল্টো। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে নতুন সুরক্ষিত প্রাসাদ তৈরি করেছে। নিজেকে বিষ চিকিৎসক দ্বারা আবৃত রেখেছে। পুরাণে রাজার অভিশাপের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করেছে ঋষি শমীক। তাকে বাঁচার পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার পিপাসা দূর করার জন্য কোনো মায়া সরোবর বা মায়া ঝর্ণার সৃষ্টি করেননি।

প্রধান পৌরাণিক চরিত্র তিনটি সম্পর্কে এবার একটু দৃষ্টি দিলে দেখব সম্পূর্ণ নয় কিছুটা পরিবর্তন করেছেন নাট্যকার। পুরাণে পরীক্ষিতের পরিচয়— চন্দ্রবংশীয় এক রাজা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও সুভদ্রার পৌত্র, অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র এবং জনমেনজয়ের পিতা। মৃগয়াকালে বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণে পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শমীক নামক এক মৌনব্রতী তপস্যারত মুনির দর্শন পেয়ে তাঁকে মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কোন উত্তর না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি একটি মৃত সাপকে ঋষির গলায় পরিয়ে দিয়ে চলে যায়। এই ঘটনায় পিতার অবমাননা সহ্য করতে না পেরে ঋষিপুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দেয় সাতদিনের মাথায় তক্ষকের কামড়ে মৃত্যু হবে রাজার। ধ্যান ভাঙ্গার পরে ঋষি শমীক রাজাকে সচেতন করে পুত্রের অভিশাপ বিষয়ে এবং রাজা তখন এক নতুন প্রাসাদ তৈরি করে সর্প চিকিৎসক আবৃত হয়ে থাকতে লাগলেন। কাশ্যপ নামক এক বিষ চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে, তক্ষক অর্থ দান করে পথ থেকে সরিয়ে দেন। এবং তক্ষকের নির্দেশে কিছু নাগ তপস্বী বেশে বহুপ্রকার ফল নিয়ে পরীক্ষিতকে ফল উপহার দিয়ে আসেন। সেই ফলের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ এক কীটকে রাজা দেখতে পান। এবং সেই কীটকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন শৃঙ্গীর বাক্যকে সত্য করার জন্য আর তখনই তক্ষক নিজমূর্তি ধারণ করে পরীক্ষিতকে দংশন করে। এরূপ চরিত্র পুরাণের। নাটকে কিন্তু কোনো প্রাসাদ গড়ার বা কোনো সর্প চিকিৎসকের কথা বলা নেই যারা রাজাকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ রাজা এখানে নিজেকে রক্ষায় সচেষ্ট নয়। বরং সে মৃত্যুকে জয় করতে শিখেছে। স্বয়ং শৃঙ্গী তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। মহান চরিত্র রূপে নাট্যকার চরিত্রটিকে এঁকেছেন।

ঋষি শমীক চরিত্রটি পুরাণের হুবহু অনুকরণ নয়। একটু পরিবর্তন আছে। পরিমার্জন করেছেন নাট্যকার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সে পরীক্ষিতের তৃষ্ণা দূর করার জন্য মায়া সরোবর বা মায়া ঝর্ণার সৃষ্টি করেছে। পুরাণে শমীক রাজাকে সচেতন করেছে তাঁর মৃত্যু বিষয়ে, এখানে সেরকম কোনো বিষয় নেই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সবথেকে বেশি পরিবর্তন হয়েছে ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর। অনুশোচনার আগুনে নিজে ঝলসে মরেছে, বাঁচাতে চেয়েছে রাজা পরীক্ষিতকে। নিজের মৃত্যু কামনা করেছে শেষে। নিজের বিষে ছটফট করছে নিজে। এইরূপ পুরাণ বহির্ভূত। মহাভারতের শৃঙ্গীর তুলনায় অনেক মানবিক সে।

সমগ্র কাহিনিটি নাট্যকার ছ'টি দৃশ্যে দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটির দৃশ্যপট সম্পর্কে নাট্যকারের নির্দেশ নাটকটিকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল দান করেছে। এই নাটকে জীবনের মূল্য সম্পর্কে নাট্যকার ইঙ্গিত করেছেন। মৃত্যু জীবনের পরিণতি। মাইকেলের কথায়— 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে, কোথা কবে।' (বঙ্গভূমির প্রতি) — কেউ কোনোদিন অমর নয়। তবে মৃত্যু ভয়ে থেকে, জীবনের স্বাদগ্রহণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা ঠিক নয়। জন্ম যখন হয়েছে, মৃত্যু একদিন নিশ্চিত। —এটি ধ্রুব সত্য। মানুষ বাঁচতে চায়, কিন্তু জীবন মাত্রেই মরণশীল। মৃত্যু হলেই পুনর্জন্ম। তাই মৃত্যু বীভৎস নয়, বরং তা মধুর। নাটকটির কাহিনি যে মহাভারত থেকে নেওয়া সেখানে এই সহজ সত্যটি বুঝতে পারেনি রাজা পরীক্ষিত। নাটকে সেই পরীক্ষিত বুঝতে সক্ষম হয়েছে। যে ক'দিন বাঁচবো জীবনে বাঁচার মতোই বাঁচবো। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে নাটকের পরীক্ষিত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

এই নাটকে পাঁচটি চরিত্র। পরীক্ষিত, ঋষি শমীক, ঋষিপুত্র শৃঙ্গী, সারথি তন্ত্রিপাল এবং মহামন্ত্রী। পরীক্ষিত, শমীক, শৃঙ্গী মহাভারতের চরিত্র হলেও তন্ত্রিপাল এবং মহামন্ত্রী নয়। তারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। সারথি হয়ে সে জীবনের যা মানে বুঝেছে, একজন রাজা হয়েও পরীক্ষিত সেই অর্থ বুঝতে পারেনি। মৃত্যু ভয় তাকে গ্রাস করেছে। সারথি জীবনের মন্ত্র শিখিয়েছে রাজাকে। সাধারণ মানুষ জীবন যেভাবে অতিবাহিত করে, একজন বিত্তবান, ক্ষমতাবান মানুষ জীবনকে সেভাবে দেখতে পারে না। সাতদিনের মাথায় মৃত্যু হবে— এই ভবিষ্যৎ জানতে পেরে মৃত্যু ভয়ে কাতর রাজাকে উদ্দেশ্য করে তন্ত্রিপাল বলেছে— জীবনের এক একটা দিন এক একটা সমুদ্র। মৃত্যু সাত সমুদ্রের পরে। ততদিন ভালো করে বাঁচতে হবে—

> "বাঁচুন ...বাঁচুন ...মহারাজ সাতদিনের প্রতি মুহূর্তে বাঁচুন...।"[১৪]

অনেকসময় জীবনের দার্শনিক সত্য সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। তন্ত্রিপালের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাকেই দেখিয়েছেন। মন্ত্রীও, তন্ত্রিপালের মতো জীবনকে সহজ ভাবে অনুভব করেছে। রাজা পরীক্ষিত যখন তন্ত্রিপালের কথায় উজ্জীবিত হয়ে জীবনে যে ছ'দিন আছে তা উপভোগ করে বাঁচতে চেয়েছে তখন মন্ত্রী বলেছে—

> "ধন্য ধন্য রাজা! ধন্য পরীক্ষিত।"[১৫]

মনোজ মিত্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের তুলনায় তক্ষক তাই একটু ভিন্ন মাত্রার নাটক। নাটকের নাম দিয়েছেন তক্ষক। কিন্তু কোনো তক্ষক চরিত্র রাখেননি। তক্ষকের নাম নিয়েই নাটকের কাহিনি গভীরতা লাভ করেছে কিন্তু সরাসরি তক্ষকের কোনো সংলাপ নেই। তক্ষক আসলে এক প্রতীক মাত্র। মৃত্যু ভয়ের প্রতীক। সেই ভয়েই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে দেয়। জীবনের স্বাদ গ্রহণে অপূর্ণ থেকে যায়। পুঁটিরামায়ণ, অশ্বত্থামা, নরক গুলজার, যা নেই ভারতে প্রভৃতি নাটকেও পুরাণ আছে। তবে তা অন্য মাত্রায়— হয় রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটকগুলি রচিত হয়েছে কিন্তু তক্ষক, জীবনের অর্থ প্রকাশক নাটক। বলা যায় পৌরাণিক মোড়কে মোড়া গভীর জীবন দর্শনের নাটক এটি।

Reference:

১. ঘোষ, জগন্নাথ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কল-০৯, পুনর্মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৫৭
২. মিত্র, মনোজ, মনোজাগতিক, 'অশ্বত্থামা ও সত্যসন্ধান', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০২২, পৃ. ৮৬-৮৭
৩. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (২), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ- ১৪২২, পৃ. ৫৫
৪. তদেব, পৃ. ৫৮
৫. তদেব, পৃ. ৬৮
৬. তদেব, পৃ. ৬৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. তদেব, পৃ. ৭১
৮. তদেব, পৃ. ৫৮
৯. তদেব, পৃ. ৭৯
১০. তদেব, পৃ. ৬৫
১১. তদেব, পৃ. ৭৫
১২. তদেব, পৃ. ৭৯
১৩. তদেব, পৃ. ৭৯
১৪. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (৩), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ- ১৪২২, পৃ. ৪৩৫
১৫. তদেব, পৃ. ৪৩৮

Bibliography:

ঘোষ, জগন্নাথ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কল-০৯, পুনর্মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৫
চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম); ডি.এম. লাইব্রেরী; প্রথম প্রকাশ ১৩৭১
মিত্র, মনোজ; নাটক সমগ্র (২); মিত্র ও ঘোষ; কল-৭৩; পঞ্চম মুদ্রণ; ভাদ্র ১৪২২
মিত্র, মনোজ; নাটক সমগ্র (৩); মিত্র ও ঘোষ; কল-৭৩; পঞ্চম মুদ্রণ; ভাদ্র ১৪২২
মিত্র, মনোজ, মনোজাগতিক, 'অশ্বত্থামা ও সত্যসন্ধান', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০২২
সরকার, সুধীর চন্দ্র; পৌরাণিক অভিধান; এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স; কলি-৭৩; একাদশ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী; মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া; পুস্তক বিপণি; কল-৯; দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫
Kosambi, D.D.; Myth and Reality; Published by Ramdas G. Bhatkal for popular prakashan; reprinted 1994

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 518 - 523
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিজয় তেন্ডুলকরের ‘চুউপ! আদালত চলছে’ : পুরুষতন্ত্রের এক বিশ্বস্ত দলিল

ড. জিনিয়া পারভীন
Email ID : jiniaparveen1988@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Inner voice of women, Patriarchy, Gender discrimination, Oppressed, Moral values.

Abstract
The renowned Marathi playwright Vijay Tendulkar has presented the inner voice of women[1] in the report of Bengali drama with great skill. A popular play by Vijay Tendulkar, written on the life story of a woman, is ‘Chup! Adalat Cholche’. The play in question establishes the issue of how women have been victims of patriarchy[2] for thousands of years, deprivation, disregard and gender discrimination.[3] Leela Benare is a shining example of how difficult it is for a highly educated woman to maintain her selfhood, that is, her own identity, in a patriarchal society. Through Leela Benare, the playwright wants to say that patriarchy is pervasive in all levels of society, such as religion, culture, and morality, which has oppressed[4] women. Along with this, playwright Vijay Tendulkar has also raised several questions about love, sexuality, marriage and moral values[5] prevalent in society.

Discussion

মারাঠি নাট্যজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন বিজয় তেন্ডুলকর। তিনি একাধারে নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের গিরগাঁওয়ে; এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।[১] তাঁর পিতা ছিলেন একজন সামান্য কেরানি। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন করতে না পারলেও পিতার সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা তাঁকে একসময় বইমুখী ও বহুমুখী করে তোলে এবং কালক্রমে তিনি নানান বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে তাঁর নাটকের বিষয় হয়ে দেখা দেয়। বিজয় তেন্ডুলকর সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন যে, নাটক কেবল বিনোদন নয়— বরং সমাজের অপ্রিয় ও অন্ধকার দিকগুলিকে উন্মোচনের একটি বিরাট হাতিয়ার। তাই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংকটই তাঁর নাটকের মূল বিষয় হয়ে দেখা দেয়। বিজয় তেন্ডুলকর রচিত নাটকের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল - ‘শ্রীমন্ত’ (১৯৫৫), ‘মানুষ নানাবাচে বেট’ (১৯৬২), ‘মী জিংকালো, মী হারালো’ (১৯৬৩), ‘অজাগর অনি গন্ধর্ব’ (১৯৬৬), ‘কবাল্যাচি শালা’ (১৯৬৪), ‘শান্ততা! কোর্ট চালু আহে’ (১৯৬৮), ‘গিধাড়ে’ (১৯৭১), ‘সখারাম বাইন্ডার’ (১৯৭২), ‘ঘাসিরাম কোতোয়াল’ (১৯৭২), ‘কন্যাদান’ (১৯৮৩) ইত্যাদি। তেন্ডুলকার তাঁর নাটকে বাস্তব জীবন, সমাজের অন্যায়, নারীর নিপীড়ন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও মধ্যবিত্তের ভণ্ডামিকে সাহসিকতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আপাত সম্ভ্রান্ত মানুষের অন্তরালে যে হিংস্র চরিত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লুকিয়ে থাকে তাকে উদঘাটন করেছেন। এ ছাড়া, জাতপাত, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কও তাঁর নাটকের অন্যতম বিষয়। সমালোচক বলেছেন, -

> "এই বিশিষ্ট নাট্যকার তাঁর জীবনে অনেক অন্ধকার মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই বেশিরভাগ নাটকেই নাট্যকারকে আমরা দেখি তার অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক আলোড়নকে আপাত নিস্তরঙ্গতার মুখোশে ঢাকতে। ওঁর লেখা বেশ কিছু নাটকে, বিশেষত যে নাটকগুলি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বারংবার প্রকাশ পেয়েছে হিংস্রতা যা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ। প্রকৃত জীবনের অনুভূতির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে নাট্যকারের সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যে লড়াই যেন বার বার দেখা যায়। বাস্তবতার ছোঁয়ায় তাঁর নাটকগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে।"[২]

আমাদের সমাজে যারা নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, শোষিত তাদের জন্য তিনি কলম ধরেছেন। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর অবস্থান কোথায় সেই বিষয়টিকেও তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'চুউপ! আদালত চলছে' সেই ধারারই একটি বিশ্বস্ত দলিল। এটি এমন একটি নাটক যা নারীর আত্মমর্যাদা, সমাজের নৈতিক ভণ্ডামি এবং পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

'চুউপ! আদালত চলছে' নাটকটি তিন অঙ্কে রচিত নাটক, চরিত্র মাত্র আটটি। আলোচ্য নাটকের মূল চরিত্র লীলা বেনারে। তাকে কেন্দ্র করেই নাট্যকার তাঁর অভিপ্রায়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। লীলা বেনারে একজন উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত নারী। সে একজন সুশিক্ষিকা। সময়ানুবর্তিতা ও সৌজন্যতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক, -

> "স্কুলে যখন প্রথম বেলটা বাজে আমার পা তখন দরজার চৌকাঠে। এই আট বছরে আমাকে একটা দিনও দেরি করে আসার জন্যে বকুনি খেতে হয়নি। আমি পড়ানো নিয়ে কখনও পিছিয়ে পড়ি না। সব খাতাপত্র ঠিক সময়ে দেখা হয়ে যায়। কেউ কোনোদিন আমার দিকে আঙুল তুলতে পারে না। আমি কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ি না।"[৩]

বেনারে যখন সামন্তকে নিজের সময়ানুবর্তিতা ও সৌজন্যতার কথা বলে তখন সামন্ত বেনারকে বলে –

> "আপনি কি মাস্টারনি?"[৪]

সামন্তর এই কথার মধ্যে উঠে আসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি কালো অধ্যায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কোনো নারী যদি শিক্ষক হয় তাহলে তাঁকে নানান কুকথার মুখোমুখি হতে হয়, ঠিক তেমনই বেনারেকেও শুনতে হয়েছে এমন কটু বাক্য।

আমরা সচরাচর নারী বলতে যা বুঝি সে নারী কিন্তু লীলা বেনারে নয়। তাকে পুরুষনির্মিত ছকে ফেলা যায় না। আসলে সে নারী, যে পুরুষতন্ত্রকে উপেক্ষা করে নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াকে নিয়েই বাঁচতে চেয়েছে আজীবন। কিন্তু পুরুষনির্মিত সমাজে নারীর চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য নেই। তাই তো আমরা দেখি যখন লীলা বেনারের বয়স চোদ্দো ছিল, যখন সে জানত না পাপ কী তখন সে মন দিয়ে বসে নিজের মায়ের ভাইকে অর্থাৎ মামাকে। সে বিয়েও করতে চেয়েছিল। কিন্তু, -

> "সবাই-আমার মাও-এর বিরোধিতা করলেন। আর আমার সাহসী নায়কটিও লেজ গুটিয়ে পালালেন। কী রাগ হয়েছিল তখন তার উপরে-মনে হয়েছিল তার মুখটা মেরে ফাটিয়ে দিই আর থুতু দিই তার উপর! কিন্তু আমি বোকা ছিলাম তাই বাড়ির প্যারাপেট থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলাম-মরতে চেয়ে। কিন্তু আমি মরিনি। আমার শরীর মরেনি!"[৫]

আসতে আসতে সে বুঝতে পারে এই সমাজ পাপপুণ্য বলতে কী বোঝায়। তাই সে পুরুষনির্মিত সমাজেই, তাদের নির্দেশিত পথেই সে ফিরে আসে এবং নতুনভাবে জীবনযাপন শুরু করে।

নাটকের অন্যান্য চরিত্র যেমন, মিঃ কাশিকর, সুখাত্মে, দামলে, নানাসাহেব শিন্ডে প্রমুখ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর কিছু সভ্য সমাজভুক্ত লোকের শবদেহ। তাদের ঠোঁটে বাজছে কিছু পুরোনো ভালো ভালো কথা, কিন্তু জঠরে সব অতৃপ্ত কামনা। তারা সমাজে নীতি প্রতিষ্ঠার নামে নারীর সামেন খাড়া করেছে নানান আদর্শ, কিন্তু নিজেরাই এক একজন আদর্শচ্যুত,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্খলিত মানুষ। এরা সমাজের সেই শ্রেণি যারা নিজেদের নৈতিক বলে দাবি করলেও নারীর স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। তাদের চোখে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী হল, -

> "সমাজের দেহে একটা অসুখ।"[৬]

তাদের মতে একজন নারীর গুরু কর্তব্য হল পুরুষসৃষ্ট সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার না করে সমাজের সেই উচ্চ মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করা। যদি কোনো নারী এই নীতি লঙ্ঘন করে তাহলে সে দেশ ও দশের প্রধানতম শত্রু। কিন্তু পুরুষের সামনে আদর্শ কই? তারা যখন সব নীতি-আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু দৈহিক সুখভোগের জন্য একজন নারীর সঙ্গে দিনের পর দিন দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয় তখন পুরুষতন্ত্র চুপ থাকে কেন? আসলে পুরুষ সমস্ত নীতি-নিয়ম সৃষ্টি করেছে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে। নারী তাদের কাছে ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, -

> "তাহাদিগের শৈশবাবস্থার অনাদর, বৈধব্যের দারুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থার যন্ত্রণা এবং বার্দ্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের জীবিত কাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিগের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়।"[৭]

নাটকের কাহিনি অগ্রগমনের সাথে সাথে এই সত্যও আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লীলা বেনারে বুঝতে পারে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন জীবনসঙ্গী দরকার, যে সুখে-দুঃখে তার পাশে থাকবে। তাই সে আবার প্রেমে পড়ে প্রফেসর দামলের। দামলে একজন বিবাহিত পুরুষ। তার পাঁচটি সন্তানও আছে। লীলা বেনারে এই সত্যটি জানত কি না তা আমাদের স্পষ্ট করে জানাননি নাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকর। তবে লীলা বেনারে তার সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালোবাসতেন প্রফেসর দামলেকে। বেনারের বিশ্বাস ছিল বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত থাকলেও পরিণত বয়সের প্রেম ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ, -

> "এই প্রেম তো বুদ্ধিমতি প্রেম কারণ এবার এক অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিমান লোকের প্রতি প্রেম ছিল। এটা প্রেমই নয়, এ তো পূজা!"[৮]

সেই পুজোর বেদিতে বেনারে সর্বস্ব দিয়ে বসে। সে ভাবতে শুরু করে জীবনে এবার সুখ সমাগত। কিন্তু তার ভাবনা আর বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতে পারে না। কেননা,

> "...আমার বুদ্ধিসর্বস্ব দেবতা পূজা গ্রহণ করে সেখান থেকে চলে গেলেন। তিনি আমার মনও চাননি আমার আত্মিকতাও চাননি-এসব নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথাও ছিল না! [মৃদু স্বরে] উনি তো সত্যি দেবতা নন, উনি মানুষ। তাঁর জন্যে সবটাই শরীর-শরীরের জন্য শরীর! ব্যাস! আবার শরীর!"[৯]

বেনারের কথাতেই স্পষ্ট যে, প্রফেসর দামলে কেবলমাত্র শারীরিক সুখ পাওয়ার জন্যই বেনারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, জীবনসঙ্গী করার জন্য নয়। তাই লীলা বেনারের কোনো কাকুতিমিনতিই তার কানে ঢোকে না,

> "অকৃতজ্ঞ হয়ো না। এই শরীরই তো একসময় পুড়েছে আর তোমাকে দিয়েছে একটা অসম্ভব সুন্দর মুহূর্ত। মনে হয়েছে তুমি স্বর্গের কাছাকাছি চলে এসেছ! ভুলে গেছ সেটা? সেই মুহূর্তটা তোমাকে নিয়ে গেছে অনেক অনেক উঁচুতে স্বর্গদ্বারের কাছে। সেটা তুমি ভুলে যাবে?"[১০]

তা, ছাড়া সে নিজের মুখেও স্বীকার করেছে সে কথা। দামলের ঔরসে বেনারে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লেও বেনারে সমস্ত খুলে বলে প্রফেসর দামলেকে। সব শুনে তার প্রতিক্রিয়া, -

> "তুমি কোথায় যাবে তা তোমারই সমস্যা। আমি তোমার ব্যাপারে খুবই সমবেদনা বোধ করছি। কিন্তু আমি তো কিছুই করতে পারব না। আমার নিজের সুনাম তো রক্ষা করতে হবে।"[১১]

হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষতন্ত্রের অবহেলা, বঞ্চনা, উপেক্ষা ও লিঙ্গবৈষম্যের শিকার তামাম বিশ্বের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত লীলা বেনারে। লীলা বেনারের মাধ্যমে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে যেমন ধর্মে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায় পুরুষতন্ত্র পরিব্যাপ্ত, যা নারীকে অবদমিত করে রেখেছে।

লীলা বেনারে যখন ভেবেছে যে, জীবনে এবার সুখ সমাগত তখন তাকে পুরুষতন্ত্রের কাছে ধাক্কা খেতে হয়েছে। জীবনে চলতে গিয়ে বারবার ঠোকর খেয়েছে ঠিকই, বারবার বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানবজাতির প্রতি কোনো কটূক্তি প্রয়োগ করেননি। সে নতুনভাবে আবার নিজের জীবনটাকে সাজাতে চেয়েছে। তাই তো আমরা দেখি, সুখান্তে যখন প্রফেসর দামলেকে গালিগালাজ করে তখন বেনারে বলে, -

> "প্লিজ ওঁকে বদমাইশ বলবেন না। উনি ভালো লোক হতে পারেন। উনি পণ্ডিত ও বিজ্ঞ লোক। মেয়েটি সে তুলনায় সামান্য। ও হয়তো তাঁকে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি যে ওর মনে তাঁর জন্যে কত ভালোবাসা ছিল। মেয়েটি কোনো ব্যাপার নয় এই ক্ষেত্রে, বাচ্চার কথাটাই প্রধান।"[১২]

বেনারে নিজেকেই দোষারোপ করেছে। আসলে সে বুঝতে পেরেছে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব স্বর বলে কিছু নেই। তাকে পুরুষতন্ত্র যেমন চালাবে তেমনই চলতে হবে। নারী অপাঙ্‌ক্তেয়, অপর, অবলা। তাই সে আর নিজের জন্য কিছুই চায়নি। সে তার বাকি জীবনটা আগত সন্তানের কথা ভেবে আবার নতুনভাবে গড়তে চেয়েছে, -

> "আসলে তার কোনো দোষ নেই। কিন্তু তার পরিস্থিতি খুব গম্ভীর। ও বাচ্চাটাকে বড়ো করতে চায়। ও শুধু বাচ্চাটার জন্যেই বাঁচতে চায়। ও বিয়ে করতে চায়।" [১৩]

কিন্তু তার সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

মাতৃত্ব বড় পবিত্র ধর্ম। তা ছাড়া, মাতৃত্বের কল্পনায় বিশেষ মাহাত্ম্য বিরাজ করে। আমরা নারীকে মানবজাতির মাতা হিসেবে স্বীকার করি। আমাদের সভ্যতায় তার সবসময় পূজা চলে। তোমার মাকে দেবতা রূপে পূজা করবে এই কথাই আমরা বাচ্চাদের ছোটোবেলা থেকে শেখাই। একজন মার বিশাল কর্তব্য আছে। তাঁর অস্তিত্ব দিয়ে তিনি ঐন্দ্রজালিক আবরণ তৈরি করেন তার শিশুকে রক্ষা করার জন্য। এই সমস্ত কথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শুধু বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; অবিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে নয়। বিবাহবহির্ভূত মাতৃত্ব চিরকালই খুব বড় পাপ হিসাবে দেখা হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। পুরুষতন্ত্র বলে যদি বিবাহ ব্যতিরেকে কোনো নারী তার বাচ্চাটিকে প্রতিপালন করার অঙ্গীকার করে তাহলে সমাজের অস্তিত্বে সংকট দেখা দেবে। নীতি-দুর্নীতি বলে সমাজে কোনো মূল্যবোধই বেঁচে থাকবে না। পুরুষ বলে, -

> "ভ্রূণহত্যা এক জঘন্য অপরাধ। কিন্তু একটি অবৈধ সন্তান প্রতিপালন করা আরও বেশি ভয়ংকর। এই কাজ যদি আমরা সমর্থন করি তাহলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানই আর বেঁচে থাকবে না। চারিদিকে শুধু অনৈতিক নৈরাজ্য চলবে। আমাদের চোখের সামনে ঐতিহ্যবাহী সমাজের স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।"[১৪]

এই পুরুষনির্মিত তন্ত্রের কাছে লীলা বেনারের শেষ ইচ্ছাটুকুও বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতে পারে না।

তবে নারীর অবমাননা, বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের পেছনে নারীরাও অনেকাংশে দায়ী-এই বিষয়টিকেও প্রথিতযশা নাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকর সুকৌশলে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন। নাটকের অন্যতম নামহীন নারীচরিত্র; যার পরিচয় মিসেস্ কাশিকর তিনি বিশ্বাস করেন যে, নারীরা শিক্ষিত হলেই সমাজ কালিমালিপ্ত হয়, পাপ কাজে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, -

> "এখনকার দিনে বিয়ে না করেও পারা যায়। মেয়েরা শুধুই আরাম করে। দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে কেউ চিন্তিতই নয়। দেখুন আমাদের সময়ে একটা মেয়ে যদি খাঁদা, কালো, কুঁজো বা যাই হত-তাহলেও তার বিয়ে ঠিকই হত। এই যে মেয়েরা এখন চাকরি করতে শিখেছে, তাতেই সব উলটোপালটা হয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই তো সমাজে অপরিণামদর্শী যৌনচিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে।"[১৫]

শিক্ষাই কেড়ে নিচ্ছে কোমলতা, বিনয়, লজ্জা, মধুরতা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, অনুনয় প্রভৃতি যা নারীর সহজাত প্রবৃত্তি বলে একজন নারীর কাছে পরিচিত। কিন্তু এই ললনারা কখনই ভেবে দেখে না যে, শিক্ষাই মানবজাতির উন্নতির একমাত্র সোপান। ভারতবর্ষীয় নারীরা বহুকাল থেকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ ও জড়ের ন্যায় কালযাপন করতে বাধ্য হয়েছে একমাত্র শিক্ষার অভাবেই। একজন সুশিক্ষিত নারীই পারে সমাজের-পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে, যা নারীকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নারীর শিক্ষার, স্বাধীনতার বিরোধী। তাই সব মিলিয়ে একজন নারীর কাছে একজন নারীর জীবন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"...একটা বই যার পাতাগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি হয়ে গেছে। জীবন একটা বিষাক্ত সাপ যেটা নিজেই নিজেকে কামড়ায়। জীবন মানে একটা বিশ্বাসঘাতকতা। জীবন হচ্ছে একটা ধোঁকাবাজি। জীবন হল একটা নেশার বস্তু। জীবন হল এক ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা। জীবন মানে একটা কিছু যেটা কিছুই না-বা একটা শূন্যতা যেটার মানে অন্য কিছু।"[১৬]

পরিশেষে বলা যায় যে, বিজয় তেন্ডুলকর তাঁর চুউপ! আদালত চলছে' নাটকে পুরুষশাসিত সমাজে একজন উচ্চশিক্ষিত নারীর বেদনার্ত জীবনের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। প্রফেসর দামলে লীলা বেনারের শিক্ষার আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে তার সঙ্গে যৌনতা উপভোগ করে। এক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধী প্রফেসর দামলেই। কিন্তু পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সামাজিক অনুশাসনে নারীকে প্রলুব্ধ এবং পথভ্রষ্ট করে যে পুরুষ সে বিচারের উর্ধ্বে থাকে। নাটকটিতে এভাবে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অমানবিক, অমানুষিক সহিংসতাকে তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যকার শম্ভু মিত্র এ নাটক সম্পর্কে বলেন যে, -

"আমাদের চারদিকের এই ভণ্ড, অক্ষম ও ঈর্ষাপূর্ণ লোকগুলোর মধ্যে আর একজন অনুভূতিসম্পন্ন লোকের ভণ্ডামি বা ধাপ্পাবাজি যার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, তার জীবনে যে কি গ্লানি আসতে পারে তা এই নাটকে চমৎকারভাবে রূপায়িত। সেই চরিত্রটি এই নাটকে একজন মেয়ে হওয়াতে অবস্থাটার নির্দয়তা আরো বেশি করে বোঝা যায়। অথচ যে মেয়েটি বিদ্রোহিনী নয়। সে সমাজকে তুচ্ছ করে একলা চলতে চায়নি। সে একটা সমাজের কাঠামোর মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিল। সন্তান চেয়েছিল, এবং সন্তানকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একজন পিতা দিতে চেয়েছিল। এটাই তার অপরাধ। এবং সেই অপরাধের বিচার করে এমন কয়েকজন লোক, যারা সততায়, কর্মদক্ষতায় সব দিক থেকেই তার থেকে নিকৃষ্ট। এই ঘটনাটাই আমাদের সামাজিক জীবনকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে যে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে উপলব্ধি করি যে আড়ম্বর করে যতো নীতিকথা ঘোষণা করা হয় আমাদের আজকের সমাজে, সে শুধু অপরের প্রতি দোষারোপ করার জন্যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত ও সংবেদনশীল করবার জন্যে নয়।"[১৭]

পুরুষশাসিত সমাজে একজন উচ্চশিক্ষিত নারীর আমিত্বকে অর্থাৎ নিজস্বতাকে ধরে রাখা কতটা কঠিন লীলা বেনারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মূলত নাটকের ভেতর নাটক (Meta-theatre) রচনার মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, সমাজ কীভাবে বিচারপ্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করে একা একজন নারীর চরিত্র হনন করতে চায়। সেই সঙ্গে নাট্যকার বিজয় টেন্ডুলকর সমাজে প্রচলিত প্রেম, যৌনতা, বিয়ে এবং নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন।

Reference:

১.https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Tendulkar&hl=bn&sl=en&tl=bn&client=srp. Access on 07.04.2025 at 03: 10 AM
২. তেন্ডুলকর বিজয়, চুউপ! আদালত চলতে, শুক্লা বসু (সেন) অনূদিত, বিরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী, ২০১৬, পৃ. ১৩১
৩. তদেব, পৃ. ২৬
৪. তদেব, পৃ. ২৬
৫. তদেব, পৃ. ১১০
৬. তদেব, পৃ. ১০৩
৭. রায়, ভারতী (সম্পা.) নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা, আনন্দ, ২০০২, পৃ. ৬৬
৮. তেন্ডুলকর বিজয়, চুউপ! আদালত চলতে, শুক্লা বসু (সেন) অনূদিত, বিরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী, ২০১৬, পৃ. ১১০
৯. তদেব, পৃ. ১১০-১১১
১০. তদেব, পৃ. ১১০-১১১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. তদেব, পৃ. ৭৬।
১২. তদেব, পৃ. ৯৮
১৩. তদেব, পৃ. ৯৭
১৪. তদেব, পৃ. ১০৭
১৫. তদেব, পৃ. ৮৬
১৬. তদেব, পৃ. ১০৯
১৭. তেন্ডুলকর, বিজয়, চোপ, আদালত চলছে, এসবি যোশী ও নীতিশ সেন অনূদিত, গ্রন্থপীঠ, ১৯৭৬, মুখবন্ধ।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 524 - 535
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ : পুরাণ প্রতিবিম্বে অন্তর্দ্বান্দ্বিক জীবনভাষ্য

প্রজ্ঞা চন্দ
প্রভাষক (বাংলা)
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিস
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি
ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID : proggachandaritu@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Mythology, Archetype, Inner conflict, Verse drama, mythological adaptation, psychological discourse.

Abstract
The great poet and playwrights Buddhadeva Bose (1908–1974), a prominent figure of the modern era, had a deep understanding of modern human life and psychology. Modern human life and psychology have become increasingly complex, requiring writers to adopt refined narrative techniques. Consequently, he successfully unraveled the intricate inner-conflicts of modern human of the post-World War era. Bose's childhood memories and academic engagement with comparative literature nurtured his interest in mythology. Myths encompass vast narratives and timeless philosophical archetypes. To portray the internal psychological conflicts of his characters, Buddhadeva Bose, as a modern poet and playwright, drew inspiration from mythology, employing verse drama as his preferred literary form. His involvement in drama began in early adulthood, and he made significant contributions to this genre. Among Bose's verse plays, Tapasvi O Tarangini (1966) stands out as a remarkable literary creation. Bose derived its central narrative from the Mahabharata, particularly the mythological story of the sage Rishyashringa, unfamiliar with female existence, and the courtesan Tarangini. Through a nuanced depiction of their psychological struggles, Bose reinvented mythology with a modern perspective. He not only adapted mythological events but also reshaped unstated narratives to align with the mythological essence, while designing non-mythological characters to reflect contemporary human nature. The application of mythological symbols in literature is not uncommon, yet Buddhadeva Bose's interpretation is unique. In this play, he delves into the psychological aspects of male and female characters, transforming the courtesan Tarangini from a figure of mere carnal desire into an embodiment of romantic love. He illustrates the sage Rishyashringa's moral downfall, self-discovery, and ultimate liberation. Through non-mythological characters, he presents profound insights into life and, most importantly, creates a new lens through which to read mythology. His skillful technique of aligning mythology

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

with modern psychological discourse sets his mythological adaptation apart as a distinctive literary achievement.

Discussion

ক্রমবিবর্তিত মানবসভ্যতার স্থির অন্তর্লীন প্রত্নপ্রতিমাকে (Archtype) ধারণ করে, মিথ-পুরাণের কাহিনিসমূহ যুগে যুগে আধার হয়েছে; জীবন রহস্য বর্ণনায়, জটিলতর মানবমনের দ্বন্দ্ব মীমাংসায় ও জীবন সম্পর্কে গভীর পরিজ্ঞান দানের। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংক্ষুব্ধ-সময়ের বিপন্ন-বাস্তবতার পটে, আধুনিক মানবের অন্তর্দ্বান্দ্বিক জীবনভাষ্য বয়ানে কাব্যনাট্যকে আধার ও পুরাণকে আধেয়রূপে গ্রহণ করে বাংলার সাহিত্য-পরিমণ্ডলে যাঁর দেদীপ্যমান পদচারণা প্রাতিস্বিকতায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে তিনিই কলাকৈবল্যবাদী লেখক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে মিথ-পুরাণের প্রয়োগ অপ্রতুল নয়। প্রতীচ্যে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রিক মহাকবি হোমারের লেখনীতে ট্রয়ের যুদ্ধ সংক্রান্ত মিথের সমাবেশে রচিত ইলিয়ড-ওডিসি থেকে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কালজয়ী ট্র্যাজেডি নির্মাতা নাট্যকারগণ এস্কাইলাস-সফোক্লিস-ইউরিপিদিসের সৃষ্টিতে মিথকে মূল অবলম্বন হিসেবে নাটকে গ্রহণ করতে দেখা যায়। আধুনিক সময়ে মিথাশ্রয়ী সাহিত্য রচনার সংখ্যাও কম নয়। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকগণের মধ্যে জেমস জয়েস (১৮৮২–১৯৪১), টমাস স্টার্নস এলিয়ট (১৮৮৮–১৯৬৫), আলবেয়ার কাম্যু (১৯১৩–১৯৬০), জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫–১৯৮০) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের মধ্যে কেউ মিথ-পুরাণকে রচনা-কাঠামোর সঙ্গী করেছেন, কেউ আধুনিক মনস্তত্ত্বের কোন বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে মিথের কোন অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন, আবার কেউ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছেন। প্রাচ্যের সাহিত্যাঙ্গনে কখনও বিষয় বৈভবে আবার কখনও প্রকরণশৈলীতে মিথ-পুরাণের স্বকীয় প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায় যাঁর কাব্যনাটকে তিনি সব্যসাচী লেখক বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব রচিত পুরাণাশ্রয়ী কাব্যনাটকসমূহ হল— *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০), *প্রথম পার্থ* (১৯৭০), *সংক্রান্তি* (১৯৭৩)। এ ধারার গদ্যনাটকের মধ্যে রয়েছে *ইক্কাকু সেন্নিন* (১৯৭১), *কলকাতার ইলেকট্রা* (১৯৬৭), *সত্যসন্ধ* (১৯৬৭)। শেষ বয়সে তিনি রচনা করেন *মহাভারত* বিষয়ক তাঁর ভিন্ন চিন্তার প্রতিফল প্রবন্ধগ্রন্থ *মহাভারতের কথা* (১৯৭৪)।

মার্কিনমুলুকের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে (১৯৬৩) তুলনামূলক সাহিত্যবিচার সূত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় এপিক *ইলিয়ড-ওডিসি-ঈনীড* এবং অপরপক্ষে ভারতীয় পৌরাণিক মহাকাব্য *রামায়ণ-মহাভারত* বিষয়ক তাঁর অনুসন্ধিৎসু লেখক মনে যে সকল প্রশ্নের ও কৌতূহলের উদ্রেক ঘটে তারই বহিঃপ্রকাশ পরবর্তীকালে তাঁর রচিত পুরাণাশ্রয়ী কাব্যনাটক। মূলত ভারতবর্ষীয় জাতির 'স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস'[১] *মহাভারত*-ই তাঁর আগ্রহের মূল কেন্দ্রস্থল।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের মধ্যে সবার্পেক্ষা বিখ্যাত *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* কাব্যনাটকটি পৌরাণিক ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানকে আশ্রয় করে রচিত। ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের মূলে রয়েছে উর্বরতার প্রত্নপ্রতিমা। বাল্মিকী *রামায়ণের* আদিকাণ্ডে, বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে অলম্বুষা জাতক-৫ এবং নলিনিকা জাতক-৫২৬ এ ঈষৎ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সহযোগে ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের সন্ধান মেলে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের *মহাভারতে* সবিস্তারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনি অন্তর্ভুক্ত আছে। *মহাভারতের* আরণ্যক পর্বের ১১০-১১৩ সর্গে, পদ্মাপুরাণের পাতাল-১৩, মহাবস্তুভদ্রকল্পাবদান-৩৩, অবদান কল্পলতা-৬৫, ১০১ প্রভৃতি স্থানে এর অস্তিত্ব মেলে।[২] ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাণের কাহিনিসার হলো, অপাপবিদ্ধ আজন্ম ব্রহ্মচারী তাপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশের মধ্য দিয়ে অনাবৃষ্টিজনিত বন্ধ্যত্ব আক্রান্ত অঙ্গরাজ্যকে বর্ষণমুখর করে পুনরায় তার উর্বরতা ফিরিয়ে আনার আখ্যান। প্রাচীন বহুল প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুসারে নর-নারীর মিলনে দূর হয় বন্ধ্যত্ব, আসে বৃষ্টি, প্রকৃতি হয় উর্বরা, ধরিত্রী হয় শস্য শ্যামলা। উর্বরতার এ প্রত্নপ্রতিমাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনি।

অলম্বুষা জাতকে এ কাহিনি কিছুটা ভিন্ন। সেখানে হিমালয়বাসী কঠোর ধ্যানমগ্ন 'শীলতেজা' ঋষ্যশৃঙ্গের তপশক্তি দ্বারা শক্রভবন ভীত হলে সুচতুরা বারাঙ্গনা অলম্বুষাকে নিয়োগ করা হয় ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য নাশের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে ঋষ্যশৃঙ্গের তপোভঙ্গের মধ্য দিয়ে শক্রভবন শঙ্কামুক্ত হন। অন্যত্র, নলিনিকা জাতকে, কাশীরাজ্যের অনাবৃষ্টিজনিত দুরবস্থার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিকার করতে শত্রুর পরামর্শে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত স্বীয় কন্যা নলিনিকাকে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গের কাজে নিয়োজিত করেন। *রামায়ণে* আবার ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি সংক্ষিপ্ত রূপে পাওয়া যায়, যেখানে হরিণীগর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম লাভ কিংবা এ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত অনুপস্থিত। মূলত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত *মহাভারতে* বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আখ্যানই বুদ্ধদেব বসু তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাটকের ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ কথা তিনি তাঁর 'কবিতা ও আমার জীবন : আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এভাবে -

> "... 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'— ঐ নাটকটাকেও কাব্যজাতীয় রচনা বলে ধরে নিচ্ছি— সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন আমি ভেবেছিলাম তখন আমি সবে মাত্র উত্তরতিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ: সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খসমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি— এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র বাইরে কিছুই জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টিবিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত —এই সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিল তখন, রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখে প্রথম দুটো লাইন— সে—দুটো দিয়েই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র আরম্ভ...।[৩]

শৈশবের মুগ্ধতার সঙ্গে মিথ-পুরাণ-সংক্রান্ত বিস্তর জ্ঞানার্জন বুদ্ধদেবকে তাঁর কাব্যনাটক রচনায় অনুপ্রেরণা জোগায় আর এভাবেই বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যজীবনে কাব্যনাটক রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। *মহাভারত* থেকে তাঁর গৃহীত আখ্যানটির সাররূপ তিনি তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাটক রচনার প্রায় সমকালে রচিত কাব্য *মরচে পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৬) এ উল্লেখ করেছেন।

ত্রিশোত্তর কালের আধুনিক বাংলার কবি বুদ্ধদেব বসুর চেতনালোকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনীর* (১৯০০) অন্তর্ভুক্ত 'পতিতা' কবিতাটি বুদ্ধদেবকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। 'পতিতা' কবিতার বিষয়বস্তু এবং তার কিছু বয়ন কৌশলও বুদ্ধদেব তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে গ্রহণ করেছেন। 'পতিতা' কবিতাটি ঋষ্যশৃঙ্গের তপোভঙ্গের দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত অনাম্নী বারাঙ্গনার হার্দিক প্রেমচেতনার এক সকরুণ প্রকাশ। ধন-সম্পদ নয়, নয় কোনো আভূষণ, এ কবিতায় হার্দ্য প্রেমে অভিভূত বারাঙ্গনা উত্তীর্ণ হয়েছে সকল পার্থিব কামনা থেকে। নিজেকে তিনি তরুণ তাপসের বিশুদ্ধ দৃষ্টিপাতে আবিষ্কার করেছেন নবভাবে। বারাঙ্গনার কণ্ঠে যে রোমান্টিক হার্দ্য প্রেমের আন্দোলন ধ্বনিত হতে শোনা যায়, তা-ই পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের তরঙ্গিনী চরিত্র গঠনের ভিত্তি রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। পুরাণে যার নাম-পরিচয় অবধি স্থান পায়নি, কেবল তার অস্তিত্বকে আশ্রয় করে বুদ্ধদেব নির্মাণ করলেন দ্বন্দ্ববিজড়িত মানবিক পূর্ণাঙ্গ এক নারী চরিত্র। অপরপক্ষে বুদ্ধদেব নির্মিত ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রের বীজসূত্র মিলবে, *মরচে পড়া পেরেকের গান* কাব্যের দ্বাবিংশতম কবিতা 'মরচে পড়া পেরেকের গান' —এ, যা এ কাব্যের নাম কবিতা। এ কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জীবনের অপ্রাপ্তি আক্ষেপ ও নৈঃসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বজর্জর অস্তিত্বের কথা জানান দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে অতৃপ্ত হৃদয়ের আর্তি -

> বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন তিক্তকাম রাত্রি,
> তিক্ত আমার মন্ত্রপূত মিলন, উৎপীড়ন আমার বীজস্রোত
> যার তেজে বৃষ্টি নামে, ফসল ফলে। যে-দেশে আমি হর্ষধারা
> নামিয়েছি,
> একা আমি শুকনো।
>
> ('মরচে পড়া পেরেকের গান', মরচে পড়া পেরেকের গান)

পুরাণের এ আখ্যানকে বুদ্ধদেব বসু স্বীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা কল্পনাশক্তি ও কবিত্বশক্তি দিয়ে এক নবজন্ম দিয়েছেন। উর্বরতা প্রত্নপ্রতিমার মিথ যে দুষ্প্রাপ্য নয় তা বুদ্ধদেব বারংবার তাঁর রচনায় ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু রচিত আরেক নাটক *ইক্কাকু সেনিন* কোম্পারু মোতায়াসু (১৪৫৩–১৫৩২) রচিত জাপানি নো নাটকের অনুবাদ,[৪] যেখানে ইক্কাকু ঋষ্যশৃঙ্গের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জাপানি প্রতিরূপ। এছাড়া পাশ্চাত্যের 'হোলি গ্রেইল' মিথটির আদি উৎস প্রাচ্যের ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান। এ মিথ থেকেই টি এস এলিয়টের *পোড়োজমি* কাব্যের পট নির্মিত।

এ অংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত *মহাভারত* থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যা দ্বারা মূল পৌরাণিক আখ্যান সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে এবং একই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর নাটকের সাথে আখ্যানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দিকগুলো চিহ্নিত করা যাবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত *মহাভারতে*র বনপর্বের ১১০, ১১১, ১১২ ও ১১৩ সর্গে ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান বর্ণিত রয়েছে। বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মবৃত্তান্ত এখান থেকে গ্রহণ করছেন। কেবল তাঁর নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের শিরোদেশে অবস্থিত শৃঙ্গ প্রসঙ্গটি পরিহার করেছেন। *মহাভারতে* উল্লেখ আছে এরূপে -

> "মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি তপঃপরায়ণ হইয়া কেবল কাননমধ্যেই বাস করিতেন; পিতা ভিন্ন আর কোনো মনুষ্যই তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই; এই জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত ছিল। সেই সময়ে দশরথের সখা লোমপাদ অঙ্গদেশের অধিরাজ হইয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণের সহিত ব্যবহার ও পুরোহিতের প্রতি অত্যাচার করাতে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; এই নিমিত্তে সহস্রলোচন তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ নিষেধ করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। একজন মুনি রাজাকে কহিলেন ...ঋষ্যশৃঙ্গ নামে সরলস্বভাব—সম্পন্ন নারী—পরিচয়বর্জিত আজন্ম—বনবাসী ঋষিকুমারকে আনায়ন করিবার উদ্যোগ করুন। সেই মহাতপাঃ আপনার দেশে প্রবেশ করিবামাত্রই বারিবর্ষণ হইবে, সন্দেহ নাই।"[৫]

অঙ্গরাজ্যের দুর্দশা, অনাবৃষ্টির কারণ, মুনি নির্দেশিত প্রতিকারের পথ, বৃদ্ধ বারাঙ্গনার এ কাজে সম্মতি প্রদান, বৃদ্ধ বারাঙ্গনা কন্যার আশ্রমে প্রবেশ, ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে কথোপকথন— এসকলই পুরাণের অনুকূলে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে মেলে। এছাড়া তিনি এখান থেকে আরো গ্রহণ করেছেন আগন্তুকের শরীরী বর্ণনা -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! অদ্য এই আশ্রমে নাতিখর্ব্ব ও নাতিদীর্ঘ এক জটিল ব্রহ্মচারী আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে দেবতা বলিয়া প্রতীতী হয়। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, লোচন কমলের ন্যায় আয়ত স্নিগ্ধ, রূপ সাতিশয় মনোহর, প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার মস্তকে রজ্জু—গ্রথিত সুদীর্ঘ নীল নিম্মর্ল জটাভার ...।"[৬]

বিভাণ্ডকের অনুধাবনে বিলম্ব হয় না যে আগন্তুক কোনো তপস্বী বা দেবতা নন, বরং নারী। কিন্তু তা পুত্রকে না জানিয়ে বরং তাঁদের তিনি ছলনাময়ী রাক্ষস হিসেবে অভিহিত করেন। বিভাণ্ডক ক্ষণিকের জন্য আশ্রম ত্যাগ করলে বারবিলাসিনীগণ মোহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে যান। অঙ্গরাজ্যে বর্ষণ শুরু হয়। লোমপাদের কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শান্তা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো ঋষ্যশৃঙ্গের সেবা করেন। এক বৎসরকাল অতীত হলে শান্তা পুত্রবতী হন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃআজ্ঞায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। পুরাণের কাহিনি এখানে শেষ হলেও বুদ্ধদেব বসুর কাহিনিতে স্বকীয়তার সূত্রপাত ঘটেছে মূলত এখান থেকে। পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গ-বিভাণ্ডক-লোমপাদ-শান্তা কেবল এই চারটি চরিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু নাট্যকার এ নাটকে তরঙ্গিণীকে সৃষ্টি করেছেন নিজ কল্পনায়। পুরাণে বৃদ্ধ বারাঙ্গনা ও তাঁর নিপুণা কন্যার ইঙ্গিত থাকলেও তারা সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠেননি। অথচ বুদ্ধদেব বসুর রচনায় তারাই হয়ে উঠেছেন কাহিনির মূল আকর্ষণ শক্তি। অন্যদিকে, অংশুমান, চন্দ্রকেতু, রাজমন্ত্রী এসকল অপৌরাণিক চরিত্রগুলো তিনি নির্মাণ করেছেন কাহিনিকে ঘন সন্নিবেশিত করার জন্য। এই একটি সরল আখ্যানকে সাহিত্যরসে জারিত করে বুদ্ধদেব বসু দৃশ্যায়নযোগ্য কাব্যময় দেহাবয়বে নাটকে রূপ দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, তার অঙ্গে-অঙ্গে যুক্ত করেছেন মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। চরিত্রগুলোকে করে তুলেছেন জীবন্ত। কাম-প্রেমের চিরন্তন দ্বন্দ্ব বিষয়ে প্রদান করেছেন নিজস্ব দর্শন। এভাবেই তিনি তাঁর এ কাব্যনাটকে পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন।

চার অঙ্কবিশিষ্ট, কোনোরূপ দৃশ্য বিভাজন বর্জিত তুলনামূলক দীর্ঘ কলেবরের কাব্যময় গদ্য ভাষায় রচিত কাব্যনাটক *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*। নাটকটি *দেশ* পত্রিকায় ১৯৬৬ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১১টি চরিত্রের মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তাঁর পিতা বিভাণ্ডক, বারাঙ্গনা তরঙ্গিণী ও তাঁর মাতা লোলাপাঙ্গী, অঙ্গরাজের কন্যা শান্তা, রাজমন্ত্রী ও তাঁর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুত্র চন্দ্রকেতু, রাজপুরোহিত, দুইজন রাজদূত, এবং এক দল গ্রামের মেয়ের কোরাস ও কিছু অপ্রধান চরিত্র সহযোগে নাটকটি নির্মিত হয়েছে। চার অঙ্কের কালিক ব্যবধান কাহিনির কার্যকারণে তাৎপর্যবাহী— প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান একদিনের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের কালিক দূরত্ব এক বছরকাল এবং শেষ দুই অঙ্কের সংঘটন কাল একই দিন।

প্রথম অঙ্কের চমকপ্রদ সূচনা বুদ্ধদেব বসুর বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানকে মনে করিয়ে দেয়। এক দল গাঁয়ের মেয়ের কোরাসের মধ্য দিয়ে মঞ্চের পর্দা উন্মোচিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার ও উদ্যানের কিয়দংশ দৃশ্যমান, তৎসংলগ্ন রাজপথে গ্রামের মেয়েরা কাব্যময় ভাষায় সমস্বরে পেশ করছেন তাঁদের বর্তমান দুর্দশা, জানতে এসেছেন তাঁদের রাজ্যের প্রতিপালকের নিকট এর প্রতিকার। তাঁদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অঙ্গরাজ্যের বর্তমান অভিশপ্ত অবস্থা। নাটকে দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে খরা, প্রখর রৌদ্রের দাহ, আসন্ন দুর্ভিক্ষ, শূন্য নারীর ক্রোড়, শুষ্ক গাভীর বাট, নিষ্ঠুর আকাশ এনং নির্দয় মেঘ সমগ্র অঙ্গরাজ্যের বন্ধ্যত্বকেই প্রকাশ করেছে -

> "গাঁয়ের মেয়েরা।
> আকাশের সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
> মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা;
> শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পরে দিন দীর্ণ, শূন্য—
> বৃষ্টি নেই!
> দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
> তবু তো কিছু ভালো মেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বন্ধু—
> যেহেতু ফ'লে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে,
> এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন।"[৭]

গাঁয়ের মেয়েদের এরূপ সংলাপ ব্যবহারে বুদ্ধদেব বসু টি.এস. এলিয়টের *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল* (*Murder in The Cathedral*, 1935) কাব্যনাটকে ব্যবহৃত সূচনা অংশের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[৮] একই পরম্পরা অনুসরণ করে নাটকের সংকটের দিকে প্রথমেই পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে। গ্রিক বিখ্যাত ট্র্যাজেডিতে একইভাবে কোনো এক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কাহিনি উন্মোচিত হত। উদাহরণস্বরূপ, সফোক্লিসের *রাজা ঈদিপাস* নাটকের কথা স্মরণ করা যায়। *রাজা ঈদিপাস* নাটকে দুর্দশাগ্রস্ত জনপদের বিবরণ সকরুণ ভঙ্গিমায় উঠে এসেছে জনগণের কণ্ঠে। এই একই পরম্পরায় বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের গাঁয়ের মেয়েদের ভূমিকাও মূল্যায়ন করা যায়। কেবল বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার কথাই *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের কোরাস অংশে বর্ণিত হয়েছে তা নয়, প্রথা ও সংস্কারের ধারক ভারতীয় প্রান্তিক গৃহবধূদের নিত্যদিনের সহজ-সরল জীবনাচারের শাশ্বত চিত্রও এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। যৌথ পরিবার চিত্র, সমাজে ব্রাহ্মণের পূজনীয় অবস্থান, মধুমতী গাভী প্রসঙ্গ, ঢেঁকির গম্ভীর পতনধ্বনি, ব্যাঙের ছাতা-শিশিরবিন্দু-এসকলই গ্রাম্যজীবন ও প্রথাগত ভারতীয় নারীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ অংশের 'অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন' —এ পঙক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ড. পুষ্পেন্দুশেখর গিরির মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্ববহ -

> " 'অগ্নি ও জলের মিতালি'কে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছে অ্যাপারটমেন্ট কনট্রাডিকশন। তবুও নাট্যঘটনায় এর একটা অদৃশ্য প্রভাব রয়েছে... অগ্নি আর জল যেন তপোধন ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ আর জল হল গণিকাগণের মধ্যমনি লোলাপাঙ্গী কন্যা তরঙ্গিনী। দু'জনের নব আবিষ্কার।"[৯]

অর্থাৎ পরস্পর দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তির মিলনে সকল প্রকার বন্ধ্যত্ব ঘুচেছে। অন্ন যেরকম বর্ষণ ছাড়া উৎপন্ন হয় না, অগ্নি ছাড়া আহার্য হয়ে ওঠে না, অথচ তারা বৈপরীত্যের প্রতীক, সেরকম নাটকে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও বারাঙ্গনা তরঙ্গিণী বিপরীত শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও বৈপরীত্যের মিলনে যে নতুন প্রাণের জন্ম হয়, নাটকে সেটাই হয়ে উঠেছে সারসত্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাঁয়ের মেয়েদের আর্ত বিলাপের মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ ঘটেছে রাজদূত সুশ্রুত ও মাধবসেনের। প্রথম দূতের দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার অঙ্গরাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলো সম্বন্ধে, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন, পুরাণের আখ্যান ভাগে যার উল্লেখ মাত্রও ছিল না। স্থানিক নাম ও অবস্থানসমূহ মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রহণ করে তিনি কাহিনির বিশ্বস্ততাকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছেন। অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের কারণ যে রাজার পাপের ফল, প্রথম দূতের সংলাপে তা প্রকাশ পেয়েছে। নাটকে পাপ-পুণ্য, কর্ম-কর্মফল, দৈব-ভবিতব্য-সংক্রান্ত দূতদ্বয়ের পারস্পরিক অভিমত আধুনিক দ্বন্দ্বজড়িত মানসিকতার ইঙ্গিতবাহী -

> “২য় দূত। দৈবজ্ঞ? (হেসে উঠে) শোনোনি সেই যবন দেশের কাহিনি? রাজা অগ্নিমাণিক্য দৈবজ্ঞের নির্দেশে আপন ঔরসজাত
>
> তরুণী কন্যা ফেনভঙ্গিনীকে পশুর মতো বলি দিয়েছিলেন।
>
> ১ম দূত। শুনেছি যবন দেশে দেবতারাও ধূর্ত ও হিংসাপরায়ণ। কিন্তু আর্যাবর্তে দেবতারা অসুরকেও বরদান করেন।
>
> ২য় দূত। কিন্তু এমন যদি হয় যে দেবতারা মানুষেরই কপোলকল্পনা?
>
> ১ম দূত। ধিক্ পাপবাক্য!
>
> ২য় দূত। এমন যদি হয় যে ধর্ম নেই, শাস্ত্রসমূহ প্রহেলিকামাত্র, আর অন্ধকারে আমাদের আলো শুধু আলেয়া?
>
> ১ম দূত। তবু কর্ম আছে। দেবতা ও বেদ যদি মিথ্যা হয়, কর্ম তবু সনাতন। আর কর্মফলেরই নামান্তর হ’লা দৈব।”[১০]

এখানে ধ্বনিত হয়েছে প্রাচীন সনাতনী বিশ্বাস। লক্ষণীয় যে, বুদ্ধদেব সুকৌশলে প্রাচ্য পুরাণের সমান্তরালে এ অংশে গ্রিক মিথের অনুষঙ্গ এনেছেন। হোমারের ইলিয়ড থেকে তিনি আগামেমনন-ক্লাইটেমনেস্ট্রা-ইফিজিনিয়া-অরেস্ট্রস আখ্যানের ইঙ্গিতে যবন রাজা অগ্নিমাণিক্য-অক্লমশ্রী-ফেনভঙ্গিনী-অরিষ্ট নামাঙ্কিত করে অভিনবত্বের পরিচয় দেন। কেবল পাশ্চাত্য মিথ নয়, ভারতীয় পুরাণের অন্য অনেক আখ্যানের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় সংলাপের মাধ্যমে। যেমন ইতিহাসে বারাঙ্গনার সুকৃতি, ভরতবংশের আদিমাতা প্রসঙ্গ, সুন্দ-উপসুন্দ আখ্যান প্রভৃতি।

আর্যাবর্তের সনাতনী বিশ্বাসে প্রকৃতি ও জীবন বারংবার একিভূতরূপে কল্পিত হয়েছে। নারীর উর্বরাশক্তি মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির সঙ্গে, বৃষ্টির ও জলের স্পন্দন প্রাণের স্পন্দনের তুলনা হতে দেখা গেছে। পঞ্চভূতের বিশেষত জলের বন্দনা অতিপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। রাজপুরোহিতের সংলাপে নাট্যকার সে চেতনারই প্রকাশ ঘটালেন।

নাটকের এ পর্যায়ে প্রবেশ ঘটে দৃঢ়চেতা, স্পষ্টবাদী ও অধিকার-সচেতন রাজনন্দিনী শান্তার, পুরাণে যার একাধিক পরিচয় বিদ্যমান। কখনো তিনি দশরথপুত্রী এবং লোমপাদের পালিত পুত্রী আবার কখনো দশরথ ও লোমপাদ একই ব্যক্তিরূপে কল্পিত এবং সেখানে শান্তা তাঁর ঔরসজাত কন্যা। শান্তা দৃঢ়তার সঙ্গে রাজমন্ত্রীর সম্মুখে তাঁরই পুত্র অংশুমানের সঙ্গে নিজ প্রণয়ের বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। শান্তা রাজমন্ত্রীকে ক্ষাত্রনারীর স্বয়ম্বরা হবার অধিকারের প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ দৃঢ়চেতা নারীকেই পরবর্তীকালে পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে পতিব্রতা নারীর মতো সংসার করতে দেখা গেছে। বৃহত্তর স্বার্থে এ কি আত্মবলিদান নাকি প্রথাগত নারীর মতো দৈবকে মেনে নেবার পরিচয় বহন করে তা নির্দ্বন্দ্ব নয়।

তরঙ্গিণী যখন মঞ্চে প্রবেশ করেন, সূচনা সংলাপেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির পরিচয় মেলে। রূপবতী ও বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী তরঙ্গিণীর ‘ধর্ম বহুর পরিচর্যা’। এক পুরুষে আসক্তিকে তিনি তাঁর জন্য পাপচিন্তা বলে আখ্যা দান করেছেন। স্বভাবস্বৈরিণী তরঙ্গিণীরই পরবর্তীকালে হার্দ্য প্রেমে উত্তরণ ঘটাবেন নাট্যকার। মা ও গুরু লোলাপাঙ্গীর দর্শিত পথ ও পরামর্শে উজ্জীবিত তরঙ্গিণী ষোলোজন সুন্দরী সখী, ফুল-মধু-সুগন্ধী, মণিমাণিক্য, ঘৃতপক্ক মাংস-পায়সান্ন, দ্রাক্ষা-রতিফল, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুসজ্জিত ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমের উদ্দেশ্যে নৌযাত্রায় বেরিয়ে পড়ার পরিকল্পনায় বিভোর।

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের নির্মাণে নাট্যকার পৌরাণিক আখ্যানের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন। যদিও সংক্ষিপ্ত আখ্যানকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর কল্পনা ও কবিত্ব শক্তির দ্বারা সুবিস্তৃত নাট্যঘটনার নির্মাণ করেছেন। কল্পনা ও কবিত্বের যথাযোগ্য যোজনার ফলেও নাট্যদেহের বহিরঙ্গে কোথায়ও পৌরাণিক আবহের বিচ্যুতি ঘটেনি। পুরাণ ব্যবহারে সাহিত্য সৃজনের এই এক অভিনব পথপ্রদর্শণ করেছেন নাট্যকার।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর্দা উন্মোচিত হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে। ঊষাকালে, ঋষ্যশৃঙ্গ সূর্যপ্রণামরত। আজন্ম তপস্বী যুবক ঋষ্যশৃঙ্গের দিনাতিপাত সুশৃঙ্খল, সংযত। তাঁর সংলাপেই নিত্যদিনের যাপিত জীবনের পরিচয় মেলে। প্রকৃতি যাঁর সখা, পিতা ভিন্ন অন্য কোনো মানব দ্বারা যার আচরণীয় নিয়ন্ত্রিত-প্রভাবিত নয়, সেই ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে এ অংশে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে নারীর, যাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ একেবারেই অবগত ছিলেন না। নাট্যকার পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুষঙ্গে রচিত নেপথ্য সংগীতের মধ্য দিয়ে মঞ্চে তরঙ্গিণীর প্রবেশ ঘটান। এটি আসন্ন ঘটনার ইঙ্গিতবাহী -

> "জাগো, সৃষ্টির আদি শিহরণ,
> জাগো, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম!
> কারো, ব্রহ্মার মতি চঞ্চল,
> আনো, দুর্বার মায়াদ্বন্দ্ব।
> এসো, শম্ভুর গিরিশৃঙ্গে
> বধূ, গৌরীর দেহসৌরভ!
> বাজো, শূন্যের বুকে ওঙ্কার,
> জাগো, বিশ্বের বীজমন্ত্র!"[১১]

সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উৎপত্তি-সংক্রান্ত পুরাণ, শিব-শক্তির পুরাণ, ওঙ্কার ধ্বনির পৌরাণিক মাহাত্ম্য সকলই সুচারুরূপে পরিমিতিবোধ সহযোগে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

মানব মনের সহজাত কৌতূহল যেরূপ অজানা অপরিচিতের প্রতি আগ্রহ জন্ম দেয়, ঋষ্যশৃঙ্গও তাঁর সহজাত সৌন্দর্যবোধে প্রথম দর্শনেই তরঙ্গিণীকে কোনো শাপভ্রষ্ট দেব বা তাপস মনে করেন। আর তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয় সেই সংলাপ যার আবেশে তরঙ্গিণীর চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি হয় -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। ...সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋকছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।"[১২]

বেদজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞ, শুদ্ধ চিত্ত তাপসের পক্ষে এরূপ বিশুদ্ধ রোমান্টিক উচ্চারণ অস্বাভাবিক নয়। চরণগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিতা' কবিতার পঙ্ক্তির সাথে তুলনীয় -

> "কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
> ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
> ...
> 'আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
> ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

(পতিতা, কথা ও কাহিনি)

অথচ নিজ দায়িত্ব সচেতন কুশলী তরঙ্গিণীর চিত্তেও প্রশ্ন জেগেছে। আজন্ম স্বৈরিণী তরঙ্গিণীর প্রতি বহুপুরুষ মোহিত হয়েছে, আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু কেউই এভাবে তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিপাত করেননি, উচ্চারণ করেননি এরকম রোমান্টিক বাণী। তবু কার্য সম্পাদনে তরঙ্গিণী কৌশলী বলেই তিনি কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে কামপাশে আবদ্ধ করেছেন এভাবে-

> "তরঙ্গিণী। তবে আরম্ভ হোক অনুষ্ঠান। জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত। গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ...ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল।"[১৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপর্যুক্ত সংলাপের ছত্রে-ছত্রে উর্বরতা-মিলন ও নবসৃষ্টির বাণী ধ্বনিত। ঋষ্যশৃঙ্গের যে ব্রহ্মচর্য এতকাল জাগ্রত ছিল সুপ্ত হয়েছে তা আর যে কামনা সুপ্ত ছিল তা হয়েছে জাগ্রত। মাল্য-আলিঙ্গন-চুম্বনে তরঙ্গিণী সম্পাদন করলেন তার 'পরিচর্যা ধর্ম', ঋষ্যশৃঙ্গকে কামপাশে আবদ্ধ করলেন। মঞ্চে অতঃপর বিভাণ্ডকের প্রবেশ, যাঁর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ সবিস্ময়ে বর্ণনা করেছেন আগন্তুকের রূপ। *মহাভারত* ও নলিনিকা জাতকের মতো *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের এ বর্ণনাও বহুবর্ণিল কাব্যময় - নলিনিকা জাতকে বারাঙ্গনার রূপের বর্ণনা এরকম -

> "জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিল এক,
> নাতিদীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব, সুগঠিতকায়,
> সুদর্শন, সুবিনীত-মস্তকে তাহার
> বিরাজে ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশের কলাপ।"[১৪]

তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকে এ বর্ণনা এরকম -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায় নন, দেবতার মতো কান্তিমান। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়; তাঁর মস্তকে নীল নির্মল সংহত জটাভার। শঙ্খের মতো গ্রীবা; দুই কর্ণ যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু। নয়ন তাঁর আয়ত ও স্নিগ্ধ; আনন যেন উদ্ভাসিত ঊষা; বার্লাকের মতো আকর্ষণ তাঁর কপোল।"[১৫]

কূটনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে এরূপে সম্মোহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসা তরঙ্গিণীর জন্য দুঃসাধ্য কিছুই নয়। বুদ্ধদেব পুরাণের এ ভাষ্যে যুক্ত করেছেন কবির ভাষ্য, যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর চেতনালোকের পরিবর্তন ঘটে যায়। তাদের সংলাপে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।
> তরঙ্গিণী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।
> ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।
> তরঙ্গিণী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।
> ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।"[১৬]

তপস্বীর আজন্ম সুপ্ত ইন্দ্রিয়লালসা যখন স্বভাবস্বৈরিণী তরঙ্গিণীর সংস্পর্শে জাগ্রত, জাগ্রত আদিম প্রবৃত্তির তাড়না, তখনই সুকুমার শুদ্ধ তপস্বীর সংস্পর্শে এবং তার জ্যোতিদীপ্ত নেত্রপাতে বারাঙ্গনার চিত্তে উদিত হয়েছে রোমান্টিক প্রেমভাব। নাট্যকারের ভাষায়-

> "দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হ'লো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে আকস্মাৎ অভিভূত করলো 'রোমান্টিক প্রেম'—যে—ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে, সেই ভাবেই।"[১৭]

নাটকে এমন শৈল্পিক সংযোজনা পুরাণ প্রয়োগে বুদ্ধদেব বসুর কবি ও শিল্পী সত্তার প্রকাশক। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল পুরাণকে ভিন্নপথে চালনা করে নয়, বরং পুরাণ পথের অন্ত রেখায় নিজ সৃষ্ট রথের সারথী হয়ে উঠলেন তিনি।

ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে বর্ষণমুখর অঙ্গরাজ্যের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকাপাত। তৃতীয় অঙ্কের সূচনা এক বৎসর পরে, তরঙ্গিণীর কক্ষে, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় বিরহী বেশে। তৃতীয় অঙ্ক থেকে পুরাণ প্রশমিত হয়ে গেছে। কবি কল্পনায় চরিত্র-কাহিনি-নাট্যদ্বন্দ্ব-নাট্যক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছে। তবে লক্ষণীয় যে, পৌরাণিক আবহের কোথাও কোনো ছেদ ঘটেনি। এ অঙ্কের প্রথমভাগে দুটি অপৌরাণিক চরিত্র চন্দ্রকেতু ও অংশুমানের বিরহ, অপ্রাপ্তি উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। দুজনেরই বিরহের কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ। অংশুমানের একটি সংলাপ এখানে উল্লেখযোগ্য, "কতকাল তাকে দেখি না। চোখে আমার অনাবৃষ্টি। দুর্ভিক্ষ হৃদয়ে।"[১৮] অঙ্গরাজ্যের অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ ও তার প্রতিকার পুরাণের আখ্যান, আর নাটকের পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ এবং তার ফলাফল প্রতিবিধান নাট্যকারের অভিপ্রায়। এ অংশে লোলাপাঙ্গী চরিত্রের আরেক প্রস্থ বিকাশ

লক্ষ করা যায়। তরঙ্গিণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দর্শনাকাঙ্ক্ষী চন্দ্রকেতুকে তিনি প্রবোধ দেন, আশা তাঁর জাগিয়ে রাখার কুশলী চেষ্টায় রত হন। এ অংশে তরঙ্গিণী ও লোলাপাঙ্গীর কথোপকথন তরঙ্গিণীর রূপান্তরিত সত্তাকে উপস্থাপন করে। লোলাপাঙ্গী তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'তরঙ্গিণী', 'তরণী', 'তরু' বলে। এ নামগুলোর মধ্যে তরঙ্গিণী চরিত্রের রূপান্তর ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। 'তরঙ্গিণী' নামে সে, উচ্ছল উদ্বেল স্বভাবস্বৈরিণী স্বভাবের প্রতীক। 'তরণী' নামে সে পারকর্তা তরী, যে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের আত্ম— আবিষ্কারের সোপানস্বরূপ, অঙ্গরাজ্যের দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের উপায়স্বরূপ। 'তরু' নামে সে বৃক্ষের মতো দৃঢ়, অবিচল, একনিষ্ঠ প্রেয়সী, ঠিক যেন রাধার মতো। একদিকে তরঙ্গিণী সকল প্রকার জাগতিক বিষয়ে বিমুখ, প্রাচ্যের বিরহিণী রাধারাণীর মতো নিরবচ্ছিন্ন বিরহকাতর-ভাবোন্মত্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। অপরদিকে লোলাপাঙ্গী তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তায় মাতৃস্নেহে ও পেশাগত কারণে বারংবার তাঁকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টারত। এ কাজে তাঁর কিছু সংলাপযোজনে বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণের যেমন বেদপাঠ ধর্ম, তেমনি আমাদের ধর্ম পরিচর্যা', 'আমরা যে যার কর্ম নিয়ে সংসারে আসি, কর্ম শেষ হ'লে চ'লে যাই। একের কর্ম অন্যের সাজে না— এই হ'ল চতুর্মুখের অনুশাসন'[১৯] অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মার বিধান। সনাতন শাস্ত্রের কঠোর বিধানের দিকটিতে নাট্যকার ইঙ্গিত করছেন, যা গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩৫তম শ্লোকে পাওয়া যায় এভাবে -

> "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"[২০]

শ্লোক অনুসারে নিজ-নিজ কর্ম সম্পাদন করাই ধর্মের বিধান, সে কাজ যেমনই হোক না কেন, নিষ্ঠাভরে তার সম্পাদনই ধর্ম। যেমনটি লোলাপাঙ্গীর সংলাপে ধ্বনিত হয়েছে।

চন্দ্রকেতুকে তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের মাপকাঠিতে পরখ করে দেখতে চান। তাঁদের কথোপকথনে স্পষ্ট হয় চন্দ্রকেতু তরঙ্গিণীর রূপমুগ্ধ, তাঁর দৈহিক সংস্পর্শের প্রত্যাশী। তরঙ্গিণী অনুসন্ধান করেন তাঁর সেই ভিন্ন রূপ যা ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর প্রথম দর্শনে আবিষ্কার করেছিলেন -

> "তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু, সত্যি বলো—আমি রূপবতী? দ্যাখে —নিবিড় চোখে তাকিয়ে দ্যাখো আমার দিকে। আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো? আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিল—আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি সেই মুখ। তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পারো?"[২১]

পৃথিবীর প্রথম নারীর প্রতি প্রথম পুরুষের হৃদয়তাপ থেকে তরঙ্গিণীর সেই হার্দ্য প্রেমের সূচনা। এখানে বুদ্ধদেব বসু উল্লিখিত W. B. Yeats (1865-1939) এর কবিতার প্রভাব লক্ষণীয় -

> 'I'm looking for the face I had
> Before the world was made'.
>
> (A Woman Young and Old: 11)

সৃষ্টির সূচনালগ্নে নর-নারীর দৃষ্টিতে বিরাজমান মুগ্ধতার অনুসন্ধানে রয়েছেন কবি। এ বাণীরূপ তরঙ্গিণীর চেতনায় ক্রিয়াশীল।

চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম সংলাপে তাঁর অন্তর্লোকের সংক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বপীড়িত অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবনের প্রথম নারী তরঙ্গিণীকে দেখে যে জৈবিক চেতনার উদ্ভব ঘটে তাঁর চিত্তে, তা আর নির্বাপিত হয়নি। রাজগৃহ, রাজকন্যা শান্তা তাই তাঁর কাছে বিস্বাদ। কাম-আকাঙ্ক্ষার কণ্টকপাশে ঋষ্যশৃঙ্গের শান্ত সমাহিত তপস্বী হৃদয় বিলুপ্ত। আনমনা চিত্তে জড়বস্তুর মতো ঋষ্যশৃঙ্গ কেবল তার কর্ম সম্পাদন করে গেছেন, আর সম্মোহিত হয়ে থেকেছেন সেই প্রথমার ভাবনায়। বলা বাহুল্য, এসবের কিছুই পৌরাণিক নয়, কবিকল্পনা। এ অংশে শান্তা-ঋষ্যশৃঙ্গের কথোপকথনে তাঁদের মধ্যকার সূক্ষ্ম মানসিক দূরত্ব, রাজ-কর্তব্যের খাতিরে কর্ম, প্রীতিহীন বন্ধনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। পুরাণকে পশ্চাতে রেখে এরকম মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কনে বুদ্ধদেব সিদ্ধহস্ত।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একবছর কাল অঙ্গরাজ্যে অবস্থান করে তপস্বী অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে যে রূপান্তর ঘটেছে, তাঁর মধ্যে যে কূটনৈতিক রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্ম হয়েছে, তার কিছু নমুনা পাওয়া যায় অংশুমান ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যবিনিময়ে। লোলাপাঙ্গী-অংশুমানের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণী সম্পর্কে অবগত হলে মঞ্চে পুনরায় পূর্ব বেশভূষায় তরঙ্গিণীর প্রবেশ ঘটে। তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের নয়নে পূর্বের সেই বিশুদ্ধ রোমান্টিক মুগ্ধতা দেখতে চান, সেই বাণী শুনতে চান, কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। সেই তপস্বীর পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপের মতো সত্য এই যে, 'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছি।'[২২]

যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গ সর্বসম্মুখে স্বীকার করেন তরঙ্গিণী নাম্নী এ বারাঙ্গনারই জন্যে তাঁর প্রতীক্ষা। সেই তাঁর জাগরণের কারণ, কামনা ও অতৃপ্তির কারণ। বর্তমানে তাঁর 'হৃদয়ের বাসনা', 'শোণিতের হোমানল', 'তৃষ্ণার্তের জল'। তরঙ্গিণীর ব্যথিত হৃদয় বলে ওঠে-

> "ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার চোখের আলোয় আবার আমি নিজেকে দেখতে চাই। চাই রোমাঞ্চিত হ'তে, আনন্দিত হ'তে। আমাকে তুমি করুণা করো।"[২৩]

অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গের চেতনার জাগরণ ঘটলো। তিনি সমস্ত উপলব্ধি করলেন, তাঁর মোহ প্রশমিত হল এবং তিনি কর্তব্য স্থির করলেন। এ রূপান্তর উপস্থাপনে বুদ্ধদেব পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নির্দেশনা অংশে লক্ষ করা যাবে –

> "তরঙ্গিণীর শেষ কথাগুলি শুনতে-শুনতে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে ফুটলো প্রথমে সংশয়, তারপর বেদনা, অবশেষে শান্তি।"[২৪]

এখানে সংশয় ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বন্দ্বকে নির্দেশ করেছে অতঃপর বেদনা তাঁর উপলব্ধির পরিচায়ক এবং শান্তি এসেছে, মোহ প্রশমিত চিত্তে কর্তব্য স্থিরকরণে। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ করে অংশুমানের সঙ্গে সুখী হওয়ার বরদান করলেন। কৌমার্য প্রত্যর্পণের বিষয়টি পৌরাণিক আখ্যানসমূহে বহুল প্রচলিত একটি ধারণা। দেব, ঋষি, তপস্বীর দ্বারা এ ঘটনা প্রায়ই ঘটে এসেছে পুরাণে। যেমন কুন্তীকে সূর্যদেব, সত্যবতীকে পরাশর কৌমার্য প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এ নাটকের শেষে লোলাপাঙ্গীকে চন্দ্রকেতুর আশ্রয়ে রেখে ঋষ্যশৃঙ্গে রাজগৃহ থেকে সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার উদ্যোগ নেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, তরঙ্গিণীর সেই পূর্বরূপ তাঁর চোখে আর ফিরবে না কারণ তাঁর সেই পূর্বদৃষ্টি লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তরঙ্গিণীকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে নিজ পিতা বিভাণ্ডকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে অজানার পথে পা বাড়ালেন। যেখানে তাঁর আর পূর্বের বিধিবদ্ধ ধর্মাচারের প্রয়োজন পড়বে না। শিষ্য কিংবা গুরু কেউই সঙ্গী হবে না। ঋষ্যশৃঙ্গ আত্ম-আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হলেন। নাট্যকারের ভাষায়-

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। সহস্র নয় একজন। আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিল। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে। সে-ই আমার বন্ধন, সে-ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব।"[২৫]

ঋষ্যশৃঙ্গের কথার এই প্রথম জাগরণ মূলত তাঁর প্রবৃত্তির জাগরণ এবং দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়া মূলত তাঁর মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার প্রতীক। তরঙ্গিণীই তাঁকে কামপাশে আবদ্ধ করে, আবার তরঙ্গিণীই তাঁর মধ্যে উপলব্ধির জাগরণ ঘটিয়ে তাঁকে মুক্তি দেন। এভাবেই বুদ্ধদেব বসু পুরাণের এক সাধারণ ঘটনার ভেতর অসাধারণত্বের বীজ রোপিত করে তাকে বিকশিত করলেন প্রাতিস্বিকতায়।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যের ভাষিক উৎসস্রোত রবীন্দ্রনাথ থেকে আগত। পরবর্তীকালে এই ভাষা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞানে, অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা দক্ষতায় জারিত হয়ে এক নবতর উৎকর্ষিত রূপ লাভ করে। তাঁর ব্যবহৃত কাব্যনাটকের পাত্র-পাত্রীর ভাষা কৃত্রিম হলেও তা কৃত্রিমতার অনুভূতি জাগায় না। বাস্তবিক নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাষা থেকে দূরবর্তী হয়েও বিষয়ের গভীরতা ও প্রয়োগ কৌশলের নৈপুণ্যে তা যথোপযুক্ত। প্রসঙ্গত কমলেশ চট্টোপাধ্যায়কৃত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাটকের ভাষা সংক্রান্ত বিশ্লেষণটি স্মরণ করা যায় -

> "নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ এবং অন্যান্য চরিত্রের আলাপের ভাষাও বুদ্ধদেব প্রাচীন ঐতিহ্যের ভূমি থেকেই গ্রহণ করেছেন। নাটকের প্রধান সব চরিত্র যথা, ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিনী, শান্তা প্রায় সকলেই, এমন অলৌকিক ভাষায় কথা বলেন—যে ধরণের বাক্য ব্যবহার এ যুগের কোনো ঋষি, রাজকুমারী বা বারাঙ্গনা করতে পারে না, অথচ সেই অপ্রাকৃত সংলাপকে আমরা মেনে নিই, কারণ বুদ্ধদেব ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিবেশকে তাঁর নাট্যকাহিনীর রূপাবয়বের মধ্যে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।"[২৬]

তাঁর নাটকের অন্যতম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাঁর ভাষা প্রয়োগের প্রাতিস্বিকতায়। নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাটকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির উপযোগী তৎসম শব্দবহুল ভাষার সাবলীল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ভাষার ওজস্বী রূপের সঙ্গে অলংকার যোজনায় সংলাপ হয়ে উঠেছে গুরুগম্ভীর এবং পৌরাণিক আবহের অনুকূল।

পুরাণ প্রয়োগে নিষ্ঠাবান থেকেও নাট্যকার বহুবিধ শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাটকে। এই নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের মানবিক উত্থান-পতন সৃজনে, অপৌরাণিক চরিত্র নির্মাণে, নাট্যিক অভিপ্রায় বাস্তবায়নে বুদ্ধদেব বসু অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকের স্তরে-স্তরে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও টানাপোড়েন, গূঢ় দার্শনিকতা, শাশ্বত উপলব্ধির বাণীরূপ। প্রসঙ্গত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরির অভিমত স্মরণযোগ্য -

> "বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যগুলিতে ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গে, কাহিনীর অন্তরালে প্রসারিত শাশ্বত মানবাভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিক অনুভব ও স্ব-কালের জীবনজটিলতাকে যুক্ত ক'রে অমেয় রহস্য ও অনন্ত ইঙ্গিতে গূঢ় করে তুলেছেন।"[২৭]

কাম ও প্রেম চেতনাকে কেন্দ্র করে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও স্বভাবস্বৈরিণী তরঙ্গিণীর মানবিক উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-মীমাংসার আখ্যান হয়ে উঠেছে বহুল প্রচলিত এ উর্বরতার পুরাণকাহিনি। পুরাণের ছায়াতলে নির্মিত হয়েছে নবতর কাহিনি, নবতর দর্শন, নবতর ভাবনা।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলি, সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), ষোড়শ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৪৫-৫৬৭

২. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, বুদ্ধদেব বসু-র তপস্বী ও তরঙ্গিণী নবমূল্যায়ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩ পৃ. ১৩

৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'কবিতা ও আমার জীবন: আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সমগ্র চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৬৩৫

৪. সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯১৮, পৃ. ৩৫৪

৫. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত), বসুমতী কার্যালয়, কলকাতা, ১৯০০, পৃ. ২২৫

৬. প্রাগুক্ত

৭. বসু, বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক সমগ্র ১, দময়ন্তী বসু সিং (সম্পাদিত), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৭

৮. Eliot, T.S., Murder in The Cathedral, Faber and Faber, London, 1955, p.1

৯. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৪. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৫. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

২০. ঘোষ, শ্রীজগদীশ চন্দ্র, শ্রীগীতা, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭৬

২১. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৬. চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ, বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার: বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিনীর ভূমিকা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৪৯

২৭. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 536 - 542
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘রক্তকরবী’-র মঞ্চভাবনায় ও আলোক প্রক্ষেপণে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন

ড. সাধনকুমার সাহা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : sksahaugb@gmail.com
ও
প্রসেনজিৎ ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : prosenjitghosh46470@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Raktakarabi, Stage Design, Light Design, Khaled Chowdhury, Tapas Sen, Indian Form.

Abstract
In the second half of the 20th century, Khaled Chowdhury and Tapas Sen emerged as stage and light designers in Bengali theatre. It is when the drama is presented on stage that its true worth is found. Khaled Chowdhury and Tapas Sen showed how to do good work at a low cost through the use of country language in the play 'Raktakarabi'. Under the direction of Shambhu Mitra, Khaled Chowdhury and Tapas Sen staged and lighted the play 'Raktakarabi'. The art of staging and lighting was established in Bengali theater through the theatrical presentation of the play 'Raktakarabi'. We will discuss how Khaled Chowdhury and Tapas Sen brought about the overall change in the artistic consciousness of Bengali theater through the play 'Raktakarabi'. What kind of change did Khaled Chowdhury make in the stage concept of 'Raktakarabi' drama by using local materials? To what extent was the staging of Khaled Chowdhury's 'Raktakarabi' drama the change of stage thinking in Bengali theatre? How much role did lightning play in Tapas Sen's 'Raktakarabi' play in the change of lighting concept in Bengali theatre?

Discussion
বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ‘বহুরূপী’ তথা গ্রুপ থিয়েটারের সুবাদে বাংলা থিয়েটারের নেপথ্য কারিগর হিসেবে মঞ্চচিত্রণশিল্পী খালেদ চৌধুরী ও আলোকশিল্পী তাপস সেনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে মঞ্চচিত্রণ শিল্পীরূপে খালেদ চৌধুরী তাপস সেনের আবির্ভাব ঘটে চারের দশকের মাঝামাঝি গণনাট্যের সূচনালগ্নের কিছুসময় পরে। অন্যদিকে খালেদ

চৌধুরীর অল্প কয়েক বছর পর (বলা যেতে পারে প্রায় সমসাময়িক কালে চারের দশকের প্রায় শেষার্ধে) বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আলোর জাদুকর তাপস সেনের আবির্ভাব ঘটে। দু'জনেই মঞ্চের নেপথ্য শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ওই সময়পর্বে বাংলা থিয়েটারে মঞ্চবিন্যাস ও আলোর প্রক্ষেপণে আমূল পরিবর্তন ঘটান নিজস্ব শিল্পদক্ষতায়। 'নবান্ন'-র প্রযোজনার পরবর্তীকালে বাংলা মঞ্চে আলো, সংগীত, শব্দ, মঞ্চস্থাপত্যেকে নানান স্তর ভেদে ব্যবহার বেড়ে যায়। আর সে সময় বাংলা থিয়েটারে মঞ্চ ও আলোর ব্যবহার খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেনের হাত ধরে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 'রক্তকরবী' ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের অনুরোধে এই নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন। স্বল্প খরচে দেশজ জিনিসপত্র ব্যবহারের মধ্যদিয়ে রক্তকরবী নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত করেন খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন।

মানুষের লোভ মানুষকে সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা থেকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করে যন্ত্রশক্তিই সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। আর এই অসীম শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কীরূপ ধারণ করেছে রবীন্দ্রনাথ তা তুলে ধরেছেন 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৩০ সনে, শিলং এর শৈলবাসের সময় (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে) *রক্তকরবী* নাটকটি রচনা করেন। যা ১৩৩১ সনে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৩ অর্থাৎ ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে বই আকরে প্রকাশিত হয়। নাটকটির প্রথম নামকরণ হয়েছিল *যক্ষপুরী*। রক্তকরবী নাটকের নাম তিন বার পরিবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম থেকে তৃতীয় খসড়ায় *যক্ষপুরী,* চতুর্থ থেকে সপ্তম খসড়ায় *নন্দিনী,* অষ্টম খসড়া থেকে রাখেন *রক্তকরবী*। আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু *রক্তকরবী*-র মঞ্চভাবনায় ও আলোকসম্পাতে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন, তাই *রক্তকরবী* নাটকের আলোচনায় না গিয়ে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন *রক্তকরবী*-র মঞ্চভাবনায় ও আলোকসম্পাতে তাঁদের প্রতিভার যে উন্মেষ ঘটেছিল তা নিয়ে আলোচনা করবো।

।। এক।।

রক্তকরবী বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক চর্চিত মঞ্চ প্রযোজনা। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে *রক্তকরবী* মঞ্চস্থ করেননি। তাঁর ধারণা ছিল *রক্তকরবী* নাটক পড়ার জন্য, অভিনয় করার জন্য নয়। যদিও তিনি রক্তকরবী মূলত অভিনয়ের জন্যই লিখেছিলেন। অভিনেতা এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি *রক্তকরবী* প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষমেশ করে উঠতে পারেননি। *রক্তকরবী* প্রকাশের আগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই শিশিরকুমার ভাদুড়িকে নাটকটি পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শিশির ভাদুড়ির প্রতিভার উপর পূর্ণ আস্থা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়িও *রক্তকরবী* মঞ্চয়ন করতে পারেননি। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্র শম্ভু মিত্র *রক্তকরবী* প্রযোজনা করতে চাইলে তিনি বাধাও দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে *রক্তকরবী* নাটকের একটিমাত্র অভিনয়ের কথা আমরা জানতে পারি, যা 'দি টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ'-এর উদ্যোগে কলকাতার নাট্যনিকেতনে ১৯৩৪ সালের ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১] এরপর ১৯৪৭ সালে *রক্তকরবী* প্রযোজনা করলেন দেবব্রত বিশ্বাস। যাঁকে আমরা চিনি রবীন্দ্রসংগীতের 'ব্রাত্যজন' জর্জ বিশ্বাস রূপে। সে সময় দেবব্রত বিশ্বাসের এই নাটকে রাজার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র। ১৯৫৩ সালে *রক্তকরবী* নাটক পরিচালনা করলেন 'সন্ধ্যানীড়' দলের অশোক সেন। সম্ভবত বলা হয় এটিই হল *রক্তকরবী* নাটকের প্রথম সৌখিন মঞ্চায়ন। অশোক সেন পরিচালিত *রক্তকরবী*-র মঞ্চায়ন সাফল্য পায়নি। শম্ভু মিত্র ও খালেদ চৌধুরী আই পি টি এ ছেড়ে বেরিয়ে বহুরূপীতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে বহুরূপীতে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় *রক্তকরবী* মঞ্চস্থ হয় এবং বলা যেতে পারে এটি *রক্তকরবী* নাটকের প্রথম স্মরণীয় মঞ্চায়ন, সম্ভবত শ্রেষ্ঠতমও। ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় যখন *রক্তকরবী* সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে বাংলার থিয়েটারে এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয়। *রক্তকরবী* নাটক পরিচালনা শম্ভু মিত্র করলেও খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন দু'জন শিল্পী *রক্তকরবী* মঞ্চায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন — মঞ্চভাবনা, সংগীত ও পোশাক পরিকল্পনা করেন খালেদ চৌধুরী ও আলো করেছেন তাপস সেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

।। দুই ।।

বাংলা থিয়েটারের নেপথ্যের কারিগর হলেন খালেদ চৌধুরী। খালেদ চৌধুরী মঞ্চ পরিকল্পনার সাথে তিনি নাটকে সংগীত, পোশাক পরিকল্পনাও করেছেন। ১৯১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর চেপরা গ্রামের কাছে দাসগ্রামে মামার বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চেপরা ছিল খালেদ চৌধুরীর পৈতৃক ভিটে। ছোটোবেলা থেকেই তিনি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দিতেন খালেদ চৌধুরী। তাঁর মামার বাড়ি ছিল নদী, পাহাড়ঘেরা, চারিদিকে জল ও বড়ো বড়ো প্রান্তর ঘেরা। বিদ্যালয়ে পড়াকলীন তিনি চাষির নৌকা পূজার সাথে পরিচিত হন। স্কুল থেকে পালিয়ে তিনি সেই পূজা দেখতে যেতেন। তিনি ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। সে সময় তাঁদের গ্রামের জনপ্রিয় পালা মনসামঙ্গল ও পদ্মাপুরাণ প্রবলভাবে খালেদ চৌধুরীকে আকর্ষণ করেছিল। রাত্রে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে লুকিয়ে পদ্মাপুরাণ দেখতে যেতেন। খালেদ চৌধুরীর বাড়ির পাশের নদী বর্ষার জলে যখন নদী পূর্ন থাকতো তখন বাইচ ও মেয়েদের ধামাইল নাচ হত। তাঁর দিদিমাও গান ও ভালো ধামাইল নাচ করতে পারতেন। গানের পরিবেশ পেতেন তিনি মূলত মামার বাড়িতেই। আর এমন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার কারণে তাঁর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই এক শিল্পী সত্তা খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯৪৪ সালে মাত্র চৌষট্টি টাকার নিয়ে খালেদ চৌধুরী কলকাতায় যান। সেখানে তিনি গণনাট্য আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। বাংলা থিয়েটার যখন গণনাট্য আন্দোলের হাত ধরে নতুন অভিমুখে পরিবর্তন ঘটছে ঠিক তখনই থিয়েটারের নেপথ্য কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন মঞ্চচিত্রণ শিল্পী খালেদ চৌধুরী। আর এখানেই শম্ভু মিত্রের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্র যখন *রক্তকরবী* নাটকের মঞ্চায়ন করবেন ঠিক করেন তখন খালেদ চৌধুরীর কথা মনে পড়েন-

> "একদিন শম্ভু মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পয়সার দরকার নেই'। উত্তর দিলেন, 'আছে'। শম্ভু বাবু বললেন, 'তাহলে নাটক করা যাক'।... শম্ভুবাবুর প্রশ্ন — 'রক্তকরবী পড়েছ'? মনে পড়ে গেলো ১৯৪৯-এর কথা, খালেদ চৌধুরী জানালেন পড়েছেন। তবু শম্ভু মিত্র আর একবার সকলে মিলে পড়ার আয়োজন করলেন।"[২]

এরপর সকলে মিলে *রক্তকরবী* পড়লেন বেশ কয়েকদিন ধরে। সবার ভালো লাগার ফলে ঠিক হয় শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় *রক্তকরবী* মঞ্চায়ন হবে। *রক্তকরবী* নাটক খালেদ চৌধুরীর প্রথম মঞ্চ পরিকল্পনা। মঞ্চ পরিকল্পনার সাথে তিনি *রক্তকরবী* নাটকে আবহ সংগীত ও পোশাক পরিকল্পনা করেন যা তার কাছে একেবারে নতুন ছিল। খালেদ চৌধুরী প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে নতুন ভাবে নতুন রূপে সাজালেন *রক্তকরবী*-র মঞ্চ। *রক্তকরবী* নাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলা ইতিহাসে *রক্তকরবী*-র মঞ্চ ভাবনা এক নতুন পথে অর্থাৎ বাংলা থিয়েটারের মঞ্চ ভাবনাকে এক নতুন দিকে পথ নির্দেশ করলেন। খালেদ চৌধুরী অনেকটা স্বাধীন-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। শম্ভু মিত্র পরিচালক হলেও বাকি শিল্পীদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে খালেদ চৌধুরী বলেছেন -

> "আমি যা যা করেছি তার পিছনে আমার কোন পূর্বশিক্ষণ ছিল না, কোন বোঝাপড়াও ছিল না শম্ভু মিত্র প্ররোচিত করেছেন আমাকে। আমি তার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। কোনো জায়গায় পেরেছি। কোনো জায়গায় পারিনি। কতটা পেরেছি, তাও আমি বলতে পারব না। কতটা পারিনি, তাও না। কিন্তু মনে হয়েছে, এই করা দরকার। এবং হাতের কাছে যা মালমশলা ছিল, তাই নিয়ে সেট করেছি। শম্ভু মিত্রের সংস্পর্শে না এলে তা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। এভাবেই আমার নাটকের প্রথম কাজকর্ম।"[৩]

আর এই স্বতন্ত্রতা খালেদ চৌধুরীর নিজস্বতাকে প্রকাশ করতে সহায়তা করেছে।

খালেদ চৌধুরী *রক্তকরবী* নাটকের আবহসংগীত করেছিলেন শুধুমাত্র শম্ভু মিত্রের কথা রাখার জন্য। এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন —

> "শম্ভু মিত্র আমাকে প্ররোচিত করতে লাগলেন যাতে নতুন করে চিন্তা করা যায়। অর্থাৎ, বাঁধাধরা ছকে চিন্তা না করে অন্যভাবে করা যায়।"[৪]

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সে সময় বহুরূপী নাট্যদলের নিজস্ব কোনো টেপ রেকর্ডার ছিল না —

> "তখন 'বহুরূপী'তে টেপরেকর্ডার ছিলই না। টেপরেকর্ডার আমাদের কাছে বিস্ময় তখন অবধি। ১৯৫৪–তে সেটা ভাবাই যায়নি। আর দলের যা অবস্থা ছিল — মানে, আর্থিক অবস্থা।"[৫]

স্বল্প খরচে তাদের সুন্দরভাবে মঞ্চে উপস্থাপন করতে হবে সংগীত হোক বা মঞ্চ সাজানো বা পোশাক পরিকল্পনা সবকিছুই খুব কম খরচে করতে হবে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যখন কলকারখানার কথা আসে তখন খালেদ চৌধুরী পুরনো লোহার দোকান থেকে টুকরো টুকরো লোহা জোগাড় করলেন এবং নানা রকম দৃশ্য ও সারঞ্জম জোগাড় করে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন খালেদ চৌধুরী। এইভাবে সংগীত করা যায় বা মঞ্চপরিকল্পনা করা যায় তা খালেদ চৌধুরী প্রথম বাংলা থিয়েটারে দেখিয়েছিলেন। খালেদ চৌধুরী লিখেছেন -

> "দোকানটা ছিল রিচি রোড আর হাজরা রোডের মোড়ে। ওইখানে পুরনো লোহার দোকান। অনেকগুলো দোকান ছিল। টিউনিং ফর্ক একটা নিয়ে ওইখান থেকে একটা সুর বার করে, মানে, একটা নোট পেয়ে গেলাম। তারপর তার সম্পর্কসূত্রে, যা যা নোটের দরকার আর কী, বা, যা পাচ্ছি, সেরকম বেশ কিছু টুকরো-টাকরা নিয়ে এলাম। নানা আকৃতির, নানা জাতের। সেইগুলো হলো আমার প্রথম কারখানা তৈরীর ব্যাপার। কারখানার সঙ্গীত আর কী। তার সঙ্গে যেটা থাকল সেটা বাঁশি।"[৬]

মঞ্চস্থাপত্যগুলিতে তিনি মূলত দুটি রং ব্যবহার করেছেন শ্বেত পাথর ও কালো পাথরের আদলে প্রথম দুটি অভিনয়ে *রক্তকরবী* নাটকে খালেদ চৌধুরী গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যবহার করেছিলেন। *রক্তকরবী* নাটকের জন্য খালেদ চৌধুরী স্টেজ পেলেন ৩০ ফুটের মতো। এই ৩০ ফুটের স্টেজের মধ্যে তাকে মঞ্চ নানা রকম সাজসজ্জা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতে গিয়ে লিখেছেন -

> "তিরিশ ফুট ওপেনিং। পাচ্ছি কিন্তু আটাশ ফুট ওপেনিং। আর আমি আসলে চল্লিশ ফুটের ডিজাইন করে ফেলেছিলাম। ওই বোধটা ছিল না। যাইহোক, ওটা কাজে লাগেনি। কাটছাঁট দিয়ে যা থাকলো, সেটাতেই রক্তকরবী শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল। সেই রক্তকরবী নানা জায়গায় হয়েছে। শেষ অবধি যা হয়েছে ওটার উপরেই অল্পবিস্তার পরিবর্তন করে। যেমন, রাজার ঘরের দরজার সামনে নকশা পরবর্তীকালে পালটে গেল। দরজা খোলার কৌশল বদলে গেল। সামনের সিঁড়ি দুপাশে বাড়ানো হল, নন্দিনী'র বসার সুবিধার জন্য। ধ্বজার নীচে একটা মূর্তি বসানো হল, অনেকটা অ্যাটলাসের মতো। মকরমুখের স্থাপত্য - অলংকরণ বদলানো হল। সর্বোপরি, রাজার ঘরের দরজার তিন দিকে বাংলার কুঁড়েঘরের আদলে নকশা করা হল। তার মাঝখানে, উপরে, একটা উড়ন্ত বাজপাখি রিলিফ।এবং সেই অনুপাতে ডানদিকের চত্বর এবং তার থামগুলো উচ্চতার হেরফরে করা হল।"[৭]

রক্তকরবী মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে খালেদ চৌধুরী নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'বহুরূপী' তখন নতুন দল, তার উপর *রক্তকরবী*-র মতো নাটক মঞ্চায়ন করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে স্বল্প খরচায় অর্থাৎ কম খরচে মঞ্চ নির্মাণ করতে হবে তার জন্য মানিয়ে নিয়ে তৈরি জিনিসকে খাপ খাইয়ে বা পুরনো জিনিস সংগ্রহ করে মঞ্চ তৈরি করলেন। নাট্যকার, পরিচালক শম্ভু মিত্র সব সময় খালেদ চৌধুরীকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাজার ঘর বানানোর জন্য কার্ড ব্যবহার করলেন। ঠিক করলে যে ঘরের পাশ দিয়ে সর্দার পাড়া থাকবে। বড় বড় কাগজ কেটে মঞ্চের ডিজাইন করলেন — এভাবেই *রক্তকরবী*-র মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। খালেদ চৌধুরী দায়িত্ব পান *রক্তকরবী*-র পোশাক পরিকল্পনার। নাটকের সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ নাটকের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক ঠিক করেন খালেদ চৌধুরী। *রক্তকরবী*-র পোশাক পরিকল্পনা সম্পর্কে খালেদ চৌধুরী বলেছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 536 -542
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাংলাতে সর্দার বললেই বেশ গোলমাল হয়। এবং দেখেছি অনেক বিখ্যাত লোক সেই গোলমালে পড়েছেন। আমাদের 'সর্দার-এর পোশাকে যখন তাঁরা দেখলেন যে, শেরওয়ানি রয়েছে, চুড়িদার রয়েছে, কেউ কেউ মেনে নিতে পারলেন না। শেরওয়ানি তখন আমাদের সরকারি পোশাক হয়ে গেছে। সরকারি পোশাকটাকে যে আমরা একেবারে এড়িয়ে যাচ্ছি, তা নয়, কিন্তু ওটাকেই যে দেখাচ্ছি, এমনও নয়। আমরা এটাকে যেমন ফেলছি না, তেমনি বিশেষ কিছু বোঝাতেও চাইছে। কেউ বললেন, 'তোমরা তো একেবারে জহরলাল নেহরুকে দেখিয়ে দিয়েছ।' আমরা জহরলাল নেহেরুকে যে একটু দেখাতে চাইছি না, ঠিক এমন কথা বলবো না জোর দিয়ে, আবার যে দেখাতে চাইছি, একথাও বলছি না। অর্থাৎ আমাদের, বরং বলা যেতে পারে যে, চোরাস্রোতে ব্যাপারটা ছিল। সে জহরলাল নেহেরুর না হয়ে ভারতীয় পটভূমিকায় যদি একজন প্রধানমন্ত্রী হত তাহলে ওইরকম পোশাক হত।"[৮]

রক্তকরবী নাটকে আমরা দেখতে পাই আসলে রাজার বিরুদ্ধে অর্থাৎ শক্তির বিরুদ্ধে নন্দিনীর লড়াই।

।। তিন ।।

খালেদ চৌধুরীর জন্মের পাঁচ বছর পর তাপস জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আলোর কারিগর তাপস সেন (১৯২৪–২০০৬) ধুবড়ি জেলার ছাতিয়ানতলাতে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে তাপস সেন 'ভুশণ্ডীর মাঠ' নাটকে আলোর খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। এরপর স্কুল জীবন সমাপ্ত করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সের জন্য পলিটেকনিকে ভর্তি হন। পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর মনোযোগ কোনোদিনই ছিল না। তিনি সুযোগ পেলেই দিল্লির মঞ্চে গিয়ে নাটক দেখতেন এবং নাটকের আলো সবসময় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। শিক্ষক প্রতাপ সেন ও সুশীল রায়চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় আলোর প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি 'রাজপথ' নাটকের আলো করেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আশিস গোস্বামী লিখেছেন -

> "পনেরো বছর বয়সেই 'রাজপথ' নাটকে আলোর কাজ করলেন তালকোটরা ময়দানে। জলভরতি কলসিতে বৈদ্যুতিক ধাতুর পাত ঢুকিয়ে ওয়াটার ডিমারের কাজ করেছিলেন। 'পি.ডাবলু.ডি' নাটকে নিচের থেকে আলো করবেন বলে, বন্ধুদের সাহায্যে এক বাড়ির কাঠের গেট খুলে আনিয়াছিলেন স্টেজের মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে একটা ফ্লাড-লাইট বসিয়ে ওপরে বসিয়ে দিলেন সেই গেট।"[৯]

বিদেশি থিয়েটারে যেখানে একাধিক আধুনিক আলোর যন্ত্রপাতি ছিল সেখানে বাংলা থিয়েটারে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব লক্ষ্য করা যেত। প্রয়োজনায় অর্থ কম থাকায় তার প্রভাব মঞ্চের ওপর পড়ত। কিন্তু বাংলা মঞ্চ তাপস সেনের মতো প্রতিভাবান আলোক শিল্পী পেয়েছে। দেশি সরঞ্জাম দিয়ে মাথা খাটিয়ে তিনি আধুনিক আলোর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতেন। তাপস সেন বাংলা মঞ্চে আলোর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। পন্ডিত রবিশংকর 'নাট্যরঙ্গ' পত্রিকায় আলোক শিল্পী তাপস সেন সম্পর্কে লিখেছেন –

> "ওর সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে সেই সময় তেমন কোন আধুনিক আলোর যন্ত্রপাতি না থাকা সত্ত্বেও মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত সব ঘটাত।"[৫১]

তিনি প্রথম বহুরূপী প্রযোজিত 'পথিক' নাটকে আলো করেন। এই নাটকের মঞ্চায়নে তিনি ইঁদুরকল আলো ব্যবহার করেন। ছোটো কাঠের বাক্সে বাল্ব লাগিয়ে তিনি ইঁদুরকল নামক আলোর যন্ত্র তৈরি করেন। এই আলোর যন্ত্র দিয়ে তিনি মঞ্চে গাড়ির হেডলাইটের আলো ব্যবহার করেন। প্রথম কাজ 'পথিক' হলেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে 'রক্তকরবী'-র মধ্যে দিয়ে। তাপস সেন তার ওভারটিন দুধের বালতি ইঁদুর কল পিকরি মিকরি ইত্যাদি দিয়ে মঞ্চে আলোর জগতে বাজিমাত ঘটেছিলেন তার উদ্ভাবনী শক্তির কারণেই তিনি বাংলা মঞ্চে আলোর জাদুকর।

১৯৫৪ সালে বহুরূপী প্রযোজিত শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়। আর এই নাটকে আলো করেন আলোক শিল্পী তাপস সেন। 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়নে তাপস সেন যে আলোছায়ার দৃশ্য তৈরি করেন তার নাম রেখেছিলেন 'ইকড়ি-মিকড়ি'। এই আলোর নির্মাণে বিদেশে যেখানে কয়েক হাজার টাকা লাগতো, সেখানে তিনি সামান্য খরচে ভাঙা ডালডার টিনের সাহায্যে 'ইকড়ি-মিকড়ি' আলোর যন্ত্র তৈরি করেন। মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—

> "এই দৃশ্যে একটা আলো-আঁধারি আবহাওয়া তৈরি করতেন একটা অদ্ভুত উপায়ে এবং প্রায় নিখরচায়।"[৫২]

সামান্য খরচে তিনি মঞ্চে আলোর মায়াজাল তৈরি করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' নাটকে আলো করেন। এসব ছাপিয়ে গেল ১৯৫৪ সালে প্রযোজিত বহুরূপীর 'রক্তকরবী' প্রযোজনা। রাজার দরজার সামনে ওপরের কোণ থেকে সোনালি আলোর বৃত্তে নন্দিনী; রাজার এঁটোরা বেরিয়ে আসছে। নন্দিনীর সিঁদুরে রাঙানো মেঘ 'আয়রে ভাই লড়াইয়ে চল' শেষ দৃশ্যের আলো যেমন মনে থাকে, তেমনি মনে থাকে বিশু পাগল আর নন্দিনীর একান্ত পরিবেশ; রাজার জালে আটকে পড়া দুটি বিহঙ্গ। মাত্র তিনটে পাঁচশো ফ্লাডের সামনে কাগজ বেঁধে তাতেই ছিঁড়েখুঁড়ে ছড়ানো ছিটোনো আলো; আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। বিশু পাগল শোভেন মজুমদারের কণ্ঠে গান 'ও চাঁদ চোখের জলে'-এর দৃশ্যের বিস্ময়কর আলো নাট্যজগতের ল্যান্ডমার্ক হয়ে রয়েছে। ওই দৃশ্যের কথা স্মরণ করে পবিত্র সরকার বহুদিন পরে লিখেছেন –

> "গানটি শোনাচ্ছে নন্দিনীকে— সেখানে মৃদু নীলাভ আলো আস্তে আস্তে চতুর্দিকে আচ্ছন্নতা বিস্তার করে ওই দুটি মানুষকে ঘিরে ধরে, দৃশ্যটির করুণ বিষণ্ণতা, বিশুর ব্যাকুল আর্তি সব মুহূর্তের মধ্যে দর্শকের বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ কণ্ঠ হাহাকার তৈরি করে দেয়। প্রয়াত শোভেন মজুমদারের ফ্যাঁসফেঁসে গলায় ওই গানটির বেদনা যেমন কান্না-কান্না মূর্তি ধরে ঝরে পড়ত, তেমনই তাপস সেনের আলোও তাঁর কান্নায় কয়েকটা সূক্ষ্ম পর্দা যোগ করত।"[১০]

সামান্য খরচে তিনি মঞ্চে আলোর মায়াজাল তৈরি করলছিলেন। ১৯৫৪ সালে ভারতের জাতীয় সংগীত নাট্য একাডেমির উদ্যোগে দিল্লি নাট্যসঙ্গে প্রথম সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বহুরূপী নাট্যদল এবং তাদের প্রযোজনায় রক্তকরবী সেখানে মঞ্চস্থ করেন ও *রক্তকরবী* শ্রেষ্ঠ আধুনিক ভারতীয় নাট্য প্রযোজনা রূপে স্বীকৃত পায়। *রক্তকরবী* সম্পর্কে অনেক পত্রপত্রিকা ভুল ধারণা পোষণ করছিল, খালেদ চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন –

> "এই নাটক দেখার পর বেশিরভাগ দর্শকের চোখ খুলে গেল। কয়েকজন অবশ্য উল্টো সুরে কথা বললেন। কোন কোন কাগজে লিখলেন যে এটা অপব্যাখ্যা হয়েছে। এবং তারপরে যখন ওটা পুরস্কার পেয়ে গেল, তখন রাতারাতি সুর পাল্টে গেল। বলা হলো দারুন ব্যাখ্যা হয়েছে। 'রক্তকরবী' মাইলস্টোন হয়ে গেল যেই পুরস্কার পেয়ে গেল। বলা হল, দারুণ ব্যাখ্যা হয়েছে। 'রক্তকরবী' মাইলস্টোন হয়ে গেল। যেই পুরস্কার পেয়ে গেল অমনি মাইলস্টোন। যেসব কাগজ কদর্যভাবে লিখেছিল, তারা আর টুঁ শব্দ করে না।"[১১]

প্রখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্ত *রক্তকরবী*-র প্রযোজনা সম্পর্কে বলেছেন -

> "বহুরূপী বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটি ধরেছে - এই ঐতিহ্যে আছে দুটি ধারার মিলন - প্রথমটা দেশজ যাত্রার ও দ্বিতীয়টা য়্যুরোপিয় বাক্সবন্দি মঞ্চের। ...কোথায় যেন বহুরূপী খাঁটি বাংলা নাট্যরূপটা ধরেছে। বিশেষ করে বাচিক অভিনয়ে - এখানেই বিশেষ করে তাঁরা খাঁটি বাঙালি 'বহুরূপী' অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রক্তকরবী'র দৃশ্যপটে যেমন রং আছে তেমন রেখাও আছে, এই সব কিছু একসুরে এক রংয়ে, এক রেখায়, এক ছন্দে গাঁথাই আধুনিক য়্যুরোপিয় থিয়েটারের প্রধান তত্ত্ব। শম্ভুবাবু 'রক্তকরবী'তে দৃঢ়তার সঙ্গে সেদিকে পা বাড়িয়েছেন।"[১২]

রক্তকরবী নাটক মঞ্চস্থের মধ্যদিয়ে শম্ভু মিত্র বাংলা আধুনিক নাটকে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। আর এই পরিবর্তনে মঞ্চচিত্রাশিল্পী খালেদ চৌধুরী ও আলোকশিল্পী তাপস সেনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের প্রতিভার কারণে তারা রক্তকরবী নাটকের মধ্য দিয়ে মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতকে শিল্পে পরিণত করেন।

Reference:

১. দাস, অর্পণ, ফিচার, পত্রিকা, ‘রক্তকরবী’ পরিচালনা করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস।
২. রায়চৌধুরী, দেবাশীষ, নাট্যগ্রন্থমালা ১, খালেদ চৌধুরী, সম্পাদনা প্রভাত কুমার দাস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী, জুন ২০০৫, পৃ. ২
৩. চৌধুরী, খালেদ, ‘রবীন্দ্রনাটকে দৃশ্যকল্প ও আবহভাবনা’, ‘থিয়েটারে শিল্পভাবনা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রা. লি., বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৯. গোস্বামী, আশিস, তাপস সেন (নাট্যজন গ্রন্থমালা), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
১১. চৌধুরী, খালেদ, ‘রবীন্দ্রনাটকে দৃশ্যকল্প ও আবহভাবনা’, ‘থিয়েটারে শিল্পভাবনা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রা. লি., বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৪৫
১২. দত্ত, উৎপল, বহুরূপী ও রক্তকরবী পাদপ্রদীপ, সূত্র : বাংলা নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর : সুনীল দত্ত, পৃ. ৭৯-৮৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 543 - 547
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘চিত্রাঙ্গদা’ : ঋতু ও রবীন্দ্রনাথ

ড. সংহিতা সান্যাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : samhita.sanyal@adamasuniversity.ac.in

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Chitrangada, Rituparno Ghosh, Rabindranath Tagore, Gender Identity, Transgender Representation, Body and Desire, Queer Storytelling, Love Beyond Gender.

Abstract
This essay explores the intersection of literature, cinema, and gender identity through a comparative analysis of Rabindranath Tagore’s Chitrangada and Rituparno Ghosh’s cinematic interpretation. While Tagore's Chitrangada transitions from a warrior to an ideal woman for love, Ghosh reimagines the character as a metaphor for gender fluidity and the struggle for self-acceptance. In Chitrangada: The Crowning Wish, Ghosh reflects his own journey as a queer artist, transforming Tagore’s narrative into a modern tale of identity and resistance. The essay discusses how literature offers boundless creative freedom, but cinema, bound by audience and market expectations, requires bold reinterpretations. Ghosh uses cinema not merely to retell a story but to challenge gender norms and societal prejudices, especially against homosexuality and trans identities. His film becomes a powerful statement of individuality and emotional truth, pushing beyond traditional binaries of male and female. This reinterpretation marks a significant step in blending mainstream art with marginalized voices.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ বললেন – “আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী।” ঋতুপর্ণ বললেন – “Chitrangada is conditioned to be a man. That’s how she was brought up.” রবীন্দ্রনাথ বললেন – “শুধু এক বরষের জন্যে/ পুষ্পলাবণ্যে/ মোর দেহ পাক তব স্বর্গের মূল্য/ মর্ত্যে অতুল্য।” ঋতু বললেন - “আমি সেক্স চেঞ্জ করে নেব।” একই নাম। একই চরিত্র। শুধু এক কবির নৃত্যনাট্য কখন যেন এক শিল্পীর Crowning Wish হয়ে উঠল। কখন যেন মহাভারতের গল্প একটি মানুষের আমৃত্যু লড়াইকে ভাষা দিয়ে ফেলল। আর তখনই, ‘চিত্রাঙ্গদা’র মতো মূল ধারার সাহিত্য সার্থক সিনেমার একটি শর্ত পূরণ করে ফেলল। যে শর্ত বলে সিনেমা হল ‘Larger than Life.’ যে সিনেমা শেষ পর্যন্ত আমাদের ধুঁকতে থাকা ইচ্ছেগুলো, রাজকীয় ইচ্ছেগুলোকে জিতিয়ে দেয়।

সাহিত্য আর সিনেমার সম্পর্ক বহুকালের। আবার ঘনিষ্ঠও বটে। ‘’উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন লিখছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "The connections that exist between literature and film are worth concentrating upon first and most simply because literature and film are near neighbours in many respects and secondly because these two forms of artistic expression appear to be increasingiy dominant in the formation of aesthetic responses."[১]

সাহিত্য হল লেখকের মুক্ত ক্রীড়ার মাঠ। সেখানে তিনি তাঁর কল্পনা এবং বাস্তবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে আকাশে উড়িয়ে দেন। তাদের পিঠে থাকে শব্দের ডানা। আবার তাদেরকে খুঁজে এনে, সযত্নে অবয়ব দেন রূপদক্ষ পরিচালক। সাহিত্যে আমরা ঘটনা পড়ি, পরিচালক তাদের পর্দায় ঘটান। সাহিত্যে যেসব চরিত্রদের মুখ কল্পনায় গড়ে নিই, পরিচালক তাদের বেছে নেন অডিশনে, হাজার লোকের ভীড় থেকে। লেখক লিখে তাঁর লেখা পাঠকের হাতে ছেড়ে স্বস্তি পান। কিন্তু পরিচালক নিজেও একজন পাঠক! তিনি পড়েন, কল্পনা করেন, তারপর তাকেই রূপ-সংলাপ-আবহ-সুর-ভঙ্গিমায় বিশ্বস্ত করে পর্দায় তুলে ধরেন। এখানেই শেষ নয়! লেখক বলতেই পারেন – 'নিজের জন্য লিখছি'। কিন্তু সিনেমা দর্শকের হতেই হবে। সাহিত্যকে বিনোদন বললে অনেকেই রাস্তায় মিছিল নামাবেন, কিন্তু এখন সিনেমা ঘোষিত বিনোদন, ব্যবসা এবং পণ্য! সুতরাং পরিচালকের আরও বড় দায় সিনেমাকে যথাসম্ভব বড় সংখ্যার দর্শক দেওয়া। কাজেই বনগাঁ লোকালের টিয়া বিশ্বাস এবং বালিগঞ্জের রিয়া গুপ্তা - দুজনের জন্য ভেবেই তাঁকে সিনেমা বানাতে হয়। উপরন্তু এখন সময় এগিয়েছে। এখন সাহিত্যনির্ভর সিনেমা মানে শুধু লোকেশন বাছা আর ছবি তুলে যাওয়া নয়। তার জন্য রীতিমত গবেষণা লাগে। সাহিত্যে বলা সময়ের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি - এমনকি দেয়ালে কীসের পোস্টার থাকবে তা নিয়ে পর্যন্ত মাথা ঘামাতে হয়। কিছুদিন আগে একটি দৈনিকে অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস একটি মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, সিনেমা এখন 'telling a story with the best technology at your disposal.' সাহিত্যে যতটা কল্পনা, তাকে বাস্তব করে তুলতে এখন হাজার একটা পদ্ধতি। এ যুগে পর্দায় ডাইনোসর দেখে আর কারও মন ভরে না। কে 'E.T.'-র টেকনোলজি নিয়ে চমৎকৃত হবে, যখন অন্তরীক্ষে আধা-মানুষ আধা-এলিয়েনের যুদ্ধ পাওয়া যাচ্ছে! সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলা সিনেমা যদি সব্যসাচীকে ফেলুদা হিসেবে দেখাতে চায়, তবে তার ফটোশপ আর অ্যানিমেশন দুইই প্রয়োজন। না হলে উনার বয়স এসে বাঙালির চিরযুবক এই নায়কের সযত্নরক্ষিত ইমেজে থাবা বসাবে! এই নিখুঁত, ঝকঝকে সিনেমা প্রজন্মে রবিকবির কাজ পর্দায় আনতে গেলে শুটিং-এর বাইরেও কিছু প্রয়োজন। তাদের নাম সাহস, মেধা এবং দূরদৃষ্টি। এদের সমন্বয় সঙ্গ দিলে মহাভারত থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য এক অন্যতর সাবটেক্সট নিয়ে বেরিয়ে আসে। আবার সেই সমন্বয়ই ওই গল্পকে মেলাতে পারে এক অত্যন্ত বিতর্কিত বাস্তবের সঙ্গে। ঋতুপর্ণ রবীন্দ্রনাথকে কোন গভীরে বহন করতেন বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এক অনন্য ভালবাসা ছিল। তাই বরাবরই রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে ভাঙাচোরা করার, খেলা করার প্রতিস্পর্ধা তাঁর মধ্যে আমরা পেয়েছি। 'চোখের বালি'-তে রবিঠাকুর কোথাও ঋতুমতী বিনোদিনীর প্রসঙ্গ আনেননি। অথচ অতৃপ্ত বালবিধবার নিস্ফল ঋতু বোধহয় তার একাকীত্বের যন্ত্রণার সবচেয়ে করুণ প্রতীক। ঋতুপর্ণ দেখিয়েছেন, আশা ও মহেন্দ্রর দাম্পত্যলীলার পাশাপাশিই দেখিয়েছেন। 'নৌকাডুবি'-তে সরাসরি অস্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ-কৃত উপসংহার। মনের মত পরিণতি দিয়েছেন চরিত্রদের। 'চতুরঙ্গ'-তে বালির ওপর দামিনীর পায়ের ছাপের অনবদ্য ফ্রেম ছেড়ে যাবার ওর চেয়ে বড় চিহ্ন কিছু হয় নাকি? এই ছোটবড় তুলির টানে বার বার ঋতুপর্ণ রবীন্দ্রনাথের অনুসৃজন করেছে। এতটাই নিজের করে পেয়েছিলেন যে না বলা কথাগুলোকে ভাষা দিতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন হয়তো। ঋতুপর্ণের নিজের মতে, সর্বকালীন মেইনস্ট্রিম টেক্সট প্রতিদিনই টুকরো টুকরো নতুন টেক্সট তৈরি করে চলে। সেজন্যেই তাঁর কোনও সাহিত্যনির্ভর সিনেমা মূল গল্পে আটকে থাকেনি। তাঁর জীবদ্দশায় শেষ নিদর্শন 'ব্যোমকেশ বক্সী'। বহুল সমালোচিত। সিনেমা হিসেবে অনেকেরই পাতে দেবার যোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু লক্ষ করতে বলব, কী আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি একটি সরল ও একটি জটিল প্রেমের গল্প বুনে গেছেন। গোয়েন্দা গল্পের নায়ক সেখানে মনস্তত্বের রহস্য খোঁজে। চোরাবালি আসলে মানুষের অবচেতন – যাতে অজান্তে অন্য কেউ ঢুকে পড়লে নিয়তি তাকে অতলে টানে। 'চিত্রাঙ্গদা' তাঁর এই সাবটেক্সট-প্রিয়তার চরম প্রকাশ।

সমকামিতা এখন একটি জ্বলন্ত বাস্তব। কোনও সমস্যা না হয়েও সমস্যা, কোনও বিকার না হয়েও অসুখ। বিশেষত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বিষয়টি নিয়ে বারবার বিতর্ক উস্কে উঠেছে। অনেক আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমলিঙ্গের মানুষকে দেখে যৌন আকর্ষণ অনুভব করাটা একটি বিশেষ জিনসজ্জার ফসল, ঠিক যেমন আরেকটি বিশেষ সজ্জার ফসল বিষমকাম। তা সত্ত্বেও সমকাম অপরাধ! আগে সমকামীরা উপেক্ষিত হতেন, কিন্তু নিজের জীবনে নিজের মতো করে বাঁচতে পারতেন! ৩৭৭-এর প্রত্যাহারের নির্দেশ তাদের চোর-ডাকাত-খুনি-ধর্ষকের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিয়েছিল। পাশাপাশি এটাও দেখার বিষয় – যেহেতু মানুষ দুটি একই লিঙ্গের, তাঁদের সপ্রেম ঘনিষ্ঠতা সমপ্রেম নয়, সমকাম! সেটা শুধুই যৌনতা, আর সেটা শুধুই নিষিদ্ধ! অথচ কোটি কোটি বিষম যুগল প্রেমের লেশমাত্র না রেখে শুধু শারীরিক চাহিদা মেটায়। অভ্যাসে একসঙ্গে থেকেও যায়। তাদের অনুমোদন সমাজে আছে। আমরা সমকামিতা নিয়ে ঠাট্টা করি, এড়িয়ে যাই, পরিচিত কাউকে এমন দেখলে মুখ লুকোই। ঋতুপর্ণ কী করেন? প্রথমত নিজের জীবনে নিজের এই তথাকথিত প্রান্তিকতাকে উদযাপন করেন। নিজের ইচ্ছেমতো unisex পোশাক বানিয়ে নেন, কাজল পরেন, মাথার চুল ফেলে দেন। স্বরের নম্রতাকে ঢাকেন না। নিজের যৌনচাহিদা কোথাও প্রকট করেননি। কিন্তু যৌন সত্ত্বাটাকে প্রবল দৃঢ়তায় প্রকাশ করেছেন। আর প্রকাশ করেছেন নিজের শিল্পীসত্ত্বা। ‘আরেকটি প্রেমের গল্প’ মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছবিটি নিয়ে প্রবল আলোচনা শুরু হয়ে যায়। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় চপল ভাদুড়ির যৌবন এবং অভি-র চরিত্রে ঋতুপর্ণকে নেওয়া মাত্রই ঋতুপর্ণর ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে দর্শক অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। ওই সিনেমায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, প্রেমের কোনও লিঙ্গ নেই। যে কোনও দুটো মানুষের মধ্যে তা হতে পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে প্রেম, সখ্য, স্নেহ, বন্ধুত্ব – এই গণ্ডীগুলো সমাজের নির্ধারণ করে দেওয়া। হতেই তো পারে, আপনি ছেলে এবং আপনার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আসলে কামগন্ধহীন প্রেম! আপনার প্রেমিকার জন্য আপনি যা যা করতে পারেন, ওর জন্যেও পারেন! অথচ সেটা মেনে নিতে আপনার আমার অস্বস্তি আছে। কারণ লিঙ্গ এবং যৌনতা নিয়ে একটা রাজনীতি আমাদের সমাজে চলে। যে যৌনতায় কোনও উৎপাদন নেই, সহজ কথায় সমাজ বা রাষ্ট্র নতুন ক্রেতা পেয়ে লাভবান হয় না, তাকেই সমাজ ‘অস্বাভাবিক’ বলে ত্যাগ করে। যদি প্রশ্ন করেন, বিষম যৌনতাতেও তো একটা দীর্ঘ সময় উৎপাদন থাকে না। ভেবে দেখুন তো প্রাক-বিবাহ বা বিবাহোত্তর পর্বে নিরোধ বিক্রয়কারী কোম্পানিগুলো কী পরিমাণ মুনাফা করে? কিংবা গর্ভনিরোধক ওষুধ, প্রেগনেন্সি কিট প্রস্তুতকারক সংস্থা? একটি সদ্যোজাত শিশুরও প্যাম্পারস বা মামাআর্থের তেল লাগে। তাই সে-ও ক্রেতা। সেও সমাজে বিচরণের যোগ্য। কিন্তু সমপ্রেমের ফসল নেই। যে সময়ে সিনেমা বানাচ্ছেন ঋতু, সে সময়ে এ এমন এক প্রেম, যা কিছুর চাহিদা রাখে না। শরীর ‘তথাকথিত’ তৃপ্তি দেয় না, সন্তান আসে না, সংসার থাকে না। শুধু ভালবাসা থাকে। এমন কেনার অযোগ্য তীব্র আবেগ সমাজ সহ্য করবে না। সুতরাং ওদের অপরাধী মার্কা দেওয়া হয়, প্রান্তবাসী করে দেওয়া হয়। ঋতুপর্ণ নিজেই লিখেছেন, -

> “আমার স্বভাবপ্রণোদিত ‘অস্বাভাবিকতা’ নিয়ে আমি বাস করেছি আমার একাকিত্বের বন্দিজীবনে – আর আমার সামনে ছিল সমাজের এক বিরাট কারাগার। যেখানে ঐতিহাসিকভাবে যে কোনও নতুন প্রথাকেই প্রবেশ করতে হয়েছে দণ্ডিত বিদ্রোহীর মতো, অনেক হিংসা এবং রক্তপাতের মূল্যে।”[২]

এই সিনেমাতে একবারও নিজেকে ‘Gay’ হিসেবে প্রকট হতে দেননি। এমন একটি মানুষী সত্ত্বা হিসেবে দেখিয়েছেন, যার সম্বল শুধু প্রেম আর শিল্প। তার যৌনতার থেকে অনেক মর্মস্পর্শী তার নিঃশব্দ প্রেমের নিবেদন। ঋতুপর্ণ সফলভাবে এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন, ব্যক্তিগত সাহমত্যের কারণে।

এই ঋতুপর্ণ যখন নিজে ঠিক করলেন নিজের কথা বলবেন, তিনি খুঁজে পেলেন চিত্রাঙ্গদাকে। চিত্রাঙ্গদা – এক আশ্চর্য সমন্বয়ের ধারিকা। এ মেয়েটি জন্ম থেকে নিজেকে পুরুষ-পরিচয়ে চেনে। তার শরীরে লাবণ্য বাড়তে পায়নি কঠোর শক্তিচর্চার শাসনে। তার হাতে অস্ত্রের নিক্কণ। দেহবল্লরী কঠিন বর্মে বাঁধা। সে প্রেমের মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ নিজের ভেতরে মুকুলিত হতে থাকা নারীত্বের অভিঘাত টের পায়। Confused identity নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, নিজের আরেক আমি-কে খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বরাবর মেয়েদের ভাষ্যে সাবলীল। অনেকেই মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নারী-মনস্তত্ব খানিকটা জায়গা অধিকার করেছিল। তিনি তাই তাঁর কাব্যে দেখালেন, কিভাবে একজন Tomboy নারী হয়ে উঠল। যেমন নারী হয়ে উঠেছে ‘সমাপ্তি’-র মৃন্ময়ী। কিন্তু মৃন্ময়ী গ্রাম্য বালিকা, তাকে সুখে সংসার করতে হবে। তাই সে পতিপ্রিয়া হয়েই থেকে গেছে। তার নারীত্বে আসাটাও স্বাভাবিক এবং মনের নিয়ম মেনে। কিন্তু মার্জিতরুচি রবীন্দ্রনাথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিত্রাঙ্গদাকে ঠিক লাস্যময়ী নারী হিসাবে রেখে দিতে পারেননি। মহাভারতকে অতিক্রম তিনি চাইলেই করতে পারতেন, সে স্বাধীনতা কবির থাকে। কিন্তু নিজে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে ভাবতে পারেননি বলেই তাঁর অর্জুন নারীর মধ্যে লাস্যের চেয়ে বেশি কিছু খোঁজে। অর্জুন সেই বীরাঙ্গনাকে খোঁজে, যে প্রজাদের রক্ষা করতে যোদ্ধবেশ ধারণ করে। যার অন্তরে মমতা আর বাইরে তেজঃপুঞ্জ। যে নারী যুগে যুগে মনস্বী পুরুষের অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ একটি নারীর গল্প বলেছেন, যে বাহ্যিক নারীত্বকে অস্বীকার করে অন্তরের নারীত্বে মহান। যার যোগ্য প্রেমগুণ পেলে রূপতৃষা ত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে যা কল্যাণকর, তাই সুন্দর। তিনি কল্যাণী চিত্রাঙ্গদাকে প্রেমের যুদ্ধ জিতিয়ে দিয়েছেন। হেরে গেছে কাম। এমনকি কামদেব।

ঋতুপর্ণ বললেন অন্য গল্প। 'ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'-র শরীরে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। 'চিত্রাঙ্গদা' হয়ে ওঠে একটি ইচ্ছের গল্প। এখানে ঋতুপর্ণ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাটের হুবহু চলচ্চিত্র রূপ তো দেনইনি, বরং বর্তমান সমাজজীবন ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে কেবল ইচ্ছের আলোটুকু ফেলেছেন।'[৩] তিনি দেখালেন, কীভাবে একটি সত্ত্বা প্রেমের স্পর্শ পেয়ে আরেক সত্ত্বাকে বেছে নিল। তাঁর চিত্রাঙ্গদা মেয়ে নয়। পুরুষ? Biologically. কিন্তু আসলে পুরুষও নয়। সে একজন মানুষ। রুদ্র-র চরিত্রটাই এমনভাবে গড়া, যাতে তাকে পুরুষ-নারীর ধরাবাঁধা পরিচয়ে মাপা না যায়। সে একজন সক্রিয় মানুষ। যার প্রাণ হল নৃত্যাভিনয়। যে কাজের জায়গায় আশা করে তার দলের ছেলেমেয়ে গভীরভাবে চরিত্রকে বুঝবে। অনায়াসে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিশিয়ে দেয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও ড্রামস। কে আছে এমন, যাকে এই চরিত্রে মানাবে? কে সে, যিনি সামনে এসে দাঁড়ালে আমরা শুনতে পাবো লিঙ্গ বৈষম্যের রাজনীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা; অথচ যাঁর শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধায় আমরা চুপ? কে আছেন, যিনি একজন ট্রান্সজেন্ডারকে তাঁর যথাযথ আনন্দবেদনায় ধরতে পারবেন? ঋতুপর্ণ নিজে ছাড়া সত্যিই কি কোনও বিকল্প ছিল? রুদ্র হয়ে ঋতু নিজেই এলেন। রুদ্র – নামে প্রচণ্ড পৌরুষ। কারণ তার মা-বাবা ছেলেকে পৌরুষে দেখতে চায়। অথচ রুদ্রের বিভঙ্গে অবলীলায় ফোটে লীলাকমল। তার জীবনে পার্থ এলে তার অঙ্গে বাঁশি বাজে। প্রেমিক পায়ে নূপুর পরিয়ে দিলে তার চোখে জল আসে। প্রেমিকের হাতের বাদ্যে তার পা কথা বলে। তার স্বপ্নদৃশ্যে সরগমে বেজে ওঠে সানাইয়ের সুর। সে নারী হতে চায়। না, নিজের জন্য নয়। সে নারীত্ব চায় তার পুরুষকে যৌনতা দেবে বলে, সন্তান দেবে বলে। রবিঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের মনোযোগ না পেয়ে লাস্যময়ী হতে চেয়েছিল। কিন্তু রুদ্র পার্থকে পেয়েও নারীত্ব চায়। কারণ পার্থ সন্তান চেয়েছে। পরিপূর্ণ যৌনতা চেয়েছে। এই যৌন নারীত্ব যে প্রকৃত নয়, তা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন অর্জুনকে দিয়ে। ভোগে ক্লান্ত অর্জুন প্রকৃত চিত্রাঙ্গদাকে চেয়েছিল। তখন চিত্রাঙ্গদার যে ভাষ্য, তা পুরুষের তৈরি করা নারীসত্ত্বার বিরুদ্ধে প্রকৃত নারীর হুঙ্কার। পিছনে বা সামনে নয়, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অধিকার চাওয়ার ইস্তেহার সেটা। ঋতুপর্ণ কিন্তু সে গল্পে গেলেন না। তিনি দেখালেন, যে নারীত্ব শুধু যৌনতার জন্য, তা biological হলেও আসলে Implant মাত্র। তা মানুষের মৌলিকতার পরিপন্থী, কারণ তা শুধুমাত্র ভোগবাদের ফসল। রুদ্র যখন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে অপারেশন করাচ্ছে, নাচ বন্ধ করে হাসপাতালে শুয়ে আছে, তখন পার্থ নিজের কাম চরিতার্থ করতে রুদ্রেরই হাতে গড়া তার দলের রূপসী মেয়েটিকে বেছে নিচ্ছে। তাকে গর্ভবতী করছে। অ্যাবরশনের টাকা চাইতে আসছে অসুস্থ রুদ্রর কাছে, যে রুদ্রকে এর আগে সে 'synthetic half thing' বলে ব্যঙ্গ করেছে। এই না-পুরুষ না-নারী রুদ্র কিন্তু অনেক বেশি নারীসুলভ হয়ে উঠেছে এই সময়, কারণ পার্থর প্রতি তার মমত্ব, বেদনা, দৃঢ়তা এবং প্রেম এই মুনাফালোভী সমাজে অনেক বেশি প্রকৃত। এতটাই, যে এই প্রেম থেকেই জন্ম নেয় ইমপ্লানটেশন ঝেড়ে ফেলার প্রতিবাদ। এই প্রেম তাকে সাহস যোগায়, বৈষম্যের সমাজে নিজের মতো, লিঙ্গভেদের ওপরে একজন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার। তাঁর নিজেরই কথায় –

> "যাদের নির্ভর করেই বেঁচে থাকবার কথা ছিল, তারাই যদি স্বেচ্ছায় ঠেলে দেয় গভীর অনিশ্চয়তার দিকে, তবে মরতে মরতেও তো আঁকড়ে ধরতে হবে কোনও না কোনও সম্বল।"[৪]

এই বোধের কাছে একজন মানবশিশুর জন্ম তুচ্ছ। পার্থর বিয়ে তুচ্ছ। তাই রুদ্রের চোখে মদন কোনও দেবতা নন, যৌনপুতুলের জোগান দেওয়া কসমেটিক সারজেন। রুদ্রের নতুন শরীর কোনও বর নয়, নিজেকে বিস্মরণের চিহ্ন। রুদ্র তাই পার্থর নয়নে নয়ন রেখে ফিরে যায় না। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেননি, যখন অর্জুন রূপসী চিত্রাঙ্গদাকে ভোগ করছিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তখন তার শরীরের ভেতর আসল রাজকুমারীর মনের কী অবস্থা হয়েছে। ঋতুপর্ণ দেখালেন। হাসপাতালে রুদ্রর বিছানার পাশে পার্থ তার প্রেমিকাকে আদর করেছে, আর রুদ্র প্রাণপণ চোখ বুজে থেকেছে। যাতে পার্থ বুঝতে না পারে। আজকের চিত্রাঙ্গদা তো এই পার্থর কাছে ফিরতে পারে না। রুদ্র ফেরেনি। তার অসুস্থতায় সে এক চিকিৎসকের সান্নিধ্য পেয়েছিল, যে তাকে বন্ধুর মতো দেখত। যে তাকে ইমপ্ল্যান্ট বাদ দিয়ে নিজস্বতায় বাঁচতে উৎসাহিত করত। সিনেমার শেষে যখন রুদ্র ওই চিকিৎসককে খুঁজছে, তখন একবার আমাদের মনে হয়েছে – রুদ্র হয়তো এবার তাকে ঘিরে বাঁচতে শুরু করবে, আবার একই গল্প! কিন্তু ঋতুপর্ণ রুদ্রকে নির্মোহ করবেন। তাই দেখা যায়, আসলে কেউ ছিলই না। ওই চিকিৎসক রুদ্রের অসুস্থতাজনিত সিজোফ্রেনিয়া। তার নিজেরই অস্তিত্বের একটা অংশ নিজের বন্ধু হয়ে, দুখজাগানিয়া হয়ে তাকে সঙ্গ দিয়েছে। রুদ্রের আর কোনও পিছুটান থাকে না। মদনের কাছে রূপের আর্তি শেষ হয় আত্মা ফেরত চেয়ে। অপারেশন থিয়েটারের লাইট জ্বলে ওঠে।

মানুষ নিজের রুচি অনুসারে সাহিত্যের নানারকম অর্থ করে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় চিত্রাঙ্গদা ছিল, আর ছিল মদনের বরপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা। মানুষ নিজেই কুরূপা ও সুরূপা নামকরণ করে চরিত্রটিকে রূপের নিরিখে সাজিয়ে নেয়। আজও একটি কালো মেয়ে ও একটি ফরসা মেয়ে এই দুই চরিত্রে অভিনয় করে। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কেউ বিকল্প ভাবেনি। ঋতুপর্ণ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তারপর অন্তত দর্শক হিসাবে আমার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমি এই নামকরণকে সমর্থন করি না। আমি 'সমকামী' শব্দটি বলি না। আর আমি নিশ্চিত, অন্তত কিছু মানুষের ভাবনার বন্ধ দরজা তিনি খুলতে পেরেছেন। এর বেশি সিনেমা আর কী করতে পারে? সিনেমার তত্ত্বমতে 'চিত্রাঙ্গদা' যেমনই হোক, সাহিত্যনির্ভর সিনেমার একটি অন্য ধারার পথপ্রদর্শক এটি। যা সাহিত্য ও সিনেমা, দুই বিষয়ে আগ্রহী মানুষকেই চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে। প্রভাবের কথা জানতে চাইবেন? ঠিক জানি না। কীসের প্রভাব কোথায় পড়ে কেউ কি বলতে পারে? তবে এটুকু বলতে পারি – আমার একার নয়, অনেকেরই মানুষটার জন্য কষ্ট হয় খুব। হয়তো তাঁর রেখে যাওয়া লড়াইটা অন্য কেউ শেষ করবেন, সিনেমার ভাষাতেই। সেদিন ঋতুপর্ণর Crowning wish নিয়ে অন্য কেউ একটা লেখা লিখবে। 'The show must go on'.

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিশীথকুমার, 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র', 'বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র প্রথম খণ্ড', নাভানা, ১৯৫৯, পৃ. ১৩

২. ঘোষ, ঋতুপর্ণ, 'প্রথম পুরুষ', সংখ্যা 'ফার্স্ট পার্সন', 'রোববার', সংবাদ প্রতিদিন, ৯ জুন ২০১৩, পৃ. ১৩

৩. https://inscript.me/revisiting-rituparno-ghoshs-chitrangada-the-burning-wish, সঞ্চারী ভৌমিক, ৮ আগস্ট ২০২২

৪. ঘোষ, ঋতুপর্ণ, 'ফার্স্ট পার্সন ১', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৮

Bibliography:

'বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র প্রথম খণ্ড', শ্রীনিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, নাভানা, ১৯৫৯

'রোববার', সংবাদ প্রতিদিন, সংখ্যা 'ফার্স্ট পার্সন', ৯ জুন ২০১৩

'চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ', মৃণাল সেন, সপ্তর্ষি, ১৯৭৭

'ফার্স্ট পার্সন ১', ঋতুপর্ণ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 548 - 557
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ইতিহাসের নির্মাণ : রক্তকরবী ও মুক্তধারা

ড. কৌশিককুমার দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : koushikduttaphd@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ugra-jatiyatabad, Samrajyabad, Punjibad, Dharmaghat, Karshanjibi, Akarshanjibi, Overtime, Shishushramik, Jatibiddesh.

Abstract
The extreme nationalism of the First World War and the capitalist imperialism transformed commonman's life into a nightmare. To emancipate humanity from this condition, Rabindranath Tagore has composed two plays named 'Muktadhara' (1922) and 'Raktakarabi' (1924) keeping in mind both the national and international contexts. In both the plays, Tagore has not only dismantled the ill-effects of capitalism, imperialism, and extreme nationalism, but he has also referred to the path of freedom from the oppression. In the play 'Raktakarabi', Tagore has portrayed how Modern European capitalism has controlled nature and human civilization through the use of scientific knowledge and technological advancement. This capitalism has also become the apparatus for control and exploitation. By portraying the socio-economic politics of the mining area, Tagore has dismantled the harsh reality of capitalism. He has also referred to the dialectical relationship between the labour and master societies. In the play 'Muktadhara', Tagore has shown how extreme nationalism negatively affects trust and humanity. Using the advantage of geographical positioning, a country tries to take control over its neighbouring country by restricting the necessary water flow. King Ranajit does not trust his uncle Biswajit; the civilians do not trust their king; the army general cheats Avijit; Bhibhuti is suspicious about his spies and creates an environment of mistrust. These pictures represent the ill-effects of extreme nationalism. This play also portrays how extreme nationalism transforms human beings into animals and thus creates history.

Discussion

১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই যুদ্ধের কারণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ আছে। কোনো বড় যুদ্ধ একটি বা দুটি কারণে সংঘটিত হয় না। এর পেছনে বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িয়ে থাকে। প্রসঙ্গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলিকে ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তা হল — অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ, বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতা তথা পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিক বিস্তার তথা সাম্রাজ্যবাদ, পরস্পর বিরোধী শক্তি জোট গঠন, সামরিক প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক সংকট,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইয়োলো জার্নালিজম প্রভৃতি। উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের সূচনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একধরনের উগ্র, স্বার্থপর ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব হয়। সমস্ত জাতি গোষ্ঠীরা নিজের দেশ ও জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে থাকে এবং অন্য জাতিকে পদানত করে নিজের নিজের দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একধরনের বিদ্বেষ ও জাতি বৈরিতার সৃষ্টি হয়। একশ্রেণির সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এই ধরনের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে থাকেন। জার্মান উপনিবেশবাদের প্রবল সমর্থক ইতিহাসবিদ হেনরিখ ভন ট্রিটস্কে প্রমুখ প্রচার করেন যে জার্মানির টিউটনিক জাতি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। জার্মান দর্শনবিদ হেগেল বলেন রাষ্ট্রই ঈশ্বর এবং রাষ্ট্রের গৌরবে জাতির গৌরব। আমেরিকান লেখক হোমার লি অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জর্জ বেঞ্জামিন ক্লেমাঁসু প্রমুখ ফরাসি নেতা ফরাসি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে ঘোষণা করেন ফরাসি সভ্যতার সঙ্গে টিউটনিক সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য। এভাবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইতালি, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর ক্ষমতাশালী দেশগুলিতে উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হয়ে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি করে।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশীয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত হয়। এই মূলধন বিনিয়োগের জন্য বাজারের প্রয়োজন হয় তাই উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি, কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা উপনিবেশ বিস্তারের জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে এভাবেই সর্বত্র পুঁজিবাদী সভ্যতার উন্মেষ ঘটে এবং পুঁজিবাদ বিশ্বযুদ্ধের পট প্রস্তুত করে।

বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় –

> “সর্বস্লাভ আন্দোলনের নেতা সার্বিয়া চাইছিল তার নেতৃত্বে স্লাভ রাজ্যগুলির ঐক্য প্রতিষ্ঠা। বার্লিন চুক্তিতে স্লাভ জাতি অধ্যুষিত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ওপর অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিন পর অস্ট্রিয়া এই স্থান দুটি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। এই স্থান দুটির অধিবাসীরা সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে ছিল। তারা এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করলে, সার্বিয়া তাদের মদত দেয় এবং এইভাবে বলকানে অস্ট্রিয়া - সার্বিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বার্লিন চুক্তিতে বুলগেরিয়াকে ত্রিধাবিভক্ত করায় বুলগাররা, এবং রোমানিয়ার কিছু অংশ রাশিয়ার হাতে যাওয়ায় রুমানিয়রা ক্ষুব্ধ হয়। ম্যাসিডোনিয়ার অধিকার নিয়ে গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে।”[১]

আর এভাবেই অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধের আবহ তৈরি করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গান্ধীজীর আহবানে সাড়া দিয়ে ভারতবাসী সক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

> “প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ ভারতীয় সেনা বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশ নেয় এবং ১০ হাজার মৃত্যুবরণ করে। যুদ্ধ তহবিলে ভারতবাসীী ৬ কোটি ২১ লাখ পাউন্ড চাঁদা দেয়। ভারতবাসী আশা করেছিল যে যুদ্ধশেষে তাঁদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, কিন্তু যুদ্ধের অবসানে দেওয়া হল ‘মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার’ যা ভারতীয়দের কাছে ছিল ‘তুচ্ছ বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক’। দাবি আদায়ের জন্য ভারতীয়রা অন্যপথ গ্রহণে বাধ্য হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেশবাসীকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করে। কাপড়, ওষুধ, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কৃষক স্বল্পমূল্যে মহাজনদের কাছে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়, আবার তাকেই অধিক মূল্যে শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে হয়। শিল্পদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যাদির আমদানি বন্ধ হওয়ায় সরকার ভারতীয়দের শিল্প বিস্তারে উৎসাহ দেয়। কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> যুদ্ধ শেষে সেগুলির ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং নতুন শিল্প স্থাপনে বাধা দেয়। এইসব কারণে ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।”[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যায়। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়ায় তাদের অবস্থা হয় শোচনীয়। সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া শাসকের যুদ্ধোন্মাদনার দায়ভার বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকে।

> “ব্রিটিশ সরকার এই সময় ভারতের শ্রমজীবী জনগণের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণির চরম দুর্দশার সৃষ্টি করল। সামরিক ও অসামরিক শাসনের খাতে যে বিপুল পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটল, তা উসুল করা হল জনগণের উপর কর বৃদ্ধি ও অন্যান্য রূপ শোষণকে আরো নির্মম করে।”[৩]

এছাড়াও সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ, হোমরুল লীগের সাফল্য, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্যপ্রয়াস এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণিকে নতুন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ করে।

> “১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচির নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট, জুন মাসে গ্রেট ইন্ডিয়া পেনিনসুলা রেলওয়ের ধর্মঘট এবং প্যারেলের কারখানায় পাঁচ হাজার শ্রমিকের কয়েকদিনের লাগাতার ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই আরো কয়েক জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী ভাবে রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। বোম্বাই আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্প শ্রমিক এবং ডাক বিভাগের শ্রমিকদের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা পৌরসভা, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প, বাংলার খড়্গপুর রেল কারখানা, মাদ্রাজ ট্রাম ও বস্ত্র শিল্প এবং লক্ষ্ণৌ-এর রেল কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়।”[৪]

১৯২০ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। এই সময় থেকেই ভারতের শ্রমিক শ্রেণি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণিও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে। বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বাংলা প্রভৃতি সর্বত্র পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ধর্মঘট হতে থাকে। এই রকম একটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সর্বত্র উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প অন্যদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। মানুষ এই অবস্থা থেকে চাইছে সর্বাত্মক মুক্তি, সেইরকম পেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি নাটক 'মুক্তধারা' (১৯২২) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৪, প্রবাসী) তে তুলে ধরেছেন পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের নগ্ন ছবিটি। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের নগ্ন ছবিটি শুধু দেখানোই নয় তা থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশও করেছেন নাটককার রবীন্দ্রনাথ।

'রক্তকরবী' (১৯২৪) নাটকে আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার ও সাধারণ মানুষের মুক্ত আত্মার ক্ষয়, সর্বশেষে যান্ত্রিকতার কারাগার থেকে মানুষের প্রাণশক্তির বিজয় অভিযানের কথা রূপক-প্রতীকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। রক্তকরবীর রাজাও স্বাধীন নয় তাঁর সৃষ্ট শক্তির দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হয়। নাটকের শেষে রাজার মানবিক মুক্তি, অন্তরের রিক্ততা ও সর্দারদের দমন করতে যাওয়ার মধ্যে আছে তার-ই ইঙ্গিত। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা দুটি প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের নিঃশেষিত করে। একদিকে প্রশাসনিক শক্তির ভয় অন্যদিকে ধর্মীয় আফিমের প্রয়োগে প্রতিরোধের ভাষা হারায় শ্রমিক শ্রেণি। শ্রম-শ্রম কেবলমাত্র শ্রম, তার ওপর ওভারটাইম, তার ওপর ধর্মীয় আবেগ, তার ওপর নেশার মৌতাত এবং সবশেষে কিছুতেই কাজ না হলে কুকুরমারা চাবুকের ভয় ফলে শ্রমিকরা প্রতিবাদটা করবে কীভাবে আর কখনই বা করবে?

> "যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।"[৫]

রক্তকরবী নাটকের নাট্য কাহিনি যে নগরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তা হলো যক্ষপুরী। এই যক্ষপুরী একটি শিল্পনগরী, এখানে একটি সোনার খনি আছে। এই সোনার খনির মালিক হলেন মকররাজ। এই নাটকের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী — এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বই এই নাটকের বিষয়বস্তু। কর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতিনিধি হল নন্দিনী ও তার পক্ষে আছে বিশুপাগল, কিশোর এবং রঞ্জন আর আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতিনিধি হল যক্ষপুরীর মকররাজ— যিনি জালের আড়ালে স্বেচ্ছাবন্দী। তাঁর পক্ষে আছে সর্দারেরা, অধ্যাপক, গোঁসাই, পুরাণবাগীশ প্রভৃতি। এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের মধ্যে নন্দিনী কীভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করে রাজাকে উদ্ধার করল এবং প্রাণহীন যক্ষপুরীতে সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রাণের স্পর্শ নিয়ে এল এ-নাটকে সে কথাই বলা হয়েছে।

এক সময়কার কৃষি-সমৃদ্ধ রাজ্য এখন খনি-সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত। প্রজাদের শ্রমিক বানিয়ে রাজা তাদের জীবনের বিনিময়ে সোনার তাল জমাচ্ছেন এবং নিজের শক্তি ও আয়ু বাড়িয়ে চলেছেন। রাজার সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগাযোগ নেই। প্রজাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ না থাকলেও রাজার শাসনে কঠিন ভূমিগর্ভে খনক শ্রমিকদের খাটাবার জন্য নানা শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত আছে। যক্ষপুরীর শিল্প-সংস্থায় কাজ করার জন্য গ্রাম থেকে মানুষদের আনা হয়েছে। সেইসব মানুষরা মাটির নিচ থেকে তাল তাল সোনা খোদাই করে মাটির ওপরে নিয়ে আসে। তাদের সেই তাল তাল সোনা গিয়ে জমা হয় মকররাজের কোষাগারে। শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে খাওয়া থাকার নিশ্চয়তাটুকু পায় কিন্তু তাদের শ্রম দ্বারা উত্তোলিত দ্রব্যের উপর তাদের কোনো মালিকানা নেই। শ্রমিকরা যাতে কাজে ফাঁকি দিতে না পারে সেজন্য রাজা সর্দারদের নিয়োগ করেছেন। সর্দাররা খোদাইকরদের কাজ পরিদর্শন করে। সোনার খনিতে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে অধ্যাপককে। খোদাইকরদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছে যাতে শ্রমিকরা অসুস্থ হলে একদিনও কাজ বন্ধ না হয়। খোদাইকরদের ধর্মাচরণের জন্য কাজ করতে ও তাদের নাম-গান শোনাতে আসেন কেনারাম গোঁসাই— যাতে তারা বিদ্রোহের পথে না যায়।

যক্ষপুরীর কোনও শ্রমিকই তাদের ব্যক্তি-নামে পরিচিত নয়। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে গেছে তাদের সংখ্যা-নামে এবং পেশাগত নামে। সর্দার এর উক্তি—

> "ওই যে টঠ পাড়ায় যেখানে ৭১ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য ণ-এর ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।"[৬]

আবার অধ্যাপক, চিকিৎসক, পুরাণবাগীশ প্রভৃতি বুঝিয়ে দেয় কর্মীদের পেশাগত নাম। যক্ষপুরীতে ওভারটাইমেরও ব্যবস্থা আছে। বারো ঘন্টার পর চার ঘন্টা ওভারটাইম করতে হয় ফাগুলালকে। বিশু বলে—

> "ওই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘন্টার পরে আরও চার ঘন্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানেনা, তুমিও জানো না অন্তর্যামী জানেন।"[৭]

যক্ষপুরীর খনি অঞ্চলের শ্রমিকরা কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা পায় না। শিশুশ্রমিক কিশোর সমস্ত দিন কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনলেও তার কোনো স্বাধীনতা নেই যে একটু সময়ের অবসরে নন্দিনীর পছন্দের ফুল রক্তকরবী তাকে তুলে এনে দেবে, তবুও কিশোর প্রতিজ্ঞা করে নন্দিনীকে বলে—"ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।"[৮] চন্দ্রা যখন গ্রামে ফিরতে চেয়ে সর্দারের কাছে ছুটি চায় তখন সর্দার বলে—

> "কেন? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে।"[৯]

ফলে এর থেকে বোঝা যায় যে বাড়ি থেকে বাসায় এসে অর্থাৎ গ্রাম থেকে যক্ষপুরীতে এসে তাদের সকলেরই বেরোবার পথ বন্ধ হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই বন্দী হয়েছে। এদের ইচ্ছা না থাকলেও রাজা নিজের প্রয়োজনে এদের জোর করে ধরে রেখেছে।

যক্ষপুরীতে মানুষকে শোষণ করে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু যাতে মানুষ তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন না হয় তার জন্য তাঁকে দেওয়া হয় মদ। বিশুর উক্তিতে বোঝা যায় —

> "সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ—"[১০]

আবার মদ দিয়েও যদি কাজ না হয়, ভোলানো না যায় তাহলে তাকে দেওয়া হয় মন্ত্র। তাতেও যদি কাজ না হয়, গজ্জুর মতো যদি কেউ অবস্থার বিরুদ্ধে যায় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কাজ-কামাই করলে যক্ষপুরীর সর্দাররা টের পেয়ে যায় এবং যে কাজে ফাঁকি দেয় তার পেছনে ডালকুত্তা লাগিয়ে দেওয়া হয়। যারা অবস্থার বিরুদ্ধে যায় না, যারা বারো ঘন্টা কাজ করে, তার ওপর ওভারটাইম করে, মদ খায় এবং মন্ত্রকে মেনে নিয়ে মানবতা খুইয়ে শোষিত হয়েই চলে তাদেরকে হতে হয় 'রাজার এঁটো'। অনুপ, শকলু, কঙ্কু রাজার এঁটোতে পরিণত হয়েছে। এদের মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ আছে বলে মনেই হয় না। শোষণের পাকচক্রে ওরা আর মানুষ নেই, মানুষের কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। নন্দিনীর কথায় –

> "লোহাটা ক্ষয়ে গেছে কালো মর্চেটাই বাকি!"[১১]

এই যক্ষপুরীতে প্রাণের কোনো স্থান নেই। এখানে সব মানুষের পূর্ণ অস্তিত্ব ভগ্ন অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই ভগ্ন অস্তিত্বময় যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ পূর্ণ অস্তিত্বময় নন্দিনীকে আনলেন অকাজের প্রয়োজনে। নন্দিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন —

> "মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সেই সহজ সৌন্দর্যের।"[১২]

যক্ষপুরীতে এসে নন্দিনী লক্ষ করে যে প্রত্যেকটি মানুষ তাদের মানবতা খুইয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষ সম্পূর্ণ মরে যায়নি। জালের আড়ালে থাকা রাজা থেকে কিশোর, বিশু, ফাগুলাল পর্যন্ত নন্দিনীর সংস্পর্শে এসে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল রক্তকরবী নাটকে আধুনিক ইউরোপীয় ধনতন্ত্র, বিজ্ঞান সাধনার শক্তি বলে প্রকৃতি ও মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের দম্ভ এবং নিয়মতন্ত্র-সর্বস্ব পুঁজিবাদী যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার স্পষ্ট রূপচিত্র। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে খনি অঞ্চলের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের নগ্ন প্রতিকৃতিটা তুলে ধরেছেন। এ নাটকে আকর্ষণজীবীদের সঙ্গে কর্ষণজীবীদের যে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ সেখানে নন্দিনী চরিত্র নিয়ে এসে সেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—

> "আধুনিক কালের 'সভ্য' দেশে ধনমত্ত ও শক্তিলুব্ধ ব্যক্তিমানুষ পরিচালিত জনপিণ্ড যে জীবনের ক্ষেত্রে ইতস্তত তাড়িত হইতেছে তাহাতে প্রানের ও প্রকৃতির সহজ দান ও সরল সৌন্দর্য উপেক্ষিত এবং রসবোধ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছি। ইহারই প্রতিবাদে রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের শক্তির উপরে প্রেমের এবং মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়গান ধ্বনিত। লোভের ভূমি গর্ভে সুড়ঙ্গ না কাটিয়া জ্ঞান ও শক্তি যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মোহমুক্ত ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে মিলিত হয় তবেই কল্যাণে সার্থকতা। — ইহাই রক্তকরবীর বক্তব্য।"[১৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অপর একটি বিখ্যাত নাটক 'মুক্তধারা'-য় আমরা লক্ষ করি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের নগ্ন স্বরূপ। সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হলো শোষণ। কিছু সংখ্যক মানুষের ফুলে-ফেঁপে ওঠার জন্য বেশিরভাগ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষের নিঃস্ব হওয়া প্রয়োজন - এ কথাই বলে সাম্রাজ্যবাদ। 'মুক্তধারা' নাটকের সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ কিভাবে খুলে গেছে তা আমরা বিচার করে দেখব।

মুক্তধারা নাটকের রাজার নাম রণজিৎ, রাজ্য উত্তরকূট। রণজিতের পিতামহ প্রাগজিৎ দক্ষিণ দেশ শিবতরাই-এর স্বাধীনতা হরণ করেছিল। তিন পুরুষ ধরে শিবতরাইকে বশ্যতা মানাবার বহু চেষ্টা করেছিল। এহেন শিবতরাইয়ের অর্থ উপার্জনের প্রধান মাধ্যম হলো পশম রপ্তানি ও চাষবাস। শিবতরাই যে পথ দিয়ে পশম রপ্তানি করত সেই নন্দী সংকটের পথ প্রাগজিৎ বন্ধ করে দিয়েছিল। পথ বন্ধ করে শিবতরাইয়ের পশম বিক্রির দায়িত্ব নিয়েছিল উত্তরকূট। অন্যের উৎপাদিত পণ্যের উপর খবরদারি সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিবতরাইকে এভাবে শোষণ করে উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র হয়ে উঠেছিল সুলভ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর বশ্যতা স্বীকার করেনি শিবতরাই। তাই রণজিতের রাজত্বে পঁচিশ বছরের চেষ্টায় মুক্তধারাকে বেঁধেছে যন্ত্ররাজ বিভূতি। শিবতরাইয়ের তৃষ্ণার জল এবং চাষের জলকে এবার নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করবে উত্তরকূট। ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা নিয়ে রাজ্যের সীমানায় বাঁধ দেওয়ার ফলে প্রতিবেশী রাজ্য শিবতরাইকে জল দেওয়া বা না দেওয়া উত্তরকূটের মর্জির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এও একটি বীভৎস রূপ। তৃষ্ণার জল উত্তরকূটের মর্জির অধীনে হওয়ায় শিবতরাই বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য, কারণ বশ্যতা মেনে চললে জল পাবে নইলে শুকিয়ে মরবে। ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ এবং জল বন্ধ করে বাঁ হাতের বদান্যতায় বাঁচিয়ে রাখা হবে শিবতরাইকে, কারণ উত্তরকূটের সাম্রাজ্যবাদী রাজা জানে—

> "বিদেশি প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।"[১৪]
>
> "যে প্রজারা দূরের লোক তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।"[১৫]

দেবতার দান মুক্তধারাকে বন্দী করে সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে উত্তরকূটের জয় উত্তরকূটের পুর-দেবতাদের জয়। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা এতদূর যে দেবতাকে নিজের সাম্রাজ্য বলতে পিছপা হয় না। তারা মনে করে তৃষ্ণা'র শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে উত্তরকূটের সিংহাসন তলায় ফেলে রেখে যাবে দেবতা। বর্তমানে কাবেরী ইস্যু বা গঙ্গা-তিস্তার জলবণ্টনেও অনেকটা একই চিত্র দেখতে পাই।

শুধু মুক্তধারা বা নন্দী সংকটের পথ বন্ধ-ই নয়, উত্তরকূটের মানুষদের শিবতরাইয়ের বিরুদ্ধে বিভীষিকা হয়ে ওঠার জন্য দেওয়া হয় উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষা। ঔপনিবেশিক শক্তিকে উপনিবেশের প্রতি শেখানো হয় প্রবল ঘৃণা, এবং তাদের প্রতি সহানুভূতির পথ আটকে দেবার জন্য প্রয়োজন হয় উগ্র-জাতীয়তাবাদের। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদ হল সাম্রাজ্যবাদেরই আরেক রূপ।

উত্তরকূটের গৌরবে গৌরব করার শিক্ষা ছাত্রদের শেখায় তাদের গুরু। তাই বিধাতার বিরুদ্ধে হাত চালিয়ে বিধাতা হতে ইচ্ছুক যন্ত্ররাজ বিভূতিকে শিরোপা দেওয়ার দিনে ছাত্রদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে যাচ্ছেন গুরু। অন্যের তৃষ্ণার জল বন্ধ করার এ-এক পৈশাচিক আনন্দ, ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। বিভূতি শিবতরাই-এর খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছে। রাজা ছেলেদের জিজ্ঞেস করছেন —

> "রণজিৎ। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?
> ছেলেরা। (লাফাইয়া হাত তালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।
> রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?
> ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্য।
> রণজিৎ কেন জব্দ করা?
> ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।
> রণজিৎ। কেন খারাপ?
> ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ ভয়ানক খারাপ সবাই জানে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?
গুরু। জানে বৈকি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িসনি— বইয়ে পড়িস নি— ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
ছেলেরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
গুরু। আর ওরা আমাদের মতো— কী বল না— (নাক দেখাইয়া)
ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।
গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কি প্রমাণ করে দিয়েছেন— নাক উঁচু থাকলে কী হয়?
ছেলেরা। খুব বড় জাত হয়।
গুরু। তারা কী করে? বল না— পৃথিবীতে বল— তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?
ছেলেরা। হ্যাঁ, জয়ী হয়।
গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?
ছেলেরা। কোনদিনই না।
গুরু। আমাদের পিতামহ মহারাজ প্রাগজিৎ দুশো তিরানব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?
ছেলেরা। হ্যাঁ দিয়েছিলেন।"[১৬]

এভাবেই সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালিত উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষা ছাত্রদের শেখানো হয়। মহারাজা বুঝে নিতে চান তাঁর দেশের ছাত্রসমাজ তাঁরই মতো (তথাকথিত!) দেশপ্রেমিক কী না? উপরের সংলাপ পড়ে মনে পড়ে যায় 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার মগজধোলাইয়ের কথা। মেকি দেশপ্রেমের মগজ ধোলাই কীভাবে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে উগ্র-জাতীয়তাবাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে ওঠে। 'মুক্তধারা'-তে যেন তারই একটি প্রতিলিপি আঁকা হয়েছে।

> "উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায় একদিন এই সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে।"[১৭]

—এই মহান দায়িত্ব নিয়েছে উত্তরকূটের পূজনীয় গুরুদেব। বর্বর সাম্রাজ্যলোভী, অত্যাচারী যে মানুষগুলোকে উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে গুরুরা রাষ্ট্র তাদের ব্যবহার করে। এই ছাত্রদের পূর্বসূরিদেরও উগ্র-জাতীয়তাবাদ শেখানো হয়েছে যার প্রমাণ উত্তরকূটের নাগরিকদের কথোপকথন। উত্তরকূটের নাগরিকরা যখন শিবতরাই-এর গণেশকে যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়ধ্বনি দিতে বলে তখন গণেশ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, গণেশকে তারা ব্যঙ্গ করে এবং বলে—

> "তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।"[১৮]

এতেই শেষ নয়, অভিজিৎ তিন পুরুষ ধরে বন্ধ থাকা নন্দী সংকটের পথ খুলে দিলে উত্তরকূটের ভোজন পাত্রের তলাটা খসে যায়। স্বার্থে ঘা পড়ে উত্তরকূটের উগ্র-জাতীয়তাবাদী মানুষের। তাই নন্দী সংকটের পথ আবার বন্ধ করার জন্য অমাবস্যার রাত্রিতে তারা লোক জোটায়। যারা সে কাজে যেতে রাজি নয় তাদের প্রতি দয়া দেখাতে পারেনা উগ্রজাতীয়তাবাদীর দল। হুব্বা এবং উত্তর ভৈরবের মন্দিরের ঘন্টা বাদক লছমনকে মর্জির বিরুদ্ধে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে যায়। লছমনের স্ত্রীর রোগের কথাও তাদের কানে ওঠেনা। এরইমধ্যে বনোয়ারি যখন বলে—

> "শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।"[১৯]

তখন কঙ্কর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বনোয়ারি বলে—

> "আমি এক পা নড়বে না।"[২০]

তখন তাকে বাঁধবার হুকুম দেয় কঙ্কর। উগ্র জাতীয়তাবাদী আচরণ ও কথাবার্তা শোনা যায় কঙ্করের মুখে—

> "উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।"[২১]

একই জায়গায় মানুষ হয়েও কঙ্কররা কোনো ব্যক্তিকে চেনে না। বাঁধ বাঁধার কাজে মজুর না পাওয়া গেলে রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে জোর করে তুলে আনা (জনাই গাঁয়ের অম্বার ছেলে সুমনও আছে) উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এক রূপ। বিশ্বাস আর মানবতার মূলে আঘাত করেই জয়ের গৌরব করে চলেছে উগ্র-জাতীয়তাবাদ। রণজিৎ বিশ্বাস করে না কাকা বিশ্বজিৎকে, প্রজারা বিশ্বাস করে না রাজাকে, সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অভিজিতের সঙ্গে, বিভূতি সন্দেহ করে বিশ্বস্ত চরদের এভাবে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বাতাবরণে মুক্তধারার সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের স্বরূপটি স্পষ্ট করে।

উত্তরকূটের মানুষদের পাশাপাশি শিবতরাইয়ের মানুষরাও উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা মনে করে উত্তরকূটের মানুষগুলো যেন একতাল মাংস নিয়ে গড়া, বিধাতা গড়তে শুরু করে আর ফুরসত পাননি। তাদের কাপড় পরার ধরন "যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে।"[২২] এমনকি শিবতরাইয়ের লোকেরা মনে করে উত্তরকূটের লোকেদের শিক্ষা পর্যন্ত নেই তাদের অক্ষরগুলো উইপোকার মতো। উত্তরকূটের মতোই শিবতরাই-এর একটি গুরু আছে যে কিনা একই রকম জাতীয়তাবাদী সুরে বলে—

> "ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈব চ।"[২৩]

শিবতরাইয়ের মানুষেরা ভাবে যে সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে গড়িয়ে পড়া অমৃতের মাটি দিয়ে শিবতরাই-এর পুরুষরা গড়া। আর দৈত্যরা যখন উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিল তখন সেই ভাঁড়-ভাঙ্গা পোড়া মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়।

> "তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ— অপবিত্র।"[২৪]

অভিজিৎ নন্দীসংকটের পথ খুলে দিয়েছে, সেই বন্দী ধারাকে করেছে মুক্ত। এই অভিজিৎ উত্তরকূট বা শিবতরাই-এর কেউ নয়, তার জন্ম মুক্তধারার ঝরনা তলায় অর্থাৎ দুই রাজ্যেরই সীমানায় — মনুষ্য বর্জিত এলাকায়। তাই তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের চর্চা নেই সে চর্চা করেছে মনুষ্যত্বের এবং হয়ে উঠেছে প্রাদেশিক বা দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক চরিত্র। উত্তরকূট বা শিবতরাইয়ের স্বার্থের সঙ্গে সে বদ্ধ নয়। সে নিজে মুক্ত বলেই শিবতরাইকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে, আবার একইভাবে শোষকের লজ্জা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে উত্তরকূটকে। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদী গর্বোদ্ধত শক্তির শোষণের ও তার থেকে মুক্তির ছবি আঁকা হয়েছে মুক্তধারা নাটকে। প্রসঙ্গত ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—

> "শুধু আমাদের নয় ইউরোপ-এশিয়া-আমেরিকায় ভবিষ্য মানুষের মরণ-বাচনের সমস্যার শুভ সমাধানের সংকেত এই ভাবনাট্যটিতে আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৈজ্ঞানিক মানুষের যান্ত্রিক বুদ্ধিকে চণ্ড করিয়া নামাইয়াছে। সেই সঙ্গে সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বণিক-বৃত্তি মিলিয়া পৃথিবীর বক্ষে যে পীড়ন যন্ত্র চালাইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণ প্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হইবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হইয়া যন্ত্র মানুষের দাস হইবে। — ইহাই মুক্তধারার মর্মকথা।"[২৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে স্বরাজের আশায় ভারতবাসী সাহায্য করেছিল ইংরেজকে। এমনকি ইংরেজের জয়ে ভারতবাসী উল্লাস পর্যন্ত করেছিল। ১৯১৮ সালে স্টার থিয়েটার অভিনয় করে 'খাসদখল'। সে-রাতের অভিনয়কে ঘোষণা করা হয় — 'victory celebration performance' মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় হয় 'ব্রিটিশ বিজয়', মিনার্ভাতে 'বিজয় উল্লাস'। কিন্তু ইংরেজ সরকার স্বরাজ দেওয়া দূরে থাক যুদ্ধ শেষে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের দিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে ব্রিটিশের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। সর্বত্র লোভ, মূল্যবোধহীনতা আর অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয় গোটা পৃথিবী জুড়ে, ঠিক যেমনটি হয়েছে মুক্তধারা নাটকে। উত্তরকূটের অহংকার, লোভ, শিবতরাইয়ের প্রতি ঘৃণা শুধু উত্তরকূটবাসীর নয় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীর, সব কালের, সমগ্র দুনিয়ার। আজকের দিনেও ইরাক-ইরানের ওপর মার্কিন আক্রমণ বা প্রাদেশিক হিংসা যেমন ভারত-পাকিস্তান হিংসা উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়ার হিংসা, হিন্দু-মুসলমান-ইহুদি-খ্রিস্টান জাতিবিদ্বেষ মুক্তধারা নাটকের সত্যকে এখনো প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। সমসাময়িক বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ফ্যাসিবাদী শক্তির লোভ-হিংসা-অহংকার-মিথ্যাচার এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অসহায়তার যে বাস্তবকে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— তারই নাট্যরূপ মুক্তধারা। আজকের ভিন্ন ধরনের ভিন্ন চরিত্রের সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের যুগে মুক্তধারা নাটকের নিবিড় পাঠের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, জীবন, উচ্চ-মাধ্যমিক আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা, জুন ২০০১, তৃতীয় সং, পৃ. ১৪৭
২. মুখোপাধ্যায়, জীবন, স্বদেশ পরিচয়, নবভারতী প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০০, পরিমার্জিত দ্বাদশ সং, পৃ. ৫০৫-৫০৬
৩. সেন, সুকোমল, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১ম খন্ড), কলকাতা, ১৯৮৬, তৃতীয় সং, পৃ. ১৭৩
৪. মুখোপাধ্যায়, জীবন, স্বদেশ পরিচয়, নবভারতী প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০০, পরিমার্জিত দ্বাদশ সং, পৃ. ৫০৪-৫০৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৬৪, পৃ. ৩০৮
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০৩, পৃ. ৪১
৭. তদেব, পৃ. ৩৫
৮. তদেব, পৃ. ১১
৯. তদেব, পৃ. ৩৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৪
১১. তদেব, পৃ. ৭৪
১২. তদেব, পৃ. ১১৯
১৩. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড), আনন্দ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৭, প্রথম আনন্দ সং, পৃ. ২৩৯
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ১৫
১৫. তদেব, পৃ. ১৫
১৬. তদেব, পৃ. ১৮
১৭. তদেব, পৃ. ১৮
১৮. তদেব, পৃ. ২৯
১৯. তদেব, পৃ. ৪২
২০. তদেব, পৃ. ৪৩
২১. তদেব, পৃ. ৪৩
২২. তদেব, পৃ. ২৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৩. তদেব, পৃ. ২৮

২৪. তদেব, পৃ. ২৮

২৫. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড), আনন্দ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৭, প্রথম আনন্দ সং, পৃ. ২৩০

Bibliography:

ঘোষ, শঙ্খ, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০১, (পঞ্চম সংস্করণ)

চ্যাটার্জি, শিবব্রত, রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০

জামান, মানসী, বাংলা নাটক (১৯৪০-৬০) আর্থসামাজিক দৃশ্যপট, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২

সিকদার, অশ্রুকুমার, রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য, আনন্দ(প্রথম সং), কলকাতা, ২০১০

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 558 - 566
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' জীবনী নাটকে উনিশ শতকীয় সামাজিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ-সন্ধান

সৌম্যজিৎ চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : soumojit111@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Biographical Drama, Bengal Renaissance, Young Bengal, Colonial influence, Reform movement, Nationalism, Marxist approach.

Abstract
Balai Chand Mukhopadhyay, widely known as 'Banaphool', was one of the most prolific authors of Bengali language and literature. Famous for his unique and intricate short stories, he also wrote sixty novels, nearly a thousand poems, numerous essays on diverse topics, five dramas, and several one-act plays during his literary career. Notably, he pioneered the modern Bengali biographical drama. 'Sri Madhusudan', published in 1939, was his first biographical drama. It was based on the life of the famous 19th-century Bengali poet, Michael Madhusudan Dutta. Three years later, in 1942, his second biographical drama, 'Vidyasagar', was published. These two plays gained immense popularity during that period. Surprisingly after this, Banaphool never returned to the biographical drama genre. In this research paper, we will primarily discuss the nature of the nineteenth-century social conflicts portrayed in the play 'Sri Madhusudan'. Additionally, we will critically analyze the success of this play in recreating specific historical period.

Banaphool wrote the play 'Sri Madhusudan' based on Jogindranath Basu's 'Michael Madhusudan Dutter Jeevan-Charita', a well-known biography of Michael Madhusudan Dutta published in 1893. This play is primarily recognized as a product of 20th-century modern Bengali literary thought. However, despite being a biographical drama, 'Sri Madhusudan' also portrays the conflicts and tensions hidden between different social groups and classes during the Bengal Renaissance. Here, we see characters from that period, such as Reverend Krishnamohan Bandopadhyay, a former disciple of Derozio, Rajnarayan Basu, a close associate of Brahma Debendranath Tagore and a prominent member of 'Tattwabodhini Sabha', Bhudev Mukhopadhyay, a supporter of conservative thoughts and values, Gourdas Basak, Bholanath Chandra, Madhu's other friends from Hindu College, Barrister Manomohan Ghosh, Rebecca and Henrietta, Madhusudan's Europian spouces etc. Each of these characters in this play, with their distinct beliefs and practices, alongside

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Madhusudan's central character, plays a pivotal role in helping us understand the nature of 19th-century Bengali society under colonial rule.

Discussion

প্রকরণগত বিচারে আধুনিক বাংলা জীবনী-নাটক যে বিশ শতকীয় মনন ও সাহিত্যচর্চার বিশেষ ফলশ্রুতি – গবেষক ও সমালোচক মহলে সে কথা অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, এই নবতম নাট্য-প্রকরণের কায়া ও আদর্শ নির্মাণে নাট্যকার বনফুলের কৃতিত্ব সর্বতোভাবে উল্লেখ্য। নাট্যকার হিসেবে বনফুল তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪২) নাটকে জীবনী-নির্ভর যুগোপযোগী বাংলা নাটক রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পরবর্তীকালে সেই পথে অনেকেই জীবনী-নির্ভর নাটক লিখতে প্রয়াসী হলেও, সবক্ষেত্রে সেই প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে বনফুল রচিত প্রথম জীবনী-নির্ভর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'শ্রীমধুসূদন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এই নাটকে উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকট বা রূপায়িত হয়েছে, মূলত তাই নিরূপণের চেষ্টা করা হবে। উল্লিখিত দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিচারের ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা খতিয়ে দেখা এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিশেষভাবে জরুরি। নাটকে এরূপ বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনার সমাবেশ বিরল নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই নাটক ব্যক্তি-জীবনী অনুসরণের প্রাকরণিক বাধ্যতাকে অনেকাংশে ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। ফলে নাটকের আধারে মধুসূদন জীবনীর বিষাদদীর্ণ, ট্র্যাজিক রসরূপ নির্মাণের পাশাপাশি নাট্যকার এই নাটকে সমসাময়িক যুগচিত্র অঙ্কনেও যথেষ্ট সফল হয়েছেন।

বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি মুখ্যত যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' (১৮৯৩) গ্রন্থের ওপর আধারিত। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'পশ্চাৎপট' (১৯৭৮)-এ নাট্যকার স্বয়ং একথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত জীবনী-গ্রন্থের থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদান নির্বাচন করে নাট্যকার এখানে মধুসূদনের জীবন-ট্র্যাজেডির যথাযথ নাট্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যি বলতে সমকালে এবং পরবর্তীতেও নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। এই নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন, -

> "বাংলা সাহিত্যে এই মধুসূদন নাটিকাটি নূতনত্ব পেয়েছে। মধুসূদনের চরিত্রচিত্র বাস্তব হ'য়ে উঠেছে।"[১]

তবে শেষপর্যন্ত এই বাস্তবতা নাটকের প্রয়োজনকেই সিদ্ধ করেছে, জীবনীর নয়। এ ব্যাপারে নাট্যকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ইতিহাস বা জীবনচরিত নয়, মধুকবির জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে এক ঐক্যসূত্রে বেঁধে, সংলাপময় দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে এক্ষেত্রে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা নাটক। মাইকেল-জীবনী পাঠের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মনে এই নাটক রচনার প্রাথমিক প্রেষণা জাগে। ফলত মধুসূদনের জীবনের নানান ঘটনার অনুষঙ্গে এখানে উনিশ শতকীয় সমাজ-প্রতিবেশ মূর্ত হয়েছে। এই নাটকের চরিত্রেরা ইতিহাসের এমন এক কালপর্ব থেকে আহৃত যা আমাদের আত্মপরিচয় অথবা সত্তানির্মাণ তথা আমাদের সামগ্রিক হয়ে ওঠা বা গড়ে ওঠার নিরিখে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে বাঙালি সমাজের পরিচিত বিন্যাসে দ্রুত বদল সূচিত হয়েছিল। 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের প্রধান এবং অন্যান্য কুশীলবেরাও সেই বদলের অংশীদার হয়েছিলেন। এই অংশগ্রহণ পরোক্ষ ছিলনা, বরং তা এতখানি প্রত্যক্ষ ও নিবিড় ছিল যার প্রভাব সমাজের পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও বর্তেছিল। সেই প্রভাব আত্মস্থকরণের মধ্যে দিয়ে তাঁরা সকলে নিজেদের সামাজিক তথা ঐতিহাসিক দায়ভার পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে এঁদের অনেকেই সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হিসেবে মান্য হয়েছেন। জীবনী-নির্ভর নাটক রচনার উদ্দেশ্যে নাট্যকার বনফুল তাই খুব সুদূর অতীতে নয়, বরং তাঁর পূর্ববর্তী শতক থেকেই চরিত্র নির্বাচন করে নিতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে প্রকরণের বিচারে নতুন একধরনের নাটক লেখার সূত্রপাত হয় যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে তখনও বাংলা ভাষায় জীবনী-নির্ভর নাটক রচনার এই ঐতিহ্য বাঙালির অনায়ত্ত ছিল।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন, অর্থাৎ মহাকবির জীবনের শেষ ত্রিশ বছরের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের কাহিনী আবদ্ধ। তবে এই সময়পর্বে কবির জীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ নাটকে নেই। বরং এক্ষেত্রে নাট্যকার কিছুটা স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। কবির জীবনী থেকে তিনি সযত্নে সেই সব উপাদান সংগ্রহ করেছেন যা তাঁর চরিত্রের অমোঘ, অনিবারণীয় পরিণতির নাটকীয় রসরূপ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নির্মাণে সহায়ক হবে। তাছাড়া মধুসূদনের জীবনে নাটকীয়তার কোনও অভাব ছিলনা। হিন্দু কলেজের ছাত্র, ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের প্রিয়শিষ্য মধুসূদন তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে বিবেচিত হতেন। নাটকেও তাঁর বন্ধুরা এবিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের সাক্ষ্য জানিয়েছেন। এই বন্ধু, সহপাঠীদের মধ্যে আমরা সেখানে গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দেখা পেয়ে যাই। বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল, তা বাঙালির দীর্ঘকালীন জড়তাকে ভীষণভাবে আহত করে। প্রসঙ্গত ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কথা স্মরণ করা যায়। নাটকে চরিত্র হিসেবে যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তরুণ বয়সে তিনি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। বিলেত যাওয়ার পাশাপাশি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য মধুসূদনের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ হিসেবে নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত উভয়ক্ষেত্রেই মধুসূদনকে আশাহত হতে হয়। নাটকের সপ্তম দৃশ্যে বন্ধু গৌরদাসকে, মধু স্বয়ং সেকথা জানিয়েছেন –

> "মধু। ...ভাই গৌর, বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়! আমার মনে শান্তি নেই-রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These rascals have treated me shabbily—বিলেত নিয়ে যাবে আশা দিয়েছিল—but now they are very cold about it. But go to England I must."[২]

আবার নবম দৃশ্যে কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে সংলাপেও এ ব্যাপারে মধুসূদনের ক্ষোভ ধরা পড়েছে। তাঁর ও দেবকীর পরিণয়ের বিপক্ষে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, মধুর মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলার প্রসঙ্গ টেনে আনায় প্রতিবাদী মাইকেল তাঁকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেছেন যে, একদা ডিরোজিও'র শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য, ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান, এমনকি নিজের পরিবার থেকে বিতাড়িত কৃষ্ণমোহন, কীভাবে তাঁর প্রতিশ্রুত বাক্য থেকে সরে আসতে পারেন –

> "মধু। May I ask you one question, sir? Are you not a disciple of the famous Derozio? Is he not the man who made drinking a fashion amongst us? Is it not a fact that you yourself drank, ate beef and were turned out of your own home? আপনি আমাকে বলছেন— উচ্ছৃঙ্খল মাতাল!"[৩]

বলা বাহুল্য, মধুসূদনের এই অভিযোগ অসঙ্গত নয়। ইউরোপীয় শিক্ষা এবং জীবনবীক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল বা 'ইয়ং ক্যালকাটা'র সদস্যেরা আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, হিন্দুধর্মের বিরোধিতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজে তুমুল আলোড়ন তৈরি করেছিলেন। সেকালের সংবাদ-সাময়িকপত্রে (সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি) তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছিল যার মধ্যে ফিরিঙ্গি পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণ, অপরিমিত মদ্যপান, দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ, গোমাংস ভক্ষণ, নাস্তিকতা প্রচার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য –

> "অপর প্রযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ কর্য়ে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ কর্য়ে জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা মহিষটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে যায় অতএব মেম্বর মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কুরীতির পরিবর্তে সুনীতিগুলীন সংস্থাপন করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের সুরীতির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> শাসন উল্লঙ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজ হইতে বাহির করিয়া দেন এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়া দেখুন কিপর্য্যন্ত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয়...।"[৪]

তবে সেকালে কেবলমাত্র রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের তরফ থেকেই যে নব্যবঙ্গীয়দের বিরোধিতা করা হয়েছিল তাই নয়, পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিরাও, ইউরেশীয় কবি ও শিক্ষক ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রদের গতিবিধির প্রতি সন্দিহান ছিলেন। এমনকি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বিরোধিতায় তাদের একজোট হতেও দেখা যায় –

> "রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ শুধু ডিরোজিও-বিরোধিতা করেননি, এই বিরোধিতায় খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিশেষ সক্রিয়তা ছিল। ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গে ডিরোজিও-পরিবারের যোগ থাকলেও প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ তথা আলেকজান্ডার ডাফ ভারতবর্ষে আসার পর থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের প্রতি তাঁরা প্রসন্ন ছিলেন না।"[৫]

আসলে ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির (Free Rational Thinking) প্রতি একধরনের আনুগত্য ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাছাড়া ছাত্রেরা তাঁদের গুরুর থেকে স্বদেশপ্রেম ও সততার শিক্ষা লাভ করেছিল। স্বভাবতই নাটকে কৃষ্ণমোহনের পরিবর্তন মধুকে বিস্মিত, ব্যথিত করেছে। উল্লেখ্য, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের মতো একক চরিত্র হিসেবে অবতীর্ণ না হলেও নাটকে প্রসঙ্গক্রমে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মতো অন্যান্য নব্যবঙ্গীয়দের উল্লেখ রয়েছে।

'ভারতে বৃটিশ শাসন' (১০ই জুন, ১৮৫৩) এবং 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' (২২শে জুলাই, ১৮৫৩) প্রবন্ধদুটি, ভারতীয় সমাজ ও তার বিবর্তন সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ভাবনার স্মারক বহন করছে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও ইংরেজের শাসন ভারতবর্ষে সামাজিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করেছে বলে মার্কস এখানে মন্তব্য করেন –

> "এ কথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল - এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"[৬]

বস্তুত চিরাচরিত গ্রামগোষ্ঠী-সংগঠন ও তাদের অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে ইংরেজ ভারতীয় সমাজের উৎপাদন সম্পর্কে মৌলিক বদল আনে। এই বদলের লক্ষণগুলি উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজে ক্রমে সুস্পষ্ট হয়। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার, সংবাদ-সাময়িকপত্রের আবির্ভাব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সামাজিক শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিভিন্ন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে যেমন যাবতীয় পুরনো আচার-সংস্কার-মূল্যবোধ-রীতিনীতিকে নতুন শিক্ষার আলোকে পরখ করে নেওয়ার অভ্যাস দেখা যায়, তেমনই সমাজের রক্ষণশীল অংশের সুসংহত বিরোধিতার দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। দীর্ঘকালীন জড়তাভঙ্গের ফলে সমাজের তথাকথিত শান্তি বিঘ্নিত হয়, পাশাপাশি সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে।

নাটকে মধুসূদন চরিত্রের মধ্যে এক বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বন্ধুদের ভাষায় 'rebel' বা 'revolutionary' মধু বসনে-বেশভূষায় খাঁটি ইউরোপীয়। শেক্সপীয়র ও মিলটনের দেশ তাঁর কাঙ্ক্ষিত তীর্থস্থল। অমিত আকাঙ্ক্ষা ও তার অচরিতার্থতা – নাটকে মধুর চরিত্রের পরিণতিকে দ্যোতিত করেছে। সমকালীন হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতাকে অস্বীকার ও তার বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের বিদ্রোহ ফুরিয়ে যায়নি, অধিকন্তু তা তাঁকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পথে চালিত করেছে। কিন্তু ইংরেজিতে কাব্যচর্চা করলেও, 'নেটিভ' মধুসূদন ইংরেজের থেকে কোনও বিশেষ স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারেননি। এমনকি বিশপস কলেজে পাঠরত অবস্থায় গোরাদের পাশে মধু ও অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হয়। মধুর তরফ থেকে এর প্রতিবাদ নাটকের একাধিক দৃশ্যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের চোখে পড়বে। যেমন নবম দৃশ্যে কলেজে তাঁর আচরণ সংক্রান্ত কৃষ্ণমোহনের অভিযোগের উত্তরে মধু জানিয়েছেন–

> "মধু। Ashamed? Why? খাবার পর প্রত্যেক student-কে wine দেওয়ার নিয়ম – that is our legitimate due. Why will that rascal of a steward refuse to give us our share?
> কৃষ্ণমোহন। He did not refuse – মদ আর ছিল না – that is a fact – ফুরিয়ে গিয়েছিল।
> মধু। ফুরিয়ে গিয়েছিল? সাহেবদের বেলায় ফুরোয় না, আর Indian student-দের বেলাতেই ফুরিয়ে যায়? I won't tolerate this injustice, I am simply fed up with the distinction They make between black skin and white skin."[৭]

খুব স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রের অন্তর্লীন মর্যাদাবোধ ও আভিজাত্যের গরিমায় এহেন মধুসূদনের পক্ষে কলকাতার 'ইস্ট-ইন্ডিয়ান' সমাজে মিশে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছে। তাই বিদেশিনী অর্ধাঙ্গিনীর পাশে এই একক, নিঃসঙ্গ মাইকেলের মধ্যে নাট্যকার উৎপল দত্ত, ষোড়শ শতকের স্পেনীয় লেখক মিগুয়েল দ্য সেরভান্তেস কর্তৃক সৃষ্ট অবিকল্প দন কিহোতে চরিত্রের তুলনা খুঁজে পেয়েছেন। আর সত্তার অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল এই ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্যের সার্থক রূপদানের ফলে কিছু কিছু ত্রুটি (যেমন: কালানৌচিত্য দোষ) থাকা সত্ত্বেও নাটকে মধুর চরিত্র এত জীবন্ত হয়েছে।

'মধুসূদন-স্মৃতি' গ্রন্থে, উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের প্রেক্ষিতে মাইকেলের স্থান-নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রাবন্ধিক সঞ্জীব সেন, সমকালীন মননচর্চার তিনটি ধারার উপস্থিতির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন। নবজাগরণের এই ত্রিধারা বিংশ শতকের চিন্তার উজ্জীবন ঘটিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন খাতে। এরা হল – নব্যমানবতাবাদী ধারা, যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তির ধারা এবং সর্বোপরি নব্য হিন্দুত্বের ধারা। প্রাবন্ধিক যথাক্রমে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে প্রথম, ডিরোজিওকে দ্বিতীয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে তৃতীয় ধারার প্রাণপুরুষ রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবার প্রথমোক্ত দুই ধারার বিরোধিতায় সমাজের রক্ষণশীল অংশ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কীভাবে সংহত বা একজোট হয়েছিল, সে উল্লেখ পূর্বে রয়েছে। অন্যদিকে আলোচ্য নাটকে ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গলের পাশাপাশি অন্যান্য ধারার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও লক্ষ করা গিয়েছে। পাশাপাশি অনেক সংলাপে আলাদা আলাদা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী একাধিক সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যারা তৎকালীন সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বা স্বরূপ বুঝতে সহায়তা করে। প্রসঙ্গত 'জ্ঞানান্বেষণ' 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' থেকে শুরু করে 'তত্ত্ববোধিনী', 'চন্দ্রিকাপ্রকাশ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'দ্য রিফর্মার', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'বেঙ্গল হরকরা', 'মাদ্রাস সারকুলেটর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সিটিজেন' সহ আরও বেশ কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের নামোল্লেখ করা যায়। এমনকি নাটকের সর্বশেষ দৃশ্যে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-এর উল্লেখ পর্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে; যদিও তা স্রেফ উল্লেখমাত্রই। তবে উল্লিখিত অন্যান্য পত্রপত্রিকাগুলি সমসাময়িক কালপর্বের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গের সংকেত পাঠকের কাছে ঠিকই হাজির করে।

ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচলন সমাজ-অভ্যন্তরে কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সেকথা ইতিপূর্বে প্রবন্ধে আংশিকভাবে এসেছে। ইংরেজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেকালে এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সাথেই রেলপথের বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই ঔপনিবেশিক শাসকের নিজস্ব স্বার্থের অনুকূলে প্রণীত হয়েছিল। অথচ এই প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্মোচন ও প্রসার, পরাধীন ও বিজিত এক বিপুল জনগোষ্ঠীর হাতে ভাবী পরিবর্তনের অমোঘ আয়ুধ তুলে দিয়েছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানোদয়ের ফলে উদ্ভূত দেশীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী (Local Intelligentsia), বিভিন্ন সামাজিক নীতি ও আইনকানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি এই শ্রেণীর গভীর সম্ভ্রমবোধের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতার এহেন প্রচেষ্টা একমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি তাঁদের কুণ্ঠাহীন আনুগত্যের পরিচয়বাহক নয়। এই প্রসঙ্গে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ইংরেজরা পুরোদস্তুর ক্ষমতায় আসবার পর আমাদের দেশটাকে কীভাবে দ্রুত গড়ে তোলা যায়, কী করে ইংরেজদের সভ্যতার সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেই তাদের সমতুল্য হয়ে ওঠা সম্ভব, সেটাই ছিল আমাদের বরেণ্য, সংস্কারকদের লক্ষ্যস্থল।"[৮]

অবশ্য এই প্রবণতার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাদেশিকতার প্রথম অঙ্কুর যা যথাকালে, উপযুক্ত পরিবেশে পরিস্ফুট হয়েছিল। নাটকে, মধুসূদন চরিত্রের মধ্যে এই স্বাদেশিকতাবোধের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন বিশপস কলেজে 'নেটিভ' ক্রিশ্চান মধুসূদনের ওপর ইউরোপীয় কলেজিয়েট পোশাকের বদলে সাদা ক্যাসক পরে আসার হুকুম জারি হলে তিনি 'বহুবর্ণ বিচিত্রিত' জাতীয় পোশাক পরে কলেজে হাজির হয়েছেন। আবার কলেজের স্টুয়ার্ড ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ ওয়াইন দিতে অসম্মত হলে প্রতিবাদী মধু যেভাবে খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার করে উঠে এসেছেন, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ পূর্বেও রয়েছে। সুতীব্র মর্যাদাবোধের পাশাপাশি এহেন কাজ নাটকে মধুসূদন চরিত্রের দৃঢ়তা ও স্পর্ধিত আত্মপ্রত্যয়কে প্রতিফলিত করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি তিনি পিতা রাজনারায়ণের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়, যার একাধিক প্রমাণ নাটকে রয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, মধুসূদনের স্বদেশ তথা বঙ্গপ্রীতির দৃষ্টান্ত এরপর নাটকের দশম দৃশ্যে নটবরের সাথে কথোপকথন পর্বে পরিলক্ষিত হয়। মাদ্রাজে ইউরোপীয় কায়দায় সজ্জিত মধুর অন্দরমহলে সাক্ষাৎপ্রার্থী নটবরের সাথে বঙ্গদেশ ও সমাজের সংবাদ এসে প্রবেশ করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টান মধুসূদন, বন্ধু গৌরদাসের থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। কিন্তু পত্র দ্বারা অনুরোধের পরেও গৌরের তরফ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় অভিমানী মধুসূদন বাংলাদেশের খবর শুনে উচ্ছ্বাসের বদলে অনীহা প্রকাশ করেছেন – "I refuse to be interested in anything that concerns Bengal"[৯], আর সেজন্যই জর্জ টমসনের British India Society এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের Bengal Landholders Association -এর মিলিত সংগঠন British India Association তৈরির খবরও মধুর কাছে ফিকে হয়ে গিয়েছে। দেশীয় জনতার পরিচয় বহনকারী, প্রচলিত 'নেটিভ' শব্দ ব্যবহার করায়, নটবরের বিরুদ্ধে মধুর সচেতন প্রতিবাদও এখানে লক্ষণীয়।

দ্বাদশ দৃশ্যে মিশনারিদের প্রতি আস্থাচ্যুত, মাতৃহারা মধুর সংলাপে আবারও বাংলাদেশের প্রতি গভীর অভিমান ঝরে পড়েছে। নটবর বাংলায় লেখার অনুরোধ জানালে তীব্র আক্ষেপবশত মধুসূদনের উক্তি –

> "মধুসূদন। বাংলা লেখবার জন্যে নিজেই আমি ছটফট করছি; I know I can make and remake that language, বাংলা ভাষার চেহারা বদলে দিতে পারি আমি। কিন্তু কেউ আমার লেখা পড়বে না, বাংলাদেশ চায় না আমাকে and I know it for certain."[১০]

পিতার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আগত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সাথে আলাপচারিতার সময়েও মধু চরিত্রের মধ্যে 'বাঙালীসুলভ' এই প্রগাঢ় অভিমানবোধ সংক্রামিত হয়েছে।

এছাড়া চতুর্দশ দৃশ্যে রঙ্গলালের কবিতার প্রশংসায় মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতির অন্তর্লীন দীপ্তির আঁচ পাওয়া যায়। যদিও এই প্রীতি কোনরকম সংকীর্ণ গণ্ডি বা সীমার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলনা। বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একাধিক সাহিত্যাদর্শ থেকে তাঁর রচনাকর্মের বিষয় ও আঙ্গিক নির্বাচনের প্রবণতার মধ্যে এই অনুভূতির সম্যক প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

এরপর পঞ্চদশ দৃশ্যে মধু-বিদ্যাসাগর কথোপকথন পর্বে, বিদ্যাসাগর যখন 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদক হিসেবে মধুসূদনের নামোল্লেখ করেন (যদিও এই তথ্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে), তখন তাও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর দরিদ্র প্রজার পক্ষাবলম্বনের ভূমিকাকেই সাব্যস্ত করে। আবার অষ্টাদশ দৃশ্যে সাগরদাঁড়ি থেকে আগত প্রবীণ পণ্ডিতমশাইয়ের প্রতি মধুর আচরণে বিস্মিত গৌরদাসের মন্তব্য, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচায়ক –

> "গৌরদাস। লোকটা বাইরে খাঁটি সায়েব অথচ অন্তরে খাঁটি বাঙালী। আশ্চর্য!"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এভাবে মধুসূদন চরিত্রের মধ্যে মূর্ত গভীর স্বদেশানুরাগ নাটকে বারবার তাঁর বিদ্রোহী সত্তার পরিচয়কেই উন্মোচিত করেছে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার আলোচ্য নাটকে মধুসূদনের পাশে যে সমস্ত চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়, তাঁদের সকলের পরিবর্তন ও পরিণতি একই পথে ঘটেনি। তবে ঔপনিবেশিক শাসকের প্রতি তাঁদের মনোভঙ্গি সময়ের সাথে সাথেই ক্রমশ বদলে গিয়েছে। এই শাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে অনবগত না হলেও প্রথমদিকে এঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং মুগ্ধতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এঁরা অনেকেই বৃটিশ প্রশাসকের বিরুদ্ধে 'চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি' পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা সম্ভব যে তৎকালীন সমাজের প্রধানতম দ্বন্দ্বের চরিত্র এঁদের কাছে যথারূপে প্রতিভাত হয়েছিল –

> "বর্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্য বিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া আর এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্তমান প্রভুরা যত ভাল, তত ভাল না হইতেও পারেন। অতএব এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশা পূরণ করেন না। পূর্ব্বে সাহেবেরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলণ্ড গমনের সুবিধা হওয়াতে এদেশের প্রতি সাহেবদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা মমতা কমিয়া গিয়াছে...।"[১২]

১৮৭৩ সালে 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসু একথা উল্লেখ করেন। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যেও দেখি বন্ধুপরিবৃত রাজনারায়ণ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-প্রকাশক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্রের সাথে যুগ্মভাবে তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। বিধবা বিবাহের সপক্ষে জনমত গঠনে বেঙ্গল স্পেক্টেটরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। তাছাড়া খাদ্যাভ্যাস সংস্কারের প্রশ্নে এই পত্রিকা নিরামিষ খাবারের পরিবর্তে মাছ-মাংসের মতো জীবনীশক্তির বিবর্ধক আমিষ খাদ্য গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছিল। সর্বোপরি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আরও বেশি সংখ্যক দেশীয় প্রার্থীর অন্তর্ভুক্তির পক্ষেও তৎকালীন সময়ে বেঙ্গল স্পেক্টেটর জোর সওয়াল করে। এহেন পত্রিকা এবং রামগোপাল ঘোষের প্রসঙ্গ এই নাটকে একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে।

যাইহোক, মধুর খ্রিস্টান হওয়াকে সর্বতোভাবে সমর্থন না করলেও নাটকের এই একই দৃশ্যে রাজনারায়ণ সমকালীন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। স্বভাবতই 'স্বদেশীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী', রক্ষণশীল ভূদেব তাঁর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের গতিবিধির কথা প্রকাশ্যে এনেছেন যা তথ্যগত বিচারে নির্ভুল। ব্রাহ্মসমাজের অনুসারী রাজনারায়ণ একসময় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি এই পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার সদস্যও ছিলেন। মতাদর্শ প্রচার ও নীতিগত ক্ষেত্রে এই সভার অন্যান্য সদস্যদের বিরোধিতায় ক্ষুণ্ন দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্যে লিখছেন –

> "কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইঁহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কার না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"[১৩]

দেবেন্দ্রনাথের এহেন মন্তব্য থেকে সমসাময়িক মেধা ও মননচর্চার দ্বন্দ্ববিরোধপূর্ণ, বহুরৈখিক স্বরূপটির পরিচয় পাওয়া যায়, যা বর্তমান নাটকেও নানাভাবে আভাসিত হয়েছে।

রাজনারায়ণ ছাড়া মধুসূদনের অপরাপর বন্ধু হিসেবে নাটকে উপস্থিত ভূদেব চরিত্রটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ভূদেবের মধ্যে রক্ষণশীল, সনাতন পন্থায় বিশ্বাসী যুবকের পরিচয় মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ভূদেব শুধু আচার-ব্যবহারে রক্ষণশীল ছিলেন তাই নয়, পাশাপাশি তিনি উনিশ শতকের একাধিক মৌলিক সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধতাও করেছেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষক ভূদেবের ঘোর আপত্তির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ

করা যায়। এমনকি ভূদেব জাতিভেদপ্রথার সপক্ষেও লেখনী ধারণ করেছেন। যদিও আলোচ্য নাটকে সেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, থাকার কথাও নয়। বরং মধুসূদনের আন্তরিক বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই ভূদেব চরিত্রটি নাটকে স্থান পেয়েছে। তাঁর অনুরোধে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার কথা নাটকে মধু স্বয়ং বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছেন। সর্বোপরি সৌখিন নাট্যশালার প্রসারের যুগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক তথা পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 'দ্য রিফর্মার' পত্রিকার সম্পাদক, অভিজাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণোত্তর পর্বে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুসূদনের দুই স্ত্রী রেবেকা ও হেনরিয়েটা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের 'গোঁড়া হিন্দু' স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী ও কন্যা দেবকী (দৈবকী) প্রভৃতি চরিত্রগুলি কিছুটা গৌণভাবে নাটকে স্থান লাভ করেছে।

এভাবে মধুর সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি নবযুগের সাক্ষ্য বহনের পাশাপাশি নাটকে যুগের অন্যবিধ লক্ষণ বা সংকেতগুলিকেও মূর্ত করে তুলেছে। তার মধ্যে থেকে ঔপনিবেশিক শাসনে শাসক-শাসিত সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম টেনশন বা উত্তেজনার দিকটি যেমন শনাক্ত করা সম্ভব, তেমনি সমাজে স্বার্থরক্ষাকারী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং তাদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের রূপরেখাঙ্কনও নিতান্ত কঠিন নয়। ফলত জীবনী-নির্ভরতার প্রকরণগত ঘেরাটোপ অতিক্রম করে এই নাটক, উনিশ শতকীয় বাঙালি-মননচর্চার বিবিধ মাত্রাগুলিকে দ্যোতিত করে। আর সেই দ্বন্দ্বমুখর, বহুমাত্রিক, তরঙ্গক্ষুব্ধ সময়ের ক্যানভাসে নাট্যকার আমাদের মধুসূদন চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করান যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম এপিক, ওড, সনেট, প্রহসনের সার্থক স্রষ্টা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, সদা বিদ্রোহী এবং সমকালীন যুগচেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক।

Reference:

১. বনফুল, 'রবীন্দ্র স্মৃতি', প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৬২
২. বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৬
৩. তদেব, পৃ. ৫৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩৪০, কলকাতা, পৃ. ১৭২
৫. রায়, অলোক, 'উনিশ শতক', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৯১
৬. মার্কস, কার্ল, মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি (৩য় খণ্ড), প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯, মস্কো, পৃ. ১৪৩
৭. বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৫৫
৮. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'শতবার্ষিকীর আলোছায়ায়', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৯
৯. বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৫৮
১০. তদেব, পৃ. ৭০
১১. তদেব, পৃ. ১০৪
১২. বসু, রাজনারায়ণ, 'সে কাল আর এ কাল', দ্বিতীয় মুদ্রণ, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮০০ শক, কলকাতা, পৃ. ৭৮-৭৯
১৩. রায়, অলোক, 'উনিশ শতক', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৭২

Bibliography:

বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', কলকাতা, অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০

ঘোষ, ড. অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

দত্ত, বিধান সম্পাদিত, মধুসূদন স্মৃতি, সাহিত্যম, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

ঘোষ, অমলকুমার, 'বনফুলের জীবনী নাটক শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর', পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২৩

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 567 - 572
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রাণী সুমিত্রা থেকে তপতী হয়ে ওঠা - 'তপতী' নাটকে আত্মত্যাগের পথে এক আদর্শ স্থাপনের যাত্রা

ড. ঋতুপর্ণা বসাক দাশগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপিকা, ইংরাজি বিভাগ
শিলিগুড়ি বি. এড. কলেজ, দার্জিলিং
Email ID : ritunbu@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
দাম্পত্য প্রেম, দ্বন্দ্ব, সংকট, আদর্শ, তপতী।

Abstract
নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে দ্বন্দ্ব, আবেগ, সংলাপ ও কর্মের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন এবং একটি বার্তা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ যে একান্তই কবি এবং নাট্যকার হিসেবে তাঁর দুর্বলতা যাকে "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি" - অনেক সমালোচককৃত এ অভিযোগ দীর্ঘকালের হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ট্রাজেডি নাটক গুলিতে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা সুস্পষ্ট। সেই অনন্যতা তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন রীতির কুশলতায়, বলার আর্ট দিয়ে তিনি তাঁর ট্রাজেডির স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকটি একাধারে প্রেম, সংকট ও দ্বন্দ্বের কথা বলে। এই দ্বন্দ্ব ও সংকট একদিকে কাশ্মীর ও জালন্ধরের মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পর্ক আবার অপরদিকে রাজা বিক্রমদেব এবং রানী সুমিত্রার ব্যক্তিগত দাম্পত্যকে অস্থির করে তোলে। বিক্রমের স্বার্থকেন্দ্রিক বাসনা এবং জোর করে সুমিত্রার প্রেমকে অধিকৃত করতে চাওয়ার মোহপাশ থেকে তাকে কিছুতেই মুক্ত করতে না পেরে শুরু হয় সুমিত্রার আত্মশুদ্ধির তপস্যা যা তাকে উন্নীত করে তপতীতে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই দাম্পত্যের নির্মাণ ও বিনাশের কারণ ও স্বরূপ অন্বেষণের একটি প্রয়াস করা হবে।

Discussion

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' (১৮৮১) নাটকখানি আগাগোড়া নতুন ভাবে লিখিত হয়ে তাঁরই হাতে 'তপতী' (১৯২৯) নাটকে নবরূপ লাভ করেছে। কানাডা-জাপান সফরের শেষে শান্তিনিকেতনে ফেরার পরে নিঃসঙ্গতা যখন তাঁকে গ্রাস করছিল সেই সময় তিনি হাত দিলেন 'তপতী' রচনায়। কয়েকমাস আগে কলকাতায় 'রাজা ও রানী' নাটকটি অভিনয়ের পরিকল্পনা হওয়ায় তাকে অভিনয় যোগ্য করে তোলার জন্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত করে তার নামকরণ করেছিলেন 'ভৈরবের বলি' কিন্তু নিজের রচনায় নিজেই খুশি হতে না পেরে শেষপর্যন্ত পাঁচ মাস পরে লিখলেন নতুন নাটক 'তপতী'। প্রভাত

কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (তৃতীয় খণ্ড) জানাচ্ছেন যে নির্মল কুমারী মহলানবিশকে ১৯২৯ সালের ৮ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

> "গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে - দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি - বোধ করি দিন দশেকের বেশি সময় নেয় নি।"[১]

প্রথমে পাণ্ডু লিপিতে নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'সুমিত্রা', পরে গ্রন্থ মুদ্রণের সময় নাম দেন 'তপতী'। অবশ্য এমন নামান্তর ও রূপান্তর রবীন্দ্র নাট্যধারার একটি বিশিষ্টতা বলা যেতে পারে যা সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, -

> "রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটককে পরবর্তীকালে রূপান্তর ও নামান্তর দিয়াছেন, তাহা ছাড়া নূতন সংস্করণের সময়েও অনেক নাটককে প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত করিয়াছেন। কোন কোন নাটকের রূপান্তর এত অধিক হইয়াছে, যে দুখানিকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, যেমন রাজা ও রাণী এবং তপতী।"[২]

এখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা কারণ অন্যান্য অনেক নাট্যকারকে স্বরচিত নাটকের সংস্করণভেদে পরিমার্জনা করতে দেখলেও স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদায় বিকল্প রূপ দিতে বড় একটা দেখা যায় না।[৩]

নতুন নাটক 'তপতী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

> "'রাজা ও রানী' আমার প্রথম বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা। সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ আছে - সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহন করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা। রচনার দোষে সেই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি।"[৪]

এবারে সেই ভাবটি স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠল যখন কাব্য নাট্য 'রাজা ও রানী' রূপান্তরিত হল গদ্যনাট্য 'তপতী'তে।

আদর্শ বাদে অনুপ্রাণিত ভারতীয় চেতনায় সাহিত্যের সত্য রূপে ট্রাজেডির সত্যকে মর্যাদা দেয়নি ভারতীয় সাহিত্য - এমনটাই বলেছেন অশ্রু কুমার শিকদার তাঁর 'রবীন্দ্র নাটকে রূপান্তর ও ঐক্য' শীর্ষক গ্রন্থে। তাঁর মতে –

> "যে জীবন দৃষ্টির ফলে ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি কোন দিন প্রশ্রয় পায়নি সেই জীবন দৃষ্টি ক্রমে-ক্রমে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন অধিক পরিমাণে লাভ করেছিল। উপনিষদীয় আনন্দবাদের তত্ত্বকে তিনি যে শুধু সচেতনভাবে গ্রহন করেছিলেন তাই নয়, তাঁর ঐতিহ্য সচেতন মনের স্বাভাবিক গঠনও ঐ মতবাদের অনুকূল ছিল... আদর্শবাদী চেতনার উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকগত প্রয়োজনেই 'রাজা ও রানী'কে 'তপতী'তে রূপান্তরিত করেননি - এই ঐতিহ্যের প্রভাবে তিনি 'রাজা ও রানী'র ট্র্যাজিক চেতনার অসম্পূর্ণ ও অসার্থক প্রকাশ টুকু 'তপতী' রচনাকালে অপসারিত করেছেন।"[৫]

উপনিষদীয় আনন্দবাদের তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি নাটক রচনার এক স্বকীয় ধারার প্রবর্তন করলেন। শঙ্খ ঘোষের মতে বিসর্জন লেখার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে শুরু করেছিলেন যে চলতি ট্রাজেডির ধারণা না তাঁর নিজস্ব জগত না

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতবর্ষের।[৬] নাটকের পরিণামে সুমিত্রা যেভাবে তপতী হয়ে উঠলেন তার মধ্য দিয়ে নবজীবনের প্রতি ইঙ্গিত, দ্বন্দ্ব অবসানে স্বকীয়তার সেই প্রতিষ্ঠার কথাটিই মুখ্য হয়ে ওঠে।

নাটকের প্রারম্ভে ভোগের দেবতা মদন আর ত্যাগের দেবতা রুদ্র ভৈরবের পুজোর দ্বন্দ্ব দিয়ে নাটকের দুই মুখ্য চরিত্র বিক্রম ও সুমিত্রার জীবনে আসন্ন দ্বন্দ্বের আভাস রচিত হয়। জলন্ধর রাজ বিক্রম কাশ্মীর রাজ্য জয় করে রাজ কুমারী সুমিত্রাকে বিবাহ করতে চাইলে 'প্রজা রক্ষার করুণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার করে' সুমিত্রা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং প্রার্থনা করেন, 'রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়'। তাই এই বিবাহ সুমিত্রার সানন্দ অনুমোদন সিদ্ধ ছিল না। ছিল একপ্রকারের সমঝোতা যা তিনি করতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন পুর বৃদ্ধ গণের অনু রধে, বিক্রমের আক্রমণে ও উৎপাতে ধ্বস্ত কাশ্মীরকে বাঁচাতে। ঘটনার আকস্মিকতায় ব্যথিত ও বিহ্বল সুমিত্রা মার্তণ্ড দেবের মন্দিরে তিন দিন তপস্যা করে নিজেকে শোধিত করে দাম্পত্য বরণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সুমিত্রার চরিত্রে তপস্যার ভুমিকা প্রস্তুত করেছেন। সুমিত্রার কাছে দাম্পত্য এক তপস্যা। ধ্যান ও উপবাসের মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করে অসহ্য অপমানবোধকে দগ্ধ করে তারপর স্বামী রূপে বিক্রমকে বরণ করেছিলেন সুমিত্রা। অর্থাৎ সুমিত্রা প্রথম থেকেই ত্যাগ ও তপস্যার প্রতিমূর্তি। তাঁর প্রেমে মিশে আছে পরহিত, প্রজা বাৎসল্য, প্রেম ও করুণাধারা। বিবাহের পর থেকে সুমিত্রা প্রতিদিন মনে মনে এই সাধনা করে চলেন যে দুর্জয় আসক্তিতে তিনি কিছুতেই ভেসে যাবেন না, সেই দুর্জয়তাকে ঠেকাতে গিয়েই তাঁর মন অবিচল পাষাণ হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। তিনি রাণীর দায়িত্ববোধে সচেতন বলেই তাঁর সংঘাত ক্রমশ জটিল আবর্তময় হয়ে উঠতে দেখা যায়। তাই বিক্রম যখন মকরকেতনের পূজার আয়োজন করে নগরীকে ঢেকে দিতে চান উৎসবের আতিশয্যে, তখন সুমিত্রা যোগীশ্বর বৈরাগী কৈলাসনাথের কাছে হয়েছেন আত্মসমর্পিত। দুই পূজারীর দুই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত দুই দেবতার কাছে পূজা তাদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যকে প্রকটতর করে মাত্র।

জালন্ধররাজ বিক্রম কাশ্মীর রাজ্য জয় করে সেখানকার রাজকুমারী সুমিত্রাকে বিবাহ করে এনে রাজ্যে বিজয়োৎসবের আয়োজন করে মদনদেবকে উৎসবের কর্তৃত্ব দিতে চাইলে তাঁর সুহৃদ তথা রাজ্য ও রাজার হিতৈষী দেবদত্ত পরামর্শ দিয়েছেন রুদ্র ভৈরবকে সে কর্তৃত্ব দিতে কারণ রুদ্র ভৈরব মানুষকে মদন দেবের মতো শুধু স্বপ্ন জগতে অলস ভাবে রূপ-সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে বেঁধে না রেখে তাকে ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জীবনাদর্শের প্রতি নিয়োজিত হবার জন্য শক্তি প্রদান করেন এবং মোহ আবরণ ছিন্ন করেন। ভৈরব দেবতার প্রাঙ্গণে দেবদত্ত ও একদল উপাসক যোগীশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে গান গেয়েছেন, "হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহো।/ দূর করো মহারুদ্র,/ যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,/ মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ" - এই গান ভোগের দেবতা মদনকে ভস্মীভূত করে শিব অর্থাৎ মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করেছে। বিক্রম দেবের অন্ধ আবেগের বিপরীতে রয়েছে সুমিত্রার নিঃস্বার্থ ত্যাগ। বিক্রমের কর্তব্য বিমুখতা ও সৌন্দর্য মোহে কল্যাণবোধহীনতা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তিনি সুমিত্রার বাহ্যিক অপরূপ রূপের মোহে পাগলপ্রায়, কিন্তু সুমিত্রার অন্তরের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও লাবণ্যের পরিচয় পেতে চাননি কখনো। রাণী সুমিত্রার বহিরঙ্গ রূপের অন্তরালে গভীরতর এক সত্য ও সুন্দরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি রয়ে গিয়েছেন অজ্ঞ। আর তা দেখতে ও বুঝতে ব্যর্থ বিক্রমের সাথে এ নিয়েই দেবদত্তের তর্ক বেঁধেছে। দেবদত্ত যথার্থই বলেছেন, "নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ প্রজাদের; শুধু কি তিনি রাজবধূ? তিনি যে লোকমাতা"। এই 'লোকমাতা'র ভুমিকা বিক্রম কিছুতেই বুঝতে চাননি। শুধু তাইই নয়, প্রেমে অন্ধ হয়ে রাজার কর্তব্যকে পর্যন্ত অবহেলা করেছেন গর্বভরে কিন্তু সুমিত্রা তা মেনে নিতে পারেননি। বিক্রমের ভোগের আকাঙ্ক্ষা সুমিত্রাকে শুধু ভোগের রাজ্যে পেতে চায় কিন্তু সুমিত্রা তা চান না, তিনি চান চিত্রাঙ্গদার মতো স্বামীর পাশে থাকতে, সব সঙ্কটে সম্পদে বিক্রমের সহচরী হয়ে দাঁড়াতে। তাই তিনি বলেন, "আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না সিংহাসনের পাশে?... আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে"। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জীবনবীণার তার সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে বাঁধা। সুমিত্রার মন জয় করতে বিক্রম বলেন, "আমার রাজ কোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি... তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে। তখন সুমিত্রা উত্তর দেন, - "ক্ষমা করো মহারাজ... অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে, তবে এসব তো বন্দিনীর বেশভূষা – এ আমি বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ করো সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী? সে আমি নই"।

দু'জনের দাম্পত্যের আদর্শে বিশাল ব্যাবধান। বিক্রম চেয়েছেন নিষ্কাম প্রেমকে সকাম প্রেমের সঙ্কীর্ণতায় বেঁধে সঙ্কুচিত করে রাখতে আর সুমিত্রার প্রেমে রয়েছে দুরূহ তপস্যা - সে প্রেম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে বেড়িয়েছে জীবনভর। শান্তিনিকেতন রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে প্রেম দুঃখকে স্বীকার করে নেয়... এই দুঃখের মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে"। সুমিত্রার প্রেম এইরকম-ত্যাগ-দুঃখ-তপস্যায় উজ্জ্বল।

অবশেষে কাশ্মীর থেকে আগত কর্মচারীদের অত্যাচারে জর্জরিত জলন্ধরবাসীগণের অসহায় আর্তনাদে, সতীতীর্থের তীর্থযাত্রীদের কাছ থকে জোর পূর্বক কর আদায় এবং সতী ধরমের অবমাননার সংবাদে সুমিত্রার সহ্যশক্তি শেষ সীমা অতিক্রম করে। রাজা বিক্রমের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে চলে গেলেন রাজ্য ছেড়ে, "রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারিনি, শুভকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না" - চিঠি পড়ে সঙ্কীর্ণ ক্রোধে অন্ধ হয়ে বিক্রম বলেছেন, "পদানত ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী করে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে"। এবারে দাম্পত্যের দ্বন্দ্ব সমস্ত শালীনতা ও সম্মানের সীমা লঙ্ঘন করে গেছে। কিন্তু সুমিত্রা কোন সংঘাত বা বিদ্রোহের পথে না গিয়ে স্বীয় আদর্শ রক্ষার্থে রাজরাণী থেকে তপতী হয়ে উঠলেন। এ নাটকের মুলকথা এসেছে বিদিশার সংলাপে, - "ওই ভুবনভুলানো রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি - কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না। এ কি নিষ্ঠুর নিরাসক্তি... রাজ বৈভবের জালে পারলে না তোমায় বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী"।

এ নাটক শেষ হয়েছে রাণী সুমিত্রার আত্মত্যাগে মিলন-বিচ্ছেদের ঊর্ধে এক অমলিন অমৃতলোকের বিভায় সুমিত্রা হয়ে উঠলেন তপতী। তখন তিনি স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা-বেদনা-ক্রোধের গণ্ডিতে বাঁধা মানবী নন আর, আত্মশুদ্ধির পথে যাত্রারত এক সমর্পিতা পূজারিণী তপস্বিনী। নীহার রঞ্জন রায় 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী'র সুমিত্রাকে তুলনা করে মন্তব্য করেছেন, -

> "রাজা ও রানীর সুমিত্রা মানবী ছিলেন... কিন্তু তপতীর রাণী ত্যাগের কঠোর তপস্যায় মানবীয় দোষগুণ হইতে প্রায় যেন দেবীর পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন এবং গল্পবস্তুনিহিত তত্ত্বটি যেন আত্ম প্রচারে উন্মুখ হইয়াছে...।"[৭]

সম্ভবত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ নাটকের নাম প্রথমে 'সুমিত্রা' রাখতে চেয়েও শেষপর্যন্ত 'তপতী' রাখাই শ্রেয় মনে করেছেন। 'সুমিত্রা' নামকরণ হলে সেখানে এক মানবীর কাহিনী প্রাধান্য পেত আর সেক্ষেত্রে নামকরণ ও নাটকের মুল বক্তব্যের মধ্যে একটা বৈষম্য প্রকট হত। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ আদর্শের প্রতি এক নারীর অবিচল বিশ্বাস এবং সেই আদর্শ রক্ষার্থে সাধনা ও চরম সাধনার চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে জনৈক স্ত্রীলোক তার সঙ্গিনীদের রাণী সুমিত্রার খবর জানিয়ে বলে যে, "প্রণাম করে বললুম, তুমি আমাদের রাজকুমারী সুমিত্রা। তিনি বললেন, আমার নাম তপতী"।

আত্মাহুতির আয়োজন সম্পূর্ণ করে বিক্রমকে মন্দিরে ডাকতে পাঠিয়েছেন সুমিত্রা কারণ এবারে তিনি সর্বশেষ পরিণতির জন্য প্রস্তত।সংকল্প করে ফেলেছেন, "তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাবো"। ভার্গবকে মন্দিরের দরজা খুলে বলেন তিনি। প্রচণ্ড পদক্ষেপ নেবার পূর্বে উচ্চারণ করেন, "রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম, ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে... তাঁর পরম তেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব"। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশয্যায় পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সূর্যমন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সানন্দে প্রবেশ করেছেন রাণী সুমিত্রা— হয়ে উঠেছেন স্থিতধী তপস্বিনী তপতী। তিনি যেন আর মর্ত্যের মানবী সুমিত্রা নন - আঁধারনাশক আলোক দেবতা সূর্যের কন্যা তপতী, সূর্যভক্ত সংবরণ রাজার তপোনুরক্তা স্ত্রী। আলোক দেবতার আগমনে যেমন সমস্ত ক্লেদ, অন্ধকার ও জড়ত্ব নাশ হয়ে আশা ও প্রাণের সঞ্চার হয় ঠিক তেমনই আত্মতেজে উজ্জ্বল তাপসী সুমিত্রা সাক্ষাৎ মুক্তি দূতী হয়ে উঠেছেন বিক্রমের অত্যাচারী রাজশাসনে বিপর্যস্ত প্রজাকুলের কাছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে সুমিত্রার ভালবাসাকে পৌরুষের অহংকারে অধিকার করতে চেয়ে রাজ্যজুড়ে হিংসা যজ্ঞের তাণ্ডব রচনা করলেন বিক্রম সেই অগ্নিকেই শেষ আশ্রয় রূপে বরণ করে রাণী সুমিত্রা হয়ে উঠলেন তপতী। সুমিত্রার আত্মাহুতিতে একথাই স্পষ্ট হল যে শক্তি আর স্পর্ধার আস্ফালনে রাজ্যজয় করা সম্ভব কিন্তু হৃদয় জয় করা অসম্ভব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজা ও রাণীর বিক্রমদেব নাটকের শেষে সুমিত্রার মৃত্যুর পরে অনুশোচনা প্রকাশের যে অবকাশ পেয়েছিলেন তপতী নাটকে রবীন্দ্রনাথ বিক্রমকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। সুমিত্রার আত্মবলিদানে মার্তণ্ড মন্দিরে শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হল ঠিকই, কিন্তু সে ভয়াবহ পরিণামে বিক্রমের মধ্যে অনুশোচনাজাত কামাসক্তির অবসানে মোহমুক্তি ঘটল কিনা তা বোঝবার উপায় নেই কারণ নির্বাক ও হতচকিত বিক্রমের চোখের সামনে নাট্যকার যবনিকা টেনে দিয়েছেন। তাঁর এই আত্মাহুতিতে হয়ত বিক্রমের জাগরণ ঘটবে মোহসর্বস্বতা থেকে এই আশায় নাটকটি শেষ হয়েছে।

লুকাস তাঁর 'Tragedy' গ্রন্থে বলেছেন, -

> "We realize that there is no rule about the character of tragic characters except that they must have character; and we can only add that not wickedness but weakness remains the hardest of all human qualities to make it dramatic."[৮]

এই ধারণার ভিত্তিতে বলা চলে যে চারিত্রিক সত্তার ভালো বা মন্দ দিক নয়, সেই সত্তার শক্তিতেই নিহিত আছে ট্রাজিক চরিত্র হয়ে ওঠার চাবিকাঠি। তাই বিক্রমের চরিত্রের মধ্যে যে শক্তি ও স্পর্ধা রয়েছে তা একদিকে যেমন তাঁকে দিয়েছে নায়কের মর্যাদা অপরদিকে তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি, উগ্রতা, ভারসাম্যবোধের অবলুপ্তি ঠেলে দিয়েছে বিনাশের পথে। এই মারাত্মক চারিত্রিক ত্রুটির কারণে বিক্রম হয়ে উঠেছেন আত্মশক্তির অপচয় ও আত্মবিনাশের স্পষ্ট উদাহরণ। ট্রাজিডি আরো মর্মন্তুদ হয়ে উঠল এই কারণে যে আত্মবিনাশে নিজের মৃত্যু হল না- মৃত্যু ঘটালো প্রিয়জনের। যাকে অধিকার করার জন্য এত আয়োজন, এত প্রচেষ্টা, এত স্খলন সে নিজেকে নিয়ে গেল সব কিছুর উর্ধে- আত্মসম্মান রক্ষার্থে নিল চরম পদক্ষেপ, দিল আত্মাহুতি। সোমেন্দ্র নাথ বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাটকে ট্রাজিডি'তে বিষয়টিকে যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন, -

> "বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা মানুষ মাত্রেই করে। নিজের মনের মতো একটা জীবনের খসড়া সকলেই তৈরি করে নিতে চায় কিন্তু নানা রকম প্রতিবন্ধকতা অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা জীবনে ঘটিয়ে দেয়। আঘাতে আঘাতে তার স্বাভাবিক সত্তা যখন আত্ম রক্ষণশীল হয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় ...মনের গতি তখন একমুখী - জীবনের সামগ্রিকতা বোধ প্রায় লুপ্ত। পতনের একটা গতি আছে, একটা ভরবেগ বা momentum আছে। একবার পড়তে শুরু করলে বস্তুর পড়ার গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ভারসাম্যচ্যুতি, শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই ট্রাজিডির নায়ক চরিত্রের পরিণতি। ফলে বহির্জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, যখন বোঝাপড়া করার মনটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন ব্যূহ-আবদ্ধ যোদ্ধার মতো তাকে লড়াই করতে হয়- নিয়তির সঙ্গে, নিজের অজান্তে নিজের গড়া অবস্থার সঙ্গে।"[৯]

এই নাটকে বিক্রমের অবস্থাও এই রকম। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে বিক্রমের আত্মঘাতী প্রেম বিশ্বঘাতী প্রতিহিংসায় পরিণত হয়ে তার চরিত্রকে এমন একমুখী করে ফেলেছে যে সংসারের সামগ্রিকতার সাথে তার মনের যোগ ছিন্ন হয়েছে। ক্রোধ, উত্তেজনা, অহংকার ও অভিমানে অন্ধ মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে নিজস্ব কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে খাদে পড়ে। এই অন্ধত্বকেই এরিস্টটল বলেছেন 'peripeteia'; এর ফলে নিজের জীবনের সাথে সাথে প্রিয়তম ব্যক্তির জীবনেও ঘনিয়ে আসে চরম বিপর্যয় যাকে লুকাসের ভাষায় বলা যায়, -

> "...again and again men do thus laboriously contrive their own annihilation or kill the thing they love."[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দাম্পত্যের দ্বন্দ্ব এ নাটকের চাবিকাঠি হলেও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বকে শুধু আদর্শ বা ভাবের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি - অন্তর্নিহিত তাড়নায় বিক্রমের চরিত্রের দ্বিখন্ডীকরণের চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন।

'তপতী' নাটকটি রচিত হয় 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনার প্রায় এক বছরের মধ্যে। উভয় রচনাতেই মুখ্য পুরুষ চরিত্র নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখে – সংসারে বা রাজ্যে স্ত্রীর কোন নির্মাণমূলক ভুমিকাকে স্বামী স্বীকার করে না বা বলা ভাল যে স্বীকার করতে চায় না। যোগাযোগের কুমুকে রবীন্দ্রনাথ সংসারে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিন্তু সুমিত্রাকে কামনা জর্জরিত সংসারে আর ফেরান নি। পুরাণের রাজা সংবরণ দীর্ঘ তপস্যার পরে সূর্য কন্যা তপতীকে লাভ করে রাজকার্য ভুলে মোহে মত্ত হয়ে পড়লে তপতী সংবরণের মধ্যে মঙ্গল বোধ জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু সুমিত্রা তা পারেননি। কিন্তু শুভঙ্করী রূপের প্রকাশ স্বরূপ তিনি আত্মাহুতির পথে বিক্রমের বিবেককে জাগ্রত করে বিক্রমকে বাঁচাতে চেয়েছেন মোহের অন্ধকার নাগপাশ থেকে। তপতীর ভুমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন, "সুমিত্রার মৃত্যুতে আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্যপোলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল"।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), ১৪২৬, কলিকাতা, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৮
২. বিশী, প্রমথনাথ, 'রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা' (রবীন্দ্রনাটকের রূপান্তর ও নামান্তর) ১৩৭৪, কলকাতা পৃ. ১২৮
৩. শিকদার, অশ্রু কুমার, 'রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য', ১৯৯৩, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স পৃ. ১১
৪. https://rabindra-rachanabali.nltr.org/print/1268
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৬. ঘোষ, শঙ্খ, 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', ১৯৬৯, পৃ. ১৯
৭. রায়, নীহার রঞ্জন, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভুমিকা' (অখণ্ড সং) পৃ. ৩৩৬
৮. Lucas, F.L. 'Tragedy in relation to Aristotle's Poetics', 1957, Hogarth Press, p. 110
৯. বসু, সোমেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাটকে ট্রাজিডি', ১৯৭৪, কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইন্সিটিউট, পৃ. ২২-২৩
১০. Bradley, A. C. 'Shakespearean Tragedy', 1949, Macmillan company, p. 7

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 573 - 583
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান : প্রসঙ্গ নাট্য উপাদান

নিফাত আলমগীর
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : nifatalamgir9@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ghazir song, Pir literature, Punthi, folk drama, southern region, Dakshina Ray, Ghazi-Kalu-Champavati Punthi, folk life.

Abstract
A significant genre of ancient folk theater of Bengal is 'Gazir song'. Ghazir song varies from region to region in Bangladesh. Although there is no specific information about the origin of Ghazir song, it can be said that Ghazir song has a close relationship with the Pir literature called Punthi of Ghazi-Kalu-Champavati. It is also known that Ghazi stories are associated with the mythical tiger god Dakshina Ray in Ghazi songs of the southern region. Various elements of thousand-year-old folk drama are hidden in the performance and character of Ghazi songs, which are tried to be highlighted in this article as a reflection of the folk life and spirit of that time.

Discussion

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজির গান, গাজির পালা, গাজির গীত, গাজির গাইন, পিরের গান, গাইনের পালা, গাইনের গীত, গাইনের তামাশা ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই গাজির গান বাংলাদেশের গ্রামসমাজের সাধারণ মানুষের লোকসংস্কৃতি সাথে সম্পৃক্ত এবং সংগীত, কথকতা ও অভিনয় সমৃদ্ধ এই লোকনাট্য বাংলাদেশের ফোকলোর সম্পদকে প্রতিনিধিত্ব করে।[১] বাংলাদেশের দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদূর অতীতকাল হতে লোকসংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে লোকনাট্য প্রচলিত হয়ে আসছে। এই লোকনাট্যগুলোর বীজ রোপিত হয়েছিল সেই প্রাচীনকালে লোকসমাজের প্রয়োজনেই। এইসব লোকনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল গাজির গান লোকনাট্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

> “লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।”[২]

বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ গাজির গান শিল্প মাধ্যমটি আলোচক-সমালোচকদের নজরে আসে। এরপর থেকেই অনেক আগ্রহী ব্যক্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাজির গান বা পালা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে শুরু করেন। অতএব এই সব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, গাজি-কালু-চম্পাবতী বিষয়ক পুথির কাহিনির সাথে গাজির গানের কাহিনির সাদৃশ্যতা থাকলে গাজির গান ও গাজির পুঁথি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের শিল্প।[৩] বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে এমন কিছু গাজির গান পাওয়া যায়, যার কাহিনিতে গাজি-কালু-চম্পাবতীর কাহিনির কোন উপস্থিতি নেই।

গাজির গান বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে ফোকলোর তথা লোকসংস্কৃতির অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ শাখা হল লোকনাট্য। যারা এই লোকনাট্যের কর্ণধর বা ধারক ও বাহক, সাধারণ অর্থে তাঁরা আমাদের নিম্নশ্রেণির বা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৃষিজীবী অর্থাৎ তাঁরা লোকসমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ। সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান : প্রসঙ্গ নাট্য উপাদান বিষয়ক এই আলোচনায় বাংলাদেশের লোকজাতীয় সংস্কৃতির নির্মাণের পরিচয়কে স্পষ্টতর করে তোলার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থাৎ গাজির গানে লোকনাট্যিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্য না গৌণ তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া এ প্রবন্ধে গাজি গানের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমটি হল, গাজির গানের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও তৎকালীন লোকসমাজের জীবনধারা। দ্বিতীয়টি হল, সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গানের ঐতিহাসিকতা এবং তৃতীয়টি হল, গাজির গানের শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যে নাট্য উপাদান কিভাবে বিদ্যমান। গাজির গানের নাট্যিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা একারণে প্রয়োজন যে, গাজির গান লৌকিক গান হিসেবে প্রচলিত হলেও এর মধ্যে নাটকের নানা উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই মধ্যযুগের কোনো এক অজ্ঞাত কালপর্ব থেকে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা বাঘের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গাজি পিরের নাম স্মরণ করে আসছে। কালক্রমে এই পিরকে নিয়ে গড়ে ওঠেছে এক নাটকীয় কাহিনি, যা গাজির গানের কথাবস্তু।[৪] গাজির গান সপ্তদশ শতকের বাংলার মুসলমান সমাজে পূজিত গাজি পিরের লৈকিক-অলৌকিক কাহিনি কেন্দ্রিক কৃত্যমূলক 'পীরের পাঁচালী'।[৫] গাজী পীর, সত্যপীর, মানিক পীর, খোঁয়াজ খিজির, বড় পীর, দমের মাজার প্রমুখ পিরের জীবন কাহিনি অবলম্বনে অন্ত্য-মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে জারিগান, ব্রতকথা ও পাঁচালি নির্ভর আখ্যান নির্মিত হয়। হয়তো এদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সময় প্রবলভাবে অস্তিত্বমান ছিল। আবার কেউ কেউ উদ্ভাবিত হন লোকমানসের মাধ্যমে। গাজিকে কেন্দ্র করে রচিত গাজির গান 'পাঞ্চালি' অর্থাৎ তা আসরে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশনযোগ্য কাব্য[৬] - একথার প্রমাণও পাওয়া যায়। গাজির জীবনভিত্তিক আখ্যান কাব্যের মুদ্রিত পুঁথি শেখ রহিমকৃত 'গাজি কালু চম্পাবতী' পুঁথিকে কবি স্বয়ং 'গাজীর গীতি', আবার পয়ার পাঁচালি নামে অভিহিত করেছেন।[৭] গাজির জীবনকেন্দ্রিক কিংবা প্রসঙ্গ ভিত্তিক দু' ধরণের কাহিনির সন্ধান মেলে - (ক) গাজিকালু চম্পাবতী পুথির লেখ্যরূপ, (খ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 'মৌখিক আখ্যান', 'জামাল-কামাল', 'আফতাব-মাহতাব', 'দিদার বাদশা' প্রভৃতি পালা।

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজি পিরকে নিয়ে অনেকগুলো পুঁথি রচিত হয়।[৮] গাজি পিরের জনপ্রিয়তার কারণেই মৌখিক সাহিত্যের পাশাপাশি গাজি পিরকে ঘিরে লিখিত পুঁথি সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যে।

গাজি পির বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথির রচনাকাল ১৭৯৮-৯৯ সাল, যার রচয়িতা খোদা বখশ। সৈয়দ হালুমীর ১৮২৭, আবদুর রহিম ১৮৫৩, খন্দকার মাহমুদ আলী ১৮৭৮, মোহাম্মদ মুন্সী ১৮৯৬ এবং আবদুল গফুর বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুঁথি রচনা করেন বলে জানা যায়।[৯] তবে গাজির গানের মূল কাহিনি মৌখিক রীতির সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও গাজির গান এসব পুঁথির কাহিনিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে। দু'একটি চরিত্রের নামের রদবদল থাকলেও এইসব পুঁথিতে গাজি কালু-চম্পাবতীর কাহিনি মোটামুটি একই। এ থেকে ধারণা করা যায়, পুঁথি সাহিত্যের ছায়াকে অবলম্বন করেই পালার কাহিনি সমূহ রচনা শুরু হয়। এই পালাসমূহ সংখ্যায় যেমন প্রাচুর্যের দাবিদার-বিষয়বস্তুতেও তেমনিই বৈচিত্র্যমুখী। লোকসমাজ তার আপন জীবনের অনুকৃতির সাথে সাদৃশ্য রেখে নতুন নতুন পালা ও গাঁথা তৈরি করে এবং এর প্রায় প্রতিটি পালাতেই গাজি পির বা কালুর উপস্থিতি থাকলেও ঘটনা এবং চরিত্রের বিস্তৃতির কারণে এর পালার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

বাংলায় যে সকল পূজ্য পির রয়েছেন তাদের মধ্যে গাজি পিরের প্রভাব ব্যাপকতর।[১০] গাজির গানের প্রচলন ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে সমালোচকগণ অনেকটা নীরব ভূমিকা পালন করেন। তবে গাজির গানের কাহিনিতে যেসব ঐতিহাসিক আবহ ও ইতিহাসের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে- মুসলিম শাসনামলের কোনো এক পর্যায়ে গাজির গানের উদ্ভব ঘটেছিল। এই অনুমানের পেছনে হয়তো পর্যাপ্ত যুক্তি আহরণ করা সম্ভব। এর জন্য গাজির কাহিনিতে যে সকল ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্থানের নামের উল্লেখ রয়েছে, তাদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা-পর্যালোচনা করার প্রয়োজন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথমত, গাজি পিরের প্রাসঙ্গিক সাহিত্যকে পর্যালোচনা করলে আপত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, মুসলিম শাসনামলের কোনো এক পর্যায়ে গাজি নামে একজন পির ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল এবং বাঘের দেবতার বিকল্প হিসেবে সমকালীন সমাজে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। যদিও গাজির গানের মাঠ পর্যায়ের এক গবেষণায় উঠে এসেছে - গাজি পিরের বাহক ছিল বাঘ।[১১] লোকপূজ্য পির গাজি দক্ষিনা রায়ের পর্যায়ভুক্ত হয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে পূজো হয়ে ওঠেন।[১২] এই ধারণা থেকে অনেকেই মনে করেন ইতিহাসের কোন একজন ধর্মযোদ্ধা ক্রমে গাজি পিরে পরিণত হয়েছেন বা গাজি পির সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি চরিত্র।

দ্বিতীয়ত, গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনি। এই কাহিনির মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়া রয়েছে বলে মনে করেন জনাব জাকারিয়া। এই কাহিনির সূত্র ধরে উক্ত কাহিনিতে সুন্দরবন এবং সেকেন্দার শাহ এই দুটি উপসর্গকে তুলনা করলে, তাঁর এই প্রস্তাবনার পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করেন স্বরোচিষ সরকার।

সুন্দরবন : এই প্রসঙ্গে মনে রাখার দরকার যে, বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলের সময় অধিকাংশ অঞ্চলই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই সময় অনেক পিরই তাদের সঙ্গীদের নিয়ে এইসব বনজঙ্গলে আবাদ করেছিল। আর এ কারণেই তাদেরকে বলা হত 'আবাদি পির'। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারত থেকে আগত এসব পিরদের নিকট বাংলাদেশের সব বনাঞ্চলই সুন্দরবন বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুন্দরবনের তৎকালীন বৃহত্তম সীমানার কথা বাদ দিয়েও সে কথা বলা যায়। তাছাড়া বাঘের উৎপাতও তৎকালীন বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কমবেশি ছিল। আর তাই বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শুধু সুন্দরবন নিকটবর্তী অঞ্চলেই নয়, বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই ছিল। বাঘ-পির সম্পর্কিত প্রথম কাহিনি 'রায়মঙ্গল' রচিত হয়েছিল চব্বিশ পরগনায়, এই প্রসঙ্গে সেটিও বিবেচনা করার মতো। এছাড়া গাজি পিরকে নিয়ে লেখা যেসব পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রাচীনতর পুঁথিগুলো পাওয়া গেছে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলে, অর্বাচীনতর কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ও চব্বিশ পরগনায়। আর প্রাচীনতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁথিটি রচিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের লেখক দ্বারা। তৎকালীন সুন্দরবনের নিকটবর্তী জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনাতে তেমন কোন বিখ্যাত পুঁথি লেখকদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের এই অঞ্চলগুলোই সুন্দরবনের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল। তাই গাজির গানে উল্লেখিত সুন্দরবন কতোটা বর্তমান সুন্দরবনকে প্রতিনিধিত্ব করে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়াটা নিশ্চয়ই অবান্তর নয়।[১৩]

শাহ সেকান্দর : ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গৌড়ের সুলতান শাহ সেকেন্দারের (১৩৫৫-১৩৯২) খ্রি: বহু পুত্রের মধ্যে একমাত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহই (১৩৯৩-১৪১১) খ্রি: জীবিত ছিলেন। যিনি বিশ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আর সেকেন্দার শাহ রাজত্ব করেন পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি আদিনা মসজিদ নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা উপমহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ। গিয়াসউদ্দীন আজম সাহের তাঁর পিতা সুলতান সেকেন্দার সাহের সাথে মতপার্থক্য তৈরি হলে তিনি রাজধানী ত্যাগ করেন, স্বরোচিষ সরকারের মতে এই কাহিনির সঙ্গে তুলনা করা যায় গাজির তাঁর পিতার সাথে দ্বন্দ্ব ও বনবাসের কাহিনিকে।

গৌড়ের ক্ষমতা দখলের আগে গিয়াসউদ্দীন সোনারগাঁ থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, বৃহত্তর ঢাকা থেকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত এই দীর্ঘ এলাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে নিশ্চয়ই অনেক সময় প্রয়োজন হয়েছিল। গিয়াসউদ্দীনের এই অসাধারণ বীরত্বের পাশাপাশি তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও সকল ঐতিহাসিকগণ একমত। গিয়াসউদ্দীন সাহের তত্ত্বাবোধনে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটে, এমনকি তাঁর অসমাপ্ত কবিতাও একজন ফরাসি কবি হাফিজই সমাপ্ত করেন। অবশ্য তাকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ তিনিই করেছিলেন।[১৪] ইতিহাস থেকে জানা যায়, গিয়াসউদ্দীন আজম বিহারের পির মুজফ্ফর শামস বলখি এবং তাঁর বাল্যবন্ধু পির কুতুব-ই-আলমের মতামতকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং অনুমান করা হয়, তাদেরই পরামর্শে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য করতে শুরু করেছিলেন। এছাড়া তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সুফি ও পিরগণ ধর্ম প্রচারের প্রসার ঘটান বলে জানা যায়।[১৫] এই সুলতানই দুই-এক শতাব্দীর ব্যবধানে সাধারণ পির ভক্ত মানুষের কাছে মিথতুল্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে যা অসম্ভব কিছু নয়। ইলিয়াস শাহের পতনের পর হিন্দু রাজা গণেশ গৌড় অধিকার করেন এবং এই সময় স্থানীয় পিরদের মধ্যে হতাশা ও সংশয় জন্ম

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নেয় এবং এরপরেই তারা নতুন ভাবে দীক্ষিত মুসলমানদের নিকট তাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করে রাখার প্রচেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টাকে আরো উসকে দেন গণেশের পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে যে তাঁর উৎসাহ ছিল তার সর্বজনবিদিত। এজন্য অনেকেই মনে করেন, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজেও মধ্যে মিশে আছেন।[১৬] তাছাড়া তাঁর বন্ধু পির কুতুব-ই-আলমও কিভাবে কালু পিরের সঙ্গে মিশে আছেন। এ বিষয়ে প্রাচীনতম পুঁথির লেখক খোদা বখশ এর কালু সম্পর্কিত পুঁথির একটি অংশ উল্লেখ করলে আমাদের অনুমান করতে সুবিধা হবে। কালুর পরিচয় দিয়ে খোদা বখশ লেখেন -

"বাদশার পালকপুত্র কালু হাজেরা।
পাঁচশত উমরা মধ্যে প্রধান উমরা।
গাযীর সহিতে তার অনেক পেয়ার।
গাযী আর কালু দুহে একই ইয়ার।"[১৭]

উল্লেখিত পুঁথির অন্যতম আমির ও ইয়ার 'কালু' পরবর্তী পুঁথিগুলোকে শুধু ভাতৃপরিচয় পরিচয় ধারণ করে। আর এ কারণেই হয়তো সেসব পুঁথিগুলো থেকে কালুকে সহজে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে গাজির মধ্যে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে যেমন আবিষ্কার করা যায়, তেমনি কালুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় পির কুতুব-ই-আলমকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে গাজির গানের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, এক. নতুনভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে গাজিমঙ্গল কাব্যের জন্ম হয়েছিল। মঙ্গল গানের মতো তা প্রথমে পাঁচালি গান হয়ে লোকনাট্যে এক অন্যমাত্রা যোগ করেছিল এবং এ থেকে গণ্য করা যায় যে, গাজি গানের উৎস ছিল গাজি বিষয়ক পুঁথিগুলো। অর্থাৎ প্রথমে জন্ম হয়েছিল গাজি বিষয়ক পুঁথির এবং এই পুঁথি পাঠ ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া ক্রমবিকশিত হতে হতে জন্ম হয়েছিল গাজির গানের। দুই. গাজির গানের উপর ভিত্তি করেই গাজ বিষয়ক পুঁথিগুলোর উদ্ভব হয়েছিল। তাতে গাজির গানের উদ্ভব পনের শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা সম্ভব।[১৮]

উপরিক্ত আলোচনা থেকে মীমাংসায় আসা কঠিন যে - গাজির গান না গাজি বিষয়ক পুঁথি? কে কার থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল? তবে তর্কে না গিয়ে উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে মেনে নেওয়াই অধিকতর যৌক্তিক।

গাজির গান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। গাজির গানের পরিবেশন রীতিতেও রয়েছে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা, গাজির গানের দলে মোটামুটি ৮/৯ জন লোক লাগে। গাজির গান যারা পরিবেশন করে থাকেন, তাঁদের আঞ্চলিক নাম গায়ান, গায়েন বা গাইন।[১৯] এর মধ্যে একজন থাকেন মূল গায়েন আর মূল গায়েনের সহযোগী এক ধরনের গায়েন থাকে, যাদেরকে 'তাতাইরা গাইন' বলে।[২০] গায়েনদের সহযোগিতার জন্য থাকেন কয়েকজন দোহার, যারা প্রয়োজনে অভিনয় করেন, আবার কখনো কখনো গানের ধুয়ার অংশে অংশগ্রহণ করেন। কয়েকজন থাকেন যন্ত্রী, যারা হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল বা মৃদঙ্গ, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজান। কোনো কোনো অঞ্চলে নৃত্য পরিবেশনের জন্য অল্পবয়স্ক ছেলেদের নারী সাজে সাজানো হয়ে থাকে।

অঞ্চলভেদে গায়েনদের পোশাকেরও ভিন্নতা পাওয়া যায়। আবদুল হক চৌধুরীর বর্ণনায় জানা যায়, বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের গায়েনদের পোশাক ছিল রঙিন পাজামা ও সাথে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢিলে-ঢোলা আচকান। আচকানের পিঠে ও আস্তিনের উপরের লালসালুতে কাপড়ের তৈরি হরতন, রুইতনের টিক্কার অর্ধচন্দ্রাকৃতির নকশা থাকতো। মাথায় থাকতো পাগড়ী, হাতে থাকতো চামর।[২১] বিংশ শতকের শেষ দিকে ঢাকা, ফরিদপুর অঞ্চলের গায়েনদের পোশাক ও পরিবেশনরীতি ছিল কিছুটা আলাদা। এই অঞ্চলের মূল গায়েন পাঞ্জাবি, ধুতি ও কালো টুপি বা পাগড়ি পড়ত, গলায় তসবি ও হাতে থাকতো চামর, যা চমরি গাইয়ের লেজ দিয়ে তৈরি করা হত যা রাজকীয় পাখা হিসেবে বহুকাল ধরে জনপ্রিয় ছিল। আব্দুল হক চৌধুরী গাজির গানের পরিবেশন রীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বিল পাহাড়ের ফাঁকা জায়গায় গাজির গানের আসর বসত। গাজির গানের আসর তৈরি হত ৪×৪ গজ পরিমিত স্থানে। এর চারি কোণে চারটি বাসের 'ঠুনি' পোতা হত। ঠুনির উপরে 'ধাইর্যার' (তলই) চাউনি দেওয়া বা সামিয়ানা টাঙ্গানো হত। আসরের নিচে পাটি বিছিয়ে দেওয়ার পর গাজির পালার গায়েন এসে উত্তর দিকের দুই খুটির মধ্যখানে মাথায় অর্ধবলয় শোভিত আনুমানিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাড়ে চার ফুট লম্বা ও এক ইঞ্চি বেড়ের একটি লৌহদণ্ড গেঁড়ে পুতে দিতো। এটা গাজির 'আষা' (লাঠি)। এর গোড়ায় একখানি কুলায় রাখা হতো দু'সের চাউল, আম্র-পল্লব প্রভৃতি দ্রব্য। আর খুলনাঞ্চলে চালের উপর রাখা হত মিষ্টান্ন বা চিনি, আলু, ধূপদানি, আগরবাতি, সিঁদুরের কৌটা, চামর প্রভৃতি। পাশে রাখা হত আমপাতার ঘট। ঘটে জল রাখা হত এবং সবুজ কচি পাতার পল্লব স্থাপন করা হয়। এগুলি গাজির নামে শিরণি দেবার নাম করে গায়েন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে চেয়ে নিতো। এটা সম্ভবত গাজির গানের সুপ্রাচীন রীতির স্মারকরূপে করা হত। গায়েনের দোহারী ও বাইন আসরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশের বসতো তাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। আসরের চতুর্দিকে বসতো শ্রোতারা।[২২]

দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ভূমিকায় গাজির গানের আসরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

> "আসলে চারিকোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি পোঁতা; ...উত্তর দিকের মাঝামাঝি একটা লোহার খুঁটি, মাথায় একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহ বলায় ধারণ করিয়া ভূপ্রোথিত ছিল। ...নিচে একখানি কুলায় চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য সাজানো ছিল। সেগুলি গাজির সিন্নি। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির চাষী সম্প্রদায়ই এই সিন্নি মানত করিয়া বাড়িতে গাজির গীতি দিয়া থাকে।"

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে এই নাটক যেকোনো খোলা জায়গায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। যেমন - বাড়ির বাইরে, উঠানে, বাগান বাড়ি, স্কুল মাঠ, হাটের খোলা জায়গায়, সমতল ভূমিতে এই নাট্যের আয়োজন করা হয়। মোটামুটি ৮ ফুট থেকে ১২ ফুট ব্যাস যুক্ত গোলাকার অংশে অভিনয় - বাদ্যযন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। আবার কোথাও কোথাও ১০'×১০' আকৃতির বর্গাকার আয়তক্ষেত্র আসররূপে নির্দিষ্ট করা হয় এবং এর চারিদিক ঘিরে দর্শকেরা মাটিতে বসে। চার কোনায় চারটি বাঁশের খুটির উপর সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়। অধিক শীত বা বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে টিন দিয়েও ছাপড়া (ছাদ) তৈরি করা হয়ে থাকে। শিশু বা কিশোরদের সামনের দিকে, নারীদের অবস্থান থেকে সাধারণত পিছন দিকে ঘরের বারান্দায় বা ঘর সংলগ্ন এলাকায়, আর কখনো কখনো এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য চেয়ার ও বেঞ্চের ব্যবস্থা থাকে। আসরস্থানে চট বা পাটি বিছানো হয়।[২৩] গাজির গানের মূল গায়েন এবং তাঁর সহযোগীগণ কখনো গানের মাধ্যমে, কখনো পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে, কখনো গদ্য ভাষায় বর্ণনা করে। এই বর্ণনায় একধরনের অভিনয়ের কৌশল ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণত নাট্যভিনয় থেকে আলাদা। মূল গাইনকেই প্রধান কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। সহযোগী গায়েন হিসেবে যিনি থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় তিনিই গাজীর কালুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহযোগী গায়েন এবং দোহারদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। তবে কালুর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন, স্বভাবতই অন্য দোহারদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চেনা যায়। দোহারগণ শুধু সঙ্গীত সহযোগীই নয়, প্রায় সকল দোহারকেই কোনো না কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। যন্ত্রী ও ছোকরা হিসেবে যারা কাজ করেন, আপাতত দৃষ্টিতে কাজ নির্ধারিত মনে হলেও, গাজির গানের পুরো দলটিকেই গান ও অভিনয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[২৪]

গাজির গান পরিবেশনের সময়কাল মোটামুটি এর দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে। তবে একটি পালাগান শেষ হতে মোটামুটি তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। মো. জাহাঙ্গীর হোসেন তাঁর *দক্ষিণবঙ্গে ঐতিহাসিক লোকনাট্য : গাজীর গান* গ্রন্থে গাজির গানের পরিবেশনা কাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন -

ক. আখ্যান- পূর্ব পর্ব

খ. আখ্যান -পর্ব

গ. অন্তপর্ব বা সমাপ্তি পর্ব

আখ্যান পূর্ব পর্ব শুরু হয় বন্দনা দিয়ে। এই বন্দনা হয় দশ মিনিট মতো। যন্ত্রসংগীত সহযোগে এই বন্দনাকে কোনো কোনো অঞ্চলে ধুম্বাইল বলে। আখ্যান পূর্ব পর্বের এই ধুম্বাইলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল - দর্শকদের আসরের প্রতি মনোনিবেশ করানো। এই সময় মূল অভিনেতা অর্থাৎ গাজি তিনবার মঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন এবং পূজা সম্পন্ন করেন। মূল গায়েন বা অভিনেতাগন আল্লাহর প্রতি ভক্তিস্থাপন করে বন্দনা গীতি শুরু করেন।

প্রথমে একজন গায়েন সূচনা করেন আর সাথে সাথে দোহারগন তার পুনরাবৃত্তি করে এবং এরই সাথে সাথে সুর ঝংকারে গোটা পরিবেশ মুখরিত করে তোলেন। গাজির আসর বন্দনা করেন গাজি নিজেই -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আ...আ...আ...
একি মাগো বাঘের দেবী
আমার কণ্ঠে কর ভর
ওগো বসিতে আছল দেব মাগো
গাছত নাড়ু পড়ে
তোমার গান, তোমার বাদ্য মাগো
উপলক্ষ আমি...
এ সভা মাঝে গান ভাঙ্গিলে মাগো
লজ্জা পাবে তুমি।"[২৫]

গাজির গানের দুই ধরনের বন্দনা রয়েছে। যথা -

১. গাজির জীবনের বন্দনা
২. গাজি সাধন মরগের বন্দনা

মূল আখ্যান ভাগে গাজির গানের অভিনেতাগন বন্দনাকে কখনো বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো বর্ণনাত্মক গীতে, আবার কখনো কাব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করে থাকেন, আবার কখনো কখনো সংলাপের মাধ্যমে অভিনয়ও করেন। দুটি পরস্পর দৃশ্য বা ঘটনার সংযোগ স্থাপনের জন্য বর্ণর্নাত্মক গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূল অভিনেতা বা গায়েন গদ্যে ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে সংলাপাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেন। বর্ণনাত্মক গদ্যভিনয়ের মাধ্যমে মূল গায়েন ঘটনার বা কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকেন এবং বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে কাহিনির যে সব অংশে সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সব অংশে মূল গায়েন বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে রস সৃষ্টিপূর্বক সমস্যার সমাধান করেন। সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে মূলগায়েন স্থান, চরিত্র ও ঘটনার পরিবর্তন ঘটান।

অন্ত বা সমাপ্তি পর্বে গায়েন বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পালা সমাপ্ত করে থাকেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ, রসুল ও গাজির গুণকীর্তন করে দলের সকল অভিনেতার পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে পালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সমাপ্তি সূচক বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশনা শেষ করা হয়।

মূল গায়েন –

"ওস্তাদ আমার আলীমুদ্দিন বিশ্বাস গো
ওই তার নারকেল বাড়িয়ার বাড়ি।
হাজার হাজার পাক সালাম জানাই গো
ও সালাম জানায় যে তার পায়
এই আসরে কালানাচ করছে মো. দুলাল নাম
রবিউল, পিটু সুলতান এই আসরে ছুকরিগে
হারমোনিয়াম বাজায় নায়েব আলী
সাইদুর রহমান বাজায় ঢোল
সাইদুর রহমান বাজায় ঢোল
আর হাফিস বাজায় বাঁশি গো
ও দল মালিক হয় তোয়াজ উদ্দিন মন্ডল গো
ও যিনার দুধসর গিরাম বাড়ি গো,
ও নিজের নামটি রওশন আলী বয়াতী গো
ও আমার দুর্ধসর গিরাম বাড়ী গো।"[২৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখন প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গাজির গান ও গাজির বিষয়ক পুঁথি দুটিই সম্পূর্ণ আলাদা শিল্পমাধ্যম।[২৭] পুঁথিগুলো একাধিক নির্দিষ্ট ছন্দে রচিত এক ধরনের কাব্য। পৃথকভাবে সেগুলোর শিল্পমূল্য আছে। উপরিক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, গাজির বিষয়ক পুঁথির সঙ্গে গাজির গানের কাহিনির সম্পর্ক থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে আলাদা এক ধরনের শিল্পমাধ্যম। গাজির বিষয়ক পুঁথির লিখিত পান্ডুলিপি থাকলেও গাজির গানের কোনো প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি নেই এবং গাজির গান উপস্থাপন করার সময় সেই পান্ডুলিপিও নানাভাবে বদলে যায়। পরম্পরাক্রমে গায়েনদের স্মৃতিই সবচেয়ে বিশ্বস্ত পান্ডুলিপি হিসেবে কাজ করে।

সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাযী, মোবারক বা মোবরা গাযী, কালুপীর, বনবিবি প্রভৃতির লৌকিক পির-দেবতাকে ব্যাঘ্র-দেবতা রূপে পূজা করার প্রথা দেখা যায়। আগেকার দিনে বনাঞ্চলে কাঠ, মোম, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যাওয়ার পূর্বে এইসব দেবতাদের পূজা করে যাওয়ার প্রথা চালু ছিল। সেই প্রথার প্রচলন এখনও কম-বেশি আছে বলে জানা যায়। যেমন - সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় এবং তাঁর পরবর্তীকালে ব্যাঘ্রকুলের অধিপতি বলে মুসলিম গাজি পির এখনও এই অঞ্চলের জনমানসে মোটামুটি অস্তিত্বশীল। ব্যাঘ্রপূজা সম্বন্ধে নীহার রঞ্জন রায় বলেন –

> “আদিম বাঙালির সর্প ও ব্যাঘ্রভীতি সুবিদিত এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কি করিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিয়াছিল এখন আর অবিদিত নয়।মধ্যযুগে মনসা পূজা এবং দক্ষিণ রায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই।”[২৮]

সে সময় মানুষের প্রকৃতির সাথে লড়াই করার সামর্থ্য ছিল না, তাই যার কাছ থেকে ভয়, বিপদ বা অকল্যাণের আশঙ্কা থাকতো, তার কাছে নতি স্বীকার করে পূজা দিয়ে তুষ্ট করে ভয়, বিপদ বা অকল্যাণের হাত থেকে রেহাই পাবার প্রচেষ্টা করত। অরণ্য বা অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে প্রতিনিয়ত হিংস্র প্রাণী বিশেষ করে বাঘের সংস্পর্শে আসতে হত। যেহেতু তাদের বধ বা বশীভূত করা কিংবা ভয় দেখানোর শক্তি তখনকার মানুষদের ছিল না। তাই পূজা দিয়ে তুষ্ট করে অনিষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করত।

প্রাচীন আর্য সমাজের পশুরা সরাসরি মানুষের কাছ থেকে পূজা পেত না। আর্য ও অনার্য ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে বহু অনার্য দেবদেবী ব্রাহ্মণ ধর্মে স্থান করে নিলে তাঁদের সঙ্গে ইতর প্রাণীদের অনেকেই বিভিন্ন অনার্য এমনকি আর্য দেবদেবীর বাহনরূপে পূজার নৈবেদ্যের অংশীদার হয়ে পড়ে এবং সিংহ থেকে শুরু করে পেঁচাও পর্যন্ত দেব-দেবীর বাহক হবার কৃতিত্ব লাভ করে। কিন্তু কোনো দেবদেবীর বাহক না হয়েও ব্যাঘ্র পূজার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বাঙালির কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে কোনো কোনো অরণ্যাঞ্চলে দেখা যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে এ ধরনের ব্যাঘ্র পূজার প্রচলন ছিল। ধারণা করা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের প্রাচীন দক্ষিণ রায়ই খুব সম্ভব পরবর্তীকালে বা পরিবর্তিত রূপে উত্তরবঙ্গে ও ময়মনসিংহ জেলায় আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সেখান থেকেই বড়খাঁ গাজির ঐতিহ্যও মিশে গিয়েছিল।[২৯]

সুন্দরবন অঞ্চলে মোম, মধু, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে মানুষের বসতি স্থাপনের কারণে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাঘ্রপূজার প্রচলন হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। খুব সম্ভব আদিম মানুষের কালে প্রচলিত বারা মুন্ডকেই ব্যাঘ্র দেবতার প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল এককালে।[৩০] তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠার বেশ আগে থেকেই বারা মুন্ড পূজার প্রচলন ছিল যদিও দক্ষিণ রায়ের ‘রায় অভিধাটুকু’ মুসলিম আমলে সংযোজিত হয়েছিল।

মোটকথা, বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ব্যাঘ্র পূজার প্রচলন হয়েছিল। সাধারণত মৌল্যা, মঙ্গলী, বাগদী, কাঠুরিয়া, শিকারী, বুনো, পাটনি, জেলে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির হিন্দু যারা কার্যোপলক্ষে সুন্দরবনে যাতায়াত করতেন অথবা বনাঞ্চলের কাছে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যেই ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজার প্রচলন প্রথম ঘটে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলমানদের নিম্নবঙ্গ অধিকার ও পির-দরবেশগণ কর্তৃক সেখানে ইসলাম প্রচারের সময় কোনো বিশিষ্ট অমুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনো মুসলিম ধর্ম যোদ্ধার প্রবল সংঘর্ষ হয় এবং সেই অমুসলিম নেতা যিনি স্থানীয় হিন্দুদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করেন তিনি হচ্ছেন আলোচ্য দক্ষিণ রায়। তাঁদের মতে, তিনি একজন পুরোপুরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ত্যাগ ও বীরত্বের জন্য পরবর্তীকালে লৌকিক দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। আবার কেউ বলেন, - ‘দক্ষিণরায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্বাণে শিকার

করেন, তাঁহার চরিত্র দেবত্বে পরিণত হয়।' তাকে যশোহর অঞ্চলের তথাকথিত মুকুট সেনাপতি রূপেও পরিচয় করা হয়। এক্ষেত্রে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন –

"অবশ্য এ সকল কাহিনির মূলে কোন সত্য নাই।"[৩১]

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই উক্তি বড়খাঁ গাজির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নিম্নবঙ্গে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠার পর অধিবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বহিরাগত মুসলিম হলেও অধিকাংশই ছিলেন এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলিম। ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা তাদের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে অতীতের সংস্কারকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে তারা যে পূজার্চনা করে এসেছিল নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে সেটাকে ছেড়ে দেওয়ার মতো সাহসও তাদের হয়নি। অতএব শ্যাম ও কুল উভয়কে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে একটি বিকল্প ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, এই বিকল্প ব্যবস্থার নামই হচ্ছে আলোচ্য গাজি কাহিনির নায়ক বড়খাঁ গাজি বা গাজি পির।

আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, এই গাজি পিরই হচ্ছে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণা রায়ের মুসলিম সংস্করণ। তিনি ভাগ্য দেবতা নন বরং দেবতার ধারণায় ইসলামের প্রতিপন্থী। সে কারণে তিনি ব্যঘ্রকুলের পির ও বনের বাঘ তাঁর একান্ত অনুগত সেবক। হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতাকে পূজা দেওয়া যায়। কিন্তু মুসলিম গাজি পিরকে পূজা দেওয়া চলে না। অতএব তাঁর জন্য 'শিরনি' ব্যবস্থা করা হল, এও এক রকম পূজা। ভক্তি ও বিশ্বাসের থেকে মানুষ এটা করত। সেই সাথে গাজি পিরকে সন্তুষ্ট করতে বন্দনা গীতেরও আয়োজন করত। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে, সন্তানলাভ, রোগব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, বাসনা, বিপদ-আপদ, ফসল হীনতা, মনোকামনা পূর্ণতার প্রভৃতি জন্য তারা গাজি পিরের কাছে মানত করতো এবং এই মানত পূর্ণ হলে গাজি পিরের অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে গাজির বন্দনামূলক গানের আয়োজন করত[৩২], যা থেকে গাজির গানের উৎপত্তি।

গাজির গান মধ্যযুগের পির পাঁচালি রীতির একটি রূপ। বাংলা নাট্য ঐতিহ্যের মূলে যেসব লোকনাট্য রীতির অবদান রয়েছে, তার মধ্যে 'গাজির গান' অন্যতম। শুধুমাত্র আঙ্গিক নয়, মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় 'গাজির গান'-এর পরিবেশনায়ও উঠে এসেছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য-সমাজ-সময় ও মিথ। 'গাজির গান' কৃত্যের অনুসঙ্গে পরিবেশিত হলেও সময়ের সাথে ধর্মীয় ভেদের পরিকাঠামো ছাড়িয়ে তা হয়ে উঠেছে অসাম্প্রদয়িক নাট্যরূপ।

মধ্যযুগের মুসলমান মানসে গাজির বসবাস হলেও শিল্পের বিচারে গাজির গান প্রাচীন বাংলার পাঁচালি রীতির দ্বিতাদ্বৈতবাদী উত্তরাধিকার।[৩৩] 'বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি' যার প্রাণধর্ম। এই রীতিতে কাহিনির বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গায়েন বা দোহার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আধুনিককালে অভিনয়ের এই কৌশলকেই বলা হয় 'বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতি'।[৩৪] বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতি একের মধ্যে বহু আবার বহুর মধ্যে একের উপস্থাপনা। গাজির গানের শিল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণের পূর্বে বাংলা নাটকের বিবর্তন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন তাহলেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো গাজির গানের শিল্পে কতটা নাট্য উপাদান বিদ্যমান –

প্রাচীনকালে নাট্যকলার উদ্ভব হয়েছিল ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই। প্রাচীন গ্রীকে গ্রীক দেবতা Dianysus এর পূজা পদ্ধতি ছিল Cathersis। Cathersis পূজা পদ্ধতি ছিল সংগীত সহযোগে বুক চাপড়ে কান্না বা হাহাকারের মাধ্যমে বিগত বছরের শোক, গ্লানি, খরা, ফসলহীনতা, বিপদমুক্তির কামনা, সমস্ত না পাওয়াকে দেবতার চরণে সমর্পণ করা, যেন তা পরবর্তী বছরে আর ফিরে না আসে। যা থেকে ট্রাজেডির উৎপত্তি। আবার Dianysus এর পূজা উৎসবে হাস্য পরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সংগীত (phallic song) এর প্রচলন ছিল, যা থেকে কমেডির সৃষ্টি।[৩৫] এখানে গ্রিক নাটকের উৎপত্তি উৎস Dianysus এর পূজা পদ্ধতিতে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, এক. এই পূজার উদ্দেশ্য হল বিগত বছরের না পাওয়া, বিপদমুক্তির কামনা, শোক, গ্লানিকে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা, দুই. বিনোদন লাভ।

গাজির গানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পির গাজিও লোকায়ত সমাজে সর্ব বিপদ ভঞ্জক পির।[৩৬] বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা, যাদের সন্তান আছে তাদের সন্তানের মঙ্গল কামনা, আত্মীয়স্বজনের রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, বিয়ে, ফসল ওঠা, উন্নতি,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবনতি, উদ্দেশ্য পূরণার্থে গাজির গানের মানত করা হত। এখানেও ক্যাথারসিস পূজা পদ্ধতির দুটি উদ্দেশ্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে খুলনা অঞ্চলের গাজির গানের শিল্পী মাহাতাব শিকদার বলেন -

> "গাজীর গান মূলত দুইটি উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়। প্রথমত, মানুষের উদ্দেশ্যে, মানতের উদ্দেশ্যে বলতে মানুষ যখন কোন বিপদে পরে, অসুস্থ হয়ে পরে, বিবাহ না, সন্তান হয় না তখন গাজীর গানের মানত করেন। দ্বিতীয়ত, আনন্দদানের উদ্দেশ্য।"[৩৭]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গাজির গানের শৈল্পিকতায় কিছুটা পার্থক্য ও স্বাতন্ত্রতা থাকলেও এই শিল্পে নাটকের সকল উপাদানই বিদ্যমান। শুধু মনোরঞ্জন বা চিত্তবিনোদনেই কেবল নয়, নীতিশিক্ষা ও সমাজচেতনার ক্ষেত্রে লোকজীবনে গাজির গান লোকনাট্যের আবেদন সুগভীর ও সুবিস্তৃত।

একসময় বাংলার গ্রামীণ সমাজে গাজির গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি প্রায় বিলুপ্তির পথে। নগরায়ণ, আধুনিক বিনোদনের প্রসার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে এই লোকসংগীতের প্রচলন কমে এসেছে। তবে কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং লোকসংস্কৃতি গবেষক এটি সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন। আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যমে বিনোদনের প্রসারের ফলে তরুণ প্রজন্ম লোকসংগীতের প্রতি আগ্রহী কম। গ্রামাঞ্চলে আগের মতো সাংস্কৃতিক আসর বা যাত্রাপালার আয়োজন কমে গেছে, যা গাজির গানের প্রচলনেও প্রভাব ফেলেছে। গাজির গান মূলত হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির ফসল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিভাজন বেড়ে যাওয়ায় অনেক স্থানে এটির তেমন জনপ্রিয়তা নেই। গাজির গান পরিবেশনকারী লোকশিল্পীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, কারণ এটি থেকে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

আজকের ডিজিটাল যুগে যদিও আধুনিক গান ও বিনোদনের প্রচলন বেশি, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী লোকগান মানুষকে শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করে। লোকগান নতুন ভাবে পরিবেশন করা হলে এটি তরুণদের কাছেও আকর্ষণীয় হতে উঠতে পারে। বর্তমান সময়ে গাজির গানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। গাজি পীরকে বলা হয় বনের রক্ষক। তাঁর কাহিনিতে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও বন ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে এই বার্তাটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। এটি শুধু একটি ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত নয়, বরং সমাজ, সংস্কৃতি, ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি ও পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। তাই এটিকে আধুনিকায়ন করে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলার লোকজীবন ও সংস্কৃতির এই মূল্যবান সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবে।

Reference:

১. আসগর, সৈকত, বাংলার লোকঐতিহ্য : লোকনাট্য, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৮
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড), এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬২৮
৩. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১১
৪. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১২
৫. আল দীন, সেলিম, মধ্যযুগের বাঙলা নাটক, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৬), পৃ. ৩২৬
৬. তদেব, পৃ. ৩৪২
৭. আহমদ, আফসার, গাজীর গান: শিল্পরীতি, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, আগস্ট, ১৯৯৮), পৃ. ২
৮. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. তদেব, পৃ. ১১২

১০. কবি শামস্, শাহরিয়ার, পীর পাঁচালি ধারার নাট্য: বাগেরহাট জেলার গাজীর গান, (ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর, ২০১৭), পৃ. ২৬

১১. তদেব, পৃ. ২৬

১২. ইসলাম, মো. আমিরুল, সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান -একটি সমীক্ষা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ২

১৩. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১৪

১৪. খান, কে এস রাইসউদ্দিন, বাংলাদেশ: ইতিহাস পরিক্রমা, চতুর্থ সংস্করণ, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৬-২৭

১৫. করিম, আব্দুল, বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ২২৮

১৬. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১২৫

১৭. মোহাম্মদ, যাকারিয়া আবুল কালাম, বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃ. ৩৮৫

১৮. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১২৬

১৯. রিয়াজুল, হক খন্দকার, বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন: ৬৬, গাজীর গান, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৫), পৃ. ৮০

২০. তদেব, পৃ. ৮০

২১. রিয়াজুল, হক খন্দকার, বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন : ৬৬, গাজীর গান, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৫), পৃ. ৬৫

২২. তদেব, পৃ. ৬৫

২৩. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য : গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৩৮

২৪. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১৬

২৫. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য : গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৪১

২৬. তদেব, পৃ. ৫৭

২৭. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১৬

২৮. মোহাম্মদ, যাকারিয়া আবুল কালাম, বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃ. ৬৫

২৯. তদেব, পৃ. ৬৬

৩০. তদেব, পৃ. ৬৯

৩১. তদেব, পৃ. ৬৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65
Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩২. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য: গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৬০

৩৩. আহমদ, আফসার, গাজীর গান : শিল্পরীতি, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, আগস্ট, ১৯৯৮), পৃ. ৩

৩৪. আল দীন, সেলিম, মধ্যযুগের বাঙলা নাটক, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৬), পৃ. ৮৮

৩৫. ঘোষ, অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ষষ্ঠ সংস্করণ, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৮), পৃ. ১

৩৬. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য : গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৩৫

৩৭. তদেব, পৃ. ৩৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 584 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 584 - 592
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সাঁওতালদের খাদ্য সংস্কৃতি : অতীত থেকে বর্তমান পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনা

জয়ন্ত কুমার বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম
Email ID : kbjayant@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Santal food culture, Indigenous food system, Modernity, Globalization, Traditional knowledge.

Abstract

The Santal community, one of the largest indigenous groups in India, has a rich and distinctive food culture deeply intertwined with their agriculture, environment, and traditions. Historically, their diet primarily consisted of millets, rice, maize, wild tubers, foraged vegetables, and bush meat, with fermented foods such as hadiya (a rice-based alcoholic beverage) playing a significant role in social and religious ceremonies. Their food practices were sustainable, seasonal, and community-oriented, reflecting a profound understanding of the local ecosystem.

However, modernization, economic shifts, deforestation, urbanization, and government policies have significantly altered traditional Santal dietary patterns. The decline of shifting cultivation, the expansion of cash crops, and increasing reliance on market-based food sources have led to nutritional transitions, often resulting in malnutrition and lifestyle-related diseases. Additionally, the influence of globalization and mass media has popularized processed foods, disrupting traditional dietary habits and weakening cultural identity.

This study adopts an ethnographic approach, incorporating fieldwork, interviews with Santal elders, and an analysis of colonial records and anthropological literature to conduct a comparative historical review. A temporal analysis reveals how economic policies, climate change, and urban migration have transformed Santal food traditions.

The preservation of Santal food culture is crucial for cultural sustainability, food security, and biodiversity conservation. Revitalizing indigenous food knowledge and ensuring the intergenerational transmission of culinary traditions can be achieved through community-driven initiatives, documentation of food practices, and supportive policy interventions.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 584 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ভূমিকা : সাঁওতাল সম্প্রদায়, যা ভারতের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠী, প্রধানত ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং বিহার রাজ্যে বসবাস করে। ঐতিহাসিকভাবে, সাঁওতালদের স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে উঠেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষিনির্ভর জীবনধারা, প্রাণবাদী বিশ্বাস এবং সমাজকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার উপর।[১] তাদের খাদ্য সংস্কৃতি তাদের পরিবেশ, কৃষি অনুশীলন এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত, যা শতাব্দীকাল ধরে সংরক্ষিত একটি সুস্থায়ী জীবনধারার প্রতিফলন। তবে, আধুনিকতা, বিশ্বায়ন এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সাঁওতাল ঐতিহ্যবাহী খাদ্যাভ্যাসে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে।[২, ৩] খাদ্য সাঁওতাল জীবনে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে; এটি শুধুমাত্র পুষ্টির উৎস নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়, স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলনও বটে। ঐতিহ্যগত সাঁওতাল খাদ্য তালিকায় মূলত বাজরা, ধান, কন্দ, বনজ ফল এবং বন্য প্রাণীর মাংস অন্তর্ভুক্ত, যা তাদের জীবিকানির্ভর কৃষি ও বনসম্পদের উপর নির্ভরশীলতার প্রতিফলন ঘটায়।[৪] খাদ্য সাঁওতালদের বিভিন্ন আচার ও উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেমন সোহরাই ও বাহা উৎসবে সমাজভিত্তিক ভোজের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়।[৫] সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির অধ্যয়ন কেবল আদিবাসী জ্ঞানের দলিল তৈরির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি বিশ্লেষণ করতে সহায়ক যে বহিরাগত প্রভাব কীভাবে তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করছে, যা পুষ্টি নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ক্ষয় এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রশ্ন তুলেছে।[৬]

গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রশ্ন : এই গবেষণার লক্ষ্য হল অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির রূপান্তর বিশ্লেষণ করা, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বহিরাগত প্রভাব এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ অন্বেষণ করা। প্রধান গবেষণা প্রশ্নগুলি হল -

1. সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যাভ্যাস কী ছিল?
2. অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক কারণগুলি কীভাবে তাদের খাদ্যাভ্যাসকে প্রভাবিত করেছে?
3. আধুনিকতা, সরকারি নীতি এবং বিশ্বায়ন সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির উপর কী প্রভাব ফেলেছে?
4. পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে ঐতিহ্যগত খাদ্যজ্ঞান ও খাদ্যাভ্যাস কীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে, গবেষণাটি আদিবাসী খাদ্য ব্যবস্থা, স্থায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক সহনশীলতা সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনায় অবদান রাখতে চায়। এই রূপান্তরগুলোর বিশ্লেষণ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাদ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করবে।

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণাটি সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে বহুমুখী গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে নৃগবেষণা ক্ষেত্রকর্ম, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক অধ্যয়ন, যা সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন সমূহকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করেছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং খাদ্যসংক্রান্ত ধারণাগুলি সরাসরি বোঝার জন্য নৃগবেষণামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার মহকুমার সাঁওতাল অধ্যুষিত তিনটি গ্রামে ধরমপুর, পলাশ বুনি ও আগোয়া গ্রামে মাঠপর্যায়ে গবেষণা পরিচালিত হয়, যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ, নারী এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আধা-গঠনমূলক সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। এছাড়া, রান্নার পদ্ধতি, খাদ্য সংগ্রহের রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত খাবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যা সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তন অনুধাবনের জন্য ঔপনিবেশিক নথি, নৃগবেষণা প্রতিবেদন এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার পর্যালোচনা করা হয়েছে। Bodding (1925) এবং Majumdar (2016)-এর গবেষণাগুলি ঐতিহ্যবাহী খাদ্যাভ্যাসের মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে, যেখানে সাম্প্রতিক গবেষণা আধুনিক প্রভাবগুলোর মূল্যায়নে সহায়তা করেছে। এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ খাদ্য ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনের কারণগুলো চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন সময়পর্বের খাদ্যাভ্যাসগত পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ

করা হয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠ সাঁওতালদের খাদ্যাভ্যাসের তথ্য নবীন প্রজন্মের সঙ্গে তুলনা করে প্রধান খাদ্য, ভোজন পদ্ধতি এবং বাজার নির্ভরতার পরিবর্তন চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণাটি সরকারি নীতি, অভিবাসন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবকেও বিশ্লেষণ করেছে, যা সাঁওতাল খাদ্য-সংস্কৃতির বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যথাযথ তথ্যসংগ্রহ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, গবেষণাটি কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। প্রত্যন্ত সাঁওতাল গ্রামগুলিতে প্রবেশের সীমাবদ্ধতা থাকায় বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর সঙ্গে বিস্তৃতভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি, মৌখিক ঐতিহ্য সাঁওতাল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় অতীত খাদ্যাভ্যাস নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে বিষয়গততা ও স্মৃতিভ্রংশের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, মাঠপর্যায়ের গবেষণা, ঐতিহাসিক দলিল এবং তুলনামূলক পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণাটি একটি সুষম ও নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

সাঁওতাল ঐতিহ্যবাহী খাদ্য সংস্কৃতি : সাঁওতালদের খাদ্য সংস্কৃতি পরিবেশগত পরিস্থিতি, কৃষিচর্চা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হওয়া ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের দ্বারা গঠিত হয়েছে। তাদের খাদ্যাভ্যাস স্বনির্ভরতার উপর গুরুত্ব দেয়, যেখানে প্রধানত শস্য, বনজ খাদ্য, শিকার এবং গাঁজন প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা দেখা যায়, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ।[৭]

সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যতালিকায় প্রধানত বিভিন্ন জাতের শস্য যেমন রাগি (finger millet), বাজরা (pearl millet), ধান, ভুট্টা এবং বুনো কন্দমূল অন্তর্ভুক্ত। এই ফসলগুলি খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষযোগ্য এবং পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ হওয়ায় জীবিকার জন্য উপযুক্ত।[৮] নিম্নভূমি অঞ্চলে ধান প্রধান খাদ্য, যেখানে পার্বত্য অঞ্চলে মিলেট ও ভুট্টার প্রচলন বেশি।[৯] বন থেকে সংগৃহীত বুনো কন্দমূল যেমন ডায়োস্কোরিয়া (যাম) ও কলোকাসিয়া (কচু) খাদ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়, বিশেষ করে অনাবৃষ্টি ও খাদ্য সংকটের সময়ে।[১০]

বনজ খাদ্য সংগ্রহ সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বুনো মাশরুম, খাওয়ার উপযোগী শিকড়, শাকসবজি, মধু এবং তেঁতুল, মহুয়া ও আতা ফলের মতো বনজ ফল সাঁওতাল খাদ্যতালিকার অপরিহার্য উপাদান।[১১] শিকারের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত ভাবে প্রোটিনের চাহিদা মেটানো হলেও, বর্তমানে আইনি নিষেধাজ্ঞা ও বাসস্থান সংকটের কারণে এটি হ্রাস পেয়েছে। অতীতে বন্য শুকর, হরিণ, খরগোশ এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি শিকার করা হত, পাশাপাশি স্থানীয় জলাশয়ে মাছ ধরার মাধ্যমে খাদ্যের সংস্থান করা হত।[১২] এই বনজ সম্পদ শুধু খাদ্যতালিকা সমৃদ্ধ করত না, বরং সাঁওতাল পরিবেশগত জ্ঞানকেও প্রসারিত করত।

সাঁওতালদের খাদ্যাভ্যাস মৌসুমভেদে পরিবর্তিত হয়। বর্ষাকালে সদ্য কাটা ধান এবং বুনো শাকসবজি প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে সংরক্ষিত শস্য, গাঁজনকৃত খাবার ও ধূমায়িত মাংস খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করে[১৩]। গ্রীষ্মকালে বনফল এবং মহুয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, আর বসন্তকালীন বাহা উৎসবে ঋতুভিত্তিক বিশেষ খাবার দিয়ে সামাজিক ভোজের আয়োজন করা হয়।[১৪] এই মৌসুমভিত্তিক অভিযোজন খাদ্য সংরক্ষণ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

গাঁজন পদ্ধতি সাঁওতাল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিতে সহায়ক। এর প্রধান উদাহরণ হল হাঁড়িয়া, যা ভেষজ স্টার্টারের সাহায্যে প্রস্তুত করা এক প্রকারের গাঁজনকৃত চালের মদ। এটি সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎসব, বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।[১৫] এছাড়াও, রোদে শুকানো এবং গাঁজনকৃত কন্দমূল দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।[১৬] এই ঐতিহ্যবাহী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিগুলো সাঁওতাল খাদ্য বৈচিত্র্য এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সাঁওতাল উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানে খাদ্য একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। সোহরাই উৎসব, যা কৃষি ও গবাদি পশুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে পালিত হয়, সেখানে বিশেষ ধানের খাবার, বুনো মাংসের তরকারি এবং হাঁড়িয়া প্রস্তুত করে সমগ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[১৭] বাহা উৎসবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ধান, মহুয়া ফুল ও

মাংস উৎসর্গ করার পর তা সমগ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হয়।[১৮] এই উৎসবগুলি সামাজিক সংহতি জোরদার করে এবং প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাঁওতালদের গভীর সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটায়।

আধুনিক প্রভাব সত্ত্বেও, অনেক ঐতিহ্যবাহী খাদ্যাভ্যাস টিকে আছে, যা সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির স্থিতিস্থাপকতাকে প্রতিফলিত করে। তবে, বাজারে বাণিজ্যিক খাদ্যের প্রসার এবং পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা খাদ্য পছন্দে পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে, যা আদিবাসী খাদ্য জ্ঞানের বিলুপ্তির আশঙ্কা সৃষ্টি করছে।[১৯]

সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির পরিবর্তনের কারণসমূহ : সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতি, যা আত্মনির্ভরতা ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক-রাজনৈতিক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোর ফলে খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য উৎস এবং উপভোগের ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে, যা পুষ্টিগত নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ে প্রভাব ফেলেছে।

ঐতিহাসিক ভাবে, সাঁওতালরা জুম চাষ ও জীবনধারণমূলক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করত এবং প্রধানত নানা ধরনের মিলেট, ধান, ডাল ও কন্দজাতীয় শস্য উৎপাদন করত।[২০] তবে, স্থায়ী কৃষি ও বাণিজ্যিক নগদ ফসলের (যেমন গম, সরিষা, সয়াবিন) প্রচার সংক্রান্ত সরকারি নীতির কারণে ঐতিহ্যবাহী ফসলের চাষ হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্য বৈচিত্র্য কমেছে এবং বাজার থেকে কেনা খাদ্যের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে জীবিকার আর্থিকীকরণ ঘটেছে, যার ফলে অনেক সাঁওতাল কৃষিকাজের পরিবর্তে মজুরি শ্রমের দিকে ঝুঁকছে। এর ফলে বাজারজাত খাদ্য যেমন প্রক্রিয়াজাত শস্য, পরিশোধিত তেল এবং সংরক্ষিত খাবার খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে, যা পুষ্টিগত গ্রহণ এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব পরিবর্তন করেছে।[২১]

বন নিধন এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে সাঁওতালদের খাদ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, বন থেকে বুনো ফল, কন্দ, মাশরুম ও প্রাণিজ খাদ্য সংগ্রহ করা হত, কিন্তু খনন, নগরায়ণ এবং কাঠ সংগ্রহের ফলে এ ধরনের সম্পদের প্রাপ্যতা কমে গেছে।[২২]

জলবায়ু পরিবর্তন বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত করেছে, যার ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং জলসংকট তৈরি হচ্ছে। খরা ও বন্যার বৃদ্ধিপ্রবণতা সাঁওতালদের উচ্চফলনশীল সংকর ফসল গ্রহণে বাধ্য করছে, যা পুষ্টিগুণ ও বীজ স্বায়ত্তশাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।[২৩]

নগরায়ণ ও মূলধারার ভারতীয় খাদ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নগরজীবন ও শিক্ষার প্রভাবে গমের রুটি, ফাস্ট ফুড এবং প্রক্রিয়াজাত স্ন্যাকসের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, যেখানে মিলেট-ভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী খাবার কম গুরুত্ব পাচ্ছে।[২৪]

সুপারমার্কেট ও প্যাকেটজাত খাবারের সহজলভ্যতা বাড়ার ফলে গৃহে প্রস্তুতকৃত খাবারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং বাজারজাত প্রক্রিয়াজাত খাবারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। তদুপরি, পরিশোধিত তেল ও মশলা ব্যবহারের আধুনিক রান্না প্রক্রিয়া ঐতিহ্যবাহী স্বাদ ও পুষ্টির কাঠামো পরিবর্তন করছে।[২৫]

সরকারি খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা (PDS) সাঁওতালদের খাদ্যাভ্যাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভর্তুকিযুক্ত গম, চাল ও ডালের সরবরাহ ঐতিহ্যবাহী দানাশস্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করেছে এবং সরকারি খাদ্যভাণ্ডারের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছে।[২৬]

একইভাবে, মিড-ডে মিল কর্মসূচি ও অঙ্গনওয়াড়ি পুষ্টি পরিকল্পনার মাধ্যমে স্কুলে শক্তিবর্ধক খাদ্য, পরিশোধিত শস্য এবং দুগ্ধজাত পণ্য চালু করা হয়েছে, যা স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য ঐতিহ্যবাহী খাবারের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে।[২৭] এনজিও এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গৃহ-উদ্যান প্রচারের মাধ্যমে উদ্যোগ নিচ্ছে, তবে সংকর বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতির ওপর প্রভাব ফেলছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 584 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং নগরায়ণের ফলে বৈশ্বিক খাদ্য প্রবণতা সাঁওতালদের খাদ্য পছন্দকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে।[২৮] তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, কার্বোনেটেড পানীয় এবং রেস্তোরাঁয় প্রস্তুত খাবারের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী খাদ্যের পরিবর্তে গ্রহণ করা হচ্ছে।

সুপারমার্কেট ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পের বিস্তৃতির ফলে খাদ্যের একরূপীকরণ ঘটছে, যেখানে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত খাবারের পরিবর্তে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত খাদ্য গ্রহণ বাড়ছে। উপরন্তু, খাদ্য বিজ্ঞাপন ও সামাজিক প্রবণতা পশ্চিমা খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করছে, যা স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।[২৯]

সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতি অর্থনৈতিক পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয়, নগরায়ণ, সরকারি নীতিমালা এবং বিশ্বায়নের ফলে দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। আধুনিকায়নের ফলে খাদ্যের বৈচিত্র্য ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পেলেও, এটি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষতিসাধন করছে। তাই ঐতিহ্যবাহী খাদ্য পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন, পরিবেশবান্ধব কৃষির প্রচার এবং আদিবাসী খাদ্য ঐতিহ্যের নথিভুক্তির মাধ্যমে সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।

সাঁওতাল পরিচয় ও স্বাস্থ্যের উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব : সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতির পরিবর্তন তাদের পরিচয়, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। যদিও আধুনিকীকরণ ও অর্থনৈতিক একীকরণ নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, তবুও এটি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান হ্রাস, পুষ্টিগত সংকট এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে গেছে।[৩০]

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান প্রভাব হল তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশজ খাদ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের অবক্ষয়। ঐতিহ্যগতভাবে, সাঁওতাল খাদ্যাভ্যাস প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল, যেখানে খাদ্য সংগ্রহ, ঋতু অনুযায়ী আহার এবং খাদ্য সংরক্ষণের প্রথা পুষ্টি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।[৩১] তবে নগরায়ন, জীবনধারার পরিবর্তন এবং বাজার নির্ভর খাদ্যের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা এই প্রথাগুলির ধ্বংস ঘটাচ্ছে।

তরুণ সাঁওতালরা বন্য ভোজ্য উপাদান, সুস্থায়ী চাষাবাদ পদ্ধতি এবং ঐতিহ্যবাহী খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল সম্পর্কে কম জানছে, যার ফলে প্রজন্মান্তরের জ্ঞান সংক্রমণ ব্যাহত হচ্ছে।[৩২] এই ক্ষতি শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়, এটি সম্প্রদায়ের পরিবেশগত প্রজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরশীলতার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব পড়েছে, যার মধ্যে অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা এবং জীবনধারা সংক্রান্ত রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিলেট, কন্দজাতীয় খাদ্য ও জৈব শাকসবজি থেকে পরিশোধিত শস্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও চিনি-সমৃদ্ধ পানীয়তে পরিবর্তনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।[৩৩]

গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে অপর্যাপ্ত ক্ষুদ্র পুষ্টি উপাদান থাকায় সাঁওতাল শিশু ও নারীদের মধ্যে আয়রন ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩৪] পাশাপাশি, তৈলাক্ত, লবণাক্ত ও চিনি-সমৃদ্ধ খাদ্যের অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের হার বাড়ছে, যা পূর্বে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরল ছিল।[৩৫]

সাঁওতাল খাদ্য সংস্কৃতি তাদের উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক পরিচয়ের সাথে গভীরভাবে জড়িত। ঐতিহ্যবাহী উৎসব যেমন সোহরাই, বাহা ও করম উৎসব সম্মিলিত রান্না, ভাগ করে খাওয়া এবং হাঁড়িয়া (গাঁজনকৃত চালের মদ) গ্রহণের মাধ্যমে উদযাপিত হত। তবে আধুনিক খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব এবং স্থানীয় পানীয় প্রস্তুতের ওপর বিধিনিষেধের কারণে এই ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসংস্কৃতি ক্রমশ বিলীন হচ্ছে।[৩৬]

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ও নগরায়নের ফলে তরুণ সাঁওতালরা ঐতিহ্যবাহী উৎসবে কম অংশগ্রহণ করছে, যার ফলে সাংস্কৃতিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে।[৩৭] খাদ্য সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের বিলোপ কেবল সামাজিক সংহতি দুর্বল করছে না, এটি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক চর্চাতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ঐতিহ্যগতভাবে, সাঁওতালরা আত্মনির্ভরশীল কৃষিকাজ করত এবং বনজ সম্পদের ওপর নির্ভর করত। তবে জীবিকা নির্বাহের পরিবর্তনের ফলে তারা ক্রমশ বাজারনির্ভর হয়ে পড়ছে। এর ফলে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে তাদের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ এখন অনেক পরিবার তাদের আয়ের একটি বড় অংশ দোকান থেকে কেনা খাদ্যে ব্যয় করছে।[৩৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 584 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একই সঙ্গে, সরকারের নগদ অর্থকরী শস্য চাষের প্রচারের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস, জলের অভাব এবং দেশীয় খাদ্যের বৈচিত্র্য নষ্ট হয়েছে। কৃষিতে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষতি খাদ্য নিরাপত্তাকে দুর্বল করেছে এবং সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে তুলেছে, যার ফলে তারা এখন সরকারি খাদ্য ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।[৩৯]

সাঁওতালদের খাদ্য সংস্কৃতির পরিবর্তন তাদের পরিচয়, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। আধুনিকীকরণ নতুন খাদ্যপছন্দ ও বাজার প্রবেশাধিকার এনেছে, তবে এটি দেশজ জ্ঞান হ্রাস, পুষ্টিগত ঘাটতি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষয়ের কারণ হয়েছে। তাই, ঐতিহ্যবাহী খাদ্যব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, পরিবেশবান্ধব কৃষির প্রচার এবং দেশজ রান্নার ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সাঁওতাল জীবনধারার মূল উপাদানগুলিকে রক্ষা করতে পারে।

সাঁওতাল ঐতিহ্যবাহী খাদ্য সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা : সাঁওতাল খাদ্য ঐতিহ্যের দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ, নথিভুক্তকরণ প্রচেষ্টা এবং নীতিগত হস্তক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, যা আদিবাসী খাদ্য ঐতিহ্য রক্ষা, খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সাংস্কৃতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।[৪০]

স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায়গুলো মিলেট, ভুট্টা এবং আদিবাসী ধানের জাত পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রোহিত কৃষিকৌশল গ্রহণ করছে, যা একসময় তাদের খাদ্যাভ্যাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।[৪১] বিভিন্ন এনজিও এবং তৃণমূল সংগঠন জৈব কৃষি, বীজ সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী রান্নার কৌশল প্রচারের জন্য কর্মশালা পরিচালনা করছে। পাশাপাশি, সম্প্রদায়ের প্রবীণরা বুনো খাবার সংগ্রহ, সুস্থায়ী শিকার এবং প্রাকৃতিক গাঁজন কৌশল সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।[৪২]

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী রন্ধনপ্রণালী, খাদ্যাভ্যাস এবং রান্নার পদ্ধতি সংরক্ষণের জন্য নথিভুক্তকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠেছে। গবেষক এবং আদিবাসী অধিকারকর্মীরা মৌখিক ইতিহাস, রেসিপি বই এবং ডিজিটাল সংরক্ষণাগার তৈরির মাধ্যমে আদিবাসী খাদ্যজ্ঞান হারিয়ে যাওয়া রোধের চেষ্টা করছেন।[৪৩] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও আদিবাসী প্রবীণদের সহযোগিতায় খাদ্যসংস্কৃতি লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে।[৪৪]

আদিবাসী খাদ্যব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের জরুরি প্রয়োজন। নীতিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত -

- প্রথাগত শস্যকে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা।
- সুস্থায়ী কৃষিকাজে নিয়োজিত আদিবাসী কৃষকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- সাঁওতাল খাদ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য সাংস্কৃতিক উৎসব ও সচেতনতামূলক প্রচার চালানো।

সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ, নথিভুক্তকরণ প্রচেষ্টা এবং নীতিগত সহায়তার সমন্বয়ে সাঁওতালদের সমৃদ্ধ খাদ্য সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব, যা শুধুমাত্র পুষ্টি নিরাপত্তাই নিশ্চিত করবে না, বরং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাও সংরক্ষণ করবে।

উপসংহার : সাঁওতাল খাদ্যসংস্কৃতির রূপান্তর একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, সাঁওতাল খাদ্যাভ্যাস প্রধানত জীবিকা নির্ভর কৃষি, বুনো খাবার সংগ্রহ এবং ঋতুভিত্তিক খাদ্যচক্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যেখানে স্থানীয় শস্য, বুনো ভোজ্য উপাদান এবং গাঁজন পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তবে, আধুনিকীকরণ, বন উজাড়, সরকারি কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং বিশ্বায়নের ফলে বাজারভিত্তিক ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের প্রতি নির্ভরতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, যা সাঁওতালদের স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

স্থানীয় খাদ্যজ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক খাদ্য উৎসের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে পুষ্টিহীনতা ও জীবনধারা সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করেছে। তদুপরি, ঐতিহ্যবাহী খাদ্য সম্পর্কিত

ধর্মীয় ও সামাজিক আচার, যা একসময় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত, তা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্প্রদায়ভিত্তিক কৃষি পুনরুজ্জীবন, খাদ্যসংস্কৃতির নথিভুক্তকরণ এবং নীতিগত সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত, বিশেষত কীভাবে বৃষ্টিপাতের ধরন, মাটির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন সাঁওতাল কৃষি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। পাশাপাশি, নীতিনির্ভর গবেষণার মাধ্যমে কীভাবে আদিবাসী খাদ্যব্যবস্থাকে মূলধারার পুষ্টি ও কৃষি কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত করা যায়, তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। খাদ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে কেবল একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক পরিচয়কে রক্ষা করা হবে না, বরং সুস্থায়ী খাদ্যব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

Reference:

১. Murmu M. Cultural continuity and change: A study of Santal society. Int J Tribal Stud. 2019;7(1):25-42

২. Bodding PO. Studies in Santal medicine and connected folklore. Oslo: J. Dybwad; 1925

৩. Das R, Saren S. Food and identity: An ethnographic study on the Santal community of Jharkhand. J Tribal Stud. 2021;18(2):45-62

৪. Toppo L. The Santal way of life: Food, faith, and sustainability. Ranchi: Indigenous Knowledge Press; 2020

৫. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018

৬. Majumdar D. Indigenous food practices and nutritional security among Santals. Econ Polit Wkly. 2016;51(29):112-20

৭. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018

৮. Bodding PO. Studies in Santal medicine and connected folklore. Oslo: J. Dybwad; 1925

৯. Majumdar D. Indigenous food practices and nutritional security among Santals. Econ Polit Wkly. 2016;51(29):112-20

১০. Toppo L. The Santal way of life: Food, faith, and sustainability. Ranchi: Indigenous Knowledge Press; 2020

১১. Das R, Saren S. Food and identity: An ethnographic study on the Santal community of Jharkhand. J Tribal Stud. 2021;18(2):45-62

১২. Murmu M. Cultural continuity and change: A study of Santal society. Int J Tribal Stud. 2019;7(1):25-42

১৩. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95

১৪. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018

১৫. Das R, Saren S. Food and identity: An ethnographic study on the Santal community of Jharkhand. J Tribal Stud. 2021;18(2):45-62

১৬. Majumdar D. Indigenous food practices and nutritional security among Santals. Econ Polit Wkly. 2016;51(29):112-20

১৭. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 584 - 592
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৮. Murmu M. Cultural continuity and change: A study of Santal society. Int J Tribal Stud. 2019;7(1):25-42
১৯. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95
২০. Bodding PO. Studies in Santal medicine and connected folklore. Oslo: J. Dybwad; 1925
২১. Toppo L. The Santal way of life: Food, faith, and sustainability. Ranchi: Indigenous Knowledge Press; 2020
২২. Majumdar D. Indigenous food practices and nutritional security among Santals. Econ Polit Wkly. 2016;51(29):112-20
২৩. Das R, Saren S. Food and identity: An ethnographic study on the Santal community of Jharkhand. J Tribal Stud. 2021;18(2):45-62
২৪. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95
২৫. Majumdar D. Indigenous food practices and nutritional security among Santals. Econ Polit Wkly. 2016;51(29):112-20
২৬. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018
২৭. Das R, Saren S. Food and identity: An ethnographic study on the Santal community of Jharkhand. J Tribal Stud. 2021;18(2):45-62
২৮. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95
২৯. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018
৩০. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018
৩১. Toppo L. The Santal way of life: Food, faith, and sustainability. Ranchi: Indigenous Knowledge Press; 2020
৩২. Das R, Saren S. Food and identity: An ethnographic study on the Santal community of Jharkhand. J Tribal Stud. 2021;18(2):45-62
৩৩. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95
৩৪. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018
৩৫. Das R, Saren S. Food and identity: An ethnographic study on the Santal community of Jharkhand. J Tribal Stud. 2021;18(2):45-62
৩৬. Murmu M. Cultural continuity and change: A study of Santal society. Int J Tribal Stud. 2019;7(1):25-42
৩৭. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95
৩৮. Hansda R. Santal rituals and food culture: A historical perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2018
৩৯. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95

৪০. Murmu M. Revival of traditional tribal foods: A policy perspective. Int J Indig Stud. 2020;9(2):55-72

৪১. Hansda R. Food sovereignty and tribal agriculture: A Santal perspective. Kolkata: Tribal Research Institute; 2019

৪২. Majumdar D. Sustaining traditional food knowledge among the Santals. Econ Polit Wkly. 2017;52(8):96-105

৪৩. Das R, Saren S. Preserving indigenous food heritage: Case study of Santal culinary practices. J Tribal Stud. 2022;19(1):33-48

৪৪. Panja T. Tribal food culture in transition: Challenges and opportunities. Indian J Anthropol. 2022;60(4):77-95

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 593 - 601
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অথর্ববেদীয় কৃষিসূক্তের প্রেক্ষাপটে কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত লোকাচারের সেকাল ও একাল

উজ্জ্বল কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত-বিভাগ
শালবনী সরকারী মহাবিদ্যালয়, কয়মা, ভীমপুর
Email ID : mailtoujjalkarmakar@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Atharvaveda, Kṛṣisūkta, Sītāyajña, Sītā, Hālika, Sītādhyakṣa, Royal Polughing Ceremony, Rāmāyaṇa.

Abstract
India is an agricultural country, so the influence of agriculture on the literature, culture and folklore of this country is considerable. As a result of the overall dependence of the Vedic social system on sacrifices, the practice of sacrifices has also been followed in the agricultural sector. In the Vedic mantras, the god of agriculture has sometimes been prayed for the prosperity of the crops, and in some places, special offerings have been made in sacrifices for the prosperity of the crops. Various rituals have been prescribed in the Vedic rituals on the occasion of sowing seeds and harvesting new crops. These rituals were initially confined to the so-called vaitānika or sacrificial rituals, far from the common ones. But in the later Atharvavedic folklore, they have become very popular, and the Vedic trend of these agricultural-centric rituals has been combined with various folk trends during the period of Atharvavedic Sūtra literature. As a result, as these agricultural-centric folk customs gradually became popular, they also successfully crossed the boundaries of country and time and entered the international arena. Similarly, these popular folk customs or festivals have found a place in the literature of the later period. In the prepared essay, I intend to talk a few words about the nature of the folk customs practiced in the agricultural sector of that time and the types of their ceremonies in the later period, in the context of an agricultural hymn from the Atharvaveda.

Discussion

বৈদিক সাহিত্য ধারায় ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি বেদ যাজ্ঞিক, পাঠক ও গবেষক মহলে জনপ্রিয়তার শিখরস্পর্শী। শ্রৌত যজ্ঞের বহুলাংশই ত্রিবেদ নির্ভর। তত্ত্বের নিগূঢ়তায় ও তথ্যের বিবিধতায় ঋক্ প্রভৃতি ত্রিবেদ স্ব-স্ব মহিমায় চিরভাস্বর। এককথায় যাদের আমরা সম্ভ্রান্তবেদ বলতে পারি। সেইদিক থেকে চতুর্থবেদ অথর্ববেদে যেন সেই সাবেকী শ্রৌতধারায় ভাটার টান পড়েছে। কোথায় সেই সোমযাগ, রাজসূয়যাগ, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগের বর্ণাঢ্যময় জাঁকজমকতা, আর কোথায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একান্ত সংগোপনে অনুষ্ঠেয় স্ত্রীবশীকরণ, কৃমিনাশন, দুঃস্বপ্নদমন প্রভৃতির চাকচিক্যহীনতা। ঋক্ প্রভৃতি তিন বেদে প্রায়শই ধরা পড়েছে মানব-মনের উচ্চকোটির জীবনদর্শন, বস্তুদর্শন ও তার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতির মত উঁচুস্তরের জাগতিক চাহিদার প্রার্থনা। অথর্ববেদে যে এগুলি একেবারেই অমিল তা বলা যায় না। কিন্তু অথর্ববেদের নিজস্বতার পরিচয় যাদের নিয়ে, সেগুলি তথাকথিত দৈনন্দিন বস্তুজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। সমাজের একজন সাদামাটা অতি সাধারণ মানুষের অতিতুচ্ছ পার্থিব চাহিদাও অথর্ববেদীয় ঋষির দৃষ্টি এড়ায়নি। সোমযাগে সোমক্রয়ের প্রতীকি অনুষ্ঠানে যে লোকটির কাছ থেকে সোমলতা নেওয়া হত; যজ্ঞ স্থলের বাইরে অপেক্ষারত সেই দেহাতি মানুষটির অন্তরের ব্যাথা বোধ হয় সর্বদর্শী ব্রহ্মা প্রমুখ ঋষি ঋত্বিক্ এর হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল। আর তারই ফলশ্রুতিতে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখেই ব্রহ্মা, অথর্বা প্রমুখ ঋষিরা অথর্ববেদের আয়ুষ্য, ভৈষজ্য, পৌষ্টিক প্রভৃতি মন্ত্রগুলির দর্শনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। শুধু তাই নয় যে নারীসমাজ তিন বেদ নির্ভর সম্ভ্রান্ত বৈদিকসংস্কৃতিতে খানিকটা ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের হিতার্থে অথর্ববেদের ঋষিরা অনেক দিলদরিয়া ছিলেন বলা যায়। তাই অন্তঃপুরচারিণী একজন সাধারণ ঘরণীর একান্ত ব্যাক্তিগত বিবিধ মেয়েলী সমস্যারও সমাধান দিতে অথর্ববেদের ঋষিরা কুণ্ঠা বোধ করেননি স্বপত্নীদমন, সুখপ্রসব-করণ, রক্তপাত-নিরোধক প্রভৃতি মন্ত্রগুলিতে। পরবর্তী কালের স্মৃতিশাস্ত্রও তাই অথর্ববেদের এই সার্বজনীকতা অস্বীকার করতে পারেনি। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (আপ.ধ.সূ.) সমাজের সকল স্তরের মানুষের বেদ হিসাবে উপদিষ্ট হয়েছে অথর্ববেদ[১]। সামগ্রিকরূপে কোন একটি সামজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয় পেতে হলে, সেই সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পদ্ধতির নিরীক্ষণ একান্তই প্রয়োজন। তাই চতুর্থবেদ অথর্ববেদকে বাদ দিয়ে ঋক্ প্রভৃতি ত্রিবেদ নির্ভর বৈদিক সংস্কৃতির পরিচয় বোধহয় অনেকাংশেই অধরা থেকে যায়। অথর্ববেদ এক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রাচীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতির পরিচায়ক অভ্রান্ত একটি দলিল রূপে এসে পৌঁছেছে। অথর্ববেদীয় মন্ত্রে ও মন্ত্রভাষ্যে লোকসংস্কৃতির একটি নিদর্শন এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

কৃষিমাতৃক দেশ ভারতবর্ষ, তাই সর্বকালেই এই দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও লোকাচারে কৃষির কথা বারে বারেই ঘুরে ফিরে এসেছে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কবি মানসে চকিতে চকিতে উদ্ভাসিত হয়েছে – 'কৃষিমিৎ কৃষস্ব' ও 'আমরা চাষ করি আনন্দে'র মত ছন্দোময়ী বাণী। অথর্ববেদে এর অন্যথা ঘটেনি, পরিবর্তিত লোকাচার ও লোকানুষ্ঠানকে সাথে নিয়ে অথর্ববেদের তৃতীয় কাণ্ডের একটি সূক্তে (৩।১৭) ঋষিকবি বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কৃষির জয়গান। সমগ্র সূক্তে মন্ত্রের সংখ্যা নয়টি, দেবতা সীতা (হালে উৎখাত রেখা, কর্ষণ পদ্ধতি বা কৃষিকার্য)[২]। সূক্তের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং অথর্ববেদীয় বৈতানসূত্র ও কৌশিকসূত্রকে অনুসরণ করে ভাষ্যকার সায়ণ সূক্তটির বহুবিধ বিনিয়োগ দেখিয়েছেন। যার অধিকাংশই কৃষিকার্যে ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

প্রথমে কৌশিকগৃহ্যসূত্র অনুসারে সূক্তটির প্রস্তাবিত বিনিয়োগগুলির পরিচয় দেওয়া যাক। ভূস্বামী আলোচ্য সূক্তটির জপ করতে করতে জোয়ালের ডানদিকের বলদ যোজনা করবেন এবং তিনি ভূমি কর্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনার্থে খানিকটা জমি কর্ষণ করে সূক্তটির পাঠ সমাপন হলে 'হালিক' অর্থাৎ কর্ষণ কার্যে নিযুক্তকে হাল ছেড়ে দেবেন। ভূকর্ষণের উপযোগী লাঙল, জোয়াল ও বলদকে একসঙ্গে হাল বলা হয়। সে সময় লাঙল ত্রিফলক বিশিষ্ট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সূক্তের বিনিয়োগে। ত্রিফলকে কর্ষণের ফলে জমিতে তিনটি সীমান্ত বা রেখা উৎখাত হলে, তাদের উত্তরবর্তী সীমান্তে অগ্নি স্থাপন করে এই সূক্তের পাঠে পুরোডাশের (যজ্ঞীয় পিঠে বিশেষ) মাধ্যমে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ও স্থালীপাকের (যজ্ঞীয় পায়েস) মাধ্যমে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্য যাগ করে কর্ষণকার্য সেই উত্তরবর্তী সীমান্তেই সমাপনীয় ছিল[৩]। নিরুক্তকার যাস্ক নির্বচনের মাধ্যমে ইন্দ্র শব্দের অর্থ করেছেন বজ্রের দ্বারা ইরা বা ভূমিকে যিনি বিদীর্ণ করেন বা বৃষ্টিপাতের দ্বারা বীজের আবরণ যিনি দীর্ণ করেন তিনিই ইন্দ্র। ঋগ্বেদের ইন্দ্রে যুগপৎ বীরত্ব ও অন্নদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ প্রকাশিত হয়েছে। আর ঋগ্বেদের অশ্বিদ্বয় হলেন দৈবভিষক্ বা চিকিৎসক, সুতরাং তাঁরা ভেষজ উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত দেবগণ হবির্গন্ধে পরিপ্লুত যজ্ঞ প্রদেশেই বিচরণ করতেন। কিন্তু অথর্ববেদীয় লোকাচারে তাঁরা তাঁদের সেই সম্ভ্রান্ততার খোলস ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধার্থে কৃষিক্ষেত্রেও এসে হাজির হয়েছেন। বৈদিক দেবতাদের পৌরাণিকী দেবতারূপে উত্তরণের প্রক্রিয়া বোধহয় অথর্ববেদ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আজও এই বাংলার প্রান্তিক প্রদেশের সাধারণ কৃষকদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ধানের চারা রোপণের পর ইন্দ্র পূজার প্রচলন আছে। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটি পূর্বোক্ত অথর্ববেদীয় সংস্কৃতির নব সংস্করণ কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। সূক্তের 'সীতে বন্দামহে' ইত্যাদি অষ্টম মন্ত্রটির দ্বারা ভূস্বামী হালিককে দিয়ে কর্ষণ করা তিনটি সীতা বা হলোৎখাত রেখাকে অনুমন্ত্রণ করাবেন[৪]। এছাড়াও অদ্ভুতশান্তিকর্ম, বৃষলাভকর্ম, যজ্ঞবাস্তুসংস্কার কর্মেও সূক্তটির কৌশিকগৃহ্যসূত্র অনুসারে বিনিয়োগ দেখিয়েছেন ভাষ্যকার সায়ণ।

বৈতানসূত্র অথর্ববেদীয় শ্রৌতসূত্র। এই সূত্রগ্রন্থটিকে অনুসরণ করেও ভাষ্যকার সায়ণ আলোচ্য সূক্তটির কয়েকটি শ্রৌত বিনিয়োগের ক্ষেত্র দেখিয়েছেন। যার কিছু তথ্য বেশ চমকপ্রদ। অগ্নিচয়ন শ্রৌত যাগের একটি প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান। অগ্নিচয়ন অগ্নিকুণ্ড নির্মাণের প্রক্রিয়া বিশেষ। বিবিধ আয়তনের ও আকৃতির অগ্নিকুণ্ড ব্যবহৃত হত শ্রৌতযাগে। অগ্নিকুণ্ড নির্মাণের সময় অগ্নিক্ষেত্রের কর্ষণের সুবিধার্থে একটি ফলকের ব্যবহার করা হত। অগ্নিচয়নের সময় অথর্ববেদীয় ঋত্বিক্ ব্রহ্মা কর্তৃক 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রটি পাঠের মাধ্যমে সেই ফলকটি অনুমন্ত্রণীয় ছিল। অর্থাৎ ফলকটির দিকে তাকিয়ে একনিষ্ঠভাবে পূর্বোক্ত মন্ত্রটির পাঠ বিধেয় ছিল[৫]। সূক্তগত 'লাঙ্গলং পবীরবৎ' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রটির দ্বারা ভূমি কর্ষণরত লাঙ্গলটির অনুমন্ত্রণ করণীয় ছিল। এছাড়া 'কৃতে যনৌ' ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রটির পাঠের মাধ্যমে চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত কৃষিক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বীজবপনকারী যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যুকেও অনুমন্ত্রণ করতে হত[৬]।

শুক্লযজুর্বেদীয় পারস্করগৃহ্যসূত্রে (পা.গৃ.সূ) কৃষিকার্যের নবারম্ভে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি গৃহ্যানুষ্ঠান অনূদিষ্ট হয়েছে। ভূকর্ষণ ও বীজবপনের জন্য 'সীতাযজ্ঞ' নামক একটি গৃহ্যনুষ্ঠান (পা.গৃ.সূ. ২।১৭) প্রথম কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত সাগ্নিকের করণীয় ছিল। শুক্লপক্ষে চন্দ্র-তারকার অনুকূল অবস্থিতিতে পুণ্য দিবসে নব উদ্যমে এই যাগের অনুষ্ঠান হত। মতান্তরে শুক্লপক্ষীয় গ্রহনক্ষত্রের শুভ অবস্থান ছাড়াও বা পুণ্য দিবস ব্যাতিরেকেও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যেকোন লগ্নে অকৃষ্ট ভূমির কর্ষণে অসুবিধা ছিল না। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ভূ-কর্ষণের অসুবিধা না থাকার কারণ হল – জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি দেবতা ইন্দ্র এবং বৃষ্টির মুখাপেক্ষী কৃষিকার্য ইন্দ্রের আয়ত্তাধীন[৭]। মাতৃপূজা ও আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের অনন্তর হলকর্ষণ করণীয় ছিল। হলকর্ষণের পূর্বে ইন্দ্র, পর্জন্য, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ, উদলাকাশ্যপ, স্বাতিকা, সীতা ও অনুমতি এই আট দেবতার উদ্দেশ্যে দধি, যব, তণ্ডুল প্রভৃতির দ্বারা হোম করণীয় ছিল। দধি, যব, তণ্ডুল প্রভৃতি একটি পাত্রে নিয়ে আচমন করে পবিত্র হয়ে গোময় দ্বারা প্রলিপ্ত কৃষিক্ষেত্রের একপ্রান্তে বসে যথাবিহিত মন্ত্রে প্রতি দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করতে হত। অনন্তর মধু ও ঘি একটি ভিন্ন পাত্রে নিয়ে কর্ষণকার্যে নিযুক্ত প্রতিটি বলদকে মৌন থেকে লেহন করাতে হত। অগ্রবর্তী বা শ্রেষ্ঠ বলদদের স্নান করিয়ে ঘুঙ্গুর, গন্ধদ্রব্য ও মাল্যদানে অলংকৃত করে অকৃষ্ট ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হত। অতঃপর 'সীরা যুঞ্জন্তি' প্রভৃতি আলোচ্য সূক্তটির প্রথম মন্ত্রটির পাঠে বলদগুলিকে দক্ষিণ ও উত্তরক্রমে জোয়ালে যোজনা করণীয় ছিল। 'শুনং সুফালা' ইত্যদি পঞ্চম মন্ত্রটির পাঠে ভূমি কর্ষণ করতে হত। অথবা উক্ত মন্ত্রের পাঠে লাঙলের ফালকে স্পর্শ করণীয় ছিল। যিনি সাগ্নিক কৃষক তার ক্ষেত্রে স্থালীপাক করে চরু (পায়েস) দিয়ে পূর্বোক্ত ইন্দ্রাদি আটজন দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করার পরেই ব্রীহি বা ধান, যব প্রভৃতির বীজ বপন করণীয় ছিল[৮]।

সূক্তটির মন্ত্রার্থের সাথে কর্মাবলীর রূপসম্পত্তি কতটা ঘটেছে দেখা যাক -

সীরা যুঞ্জন্তি কবযো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নযৌ।। ১।।

প্রথম মন্ত্রটির সায়ণানুসারী অর্থ যথা – মেধাবীরা (অকৃষ্ট ভূমি কর্ষণের জন্য) লাঙল যোজনা করেন। দেবতাদের সুখকর (হবিঃ রূপ) অন্ন লাভের আশায় ধীমান্ ব্যক্তিরা বলীবর্দ অর্থাৎ বলদের স্কন্ধে জোয়াল প্রসারিত করেন।

সমগ্র সূক্তটির জপে জোয়ালে বলদ যোজনার ও কর্ষণ আরম্ভের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মন্ত্রের অর্থের সাথে কর্মানুষ্ঠানের যথেষ্ট রূপসম্পত্তি ঘটেছে বলা যায়। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদেও (১০।১০১।৪) পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'সুম্নযৌ'এর স্থানে 'সুম্নযা' পদটি পঠিত হয়েছে। সায়ণাচার্য অথর্ববেদভাষ্যে এর অর্থ করেছেন – 'সুখকর যজ্ঞ', ঋগ্বেদভাষ্যে কেবলমাত্র –'সুখ'। ঋগ্বেদে মন্ত্রটির গত-বিনিয়োগ সমাদিষ্ট হয়েছে। অতএব মন্ত্রটির অথর্ববেদীয় এহেন বিনিয়োগ এটাই প্রমাণ করে যে কৃষিক্ষেত্রে এই আনুষ্ঠানিকতার প্রাদুর্ভাব একেবারেই অথর্ববেদ অথবা তার সূত্রসাহিত্যের সময়কালে। পাশ্চাত্য গবেষক হুইটনির মতে মন্ত্রটিতে কবিকর্মের সাথে লাঙলকারীর প্রচ্ছন্ন তুলনা আছে[৯]।

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনোত কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
বিরাজঃ শ্নুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্কমা যবন্।।২।।

সায়ণানুসারী অর্থ – (হে কৃষকেরা!) লাঙলগুলি জোয়ালের সাথে যুক্ত কর, জোয়ালগুলিকে বলদের পিঠে যুতে দাও। যোনীতুল্য প্রস্তুত এই কৃষিক্ষেত্রে বীজবপন কর। পরিপক্ক ফসল শীঘ্রই কর্ত্তনের উপযোগী হোক; যাতে আমাদের গোলাগুলি শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মন্ত্রটিতে গর্ভধারণের সাথে বীজবপনের একটি প্রচ্ছন্ন তুলনা আছে। মন্ত্রটি একটু পরিবর্তিত রূপে ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অথর্ববেদীয় এই মন্ত্রটির পাঠের মাধ্যমে চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত কৃষিক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে বীজবপনকারী যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যুকে ব্রহ্মা কর্তৃক অনুমন্ত্রণের বিধান দেওয়া হয়েছে বৈতান শ্রৌতসূত্রে। প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সাধারণত বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য কৃষিকার্য সমাদিষ্ট হলেও, অথর্ববেদীয় লোকাচারে আমরা দেখছি কৃষিকার্যের আনুষ্ঠানিক সমারম্ভের জন্য শ্রৌতকর্মানুষ্ঠানকারী অধ্বর্যু, ব্রহ্মা প্রমুখ ঋত্বিকদের ইন্দ্রাদি দেবতাদের মত বিতান বা যজ্ঞ প্রদেশ ছেড়ে কৃষিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হতে।

লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশীমং সোমসৎসরু।
উদিদ্ বপতু গামবিং প্রস্থাবদ্ রথবাহনং পীবরীং চ প্রফর্ব্যম্।।৩।।

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ – বজ্রের ন্যায় কঠিন অগ্রভাগ যুক্ত (ভূমি উৎপাটনের মাধ্যমে) শস্য উৎপাদনকারী, কৃষকের সুখদায়ী ও সোমযাগ নিষ্পাদক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট লাঙল শস্য বপন করুক। (ক্ষেত্র কর্ষণে ধান্যাদি সমৃদ্ধির ফলে) গবাদিপশু, রথবহনে সমর্থ ঘোড়া, বলদ ও সকল কামনার পূর্তিকারী প্রথম বয়ঃস্থা স্ত্রী লাভ হয়।

বৈতানশ্রৌতসূত্র অনুযায়ী এই মন্ত্রের দ্বারা কর্ষণকার্যে যুক্ত লাঙলটির অনুমন্ত্রণ করণীয় ছিল। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রটি উপলব্ধ নয়। তবে বাজসনেয়সংহিতায় (১২।৭১) মন্ত্রটি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ঋগ্বেদীয় অক্ষসূক্তে কৃষিপ্রশংসা কালে ঋষিকবি একই ভাবে কৃষিকার্যের শুভফল ঘোষণা করেছেন - ...কৃষিমিৎ কৃষস্ব...তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া (ঋ.বে. ১০।৩৪।১৩)।

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্নাতু তাং পূষাভি রক্ষতু।
সা নঃ পযস্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্।।৪।।

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ - ইন্দ্র সীতাকে (লাঙলের ফালকে) নিম্নমুখী করে ধরুন, পুষা তাকে (সর্বত ভাবে) পালন করুন, সেই সীতা(ফসলের উপযুক্ত কৃষ্টভূমি) জলযুক্তা হয়ে সারা বছর শস্য উৎপাদন করুক।

মন্ত্রটি ঋগ্বেদেও একটু ভিন্নরূপে পাওয়া যায় (ঋ.বে. ৩।৫৭।৭)। ঋগ্বেদে ‘তাং পূষাভি রক্ষতু’এর স্থলে ‘তাং পূষানু যচ্ছতু’ এই ভাবে মন্ত্রটি পঠিত হয়েছে। ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটির দ্রষ্টা ঋষি বামদেব এবং যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণে মন্ত্রটির বিনিযোগ সমাদিষ্ট হয়েছে।

শুনং সুফলা বি তুদন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অনু যন্তু বাহান্।
শুনাসীরা হবিষা তোশমানা সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তমস্মৈ।।৫।।

পঞ্চম মন্ত্রের অর্থ – লাঙলগুলি সুন্দরভাবে ভূমি কর্ষণ করুক, কর্ষকেরা সুষ্ঠ ভাবে বলীবর্দ বা বলদগুলিকে অনুগমন করুন। সুনসীর (সুখ ও লাঙলের অভিমানিনী দেবতারা) আহুতির দ্বারা তুষ্ট হয়ে যজমানের ধান্যাদি ওষধীগুলিকে সুন্দর ফলযুক্ত করুন।

এই মন্ত্রটিও ঋগ্বেদে পঠিত হয়েছে কিন্তু প্রথম পাদটির কিছু অংশ ও সমগ্র দ্বিতীয় পাদটি পরিবর্তিত রূপে[১০]। এই মন্ত্রটির প্রথম চরণের কিছু পদের ঋগ্বেদে ইতর বিশেষ থাকলেও দুই বেদেই পাদটির অর্থগত সাম্য আছে। কিন্তু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয় পাদটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। ঋগ্বেদে দ্বিতীয় পাদটিতে পর্জন্যের কাছে মধুর জল ও সুনসীরের কাছে সুখ প্রার্থনা করা হয়েছে[১১]। বোধহয় অথর্ববেদীয় পরিবর্তিত লোকাচারের অনুগমন করতে গিয়ে বামদেব দৃষ্ট মন্ত্রটিই কৃষকের স্বার্থে যেন ঋষি বিশ্বামিত্র একুটু ভিন্নরূপে ভিন্নার্থে উপস্থাপন করেছেন।

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্। শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়।।৬।।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ - বলীবর্দ বা বলদগুলি সুখে কর্ষণ করুক, কৃষকেরা সুখে (ভূমি)কর্ষণ করুন, লাঙলগুলিও সুন্দরভাবে (ভূমি) কর্ষণ করুক, (হাল-সংযুক্ত) বন্ধনরজ্জুগুলি (লাঙল-জোয়ালের সাথে বলদগুলিকে) সুন্দরভাবে বন্ধন করুক, (কৃষকের সুখার্থে) বলদ তাড়াবার লাঠিটি বলদগুলিকে (ভূকর্ষণে) সুষ্ঠু প্রেরণা দিক।

মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতায় একই ভাবে পঠিত হয়েছে (ঋ.বে. ৪।৫৭।৪)। দুই সংহিতার ভাষ্যে মন্ত্রটির অর্থগত বিশেষ পার্থক্য নেই।

শুনাসীরেহ স্ম মে জুষেথাম্। যদ্ দিবি চক্রথুঃ পযস্তেনেমামুপ সিঞ্চতম্।।৭।।

সপ্তম মন্ত্রের অর্থ – (হে যুগ্ম দেব) শুনাসীর কৃষ্যমান এই কৃষিক্ষেত্রে আমাদের প্রদত্ত হবি বা আহুতি গ্রহণ করো। তোমরা দ্যুলোকে যে জলের সৃষ্টি করেছ; সেই বৃষ্টির জলের দ্বারা কৃষ্যমান এই ভূমিকে সিঞ্চন করো।

ঋগ্বেদে মন্ত্রটি একটু পরিবর্তিতরূপে পঠিত হয়েছে (ঋ.বে. ৪।৫৭।৫)। অথর্ববেদীয় মন্ত্র ‘শুনাসীরেহ স্ম মে জুষেথাম্’ এর স্থানে ঋগ্বেদে 'শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং' পঠিত হয়েছে। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে ‘বাচং’ পদের গ্রহণে সমগ্র পাদটির অর্থ করেছেন – ‘হে শুনাসীরৌ তৌ যুবামিমাং বক্ষ্যমাণাং মদীয়ং বাচং জুষেথাম্’ ইত্যাদি। অর্থাৎ আমাদের দ্বারা প্রযুক্ত এই স্তুতি বাক্ তোমরা সেবন করো। শুনাসীর পদে সায়ণাচার্য ইন্দ্র ও বায়ু এই দুই দেবতাকে বুঝিয়েছেন ঋগ্বেদ ভাষ্যে[১২]। পূর্বেই আমরা দেখেছি অথর্ববেদীয় লোকাচারে ভূমি কর্ষণের আগে ইন্দ্র, মরুদ্গণ প্রমুখ আটজন দেবতাদের উদ্দেশ্যে কৃষ্যমান কৃষিক্ষেত্রে আহুতি দিতে হত। অতএব ক্রিয়মান কর্মের সাথে সায়ণ কথিত মন্ত্রার্থের যথেষ্ট রূপসম্পত্তি ঘটেছে বলা যায় অথর্ববেদে। হুইটনি মন্ত্রটির ক্ষেত্রকর্ষণে যজ্ঞীয় অনুষঙ্গের প্রসঙ্গকে বাদ দিয়েই কেবল মন্ত্রের পদগুলির অর্থের উপর নির্ভর করে মন্ত্রটির অর্থ করেছেন।[১৩]

সীতে বন্দামহে ত্বার্বাচী সুভগে ভব। যথা নঃ সুমনা অসো যথা নঃ সুফলা ভুবঃ।।৮।।

অষ্টম মন্ত্রের অর্থ – হে সীতা! (আমরা) তোমার বন্দনা করি, সৌভাগ্যবতী তুমি আমাদের অভিমুখী হও, যাতে আমারা সুন্দর মনোভাবাপন্ন হতে পারি, যাতে আমরা শোভন ফলযুক্ত হতে পারি।

মন্ত্রটি ঋগ্বেদেও পঠিত হয়েছে তবে একটু ভিন্নরূপে ও ভিন্নক্রমে।[১৪] তবে উভয় বেদেই মন্ত্রগত তাৎপর্যের বিশেষ প্রভেদ নেই। অথর্ববেদীয় বৈতানশ্রৌতসূত্রে এই মন্ত্রটির দ্বারা ভূস্বামী হালিককে দিয়ে কর্ষণ কৃত তিনটি সীতা বা হলোৎখাত রেখাকে অনুমন্ত্রণ করাবেন বলে আদিষ্ট হয়েছে।[১৫] সুতরাং মন্ত্রের অর্থের সাথে কর্মানুষ্ঠানের যথেষ্ট রূপসম্পত্তি ঘটেছে এখানে একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

ঘৃতেন সীতা মধুনা সমক্তা বিশ্বৈর্দেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ।
সা নঃ সীতে পযসাভ্যাববৃৎস্বোর্জস্বতী ঘৃতবৎ পিন্বমানা।।৯।।

নবম মন্ত্রের অর্থ – মধুর রসে সিক্তা, বিশ্বদেব ও মরুদ্গণের দ্বারা অনুমিতা সীতা! বলযুক্তা(তুমি) সরস অন্নের দ্বারা আমাদের পরিবৃত্ত করো। মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায় না। কিন্তু বাজসনেয়সংহিতা (১১।৭০), তৈত্তিরীয়সংহিতাতে (৪।২।৫) মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অথর্ববেদের উত্তরকালে রামায়ণেও পূর্বে উল্লিখিত কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বাল্মীকীয় রামায়ণের বালকাণ্ডে বিশ্বামিত্র সহযোগে রাম ও লক্ষণকে জনকপুরীতে উপস্থিত হতে দেখি আমরা। তথায় বিশ্বামিত্রের ঐকান্তিক অনুরোধে রাজা জনক তাঁর কাছে রক্ষিত হরধনুর সমক্ষে রাম ও লক্ষণকে উপস্থিত করলেন। এই ধনুঃ প্রাপ্তির ইতিহাস ও সীতাকে বীর্যশুল্ক করার মানসিক সঙ্কল্পের কথা রাজা জনক জানিয়েছেন এখানে (বালকাণ্ড, সর্গ-৬৬-৬৭)। এই সর্গেই আমরা সীতার জন্মের ইতিবৃত্ত পেয়ে থাকি। যজ্ঞীয় ক্ষেত্র কর্ষণকালে রাজা জনক হলোৎঘাত রেখা হতে এক কন্যা সন্তান লাভ করেন। যেহেতু হলোৎঘাত রেখা বা সীতা থেকে তিনি এই কন্যা লাভ করেন; তাই পরবর্তী কালে তারঁ এই কন্যা সীতা নামে অভিহিতা হন -

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়িতা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।। (রামায়ণ-১।৬৬।১৪)

যদিও শ্লোকটিতে প্রত্যক্ষতঃ যজ্ঞীয় ক্ষেত্র কর্ষণের কথা নেই। তথাপি টীকাকার গোবিন্দরাজ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যাকালে যজ্ঞীয় ক্ষেত্রকর্ষণের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। গোবিন্দরাজের মতে শ্লোকের 'ক্ষেত্র' শব্দটি যজ্ঞীয় কৃষিক্ষেত্রের বাচক, তিনি সাক্ষাৎ শাস্ত্র বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে – দুটি বলদের সহযোগে অগ্নি চয়নার্থে যজ্ঞীয় ক্ষেত্রকর্ষণ করা হত। সেখানে 'লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশীমং সোমসৎসরু' (অ.বে.৩।১৭।৩) প্রভৃতি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অকৃষ্ট ভূমির কর্ষণ করা হত[১৬]। রাজা জনক ছিলেন সাগ্নিক বা আহিতাগ্নি যজমান তাই পারস্কর গৃহ্যসূত্র (পা.গৃ.সূ. ২।১৭) অনুযায়ী কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত তাঁর পক্ষে হলকর্ষণের পূর্বে ইন্দ্র প্রমুখ আট দেবতার উদ্দেশ্যে দধি, যব, তণ্ডুল প্রভৃতির দ্বারা হোম ও চরু নির্বাপ অবশ্যই করণীয়। সেই কারণেই গোবিন্দরাজ এখানে যজ্ঞীয় ক্ষেত্র কর্ষণের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন বলে মনে হয়। আবার বর্তমান কালের তুল্য সে কালেও কোন শুভ কর্মের আনুষ্ঠানিক সূচনা কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি বিশেষের হাত দিয়ে করা হত। তাই প্রজাবৎসল রাজা জনককে আমরা যজ্ঞীয় হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে হাজির হতে দেখি। অতএব কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত অথর্ববেদীয় লোকাচারের ধারা রামায়ণেও প্রবহমান ছিল বলা যায়।

অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচার অধিকরণের সীতাধ্যক্ষ নামের ৪১তম প্রকরণে কৌটিল্য কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী একজনকে সীতাধ্যক্ষ হিসেবে রাজা কর্তৃক নিয়োগের নিদান দিয়েছেন। যাকে এখনকার মন্ত্রীসভার কৃষিমন্ত্রী বলা যেতে পারে। কৃষির উপযোগী বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে, জমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোন জমিতে কি চাষ করলে ফসল উৎপাদন ভালো হবে ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকতে হবে তার। সীতাধ্যক্ষের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল কৌটিল্য সবিস্তারে এই প্রকরণে নথিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এই আলোচনার অবসরে সেকালে কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত একটি লোকাচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেকালে সকল প্রকার বীজের বপন সময়ে, তার প্রথম মুষ্টি স্বর্ণজল দিয়ে সিক্ত করে বপন করতে হত এবং সেখানে একটি বিহিত মন্ত্রের পাঠও বিধেয় ছিল –

প্রজাপতয়ে কাশ্যপায় দেবায় চ নমঃ সদা।
সীতা মে ঋধ্যতাং দেবী বীজেষু চ ধনেষু চ।। (অ.শা.পৃ.১৭৯)

মন্ত্রার্থ-প্রজাপতি, কাশ্যপ ও পর্জন্য দেবকে সর্বদা নমস্কার করি। সীতাদেবী আমার বীজ ও ধনসমূহের বৃদ্ধি বিধান করুন। রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে – "কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম এখানে 'সীতা' বলিয়া ধৃত হইয়াছে।" (অ.শা. প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৯.)। সুতরাং অথর্ববেদীয় মন্ত্রে যে হলোৎখাত রেখার অভিমানিনী দেবতাকে সীতা বলে স্তুতি করে তাঁর কাছে শস্য সমৃদ্ধির প্রার্থনা করা হয়েছে, সেই সীতাই অর্থশাস্ত্রে কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে কল্পিতা হয়েছেন। রামায়ণেও একটি মূর্ত চরিত্র বিনির্মাণে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলা যায়।

আধুনিক ভারতবর্ষে কৃষিকেন্দ্রিক বহু উৎসব প্রচলিত। যেমন - বাংলার নবান্ন, ওড়িশা ও ছত্রিশগড়ের নুয়াখাই, অসমের ভোগালী বিহু, মেঘালয়ের ওয়াঙ্গল, তামিলনাড়ুর পঙ্গল, কেরলের ওনম্। এই উৎসবগুলিকে বৈদিক যুগে প্রচলিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 593 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৃষি ভিত্তিক যজ্ঞ কর্মের মধ্য প্রলম্বন যজ্ঞের অর্থাৎ শস্যকাটাই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লোকাচারের বিবর্তিত অনুষ্ঠান হিসাবে দেখা যেতে পারে। সুতরাং আধুনিক ভারতে বহুল প্রচলিত এই উৎসবগুলিতে পূর্বে আলোচিত সেই সীতাযজ্ঞের প্রভাব সেভাবে নেই বলা যেতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়া, মায়ানমার, প্রাচীনের শ্যামদেশ বা আধুনিকের থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে রামায়ণের প্রভাব সুদূর প্রসারী। রামায়ণের মাধ্যেমেই প্রাচীন ভারতীয় কৃষি কেন্দ্রিক এই লোকাচার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বহুল প্রচলিত হয় ও কালে কালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে[১৭]। পূর্বোক্ত দেশগুলিতে এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানটি ‘Royal Polughing Ceremony’বা ’রাজকীয় হলকর্ষণ’ উৎসব হিসাবে উদ্-যাপিত হয়। দেশ ও কালের প্রভাবে এই লোকাচারের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মূল আঙ্গিকটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সেখানেও অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে দেশের সর্বময় কর্তা বা রাজা পূর্বনির্ধারিত কৃষিক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে লাঙল দিয়ে ক্ষেত্রকর্ষণের মাধ্যমে কৃষিকার্যের শুভারম্ভ করেন। ভারতীয় প্রাচীন লোকাচারের মতো এখানেও কর্ষণকার্যে নিযুক্ত বলদগুলিকে বিবিধ অলংকারে অলংকৃত করা হয়। ক্ষেত্রকর্ষণের সময় সেদেশীয় পুরোহিতেরা পঞ্চদশ দেবতার উদ্দেশ্যে সমন্ত্রক অর্ঘ্য নিবেদন করেন। তুলনীয় পারস্করগৃহ্যসূত্রে আমরা ক্ষেত্রকর্ষণ আরম্ভে ইন্দ্র প্রমুখ আটজন দেবতার উদ্দেশ্যে সমন্ত্রক আহুতি দানের বিধান পায়। তথ্যসূত্র অনুযায়ী বৃষ্টির দেবতা *মিয়ো খৈং কিয়াজওয়া* এর প্রসন্নতার জন্য রাজকীয় হলকর্ষণ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়, যাতে দেশে শস্য উৎপাদন ভালো হয়[১৮]। অতএব পরিশেষে বলা যায়, উত্তর কালের ভারতীয় সাহিত্য রামায়ণকে অবলম্বন করেই প্রাচীন ভারতীয় কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচারের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সফল পদার্পণ ঘটেছে।

রাজকীয় হলকর্ষণ উৎসব, ব্যাঙ্কক, থাইল্যাণ্ড, ২০১৯, ব্রহ্মদেশীয় সোয়া চোন (Saya Chone) কর্তৃক অঙ্কিত রাজকীয় হলকর্ষণের চিত্র[১৯]

Reference:

১. সা নিষ্ঠা যা বিদ্যা স্ত্রীষু শূদ্রেষু চ, আথর্বনস্য বেদস্য শেষ ইত্যুপদিশন্তি। (আপ. ধ. সূ. ২.২৯.১১-১২)।

২. ‘সীরা যুঞ্জন্তি’ ইতি নবর্চং সীতাদৈবত্যমানুষ্ঠুভম্। বিশ্বামিত্রঃ সর্বাভিঃ সীতামেব’স্তৌৎ। (অথর্ববেদীয়-বৃহৎসর্বানুক্রমণিকা ২।২।৬)।

৩. ‘সীরা যুঞ্জন্তি’ইতি দ্বিতীয়সূক্তেন কৃষিনিষ্পত্তিকর্মণি ক্ষেত্রং গত্বা যুগলাঙ্গলং বধ্নাতি। অনেনৈব সূক্তেন দক্ষিণম্ অনড্বাহং যুগে যুনক্তি। ততঃ কর্তা অনেন সূক্তেন প্রাচীনং কৃষন্ সূক্তসমাপ্তনন্তরং হালিকায় হলং প্রযচ্ছেৎ। তেন তিসৃষু সীতাসু কৃষ্টাসু উত্তরসীতান্তে অগ্নিম্ উপসমাধায় অনেন সূক্তেন পুরোডাশেন ইন্দ্রম্ স্থালীপাকেন অশ্বিনৌ চ যজন্ উত্তরস্যাংসীতায়াং সংপাতান্ আনয়েৎ। (অ.বে.সা.ভা. পৃ. ৩৪৫)

৪. ‘সীতা বন্দামহে’ইত্যৃচা হালিকেন কৃষ্যমাণাস্তিস্রঃ সীতাঃ কর্তা প্রত্যেকম্ অনুমন্ত্রয়তে (অ.বে.সা.ভা.পৃ. ৩৫৪)

৫.অগ্নিচয়নকর্মণি অগ্নিক্ষেত্রকর্ষণায় যুজ্যমানং সীরং 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইতি ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়তে। (অ.বে.সা.ভা.পৃ. ৩৪৫)।

৬. 'কৃতে যনৌ'ইতি তস্মিন্ কৃষ্টক্ষেত্রে ওষধীরাবপন্তম্ অধ্বর্যুম্ অনুমন্ত্রযতে। (অ.বে.সা.ভা. পৃ. ৩৪৫)।

৭. ইন্দ্রদৈবত্যং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রং ইন্দ্রায়ত্তা চ কৃষিরিতি (পা.গৃ.সূ. কর্কভাষ্য পৃ. ২৮৬)।

৮. অথ সাগ্নিকস্য কৃষিকর্মণি বিশেষমাহ। ...স্থালীপাকস্য চরোঃ পূর্ববল্লাঙ্গলযোজনোক্তদেবতা ইন্দ্রাদিকাঃ যজেত কিংকুর্বন্ প্রবপন্ কুর্বন্ কযোঃ ব্রীহিযবযোঃ ব্রীহিযবযোর্বপনকালে। (পা.গৃ.সূ. হরিহর ভাষ্য, পৃ. ২৮৭)।

৯. The verse seems to imply hidden comparison of the Poet's work with the plowman's. (হুইটনি, অথর্ববেদ সংহিতা, পৃ.১১৫)।

১০. শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ। শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং।। (ঋ.বে. ৩।৫৭।৮)।

১১. পর্জন্যো মধুনা মধুরৈঃ পয়োভিরুদকৈঃ সিঞ্চতু। হে শুনাসীরা...সুখমস্মাসু ধত্তম্... (ঋ.বে.সা. ৩।৫৭।৮)

১২. অতঃ শুন ইন্দ্রঃ সীরো বায়ুঃ ইতি (ঋ.বে. সা.ভা. ৪।৫৭।৫)।

১৩. Śunāsīrā, do ye (two) enjoy me here; what milk ye have made in heaven, therewith pour ye upon this (furrow). (হুইটনি, অথর্ববেদ সংহিতা, পৃ.১১৭)।

১৪. অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা। যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি।। (ঋ.বে.৪।৫৭।৬)

১৫. 'সীতা বন্দামহে'ইত্যৃচা হালিকেন কৃষ্যমাণাস্তিস্রঃ সীতাঃ কর্তা প্রত্যেকম্ অনুমন্ত্রয়তে (অ.বে.সা.ভা.পৃ. ৩৫৪)।

১৬. অথেতিবৃত্তান্তান্তরারম্ভে ক্ষেত্রং যাগভূমিং মে কৃষতঃ ময়ি কর্ষতীত্যর্থঃ চয়নার্থমিতি শেষঃ "লাঙ্গলং পবীরবমিতি দ্বাভ্যামৃষভেণ কৃষতি" ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ। (রামায়ণ - ১।৬৬।১৪)।

১৭. The Royal Ploughing ceremony was introduced to Southeast Asia from ancient India. The ceremony appeared in ancient Indian epic Rāmāyaṇa, thousand years ago. (Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ploughing_Ceremony#The_pre-Ramayana_tradition retrieved on- 28.11.2020

১৮. The Ploughing ceremony was a ritual to propitiate the rain god, *Meo Khaung Kyawzwa* in order to ensure a good harvest for the kingdom.
(Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ploughing_Ceremony#The_pre-Ramayana_tradition retrieved on- 28.11.2024

১৯.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saya_Chone%27s_%22Royal_Ploughing_Ceremony%22.png. retrieved on- 28.11.2024

Bibliography:

অথর্ববেদ শৌনকীয় (পদপাঠ-শ্রীসায়ণাচার্যকৃতভাষ্য-পাঠভেদ-টিপ্পণী-সহিত), সম্পা. বিশ্ববন্ধু (ভীমদেব, বিদ্যানিধি,মুনীশ্বরদেব প্রমুখের সহযোগীতায়), *বিশ্বেশ্বরানন্দ ভারত-ভারতী গ্রন্থমালা ১৩-১৭*, হোশিয়ারপুর: বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক শোধসংস্থান, ১৯৬০ (প্রথম খণ্ড)

অথর্ববেদীয়-বৃহৎসর্বানুক্রমণিকা, সম্পা. বিশ্ববন্ধু, হোশিয়ারপুর:বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক শোধসংস্থান, ১৯৬৬

আপস্তম্ব, *আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র* (শ্রীমৎ হরদত্ত মিশ্র বিরচিত উজ্জ্বলা বৃত্তি সহিত), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় চিন্নস্বামিশাস্ত্রী এবং মীমাংসা শিরোমণি রামনাথশাস্ত্রী, বারাণসী:চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ১৯৬৭

ঋগ্বেদসংহিতা (শ্রীমৎ সায়ণাচার্য বিরচিত ভাষ্য সহিত), সম্পা. এন. এস্. সোনটক্কে, সি.জি. কাশিকর্, বি.এস্. বরদারাজ শর্মা, বি.ভি. উম্রাণিকর্ প্রমুখ, পুণে:বৈদিক-সংশোধন- মণ্ডল, ১৯৩৬

কৌটিল্য, *অর্থশাস্ত্র*, সম্পা. রাধাগোবিন্দ বসাক বিদ্যাবাচস্পতি, কোলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিসার্স প্রা. লি., ১ম খণ্ড, ১৯৬৭

পারস্কর-গৃহ্যসূত্র (কর্কাচার্য, জয়রাম,হরিহর, গদাধর, বিশ্বনাথ প্রমুখ লিখিত ভাষ্য সহিত), সম্পা. মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে, বোম্বাই : মুন্সীরাম মনোহরলাল প্রা. লি., ১৯৮২

শ্রীমদ্-বাল্মীকি-রামায়ণ (গোবিন্দরাজ কৃত ভাষ্য সহিত), সম্পা. টি.আর. কৃষ্ণাচার্য এবং টি.আর. ব্যাসাচার্য, বালকাণ্ড, বোম্বাই: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১১

Whitney, William Dwight. *Atharva-Veda- Saṃhitā* (trans. with a critical & exegetical commentary). Ed. Charles Rockwell Lanman (with the cooperation of various scholars). *The Harvard Oriental Series.* Vol. VII. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1905

(Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ploughing_Ceremony#The_pre-Ramayana_tradition retrieved on- 28.11.2020

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 602 - 607
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

দ্বারিয়াপুরের ডোকরা শিল্প : একটি সমীক্ষা

ড. মিঠু দে
অতিথি অধ্যাপক
গুসকরা মহাবিদ্যালয়, গুসকরা, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : deymithu014@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Dhokra, Wax Method, Traditional, Trible, Blackmiths, Images, Metal, Artisans.

Abstract
Dwariapur, is famous village for Dhokra craft. Dwariapur village is located at Purba Bardhaman district, Ausgram (I) Block. There is a groyp of families involved in making dhokra craft at Dwariapur. Dhokra art is the one of the ancient Indian art. The wax method of metal casting, popularly known as Dhokra. In West Bengal two District are famous for this art, one of in Bikna village (Bankura) and nearby Dwariapur village (Purba Burddhaman). The ancient craft of Dhokra art was once widespread though out India, but is now restrict to a small number of groups of traditional artisans in widely dispersed locations. According to Risley, 'Dokra' as a sub caste of kamars black miths in western Bengal, who make brass idols. Dhokra artists create different types of objects. They also made and sold decorative items in different shapes and sizes. Metal used by Dhokras is usually the scrap old utensils scrap collected from the villages, heated and broken into small bits. The craftsman knows by experience the amount of metal required for casting a particular object. The main items of Dhokra art, is enchanting folk motif, primitive simplicity a rustic beauty and imaginative designs and patterns which finds influence from life and surrounding environment of the artisans. The traditional themes of these cast metal sculptures include images of Hindu and Tribal Gods and Goddesses, human images, dancing doll, tribal images, many types of animal etc.

Discussion

সংস্কৃতি হল মানবসৃষ্ট এমন সব কৌশল যার মাধ্যমে মানব সমাজ তার সমস্ত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। কোন স্থানের মানুষের আচার ব্যবহার, জীবিকা, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের উন্নতি বা অবনতি ঘটে সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ক্রিয়া কলাপকে কেন্দ্র করে। জনজীবন বা লোকজীবনের প্রয়োজনে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণ ও উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত লোকসমাজ হতে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, - "সংস্কৃতি যদি সভ্যতা বৃক্ষের একটি পুষ্পিত শাখা হয়, তাহলে লোকসংস্কৃতি হল সেই বৃক্ষের শিকড় যা মাটিকে আশ্রয় করে আছে এবং যে মাটি থেকে রস আহরণ করে বৃক্ষকে ফল ফুলে সজ্জিত করে শোভা বৃদ্ধি করে"। এই লোকসংস্কৃতি এক বিশেষ দিক হল লোকশিল্প। ড. নীহার রঞ্জন রায় লোকশিল্পকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকায়ত শিল্প বলেছেন। লোকশিল্প তথা লোকায়ত শিল্পের বিকাশ ঘটেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ শিল্প জ্ঞান হতে। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় শিল্পকলা অথবা লোকায়ত শিল্পকলার উৎস সন্ধানে নিরত হলে আমাদের অতি অবশ্যই পৌছাতে হবে সমাজ বিকাশের এমন এক প্রাকৃত স্তরে যেখানে জীবনধারন তথা জীবিকা নির্বাহের মৌল প্রয়োজনেই মানুষ সরাসরি এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করত। আদিম সমাজ হতে উদ্ভূত এবং তার প্রত্যক্ষ গোষ্ঠীগত উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যবাহী উত্তরসুরীর যে শিল্পকলার অনুশীলন করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বা যুগে এসে পৌছেছে সেই সকল ব্যবহারিক শিল্পকলাকে লোকশিল্প বলে চিহ্নিত করা যায়।[১] এখানে যে জায়গাটি নিয়ে এই লোক শিল্প গড়ে উঠেছে সেটি প্রাচীন বঙ্গদেশের রাঢ জনপদ। ভূমিবিন্যাস ও অধিবসতির দিক থেকে এই রাঢ় জনপদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে তাম্রপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিক পরিচয়ে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ক্রমবিকাশের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। মানব গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শিল্পকলার নিদর্শন মিলেছে বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে। শিল্প মনস্কতার পথ ধরেই একদিন মানুষ পাথর দিয়ে, মাটি দিয়ে, কাঠ দিয়ে, লোহা দিয়ে কিছু না কিছু গড়েছে কখনো তা প্রয়োজনীয় বাসনপত্র, কখনো অস্ত্র, আবার কখনো অলংকার। সেই অলংকার যেমন দেহের তেমনি গৃহেরও।

রাঢ়বাংলার পুরুলিয়া, রাচি, বীরভূম, প্রান্তিক দুমকায় এছাড়াও বর্ধমান ও বাঁকুড়াতে ডোকরা শিল্পের প্রচলন রয়েছে। রাঢ়বাংলা বাদ দিয়ে ছত্রিশগড় ও ওড়িষ্যাতেও ডোকরা শিল্পের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এইসব জায়গাতে তাদের জীবিকা ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। ডোকরা শিল্প সম্ভবত প্রথম উদ্ভূত হয় মধ্যপ্রদেশ অথবা ছোটনাগপুর বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্পের কারিগর যারা আদিতে যাযাবর জনগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন জারা ঘুরতে ঘুরতে বিহার সীমান্ত পার হয়ে বঙ্গভূমির রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তবে আজ এত বছর পরেও এই শিল্পকে রাঢ়ের শিল্প বলা চলে, রাঢ় ভূমির যে দুটি জায়গাতে এই ডোকরা শিল্পের প্রসার ঘটেছিল তাদের মধ্যে বর্তমান বাঁকুড়া জেলা ও বর্ধমান জেলা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যখন অন্য ধাতুর প্রচলন হয়েছিল তখন ধাতু মূর্তি, ধাতুপাত্র, ধাতু অস্ত্র গড়তে শিখেছিল মানুষ। ধাতু ব্যবহারের প্রথম স্তরে যেসব ধাতব লক শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল, ডোকরা শিল্প সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের যেমন ভারী শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, পূর্বাঞ্চলের তেমনি হস্ত ও কারুশিল্পের প্রসার ঘটেছে, এই রকমই এক গ্রাম নিয়ে এই লেখায় আলোকপাত করবো।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম এক নম্বর ব্লকের অধীনে একটি গ্রাম দ্বারিয়াপুর। এই গ্রামটি দিগনগর দু'নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এই গ্রামটি বিশেষ এক লোক শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামটিতে যাওয়ার জন্য সবথেকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনটি হল গুসকরা। গুসকরা স্টেশন থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের যে কয়েকটি জায়গা ডোকরা শিল্পের জন্য বিখ্যাত সেই সব জায়গার মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। সড়কপথে গুসকরা মানকর রোডের ধারে দ্বরিয়াপুর গ্রামে ডোকরা শিল্পীদের বাস। এই সমস্ত লোক শিল্পি অধিকাংশ পরিবার ভিত্তিক।

> "এই সমান্তর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন কৃষিকাজ, লিখন প্রণালী, ব্রোঞ্জ তৈরির মতো মোম ছাঁচ গলানোর ঢালাই রীতির Cire Perdue Metel Casting অন্যতম নিদর্শন। এই ধাতুশিল্পই ডোকরা শিল্প। এই বিশিষ্ট রীতির শিল্প ভারতীয় জনকৃতির ধারা, কোন বিদেশগত ধারা নয়।"[২]

প্রধানত পিতল দিয়ে ঢালাই পদ্ধতিতে নির্মিত প্রাচীন লোকো শিল্পের বৃহৎ নিদর্শনকে ডোকরা শিল্প বলে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে প্রায়ই একই ধরনের প্রযুক্তি পদ্ধতি ও শিল্প সংস্কৃতি বিকাশ ঘটে। তবে এই ধরনের বিকাশকে নৃতত্ত্ববিদরা 'সংস্কৃতিক সমান্তরতা' বা Cultural Parallel বলে অভিহিত করেছেন। এই ডোকরা শিল্প ভারতবর্ষ ছাড়াও মালয়েশিয়া, আফ্রিকা, মিশর এবং মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোম ছাঁচ গলানো ধাতু শিল্পটি দেখতে পাওয়া যায়। ধাতু শিল্পের বিকাশ ও আগুনের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আগুনের তাপে ধাতু গলানো যায় দেখেই মানুষ বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করার কথা ভেবেছিল। নবোপলীয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যুগের মৃৎশিল্প থেকে তাম্র প্রস্তর যুগের ধাতু শিল্পে উত্তরণ কালে এই শিল্প রীতি বিকাশিত হয়। বিশিষ্ট লোক শিল্প গবেষক প্রভাস সেনের মতে, -

> "The art of casting metel into different objects of use developed as man stepped into the copper stone age from that of burnt clay pottery."[৩]

প্রভাস সেন তার, 'Metel work, craft of West Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন, - "বহু প্রাচীন ভ্রাম্যমান যাযাবর গোষ্ঠী বহু ধরনের অনার্য জীবিকায় জড়িত থেকে এদেশের পথে পথে, গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন হাজার হাজার বছর ধরে, তারা ধাতু শিল্পের কাজ করেছেন, রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন শারীরিক কৌশল প্রদর্শনের খেলা ও বাঁদর নাচের খেলা দেখিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন, জাতিগতভাবে ডোকরা শিল্পীরা তাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত"। কাজেই বাংলার ডোকরা শিল্পের উৎস অনেক প্রাচীন। প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে এই শিল্প রীতি চলে আসছে।

ডোকরা সম্প্রদায়ের উদ্ভাব ও প্রাচীনতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক আলোকপাত করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রথম যার নাম আসে তিনি হলেন এইচ. এইচ. রিজলি তার সুপরিচিত গবেষণা গ্রন্থে লিখেছেন, -

> "Dhokra a subcaste of kamars or black smiths in western Bengal who make brass idols."[৪]

রিজলির গবেষণা অনুসারে বলা যায় যে, কামার সম্প্রদায় লোহার নির্মিত শিল্প ছাড়াও অন্যান্য ধাতুশিল্পের ও কাজ করেন। আদিতে এই কর্মকার সম্প্রদায় সম্পূর্ণ আদিবাসী ছিলেন। ডোকরারা পরবর্তীকালে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু বর্ণাশ্রম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত শূদ্রশ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। অনেকে আবার ইসলাম ধর্ম ও গ্রহণ করেছেন। শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায় তার গ্রন্থ 'বিশ্বকর্মার সন্ধানে' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু হস্তশিল্পী ও কারিগরি শিল্পীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ডোকরা শিল্পীদের নিয়ে তিনি বলেছেন, এই ডোকরা সম্প্রদায় বহুপ্রাচীন আদিবাসী লোক শিল্পী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বর্তমানে এরা বিভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন ভিন্ন জীবিকায় ব্যাপৃত থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আরো লিখেছেন আজকাল যাদের ডোকরা কামার বা কারিগর বলা হয়, যতই তাদের সঙ্গে কাজ করেছি ততই ক্রমশ বুঝতে পেরেছি এরা ভারতবর্ষের যেখানেই থাক না কেন, সকলেরই মূল এক। এদের সকলের কাছেই শুনেছি যে এদের আদি গুরু বিশ্বকর্মা। তারা মূলে এবং সর্বাগ্রে ঘুঙুর তৈরি করতেন।[৫] প্রাচীন পুরানগুলিতে ধাতব মূর্তি এবং ফাঁপা ধাতব মূর্তি দুইয়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণ ও মৎস্য পুরাণ এ এই ধাতু শিল্প রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালের গবেষক প্রশান্ত দত্ত, তার প্রবন্ধে এই শিল্পের সম্পূর্ণ নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তার মতে ডোকরা শিল্প পদ্ধতি বহুকাল থেকেই ভারতীয় নাগরিক সভ্যতায় সুনিশ্চিত স্থান করে নিয়েছিল। যদিও তাদের উদ্ভব বহু প্রাচীন আদিবাসী সমাজে। এই শিল্প পদ্ধতি ভারতীয় ধাতু শিল্প সংস্কৃতির সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৬]

এইচ. এইচ. রিজলি তার গবেষণায় ডোকরা শিল্পীদের সুস্পষ্ট ভাবে প্রাচীন কর্মকার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এই সম্প্রদায়কে মোট আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন সেগুলি হল - ১. লোহার কামার- যারা লৌহ নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করেন, ২. পিতলের কামার- যারা পিতলের বাসনপত্র ও ক্ষুদ্র মূর্তি, ঘন্টা, ঘুমুর ইত্যাদি নির্মাণ করেন, ৩. কাঁসারী- যারা কাঁসার বাসনপত্র নির্মাণের কাজ করেন, ৪. স্বর্ণকামার- যারা সোনার অলংকার এবং ক্ষুদ্র তৈজর্সাদি নির্মাণ করেন, ৫. ভাটরা কামার - এই শ্রেনীর কর্মকারেরা সাধারণত ধাতু দিয়ে প্যাঁচা, হাঁস ইত্যাদি দেবদেবীর বাহন মূর্তি নির্মাণ করেন এছাড়াও কাজল লতা ও বাতিদান রূপে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের লোহার ফ্রেমও তৈরি করেন, ৬. ঢাড় কামার - এরা পিতলের আয়না তৈরি করবার কারিগর, ৭. ডোকরা কামার- যারা মোম ছাঁচ গলানো পদ্ধতির ধাতুশিল্প বস্তু নির্মাণ করেন। বিভিন্ন গবেষকের লেখায় শব্দটি ঢোকরা বা ধোকরা বলেও উল্লেখিত হয়েছে। আমরা ডোকরা শব্দটি ব্যবহার করছি। ৮. তাম্র কামার - যারা তামার বাসনপত্র তৈরি করেন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট উপবিভাগ আছে।[৭] বিনয় ঘোষ ডোকরা শিল্পীদের উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কালেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধাতু শিল্পের সমান্তরাল বিকাশ ঘটেছিল, প্রাক আর্যগোষ্ঠীর কোন কোন সম্প্রদায় জাতি বর্ণ ভিত্তিক সমাজবিন্যাসে নিম্নতর সামাজিক সোপানে স্থান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পেয়েছিল। এই হিন্দু পর্বেই এইভাবে সমাজের অবতলে স্থান পাওয়া লোকায়ত ধাতু শিল্পীদের একাংশের নাম ডোকরা কামার।[৮]

এই ডোকরা শিল্প বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কারণ এই শিল্পের নির্মাণ পদ্ধতির বৈচিত্র্যের জন্য। এই শিল্পে মৃৎশিল্প নির্মাণ পদ্ধতি সঙ্গে সঙ্গে ধাতুশিল্প নির্মাণ কর্মের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ডোকরা শিল্পীদের হাতে এই শিল্প প্রকৃত রূপ লাভ করে। প্রথমে এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে সেই মাটি ভালো করে চেলে নিয়ে কাঁকরমুক্ত করে নেওয়া হয়, এর সাথে বালি, ঘুঁটে আর পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে মন্ড বানাতে হয়, এই মন্ড দিয়ে মডেল বানিয়ে ভালো করে শুকানো হয়, শুকানো মডেলের ওপর ধুনো মাখিয়ে আর পিতলের তার জড়িয়ে সেটার ওপর মোমের নকশা তৈরি করেন শিল্পীরা, মোমকে নরম করে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে সূক্ষ্ম সুতো তৈরি করেন শিল্পীরা, এই মোমের পুতুল তৈরির উপরেই নির্ভর করে ডোকরা শিল্পীদের হাতের কাজ। এবারে একটি ফানেলের ভেতরে পিতল বা দস্তার টুকরো ভরে তার ওপর মাটির আস্তরণ দিয়ে আবার শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই ভাবেই মোমের পুতুল সহ ছাঁচটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগে থাকে ধাতুর টুকরো ভর্তি ফানেল, আর এক ভাগে মোমের পুতুল। এবারে একটা উণুনে মোমের পুতুল গলিয়ে দিলেই পড়ে থাকে ফাঁকা ছাঁচ, যার মধ্যে গলে যাওয়া পিতল গিয়ে অপূর্ব শিল্পকর্মের রূপ নেয়। বাইরে থেকে শিখার রঙ দেখে শিল্পীরা বুঝতে পারেন কখন পিতল গলেছে, এবারে এই জ্বলন্ত আগুন থেকে বের করে ঠান্ডা করে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিয়ে গোবর দিয়ে পরিষ্কার করলেই তৈরি হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর শিল্প-কর্ম। কারিগরি পরিভাষায় ডোকরা কাজের নাম ঢালাই বা পিতল ঢালাইও বলতে পারি। বহুদিন ধরে দুই ধরনের ধাতু ঢালাই এর প্রচলন ছিল ঘন ঢালাই ও ফাঁপা ঢালাই। ঘন ঢালাই পদ্ধতি একালে দক্ষিণ ভারতে দেখতে পাওয়া যায়। ডোকরা শিল্প ফাঁপা ঢালাই এর অন্তভূক্ত। মাটির ছাঁচ ব্যবহৃত হয় বলে ইংরেজি ভাষায় এই পদ্ধতির প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা হল – "Clay moulded investment casting" অর্থাৎ মাটির ছাঁচের মোড়ক ঢালাই।[৯] এই শিল্পকর্মে নির্মাণের জন্য মাটি, মোম, পিতল, সরষের তেল, রং, দস্তা, সিসে, যন্ত্র ও তৈজসের মধ্যে চাই পিতল গলাবার পাত্র, ছেনি, হাতুড়ি, সাঁড়াশি, ব্রাশ, সরুশিক, কাঠি, হাঁপর, জল, মাটি ও আগুনের সাহায্যে এই শিল্প প্রস্তুত হয়। আগুন জ্বালাবার ইন্ধন কয়লা বা কাঠ তাই প্রয়োজনীয়। মূর্তিগুলো নরুন দিয়ে জট মারে, চিকন করে, ঘষে, মেজে বাড়তি অংশ চেচে ফেলে মূর্তিটির সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তোলা হয়। ডোকরা শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি প্রায় সবই কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। তারা উৎপাদিত শস্য পরিমাপের জন্য যে পাত্রের প্রয়োজন সেগুলি তৈরি করত, যেমন - শস্য মাপার পাই, কনা, ছটাক, তেলের পোলা, ফুলের সাজি, রেকাবি, সিঁদুর কৌটো, আতর দানি, ফুলদানি, গয়নার বাক্স, প্রদীপ প্রভৃতি। আদিবাসী মা ও ছেলে, নৃত্যরত ও আদিবাসী নরনারী, তীর ধনুক হাতে আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিমূর্তি, কর্মরত নরনারী, কলসি হাতে রমণী, চুল বাধায় ব্যস্ত নারী, দোতারা হাতে বাউল প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরনের গহনা যেমন হাঁসুলি, নুপুর, আংটি, নাচের ঘুঙুর, হারের লকেট, গরুর গলায় ঘন্টা প্রভৃতি, অনেক রকমের ঘোড়া, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সিংহ, রকমারি হাতি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, হরিণ, পেঁচা, ময়ূর, কচ্ছপ, নানা ধরনের মাছ, ব্যাঙ, বাঁদর প্রভৃতি ডোকরা শিল্প পদ্ধতিতে প্রস্তত করা হয়। এছাড়াও দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে দেবী লক্ষ্মীর মূর্তি বেশি দেখতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীর সাজ, বাগদেবী সরস্বতী, ভগবতী, কার্তিক, গনেশ, দুর্গা, নটরাজ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি। আধুনিক সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয় চুরি, বালা, নেকলেস, মাথার পিন, কানের দুল, শাড়ি আটা ক্লিপ প্রভৃতি। এছাড়া অনেক সময় ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী নানা নিত্য নতুন ডোকরা শিল্প শিল্পীরা বানিয়ে থাকেন অর্থাৎ ক্রেতাদের রকমারি চাহিদা এই ডোকরা শিল্পের নতুন শিল্প ভাবনা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করে।

বর্তমান সমীক্ষা অনুসারে দ্বারিয়াপুর গ্রামে যে ডোকরা শিল্পীরা বসবাস করেন তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল বলা চলে না। যৌথ পরিবারের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে একক পরিবার হলেও সদস্য সংখ্যা কম নয়, কারণ এই শিল্পকর্মটি করার জন্য ছেলেমেয়ে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে থাকে। ডোকরা শিল্পী পরিবার গুলির মধ্যে সামাজিক বিধিনিষেধ খুব একটা কড়াকড়ি নয়। তবে বিবাহের বিষয়টি নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমান সমাজের ডোকরা শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব জীবিকা ছেড়ে অন্য জীবিকার পথ বেছে নিয়েছেন। তবে বেশীরভাগ

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষেত্রেই তারা কোন না কোন শিল্প কর্মের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন। অধিক কাল যাবৎ দরিদ্রতার কারণে তাদের মধ্যে যথেষ্ট হতাশা ও হীনমন্যতা কাজ করছে। এই শিল্পীরা শিক্ষার দিকে তাদের আগ্রহ খুব একটা প্রকাশ করে না। তবে যে পাড়াতে বসবাস করে সেগুলি অপরিষ্কার, গৃহগুলি জীর্ণ, চালের খড় ও টালি দীর্ঘদিন বদলানো হয় না। এই শিল্পী গোষ্ঠীর সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ কিছু জাঁকজমক দেখতে পাওয়া যায় না।

দ্বারিয়াপুরে ডোকরা শিল্পীদের বর্তমান সময়ে সরকারি সাহায্য পেয়ে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সরকারি প্রচেষ্টায় তাদের বাইরে থেকে কাজের অর্ডার আসে এবং সেইসব কাজের মাধ্যমে তাদের যেমন শিল্প-কর্ম করার উদ্যোগ বেড়েছে তেমনি তাদের আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়েছে। সপ্তাহে দুটি দিন এই গ্রামে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের শিল্পকর্ম বিক্রি করার ব্যবস্থা আছে। যেখানে আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক পর্যটকরা আসে তার ফলে তাদের বিক্রি ও বাড়ে, এছাড়া এখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মেলা বসে আর তাতে ডোকরা শিল্পের কদর নেহাত কম নয়। হস্ত শিল্প মেলা, সবলা মেলা, খাদি মেলা এই রকম আরো নানা রকমের মেলাতে ডোকরা শিল্পীরা তাদের শিল্পের সম্ভার নিয়ে পসরা সাজায়। বহু শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন আকারের ডোকরা জিনিস পত্র নিয়ে এইসব মেলাতে বসে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয়, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে ও এই ডোকরা শিল্পীরা তাদের শিল্পের প্রদর্শন করে থাকে।

তবে বর্তমানের পরিস্থিতি দশ বছর আগেও এরকম ছিল না তখন কোন রকমে ধুকতে ধুকতে বেঁচে ছিল ডোকরা ও তার শিল্পীদের পরিবার। বিশেষ দুই একজন রাজ্য, দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের শিল্প নিদর্শন থেকে পুরস্কার পেলেও সাধারণ ডোকরা শিল্পীরা ছিলেন খুবই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে। বর্তমান সময়ে লোক শিল্পের নানা কর্ম প্রচেষ্টায় ডোকরা শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও মঞ্জুষা, খাদির মত বিভিন্ন সংস্থা এই শিল্পকর্ম কিনছে। এই শিল্পের আরেকটি সমস্যা হল মিডিল ম্যান। ডোকরা শিল্পীদের নিরক্ষরতা ও বাজার অর্থনীতির বাস্তব বুদ্ধিতে মিডিল ম্যান প্রতি নিয়ত তাদের ঠকিয়ে চলে। সাধারণ ডোকরা শিল্পীরা নিজস্ব উৎপাদিত পণ্যের দাম ঠিক করতে পারেন না, ফলে শিল্পীদের বেশির ভাগই মিডিল ম্যানের কাছ থেকে টাকা বা কাঁচামাল নেয় তাই তাদের দামেই শিল্প দ্রব্য বিক্রি করতে তারা বাধ্য হয়। ফলে ডোকরা শিল্পীরা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়।[১০] West Bengal District Gazetters, Bardhaman, আনুসারে 'Dariapur Dhokra Artisans Co-Operatives Industrials Society Ltd'. প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ডোকরা শিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে। এই গ্রামের ডোকরা শিল্পী হারাধন কর্মকার লন্ডন, চিকাগো ও জাপান গিয়েছিলেন ডোকরা শিল্পের প্রদর্শনী করতে। তিনি জুন, ২০১৫ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত 'Gannat Fastival' অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রামের আরেক ডোকরা শিল্পী সুভাষ মণ্ডল, জুলাই ২০১৫ সালে USA এর NABC হাউসটোনে ডোকরা শিল্পের প্রদর্শনী করেন।[১১]

বর্তমান প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রতিবছর এপ্রিল মাসে দ্বরিয়াপুরে অনুষ্ঠিত হয় ডোকরা মেলা। এই শিল্প মেলা হল একটি বার্ষিক উৎসব যা বাংলার আদিবাসী ডোকরা শিল্পের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই মেলায় ডোকরা শিল্প প্রদর্শন ও বিক্রয় ছাড়াও উপজাতীয় নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য, বাউল গান সারাদিন ব্যাপী পরিবেশিত হয়। ডোকরা শিল্পীরা তাদের নানান ধরনের শিল্প কর্ম ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরেন। দ্বারিয়াপুরের ডোকরা শিল্প বর্তমান সময়ে এক বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো শিল্প গ্রাম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

Reference:

১. চৌধুরি, যজ্ঞেশ্বর, রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ২০০৮, পৃ. ৩০৬

২. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৭০

৩. Sen, Prabhas, Metal work, craft of West Bengal, Mopin Publishing, New Delhi, 1994, pp. 84

৪. Risley, H. H, The Tribes and Castes of Bengal, vol 1, Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981, pp. 236

৫. মুখোপাধ্যায়, মীরা, বিশ্বকর্মার সন্ধানে, দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 68
Website: https://tirj.org.in, Page No. 602 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. দত্ত, প্রশান্ত, পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা শিল্পের আদিপর্ব, লোকশ্রুতি, ঢাকুরিয়া, ১৯৯৮, পৃ. ১২

৭. Risley, H. H, pp. 388

৮. ঘোষ, বিনয়, বাংলার ডোকরা শিল্প ও শিল্পী গীবন, বিশবভারতী, ১৩৭৯, পৃ. ৮৭

৯. বসিরুদ্দোজা, সৈয়দ, রাঢ়ের শিল্প ডোকরা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ১০

১০. Khan, Malay, Dokra Art of Bankura, International Research Journal of Education and Technology, vol-6, 2023, pp. 86-94

১১. West Bengal District Gazetters, March, 1994, pp. 24

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 608 - 616
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুলিয়া জেলায় ডাইনি প্রথার অতীত-বর্তমান : প্রসঙ্গ সাঁওতাল সম্প্রদায়

মি: শিবু মাঝি
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মহাত্মা গান্ধী মহাবিদ্যালয়, দলদলি, লালপুর
Email ID : majhishibu65@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Santal, Darwa, Joan of Arc, Jan Guru, Ojha, Lita, Pub and illiteracy.

Abstract

At present, there are more than 705 aboriginal Communities in India. The Santal community is one of the third-largest groups. They mainly reside in the eastern states of India. In West Bengal, the highest concentrations are found in districts like West Medinipur, Bankura, Purulia, Jhargram, West Bardhaman, and Malda, particularly in areas like the Gazal Block. The practice of identifying individuals as witches (Daini) and the Related customs is a long-standing social issue among the Santals, which has been ongoing. While this practice existed among indigenous communities in India and abroad, over time, the term 'Daini' has become limited to fictional stories among mainstream populations both in India and outside. However, within indigenous groups, particularly the Santals, this practice has continued largely intact, continuing even after independence.

To limit the practice of witchcraft and witch identification, states with a significant indigenous population, such as Jharkhand, Bihar, Odisha, and Chhattisgarh, have enacted anti-witchcraft laws. However, no such law has been introduced in Purulia district or West Bengal. In this state, the issue of witchcraft and the related practices have been largely ignored or avoided as a social issue concerning indigenous Santal communities. Particularly in the southwestern part of West Bengal, in Purulia district, which is known for being drought-prone, the practice of labeling individuals as "Daini" has been prevalent even after independence.

The northern, southern, and eastern parts of Purulia district are primarily inhabited by Santal communities. In the northern region, areas like Kashipur, Nituria, and Saturi block; in the eastern region, areas like Hura and Puncha blocks; and in the southern area, regions like Manbazar 1 Block (two areas), Manbazar 2 Block (seven areas), and the Kaira area of Bandwan police station have a important Santal population. The period between 1960 and 1980 in these areas is known as the "Ojha, Sakha, and Jan Guru era," as during this time, there was widespread torture due to the identification of individuals as

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

witches. However, from the 1980s, anti-witchcraft movements began, leading to some reduction in the practice.

This article attempts to explore the past and present context of witchcraft identification and practices within the Santal community in Purulia district. However, most of the discussion is based on secondary sources.

Discussion

ডাইনি এবং ডাইনি প্রথা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহ্যগত ভাবে চলে আসছে। শুধু আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে নয়। এই বিশ্বাস ভারতের মূলস্রোতে এবং ভারতের বাইরে দেশগুলিতেও ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া তা কাল্পনিক গল্পের মধ্যে কালের নিয়মে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে স্বাধীনোত্তর সময় পর্যন্ত বজায় আছে। এমন কি গৌণ হলেও বর্তমানে ডাইনি বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেনি। যদিও ডাইনি প্রথা লুপ্ত হয়েছে। পূর্বে মূলস্রোতের অধিবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ডাইনি বিশ্বাস ছিল কিন্তু ডাইনি প্রথা ছিল না। এমন কি স্বাধীনোত্তর আদিবাসী সাঁওতালদের এখনও ডাইনি বিশ্বাস বর্তমান। কিন্তু আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে বিশ্বাস এবং প্রথা উভয় বর্তমান ছিল। এমন কি স্বাধীনোত্তর সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমান ডাইনি এবং ডাইনি প্রথা রোধ করার জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড় ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে বিংশ এবং একবিংশ শতকে ডাইনি বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণা-পশ্চিমাংশে অবস্থিত পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশে ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত সময়কে ওঝা, সখা এবং জানগুরুর যুগ নামে পরিচিত। কারণ উক্ত সময়ে ডাইনি প্রথার মাধ্যমে ডাইনি চিহ্নিত করে জরিমানা, ঘর ছাড়া এমন কি হত্যা পর্যন্ত ঘটত। এই প্রথার বিরুদ্ধে কবি সারদা প্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে ডাইনি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালদের ডাইনি প্রথাকে সামাজিক বিষয় হিসাবে এড়িয়ে যান। ডাইনি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন থেকে দূরে থাকেন। তাই প্রবন্ধটিতে পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনি এবং ডাইনি প্রথার সেকাল-একাল অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাঁওতালদের সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হল তাদের ডাইনি ও ডাইনি প্রথা। এই প্রথার ফলে তাদের পারিবারিক ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। যা তাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটা বড় সমস্যা হিসাবে চলে আসছে। প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে কারো জ্বর হলে বা মারা গেলে মাঝির নেতৃত্বে জান গুরুর কাছে যায় এবং গ্রামের কোনো মহিলাকে ডাইনি নামে দোষী সাব্যস্ত করে। দোষী করে মোটা অংকের টাকা জরিমানা, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা পর্যন্ত করা হয়। তাই সাংস্কৃতির অগ্রগতির প্রধান বাধা হিসাবে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ডাইনি প্রতিপন্ন করার প্রধান নীতি হল জান গুরুদের পক্ষ পাতিত্ব করা। অর্থাৎ মাঝি পারগাণাদের স্ত্রীকে ডাইনি করা হয় না। তবে এই প্রথাকে দমন করার জন্য ঔপনিবেশিক যুগ এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও প্রশাসন ব্যবস্থার পদক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চলে আসছে। সাধারণত প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক কেন মহিলাদেরকেই ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? কারণ হিসাবে বলা হয় পুরুষেরা মহিলাদের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুণ বা বিদ্যা শেখার জন্য লিটা তথা মারাং বুরুর কাছে যায়। লিটা তাতে রাজী হন এবং দিনক্ষণ ঠিক করেন। কিন্তু মহিলারা তা জেনে যায়। তারা তাদের স্বামীদের উল্লিখিত দিনে নেশাগ্রস্ত করে ফলে তারা যেতে পারেনি। পুরুষদের পরিবর্তে নিজেরাই তারা ছদ্মবেশে লিটার কাছে গিয়ে সেই মন্ত্র গ্রহণ করে। পরের দিন পুরুষেরা হাজির হয়। লিটা তখন বলেন তাদেরকে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। তারা উত্তরে বলেন না। তখন লিটা বুঝতে পারেন এবং তাদেরকে ওঝা বা জানগুরু হওয়ার মন্ত্র দেন। তাদের প্রচলিত বিশ্বাস ডাইনিরা রত্রিতে মাঝি থান বা জাহিরা থানে মিলিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দেবতাদের সাথে নাচ গান করে। আবার তাদের শিষ্য যাতে ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকে তার জন্য তারা নতুন নতুন শিষ্যদের শিক্ষা দেয়। বাড়ির লোক বা তার স্বামী তার অপছায়া দেখতে পায়। রাত্রে বাইরে থাকলেও তারা বুঝতে পারে না।[১] তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায় তাঁর গল্প গুচ্ছের তৃতীয় খন্ডে মূল স্রোতের অধিবাসীদের মধ্যে ডাইনি বিশ্বাস ও গুণীনদের ভূমিকা স্বনা বা স্বর্ণ নামে চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আদিবাসী সমাজে গ্রামের মাঝি বা মোড়লদের নেতৃত্বে গ্রামের সমস্ত পরিবারকে নিয়ে ডাইনি সামাজিক স্বীকৃতি এবং

ডাইনি প্রথা অনুপস্থিত ছিল। তাছাড়া তা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়। তবে ডাইনি বিশ্বাসের উপাদানগুলির মধ্যে কোনো বৈশাদৃশ্য ছিল না। অর্থাৎ ডাইনি বিশ্বাসের কারণ হিসাবে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্রতা, কুসংস্কার এবং স্বার্থান্বেষী, ধূর্ত প্রভাবশালী মানুষের আদিম প্রবৃত্তি তথা কু-চিন্তাকেই দায়ী করেছেন।[২]

ঔপনিবেশিক সময়ে সিধু-কানহুর নেতৃত্বে বিদ্রোহের সময় 'ডারওয়া' বা ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে মহিলাদেরকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে হত্যা করা হত। বিদ্রোহীগণ সুন্দর সুন্দর মহিলাদেরকে ডাইনি চিহ্নিত করে হত্যা করা হত।[৩]

সমাজতত্ত্ববিদদের ধারণা নারী জাতির প্রাধান্য ভীতিজনিত কারণ থেকেই ডাইনি চেতনার উদ্ভব। কারণ দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় আদিবাসী নারীরা জ্বালানী থেকে শুরু করে ঔষধি বৃক্ষ সংগ্রহসহ সব বিষয়ে মেয়েরাই ছিল বিশেষজ্ঞ। তাই নারীদের জ্ঞান ও কর্ম অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে দমিত করার জন্যই উদ্ভব ডাইনি চেতনা।[৪]

সমাজে নিঃসঙ্গ ও বিধবাদের জমির উপর অধিকার ছিল। এই নারীদের ডাইনি নামে চিহ্নিত করে তাদের আত্মীয়রাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হত্যা করার ঘটনা ঘটে। এক জনৈক গবেষকের মতে, 'Greater incidence of witch killings among the Santals could thus be explained by the fact that their women had traditionaly enjoyed a higher order of rights in lands.' আর্চার সাহেব ১৯০৬ খ্রি সাঁওতাল পরগণায় ভূমি বন্দোবস্ত কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কেবল বিধবা এবং নিঃসঙ্গদের ভূমি স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে বিধবা নারীদের কন্যা সন্তানেরা পিতা ও মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে আদালতে মামলা শুরু করে। তাই বিধবা নারীদের ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত এবং হত্যা করার পরেও জমি হস্তগত করা অসুবিধাজনক। ডাইনি প্রথার সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় হল পুরুষদের কদাচিত ডাইনী হিসাবে চিহ্নিত করা হত। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভোটাধিকার, সংক্ষণের সুবিধা, শিক্ষার প্রসার, বাজারি অর্থনীতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কু-প্রথার প্রতি আঘাত। মাঝি প্রথার ভাঙ্গন নারীদের উপর নিপীড়ন অনেকটা কমে যায়।[৫]

বর্তমানে ডাইনি প্রথা বা বিদ্যা কি তা নিয়ে বিতর্ক। বেশীরভাগ মানুষই অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার বলে অভিহিত করেন। কারণ এর কোনো বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখা বা প্রমাণ নেই। কিন্তু ডাইনি সম্পর্কে যে গল্প বা কাহিনি শোনা যায় তা শিহরণ জাগানো। ভারতবর্ষ ছাড়াও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সমৃদ্ধ দেশগুলির ক্ষেত্রেও ডাইনি ধারণা বর্তমান। তাই ডাইনি বা ডাইনি বিদ্যা সম্পর্কে আরো গবেষণার প্রয়োজন। তবে ডাইনি প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় আদিবাসী তথা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে। পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা দেখা যায়, কারো কোনো রোগ না সারলে বা মারা গেলে আসল কারণ না জেনে জানগুরুর মাধ্যমে গ্রামের কাউকে ডাইনি নামে চিহ্নিত করে জরিমানা, বহিষ্কার এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে কিছুটা ভাটা লক্ষ করা যায়।[৬] কিন্তু বর্তমানেও তারা বিশ্বাস করে যে ডাইনি বিদ্যা সমাপ্ত হয় বাড়ির কাউকে মারার মাধ্যমে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হত্যা করে ডাইনি খাবে। (ক) মন্ত্রের দ্বারা ফুসফুস বার করে ফলে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। (খ) কোনো জন্তু-জানোয়ারের দ্বারা হত্যা করা হয়। (গ) বোঙার সাহায্যে মারা হয়। (ঘ) কোনো পাথর ঘরের মধ্যে পুঁতে রাখে তাতে পা লাগলেই লোকটি মারা যাবে। (ঙ) রোগ জীবাণু সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।[৭]

ডাইনি বিশ্বাস শুধু পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রথার চল ছিল। কোনো কোনো জায়গায় এখনও বর্তমান। ফ্রান্সে ১৪৩১ খ্রি: জোয়ান অফ আর্ক নামে ১৯ বছরের মেয়েকে ডাইনি সন্দেহ করে হত্যা করা হয়। কারণ সে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় জমির বিরোধ, পারিবারিক কলহের কারণে গুনীর দ্বারা ডাইনি হিসাবে ঘোষণা করে থাকে। এখনও আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা কোন কোন দেশে এই প্রথার চল বা বিশ্বাস আছে। ১৯৬৪ খ্রি: ১৮ মে 'লাইফ' পত্রিকায় ডাইনি ক্রিয়াকলাপের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের *ফোকলোর সোসাইটির* সভাপতি ডোগলাস কোনেড ডাইনি বিদ্যা চর্চার কথা স্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন ডাইনি ও ডাইনি তন্ত্রের বিশ্বাস অজ্ঞতা, অজানা রহস্যময় ধারণা। যা ঐতিহ্যগত বিশ্বাস থেকেই জন্ম হয়। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ডাইনি বা ডাকিনী বিদ্যার সাথে আদ্যাশক্তির উল্লেখ আছে। ডাইনিদের আলোকিক শক্তির অধিকারী শক্তি হিসাবে সংস্কৃতে, ইংরাজীতে 'Witch' শব্দটি বলতেও নারীদের চিহ্নিত করা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়। এ থেকে অনুমান করা হয় ডাইনি শুধু সাঁওতাল সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ধারাবাহিকভাবে ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, অকাল মৃত্যু, দূরারোগ্য বিধি দ্বারা মৃত্যু ইত্যাদি যেমন আদিম মানুষের কাছে অজানা ছিল। যদিও তার নির্দিষ্ট কারণ ছিল। ফলে এক শ্রেণির মানুষ আলোকিক শক্তির চর্চা করে এবং যাদু বিদ্যার মাধ্যমে শত্রু উচ্ছেদ এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক অনুরূপভাবে ডাইনি তন্ত্র, তন্ত্র বিদ্যা, তুকতাক অর্থাৎ যাদু বিদ্যার সাথে বিভিন্ন কাল্পনিক বিদ্যার উদ্ভব ঘটে। অপর দিকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ডাইনিরা বদ আত্মাকে বশীভূত করে নানা ক্ষতিসাধন করতে পারে। কারণ ডাইনিরা হচ্ছে এই বদ আত্মার বাহক। এর কারণ জ্ঞান বিকাশের অসাম্যতা, প্রাকৃতিক, আর্থসামাজিক দুর্দশা বর্তমানেও আদিবাসী তথা সাঁওতালদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

তাই ডাইনি বিশ্বাস এখনও টিমটিম করে টিকে আছে। আসলে এর মূল কারণ আর্থসামাজিক দুর্দশা, মানসিক সংকীর্ণতা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর অযোগ্যতা অর্থাৎ সচেতনতা ও বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব। সাঁওতাল ছাড়া অন্যদের মধ্যেও কাল্পনিক অবস্থায় বর্তমান। কেননা বাচ্চাদের ছোট বেলায় গল্প শুনানো হয় ডাইনিরা দেখতে বৃদ্ধা, সাদা চুল, বড় বড় নখ, নাক, বাচ্চাদের ফুসফুস ও রক্ত চুষে খায়। সবসময় ক্ষতিকারক কাজ তাদের বৃত্তি। এমন কি ইউরোপেও বলা হয় ডাইনিরা ঝাঁটা হাতে নিয়ে আকাশে ওড়ে। তা ছাড়া নির্জন কুটিরে কুৎসিত বৃদ্ধা ঔষধ তৈরী করে এবং পাশে কালো বিড়াল ঘুরে বেড়ায়। আদিবাসী তথা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত আছে ডাইনিরা নির্দিষ্ট স্থানে রাত্রে ভাঙ্গা কুলো মাথায় এবং ঝাঁটা পরে নাচ গান করে। সকাল হতে না হতে আবার ফিরে আসে। এই কুসংস্কার আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে আজও টিকে আছে। তার মূল কারণ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা। তা ছাড়া গ্রামের মোড়ল থেকে শুরু করে সরকারও আদিবাসীদের সামাজিক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করে এড়িয়ে যান। কেননা শুধু পুরুলিয়া নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরক্ষর, কুসংস্কারে আবদ্ধ নেশাগ্রস্ত মানুষ এবং আর্থসামাজিক দুর্দশা থেকে মুক্ত হলে মানুষ ডাইনি বিদ্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মরবে না এবং ডাইনিরাও থাকবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি মহাকাশ অভিযান ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা উপরোক্ত কুসংস্কারকে আড়াল করেছে। কেননা শিক্ষা, জ্ঞান বিকাশ ও সম্পদের বৈষম্যকে বেশী করে দায়ী করা যায়।[৮]

আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজে প্রাচীনকাল থেকে চাল পড়া, তেল পড়া, সরিষা পড়া, তুকতাক ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতি নামে ব্যবহার করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কারের আগে এর মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করে। তা ছাড়া তাদের ধারণা মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের জন্য কোনো না কোনো দেবতার প্রভাব, অমঙ্গল ও পাপের কারণে হয়। কারণ পাপের ফলে ভয় ও ভয় থেকেই হয় রোগ। এই ধারণা গতানুগতিকভাবে ধরে তারা আজও পেছনে। তা ছাড়া তাদের বিশ্বাসী গাছ গাছড়ার রস, তুকতাক, ঝাড়ফুক ইত্যাদিতে এক অদৃশ্য শক্তি আছে যা গুনীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করলে রোগ নিরাময় হয়। পুরুলিয়া তথা সাঁওতাল সমাজে ডাইনিটিকে থাকার মূল কারণ শুধু আর্থসামাজিক দুর্দশা, নিরক্ষরতা নয়। তার সাথে মূল কারণ হল সমাজের কিছু অসাধু প্রভাবশালী লোক যারা নিজেদের স্বার্থকে বাস্তবায়িত করার জন্য ডাইনি প্রথাকে আরো জাগিয়ে তোলে। তা ছাড়া সাঁওতাল সমাজের কতগুলো নীতিকে দায়ী করা যায়। পবিত্রতা রক্ষার কারণে ঋতুবতী মহিলাদের কিছু, কিছু জিনিস স্পর্শ করতে না দেওয়া, দ্বিতীয়বার বিবাহিত মহিলারা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের সমাজে ক্ষোভ থেকে যায়। ডাইনি প্রথা দূরীকরণের ক্ষেত্রে শ্রী বাস্কের ৬টি মতকে সমর্থন করা যায়। ডাইনি তন্ত্র কে যে অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও শাসন চলছে তার মোকাবিলা করতে হবে। ডাইনি বিদ্যা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচার করা। বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ডাইনি বিদ্যা যে মিথ্যা, ভ্রষ্টাচার তা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। এমন ওঝা ও জানগুরুদের কার্যকলাপ জন সম্মুখে আনতে হবে। সাঁওতাল তথা আদিবাসীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে হবে। ডাইনি নামে অবিচার, পীড়ন ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য আইনের শাসন, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান। ডাইনির উপর শোষণ, পীড়ন, অত্যাচার করার পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা গ্রহন করার ক্ষেত্রে পিছপা হবে।[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাঁওতাল সমাজে ও সাংস্কৃতির সাথে চলে আসা আর একটি অন্যতম উপাদান হল ওঝা ব্যবস্থা। কিন্তু P.O.Bodding সহ অন্যান্য পণ্ডিত গণের বিশ্বাস ওঝা শব্দটি হিন্দুদের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে। কিন্তু ইহাও সত্য আর্যগণ ২০০০ খ্রি: পূ: থেকে ১৫০০ খ্রি: পূ: মধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এই সময়টাকে বলা হয় বৈদিক যুগ। উক্ত সময়ে চারটি বেদ রচিত হয় তাতে যাদু বিদ্যার কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু অথর্ব বেদে যাদু বিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, ডাইনি বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া গেছে। কারণ এই সময় আর্যরা পূর্ব ভারত তথা গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে ছিল। এই সময় তারা দ্রাবীড়, প্রাকদ্রাবীড় গোষ্ঠীর স্পর্শে আসার ফলে আর্যরা প্রথমে তাদের কাছ থেকে ধার নেয়। পরে প্রাক্-দ্রাবীড় তথা সাঁওতালরা পুনরায় গ্রহণ করে। তাই অথর্ব বেদে তন্ত্রমন্ত্র, যাদুবিদ্যা এবং ডাইনি বিদ্যার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যাদেরকে আর্যরা 'মিথ্যা পূজারী' এবং 'মাংস খাদক' হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। আদিবাসী গোষ্ঠী ওঝা শব্দটি পুনরায় গ্রহণ করে। সম্ভবত খ্রি: পূ. ৬ষ্ঠ শতকে যখন বৌদ্ধ ধর্ম আলাদা ধর্ম হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। সে সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে যাদু বিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, ডাইনি বিদ্যা গ্রহন করে। এইভাবে দেওয়া নেওয়া গঠন পুনর্গঠন এর মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল। যার এক অভিনব পরিবর্তন হয়েছে।[১০] ওঝা বিদ্যা ধারাবাহিকভাবে গ্রামে বজায় রাখার জন্য গ্রামের যুবক ছেলেদেরকে প্রত্যেক বছর মে মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বা অক্টোবর মাসের শুরতে ওঝা বিজ্ঞান বা ওঝা বিদ্যা শেখার জন্য বাৎসরিক কোর্স প্র্যাক্টিস করানো হত। যার নাম ছিল পাইসারি। কিন্তু বর্তমানে সাঁওতাল এলাকায় হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, স্থাপিত হওয়ার ফলে এক দিকে যেমন ডাইনি বিদ্যা সম্পর্কে বিশ্বাস কমছে। অপর দিকে তেমনি গ্রামে গ্রামে ওঝা বিজ্ঞান শিক্ষার যে কোর্স চলত তা আর সাঁওতাল গ্রামগুলিতে দেখা যায় না। তা ছাড়া গ্রাম থেকে ওঝা বা সাঁওতালদের ডাইনি ধরার হাইকোর্ট হিসাবে চিহ্নিত জানগুরু প্রথার প্রতি বিশ্বাস খুব কম সাঁওতালদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[১১]

উপরোক্ত ওঝা ও সখা ব্যবস্থা সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। যদি মাঝি মাপাজিরা রাজনৈতিক নেতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীন থাকত। বিধবাদের ডাইনি সাজানো, ওঝা বা সখা, তুকতাক, যাদু বিদ্যা, জোর পূর্বক জরিমানা টাকা আদায় ইত্যাদি অন্ধ গণ্ডির বাইরে আসতে পারতেন। তা ছাড়া সাঁওতালদের বিবাহ অনুষ্ঠানে, বা পালাপার্বণে হাঁড়িয়া, মদ খাওয়ার স্বীকৃতি সাময়িকভাবে পরমপ্রিয় পাণীয়। কিন্তু একে অজুহাত করে বোতল বোতল হাঁড়িয়া, মদ খাওয়ার দ্বারা আশক্ত। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করে ওঝা বা জানগুরুকেও ছাড়তে পারছে না। তাই এখনও বিভিন্ন গ্রামে ডাইনি অপবাদ দিয়ে মাঝের মধ্যেই অসহায় মানুষকে ঘর ছাড়া, জরিমানা, হত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন ২০০৫ খ্রি: পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানায় বাহামনি হাঁসদা এবং তার স্বামী বাবু লাল হাঁসদাকে গ্রাম ছাড়া করা হয়। অযোধ্যা পাহাড়ের পুনিয়া শাষন গ্রামের কালো মণি সরেনের মাকে ডাইনী সন্দেহে ঘর ছাড়া করায়। কালো মণি সরেন সেখান থেকে পালিয়ে বলরামপুর থানার ডুংরীডি গ্রামে বসবাস করছে। ২০০৬ খ্রি: জুলাই মাসে বলরামপুর থানার নন্দুডি গ্রামের বলরাম মান্ডির বউকে ডাইনী সন্দেহে স্বপরিবারে ঘর ছাড়া করায়। তাই বলা যায় সাঁওতাল সমাজে পর্যন্ত এখনও চেতনা হলেও জাগরণ হয়নি।[১২] সত্তর এর দশকের পর থেকে দেখা যায় সাঁওতাল সমাজ ও সাংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে সাথে সমাজ ও সাংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে চেতনার উন্মেষন ঘটেছে। সমাজের মধ্যে আবার অপর দিকে ডাইনি বিশ্বাস, পণ প্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজ এবং সাংস্কৃতিতে সংকটের বিষয় গুলিও প্রকাশ পেয়েছে 'মড়ে ক তুরুইক' কাহানীর মাধ্যমে। যা সমাজ ও সাংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার দেখা যায় এক বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের যুগে সাঁওতাল তথা খেরওয়াল সাংস্কৃতির একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কেননা যুগের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা স্বত্বেও সাঁওতালদের মধ্যে চেতনার বিকাশ লাভ করার সাথে সাথে ঐতিহ্যের সুষ্ঠ চেতনাও লক্ষ্য করা যায়।[১৩]

স্বাধীনোত্তর পুরুলিয়া জেলার একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাগুলি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ৯০ এর দশক পর্যন্ত ডাইনি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত ছিল। বিশেষ করে মানবাজার থানার ১ নং ব্লকের বিসড়ি এবং ধানাড়া অঞ্চল। মানবাজার ২ নং ব্লকের বুড়িবাঁধ, জামতোড়িয়া, আঁকরো, বোরো, বড়গোড়িয়া, দীঘি ইত্যাদি সাতটি অঞ্চল এবং বান্দোয়ান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থানার কায়রা। উক্ত এলাকাগুলিতে ৬০ এর দশক থেকে মহিলাদের ডাইনি নামে চিহ্নিত করে জরিমানা, বয়কট, ঘর ছাড়া এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হত।

কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে উক্ত এলাকাগুলি পুরুলিয়া সদর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম এলাকায় অবস্থিত ছিল। পায়ে হাঁটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ এলাকাগুলি খাল এবং বর্ষার জলে পুষ্ট নদীগুলির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কেননা নদী এবং খালগুলিতে কোনো কালভার্ট ছিল না। পুরুলিয়া সদর থেকে যেতে হলে প্রায় তিন-চার দিন সময় লাগত। তা ছাড়া উক্ত এলাকায় যথাযথ শিক্ষার সুযোগ ছিল না। মানবাজার ২ নং ব্লকে সাতটি অঞ্চলে মোট ৫৮টি প্রাইমারি বিদ্যালয় থাকলেও কোনো হাই স্কুল ছিল না। যদিও সেখানে ৪ টি জুনিয়ার হাই স্কুল ছিল। তাই হাই স্কুলে পড়তে হলে নদী পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে আগুই বিল অথবা ৭ কিলোমিটার দূরে বোরো যেতে হত। উত্তরে যেতে হলে ১৬ কিলোমিটার দূরে মানবাজার। যা সবার ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। আশির দশকে জামতোড়িয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় স্বাক্ষরতার হার শতকরা ১০ শতাংশ। এমন কি মানবাজার ২ নং ব্লকের সাথে এক সঙ্গে ধরলে তা দাঁড়ায় শতকরা ৪-৫ শতাংশ। এই এলাকায় কংসাবতী, বুড়িবাঁধ ড্যাম, জ্যাক নদী ও কুমারী নদী থাকলেও তাদের সেচের সুযোগ ছিল না। বরং তাদের জমিগুলি জলের তলায় চলে যায়। তাই চাষের জন্য বর্ষার জলের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলস্বরূপ সাত মাস জীবন-জীবিকার জন্য পূব বা নামাল খাটতে বর্ধমান, দূর্গাপুর, হুগলী ইত্যাদি জায়গায় যেতে বাধ্য হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও সেখানে যথাযথ নার্স বা ডাক্তার পাওয়া যায় না। ফলে তারা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তা ছাড়া দারিদ্রের কারণে আধুনিক চিকিৎসা নিতে অক্ষম। তাই তারা বাধ্য হয়ে ওঝা, সখা, বা জানগুরুর কাছে যেতে বাধ্য হত। সেই সুযোগ কিছু স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষ গ্রহণ করে। কেউ শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলে বা রোগের কারণে মারা গেলে রোগ চিহ্নিত না করে গ্রামের মোড়লদের নেতৃত্বে জানগুরুর কাছে যেত। মৃত্যু বা রোগের জন্য বেশিরভাগই গ্রামের কোনো অসহায় বিধবা নারীকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে মোটা অংকের টাকা জরিমানা দাবী করা হত। দিতে অস্বীকার করলে সামাজিক বয়কট, গ্রাম ছাড়া এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হত। যদিও বর্তমানে আর্থ-সামাজিক, যোগাযোগ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে কিন্তু আশানুরূপ নয়।[১৪]

বোরো, ছোটরাঙা, রায়না, দাড়িকাডোণবা, জামতেড়িয়া, ধরমপুর, ডঙ্গরডি, বসন্তপুর, পাঁড়রান মুকুন্দপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি একেবারে পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। উপরোক্ত এলাকাগুলি আদিবাসীদের বসবাসের এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। এই এলাকার সব চাইতে বড় সমস্যা ডাইনি। উক্ত অঞ্চলগুলিতে তিন থেকে চার বছরে ডাইনি অপবাদে ডাইনি এবং তার পরিবারসহ অনেক মানুষকে নিপীড়ন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ইহাই শেষ নয়, প্রচণ্ড অত্যাচারে অনেকে মারা গেছে এবং ঘর ছাড়া হয়েছেন। এমন কি অনেকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। কিন্তু তা বর্তমানে কমেছে। কারণ এই রকম অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু তরুণ যুবকদের আন্দোলনে সামিল করেন সাঁওতাল রমণীদেরকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে হাজার হাজার টাকা নেওয়া, জমি দখল করা এবং ওঝা ও সখাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয় কিন্তু কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। কেন ঘটছে তা সারদা বাবুর কাছে জানতে চাইলে জানান- 'আইন প্রণয়ন ছাড়াই সাঁতালদের ডাইনি প্রথা অবসান ঘটবে। এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমাদের হতাশ হলে চলবে না। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সত্যের জয় হবে'। ডাইনির মূল কারণ অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ছাড়াও সাঁওতালদের মধ্যে পারস্পারিক হিংসা এবং ওঝাদের উপর ভিত্তি করে ডাইনি প্রথা গড়ে ওঠে। কারণ প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামেই ওঝার অস্তিত্ব ছিল বর্তমানেও কোনো কোনো গ্রামে এখনও আছে। ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয় সাধারণত সমগোষ্ঠীর লোকেদেরই। কারণ তাদের মধ্যেই সম্পত্তির বিবাদ বর্তমান থাকে এবং সমাজ বা গ্রামের বৃহৎ অংশই ডাইনির পক্ষে।

শুধু নিরক্ষর নয় শিক্ষিত উচশিক্ষিতরাও এই রীতিতে বিশ্বাসী। মন্ত্রী পদে থাকা সত্ত্বেও ডাইনির পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে, এই প্রথা কুসংস্কার হলেও অনেকে এটাকে বিশ্বাস করেন। তাই উক্ত ব্যক্তি সেই পক্ষে মত দেন। আরো বলা হয় সাঁওতালদের নিরক্ষরতা, দারিদ্রতা, যোগাযোগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ইত্যাদি এলাকা ভিত্তিক সমস্যা। কিন্তু মেদিনীপুরের পাশ্চাত্য ফেরত ইঞ্জিনিয়ার নিত্যানন্দ হেম্ব্রমের সমস্যা নয়। কিন্তু ডাইনি পুরুলিয়া নয় সমগ্রহ সাঁওতাল

জাতির সমস্যা। কারণ যারা বলেন ডাইনি কোনো সমস্যা নয়। তাদের কাছে সত্যিই নয়। কারণ কোনো ওঝা বা সখার সাহস নেই তাদের ডাইনি অপবাদ দেওয়ার। বেশ কয়েকটি ডাইনি ঘটনা যেমন ২৮/০৫/৮০ তে মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার তাঁতিয়া গ্রামের এক মহিলা ও মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বান্দোয়ান থানার কপাট ডাঙা গ্রামের এক মহিলাকে ঝাঁটা পরানো হয় এবং অখাদ্য ও কু-খাদ্য খাওয়ানো হয়।[১৫] এই সময়ে লোয়াগোড়া গ্রামের শ্রীপতি হেম্ব্রমের স্ত্রীকে ডাইনি করা হয় বাবুরাম হেম্ব্রমের মহিষ মারা যাওয়ার কারণে এবং ৩৪০টাকা জরিমানা করা হয়। পুনরায় জানগুরুর কাছে গিয়ে শ্রীপতি হেম্ব্রম নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু গ্রামের মোড়লরা তার কাছে সখা ঘর যাওয়া এবং আসার নামে ২৪৪০ টাকা নেওয়া হয়। অপর দিকে ডাইনি করার নামে বাবু রামের কাছে ২১০০ টাকা নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত তৃতীয়বার সখা ঘর যাওয়ার পর বলা হয় পূর্বের মহিলাই ডাইনি। কেন না তার বাড়ির পাশাপাশি অপদেবতা আছে। আবার ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ললিন টুডুর স্ত্রীকে ডৗন করা হয়। ললিন টুডু দেওয়ানি বা আপিল করে সুধীর টুডুর স্ত্রীকে ডাইনি করলে সুধীর টুডু তা প্রত্যাখান করেন। সুধীর টুডুর অনুগামী চক্রধর টুডু ঘোষণা করেন তারা ডাইন বা ভূত মানে না। ফলে সখা ও ডাইনি পক্ষের লোকেরা তাদের উপর চড়াও হয়। ঘটনাক্রমে টাঁগির আঘাতে লক্ষ্মণ টুডু মারা যান। অপর দিকে সুধীর টুডু এবং মিলন টুডু পালিয়ে বাঁচেন। তারা সারদা বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই ঘটনায় সুধীর ও মিলন কে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক মাসের জন্য জেলে পাঠানো হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মহাষ্টমীর দিন সুধীর ও মিলন জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরেন। অবশেষে তারা বিচারে মুক্তি পান।[১৬]

তারপরও ধারাবাহিকভাবে ডাইনি চিহ্নিত করণ চলতে থাকে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে লাল মোহন মান্ডির স্ত্রী চুনি মান্ডিকে ডাইনি অপবাদে চিপুড়ি গ্রাম থেকে তাড়া করা হয়। লম্বোধর কিস্কুর স্ত্রীকে ডাইনি করে এক ঘরে করা হয়। কবি সারদা প্রসাদ কিস্কুর চিঠি পেয়ে খেরওয়াল গাঁওতার মন্মথ বাস্কে সেখানে হাজির হন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকিবাইদ গ্রামের নীলমণি কিস্কুকে ডাইনি হিসাবে ধরা হয়।[১৭]

কিন্তু আশির দশক থেকে সারদা প্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে মহাদেব হাঁসদা, মহেস্বর বেশরা, মন্মথ বাস্কে, জাগরণ সরেন, কলেনদ্র নাথ মান্ডি, সুধীর টুডু, মিলন টুডু প্রমুখ ডাইনি বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সাংবাদিক বিক্রম নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার এবং সমাজ সেবিকা মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখদের সহযোগিতায় ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের ফলে ডাইনি চিহ্নিত করণে কিছুটা ভাটা পড়ে।[১৮]

পুরুলিয়া তথা সমগ্রহ সাঁওতাল সমাজে ডাইনি প্রথার অন্তরালে মানুষের অপরিবর্তনীয় আদিম প্রবৃত্তি, ধান্ধাবাজ, স্বার্থবাদী মানুষের অবস্থান। বেশীরভাগই আদিবাসীরা ক্রেশার, হাস্কিং মিল এবং ধোঁয়াযুক্ত স্থানে সন্ধ্যা অবধি কাজ করেন। ফলে টবি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয়। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চিকিৎসা বা অর্থের অভাবে পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা ওঝা ও জানগুরুর দবারস্থ হতে বাধ্য হয়। সেই সুযোগ গ্রহণ করে কিছু স্বার্থপর মানুষ। উক্ত সুযোগে পূর্ব শত্রুতা বশত গ্রামের কাউকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে সর্বস্বান্ত করা হয়। তা যদিও বিচার বুদ্ধিহীন অযৌক্তিক অথচ গতানুগতিক ভাবে চলে আসছে। যেমন গ্যালিলিও পঞ্চদশ শতকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সূর্য স্থির পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরছে তা প্রমাণ করলেও, তা উক্ত সময়ে প্রত্যাখান করা হয়। তাকে অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। বর্তমান সময়েও চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় সাধারণ মানুষের ধারণা রাহু তাকে গ্রাস করেছে। তাই সেই সময় শাঁক, করতাল, ঘন্টা বাজানো হয়। অর্থাৎ সত্যকে জেনেও সমাজ তা অস্বীকার করে। সমভাবে আদিবাসী সমাজেও কিছু স্বার্থবাদী মানুষের প্রভাবে ডাইনি প্রথার মতো কুসংস্কারকে মানতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু মূলস্রোতের সমাজে দেখা যায় না। পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনির কতগুলো ঘটনার মাধ্যমে এর অন্তরালের বিষয়টি উল্লেখ করা হল। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বান্দোয়ান থানার শালিডি গ্রামে ডাইনি অপবাদে সূর্য হেম্ব্রম, মিনি হেম্ব্রম (স্ত্রী), দীপক হেম্ব্রম (ছেলে) এক সাথে তিন জনকে হত্যা করা হয়। বান্দোয়ান থানাতেই রিঠাগোড়া গ্রামে পৈতু হেম্ব্রমের পিতা টিবি রোগে মারা যান। কিন্তু মোড়লদের নেতৃত্বে জানগুরুর কাছে যায় এবং পূর্ণ হেম্ব্রমের মেয়ে মঞ্জরিকে ডাইনি করা হয়। তাকে মোট ডাইনি বাবদ ১১৮০টাকা ২৫ পয়সা জরিমানা করা হয়। কিন্তু মঞ্জরি পুনরায় আপিল করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু মোড়লরা অস্বীকার করে। বিপরীতে দাবী করে তার জামায় জানগুরুকে ঘুষ দিয়ে নির্দোষ প্রমাণ করেছে। তাই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র ধানী জমি বন্ধক দিতে বাধ্য করে। শেষপর্যন্ত প্রশাসনের দারস্থ হয়েও তার শেষ রক্ষা হয়নি। বলা হয় - 'ওটা সাঁওতালদের ব্যাপার তাদের সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না'।

এছাড়াও কুশবনি গ্রামের নিশিকান্ত মান্ডির স্ত্রী পূর্ণিমাকে বার বার ডাইনি করে ৮০ বিঘার চাষীকে সর্বস্বান্ত করা হয়। সুরুজ মণি মান্ডিকে চিপুডি গ্রাম থেকে ১০ বছরের ছেলেসহ গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয়। ডাইনি বিরোধী এবং মাদক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে গোমস্তা প্রসাদ সরেন এবং তাঁর সমর্থকগণ ডাইনি অপবাদে বিতাড়িত সুরুজ মণি মান্ডিকে চিপুডি গ্রামে পোঁছে দেওয়ার পদ যাত্রার আয়োজন করলে প্রশাসন তা রাস্তা অবরোধ করে তা ভেস্তে দেয়।[১৯]

কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু ধারাবাহিকভাবে ডাইনি প্রথার বিরোধী আইন প্রণয়ন করার দাবী করে আসছেন। ডাইনি প্রথা রোধ-কড়া আইন অন্যান্য রাজ্য পারে আমরা পারি না কেন'। নারী সুরক্ষা নির্যাতন প্রতিরোধ বিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পাশ হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ডাইনি প্রতিরোধ আইন ঝাড়খন্ড সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দে, ছত্তিশগড় সরকার ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে, বিহার সরকার ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পাশ হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি জেলা গুলিতে ডাইনি প্রথার চল থাকলেও প্রশাসনের কোনো সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না।

একবিংশ শতাব্দীতেও দেখা যায় ডাইনি নামে অত্যাচার, জরিমানা, সামাজিক বয়কট, হত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। ২২শে জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ডাইনি করা হয়। বাঘমুন্ডি থানার রাঙ্গা গ্রামের রাশি টুডুকে ডাইনি নামে জরিমানা এবং গোটা গ্রাম বেঁধে ঘোরানো হয়।[২০]

ডাইনি বিশ্বাস ও ডাইনি প্রথা শুধুমাত্র বর্তমান পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্রহ সাঁওতাল সম্প্রদায় এবং ভারত ও ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অপর দিকে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনি প্রথার অবসান ঘটলেও ডাইনি বিশ্বাস এখনও বর্তমান আছে। ঠিক সমভাবে পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদের মধ্যে সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আদিবাসী এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষার প্রসার, যোগাগোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রামে গ্রামে যে ওঝাদের ট্রেনিং ব্যবস্থার যেমন অবসান ঘটেছে। তেমনি অপরদিকে ডাইনি প্রথারও বিলুপ্ত হয়। বর্তমানে যদিও অন্তরালে ডাইনি বিশ্বাস থাকলেও ডাইনি নির্যাতন প্রায় দেখা যায় না। তবে সাঁওতালদের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিজ্ঞানভিত্তিক সচেতনমূলক শিক্ষার প্রসার, আধুনিক চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো ইত্যাদি যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ডাইনি বিশ্বাস অবসান ঘটবে। তা ছাড়া সাথে সাথে সরকার কর্তৃক ডাইনি বিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ডাইনি চিহ্নিতকারী ওঝা, সখা ও জানগুরুদের নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়।

Reference:

১. রেভারেণ্ড. এল. ও. স্ক্রেফসরুড, *হড় করেন মারে হাপড়াম ক রেয়াঃ কাথা,* পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি আকাডেমি, জানুয়ারী, ২০১০, পৃ. ২১৯, ২২৪

২. বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *'ডাইনি', গল্পগুচ্ছ,* (তৃতীয় খন্ড), জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, (সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৭, (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ. ১১৯, ১২০, ১২৪

৩. বাস্কে, ড. ধীরেন্দ্র নাথ, *ছটরায় দেশ মাঝির স্মৃতি কথা,* ১৮/১ শান্তি নগর, রিজেন্ত পার্ক, কলকাতা, মার্চ, ২০২১, পৃ. ৮, ১০, ১৫

৪. সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী: সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম* (দ্বিতীয় সংস্করণ), বুকপোস্ট পাব্লিকেশন, ৭ নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা, জানুয়ারি,২০২৪, পৃ. ৪৭১

৫. তদেব, পৃ. ৪৭২

৬. হেম্ব্রম, শ্রী মণ্ডল, *সাঁওতাল সমাজে ডাইনী,* সম্পাদনা, ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক, *যাদুঘর,* মারাং বুরু প্রেস, মেদনীপুর, ১৯৭৭, পৃ. ৪৬ – ৫০

৭. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, *পুরলিয়ার ডাইনী বিরোধী আন্দোলন,* সঞ্চয়ন প্রকাশনী, কোলকাতা, (৪র্থ প্রকাশ), ২০০৭, পৃ. ৮৮, ৮৯

৮. তদেব, পৃ. 95, 96, 97

৯. তদেব, পৃ. 97, 98

১০. D. N. Majumdar, *The Santal: A Study in Culture-Change.* Printed by the Government of India Press, Calcutta, 1956, p. 114, 115

১১. Ibid, p. 52, 115

১২. কর্মকার, ড. জলধর, *ঐক্য ভাবনায় সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি,* ট্যুরেন পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী, ২০২১, পৃ. ১১৩-১১৬

১৩. কিস্কু, সারদা প্রসাদ, (খে বা), *খেরওয়াল বাসিয়াওয়া কাহিনীক,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, নর্থ ঘোষ পাড়া, বালী হাওড়া, ডিসেম্বর, ২০১৭ পৃ. ৭, ৮, ৯

১৪. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. 108, 110–113

১৫. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, *সাঁওতালী* ভাষা *লিপি, ও সাহিত্যচর্চা ইতিবৃত্ত,* সঞ্চয়ন প্রকাশনী, ১২১/এসীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলকাতা ৯, নবম একাদশ স্নগস্করণ, ২০১৮, পৃ. ৩৮০-৩৮২

১৬. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১১৯

১৭. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬-১৪১

১৮. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৫, ১৯৫

১৯. সরেন, গোমস্তা প্রসাদ, *ফিরে দেখা* (দ্বিতীয় খন্ড), ১বি/৬৬ জয়দেব এভিনিউ, দূর্গাপুর, মার্চ, ২০১৫, পৃ. ১, ৪-১০

২০. তদেব, পৃ. ১৫, ১৬, ১৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 617 - 626
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ত্রিপুরা রাজ্যের ঊনকোটি জেলায় প্রচলিত ধামাইল গানে প্রতিফলিত জনজীবন : একটি সমীক্ষা

কৃষাণ নমঃ
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কৈলাশহর, ঊনকোটি, ত্রিপুরা
Email ID : krishannamo1234@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Folk culture, Partition of India, Tripura, Folk songs, Dhamaail songs, Regionalism, Public life.

Abstract

Folk music is the most popular and widely circulated branch of Bengali folklore. It is difficult to determine the exact number of years since the creation of folk music. Since the dawn of civilization, music has been intricately connected with human life. Music serves as the only refuge for joy, sorrow, and anguish. Like classical music, melody is the main attraction and source of pleasure in folk music. "Folk music" primarily originates from rural life. It carries the essence, fragrance, and true nature of the common people. This music is deeply infused with the traditions, beliefs, and religious practices of rural life, reflecting various colors and aromas of folk culture. Most importantly, the language of folk music is highly regional.

During the Partition of India and the Liberation War, countless people were forced to leave their ancestral homes and move to West Bengal, Tripura, and Assam. These displaced individuals could bring nothing with them except their culture. Literature serves as a mirror of society, and accordingly, the impact of Partition has been meticulously reflected in Bengali literature. Due to this displacement, the refugees who migrated to these regions gradually blended their culture with that of the native population through long-term coexistence. The songs, rhymes, stories, rituals, dramas, proverbs, and sayings brought by the people from East Bengal merged seamlessly with the cultural fabric of both Bengals.

Folk music is dominated by the melody of Bhatiyali. Just as different regions develop their unique characteristics based on natural surroundings, folk music in this country has also evolved by embracing nature. The landscape of Bangladesh is not uniform everywhere—some areas are barren and rocky, some have undulating terrain, some face drought, while others suffer from river erosion. Due to these regional differences, folk music has not attained a universal form but has instead developed distinctive regional variations. For instance, Bhawaiya in the northern part of the country, Bhatiyali in the eastern region, and Baul songs in the southwestern part are prominent examples.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Additionally, the rivers in different regions of Bangladesh have distinct characteristics. For example, the nature of the Padma, Meghna, Surma, and Dhaleshwari rivers is different from that of the Madhumati, Ichamati, and Bhairab rivers. Consequently, the bond between people and rivers varies across regions. As a result, the creation and evolution of folk music in different regions take on unique dimensions, distinct from one another.

Discussion

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Folklore'। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'Folklore' শব্দটির জন্ম হয়। তার একশো বছরের কিছু সময় পরে ম্যারিয়া লিচ্ (Maria Leach) তাঁর S.D.F.M.L (সংক্ষেপে) অর্থাৎ 'Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে ২১ জন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি বিদের দেওয়া সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম সংজ্ঞা কার জোনাস বালি (Jonas Balys) লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন -

> "Folklore comprises traditional creations of peoples primitive and civilised. They are achived by using sounds and words in metric form and prose, and include also Folk beliefs or superstitions, customs and performances, dances and places."[১]

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন –

> "লোকসাহিত্য নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত যে সমাজ, কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাব মুক্ত, সেই সমাজের সামগ্রিক জীবনবোধ ও মানসিকতার দ্বারা রচিত। স্বভাব কবিত্ব এবং সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবই সেই সাহিত্যের মুখ্য উপাদান।"[২]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণ কুমার চক্রবর্তী লোকসাহিত্য বিষয়ে বলতে চেয়েছেন, লোকসাহিত্য নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত এবং কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত। স্বভাব কবিত্ব এবং সহজ-সরল-অনাড়ম্ব ভাবই লোকসাহিত্যের মুখ্য উপাদান। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার বলেছেন -

> "লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত বুঝেছি অনাগরিক সংস্কৃতিকে। সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী কৌম সমাজে তার জন্ম।"[৩]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার অনাগরিক সংস্কৃতিকেই বুঝিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কারণ অনাগরিক পরিবেশেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা হল -

> "অর্থ-সামাজিক জীবন প্রবাহ ও সমাজ সংগঠনের পটভূমিকায় সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যময় বিকাশ তার বিশিষ্টরূপ লোকসংস্কৃতি।"[৪]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় অর্থ-সামাজিক জীবন ও সমাজ সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলির উপর ভিত্তি করে লোকসংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল -

১. লোকসংস্কৃতি বলয়ের অন্তর্গত জনগণকে ঐতিহ্য নির্ভর সাধারণ সংস্কৃতি পালন করতে দেখা যায়।
২. লোকসাধারণ প্রায় একই প্রকার বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করেন।
৩. সংস্কৃতির এই বৃত্তে সমাজ স্বরূপের সংহতিময় অবস্থান ও সমভাবাপন্ন সংহতি বোধ রয়েছে।
৪. নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে একটি সংস্কৃতির বৃত্ত গড়ে উঠে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. লোক ও সংস্কৃতির বলয়ে বসবাসকারী মানুষের আর্থিক পরিকাঠামো সামাজিক মানদন্ড প্রভৃতি প্রায় একই রকমের, প্রভৃতি।

বাংলা লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত জীবন শাখা হল লোকসংগীত। আজ থেকে ঠিক কত বছর আগে এই লোকসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। সভ্যতা সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই সঙ্গীত মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। সংগীতই মনের আনন্দ দুঃখ বেদনার একমাত্র অবলম্বন। উচ্চ সংগীতের মতো সুরই লোকসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দ। 'লোকসংগীত' মুখ্যত গ্রাম্য লোকজীবন থেকে উদ্ভূত। এই গানে প্রকৃত মানুষের রূপ-রস-গন্ধ বর্তমান। এই গানে নিবিড় ভাবে মিশে আছে গ্রাম্য জীবনের লোকাচার-বিশ্বাস-ধর্ম ইত্যাদির নানা বর্ণ ও গন্ধ। সর্বোপরি এই গানের ভাষা অত্যন্ত আঞ্চলিক।

লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য। বিভিন্ন দেশে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তেমনি ভাবে লোক সঙ্গীত এ দেশে প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের প্রকৃতি সব অঞ্চলে একরকম নয় – কোথাও দেখা যায় অনুর্বর প্রস্তর ভূমি, কোথাও দেখা যায় তরাই অঞ্চল, কোথাও দেখা যায় মঙ্গা অঞ্চল, কোথাও দেখা যায় নদী ভাঙ্গন অঞ্চল। এই সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চলের কারণে লোকসঙ্গীতের সুর সার্বজনীন রূপ লাভ না করে আঞ্চলিক রূপ লাভ করে। যেমন - উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, পূর্বাঞ্চলের ভাটিয়ালি, দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের বাউল মারফতি ইত্যাদি। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত নদনদী রয়েছে তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, যেমন - পদ্মা–মেঘনা সুরমা ও ধলেশ্বরী যেরূপ সেই রূপ মধুমতি, ইছামতী, ভৈরব প্রভৃতির সাথে মিলে না। তাই দেখা যায় নদ-নদীর সঙ্গেও জন মানুষের যে যোগসুত্র স্থাপিত হয় সেই যোগসূত্র সবজায়গাই একরকম না, একেক অঞ্চলে একেক রকম হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সেই অঞ্চলের লোকসংগীত এর সৃষ্টি এবং বিকাশ অন্য অঞ্চলের সাথে ভিন্ন মাত্রা দেখা যায়।

যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ যে সংস্কৃতি লালন করে আসছে সাধারণ অর্থে তাই লোকসংস্কৃতি। ঐতিহ্যানুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবনযাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকেই সহজ ভাষায় লোকসংস্কৃতি বলা হয়। লোকসংস্কৃতির আলোচনায় 'লোক' বলতে কোন একজন মানুষকে বোঝায় না। বোঝায় এমন একজন মানুষকে, যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা। আর 'সংস্কৃতি' হল সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ জীবন চর্যার। সংস্কৃতি অনুশীলন নির্ভর, কালপরম্পরায় বহমান, ক্রম পরিবর্তনশীল। তাই বলা যায়, লোকসংস্কৃতি হল যাতে লোকসমাজের সভ্যতা জনিত উৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে, লোকসমাজের জীবনচর্যার উন্নত রূপটি প্রকাশ পায়।

লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য যা অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিমন্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে এর উদ্ভব। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লী বাসিরা স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এর লালন পালন করেন। এগুলি মূলত ব্যক্তি বিশেষের রচনা হলেও সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা; এর মধ্য দিয়ে জাতির হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়। এই জন্যই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'জনপদের হৃদয়-কলরব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসংগীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, লোকছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ ও প্রবচন এই আটটি শাখায় ভাগ করা হয়।

লোকসংগীত ঐতিহ্যগত ভাবে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গান। সাধারণত পল্লীর জনগণ এর প্রধান ধারক ও বাহক। বিষয়, কাল ও উপলক্ষ্য ভেদে এই গানের অবয়ব ছোট কিংবা বড় হয়। ধুয়া, অন্তরা, অস্থায়ী আভোগ সম্বলিত দশ বারো জনের লোকসংগীত আছে। আবার ব্রত গান, মেয়েলি গীত, মাগনের গান, জারি গান, গম্ভীরা গান ইত্যাদি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কবির লড়াই, আলকাপ গান, লেটো গান এবং যাত্রা গান হয় আরো দীর্ঘ, কারণ সারা রাত ধরে এগুলি পরিবেশিত হয়। লোকসংগীত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। লোকসঙ্গীতের বিপুল উৎস ত্রিপুরা রাজ্য। সংগীতের উৎপত্তি জুমকে কেন্দ্র করে। লোকগান নিত্যকালের গান। এই গানে আছে মানুষের প্রাণের ছোঁয়া, মাটির গন্ধ। এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ বেদনা, হাসি কান্না আর প্রেম ভালোবাসার কাহিনী লোকসংগীতের মূল বিষয়বস্তু।

গ্রাম্য জীবন প্রকৃতি আর সমর্পিত হৃদয়ের একটি আনন্দ ও অনির্দেশ্য বেদনা এই তিনটি উপাদান নিয়ে রচিত গানই হল লোকগান।

মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন কাশীপুরী লিখেছেন —

> "লোকসংগীত অপেক্ষা জনপ্রিয় সংগীত বাংলা সাহিত্যেই শুধু নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও নেই। কারণ লোক সংগীতে আছে গুণমনের অকপট অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির আবেদন অত্যন্ত গভীর ও অত্যান্ত হৃদয় হৃদয়গ্রাহী। লোকসংগীতে আছে সরল স্বাভাবিক জীবনের মনোরম আলেখ্য আদর সোহাগের অনুপম মাধুর্য।"[৫]

উপরিক্ত সংজ্ঞাগুলির উপর ভিত্তি করে লোকো সংস্কৃতি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যেতে পারে—

১. মৌখিকভাবে লোকসমাজে প্রচারিত।
২. সম্মিলিত বা একক কণ্ঠে গাওয়া যেতে পারে।
৩. প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষের মুখে মুখে এর বিকাশ ঘটে।
৪. সাধারণত নিরক্ষর মানুষের রচনায় এবং সুরে এর প্রকাশ ঘটে।
৫. আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারিত হয়।
৬. প্রকৃতির প্রাধান্য বেশি।
৭. দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রকাশ পায়।
৮. গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন যাপন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
৯. স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সারল্য, বাহুল্য বর্জন, সর্বোপরি আন্তর্জাতিকতা লোকসংগীত এর প্রাণ।
১০. লোকসংগীতে আমরা সুর নয় কথারই প্রাধান্য দেখে থাকি।

পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের লোকগান প্রচলিত রয়েছে। তেমনি উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ও বিভিন্ন ধরনের লোকগানের প্রচলন দেখা যায়। যেমন - ধামাইল গান, সূর্য ব্রতের গান, অন্নপ্রাশনের গান, ভাইফোঁটার গান, চড়ক পূজার গান, দূর্গা পুজা কেন্দ্রিক লোকগান, মনসামঙ্গলের গান, পৌষ সংক্রান্তির গান, বৈষ্ণব সেবার গান, মণিপুরীদের লোকগান, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকগান প্রভৃতি।

ত্রিপুরা একটি পাহাড়ি রাজ্য। যার আয়তন ১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কিমি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে স্থান নেয়। বাংলাদেশের সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক মানুষ ত্রিপুরার উত্তর জেলায় এসে বসতি স্থাপন করে। এইসব নাগরিকরা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার সময় কোন কিছুই নিয়ে আসেননি, শুধু বয়ে এনেছিলেন নিজেদের সংস্কৃতিকে। আর সেই সূত্র ধরেই লোকসংস্কৃতির ধামাইল গানের ধারাটি ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলায় ধীরে ধীরে বনস্পতি রূপ ধারণ করে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'ধামাইল' শব্দটির যথার্থ উৎস আজ পর্যন্ত কোনো গবেষক সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারেননি। তবে অনেকেই নানা ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে 'ধামালি', 'ধামান', 'ধামন', 'দামান', 'ধামলী' শব্দ থেকে ধামাইল গানের উৎপত্তি হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ (১৮৩৪-১৯১৬) এর হাত ধরেই ধামাইল গানের বিস্তৃতি ঘটে। এই জন্য রাধারমন দত্ত পুরকায়স্থকে 'ধামাইল' গানের জনক বলা হয়।

ধামাইল গান মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিয়ে উপলক্ষে আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও এই গানের পরিবেশনা দেখা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে 'ধামালী' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও রাধারমনের হাত ধরেই নৃত্যগীত হিসেবে ধামাইল গান শীর্ষক পরিবেশনার উদ্ভব হয়েছে। ধামাইল গান বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ভারতের ত্রিপুরা, করিমগঞ্জ, শিলচর ইত্যাদি এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। 'ধামাইল' গানের মধ্যে আবার বিভিন্ন পর্ব রয়েছে। যেমন - বন্দনা, আসর, বাঁশি, জলভরা, গৌররূপ, শ্যামরূপ, বিচ্ছেদ, কোকিল সংবাদ, কুঞ্জ সাজানো, স্বপন, চন্দ্রার কুঞ্জ, মান ভাঙানো, মিলন, সাক্ষাৎ, খেদ, বিদায় প্রভৃতি।

'ধামাইল' গানের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যেমন -

- এইগান সমবেত সঙ্গীত আকারে পরিবেশন করা হয়।
- শিল্পীরা চক্রাকারে নৃত্যের আঙ্গিকে ঘুরে ছন্দময় করতালির মাধ্যমে এই গান গেয়ে থাকেন।
- গান গানের সময় কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু জায়গায় ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়।
- ধামাইল গানের শিল্পীরা তাদের ছন্দময় করতালির মাধ্যমে সুর-তাল-লয় এর সমন্বয় করে থাকেন।
- এই গানের গায়নরীতি ও অন্য গানের চেয়ে আলাদা। গানের শেষে লম্বা টানের রেশ পরিলক্ষিত হয়।

পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় উত্তর জেলা ও ঊনকোটি জেলায় বহুল পরিমাণে ধামাইল গান ও নাচ প্রচলিত রয়েছে। কৈলাশহর, কুমারঘাট, কাঞ্চন বাড়ি, কাঞ্চনপুর, পেচারখল, ধর্মনগর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের জনজীবনের সাথে ধামাইল গান ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এইসব অঞ্চলের হিন্দু বাঙ্গালীদের সকল মানুষের যাবতীয় মঙ্গল কার্যের সময় ধামাইল গান গাওয়া হয়। ওই সব অঞ্চলে বাঙ্গালীদের বিয়ের আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিন বর ও কনের বাড়িতে ধামাইল গান ও নৃত্যের আসর জমে ওঠে। সন্ধ্যে থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত এই গানওনাচ চলতে থাকে। ধামাইল গান অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার আগে গৃহস্থ প্রথমে ধামাইল গান ও নৃত্য শিল্পীদের পান-সুপারি, ধূপ-দীপ, দুর্বা, ধ্বনি দিয়ে বরণ করেন। বরণ হওয়ার পর শিল্পীরা অনুষ্ঠান শুরু করেন। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ের গানের মধ্য দিয়ে তারা ধামাইল গান ও নাচ সমাপ্ত করেন। ত্রিপুরার উত্তর জেলায় বহুল প্রচলিত কিছু ধামাইল গান ও জনজীবনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে নিজে নাতীদীর্ঘ আলোচনা করা হল।

বন্দনা

"আরে অয় গো,
পূর্বেতে বন্দনা করি পূর্ব দিবাকর
যে ভানু উদয় হইলে সয়াল অয় প্রহর।
উত্তরে বন্দনা করি উত্তম তীর্থস্থান
তেত্রিশ কোটি দেব গণে যাতে করুইন ধ্যান।
পশ্চিমে বন্দনা করি ক্ষেত্র জগন্নাথ
প্রসাদ বলিয়ারে বাজারে বিকায় ভাত।
ভাত বিকায় ব্যঞ্জন বিকায় আর বিকায় পিঠা
জগন্নাথের লাবরা ব্যঞ্জন খাইতে লাগে মিঠা।
চন্ডালেতে রান্দে ভাত ব্রাহ্মণে সে খায়
তথাপি নরলোকের জাতি নাহি যায়।
দক্ষিণের বন্দনা করি কালিদয় সাগর
চান্দ সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা তাতে অইল তল।
তল অইল চৌদ্দডিঙ্গা বাদের কারণ
সেই হণে মনসার পূজা সঞ্চয়ে ভুবন।
একে একে বন্দনা করিলাম সমাধান
আইজ রাইতে গাইবো মোরা অধিবাসের গান।"[৬]

ব্যাখা - এই গানটি অধিবাসের রাতে ধামাইল গান বা নাচ শুরু করার সময় একেবারে প্রথমে বন্দনা করে গাওয়া হয়। মধ্যযুগের রচিত মঙ্গলকাব্যগুলোতে একেবারে প্রথমেই বিভিন্ন দেব দেবীর বন্দনা করা হয়েছে। তদনুরূপ ধামাইল গানের বন্দনা অংশেও বিভিন্ন দেব দেবীর বন্দনা আমরা দেখতে পাই। আমরা এই গানটিতে সূর্যের বন্দনা পাই। যে সূর্যের আলোয় প্রতিটি রাতের পর একটি নতুন দিন আসে। প্রকৃতি পূজার প্রবণতা ভারতীয়দের মধ্যে বৈদিক যুগ থেকে আজও বিদ্যমান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই গানটিতে হিমালয় পর্বতের বন্দনায় আমরা পাই। একে একে আমরা এই গানটিতে জগন্নাথ এবং শিব কন্যা মনসা এইসব দেব-দেবীদের বন্দনাও পাই। এই এই গানটি কবে রচিত হয়েছিল সে কথা আমরা জানি না, বা গানটি কার রচিত তাও আমাদের অজানা। যুগের পর যুগ ধরে এই সব গান লোকমুখে প্রচলিত এবং প্রবাহিত হয়ে আসছে। আমরা বাংলার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে বাংলা একসময় বর্ণভেদ, জাতিভেদ এইসব কুপ্রথা বলা যায় কুসংস্কার চরম রূপ নিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের ছায়া স্পর্শ করতেন না তাদের। তাদের ছোঁয়া কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। সমাজের অন্তজ শ্রেণীর মানুষরা যেমন - চন্ডাল, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি জাতির লোকদের গ্রামের বাইরে থাকতে হতো। কেননা সমাজের মাথা ব্রাহ্মণদের মতানুসারে এদের ছায়া স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণদের জাত যায়, তাদের নরকবাস হয়। কিন্তু এই গানটির একটি পংক্তিতে আমরা দেখতে পাই যে গানটির রচয়িতা জাতিভেদের এই কুপ্রথার কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন -

“চন্ডালেতে রান্দে ভাত ব্রাহ্মণে সে খায়।
তথাপি নরলোকের জাতি নাহি যায়।।”

এই গানটি আজও সমমর্যাদায় ধামাইল গানের সময় প্রথমেই গাওয়া হয়। উত্তর ত্রিপুরার প্রতিটি হিন্দু বাঙালিরা বিয়ের সময় এই গানটি গেয়ে থাকেন। বিয়ের মতো শুভ অনুষ্ঠানে দেবদেবী ও প্রকৃতির বন্দনামূলক এই গানটি আজও খুব প্রাসঙ্গিক।

আসর

“আমি ডাকি কাতরে,
আইসো গৌর নিত্যানন্দ এই আসরে।
তোমায় আসন দিয়া বসাইব হৃদয় মন্দিরে,
ভক্তগণ সঙ্গে করি, একবার আইস দয়াল হরি
তোমায় আসন দিয়া বসাইবো হৃদয় মন্দিরে।
তোমার যন্ত্র তুমিগো ধর, গৌর তোমার কীর্তন তুমি করো,
তুমি না বাজাইলে দেহযন্ত্র বাজবে কেমনে।
সুরেন্দ্রমোহন গো বলে, গৌড় আমার দয়া না করিলে
তোমার পতিতপাবন কে পাইবে জগত সংসারে।
তোমায় আসন দিয়া বসাইবো হৃদয় মন্দিরে।”[৭]

ব্যাখা - এই ধামাইল গানটি বন্দনার পর আসর সাজানোর সময় গাওয়া হয়। আসর পর্যায়ের এই গানে ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার সম্মিলিত অবতার শ্রী চৈতন্যদেবকে আহবান করা হয়। শ্রী চৈতন্যদেবকে ভক্তের হৃদয়ে আসন পেতে বসানোর কথা বলা হয়েছে। গৌরাঙ্গকে বলা হয়েছে তাঁর বাদ্যযন্ত্র যেন তিনি ধরেন এবং তিনিই যেন কীর্তন করেন। আমাদের মনের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। আমরা এই জগতে যা করি সবকিছুই ঈশ্বর আমাদের দিয়ে করান। আমাদের জীবনের অদৃশ্য সুতো ঈশ্বরের হাতেই। তিনি যদি আমাদের দেহ যন্ত্রণা বাজান তাহলে আমাদের দেহ অচল হয়ে যাবে। এই গানটিতে আমরা একটি নাম পাই, যেটি হল সুরেন্দ্রমোহন। এই নাম দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এই গানটি সুরেন্দ্রমোহন নামে জনৈক ব্যক্তির রচনা। তিনি গৌড়ের প্রতি তার অগাধ আস্থাকে এই গানটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন গৌড় দয়া না করলে এই জগৎ সংসার থেকে, এই মায়া থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। তাই তিনি সুললিত কণ্ঠে গৌরাঙ্গ কে ডাকছেন তিনি যেন এই আসরে আসেন এবং আসন পেতে বসেন। আমরা এখনও একটি ভাবনাকে মানি যে জীবতকালে এই জগতে আমরা ঠিক যেমন কর্ম করব, পরকালে আমরা সেই সব কর্মই আবার ফেরত পাব।ভগবানের নাম ছাড়া এই জগত পার হওয়া যায় না। আসর পর্যায়ের এই গানে আমরা ভগবানের প্রতি অগাধ আস্থা কে ফুটে উঠতে দেখতে পাই। এই গানটি আজও সিলেটি বাঙালি বিবাহের আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিনরাতে আসর পর্যায়ের গান

গাওয়া হয়। বলাবাহুল্য শ্রীহরি সম্পর্কিত এ জাতীয় গান শুধুমাত্র বিবাহের ধামাইল এই নয়, হরিকীর্তন, বৈষ্ণব সেবার আসরেও শোনা যায়। এই গানটি শুধুমাত্র উত্তর ত্রিপুরার মানুষের জনজীবনে নয়, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের, বলা যায় বাংলার সকল মানুষের মধ্যেই এই গানের গভীর প্রভাব আজও বিদ্যমান।

বাঁশি

"বাঁশিরে, শ্যাম চান্দের বাসি করিলায় উদাসী।
বাঁশিটি বাজাইয়া বন্দে থইলা কদম ডালে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে।
অষ্ট আঙুল বাঁশের বাঁশি তরল গাছের আগা।
তরে কে শিখাইলো বাঁশি আমার নামটি রাধা।
যেই ঝাড়ে থাক গো বাঁশি ঝাড়ের নাগাল পাইলে,
ঝাড়ে মূলে উগরিয়া সাগরে ফালাইতাম বাঁশি।
করিলায় উদাসী..."[৮]

ব্যাখা - উপরিউক্ত এই গানটি 'বাঁশি' পর্যায়ের গান। অধিবাসের সন্ধ্যায় আসর পর্যায়ের গানের পর বাঁশি পর্যায়ের এই গানগুলি দেওয়া হয়। এই গানটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধার মন উদাসীন হয়ে আছে। কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে সেটিকে কদম গাছের ডালে রাখল এবং বাতাসে বাশির সুর রাধা রাধা গুঞ্জন ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা জানি বাঁশ গাছের কচি আগা দিয়ে বাঁশের বাঁশি তৈরি হয় এবং তাতে আটটি আঙ্গুল দিয়ে বাজানোর সুবিধা যুক্ত থাকে। শ্রীরাধা বাঁশিকে করছেন যে রাধার নাম বাঁশিটিকে কে শেখালো? কৃষ্ণ রাধার জন্য জলের ঘাটে বসে প্রতীক্ষা করছে এবং বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে আহবান করছে। রাধা বলছেন যে, যেই ঝাড়েই বাঁশিটি থাকুক না কেন রাধা যদি সেই ঝাড়ের নাগাল পান তাহলে সেই ঝাড়কে তিনি সমূলে উৎপাটন করে সাগরে ভাসিয়ে দেবেন। উপরিউক্ত ধামাইল গানে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার মনের অবস্থার যে চিত্র আমরা পাই তা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তখনকার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে ও সমরূপ উদাহরণ দেখতে পাই। প্রাকচৈতন্য যুগের কবি বড়ু চন্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। এই কাব্যের অসংখ্য পদে আমরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধাকে উতলা হতে দেখতে পাই। তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল -

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশির শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।"[৯]

আমাদের আলোচ্য এই ধামাইল গানটিতে 'কৃষ্ণকীর্তন', 'বৈষ্ণব পদাবলী'র অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ এর প্রভাব পড়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। রাধা এবং কৃষ্ণ প্রাচীন যুগে যেমন বাঙালির মনে বিরাজমান ছিল আজও প্রতিটি বাঙালি তাদের হৃদয়ে রাধা-কৃষ্ণকে, তাদের প্রেমকে ধরে রেখেছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের প্রগাঢ়তা এই গানটির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। ত্রিপুরার উত্তর এবং ঊনকোটি জেলায় এই গানটি আজও বহুল প্রচলিত, প্রচারিত হয়ে আছে। আজো জনজীবনে এই সব গানগুলি প্রেমের সঞ্চার ঘটায়।

জলভরা

"আমরা ভরি গঙ্গার জল,
ঢেউ দিওনা ঢেউ দিওনা কলসি হবে তল।
পুষ্করিণীর চাইর ওপারে চম্পা নাগেশ্বর
পাতায় পাতায় লেখিয়া থইসে পিরিতের জ্বর।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কলসি ভরিয়া রাধে থইলা কদম তলে,
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে কলসি মাঝারে।
কদমফুল বাছিয়া রাধে নিরখিয়া চায়,
কালাচান্দের যুগল চরণ জলে দেখা যায়।
কলসি লইয়া রাধে বাড়িত চলিয়া আইলা,
কাঞ্জের কলসি ভূমে থইয়া জোয়োর ধ্বনি দিলা।"[১০]

ব্যাখা - এই গানটি 'জলভরা' পর্যায়ের গান। অধিবাসের দিন বর এবং কনেকে স্নান করানোর রীতি প্রচলিত আছে। সেই স্নানের জল ভরতে যাওয়ার সময় সকলে মিলে জলভরার এইসব গান গেয়ে থাকেন। এই গানটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীরাধা তাঁর সখীদের সাথে পুকুরে জল ভরতে গেছেন এবং তিনি কলসী ডুবার ভয়ে জলে ঢেউ দিতে মানা করছেন। পুকুরের চারিদিকে চাপা এবং নাগেশ্বর ফুল ফুটে রয়েছে এবং সেই গাছের পাতায় পাতায় কৃষ্ণ রাধার জন্য প্রেমের বার্তা লিখে রেখেছেন। কলসীতে জল ভরে রাধা সেই কলসী কদম গাছের নিচে রেখেছেন। গাছ থেকে কদম ফুল ঝরে পড়ে সেই কলসী ভরে গেছে। রাধা কলসী থেকে কদম ফুল বেছে ভালোভাবে চেয়ে দেখছেন কলসীতে আর ফুল রয়েছে কিনা। রাধা তখন সেই কলসীতে কালাচাঁদ তথা শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগলকে দেখতে পান। অর্থাৎ সবই কৃষ্ণের লীলা। তারপর রাধা কলসী কাঁখে নিয়ে বাড়িতে চলে আসেন এবং সেই কলসী মাটিতে নামিয়ে রেখে উলুধ্বনি দিলেন।

এই গানে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ প্রেমিকের তার প্রেমিকার প্রতি প্রেম নিবেদনের স্বরূপ জানতে পারি। প্রেম শ্বাশত। প্রাচীনকালে জনজীবনে প্রেমকে যে স্থানে রাখা হত, প্রেমকে যেরূপে মহিমামণ্ডিত করা হতো, বর্তমান যুগের একজন আদর্শ প্রেমিক ও প্রেমিকার কাছে প্রেম সেই সম্মানীয় স্থানেই অধিষ্ঠিত। এই গানে যেমন আমরা দেখি যে কৃষ্ণ চাপা এবং নাগেশ্বর ফুল গাছের পাতায় রাধার জন্য প্রেমবার্তা লিখে রেখে তার প্রেম নিবেদন করেছেন এ যুগে ও আমরা বিভিন্ন উপায়ে প্রেম নিবেদন করতে দেখতে পাই। গানটিতে শ্রীরাধাকে আমরা গৃহস্থবাড়ির কন্যা বা বধূ হিসেবে দেখতে পাই। জল নিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই রাধা পারিপার্শ্বিক সব বিষয় ছেড়ে সান্ধ্যকালীন দ্বীপদান ও উলুধ্বনি দিতে প্রবৃত্ত হলেন। এইখানে আমরা একজন আদর্শ বাঙালি বধূকেই পাই। আজও প্রতিটি বাঙালি মেয়ে বউরা সন্ধ্যায় তুলসী মঞ্চে বা ঠাকুরের সামনে দ্বীপ জালান এবং উলুধ্বনি দিয়ে থাকেন।

সবশেষে বলতে পারি যে এই গানটি বাঙালি জনজীবনে আজও সমাদৃত। রাধাকৃষ্ণ এবং তাদের সম্পর্কিত সকল গান ও কবিতাই বাঙালির হৃদয়ে যত্নশীল হয়ে আছে। বিয়ের আগের দিন এই গানটি গেয়ে আজও অধিবাসের স্নানের জল ভরা হয়।

নাম

"ছাড়রে সংসারের আশা, কৃষ্ণ নামে করো নিসা,
নামে করো নিসা রে মন, নামে করো নিসা।
না লইয়া কৃষ্ণ মন্ত্র, আগে করলায় বিয়া,
অতি সাধের সুন্দর নারী, ভবে যাইবায় থইয়া।
পূর্ণিমার চাঁদ থাকবে নারে আসবে অমাবস্যা,
চিরদিন তো থাকবে নারে রঙ্গের ভালোবাসা।
দিন দয়াল দাসে বলে, নদীর কূলে বসিয়া,
পার হইব পার হইব বলে, দিনতো যায় মোর গইয়া।"[১১]

ব্যাখা - এই গানটি ধামাইল গানের 'নাম' পর্যায়ের গান। অধিবাসের দিন আসর পর্যায়ের পর ক্রম অনুসারে পরপর নাম পর্যায়ের এই গানগুলি গাওয়া হয়। এই গানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা হয় এই সংসারের মায়া থেকে মুক্ত করার জন্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই গানে বলা হয়েছে যে সংসারের আসা, সংসারের মায়া পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ নামে মনোনিবেশ করতে হবে। ১৬ নাম ৩২ অক্ষর জপ করা ছাড়া এই ভবসাগরের মায়া পরিত্যাগ করা যায় না। গানটিতে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের মন্ত্র না নিয়ে আগে বিবাহ করা হয়েছে। যেই সুন্দরী নারী রূপে মোহিত হয়ে মন্ত্র না নিয়েই আগে বিবাহ করা হয়েছে সেই নারীকেই ভবে ফেলে যেতে হবে। বলা হয়েছে যে আকাশে সব সময় পূর্ণিমার চাঁদ থাকবেনা, পূর্ণিমার পর প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী অমাবস্যা আসবেই। গানের এই পংক্তিটির মাধ্যমে দুটি অর্থের প্রকাশ পাচ্ছে। অন্য অর্থটি হচ্ছে মানুষের রূপ, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ কোন কিছুই স্থায়ী নয় মহাকালের নিয়মে এই সবকিছুর মায়া ছেড়ে সবাইকে একদিন যেতে হবে। তাই কৃষ্ণ নামের দ্বারা এই সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ না করলে এই ভব সাগর পার করা যাবে না। চিরদিন যে রঙের ভালোবাসা থাকে না, এই কথাটিও গানে গানে বলা হয়েছে। নদীর তীরে বসে আছেন দীনদয়াল দাস। তিনি নদী পার হবার আশায় বসে আছেন এবং সেই প্রতীক্ষায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই পংক্তিটির মাধ্যমে দুটি অর্থ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অর্থে নদীর কূল বলতে এখানে জীবনের অন্তিম লগ্নকে বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু পার হতে তিনি পারছেন না এবং তা করতে করতে দিন চলে যাচ্ছে। এই গানটিতে আমরা একজনের নাম তাই তিনি হলেন দীনদয়াল দাস। এই নামটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে এই গানটি উনারই রচনা।

এই গানটিতে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হই। নাম ছাড়া যে মুক্তির আর কোন উপায় নেই আজকের জনজীবনকে এই বার্তাই গানটি দেয়। বিয়ের সময় আজও এই গানটি ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করে গাওয়া হয়। আজও নামকীর্তনের সমাবেশ দেখা যায়। জনজীবনে এই নাম জাতীয় গান গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই সংগীতের শাখাগুলোর মধ্যে লোকসংগীত হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, প্রাচীন ও সাধারণ একটি ধরন। বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের খুবই কদর রয়েছে। লোকসংগীত বলতে সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে উচ্চারিত প্রথানুগ সংগীতকে বোঝায়। এটি বহুকাল ধরেই আমাদের প্রজন্ম পরম্পরায় গাওয়া হয়ে আসছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষের মুখে এই গান এখনো বেঁচে আছে। এটি সাধারণত মৌলিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। বিভিন্ন উপলক্ষে আমাদের বাউলেরা মর্মস্পর্শী আবেগ দিয়ে লোকসংগীত গেয়ে থাকেন। প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেই এ সংগীত গাওয়া হয়। লোকসংগীতগুলো আধ্যাত্মিক গ্রামীণ ও অপার্থিব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গাওয়া হয়। এটি গ্রাম্যজীবনের এক বিস্ময়কর বর্ণনা।

দেশপ্রেমের আবেগ বিজড়িত লোকসংগীত গুলো অতীতের দুঃখ বিজড়িত কাহিনী বর্ণনা করে শ্রোতার চোখে অশ্রু নিয়ে আসে। অবশ্য লোকসঙ্গীতে আনন্দভরা বিষয়বস্তু ও যুগপতভাবে বর্তমান। এখনও গ্রামের অনেক লোক সূর্যাস্তের পরে তাদের নিজেদের তৈরি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বারান্দায় বসে স্থানীয় শ্রোতাদের কাছে লোকসংগীত পরিবেশন করেন। আমাদের লোকসংগীতগুলো তাদের ভিন্নধর্মী নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের উল্লেখযোগ্য অহংকার এ পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার প্রবাহের বাংলার মাটির শিল্প, তার একান্তই নিজস্ব সম্পদ এই সব গানগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এখনকার মানুষেরা আর এইসব লোকগানে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে এই সব অমূল্য সম্পদ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে। এই মূল্যবান সম্পদ রক্ষার জন্য সচেতনতা ও সযত্ন প্রয়াস একান্তভাবেই অপরিহার্য।

Reference:

১. দাশ, নির্মল, লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব পরিক্রম, অক্ষর পাবলিকেশনস্, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃ. ২৯
২. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তকবিপন, কলকাতা-৯, পৃ. ১১
৩. সরকার, পবিত্র, লোকভাষা লোকো সংস্কৃতি, তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, চিরায়ত প্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫
৪. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. ইসলাম, তুর, মাহারুল, লোকসংগীত এর বিচিত্র ধারা, পৃ. ১৯
৬. তথ্যদাতা – নিয়তি শীল, বয়স : ৬৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : কৈলাশহর, জেলা : ঊনকোটি, থানা : কৈলাশহর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪
৭. তদেব
৮. তদেব
৯. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৮০
১০. তথ্যদাতা – নিয়তি শীল, বয়স : ৬৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : কৈলাশহর, জেলা : ঊনকোটি, থানা : কৈলাশহর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪
১১. তদেব

Bibliography:

আশরাফ সিদ্দিকী : লোক-সাহিত্য (প্রথম খন্ড), সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্ডস, কলকাতা ৭০০০৬৭।
পঙ্কজ বিশ্বাস : লোকসংগীত স্বরূপ শোষণ ও প্রতিক্রিয়া।
মাহারুল ইসলাম তুর : লোকসংগীত এর বিচিত্র ধারা।
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।

OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 627 - 634
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে ত্রিপুরার প্রবাদ : একটি বিশ্লেষনী পাঠ

রাকেশ দেবনাথ
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, অমরপুর, ত্রিপুরা
Email ID : rakeshdebnathrbs1410@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tripura, Family Relationship, Social Relationship, Caste, Byword, Social Experience, Agriculture Life, Language.

Abstract
Folk culture is a reflection of the common people. It is deeply intertwined with the lives of rural Bengali communities. For generations, people have nurtured and preserved this folk culture. The customs, traditions, beliefs, and way of life of indigenous societies are all integral parts of folk culture. One of the most significant branches of folk culture is proverbs. Through proverbs, one can learn about a nation's civilization and social history, as they originate from the everyday experiences of common people and represent an important aspect of folk literature.

Tripura, a hilly state in the northeastern region of India, is home to a majority of Bengali-speaking people. Based on field studies, this article discusses various proverbs collected from different districts of Tripura. These proverbs provide insights into the daily lives of the common people of Tripura, their regional language, economic conditions, agricultural practices, sense of humor, and social issues.

Proverbs are an essential branch of folk literature, emerging from the everyday lives of common people. They are the product of human wisdom and long-term experiences. Proverbs are concise expressions enriched with the essence of human experiences. They capture the deep emotions of rural life while encapsulating the essence of people's prolonged struggles and lived experiences. As a part of folk literature, proverbs represent a highly enriched section of folk culture. They originate from the experiences of common people, shaped by their collective way of life. Although proverbs were initially created by earlier generations of people, they have now found a place in refined modern literature.

The creation of every proverb is rooted in long-term social experiences and specific incidents. Rural people may not possess scientific knowledge, but they have a deep understanding of nature's moods, storms, rain, tides, plants, rivers, mountains, animals, and their surroundings. They observe human nature, life transitions, social customs, daily struggles, and selfish tendencies with a keen and insightful perspective. These experiences take the form of proverbs. Proverbs hold a significant place even in the smallest family units.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Many proverbs have been created based on interpersonal relationships within households and domestic life.

Discussion

বাংলা লোকসাহিত্যের ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, গান, লোককথা প্রভৃতি সকল বিভাগেরই যথেষ্ট সমৃদ্ধি কিন্তু তারপরেও লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে বিশেষভাবে প্রবাদ চর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা গেছে। এর মূল কারণ বাঙালির প্রত্যহিত জীবনে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অপরাপর বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে নিহিত। প্রবাদের মধ্যে একটি নিত্যতা আছে। প্রবাদ যে বহু বৈচিত্র্যময় তার প্রমাণ রয়েছে। প্রবাদের বিষয় বিভাজনে। প্রবাদের মধ্যেই সমাজের গতি বিধির সবকিছু ধরা পড়ে। পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্ক, কৃষি জীবন, শুভ-অশুভ বোধ, খনার বচন, বিবাহ, চিকিৎসা, রাজনীতি, পৌরাণিক প্রসঙ্গ সবকিছুই প্রবাদে প্রকাশ পায়। এসব কিছুই ত্রিপুরার লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদে দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা প্রবাদ নারী কণ্ঠে সৃষ্টি, গ্রাম্য নারীরাই এর ধারক ও বাহক। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রবাদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

"গাতার যুগী বনের হিয়ার
তার নাই বেন বিয়াল।"[১]

ত্রিপুরার একটি সম্প্রদায় নাথ, দেবনাথ, নাথ ভৌমিক অর্থাৎ শিব গুত্র যারা। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রবাদটির সৃষ্টি। এই নাথদের যোগী বলা হয়। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই প্রবাদটি সৃষ্টি। 'নাথ সাহিত্যে' আমরা নাথ যোগীদের বিভিন্ন সাধনা সম্পর্কে জানতে পারি, তারা বিভিন্ন জায়গায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সেই সূত্র থেকেই হয়তো প্রবাদটির সূত্রপাত।

"আধপা চালের পিডালি।
কত করলি তুই বিডালি।"[২]

এই প্রবাদটিতে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষা স্পষ্ট। বাঙালির চিরাচরিত খাদ্যশস্য চাউল এর উল্লেখ রয়েছে বক্ষমান প্রবাদটিতে। এখানে 'বিডালি' শব্দের অর্থ হল দুষ্টামি। এক ব্যক্তির মধ্যে যখন অনেক ধরনের দুষ্ট বুদ্ধির প্রতিভা থাকে, তখন ওই দুষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"পরের তেলে ব্রাহ্মন সুন্দর।"[৩]

হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি জাতি ব্রাহ্মণ। তারা মূলত নিজেদের এলাকায় পূজা-পার্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। আসলে এই প্রবাদটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শোষক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়। শাসক-শোষক সাধারণ মানুষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি, তাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রবাদটি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ শোষিত মানুষের মুখে শোনা যায়।

"পঞ্চাশ টেহার গরু কিন্না পাঁচশ টেহা ঠেলোনি।"[৪]

ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক এই প্রবাদে বলা হয়েছে পঞ্চাশ টাকার দিয়ে গরু কেনার পর সেটিকে যখন বাড়িতে আনতে পাঁচশ টাকা খরচ হয়, তখন লাভের কিছু থাকে না। অর্থাৎ লাভের অপেক্ষা লস যখন বেশি হয় তখন ব্যবসায়িকরা এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করে।

"কাউয়া চিনে ঘাউয়া কাণ্ডল"[৫]

মন্দলোক সর্বদা মন্দকাজে ব্যস্ত থাকে। সে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না। যেমন কাক সর্বদা আর্বজনা থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে সেক্ষেত্রে ভালো কিছু পেলেও অর্থাৎ ভালো কাঠাল পেলেও সে খেতে চায় না বা খেতে পারে না।

"বেল ফাকলে কাউয়ার কি"[৬]

'বেল' বাংলার একটি নিজস্ব ফল। এই ফলের বাহিরের আবরণ অনেকটা শক্ত হয়। তাই কাক কিংবা অন্য কোন পাখি এই ফল সহজে খেতে পারে না। সাধ্যের বাইরে এমন কোন জিনিস বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"মুলে দিয়া ঘর নাই পূবে দিয়া দরজা।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বাহাদুরি বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"পিডা কও মিডা কও ভাতের মতো নাই,
মাসি কও পিসি কও মার মত নাই।"[৮]

সমাজে পরিবারে নারীর অবস্থান বিবিধ। নারী কখনো মা, কখনো শাশুড়ি, কখনো স্ত্রী, কন্যা, ননদ, বোন, কখনও আবার মাসি, পিসি। মা বাঙালি ঘরের প্রধান নারী চরিত্র। আর একমাত্র মা-ই আছেন যে আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। তাই পিঠেপুলি বা চিড়ে মুড়ির সঙ্গে যেমন ভাতের তুলনা হয় না, তেমনি পিসি মাসির সঙ্গেও মায়ের তুলনা হয় না। এভাবেই দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের সাথে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে পরিবারে মায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা আমাদের লোকসংস্কৃতির অনন্য একটি বৈশিষ্ট্যের উদাহর।

"অতি সাধু চোরের লক্ষণ।"[৯]

ভন্ড প্রকৃতির লোকদের বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।"[১০]

সম্বলহীনা বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। শুধু যে মামা নেই এই বিষয়টি বুঝাতেই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় এমনটা নয়। অন্যান্য অর্থেও এই প্রবাদটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। নাই মামা অর্থাৎ যার মামা নেই তার কাছে কানা মামা অর্থাৎ দৃষ্টিহীন মামাই ভাল।

"কত রঙ্গ করলি কালি।
ছিড়া কাঁথায় দিলি মকমলের তালি।"[১১]

যোগ্যতার বাইরে গিয়ে কিছু চাহিদা কিংবা অধিকার করে বসে থাকলে, এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"আঙ্গুল ফুইল্লা কলাগাছ"[১২]

হঠাৎ পরিবর্তন অর্থে রূপক এর আশ্রয়ে গ্রামবাংলায় এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন অর্থনৈতিকভাবে হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠে তখন ব্যবহৃত হয় এই ধরনের প্রবাদ। অনেক প্রবাদ লোকসমাজ থেকে সাহিত্যে স্থান করে নেয়। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ত্রিপুরার কথাকার অরুণোদয় সাহার 'পদ্মপাতায় জল' উপন্যাসে দিবাকর যখন শরণার্থী শিবিরে ঘর তৈরি করার কাজ শুরু করে অল্প দিনের মধ্যে সরকারের টাকা নয় ছয় করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় তখন কোথাকার এই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রচলিত বাংলা লোকগানও আছে।

"পরের বাড়ির বিয়া
নাইচ্চা মরি গিয়া।"[১৩]

অপ্রয়োজনীয় কাজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয় এই প্রবাদ। অর্থাৎ আমরা যখন অপ্রয়োজনীয় কাজে মন দেই সেই সময় এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"আডের আড নাতিনের বিয়া
দেইক্কা আলাম গিয়া।"[১৪]

আমরা যখন একটি কাজ করতে গিয়ে অনেকগুলো কাজ একসাথে করে আসি তখন এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়। বাংলা লোকসাহিত্যে এমন আরেকটি প্রবাদ আছে-"সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না।"

"গারমোডা অইয়াগেসে।"[১৫]

কেউ যখন কোন একটি কাজে দক্ষ নয়, কিন্তু দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে ওই কাজ করতে যায় তখন বয়োজ্যেষ্ঠরা এই ধরনের প্রবাদ উচ্চারন করে।

"সূচ কয় চালনীরে, তোর নিচে কেন ছেঁদা।"[১৬]

পরনিন্দা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। মানুষ যখন নিজের অবস্থা ভুলে অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করে তখন এই ধরনের প্রবাদ গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সূচের বৈশিষ্ট্য হল তার উপরের অংশ সূচালো এবং নিচের অংশে সুতো আটকানোর জন্য একটি ছিদ্র থাকে। আর চালনীর বৈশিষ্ট্য হল গোলাকার তার সারা দেহে সহস্র ছিদ্র। এখানে

সূচেরও ছিদ্র আছে আবার চালনিরও ছিদ্র আছে। এখানে সূচ নিজের গঠন বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে চালনিকে বলছে উপরোক্ত কথাটি। গভীর ভাবে দেখলেই সূচ ও চালনী দুটোই জড়বস্তু। জড়বস্তু কথা বলতে পারে না। তাই এই প্রবাদ বাক্যটি সমাজেরি মানুষের পরনিন্দা বুঝায়।

"কুত্তার লেজ বারো বছর চুঙ্গাত থাকইলেও যে বেয়াঁ হে বেয়াঁ"[১৭]

মন্দ লোক সর্বদা মন্দই হয়। তারা কোনোদিনও নিজের মন্দ স্বভাব বর্জন করতে পারে না এই ধরনের ব্যক্তিদের এই ধরনের ব্যক্তিদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এরকম প্রবাদ উচ্চারিত হয়।

"আমনা হরি সেলাম পায়না।
মামি হরি পিরা বায়"[১৮]

যখন যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য জিনিস পায় না। কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তি সেই জিনিস পাওয়ার জন্য আক্ষেপ করে তখন এই ধরনের প্রভাত উচ্চারিত হয়।

"ঘরের ভিঙা নাই, জামাই কত্তুই অইয়ে"[১৯]

দারিদ্রতা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"ধান খাইস মুরগি যাইবা কই।"[২০]

আমরা যখন কোনো কিছু না জেনে বুঝেই কোন চুক্তিপত্রে নিজের সম্মতি জানাই কিংবা কথা দিয়ে ফেলি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন জানতে পারি এই কাজটি আমার জন্য সুবিধের নয়, তখন আমাদের সম্পর্কে এই প্রবাদটি বলা হয়। মুরগি যেমন একবার ধান খেলে বারবার ঘুরে আসে খাবার জন্য, আমাদেরও একই অবস্থা হয়। এ বিষয়ে আরেকটি প্রবাদ হল –

"ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না"

"কলির কৃষ্ণ"[২১]

অতিরিক্ত চালাক ব্যক্তিদের বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"নবী হেইদ হাঙ্গা ববি এতকা কুশি মুচি।"[২২]

এর অর্থ হল - 'নবী' অর্থাৎ নববধূ বাবার বাড়িতে যতই 'কুশি মুচি' অর্থাৎ কান্নাকাটি করুক না কেন, তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যখন আমরা জানতে পারি নিজের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন একটি কাজ আমাদের করতেই হবে, তখন অসম্মতি জানালেও আদতে কোনো লাভ নেই।

"ভাত দেইখ্যা দিও ঘি
জামাই দেইখ্যা দিও ঝি।"[২৩]

বক্ষমান আলোচ্য প্রবাদটিতে বলা হয়েছে ভাত দেখে অর্থাৎ ভাতের পরিমাণ মতো ঘি দেওয়ার জন্য এবং উপযুক্ত ছেলে দেখেই মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য।

"থাকতে চিনে না হাই
মরলে কয় রামচন্দ্রন গোসাই"[২৪]

কোন জিনিস যখন আমাদের নিজের থাকে তখন আমরা গুরুত্ব দেই না। কিন্তু যখন হারিয়ে ফেলি তখন অধিক গুরুত্ব দিই। এই অর্থেই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

"অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে
ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট স্ত্রী নষ্ট মারনে।"[২৫]

অভাবে স্বভাব নষ্ট অর্থাৎ মানুষ অভাবে পড়লেই তার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে যা কিছু করে বসে। অর্থনৈতিক অভাবে মানুষ চুরির পথও বেছে নেয়। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ১৩৫০ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' কবিতার কথা। সেখানে আমরা দেখতে পাই একটু ফ্যান এর জন্য মানুষ হাহাকার করছে। 'নবান্ন' নাটকের একটু খাবারের জন্য মানুষ ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই যে মানুষের খাবারের অভাবে তার স্বভাব নষ্ট অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবনযাপন ভুলে গিয়ে ডাস্টবিনে খাবার সংগ্রহ করছে। তাই উপরোক্ত প্রবাদের প্রথম চরণে বলা হয়েছে এই এ কথা। ‘মুখ নষ্ট বরণে’-আমাদের শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ মুখমণ্ডল। এই মুখমণ্ডলে দেখা দেয় বরণ। যা পরবর্তী সময়ে ভালো হয়ে গেলেও তার কিছু ছাপ বা দাগ রেখে যায়। তার জন্য মানুষের মুখের সৌন্দর্য কমে যায়। তাই বলা হয়েছে ‘মুখ নষ্ট বরণে’। ঝড় বৃষ্টির সময় খেতে পাকা ধান থাকলে তা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা বন্যা হলে সকল ধরনের শস্যজাতীয় ফসল এবং অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট। অতিরিক্ত শাসন করলেই যেমন ছেলে মেয়েরা হাতের বাইরে চলে যায় তেমনি ঘরের স্ত্রী কেউ অতিরিক্ত শাসন তথা মারতে নেই। স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত শাসন দেখিয়ে স্ত্রীকে মারলে স্ত্রী নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ সে স্বামীর কথা গুরুত্ব নাও দিতে পারে, তাই বলা হয়েছে স্ত্রী নষ্ট মারনে।

“গামছা বাধা দই।
মাগনা পাইলে লই।”[২৬]

কোন জিনিস যখন বিনামূল্যে পাওয়া যায় তখন এর সুবিধা ধনী-দরিদ্র সবাই নিতে চায়, তখন ওই সুবিধাবাদী মানুষদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

“গরিব মরে ভাতে, মুস্তান মুরে শীতে।”[২৭]

বাহাদুরি দেখানো ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

“তেলা মাথায় তেল দেওয়া।”[২৮]

নিজের দুর্বলতা বা দারিদ্রতা প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি বলা হয়। এই প্রবাদটির গুড়ার্থ দাঁড়ায় এমন, যার যা কিছু আছে তাকে আরও দেওয়া হয়। কিন্তু যার নেই যে জিনিসগুলো তার দরকার সেই জিনিসগুলো সে পায় না। তখন সেই বঞ্চিত ব্যক্তি অভিমানে এই সমস্ত প্রবাদগুলি উচ্চারণ করে। আসলে এখানে তেল দেওয়া প্রতীক মাত্র বা রুপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন প্রবাদ স্রষ্টা।

“হডকেরে হডকে খাইছে।
পাকনা চুলে কিলিপ মারছে।”[২৯]

পরিস্থিতির বাইরে গিয়ে যখন কেউ কিছু করতে চায় বা করে বসে তখন এ ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

“বাড়ির শোভা বাগ্ বাগিচ ঘরের শোভা ওসারা
দাঁতের শোভা মাজন মেশি চোখের শোভা ইশারা।”[৩০]

সৌন্দর্যতা বুঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। এই প্রবাদটি আমাদের গ্রামেও প্রচলিত আছে। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে বাড়ির শোভা অর্থাৎ সুন্দর্য ফুলের বাগান বা গাছপালা আর ঘরের শোভা ওসারা। এই ওসারা কথার অর্থ ঘরের পীরা বা ধাইর। কোন ঘরের পীরা বা ধারই না থাকলে সেই ঘর সুন্দর দেখায় না। প্রবাদটিতে আরো বলা হয়েছে মানুষের দাঁতের সৌন্দর্য মাজন আর চোখের সৌন্দর্য ইশারা।

“অন্যের গরু দেখে দড়ি বাগানি”[৩১]

সমাজের লোভী প্রকৃতির মানুষদের বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ উচ্চারিত হয়। বাংলা লোকসাহিত্যে এমন আরেকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে –

“গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।”

“পরের ছেলের নাম পরমানন্দ
যত গোল্লায় যায় ততই আনন্দ।”[৩২]

প্রতিবেশীদের প্রতি হিংসা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

“আমনা বুজ পাগলেও বুঝে
ভাত খাইয়া চিড়া খুঁজে।”[৩৩]

প্রবাদটিতে বলা হয়েছে নিজের বুঝজ্ঞান পাগলেরও আছে। আসলে প্রবাদটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। স্বার্থান্বেষী মানুষদের উদ্দেশ্য করে এই ধরনের প্রবাদ উচ্চারিত হয়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"চোখ লই ডং নয়।"[৩৪]

মানব জীবনে চোখ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই চোখ নিয়ে চোখ নিয়ে কোন শয়তানি নয় বা চোখের কোন সমস্যা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করা দরকার।

"চুল নাই বেটি চুলের লাইগা কান্দে।
কচুপাতা দিয়া বিডি ডাল্লা খুফা বান্দে।"[৩৫]

দারিদ্রতা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। এরকম আরেকটি প্রবাদ হল -

"এমনি মিলে না আবার ত্যানা প্যাচাইয়া।"[৩৬]

Reference:

১. তথ্যদাতা – নাম : নিয়তি দে, বয়স : ৫৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী , থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

২. তথ্যদাতা – নাম: শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫

৩. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

৪. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

৫. তথ্যদাতা – নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

৬. তথ্যদাতা – নাম : ঝুলন দেবনাথ, বয়স : ৪৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

৭. তথ্যদাতা – নাম : মল্লিকা দেবনাথ, বয়স : ৪২, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সূর্য মনি নগর, জেলা : পশ্চিম ত্রিপুরা, থানা : আমতলী, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০৩/২০২৪

৮. তথ্যদাতা – নাম : নিয়তি দে, বয়স : ৫৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

৯. তথ্যদাতা – নাম : সুজিত দে, বয়স : ৬২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

১০. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫

১১. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর. কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

১২. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

১৩. তথ্যদাতা – নাম : সুনিল দেবনাথ, বয়স : ৫১, লিঙ্গ : পুরুষ , পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

১৪. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪

১৫. তথ্যদাতা – নাম : নিয়তি দে, বয়স : ৫৫, লিঙ্গ: মহিলা, পেশা: গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

১৬. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০২/২০২৪

১৭. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

১৮. তথ্যদাতা – নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

১৯. তথ্যদাতা – নাম : মল্লিকা দেবনাথ, বয়স : ৪২, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সূর্য মনি নগর, জেলা : পশ্চিম ত্রিপুরা, থানা : আমতলী, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০৩/২০২৪

২০. তথ্যদাতা – নাম : শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫

২১. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

২২. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫

২৩. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

২৪. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪

২৫. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

২৬. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

২৭. তথ্যদাতা – নাম : শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫

২৮. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

২৯. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫

৩০. তথ্যদাতা – নাম : শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫

৩১. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫

৩২. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

৩৩. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০২/২০২৪

---

৩৪. তথ্যদাতা – নাম : ঝুলন দেবনাথ, বয়স : ৪৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

৩৫. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

৩৬. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

Bibliography:

বরুণ কুমার চক্রবর্তী : বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯

সুনীল কুমার দে : (সম্পাদিত) বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলিত কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ০৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য,ষষ্ঠ খন্ড প্রভাত,প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ দে'জ পাবলিশিং কলকাতা – ০৯

ওয়াকিল আহমেদ : বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা প্রথম প্রকাশ, বইপত্র, বাংলাবাজার ঢাকা – ১১০০

আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খন্ড, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা – ৭০০০৬৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 635 - 648
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষার অনুষঙ্গে নারীর ভাষা

বিবেকানন্দ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : bibekd332@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
language, society, rules of society, sociolinguistics, gender-based language, women's dialect, jhargram district, Uttor Poschima Jharganyi.

Abstract
Gender-based language diversity is of particular importance in the discussion of sociolinguistics. The diversity of masculine and feminine language is seen with particular importance in sociolinguistics. Sukumar Sen had previously discussed women's language in Bengali. Here, the language of women in context of Uttor Poschima Jharganyi language has been discussed, in the context of sociolinguistics. The discussion is mainly based on field research. Since the rules of society are different for men and women, there is diversity in the use of language due to the diversity of social rules. Some language usage patterns, words, are used only by women or are used for them. Along with the change in the rules of society, this change in language is the main topic of discussion in sociolinguistics.

Discussion

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২২তম জেলা হিসেবে পরিচিতি পায় ঝাড়গ্রাম জেলা। ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যেমন লক্ষণীয় তেমনি সামাজিক বৈচিত্র্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঝাড়গ্রাম জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী বিনপুর ১নং ও ২নং ব্লক, ঝাড়গ্রাম ব্লক এবং জামবনী ব্লকের উত্তর, উত্তর পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের ভাষাকে ছন্দা ঘোষাল তাঁর গবেষণাপত্র 'ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাংলা উপভাষার রূপরেখা'-তে যা পরবর্তীতে 'ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, তাতে উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী[১] নামে অভিহিত করেছেন। সুকুমার সেন এই অঞ্চলের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডী[২] বলেছেন। সুধীর কুমার করণ এই অঞ্চলের ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী ভাষা না বলে সীমান্তরাঢ়ী নামকরন করেছিলেন। আবার ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, সুকুমার সেন কর্তৃক প্রদত্ত ঝাড়খণ্ডী উপভাষা নামটি গ্রহণ করার পক্ষপাতি। তিনি 'সীমান্ত রাঢ়ী' নামটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাঢ়ী উপভাষার সাথে নামটির আনুগত্য ও 'সীমান্ত' বিশেষণের যথাযথভাবে নির্দিষ্ট দিককে নির্দেশ না করাকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। এছাড়া –

> "সর্বোপরি ঝাড়খণ্ডী বিষেশনটি এই উপভাষা রূপগত ও বর্ণগত স্বাতন্ত্রের সংকেত বইছে। অন্য আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ঝাড়খণ্ডী শব্দের মধ্যে নিহিত আছে একটি আরণ্যক জীবন ব্যঞ্জনা।"[৩]

উত্তরা ঝাড়খণ্ডী ও দক্ষিণী ঝাড়খণ্ডী এবং আরেকটি রূপ পূর্বী ঝাড়খণ্ডীর কথা বলেছেন। আবার উত্তরা ঝাড়খণ্ডী ও দক্ষিণী ঝাড়খণ্ডীকে তিনি স্থান কথা অঞ্চল ভূমির নাম অনুসারে যথাক্রমে 'মানভূঁইয়া ঝাড়খণ্ডী' ও 'ধলভূঁয়া ঝাড়খণ্ডী'[৪] নাম দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঝারগ্রাম জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উক্ত ব্লকগুলির ভাষা ধীরেন্দ্রনাথ সাহা কথিত 'ধলভূঁয়া ঝাড়খণ্ডী'র মধ্যে পরে। ঝাড়গ্রাম জেলার প্রেক্ষিতে আলোচনার সুবিধার্থে ছন্দা ঘোষাল এর দেওয়া উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী নামটি গ্রহন করেছি।

মানুষই একমাত্র জীব যার ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে। মানুষ তার এই ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাটি পৃথিবীতে আবির্ভাবের পরে ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করেছে। রামেশ্বর শ' বলেছেন –

> "এই অনন্য সুলভ সম্পদটি শুধু তারই আছে, কারণ শুধু তারই প্রয়োজন আছে এই সম্পদের। তার কারণটি অবশ্য আমরা যদি তলিয়ে দেখি তবে ধরতে পারব এর মূলে আছে আবার অন্য একটি আরো গভীরতর মানব বৈশিষ্ট্য যেটি অন্য প্রাণীর নেই। সেটি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের ক্রিয়াজাত তার চিন্তারাজি।"[৫]

তাই প্রথমদিকে জৈবিক প্রবৃত্তির প্রকাশের জন্য আকার ইঙ্গিত থেকে কণ্ঠ উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মানুষ তার শরীরবৃত্তীয় বিষয়কে প্রকাশ করতে সমর্থ হলে ভাষা উৎপত্তির বীজ রোপিত হয়। ভাষার উৎপত্তি শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার প্রকাশের জন্য হয়নি তাহলে অন্যান্য জীবরাও ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হত। বিবর্তনের ধারাটি দেখলে দেখব প্রথমে জড় তারপর প্রাণ ও প্রাণের পর মনের বিকাশ। এই মনের অধিকারী হল মানুষ, চিন্তা করবার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা তাই বলেছেন শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার কারণে ভাষা সৃষ্টি হয়নি। ভাষার সঙ্গে মানুষের চিন্তা, অনুভব, অভিপ্রায়, সংকল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্বিত। মানুষ তার মনের চিন্তার প্রকাশের জন্যই ভাষার ব্যবহার করে। এককথায় মানুষের চিন্তার ধ্বনিদ্বারা প্রকাশিত রূপকে ভাষা বলা যায়। মানুষ তার চিন্তারাজিকে একা একা প্রকাশ করতে পারে না, তাকে এই চিন্তাকে প্রকাশ করতে অপর একজনের প্রয়োজন হয়। একমনের চিন্তাকে অপর মনে পৌঁছে দিতে বাহন হিসেবে কাজ করে ভাষা। আর আমরা যখন একের বেশি দুইয়ে আসি তখনেই সমাজ সৃষ্টি হয়। ভাষা সৃষ্টির মূলে তাই ব্যক্তি মানুষের মনন ও চিন্তার সাথে সমাজবদ্ধ মানুষের ভাববিনিময়ের ইচ্ছাটিও রয়েছে।

> "The first point we must make about language, then, is that is a social, rather than a biological, aspect of human life."[৬]

ভাষিক প্রক্রিয়া সচল রাখবার জন্য দরকার হয় সমাজের। সমাজে বসবাসকারী মানুষ নিজেদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার আদান প্রদানের জন্য ভাষা-র ব্যবহার করে থাকে। আসলে মানুষ তার নিজের ভাব ও চিন্তাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বলে তার উন্নততর প্রকাশ মাধ্যম ভাষার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ভাষা সৃষ্টি বা তার প্রয়োগ দুটির জন্যই দরকার একাধিক মানুষের উপস্থিতি। একারণেই মানব সমাজ ও ভাষাকে পৃথক করে দেখা যায় না।

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী Edgar H. Sturterant ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন —

> "A Language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and Interact."[৭]

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষ করে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে সেগুলি হল—

১. ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের সমষ্টি (vocal symbols)।

২. সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা হিসেবে গণ্য হবে যা বিশেষ কোনো বস্তু বা ভাবের প্রতীক (Symbol)।

৩. ধ্বনির নির্বাচন সুনির্বাচিত নয় (arbitary)।

৪. ধ্বনিগুলি নির্বাচন খেয়ালখুশিতে হলেও নির্বাচনের পর শব্দমধ্যে ও বাক্যমধ্যে বিন্যাসটি বিধিবদ্ধ হয় (System)।

৫. ভাষার সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ-বিশেষ ভাষা বিশেষ-বিশেষ সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

তাহলে দেখা যায় যে, ভাষা ব্যক্তি মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হলেও সামাজিক প্রয়োজনই তার সৃষ্টির মূল কারণ। আবার সমাজ এর একটি নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে, পরিবেশ থাকে, মূল্যবোধ থাকে, নিয়মাবলি থাকে। সমাজকে এইসব মানতে হয় বা এই সব কিছু নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। তাই নির্দিষ্ট সমাজে প্রযুক্ত ভাষাকেও কিছু কিছু সামাজিক

নিয়মাবলি মানতে হয় এবং এই নিয়মের পরিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন হলে, ভাষারও অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় –

> "কোনো ভাষার অধিকাংশ শব্দ প্রতীকের আড়ালে থাকে সমাজের নিয়মকানুন, প্রথা-পদ্ধতি, মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা। বাগদান মানে কাউকে কথা দেওয়া নয়, এ শব্দের আড়ালে কাছে বাঙালি সমাজের বিয়ের রীতি-নীতি। এ শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি, বিয়ে উপলক্ষে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে বিয়ে সম্পর্কিত চুক্তির প্রসঙ্গটি।"[৮]

ভাষার সাথে সমাজের সম্পর্কে সমাজভাষার দিকটি এসে পড়ে, সমাজভাষার ক্ষেত্রে ভাষার বক্তা, ভাষার শ্রোতা ও বিষয় বা উপলক্ষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাইম্স তাঁর প্রবন্ধ 'The Ethnography of Speaking'-এ জানিয়েছিলেন ভাষাটির কী চরিত্র দাঁড়াচ্ছে তা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি পক্ষের উপর — বক্তা (sender), শ্রোতা (reciver) এবং উপলক্ষ (setting)।[৯] তাই আমাদের জানতে হবে বক্তার সামাজিক পরিচয়, সেই সামাজিক পরিচয়ের অন্যতম একটি হল লিঙ্গগত পরিচয়।

Peter Trudgill তাঁর 'Socio Liguistics : an introduction to language and socity' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "The division of the human race into male and female is so fundamental and obvious that we take it for granted. The fact that the difference is so basic means that it is hardly surprising that it is also reflected and indicated in all human languages."[১০]

সমাজভাষার আলোচনায় নারী-পুরুষের ভাষা বৈচিত্র্য দেখা যায়। শারীরিক ভিন্নতার জন্য নারী-পুরুষকেন্দ্রিক ভাষার যে বৈচিত্র্য ঘটে তা বিশ্বজনীন –

> "It is a semantic universal which is lexicalized in all the languages of the world in terms of pairs of such as man-woman, boy-girl, son-daughter and son."[১১]

যখন থেকে ব্যাকরণের জন্ম তখন থেকেই বৈয়াকরণগণ নারী-পুরুষের ভাষা পার্থক্য নিয়ে কম-বেশি সচেতন ছিলেন। এই জন্যই ব্যাকরণে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, Masculine gender, feminine gender ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক শব্দগুলি পাওয়া যায়।

হিন্দি ও উর্দু ভাষার প্রায় বেশিরভাগ শব্দই পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রী লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন—

ভাত, কাগজ, আদমী — পুংলিঙ্গ

কিতাব, লাজ, নীদ — স্ত্রী লিঙ্গ

এছাড়া এতে সম্বন্ধ পদ, বিশেষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও লিঙ্গভেদ দেখা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সম্বন্ধ পদ — মেরা চাচা	মেরী চাচী
বিশেষণ — আচ্ছা আদমী	আচ্ছী অওরত

বাংলার ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় না, উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ীতে এরকম লক্ষ করা যায় না। কিন্তু পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের আলাদা আলাদা রুপ আছে, যেগুলি নির্দিষ্ট লিঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়ে থাকে। হিন্দির মত সমস্ত শব্দকেই দুটি গোত্রে ফেলা হয় না। পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের আলাদা আলাদা রুপের প্রয়োগগুলি নিচে আলোচনা করা হল -

এখানে পুংলিঙ্গবাচক শব্দের সাথে স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রত্যয় যোগ করে নারীসূচক শব্দ গঠিত হয় —

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী প্রত্যয়	স্ত্রী লিঙ্গ
কাকা	ই	কাকি
জ্যাঠা	ই	জেঠি
কুনা (বালক)	ই	কুনি
ছঁড়া (বালক)	ই	ছুঁড়ি
বেটা	ই	বিটি
পিসা	ই	পিসি
দাদা	ই	দিদি
মামা	ই	মামি
থুবড়া	ই	থুবড়ি
বুড়া (বৃদ্ধ/বাচ্চা ছেলেকে ভালোবেসে বলে)	ই	বুড়ি (বৃদ্ধা/বাচ্চা মেয়ে)
মাউসা (মেসো)	ই	মাউসি (মাসি)
খকা	ই	খুঁকি
মেথর	আনি	মেথরানি
নাপিত	আনি	নাপিতানি
চাকর	আনি	চাকরানি
সমদি (বেয়াই)	আন	সমদান (বেয়ান)
ডম্‌ (ডোম)	নি	ডমনি
লাতি	নি	লাতনি
বামুন	নি	বামনি
বিহাই (বেহাই)	ইন্‌	বিহাইন
নাগ	ইন্‌	নাগিন

এছাড়া আলাদা আলাদা শব্দ রয়েছে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের জন্য -

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
বর	বউ/কইন্যা,
বাপ/বাবা/বাবু	মা/মাই
পুতরা (ভাইপো)	ঝিয়ারি (ভাইঝি)
জামাই/জাম	ঝি
মরদ	মাগি
হালিয়া/বলদ/বলদা/হাইলা	গাই
খাসি/বদা	পাঁঠি/ধাইড়
স্বামী	ইস্তিরি (স্ত্রী)

স্ত্রীবাচক ও পুংবাচক শব্দ যোগে পুংলিঙ্গবাচক ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠিত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
বেটাছানা/ছা	বিটিছানা/ছা

	মেঁয়াছানা/ ছা
সাঁড়া মুরগি	ঢাঁড় মুরগি
মরদ লোক	মেঁয়া লোক

উপরের আলোচনায় আমরা নারী ও পুরুষবাচক শব্দগুলির বৈচিত্র গুলি দেখলাম। পুরুষ ও নারীবাচক শব্দের বৈচিত্র্যগুলি দেখার পর এবার লিঙ্গ ভেদে ভাষার ব্যবহারের বৈচিত্র্যগুলি দেখার প্রয়াসের মাধ্যমে বক্তা নারীর ভাষা প্রয়োগের নানাদিক আলোচনা করার প্রয়াস করা হল -

সামাজিক বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু : সামাজিক বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু নারীর ভাষা ব্যবহারে বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। এই ট্যাবু বা সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বরাবরই বেঁধে রাখতে চেয়েছে। সামাজের এই নিয়ম যেমন নারীর সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে ঠিক তেমনি সামাজ সংগঠনের এই নিয়ম তার ভাষা সংগঠনেও প্রভাব ফেলেছে। Trudgill বলেছেন—

> "Taboo may perhaps therefore have a powerful influence on the growth of separate sex vocabularies generally. If taboos become associated with particular objects or activities such that, say, women are not permitted to use the original name, then new words or paraphrases are likely to be used instead, and sex differentiation of vocabulary items will result."[১২]

এ প্রসঙ্গে ট্র্যাডগিল 'Zulu'-মহিলাদের উদাহরণ দিয়েছেন, সেখানকার মহিলাদের তাদের শ্বশুর ও শ্বশুরের ভাইদের নাম সম্বোধন করা নিষেধ, যদি এই ট্যাবু কেউ ভাঙে, নাম সম্বোধন করে ডাকে; তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হতে পারে। বাঙালি সমাজে নিয়মের এতটা গোঁড়ারূপ না থাকলেও, বাঙালি সমাজেও মহিলারা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী ভাশুর প্রভৃতির নাম নিতে পারে না। যে নাম উচ্চারণের নিষেধ বা ট্যাবু রয়েছে আর পরিবর্তে মহিলারা অন্য কিছু ব্যবহার করে থাকে। বয়স্ক স্বজন, যাদের নাম নেওয়া নিষেধ তাদের নামের সাথে ধ্বনিগত মিল থাকলে নারীরা সেটা এড়িয়ে গিয়ে প্রতিশব্দ ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায়—

এক ব্যাক্তির ডাক নাম 'কালো' হওয়ায় তাঁর স্ত্রী 'কালো' উচ্চারণ করত না। 'কালো রঙের শাড়ি' এর পরিবর্তে 'আঁধার রঙা শাড়ি' বলত। এছাড়া স্বামীর ডাক নাম 'হাতি' হওয়ার কারণে তার স্ত্রী হাতিকে 'বড়ঠাকুর' বলে ডাকে।

স্বজনের নামের সাথে মিল	বয়স্ক স্বজনের নাম	প্রতিশব্দ আছে এমন শব্দ
কালো (রঙ)	কালো	আঁধার রঙা
লতি (কচুর দণ্ড)	লতিকা	আলতি (কচু) গাছ
ভূতি (কাঁঠালের মাঝখান)	বিভূতি	কাঁঠালের মুগুর
হাতি	হাতি	বড়ঠাকুর
পূর্ণিমা/পুন্নিমা	পূর্ণিমা	নুনেই
সোমবার	সোমা/শমা	রবিবারের পরের দিন
রবিবার	রবি	ছুটির বার
বস (বসা)	বসন্ত	জিরা, জিরাও
পরশু	পরশুরাম	উদিন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এছাড়াও মেয়েদের গ্রামাঞ্চলে উঁচু স্বরে কথা বলা নিষেধ বিশেষ করে বাড়ির বউদের, রাজীব হুমায়ুন তাঁর গবেষণায় দেখেছেন সন্দীপ অঞ্চলের মেয়েদের একধরনের ফিসফিসিয়ে কথা বলার স্টাইল রয়েছে। এর পেছনে তিনি গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রদত্ত নিয়ম পরপুরুষের কানে মেয়েদের কণ্ঠস্বর যাওয়া 'গোনাহ্'কে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে এবং তার ভাষা ব্যবহারেও এই পুরুষতন্ত্রের ছাপ স্পষ্ট। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে যদিও ফিসফিসিয়ে কথা বলার স্টাইল মেয়েদের নেই, কিন্তু মুসলিম মেয়েরা মূলত গ্রামাঞ্চলে পরপুরুষের সামনে কথা বলে না। কিন্তু শহরের মেয়েদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রেও নিয়মের কড়াকড়ি না থাকলেও মেয়েদের জোরে জোরে কথা বলাকে খারাপ নজরে দেখা হয়।

'বউ মানুষের বেশি গলা করা ভাল নাই বাপু।'

'ভাতারের চেয়ে মাগের গলার জোর বেশি হ্ইলে ঘর ভাঙি জাই (যায়)।'

দুটি কথা মুনিয়াদা গ্রামের বাসন্তী দাসের (৭২) মেয়েদের জোরে কথা বলা খারাপ চোখে দেখেন কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে দেওয়া। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েকে পুরুষের নীচে রাখতে চায়। তাই সে অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি বা গলার জোর, যাই হোক না কেন, নারীর কম হবে এটাই প্রত্যাশা করে। উক্ত দুটি উদাহরণে দেখা যাচ্ছে 'বউ' যদি বেশি 'গলা করে' অর্থাৎ জোরে কথা বলে তাহলে তার শ্বশুর বাড়ির বয়স্ক লোকেদের প্রতি ভয় কেটে গেছে বলা ধরা যায়। এরপর সে হয়তো তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শুরু করবে। একজন নারীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাঁধা নিয়মের বাইরে বেরিয়ে যাওয়াকে সমাজ ঠেকাতে চায় নিয়মের বন্ধনে। তাই 'ভাতার' (বর) এর চেয়ে মাগ (বউ, এক্ষেত্রে) নিচু গলায় কথা না বললে সংসার ভেঙে যাবার ভয় দেখানো হয় এবং এই নিয়ম তাকে ছোটো থেকেই শেখানো হয়, বাপের বাড়িতে জোরে কথা বললেও বয়সের সাথে সাথে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে এলে তাকে এ বিষয়ে সচেতন করা হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে তার উলটো তার গলার স্বর উঁচু ও দৃঢ় হবে এটাই সামাজ প্রত্যাশা করে থাকে।

অপরিচিত বা বয়সে বড় পুরুষদের সাথে অর্থাৎ ভাশুর, শ্বশুর স্থানীয় ব্যক্তিদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সরাসরি বাক্ আদান-প্রদান না করার রীতিও লক্ষ করা যায়। সরাসরি বাক্যালাপ না করে পরোক্ষ বাক্যালাপ করতে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের নারীদের। এর জন্য তারা কোনো একজন অল্পবয়সীকে মাঝখানে রেখে বাক্যালাপ করে। অপরিচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের কেউ বাড়িতে এলে নারীরা বলে— 'বেটা, উনাকে ব্ইসতে বল্, তোর বাবা নামোপাড়া গেছে, চলি আ্ইসবে এখ্নি'।

আবার যদি পরিচিত বয়স্ক কেউ আসেন, সম্পর্কে ভাশুর হলে— 'তোর জেঠা কে বইসতে দে, জিগ্‌গাস কর চা খাবেন না শরবৎ করি দিব'?

উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে নারীরা তাদের কথোপকথনে নিজের সন্তানকে মাঝখানে রেখে নিজের কথা ব্যক্ত করেছেন। পুরুষরা এরকম করে না, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ অনেক সময় ভাইয়ের বউ এর সাথে কথা বলার সময় মাঝখানে ভাইয়ের সন্তান বা নিজের সন্তানকে রেখে কথা বলে থাকে। তবে একই বাড়িতে থাকলে (যৌথ পরিবার), ভাশুরকে সাধারণত দাদা হিসেবে সম্বোধন করে কথা বলে থাকে, সেক্ষেত্রে মাঝখানে কাউকে না রেখেও কথোপকথন করে থাকে, কিন্তু কথা বলার সময় স্বর নীচু, কম কথা, এগুলোর খেয়াল রাখতে হয়।

ঝাড়গ্রামের জেলার নারীরা স্বামী, শ্বশুর, ভাশুর নাম সচরাচর মুখে আনে না।

স্বামীর ক্ষেত্রে—

শুনছো,
বাবুর বাবা, বুড়ির বাবা,
বাবুর বাপ, মুনুর বাপ্,

ভাসুরের ক্ষেত্রে—

বাবুর জেঠা, ছুটার জেঠা,

মুনুর জেঠা, কুনুর জেঠা

শ্বশুরের নামও উচ্চারণ করা নিষেধ, সেক্ষেত্রে—

মুনুর দাদু, বাবুর দাদু ইত্যাদি।

পুরুষের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে বাধা থাকে না তারা অন্যকে নাম বলার সময় নাম বলতে পারে।

রক্ষণশীলতা ও মর্যাদা সচেতনতা : রক্ষণশীলতা ও মর্যাদা সচেতনতা নারীর ভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে রক্ষণশীল হয়। পুরুষ যত সহজে পুরোনো কথা ত্যাগ করতে পারে বা নতুন কথা গ্রহণ করতে পারে নারী তত সহজে তা পারে না। নারী ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাই নতুন ভাষী বা শব্দের সাথে সহজে তার যোগ স্থাপন হয় না যতটা সহজে একজন পুরুষের হয়। সুকুমার সেন বলেছেন—

> "Woman's speech is, generally speaking, more conservativ than that of a man. In other words, womean's speech retain archaic features when these have long disappeard from the dialect of man. It is also a very noted fact that women avoid neologism as far as they can."[১৩]

সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন ভদ্রঘরের মেয়েরা 'ল' এর জায়গায় 'ন' খুব বেশি ব্যবহার করে—

লুচি > নুচি,
লঙ্কা > নঙ্কা,
লাউ > নাউ,
লেপ > নেপ।

উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে ভাষার ক্ষেত্রে এই নিয়মটির সাধারণীকরণে একটু অসুবিধা দেখা দেয়, অশিক্ষিত মেয়ে পুরুষেরা উভয়েই লুচি কে নুচি বলে থাকে। আবার শিক্ষিত মহিলারা অনেকেই 'ল' এই উচ্চারণ করে থাকে।

আবার ভাষার মর্যদা সচেতনের কথা ধরলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন, মেয়েরা মর্যাদা সচেতন বলে তাদের ঝোঁক ভাষার standard variety এর দিকে অর্থাৎ নারীদের বাংলার রাঢ়ীর প্রতি ঝোঁক বেশী হবার কথা। আবার ঝাড়খণ্ডী ভাষাতে (ঝাড়গ্রামের প্রচলিত উপভাষা) রাঢ়ীর পূর্ব রূপ অনেকটা রক্ষিত। তাই এ বিষয়টির পরস্পর বিরোধী রূপটি উঠে আসে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর পরাধীনতা : পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুসারে পুরুষের কর্তৃত্বেই সমাজ চলে। সমাজের অন্যান্য দিকের মতো ভাষাতেও এই নিয়মের প্রভাবে নানা পরিবর্তন নিয়ে আসে। যেমন— মিনতির বাপ বিহা দিবেক বলি ভালো ছানা খুঁইজছে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে -

"গনা বিহা করবে, উয়ার জন্যেই কইন্যা দেইখ্ছি।"

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের কর্তৃত্ব ভাষার ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মিনতির, 'বিয়ে দেবে' কিন্তু গনা 'বিয়ে করবে'।

নারীর পুরুষের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকার কারণে এই পরিবর্তন ভাষার ক্ষেত্রেও এসেছে। সমাজের নিয়মে ভাষী নিজের অজান্তেই বাক্যের ক্রিয়ার পরিবর্তন করেছে। সমাজ সংগঠন ভাষার সংগঠনকে প্রভাবিত করে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সমাজ নারীদের দেয় না, কিন্তু পুরুষদের দেয়, সাধারণ বাংলাতেও ছেলের বিয়ে প্রসঙ্গে বলা হয়—

রাম বিয়ে করবে।

মেয়ের ক্ষেত্রে—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রেখার বিয়ে হবে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার যৌগিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যৌগিক ক্রিয়াটির ব্যবহার পুরুষের সমাজে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বোঝায়। গ্রামাঞ্চলে নারী যদি 'বিয়ে করব' কথাটি ব্যবহার করে তাকে ভৎর্সনার স্বীকার পর্যন্ত হয়তো হতে পারে। এক্ষেত্রে 'বিয়ে করব' কথাটি তার বাড়ির অমতে পালিয়ে বিয়ে করা বোঝাবে যা সমাজ স্বীকৃত নয়। যদি পুরো বিশ্বের দিকে নজর দেই তাহলেও দেখব সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বেশির ভাগ সময় পুরুষদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে এর উদাহরণ অন্যান্য ভাষাতেও রয়েছে—

Chairman,
Salesman,
Man is mortal

নারীদের নম্র স্বভাব নারী সুলভ কোমল মন : নারীদের নম্র স্বভাব ও নারী সুলভ কোমল মন, তাদের সিদ্ধান্ত অন্যের উপর চাপিয়ে না দেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি কারণ নারী পুরুষের ভাষায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বোলিনজার উক্ত স্বভাবের জন্য ইংরেজিতে নারীর-ভাষায় দু-ধরনের প্রক্রিয়া চলছে দেখান—

১. 'Tag question' এর উদাহরণ দিয়েছেন—

The war in Vietnam is terrible,
isn't it?

উক্ত প্যাটার্নের উদাহরণ উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষার নারীর ভাষাতেও মেলে—

"ফুলকুশমার ইঁটেই ভালো, তাই না?
বঙ্কিম মাস্টরের কাছেই পড়াতে পাঠালে ভালো হবেক বলো?"

উক্ত দুটি উদাহরণে নারী তার বক্তব্যের সমর্থন চেয়েছে। এর পেছনের কারণ যেমন তার নারী সুলভ নম্র-মন, সিদ্ধান্ত না চাপানো রয়েছে তেমনি, সে জানে শেষ সিদ্ধান্তের জন্য তাকে পুরুষের সম্মতির অপেক্ষা করতে হবে। সে এ নিয়মে অভ্যস্ত এবং নিজের অজান্তেই এ নিয়ম তার বাচিক ব্যবহারে পরিবর্তন এনেছে।

অপর একটি পক্রিয়ার কথা বোলিনজার বলেছিলেন সেটি হল— 'Rising intonation'-এর উদাহরণ স্বরূপ বোজিঞ্জার দেখিয়েছেন — 'ডিনার কখন খাবে?' স্বামীর এ প্রশ্নের জবাবে মেয়েদের বলতে শোনা যায়— 'ahh around six o'clock?'

এই প্যাটার্নটির সাধারণীকরণের মত উপযুক্ত ডাটা পাইনি কারণ ১০ টার দিকে যাব, ২ টার দিকে আসছি এগুলো পুরুষদের ভাষাতেও বহুল ব্যবহার হয়।

শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য : নারী পুরুষের ভাষায় শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এমন কিছু কিছু শব্দ আছে যা নারীদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয়। এছাড়া কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো নারীরাই ব্যবহার করে। আবার কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো নারীরাই বেশি ব্যবহার করে। পুরুষরা ব্যবহার করলেও তা নারীদের তুলনায় অনেক কম — উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষার নারীদের ভাষাতেও এরকম শব্দের প্রাচুর্য রয়েছে—

'পোড়া' বিশেষণটি দিয়ে মেয়েরা কথা বলে থাকে—

'এমন পুড়া (পোড়া) দেশে কি আর ভালো লোক নাই?'

এছাড়া 'পোড়া' বিশেষণ দিয়ে—

পুড়া দেশ
পুড়া চোখ
পুড়া কপাল ইত্যাদির ব্যবহার নারীরা প্রায় করে থাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই বিশেষণগুলো মূলত নারীরাই ব্যবহার করে, পুরুষেরা ব্যবহার করলেও তা খুবই কম। স্বজনসূচক শব্দের ক্ষেত্রেও দেখব বিশেষ বৈচিত্র্য—

দেওর, ভাশুর, ননদ,
জা, ভাশুর পো

উক্ত শব্দগুলি মেয়েরাই ব্যবহার করে, আবার —

শালা, শালি,
শড়ুভাই, সম্বন্ধী।

এগুলো শুধুমাত্র পুরুষরাই ব্যবহার করে কারণ এর পেছনে রয়েছে বাঙালি সমাজের পরিবারের গঠন বিন্যাস। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষায় ‘কী’ প্রত্যয়যোগে মেয়েদের সম্বোধনের শব্দের প্রচলন আছে। যেমন— বড়, মেজো, সেজো, ছোটো।

এগুলির সাথে ‘কী’ যোগ হয়ে’
বড়্কী (বড়বউ), মেজকী/ মাজ্কী,

সেজ্কী/ সাজকী, ছোট্কী ইত্যাদি, বাড়ির ছোটো বড় বউদের সম্বোধনের শব্দ তৈরি হয় —

সাজ্কীলো কি করছু? সিনাতে জাবি (যাবি) খালকে?

পুরুষদের ক্ষেত্রে ‘কা’ প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়—

বড়্কা, মেজ্কা, সেজ্কা, ছোট্কা।

‘পনা’ যোগে নারীদের কিছু কিছু শব্দ আছে যা কেবলমাত্র নারীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়, যেমন —

গিন্নিপনা
সতীপনা, নেকিপনা (ন্যাকাপনা), বেহয়াপনা ইত্যাদি।
“এতো সতীপনা দেখাই উপরে! আর ভিত্রে ভিত্রে এই সব করি বেড়াই।”
“মা গ মা নেকিপনা দেইখলে মরি জাবি (যাবি)।”

নারীরা সমাজে সবার সামনে জোরে কথা বললে বা অপশব্দ ব্যবহার করলে তাদের খারাপ চোখে দেখা হয়। তাই নারীরা অপরিচিত পুরুষদের সামনে, বয়স্কজনদের সামনে ধীরে ও কম কথা বলে। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষা ব্যবহারকারী নারীদের সর্বসম্মুখে স্ল্যাং বা অপশব্দ ব্যবহার করা সমাজ নিয়মের পরিপন্থী। কিন্তু নারীদের নিজেদের মধ্যে ও ঝগড়ার সময় বেশ কিছু অপশব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শব্দগুলিতে বিভিন্ন সমাসের বাহুল্য দেখা যায়। নিম্নে তাদের বিভিন্ন সমাসের বর্গীভূত করে দেখানো হল—

বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনোটিরই অর্থ প্রধান ভাবে না বুঝিয়ে তাদের দ্বারা অপর কোনো পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলা হয়।

অবৈধ সম্বন্ধসূচক ব্যবহার করার সময় নারীরা বহুব্রীহি সমাসের প্রয়োগ করে থাকে— বাপ-ভাতারী (বাপ ভাতার যার, এখানে ‘মা’ হবার কথা কিন্তু এখানে এটি মা আর্থে ব্যবহৃত না হয়ে একটি গালি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে যা এমন কোনো মহিলাকে বোঝায় যার চরিত্র খারাপ)।

‘তোর মত বাপ-ভাতারী মাগি কুথাও দেখিনি লো!’

শারীরিক গঠনকে ব্যঙ্গ করে ব্যবহৃত অপশব্দে ও নারীরা ব্যবহার করে থাকে—

মুখ-পুড়ী, উটকপালী, মুখ-পড়া, পুড়াকপালী ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহুব্রীহি সমাসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

বার-দুয়ারী— বার-দুয়ারী বারোভাতারীর মতন ঘুরি বেড়াবে সারাদিন।

উক্ত গালি বা গঞ্জনাতেও সমাজ সংগঠনের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। নারীর বেশি বাইরে বেরোনো ঠিক নয় এর ঘর ওর ঘর যাওয়া ঠিক নয় তাহলে নারীর স্বভাব ভালো থাকবে না এরকম ভাবা হয়। আসলে নারীই ঘরের সমস্ত কাজ কর্ম

করে থাকে, সে যদি বেশি বাইরে থাকে, লোকের ঘরে গল্প করতে যায় তাহলে বাড়ির পুরুষদের সেবা-যত্নের ত্রুটি হবে ধরে নেওয়া হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পুরুষের দাসী করে দেখতে চায়। গ্রামাঞ্চলেই এটি বেশি দেখা যায়। শহরের ক্ষেত্রে এই অপশব্দগুলি কম ব্যবহৃত হয় কারণ সেখানে নারীর প্রতি মানসিকতা কিছুটা হলেও রক্ষণশীলতা মুক্ত।

তৎপুরুষ সমাস : যে সমাসে পূর্বপদের কর্ম করণ অপাদান ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্ন কিংবা বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের লোপ হয় এবং পরপদের অর্থটি প্রধানভাবে বুঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

মুখঝামটা— মুখঝামটা মারি কথা বˆলনা বুˆঝলে।

পাড়া-বেড়ানি— পাড়া বেড়ানির ঘরে মন টিকে নাই।

এছাড়াও -

পাড়া-ঢলনি, সর্বনাশী, হাড় জালানি, পাড়া-মজানি, ঘর-জালানি ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। ঝাড়গ্রামের নারীদের ভাষায় এই সমাসবদ্ধ পদের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়—

বাচ-বিচার (বাছ-বিচার) — আমিষ-নিরামিষ কিছু বাচ-বিচার নাই।

জাত-জন্ম — উয়ার জাত-জন্মের ঠিক নাই।

এছাড়াও -

সাত-সত্‌রো (সাত-সতেরো)
নয়-ছয়
ছানা-পোনা
চাল-চুলা (চাল-চুলো)
রান্না-বান্না
সোনা-দানা
ঝি-জামাই
খুদ-কুড়া [খুদ-কুড়া ঢুকি গেল ঢঢরে মাস পিঠা হবেক মকরে (গান)]
বাড়-বাড়ন্ত
ভাই-ভায়াদ ইত্যাদি।

উক্ত সমাসবদ্ধ পদগুলির কিছু কিছু পুরুষেরাও ব্যবহার করে থাকে কিন্তু নারীরা তুলনামূলক বেশি ব্যবহার করে।

সর্বনাম : সর্বনামের প্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে নারী পুরুষদের ভাষার বৈচিত্র সেভাবে দেখা যায় না—

ইংরেজিতে যেমন— পুরুষের ক্ষেত্রে ‘He’

মেয়েদের ক্ষেত্রে ‘She’

বাংলায় এরকম ভেদ দেখা যায় না।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পুরুষেরা যারা মূলত অশিক্ষিত তারা তাদের স্ত্রীদেরকে ‘তুই’ সম্বোধন করে। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা তাদের ‘তুমি’ দিয়ে সম্বোধন করে থাকে। যদিও বর্তমানে শিক্ষিত কমবয়সী নারী-পুরুষেরা উভয় উভয়কেই ‘তুই’ বলে থাকে।

বিশেষ বাক্যাংশ : বিশেষ বাক্যাংশ ব্যবহার নারীর ভাষায় মান্য চলিত বাংলাতে যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

বাপের ভাগ্য —তোর বাপের ভাগ্য ভালো আমার মত মা পাইছু।

এছাড়াও

কোলের মেয়ে
চখের আড় (চোখের আড়াল না হতে দেওয়া)
পেটের ছানা (সন্তান)
মাথার দিব্বি (মাথার দিব্যি)
সোনার চাঁদ
দুধের ছা (সন্তান) ইত্যাদি।

ক্রিয়া বাক্যাংশ : বিশেষ বাক্যাংশের মতো ক্রিয়াবাক্যংশ এর ব্যবহার চলিত মান্য বাংলায় বহুল। ঝাড়গ্রামের নারীর ব্যবহৃত ভাষায় ও এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন -

হাড়ামাস কালি করা -

খাটি করি হাড় মাস কাইলা হই গেল।

পোকা ধরা —

বসি বসি গতরে পোকা ধরা আর কি।

ধম্মে না সওয়া (ধর্মে না সওয়া) —

ধম্মে সইবে নি, লোক্‌কে ঠকান্‌ বেরাই যাবেক।

চেঁচাই ঘর মাথায় তুলা (চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করা) —

চেঁচাই ঘর মাথায় তুলি দিল।

বানের জলে ভাসি আসা (বানের জলে ভেসে আশা) —

আমিও বানের জলে ভাসি আসি নাই।

এছাড়াও—

গতর খাটান
মাছের তেলে তেল ভাজা
হাড় জুড়াল
ঝেঁটাই বিষ ঝাড়া
তিন কাল যাই এককালে ঠেকা
গায়ে বাতাসা লাগানা
পিত্তি চট্‌কান
শত্তুরে মুখে ছাই দিয়া ইত্যাদি।

যুক্ত ক্রিয়ার প্রয়োগ উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও নারীদের কথ্য ভাষায় বহুল ব্যবহার হয়। 'বানের জলে ভাসি আসা' বাক্যাংশটির মধ্যে নারী তার মর্যাদার স্থাপন করতে চেয়েছে যে সে বানের জলে ভেসে আসেনি তাকে আনা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সুপ্তভাবে রয়েগেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের কতৃত্বের প্রকাশ। নারীকে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে এনেছে পুরুষ তাই সে এসেছে। এর উল্টো সমাজে ঘটেনা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাবদ্যোতক বাক্যাংশ ও বাক্য : পুরুষদের চেয়ে নারীদের অনুভূতি বেশি হয় তারা সহজে পরের অনুভূতিগুলি বুঝতে পারে, নারীর সহজেই কোনো কিছুতে বিস্মিত ও অবাক হয়ে পড়ে পুরুষদের তুলনায় তাই নারীদের ভাষায় বিস্ময়সূচক বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখা যায় বেশি। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও নারীদের ভাষাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি—

মাগো! —

মাগো! কথার ছিরি! লোকে কি বইলবেক?

মরণ! —

মরণ! বুড়াবয়েসের শখ দেখ্‌ন!

আমার পুড়া কপাল! —

আমার পুড়া কপালেই কি এমনি হয়!

এই বাকতাত্ত্বিক বৈচিত্রগুলি মূলত নারীদের মুখেই শোনা যায়।

নারী স্বভাবত কোমল হৃদয়ের হয়, সবার মঙ্গলকামনা করা তার একটি বৈশিষ্ট্য এই জন্য আমরা দেখি নানা অমঙ্গল সূচক শব্দকে তারা পরিবর্তন করে নেই। আবার নারীর মুখেই পরিবারের মঙ্গল কামনায় ঠাকুর দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার বিচিত্র ভাষার উদাহরণ পাই—

'সাপ'কে 'লতা' হিসেবে বলার রীতি বাংলা ভাষায় রয়েছে উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও মেয়েরা সাপকে 'লতা' হিসেবে সম্বোধন করে থাকে, তবে পুরুষেরাও সাপের পরিবর্তে লতা ব্যবহার করে থাকে। তার বিশ্বাস সাপের নাম নিলে যদি সাপ তার সন্তানের অমঙ্গল করে। তাই সাপের নামের পরিবর্তে লতার ব্যবহার।

বাড়িতে চাল না থাকলে 'চাল বাড়ন্ত'

শাঁখা ভাঙা কে বলে শাঁখা ঠাণ্ডা হওয়া।

শাঁখা যেহেতু বিবাহিত নারীদের স্বামীর মঙ্গলের জন্য পরার নিয়ম তাই তা ভেঙে গেছে বললে স্বামীর অমঙ্গল হতে পারে এই বিশ্বাস। এছাড়া স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর হাতের এয়োস্ত্রীর নিদর্শন সিন্দুর মুছে ফেলার সাথে সাথে শাঁখা পলাও ভেঙে ফেলার নিয়ম আছে। তাই যাতে কোনোভাবে স্বামীর অমঙ্গল না হয় তাই ভাঙার পরিবর্তে ঠাণ্ডা ব্যবহার হয়।

সম্বোধনের ভাষা : উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে নারীরা একে অপরকে সম্বোধন করার সময় 'লো' 'গে' এছাড়া 'ধন' (ধোনি) সম্বোধন করে থাকে। যেমন—

সমবয়স্ক পরিচিত নারীদের সম্বোধনের সময়—

কী লো কুথায় যাচ্ছু সকাল সকাল,

কী লো কী করছু, সিনাতে কখন জাবি (যাবি)?

কী লো তলা টানতে জাবি (যাবি) না নাই?

এছাড়া কমবয়স্কদেরকে সম্বোধন করার সময়—

কী লো বড়লোকের বেটি নতুন জামা পরিছু (ঠাকুমা নাত্‌নিকে আদর করে)

বয়স্কদের সম্বোধন করার সময়—

কী গো বড়্‌দি রান্না হইলো?

মা গো খাতে দিবে নাই?

মাই গো খাতে দিবি নাই?

এছাড়া নারীর সম্বোধনে অনেক সময় 'ধন' ব্যবহৃত হয়—

গড়িকরি ধন এমন সংসারকে

মার্‌ ন ধন দেখ্‌ কী কইরছে, জালাই মাইর্‌ল।

এছাড়া নারীরা স্বামীকে সাধারণত তুই/তুমি বলে সম্বোধন করে থাকে, কিন্তু রাগের সময় বা বিরক্তি প্রকাশের সময় নারী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উনি, উনার, উ/উয়ার ইত্যাদি সম্বোধন করে—

'সারাদিন খাটি মরি তাও উয়ার মন জগাতে পারি নাই।
আমি হলে সারাদিন খাটি মরছি আর উনি এক গ্লাস জল গড়াই খাবে নাই'।

পুরুষেরা সাধরণত এরকম ভাবে কথা বলে না। রাগ অভিমানের সময় পুরুষেরা নারীকে উনি/উ বলে না।
এছাড়াও 'ভাই' সম্বোধনটিও নারীরা একে অপরকে করে থাকে নিজেদের সাথে কথা বলার সময় –

'না ভাই আমার বরের অতো মুরোদ নাই'।

বর্তমান যুগে সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে। যুগ যুগ ধরে পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্ব করে আসছে, সমাজের নিয়ম গঠনে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নিজেদের কর্তৃত্বের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা নারীদের সমস্তকিছুতে পিছিয়ে রাখতে চেয়েছে বারবার। এই সব কারণ সমাজে পুরুষেরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থেকেছে। নারীরা থেকে গিয়েছে তাদের অনুসারী হিসেবে। এই ট্রাডিশোনের বাধা সেধেছে সাম্প্রিক নারী প্রগতি। নারীরা এখন আর পুরুষের বানানো সমস্ত নিয়মকে মুখ বুঝে মেনে নিতে নারাজ। নারীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিভিন্ন পুরুষতান্ত্রিক প্রথা নিয়মের বিরুদ্ধে। আসলে বর্তমানে নারীরা শিক্ষার আলোতে আসার ফলে তাদের মধ্যে নিজের প্রতি নির্ভরতা বেড়েছে। তারা শুধু আর পরের দয়ায় থাকতে রাজি নয়। স্বনির্ভরতার সাথে সাথে আসছে চারিত্রিক দৃঢ়তা। সমাজের এই বদলের সাথে সাথে ভাষারও বদল ঘটছে। ভাষায় নারী পুরুষ ভিন্নতা দূর করতে ইংরেজিতে শব্দ বদল ঘটছে—

পূর্বের শব্দ	**বর্তমান শব্দ**
Salesman	sales-assistant
Chairman	chairperson
Miss/Mrs	Ms

শুধু ইংরেজিতে নয় বাংলা ভাষাতেও এর প্রভাব কমবেশি পড়ছে।

বর্তমানে মহিলারা 'সভানেত্রী' 'অধ্যাপিকা' ইত্যাদির পরিবর্তে 'সভাপতি', 'অধ্যাপক' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতি। শহরের মেয়েরা শুধু নয় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত মেয়েরাও এখন 'বিয়ে দেবে' এর পরিবর্তে 'বিয়ে করব' ব্যবহার করছে। মোট কথা নারী শিক্ষার প্রসারে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। তারা স্বাবলম্বী হচ্ছে, এর ফলে পুরুষের কর্তৃত্বের প্রভাবও কমে আসছে। এই সব পরিবর্তন টেবুর প্রভাব কমাচ্ছে। সমাজ সংগঠনের এই পরিবর্তন ভাষা-সংগঠনের উপরেও পড়ছে। এর ফলে কমে আসছে নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার পার্থক্য। পুরোনো আমলের নারীদের মধ্যেই 'নারীর ভাষা' সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। আগামী দিনে সামাজিক কারণে নারী পুরুষের ভাষার বৈচিত্র আর খুব বেশি থাকবে না।

Reference:

১. ঘোষাল, ছন্দা, ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৬৮, পৃ. ৪৭
২. সেন, সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, আ.পা.প্রা.লি, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৮
৩. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ, ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ১৯৮৩, পৃ. ৩২
৪. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ. ৩৩
৫. শ', রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৯, পৃ. ১
৬. Francis, Q. Nelson, The Structure of American English [দ্র: শ', রামেশ্বর, তদেব,] পৃ. ৪
৭. Structevant, Edgar H, An Introduction to Linguistic Science, New Haven, Yale University press, 1947, ch.I [দ্র: শ', রামেশ্বর, তদেব,] পৃ. ৮
৮. হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ. ২৫

৯. সরকার, পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ১৫৬
১০. Trudgill, Peter, Sociolinguistics an introduction to language and socirty, Pengain Books, Fourth Edition, 2000, P. 61
১১. Trudgill, Peter, Ibid, P. 61
১২. Trudgill, Peter, Ibid, P. 66
১৩. Sen, Sukumar, Women's Dialect in Bengali, Jijnas, 1A College Road, Calcutta 700009, P. 2

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 649 - 658
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎ সাহিত্যের ভাষা-নির্মাণ শিল্প : কয়েকটি গল্পের নিরিখে

ড. ছন্দা ঘোষাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : chhandaghoshal.bengali@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Fictions of Saratchandra, plot, amazing characters, creation of plots, creation of characters, function of language, world literature.

Abstract
In respect of art, the best glory of author Saratchandra Chattopadhyay lies in creation of amazing characters of his fictions. In his fictions Saratchandra creats various amazing characters with his full sympathy, like leman male and female, teenagers, apathetic persons, hypocritical characters, daring youngster, sub-altern characters, even animal characters and they achieve eternal place in world literature. And unquestionably we can say that the language is the essential part of this creation. For analysis and description, we have selected here some stories like, 'Bindur Chele', 'Anuradha', 'Sati', 'Paresh', 'Bilasi', 'Mahesh', 'Lalu', 'Cheledhara', 'Bachar Panchash Purber Ekta Diner Kahini', 'Deogharer Smriti' etc., written by Saratchandra and we have observed here the function of language to creat the plots and characters of fictions in various points of views.

Discussion

অর্থনৈতিক কাঠামো তথা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল পারিবারিক কাঠামো। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে বদলে যায় পারিবারিক কাঠামোও। সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল কৃষি-ব্যবস্থার ওপর, যেখানে পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নির্ভরশীলতা ছিল চাষবাসকেন্দ্রিক। যে পরিবারে প্রধান অভিভাবক ছিলেন বাবা; বাবার অবর্তমানে মা কিংবা পিতৃতুল্য বড়দাদা। কৃষি-কাজে বাবা কিংবা বড়দাদাকে সাহায্য করতো সন্তান কিংবা কনিষ্ঠভাইয়েরা। তাই সম্পত্তি ছিল পারিবারিক প্রধানের মালিকানার অধীন। ফলে পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নির্ভরশীলতা ছিল পরিবারের ওপর। তাই বাবা-মায়ের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বাবা-মা তথা পারিবারিক প্রধানের নির্বাচিত পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করে পরিবারের সঙ্গে সন্তানাদিসহ বসবাস করতো। এ পরিবার ছিল সমাজবিজ্ঞানী মারডক (Murdock) কথিত সম্প্রসারিত বা যৌথ পরিবার। সেখানে আত্মীয় বা রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে রক্তের বাইরের সম্পর্কের লোকেরাও মাঝে মাঝে আশ্রয় পেত। (ঘোষ দস্তিদার, ২০০২ : ৩৫৮) কিন্তু ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাতে এই যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ধাক্কা খেল। কলকারখানা স্থাপন এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন তথা চাকরি-সৃষ্টি গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত হানল। কলকারখানায় উৎপাদিত মনোহারী পণ্যের অধিকারী হতে তথা জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে প্রয়োজন কাঁচা পয়সার। সেই পয়সার নাগাল পাওয়া যায় কলকারখানায়, অফিস-কাছারিতে চাকরি করলে। ফলে গ্রামীণ যৌথ পরিবারের আর্থিক পরাধীন সদস্যেরা

ক্রমে গ্রাম থেকে নগরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল চাকরি-সূত্রে। গ্রাম-কেন্দ্রিক যৌথ পরিবারে আছড়ে পড়ল নগর তথা বহির্বিশ্বের ঢেউ। আর্থিক সাবলম্বী সদস্যরা যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে গড়ে তুললো স্বনির্বাচিত ক্ষুদ্র-পরিবার বা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। (ঘোষাল, ১৪২৭ : ২৮)

তবে শিল্প-কেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইউরোপ-আমেরিকার সম্প্রসারিত পারিবারিক কাঠামোয় যেভাবে আঘাত হেনেছিল, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের কালেও ভারতবর্ষের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং সামাজিক মূল্যবোধের কারণে বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক যৌথ পারিবারিক কাঠামোয় সেভাবে আঘাত হানতে পারেনি। তাই ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিককালে রচিত হলেও বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে আমরা একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের-ই পরিচয় পাই।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' (১৯১৩) থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনাগুলি যখন একে একে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের মনে আগ্রহ ইতিমধ্যে আন্তরিক ও গভীর হয়েছে। দেশকে, দেশের মানুষকে যথার্থভাবে জানার ঐকান্তিক প্রেরণা জেগেছে। পুরনো সমাজ ও পুরনো ধরনের জীবনযাত্রার প্রতি তাঁদের মধ্যে একটি নস্টালজিক মোহাচ্ছন্নতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী 'ভারতী গোষ্ঠী'র কথাকারদের মধ্যে পুরনো সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রতি এ ধরনের কোনো আগ্রহ বা মোহাচ্ছন্নতা দেখা যায়নি। বরং তাঁরা নতুন যুগোপযোগী ব্যক্তি-চেতনার বিচিত্র প্রকাশকেই গল্প, উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন। এতে পাঠক সমাজের বৃহত্তর অংশই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেনি। আবার অন্যদিকে ছিলেন আর এক শ্রেণির লেখক — যাঁরা পুরানো জীবনধারাকে আশ্রয় করে রক্ষণশীল প্রাচীন প্রথানুসারী গল্প উপন্যাস লিখছিলেন। এঁদের জীবনদৃষ্টি ছিল রক্ষণশীল, পিছনের দিকে ফেরানো। জীবনের চলমান প্রবাহ সম্পর্কে এঁরা ছিলেন উদাসীন, অনাগ্রহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। (রায়চৌধুরী, ২০০০:১০৪)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রক্ষণশীল লেখকগোষ্ঠীর মতো প্রাচীন জীবনাদর্শের ও নীতিবোধের মহিমা কীর্তন করেননি। পাপপুণ্য ও সতীত্বের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে মানুষকে বিচার করেননি। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে পুরনো জীবনচর্চার ও সামাজিক বিন্যাসের প্রতি তাঁর একধরনের সংবেদনা ছিল। সংবেদনশীল শিল্পীর মানবীয় দৃষ্টি দিয়ে পুরনো জীবন যাপন ও আমাদের সামন্ততান্ত্রিক একান্নবর্তী নিম্নমধ্যবিত্ত কৌম সমাজের স্বরূপটি উদঘাটন করতে চেয়েছেন তিনি। বস্তুত এই সমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি এর প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতিও তাঁর রক্তের গভীরে। তাই সংস্কার-জীর্ণ এই সমাজের নিষ্ফলতা, ত্রুটি, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও তিনি এই সমাজের ধ্বংস কিংবা এর আমূল পরিবর্তন চাননি কখনও। ফলে তাঁর রচনায় এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত নারী-পুরুষের চারিত্রিক হীনতার পাশাপাশি চারিত্রিক মহিমাও পরিদৃশ্যমান। (রায়চৌধুরী, ২০০০ : ১০৭)

শিল্পকলার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক কৃতিত্ব চরিত্র নির্মাণে। হাওড়া-হুগলি-বর্ধমান আর মাঝে মধ্যে বার্মা অথবা বিহারের প্রবাসী বাঙালি সমাজের সীমায়িত প্রেক্ষাপটে মানব চরিত্রের যে বিচিত্ররূপ তিনি অঙ্কন করেছেন তা কম আশ্চর্যের নয়। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-কিশোর, প্রেমময়ী নারী, আত্মভোলাপুরুষ, নিষ্ঠুর, কপট-নারী-পুরুষ, নির্ভীক যুবা-কিশোর, নিম্নবর্গীয় নারী-পুরুষ, এমনকি মানবেতর প্রাণীকেও সহানুভূতির স্পর্শে অমর সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। আর এই নির্মাণে ভাষা ব্যবহারের ভূমিকা যে সর্বাধিক তা বলাই বাহুল্য।

বিষয়টি প্রাঞ্জল করতে এখানে আমরা শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে', 'অনুরাধা', 'সতী', 'পরেশ', 'বিলাসী', 'মহেশ', 'লালু', 'ছেলেধরা', 'বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী', 'দেওঘরের স্মৃতি' প্রভৃতি গল্পে পটভূমি এবং চরিত্র নির্মাণে লেখকের ভাষাব্যবহারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

কথাসাহিত্যের লেখক যখন তাঁর রচিত কথায় কোনো চরিত্রসৃষ্টি করেন তখন সেই চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে বাস্তবিক বা শরীরী করে তোলার উদ্দেশ্যে চরিত্রটিকে কাহিনিধারার প্রথমে নিয়ে আসার মুহূর্তে তিনি নিজে চরিত্রটির অন্তর্গত এবং বাহ্যিক কিছু বৈশিষ্ট্যর বর্ণনা দিয়ে দেন। যেমন— চরিত্রটি লম্বা না বেঁটে, রোগা না মোটা, রাশভারি না চপল ইত্যাদি। কখনো আবার চরিত্রটির নিজস্ব কিছু আচরণ বা কথাবার্তা (আত্মকথন) সাজিয়ে দিয়ে তার শারীরিক এবং মানসিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। কখনো আবার কাহিনির অপরাপর চরিত্রের সঙ্গে তার কথোপকথন এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েও চরিত্রটির আদলের একটি পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন। (সরকার, ২০০২:১৮৯)

তবে কাহিনির প্লটের প্রকৃতির উপর চরিত্র বর্ণনার ধরন নির্ভর করে। অর্থাৎ প্লটের ধরন অনুযায়ী কখনো চরিত্রের বাহ্যরূপের বর্ণনা প্রাধান্য পায়, কখনো বা বাহ্যরূপের বর্ণনা গৌণ থেকে চরিত্রের আন্তররূপ ও তজ্জনিত আচার-আচরণের বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করে চরিত্রের ক্রমবিবর্তিত প্রকৃতি উন্মোচনার্থে। কোনো চরিত্রকে ব্যক্ত করতে বা তার চারিত্রিক পরিবর্তনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে লেখক হয় প্রত্যক্ষ বর্ণনা বা চরিত্রটির কথাবার্তা-আচার-আচরণ, কাজকর্মের ধরন বদল করার মতো পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

তাই কোনো চরিত্রের গঠন বুঝতে তার নিজস্ব কথন বা অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে পারস্পারিক সংলাপ নির্মাণ কথাসাহিত্যের একটি অন্যতম উপায় বা মাধ্যম।

শরৎচন্দ্রের কথাশিল্পের আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। মানবমনের চিরন্তন যে মায়ামমতা, স্নেহপ্রীতি, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সঞ্জাত আবেগ তাকেই শিল্পরসে জারিত করে পাঠকের আস্বাদনপাত্রে পরিবেশন করে গেছেন তিনি। আর মানব হৃদয়ের এই দিকটিকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর রচনায় সরল-উদার, পরোপকারী কোমলস্বভাব চরিত্রের পাশাপাশি Binary Contrast রূপে কপট-ক্রূর, সুযোগসন্ধানী, নিষ্ঠুর স্বভাব চরিত্রদেরও নির্মাণ করেছিলেন। তবে তাঁর ভালোবাসা, সমবেদনা প্রথম পক্ষের চরিত্রগুলির উপর বর্ষিত হয়েছিল বলে তাঁর সাহিত্যে তারা যতটা স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় পক্ষের চরিত্রগুলিকে তিনি খুব সামান্যই স্থান দিয়েছেন।

আলোচ্য গল্পগুলিতে বর্ণনার ভাষা নির্মাণে শরৎচন্দ্র কয়েকটি রীতি গ্রহণ করেছেন। ১) যেখানে লেখক কথক হিসেবে সরাসরি নিজে ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর অবলম্বন দীর্ঘ সমাসবহুল তৎসম শব্দ পরিহারী সাধু অথবা চলিত বাংলা আর ২) যেখানে চরিত্র নিজের কথা নিজে বলছে বা অন্যান্য চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনে কাহিনি প্রবাহিত হয়ে চলে সেক্ষেত্রে তিনি মান্যচলিতের মধ্যে হাওড়া-হুগলির কথ্য উচ্চারণ মিশিয়ে একধরনের ঔপভাষিক বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। এছাড়া আছে ৩) চরিত্রগুলির অঙ্গভাষা এবং ৪) অধিধ্বনিগত প্রায়ভাষা। ৫) এর অতিরিক্ত আছে উপলক্ষ্য অনুসারী ভাষার কোড মিক্সিং এবং কোড শিফটিং ৬) আর আছে ধর্ম-লিঙ্গ-বয়স-শিক্ষা-পেশা অনুসারী সামাজিক শ্রেণি উপভাষা।

চরিত্রগুলির আন্তর গঠন-ই পাঠকের সামনে তুলে ধরা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় শরৎচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে চরিত্রগুলির বাহ্যরূপের বর্ণনা প্রায় গৌণ রেখেছেন। যৎসামান্য বাহ্যরূপের বর্ণনা যেখানে দিয়েছেন তা চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত নয়। বড়োজোর পরিস্থিতি প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। যেমন—

১. লেখককৃত বর্ণনার ভাষা –

i) চরিত্রের বাহ্যরূপের বর্ণনা :

ক) বিন্দুবাসিনী অসামান্যা রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিন বড়বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল। কিন্তু দুদিনেই তাঁহার এ ভুল ভাঙ্গিল। দুদিনেই টের পাইলেন, ছোটবৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার-অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে।’ (বিন্দুর ছেলে) — সমগ্র গল্পে কিন্তু রূপের জন্য বিন্দুবাসিনীর কোনো চারিত্রিক বিকার দেখা যায় না। বরং তার ভেতরের মাতৃসত্তাকে লালন করতে গিয়ে সে তার বাহ্যরূপকে কোনো দিনই আমল দেয়নি। তাই তার ননদ এলোকেশীর ছেলে খেমটাদলের নর্তকীদের রূপকে তার রূপের সঙ্গে তুলনা করলে সে রেগে ওঠে। এবং বিন্দুর বড়জা অন্নপূর্ণাও এলোকেশীর কাছে বিন্দু সম্পর্কে অনুযোগ করে বলে— ‘অত চুল তা বাঁধবে না, অত কাপড় গয়না তা পরবে না, অত রূপ তা একবার চেয়ে দেখবেনা।’

খ) পথচারীদের ঠেঙিয়ে সর্বস্ব অপহরণকারী ঠ্যাঙাড়ের বর্ণনা— i) ‘তার মূর্তি দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। মুখে তার কালি মাখানো, তাতে সাদা সাদা চুনের ফোঁটা দেওয়া। যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া।’

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ii) 'যে দুর্বল সিং — দুদিন হয়তো পেটে একমুঠো অন্নও নেই — আবার পথে এসেছে লোক ঠ্যাঙাতে'। (বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী) — গল্পের কথক এবং প্রধান চরিত্র নয়নছাতির কথনে উনিশ বিশ শতকের বাংলার অতি দুর্ধর্ষ ঠ্যাঙাড়ের যে দৈহিক রূপের বর্ণনা পরিস্ফুট হয়েছে তার সঙ্গে তার বৃত্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই। বরং চেহারার সঙ্গে তার কর্মের যে কন্ট্রাস্ট লেখক তৈরি করেছেন — তাতে ওই রকম হীনবৃত্তি গ্রহণের প্রেক্ষাপট সুপরিকল্পিতভাবে সুস্পষ্ট করে এই হীনবৃত্তিধারীদের প্রতি পাঠকের অন্তরে একরকম সমবেদনা, করুণার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক।

ii) পটভূমির বর্ণনা -

ক) সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের বাহুল্য বর্জিত সাধু ভাষায় -

'বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। ...ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি।' [মহেশ] — এই বর্ণনায় ক্রিয়ার দীর্ঘরূপ আর সম্মুখ, ধরিত্রী, নিরন্তরের মতো কয়েকটি তৎসম শব্দের ব্যবহার ছাড়া ভাষা প্রায় কথ্য রীতিতুল্য।

খ) শরৎচন্দ্র তাঁর শেষ পর্বের রচনা 'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থে শিশু-কিশোরদের জন্য যে গল্পগুলি লেখেন তার ভাষাবর্ণনা রীতি সামগ্রিক ভাবেই চলিত রীতির। বোধহয় সে সময় রবীন্দ্রনাথ, প্রথম চৌধুরীর সচেতন প্রয়াসে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমী সাধু গদ্যের প্রচলিত বর্ণনা রীতিকে পাশে সরিয়ে দিয়ে সাহিত্যের বর্ণনার ভাষায় চলিত রীতির চাল চালু হয়েছিল বলে। যেমন— 'ঠ্যাঙাড়ের কথা শুনেছে অনেকে এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেচেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও পশ্চিম বাঙলায়, অর্থাৎ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল খুব বেশী।' [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

২. প্রত্যক্ষ সংলাপে চরিত্র বর্ণনার ভাষা -

ক) চরিত্রের আত্মকথন—

i) নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া-সিঁদুর ঘুচোবে সাধ্যি কার? [সতী] – কথ্য বাংলা

ii) খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ – করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল – তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েছে – তাকে? [লালু] – কথ্য বাংলা

iii) বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ চুপ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই তো সে-যাত্রা বেঁচে গেছি। [ছেলেধরা] – মান্য বাংলা

খ) ভিন্ন চরিত্রের কথনে উদ্দিষ্ট চরিত্রের বর্ণনা—

i) খুড়ো লালুর উদ্দেশ্যে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম। যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন? আমি হলে বজ্রাঘাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না। [লালু] (মান্য বাংলা)

ii) হীরু বললে, এদেশে কেনা জানে, তোমাদের দু-ভায়ের কথা! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছ — তোমরা মনে করলে পার না কি! [ছেলেধরা] [মান্য বাংলা]

iii) কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধহয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে। [ছেলেধরা] – কথ্য বাংলা।

৩. বিবৃতির ভাষায় ঔপভাষিক বিচ্যুতি -

ক) অতীতকালে উত্তম পুরুষে ক্রিয়ায় 'আম্' এর পরিবর্তে 'উম্' বিভক্তি -

i) এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে – হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকুর ধারে। [ছেলেধরা]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ii) বললুম, ছাড় ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম। [ছেলেধরা]

iii) এটা রেখে দিলুম।[ঐ]

খ) অতীতকালে প্রথম পুরুষে ক্রিয়ায় 'ও' এর পরিবর্তে 'এ' বিভক্তি

i) কে একজন বুদ্ধিমান বললে। [ছেলেধরা]

ii) ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। [,,]

iii) ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে — শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে। [ছেলেধরা]

গ) গৌণ কর্মে 'কে' এর পরিবর্তে 'রে' বিভক্তি—

i) তখন দুজনে মিলে তারেও ঠেঙিয়ে মারবো। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) নয়ন টান মেরে তারে তুলে দাঁড় করালে। [ঐ]

iii) —চলো, ওরে বেঁধে নিয়ে থানায় ধরিয়ে দিই গে।[ঐ]

iv) —ওরে ধরে আনো নয়নদা।[ঐ]

v) এক ব্যাটারে পেয়েচি দাদাভাই।[ঐ]

ঘ) যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপে 'ছ'-এর পরিবর্তে 'চ'-এর ব্যবহার

i) অনেক দেরি হয়ে গেল, ঠাকুরমা ভাবচে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) আমি এখনই দুএক ব্যাটাকে ধরে আনচি। [,,]

iii) তখনও দুকানে বাজচে। [,,]

iv) আবার নড়চে। [লালু]

ঙ) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে অসমাপিকা ক্রিয়া রূপ 'গে' এর ব্যবহার—

i) বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। [বিলাসী] — (গিয়া করুক> করুক গিয়া>করুক গে)

ii) বেঁধে নিয়ে থানায় ধরিয়ে দিই গে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

iii) বাড়ী থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসি গে। [পরেশ] — (গিয়া> গিয়ে নিয়ে আসি > নিয়ে আসি গিয়ে > নিয়ে আসি গে।)

চ) নঞর্থ 'না' এর পরিবর্তে 'নে' অব্যয়ের ব্যবহার—

i) ওরে নির্মল, ...পালাস নে রে। [লালু]

ii) ওর কিছু আমরা চাই নে। [পরেশ]

iii) এখনো তেমন বোষ্টম হতে তুই পারলি নে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ছ) অধিকরণ কারকে এ, তে বিভক্তির পরিবর্তে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার — 'উঠে ঘরকে যা।' [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

জ) ক্রিয়া বিশেষণ 'জো' (<সুযোগ/ জোর) – এর ব্যবহার —

i) ছোটবৌকে শাসন করিবার জো ছিল না। [বিন্দুর ছেলে]

ii) সে কথা কারো বলবার জো নেই। [বিন্দুর ছেলে]

iii) শান্তিতে একমুঠো খাবারও জো নেই। [সতী]

iv) তোমাকে যে সে জিনিস দেখাবার জো নেই...।[অনুরাধা]

8. চরিত্রের অঙ্গভাষা -

কথাকারদের চরিত্র নির্মাণের আর একটি দিক হলো সংলাপের আগে বা পরে চরিত্রের কথা বলার ধরন বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি বিবৃত করা। শরৎচন্দ্রও এই রীতির ব্যত্যয় ঘটাননি। এগুলিকে অঙ্গভাষা বা পরোক্ষ ভাষা বলা চলে। যেমন—
ক)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

i) খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, (লালু) — [ভয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে]

ii) খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? [ভয়কে গোপন করার প্রচেষ্টা]

iii) এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল। [লালু]

iv) কনকনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন। [লালু]

v) পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, (লালু), [মনের দ্বিধা কাটিয়ে]

vi) এ-হাতের টাকা ঝনঝন করে ও-হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে, [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী] [প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে]

vii) উমা চকিত হইয়া কহিল, (সতী)

viii) বিন্দু হাসিল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, (বিন্দুর ছেলে) – (আশঙ্কার দ্যোতনাবাহী)

ix) এলোকেশী সগর্বে পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বিন্দুকে বলিলেন, [বিন্দুর ছেলে]

x) বিন্দু জিদ করিয়া বলিল, [ঐ]

xi) অমূল্য ভয়ে নীল বর্ণ হইয়া বলিল, [ঐ]

xii) যাদব হাতের নলটা ফেলিয়া দিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, (ঐ)

xiii) অন্নপূর্ণা রাগিয়া গিয়া বলিলেন। (ঐ)

xiv) বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। (ঐ)

xv) অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন— (বিন্দুর ছেলে)

xvi) অন্নপূর্ণা তাহার-কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, (,)

xvii) উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল — আমার মাথা খাও দাদা, উঠো না। (সতী)

xviii) হরিশ বিদ্যুৎ-বেগে আসন ছাড়িয়া উঠিল — নাঃ শান্তিতে একমুঠো খাবারও জো নেই। (সতী)

xix) হরিশ চোখ রাঙাইয়া লাফাইয়া উঠিল — বেশ করি বলি। আমার খুশি। (সতী)

এখানে লক্ষণীয় শেষোক্ত এই উক্তিগুলির আগে পরে প্রথাগত রীতিতে বলিল, কহিল, বলিয়া, কহিয়া ক্রিয়ারূপ নেই।

খ) শরৎচন্দ্র আর এক রীতির সংলাপ রচনা করেছেন যেখানে আবেগের তীব্রতা বোঝাতে বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখেছেন—

i) আত্মঘাতী না হলে আর—, বলিতে বলিতে দ্রুত বেগে (হরিশ) বাহির হইয়া গেল। (সতী)

ii) বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, ...এ কি দুর্নাম দেওয়া–একি আমার–। (সতী)

গ) এছাড়া আছে মানবেতর প্রাণীর অঙ্গভাষা — i) 'প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়লে' (দেওঘরের স্মৃতি)

ii) 'মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল।' (মহেশ)

৫. Para Language বা প্রায় ভাষার ব্যবহার -

আর একধরনের বর্ণনা হল সংলাপের আগে বা পরে — এগুলি হলো কথার স্বরভঙ্গি বা নানা আবেগ প্রসূত স্বরের উত্থান-পতনের বর্ণনা — ভাষাবিজ্ঞানে যেগুলির পরিচিতি অবিভাজ্য ধ্বনি বা অধিধ্বনি হিসেবে। যেগুলি প্রায়ভাষা স্তরের — যেগুলি মানুষের মনের বিচিত্র আবেগের সুপরিবাহী। শরৎচন্দ্রের গল্পে এর ব্যবহার—

ক)

i) বিন্দু মৃদুস্বরে বলিল, (বিন্দুর ছেলে)

ii) বিন্দু রুক্ষস্বরে বলিল, („)

iii) বিন্দু গর্জন করিয়া বলিল, („)

iv) মাধব ...শুষ্কস্বরে বলিল (,,)

v) স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল, (সতী)

vi) লেপকাঁথা জড়ানো মড়া ...ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, (লালু)

vii) কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম, (বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী);

viii) ভয়ে ভয়ে বললাম, (ঐ)

ix) নয়নচাঁদ দাঁত কড়মড় করে বললে, (ঐ)

x) নয়ন চেঁচিয়ে বললে, [দূরত্ব জ্ঞাপক] (ঐ)

খ) আর একধরনের প্রায় ভাষার বর্ণনা শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে পাওয়া যায়, যেখানে লেখক নিজে তার বর্ণনা না দিয়ে অন্য চরিত্রের অনুভবের মধ্যে দিয়ে তা ব্যক্ত করেন। যেমন—

i) বললে, দেরি কোরো না দাদা, মাথা তাক করে মারো। ...নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) না, এমনি। চলো যাই — আমি ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম নয়নদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ। (ঐ)

গ) আর একধরনের প্রায় ভাষার ব্যবহার শরৎচন্দ্র করেছেন—যেখানে কণ্ঠস্বর বা উচ্চারণের ধরন বর্ণনা না করে সরাসরি সংলাপে বিশেষ ধ্বনি যোজনা করে কণ্ঠস্বরের ধরনটি বুঝিয়েছেন। যেমন—

i) নাঃ ভয় কি! এই যে হাতে লাঠি রইল। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী] এখানে 'না' ধ্বনিতে বিশেষ স্ট্রেস বা জোর দিয়ে লেখক চরিত্রটির কণ্ঠস্বরে জোর করে সাহস সঞ্চারের চেষ্টাকে তুলে ধরেছেন।

ii) 'না নয়ন দা, না, মেরো না।' — 'না' ধ্বনির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ব্যাকুল মিমতির সুর পরিস্ফুট হয়। (ঐ)

৬. রেজিস্টার বা উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষায় কোড-মিক্সিং এবং কোড শিফটিং -

ক) কোড মিক্সিং বা বুলি মিশ্রণ :

i) (বার - লাইব্রেরির সদস্য) ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ...তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া। (সতী)

ii) বীরেন (উকিল) কহিল, ...সেদিন গোঁসাইবাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যাণ্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তোমরা তা বিশ্বাস করলে না, ...আমি এমন অনেক জিনিস জানতে পারি তোমরা যা ড্রিম কর না। (সতী)

iii) ব্রজেন্দ্র বলিল, উঃ- হরিশটা কি স্কাউন্ড্রেল! (সতী)

iv) বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে ...কহিলেন, আমার ত মাথার চুল পেকে গেল, কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্ দিতে পারলে না। (সতী)

v) যোগীনবাবু কহিলেন, ...গভর্নমেন্টে বোধ করি মুভ করা উচিত। (সতী)

খ) কোড শিফটিং বা বুলি লম্ফন :

i) ভক্ত বীরেন বলিলেন, অ্যাবসোলিউট্লি নেসেসরি! (সতী)

ii) ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? (মহেশ)

৭. সামাজিক শ্রেণি উপভাষা -

সামাজিক শ্রেণিভেদ অনুযায়ীও মানুষের মুখের ভাষায় বৈচিত্র্য ঘটে। আর একজনের মুখের ভাষা শুনেই ধারণা করা যায় তার পেশা, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, শিক্ষাগত শ্রেণিভেদ সম্পর্কে। সামাজিক শ্রেণির ভাষাগত এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে সমাজ ঘনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ লেখক শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তা তাঁর সৃষ্ট বিবিধ পেশা, ভাষা, বয়স, ধর্ম, লিঙ্গ, শিক্ষগত মানের চরিত্রগুলির মুখের ভাষা ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। যেমন—

ক) পেশাগত ভাষা -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(১) নাপিতের ভাষা -

i) কিন্তু আজ কি বার? তোমার ছোটমা হুকুম না দিলে ত ছাঁটতে পারিনে দাদা! (বিন্দুর ছেলে)

ii) বড় শক্ত ফরমাস হয়েচে মা, ...এমনি করে ছাঁটতে হবে, ওকি আমি পারব! (বিন্দুর ছেলে)

(২) কৃষকের ভাষা -

i) 'কাহন খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন।' (গফুর/মহেশ)

ii) 'বিঘে-চারেক জমি ভাগে চাষ করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা।' (ঐ)

(৩) মোটরগাড়ির চালকের ভাষা -

i) নেহি মাইজী, স্টেশনসে আতেহেঁ। (আব্দুল সোফার/সতী)

ii) কলকাতাসে এক মাইজী আউর বাচ্চা আয়া। (ঐ)

(৪) পারিবারিক চিকিৎসকের ভাষা -

i) 'বোধ হয় সমস্ত আফিঙটাই বার করে ফেলা গেছে, —বৌমার জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই।' (সতী)

(৫) সাপুড়ের ভাষা

i) ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—/মনসা দেবী আমার মা—/ওলট পালট পাতাল- ফোঁড়—/ঢোঁড়ার বিষ তুইনে, ...(বিলাসী)

(৬) দাস-দাসীর ভাষা -

i) 'কিছু তাড়াতাড়ি নেই বড়বাবু, বেলা হোক না, —আপনি বরঞ্চ আজ গঙ্গাস্তান করে আসুন।' (পরেশ)

ii) 'রান্নার সমস্ত যোগাড় করে দিয়েছি বড়বাবু।' (দাসী/পরেশ)

iii) 'লালুবাবু কোঠি মে নেহি হ্যায়।' (হিন্দুস্থানী দারোয়ান/লালু)

(খ) বালকের ভাষা -

i) খুন করলে ফাঁসি হয় আমাদের পড়ার বইয়ে লেখা আছে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) আচ্ছা নয়দা, ওরা ফিরে গিয়ে আবার তো মানুষ মারবে? (অল্প বয়সের অপার কৌতূহল) (ঐ)

iii) কি শেষ হলো নয়নদা? (,,)

iv) অমূল্য বলিল, দিদি অত হাসচে কেন? আমি ত আর ইস্কুলে যাব না। (বিন্দুর ছেলে)

v) অমূল্য পিঠ ছাড়িয়া দিয়া রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি কি কানা? চোখে দেখতে পাও না? (ঐ)

vi) বেশ যাত্রা ছোটমা। কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার চমৎকার খেমটার নাচ হবে। কলকাতা থেকে দুজন এসেচে, নরেনদা দেখেছে, ঠিক ছোটমার মত-খুব ভাল দেখতে— তারা নাচবে, বাবাকেও বলেচি। (বালোকোচিত সারল্য) (ঐ)

(গ) নারীর ভাষা -

i) 'তবে যদি বললে ত বলি, বড়বৌ, অমূল্যটিই তোমার কচি খোকা, আর আমার নরেনই কি বুড়ো? আর ও-কি কখনও বড়লোকের ছেলে চোখে দেখেনি গা, এইখানে এসে দেখচে?' (বিন্দুর ছেলে/এলোকেশী)

ii) হাঁ ঠাকুরঝি, আজ দিদির মাথাটা বেঁধে দাও— (বিন্দুর ছেলে)

iii) হাঁ লা তোর জন্যে কি কুটুম-কুটুম্বিতেও বন্ধ করতে হবে? (ঐ)

iv) না ঠাকুরপো, তোমরা আর কোথাও গিয়ে থাক গে না হয়। (ঐ)

v) শুধু মুখপোড়া, মাস্টারের জন্যই হচ্চে না। তার সর্বনাশ হোক, বাছাকে সে যে কি বিষ-নজরেই দেখেচে, তা সেই জানে। ...হিংসে করে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেচে। (ঐ)

vi) আমার দিব্যি রইল বড়দি। (ঐ)

vii) ঐ বুড়ো মিনসেই আদর দিয়ে তোর মাথাটা খেলে। (ঐ)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73
Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

viii) বঠ্‌ঠাকুর আমার মাথাটা কেটে নেবে। (ঐ)

ix) কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলি, মাইরি...। (ঐ)

ঘ) বিশেষ ধর্মের ভাষা -

i) নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যতখুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। ...যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না। (মহেশ/ গফুর চাষি)

ঙ) সামাজিক সম্পর্কের ডিসকোর্সের (Discourse) ভাষা :

i) ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্কের ডিসকোর্স- ক) যাদব (ভাসুর) কষ্টে চোখ খুলিয়া বলিলেন, কে ও? অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন ছোটবৌ (ভাদ্রবউ) কি বলতে এসেচে, শোন। ...ছোটবৌ কথা কহিল না, তাহার হইয়া অন্নপূর্ণাই বলিয়া দিলেন, ...। (বিন্দুর ছেলে)

ii) গুরুচরণ ব্যস্ত হইয়া পরেশের (অনুজ পুত্র) ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, ... ছোট বধূমাতার (ভাদ্রবউ-এর) বাপের বাড়ির দাসী পথ আটকাইয়া বলিল, আপনি ঘরের ভেতরে যাবেন না।

যাব না? কেন?

ঘরে মা বসে আছেন।

তাঁকে একটুখানি সরে যেতে বল না ঝি। (পরেশ)

এছাড়া শেষপর্বের লেখায় রবীন্দ্র-প্রমথনাথের স্টাইল অনুসারী বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠনের বিচ্যুতিও কিছু কিছু ঘটিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। যেমন—

ক) বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠন কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই ফর্মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে শরৎচন্দ্র বাংলা বাক্যের গঠনে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত—

i) ঝুলি ঝেড়ে তারা খুঁজে দেখছিল কি আছে। [তারা ঝুলি ঝেড়ে কি আছে খুঁজে দেখছিল। (কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া > কর্ম + কর্তা + ক্রিয়া)] (বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী)

ii) নয়ন টান মেরে তারে তুলে দাঁড় করালে। [(আদর্শ গঠন— নয়ন তাকে টান মেরে তুলে দাঁড় করালে। (কর্ম + অস. ক্রি + সমা.ক্রি)] (ঐ)

iii) নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে। [আদর্শ গঠন— অসমাপিকা + সমা. > সমাপিকা + অসমাপিকা] (ঐ)

iv) না নিলেন পিসীমা, না নিলে তোমার মেজবৌয়ের ভাইয়ের দল পথে। [আ.গ— পিসীমা নিলেন না, তোমার মেজবৌয়ের ভাইয়ের দল পথে নিলে না।] (ঐ)

v) কে দাঁড়িয়ে ওখানে? [আ.গ.— কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে/আছো] এখানে অসমাপিকার পূর্বস্থাপনা এবং সমাপিকার বিলোপন ঘটানো হয়েছে। (ঐ)

পরিশেষে বলতে হয় শরৎচন্দ্রের স্টাইলের আসল বিশেষত্ব হলো সহৃদয় হৃদয়সম্বাদী পাঠকের হৃদয়কে করুণায়, সমবেদনায় উদ্বেল করে তোলার মুন্সীয়ানায় — যা তাঁর সমসময় বা পূর্বাপর খুব কম লেখকই পেরেছেন। আর এখানেই তিনি তৈরি করে ফেলেন তাঁর নিজস্ব এক micro-grammar — যা তাঁর অনুজ লেখকদের অনুসরনীয় হয়।

Reference:

১. ঘোষ দস্তিদার, মৃণালকান্তি (২০০২) : সমাজবিজ্ঞান বিচিত্রা, নিউসেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৩৫৮

২. ঘোষাল, ছন্দা (১৪২৭) : আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য : সমালোচনা ও শৈলী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৮

৩. সরকার, পবিত্র (২০০২) : গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১৮৯

৪. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ (২০০০) : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০৪, ১০৭

সংক্ষেপণ : আ.গ — আদর্শ গঠন
অস. ক্রি — অসমাপিকা ক্রিয়া
সমা. ক্রি — সমাপিকা ক্রিয়া

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 659 - 663
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ছোটগল্পে ভাষা শৈলীর রূপান্তর : দ্বিতীয়ার্ধের নির্বাচিত গল্পকারদের রচনাশৈলীর তুলনামূলক পর্যালোচনা

বর্ষা পন্ডা
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
বাংলা ছোটগল্প, ভাষা শৈলী, রূপান্তর, সমাজচেতনা, আধুনিকতা, ভাষার বিবর্তন, বাস্তববাদ।

Abstract

বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক গভীর রূপান্তরের সাক্ষী। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোটগল্পের ভাষা ও আঙ্গিকেও পরিবর্তন আসে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী থেকে শুরু করে সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আধুনিক গল্পকারদের লেখনীতে ভাষা শৈলীর এই বিবর্তন লক্ষণীয়। আধুনিক সমাজের নিত্যদিনের ঘটনা, ব্যক্তির মানসিক টানাপোড়েন, বাস্তবতার নিরিখে জীবনচিত্রণ এবং ভাষার বহুমাত্রিকতা ছোটগল্পে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। বর্তমান গবেষণাটি দ্বিতীয়ার্ধের নির্বাচিত গল্পকারদের গল্পের ভাষা, বর্ণনা শৈলী এবং সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে।

Discussion

ভূমিকা - বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে ভাষা শৈলীর বিবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এই সময়ের ছোটগল্পের ভাষা ছিল অলঙ্কারময়, কাব্যময় এবং সমাজের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণির মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পে ভাষা শৈলীর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই সময়ে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনবোধে এক গভীর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা গল্পের ভাষা ও আঙ্গিকেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়, দেশভাগের যন্ত্রণা, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, সমাজতান্ত্রিক চেতনার উত্থান এবং নগরজীবনের বাস্তবধর্মী সংকট বাংলা ছোটগল্পের ভাষায় বহুমাত্রিকতা নিয়ে আসে। গল্পকারদের ভাষায় আঞ্চলিক রীতি, কথ্যভাষার সংযোজন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার বহুবিধ প্রতিফলন দেখা যায়। ভাষার এই রূপান্তর বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের গভীরতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-নির্ভর ভাষা থেকে শুরু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠিন বাস্তববাদী শৈলী, সমরেশ বসুর নগরজীবনের জটিল ভাষা এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক মানসিক দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার ভাষা —এগুলো এক-

একটি সময়ের ভাষা শৈলীর পরিচায়ক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ফুটে ওঠে, যা গ্রামীণ জীবনের সরল সৌন্দর্যকে ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরে। 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত'-তে বিভূতিভূষণের ভাষা একদিকে যেমন কাব্যময়, তেমনই আবার গ্রামীণ জীবনের অন্তর্নিহিত আবেগকে ফুটিয়ে তোলে। অন্যদিকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ভাষা হয়ে ওঠে কঠোর বাস্তববাদী, যেখানে দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং সামাজিক বৈষম্যের ছবি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন, অভাব, লড়াই এবং সামাজিক দ্বন্দ্বকে গভীর বাস্তবতায় তুলে ধরে।

সমরেশ বসুর গল্পে নাগরিক জীবনের ভাষা ফুটে ওঠে। মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্নভঙ্গ, টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁর ভাষাকে গতিশীল, সংলাপমুখর ও বাস্তবধর্মী করে তোলে। 'প্রজাপতি' বা 'গঙ্গা'র মতো গল্পে সমরেশ বসুর ভাষার মাধ্যমে নগরজীবনের সংকট, মানসিক জটিলতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়। অপরদিকে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে আধুনিক মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব, আত্মানুসন্ধান এবং সামাজিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁর ভাষা কখনও মনস্তাত্ত্বিক, কখনও নাগরিক বোধের গভীরতাকে স্পর্শ করে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'নীললোহিত' গল্পে সুনীলের ভাষা শহুরে জীবনের বিষণ্ণতা, মানসিক টানাপোড়েন এবং আধুনিকতার সংকটকে ফুটিয়ে তোলে। দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে স্থানীয় উপভাষার সংযোজন এবং কথ্যরীতির ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রায়নকে আরও বাস্তব ও প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পল্লীজীবনের ভাষা, লোকসংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার পাঠককে গ্রামীণ জীবনের গভীরে নিয়ে যায়। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' বা 'গণদেবতা' গল্পে তারাশঙ্করের ভাষা, স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনবোধকে তুলে ধরার জন্য আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ ব্যবহার করেছেন।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর রূপান্তরের পিছনে কার্যকরী প্রভাবগুলি বিশ্লেষণ করা, বিভিন্ন গল্পকারের ভাষার ভিন্নমাত্রিক ব্যবহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা এবং বাংলা ছোটগল্পে ভাষার বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। ভাষার এই বিবর্তন বাংলা ছোটগল্পকে শুধুমাত্র সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখেনি, বরং সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর বিবর্তন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক নতুন মাত্রা পায়। এই সময়ে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ছোটগল্পের ভাষার শৈলীতেও গভীর প্রভাব ফেলে। ভাষার মধ্যে বাস্তববাদ, মনস্তাত্ত্বিক সংকট, সংলাপের বহুমাত্রিক ব্যবহার, আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ এবং কথ্যরীতির প্রবেশ গল্পকে বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র ভাষার গতিশীলতাকেই তুলে ধরে না, বরং সমাজের বহুমাত্রিক সমস্যাকে পাঠকের সামনে বাস্তবতার আবরণে উপস্থাপন করে।

১. ভাষা শৈলীর রূপান্তরের প্রেক্ষিত - বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পে ভাষা শৈলীর রূপান্তর বহুস্তরীয় ও বৈচিত্র্যময়। রবীন্দ্রোত্তর যুগে ছোটগল্পের ভাষা আর কেবল সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থাকেনি; বরং তা সমাজের নানান স্তরের মানুষের কথ্যভাষাকে গ্রহণ করেছিল। ভাষার মধ্যে স্থানীয় উপভাষার প্রভাব, আঞ্চলিক রীতির অনুপ্রবেশ এবং সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের ভাবপ্রকাশ ভাষা শৈলীতে বহুমাত্রিকতার জন্ম দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীতে বাস্তববাদের শক্তিশালী প্রয়োগ ঘটান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' গল্প থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি গল্পের একটি গভীর দার্শনিক মন্তব্য যা মানুষের জীবনের বিভ্রান্তি এবং ভুল ধারণার প্রতি একটি কঠোর দৃষ্টি প্রদান করে।

> "সবাই নিজেকে ভোলায়। খিদে-তেষ্টা পেলে তা মেটানো, ঘুম পেলে ঘুমানো, এসব ছাড়া জীবনটা আমাদের বানানো, নিজেকে ভোলানোর জন্য ছাড়া বানানোর কষ্ট কে স্বীকার করে? বেশিরভাগ মানুষের এটা বুঝবার ক্ষমতা থাকে না, সারাজীবন ভুলও ভাঙে না, বুঝতেই যদি না পারা যায়, ভুল তবে আর কিসের ভুল? কেউ কেউ টের পেয়ে যায়, তাদের হয় কষ্ট। জীবনকে যারা বুঝে, বিশ্লেষণ করে বাঁচতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> চায় এই জন্য তারা বড় দুঃখী। বড় যা কিছু আঁকড়ে ধরতে পায় তাই ভুয়ো। এই জন্য এই ধরনের লোকের মনে জীবন থেকে বড় কিছু প্রত্যাশা থাকা বড় খারাপ- যত বড় প্রত্যাশা তত বড় দুঃখ পায়।"[১]

এই উদ্ধৃতিটি একটি গভীর জীবনবোধ এবং চিন্তাভাবনার প্রকাশ, যেখানে লেখক ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্নিহিত দুঃখের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি বিশ্বকে চিত্রিত করেছেন যেখানে মানুষের ভুল ধারণা, আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যাশা এক ধরনের দুঃখের জন্ম দেয়।

এটি তার ছোটগল্পে বাস্তববাদী উপস্থাপনার এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত, যেখানে মানুষ নিজেকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন সে জীবনের গভীরে পৌঁছায়, তখনই তার সামনে আসে এক কঠিন, কিন্তু বাস্তব সত্য। চরিত্রের মনের গভীরে প্রবেশ করে ভাষা গল্পের গতিকে তীক্ষ্ণ বাস্তবতায় নিয়ে যায়।

> "বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর-তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ–কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর, এবং তন্তুবায় দু ঘর। জাঙলের সীমানা বড়; হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিতও অনেক– নীলকুঠির সাহেবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিন শো বিঘা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে গ্রামীণ জীবনের সরলতা, লোকসংস্কৃতির অনুষঙ্গ এবং মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম জীবন্ত হয়ে ওঠে।"[২]

এটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' গল্পের একটি অংশ। এখানে তিনি বাঁশবাঁদি গ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অন্যদিকে মানুষের বসবাসের সহজ, গ্রামীণ জীবন উঠে আসে। এই অংশে বাঁশবাঁদি গ্রামের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা একটি ছোট গ্রাম, যেখানে পুকুরের চারপাশে কয়েকটি ঘরবাড়ি আছে এবং গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের বাস।

২. বাস্তববাদ ও মনস্তাত্ত্বিক অনুধ্যান - দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে বাস্তববাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। গল্পের ভাষা শুধু বর্ণনামুখর ছিল না, বরং তা চরিত্রের মানসিক সংকট, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধানকে ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে ভাষার সরলতা, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং সমাজের কুসংস্কার নিয়ে তীক্ষ্ণ হাস্যরস লক্ষ্য করা যায়। 'স্বর্ণমৃগ' এবং 'সাঁঝবাতির রূপকথা'র মতো গল্পে সমাজের অন্তর্লীন সংকট, মানুষের মানসিক দুর্বলতা এবং মূল্যবোধের পতন ব্যঙ্গাত্মক ভাষার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা কখনও সরল, কখনও রসাত্মক, আবার কখনও তীক্ষ্ণ সমাজবীক্ষণের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়।

> "কত আদরের এই দেহ। তবু যখন দেহ মরে তখন তাহা অশুচি হইয়া যায়। প্রিয়জন যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ কত সমাদর, কত আদর ও সোহাগ। সেই প্রিয়জন যখন মৃতদেহে পর্যবসিত হইল তখনই তাহা অস্পৃশ্য।"[৩]

এই উদ্ধৃতিটি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *দূরবীন* বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি মানুষের জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীর চিন্তা করছেন।

উদ্ধৃতিটি প্রিয়জনের জীবিত অবস্থায় আমরা যে স্নেহ, ভালোবাসা, আদর ও সোহাগ অনুভব করি, তা মৃতদেহের ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত হয়ে যায়। মৃতদেহ যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন তা আর সেই প্রিয়জনের দেহ থাকে না, বরং এটি হয়ে ওঠে অশুচি বা অস্পৃশ্য। এটি প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মৌলিক সত্যকে তুলে ধরে— যেখানে দেহের জীবন্ত অবস্থায় আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মৃত্যু তাকে এক আলাদা পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই চিন্তাভাবনা মানুষ এবং মৃত্যুর সম্পর্ক, জীবনের অস্তিত্ব এবং তার পরিণতি সম্পর্কে এক গভীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিফলন দেয়। এই উদ্ধৃতিটি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *দূরবীন* বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি মানুষের জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীর চিন্তা করছেন।

উদ্ধৃতিটি প্রিয়জনের জীবিত অবস্থায় আমরা যে স্নেহ, ভালোবাসা, আদর ও সোহাগ অনুভব করি, তা মৃতদেহের ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত হয়ে যায়। মৃতদেহ যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন তা আর সেই প্রিয়জনের দেহ থাকে না, বরং এটি হয়ে ওঠে অশুচি বা অস্পৃশ্য। এটি প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মৌলিক সত্যকে তুলে ধরে— যেখানে দেহের জীবন্ত অবস্থায় আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মৃত্যু তাকে এক আলাদা পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই চিন্তাভাবনা মানুষ এবং মৃত্যুর সম্পর্ক, জীবনের অস্তিত্ব এবং তার পরিণতি সম্পর্কে এক গভীর প্রতিফলন দেয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ভাষার মধ্যে থাকে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম উপস্থাপনা। 'দূরবীন' এবং 'পারাপার' গল্পে শীর্ষেন্দুর ভাষা চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন, অনিশ্চয়তা এবং সমাজের গভীর সংকটকে চিত্রায়িত করে। তাঁর ভাষা কখনও রহস্যময়, কখনও পরাবাস্তবতায় মোড়া। চরিত্রের অন্দরমহলের অনির্ধারিত দ্বন্দ্ব ও সংশয় শীর্ষেন্দুর ভাষায় দক্ষতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।

৩. ভাষার বহুমাত্রিকতা ও কথোপকথনের ভূমিকা - দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে ভাষার বহুমাত্রিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভাষার মধ্যে স্থানীয় উপভাষা, কথ্যরীতির সংমিশ্রণ এবং সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রায়ন গল্পের ভাষাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে সংলাপ গল্পের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন, সামাজিক সংকট এবং গল্পের গতি নির্ধারিত হয়েছে। নাগরিক জীবনের জটিল সংকট, গ্রামীণ জীবনের সরলতা এবং মধ্যবিত্তের আর্থসামাজিক টানাপোড়েন সংলাপের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ গল্পের বাস্তবতাকে গভীরতা দিয়েছে। তাঁর গল্পে গ্রামীণ জীবনের কথ্যরীতি, স্থানীয় সংস্কৃতির অনুষঙ্গ এবং লোকজ ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার গল্পকে জীবনের অন্তর্লীন বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' বা 'গণদেবতা' গল্পে তারাশঙ্করের ভাষার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ প্রাণবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪. ভাষা ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক - দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে ভাষা কেবল গল্প বলার মাধ্যম ছিল না, বরং তা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনবোধ, সংস্কৃতি এবং সময়ের প্রতিফলন বহন করেছে। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের ভাষা, নগরজীবনের বাস্তবতা এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্ব ভাষার শৈলীতেই প্রতিফলিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে লোকজ ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার দেখা যায়। গল্পের চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাষার শৈলী নির্ধারিত হয়েছে।

সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে নগরজীবনের ভাষা ছিল গতিশীল, দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং চরিত্রের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

উপসংহার - বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর রূপান্তর কেবলমাত্র ভাষাগত পরিবর্তন নয়, বরং সমাজ, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক প্রতিচ্ছবি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তববাদী ভাষা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকায়ত ভাষা, সমরেশ বসুর নগরজীবনের ভাষা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক মানসিক দ্বন্দ্বের ভাষা এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার ভাষা বাংলা ছোটগল্পের শৈলীতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

এই রূপান্তর কেবলমাত্র ভাষার রূপ নয়, বরং বিষয়বস্তুর গভীরতা, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, এবং সামাজিক সংকটের বহিঃপ্রকাশে এক অনন্য অবদান রেখেছে। বাংলা ছোটগল্পের ভাষা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনবোধকে প্রকাশের

মাধ্যমে সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর এই বৈচিত্র্য নতুন প্রজন্মের লেখকদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, (১৯৫৪), *পুতুলনাচের ইতিকথা,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৫৬
২. তদেব, পৃ. ২০
৩. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, (১৯৮৮), *দূরবীন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪০

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, (১৯৫১), *পুতুলনাচের ইতিকথা,* কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির।
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৫৪), *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।
বসু, সমরেশ, (১৯৬৭), *প্রজাপতি,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস।
গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, (১৯৭০), *অরণ্যের দিনরাত্রি,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, (১৯৮০), *স্বর্ণমৃগ,* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।
মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, (১৯৮৮), *দূরবীন,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
চৌধুরী, সুনীলকুমার, (২০০১), *বাংলা ছোটগল্পের ভাষা ও শৈলী,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
দত্ত, সুপ্রিয়, (১৯৯৫), *বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন,* কলকাতা: সাহিত্য একাডেমি।
ঘোষ, অরিন্দম, (২০১০), *আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ভাষা বিশ্লেষণ,* কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ।
মুখোপাধ্যায়, অশোক, (১৯৯৮), *বাংলা কথাসাহিত্যের রূপান্তর,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।
সেন, প্রতাপচন্দ্র, (২০০৫), *বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন,* কলকাতা: বিদ্যাসাগর পাবলিকেশন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 664 - 690
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি বোদলেয়ারের কবিতায় গ্রীক ও রোমক মিথের বহুস্তরীয় পরিপ্রশ্ন : সামাজিক ও কাব্যগত অভিব্যঞ্জনা

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Baudelaire, Myth, Fleurs du Mal, Poetry, Le Cygne, Hell, Charon, Andromache, Sphinx, Hades, Asthetic.

Abstract
Charles Baudelaire's poetic approach and the myths used in his poems are inseperable. Greek and Roman myths are the strength of his poems where exquisiteness is underlying. Only Ganga myth of the treasure of Indian myths is present in his poems rendered with intrinsic distinction. He has stood face to face with modern disgusted raucous time. We find the agony of sordid existence in his poem. Easy move of his pen has given the shape of a pleasant image to the ancient Greek and Roman myths. He has continued his quest of multidimensional Greek and Roman myths in his 'Les Fleurs De Mal'(1857). The poet's poetry has centered round the ugly face of urban civilization. Hell is in his poem a perfect myth. 'Sisyphus', cursed by the God of Greek mythology, has come in his poem. Likewise, Greek mythological gods as Phoebus, Apollo, Erebus, Antilope, David, Maddona, Venus, Eldorado, Icaria, Pylades, Electra, Cybele, Andromacho, Simois etc. are also present in his poems. Besides, in poems like 'La Beaute', Les Chats', 'Spleen' we find the cruel night-hag, Sphinx. Baudlaire has enriched his creation through presenting Hector, Pyrrhus, Pelides, Aeacides, Helenus and such others from Homer's Elliad and glorious ancient literature. He has given unparallel poetic glory to myth, fantasy, legendary tale etc. He has capitalised glorious treasure of Greek myth with his own deep insight like a magician. The great poet Baudelaire has created a delightful abode through the suppressed pain of defeated heroes of sublime Greek mythology.

Discussion

।। এক ।।

“And, sick at heart, I saw them plunge headfirst
Into the fiery furnace of excess,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Who - tempted by the taste of blood - prefer
A living hell to death and nothingness!"[১]

কবি বোদলেয়ার। নরক তাঁর কবিতার মিথিক বিনির্মাণ। তাঁর কবিতায় নরক স্বতোৎসারিত আবশ্যক উপব্যঞ্জন। নরক একটি সর্বব্যাপক-সার্বজনীন মিথ। উদ্ধৃতিটি বোদলেয়ারের (1821-1867) 'Le Jeu' - কবিতার শেষ স্তবকের শেষ দুটি চরণ। কবিতাটি ওয়াল্টার মার্টিন 'Games of Chance' শিরোনামে ইংরেজিতে কাব্যানুবাদ করেছেন। জুয়া ভাগ্য নির্ভর। জুয়া মানুষকে শূন্যতার নরকে নিয়ে যায়। জুয়ার নেশা এক মনস্তাত্ত্বিক বিকার। জুয়ায় মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে ওঠেন। মানুষের মানুষ হওয়ার সাধনা থেকে বহু দূরের অধোনির্মাণ ঘটে যায় তাঁর নরক যাত্রায়। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন 'জুয়ো' শিরোনামে। কবির অনুবাদে চরণ দুটি এরকম -

"ঈর্ষিত হৃদয়, তবু হানে ত্রাস দুর্ভাগারা
হ্যাঁ খোলা গহ্বরে ছোটে, আপনার শোণিতে মাতাল,
শূন্যতার যে-কোন অন্যথা খুঁজে সর্বস্বান্ত যারা
হোক তা যাতনা, মৃত্যু, নরকের অনন্ত পাতাল।"[২]

নরক। নরক প্রাচীন মানবজাতির গভীরতম প্রজ্ঞার কল্পিত অনুধ্যান। মানবের সার্বজনীন সমাজ চৈতন্যের নৈতিক সত্যরূপ নরক। নরক মানুষের বিস্ময়বোধক কল্পসৃষ্টি। মানুষের দর্শনবোধের প্রাথমিক মৌল স্তর। জুয়া যে মানুষের জীবনকে পঙ্কিল, দুর্বহ ও বিতৃষ্ণ বিকৃতির ভারে জর্জর করে তোলে, তাই বোঝাতে পুরাণের নরককে কবিতায় ফিরিয়ে এনেছেন কবি বোদলেয়ার। গ্রীক ও রোমক পুরাণে নরক অন্ধকার জগৎকক্ষ - যার দেবতা হেডিস (Hades)। হেডিস পাতালের দেবতা, হেডিস পাতালপুরী শাসন করতেন। মানুষের মৃত আত্মা যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তখন পাতালপুরীতে যে অধিদেবতা তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তিনি হেডিস। হেডিস মৃতদের প্রভু। পাতালের রাজা তিনি। কোন গ্রীক কিংবদন্তিতে হেডিসকে প্রতিভাবান চিকিৎসক রূপে দেখানো হয়েছে। সর্বোপরি হেডিস তাঁর সুচিকিৎসার গুণে মৃত মানুষকে জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন। হেডিসকে ভাগ্য দেবীর প্রভু হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। হেডিস জীবন-মৃত্যুর বিচারক। মানুষ যখন পাতালপুরী আক্রমণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন তিনি তাদের ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। হেডিস জাদুর দ্বারা সকলের পতন ঘটাতে সক্ষম হতেন। মৃতদের দেবতা বলে জীবিতরা তাঁকে ভয়ঙ্কর মনে করতেন। কিন্তু তিনি নিজে মৃত্যু ছিলেন না। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি অন্ধকার পাতালপুরীতে কাটিয়েছেন। গ্রীকরা হেডিসকে প্রণাম করতেন। গ্রীক মিথোলজিতে হেডিস সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> "Hades was seen as a dark and unattractive god, hard-hearted and merciless… Hades rarely features in classical mythology. In the stories of punishment after death, or of the living humans who visited his dark country, he is seldom involved personally."[৩]

বোদলেয়ারের কাব্যদর্শন নরক দর্শনেরই নামান্তর। কিন্তু তাঁর নরক চির অন্ধকারে ডুবন্ত নয়। নরকের ঘ্রাণ তাঁর কবিতার কোষে কোষে। আর সেখান থেকেই খুঁজে নেওয়া যায়, কবিতার বিমল সৌন্দর্য। কবির কবিতা নিয়ন আলোয় পণ্য হয়ে যাওয়া শহর সভ্যতার অন্ধকারের নারকীয় চিত্রকল্পে টইটম্বুর। নরক আর পাতাল প্রদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে নেই। আমাদের এই অসুস্থ রোগ জর্জর অসাম্যের পৃথিবী সত্য সত্যই অন্ধকার আবিষ্ট আন্ডারওয়ার্ল্ড। এখানে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে নারকীয় বিভীষিকা। কবির 'Un Voyage a` Cythere' ('সিথেরায় যাত্রা') - কবিতায় ত্রিশাখা যুক্ত ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহের চিত্রকল্প অসুস্থ পৃথিবীর সত্যকার নরক দর্শন। বাস্তব পৃথিবীর বীভৎসতাকে ধারণ করে আছে, কবিকল্প এই দৃশ্য। এই নারকীয় শব কবির আত্মপ্রতিকৃতি -

"Goddess of Love, your isle was nothing but
An emblem with an image, torn apart."[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সৌন্দর্যের দ্বীপভূমিতে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো পচা মড়ার ব্যাপ্ত চিত্রকল্প। আমাদের অস্তিত্বের মনোমূলে প্রোথিত হয়ে যায় বীভৎস নারকীয় নির্যাস।

বোদলেয়ারের প্রথম কবিতা 'Au Lecteur' - ('To The Reader' - 'পাঠকের প্রতি')। প্রতিদিন আমরা নরকে গড়িয়ে পড়ি - 'down towards Hell'. দিনে দিনে আতঙ্কহীন দুর্গন্ধে ডুবে থাকি। এই তো নরক। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি কাব্যানুবাদে -

"Each day brings one more step in our desce
Through stinking shades that would have gagged us once."[৫]

বোদলেয়ারের অনেক কবিতার ছত্রে ছত্রে নরকের চিত্র। কবির 'Les Phares' (আলোকস্তম্ভ), 'Don Juan aux Enfers' (নরকে ডন জুয়ান), 'Hymne a` La Beaut´e' (সৌন্দর্যের স্তব), 'Sed Non Satiata' (তবু অতৃপ্তা), 'Duellum' (দ্বন্দ্বযুদ্ধ), 'Horreur Sympathique' (অনুকম্পায়ী ত্রাস), 'Chant d' Automne' (হেমন্তের গান), 'Le Vin de I'Assassin' (খুনের মদ), 'Les Litanies de Satan' (শয়তান স্তোত্র), 'Le Voyage' (ভ্রমণ), 'Madrigal triste' (বিষাদগীতিকা) প্রভৃতি কবিতায় নরকের উল্লেখ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অবশেষে কবি লিখলেন, স্থির মৃত্যুর দেশে যাওয়ার সময় হয়েছে। অনির্বাণ উজ্জ্বলন্ত আলোকের জ্যোতি দেখেছেন কবি। সে স্বর্গ থেকে আসুক অথবা নরক থেকে। তাতে কিছু এসে যায় না - 'Hell or Heaven, what does it matter?' কেবলই উজ্জীবনী বিভা। কবি তাঁর 'Le Voyage' ('ভ্রমণ') কবিতায় লিখলেন -

"Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu' importe?
Au fond de I'nconnu pour trouver du nouveau."[৬]

ভারতীয় হিন্দু মিথোলজিতে নরকের বর্ণনা আছে। মর্ত্য পৃথিবীতে পাপ কাজে লিপ্ত মানুষ শাস্তি স্বরূপ নরকে গমন করেন। তাদের নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বিভিন্ন রকম পাপকর্মের জন্য বিভিন্ন রকম নরক নির্দিষ্ট রয়েছে। এগুলির মধ্যে রৌরব, শূকর, বিবসন, মহাজ্বাল, বৈতরণী, কৃমিভোজন, সন্দংশ, মহারৌরব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেমন যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলেন, ব্রহ্মহত্যার মত ঘটনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেন, তিনি রৌরব নরকে গমন করেন। 'শিবপুরাণ' - গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"কূটসাক্ষ্যন্তু যো ব্যক্তি বিনা বিপ্রং সুরাসবম্।
সদানৃতং বদেদ্‌যস্তু স নরো যাতি রৌরবম্।"[৭]

হিন্দু পুরাণে নরকের সংখ্যা অনেক। অসংগত, রীতি বিরুদ্ধ কর্মই পাপ। এই পাপের কারণেই মানুষ নরকে নিমজ্জিত হয়। অনুতাপ, অনুশোচনা এবং শিব স্মরণেই পাপ বিনষ্ট হয়। গ্রীক মিথোলজির 'Hell' এবং হিন্দু পুরাণের নরকের স্রষ্টারা কেউ কাউকে বলে কয়ে এমন কল্পিত মিথের সৃষ্টি করেননি। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সর্বব্যাপক মানবমনের মধ্যে একটি সার্বজনীন ঐক্য আছে।

কবিতায় মিথের প্রয়োগ তাৎপর্য ও মিথিক শব্দ-সংকেতের জাদু কবির উপলব্ধির অভিজ্ঞানজাত। কবিতার মিথ চয়ন কবি মানসের নিজস্বতার উপর নির্ভরশীল। ধ্রুপদী স্রষ্টারা যে রকম মিথ ব্যবহার করেন, রোম্যান্টিক কবিরা ঠিক তেমন করেন না। বহু পঠনপাঠনের অধিকারী কবি মনীষীই স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতায় মিথ ব্যবহার করতে পারেন। কবি বোদলেয়ারের কবিতায় ব্যবহৃত মিথ তাঁর কবি মানসের সঙ্গে সংলগ্ন। বিষণ্ণতা, বিতৃষ্ণা, পাপ, নরক, শয়তান, পিশাচ-পিশাচী, ভূত-প্রেত, মড়া, গলিত শব, মদমত্ত রতি, ডাকিনী, প্রেতচ্ছায়া, প্রেতদল, স্বর্গদূত, দেবদূত, ডাইনি বুড়ি, জাদুবিদ্যা প্রভৃতি মিথ ও মিথ নির্ভর অলৌকিকতা ও কিংবদন্তি সুলভ শব্দ প্রয়োগে কবি সিদ্ধহস্ত। অতীত ঐতিহ্য থেকে নির্বাসিত আমরা। যুগের ভয়ঙ্কর বিনষ্টি ও বীভৎসতা কবিকে পীড়িত করেছিল। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসির অমানব ঘটনা চিহ্নিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মিথকে তুলে এনেছেন কবি। এবং আধুনিক বর্তমানের বাস্তবিক সম্পূরক অণুঘটক রূপে মিথকে ব্যবহার তাৎপর্যে কবিতা-সংলগ্ন শীলিত কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি তাঁর কবিতায়।

।। দুই।।

আধুনিক কাব্যের প্রতিষ্ঠা পুরুষ যেমন বোদলেয়ার, ঠিক তেমনই আধুনিক কবিতায় মিথের সঞ্চালক, সংরক্ষক এবং স্থপতি হচ্ছেন বোদলেয়ার। বোদলেয়ারই প্রথম আধুনিক কবিতায় মিথের প্রজ্ঞানির্ভর উৎসমুখ উন্মোচিত করে কবিতাকে অতীত ঐতিহ্যের ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আধুনিক কবিতায় প্রতীক নির্মাণের আদিপুরুষও তিনি। প্যারিস শহর আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত শহরের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ইউরোপের সেই কবি বোদলেয়ার, যিনি আধুনিক কবিতার প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে নগ্ন বাস্তব যাপনের বিমর্ষ রূপকে কবিতার বিষয় করে তুলেছেন।

বোদলেয়ারের কবিতায় গ্রীক এবং রোমক মিথ কবিতার শক্তি ও সৌকর্য। ভারতীয় মিথের মধ্যে একমাত্র গঙ্গা মিথই স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কবির কবিতায় উপস্থিত। কবিতায় উল্লিখিত বেশিরভাগ মিথ দেশ কালের সীমানা ভেঙে উর্ধ্বতর সার্বজনীনতা অর্জন করেছে। মানব অস্তিত্বের মর্মমূলে রয়েছে সূচিতীক্ষ্ণ বিষণ্ণতা, ভয়াবহ অস্তিত্বের যন্ত্রণা। আধুনিক বিতৃষ্ণ কর্কশ সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি। বোদলেয়ারের কলম অনায়াসে প্রাচীন মিথকে সাহিত্যের প্রসন্ন মূর্তিরূপ দিয়েছিলো। কবি বুদ্ধদেব বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদে ইউরোপীয় মিথের সার্বজনীনতাকে ভারতবর্ষের উর্বর মাটিতে পুঁতে দিয়েছেন। এদেশের জল হাওয়া, আলো বাতাসে লালিত - বর্ধিত ও লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে কবিতাভুবনের বহু মূল্যবান মিথ। মিথের তাৎপর্যে কবিতা নানা অর্থ দ্যোতনা লাভ করেছে। প্রযত্ন পরিচর্যায় বুদ্ধদেবের অনূদিত বাংলা কবিতার মিথ ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। সমকালের বাঙালি কবিদের পাণ্ডিত্যের তীক্ষ্ণতা ইউরোপীয় কোন কোন বিজ্ঞতমের থেকে ন্যূন্য ছিল না। কবিত্বশক্তিতেও তাঁরা প্রথিতযশা ইউরোপীয় কবিদের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন। কিংবদন্তি, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, লোককথা - রূপকথা - অলৌকিকতার মোড়ক ও কল্পনাশ্রিত প্রতীকে বুদ্ধদেবের অনূদিত কবিতা বাঙালি মানসের নিকটবর্তী হয়েছে। মিথের সুবৃহৎ পরিসরে তিনি শুধু বিশল্যকরণীই আনয়ন করেননি, অনূদিত বাংলা কবিতায় গোটা বনবিতানের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বুদ্ধদেব। নরক ও মৃত্যু সংলগ্ন বীভৎসতাও ভারতীয় পুরাণের প্রচ্ছায়ায় প্রলম্বিত। এক শিল্পী ও শিল্পের অঙ্কুরিত বীজকে টবের পরিখা ভেঙে আভূমি প্রসারিত বাংলাদেশের শস্যভূমিতে পুঁতে দিয়েছেন তিনি।

বোদলেয়ারের 'Les Fleurs Du Mal' (1857) কাব্যের কবিতাগুলিকে আপাত পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হলেও একটা অন্তর্বয়নের বন্ধনে প্রতিটি কবিতা আন্তর্জালিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। কবি কাব্যগ্রন্থটিকে 'Spleen et Id´eal' (বিতৃষ্ণা ও আদর্শ), 'Tableaux Parisiens' (প্যারিস চিত্র), 'Le vin' (মদ), 'Fleurs du Mal' (ক্লেদজ কুসুম), R´evolte' (বিদ্রোহ), La Mort (মৃত্যু), Poemes ajout´es (আরো কবিতা) প্রভৃতি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। কবির কলমে আধুনিক সমাজ বহুমাত্রিক মিথ। এলিয়টের 'The Waste Land' -কাব্যের কবিতাগুলি বন্ধ্যাত্ব, উর্বরতা, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মিথিক নির্মাণ। আর বোদলেয়ারের কবিতাবিশ্ব আধুনিক নগর সভ্যতার কুৎসিত পঙ্কিল নরক। এর মধ্যেই কবি সুন্দরের অন্বেষণ করেছেন। কুৎসিত পাপের পঙ্কিলতা থেকে সমস্ত রস - কষ নিংড়ে নিংড়ে কবি নির্মাণ করেছেন কবিতার সৌন্দর্য। কাব্যের প্রায় কবিতাতেই রয়েছে মিথিক বয়নশিল্প। তবে তা হাড় জিরজিরে অন্ত্যজ তাঁতির হাতে বোনা, ছেঁড়া চট, ধুলো মিশ্রিত তুলোর উপাদান। তবুও তার আশ্চর্য লাবণ্য - ভিন্ন বেনারসী। আশ্চর্যের লগ্নে অন্যমনা।

সিসিফাস (Sisyphus) - গ্রীক পুরাণে দেবতাদের দ্বারা অভিশপ্ত চরিত্র। যিনি একটি পাথরকে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যান। সেখান থেকে পাথরটি আপনা আপনি আবার গড়িয়ে পড়ে। অনন্তকাল তাঁকে এই কাজ করে যেতে হয়। এর থেকে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর তেমন কিছু হয় না। বোদলেয়ার তাঁর 'Le Guignon' ('Bad Luck' - 'দুরদৃষ্ট') কবিতায় সিসিফাসের উল্লেখ করেছেন -

"Sisyphus, il faudrait ton courage!
…L' Art est long et Temps est Court."[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Walter Martin - এর ইংরেজি পদ্যানুবাদ এরকম -

"As Time is not as long as Art
… … …
A stubborn, Sisyphean heart."[৯]

সিসিফাস হেরে গেলেন। তার কাজ শ্রমসাধ্য কিন্তু নিরর্থক। একথা বোঝাতে 'সিসিফিয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। একথা কবি বুদ্ধদেব অনুবাদ করলেন -

"সিসিফাস, তোর সাহসের সর্বস্ব
হার মানে এই বিরাট বোঝার কাছে।
...শিল্প বিশাল, আয়ু অতিশয় হ্রস্ব।"[১০]

গ্রীক দেবতা জিউসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দেবতারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন। তাঁর নগ্ন মৃতদেহ অবহেলায় ফেলে দেওয়া হয়। যথাযথভাবে তাঁর শেষকৃত্য করানো হয়নি। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন -

> "Sisyphus died of weakness and old age, for which there is no cure, and in the Underworld he suffers punishment for spying on Zeus, or for impiety."[১১]

হ্যাঁ - একথা ঠিক, সিসিফাসের কাজ কোন কাজ হয়ে উঠল না। তাঁকে ঠেলে দিল গভীর হতাশায়। বোদলেয়ার মানবজীবনের নৈরাশ্য ও অন্তরের আর্তিকে শিল্পরূপ দিলেন। সিসিফাসের জন্য কেউ সমাধিফলক নির্মাণ করেননি। শবযাত্রায় কেউ শোক জ্ঞাপন করেননি। কেউ তাঁকে সম্মান জানাননি। মৃত্যুর পরেও তাঁর শবদেহ গভীর অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গেল। উপরওয়ালাদের নির্মম ক্রোধ থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না ইহজীবনে। গ্রীক পুরাণের এই কাহিনী সাংকেতিত হয়েছে বোদলেয়ারের কবিতায়। কবিতায় সৃষ্ট সিসিফিয়ানের প্রতীকের মূল্য অসাধারণ। ধূর্ততার শাস্তি কি এমন হতে পারে? না - প্রাচীন গ্রীকের ধূর্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এমনই প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিল? একটি প্রতীক সংকেতে কবি চিন্তাশীল পাঠক সমাজের কাছে এমন প্রশ্ন রেখে গেলেন। সমগ্র কবিতাটি একটি শব্দস্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রইল - তিনি সিসিফাস। মানবিকতার অবমূল্যায়ন ও অযৌক্তিক বিচার ব্যবস্থার প্রতীক তিনি। কবির কলম তীক্ষ্ণ শরের মত বিদ্ধ করল গ্রীকপুরাণের শ্রদ্ধেয় দেবসমাজকেও। বোদলেয়ারের কবিতায় সিসিফাস হয়ে উঠলেন সৃজনশীল ধ্রুবপদ।

ফীবাস (Phoebus Apollo) - গ্রীক ও রোমক পুরাণের দেবতা। অ্যাপোলোকে ফীবাস অ্যাপোলো বলেই ডাকা হত। ফোয়েবাস (Phoibos) - অর্থাৎ উজ্জ্বল। গ্রীক পুরাণে জিউস ও লেটোর দুই যমজ সন্তান ছিলেন যথাক্রমে পুত্র অ্যাপোলো ও কন্যা আর্টেমিস। অ্যাপোলো বহুমুখী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি সূর্যদেবতা - 'God of Light'. তিনি সঙ্গীত, কাব্য ও শিল্পের দেবতা। C. Scott Littleton সম্পাদিত 'Mythology' - গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "The twin brother of Artemis, Apollo was the God of light, and of the sun itself, but he was also the patron of music, poetry and all the fine arts, and of healing and prophesy. Although he was a figure of great beauty, and therefore a favoured subject of artists and sculptors, he was often unhappy in love."[১২]

অ্যাপোলো ছিলেন জ্ঞানী। তিনি ভবিষ্যৎ জানার অধিকারী ছিলেন। বোদলেয়ার গ্রীক পুরাণের ফীবাসকে তাঁর 'La Muse Malade' ('The Sick Muse' - Walter Martin, 'রুগ্ন কবিতা' - বুদ্ধদেব বসু) - কবিতায় নিয়ে এসে নতুন কাব্যবোধের পরিচয় রাখলেন। বোদলেয়ার পাঠককুলকে জানাচ্ছেন, রোম্যান্টিক কাব্যের যুগবসান হয়ে গেছে। নতুন কাব্যবোধের জন্ম হয়েছে। এই কবিতা ব্যাধি জর্জরিত, তার চক্ষু কোটরাগত - মূঢ়, মূক। তার চোখে মুখে আতঙ্কের হিমেল হাওয়া। দানবের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিবিক্ত লালসা - নতুন কবিতা শরীরে। এমনই আধুনিক কবিতা। কবি ফিরে যান অতীতের ধূসর গ্রীক পুরাণের জগতে। কবির অন্তর স্পর্শ করে দূর অতীতের সঙ্গীত মূর্ছনা। স্মৃতি কাতর কবি ফীবাসকে স্মরণ করেন। তেমনি কবিতায় ফিরে ফিরে আসে গ্রীক পুরাণের আরেক দেবতা প্যান (Pan)।

প্যান (Pan)- গ্রীক পুরাণে সুখী দেবতা। তাঁর জন্মভূমি গ্রাম্য আর্কাডিয়ায়। তিনি ক্ষেতের দেবতা, শস্যের দেবতা, প্রকৃতির দেবতা এবং পাহাড় সংলগ্ন অরণ্যের দেবতা। তিনি যৌনতা, উর্বরতা ও বসন্ত ঋতুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই দেবতা প্রতীক চিহ্নিত, তা হল বাঁশি - এই বাঁশি ফাঁপা নল দিয়ে তৈরি, যাকে 'প্যান বাঁশি' বলা হয়। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন -

> "Pan lives the same kind of life as the herdsmen whom he protects. He rises before dawn and loves pastures and forests. … he also protects wild animals and keeps bees. Pan loves music and dancing and plays … Pan knows the art of prophecy."[১৩]

শিল্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন প্যান। বোদলেয়ার লিখলেন -

> "Phoebus, et le grand Pan, Le seigneur des moissons."[১৪]

ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটি ইংরেজিতে কাব্যানুবাদ করলেন 'The Sick Muse' - শিরোনামে। লিখলেন -

> "As when the Lord of Song, the God of Grain
> Shared long ago a strong and fruitful reign."[১৫]

কবি বুদ্ধদেব তাঁর 'রুগ্ন কবিতা' -য় লিখলেন -

> "ফীবাস, গানের পিতা, আর প্যান, শস্যের সম্রাট।"[১৬]

আধুনিক কবিতার শূন্য চোখের শূন্য দৃষ্টি, অপ্রকৃতিস্থ রূপ ও শীতল আতঙ্কের জলছবি এঁকেছেন বোদলেয়ার। রোম্যান্টিক ও আধুনিক - এই দুই বিসংগত দ্বন্দ্ব মুখরতাকে সৃষ্টিশীল মিথের সাংকেতিকতায় কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি। গ্রীক ও রোমক যুগের মিথকে অবলম্বন করে বিচ্ছিন্ন বেদনা ও বাস্তবতাকে বিশেষভাবে সময়লগ্ন করলেন বোদলেয়ার।

ক্যারন (Charon) - গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত নদী পারাপারের মাঝি দেবতা। এক অর্থে তিনি মৃতদের ফেরিওয়ালা। তিনি মৃতদের আত্মাকে অ্যাকেরণ ও স্টাইক্স নদী পেরিয়ে পাতালে নিয়ে যান। অন্ধকারের দেবতা এরেবাস (Erebus) এবং রাতের দেবী নাইক্স (Nyx) এর সন্তান তিনি। ক্যারন কুৎসিত কদর্য বৃদ্ধের মতো। তিনি নাক আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং ছেঁড়া ফাটা জীর্ণ পোষাক পরেন। তাঁর জ্বলন্ত চোখ এবং কঙ্কাল সদৃশ মুখের কারণে তাঁকে রাক্ষসের মত মনে হয়।

প্রাচীন গ্রীসে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কালে মৃত ব্যক্তির মুখের মধ্যে অথবা শ্মশানের পাশে কম মূল্যের মুদ্রা রাখা হত। এটি ক্যারনের ওবেল (Charon's Obols) নামে পরিচিত। মুদ্রাগুলি আত্মার যাত্রাকালীন ভ্রমণ পথের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। যে সমস্ত মৃত ব্যক্তি বা তার স্বজনেরা পারিশ্রমিক দিতে পারতেন না, অথবা যাদের কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না, তাদের নদী পারাপারের অনুমতি নিতে হত। তার জন্য তাদের একশ বছর নদীতীরে ঘুরে বেড়াতে হত। অবশ্য ক্যারন পাতালের মধ্যে থেকেও মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন। গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত আছে মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যারন নদীতে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করতেন - "Charon waited with his boat."[১৭]

বোদলেয়ার বিবেকবর্জিত লম্পট কিংবদন্তি ডন জুয়ানকে নরকে নিয়ে গেছেন তাঁর 'Don Juan aux Enfers' - কবিতায়। পাতাল অভিমুখী সেই নরক। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটি ইংরেজি পদ্যানুবাদ করেছেন 'Don Juan in the Underworld' - শিরোনামে। সমগ্র কবিতাটি গ্রীক পুরাণে বর্ণিত নরকের পটভূমিতে গড়ে ওঠা কবিভাষ্য। ডন জুয়ান স্প্যানিশ ও ইতালীয় লিজেণ্ড। কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতায় বর্ণিত নরক গ্রীক পুরাণ থেকে গৃহীত। ভারতীয় হিন্দু পুরাণের 'রৌরব' বা 'বৈতরণী'র সঙ্গে এর সামান্য সাদৃশ্য মাত্র রয়েছে। দুষ্ট ডন জুয়ান বিভিন্ন বয়সের রমণীদের প্রলুব্ধ করতেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাধা পেলে অপ্রাপ্তি জনিত কারণে কন্যার পিতাকেও হত্যা করতে পিছপা হতেন না। এরকমই কোন কন্যার মৃত সেনাপতি - পিতা আমন্ত্রণ রক্ষার আছিলায় ডন জুয়ানকে জোর পূর্বক টেনে - হিঁজড়ে পাতাল প্রদেশের নরকে নিয়ে যায়। সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন ক্যারন। ওয়াল্টার মার্টিন তাঁর ইংরেজিতে অনূদিত কবিতায় লিখলেন -

> "When Juan went down below and paid the fee...
> To Charon for his passage from the shore."[১৮]

বুদ্ধদেব তাঁর 'নরকে ডন জুয়ান' ('Don Juan aux Enfers') কবিতায় চরণ দুটির অনুবাদ করলেন -

> "যেদিন ডন জুয়ান, কারনেরে কড়ি গুনে দিতে
> নেমে এলো পাতালসলিলে।"[১৯]

নৌকা পারাপারের মুদ্রা, পারানির 'কড়ি' প্রভৃতি প্রাচীন মানব সমাজে মৃত্যু-সংকেতকে দেশ কালের ব্যবধান, সংস্কারগত পার্থক্য সত্ত্বেও একটা সার্বজনীন রূপের সন্ধান দিয়েছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, আত্মা সম্পর্কে মানব মনের ধারণায়ও কোন না কোন মিল রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক জাতি কিংবা ভারতীয় জাতি কেউ কাউকে বলে কয়ে কিছু করেননি। ব্যাস-বাল্মীকি কিংবা হোমার প্রভৃতি কবিরাও নিজেদের মধ্যে বলা-কওয়া করে কিছু লেখেননি, তাঁদের রচনায় স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয় থাকলেও মানব মনের একটা ঐক্য বিদ্যমান থেকে গেছে। ক্যারনের নদী পারাপার সম্পর্কে 'মিথোলজি' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "The only way to cross the stream was by ferry. The ferryman Charon, a dishevelled figure, arbitrarily selected those spirits he would carry across and those who had to wait. The fare was an obol a small coin."[২০]

কবিতায় বোদলেয়ার এছাড়া যে সমস্ত মিথিক চরিত্রগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি যথাক্রমে- আন্তিস্থিনীস (Antisthenes), সাগানারেল্লে (Saganarelle), ডন লুইস (Don Luis), এলভিরা (Elvira) প্রভৃতি।

মিথ এবং সাহিত্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। মিথ বহুলাংশে সাহিত্য শিল্পের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করে। কবি শিল্পীরা মিথ অবলম্বনে কবিতার বিনির্মাণ ঘটান। মিথ চরিত্র এবং প্লটের মধ্য দিয়ে কবিতাকে ব্যঞ্জিত করে। কবি বোদলেয়ার তাঁর 'La Muse Malade', 'Don Juan Aux Enfers' প্রভৃতি আলোচিত কবিতায় গ্রীক মিথের মধ্য দিয়ে ইতিহাস ও কিংবদন্তির পুনর্নির্মাণ করেছেন।

।। তিন।।

মিথ - কাহিনীকে প্রতীক এবং মোটিফের মধ্য দিয়ে কবিতায় ব্যবহার করে বোদলেয়ার ধীমান পাঠকের কাছে স্বচ্ছন্দে উপস্থাপিত করেন। ঐতিহ্যের সংরক্ষণ কবিতার বড় দিক। বড় মানব সভ্যতার অলিখিত কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে কবি বোদলেয়ার লিখেছেন আধুনিক কাব্যের শতকিয়া। ফিঙ্কসের মিথ কবিতায় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি ক্লেদাক্ত সভ্যতার অবক্ষয়ী রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি তাঁর 'La Beaute', 'Avec ses vetements Ondoyants Et Nacres', 'Les chats', 'Spleen' - প্রভৃতি কবিতায় ফিঙ্কস মিথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন।

ফিঙ্কস (Sphinx) - গ্রীক পুরাণ অনুসারে ফিঙ্কস নির্দয়, বিশ্বাসঘাতক একটি প্রাণী। যার মাথা একজন নারীর, দেহ সিংহের এবং ডানা ঈগলের। কোন ব্যক্তি যে বা যারা ফিঙ্কসের মুখোমুখি হতেন, তিনি তাদের একটি ধাঁধার উত্তর দিতে বলতেন। যারা ধাঁধাটি সমাধান করতে পারতেন না, তিনি তাদের হত্যা করে খেয়ে ফেলতেন। গ্রীক পুরাণে ফিঙ্কস ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের অনন্য রাক্ষসী। মিশরীয় পুরাণে অবশ্য ফিঙ্কসকে পুরুষ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মিশরীয়দের কাহিনীতে ফিঙ্কসের পাখিদের মত ডানা নেই। এমন বিসদৃশ শারীরিক গঠনের মধ্যে পুরুষ্টু যুবতীর মত ফিঙ্কসের স্থূল স্তনের চিত্রমূর্তি পাওয়া যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোদলেয়ার তাঁর 'Les Fleurs Du Mal' কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় ফিঙ্কসের উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে 'La Beaute' (Beauty, সৌন্দর্য), Avec ses Vetements ondoyants et nacr´es (In glistening shot - silk, স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে), Les Chats (Cats - বিড়ালেরা), Spleen (J'ai plus de souvenirs Que si j'avais mille ans' Black Bile - বিতৃষ্ণা) প্রভৃতি কবিতা। কবিতায় ফিঙ্কসের মত একটি ভয়ঙ্কর বা নিষিদ্ধ মিথের একাধিকবার উল্লেখে কবির কাব্য মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি অনেকখানি অনুধাবন করা যায়। এমন মিথ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বোদলেয়ার তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৯০ এর দশকের অবক্ষয়ী ধারণার সঙ্গে যুক্ত ইউরোপীয় আন্দোলনের ভূমিকা যেন আগে থেকেই লিখে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর কবিতাগুলিতে ফিঙ্কস মিথের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন। ফিঙ্কসের মোটিফ ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতীক। এরকম একটি বিচিত্র হিংস্র প্রাণী মনন বিযুক্ত কদাকার পুরুষদের প্রলুব্ধ করে। ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পে ফিঙ্কসের নানা চিত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃতির অবক্ষয় ও সামাজিক বিকৃতিকে কবিতার মোটিফ রূপে ব্যবহার করে কবি রোম্যান্টিক কবিদের সৌন্দর্য চেতনাকে শেকড়শুদ্ধ উৎপাটিত করলেন।

সকল বড় কবিই কবিতার সৌন্দর্য নির্মাণে রত থাকেন। বোদলেয়ারও তাঁর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু কবির সৌন্দর্য অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার। প্রাচীন পৌরাণিক নরমাংস ভক্ষণকারী জীব ফিঙ্কসের স্থূল স্তন যা যৌনতা উদ্রেক করে, যা বিকৃত, যা হত্যার মত পাপ থেকে উৎসারিত, তা থেকেই কবি সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস নিলেন। মিশরীয় মিথে ফিঙ্কসের কাজ ছিল অশুভ শক্তিকে দমন করা।

গ্রীক ও মিশর উভয়দেশেই মন্দিরের প্রবেশ পথে ফিঙ্কস মূর্তির স্থাপত্য নির্মাণ করা হত। এছাড়া দেওয়াল গাত্রেও ফিঙ্কসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হত। প্রেম ও যৌনতার বিকৃত পথ, যা সর্বনাশের নির্দেশ্য অশনি সংকেত বহন করে তা থেকেই কবি নির্মাণ করেন কবিতা - সৌন্দর্যের হর্ম্য নিকেতন। প্রাচীন গ্রীক মিথ রাক্ষসীরূপী ফিঙ্কস মূর্তির সঙ্গে বর্তমানের অবক্ষয়ী নগর সভ্যতার দূরতর সংযোগ ঘটিয়েছেন কবি। মিথের বহমান তাৎপর্যকে বর্তমানের আধুনিক যুগমানসের সঙ্গে মেলবন্ধনের পাশাপাশি চিরন্তন সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন কবি। কিন্তু এ সৌন্দর্য রোম্যান্টিক শীলিত সৃষ্টির বিপরীতে। ঐতিহ্য - অনুশাসন ও আধুনিক সৃষ্টির মধ্যে যে আপাত দৃষ্টিগত বিরোধাভাস রয়েছে, কবি তাকে মিলিয়েছেন তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদর্শী কাব্যধর্মী মেজাজে। সৃষ্টি হয়েছে কবিতার অভিনব সৌন্দর্য। বোদলেয়ার তাঁর 'La Beaute' কবিতায় লিখলেন -

"Je suis belle, O mortels! Comme un reve de pierre,
Je trone dans l'azur comme un sphinx incompris."[২১]

ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি পদ্যানুবাদে (Beauty) -

"I have the cold and hard perfection of
A dream. My breast, where mortal men expire,
... ...
Dispassionate? aloof and motionless,
A solemn sphinx, preeminent in space."[২২]

কবি বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে -

"মরগণ, আমি যে সুন্দর! যেন পাষাণে স্বপ্নিত,
এই স্তন, সকলেরই ঘুরে - ঘুরে সর্বনাশ যাতে
তা পারে কবির চিত্তে সে-প্রেমের সংক্রাম জোগাতে
দুর্বোধ স্ফিঙ্কসের মতো,..."[২৩]

কবির কবিতায় সুন্দর হল স্বপ্নের পাষাণ। রমণীর স্তন কবির হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে, সর্বনাশের আগুনে পুড়িয়ে দেয়। কবির চিরন্তন প্রেরণাশক্তি যা, তা হচ্ছে মূক নির্জীব জড় পদার্থের মত। আকাশের সুউচ্চ নীলে আসীন, দুর্বোধ ফিঙ্কসের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মত। কবিতার সৌন্দর্য নিয়ে কবি কোন কূট তর্ক করেন না। কিন্তু পাষাণগাত্রেই ফুটে উঠে কবির কবিতার সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের এমন বৈপরীত্যবোধক মেধাবী অন্বেষণের স্রষ্টা হচ্ছেন বোদলেয়ার।

ঢেউ তুলে যান শ্রীমতী তিনি। হরিণী নয়না সে নারী। চক্ষুদ্বয় মার্জিত সুন্দর। চোখ তার প্রকৃতির সংকেতের মত। গ্রীক মিথের প্রাচীন ফিঙ্কস ও দেবদূতকে একই বন্ধনীতে রেখে পবিত্র করে তুললেন কবি। বোদলেয়ার মূল ফরাসিতে লিখলেন -

"Avec ses vetements ondoyants et nacres
… … …
Ou lange inviole se mele au sphinx antique."[২৪]

ওয়াল্টার মার্টিন ইংরেজিতে কবিতাটি কাব্যানুবাদ করলেন 'In glistening shot silk' শিরোনামে। লিখলেন -

"In glistening shot silk sheseems to wind,
United with a sphinx on some dead star."[২৫]

বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করলেন ('স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে…') -

"স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে চলে শ্রীমতী -
রূপক-রঙ্গ খেলা করে অদ্ভুত,
মিল খুঁজে পায় স্ফিঙ্কস আর দেবদূত।"[২৬]

সোনা হিরে - এগুলি তো ব্যর্থ নক্ষত্রের মত চিরকাল জ্বলতে থাকে। নিস্তাপ বন্ধ্যা নারীর হিম নিষিক্ত উদাসীনতাকে ফিঙ্কস মিথের মধ্য দিয়ে প্রেম-অপ্রেম, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সুতোয় গেঁথে আধুনিক কবিতার নন্দনকাননে প্রবেশের পথ উন্মোচিত করে তুললেন কবি বোদলেয়ার।

বোদলেয়ার বিড়ালকে কেন্দ্র করে তিনটি কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে 'Les Chats' (বিড়ালেরা) শিরোনামের কবিতাটিতে গ্রীক মিথ ফিঙ্কসের উল্লেখ এসেছে। কবির কবিতায় বিড়াল শীর্ণ কঠিন পণ্ডিত ও উগ্র প্রেমিক। শীত-শীতলতা ও একাকিত্ব বোধের বিশিষ্টতার কারণে প্রাণীজগতে বিড়াল অনন্য। বোদলেয়ার বিড়ালের অন্ধকার প্রীতির জন্য তাকে নরকের আবহ - সংলগ্নতায় কবিতার চালচিত্রের সঙ্গে মানানসই করেছেন। গ্রীক পুরাণের ফিঙ্কস এবং এরেবাস (Erebus) - এর মধ্য দিয়ে অন্ধকার ও বিষণ্ণতার রূপকে স্পষ্ট করেছেন। আধুনিক সময় গ্রীক পুরাণের নরক বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের মত। ওয়াল্টার মার্টিন 'Les Chats' - কবিতার ইংরেজি পদ্যানুবাদ করলেন 'Cats' শিরোনামে। লিখলেন-

"Bemused, their attitudes evoke the style
Of sphinxes lost in thought beside the Nile,
Absorbed into a dream that never ends."[২৭]

ফিঙ্কসের সঙ্গে তুলনায় কবিতায় অন্ধকার জগত প্রসারিত হল নির্লিপ্তভাবে। বুদ্ধদেব অনুবাদ করলেন -

"স্ফিঙ্কসের মতো নির্জনতার অঙ্কে লীন,
আলসে এলিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে সে অন্তহীন
ভাবের আবেশে মগ্ন মহান ভঙ্গিমায়।"[২৮]

কবিতায় উঠে এসেছে স্তব্ধ ভীষণ অন্ধকার। এই অন্ধকার বৈনাশিক সমসময়ের প্রত্যয়। বিড়াল হয়ে উঠল সেই অন্ধকারের প্রতীকরূপ। বিড়াল অন্ধকার এবং মৃত্যুর প্রতীক। অন্ধকার জগতের সঙ্গেই তার ঘোরাফেরা। 'Dictionary of Symbols' - গ্রন্থে Jean Chevalier এবং Alain Gheerbrant বিড়াল সম্পর্কে লিখেছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "Many traditions hold black cats to be symbols of darkness and of death. Cats are sometimes viewed as servants of the Underworld"[২৯]

বোদলেয়ার কবিতায় বিড়ালের অন্ধকার প্রিয়তাকে চিহ্নিত করতে পুরাতনী গ্রীক মিথ এরেবাস এবং ফিঙ্কসের পর্যায়ক্রমিক অন্ধকারের মাত্রাবোধকে ঝাঁকুনি দিয়ে কবিতাকে শক্ত ভূমির উপর দাঁড় করালেন।

আধুনিক মানুষ বিষণ্ণ, বিতৃষ্ণ। সংশয় এবং উদ্বেগ তাঁর সহযাত্রিক। বিতৃষ্ণা আধুনিক সচেতন মানুষের কোষে কোষে কুটিল জীবাণুর মত বংশবৃদ্ধি করেছে পরম নির্ভয়ে। শিলাখণ্ডে ভাস্কর মূর্তির অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী ফিঙ্কস, নামহীন ত্রাস। সৎকারহীন মৃতদেহে কৃমিরা বাসা বাঁধে। কৃমিকীটেরা পচনশীল মৃতদেহকে খুঁটে খুঁটে খায়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা দিনের বিষণ্ণতা বহন করেছে আধুনিক মানুষ।

বৎসরের পর বৎসর ধরে হিম তুষারাবৃত মন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। কবিতায় পুরাতনী কালের ফিঙ্কস ঘুরে ফিরে আসে স্বমহিমায়। বোদলেয়ার তাঁর 'Spleen' ('J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans') - কবিতায় জানালেন হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, যা কবিকে উপহার দিয়েছে বিষণ্ণ স্মৃতি। যা পুরাতনী ফিঙ্কসের মত নির্মম। কবিতায় কবি অন্তহীন বিতৃষ্ণাকে চারিত করলেন আধুনিক সচেতন মানুষের কোষে কোষে। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'Black Bile' শিরোনামে। লিখেছেন -

"Millenium of memories, All mine …
… … …
A timeless, sleeping sphinx engulfed in sand,
Ignored by everyman, in no man's land."[৩০]

জনশূন্য অনাবাদী ভূমি। বিবর্ণ ও উপেক্ষিত। সে পতিত ভূমি মানচিত্রে স্থানাঙ্ক চিহ্নিত নয়। বেওয়ারিশ, অনধিকৃত এই পোড়ো জমি। কবি বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির অনুবাদ করলেন 'বিতৃষ্ণা' (Spleen) শিরোনামে। লিখলেন -

"হাজার বছর যেন বেঁচে আছি, এত স্মৃতি জমেছে আমার।
... তোর স্বরূপ নিশ্চিত
শুধু এক শিলাখণ্ড, নামহীন ত্রাসে পরিবৃত,
পুরাতন স্ফিঙ্কস এক, সাহারার অস্পষ্ট অকূলে
তন্দ্রায় বিলীন, তাকে উদাসীন বিশ্ব রয় ভুলে,
মানচিত্রে নাম নেই।"[৩১]

এখানে বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তির কিম্ভূতকিমাকার রূপ কবি বোদলেয়ার আধুনিক পাঠককে উপহার দিলেন। এমন বিশুষ্ক বালুকাভূমির উপরেই সৃষ্টির সৌন্দর্য স্তম্ভ গড়ে তুললেন কবি। গ্রীক পুরাণের পুরাতনী ফিঙ্কস, রৌদ্রদগ্ধ জনমানব শূন্য সাহারা বোদলেয়ারের কবিতার নব পাঠমালা হয়ে উঠল। আধুনিক কালের বোধবুদ্ধিহীন মানুষকে তীক্ষ্ণ ধাঁধায় জর্জরিত করে নারকীয় কুৎসিত রাক্ষসী ফিঙ্কস ভক্ষণ করেন। গ্রীক পুরাণে ফিঙ্কস (Sphinx) সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> "The Sphinx, which had the head of a woman and the body of a Loin, preyed viciously on the inhabitants of Thebes, similarly the Nemean Lion was reputed to harass and attack the hapless people of the town of Nemea."[৩২]

ফিঙ্কসের নবনির্মাণ ঘটল বোদলেয়ারের 'Les Fleurs Du Mal' কাব্যের অনেক কবিতায়। অবক্ষয়িত শহুরে সভ্যতার ব্যাধি জর্জর রূপ কবি সন্ধান করেছেন বহু পুরাতনী মানব কল্পনার অবিস্মরণীয় মিথের মধ্যে। এমন মিথের প্রয়োগ কবির কলমে যুগচৈতন্যকে প্রকাশ করেছে। বিপুল সাহসিকতায় কবি আধুনিক কাব্যের মুক্তিদূত হয়ে উঠলেন এবং তা তাঁর নিজের কবিতাকে বাহন করে।

।। চার।।

কবি বোদলেয়ার। সময়, রঙ, আকাশ-নক্ষত্র-নদী এবং অন্ধকারকে আপন অনুভূতির পেলবতায় গ্রীক মিথের সৌকার্যে কবিতায় অনন্য করে তুলেছেন। অন্ধকারের রূপকে তুলে এনেছেন বিড়ালের অন্ধকার প্রিয়তার সঙ্গে। অবশ্যই গ্রীক মিথ এরেবাস অন্ধকার চেতনার দ্যোতনা জাগায়। এভাবেই 'Les Chats', 'Les Bijoux', 'R´eversibilite' প্রভৃতি কবিতায় গ্রীসীয় মিথিক চরিত্রগুলিকে প্রতীক সংকেতের দ্যোতনায় সৃষ্টিশীল করেছেন।

এরেবাস বা এরেবস (Erebus) - গ্রীক পুরাণে এরেবাস হল অন্ধকারের রূপ। এরেবাসের অর্থ অন্ধকার, আদিম অন্ধকার বা বিষণ্ণতা। এরেবাস পাতালপুরীরও অর্থ নির্দেশক - আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্ধকার, অন্ধকারের বলয় - ঘনীভূত অন্ধকার। C. Scott Littleton - সম্পাদিত 'Mythology' গ্রন্থে বলা হয়েছে - "Erebus, the gloom of Tartarus"[৩৩] - নরকের বিষণ্ণতা। মৃত্যুপুরী বা নরকের অধিবাসী হেডিস (Hades) হলেন পাতালের রাজা, মৃতদের দেবতা। গ্রীকরা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে চলতেন, তাঁকে নিয়ে চিন্তা করতেন না। পক্ষান্তরে এরেবাস পাতালের গভীর অতল গহ্বর। দুষ্টদের জন্য যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার অন্ধকূপ বা অন্ধকার কারাকক্ষ, Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন - "Erebus is the darkness below the depths of Hades."[৩৪]

বোদলেয়ার তাঁর 'Les Chats' - কবিতায় অন্ধকারের দ্যোতনা বোঝাতে বিড়াল প্রতীকটিকে গ্রহণ করেছেন। অন্ধকারের জমজমাট রূপ ফুটিয়ে তুলতে কবি গ্রীক পুরাণের 'এরেবাস' (Erebus) - এর অনুষঙ্গে কবিতাটিকে শিল্পমূল্যে উত্তীর্ণ করেছেন। কবি লিখেছেন -

> "L' Ere'be les eut pris pour ses coursiers fune`bres,
> S'ils pouvaient au servage incliner leur fiert´e."[৩৫]

নির্জন অন্ধকারের বাসিন্দা এই বিড়াল প্রাণীটির অন্ধকার প্রিয়তাকে ছাপিয়ে যেতে পারে গ্রীক পুরাণের অন্ধকারের প্রতিকৃতি দেবতা এরেবাস। বুদ্ধদেব বসু 'Les Chats' - কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'বিড়ালেরা' শিরোনামে। লিখেছেন-

> "খোঁজে সে বিজন, স্তব্ধ ভীষণ অন্ধকার;
> শবযাত্রায় অশ্ব হ'তো সে চমৎকার
> এরেবস তার গর্ব ভাঙতে পারতো যদি!"[৩৬]

প্রাচীন মানুষের স্বপ্ন-কল্পনার সারাৎসার, জীবন-মৃত্যুর বোধলোকের বিপর্যাস ঘটিয়ে মিথের মধ্য দিয়ে চমৎকার কাব্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কবি। বর্তমান মানুষের বিষণ্ণতা, নির্জনতা ও অন্ধকারের প্রতীকী রূপ হয়ে রইল 'বিড়াল' কবিতাটি। ছোট এই কবিতাটি কবির কাব্যোৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করল।

আন্তিওপি (Antiope) - গ্রীক পুরাণে অ্যান্টিওপি ছিলেন নদীদেবতা অ্যাসোপাস (Asopus) - এর কন্যা। তিনি অ্যাম্ফিয়ন (Amphion) এবং জেথাসের (Zethus) - এর মাতা। আন্তিওপির সৌন্দর্য জিউসকে (Zeus) আকৃষ্ট করে। জিউস স্যাটারের রূপ ধারণ করে তাকে ধর্ষণ করেন। এটিই গ্রীক পুরাণের একমাত্র কাহিনী যেখানে জিউস একজন স্যাটারে পরিণত হয়েছেন। পরিশেষে আন্তিওপি হয়ে উঠলেন জিউসের প্রেমিকা। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> "Antiope, daughter of Nycteus, regent of Thebes, or, according to some, of the River Asopus, was very beautiful and Zeus made her his love."[৩৭]

অলংকার কবির প্রেয়সীকে দ্যুতিময় করে তোলে। স্বর্গ থেকে নেমে আসেন রূপসী আন্তিওপি। নিতম্বে তাঁর সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলে। স্বর্গের বিদ্যাধরীর মতো মনোরম স্নিগ্ধতা তাঁর শরীরের কোনাচে কোনাচে ঢেউ তোলে। কিন্তু মুহূর্তে বোদলেয়ারীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের সাধারণ নিয়মে স্বর্গীয় লাবণ্যের দীপ্তি মুমূর্ষ প্রদীপের শিখার মত ধীরে ধীরে নিভে যায়। জেগে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকে ঘন অন্ধকার। পবিত্র পুণ্যতোয়া গঙ্গা যেমন দূষণে দূষণে পঙ্কিল হয়ে ওঠে, তেমনি আন্তিওপির সৌন্দর্যও মলিন হতে থাকে। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির পদ্যানুবাদ করলেন 'Jewels' শিরোনামে। লিখলেন -

"Enchanting as a goddess, or a sphinx,
Though slender as a boy, Painted lips,
… … …
Slowly the lamp gave up, resigned to die."[৩৮]

কবি সৌন্দর্যচক্রের এই কবিতাটিতেও রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের স্থলে প্রেমের নৈরাশ্য, হতাশা এবং প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়ার উদ্ভাসকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। গ্রীসীয় মিথকে ভেঙে চুরে নতুন আঙ্গিকে তাঁর কবিতাশিল্পে প্রতিস্থাপিত করলেন কবি। কবি বুদ্ধদেব কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'অলংকার' ('Les Bijoux') শিরোনামে -

"নিতম্বে সে আন্তিওপি, ক্ষীণ স্কন্ধে তরুণ বালক,
মিশে যায় বিপরীত; আর তার রোমহর্ষ ত্বক
বাদামি, মসৃণ, স্নিগ্ধ - মনে হয় স্বর্গের সম্ভার।
নিবে গেলো মুমূর্ষ বাতির শিখা।"[৩৯]

আধুনিক মানুষ বিষণ্ণ - কারণ চেতনার উজ্জীবনহীনতা। সামাজিক নৈরাশ্যের অন্ধকার ভর করে আছে সর্বত্রই। বিষণ্ণ আঁধার শুধু নগরে প্রান্তরে। জ্ঞান নেই - তাই কোথাও কোন প্রেম নেই। বাস্তবের অন্ধকারাচ্ছন্ন চোরাগলিতে মুখ থুবড়ে পড়ল রোম্যান্টিক শিল্প সৌন্দর্য।

ডেভিড (David) - বোদলেয়ার তাঁর 'R´eversibilit´e' - কবিতায় ডেভিডের (জন্ম - ৭ নভেম্বর, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন। ডেভিড সম্রাট হেরক্লিয়াসের পুত্র। ডেভিডের জীবন সুখকর ছিল না। ডেভিড বাইজেনটিয়াম সাম্রাজ্য - এর রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। বিদ্রোহজনিত কারণে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁর মাতা মার্টিনার জিহ্বা কেটে নিয়েছিলেন। এবং ডেভিডসহ তাঁর ভ্রাতাদের নাসাচ্ছেদন করে তাদের নির্বাসিত করেছিলেন। অবশ্য পরে বাকি জীবন তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই কাটিয়েছিলেন। ইতিহাস অনুসারে ৬৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর মধ্যেই ডেভিডকে সহ-সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। যা ছিল তাঁর শৈশব ও কৈশোর অবস্থা। সম্ভবত ৬৪২ সালে একটি বিদ্রোহের মাধ্যমে তাঁর মাতা এবং তাঁর পরিবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। ডেভিড নামটি বাইবেলের ডেভিডের সঙ্গে সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টা বলে মনে করা হয়। ইতিহাস, কিংবদন্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই কাহিনী গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় মিথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাস এবং পুরাণের সংশ্লেষ ঘটেছে এখানে। ডেভিড (David) - এর অর্থ প্রিয়তম। সুন্দর এই নামটি অনেকে পছন্দ করেন। শিশুদের নামকরণও করেন কখনো কখনো। পঞ্চম স্তবকে সম্পূর্ণ আলোচ্য কবিতাটিতে ফরাসি 'Ange' (Angel অর্থাৎ দেবদূত) শব্দটি দিয়ে প্রতিটি স্তবকের প্রথম চরণটি শুরু হয়েছে। শব্দটির অর্থ স্বর্গীয় দূত, পরী কিংবা নিষ্পাপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে 'আনন্দময়ী', 'দয়াময়ী', 'স্বাস্থ্যবতী', 'লাবণ্যময়ী' ও 'কল্যাণী' শব্দ সম্বোধনে স্বর্গীয় দেবীর নিকট কবি যন্ত্রণা রিক্ত মর্মস্পর্শী বেদনা জানাচ্ছেন। শতাব্দী সঞ্চিত ব্যাধি, লজ্জা, কান্না, নির্বেদ, ত্রাস, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আক্রোশের বীভৎস রূপ কেমন? - কল্যাণী তা অনুসন্ধান করেন না। কবি যখন তাঁর কবিতায় সুনির্বাচিত মিথ প্রয়োগ করেন, তখন বোঝা যায় কবির স্বভাব ও কবি প্রকৃতির যথার্থ অভিমুখটি। কবির মানসস্বাস্থ্য অনুসন্ধানের মৌল ক্ষেত্র কবিতায় কবির ব্যবহৃত নিজস্ব মিথ। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ডেভিড যদি কল্যাণীর কোমল করস্পর্শের পবিত্র অনুভূতির আলতো ছোঁয়া পেতেন, তবে আমাদের নিষ্করুণ শুষ্ক জীবন আনন্দের আলোকে দীপ্ত হতে পারত।

ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির ইংরেজি পদ্যানুবাদ করলেন 'Reversibility' শিরোনামে। লিখলেন -

"Angel of happiness, goodness and light,
King David on his death - bed would have been

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Enchanted to receive you as his Queen."[৪০]

সেই সুদূর অতীতের রাষ্ট্র বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ সময়ে বাইজেনটিয়াম সাম্রাজ্যের শাসকদের শাসনকালে বালক সম্রাট ডেভিডের যন্ত্রণাদায়ক বিষণ্ণ মৃত্যুর ক্ষণকে চিত্রিত করলেন কবি। কবিতায় আবহমান কালের ব্যাধি, বিষণ্ণতা ও নির্বাসিত পাংশুতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন বোদলেয়ার। মৃত্যুমুখী বালক ডেভিড মৃত্যুকালে যদি প্রসন্ন কল্যাণী হস্তের স্পর্শলাভ করতেন, তবে কবি তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব করতে পারতেন। একালেও ফুটো ম্লান হাসপাতালের দেওয়ালে মাথা খুঁড়লেও কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই, অন্তত নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য। এই আমাদের আজকের বাস্তব পৃথিবী। প্রবাসী রোদ্দুর। শহুরে সভ্যতায় ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের জন্য রোদ বড্ড কৃপণ। ভিক্ষেও মেলে না। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির অনুবাদ করেছেন বৈপরীত্য শিরোনামে। লিখেছেন -

"জ্বর, হিম, ঘাম, নির্বাসনের পাংশুতায়
হুঁচটে কাঁপনে ভ'রে দেয় ম্লান হাসপাতাল,
অক্ষম ঠোঁটে কৃপণ রোদের ভিক্ষা চায়?
… … …
কল্যাণী তুমি, আলোকে পুলকে পুণ্যপ্রাণ !
মরণের ক্ষণে ডেভিডের হ'তো সান্ত্বনা
তোমার দেহের নিঃসরণের দীপ্ত দান।"[৪১]

।। পাঁচ ।।

কেবল ভাষার জন্য মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক হয়নি। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করেছে। মানুষ মানুষ হয়েছে তাঁর প্রেমের তপস্যার জন্য। মানুষ মানুষ হয়েছে তাঁর শিল্প সাধনার জন্য। ম্যাডোনা, ভেনাস, পমোনা - এসব মিথ সভ্যতার পরিশীলনের উচ্চতর স্তরের সাক্ষ্য বহন করে। বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় এসব মিথের অভিব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে বিতৃষ্ণ মনের পরিচয় যেমন রেখেছেন, ঠিক তেমনি তাঁর ক্লেদাক্ত মনের যন্ত্রণার উৎসার ঘটিয়েছেন।

ম্যাডোনা (Madonna) - মাতৃত্বের প্রতীক। বোদলেয়ার তাঁর 'Que diras-tu ce soir, pauvre ame solitaire' - কবিতায় ম্যাডোনার উল্লেখ করেছেন। ম্যাডোনা মাতা ও সন্তানের মধ্যে ভালোবাসার প্রতীক। গ্রীক মিথোলজি অনুসারে ম্যাডোনা হচ্ছেন, ইতালীয় রাভেনায় অবস্থিত ভার্জিন মেরির একটি বাইজেন্টাইন মার্বেল ভাস্কর্য। পরবর্তীকালে গ্রীক পুরাণের উক্ত ভাস্কর্যটিকে আধুনিক রূপ দিয়ে বিনির্মিত করা হয়েছে। ভাস্কর্যটি ইতালীয় রেঁনেসাঁ পর্বের শিল্পী জিওভান্নি বেলিনি (Giovanni Bellini, 1430-1516) একদশক (১৪৬০-৭০) ধরে নির্মাণ করেছিলেন। সৌন্দর্য, স্বর্গের গন্ধভার নিয়ে ঝরে ঝরে পড়ে। রোম্যান্টিক কবিরা সুন্দরের স্বপ্নিল আধ্যাত্মিক রূপ নির্মাণ করেন। সে বলে আমি সুন্দর, সুন্দরকে ভালোবাসো। আমি দেবদূত, আমি কর্ত্রী, ম্যাডোনা - সরস্বতী। স্বর্গ হতে ঝরে পড়া পুণ্য প্রভা পৃথিবীকে স্নিগ্ধ সুন্দর করে। কিন্তু কবির সুন্দরের পথ ভিন্নমুখী। কবির সুন্দর রাতের শান্ত নির্জনতায় দিশাহীন। ফুটপাতে জনতার নৃত্যের ভিড়ে পঙ্কিল। অবাস্তব স্বপ্নের কোলাহল, আগুনে কলঙ্ক চিহ্ন - মশালের এমন জ্যোতি। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'What will you say?' - শিরোনামে। লিখেছেন -

"Sometimes at night, inside my solitude,
Or in the street, surrounded by the crowd,
Her spirit beckons like a flame in air."[৪২]

অবশেষে বোদলেয়ার গর্বিত ম্যাডোনার অভিভাবিকা সুলভ আত্মকথন শোনালেন একালের পাঠককুলকে -

"Je suis I' ange gardien, la muse et la Madone."[৪৩]

বোদলেয়ারের কবিতায় সৌন্দর্যবোধের স্বরূপ বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রোম্যান্টিক কবিতার ধারাবাহিক স্রোতকে অবরুদ্ধ করে বিপরীতমুখী আধুনিক কাব্যের প্রবাদপুরুষ হয়ে উঠলেন কবি। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটি অনুবাদ করেছেন 'কোন কথা আজ বলবি রাতে' (Que diras-tu ce soir, pauvre ame solitaire) - শিরোনামে। কবি লিখেছেন -

"থাকি নিশীথের নির্জনতায় লুপ্ত,
চলি রাজপথে জনতায় প্রক্ষিপ্ত,
তার প্রতিভাস মশালের মতো ছড়ায় জ্যোতি;
'সুন্দর আমি', সে বলে, 'আমারই জন্য
শুধু সুন্দরে ভালোবেসে হবে ধন্য;
আমি দেবদূত, কর্ত্রী, ম্যাডোনা, সরস্বতী!"[৪৪]

সিথেরা (Cythera) বা ভেনাস (Venus) - এর উল্লেখ কবি বোদলেয়ার করেছেন তাঁর 'Un Voyage a Cythere' (সিথেরায় যাত্রা) - কবিতায়। সিথেরা একটি ছোট গ্রীক দ্বীপ। দ্বীপটি দেবী আফ্রোদিতির (Aphrodite) জন্মস্থান। তিনি সমুদ্র থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দ্বীপে একটি সমুদ্রের খোলের উপর আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই কারণে তাঁকে সাইথেরিয়া নামেও ডাকা হত। আফ্রোদিতি প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। C. Scott Littleton তাঁর 'Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> "Aphrodite, the goddess of love, marriage and beauty, personified not only romantic love but also sexual passion and her unearthly charm attracted both gods and mortals."[৪৫]

এছাড়া সিথেরা কামনা, আনন্দ, আবেগ, প্রজনন, যৌনতা এবং উর্বরতার দেবী। তিনি পতিতাদের পৃষ্ঠপোষক দেবীও ছিলেন। ঐ দ্বীপে অনেক শিলাখণ্ডের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। গ্রীক প্রবাদে যাকে 'The Greek's Rock' বা 'গ্রীক শিলা' বলা হয়। শিল্পকলায় সিথেরা সঙ্গম সুখের প্রতীক। ফরাসি চিত্রশিল্পী ওয়াতো (Watteau, 1684-1721) 'সিথেরায় তীর্থযাত্রা' (Pilgrimage to Cythera) বা 'সিথেরায় জন্য যাত্রা' (Embarkation for Cythera, 1717-1718) - শিরোনামাঙ্কিত এক ছবি এঁকেছিলেন। কবি বোদলেয়ার তাঁর 'Les Phares' (আলোকস্তম্ভ) - কবিতায় ওয়াতোর উক্ত শিল্পকে 'মদনোৎসব' বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রণয় জর্জর তরুণ-তরুণী রমণীয় পুষ্পশোভিত হ্রদবেষ্টিত অরণ্যে প্রমোদতরণী প্রস্তুত করেছেন, কামরাজ্য সিথেরায় দিকে যাত্রা করার জন্য। যেখানে আছে প্রস্তর নির্মিত আফ্রোদিতির মূর্তি। ঠিক রূপকথার নায়িকাদের মত হাসি। প্রেমের প্রমোদযানে সে যাত্রা। প্রমোদতরণী এগিয়ে চলেছে জলরাশির তট বরাবর। এগিয়ে চলছে তো চলছে। প্রমোদতরণী শিলাখণ্ডের কাছে আসতেই মনে হল কোন দেবমূর্তি দাঁড়িয়ে রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেখা গেল ভিন্ন ছবি। ফাঁসিকাঠ থেকে একটি মৃতদেহ ঝুলছে। এই দ্বীপে ভেনাসের কোন মূর্তি নেই। ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত মৃতদেহ একটি ভয়ঙ্কর বীভৎস রসের প্রতীকী চিত্ররূপ। কবিতাটিতে বিক্ষত, বিতৃষ্ণ, ও যন্ত্রণাক্ষত বোদলেয়ারীয় মানসভূমির চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত।

জ্যোৎস্না বিছিয়ে ভালোবাসা চেয়েছিল ঘর। কোথায় হারিয়ে গেল। তার বিশীর্ণ বিস্তার। রোম্যান্টিক কবিতায় আবিষ্ট পাঠককুল এমন পংক্তিতে শিউরে উঠবে নিশ্চয়ই। ঝুলন্ত মৃতদেহটিকে শবভুক পাখিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। গ্রীক-রোমক পুরাণে দেবী আফ্রোদিতিই হচ্ছেন দেবী ভেনাস (Venus)। রোমক ও ল্যাটিন শিল্প-সাহিত্যে ভেনাসকে নগ্ন রূপে চিত্রিত করা হয়। হিংস্র বেগে চঞ্চুঘাতে শকুনেরা ঝুলন্ত শবদেহ থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ভোগ করে রক্তমাখা শব। বোদলেয়ারীয় কুটিল পৈশাচিক নির্মম বাস্তবতা ছিঁড়ে কুটে ফেলে বাকি সব কবিদের মিথের একটি খুঁটির উপরে ভর করে আছে গোটা একটি বাস্তব পৃথিবী। রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের বিপরীত চিত্রকল্প। বোদলেয়ারীয় মর্মান্তিক শিল্প স্থাপনা। ওয়াল্টার মার্টিন ইংরেজিতে

অনুবাদ করলেন 'A Voyage to Cythera' - শিরোনামে। কবিতার শেষ স্তবকে পাঠককুলকে হাজির করলেন বীভৎস রসের বধ্যভূমিতে -

"Goddess of Love, your isle was noting but
An emblem with an image, torn apart…
O God of love, grant me the strength of heart
To contemplate my corpse without disgust!"[৮৬]

মূল ফরাসিতে বোদলেয়ার লিখলেন -

"Dans ton ile, O Venus! Je n'ai trouve debout."[৮৭]

প্রেম সৌন্দর্যের দেবী ভেনাসের বাসভূমি সেই দ্বীপ। সেখানে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলন্ত গলিত মৃতদেহটি একটি প্রতীক। কার প্রতীক? কবি বললেন 'সে আমারই'। বুদ্ধদেবের অনুবাদে কবিতাটির মিথিক নামকরণ অপরিবর্তিত - 'সিথেরায় যাত্রা'। কবি শেষ স্তবকে উপহার দিলেন বিতৃষ্ণ, ব্যথিয়ে ওঠা কাব্য পংক্তি। লিখলেন -

"ভেনাস, তোমার দ্বীপে শুধু এই প্রতীক প্রোথিত,
ফাঁসিকাষ্ঠে পচা মড়া - চিত্রকল্প ঝোলে সে আমারই।"[৮৮]

এলদোরাদো (El Dorado) - দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত কিংবদন্তির কথামালা দিয়ে ঘিরে থাকা একটি পৌরাণিক শহর। মিথকথা অনুযায়ী, এই শহরের রাজা এত ধনী ছিলেন যে, তিনি নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানে সোনার ধুলোয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেকে ঢেকে রাখতেন। তারপর পবিত্র হ্রদে স্নান করে তিনি সেই ধুলোরাশিকে ধুয়ে ফেলতেন। হারিয়ে যাওয়া শহরের কিংবদন্তি দূর ধূসর অতীতচারী পৌরাণিক রহস্যময়তার জন্ম দিয়েছে। ষোল-সতেরো শতকের দিকে ইউরোপীয়দের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দক্ষিণ আমেরিকার কোন একটা অংশে লুকিয়ে রয়েছে সোনায় মোড়ানো একটি শহর, যার নাম এলদোরাদো। এই শহরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনুসন্ধানে উৎসুক অভিযাত্রীরা ঘন বর্ষণ অঞ্চল বা রেইন ফরেস্ট (Rain Forest) ও তৎসংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল সমূহে ব্যর্থ অভিযান করেছিলেন। কিন্তু সোনার সন্ধান তারা পাননি। পৌরাণিক অভিমত অনুযায়ী এলদোরাদো প্রচুর সম্পদের অঞ্চল বলে কথিত। পৌরাণিক এই কাহিনীটিকে ইংরেজ কবি মিলটন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট' (Paradise Lost) কাব্যে উল্লেখ করেছেন। এলদোরাদো শব্দটির বর্তমানে অর্থ সংশ্লেষ হয়েছে। শব্দটিতে এমন কোন স্থানকে বোঝায়, যেখানে দ্রুত এবং সহজেই সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। কবি বোদলেয়ার তাঁর 'Les Fleurs du Mal' (ক্লেদজ কুসুম) কাব্যগ্রন্থের 'Un Voyage a Cythere' (সিথেরায় যাত্রা) - কবিতায় 'এলদোরাদো'-র উল্লেখ করেছেন। রূপকথার পক্ষ বিস্তার করা পৌরাণিক শহরের স্মৃতি আধুনিক সময়ের অভিঘাতে বড় ধূসর, ম্রিয়মান। বড় শ্রীহীন তাঁর রূপ। সেই সনাতনী বনতল, কিংবা পুরাতনী কপোতের কূজন কোথায় হারালো? দ্বীপে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলে আছে এক শব। আর শবভুক পাখিরা তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে গলিত শবদেহ থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে রক্ত-মাংস-মজ্জা। কবির কাব্যের আধুনিক ব্যাকরণ এমন চিত্রকল্প। পুরাতনী পৌরাণিক স্মৃতির শহরের এক বর্ণঘন বিপর্যাস ঘটিয়ে মহিমময় রোম্যান্টিক কবিতার অবশেষ ঘোষণা করলেন বোদলেয়ার। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির ইংরেজি কাব্যানুবাদ করেছেন 'A Voyage to Cythera' - শিরোনামে। কবিতায় লিখলেন -

"And what's that sad black island there? - It's some
Cythera' so they say, where mermaids sing.
El Dorado! Old cocks came here to swing.
When all is said and done it's pretty tame."[৮৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই দ্বীপ? প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যার উত্তর হ্যাঁ-ধর্মী। বিষণ্ণ এবং মলিন - ঠিকই। আর সেই পৌরাণিক শহর এলদোরাদো? গতায়ু তাঁর পুরাতনী সৌন্দর্য। দিগন্তের পান্থশালাকে আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কর্কশ মরু ধূসর নগর সভ্যতায় হৃদয়ের কলতান স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রতীক-সাংকেতিকতার অনিবার্য বিপর্যয় ঘটালেন কবি, একান্তই শ্রীবর্জিত -

“দেখা যায় কোন দ্বীপ - কালো, আর বিষাদে মলিন?
- জানো না, সিথেরা ঐ, সেকালের শৌখিনের প্রিয়,
মামুলি এলদোরাদো, গানে-গানে অবিস্মরণীয়
কিন্তু যা-ই বলো, এই দেশ বড়ো ধূসর, শ্রীহীন।”[৫০]

মিথিক্যাল ব্যাপ্তিই গোল্ডেন সিটির অলিখিত উপাখ্যান। এলদোরাদো সোনায় মোড়া যাদু শহরের শক্তিশালী পুরোহিত রাজা। সমগ্র লোকসমাজ বিশ্বাস করেছে এই কিংবদন্তি। C. Scott Littleton তাঁর ‘Mythology’ - গ্রন্থে লিখেছেন -

> “The legend of a lost city of Gold, rulewd by ‘men of metal’, ...When the Spaniards arrived on the west coast of South America, they heard stories from nearby all the peoples on the frings of the Inca empire about a magical kingdom where the roads and buildings were made of gold. It was ruled by a powerful priest king, called El Dorado (‘the gilded one’), because even his body was covered in gold. ...Gradually, El Dorado lost its original meaning, and instead of referring to a person came to be haphazardly applied to any mythical golden city.”[৫১]

পমোনা (Pamona) - প্রাচীন গ্রীক দেবী। বোদলেয়ার তাঁর ‘Je n’ai pas oublie, voisine de la ville’ - কবিতায় এই দেবীর উল্লেখ করেছেন। ওয়াল্টার মার্টিন এক স্তবকের ছোটো এই কবিতাটিকে ইংরেজিতে পদ্যানুবাদ করেছেন ‘I haven’t Forgotten’ - শিরোনামে। কবি বুদ্ধদেব বসু কবিতাটি ‘এখনো ভুলিনি তাকে’ শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। পমোনা প্রাচুর্যের দেবী। তিনি উদ্যান তথা বাগান ও ফল - বৃক্ষের দেবী। তাঁর কোন গ্রীক প্রতিরূপ নেই। তিনি ফলের গাছগুলিকে পরিচর্যা, রক্ষা এবং চাষাবাদের জন্য যত্ন নেন। চিত্রকলায় শিল্পীরা তাঁকে সাধারণত ফলমূল সজ্জিত থালার প্রতীকে চিত্রিত করেন। পমোনাকে শিল্পীরা তাঁদের স্থাপত্যকলায় বিশেষত্ব দিয়েছেন। আমেরিকায় দেবীর নামাঙ্কিত বিভিন্ন শহর এবং পার্কের নামকরণ করা হয়েছে। Wikipedia - তে গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

> “Pamona was the goddess of fruit trees, gardens, and orchards. …She was not actually associated with the harvest of fruits itself, but with the flourishing of the fruit trees.”[৫২]

বাগান ও স্থাপত্য পরস্পরাশ্রয়ী। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকলায় বাড়ি ঘরদোরের সামনে যেমন উঠোন ও আঙিনা সংলগ্ন একচিলতে বাগানবাড়ি, তেমনি ইঁট-পাথরে নির্মিত বৃহৎ স্থাপত্য শিল্পের পাশে পাশেই থাকে সুবৃহৎ উদ্যান বা পার্ক। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে -

“The little white-washed house we used to own -
A peaceful place, a few steps past the town,
The goddesses, stuck in a meagre wood.”[৫৩]

কবি ভোলেননি তাঁদের শহরের নিকটবর্তী শান্ত সাদা বাড়ি পমোনাকে, যা গ্রীক পুরাণের আরেক নারী ভেনাস সুন্দরীর মত। সেই সন্ধ্যালোকে অস্তগামী সূর্য জলপ্রপাতের মত আলোকরাশি বিকিরণ করে। আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিকের নিয়ন আলোতে কবি ভোলেননি তাকে। বুদ্ধদেবের অনুবাদে -

“এখনো ভুলিনি তাকে - নগরের গা - ঘেঁষে, নির্জন,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের সাদা বাড়ি, ছোটো, কিন্তু শান্ত সারাক্ষণ।
পমোনা, পাথরে গড়া, আর এক স্থবির ভেনাস।"[৫৪]

ইকারাস (Icarus), ইকারী (Icaria) - গ্রীক মিথোলজির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। অহংকার, অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি কি হতে পারে, তার নীতিশাস্ত্র সম্মত দিক নির্দেশ রয়েছে গ্রীক পুরাণ কথায়। গ্রীক পুরাণ অনুসারে জানা যাচ্ছে, ইকারাস ছিলেন ক্রিটের গোলকধাঁধার দক্ষ স্থাপত্যশিল্পী, ডেডালাসের (Deadalus) পুত্র। ইকারাস গোলকধাঁধা থেকে পালানোর রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। এথেন্সের রাজা থিসিয়াস গোলকধাঁধা থেকে পলায়ন করেন। থিসিয়াস ছিলেন রাজা মিনোসের শত্রু। মিনোস সন্দেহ করেন, এর জন্য দায়ী ইকারাস ও তার পিতা ডেডালাস। রাজা মিনোস তাঁদের বন্দি করলেন। ইকারাস পাখির পালক, কম্বলের সুতো, চামড়ার ফিতা এবং মোম দিয়ে তৈরি ডানা ব্যবহার করে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি পিতার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে নিচু থেকে উড়তে থাকেন, ফলে জলে তাঁর পালক ভিজে যায়। তাঁর পিতা সূর্যের খুব কাছ থেকে উড়তেও মানা করেন, কেননা সূর্যের প্রচন্ড তাপে মোম গলে যাবে। এসব নির্দেশ অমান্য করে তিনি সূর্যের কাছ থেকে উড়তে থাকেন, ফলে সত্য সত্য তার ডানার মোম গলে যায় এবং আকাশ থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে তিনি ডুবে মারা যান। ইকারাসের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিভাবান শিল্পী পিতা ছেলের স্মৃতিকে বহন করে মৃত্যু যন্ত্রণায় কেঁদে ফিরতেন। মৃত্যু দ্বীপটিতে দাঁড়িয়ে তিনি ইকারিয়া বলে ডাকতেন। উক্ত মৃত্যু স্থানটি 'ইকারিয়ান সাগর' নামে চিহ্নিত। ইকারাস উচ্চ-অবুঝ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক-পুরুষ। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার বাস্তব ভূমি ছিল না। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> 'But Deadalus constructed wings out of wax and feathers for himself and Icarus, and they flew away from Crete. Icarus, however, contrary to the warnings of Deadalus, flew too high, and the sun melted the wax of the wings, so that Icarus fell into the sea and drowned. The sea was called Icarian after him."[৫৫]

কবি বোদলেয়ার তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুটি কবিতা যথাক্রমে 'Le Voyage ('Travellers' - 'ভ্রমণ') এবং 'Les plaints d'un Icare' ('The Laments of an Icarus' - 'ইকারুস বিলাপ')-এ প্রাচীন গ্রীক মিথ ইকারুসের উল্লেখ করেছেন। কবিতা দুটি হয়ে উঠেছে বোদলেয়ারের আত্মপ্রকৃতি। সূর্যের অগ্নিবর্ষী তাপে বিকল ডানার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইকারুস সমুদ্রে ডুবে গেলো। ইকারুসের মতই কবি 'Le Voyage' - কবিতার শেষ স্তবকে বলে উঠলেন -

"Weigh anchor, Captain Death, the sails are set.
We've seen enough - too much - it's time to go."[৫৬]

মৃত্যুর সময় হয়েছে। প্রাচীন মৃত্যু। অন্ধকার পথ। কাণ্ডারী নোঙর তুলে দিয়েছেন। মৃত্যুর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। সে সৌন্দর্য স্বর্গ থেকে আসুক অথবা নরক থেকে। আর 'Les plaints d'un Icare' - কবিতায় ভাঙা ডানা ইকারুস বুঝেছেন, তিনি বিচূর্ণ। তাঁর এমন নম্রতাবোধের সময় ছিল না। কবি বোদলেয়ার ইকারুসের আত্ম প্রতিবিম্ব। লিখে ফেললেন অন্ধকার সমাধিলিপি। ওয়াল্টার মার্টিনের কাব্যানুবাদে -

"And victimized by the sublime
Whose cautery has sealed my doom,
I lie here in an unmarked tomb -
The fallen angel's paradigm."[৫৭]

এ সমাজে কোথাও কোন আশা নেই, আলো নেই। নিষ্ফল ব্যর্থতার চোরাবালিতে ডুবে গেছে কবির হৃদয়। ডুবে গেছে সব সাধ। সুন্দরের স্থপতি তিনি। কেমন সে সুন্দর? ভগ্ন সুন্দর। সমাধিফলকে তাঁর নাম লেখা থাকবে না। কেবলই অন্ধকার গহ্বর। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'ইকারুস বিলাপ' কবিতায় লিখলেন -

"সুন্দরে ভালোবেসে আমি আজ ভস্ম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাধিফলকে উজ্জ্বল সম্মানে
থাকবে না লিপিচিহ্ন আমার নামে,
আমার কেবল সর্বস্ব গহ্বর।"[৫৮]

পিলাদেস (Pylades) **ও এলেকত্রা** (Electra) - গ্রীক পুরাণ অনুসারে পিলাদেস ছিলেন রাজা স্ট্রোফিয়াস এবং রাণী অ্যানাক্সিরিয়ার পুত্র। ফোসিসের রাজপুত্র তিনি। ট্রেজান যুদ্ধের দুই নায়ক আগামেমনন এবং মেনেলাউস হলেন তাঁর কাকা। তিনি ওরেস্টেসের বন্ধু। ওরেস্টেস যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন, তখন পিলাদেস তাকে সাহায্য করেন। পিলাদেস স্বদেশে ফিরে এলেও হত্যার অপরাধে যুক্ত থাকার কারণে তার বাবা তাকে নির্বাসিত করেন। শাস্তি ও জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁদের বন্ধুত্বে কোন ছেদ পড়েনি। দুর্ভাগ্যকে সমানভাবে ভাগ করেছেন পরস্পর। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> "Pylades, the son of Strophius, who become his (Orestes) friend and was dearer to him than a brother."[৫৯]

পিলাদেস হচ্ছেন, আদর্শ বন্ধুর চিরন্তন প্রতীকরূপ।

অপরপক্ষে ইলেকত্রা ছিলেন রাজা আগামেমনন এবং রাণী ক্লাইটেমনেস্ট্রার কন্যা। তাঁর ভ্রাতা ওরেস্টেস। পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনিও ভাইকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর মা এবং মায়ের প্রেমিক এজিস্থাসের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর তাঁর ভাই ওরেস্টেসের বন্ধু পিলাদেসকে বিবাহ করেন। ইলেকত্রা চিরন্তনী নারীর প্রতীক। গ্রীক পুরাণে বলা হয়েছে –

> "Eight years after Agamemnon's death. Orestes returned eagerly awaited by Electra, On her advice, he killed Clytemnestra and Aegisthus. …Electra, according to Apollo's command, married Pylades."[৬০]

বোদলেয়ার তাঁর 'Le Voyage' ('Travellers' - 'ভ্রমণ') কবিতায় জীবনের যাত্রা শেষ করে মৃত্যুনদীর সীমান্তে উপনীত হয়েছেন। মৃত্যু আসন্ন। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যাত্রার সময় হয়েছে। নোঙর তুলে দেওয়া হয়েছে। অজানা সেই যাত্রাপথে মৃত্যুর সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করছেন কবি। এ পৃথিবীর নরক দর্শনের মধ্যেই বিরাজ করছে সেই সৌন্দর্য। তমসার অতলান্ত সমুদ্রে কবির যাত্রা। কবি গ্রীক পুরাণের বন্ধু বৎসল পিলাদেসকে কবিতায় তুলে আনেন। আর সেই ট্রোজান যুদ্ধের সময়কালীন ষড়যন্ত্র-হত্যা-ঈর্ষা-বিদ্বেষের বিষণ্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন আবহে কমনীয় নারী মূর্তি ইলেকত্রা - নরকের মধ্যেও কবিকে স্বপ্ন দেখান। পিলাদেস মৃত্যু সমুদ্র থেকে হাত ধরে টেনে তোলেন। আর ইলেকত্রা সন্তরণে সাহায্য করেন। জীবনের অবসানে মৃত্যুর নতুন দ্বীপে পৌঁছে যান কবি। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে (Travellers) -

"Dead sisters and companions, in the mist -
Electra, with the loyal Pylades.
We recognize those voices! Why resist?
Swim out and join us now, and be at ease."[৬১]

নির্মল অপরাহ্নের কোন অবসান নেই। যাত্রা শেষে পথিকের হৃদয়ে অপূর্ব বিস্ময়। বুদ্ধদেব অনুবাদ করলেন -

"ওপারে বাড়ায় বাহু পিলাদেস, এখনো তেমনি,
প্রেতেরে চিনিয়ে দেয় পুরাতন গানের গুঞ্জন।
'সাঁৎরে ধর এলেকত্রাকে, সে-ই তোর বিশল্যকরণী!
বলে সে, একদা যার জানুতট করেছি চুম্বন।"[৬২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সিবেলী (Cybele) - হলেন গ্রীক পুরাণের মহান দেবী - 'The great mother' (Magna Mater)[৬৩] তিনি পুরুষ দেবতা আকাশ এবং মাতৃ দেবী পৃথিবীর কন্যা। জন্ম মুহূর্তে তিনি পুরুষ এবং নারী উভয়েই ছিলেন। যাকে বলা হয় 'hermaphrodite' অর্থাৎ উভয়লিঙ্গ। দেবতারা এতে ভয় পেয়ে তাঁকে বর্জন করেছিলেন এবং পুরুষ অঙ্গটি কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। এটি থেকে একটি বাদাম গাছ জন্ম লাভ করে। সিবেলী ছিলেন প্রকৃতি, উর্বরতা এবং মাতৃত্বের দেবী। তিনিই পৃথিবী মাতার দেবী মূর্তি। তিনি সকল মানুষের মাতা। মাতৃতান্ত্রিক উর্বরতা বাদের নবসম্ভাবনা মুকুলিত হয়েছে এখানে। মেষ পালকের দ্বারা বেড়ে ওঠা অ্যাটিসের প্রতি তাঁর গভীর ট্র্যাজিক করুণ প্রেম - যা আত্মবিচ্ছেদ, পুনর্জন্ম, এবং জীবন-মৃত্যুর চক্রাকৃতি প্রকৃতি বলয়কে নিয়ে নির্মিত। তাঁর হৃদয় ভেঙে পড়ে। সিবেলীর দেহের কোনো ক্ষয় নেই। তিনি পবিত্র রমণী। গ্রীক ও রোমক পুরাণে বলা হয়েছে -

> "Cybele grew up in the forests and become a beautiful and gifted woman. ...she became known as the Mother of the Mountain. Then she fell in love with a youth called Attis. ...Some say that Attis was a Shepherd."[৬৪]

গ্রীক পুরাণে সিবেলী হলেন, হৃদয়ের দেবী - 'goddess of heart'[৬৫] বোদলেয়ার কবিতা লিখছেন, জিপসী সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীদের নিয়ে। জিপসীরা যাযাবর বেদেদের মত। সন্তান সন্ততি নিয়ে দল বেঁধে তাঁরা খাদ্যের অন্বেষণে ফেরে। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এঁরা গান শোনায়। যাত্রিক জিপসীদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। এঁদের কোন আশা নেই, ভাষা নেই, নেই কোন ভবিষ্যৎ। কেবলই এঁদের জন্য আছে সিবেলীর প্রেমমদির দৃষ্টি। তাই ঘাস সবুজে সবুজে হয়ে ওঠে ভরপুর সবুজ। ফুল ফোটে। স্রোত ফুলে ফুলে ওঠে। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে -

> "The cricket, when it spies a gypsy band,
> Chirps louder from its burrow in the sand;
> Cybele loves them well and shall bring forth."[৬৬]

সিবেলী আলোচ্য কবিতায় উদ্ভিজ্জ জীবনীশক্তির প্রতীক। প্রণয়ের প্রশস্ত দেবদারু বৃক্ষের প্রতীকরূপ তিনি। অনন্ত সুবাতাস জীবনকে মধুচ্ছন্দে দোলায়িত করে। কবি বুদ্ধদেব কবিতাটির বাংলায় নামকরণ করেছেন 'যাত্রী বেদেরা' (Bohemiens Voyage)। লিখেছেন -

> "পতঙ্গ, তার রুক্ষ বিবর থেকে,
> চৌদুনে তান লাগায় ওদের দেখে;
> এবং সিবেলী যেহেতু প্রণয়াসক্ত।"[৬৭]

আলোচিত পর্যায়ের মিথগুলির বৈচিত্র্য বোদলেয়ারের বহুমুখী মানস অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আধুনিক কবিতার চিন্তন বিশ্বে তিনি যে জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন, তা তাঁর গ্রীক মিথ ব্যবহারের অনন্য প্রয়োগ কৌশলের গুণে। তাঁর লিখিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি মিথের বহুমুখী তাৎপর্যে ব্যতিক্রমী চিরন্তনতার দাবী করতে পারে। উপরিউক্ত কবিতাগুলি যেন প্রাচীন মানুষের কল্পনা ও আধুনিক সভ্যতার সত্যরূপ প্রকাশে দায়বদ্ধ।

।। ছয়।।

বোদলেয়ারের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Le Cygne'। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির ইংরেজি নামকরণ করেছেন 'The Swan'। বুদ্ধদেব বসুর বাংলা অনুবাদে কবিতাটি হয়েছে 'রাজহাঁস'। রাজহাঁস - নির্মল, শান্ত জলাশয় হল তার উপযুক্ত আশ্রয়ের চারণক্ষেত্র, বসতবাড়িও বটে। আজন্ম লালিত শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, সেই নিষ্পাপ রাজহাঁস সামাজিক ভাঙ্গগড়ায় প্রাকৃতিক হ্রদের পুরানো নিরাপদ নীড় থেকে নির্বাসিত। প্যারিস চিত্রের অন্তর্গত এই কবিতাটির রচনাকাল পুরানো ভেঙ্গে নতুন শহর পত্তনের সময়। পুরানো স্মৃতির প্যারিসের ধ্বংস সজ্জার উপর নির্মম শ্বাসরোধী নগরায়ণের ভারবাহী রূপ কবির আলোচ্য কবিতা। ধনতান্ত্রিক, বিবেকবর্জিত এই আধুনিক সভ্যতা চেটে পুটে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খাওয়া, ফুলে ফেঁপে ওঠা মানুষকে দিয়েছে অনেককিছু। অন্যপক্ষে পৃথিবীর লক্ষ কোটি প্রাণীকুল, বৃহত্তর উদ্ভিদ জগতের একাংশ এবং নিম্নবর্গীয় মনুষ্যকুলের ধ্বংসসাধন, অপমৃত্যু ও নির্বাসনের হোতা এই আধুনিক সভ্যতা। সভ্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বা যাজকতন্ত্র ও বুদ্ধিমান শহর বিলাসী মানুষের দান এগুলি। কবিতাটিকে কবি মানবকল্পিত মিথের আশ্চর্য আলেখ্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন। কবিতাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যমণ্ডিত কবিতারূপে বিবেচিত হওয়ার কারণ বোধ হয় মিথিক চমৎকৃত বিনির্মাণ। সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমক পুরাণের সংশ্লেষ-ব্যবহার তাৎপর্যের বহুমুখী ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ধর্মিতা ও সংকেতময়তায় কবিতাটি সর্বকালের সহৃদয় পাঠকের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে।

আন্দ্রেমাকি (Andromache) - গ্রীক পুরাণে প্রিয়ামপুত্র বীর হেক্টরের পত্নী। ট্রোজান রমণী তিনি। ট্রোজান যুদ্ধে অ্যাকিলিসের দ্বারা হেক্টরের হত্যাকাণ্ডের পর অ্যাকিলিসের পুত্র পিরহুস হেক্টরের ভাই হেলেনাস ও আন্দ্রেমাকিকে যথাক্রমে দাস-দাসী রূপে পরিণত করেছিলেন। বীরের পত্নী তিনি। রাজপ্রাসাদে উপযুক্ত মর্যাদায় যিনি মহিমময়ী হয়ে থাকতে পারতেন, নিষ্ঠুর রাষ্ট্রিক বিপর্যয় এবং যুদ্ধের অভিঘাতে তিনি নির্বাসিত হলেন পরাশ্রিত দুর্ভাগ্যপীড়িত দাসী রূপে। কি নির্মম পরিহাস অপেক্ষা করেছিল তাঁর জন্য। অ্যাকিলিসের পুত্র পিরহুস তাঁকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যা দাসীর থেকে কোন অংশে কম ছিল না। ট্রয় ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় চরিত্র হেক্টর। দুর্ভাগ্যপীড়িত আন্দ্রেমাকি তাঁর পরিবার এবং দেশের জন্য অশেষ যন্ত্রণা বহন করেছেন। মৃত্যুর পরে হেক্টরের সমাধিস্থলে নিত্য নৈবেদ্য প্রদান করতেন তিনি। তিনি তাঁর বিশ্বস্ততা ও সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাষ্ট্রিক ও যুদ্ধকালীন দুর্দশার প্রতীক তিনি। বিনয়, জ্ঞান, মনোমুগ্ধকর শ্রী ও সৌন্দর্যের কল্পনারী তিনি। অ্যাকিলিস কর্তৃক তাঁর পিতা এবং সাত ভাইয়ের মৃত্যু যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন। মায়ের অসুস্থতাজনিত মৃত্যু তিনি দেখেছেন। যুদ্ধের সহিংসতার কারণে তিনি হয়ে উঠেছেন বাস্তুচ্যুত নারী। সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁকে নিরাপদ সামাজিক সীমানা দিতে পারেনি। একটি স্থায়ী ঘর ছাড়াই তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে। ট্রয়ের প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছেন মৃত্যুদৃশ্য। প্রয়াত হেক্টরের পত্নী - এখন তিনি বিধবা রমণী। গ্রীক পুরাণে তাঁর পরিণতি নির্দিষ্ট -

> "Meanwhile the woman of the court were assigned as slaves to the Greek victors. Hector's widow Andromache fell to Neoptolemus, while Queen Hecuba was given to Odysseus."[৬৮]

সেই রাজেন্দ্রাণী আন্দ্রেমাকি যেমন নিষ্ঠুরভাবে নির্বাসিতা, ঠিক তেমনি পুরানো আর নতুনের ভাঙ্গন ও গড়নের সংকট মুহূর্তে তিরবিদ্ধ পাখির মত ছটফট করতে করতে ডানা ঝাপটায় সুবৃহৎ শান্ত সরোবরের রাজপুত্র রাজহাঁস। ফুটপাতে নর্দমার জল খোঁজে। পরাজিত নায়কের পত্নী আন্দ্রেমাকি এখন ক্রীতদাসী। অনুরূপ সেই পায়ে বেড়ি দেওয়া, ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপীকৃত জঞ্জালের ধারে, নর্দমার জল খেতে অতিকষ্টে গুটি পায়ে হেঁটে যায় রাজহাঁস। বিষণ্ণ-বিবেক শুধু। কোথাও কোন প্রেম নেই, নেই কোন সুবাতাস। ঠিক যেন হেক্টরের বিধবা রমণী - রাজেন্দ্রানী আন্দ্রেমাকি। কবি বোদলেয়ার তাঁর 'Le Cygne' - কবিতায় এভাবেই গ্রীক মিথ আন্দ্রেমাকিকে ব্যবহার করেছেন। নৈপুণ্যের অভিনবত্বে সম্পূরক হয়ে উঠেছে রাজহাঁস। দু'জনেই নির্বাসিতা, দু'জনেই বন্দিনী। দু'জনেই ফেলে এসেছে তাদের স্মৃতির অতীত। দাসত্বের ভারবাহী মুমূর্ষু জড়ের মতো সম্বিতবিহীন - ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা। ওয়াল্টার মার্টিন তাঁর অনূদিত 'The Swan' কবিতায় লিখলেন -

> "I think about you now, Andromache,
> By this sad stream that brings back long lost years;
> Your grievous fate, your fallen majesty,
> This false Simois, swollen with your tears."[৬৯]

সেই বিধবা রমণী আন্দ্রেমাকির কথাই ভেবেছেন কবি। বিপুল বিষণ্ণ বেদনা তাঁর। কুলপ্লাবী সে বেদনা গ্রীক মিথের - সিমইস (Simois) নদীর মতই ভারাক্রান্ত।

সিমইস (Simois) - গ্রীক পুরাণের এক নদী দেবতা। যিনি ওশেনাস এবং টেথিসের পুত্র। নদীটি ইডা পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে ট্রোজান সমভূমিতে স্ক্যামাণ্ডার নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর কথা ইলিয়ডে উল্লিখিত আছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ট্রয় যুদ্ধে দেবতারা যখন ট্রোজানদের পক্ষ নেন, তখন সিমোইস ট্রোজানদের সমর্থন করেন। অপর একটি নদী যার নাম স্ক্যামাণ্ডার, তিনিও ট্রোজানদের সমর্থনে সিমইসের কাছে উদাত্ত আবেদন রেখেছিলেন। বলেছিলেন -

প্রিয় ভাই -

সর্বোচ্চ গতিতে আমার সাহায্যে এসো।
তোমার ঝর্ণার জল দিয়ে তোমার স্রোত পূর্ণ করো।
তোমার সমস্ত স্রোতকে জাগিয়ে তোল।
এক বিরাট ঢেউয়ের মতো উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকো।
এবং কাঠ ও পাথরের প্রচন্ড গর্জন জাগিয়ে তোলো,
যাতে আমরা এই বর্বর মানুষটিকে থামাতে পারি।
যে তার শক্তিতে (দেবতাদের মত) ক্রোধের আগুনে জ্বলছে।

ইলিয়াডে উল্লিখিত আছে -

> "Dear brother, let's unite to overpower this man or he will soon be sacking lord Priam's great town without a Trojan to stop him, Come Quickly to my help! Fill your channels with water from the springs, replenish all your mountain streams, lift up a great breaker and send it down, seething with logs and boulders, so we can stop this savage who is carrying all before him. He thinks himself a match for the gods."[৭০]

প্রিয়ভাই সিমইসের উদ্দেশ্যে জানিয়েছে, এসো, আমরা দু'জনে মিলে একজন মানুষের শক্তি ধরে রাখি। কারণ বর্তমানে সে প্রভু প্রিয়ামের মহান শহরে ঝড় তুলবে। যুদ্ধে ট্রোজানরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আমাকে তাঁকে পরাজিত করতে সাহায্য করুন। এরপর সিমোইস এবং স্ক্যামাণ্ডার তাঁদের জল একসাথে ছুড়ে মারে। যেখানে রয়েছে তাঁদের সাদা ঘোড়া। তাদের চরানোর জন্য সিমোইস ঘাসের অমৃতরূপে বেড়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় স্ক্যামাণ্ডার অ্যাকিলিসকে জলের ঢেউ উচ্চতায় স্থাপন করে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য সিমোইস সাড়া দেওয়ার আগেই হেফেস্টাস আগুনের শিখা দিয়ে স্ক্যামাণ্ডারকে দমন করে অ্যাকিলিসকে বাঁচাতে সক্ষম হন।

অবশেষে ট্রয় নগরীর পতন ঘটল। ট্রোজানদের পতনে সিমোইস ক্রন্দন করলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতার ফলে ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁরা শোকপ্রকাশ করলেন। শোকাহত সিমোইস প্রিয়মের শহরের ধ্বংসাবশেষের জন্য দূরে কাঁদলেন। নদীর তীক্ষ্ণ জলরাশি চিৎকার করল। ট্রয় নগরী রক্ষার জন্য তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন, পারলেন না তাঁরা।

বোদলেয়ারের 'Le Cygne' - কবিতাটি পুরোপুরি মিথের মোড়কে আবৃত। আন্দ্রেমাকি, হেক্টর, সিমইস, পিরহুস, 'হেলেনুস জায়া' (অর্থাৎ আন্দ্রেমাকি, পিরহুসের মৃত্যুর পর হেলেনাস আন্দ্রেমাকিকে বিবাহ করেছিলেন) প্রভৃতি গ্রীক মিথের সংকেতিক বিন্দু বীজকে বোদলেয়ার সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। কবিতার সীমিত অবয়বে ইলিয়ডের সর্বব্যাপক মহিমান্বিত ক্লাসিক গাম্ভীর্যকে সমকালীন প্যারিসীয় বাস্তবতায় সার্বজনীন করে তুলেছেন কবি। আন্দ্রেমাকি প্রেমিক-স্বামী হেক্টরের বাহুচ্যুত হয়েছেন। আনত তিনি, এক বিষণ্ণ শূন্যতা সারাজীবন তাঁকে যাতনা দিয়েছে। বিমর্ষ হৃদয়ে স্বামীর সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক প্রদান করতেন তিনি। আর গ্রীক মিথোলজিতে হেক্টরের অসহায় নির্মম পরিণতি সহৃদয় পাঠককুলকে ব্যথিয়ে তোলে। রণভূমিতে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেক্টর বুঝেছেন তাঁর দুরদৃষ্ট আসন্ন পরিণতি। বলেছেন -

> "It's over. So the gods did, after all, summon me to my death. ... Evil death is no longer far away, ... So now my destiny confronts me. Let me at least sell my life dearly and not without glory, after some great deed for future generations to hear of."[৭১]

বোদলেয়ারের রাজহাঁস তাঁর শৈশব-যৌবনের সুশীতল মনোরম জলাশয় হারিয়ে নির্বাসিত হয়েছে। শোকতপ্ত বিধবা আন্দ্রেমাকির প্রতীকী প্রতিকল্প রাজহাঁস।

বিজয়ী অ্যাকিলিসের পুত্র পিরহুসের (Pyrrhus) অহংকারী হাত তাঁকে টেনে হিঁচড়ে দাসী বানিয়েছিল। অমর্যাদা এবং নির্যাতিতার আরেক রূপ উপেক্ষিতা উপপত্নীরূপে আন্দ্রেমাকিকে জীবন কাটাতে হয়েছে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে নিওপটোলেমাস জন্ম মুহূর্ত থেকে পিরহুস ডাক নামে পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি অ্যাকিলিডাস (Achillides), পেলিডেস (Pelides), আইত্রসিডেস (Aeacides) প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন। গ্রীক পুরাণে তাঁকে হিংস্র যোদ্ধারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি শক্তিশালী কিন্তু বিরক্তি উৎপাদক যোদ্ধা। পিরহুস বা নিওপটোলেমাস (Neoptolemus) ছিলেন নৃশংস। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কমপক্ষে ছয়জন এবং ট্রয়ের পতনের পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছিলেন। এদের মধ্যে রাজা প্রিয়াম, ইউরিপিলাস, পলিক্সেনা। এছাড়াও হেক্টর ও আন্দ্রেমাকির দুই শিশু সন্তান যথাক্রমে পলিটস ও অ্যাস্টিয়ানাক্সকেও তিনি হত্যা করেছিলেন। গ্রীক মিথোলজিতে বলা হয়েছে –

> "He (Neoptolemus) was also called Pyrrhus because of his fair hair, … He was one of the best warriors before Troy and killed Eurypylus, son of Telephus. Neoptolemus was in the Wooden Horse, and during the night of Troy's fall killed King Priam. Among his captives were Andromache and Helenus the seer."[৭২]

প্রিয়াম পুত্র হেলেনাস ছিলেন দূরদর্শী এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। অ্যাপোলো তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলেন। হেলেনাস (Helenus) - কে পিরহুস বন্দি করেছিলেন। এছাড়া পিরহুস আন্দ্রেমাকিকে উপপত্নী করেন। অবশ্য দাসী ছাড়া তা আর কিছুই নয়। এমনকি ট্রোজান রাজকন্যা পলিস্কেনার বাড়ি ফেরার পূর্বেই তিনি তাঁকে বলি দেন। অ্যান্দ্রেমাকি এবং হেলেনাসকে নিয়ে তিনি এপিরোট দ্বীপপুঞ্জে যান। এঁদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেননি পিরহুস। অবশেষে এই নৃশংস যোদ্ধাকে ওরেস্টেস হত্যা করে তাঁর অস্থি এপিরাসের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রিয়াম পুত্র হেলেনাস আন্দ্রেমাকিকে বিবাহ করেছিলেন। গ্রীক মিথোলজিতে বলা হয়েছে –

> "Helenus's Revange : The Greeks were further encouraged by a tip from a captive Trojan. This warrior, Helenus had hoped to marry Helen after Paris's death."[৭৩]

নির্বাসিত রাজহাঁস। কারুকার্য শোভিত নগরীর ভগ্নাবশেষ। কবির স্মৃতি রোমন্থন। বোদলেয়ারের 'Le Cygne' কবিতাটি হয়ে উঠল পরাজিত মানুষের বিবেক। গ্রীক পুরাণের আন্দ্রেমাকি, হেলেনুস বন্দি ক্রীতদাস। সীমইয়ের বিপুল জলরাশি চিৎকার করেও ট্রয়কে রক্ষা করতে পারল না।

মৃত্যু-নেমেসিস হেক্টরের পতন নিশ্চিত করল। পুরানো স্মৃতির শহর মুখ থুবড়ে পড়ল। অসহায় রাজহংসের মত গ্রীক পুরাণের বন্দি চরিত্রগুলোর ক্লান্ত বিষণ্ণতা দিয়ে কবি কবিতার উপসংহার ঘটালেন। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে -

> "To mind again, Andromache, torn from
> Your husband's arms to be bebased for life
> By Pyrrhic pride beside an empty tomb -
> Great Hector's widow! Helenus's wife!"[৭৪]

।। সাত ।।

রোম্যান্টিক কবিদের কবিতায় ছিল অনুভবময়তা। রোম্যান্টিক বিষাদ অকারণ। অপরপক্ষে বোদলেয়ারের কবিতায় এলো দুরূহতা ও বিবিক্ত বিষাদ। আধুনিক কবিতার কাঠিন্যের কারণ বহু পঠনের স্বল্পতা। সমগ্র মানবজাতির গৌরব-অগৌরব জনোচিত সমস্ত কর্ম, সাধনা প্রসূত সমস্ত শিল্পকর্ম, মিথিক উপাদান, কল্পকথা সমৃদ্ধ কিংবদন্তি, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের দূরতর পথে বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান-লৌকিক-অলৌকিকের চেতনালোকে যে ছায়াপথ নির্মাণ করেছে তারই বিনির্মিত কাব্যরূপ বোদলেয়ারের আধুনিক কবিতা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবিতায় গ্রীক মিথের ব্যবহার সাবলীলতায় কবি উচ্চতর কবিত্বশক্তির পরিচয় রেখেছেন। বোদলেয়ারীয় মিথ কবিতায় গন্ধমাদনের দুর্বহ ভার নয়। মিথের বিন্দুকণিকায় তাঁর কবিতার মূল প্রাণচৈতন্যের সংকেত উৎসারিত হয়েছে। একটি-দুটি মিথের লৌহ স্থাপনে দণ্ডায়মান থাকে সমগ্র কবিতা। কবিতায় প্রাচীন মিথের ব্যবহারে তিনি অভিনব শৈলী প্রকরণ আবিষ্কার করেছেন। প্রাচীন মিথের ব্যবহার প্রকল্প দিয়েই কবি সংকটজর্জর অসম বিবেকবর্জিত সমাজের যুগচৈতন্যকে ক্ষুরধার তাৎপর্যে উদঘাটিত করেছেন। অভ্যেসের ক্লান্তিকে বহন করতে করতে ক্লান্তিচালিত মানুষ ভুলে গেছে প্রকৃত বিষণ্ণতার স্বরূপ। আধুনিক বিতৃষ্ণার আবিষ্কারক কবি বোদলেয়ার। বিশ্বজনীন মানবিক অবক্ষয়ের অগ্ন্যুৎপাতকে প্রাচীন গ্রীক-রোমক পুরাণ দিয়েই এক লহমায় কবি আধুনিক চিন্তাশীল কাব্যপাঠকের মস্তিষ্কে চালিত করে সচকিত করে করে তুললেন। শহর সভ্যতার যুগগত বিতৃষ্ণা ও যন্ত্রণা তাঁর কবিতার শক্তি ও সম্পদ। গুটিপোকার মত কুটে খাওয়া জর্জর মানব হৃদয়ে গ্রীক মিথের উজ্জীবনী চৈতন্য দিয়েই তিনি পৃথিবীর রোম্যান্টিক কবিতার গতিময় ঘোড়াকে কঠিন লাগাম পরালেন। জলোচ্ছ্বাসের মত কবিতার স্বতন্ত্র প্রণালী দিয়ে নতুন ভাব্যভুবন উন্মোচিত হল। মিথের সাংকেতিকতা কবিতার শিরায় উপশিরায় নিয়ে এলো ভয়াবহ কম্পন। বদলে গেল কবিতার জেনেটিক রূপ। তাঁর মিথ ব্যবহার কবিতাকে গুরুভারে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি, বরং তাঁর মিথ আকীর্ণ কবিতাগুলি সৌন্দর্যের নতুন অর্থ তাৎপর্যে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। কবির অনেক ভালো ভালো কবিতা মিথ ব্যবহারের চিরন্তন সৌকর্যে লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। সময়ের গোধূলী সন্ধ্যায় তাঁর কবিতা বেঁচে রয়েছে মিথের সংকেত জাদুতে। কবিতার নতুন ফর্মে প্রধানত হোমারের মহাকাব্য থেকে মিথের টুকরো টুকরো নুড়ি কুড়িয়েছেন কবি। ঐতিহ্যবন্দিত গ্রীক মিথের সুবিশাল ভাণ্ডারকে আপন অন্তর্দৃষ্টিতে দক্ষ জাদুকরের মত কবিতায় ব্যবহার করেছেন তিনি। তবুও বলতে হবে, মিথের ঐতিহ্য নির্ভর বিশ্বাসের জ্বরে আক্রান্ত নন কবি। প্রকৃতপক্ষে কবিতায় বোদলেয়ারের মিথ ব্যবহার যুগের ধ্বনিত অনুরণন। কবিতার যুগগত বিষণ্ণতাকে কবি তাঁর কলমের ধারাল হাঁসুয়ায় শান দিয়েছেন। হোমারীয় মিথের পরাজয় জর্জর নারী পুরুষের পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনকে কবিতায় সংবেদনশীল করে তুলেছেন। কবির নরক ক্লেদাক্ত। তাঁর সৌন্দর্য গলিত শবের দুর্গন্ধ পীড়িত রক্ত-রসে ডুবন্ত। মানুষের বোধিতে অনুপ্রবেশ করা কীটের মত শয়তানের স্বরূপ তিনি জেনেছেন। অধঃপতিত, নিমজ্জিত শয়তানের সঙ্গে তাঁর কবিতার ওঠাপড়া। অন্ধকার গোপন সুড়ঙ্গ দিয়েই তিনি কবিতার অভিনব আলোক-সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কবিতায় কোন নীলকান্তমণি নেই, নেই তার কোনো জ্যোতি। তাঁর কবিতার যৌবন-কীটদষ্ট, যক্ষাগ্রস্ত। তবুও সুন্দরের চরণতলে নতজানু তিনি। তাঁর কবিতার সৌন্দর্যকে তিনি ছেঁকে নিয়েছেন গ্রীক পুরাণের পরাজয় পীড়িত চরিত্রের অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে। গলিত শবের দুর্গন্ধকে তিনি শুভ্র চাদরে ঢেকে দেননি। কোন বিলাসী সুগন্ধিতে তাঁর ঘরদোর ভরে যায়নি। পঙ্কিল ক্লেদাক্ত কৃমিকীট লালিত নারকীয় বীভৎস শবদেহের মধ্যে রসরক্ত নিংড়ে নিংড়ে কবি গড়ে তুলেছেন সৌন্দর্যের হর্ম্য নিকেতন।

Reference:

১. Walter Martin, Games of Chance (Charles Baudelaire - এর ‘Le Jue’- কবিতার ইংরেজি কাব্যানুবাদ)। Charles Baudelaire Complete Poems, Introduction by Carol Clark, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 249

২. বুদ্ধদেব বসু, জুয়ো (Le Jeu), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২৮৭

৩. C. Scott Littleton (General Editor) Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 160-161

৪. Walter Martin, A Voyage to Cythera (Charles Baudelaire - এর ‘Un Voyage A Cythera’- কবিতার ইংরেজি কাব্যানুবাদ)। Charles Baudelaire Complete Poems, Introduction by Carol Clark, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 312

৫. ibid, To The Reader, (‘Au lecteur’ - ‘পাঠকের প্রতি’) P. 3

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. Charles Baudelaire, Le voyage, (Read French), Ibid, P. 350
৭. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদক), শিবপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৬, পৃ ১১৯৫
৮. Charles Baudelaire, Le Guignon, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 13
৯. Walter Martin, Bad Luck, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 37
১০. বুদ্ধদেব বসু, দুরদৃষ্ট (Le Guignon), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২০
১১. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.269
১২. C. Scott Littleton (General Editor) Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 184
১৩. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.222
১৪. Charles Baudelaire, La Muse Malade, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 10
১৫. Walter Martin, The Sick Muse, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 29
১৬. বুদ্ধদেব বসু, রুগ্ন কবিতা (La Muse Malade), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২১৯
১৭. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.69
১৮. Walter Martin, Don Juan In the Underworld, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 45
১৯. বুদ্ধদেব বসু, নরকে ডন জুয়ান (Don Juan aux Enfers), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২৩
২০. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 194
২১. Charles Baudelaire, Le Beaute, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 15
২২. Walter Martin, Beauty, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 49
২৩. বুদ্ধদেব বসু, সৌন্দর্য (La Beaute), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২৪
২৪. Charles Baudelaire, Avec ses Vetements Ondoyants et nacres, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 25
২৫. Walter Martin, In Glistering Shot Silk, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 71

২৬. বুদ্ধদেব বসু, স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে.... (Avec ses Vetements Ondoyants et nacares), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩২-২৩৩

২৭. Walter Martin, Cats, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 175

২৮. বুদ্ধদেব বসু, বিড়ালেরা (Les Chats), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬৫

২৯. Jean Chevalier and Alain gheerbrant, Cat, Dictionary of Symbols, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 1996, P. 163

৩০. Walter Martin, Black Bile, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 195

৩১. বুদ্ধদেব বসু, বিতৃষ্ণা (Spleen), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬৮

৩২. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 149

৩৩. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 136

৩৪. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.101

৩৫. Charles Baudelaire, Les Chats, Les Fluers Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 72

৩৬. বুদ্ধদেব বসু, বিড়ালেরা (Les Chats), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২৬৫

৩৭. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 33

৩৮. Walter Martin, Jewels, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 55

৩৯. বুদ্ধদেব বসু, অলংকার (Les Bijoux), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২৭

৪০. Walter Martin, Reversibility, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 117

৪১. বুদ্ধদেব বসু, বৈপরীত্য (Reversibilite), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৫১

৪২. Walter Martin, What will you Say?, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 111

৪৩. Charles Baudelaire, Que diras-tuce soir, Pauvre ame solitaire, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 44

৪৪. বুদ্ধদেব বসু, কোন কথা আজ বলবি রাতে (Que diras-tu ce soir, Pauvre ame solitaire), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৪৮

৪৫. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 166

৪৬. Walter Martin, A Voyage to Cythera, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 313

৪৭. Ibid, P. 312

৪৮. বুদ্ধদেব বসু, সিথেরায় যাত্রা (Un Viyage a Cythere), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১৯

৪৯. Walter Martin, A Voyage to Cythera, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 313

৫০. বুদ্ধদেব বসু, সিথেরায় যাত্রা (Un Viyage a Cythere), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১৭

৫১. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 612

৫২. en.wikipedia.org, Pomona (Mythology), from Wikipedia, The free encyclopedia, dated - 06.03.2025

৫৩. Walter Martin, I haven't Forgotten, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 257

৫৪. বুদ্ধদেব বসু, এখনো ভুলিনি তাকে (Je n'ai Pas Oublie, Voisine de la ville), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৯১

৫৫. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 80

৫৬. Walter Martin, Travellers, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 351

৫৭. Ibid, The Laments of an Icarus, P. 375

৫৮. বুদ্ধদেব বসু, ইকারুস বিলাপ (Les plaintes d'um Icare), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৪২

৫৯. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 216

৬০. Ibid, P. 97

৬১. Walter Martin, Travellers, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 351

৬২. বুদ্ধদেব বসু, ভ্রমণ (Le Voyage), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮

৬৩. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 76

৬৪. Ibid,

৬৫. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 145

৬৬. Walter Martin, Roving Gypsies, (Bohemiens en Voyage), Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 41

৬৭. বুদ্ধদেব বসু, যাত্রী বেদেরা (Bohemiens en Voyage), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২২

৬৮. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 225

৬৯. Walter Martin, The Swan, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 227

৭০. Homer, Iliad 21.310-319), penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2003, P. 372

৭১. Ibid, P. 388

৭২. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 198

৭৩. C. Scott Littleton (General Editor) Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 222

৭৪. Walter Martin, The Swan, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 229

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 691 - 696
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিশ শতকের প্রথম আলোয় বঙ্গনারী : প্রেক্ষিত এপার বাংলা ওপার বাংলা

দিলরুবা খাতুন
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kdilruba91s@gmail.com

ও

ড. কাকলি ধারা মন্ডল
অধ্যাপিকা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kakali.ku.folklore@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bengali women, patriarchy, oppression, women education, reformation, etc.

Abstract
In the early 19th century, Bengali women lived in a dark societal context, influenced by patriarchal norms and traditional practices that marginalized their rights and freedoms. Despite some educational advancements, many educated women still supported oppressive traditions, such as widowhood customs, reflecting the deep-rooted societal norms. The push for women's education gained momentum, especially after the partition of Bengal, leading to the establishment of many schools for refugee women, which significantly altered their educational landscape. The continuation of arranged marriages and the lack of agency for women in choosing their partners, revealing the entrenched societal norms that persisted into the 20th century. Women played a crucial role in the nationalist movements, although their contributions were often overlooked by male leaders, emphasizing the need for recognition of women's agency in historical contexts. The partition of India led to significant upheaval, with many women facing violence and displacement, which further complicated their social status and rights. This paper, by reviewing several literature as primary data source and secondary data source, discusses in detail the aforementioned issues, challenges and fights of the women in Bengal and finally concludes by noting that the refugee women from East Bengal brought about a transformative change in societal perceptions of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

women, leading to greater independence and self-reliance in the post-partition era.

Discussion

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গনারীর অবস্থান ছিল অন্ধকারময়। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের জীবনে আলো-আঁধারের খেলা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে আলোর আবির্ভাব। ৪০-এর দশক থেকে অতি দীপ্য। বিশ শতকের সূচনা থেকেই বঙ্গসমাজ সামাজিক প্রথাগুলি মোচন ও অমোচন এর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল, কারণ উনিশ শতকের ধ্যানধারণার প্রলম্বিত ছায়া তখনও অনেকটা ঢেকে রেখেছিল সমাজ মননকে। পিতৃতন্ত্রের কাঠামো তখনো বেশ মজবুত। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় পিতৃতন্ত্রের স্বৈরিতাকে পরোক্ষ সমর্থন করেছিলেন কোন কোন বিশিষ্ট মহিলা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মতো শিক্ষিতা আধুনিক মনস্ক মহিলা লিখেছিলেন, -

> "পুরুষেরা জেনে বুঝে যে মেয়েদের উপর অত্যাচার অবিচার করবার জন্যই অন্যায় আইন প্রণয়ন করেছে বা আচার প্রবর্তন করেছে তা আমি বিশ্বাস করিনে।"[১]

সেজন্য বিশ শতকের অন্তত প্রথম তিনটি দশকে দেখা যায় অত্যাচারিতা নারী সমাজের বিবর্ণ ছবি।

নারী সম্পর্কে উনিশ শতকের মনোভাব বিশ শতকের অনেকখানি সময় জুড়ে অটুট ছিল। আশাপূর্ণা দেবী হতাশার সুরে লিখেছিলেন, -

> "এখন অনেক কিছু বদলেছে কিন্তু মনোধর্ম তেমন বদলাইনি।"[২]

উনিশ-বিশ শতকের বিশিষ্ট নারীবাদী কৃষ্ণভাবনী দাস আট বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেও অগ্রাহ্য করতে পারেননি বিধবার সংস্কার। বিধবা হওয়ার পর নিজ নিষ্ঠার সঙ্গে বৈধব্য পালন করেন, সমর্থন করেছিলেন সেই সংস্কার অতিসাধারণ অনালোকিত নারীর মতো। স্বাধীনতা লাভের প্রায় একদশক পরেও বিধবাদের ওপর কড়া বিধি-নিষেধ কিভাবে চাপিয়ে দেওয়া হত বাণী বসু তার 'শ্বেত পাথরের থালা' (১৯৯০) উপন্যাসে দেখিয়েছেন ২৭ বছরের বন্দনা বিধবা হলে। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও বঙ্গ সমাজে ভ্রূ কুঞ্চিত হত বিধবা বিবাহের কোন ঘটনা শুনলে। বিশ শতকের শেষ লগ্নেও বঙ্গসমাজ বিধবা বিবাহ নিয়ে যে এক অদ্ভুত দোলাচলে ছিল তা স্পষ্ট।

উনিশ শতকের ধারা বজায় রেখে বিশ শতকে কন্যাসন্তানের জন্মকে মনে করা হতো পরিবারের পক্ষে অভিশাপ। কেবল পণ প্রথার চাপে নয় পূর্ব সংস্কারের প্রভাবেও। সন্তান সম্ভবা মহিলা প্রথম সন্তানের জন্মের পূর্বে আকুল হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, যেন পুত্র সন্তানের জননী হতে পারেন। সেই সৌভাগ্যের ওপর নির্ভর করতো শ্বশুরবাড়িতে তাঁর আদর যত্ন সম্মানের প্রশ্নটি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শিক্ষিত পরিবারগুলি বাল্যবিবাহে তেমন উৎসাহ বোধ না করলেও ১৯৮৭ সারদা বিলে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলে ঝড় ওঠে প্রতিবাদের। এই বিল পাস হওয়ার (১৯২৯) পরও অনেকে সমর্থন করে গিয়েছিলেন বাল্যবিবাহ। এই একুশ শতকেও বালিকা বিবাহ বিরল নয়, এটা একটা সামাজিক সমস্যা রূপে বিদ্যমান।

সমাজ সংস্কারের প্রভাবে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে সুর কিছুটা নরম হলেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তাদের প্রশ্ন ছিল একটাই, লেখাপড়া শিখে কি মেয়েরা চাকরি করবে? শিক্ষা যে কেবল চাকরির জন্য অপরিহার্য নয় একথা তাদের মনে হয়নি একবারও। সমাজের প্রগতি যে নারী শিক্ষার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তা বুঝতে সময় লেগেছিল অনেক। পুরুষের ভয় ছিল লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা মানবে না পুরুষের কর্তৃত্ব। স্বাধীনচেতা হয়ে উঠবে, আলগা হয়ে যাবে পুরুষতন্ত্রের ভিত। আর মায়েদের দুশ্চিন্তা ছিল লেখাপড়া জানা মেয়ে, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে অগ্রাহ্য করবে পারিবারিক অনুশাসন, যার পরিণতি অশান্তি। তবে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য শতাব্দীর প্রয়াস যেখানে পূর্ণ সাফল্য পায়নি, দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাদের কলোনিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রী শিক্ষার ছবিটা একেবারে পাল্টে দিয়েছিল এক দশকের মধ্যে। ১৯৪৯-১৯৫৫ এর মধ্যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে গড়ে উঠেছিল ৩৪০টা স্কুল। ১৯৬০-৬১ তে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৮৫ টা।[৩] পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা দেখল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মেয়েরা কি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা জগতে। তবে অস্বীকার করা যায় না তাদের লেখাপড়া শেখার তীব্র অনুপ্রেরণার উৎস ছিল, অর্থনৈতিক সংকট এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থ উপার্জন করে স্বনির্ভর হওয়া।

বিশ শতকেও বাঙালির অন্দরমহলের ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। মেয়েদের জীবনে আরোপিত নিয়ম কানুনে উনিশ শতকের প্রভাব স্পষ্ট। নারীর আদর্শ স্থান ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। পুরুষের জগত বাইরে, নারীর অন্তঃপুরে, এই ভাবনা থেকে অধিকাংশ পুরুষ বেরিয়ে আসতে পারেনি বিশ শতকেও। ইচ্ছে করেই পুষে রেখেছিল এই ভাবনা, দুটো কারণে - প্রথম নারীর প্রতি পুরুষের যুক্তিহীন অবিশ্বাস; দ্বিতীয়, বাইরের জগতের আলোর স্পর্শে এলে তাদের চোখ ফুটবে, পুরুষের কর্তৃত্বে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে এই আশঙ্কা। অবরোধ প্রথার শিকার হয়েছিল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বঙ্গনারী। তাই এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল হিন্দু মুসলমান উভয় নারী সমাজ। শিক্ষিত হিন্দু মেয়েদের মতো মুসলমান বিদুষীরাও মেনে নিতে পারেননি অবরোধ প্রথা। ব্যক্তিগত জীবনে অবরোধ প্রথার তিক্ত অভিজ্ঞতা বেগম রোকেয়াকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন সংস্কার মুক্ত মুসলমান মহিলা।

উনিশ শতকে বঙ্গ সমাজে যে বিবাহ প্রথা ছিল তাকে আঁকড়ে রেখেছিল বিশ শতকেও। এই শতকেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিয়ে হত সম্বন্ধ করে। সেই বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর পছন্দ-অপছন্দ ছিল মূল্যহীন। ছেলে মেয়ের বিবাহ বন্ধনের পরিবর্তে গুরুত্ব পেত দুই পরিবারের বন্ধন। তবে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে যায় সম্বন্ধ করা বিয়েতে। উনিশ শতকের শেষের দিকেও ছেলে মেয়ের বিয়েতে ঘটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিয়ের সম্বন্ধ আনা থেকে বিয়ের সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে পত্রপত্রিকাগুলি বিয়ের বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ঘটকের বিকল্প হয়ে উঠলে ক্রমশ দাম কমল তাদের পেশায়। তাছাড়া ২০ শতক এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব ঘটতে থাকলো রোমান্টিক প্রেমের বিয়ের যেখানে পাত্র-পাত্রী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির মাথা গলাবার সুযোগ নেই। তথাপি সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার কথা যে বাতিল হয়ে যায়নি এই একুশ শতকেও তার প্রমান খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত রাশি রাশি বিজ্ঞাপন এবং অগুনতি বিবাহ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব।

সম্বন্ধ করে বা পূর্বরাগে বাধা পড়ে যেভাবেই বিয়ে হোক না কেন শুরুতেই দাম্পত্য জীবন ছিল মেয়েদের কাছে এক অন্যরকম যুদ্ধক্ষেত্র। একান্নবর্তী যৌথ পরিবার যদি বেজায় রক্ষণশীল হতো তাহলে নববধূর কপালে দুঃখের সীমা থাকত না। নববধূর দাম্পত্য জীবন উপভোগে পথের কাঁটা ছিল একদিকে করা পারিবারিক নিয়ম-কানুন অন্যদিকে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের সতত নজরদারি। এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সুবর্ণলতার।

বিশ শতকের প্রথমার্ধেও পুরুষ সমাজ মেনে চলছিল লিঙ্গবৈষম্যের তত্ত্ব। তাদের ধারণা ছিল নারী জাতি কখনো তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। তাই তাদের স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মেয়েদের দাবিটা ছিল ভিন্ন রকম। বেগম রোকেয়া দাবি করেন –

> "স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।"[৪]

বিশ শতকে নারীর স্বাধীনতা নিয়ে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল না। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের ভাবনাও অভিন্ন ছিল না। তবে অস্বীকার করা যায় না বিশ শতকে নারী স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ঠাকুর বাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী। বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধেও কোন কোন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সমর্থন করতে পারেননি উপার্জন করে মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বাধীনতাকে। নীরদ চন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯) ছিলেন মেয়েদের চাকরি করার প্রবল বিরোধী।[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ শতকে বঙ্গ নারীর পরিচয় ছিল নিরন্তর পরিবর্তনশীল।[৬] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতারা মেয়েদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য। ভারতীয় নারীর পরম্পরীন আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন সুকৌশলে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামকে পরিণত করা হয়েছিল মাতৃভূমির পূজা রূপে, ভারত হয়েছিল ভারত মাতা। উদ্দেশ্য ছিল নারী সমাজের ভাবাবেগকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাজে লাগানো। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়েছিল তাদের। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে দু-চারজন নারী উপস্থিত থাকলেও তাদের কোন ভূমিকা ছিল না। কংগ্রেসের নীতি নির্ধারক কমিটিতে তাদের স্থান তো দূরের কথা, অনুমোদন দেওয়া হত না তাদের সমস্যা উত্থাপনেও। জাতীয় নেতাদের বক্তব্য ছিল নারীর আদর্শ ভূমিকা জায়া ও জননীর। উপযুক্ত স্থান গৃহকোণ। রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ তাদের জন্য নয়।

লবণ সত্যাগ্রহের আগে পর্যন্ত গান্ধীজী ছিলেন এই ধারণার অংশীদার। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীবাদী আন্দোলন নারীকে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি রূপে তুলে ধরেছিল। যারা বিদেশী শাসকের বর্বর শক্তির রূপান্তর ঘটাবে অহিংস পথে অবিচলিত থেকে। নারীর গান্ধী মডেল আরোপ করা হয়েছিল পবিত্রতা সততা এবং কর্তব্য পরায়ণতা। এইরকম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নারী একদিকে পুরুষের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হয়ে পরিবারের দাসত্ব সামলাবে, অন্যদিকে প্রয়োজনে কাজ করবে দেশের জন্য।[৭] তবে অনেক নারীর এ রূপের সমর্থক ছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন সেই নারী যারা তেজস্বিনী নির্ভীক। সুভাষচন্দ্র মমতাময়ী সীতাকে চাননি চেয়েছিলেন শক্তিময়ী ঝাঁসির রানীকে।[৮] তিনি নারী সমাজকে ভাগ করেছিলেন দুই ভাগে ভগিনী ও মাতা। ভগিনীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে প্রত্যক্ষভাবে মায়েরা তাদের সমর্থন করবে পিছন থেকে।

নারী সমাজ জেগে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে। তাদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক ভিন্নমাত্রা পেয়েছিল নারী মুক্তির ধাত্রী হিসেবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েই স্বাধীনতার চিন্তা ও আত্ম উপলব্ধির প্রথম স্বাদ গ্রহণ করে নারী সমাজ। কিন্তু বঙ্গ নারীর এই ভাবনাকে গুরুত্ব দেননি জাতীয়তাবাদী নেতারা। এমনকি গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলি পর্যন্ত প্রথম দিকে মেয়েদের দলভুক্ত করতে চাননি, যদিও বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে। অনেক চেষ্টা করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার অনুমতি লাভ করেন করেছিলেন চট্টগ্রামে ইউরোপীয়দের ক্লাবে সশস্ত্র অভিযানে অংশ নিতে। চল্লিশের দশকে জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটলে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সব বাধা সরে যায় মেয়েদের সামনে থেকে। কমিউনিস্ট পার্টির দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল না মেয়েদের কাছে। সাম্যবাদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক শিক্ষিত মেয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দেশের কাজে পার্টির কাজে। ১৯৪৬ এর তেভাগা আন্দোলনে কমিউনিস্ট মহিলাদের ভূমিকা ছাপিয়ে যায় পুরুষদের। কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণে তেমন আগ্রহ দিল না। তথাপি মহিলারা এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে প্রাণ দেয় পুলিশের গুলিতে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাধীনতা এবং দেশভাগ এই তিনটি অভিঘাত বঙ্গনারীর জীবনে এনেছিল অভূতপূর্ব অচিন্ত্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে স্বাধীনতা ছিল অভিধা কারণ তাদের কাছে স্বাধীনতা আশীর্বাদ না হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল অভিশাপ রূপে। স্বাধীনতার অপর পিঠে দেশভাগ। স্বাধীনতা না হলে দেশ ভাগ হত না দেশভাগ না হলে হারাতে হত না বাস্তভিটে, ত্যাগ করতে হত না জন্মভূমি। ১৯৪৬ এর নোয়াখালী ও টিপে রাজধান দাঙ্গা ছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে অশনি সংকেত। এই দাঙ্গার পরিণামে অসংখ্য হিন্দু নারী ধর্ষিত হয় অপহৃত হয় বাধ্য হয় ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করতে। কিন্তু যেসব হিন্দু মেয়ে অপহৃত হয়ে উদ্ধার পায় তাদের জীবনে ঘনিয়ে আসে চরম বিড়ম্বনা। তারা পরিত্যক্ত হয় নিজের পরিবার ও সমাজের দ্বারা। নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। হারায় আত্মপরিচয়। ক'জনই বা জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের সুতারার মতো জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে তৈরি করে নিতে পেরেছিল নিজের আত্মপরিচয়?

ছেচল্লিশের এর দাঙ্গার পর শুরু হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের গণপ্রবার্জন। এরপর স্বাধীনতা এল কিছুদিন পরে দেশভাগ ধর্মের ভিত্তিতে। সিভিল র‍্যাডক্লিফের কলমের আচরের দাগ দেশের মাটিতে পড়েনি, পড়েছিল পূর্ববঙ্গের লক্ষ

লক্ষ হিন্দুর বুকের পাঁজরে। যাদের দেশ ছেড়ে নড়তে হয়নি, দেশভাগ তাদের দিয়েছিল স্বাধীনতা। আর যারা নিজভূমে পরবাসী হয়ে দেশ ত্যাগ করে তাদের দিয়েছিল উদ্বাস্তু তকমা। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষের কাছে প্রথম দিকে হয়ে উঠেছিল প্রায় অপরাধীর সমার্থক।

ইসমাত চুঘতাই লিখেছেন, সেদিন দেশটাই কেবল দুটো শরীরে বিভক্ত হয়নি বিভক্ত হয়েছিল মনটাও।[৯] একেবারে খাঁটি কথা। দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান ছিল একটা মনের দুই শরিক। তাদের সুসম্পর্ক সবক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েছিল আত্মীয়তার পর্যায়ে। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন মুসলমান দুধওয়ালা রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিয়ে জল চাইলে তার মা ঘরে যা থাকতো দিতেন। সে খুশি হয়ে খেত তারপর দুধের কলসিটা উপুড় করে দিত একটা কড়াইয়ে। তার মা বাধা দিলে সে বলত, - "ভাবেন না মাঠাইরেন আপনার পোলাডায় দিছে।"[১০] এক ভিন্নধর্মী মহিলার সঙ্গে মা ছেলের সম্পর্ক গড়ে তুলতো নির্দ্বিধায়।

হিন্দু মুসলমানের এই একটা মন প্রায় রাতারাতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল দেশভাগের ফলে, পূর্ব বাংলা পাকিস্তান বলে ঘোষিত হওয়ার পরই। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা মনে করল সেই দেশটা কেবল মুসলমানেরই হিন্দুদের কোন জায়গা নেই। তবে সব দোষটা তাদের নয়। আসলে পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাদা মনে ছিটিয়ে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার কালো কালি। অমনি শুরু হয়ে গেল হিন্দু নারী নিগ্রহ। এই ঘৃণ্য ঘটনাকে অনেক মুসলমান পুরুষ দোষাবহ বলে মনে না করলেও মুসলমান মেয়েরা সমর্থন করতে পারেননি তাদের। জ্যোতির্ময় দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে তমিজদ্দিন সাহেবের স্ত্রী তার স্বামীকে প্রশ্ন করেছেন –

> "তোমাদের দেশভাগ চাই, ঝগড়া করবে কর, আমাদের মেয়েদের মান ইজ্জত শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? কোরআনে আছে?"[১১]

বস্তুত ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ পুরুষ সমাজে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিলেও তেমনটা কিন্তু হয়নি নারী সমাজে। একজন মুসলমান নারী একজন হিন্দু নারীকে নিজের মতো করে একজন নারী হিসেবে দেখেছেন, হিন্দু নারী রূপে নয়। তারা বঙ্গনারী হয়ে উঠেছেন, মুসলমান নারী হয়ে পৃথক পরিচয়ে নয়।

দেশভাগ হল, লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হয়ে চলে এল এ বঙ্গে। কংগ্রেস সরকার প্রথমে তাদের উদ্বাস্তু বলে মানতে চাইল না। তাদের মনে হল পূর্ববঙ্গ থেকে এভাবে স্রোতের মতো উদ্বাস্ত চলে আসার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি সেখানে। সবটাই বানানো গল্প আর খবরের কাগজগুলোর মিথ্যে রটনা। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে সরকার বাধ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তু শিবির খুলতে। চরম অব্যবস্থা সরকারি অবহেলায় সেই শিবিরগুলো নরককে হার মানালো। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল লিখেছেন, -

> "কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প, ভদ্রকালিকা, যাদবপুর ক্যাম্প ও মানা ক্যাম্পে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দেখেছি নারী উদ্বাস্তুদের যারা অনেকেই বৃদ্ধা ও অসহায়... উদ্বাস্তু ক্যাম্প ঘুরলে বোঝা যায় সাতচল্লিশের দেশভাগ কত অসংখ্য পরিবারের জীবনকে কত নিষ্ঠুর ভাবে তছনছ করে দিয়েছিল... দেশভাগ দু তিনটে প্রজন্মের জীবনকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, নষ্ট করে দিয়েছে তাদের মানবিক সম্ভাবনা গুলোকে।"[১২]

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা উদবাস্তুদের বাধ্য করে কলকাতার উপকণ্ঠে সরকারি ও ফটকাবাজদের পতিত জমি জবরদখল করে মাথা গোজার ঠাই তৈরি করতে। জমি দখলের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেন উদবাস্তু মহিলারা। গড়ে উঠলো কয়েকটা উদ্বাস্তু কলোনি। ওদিকে পুলিশ ও জমির মালিকের ভাড়া করা গুন্ডারা তাদের উচ্ছাদ করার জন্য হামলা চালায়। পিছিয়ে গেল না উদ্বাস্তুরা। মহিলারাও মরণপণ লড়াই চালালেন, প্রাণ দিলেন পুলিশের গুলিতে দ্বিতীয়বার বাস্তুহারা না হওয়ার জন্য। এ লড়াইটা তারা পূর্ববঙ্গে চালাতে পারেনি দুটো কারণে, প্রথম সেখানে তারা ছিলেন সংখ্যালঘু, পুলিশ বা কিছু গুন্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করা আর একটা গোটা সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে

লড়াই করা এক নয়। একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়, এ বঙ্গের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যে সুযোগ পেয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে তা পাওয়া যায় নি। উদ্বাস্তু অবস্থায় ভিটেহারা নারীদের এক তরুণ চিত্র আমরা দেখতে পায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসে।

উদ্বাস্তুরা কলকাতার সাবেকি ভদ্র সংস্কৃতিতে ঘটায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিশেষ করে নারী সমাজে কলকাতার এত দিনের সুশীল শান্ত নারী সমাজে কাঁপন ধরিয়ে দিল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মধ্যবিত্ত মেয়েরা। তাদের রাজপথে দেখা গেল চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে। বেঁচে থাকার জন্য তারা বাধ্য হল পুরুষের পেশা গ্রহণ করতে। তবে এ কাজে মিশেছিল গ্লানি ও গৌরব একসঙ্গে। দেশভাগের পরিনামের শ্রেষ্ঠ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব বঙ্গ নারীর ভাবমূর্তিতে ঘটিয়েছিল পরিবর্তন। তারা সক্ষম হয়েছিল আত্মনির্ভরশীল হতে। বস্তা পচা সামাজিক বিধি নিষেধ অমান্য করতে। ফলে দেশভাগের ধ্বংস স্তুপের মধ্য থেকে ফিনিক্স পক্ষীর মত বাংলায় আবির্ভাব ঘটল এক নতুন নারী সমাজের। বঙ্গনারীর এই নতুন রূপ ছিল আগামী প্রজন্মের বঙ্গনারীর দিশারি।

Reference:

১. চৌধুরানী, দ. ই. (চৈত্র ১৩৩৫). সমাজে নারীর সত্য অধিকার. বঙ্গলক্ষী, ৩১৮

২. দেবী, আ. (১৪২৬). আর এক আশাপূর্ণা. কলকাতা, পৃ. ১৭

৩. Nandy, U. (2019, December). The Refugee Women in West Bengal and it's influence on Bengali culture. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 2 (12), P. 581-585

৪. বেগম, র. (২০০৬). রোকেয়া রচনাবলী. ঢাকা: বাংলা একাদেমি

৫. আইয়ুব, গ. (২০০১). গত ৫০ বছরে কলকাতার মেয়েরা. In আনন্দ সঙ্গী, প্রথম প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন, কলকাতা, পৃ. ৩০১

৬. Ghosh, S. (2007). Becoming a Bengali Woman: Exploring Identities in Bengali Women Fiction, 1930-1955. School of Oriental and African Studies, University of London.

৭. Ghosh, S. (2007). Becoming a Bengali Woman: Exploring Identities in Bengali Women Fiction, 1930-1955. School of Oriental and African Studies, University of London.

৮. Ghosh, S. (2007). Becoming a Bengali Woman: Exploring Identities in Bengali Women Fiction, 1930-1955. School of Oriental and African Studies, University of London.

৯. Ismat, C. (2004). Communal Violence and Literature. In R. M. edition, No Women's Land, New Delhi. p. 40

১০. সেন, ম. (২০১০). সেদিনের কথা. In ম. সেন, জনজাগরণে নারী জাগরণে : জন্মশতবার্ষিক রচনাসংগ্রহ. কলকাতা : থীমা, পৃ. ১৫

১১. দেবী, জ. (২০২০). জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন (খন্ড 1). কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

১২. মোকাম্মেল, ত. (২০১৬). দেশভাগ সীমান্ত রেখা ঘটিয়েছে সমূহ সর্বনাশ, (অ. বিশ্বাস, Ed.) কলকাতা : গাঙচিল

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 697 - 704
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনে জাতীয়তাবাদী ধারণা

নিবেদিতা দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, সিঙ্গুর, হুগলি
Email ID : debnathnibedita2024@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bankimchandra, Nationalism, Patriotism, Society, Swadeshi movement, Anandmath, Bangadarshan, Dharmatattwa.

Abstract
The concept of Swadesh (homeland) has evolved significantly over time. In ancient and medieval periods, it did not carry the same nationalistic meaning as it does today. During monarchical rule, a ruler's domain was considered Swadesh, and the subjects' loyalty was directed toward their king rather than a collective nation. The idea of patriotism, in the modern sense, was absent. People fought to defend their ruler's territory, but their allegiance was personal rather than ideological. Unlike Bhagat Singh, who fought for an independent nation, the warriors of Shivaji or Rana Pratap were loyal to their respective rulers, not to a broader nationalist cause.

The transformation of Swadesh into a concept of national identity gained momentum after the French Revolution, which led to the decline of monarchy and the rise of democracy. This shift redefined sovereignty, placing power in the hands of the people instead of a single ruler. Nationalism emerged as a psychological and ideological force, fostering a deep sense of allegiance to one's homeland. As these ideas spread across the world, they also influenced India and Bengal.

In Bengal, literature played a crucial role in shaping nationalist consciousness. Poets, philosophers, and novelists introduced and reinforced the idea of Swadesh through their works. Bankim Chandra Chattopadhyay was a key figure in this intellectual movement. His writings reflected the transition from loyalty to a king toward a broader sense of national identity. His novels and essays not only depicted patriotism but also provided a philosophical foundation for nationalism in Bengal.

This research paper explores the rise and evolution of nationalism in Bengali society from a socio-philosophical perspective. By analysing Bankim Chandra's works, it examines how he conceptualized Swadesh and contributed to the nationalist discourse. Through this study, we gain insight into the intellectual and cultural shifts that shaped the nationalist movement in Bengal and India.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় স্বাধীনতার ধারণাটি ক্রমশ বিকশিত হতে শুরু করে। যদিও প্রথম দিকে স্বাধীনতার ধারণাটি ছিল মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে এই স্বাদেশিকতার ধারণাটি বিকাশ লাভ করে। স্বদেশচেতনা, স্বদেশপ্রীতি, স্বজাত্যবোধ প্রভৃতি শব্দগুলিকে উনবিংশ শতাব্দীর ফসল বলা যেতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষের স্বদেশচেতনার আন্দোলন প্রথম শুরু হয় ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় সংস্কারবিরোধী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে। ভারতবাসীর এই প্রয়াসই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্মভূমি বা উৎস স্থল ধরা হয়ে থাকে উনবিংশ শতকের বাংলাকে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ক্রমে সংগঠিত হতে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজেও অনুপ্রবেশ ঘটে জাতীয়তাবাদ এর। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে। বাঙালি, মূলত হিন্দু উচ্চবিত্ত সমাজ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হতে শুরু করে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে তারা পরিচিত হয় সমগ্র বিশ্বের সাথে। তাদের আন্দোলন, চিন্তাভাবনা, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি প্রভাব ফেলতে শুরু করে বাংলায়। তৎকালীন গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাস বা সংবাদপত্রের হাত ধরে সাধারণ জনগনের কাছে পৌঁছয় এই ধারণা। লেখক তার ক্ষুরধার লেখনীর মধ্যে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে তখনকার শিক্ষিত সমাজকে। যা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে। কাজেই বলা যায় বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ধারণা এসেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ বণিকদের শাসন ও নামে মাত্র নবাব শাসকদের লোভ-লালসায় বাংলার জনজীবন যখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই দুর্দিনে কিছু কবি নতুন গানের শাখা গড়ে তোলেন, যা টপ্পা গান হিসাবে পরিচিত। এই টপ্পা গানের বিখ্যাত গীতিকার রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধু বাবুর রচনার মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম স্বদেশী ভাষার প্রতি প্রেমের ছায়া দেখতে পাই। তাঁর রচনায় স্বদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার যে য সুর বেজেছিল পরবর্তীকালে কবিদের রচনায় তাই আরো পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত রূপে পরিস্ফুটে হয়েছিল। স্বদেশী ভাষার প্রতি ভালোবাসায় কবি গেয়ে উঠেছেন, -

“নানান্ দেশে নানান্ ভাসা (ভাষা)
বিনে স্বদেশীয় ভাসে পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর,
কি বা ফল চাতকীর
ধরাজল বিনে কভু
ঘুচে কি ত্রিষা (তৃষা)?”[১]

এর পরবর্তীতে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় রাজা রামমোহন রায়ের বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরেই জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই ধর্মের বেড়াজাল পেরিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে তারা। বিভিন্ন দুর্নীতি, অরাজকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলনে কখনোই পিছুপা হবেন না। বাল্যকাল থেকেই তিনি হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে নানা সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে তাকে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ। ১৮২৩ সালের ১৪ই মার্চ অস্থায়ী গভর্নর জন এডাম সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করলে তার বিরুদ্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। তাঁর ভাষায় করুণা আবেদন ছিল না বরং দেশপ্রেমের গভীরতা ও নির্ভীকতাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার জন্য হিন্দু ধর্মের কিছু পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ আন্দোলন ছিল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন। হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করলেও তিনি কিন্তু কখনোই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণের কথা ভাবেননি। তাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হলে খুবই কঠোর ভাবে তা তিনি নিষেধ করেন। তাঁর মতে এই হিন্দু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধর্মের সংস্কারের মধ্যে দিয়েই তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব। ধর্ম পরিবর্তন এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শৈশব থেকেই বেদ, উপনিষদ, কোরান, বাইবেল ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করার ফলে রামমোহন উপলব্ধি করেন সকল ধর্মের মূল কথা একই। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি একেশ্বরবাদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা Universal Religion বা সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মের নাম দেন Religion of man।

স্বদেশ চেতনা গড়ে তুলতে তৎকালীন পত্রিকাগুলির অবদানও ছিল অনস্বীকার্য। যেমন সমাচার দর্পণ, বাংলা গেজেট, গসপেল ম্যাগাজিন, ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী, সংবাদ প্রভাকর ইত্যাদি পত্রিকাগুলি জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এইসব পত্রিকায় বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক খবরাখবর, সমালোচনা ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙালির মনে স্বজাত্যবোধ ও স্বদেশ চেতনা জাগ্রত হয়।

তবে মনে করা হয় যে, ডিরোজিওর ভাবনাতেই জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। তাঁর লেখা বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুব সমাজকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন, -

“My country! In thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where the reverence now?”[২]

তাঁর শিষ্যগোষ্ঠী নব্য বঙ্গ বা Yong Bengal নামে পরিচিত ছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন নবন্দোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রশিদ কৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখেরা ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যারা তার স্বাদেশিকতার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতাত্ত্বিক বিষয়, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সমাজ সংস্কার, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রচনা, যা সাধারণ মানুষের উপযোগী সরল ভাষায় রচিত। প্রাচীন বেদান্ত ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছাত্রদের মধ্যে বেদান্ত শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে। তার মতে আমাদের ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনি প্রাচ্য শিক্ষার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তার এই ধর্মপ্রীতি, স্বদেশ প্রীতি বা স্বজাতি প্রীতিরই অপর একটি রূপ।

অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় এর শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সংস্কৃতি চিন্তা; প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘সাহিত্যসাধনা’; ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকা; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্য, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক সমস্তই বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ক্রমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবাদী আবহে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে জুন রাত্রি নটার সময় বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতা যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি কালেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা হয় মেদিনীপুরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। পরবর্তীকালে হুগলি কলেজে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ১৮৫৭ সালে বিএ পাস করেন। এরপর ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। সরকারি কর্মচারী হলেও তাঁর ক্ষুরধার লেখনী বঙ্গসমাজের জাতীয়তাবাদী ধারাকে এক অন্যমাত্রায় উন্নীত করে। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি ও সাংবাদিক। তাঁর লেখা সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, যা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো বিকশিত করে। কেবল বিনোদনমূলক নয়, তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয় দেশপ্রেম, নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরোধিতা, দর্শন ইত্যাদি, যা বাংলা সাহিত্যকে এক উচ্চমাত্রায় পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী ও কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা, যেন যথালাভের মতো। কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না, সাহিত্যের যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন।"[৩]

অতএব বলা যায় সমাজের সাথে জড়িত সব বিষয়েই তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে।

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, যাকে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণের অন্যতম দূত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ধর্মতত্ত্বে স্বদেশপ্রীতি প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য মত উদ্ধৃত করে বলেন – "এই জন্য হর্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন 'The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units'." অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশ রক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এইজন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।"[৪] দেশ রক্ষা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। আত্মরক্ষা বা স্বজন রক্ষা আমাদের কর্তব্য হলেও তা সমগ্র দেশের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, আমাদের পরিবারবর্গ সমাজে সামান্য অংশ। তাই সমুদায়কে সামান্যের জন্য ত্যাগ করা উচিত নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেশ রক্ষা আমাদের পরম কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে তার মতবাদে আমরা হিতবাদের বা উপযোগীতাবাদের পরিচয় পাই। হিতবাদের চরম উদ্দেশ্যই হল সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক ভালো। মিল, বেন্থাম, কোৎ প্রমূখ হিতবাদীদের দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তারে লেখায় পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন ইত্যাদির প্রভাব যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি পরিণত বয়সে তার লেখায় এক আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ধর্মতত্ত্বে তিনি একদিকে যেমন পাশ্চাত্য হিতবাদের কথা উল্লেখ করেন তেমনি এক চরম আধ্যাত্মিকতারও অবতারণা করেছেন। আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বলেন আত্মরক্ষার মতো স্বজনরক্ষা বা দেশরক্ষাও ঈশ্বরের আদেশ কেননা 'ইহা সমস্ত জগতে হিতের উপায়'। দেশরক্ষা ঈশ্বর উদ্দিষ্ট কর্ম, তাই আমাদের সকলেরই তা পালন করা উচিত। এই দেশরক্ষা ঈশ্বর নির্দেশিত হওয়ায় তা সহজেই নিষ্কাম কর্মে পরিণত হয়। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত মতবাদে হিতবাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদ, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মতবাদের এক মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। তিনি ধর্মতত্ত্বে বলেন,-

> "যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।"[৫]

পাশ্চাত্য মতের অনুকরণে তিনি স্বদেশপ্রীতি ব্যাখ্যা করা শুরু করলেও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা থেকে তাঁর মত ছিল সর্বাঙ্গীণভাবে পৃথক। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ কিরকম। সেই প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় Patriotism-এর সমালোচনা করে বলেন –

> "ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কারিয়া, ঘরের সমাজে আনিব।"[৬]

কিন্তু তাঁর মতে স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত মাপকাঠি হল, -

> "পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না।"[৭]

ধর্মতত্ত্বে 'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ' বলে উল্লেখ করলেও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ নিজ প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই জাতীয়তাবাদী ধারণা ক্রমে ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যদিও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সাথে যুক্ত, অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল পুরোপুরি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় মোরা। একদিকে ইউরোপীয় আগ্রাসী মনোভাব অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় পাই 'সর্ব্ব লোকে সমদৃষ্টি'। এই ইউরোপীয় দেশপ্রেম ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ধারণাগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা স্বীকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করতেই হয় ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে ইউরোপীয় দেশপ্রেমকে খুবই হেয়প্রতিপন্ন করা হলেও, তার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। অপরদিকে বঙ্কিমের স্বদেশ প্রেমের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা দাওয়া ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেছেন, -

> "বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'।"[৮]

তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতা বিষয়ে গভীর ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। তার লেখনীতে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ অঙ্গাঙ্গী কিভাবে জড়িত ছিল। জাতীয়তাবাদ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তাকে ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তির ওপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আনন্দমঠে মাতৃভূমি দেবীরূপে পুঁজিতে হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনের চরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় আনন্দমঠ উপন্যাসে। এখানে দেশকে 'মা' রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে আর সন্ন্যাসীগণ হলেন তার সন্তান। সন্তানের কাছে যেমন মাতা দেবীরূপে পূজ্য তেমনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ব্রতী বিদ্রোহীদের কাছে দেশোমাতৃকাও সমানভাবে পূজ্য। ভবানন্দের কথায় আমরা পাই, -

> "আমরা অন্য মা মানি না - জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, - স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা।"[৯]

মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদের এই ধারণাই প্রকাশিত হয় 'বন্দেমাতরম্' গানটির মধ্যে দিয়ে। আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেম ও ধর্মকে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে দেশপ্রেম এক নতুন আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি নিষ্কাম ধর্মসাধনা ও অনুশীলন তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। 'সন্তান' নামধারী সন্ন্যাসীদের নিজের জীবন তুচ্ছ করে শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজের দেশকে উদ্ধার করার বীরগাথা প্রতি ছত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় আনন্দমঠ উপন্যাস মাসিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। যার ফলে বাঙালি সমাজে জাতীয়তাবাদের এক চরম রূপ দানা বাঁধতে থাকে। এর প্রভাব এতই গভীর ছিল যে ইংরেজ সরকার অব্দি তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনে। আনন্দমঠে যে বন্দেমাতরম মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল তা আজও প্রতিটি দেশপ্রেমীর মনে শিহরণ জাগায়। বঙ্কিম পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই আনন্দমঠ উপন্যাস ও বন্দেমাতারম্ মন্ত্রের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশমাতার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় 'সাম্য' রচনা কালে তার মধ্যে যে যুক্তিবাদ এর পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালে তিনি তার থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন। তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চরম যুক্তিবাদ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খুব একটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ডিরোজিওপন্থী গণের কথা মাথায় রেখে হয়তো তিনি যৌক্তিকতার ওপর প্রাধান্য না দিয়ে ঐতিহ্য ও ধর্মেই উৎসাহ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদ বলতে যে চরমভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা করেছিলেন তা বলা যায় না বরং ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায় একটি স্বাধীন ও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত জীবনের কথা বলেছিলেন। M. K. Haldar বলেছেন, -

> "Nationalism for Bankim was not a creed for ousting the British rulers from India; it was a plea play for better conditions of living for his people within the periphery of Hinduism and under the protective umbrella provided by the British rule of the law."[১০]

অতএব তার কাছে কাম্য স্বাধীনতা হলো ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কাছে সুরক্ষামূলক আশ্রয় ও ভালোভাবে বাঁচার শর্তের জন্য স্বনির্বন্ধ অনুরোধ - একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তৎকালীন ভারতের প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর সাধারণ ধারণাই এর অনুরুপ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বজাত্যবোধকে শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের *বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতি প্রবন্ধে,*' The Real Father of Indian Nationalism' বলে অভিহিত করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে Nationality বা Nation বলতে জাতি অর্থ করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা বা Liberty ও স্বতন্ত্রতা বা Independence-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে,-

"যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।"[১১]

অতএব রাজা স্বজাতীয় বা পরজাতীয় যাই হোক না কেন যে রাষ্ট্রে প্রজার কল্যাণ সাধিত হয় সেই রাজ্যই স্বাধীন। অর্থাৎ স্বাধীনতার বা রাজনৈতিক মুক্তির শর্তই হল প্রজাদের কল্যাণ সাধন। মানুষের কল্যাণের থেকে কোন কিছুই বেশি উপযোগী নয়। তিনি বলেন, -

"আমরা পরাধীন জাতি - অনেক কাল পরাধীন থাকিব - সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।"[১২]

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে দেশচিন্তার প্রকাশ দেখা গেলেও 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই প্রথম স্বদেশ প্রেমের প্রকাশ দেখতে পাই। তিনি মনে করতেন বাঙালি যদি তার ইতিহাসকে না জানে তবে কখনোই তার মধ্যে স্বদেশ চেতনা বিকশিত হবে না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বা বাঙালি মনে স্বদেশচেতনা জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন বাংলার গৌরবময় ইতিহাসকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। কিন্তু বাংলা ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে তিনি পদে পদে ইতিহাস সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব অনুভব করেছেন। তাই আক্ষেপের সুরে 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধে বলেন, -

"যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম ও ওয়াটর্লু-ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙালী আজকাল বড়ো হইতে চায়, - হায়! বাঙালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাংলার ইতিহাস চাই। নাহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না।"[১৩]

বস্তুত মৃণালিনী উপন্যাসের পটভূমি ছিল বখতিয়ার খিলজী দ্বারা গৌড়রাজ লক্ষণ সেনের পরাজয়। মনে করা হয়, এই সময়কার ইতিহাস জানার জন্য তাঁর কাছে ছিল কেবল আবু ওমর মিনহাজউদ্দিন রচিত 'তাবক্ত ই-নাসিরি' নামক প্রাচীন পারসিক গ্রন্থ। যেখানে বলা হয় সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বখতিয়ার খিলজী বঙ্গবিজয় করেন। তিনি এই সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বঙ্গবিজয়ের কাহিনীতে বাঙালীর যে ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় আছে তা মেনে নিতে পারেননি। সেইজন্যই তিনি কল্পনা ও যুক্তির মিশ্রণে বাঙালির এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেছেন মৃণালিনী উপন্যাসের। তবে তিনি ইতিহাসকে অস্বীকার করেননি। ফলে চরিত্রগুলি হিন্দু রাজ্য পুনরুদ্ধারে সফল হয়নি। বাঙালির এই পরাজয় তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন ঠিকই, তবে স্বজাতির এই পরাজয় তার স্বজাত্যবোধে বারবার আঘাত হেনেছে। এখান থেকেই তার স্বাদেশিকতার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। তিনি মাধবচার্য চরিত্রটি চিত্রায়িত করেছেন একজন আদর্শবাদী ও জাতীয়তাবাদী উদ্যোগী পুরুষ হিসাবে। যার একমাত্র চিন্তা ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা। অতএব বলা যায় মৃণালিনীতে স্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করা হয়, তা অঙ্কুরিত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পরবর্তীকালে তাঁর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম উপন্যাসে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় 'সাম্য' মতের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরেই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠেছে।[১৪] ১৯৬৬ সালে বঙ্গদেশে আনন্দমঠ-এর বিরুদ্ধে বহ্নি উৎসব হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি উপন্যাসকে মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ গ্রন্থ বলা হয়।[১৫] তাঁর মতো জ্ঞানী মনীষীও জাতি বিরোধের অভিযোগের হাত থেকে মুক্ত নয়। তবে সমালোচনাগুলি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ বা উপন্যাসের বিরুদ্ধে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার কোনো অভিযোগ সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে উগ্র জাতীয়তাবাদের আপাত প্রকাশ হওয়ায় এই ধরনের সমস্যার উদ্রেক হয়েছে। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষত কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রায়নের সময় বিভিন্ন ধরনের বিদ্বেষ মূলক শব্দ তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে বলা যায় ইসলাম

ধর্মের বিরুদ্ধে বা জাতির বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ ছিল না, তবে কিছু শাসক যেমন ঔরঙ্গজেব প্রমূখ, এদের চরিত্র চিত্রণের সময় তিনি বেশ কিছু বিদ্বেষমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তার অভিযোগ ব্যাক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে; কখনোই সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে নয়। অতএব –

> "আনন্দমঠের তথাকথিত মুসলমান বিদ্বেষ এক্ষেত্রেও কার্যকর হইল না। বঙ্কিম সাহিত্যে এই যে মুসলিমবিদ্বেষের সন্ধান লাভ ইহা নতুন ও আনকোরা কথা। বাস্তবতার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক অভিসন্ধির কাছে সাহিত্যকে নিযুক্ত করিলে পরিশেষে সাহিত্যেরই সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়।"[১৬]

'হিন্দুত্ব' বলতে তার কাছে মনুষ্যত্ব বা মানবতার প্রতি প্রেম তথা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। কখনোই শুধুমাত্র একটি ধর্ম বিশেষ নয় বা মুসলিমদের অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই তাকে সেই অর্থে সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। তার লেখায় হিন্দু মুসলমান মিলে রাষ্ট্র গঠনের কথা পাই। যাকে Hindu-Muslim Solidarity বলা হয়, সেই হিন্দু মুসলমানের ঐ হার্দিক ঐক্য ও আন্তরিক যোগাযোগ ভিন্ন এই খন্ড ভারতে যে এক মহাভারত স্থাপিত হতে পারে না বঙ্কিমচন্দ্র তা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৮৪-৫ খ্রিস্টাব্দে 'প্রচার'এ প্রকাশিত 'সিতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, - "তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু -মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন সেও তিনি করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান। উভয়েই তোমার প্রজা হইবে।" এই প্রসঙ্গে সুধি নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় লিখেছেন, -

> "বস্তুতঃ তাঁহার দেশপ্রীতি ও দেশধর্ম কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিজাত নহে। তাঁহার মূলে আছে - সমগ্র জাতির মানুষের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ মমত্ব-বোধ ও রক্ত-ধারার প্রতি তাঁহার অপরিমিত শ্রদ্ধা।"[১৭]

তবে গোঁড়া হিন্দু পরিবারে বড় হওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্মের আধিক্য লক্ষ্য করা যাবে এটাই স্বাভাবিক। সেটি ছিল তৎকালীন সমাজের প্রভাব। হিন্দু দেব-দেবী বা মন্দিরের কথা উল্লেখ করলেও কখনোই তিনি অন্য জাতিকে হেও চোখে দেখার কথা বলেননি।

Reference:

১. https://alkama.org/Classicpoems/SwadeshiBhasha.html, 7 March 2025. Bengali. 29 March 2025.
২. Derozio, Henry Louis Vivian. To India-My Native Land. 1828
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ. ৫৩৪
৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১, পৃ. ৬৬০
৫. ঐ
৬. ঐ, প. ৬৬১
৭. ঐ
৮. দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, দার্শনিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীভারতী প্রেস, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬১
৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬০, পৃ. ৭২৫
১০. Haldar, M.K. Renaissance and Reaction in Nineteenth Century Bengal. Calcutta: Minerva Press,1977. P. 117

১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ২৪২

১২. ঐ, ২৪৫

১৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১, পৃ. ৩৩৬

১৪. ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া সেন, উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ চিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৯৬

১৫. ফজল, আবুল, 'বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা', মানবতন্ত্র। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৩

১৬. করিম, রেজাউল, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭

১৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'সীতারাম', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৯৩৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 705 - 713
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রে কৃষকবিদ্রোহ

অদিতি রায়
Email ID : aditiroy.a2019@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Peasant Revolt, Permanent Settlement, bourgeois class, 19th century, Grambarta Prakashika, middle-class intellect, class conflict, newspapers.

Abstract

Agriculture has been the mainstay of the Indian and Bengali economy, yet farmers have historically been the most exploited and deprived class. Especially after the Permanent Settlement, the farmers of Bengal were utterly devastated. While one peasant revolt after another occurred from the late 18th century through the 19th century, the newly educated modern middle class did not support these uprisings. Bengali literature played a significant role in this indifference. Not only novels and plays but also prominent articles, periodicals, and newspapers spoke against the peasant struggles. In fact, most newspapers were patronized by the British Government or the landlord class. Moreover, both the writers and the readers belonged to the so-called 'bourgeois class'. So, the peasant crisis, discontent, and struggles were nothing more than the despoilment of a barbaric society to them.

This article aims to show how the educated Bengali society accepted British rule as a model of ideal governance and how the newly formed absentee landlord class consistently received support from writers and newspapers. Although the 19th-century Bengali intellectuals often tried to understand the suffering of the peasants, they could never transcend their own class boundaries and connect with them. Despite showing sympathy, they did not support any revolts except the Indigo Rebellion. Some newspapers, like Grambarta Prakashika and Satsanga, played a vital and exceptional role in expressing the true needs and crises of farmers' lives. However, the majority of newspapers and reports failed to represent social history impartially. As a result, the Santal Revolt was portrayed as a robbery, and the Barasat Revolt appeared as a communal riot in the news reports of the 19th century.

By highlighting various examples from Bengali newspaper reporting of that era, this article aims to show how class conflict developed in the Calcutta-oriented modern Bengal. While post-Chaitanya medieval literature emphasized the lives of common people, including farmers, this study will identify specific features illustrating how the modern Renaissance alienated the middle-class intelligentsia from the masses.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বাংলার নবজাগরণের শতক উনিশ শতক। সামাজিক অনুশাসনের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে নবচেতনার উন্মেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে ভাস্বরিত হওয়ার শতক। কিন্তু ইংরেজি ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত কলকাতা-কেন্দ্রিক 'আধুনিক' বাঙালিমানসের জাগরণের এই শতক কি সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শেখায় নবনির্মিত নাগরিক-মধ্যবিত্ত সমাজ তথা বাঙালি মণীষাকে? পরমধ্যযুগের শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, গীতিকা ইত্যাদি কৃষক-সহ সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য উপাদান খুঁজে পেয়েছিল কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা কৃষক বিদ্রোহের এক জ্বলন্ত ক্ষেত্র হওয়ার পরেও উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সাময়িকপত্র তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্য বেড়ে উঠল আপামর কৃষক জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রেখে। অথচ বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হল কৃষি এবং আবহমান কাল জুড়ে, বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে কৃষকদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে করুণ, শোষিত এবং অত্যাচারিত। ব্রিটিশ শাসকের লুণ্ঠনে, সম্পদের নির্গমনে, অবশিল্পায়নে, খাজনায় ও দাদনে বুভুক্ষু ভারতবর্ষে ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৯০১ অবধি ঘোষিত দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ২৭। ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ – এই সাতচল্লিশ বছরে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত হিসাবে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার[১]। অথচ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া কৃষককুলের অভাব, অভিযোগ জানানোর কোনো জায়গা ছিল না, তাই বার বার অসম সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তারা। চরিত্রগত ভাবে তাই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে, নায়েক বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, তন্তুবায়দের সংগ্রাম, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফরাজি আন্দোলন, বারাসাত বিদ্রোহ ইত্যাদি এমনকি অনেকের মতেই সিপাহী বিদ্রোহও বুভুক্ষু কৃষকদেরই সংগ্রাম। কিন্তু সাহিত্যের মূল স্রোত ছেড়ে যদি তৎকালীন সংবাদপত্রের দিকে তাকানো যায় তাহলে সেখানেও এই বিদ্রোহগুলি নিয়ে নিরপেক্ষ প্রতিবেদন চোখে পড়ে খুব কম। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষের বাংলা সংবাদপত্রের কাছে বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক তথ্য কাম্য থাকে। কিন্তু এই আঞ্চলিক লড়াইগুলি কলকাতার বৃহত্তর নাগরিক সমাজ দ্বারা সমর্থিত না হওয়ার জন্য এই সংবাদপত্রগুলিও কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিবেদনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরে তৎকালীন উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনের বিশেষ প্রবণতা চিহ্নিত করাই হবে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সমাচার দর্পণ - ১৮১৮ সালে মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সমাচার দর্পণ। মিশনারি উদ্যোগে প্রকাশিত বলেই হয়ত সরাসরি সরকার বিরোধিতা এই পত্রিকা করেনি। জমিদারের শোষণ ও অত্যচার সম্পর্কেও কোন বিশেষ প্রতিবেদন পাওয়া যায়না। তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষকেই বিদ্রোহের মূল কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

সমাচার চন্দ্রিকা - ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮২২ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আত্মপ্রকাশ। কৌলীন্যপ্রথা ও জমিদার শ্রেণির পক্ষপাতী এই পত্রিকাটির একটাই ইতিবাচিক কাজ হল, নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। আসলে জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের ক্রমবর্ধমান বিরোধ যতটা এর কারণ, কৃষক সহমর্মিতা ততটা নয়। জমিদার শ্রেণিকে এরা দ্বিধাহীন ভাবে সমর্থন করে গেছে।

সংবাদ প্রভাকর - বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর। জমিদারশ্রেণি দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এই সংবাদপত্রে কৃষকমণ্ডলীর দুর্দশার জন্য সূর্যাস্ত আইনসহ সরকারি নীলাম সংক্রান্ত নিয়মগুলিকে দায়ী করা হচ্ছে। লেখা হচ্ছে, জমিদাররা নিঃস্ব, তারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে্রে অসীম চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত থাকেন এবং দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার বাকি খাজনার নালিশ উপস্থিত করেন না। তবে এরা মহাজন, তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের কৃষক-শ্রমে পুষ্টিবর্ধনের কথা উল্লেখ করেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে এদের মনোভাব ছিল একেবারেই ইংরেজ পক্ষপাতদুষ্ট। তাদের মতে, 'অসভ্য সাঁওতালরা' এ দেশের 'ভীরুস্বভাব, নির্দোষ' লোকদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। সাঁওতালরা সংগ্রামপুরের নীলকুঠি লুট করলে এরা

লিখছে এই বিদ্রোহ দমন যথার্থ ভাবে করা হয়নি। অসভ্য সাঁওতালরা পুনর্বার প্রজাদের উপর অত্যাচার করছে এবং এক 'সাঁওতাল পত্নী' তাদের অধ্যক্ষা হয়ে বিদ্রোহ চালনা করছে, সরকার যেন অত্যাচারী সাঁওতালদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করে। এদের মতে নীলচাষিদের সর্বনাশের মূল হল নীলকর, রেশমকর, কুঠিয়ালেরা। নীলকরদের অত্যাচারকে তুলে ধরা হয়েছে স্পষ্ট ভাবে –

> "কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই হাল, মাল, ঘর, দ্বার, জরু, গোরু, লতা, তরু, ধান, গোলা, আদা, ছোলা, ধুচুনি, কুলো, বেগুন, মুলো ইত্যাদি বাস্তু বৃক্ষ কিছুই রাখেনা। ... কুঠিয়ালরা অনেক জায়গায় 'ইজারাদার', 'পত্তনিদার', 'তালুকদার' হয়ে ঢোকেন ও সর্বনাশ করেন।...ভাণ্ডামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা বড় বড় ভদ্র ভদ্র সঙ্গতিসম্পন্ন প্রজাপুঞ্জের বড় বড় কোটাবাড়ী ভঙ্গ করিয়া উচ্ছন্ন দিয়া ভদ্রাসনে নীল বুনিয়া এককালীন গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দেন।"[২]

বলা হচ্ছে, বঙ্গদেশের পূর্ব ও উত্তর সীমানায় এমন অত্যাচার চলেছে যে দেখে মনে হয় এই রাজ্য যেন –

> "সুসভ্য, সুধার্মিক, সুশাসক, প্রজাবৎসল ব্রিটিশ গবরণমেন্টের রাজ্যই নহে...। আমরা যে সকল কথা শুনিতে পাই, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া লিখিতে সাহস হয় না।"[৩]

সরকার বিরোধিতা তো দুর, ইংরেজ সরকারের কোন বিকল্পের কথা পত্রিকাটি ভাবতেই পারেনি।

সত্যার্ণব - খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বাংলা পত্রিকাগুলির আক্রমণের জবাব দেবার জন্য ১৮৫০ এর জুলাই মাসে চার্চ অফ ইংলন্ডের মিশনারিদের পক্ষ থেকে জেমস লং-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক সচিত্র পত্রিকা সত্যার্ণব সরকার-বিরোধিতা না করলেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে এবং কৃষক তথা এদেশের দরিদ্র মানুষের পক্ষে, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। প্রতিবেদনে জমিদারদের অনুরোধ করা হয় নীচজাতির প্রতি দয়া প্রকাশ করতে। মাথট, সুদ, সুদের বোঝায় জমিদার, মহাজনরা কীভাবে প্রজাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে সর্বস্ব হরণ করছে তার স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে এই পত্রিকা।

বিবিধার্থ সংগ্রহ - রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনাকালে 'নীলদর্পণ' এর বিস্তৃত সমালোচনা (আষাঢ়, ১৭৮৩ শক) প্রকাশিত হয় যার ফলে সরকারের কোপ পত্রিকাটির উপর পরে। পরিণামে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

সমাচার সুধাবর্ষণ - ১৮৫৪ সালে দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দি) এই দৈনিক পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন ধর্ম কর্ম বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী হলেও ইংরেজ রাজত্বের অবসান তাঁর কাম্য ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহকে সমর্থন করতে না পারলেও ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহীদের দিল্লি ঘোষণাপত্র তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহকে এরা পরিবেশন করেছে অত্যাচার, লুন্ঠন, হত্যা, অপহরণ, সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদির ঘটনা দিয়ে। ব্রিটিশ দমননীতিকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সমর্থন করেছে। আবার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মেং লচ সাহেবের কত পরিশ্রম হয়েছে সেই বিষয়েও দুঃখ প্রকাশ করেছে। এমনকি সরকারি বিজ্ঞাপনও হরকরা থেকে এরা উদ্ধৃত করছে –

> "যে যে ব্যক্তি সাঁওতালদিগের রাজার মস্তক কাটিয়া দিবেক তাহাকে পাঁচ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন, আর যিনি তাহার অনুচরের শিরচ্ছেদন করিইয়া আনিবেন তাহাকেও প্রত্যেকের মস্তকের হিসাবে ১০০০ টাকা প্রদান করণে সম্মত হইয়াছেন।"[৪]

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরার পিছনে এরা রেলওয়ের সাহেব দ্বারা সাঁওতাল স্ত্রী অপহরণের ঘটনার উল্লেখ করেছে। কিন্তু সাঁওতাল স্ত্রীলোক অপহরণের ঘটনা যেন অতি সামান্য ঘটনা তাই তা সংক্রান্ত আর কোন সংবাদ বা সাঁওতালদের অসন্তোষের পিছনে দীর্ঘদিনের অত্যাচার নিয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। বরং ওই একই প্রতিবেদনে এইভাবে লেখা হচ্ছে, -

> "পর্বতবাসিদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয় লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। তাহারা ঝিকরহাটীতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছে বোধহয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না। ...অনল দ্বারা গৃহাদি ২০

> ক্রোষ ব্যাপীয় দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আমি এই বিষয়ে ঐ অসভ্য পর্বতীয় লোকদিগকে বড় দোষি করিতে পারি না, বিবেচনা করিলে গবর্ণমেন্টের প্রতিই সকল দোষ অর্পিত হইতে পারে কারণ নিকটস্থ কোন স্থানে সৈন্য থাকিলে কদাচ এরূপ হইত না।"[৫]

ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় মুগ্ধ এই পত্রিকা লিখছে, -

> "এ স্থলে প্রদেশস্থ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত ঢুগুড সাহবকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ করিতে কদাপি বিমুখ হইব না। তিনি শারীরিক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও এ প্রদেশকে.... অবিনীত অসভ্য সাঁওতালদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন।"[৬]

পত্রিকার মতে, -

"সাঁওতালরা পশুবৎ অসভ্য ও নির্বীজ"[৭]

এবং সরকারি ঘোষণা এই পত্রিকা তুলে দিচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে, অবিলম্বে এক সপ্তাহের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সরকার নিয়োজিত কর্মচারিদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের দলপতিগণের নাম প্রকাশ করলে তাদের শাস্তি হবে না। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে পদানত হয়ে সরকারি মুচলেকা সংগ্রহ না করলে যে কোন প্রকার দন্ড তাদের সরকার দেবে। এমনকি এরা এই বিদ্রোহের অরাজকতায় লর্ড ডালহৌসি সাহেব কীভাবে বিলেতের 'হেটস অফ কমেন্স' প্রতিনিধি সভায় মুখ দেখাবেন তা নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল।

এডুকেশন গেজেট - ১৮৫৬ সাল থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত এই সংবাদপত্র সরাসরি সরকার বিরোধিতা করেনি কিন্তু জমিদারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছে। লেখা হচ্ছে, -

> "...আমরাও গভরমেন্টকে আশীর্বাদ করি যেন তিনি পল্লীগ্রামের জমিদার হন। বাস্তবিক অনেক জমিদার যথেচ্ছাচার রাজগণের ন্যায় পল্লীগ্রামের প্রজাদের উপর এরূপ অত্যাচার করেন যে, গবরণমেন্ট তাহা জানিতে পারিলে তত্তৎ জমিদারি খাসমহলভুক্ত করিয়া ফেলিবেন।"[৮]

কিন্তু গবর্নমেন্ট কি জানেনা জমিদারদের যথেচ্ছাচার সম্পর্কে? তবে নিরন্ন কৃষকের প্রতি জমিদারের মাথটের অত্যাচার, সুদখোর মহাজনী শোষণ, চুনের গুদামে রুদ্ধ করে ধান খাইয়ে প্রজাকে অত্যাচার, পুকুরের অভাবে গ্রামীণ কৃষকদের জলকষ্ট ইত্যাদি সবই স্থান পেয়েছে পত্রিকার প্রতিবেদনে। কৃষকদের দুরাবস্থা দূরীকরণের ঐকান্তিক ইচ্ছা তাদের লেখার মধ্যে প্রকাশ পায়।

তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে দাড়ি সেলামী ও জমিদারি নানা অত্যাচারের কথা এই পত্রিকা স্বীকৃত হলেও মূলত হিন্দুদের প্রতি মুসলিমদের অত্যাচার হিসেবেই এই বিদ্রোহকে তারা দেখিয়েছে। লেখা হচ্ছে –

> "জমিদার পক্ষের লোকেরা বলপূর্বক লোক ছাড়াইয়া মুসলমানদিগের প্রতি একটু অধিকমাত্রায় অত্যাচার আরম্ভ করিল। মুসলমানরা অত্যাচার না দেখিয়া আপনদিগের উপাসনাগৃহে অগ্নিপ্রদান করিল।"[৯]

এই 'একটু অধিকমাত্রায় অত্যাচার' বাক্যাংশটি থেকেই বোঝা যায় তারা বিদ্রোহীদের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে ভাবিত ছিলনা।

সোমপ্রকাশ - ১৮৫৮ সালে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ দ্বারা সম্পাদিত এই পত্রিকা জমিদারদের 'সর্বশোষক' বলে উল্লেখ করে লিখছে, কৃষকদের চালে খড় নেই, ঘরে ভোজনপাত্র নেই, অর্ধাহারে বা অনশনে থেকেও তাদের জমিদারকে মাথট এবং মহাজনকে চড়া সুদে কর দিতে হয়। ভিটেছাড়া সর্বস্বান্ত ক্রীতদাস কৃষকেরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। জমিদার সম্পর্কে তারা জনপরম্পরা ব্যবহার করেছে, "যার ধন তার ধন নয়/ নেম মারে দই"। পত্রিকা থেকে জানা যায় জমিদাররা ফসলের তৃতীয়াংশ গ্রাস করে নিজেদের অর্থভাণ্ডার, নৃত্যশালার শোভাবর্ধন করছে। অর্থগৃধ্নু জমিদার জমির উৎকর্ষতা, অপকর্ষতা না দেখেই বারবার আবওয়াব নেন ও জমির কর বাড়ান। শুধু জমিদার নয়, কর্তা, দেওয়ান, পাইক, পেয়াদা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সকলকেই কৌপীনধারী কৃষকদের পুজো করতে হয়। সোমপ্রকাশ শ্লেষ করে বলছে, "নীলকরই তো দেশশাসনের কর্তা"[১০] আবার ফরাজিরা কীভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে মঙ্গলা, সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, গোপালনগর প্রভৃতি স্থানে প্রজাদের প্রাণ সংকটময় করে তুলেছে তা উল্লেখ করে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দমন করতে পারছেনা কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সোমপ্রকাশ।

গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা - গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের বিবরণ লিপিবিদ্ধ করতে ও সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৬৩ এর এপ্রিল মাসে হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় শুরু হয় এই পত্রিকা। জমিদারের অত্যাচারে পঙ্গু পল্লীসমাজের দুঃখ দুর্দশাকে বৃহত্তর জগতে প্রচার করার উদ্দেশ্য ছিল এই ব্যতিক্রমী পত্রিকার। পাবনার প্রজা বিদ্রোহেও এই পত্রিকা প্রজাদের সমর্থন করেছে। জমিদারদের অর্থসাহায্য নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে লিখতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁকে পাবনা বিদ্রোহের সময় জমিদার-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হলে তিনি জানান, -

> "গ্রামবার্তা জমিদার কি প্রজা কাহারও সপক্ষ বা বিপক্ষ নহে। অত্যাচার ও অসত্যের বিরোধিনী।"[১১]

এই পত্রিকাই একমাত্র পত্রিকা যারা নিয়মিত ভাবে স্থান কাল পাত্র উল্লেখ করে অত্যাচারিত প্রজাদের অবস্থাকে তুলে ধরেছে। যেমন, কোনো প্রজার একশত টাকা জরিমানা আদায়ের হুকুম হয়েছে কিন্তু এত পরিমাণ টাকা দরিদ্র প্রজার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় তার গৃহের একশত টাকা মূল্যের অলঙ্কার নিয়ে নেওয়া হয়েছে - এমন ঘটনার উল্লেখও আছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা - সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে দেশীয়দের অবস্থা কতখানি হীন- তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার জন্য ১৮৬০ সালে শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় গ্রামবাংলা থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথমদিকে এই পত্রিকা যখন মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত হত ততদিন জমিদারের অত্যাচার ও কৃষক-স্বার্থ নিয়ে এখানে লেখা প্রকাশিত হলেও, পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার পর এটি জমিদারশ্রেণির পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের পর পত্রিকাটির জমিদার-দরদী মনোভাব প্রতিবেদনে চোখে পড়ে। লেখা হচ্ছে, -

> "জমিদারগণকে গালি দেওয়া এক্ষণকার ফ্যাসসন। ...অবশ্য জমিদারগণ কর্তৃক প্রজাগণ উচ্ছিন্ন গেল, কিন্তু ইহার মূল দায়ী ইংরাজি রাজনীতি। ...ইংরাজি আইনে প্রজা ও জমিদারের এইরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ইহাতে উভয়ের ক্ষতি, লাভ কেবল গবরণমেন্টের। অতএব হয় গবরণমেন্ট জমিদারগণকে প্রজাদিগের সর্বময় কর্তা করিয়া দিউন, নতুবা প্রজাদিগকে রক্ষা করুন।"[১২]

তবে জমিদাররা সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য কর দিতে না চাইলে তার সমালোচনা এখানে প্রকাশিত হয়। স্বীকার করা হয় যে, নিঃস্বার্থ ভূম্যাধিকারী জগতে স্বল্প।

মিত্রপ্রকাশ - ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মিত্রপ্রকাশ' মূলত কবিতা প্রকাশ করত। এখানেই মাঘ, ১২৭৮ সংখ্যাতে তিতুমীর বিষয়ক একটি লোকগীতি প্রকাশিত হয়েছিল 'গ্রাম্যগীতি – বেলাড' শিরোনামে।[১৩] গানে তিতুমীরের পরিচালনায় 'ফকির ভাইরা' কীভাবে ইংরেজের সিপাহীদের সাথে লড়াই করে বিপদগ্রস্ত হল সেই বর্ণনা আছে। শেষে দেখানো হচ্ছে ইংরেজের হাত থেকে বাঁচতে শেষে কোম্পানির হুকুমে তারা নাপিত বাড়ি গিয়ে লম্বা দাড়ি কেটে ফেলছে। এই বেলাডে সহমর্মিতার অভাব, বিদ্রূপই বেশি।

সুলভ সমাচার - উমানাথ গুপ্তের সম্পাদনায় সুলভ খরচের জার্নাল ছিল সুলভ সমাচার, সাপ্তাহিকটি কৃষকদের করুন অবস্থা, জমিদারিপ্রথার অপব্যবহার ও শোষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সহ ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে সোচ্চার হয়। এরা প্রজার দুর্দশা তুলে ধরার পাশাপাশি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করছে –

> "রাজার সঙ্গে প্রজার কি সেইরূপ সম্বন্ধ, যেমন বিদেশী পথিকের সহিত বোম্বেটের? কেবল নেওয়া ভিন্ন কি রাজার আর কোন কাজ নাই?"[১৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা হলেও রাজার কাজের এমন প্রত্যক্ষ সমালোচনা বিরল। জমিদারের শোষণ সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে, -

> "দুগ্ধবতী গাভীর সহিত নিষ্ঠুর অর্থলোভী গোয়ালার যে রূপ সম্বন্ধ, আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারদের প্রজার সহিত ঠিক সেই প্রকার সম্বন্ধ। টাকাপ্রার্থী গোয়ালা তাহার গোরু বাছুরের প্রাণের দিকে তাকায়ইনা, একমাত্র দুগ্ধদোহন চিন্তাই তাহার সর্বস্ব, স্বার্থপর জমিদারেরও প্রজার অর্থশোষণই একমাত্র ভাবনা।"[১৫]

১৭৯৩ সালের ৮ম আইনের ৫৪ ধারায় জমিদারদের বাজে আদায় বন্ধ করে দেওয়ার পরেও তারা কীভাবে বাজে আদায় নেওয়া অব্যাহত রেখেছে তা লিখতে গিয়ে এই পত্রিকা শ্রমোপজীবি গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানাতে ও সরকারের উপর আস্থা রাখতে বলেছে। কোন গ্রাম থেকে প্রেরিত একটি চিঠি যা সুলভ সমাচারের একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে গোয়ালবাড়িকে 'দ্বিতীয় যমালয়' বলা হচ্ছে।

> "তথায় যমদূত নগদীরা জুতা, কিল, লাথী মারিয়া বুকে বাঁশ ও ডাবা চাপা দিয়া উত্তমরূপে পাট করে।"[১৬]

এই পত্রিকা থেকেই জানা যাচ্ছে যে, কলকাতায় কিছু ভদ্রলোক সামান্য লোকেদের উন্নতির জন্য 'প্রজাদের সভা' নামে একটি সভাস্থাপন করেছিলেন। এই উদ্যোগকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা হচ্ছে, ইতর প্রজাদের শিক্ষানীতি, সাংসারিক অবস্থা, অত্যাচার নিবারণ প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির ভার তারা যেন গ্রহণ করে। দুইদিন পর যাতে বাঙ্গালির প্রচেষ্টা ভগ্নোদ্যম না হয়ে পড়ে আর বিষয়েও দৃষ্টিদানের কথা বলা হচ্ছে। বাস্তবিক 'সুলভ সমাচার' শুধু কৃষকদের দুরাবস্থার কথা নাগরিক পাঠককে জানানোই নয়, তাদের উন্নতির জন্য অন্তঃকরণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের বারবার চেষ্টা করেছে। অনৈতিক মাথটের দীর্ঘ তালিকা দুটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেছিল। একটি ভারতসংস্কারক ও অন্যটি সুলভ সমাচার। 'জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' শিরোনামে এখানে মোট তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে যার ১লা আশ্বিন ১২৮০ এর তৃতীয় সংখ্যায় তারা জমিদারদের প্রতিজ্ঞা করতে অনুরোধ করেছে যাতে খাজনার উপর এক পয়সা প্রজার থেকে আদায় না হয়। লেখা হচ্ছে যে তারা ছোটলাট সাহেবের হাত ধরে বলছে যাতে কঠোর নিয়মে বাজে আদায় বন্ধ করা যায়। পাবনা বিদ্রোহ সম্পর্কে এই পত্রিকার অভিমত ছিল ব্যতিক্রমী। তাদের মতে, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বাড়লে মানবপ্রকৃতির নিয়মেই প্রজা অভ্যুত্থান ঘটে।

মধ্যস্থ - ১২৭৯ এর বৈশাখে 'নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক' হিসেবে নাট্যকার মনমোহন বসুর সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা মধ্যস্থ। মধ্যস্থ নাম হলেও এর ঝোঁক ছিল প্রাচীনপন্থা ও রক্ষণশীলতার দিকে, তাই ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে বিদ্বেষ গোপন করার চেষ্টা যেমন পত্রিকাটির ছিলনা তেমন কৃষক বিষয়ে সমবেদনামূলক প্রতিবেদনও পাওয়া যায়না। পাবনা বিদ্রোহের হাঙ্গামা নিয়েও সম্পাদকের বিরূপতাই প্রকাশিত।

ভারতসংস্কারক - জমিদারদের অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ১৮২০ বঙ্গাব্দ থেকে প্রকাশিত ভারতসংস্কার। জমিদার বা ব্রিটিশ শ্রেণি কারো বিরুদ্ধেই বলতে তারা পরোয়া করেনি। লেখা হচ্ছে, -

> "জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ...এই স্রোতের প্রবলবেগে এক দিন হয়ত ঐ দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বার্থ শ্রেণীদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিপর্যস্ত হইয়া একটা বিষম বিপ্লবে পরিণত হইবে। সেই স্রোতে অনেক জমিদারের যথাসর্বস্ব ভাসিয়া যাইবে, অনেক প্রজার সর্বনাশ হইবে, কিন্তু চরমে রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না।"[১৭]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদাররা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে কোন দায়িত্ব পালন করেনি তা নিয়ে এই সংবাদপত্র সোচ্চার হয়েছে। বলা হচ্ছে আদালত এমনকি দশ আইনের সহায়তায়ও জমিদাররা প্রজাপীড়ন করে। ক্যাম্বেল সাহেবের নাম উদ্ধৃত করে সরাসরি বলা হচ্ছে তিনি জমিদারদের অতিরিক্ত কর সংগ্রহের সুবিধা করে দিয়েছেন।[১৮] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে 'অসম্পূর্ণ ও মরীচাগ্রস্ত'[১৯] বলে উল্লেখ করে নতুন ব্যবস্থা প্রণয়নের আবশ্যকতা জানিয়েছে। বাজে

আদায় বা মাথটের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করে তারা জমিদারদের শোষণের স্বরূপ উল্লেখ করেছে। এমনকি এই পত্রিকাটি লিখেছে, -

> "সংবাদপত্র সকল জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, কেননা জমীদার ও তৎসম্পর্কীয় লোকেরা অধিকাংশই তাঁহাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক...প্রজাশ্রেণীর লোকেরা সংবাদপত্রের খবর রাখেনা।"[২০]

সাধারণী - ১২৮০ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাধারণী সাপ্তাহিক পত্রিকা বারো বছর ধরে ব্রিটিশ শাসক ও জমিদারের সমালোচনা করে গেছে। পরে ১২৯৩ এর বৈশাখ থেকে ১২৯৬ এর ভাদ্র পর্যন্ত এটি 'নব বিভাকর' পত্রিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে 'নব বিভাকর ও সাধারণী' নামে প্রকাশিত হত। সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা না থাকলেও বাবু কৃষ্ণদাস পাল জমিদারদের পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন বঙ্গে প্রজারা সুখে আছে, তাই সাধারণী লেখেন, -

> "তাঁহার মতে এই যদি প্রজার সুখের অবস্থা হয়, তিনি দুঃখের অবস্থা মনে মনে কি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন বলিতে পারি না।"[২১]

বান্ধব - ১৮৭৪ সালে ঢাকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' নামে খ্যাত কালীপ্রসন্ন ঘোষ পরিচালিত বান্ধবের। তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে এই পত্রিকার যে প্রতিবেদন প্রাপ্ত হয় তাতে ফরাজিদের দ্বারা গ্রাম লুঠ, হিন্দু ও অন্যান্য মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারের বিবরণ ছাড়া বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। ফরাজিদের একতা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এক লোকমুখে প্রচলিত ঘটনার কথা তুলে ধরেছে বান্ধব। বলা হচ্ছে সিপাহী যুদ্ধের হাঙ্গামার সময় ফরিদপুরের তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট মুসলমানদিগের মন বোঝার জন্য ফরিদপুর জেলে বন্দী দুধু মিঞাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সরকারি বিপদের দিনে তিনি কত লোক দ্বারা সরকারকে সাহায্য করতে পারেন? তাতে নাকি দুধু মিঞা উত্তর করেছিলেন, -

> "যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়া তিন দিনের জন্য মুক্তি দেন, তবে ওই তিন দিনে আমি প্রায় ত্রিশ সহস্র অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ করিতে পারি, যাহারা প্রত্যেকে আমার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব করিবে না।"[২২]

সৎসঙ্গ - ১২৯১ সালে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত এটিই একমাত্র মাসিক পত্রিকা যেখানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ দর্শানো হয়েছে। এই পত্রিকার প্রতিবেদনের ভাষা সংবাদ পত্রের মতো নয়, বরং সাহিত্যের মতো খানিক। স্বনির্ভরশীল সাঁওতালদের ধান প্রভৃতি শস্যের লোভে কীভাবে অর্থগৃধ্নু, অধার্মিক, হিন্দু বণিকরা আড়ত স্থাপন করে অন্যায় ব্যবসায় তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়েছে তার পরিচয় এই পত্রিকা ছাড়া আর কোথাও মেলেনা। গ্রামবাংলার কৃষকদের উপর অত্যাচার বা নীলবিদ্রোহ নিয়ে কৃষক-দরদী লেখা মিললেও সাঁওতাল সম্পর্কে বাঙালি নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল তারা নির্দয়, নৃশংস, অত্যাচারী, অসভ্য জাতি। তাই তাদের অভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে পাওয়া যায় না। লেখা হচ্ছে, - "নীচ শ্রেণীর হিন্দুবণিকগণের ন্যায় অধার্মিক লোক জগতে নাই। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত তাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে সহস্র পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ব্যবসায়ি বেশে অপরের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। এই সকল নরপিশাচ প্রতারণার মায়ায় সাঁওতালগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। সাঁওতালগণ কলসীপূর্ণ ঘৃত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিল, হিন্দু বণিকগণ ছিদ্রতল পাত্রে তাহা মাপ করিয়া প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিনিময়ে লবণ পাইবার আশায় সাঁওতালগণ শকট পূর্ণ ধান্য হইয়া আসিল, বণিকগণ গুরু ওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লাগিল। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে প্রতারিত হইয়া সরল প্রকৃতিক সাঁওতালগণ মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। ব্যবসায় ব্যপদেশে এইরূপে সাঁওতালগণের শোণিত পান করিয়াও বণিকগণের অর্থ পিপাসার শান্তি হইল না। তাহারা অন্য উপায়েও সাঁওতালদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত সাঁওতালের অর্থের প্রয়োজন হইত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

...বণিকদের দেয় ঋণের চড়া সুদ সাঁওতালদের জর্জরিত করলে বণিকরা আদালতের ডিক্রি নিয়ে এসে তাদের জমি অধিকার করত সে কথাও লেখা হচ্ছে। হতভাগ্য জানিত না যে, দয়াপরায়ণ ধার্ম্মিক হিন্দু তাহাকে যে দুশ্চেদ্য পাশে বদ্ধ করিল, তাহার জীবনান্তেও তাহা ছিন্ন হইবার নহে। এই সামান্য ঋণ মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া যাবতীয় সম্পত্তি সহিত হতভাগ্য সাঁওতালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইত। এই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত সাঁওতাল যতই পরিশ্রম করুক না কেন, তাহার পরিবারবর্গ অনশনে, বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া যতই সঞ্চয়ের চেষ্টা করুক না কেন, যে মুহূর্তে সে তাহার বহু শ্রমার্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল, অমনি হিন্দু উত্তমর্ণ আদালতের আদেশে তাহার সমস্ত শস্য অধিকার করিয়া লইল। তাহাতেও ঋণ পরিশোধ হইল। না। কতক অংশ অবশিষ্ট থাকিল। জমি, শস্য, তৈজসপত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না। পাঠক শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন, সাঁওতাল রমণীগণের একমাত্র আভরণ, কাঁসার অলঙ্কার, হিন্দুবণিকগণ জোর করিয়া শরীর হইতে কাড়িয়া লইতে লাগিল। মানুষের প্রাণে আর কত সহে? কৃষিজীবী অনেক সাঁওতাল জমি ছাড়িয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইরে বাধ্য হইল। যাহারা পলাইল না, তাহারা ঋণ পরিশোধের জন্য হিন্দুদিগের গৃহে দাসরূপে কার্য্য করিতে লাগিল। দস অক্লান্তভাবে প্রভুর গৃহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি ঋণ শোধের কোন উপায় হয় না। ঋণের যদি সুদ সুদের সুদ চলে, তবে কি সে ঋণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে? দাস যদি প্রভুর কার্য্য করিয়া অপর কোন কাজ করিয়ে প্রবৃত্ত হইল; সহৃদয় প্রভু অমনি তাহার আহার বন্ধ করিয়া দিলেন। যদি সে পলাইয়া গেল, প্রভু অমনি আদালতের পিয়াদ দ্বারা তাহাকে ধৃত করাইয়া আনিয়া জেলে দিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। অজ্ঞ সাঁওতাল নীরবে আবার দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিল।”[২৩]

তাদের মতে, সরকার যদি সাঁওতালদের দুরাবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহল হয়ে তাদের অসন্তোষগুলি মেটানোর চেষ্টা করত তবে এত অর্থনাশ ও রক্তপাত হত না।

সুতরাং বোঝা গেল উনিশ শতকের বাঙালি মণীষা যে দৃষ্টিতে কৃষকদের সমস্যাকে দেখেছে ও দেখাতে চেয়েছে তার অন্তত তিনটি নির্দিষ্ট প্রবণতা বর্তমান –

ক। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি মুগ্ধতা ও আনুগত্য - সংবাদপত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেনি। শিক্ষিত বাঙালির কাছে ইংরেজ ছিল আদর্শ শাসক। বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রসারের কারণে তো বটেই ব্রিটিশদের তারা ভারতবর্ষের রক্ষক হিসেবে ভাবতে দ্বিধা করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর *বঙ্গদেশের কৃষক* প্রবন্ধে অবশিল্পায়নের তত্ত্ব নাকচ করে লিখছেন, “ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত।”[২৪] সরকারি সংবাদপত্রগুলি তো বটেই, অনেক দেশীয় সংবাদপত্রও শাসকের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পায়নি।

খ। জমিদারশ্রেণির প্রতি আনুগত্য - বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেশীয় সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদারশ্রেণি তাই মহাজন সহ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিরোধিতা করলেও জমিদারদের বিরুদ্ধে সরাসরি সরব হয়েছে খুব কম পত্রিকাই। আসলে কৃষকদের নিয়ে লেখা হলেও কৃষকরা যেহেতু এই পত্রিকার পাঠক ছিল না, জমিদার সহ কলকাতার নাগরিক সমাজ ছিল পত্রিকার মূল পাঠক- তাই তাদের চোখে জমিদারশ্রেনির ভাবমূর্তি বজায় রাখা ছিল সংবাদপত্রগুলির বিশেষ দায়। তাছাড়া জমিদারশ্রেণির অর্থ আনুকূল্যে চলা পত্রিকায় জমিদারেরই নিন্দে করা সম্পাদক ও লেখকদের পক্ষে কার্যত সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জমিদারি প্রথার অবসান সমর্থন করেননি।

গ। শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও সহানুভূতির দৃষ্টি - আসলে লেখক ও পাঠক উভয়েই ছিলেন শিক্ষিত নাগরিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কেউই নিজেদের স্বার্থ রহিত করে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সমস্যা বুঝতে চায়নি। গ্রামীণ কৃষক জীবনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা সহানুভূতি দেখিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সবাই পিরামিডের শীর্ষস্তরগুলিতে বসে ভূমিস্তরে অবস্থানকারী কৃষকদের প্রতি দয়া ও করুণা নিক্ষেপ করেছেন। ফলে শ্রেণি দ্বন্দ্ব অত্যন্ত পরিমানে প্রকট হয়েছে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন সহ উনিশ শতকের সামগ্রিক সাহিত্যে।

ফলে, বোঝা যায় যাঁরা লিখছেন এবং যাঁরা পড়ছেন তাঁরা সবাই তুলনামূলক ভাবে সমাজের উচ্চকোটিতে বসে আছেন। তাই শ্রেণিদ্বন্দ্ব উনিশ শতকীয় সমাজে মেটেনা। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয় বিশ শতকের প্রায় তৃতীয় দশক অবধি যখন মূলত কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'লাঙল', 'ধূমকেতু'র মতো পত্রিকার মাধ্যমে এক বাঁক বদল সূচীত হবে। ততদিনে রাজনীতির ছত্রছায়ায় কৃষক বিদ্রোহ রূপান্তরিত হয়েছে সুসংবদ্ধ কৃষক আন্দোলনে। কংগ্রেসী আন্দোলন সফল করতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পথে নেমেছে অসংখ্য কৃষক। বাংলার বুকে শিক্ষিত বাঙালি মণীষা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তেভাগা থেকে নকশালের মতো কৃষক আন্দোলন পরিচালনায়। তার আগে উনিশ শতকীয় সংবাদপত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষক সংকটের চিত্রটি যথার্থরূপে ধরা পড়ে না, কৃষক জীবনের সমস্যার সমাধান তাই অধরাই থেকে যায়।

Reference:

১. রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ২০১৮, পৃ. ৭৮
২. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২৩৬
৩. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২৩৬
৪. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৫৮
৫. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৫৩
৬. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৭৪
৭. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২০৭
৮. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭৫
৯. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১১৬
১০. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৩২৮
১১. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১২
১২. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭০
১৩. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১১৬
১৪. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৫. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৬. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৭. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৮. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৮২
১৯. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৮৮
২০. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৪
২১. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৯১
২২. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১১৬
২৩. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২২১
২৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, "বঙ্গদেশের কৃষক", বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা গ্রন্থ, কমল চৌধুরী (সম্পা.) দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ১৬৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 714 - 717
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 714 - 717
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সন্দেশ পত্রিকা : বিচার, বিশ্লেষণ-সমীক্ষা

দেবশ্রী পণ্ডা
SACT- II, বাংলা বিভাগ
সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
গোয়ালতোড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১২৮
Email ID : debashripandaroy@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Sandesh, Children, Literature, Magazine, Significant, Delicious, Attributes, Biographies, Mythological Tales.

Abstract
Children have incredibly sensitive minds. The boat of fantasy floats away in their realm. It is the duty of a children's writer to ensure that the soft, happy aspects of a Child's mind are not overshadowed by the slightest hint of harshness or distortion. Writer can impose a burden of challenging ideas on the minds of adults. Children should not be forced to think that way. Therefore, there is less interest in writing children's literature. Sandesh which was edited century ago, is the perfect model of what a children's magazine ought to be. Commercial gain was not their primary concern. Their primary objective was to enhance intelligence of the children. Sandesh is the dawn light in the world of Bengali children's literature. This magazine has tailored its literary content to suit children. The caption of this magazine i.e., Sandesh is quite significant. Sandesh means news and it also implies delicious sweet with a thousand varied form and attributes. What was lacking in Sandesh? There were poems, songs, stories, plays of home and abroad, travelogues, biographies, mythological tales. Here almost all genres of children literature find their soil to bloom. In this article, I have attempted, to briefly discuss this magazine which is unique in its writing style.

Discussion

বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে ‘সন্দেশ’ উষার আলো। শিশু মনের উপযোগী করে এই পত্রিকা তার সাহিত্যের সম্ভার সাজিয়েছে। ‘সন্দেশ’ নামকরণটি খুব চমৎকার— সন্দেশ মানে খবর, সন্দেশ মানে মিষ্টি, হাজার রকম যার রূপ ও স্বাদ। কি না থাকত সন্দেশে— কবিতা, গান, গল্প, দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা নাটক, ভ্রমণ কাহিনি, পুরাতত্ত্বের সঙ্গে নতুন আবিষ্কার, জীবনী, পৌরাণিক গল্প কিছুই বাদ যেত না। রেখায় লেখায় অনবদ্য সন্দেশ উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনা পর্বেই অর্জন করেছিল অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। এই রচনাগুলি বিষয়গত মূল্যে কতখানি সার্থক তা আলোচনার দাবী রাখে।

‘১৩২০’ বঙ্গাব্দের বৈশাখ অর্থাৎ ‘১৯১৩’-র এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সন্দেশ পত্রিকা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায়। প্রথম সংখ্যা থেকেই সন্দেশের অনন্যতা প্রকাশিত। হঠাৎ যেন বাংলা শিশু সাহিত্যের দৈন্য ঘুচে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 714 - 717
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গিয়ে সে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। যেমন তার পাঠ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈচিত্র্য, তেমনি তার ছবি কাগজ ছাপা মলাট। তারপর প্রায় পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে বাংলাদেশে আর কোনো ছোটোদের পত্রিকা অমন মনোহর রূপ নিয়ে দেখা গেল না।

বিশ্বযুদ্ধের টাল-মাটাল সময়ে অস্থির ভাবে কেটে যায় বছরের পর বছরগুলি। ধেয়ে আসে সঙ্কটের কালো মেঘ। মহামারী, ভূমিকম্প, দেশভাগের চেষ্টা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে সন্দেশের কবি প্রজাপতিরা নিজেদের সৃষ্টির জগতে নিরন্তর নিয়োজিত ছিলেন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে যেমন সৃষ্টি করেছেন শব্দ কথার জগৎ। তেমনি রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে তৈরি করেছেন চিত্র জগৎ। সামাজিক গভীর সঙ্কটের বোধকে অবহেলা করে বিচরণ করেছেন কল্পলোকে। শুধুই শিশু মনের দাবী মেটাতে নাকি অন্য কোনো কারণে? —তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

বাংলা শিশু সাহিত্যের জগৎ আজও যেন কিছুটা অবহেলিত। অবহেলিত শিশু সাহিত্যিকেরাও। তাঁদের রচনারীতির শিল্পগুণ, বৈচিত্র্য, বক্তব্য ও শৈলীগত অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ আজও সেভাবে হয়নি। ছেলে ভুলানো ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে দিয়েই শিশু সাহিত্যের সূচনা। বিশ্বজগতের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে মানব মন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। তার মধ্যে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিশু ও কিশোর মন। এই শিশু ও কিশোর মনের গহীন অন্তরাল নিয়ে কাজ করার জন্য প্রতিভার দীপ্তি ও পরিব্যাপ্তি খুবই প্রয়োজন।

শিশু সাহিত্য নিয়ে তেমন আলোড়ন দেখা যায়নি। এর কারণ হতে পারে শিশু সাহিত্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা। প্রাপ্ত বয়স্কদের বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দুই-ই কোনো সীমারেখার বাধ্যবাধকতায় স্থান পায় না। কিন্তু শিশু মনের উপযোগী করে নানা বিষয়ের বৈচিত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য রচনা খুবই কঠিন ব্যাপার। তথাপি শিশু সাহিত্য নিয়ে আজও কৌতূহলের অভাব।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়ের সময়কালীন শিশুসাহিত্যিকেরা প্রায় বিস্তৃতির অন্তরালে। তাদের বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তুলে আনা বাংলা সাহিত্য চর্চার এক দায়বদ্ধতা সন্দেশের শিশু সাহিত্যিকেরা প্রত্যেকে আত্ম প্রতিভায় ঐতিহ্যানুরক্ত এক শিল্পী। যাদের ব্যক্তিগত প্রতিভায় ভরে উঠেছিল সাহিত্যের জগৎ।

সন্দেশ যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলায় ভালো শিশু কিশোর পত্রিকা ছিল না বললেই চলে। সেই সময়কার নামী পত্রিকা 'সখা', 'সখা ও সাথী' (১৮৯৪), 'অঞ্জলি', 'মুকুল' (১৮৯৫) বন্ধ হয়ে গেছে। 'সখা' ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে সেকালের বুদ্ধিজীবিরা এগিয়ে এসেছিল। 'সখা' ও 'মুকুল' উভয় পত্রিকাতে উপেন্দ্রকিশোরের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখা, আঁকার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনার ব্যাপারেও সাহায্য করতেন। ছোটোদের পত্রিকার অঙ্গসজ্জা নিয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল ছোটোদের মনের মতন করে একটি ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশ করা। ইচ্ছেটা ক্রমশ দৃঢ় হল ১৮৯৫ খ্রি: নিজের মুদ্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর। স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল ১৯১৩-তে সন্দেশের প্রকাশের পর।

ব্যক্তিগতভাবে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায় বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। একাধারে চিত্রশিল্পী, শিশু সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী। সুকুমার রায় বিদেশে পড়াশুনা করেছেন। নিজেকে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু দেশে এসে বাবার যোগ্য সহযোগী হয়ে উঠলেন কেন? সত্যি কথা বলতে ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক থেকে উপেন্দ্রকিশোর তেমন লাভবান হননি। নিজের কাছ থেকে প্রয়োজনে পয়সা দিয়ে চালিয়েছেন পত্রিকাটি। অন্যান্য লেখকরা যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রমথ চৌধুরী, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কালিদাস রায়, লীলা মজুমদার প্রমুখরা বিনা পয়সাতেই লেখা দিতেন। সেখানে ব্যবসায়িক হিসেব নিকেশ বা লাভালাভের টানাপোড়েন তৈরি হয়নি।

উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পরিবারভুক্ত ছাড়া আরও অনেকে সন্দেশ পত্রিকায় লিখতেন। প্রথম বর্ষেই উপেন্দ্রকিশোরের কম লেখা প্রকাশিত হয়নি। যেমন—

পৌরাণিক গল্প— প্রথম বর্ষ :

"বৈশাখ সংখ্যা — পৃথিবীর পিতা,

শ্রাবণ সংখ্যা — ত্রিপুর
ভাদ্র সংখ্যা — মহিষাসুর
আশ্বিন সংখ্যা — শুম্ভ নিশুম্ভ
পৌষ সংখ্যা — গণেশের বিবাহ
জন্তুজানোয়ারের গল্প— প্রথম বর্ষ
আষাঢ় সংখ্যায় — বাঘের গল্প
কার্তিক সংখ্যায় — সুন্দর বনের জানোয়ার
মাঘ সংখ্যায় — মাকড়সা
ফাল্গুন সংখ্যায় — শুক পাখি
চৈত্র সংখ্যায় — সাপের খাওয়া
এছাড়াও প্রথম বর্ষের সন্দেশে ছাপা হয়েছিল—
কুলদারঞ্জন রায়ের— রবিন হুড
প্রমদারঞ্জন রায়ের— বনের খবর”[১]

পাশাপাশি বিচিত্র বিষয় নিয়ে সন্দেশে রচনার প্রয়াস চলছিল। এমন কি কবিগুরুও সন্দেশের জন্য কিছু লিখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।

‘১৩২০’ শ্রাবণ সংখ্যায় চিত্রকর হিসাবে সুকুমার রায়ের আবির্ভাব সন্দেশের পাতায়। বাবা বেঁচে থাকাতে তেমন কিছু লেখেননি। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময় সুকুমার রায় ছাড়াও অন্যান্যরা লিখেছেন প্রচুর। তাঁর সন্দেশের লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

“সুদন ওঝা (১৩২৭, আশ্বিন সংখ্যা)
রাজার অসুখ (১৩২৮, ফাল্গুন সংখ্যা)
অবাক জলপান, হিংসুটি, মামাগো (নাটক)
‘আবোল তাবোলে’র কবিতাগুলি অন্যনামে ‘সন্দেশে’ লেখা হয়েছে যেমন—
‘রামগড়ুরের ছানা (হেস না, বৈশাখ ১৩২৫)
‘নোটবই’ (জিজ্ঞাসু বৈশাখ ১৩২৭)
‘বাবুরাম সাপুড়ে’ (বাপ্‌রে ১৩২৮)”[২]

এই সময়ের অন্যান্য লেখক-লেখিকারা হলেন—

“জ্যোতির্ময়ী দেবী— এক হল দুই
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত— পাল্কীর গান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— বৃষ্টি রৌদ্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সময় হারা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর— খাতাঞ্চির খাতা
সীতা দেবী— নিরেট গুরুর কাহিনী
প্রিয়ম্বদা দেবী— পঞ্চুলাল”[৩]

এছাড়াও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কে লেখেন নি সন্দেশে? চমৎকার সব লেখায় ভরে উঠেছিল সন্দেশ।

পত্রিকার প্রয়োজনে উপেন্দ্রকিশোরকে লিখতে হয়েছে দুহাতে। অন্য লেখক-লেখিকারাও যথাযোগ্য প্রতিভার সঙ্গ দিয়ে গেছেন। গান, গল্প, পুরাণের গল্প, কবিতা, নাটক, হাসি, তামাশা, দেশ-বিদেশের কাহিনি, নিত্যনতুন আবিষ্কার, তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছবির অপূর্ব সম্ভার নিয়ে এগিয়েছে সন্দেশের জগৎ।

উপেন্দ্রকিশোরের সময়ের সন্দেশের থেকে পরবর্ত্তী কালে সুকুমার রায়ের সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে— তা হল সন্দেশের শিশু থেকে কিশোর পত্রিকা হয়ে ওঠা। আবার সুকুমারের সন্দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার নিতান্তই শিশু বা কিশোর পাঠ্য নয়, গভীর অর্থবহ জীবনবোধের ফসল। পরিণত বয়সে সন্দেশের পাতা উল্টে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়। সমস্ত গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে সন্দেশ কি ধীরে ধীরে নব যৌবনের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিল।

শিশু মন অত্যন্ত কোমল। তাদের চিন্তা ভাবনার জগতে ক্ষণে ক্ষণে কল্পনার নৌকা ভেসে যায়। শিশু মনের সূক্ষ্ম কোমল দিকগুলিতে কোথাও যেন কাঠিন্য বা বিকৃতির লেশ মাত্র ছায়াপাত না ঘটে সেটা দেখা একজন শিশু সাহিত্যিকের কর্তব্য। প্রাপ্ত বয়স্কদের মনের ওপর দুরুহ চিন্তার ভার লেখক চাপিয়ে দিতেই পারেন। কিন্তু শিশু বা কিশোর মনকে আনন্দদানের পাশাপাশি সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে আলাদা রেখে গঠনশীল, কৌতূহলী, সজীব ও প্রাণবন্ত করা যেন লেখকের নিজের দায়ভার। সেদিক থেকে সন্দেশের লেখকরা সফল ছিলেন। ছোটোদের পত্রিকা কেমন হওয়া উচিত তার আদর্শ রূপ হল একশ বছর আগের সম্পাদিত সন্দেশ। বাণিজ্যিক লাভালাভের হিসেব সেখানে গৌণ ছিল। প্রধান লক্ষ্য ছিল ছেলেমেয়েদের জ্ঞানবুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা, সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত করা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নব পরিচয় বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে বৈপ্লবিক জাগরণের সূচনা করেছিল। সন্দেশ ছিল তার পথিকৃৎ।

Reference:

১. সন্দেশ পত্রিকা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২০
২. সন্দেশ পত্রিকা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২১
৩. সন্দেশ পত্রিকা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 718 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 718 - 726
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে সমকামিতা ও তৃতীয় লিঙ্গের এক মনস্তাত্ত্বিক পাঠ

প্রিয়া দাস
Email ID : priyadasrgu@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Homosexuality, Gey, Lesbian, Sexual interest, Sexual attraction, Voyeur, Taboo, Bisexual.

Abstract
Homosexuality is a sexual interest and attraction to members of one's own sex. The word 'gay' often used for male as a synonym for homosexual, and female homosexuality is referred to as 'lesbian'. The term 'Homosexuality' was coined in the late 19th Century by an Austrian- born hungarian psychologist, karoly Benkert. Now a days Homosexuality gets a subject of Bengali literature. Different authors have highlighted this issue in different ways in their writing. This topic of homosexuality has found its place not only in Bengali literature, but also in literature in other languages. So, here we will try to discuss "A psychological study of homosexuality and the third gender in Bengali literature" through our Study.

Discussion

সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণই হল সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটির ভিত্তি। অস্ট্রিয়ান বংশোদ্ভূত হাঙ্গেরিয়ান মনোবিজ্ঞানী কেরলে মারিয়া বেনকার্ট দ্বারা প্রথম 'সমকামিতা'[১] শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল। মহিলা সমকামীদের বোঝাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দটি হল 'লেসবিয়ান' এবং পুরুষ সমকামীদের ক্ষেত্রে 'গে', যদিও গে কথাটি প্রায়শ সমকামী মহিলা ও পুরুষ উভয়কে বোঝাতেও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।[২]

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মধ্যে কিছু গোড়া চিন্তাভাবনা কাজ করে, যা আমাদের জন্মের আদিলগ্ন থেকেই আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় সমাজ সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষুধা ক্রমশ তার বিস্তার ঘটাচ্ছে। যা আমাদের অন্যভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে, পাশাপাশি আমাদের মানসিকতায় আনছে আমূল পরিবর্তন।

মনুষ্য সমাজ সৃষ্টির প্রাক্‌কাল থেকেই কিছু মানুষ সমাজের মধ্যে থেকেও সামাজিক পরিচয়হীনতায় জর্জরিত হয়ে বেঁচে রয়েছে। সমাজের কাছে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ'। মনুষ্য সমাজে বেঁচে থেকেও মানুষের সামান্য সন্মানটুকু তারা পায় না। তাদের সমাজ দেগে দেয় 'যৌন বিকলাঙ্গ' বলে। সমাজের তথাকথিত মানুষের কাছে এদের একটাই পরিচয় 'হিজড়ে' বা 'নপুংসক' বলে। কিন্তু সময় পালটাচ্ছে, যুগ এগিয়ে চলছে যার ফলস্বরূপ মানুষও ধীরে ধীরে তাদের মন মানসিকতায় বদল আনতে সক্ষম হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও মানুষের মন থেকে গোঁড়ামির অন্ধকার ছায়া মুছে যায়নি। এখনও সমাজের কাছে মানুষের পরিচয়, মানুষের মর্যাদা তার ব্যক্তিগত লিঙ্গকেই কেন্দ্রায়িত করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 718 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কিত কোনো পৃথক ধারণা ছিল না। শারীরিক মিলন ছিল তাদের কাছে একটা সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, যুগ যত পাল্টেছে, মানুষের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে নানাধরণের কৌতুহল মূলক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। আর এই প্রশ্নের থেকেই জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের নতুন নতুন তত্ত্ব। মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছে যৌন সম্পর্কিত নানান পরিকল্পিত ভাবনা।

মানুষের জন্মের আদিলগ্ন থেকেই দেহজ সঙ্গমকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন বলে মনে করা হত, কিন্তু বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ধীরে ধীরে সেই দৃশ্য পাল্টে যেতে শুরু করে, মনোদৈহিক আনন্দ এখন যৌনতার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে। তবে যৌনতা বিষয়ক আলোচনায় একটা দিক চিরকালই উপেক্ষিত থেকে যায় যা খুব সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যেই লক্ষণীয়। যেখানে মানুষ তার বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি কোনো প্রকার দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করে না, বরং তার সম লিঙ্গের মানুষের সাথে দৈহিক মিলনে চরমতর সুখ ও পরিতৃপ্তি অনুভব করে। ভিন্ন রুচি সম্পন্ন যৌনতার এই দিকটিকে আমাদের তথাকথিত সমাজ চিরকাল অস্বাভাবিক মনে করে এসেছে, এবং সমাজের এক কোণে করে রেখেছে যা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

আমাদের তথাকথিত সমাজ সমকামি মানুষদের সাথে নিজেদের একটি ব্যবধান চিরকাল বজায় রেখে এসেছে এবং আজও সেই ধারা প্রবহমান। সমাজই এই ধরনের মানুষদের জীবনকে চরমতম যন্ত্রণাময় করে তুলেছে, তাদেরকে আমাদের সমাজের এক টুকরো মাটিও ছেড়ে দেওয়া হয়নি যা তাদের জীবনকে অসহনীয় কষ্টকর করে তুলেছে। কিন্তু সাহিত্যে তৃতীয় লিঙ্গ হোক বা সমকামী মানুষের বেদনাময় যন্ত্রণার কাহিনী, তা পাঠ করে, তার থেকে রসগ্রহণ করতে পাঠকেরা চিরকাল উৎসাহিত। সাহিত্যে এই বিষয়গুলো তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সফল হয়েছে। তাই পুরান থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য সবেতেই, এই ধরনের উপেক্ষিত মানুষদের জীবন কাহিনী স্থান করে নিতে পেরেছে।

বাংলা কথা সাহিত্যে সমকামিতার মতো বিষয়কে গল্প বা উপন্যাসের মাধ্যমে চিত্রায়িত করা সত্যই নিঃসন্দেহে একটি কঠিন বিষয়। তবে এ বিষয়ে অনেক লেখকই বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমনই একজন লেখিকা হলেন তিলোত্তমা মজুমদার, তাঁর লেখা 'তুবুল তুই' গল্পে, যেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে দুই বন্ধু শিবতোষ ও প্রীতিময় একসঙ্গে চোদ্দটি বছর তাদের ছাত্র জীবন কাটিয়ে ধীরে ধীরে তাদের কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিক থাকলেও শিবতোষের মনে এক অজানা আতঙ্ক কাজ করে প্রীতিময়ের বিয়ের কথা শুনে। শিবতোষের মনে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ডানা বাধে এই ভেবে যে, প্রীতিময়ের ওপর অন্য কেউ ভাগ বসাতে আসছে, যার অধিকার হয়তো শিবতোষের চাইতেও বেশি। প্রীতিময়কে আর সে রোজ সকালে দেখতে পাবে না। না বলতে পারা এক অজানা ভয় পেয়ে বসে শিবতোষকে। বিয়ের পর থেকে অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে প্রীতিময় ও তার স্ত্রী তিয়াসাকে একান্তে দেখতে পেলে সে অস্বাভাবিক চিৎকারে ফুঁসে ওঠে, কারণ তার মনে হয় যে প্রীতিময় শুধু তার, তাকে অন্য কেউ অধিকার করে বসেছে। এছাড়াও রাতে প্রীতিময় ও তিয়াসার ঘরের সামনে গিয়ে শিবতোষের দাঁড়িয়ে থাকা, প্রীতিময়কে নিয়ে তিয়াসার সাথে তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি উপন্যাসের ঘটনাকে আরো জটিল করে তুলতে থাকে। শেষপর্যন্ত প্রীতিময় তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র ভাড়া চলে যায়, অপরদিকে শিবতোষও তার জন্য মেয়ে দেখে বিবাহ করে নেয়। কিন্তু এরপরও পাঠকেরা দেখতে পাবেন, যে শিবতোষ সেই বহু প্রতিক্ষিত বিয়ের রাতেও ফুলে সজ্জিত শয্যায় প্রথম নারী সঙ্গকে অনায়াসে উপেক্ষা করে চলে যায় ছাদে, আর বলতে থাকে –

"তুবুল, তুই আমার। তোকে আমি প্রবল ভালোবাসি, তুই?"[৩]

শিবতোষ সহ অন্যান্য প্রিয়জনেরা প্রীতিময়কে তুবুল বলে ডাকত। আর এতদিন পর শিবতোষের মুখে আমরা শুনতে পাই তার অন্তরাত্মার চরমতম আকুতি, যেখানে সে স্বীকার করে যে তার সমস্ত সত্তা জুড়ে শুধু প্রীতিময় অন্য কারো স্থান সেখানে নেই।

বাংলা কথা সাহিত্যে সমকামিতা বিষয়ক রচনার প্রসঙ্গ উঠবে আর শিবরাম চক্রবর্তীর কথা উঠবে না, তা হতেই পারে না। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা 'ছেলে বয়সে' উপন্যাস, এ বিষয়ক একটি মাইলস্টোন স্বরূপ। এই উপন্যাসে একদিকে দেখা যায়, বাংলার ছেলেদের স্বাধীনতা পাবার জন্য তাদের মধ্যে চূড়ান্ত উদ্যামতা। অপরদিকে দেখা যায়, কলকাতার বুকে

গড়ে ওঠা একটি বয়েজ হোস্টেলের কাহিনী, যা উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে। যেখানে আমরা দেখতে পাই, কিশোর বয়সী অশান্ত ও মোহন নামক দুটি চরিত্রকে। অশান্ত এবং মোহন কেউই একে অপরকে চিনত না, হঠাৎ তাদের দেখা হয় একটি থিয়েটার হলে প্রথম দেখাতেই অশান্তর মনে এক আশ্চর্য অনুভূতির সঞ্চার হয়, যা পাঠকদেরকে অন্যভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। অশান্তর মনের গভীরে চলতে থাকে মোহনের তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসির কথা। অশান্ত ভাবতে থাকে কীভাবে মোহনের সাথে একটু কথা বলা যায়, এছাড়াও আরও রোমাঞ্চকর ভাবনা তার মনে উঁকি দিতে থাকে। যা পড়ে যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে কোনো যুবকের মনে কোনো যুবতীকে নিয়ে যে রোমান্টিক অনুভূতির সঞ্চার হয় এ তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

এরপর ধীরে ধীরে নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। এবং ঘটনাক্রমে অশান্ত ও মোহন দুজনের মধ্যে এক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, পরবর্তীতে তারা একই হোস্টেলে থাকতে শুরু করে। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ছিল কিছুটা অন্যরকম, বন্ধুত্বের আড়ালে অশান্তের কাছে মোহন যেন তার প্রেয়সীর প্রতিমা। অশান্ত ও মোহনের একসঙ্গে একান্তে সময় কাটানো, সকলের আড়ালে অশান্তর মোহনকে খাইয়ে দেওয়া, আর মোহনের প্রতি অশান্তর প্রেমিক সুলভ উক্তি ও ব্যবহার যেন তারই সাক্ষী বহন করে। তারা দুজনে একসাথে থাকলে তাদের মনে জেগে ওঠে অপরূপ মোহ মুগ্ধকর অনুভূতি যার ফলে অশান্ত একদিন হঠাৎ মোহনের গলা জড়িয়ে ধরে মোহনের রাঙা ঠোঁট দুটিতে এক নিবিড় চুম্বন রেখা একে দেয়।কিন্তু এই অভাবিত আত্মপ্রকাশের বিপুল আনন্দ তারা সহ্য করতে পারল না, তার অসহ্য আবেগ যেন তাদের একটু আঘাতই করল। যে পরম মুহূর্তটি তাদের ভাবি মুহূর্তগুলিকে অমৃতে মধুময় করে দিল তাকে প্রথম মুহূর্তে তারা হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারল না, — পরশমনির যে স্পর্শ তাদের সারাজীবন সোনায় সোনা করে দিল প্রথম ক্ষণে তার আঘাতের বেদনাটাই যেন বেশি করে বাজল। কিন্তু অপরদিকে মোহনের মনে চলছিল অন্য কথা, কেন সে অশান্তর আদরের প্রতিদান দিতে পারল না? কেন বুকভরা একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রিয়তমকে তার অন্তরের কথা জানাতে পারল না।

উপন্যাসের এই কাহিনী যতটা স্নিগ্ধ মনমুগ্ধকর, ঠিক তেমনই এর বিপরীতে ঘটে চলেছে এক পৈশাচিক কামনার ছবি। সেই বয়েজ হোস্টেলেই থাকে তারেশ বলে একটি ছেলে যে চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার। মোহনের মতো নারী সুলভ নমনীয় রাঙা ছেলেদের প্রতি তার নজর। সে সুযোগ পেলেই মোহনকে অধিকার করে বসে, মোহনকে তার ভালোবাসায় ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, যা মোহনের কখনোই পছন্দ নয়।

মোহন ভয়াতুরের মত বিবর্ণ মুখে অশান্তর কাছে এলে, অশান্ত তাঁর হাত ধরে কাছে বসিয়ে বলে, -

> "এত ভয় পেয়েছ কেন? বসো।"[৪]

মোহনের প্রতি তারেশের এই পৈশাচিক কামুক ব্যবহারে অশান্তর প্রতিক্রিয়া যে তার অন্তরের প্রেমিক রূপের বহিঃপ্রকাশ, তা পাঠক সহজেই অনুভব করতে পেরেছে আর মোহনও প্রেমিক অশান্তর কাছেই খুঁজে পেয়েছে তাঁর নিরাপদ আশ্রয়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি দিক না বললেই নয়, যেখানে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের শুরুতেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের আখ্যায়িকা আলোচনা করে বলেছেন, -

> "শ্রীকান্ত বড় হলে, লোকে তাকে জিজ্ঞেস করল যে তার জীবনে কাকে এবং তাকে কে প্রথম ভালোবেসেছে, শ্রীকান্ত উত্তর দিল, রাজলক্ষ্মী, প্রশ্নকর্তা উত্তর শুনে বিমুগ্ধই হলেন, কিন্তু বিমূঢ় হলেন কেবল বিধাতা - হতভাগ্য ইন্দ্রনাথ কে স্মরণ করে। শ্রীকান্ত সারাজীবন ধরে রাজলক্ষ্মীরই পুজো করে চলল, কিন্তু ছেলে বয়সে ইন্দ্রনাথই তাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে এবং যার আকর্ষণে মৃত্যুর মুখ পর্যন্ত সে বারবার অভিসারে বেরিয়েছে, সেই প্রথম প্রিয়ের প্রতি তার প্রথম প্রেম যে প্রথম প্রিয়ার চাইতে কিছু মাত্র কম ছিল তাই বা কে বলবে?
>
> কেবল চোখে নয়, মুখে নয়, মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে নয় – সমুদয় স্নায়ু-শিরা-মজ্জায় জড়ানো ছেলে বয়সের এই ভালোবাসা। ছেলেরা মাকে যেমন ভালোবাসে তেমনি অগোচর ও একান্ত। ছেলেবেলার এই স্বপ্নের কাহিনী বড়বেলার স্মৃতির বাহিনীর মধ্যে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যায় না।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 718 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে নারীসমকামিতাকে কেন্দ্র করে তিলোত্তমা মজুমদারের লেখা 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' এক অনন্য উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। এই উপন্যাসটি ১৪০৯ আনন্দবাজার পূজাবার্ষিকী সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আত্মনির্ণয় বিপন্নতা যা এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। নারী সমকামিতাকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠা এই উপন্যাসটি পাঠকের কাছে মেলে ধরেছে এক নতুন দিক। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে শ্রুতি, যাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটি নানাদিকে তার অঙ্গপ্রসার ঘটিয়েছে। আত্মনির্ণয় বিপন্নতা, যে অসুখ শ্রুতি বসুকে নিরন্তর অপূর্ণতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মফস্বল স্কুলের ভালো ছাত্রী শ্রুতি, তাঁর মাকে হারিয়েছে ছোটবেলায়, রয়েছে শুধু বাবা আর জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছোট ভাই ওলু। মা মারা যাবার পর সংসারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে শ্রুতির ওপর। সে ভালো নম্বর পেয়ে কলকাতায় ভালো কলেজে দর্শন নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলেও সংসারের কথা ভেবে সে যেতে নারাজ। কিন্তু শ্রুতি তার বাবার ক্লান্তি টের পেয়েছিল, টের পেয়েছিল তার ওপর বাবার নির্ভরতা। দূরের যেখানে আকাশ আর মাটির মিশে যাওয়া সেখানে চোখ রেখে শ্রুতি ক্রমশ হয়ে উঠছিল প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ যা ওলুকে ঘিরে থাকবে, শ্রুতিকে বাঁচাবে, বাবাকে ছুটি দেবে।শ্রুতির কলকাতায় পড়তে যাওয়াটা তার ও তার পরিবারের জন্য যে কতটা জরুরী তা সে বুঝতে পেরেছিল। এরপর শ্রুতি কলকাতার এক কলেজে দর্শন নিয়ে পড়তে শুরু করে এবং সেখানে হোস্টেলে পরিচয় হয় দেবরুপা আর শ্রেয়সীর সঙ্গে। এই প্রথম গ্রামের মেয়ে শ্রুতি এই হোস্টেলেই সমকামিতার পাঠ পায়। শ্রুতির দুই রুমমেট দেবরুপা আর শ্রেয়শ্রীর পরস্পরের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আকর্ষণের মাধ্যমে যেসব মুহূর্ত রচনা করেছিল, তারই ঘূনাবর্তে শ্রুতি বন্যায় বিধ্বস্ত নৌকার মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙছিল অথচ এই ভাঙন হন্তারক ছিল না। শ্রুতি নিজের বিবিধ খন্ডের মধ্যেই একদিন নির্ণয় করেছিল নিজেকে।

উপন্যাসের কাহিনী মূলত দুটি পর্বে বিভাজিত – 'পূর্বশ্রুতি' এবং 'পরশ্রুতি'। প্রথম পর্বের শ্রুতি বসু হল মফস্বলের স্কুলে পড়া এক ভালো ছাত্রী, যে অনেক স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় পড়তে আসে কারণ তাকে একটা চাকরি পেতে হবে। তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে। আর দ্বিতীয় পর্বের শ্রুতি বসু দর্শণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যার সত্যিকারের জীবন দর্শন ঘটেছে, ছাত্রাবস্থার পরবর্তীকালে সে একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থায় চাকরি পেয়ে সংসারের হাল ধরে।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে দেখা যায়, ছাত্রীবাসের কুড়ি নম্বর রুমে থাকা শ্রুতি বসু, শ্রেয়সী আচার্য এবং দেবরূপা পাল, যারা সবাই পড়তে কলকাতায় এসেছে। যেখানে শ্রেয়সী হল সম্পূর্ণ মেয়েলী ছাদে গড়া নমনীয় প্রকৃতির আর দেবরুপা হল ঠিক বিপরীত ছোট চুল, ছেলেদের মতো পোষাক পরিহিত, এক চরিত্র। শ্রেয়সী ও দেবরুপার মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব কিন্তু তা যেন আর পাঁচটা বন্ধুত্বের মতো নয়, তার মধ্যে রয়েছে যৌনতার গন্ধ, দেহজ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার প্রবল ইচ্ছা। দেবরুপা আসলে নারী দেহে পুরুষ প্রকৃতি বহন করছে, ফলত সে তার কামনার পরিতৃপ্তি ঘটায় শ্রেয়সীকে দিয়ে। সে কারণেই দেবরূপা যখন জানতে পারল যে শ্রেয়সী ও শুভ্রনীলের সম্পর্কের কথা তখন দেবরুপা প্রচন্ড ক্ষেপে যায় -

> দেবরুপা বলেছিল, 'ও রোজ কেন আসে?'
> শ্রেয়সী বলেছিল, 'আসুক না তুই তো দেখলি। আমি বেশিক্ষণ কথা বলিনি।'
> — কিন্তু ও রোজ আসবে কেন? ও না এলে তোর চলে না?
> — না, তা মোটেও নয়। কিন্তু ও এলে আমি না বলতে পারি না।
> — হ্যাঁ। তোকে বলতে হবে। তুই বলবি।
> — না। আমি পারবো না।
> — আসলে ও এলে তোর ভালো লাগে সেটা বল।
> — হ্যাঁ, লাগে, ভালো লাগে।[৬]

এভাবেই শ্রেয়সী ও দেবরুপার সম্পর্কের নানান ওঠাপড়ার সাক্ষী হিসেবে থেকে যায় গ্রামের মেয়ে শ্রুতি বসু। দর্শনের ছাত্রী শ্রুতি বসু যেন ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের কিছু অজানা দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। শ্রুতির মনে প্রশ্ন জাগে, প্রেম আসলে কী? কিভাবে করে প্রেম? শ্রুতি তা জানে না। প্রেম কোন ক্রিয়া পদ নয়। প্রেম করা কোনো প্রক্রিয়া

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 718 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নয়। হয়তো নিবিড় ভাবে তাকানো – এর নাম প্রেম করা, তীব্র স্পর্শাকাঙ্ক্ষা – তার নাম প্রেম করা। শ্রেয়সী ও শুভ্রনীল করছিল সেই প্রেম। আসলে পুরুষ নারীকে টানলে সে টান অমোঘ, নারী নারীকে টানলে সে অতিক্রমণ সহজ সম্ভব, এই সহজ সত্য সম্পকে দেবরুপা অবগত ছিল না, তাই তাকে কষ্ট পেতে হয়েছিল।

> "শ্রেয়সী ক্রমশ অভিমান ভাঙছিল দেবরুপা মেয়ের। দেবরুপা অভিমান ভাঙছিল শ্রেয়সী মেয়েটির। কাছে টানছিল। দেবরুপা নেমে আসছিল নীচে। আরো নীচে। শ্রেয়সীর বুকের ওপর।"[৭]

দেবরুপা আর শ্রেয়সীর সম্পর্কের সঠিক কোন ব্যাখ্যা শ্রুতি খুঁজে পায়নি। আর শ্রেয়সীও তার অন্তর মনের কাছে স্বীকার করেছে, যে দেবরূপার মত আনন্দ সে শুভ্র নীলের কাছেও পায়নি, যা পাঠককূলকে একেবারেই অবাক করেনি। এরপরে উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়, শ্রুতি যেখানে চাকরি করতো সেখানেই তার সহকর্মী হিসেবে যোগ দেয় দেবরুপা। তবে দেবরুপার চরিত্রের কোন বদল ঘটেনি, এখনও দেবরুপা রয়ে গেছে ঠিক আগের মতোই। দেবরূপা ও সঙ্গীতা দত্তের বন্ধুত্বই তার অকাট্য প্রমাণ। হঠাৎ শ্রুতি দেখতে পায় –

> "দেবরুপার হাত সঙ্গীতার ব্লাউজে খেলা করছিল। আমাকে দেখে হাত সরিয়ে নিল। সঙ্গীতা শাড়ি পরে। আঁচলে গা ঢেকে রাখে। দেবরুপা, আচঁলের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়। বদলায়নি। একটি বিন্দুও বদলায়নি ও। ঠিক সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে।"[৮]

হঠাৎ এতসবের মধ্যে শ্রুতি বুঝতে পারে, তাঁর নিজের জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ভাই ওলু, যার মধ্যে কোন জ্ঞান নেই, বোধ নেই, কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে কাম বোধ। আসলে প্রত্যেকটি মানুষই অপর এক মানুষের সঙ্গ প্রার্থনা করে। কারণ এই যৌন চাহিদা পুরোপুরি ভাবেই প্রকৃতিগত। যার নানাবিধ নজির আমরা প্রত্যহ আমাদের চারপাশে দেখতে পাই।

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে হঠাৎই আগমন ঘটে, পুরুষ দেহে নারী স্বভাবেচিত 'ললিতা'র। যার সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয় সমকামী দেবরুপা। আর এই কামোত্তেজিত অবস্থায় তাদের দেখতে পায় শ্রুতি, যা শ্রুতির কাছে অসাধারণ দৃশ্য বলে মনে হয়েছে –

> "দেবরুপার শাড়ি উঠে গেছে, কোমরে। পা ছড়ানো। ওর কোলে ললিতা। গায়ে শার্ট নেই। বুকে একটি কাপড় কাচুলির মতো বাঁধা। তার ওপর দেবরুপার হাত খেলছে। দুজনের মুখ এক পাশে নামানো। এর ঠোঁট ওর ঠোঁট ঢুকে আছে। কোনও হুঁশ নেই। ...ওরা রাধা-কৃষ্ণ খেলছে। কিন্তু কে রাধা আর কে কৃষ্ণ! আজ কৃষ্ণ রাধা সেজেছে আর রাধা কেষ্টটি সেজে মজা করছে। ...ওরা শরীর প্রকৃতি ছাপিয়ে গেছে। মন-প্রকৃতিতে মিলেছে। চিরন্তন নারীমন চিরন্তন পুরুষ মনে মিলেছে। দেহ-গঠন এখানে বাধা হয়নি। নারী দেহধারী পুরুষ, পুরুষ দেহী নারীকে জড়িয়েছে। জয় প্রকৃতির জয়।"[৯]

শ্রুতি হঠাৎই অনুভব করেছে –

> "তাঁর শরীর জুড়ে এক আশ্চর্য অনুভূতি। আমার, ওই রকম, দেবরুপার মতো, কাঁচুলি ভেদ করতে ইচ্ছে করছে! আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে! হে ঈশ্বর, এর নাম যৌন অনুভূতি! হে ঈশ্বর, আমি কি নিজেকে চিনতে পারছি! হে ঈশ্বর, আমি ওদের ঘোর ভাঙ্গিয়ে দিলাম না কেন? সে কি এজন্যই যে আমি যা পারি না, দেবরুপা যা পারে, তা প্রত্যক্ষ করে আমার সুখানুভূতি হচ্ছে!"[১০]

শ্রুতির মনে চলতে থাকে এক চরমতম আত্ম বিশ্লেষণ, তার হঠাৎ মনে হতে থাকে এ কেমন যৌন অনুভূতি। যা এর আগে সে কখনও অনুভব করেনি। তাঁর এই নতুন রূপের সঙ্গে শ্রুতি যেন নিজেকে মেলাতে পারে না। তাঁর মনে হতে থাকে, তবে কি সে এতদিন নিজেকে চিনতেই পারেনি, নিজের যৌন আকাঙ্খা সম্পর্কে সে এতদিন অনভিজ্ঞ ছিল? দর্শনের ছাত্রী শ্রুতির মনে হতে থাকে, এতদিন পরেই কি তাঁর সত্যিকারের আত্ম দর্শন ঘটলো? মনে ও মাথায় হাজারও প্রশ্ন একইসঙ্গে তোলপাড় করে তোলে শ্রুতিকে। সেই মুহূর্তে হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে, যে কয়েক বছর আগে ছাত্রীবাসে থাকাকালীন সকলে যে তাকে 'ভয়ার' (Voyeur) বলে উঠেছিল, তবে কি তারা সেদিন ঠিকই চিনেছিল শ্রুতিকে? শ্রুতি কি তবে সত্যিই 'ভয়ার' (Voyeur)? সে নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে যে যৌন সুখ অনুভব করতে অপারগ, তা কি সে ছাত্রীবাসে থাকাকালীন দেবরূপা ও শ্রেয়সীর কামুক কার্যের মাধ্যমে উপভোগ করতো? আর আজ দেবরুপা ও ললিতাকে কামোত্তেজিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 718 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে তাঁর মনের গভীরে থাকা ভয়ার শ্রুতি আবার দেখা দিয়েছে? আর সেই কারণেই হয়তো শ্রুতি তাদেরকে বিরক্ত করতে চায়নি। দুটি মানুষের অন্তরের প্রেমিক সত্তা একে অপরকে পেয়ে যেন স্বর্গ সুখ অনুভব করছে। আর তা দেখে শ্রুতিও তাঁর অন্তরে অনুভব করছে এক অজানা সুখ।

তাই শেষে দেখা যায়, চির সত্যের সাক্ষী হয়ে, মধ্যগগনে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে শ্রুতি গাইতে থাকে –

"চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করবো কি...
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে–"[১১]

সমকামী সম্পর্কগুলো যে আর পাঁচটা সম্পর্কের থেকে কোন অংশে আলাদা নয়, শারীরিক গঠন সে ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে না, তা নবনীতা দেবসেন দেখিয়েছেন তার 'বামাবোধিনী' উপন্যাসের মাধ্যমে। এখানে আমরা দেখতে পাবো তিন ছোটবেলার বন্ধু সঞ্জয়, রবি ও অংশুমালাকে। তারা একসঙ্গে পড়াশোনা করে। রবি ও সঞ্জয় পরে আই.আই.টি.-তে আর অংশু প্রেসিডেন্সিতে। এরপর রবি ও অংশুমালার মধ্যে প্রেমজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। মাতৃহারা অংশুমালাকে রবি আগলে রাখতো মাতৃস্নেহে। উপন্যাসের অপরদিকের কাহিনীতে দেখা যায় - সঞ্জয়, মালিনী নামের এক মারাঠি মেয়েকে বিবাহ করে, তাদের একটি কন্যা সন্তানও হয় তার নাম দেওয়া হয় পুষ্পাঞ্জলী।

হঠাৎ এরপরই উপন্যাসের কাহিনীতে নেমে আসে বিপর্যয়। যার প্রভাব সহ্য করতে হয়েছে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই। পিতৃ-মাতৃহীন অংশুমালা যখন রবিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই রবি তাঁর জীবন থেকে চলে যায়। অংশু হঠাৎই রবির একটি চিঠি পায়, যেখানে রবি নিজেই বলছে যে সে সমকামী আর তার আসল প্রেম সঞ্জয়, তাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। এই ভাবেই পিতৃমাতৃহীন অংশু তার ভালোবাসার শেষ অবলম্বনকেও হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির এই অমোঘ ভালোবাসার কাছে হেরে যায় সবকিছু।

লেখিকা একটি বিষয় পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, যে সমাজের তৈরি করা কিছু বিধি ব্যবস্থায়ই মানুষের দুঃখের মূল কারণ। সমাজ ঠিক করে দেয়, আমাদের কি করা উচিত আর কী নয়? রবির লেখা চিঠিই তার স্পষ্ট প্রমাণ –

> "কোন নারীর সঙ্গে প্রেম যদি ভেঙে যায়, ভুবনের সহানুভূতি ছুটে আসে। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য খেয়াল ছাড়া প্রেম ভেঙে গেলেও সহানুভূতি দেখাবে না কেউ, বলবে – ঠিকই তো হয়েছে। যেমন ভেঙেছিল প্রকৃতির বিধান। কিন্তু এটাই যে আমার নিজস্ব প্রকৃতি। তার বিধান মতোই যে আমি চলেছি, সে কথাটা বোঝাবার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে নেই। দুটি শব্দে সমকামী প্রেমিকরা সমাজে চিহ্নিত, 'বিকৃত' আর 'বিপজ্জনক'। কোনটাই ভালোবাসার সঙ্গে যায় না।"[১২]

'বামাবোধিনী' উপন্যাস রচনার পর নবনীতা দেবসেনের লেখা 'অভিজ্ঞান'[১৩] উপন্যাসে এসে আমরা বুঝতে পারি দিন বদলাচ্ছে। ধীরে ধীরে মানুষ সমাজের নীতি নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভেঙে নিজের ভালো-মন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে। এই উপন্যাসের নায়িকা হল সঞ্জয় আর মালিনীর মেয়ে পুষ্পাঞ্জলি। পুষ্পাঞ্জলি তার প্রেমিক সৌম্য থাকা সত্ত্বেও সে তার থেকে বয়েজেষ্ঠ্য, বিবাহিতা এক নারী সলমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সৌম্য বিষয়টা যেভাবে সহজেই গ্রহন করে নিতে পেরেছে, 'বামাবোধিনী'-র অংশুমালা কিন্তু তা পারেনি। এখানে লেখিকা স্পষ্টত দেখিয়েছেন দুই প্রজন্মের মধ্যে ভাবনা-চিন্তার পার্থক্য। সৌম্যর কাছে যেটা সহজ, স্বাভাবিক, অংশুমালার কাছে তা নয়। এই অস্বাভাবিকতার কারণ তাদের সংস্কারবদ্ধ ভাবনা-চিন্তা। তারা কখনও ভাবতেই পারেনি যে দুটি পুরুষ বা দুটি নারীর মধ্যে নতুন কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। তারাও আলাদাভাবে গড়ে তুলতে পারে তাদের ভালোবাসার কোন ভিন্ন জগৎ।

উপরিউক্ত যতগুলো উপন্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি প্রত্যেকটি নারী বা পুরুষ সমকামিতাকে কেন্দ্রায়িত করে। এখন আমরা যে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করবো তা সমাজের সমকামী, বিষমকামী, উভয়কামী, তৃতীয় লিঙ্গ প্রত্যেক ধরনের মানুষদের নিয়ে। এলজিবিটি মানুষদের জীবনের টানাপোড়েনের কাহিনী লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর লেখা 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। উপন্যাসে তিনি খুব নিপুণতার সঙ্গে 'Sex' এবং 'Gender' এর মধ্যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 718 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পার্থক্য করে দেখিয়েছেন। 'Sex' হল পুরোপুরি ভাবেই বায়োলজিকাল বিষয়। আর আমাদের 'Gender' নির্ধারিত হয় সমাজের দ্বারা। সমাজই আমাদের ঠিক করে দেয়, আমাদের কীরকম পোশাক পড়া উচিত, কীভাবে কথা বলা উচিত, কেমন ব্যবহার করা উচিত, কারণ সমাজের কাছে পুরুষ ও নারী ভেদে এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে এক প্রকট পার্থক্য। আর হঠাৎ যদি কোনো মানুষ এই বাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে কিছু করতে যায় তখনই আমরা তাকে অস্বাভাবিক, বিকৃত বলে মনে করি, এমন কি কখনো কখনো আমরা তাদের ভিন্ন যৌনরুচিকে পাগলামি বলে ও মনে করি। ফলত সমাজের নিয়ম বহির্ভূত কোন ভিন্ন যৌন রুচি, ভিন্ন ব্যবহার বা ভিন্ন বেশ-ভূষার মানুষদের সমাজে টিকে থাকা এবং সমাজে মানুষের সমমর্যাদা অর্জন করতে তাদের মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর অসাধারণ মায়াময় দক্ষতায় সমাজের সংকট সংকুল মানুষদের অনুভূতিগুলিকে চিত্রায়িত করেছেন। সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব নিয়ে এক দুঃসাহসিক উপন্যাস এই 'হলদে গোলাপ' – যা ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল জুড়ে প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত রোববার – এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশকালে পাঠক সমাজ বেশ আলোড়িত হয়। কাহিনি বয়নে মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা তুলে আনতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে খুঁজেছেন ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শরীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব জিনেটিক্স, মিথ-পুরাণ। এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছিলেন – 'স্বপ্নময়ের গল্প আমাদের শেকড় খোঁজার কোদাল'। কাহিনীর পরতে পরতে মিশে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি। শুধু বাংলা সাহিত্য কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এর আগে এভাবে কোন উপন্যাস লেখা হয়নি।

উপন্যাসটি বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে, উপন্যাসের নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা জেনে নেওয়া প্রয়োজন যা আমরা উপন্যাসেই পাই। 'প্রবর্তক' পত্রিকার লেখক পবন ধল বলেছিল —

> "গোলাপের রং তো আমরা গোলাপিই বুঝি। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনতা আছে; আবার হিংসা–পরশ্রীকাতরতাও আছে। শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা।"[১৪]

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হল অনিকেত, যে একটি রেডিও অফিসে চাকরি করে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনীর ব্যাখ্যা করেছেন। অনিকেত হঠাৎই অনুভব করে যে, তাদের রেডিওতে এমন একটি অনুষ্ঠান করানো যেতে পারে, যেখানে যুবক যুবতীদের মনের কিছু প্রশ্ন যা তারা সাধারণত কাউকে বলতে পারে না, তারা রেডিওতে তাদের প্রশ্ন উত্থাপন করবেন আর উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রথমে নানা বাঁধা আসলেও পরে 'সন্ধিক্ষণ' নামে একটি অনুষ্ঠান চালু হয় অনিকেতের তত্ত্বাবধানে, যদিও পদে পদে এসেছে নানান প্রতিবন্ধকতা কিন্তু তবুও শেষপর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠানটি চালিয়ে নিয়ে গেছেন। অনিকেতের স্ত্রীর নাম শুক্লা, যে সন্তান ধারণে অক্ষম। এছাড়াও তার মধ্যে রয়েছে পুরনো দিনের কিছু গোঁড়া মনোভাব, যেমন স্বামীর সঙ্গে ঋতুস্রাব নিয়ে আলোচনা করাটা তাঁর কাছে লজ্জার বিষয়। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা। তবে লেখক তার সুচারু ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের একটি অন্ধকার দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে আমরা দেখতে পাই অনিকেত, যে বাড়ির বাইরে সমকামীদের নিয়ে নানান জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন, তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন, তারাও যে আর পাঁচটা মানুষের মতই স্বাভাবিক এনিয়ে নানান মিটিং মিছিল করে বেড়ান। কিন্তু যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবৃত্তে থাকা কিছু মানুষদের সত্যি জানতে পারেন, তখন তিনি তাদের পাশে থাকতে পারেন না। নিজের আদর্শ নীতিবোধ এর সব তখন ভুলে তিনি হয়ে ওঠেন এক অন্য মানুষ। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হল অনিকেতের বাড়ির কাজের মাসির ছেলে দুলাল সে যখন হিজড়ে হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে নির্মমভাবে এইডস রোগে তার মৃত্যু হয়, তখন তাদের প্রতি অনিকেতের কোনো সহযোগী মনোভাব পাঠক দেখতে পাননি, আবার দুলালের ছেলে মন্টু যখন সমকামী এ কথা জানতে পারেন তখন অনিকেত তাদের আশ্চর্যজনক ভাবে বাড়ি থেকে বের করে দেন, কিন্তু অনিকেতের বান্ধবী মঞ্জুর ছেলে পরিমল ওরফে পরি যখন সমকামী একথা জানতে পারে তখন কিন্তু পরীকে নিজের সন্তানসম ভেবে নিতে অনিকেতের কোনো অসুবিধা হয় না কারণ পরী হল বড় ফ্যাশন ডিজাইনার। আসলে লেখক আমাদের দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 80
Website: https://tirj.org.in, Page No. 718 - 726
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভদ্রসমাজ অর্থনৈতিকভাবে যারা অসচ্ছল তাদেরকে পদদলিত করতে মুহূর্তমাত্র ভাবে না কিন্তু যারা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী তাদের কর্তৃত্ব সহজেই স্বীকার করে নেয়।

এই 'পরী' বা 'পরিমল'কে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। পরী জন্মগত ভাবেই পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু তাঁর মনে রয়েছে নারী প্রকৃতি। পুরুষের কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে নেই, তার মধ্যে রয়েছে এক মেয়েলীপনা স্বভাব। যা তাঁর মা এর চিন্তার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। মেয়েদের মতো সাজতে, তাদের মতো পোষাক পড়তে পছন্দ করত সে। তার প্রকাশ আমরা দেখেছি, 'প্রবর্তক' পত্রিকায় পরীর লেখা এক 'স্বীকারোক্তি' নামক কবিতা থেকে, যেখানে সে নিজে বলেছে –

"বয়স তখন তেরোর শেষে
প্রথমবার একা
...
দীপ্ত আমার সুপ্ত শিখা
...
আমার আশা আমার ভাষা
জানি শুধু আমি
জানি না তো জানেন কিনা
স্বয়ং অন্তর্যামী।
মা বোঝে না, কেউ বোঝে না
কোথায় আমার আমি।
ব্যঙ্গ করে বলতে পারো
তুই তো সমকামী।"

-পরী।[১৯]

এই 'পরী' চরিত্রটির সবথেকে বলিষ্ঠতম দিক হল তার অপরিসীম জেদ। সে নিজেকে কখনো ছোট মনে করে না। সেই যেদ নিয়েই ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়ে চাকরি পায়। যা তাকে সমাজের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিকভাবে অনেক স্ট্রং করে তুলেছে। পরী ভালোবাসে চয়ণ নামের নিপাট সাধারণ স্কুল মাস্টারী করা একটি ছেলেকে এবং তাকেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে চয়ণেরও পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। যদিও এ নিয়ে তাদের কম ব্যঙ্গ রসিকতার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু তবুও পরী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল।

পরী এটাও জানে যে তাদের এ বিয়ে আইন সম্মতভাবে সম্ভব নয় কিন্তু তবুও তারা চায় সামাজিকভাবে বিয়ে করতে। আসলে ছোটো থেকে আর পাঁচটা মেয়ের যেমন বিয়ে নিয়ে নানান স্বপ্ন থাকে পরীরও তেমন ছিল। পরী ও চয়ণের প্রেমে যৌনতার দিকটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে লেখক দেখিয়েছেন পরী চায় চয়ণকে পরিপূর্ণ ভাবে সুখ দিতে, তাই সে নিজের ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট সার্জারি করিয়েছিল, নিয়মিত ইস্ট্রোজেন ট্যাবলেট খেতো। অবশেষে আসে সেই শুভ দিন ২৭শে শ্রাবণ। অনিকেতের বাড়িতেই বিয়ের সকল আয়োজন হয়, পরী সাজে শাড়ি গহনায় অপরূপভাবে আর চয়ন মেরুন রঙের পাঞ্জাবিতে অবশেষে তাদের বিয়ে হয়। ঔপন্যাসীক বিয়ের ঘটনাটির মাধ্যমে সমাজের ট্যাবু কে ভাঙতে চেয়েছেন। সমাজের সমস্ত বাঁধা ছকের গণ্ডি ভেঙে দুটি প্রেমিক সত্তা এক হয়েছে তাদের শুভ পরিণয়ের মাধ্যমে, যা এর আগে বাংলা উপন্যাসে সেভাবে দেখানো হয়নি।

এ ধরণের উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে, মনে পড়ে যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কিংবা জয় গোস্বামীর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' প্রভৃতি উপন্যাসের কথা, যেখানে পুরুষ সমকামিতা বা নারী সমকামিতা–র বিষয়গুলি উঠে এসেছে লেখকের লেখনীর মাধুরতায়।

বাংলা কথা সাহিত্যে সমকামী প্রেম এই বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে, বিভিন্ন লেখকদের হাত ধরে। পূর্বে এই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা প্রচ্ছন্নতা থাকলেও, বর্তমানে তা আর নেই। কারণ মানুষ বুঝতে শিখেছে, সমকামী প্রেম কোন অন্যায় বা পাপ নয়। আর পাঁচটা যৌন প্রবৃত্তির মতোই এটি, কিন্তু তা সম লিঙ্গের মানুষের প্রতি। এর মধ্যে কোন বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা নেই। আর প্রেম তো কোনো নিয়ম মেনে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রেম মুক্ত এবং স্বাভাবিক একটি বিষয়। আর সাহিত্যে স্থান পাওয়ার পর সমকামী প্রেম বিষয়টি আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মানুষের কাছে। নানা ভাবে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের কাছে সমকামী প্রেম বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে দেহ কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না, দেহ ছাড়িয়ে হৃদয়ের ঘরে যার বসবাস, মনটাই হয়ে ওঠে প্রধান।

তাই শুধুমাত্র লিঙ্গ গত পরিচয়ই মানুষের একমাত্র পরিচয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আমরা মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি **চন্ডীদাসের** বলা একটি উক্তি তুলে ধরতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন - "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"[২০] অর্থাৎ আমরা মানুষ এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত।

Reference:

১. https://plato.stanford.edu/entries/homosexuality/
২. https://bn.m.wikipedia.org/wiki
৩. মজুমদার, তিলোত্তমা, তুবুল তুই, কালচিনির উন্মেষ (পত্রিকা) পৃ : ১৫
৪. চক্রবর্তী, শিবরাম, ছেলে বয়সে, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৩২ (১৯২৫) পরিচ্ছেদ ১৩
৫. তদেব, ভূমিকা
৬. মজুমদার, তিলোত্তমা, চাঁদের গায়ে চাঁদ,সুবীর কুমার মিত্র (প্রকাশক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড, বসু মুদ্রণ ১৯ এ সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫ পৃ. ৭৫
৭. তদেব, পৃ: ৯১
৮. তদেব, পৃ: ২১৮
৯. তদেব, পৃ: ২২৭
১০. তদেব, পৃ. ২২৭
১১. তদেব, পৃ. ২২৮
১২. দেবসেন, নবনীতা, বামাবোধিনী, দেব সাহিত্য কুটির প্রা: লিমিটেড (প্রকাশক), ১৯৯৭ পৃ. ১৫
১৩. দেবসেন, নবনীতা, অভিজ্ঞান, দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ মে, ২০১২
১৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, সুধাংশু শেখর দেব (প্রকাশক), দে'শ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, মুদ্রণ,জানুয়ারী 2015 (মাঘ ১৪২১) পৃ. ৭৩
১৫. তদেব, পৃ. ৮০
১৬. তদেব, পৃ. ৮১
১৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, মায়ামৃদঙ্গ, দে'শ পাবলিশিং, ৫ম সংস্করণ (২০২১)
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লিমিটেড, ২০১৭
১৯. গোস্বামী, জয়, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লিমিটেড, ১লা জানুয়ারী ১৯৯৮ (২০১৫)
২০. https://www.prothomalo.com/opinion/column/

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 727 - 737
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিভিন্ন পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও মহাকাব্যে তৃতীয় সত্তাদের অবস্থান

অনুশ্রী মাইতি
Email ID : maityanushree84@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Hermaphrodite, Brrihonnola, Third entities, Puran, Epic, Shiv, Krishna, Parbati.

Abstract

The word 'Brihannala' means 'hermaphrodite' in English. Although now called intersex, earlier it was called hermaphrodite. The word hermaphrodite has its origins in Greek mythology. The sum of god Herms and goddess Aphrodite. This bisexuality is not limited to Greek mythology, but exists throughout the world. Including god as well as human, plants and animals from the birth of the world present day. In the early stage of the earth creation, many animal had bisexuality. Early in the animal kingdom, protozoa, periphera, celentereta, platihelminthes, annelida, mollusca and cordata were mostly bisexual. Many of them self-fertilize sperm and eggs in their own bodies to create new animal. Then sperm and ovum slowly start to get space in different body. However, some animal still have bisexuality. Earthworms are typical examples of hermaphrodite, along with leeches, worms and snails. Some flowers are include bisexual such as Hibiscus, stramonium, swamp pea, bell etc. stamens and pistils can be seen very well in Hibiscus flower.

There are many animal that can change sex. Sex in human and other mammals is determined before birth. Whether an animal is male or female usually depends on the chromosomes. On the other hand, many animals, including marine animals, do not have sex chromosomes, so their sex is not determined at birth. The sex of animals determined Based on brain effects and environmental influence. There are several species of animal that are born as one sex but can later change their sex and transform into the opposite sex.

Not only animals, there are many people like animals who have two gender present in their bodies at the same time. Some change Their gender and transform into another gender, some wear clothes of opposite gender. Search character are found in various purans, epics, scripture, medicine sastra. I got to know the attitude and behaviour of society towards them. I got to know them after they changed from one gender to another gender sign and change their thinking. how these people are oppressed and deprived by the society. In fact, the existence, deprivation and harassment of these people is not only the modern area but from the mythical area but rather from the first state of creation of human civilization in the world, and the birth of deprivation from the day when people started to become socialised begings. but we should not forget that not only human but also in plants and other animal in the natural process of creation of life from the first stage of creation of the Earth, we found

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

this image of bisexuality, gender transformation. Therefor if we modern people look at them with normal eyes instead of looking at them with contempt, their lifestyle also become normal.

Discussion

বৃহন্নলা শব্দটির ইংরাজি অর্থ 'হার্মাফ্রোডাইট। হার্মাফ্রোডাইট কথাটির উৎস গ্রিক পুরাণ। দেবতা হার্মেস ও দেবী অ্যাফ্রোদিতির যোগফল। এই উভলিঙ্গত্ব কেবল গ্রীক পুরাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজমান, যেমন দেবতাদের মধ্যে তেমনি মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় অনেক প্রাণীর মধ্যে উভলিঙ্গত্ব ছিল। প্রাণীজগতের গোড়ার দিকে প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা এই সমস্ত প্রাণীদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ ছিল। অনেকের আবার নিজের শরীরে শুক্রাণু ও ডিম্বানুর স্বঃনিষেক ঘটে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হত। তারপর ধীরে ধীরে শুক্রাণু ও ডিম্বানু আলাদা আলাদা শরীরে জায়গা পেতে শুরু করে। তবে এখনও বেশকিছু প্রাণীর মধ্যে উভলিঙ্গত্ব রয়েছে। উভলিঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে কেঁচো আদর্শ উদাহরণ, এছাড়া রয়েছে জোঁক, কৃমি, শামুক। ফুলের মধ্যে জবা, ধুতুরা, বক, বেল ইত্যাদি উভলিঙ্গ ফুল রয়েছে। জবাফুলের মধ্যে পুংকেশর ও গর্ভকেশর খুব ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

শুধু প্রাণী নয়, প্রাণীদের মতো এরকম অনেক মানুষ আছেন যাদের দেহে একইসঙ্গে দুই লিঙ্গ বর্তমান, কেউ বা লিঙ্গ পরিবর্তন করে অন্য লিঙ্গতে রূপান্তরিত হয়, কেউ বা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে থাকে। এরকম চরিত্র বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্রে পাই। তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিচয় পাই। বৈদিক সাহিত্যে নপুংসক ও ক্লীবদের জন্মের কারণ দেখানো হয়েছে -

> "A few Verse from the Vedic canon refer to men taking birth among the third sex as a means of purification. In such cases, first gender males who abuse woman. Or brahmans who engage in prohibited in hell."[১]

বৈদিক যুগে একটা মানুষ নপুংসক কিনা তার পরীক্ষা হত পাঁচটি ধাপে-

১। জ্যোতিষীদের সঙ্গে কথা বলে।
২। তাদের সারা শরীর পরীক্ষা করা হত।
৩। একজন মহিলার সাথে তার যৌন সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা হত।
৪। প্রস্রাবে ফেনা হয় কিনা দেখা হত।
৫। মল জলে ডুবে যায় কিনা দেখা হত।

যদি এইসব পরীক্ষায় সফল না হত তবে তাকে নপুংসক হিসেবে গণ্য করা হত। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হয়েছে বিয়ের আগে বরের ক্ষমতা ভালোভাবে দেখে নেওয়া উচিত। নারদ স্মৃতিতে বিশেষ করে সমকামী ও অন্যান্য নপুংসক পুরুষদের নারীদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং বলা হয়েছে স্বামীর মধ্যে পুরুষত্বের অভাব দেখা দিলে সে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন ধর্মসূত্রগুলি নপুংসক স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন নপুংসক স্বামীর স্ত্রী তার অনুমতিক্রমে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভধারণ করতে পারে, এই ক্ষেত্রে উভয় পুরুষই ছেলের বৈধ পিতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

চরক সংহিতাতে ৮ প্রকার নপুংসকের কথা আছে। 'চরক সংহিতা' বৈদিক যুগের একটি চিকিৎসাশাস্ত্র যা ২০০ খ্রিঃপূঃ কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। সুশ্রুত সংহিতা ও বৈদিক সাহিত্যে একটি চিকিসাশাস্ত্র যা ৬০০ খ্রিঃপূঃ রচিত হয়েছিল। 'সুশ্রুত সংহিতা'তে পাঁচ প্রকার ক্লীবের কথা বলা হয়েছে।

'শব্দ-কল্প-দ্রুম-এ' ২০ প্রকার নপুংসকের বর্ণনা আছে। এখানে সমস্ত নপুংসক পুরুষদের কথা বলা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'নারদ স্মৃতি'তে যেসব পুরুষ বিয়ের জন্য যথাযথ নয় তাদেরকে ১৪ ভাগ করা হয়েছে। 'নারদ-স্মৃতি' একটি ধর্মশাস্ত্র যা খ্রিঃপূঃ প্রথম শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছিল। 'নারদ-স্মৃতি' চোদ্দ প্রকার নপুংসকের মধ্যে সাতটিকে দুরারোগ্য এবং বিবাহের জন্য ঘোষণা করেছে, যেমন-নিসর্গ, ভাধরি, ইর্শ্যক, সেব্যক, ভাতরেতাস, মুখেভাগ, অন্যপতি। আর বাকি সাতটিকে নিরাময়যোগ্য বলে মনে করেছে, যেমন-পক্ষ, অভিশাপদ গুরু, রোগ, দেব ক্রোধ, অক্ষিপ্ত, মোহবীজ এবং সেলিনা। যেসব মহিলারা যৌনকার্যে পারদর্শী নয় বৈদিক সাহিত্য তাদেরকে দশভাগে ভাগ করেছেন। দশপ্রকার তৃতীয় লিঙ্গ মহিলাদের বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বৈরিণী 'কামসূত্র' থেকে নেওয়া হয়েছে। কামিনী 'ভাগবত পুরাণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। স্ত্রীপুমস 'মহাভারত' এবং বিভিন্ন 'জ্যোতিষশাস্ত্র' থেকে নেওয়া হয়েছে। শাঁধি, সুচিবক্তা, বন্ধ্যা, পুত্রাঘ্নি 'সুশ্রুত সংহিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে। শাঁধি, নারীসন্ধা, বার্তা, সুচিমুখী, পুত্রাঘ্নি 'চরক সংহিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনপ্রকার শারীরিকভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম আর বাকি সাতটি সন্তান ধারণ অক্ষম।

হিন্দুধর্মে ও ভারতীয় পুরাণে অনেকসময় দেখা যায় দেব-দেবীরা লিঙ্গ পরিবর্তন করছেন, কখনও বা একজন দেবতা একজন দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্ধনারীশ্বরের আকার ধারণ করছেন। কখনও বা দেবতাদের অভিশাপের কারণে রাজারা পুরুষত্ব হারাচ্ছেন বা বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছেন। 'ভাগবত পুরাণে' দেখা যায় অসুরদের থেকে অমৃত পাত্র উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু মোহিনী অবতার গ্রহণ করেছিলেন। শিব এই মোহিনীকে দেখে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য পাথরের ওপর পড়ে সোনায় পরিণত হয়। 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' গ্রন্থে দেখা যায়, শিবের পত্নী পার্বতী তাঁর স্বামীকে মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে লজ্জায় মাথা নত করেন। কোনো কোনো উপাখ্যানে দেখা যায় শিব পুনরায় বিষ্ণুকে মোহিনী মূর্তি ধারণ করতে বললেন, যাতে তিনি প্রকৃত রূপান্তরটি স্বচক্ষে দেখতে পারেন।

কৃষ্ণ একবার অর্জুনকে পবিত্র এক সরোবরে স্নান করতে বললে অর্জুন মহিলা হয়ে যান। তাঁর নাম হয় অর্জুনী। 'পদ্মপুরাণে' আছে, অর্জুন নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর তিনি পুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে কামক্রীড়ায় মেতে ওঠেন। পুনরায় তাঁকে পুত সরোবরে স্নান করতে অনুরোধ করলে তিনি পুরুষত্ব ফিরে পান কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ভাব গোপন করতে পারেন না। কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর পৌরুষ সম্পর্কে অবহিত করেন। 'পদ্মপুরাণ' অনুসারে, কৃষ্ণের রাসনৃত্যে কেবলমাত্র নারীরই প্রবেশাধিকার ছিল। সেই রাসনৃত্যে অর্জুন অংশগ্রহণের অনুরোধ জানালে অর্জুন শারীরিকভাবেই নারীতে পরিণত হয়েছিলেন। বাউল ঐতিহ্য অনুসারে, যখন দেবী কালী কৃষ্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন ভগবান শিব রাধার রূপ ধারণ করে। এছাড়া দ্বাপর যুগে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের প্রেম লীলায় মত্ত ছিলেন, কৃষ্ণের মোহন বাঁশি শোনা মাত্র উতলা হয়ে পড়তেন, আর তৎক্ষণাৎ দৌড় দিতেন, এছাড়া রাধা রাতে-বিরেতে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির বাইরে বের হতেন, আর এই দৃশ্য আয়ানের বোন কুটিলার দৃষ্টি এড়ায়নি। একদিন রাধা আয়ানের আরাধ্য শ্যামা মায়ের পুজো করবেন বলে রাধা ছলনার আশ্রয় নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যান, বোনের কথা শুনে কুটিলা ও আয়ান নিজে রাধার কথা সত্যতা প্রমাণ করতে যান, এদিকে রাধা কুঞ্জবনে সখীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কৃষ্ণকে সাজাচ্ছিলেন তখন আয়ানের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ভীত হয়ে উঠলেন, রাধা কাতর নেত্রে কৃষ্ণের দিকে তাকাতেই তাঁর শ্যামাঙ্গ হতে সহসা বরাভয় প্রকটিত হতে লাগল। আর চক্ষুর পলকে তাঁর নিজের দ্বিভুজ দেহখানি একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে গেল। তখন তাঁর আলুলায়িত কুন্তল যেন একেবারে দল দল করে দুলতে আরম্ভ করে দিতে লাগল। তাঁর গলায় থাকা বিলম্বিত কমলা মালাখানি নৃমুণ্ড মালারূপে শোভা পেতে লাগল, বাঁশি অসি হল এবং কপালে তিলক রাগ শিশু শশীরূপে তাঁর দেহে যেন শোভা পেতে লাগল। সেই মুহূর্তে আয়ান ভয়ানক ক্রুদ্ধ অবস্থায় এসে কুঞ্জদ্বারে তাঁর আরাধ্যকে দেখতে পেলেন, তাঁর সমস্ত রাগ প্রশমিত হল। আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই প্রেমদাসের যোগিনী-বিদ্যার সাহায্যে চোখের পলকে শ্যামামূর্তি শ্যামরূপে প্রকট হতেন, কিন্তু পাশে রাধার প্রকাশ হয়নি।

কৃষ্ণের পুত্র শাম্বও রূপান্তরকামী ও সমকামোদ্দীপনার পৃষ্ঠপোষক। শাম্ব নারীর বস্ত্র পরিধান করে মানুষকে উপহাস করতেন এবং বিপথে চালনা করতেন। নারীর বেশ ধারণ করে সহজেই নারীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন এবং তাঁদের সম্ভোগ করতেন। 'মৌষল পুরাণ' গ্রন্থে দেখা যায়, শাম্ব একবার নারীর বেশ ধারণ করে কয়েকজন ঋষিকে নিজের গর্ভধারণ নিয়ে প্রশ্ন করেন। ঋষিরা তাঁকে অভিশাপ দেন যে, পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও শাম্ব লৌহ মুষল প্রসব করবে।

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রামায়ণে নপুংসকদের কথা পাওয়া যায়। রাম যখন বনবাসে যাচ্ছিলেন তখন সবাই তাঁকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। একটা জায়গায় এসে রাম পুরুষ-স্ত্রী সবাইকে ফিরে যেতে বলেছেন কিন্তু নপুংসকদের ফিরে যেতে বলেননি তাই সেই বনমধ্যে নপুংসকরা রামের জন্য চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছিলেন। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে যখন রাম অযোধ্যার ওই জায়গায় এসে উপস্থিত হয় তখন দেখলেন সব ক্লীব-নপুংসকরা দাঁড়িয়ে আছেন রামচন্দ্রের অপেক্ষায়, তাদের শরীর কৃশ, মাথার চুলে জটা, গায়ে ময়লা জমেছে, তাদের ধৈর্য ও ভালোবাসা দেখে রামচন্দ্র খুশি হলেন ও তাদের আশীর্বাদ করলেন তাঁরা মঙ্গল-কর্মের সূচক হবে। রামায়ণে একজন রূপান্তরকামী নারীর চরিত্র পাওয়া যায় যিনি ভগবানের দ্বারা নারীত্বকে প্রাপ্ত করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইল-বুধ ও পুরুরবার আখ্যান। রাজা ইল বাহলীক দেশের কর্দ্দম প্রজাপ্রতির পুত্র। রাজা ইল একসময় মৃগয়ার পশু বধ করতে করতে কার্তিকেয়ের জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই স্থানে মহাদেব এবং উমাকে ক্রীড়ারত দেখতে পান। দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য মহাদেব তখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছাক্রমে অরণ্যের সমস্ত পুরুষ জন্তু ও পুংবাচক বৃক্ষ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয় সুতরাং রাজা ইলও সেখানে গিয়ে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হলেন। দুঃখিত ইল হর-পার্বতীর কাছে তার পুরুষত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন কিন্তু মহাদেব বললেন অন্য বর চাইতে। তখন রাজা পার্বতীর কাছে গেলেন যেহেতু অর্ধেক বর মহাদেব দিয়ে দিয়েছেন তাই পার্বতীও অর্ধেক বর দিলেন। তখন ইল অনুরোধ করেন যেন তিনি একমাস পুরুষ ও একমাস নারীর রূপ ধারণ করতে পারেন। রাজা পুরুষ অবস্থায় স্বনামে আর স্ত্রী অবস্থায় ইলা নামে জীবনযাপন করতে লাগলেন। স্ত্রী অবস্থায় ইলা চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইলা-বুধের পুত্র পুরুরবার জন্ম হয়। তাকে একসময় প্রশ্ন করা হয় তিনি কাদের বেশি ভালোবাসেন। রাজা ইলের পুত্রদের না ইলারূপী স্ত্রীর পুত্রদের। উত্তরে ইল জানায় স্ত্রী অবস্থায় ইলার পুত্ররাই তাঁর কাছে অধিক আদরণীয়। কারণ তাতে আছে নারীত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণ আস্বাদ। ইল ও বুধের পুত্র পুরুরবাকে তার স্ত্রী উর্বশী নপুংসক বলেছেন। উর্বশী বলে যে তার স্বামীকে দিনের বেলায় একজন পুরুষ বলে মনে হয় এমনকি পুরুরবা দিনের বেলায় নিজেকে নায়ক বলে মনে করে কিন্তু রাতে একজন মহিলার মতো ভয়ে থাকেন। পুরুরবার এই আচরণ 'শব্দ-কল্প-দ্রুম ও নারদ স্মৃতিতে' সেলিনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে।

মহাভারতে রূপান্তরিত নারী, রূপান্তরিত পুরুষ, নপুংসক, ক্রস ড্রেসার এরকম বেশ কিছু চরিত্রের সন্ধান পাই। কেউ বা অভিশাপে কেউ বা নিজ স্বার্থপূরণের জন্য রূপান্তরিত হয়েছিলেন। রাজা ভঙ্গাসন একজন রাজা এবং তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। তিনি অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করে শত পুত্র লাভ করেছিলেন। এই যজ্ঞে তিনি কেবল অগ্নির স্তুতি করেছিলেন তাই ইন্দ্রর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। তাই ইন্দ্র রাজা ভঙ্গাসনকে বিপাকে ফেলার সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে ইন্দ্রমায়ায় বিমোহিত হয়ে পড়লেন। দিগ্‌ভ্রান্ত ও পিপাসিত ভঙ্গাসন ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পান। তিনি সরোবর থেকে স্নান করে ওঠার পর নিজের শরীরের পরিবর্তন দেখতে পেলেন, রাজার শরীরে সমস্ত পুরুষ চিহ্ন মুছে গিয়ে পরিণত হয়েছেন নারীতে। নিজের রূপান্তর ও স্ত্রীরূপ নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। তিনি এরপর তাঁর রাজ্য পুত্রদের কাছে সমর্পণ করে বনে চলে এলেন। স্ত্রীরূপ ভঙ্গাসনের নতুন আশ্রয় হল এক ঋষির আশ্রমে, তিনি আশ্রমে ঋষিপত্নী হয়ে থাকলেন এবং তিনি একশত পুত্রের জননী হলেন। কিন্তু তিনি তখনও পূর্বজীবনের কথা ও সন্তানদের কথা ভুলতে পারেননি। তিনি তাঁর বর্তমান পুত্রদের বললেন তাদের ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ করতে কিন্তু সেখানেই তৈরি হল সমস্যা। ইন্দ্রের মায়াজালে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল ও তারা যুদ্ধে পরস্পরকে বিনষ্ট করল। পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে যখন তিনি ভেঙে পড়েছেন তখন ইন্দ্র তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র রাজাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কোন পুত্রদের পুনর্জীবন চান, তিনি তাঁর স্ত্রী অবস্থার পুত্রদের পুনর্জীবন চেয়েছিলেন কারণ হিসেবে বলেছিলেন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহই অধিক। ইন্দ্র তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সকল পুত্রদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর ইন্দ্র রাজার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভঙ্গাসন স্ত্রী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন কারণ হিসেবে বলেছিলেন পুরুষ-স্ত্রীর সংযোগকালে স্ত্রীরই অধিক সুখ হয়, তিনি স্ত্রীভাবেই তুষ্ট আছেন।

মহাভারতে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের গুরু ছিলেন প্রখ্যাত ঋষি গার্গ্য। এই গার্গ্য প্রবল সংযম ও তপস্যার কারণে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। গার্গ্য ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করলেও তিনি বিয়ে করেছিলেন, তবে তিনি সহবাসে অক্ষম ছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একদিন গার্গ্যের শ্যালক তাঁর পুরুষত্ব পরীক্ষা করে নপুংসক বলে অপবাদ দেয়। আসলে ঋষি গার্গ্য নপুংসক ছিলেন না, কঠোর সংযম পালনের জন্য সাময়িকভাবে তাঁর সমস্ত জৈবিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে মহর্ষি এক ঘোর তপস্যায় লিপ্ত হন এবং মহাদেবের বলে মহা তেজস্বী পুত্র লাভ করেন।

মহাভারতের আর এক চরিত্র যিনি নারী থেকে পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ভীষ্মবধের জন্য দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাদেব তাঁকে বরদান করেছিলেন যে তিনি পরজন্মে কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করবেন কিন্তু পরে তিনি পুরুষত্ব প্রাপ্ত হবেন। সেই কথামতো অম্বার পুনর্জন্ম হয়েছিল দ্রুপদের ঘরে কন্যারূপে। মহাদেব দ্রুপদকেও একই বরদান দিয়েছিলেন তাই দ্রুপদ এই মহাদেবের বরের কথা জানতেন তাই কন্যাকে তিনি পুরুষ রূপে লালন-পালন করেছিলেন। পোশাক-আশাক, আচার-আচরণে শিখণ্ডী একেবারে পুরুষের মতো। দ্রুপদ তাঁর পরিচয় লুকিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শেখান। দ্রুপদ ও পার্ষতী চেয়েছিলেন তাঁদের কন্যা খুব তাড়াতাড়ি পুত্রতে রূপান্তরিত হোক। এরপর হিরণ্যবর্মার কন্যার সাথে শিখণ্ডীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বাভাবিকভাবে শিখণ্ডীর স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যায় শিখণ্ডীর নারীত্বের কথা। এই সংবাদ হিরণ্যবর্মার কাছে পৌঁছালে ক্রুদ্ধ হিরণ্যবর্মা প্রতিশোধস্পৃহায় পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণের আয়োজন করছিলেন। অন্যদিকে শোকে, লজ্জায় সকলের অজান্তে শিখণ্ডী গৃহত্যাগ করলেন। প্রাণত্যাগই অবশিষ্ট পথ ভেবে যখন তিনি নির্জন অরণ্যে বসবাস করেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে যক্ষের সঙ্গে দেখা হল, তিনি শিখণ্ডীর কাছে তাঁর দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন, শিখণ্ডী সব বললেন এছাড়া তিনি যক্ষের কাছে প্রার্থনা করলেন পাঞ্চালরাজের আক্রমণের আগে যেন তিনি পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। যক্ষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে শিখণ্ডীর সঙ্গে তাঁর দেহাংশের বিনিময় করলেন। শিখণ্ডীও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে মুহূর্তে হিরণ্যবর্মা তাঁকে পুরুষ বলে জানবেন সে মুহূর্তে তিনি নারীত্বকে পুনরায় গ্রহণ করবেন। তিনি ফিরে এসে তাঁর পুরুষত্বের কথা জানালেন এবং হিরণ্যবর্মার পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। মহাদেবের বর এবারে সত্যি হল। কুবেরের অভিশাপে যক্ষের নারীত্ব স্থায়ী হল আর শিখণ্ডীর পুরুষত্ব স্থায়ী হল। শিখণ্ডী নপুংসক বা ক্লীব নয়, তিনি প্রথম পর্যায়ে পুরোপুরি নারী, জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি পুরোপুরি পুরুষ।

মহাভারতের আর এক চরিত্র অর্জুন যিনি অভিশাপের কারণে বৃহন্নলা হয়েছিলেন। অর্জুন বনবাসে থাকাকালীন উর্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় উর্বশী তাঁর নপুংসক হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারপর পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন তাঁদের বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল যাতে সহজে কেউ ধরতে না পারেন। অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশ ধরেছিলেন। অর্জুন ছদ্মবেশ ধারণ করে বিরাট রাজার কাছে আশ্রয়ের জন্য গিয়েছিলেন। বিরাট রাজার দরবারে অনেক শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলেছিল ফলে ধরে নেওয়াই যায় উর্বশীর অভিশাপ কার্যকরী হয়েছিল, নয়তো পরীক্ষার সময়ে ধরা পড়ে যেতেন। তিনি সম্পূর্ণ নারীবেশ ধারণ করেছিলেন, তিনি হাতে চুড়ি, কানে দুল, মাথায় বেণী করতেন। তিনি রাজ অভ্যন্তরে নারীদের নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্র শেখাতেন। একবছর পরে তাঁর বৃহন্নলা দশা কেটেছিল, অর্জুনের বৃহন্নলা ছিল সাময়িক।

গুপ্ত ও কুষাণ যুগে বেশকিছু মূর্তি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্তির ডানদিকে অর্ধমহাদেব, বামদিকে অর্ধপার্বতী। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর এবং কিছু প্রাচীন মন্দিরগাত্রের উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি চোল যুগের (নবম-দশম শতাব্দীর) বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। বিভিন্ন পুরাণ এবং লোকগাথায় অর্ধনারীশ্বর নিয়ে রয়েছে নানা মতভেদ। তবুও তার মধ্যে লিঙ্গ পুরাণে বলা হয়েছে, সৃষ্টির শুরুতেই প্রস্ফুটিত হয় একটি পদ্ম। তার উপর ধ্যানমগ্ন হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। ধ্যান ভাঙলে খেয়াল করেন তিনি সম্পূর্ণ একা। তিনি ভাবতে শুরু করলেন কী করলে তাঁর নিঃসঙ্গতার অবসান হবে, তখন তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকে মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর রূপ। তখন তিনি নিজেকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেললেন- ডান দিকের অংশ থেকে জন্ম নিল পুরুষ লিঙ্গের সব প্রাণী এবং বাঁদিক থেকে জন্ম নিল সব প্রাণীর নারী লিঙ্গ। নাথ লোকগাথায় অর্ধনারীশ্বরের অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে। কিছু সাধু শিবের সাক্ষাৎ প্রার্থনায় কৈলাসে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা দেখলেন তিনি অর্ধাঙ্গিনির সঙ্গে সঙ্গমরত। তাঁরা যে সেখানে উপস্থিত সেই জ্ঞান শিবের ছিল না। মহাদেবকে এই অবস্থায় দেখে প্রথমে বিস্মিত হলেও পরে তাঁরা বোঝেন যে তাঁকে এই অবস্থা থেকে বিরত করা মানে

শরীরের ডানদিক থেকে বাঁ-দিককে আলাদা করে দেওয়া। সেই থেকে তাঁরা শিবকে অর্ধনারীশ্বর রূপে পুজো করতে থাকলেন।

উত্তর-ভারতের লোকগাথা অনুযায়ী, শিবের জটায় গঙ্গাকে অবস্থান করতে দেখে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন পার্বতী। তাঁকে শান্ত করার জন্য পার্বতীর শরীরের সঙ্গে মিলিত হন মহেশ্বর। একাংশে থাকে শিবের উপস্থিতি, অন্য অংশে বিরাজ করেন নারী শক্তি পার্বতী। এদিকে উপনিষদ বলেছে, সৃষ্টিকর্তার মনে শান্তি ছিল না। সেই পুরুষ ভীষণ একা বোধ করছিলেন। কোন সুখ, আনন্দ ছিল না তাঁর। আনন্দের জন্য শেষমেশ দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন নিজেকে নারী-পুরুষ অর্থাৎ জায়া-পতি। 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' বলা হয়েছে অর্ধনারীশ্বরের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার রোষ থেকে। আগুনপানা তাঁর চেহারা। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই মিথুনীকৃত মূর্তিকে ব্রহ্মা আদেশ দিলেন নিজেকে বিভক্ত করতে। বলা মাত্রই সেই মিথুন দেবতা বিভক্ত করলেন নিজেকে। সৃষ্টি হল পৃথক স্ত্রী, পৃথক পুরুষ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ঋষির কল্পনা এখান থেকে দুই হচ্ছে আবার এক হবার টানে দুই থেকে এক হচ্ছে।

অর্ধনারীশ্বর নিয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেটি হল - একবার দেবতা ও ঋষিগণ কৈলাসে হর-পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। ঋষি ভৃঙ্গী শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত হওয়ার কারণে তিনি পার্বতীকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শিবকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। ঋষি ভৃঙ্গীর এই উপেক্ষার কারণে পার্বতী অপমানিত বোধ করেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃঙ্গীকে নিছক চর্ম-আবৃত কঙ্কালে পরিণত করেন, ফলে ভৃঙ্গী দু-পায়ে দাঁড়াতেও অক্ষম হয়ে পড়েন। ভক্তের এমন অবস্থা দেখে শিবের মায়া হয়, তাই তিনি ভৃঙ্গীকে তৃতীয় পদ দান করেন। কিন্তু পার্বতীর সম্মান রক্ষার্থে স্বয়ং পার্বতীর সঙ্গে একদেহ হয়ে তিনি অর্ধনারীশ্বর-রূপে অবস্থান করেন, যাতে ভৃঙ্গী পার্বতীকেও প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হন। 'কালিকা পুরাণ'-এও অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে দেখা যায় গৌরী মহাদেবের বুকে নারীর ছায়া দেখলে তিনি ব্যাকুলা হন, তাঁর মনে হল অন্য কোনো রমণী বুঝি মহাদেবের হৃদয় জুড়ে আছেন। মহাদেব তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এই ছায়া অন্য নারীর নয়, এই ছায়া গৌরীর। কিন্তু গৌরীর চিন্তা গেল না যদি অন্য কোনো নারী শিবের হৃদয় জুড়ে বসে! তাই গৌরী বললেন, তিনি শিবের সমস্ত অঙ্গের স্পর্শ চান যাতে তিনি শিবের সঙ্গে নিত্য আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে পারেন। মুহূর্তে ঈশ্বর-ঈশ্বরী পরস্পরের অর্ধেক শরীর হরণ করলেন। ধরা দিলেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ'-এর সূচনায় লিখেছিলেন, শব্দ ও অর্থকে যেমন পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনি জগতের জননী এবং জনক-পার্বতী ও মহেশ্বরও সতত পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। 'বায়ুপুরাণ' ও 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'-এ দেবাদিদেবের অর্ধাঙ্গে নর রূপে আবির্ভাব প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। 'পদ্মপুরাণ'-এর সৃষ্টিখণ্ডে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার যজ্ঞ-সমাপ্তির পর শিব ও পার্বতী ব্রহ্মা পত্নী সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করতে গেলে সাবিত্রী শিব ও পার্বতীকে একদেহ হওয়ার বরদান করছিলেন।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাৎসায়ন 'কামসূত্র' রচনা করেছেন বলে ধরা হয়। 'কামসূত্র'-এর ষষ্ঠমধিকরনের নবম অধ্যায়ে ঔপরিকষ্টকম্ অধ্যায়ে নপুংসকদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে ১ ও ২ নং শ্লোকে -

> "দ্বিবিধা তৃতীয়া প্রকৃতিঃ স্ত্রীরূপিনী পুরুষরূপিনী চ।"[২]

তৃতীয় প্রকৃতি বা নপুংসক (বা হিজড়া) দুই রকমের স্ত্রীরূপিনী ও পুরুষরূপিনী। যে নপুংসকের কিছু পরিমাণ স্তন প্রভৃতির উদ্‌গম হয়, সে স্ত্রীরূপিনী এবং যাদের গোঁফ-দাঁড়ি গজায় সেইসব নপুংসক পুরুষরূপিনী। এই দুই প্রকার ক্লীবকে অবলম্বন করেই ঔপরিষ্টক প্রকরণের অবতারণা। এইসব নপুংসকরা বাৎসায়নের সময় জীবিকা লাভের জন্য যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করত। বাৎসায়নই কামসূত্রের একজায়গায় উল্লেখ করেছেন -

> "পতিসুখে সুখি না কোনো নারীকে বিচ্ছিন্ন করার উপায়ের নাম একেন্দ্রী পালিতকরণ, যার অর্থ হল কোনো নারীর পতির একটি ইন্দ্রিয়কে বিকল করে দেওয়া। হয় অন্ধ নতুবা তাকে ক্লীবে পরিণত করা।"[৩]

বাৎসায়ন 'কামসূত্র'-এ চার প্রকার নায়িকার কথা বললেও একপ্রকার পঞ্চমী নায়িকার কথা বলেছেন আর এই পঞ্চমী নায়িকাদের কোনো লিঙ্গ না থাকায় এদের তৃতীয় প্রকৃতির নারী বলা হত। এই তৃতীয় প্রকৃতির নারীরা পুরুষের

বিকৃত যৌনতার শিকার হত। বাৎসায়ন 'কামসূত্রে' ঔপরিষ্টক অধ্যায়ে এক থেকে কুড়ি নং শ্লোক অবধি নপুংসকদের রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

'মনুসংহিতার' তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে বলা হয়েছে -

> "পুমান্ পুংসোহধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।
> সমেহপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেহল্পে চ বিপর্যয়ঃ।।"[৪]

টীকা- স্ত্রীপুংসয়োস্ত বীজসাম্যেহপুমান্ নপুংসক জায়তে। এই শ্লোক অনুসারে বলা হয়, যদি উভয়ের বীর্য (শুক্র ও শোণিত) সমান সমান হয় তাহলে অপুমান্ (নপুংসক) জন্মায় অথবা যমজ পুত্র-কন্যা জন্মায়। কিন্তু উভয়েরই বীর্য যদি ক্ষীণ অর্থাৎ অসার বা অল্প হয়, তাহলে বৃথা হয়ে যায়, গর্ভ উৎপন্ন হয় না। 'মনুসংহিতা'-র নবম অধ্যায়ের ২০১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, বর্ণের অনুচ্চারক মূক এবং এই রকম কানা প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি এরা কেউই পিতার ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে না। আবার ২০২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে তাদের সম্পত্তি যারা লাভ করবে, তারা সুবিবেচনা পূর্বক যথাশক্তি ওইসব ক্লীবকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে তা না করলে তারা পতিত হবে। আবার ২০৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে-

> "ক্লীব প্রকৃতিরা যদি কোনও ক্রমে স্ত্রী অভিলাষী হয়, এবং তাদের যে সন্তান হবে (ক্লীবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সন্তানকে বুঝতে হবে), তারা যদি ক্লীবত্বাদি দোষশূন্য হয়, তবে তারাও ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে।"[৫]

মৌর্যযুগে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ বলা হয়েছিল, কোনো নারীর পতি যদি ক্লীব হয় তবে তাকে পরিত্যাগ করে সেই নারীর বিবাহ করার কথা ছিল। তবে মৌর্যযুগে এদের অবস্থা একটু ভালো ছিল। কৌটিল্য একজায়গায় বলেছেন-

> "কেউ যদি অকারণে কোনো ক্লীব বা নপুংসক অথবা পাগলকে প্রকাশ্যে অপমান করে তবে তাকে দণ্ড স্বরূপ বারো পণ জরিমানা দিতে হবে।"[৬]

'অর্থশাস্ত্র' তৃতীয় লিঙ্গের পুরুষ ও মহিলাদের অপমান করাকে অপরাধ বলে মনে করে। যদি দোষী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্বহীন হয়, বারোটি রূপার পানা জরিমানা আরোপ করা হয়, পুরুষত্বহীন না হলে জরিমানা চব্বিশ পানা। তৃতীয় লিঙ্গের কাউকে জনসমক্ষে কেউ ঠাট্টা করার জন্য জরিমানা করা হয় ছত্রিশ পানা। 'অর্থশাস্ত্র' একজন ব্যক্তি তৃতীয় লিঙ্গ কিনা তা প্রমাণ করার জন্য তিনটি প্রমাণের কথা বলেছেন-

১। নারীদের দ্বারা পরীক্ষা করা,
২। প্রস্রাবে ফেনা,
৩। জলে মল ডুবে যাওয়া।

মৌর্যযুগে হারেমের রক্ষণাবেক্ষণে খোজা ও গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত নপুংসক। তাদের একমাত্র পরিচয় দাস হিসেবে। 'মনুসংহিতার' মতো 'অর্থশাস্ত্র' আদেশ দেয় যে তৃতীয় লিঙ্গের একজন পুরুষত্বহীন পুরুষের পারিবারিক উত্তরাধিকারের কোনো অংশ পাওয়া উচিত নয়। যদি সে কোনোভাবে পুরুষত্বহীন নয় এমন বংশধরকে পরিচালনা করে তবে সেই বংশধর একটি ভাগ পেতে পারে। পরিবারকে অবশ্যই তাদের তৃতীয় লিঙ্গের আত্মীয়দের খাদ্য ও বস্ত্র দিতে হবে।

চৈতন্য অনুগামী একটা সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদেরকে 'গদাধর' ভাবে। সেজে-গুজে থাকে, প্রায় নারী স্বভাবের তারা চৈতন্যের সেবা করে। বৈষ্ণবদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রেমের তিনটি স্বরূপ আস্বাদন করার জন্য। রাধার প্রেমমহিমা কেমন, শ্রীরাধার কেমন অনুভব প্রেম নিবেদনে; দ্বিতীয়ত, রাধার কেমন অনুভব কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে; তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণের কেমন অনুভব শ্রীরাধার নিবেদিত প্রেমমাধুর্যে। চৈতন্যকে অনেকে তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য বলে মনে করেন কারণ চৈতন্য পুরুষ হয়ে মনে রাধার ভাব রেখে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি বিভোর ছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের বেশ কিছুকাল পর নতুন একটি ধারার উদ্ভব হল — সখীভাবে সাধনা করা, রাধা-ভাব নয়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সখী-ভাব। শ্রীরাধার যারা সখী ছিল, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রমুখ-এরা রাধা-কৃষ্ণের সেবা করত, এই সখীসাধনাকে বলা হয় 'মঞ্জরী সাধনা'। 'মঞ্জরী সাধনা' যারা করে তারা নিজেদেরকে শুধু সখী ভাবে না। সখীদের সখী ভাবে। একদম সামান্য নারী ভাবে। বড় কঠিন সাধনা। শুধু মনে নয়, চলাফেরায়, কথাবার্তায় একেবারে মেয়েদের মতো লজ্জাশীলা হতে হবে। নীচুস্বরে কথা বলা, আস্তে হাঁটা, ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের বেশ কিছু মন্দিরে পুজোর সময়ে পুরোহিত মেয়েদের সাজ সাজে অনেকসময় পুরুষরা মেয়েদের মতো সাজে পুজোর দিনগুলিতে। কেরালার কোট্টানকুলাঙ্গার মন্দিরে চৈত্র মাসে শ্রী ভগবতী দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসে দুই রাতের জন্য, হাজার হাজার পুরুষ নারীর সাজ সাজে এবং শ্রী ভগবতী দেবীর কাছে নিজেকে নিবেদন করে। ক্রসড্রেসারদের এই মন্দিরের উৎসবকে ঘিরে একটি গল্প রয়েছে। অনেক আগে একদল গরু-পালকরা মেয়েদের পোশাক পরে একটি পাথরের পুজো করেছিল। কিছুকাল পরে দেবী ভগবতী ব্যক্তিগতভাবে তাদের পূজা গ্রহণ করে পাথর হয়ে তাদের সামনে হাজির হন। কোট্টানকুলাঙ্গার মন্দিরটি তখন পাথরের দেবতাকে রাখার জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং বার্ষিক উৎসবের সাথে আনুষ্ঠানিক পুজো শুরু হয়েছিল। মীন সংক্রান্তির দশম এবং একাদশ দিনে সূর্য যখন মীন রাশিতে প্রবেশ করে তখন দুটি উৎসবের রাত অনুষ্ঠিত হয়। তখন পুরুষরা মেকআপ, পোশাক, পরচুলা এবং গয়না পরে। এছাড়া কর্ণাটকের উদিপির মন্দিরে কৃষ্ণ দেবতাকে শাড়ি, গয়না ইত্যাদি দিয়ে সুন্দরী যুবতীর সাজে সাজানো হয় এবং তামিলনাড়ুতে কাবেরী নদীর তীরে তিরুভানাইকোভিল শিব মন্দিরে একজন পুরোহিত শাড়ি ও পরচুলা পরেন। দুর্গা পুজোর সময় নবরাত্রির দিনে পুরুষেরা নারীদের মতো সাজে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে উৎসবের জন্য অনুদান চায়।

পুজো উপলক্ষে পুরুষদের শাড়ি পরে মহিলা সাজার রীতি হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলা বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোতেও রয়েছে।

> "প্রায় ২৩০ বছর ধরে চলে আসছে এই নিয়ম। এই রীতির পেছনেও কারণ রয়েছে। শোনা যায় ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি এলাকায় সেইসময় ইংরেজদের ছাউনি ছিল, তাই মহিলারা বাড়ির ভেতরেই থাকতেন। তখন থেকেই জগদ্ধাত্রী পুজোর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান সামালাচ্ছেন পুরুষেরা। তাঁরা শাড়ি, সিঁদুর পরে বাড়ির মহিলাদের মতো দেবীর বরণ করেন।"[৭]

শ্রী ইরাবান তামিলনাড়ুতে আরাবান নামে পরিচিত, তিনি অর্জুন এবং সর্প রাজকুমারী উলূপির পুত্র। মহাভারতের তামিল সংস্করণে দেখা যায় যে, আরাবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় একজন বীর ছিলেন এবং দুর্যোধনের অনেক সৈন্যকে হত্যা করে কৃষ্ণ ও তার পিতা অর্জুনের সেবা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় আরাবান পাণ্ডবদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য কালীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি মৃত্যুর আগে তিনটি আশীর্বাদ চান, যার মধ্যে একটি হল বিয়ে করা। যেহেতু কোনো বাবা-মা তাদের কন্যাকে জেনে-শুনে এরকম পাত্রের হাতে তুলে দেবে না, যার মৃত্যু পরের দিন হবে, তাই যেহেতু কেউ আরাবানকে কন্যা দিতে চাইলেন না, তাই কৃষ্ণ তাঁর মোহিনী রূপ ধারণ করে আরাবানকে বিয়ে করেন এক রাতের জন্য, পরের দিন আরাবানের বলি হয়, সেই তামিলনাড়ুর কুভাগামের মন্দিরে হিজড়েরা আরাবানের পুজো করে। কুভাগামের মন্দিরে ওরা জড়ো হয়। মন্দিরে বড় গোঁফওলা পুরুষমূর্তি। হিজড়েরা সঙ্গে নিয়ে আসে একজন করে পুরুষসঙ্গী। আরাবানের সঙ্গে বিয়ে হয়, পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়ে মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেয় হিজড়েদের গলায়। নাগারা বাজে, খোল-মৃদঙ্গ। আরাবানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর হিজড়েরা পুরুষসঙ্গীকে আরাবান ভেবে নিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করে। পরদিন আরাবানের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। আরাবানকে একটা রথে বসানো হয়। সেই রথ এক জায়গায় এসে থামে। সেটা 'বলি স্থান'। মূর্তির মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয় ওর ধড় থেকে। সেইসময় তুমুল ক্রন্দন করে সমবেত হিজড়ে সকল। কাঁদন পরব। এখানে-ওখানে জ্বলতে থাকে কর্পূরের মতো আগুন। হিজড়েরা মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলে। চিৎকার করে কাঁদে। সিঁদুর মুছে ফেলে।

লোকদেবতা আরাবান (বাঁ দিকে) আর রূপান্তরকামী স্ত্রী আরাবীরা (ডানদিকে) তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করছে।

(১)

(২)

আফ্রিকার কোনও কোনও উপজাতি এখনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নারী সেজে নাচে, লিঙ্গস্থানে কাপড় বাঁধে। যেন ঋতু। প্রাচীন মিশরের সূর্যদেবতা নিজের লিঙ্গদণ্ড কেটে ফেলেছিলেন একবার। কর্তিত লিঙ্গরক্ত থেকে জন্ম নিয়েছিল নতুন মানুষরা, একটা নতুন জাতি। হাওয়াই এর আদিবাসী মাউ-দের পুরুষ ও মহিলার মাঝামাঝি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এমনকি তারা উভয়লিঙ্গ হিসাবে পরিচিত। দক্ষিণ পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহ্যবাহী Dineh চার লিঙ্গের মানুষকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করা হয়, যেমন - স্ত্রী লিঙ্গ নারী, পুংলিঙ্গ নারী, স্ত্রী লিঙ্গ পুরুষ, পুংলিঙ্গ পুরুষ।

আমাদের রাজ্যের মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু ঠাকুরের পুজো করে। ইতু পুজোর নিয়ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত পুজোর নিয়ম। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার পুজো করে সংক্রান্তির দিন পুজো সম্পাদন করতে হয় অর্থাৎ ইতুকে বিসর্জন দিতে হয়। এই কারণে অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে ইতুর পুজো হয়। প্রাচীন পারস্যদেশে একসময় মিথু পুজো হত। মিথু>মিতু>ইতু। প্রাচীনকালে কুমারী মেয়ের পতিলাভ আর সাংসারিক কল্যাণ কামনায় সূর্যের পুজো মহিলামহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মহাভারতে কুন্তী পুত্র কর্ণ ছিলেন সূর্যের সন্তান। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন সূর্যের অপর নাম আদিত্য। এই আদিত্য থেকে ইতু শব্দটি এসেছে এবং শাক্তধর্মের প্রভাবে ইতু ক্রমশ দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সূর্যদেবতা থেকে ইতু শস্যদেবী লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, এইকারণে তিনি ইতুলক্ষ্মী নামে রাঢ়বাংলায় পূজিত।

জিনগত কিছু সমস্যার কারণে মানুষের রূপান্তর হয়। এমন এক রহস্যময় গ্রাম আছে যেখানে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা হয়ে যায় ছেলে। e Kolkata24x7 news এ ৯ নভেম্বর ২০২১ এ প্রকাশিত হয় এমন এক সংবাদ—

> "রহস্যময় গ্রাম : বয়স ১২ হলেই এখানকার মেয়েরা হয়ে যায় ছেলে, মেয়ে হয়ে জন্মালেও কৈশোর ছোঁয়ার ঠিক মুখে, ১২ বছর বয়সে তারা পুরুষ হয়ে যায়।"[৮]

লাতিন আমেরিকার ডমিনিক্যান রিপাব্লিকের সালিনাস নামের গ্রামে এমনটাই হয়ে আসছে বহু যুগ ধরে। সে গ্রামের শিশুকন্যারা সকলেই বড় হয়ে ১২-১৩ বছরে পৌঁছলেই পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কোনো রূপক অর্থে নয়, একেবারে শারীরিকভাবে অর্থাৎ বায়োলজিক্যালি তারা পাল্টে যায় পুরুষে। দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার পরে জানা গিয়েছে, এটা আসলে এক ধরনের শারীরিক ত্রুটির ফলাফল। বাচ্চারা যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখনই এই ত্রুটির প্রভাব পড়তে শুরু করে তাদের শরীরে। গর্ভাবস্থায় একটি বিশেষ এনজাইমের অভাবেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। গবেষক ও চিকিৎসকরা বলেছেন, সাধারণত গর্ভাবস্থায় অষ্টম সপ্তাহ নাগাদ শিশুর শরীরের যৌনাঙ্গে পরিস্ফুট হতে শুরু করে। ডিহাইড্রো টেস্টোস্টেরন নামের একটি হরমোনের প্রভাবে গর্ভস্থ শিশুদের পুং জননাঙ্গ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই হরমোনকে আবার সক্রিয় করে তোলে একটি বিশেষ ধরনের এনজাইম। কিন্তু সালিনাস গ্রামের মায়েদের গর্ভকালীন পুষ্টির অভাবের কারণেই এই এনজাইম তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষরণ হতে পারে না ফলে যারা আদতে পুরুষ শিশু, জন্মের সময় তাদের পুরুষাঙ্গ ঠিকমতো গঠিতই হয় না। সেই শিশুর জন্মকালে তার যৌনাঙ্গ এতই অস্পষ্ট থাকে যে, বাবা-মায়েরা বুঝতেই পারে না

তাদের বাচ্চাটি আসলে ছেলে, মেয়ের মতো করেই বাবা-মা মানুষ করতে থাকেন, কিন্তু ১২ বছর বয়সে যখন পুরুষ শরীরে দ্বিতীয় বারের জন্য টেস্টোস্টেরনের জোয়ার আসে প্রকৃতির নিয়ম মেনেই তখন তাদের শরীরে ফুটে উঠতে থাকে পুরুষালি লক্ষণ এবং তখন বোঝা যায় বাচ্চাটি আসলে পুরুষ। নিউইয়র্কের জিনগত রোগের গবেষক গ্যারি ফ্রু জানান, বংশগতির একটি দুর্লভ জিনের কারণে মানুষ ‘গুয়েভেডোকেস’ নামের এই জিনগত অসুখে আক্রান্ত হয়। এই অসুখে আক্রান্তরা পুরুষেরা পুরুষের অন্তর্গত সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় কিন্তু জননাঙ্গের আকৃতিগত কারণে তা প্রকাশ পায় না তাই শিশুটি ছেলে নাকি মেয়ে তা জানতে অপেক্ষা করতে হয় বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত।

Reference:

১. Amara Das Wilhelm, TRITIYA-PRAKRITI: PEOPLE OF THE THIRD SEX, Xlibris Corporation Philadelphia, PA; 2013, p. 99
২. মহর্ষি বাৎস্যায়ন, সম্পাদনা অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কামসূত্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৪০৩
৩. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন, প্রতিভাস প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৩
৪. মহর্ষি মনু, সম্পাদনা ও অনুবাদ-অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪৮৭, পৃ. ৩৬৭
৫. মহর্ষি মনু, সম্পাদনা ও অনুবাদ-অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মনুসং হিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪৮৭, পৃ. ৯৬৮
৬. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন, প্রতিভাস প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৪।
৭. সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মাথায় ঘোমটা, কপালে রাঙা সিঁদুরে, পুরুষদের হাতেই জগদ্ধাত্রী বরণ এই পুজোয়, ABP ANANDA, November 3, 2022
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0c9UssfoaGimcWpPgujpHRWJZ5g8DHPSESQdMFRMUKf7qi6PN6N72Ff2qS2gPu6sTl&id=100030508791488. Dated 4 November 2022
৮. e কলকাতা 24, হোম পেজ, ‘রহস্যময় গ্রাম : বয়স হলেই এখানকার মেয়েরা হয়ে যায় ছেলে’, e kolkata24.com, November 9, 2021
https://ekolkata24.com/offbeat-news/mysterious-village-where-girls-turn-into-boys/. Dated 19 November 2022

Bibliography:

মহর্ষি মনু, সম্পাদনা ও অনুবাদ-অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯
মহর্ষি বাৎস্যায়ন, সম্পাদনা অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কামসূত্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯
Amara Das Wilhelm, TRITIYA-PRAKRITI: PEOPLE OF THE THIRD SEX, Xlibris Corporation Philadelphia, PA; 2013
মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন, প্রতিভাস প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
অভিজিৎ রায়, সমকামিতা, শুদ্ধস্বর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০
Saiful Islam Sohel, ‘যে প্রাণীগুলো লিঙ্গ পরিবর্তনে সক্ষম’, roar.media, 23 May, 2018.
https://roar.media/bangla/main/plants-animals/some-animal-capable-of-sex-change. Dated 18 November 2022

Astro World. জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গম : অর্ধনারীশ্বর অথবা তৃতীয় প্রকৃতি, m.facebook.com, 31 January, 2020. https://m.facebook.com/112722536823190/photos/a.112724426823001/162598575168919/?type=3, Dated 18 November 2022
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২৬

ছবিঋণ :

হিন্দু পুরাণে এলজিবিটি বিষয়বস্তু, bn.m.wikipedia.org;
https://bn.m.wikipedia.org/হিন্দু_পুরাণে_এলজিবিটি_বিষয়বস্তু. Dated 18 November 2022
হিন্দু পুরাণে এলজিবিটি বিষয়বস্তু, bn.m.wikipedia.org;
https://bn.m.wikipedia.org/হিন্দু_পুরাণে_এলজিবিটি_বিষয়বস্তু. Dated 18 November 2022

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 738 - 745
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র সৃষ্টিতে ইসলাম

শাহনাজ বেগম
গবেষক
সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID : shahnajbegam510@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
self-criticism, imperfection, confession, complint, islam, rabindra sristi, sufi and vedic.

Abstract

"I am the poet of the world, where as his voice
rises, he will wake up in response to the melody
of my flute – this voice did not reach many calls,
there is a gap."

Rabindranath Tagore's 'Janmdin' poetry book number 10 poem 'Eiktan'. Published in 1941, just four months before his death. The self-criticism and the confession of imperfection of the poet Ashitipar in this poem reminds us of a complaint against Rabindranath – we will try to find the answer in the main article. Also, I will find out where the precious jewel of Islam is hidden in Rabindra's creation.

Discussion

আমাদের স্মৃতি (memory) কোথায় জমা থাকে? মস্তিষ্কের কোনো ছোট্ট কুঠুরিতে (hippocampus)। সেই স্মৃতিরা চেতন স্তরে স্থান পায় (conscious) কিছু আর কিছু স্থান পায় আমাদের অজান্তেই অবচেতনের স্তরে (sub-conscious)। যাত্রা জীবনে অভিজ্ঞতা দান করে— যা নিজস্ব একান্ত ব্যক্তিগত। তারপর তা অন্তরে চিন্তার জগৎকে নাড়া দেয়। যে অবচেতনায় বোধ জন্ম হয় তাই পরবর্তীতে চর্চার জগৎ হয়ে ওঠে। কখনো কখনো তা কয়েক'শ বছর পরও প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়ে যায়। তাই তো রবীন্দ্র চিন্তার চর্চা এখনো চলছে।

Genius ব্যক্তিকে উপলব্ধি (Decode) করতে আমাদের মতো কম বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের এতোদিন সময় লেগেই যাই। তাই তো তাঁরা উদ্বেগ দেখান না নিজের আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁরা কেবল উদ্বেগ দেখান 'চিরসত্য' সমাজের সামনে তুলে ধরতে। তাঁরা কেবল দানই করে যান মহাদানী রূপে, আমরা অবোধ তাই উপলব্ধি করতে পারি না যা তিনি দিয়ে গেলেন তা খুদ নই স্বর্ণ।

আমাদের জীবন গড়ার জন্য আমাদের ছেলেবেলার যে কত গুরুত্ব রয়েছে তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একজনের personality development এ তার childhood experiences, trouma এগুলো impact তৈরি করে – যা personality theory তে আজ প্রমাণিত। শৈশবের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন যে ব্যক্তিত্বের তারতম্য কেবল শৈশবের মেজাজ থেকেই নয়, বরং নির্দিষ্ট

অভিভাবকত্বের শৈলীর সংস্পর্শের সাথেও সম্পর্কিত। শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। আমরা যদি প্রশ্ন করি, -

> "Who was the first person to say that childhood experiences affect the adult personality?
> তবে উত্তর পাব, Originating in the work of Sigmund Freud, the psychodynamic perspective emphasizes unconscious psychological processes (for example, wishes and fears of which we're not fully aware), and contends that childhood experiences are crucial in shaping adult personality."[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় একাধারে সৃষ্টি করে গেছেন অপরদিকে তা বোঝানোর দায় পর্যন্ত নিজেই গ্রহণ করেছেন, - 'ছেলেবেলা' (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) ও 'জীবনস্মৃতি' (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবনস্মৃতি লেখার পরও লেখকের মনে হচ্ছে নিজেকে নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়নি, যা তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে গড়ে তুলতে সর্বোপরি ব্যক্তিত্ব তৈরিতে সাহায্য করেছে। সঙ্গে সাহিত্য চর্চার প্রেক্ষাপট জানিয়ে দিচ্ছেন। কখনো চিঠির – 'ছিন্নপত্রাবলী' মধ্যে ধরা থাকছে সেই সৃষ্টির ইতিহাস। বিশেষ করে তাঁর রূপকাশ্রয়ী নাটক রূপে প্রচারিত এবং বিদেশি প্রভাবিত বলে মনে করা নাটক যেমন - 'ডাকঘর' (১৯১২খ্রি.), 'রক্তকরবী' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) গুলোর জন্য Foot Notes দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই ফুট নোটগুলোতে প্রকাশকগণ নিজের কাঁচি চালিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে, 'বলাকা'র গতিবাদ বার্গসঁর সঙ্গে আলোচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে পেয়েছেন। কিন্তু এই এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র তো তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মন' থেকে প্রাপ্তি। বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজ থেকে শেখা। রাজা রামমোহন রায় তো সকল ধর্মের গোঁড়ামি মুক্ত নিরাকার এক ঈশ্বরবাদী সার্বজনীন উপাসনার মাধ্যম হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজ (২০ আগস্ট, ১৮২৮) শুরু করেন। যার বাণী বৈদিক ও কোরয়ানিক বাণীর মিশ্রণ—

" 'একমেবা দ্বিতীয়ম' – এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।
'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' — আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।"[২]

তাহলে আমরা কি দেখছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষপর্বে এসে নিজেই নিজের Re-search করে চলেছেন। যা করতে পারছেন না বলে তাঁর মনে হচ্ছে - সেটার Research gap বলে দিয়েছেন। যাতে পরবর্তী সাহিত্যিক ঠিক ঐ missing link গুলো পূর্ণ করার কথা ভাবেন।

> "মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ তার এই ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন। মনসুরউদ্দীন অভিযোগ করেন যে, তাঁর রচনায় মুসলমান চরিত্র ও সমাজ নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা নেই।"[৩]

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, মুসলমান সমাজকে নিয়ে তিনি কিছু কিছু লিখেছেন। শিলাইদহ প্রভৃতি-স্থানে তিনি কিছুদিন থেকে এসেছেন। সেখানে তিনি মুসলমানদের জানবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্বন্ধের দোষে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেননি।

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"[৪]

কারণ সেখানে তিনি ছিলেন জমিদার এবং তারা ছিল প্রজা, সেজন্য তাদের সঙ্গে নিবিড় রূপে মিশবার সুযোগ তাঁর হয়নি। অথচ মুসলমান সমাজকে নিয়ে লিখতে গেলে ঘনিষ্ঠ ভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। মুসলিম সমাজের লোকাচার, ধর্মীয় যাপনশৈলি, সমাজের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের সংবাদ না জানলে লেখার মধ্যে অপরিস্ফুট আবছা ভাবের আমদানী হবে।

"জীবনে জীবন যেগে করা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে শরৎচন্দ্র যদিও বলেছেন যে মুসলমান সমাজকে নিয়ে তিনি লিখবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সফল হতে পারবেন না।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেন—

> "তোমাদের সমাজ সম্বন্ধে আমি ভালো জানিনা, কাজেই কিছু লেখা সম্ভব নয়। তোমাদের মুসলমান লেখকদের এ সমন্ধে লেখা উচিত।"[৬]

"যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।"[৭]

সমস্যার গাছ দূর থেকে দেখা গেলেও সমস্যার শিকড় কোথায় তা জানতে হলে ঐ সমাজের সঙ্গে হয় বসবাস করতে হবে নইলে ঐ সমাজ থেকেই শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে উঠে আস্তে হবে। কিন্তু সেসময় মুসলিম সমাজ মৌলবাদ (Fundamentalism) ভাবনা চালিত হয়ে ইংরেজি রাজভাষা থেকে দূরে চলে যাওয়ায় মূল স্রোতের বাইরে চলে গেল। চাকুরি পাওয়ার জন্য আগে যেমন রাজভাষা আরবি-ফারসি জানা প্রয়োজন ছিল। ঠিক তেমনি সময়ের সঙ্গে শাসক পরিবর্তন হওয়ায় তার মুখের ভাষা ইংরেজিকে গ্রহণ করলে তবেই চাকুরির উচ্চতর জায়গায় পৌছানো সম্ভব মুসলিমদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই সঙ্গে শিক্ষিত হওয়ার আর নিজ স্বর চিনিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত প্রতিনিধি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন। তার পরেও কি করে তাঁকে শুনতে হয় যে তিনি মুসলিম সমাজের জন্য কিছু ভাবেননি। আকাশের সূর্য তো মুসলিমদের জন্য আলাদা কিছু করেনি, সাহিত্যের সূর্যও (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) যা কিছু করেছেন মানবতার জন্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিমদের তাঁর লেখায় স্থান দেননি কিন্তু এহ বাহ্য। তাঁর মানে এই নয় যে তিনি ইসলাম কে অগ্রাহ্য করেছেন, তিনি সম্মানের সঙ্গেই আত্মস্থ করেছেন কোরআনের আয়াতগুলো। যা আমাদের মুসলিম সমাজের অশিক্ষার অন্ধকারের পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। এরকম নয়তো তিনি লিখেছেন অনেক কিছু কিন্তু আমাদের দেখার চোখ তৈরি হয়নি। যে চোখের প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্র যুগে, কিন্তু মুসলিমদের অশিক্ষার অন্ধকার তা দেখতে অপারগ ছিল। যার জন্য শিক্ষার সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন, ঠিক যেমন ইসলামে সর্বপ্রথম উচ্চারিত শব্দ হল— 'ইকরাহ্' অর্থাৎ পড়ো। একই অর্থের দ্যোতনা শুধু ভাষার পার্থক্য।

আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় নারীরা ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও পদদলিত। নারীকে উটের পরিবর্তে বিক্রি করে দেওয়া হত, কন্যা সন্তান জন্মালে সেই শিশুকে হত্যা করা হত, এক পুরুষের ভোগের জন্য অসংখ্য স্ত্রী, দাসী থাকতো। নারীর সামাজিক মর্যাদা বলে কিছু ছিল না। আজ যে নারীর অধিকার নিয়ে লড়াই করা হচ্ছে, বহু পূর্বে হজরত মহম্মদ (সঃ) নারী মুক্তির জন্য করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ লেখিকার তুর্কি মহিলাদের অবরোধ তথা পর্দা প্রথা ও নিগ্রহের বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ এবং সেই সম্পর্কে জাস্টিস সৈয়দ আমির আলির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিবাদ-নিবন্ধ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়, তারই পরিচয় পাওয়া যায় 'মুসলিম মহিলা' নামক প্রবন্ধে (১৮৯১), যা সাধনা পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ইংরেজ লেখিকা তাঁর প্রবন্ধে মহিলাদের প্রতি তুর্কিদের অবহেলা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজে নারীর দুরবস্থার পরিচয় দেওয়ার জন্য একটি বিচ্ছিন্ন বর্বর ঘটনার উল্লেখ করায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন, 'এরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না।' নারী-শোষণ নিবারণের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে তাই তিনি লিখেছেন, -

> "...য়ুরোপের মধ্যযুগে স্ত্রীলোক সদাসর্বদাই উৎপীড়িত, বলপূর্বক অপহৃত, কারামধ্যে বন্দীকৃত এবং পরমখৃষ্টান য়ুরোপের উপরাজগণের দ্বারা কশাহত হইত। খ্রিস্টানগণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে, জলমগ্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী পরিত্যাগের কোনো রাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্যপদবীতে আরোপন করিলেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাদিত করা কাহারও সাধ্যায়ও ছিল না। এই জন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।"[৮]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তিনটি বাণী এখানে উপস্থিত করা হল, যার মূলকথা মানবতার জয়গান। ১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর মির্জা আলি আকবর খাঁ-এর সভাপতিত্বে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'পয়গম্বর দিবস'। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বাণী পাঠান। বাণীটি সেদিন পাঠ করেন সরোজিনী নাইডু। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, -

> "জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুরাগীদের দায়িত্বও তাই বিশাল। ইসলাম পন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্ম বিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায়। আসলে এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুইটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির উপর নির্ভর করে না, সাহিত্য দ্রষ্টাদের বাণী নিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা। সত্য ও শাশ্বতকে যারা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালোবাসার পাত্র। এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালোবেসে এসেছেন।"[৯]

১৯৩৪ সালের ২৫ জুন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি বাণী বেতারে প্রচারিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, -

> "ইসলাম পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে অনুবর্তীগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। ভারতে যে সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে, তাদের পরস্পরের প্রতি সভ্যজাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাবিত করতে হয়, তাহলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তা সম্ভব হবে না, আমাদের নির্ভর করতে হবে- সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্য দূতদের অমর জীবন থেকে চির উৎসারিত। আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে এক যোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আর্শীবাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।"[১০]

দু'টি বাণীতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইসলামকে পৃথিবীর মহত্তম ধর্মগুলির অন্যতম বলে সম্মান জানিয়েছেন এবং ইসলামের মতাদর্শ অনুযায়ী মুসলমানদের জীবনাচরণ তথা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের মনোভাব ও আচরণকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আহ্বান করেছেন। 'আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে'— এই কথার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় বিবেককেই সতর্ক করে তুলতে চেয়েছেন তিনি, যার উদ্দেশ্য দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতি। তিনি মনে করেছেন, কেবল জাতীয় রাজনৈতিক আবেগের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ় হতে পারে না, এবং এইখানেই সমকালের অন্যান্য চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়কদের থেকে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। তিনি বরাবর বিশ্বাস করেছেন, জাতীয় কল্যাণ সাধনার জন্য আগে দরকার দেশের সকল মানুষের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবদ্ধতা। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিধানে তিনি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শুদ্ধাদর্শের প্রেরণার ভূমিকাও স্বীকার করেছেন। ইসলামে যে পরধর্মসহিষ্ণুতার কথা বলা হয়েছে-হযরত মুহাম্মদ সা. যে তা বারবার বলেছেন, তা নিশ্চয়ই জানতেন রবীন্দ্রনাথ।

এই সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বাণীটি প্রকাশিত হয় নয়াদিল্লির জামা মসজিদ প্রকাশিত 'দ্য পেশওয়া' পত্রিকার পয়গম্বর সংখ্যায়। ১৯৩৬-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা বার্তাটি পাঠান। তৃতীয় বাণীতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, -

> "যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হয়রত মুহাম্মদের উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক যে নতুন, সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিলেন পয়গম্বর হজরত, এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচারণের আদর্শ। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বর প্রদর্শিত পথ যাঁরা অনুসরণ করেছেন, আধুনিক তা ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন এমনভাবে ইতিহাসকে গড়ে তোলেন যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা অটুট থেকে যায়।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি রচনাংশের গুরুত্ব এই যে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মদিনকে উপলক্ষের মধ্য দিয়ে মূলত সামাজিক আবহটিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ভারতীয় মুসলমানদেরকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ইসলাম ধর্মের শেষ নবীর শিক্ষাকে সংহতির মন্ত্রে শীলিত করে নিতে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই জন্মদিবসের বাণীগুলিতে হযরত মুহাম্মদ সা. ও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল না। কিন্তু তবুও অশিক্ষার পর্দা চোখে পড়ার জন্য ভারতীয় মুসলিমরা সেদিনও দেখতে পায়নি, আজও বিভিন্ন আলোচনায় প্রমাণিত করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম মানস নিয়ে কিছু ভাবেননি, বা সাহিত্যে স্থান দেননি। এক্ষেত্রে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন।

আসলে তিনি ইসলামের সূফীবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। সূফীবাদ ইসলামের বাইরের নয়, ইসলামের একপ্রকার রহস্যময় হৃদয়ভিত্তিক ও আত্মোপলদ্ধি মূলক মতবাদ। রূহানী প্রশিক্ষণও বলা হয়। ব্যক্তির আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরম সত্তার সন্ধানই এর লক্ষ্য। যেখানে রূহ কি সাফাই/ নিজের অন্তরের পবিত্র করাকেই সূফী বলা হয়। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হল এই দর্শনের মর্মকথা। সুফীবাদ একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সুম্পর্ক স্থাপন হল এই দর্শনের মর্মকথা। মরমি তত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োগ করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন, তাঁকে সূফী বলে।

সূফী সাধনায় প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মিলনের সেতুই হল প্রেম। সূফীতত্ত্বের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ্ প্রেমময়। সূফীতত্ত্বে প্রেম ও রহমৎ মূলত একই অনুভূতির দুটি আলাদা নাম। সুফীর জীবনে তাই আল্লাহ্র প্রেমলাভ ও রহমৎ-ই প্রধান কাম্য। এই প্রেমের জন্য সুফীরা আত্মবিসর্জনে উন্মুখ। যে প্রেমের জন্য সুফীরা আত্মত্যাগে প্রস্তুত, সেই প্রেম কি? সত্তা ও গুণের মিলনসূত্র এই প্রেম। আল্লাহ্র সত্তা অসীম, মানুষের সত্তা সীমাবদ্ধ এই অসম দুই সত্তার মিলন সেতু প্রেম। আর তা রবীন্দ্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এই ভাবে-

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 82
Website: https://tirj.org.in, Page No. 738 - 745
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।”[১২]
(গীতাঞ্জলি, ১২০)

সূফী সাধকরা নানা বাধা পেরিয়ে প্রেমাস্পদের দিকে ছুটে যায়। কোনো বন্ধনই তাকে থামাতে পারে না। বরং বাধা যত বেশি হয় তাঁর প্রেমে গাঢ়তা তত বেশি।

বর্তমানের সূফীরা রস না জেনে তারা রসিক সাজার চেষ্টা করছে। রসিক ভাব অন্তর থেকে জাগ্রত হওয়ার। সূফী কোনো মতবাদ নয়, একটা ভাব। সর্ম্পণ ভাব, যেখানে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সর্ম্পিত হয় কোনো ব্যক্তি তাকেই সূফী বলা হয়। যা অনুকরণ করা যায় না। সর্ম্পিত প্রেম-ভক্তির ভাব। প্রকৃত সূফী সর্বদা আনন্দে মশগুল থাকে। সূফী হতে হলে আনন্দ ভাব, প্রেম ভাব, সর্ম্পণ ভাব প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের মধ্যে সর্ম্পিত ভাব না আসার কারণ আমরা অবরুদ্ধ আমাদের গ্রহনশীলতা কম। দেহটা আমরা বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করে আছি। রব ও বান্দা একই প্রকৃত জাত যেমন কাপড় ও তুলা। তুলা থেকেই সুত কেটে কাপড় তৈরি কিন্তু আলাদা করে তুলার অস্তিত্ব বুঝা যায় না, সেরকম আল্লাহর (সুভানাল্লাহু তায়ালা) নূর থেকেই আমাদের সৃষ্টি। সমস্ত জাগতিক প্রাণীতেই এই নূর আছে। নিজের অন্তরে লুকিয়ে থাকা রবকে খুঁজে পাওয়ার যাত্রা হল – journey inwards. রবীন্দ্র গানে তা এভাবে ঝংকৃত হয়—

“আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি,
আমার হৃদয় পানে চাই নি।।”[১৩]
--(গীতিমাল্যর – ১১)

কিংবা,

“তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম।।”[১৪]

সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের একটি পৃথক সম্প্রদায় নয়, বরং এটি ইসলামের একটি ব্যাখ্যা। যা ইসলামের আধ্যাত্মিক সত্তার মূল নির্যাস। যার মুলে রয়েছে নিজের নফ্‌সের সঙ্গে জুদ্ধ করে জয়ী হওয়া। অহংকার ও গর্ব সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে— ‘ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান্‌ কানা মুখ্‌তালান্‌ ফাখূরা (সুরা নিসা, আয়াত ৩৬) — যার অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে ভালবাসেন না।

এই নফ্‌স বা অহং থেকে মুক্তির জন্য কোরআনে যেমন বহু বার বলা হয়েছে তা বেদেও বর্ণিত হয়েছে। আর সেই বৈদিক ঋষি ও সূফীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।...
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে—
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।...
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও

হৃদয়পদ্ম দলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।”[১৫]
-(গীতাঞ্জলি, ১)

সুফিবাদের ভিত্তিও আল্-কোরআনে রয়েছে। মূলত কোরআনের আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ আয়াত গুলো নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই সূফী ভাব ধারার উৎপত্তি। সূফীবাদের মূল সুর একমাত্র আল্লাহ্। বিশ্বজগৎ আল্লাহ্ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। সকল বস্তুতে তাঁরই মহিমা প্রকাশিত।

নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র/ গুরুর/প্রেমিকের কাছে সমর্পণ করা। তওবা (ভুল কাজের অনুশোচনা), যোহদ (পরিবর্জন), ফকর, জিকর (স্মরণ), মুরাকাবা (ধ্যান), মুহাসাবা (আত্ম সমালোচনা), সবর (স্থির চিত্তে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নেওয়া), শুকর (আল্লাহ্র অফুরন্ত নেয়ামতের স্বীকৃতি), তাওাক্কাল (আল্লাহ্র উপর ভরসা) এর পথ ধরে সূফীর রূহানি সফর শুরু হয়। যেরকম ভাবে রবির হৃদয়ে হঠাৎ রবির কিরণ অন্যদিনের চেয়ে আলাদা ভাবে প্রবেশ করেছিল—

“আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে, এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।।...
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাব বহে যাবে প্রাণ ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, এত প্রাণ হয়ে আছে ভোর।”[১৬]
(প্রভাত সংগীত, নিরর্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ)

আর প্রভাত সংগীতের মধ্য দিয়ে এক নতুন আলো প্রবেশ করে তাঁর সৃষ্টির সর্ব ক্ষেত্রে।

Reference:

১. Psychodynamic Theory: Freud–Individual and Family...pressbooks.pub
https://iastate.pressbooks.pub› chapter› freuds-psychod...
About featured snippets
২. গনী, ড. ওসমান, ‘ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ’, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৭
৩. ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রমোহন, ‘রবীন্দ্র-সমীপে’, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৪৪। শেখ আতাউর রহমান তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন। তারই অনুসরণে বিষয়টির অবতারণা করা হল এখানে। ‘বাংলা কথাসাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ২৯৬
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সঞ্চয়িতা’, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৮২৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সঞ্চয়িতা’, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৮২৫
৬. ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রমোহন, ‘রবীন্দ্র-সমীপে’, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৪৪। শেখ আতাউর রহমান তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন। তারই অনুসরণে বিষয়টির অবতারণা করা হল এখানে। ‘বাংলা কথাসাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯১,পৃ. ২৯৬
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সঞ্চয়িতা’, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৮২৫

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'প্রাচ্য সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, আশ্বিন, পৃ. ৪৫৮
৯. ইসলাম, আমিনুল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. ও রবীন্দ্রনাথের তিনটি বাণী, পুবের কলম,সম্পাদক- আহমদ হাসান ইমরান, সীরাত-উন-নবী সংখ্যা ২০২৩, পৃ. ৫৭
১০. ঐ, পৃ. ৫৭
১১. ঐ, পৃ. ৫৭
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭, পৃ. ১৩৯
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতিমাল্য, বিশ্বভারতী, প্রকাশ ১৯১৪, পৃ. ১১৩
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ২৯৭
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭, পৃ. ১
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত সংগীত, প্রকাশক পাঁচকড়ি মিত্র, ইন্দিয়ান পালিশিং হাউস, কলিকাতা, প্রকাশ ১৩১৮, পৃ.১০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ -
শেখ আতাউর রহমান, 'বাংলা কথাসাহিত্য : মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৩৮
ড. ওসমান গনী, 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০০

সহায়ক গ্রন্থ -
কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথাপ্রকাশ,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
সংকলন ও টীকা জাহিরুল হাসান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমান সমগ্র, পূর্বা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬

পত্রিকা -
আহমদ হাসান ইমরান (সম্পাঃ), পুবের কলম, ২০২৩, সীরাত-উন-নবী সংখ্যা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 746 -751
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 746 - 751
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

জৈন দর্শন ও গান্ধীজীর নিরিখে অহিংসার একটি আলোচনা

রোজিনা খাতুন
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rojinakhatunphilo@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ahimsa, Jainism, Hinduism, Violence, Parama.

Abstract
In this paper, I have discussed how the idea of non-violence stands as a parallel in some aspects of Gandhi and Jainism. They are not only parallel but also so complementary to each other that one is incomplete without the other. The ideas that Gandhi and Jainism have about non-violence are almost the same. The general meaning of non-violence is non-violence; in the broad sense, non-violence is non-harming any living being through body, mind, action, and speech, and literally, the word ahimsa means not harming oneself or others. The importance of non-violence in Jain religion and philosophy is immense, and in modern times, most of the movements that Mahatma Gandhi led to free India from the British Empire were non-violent. Therefore, it is seen that the importance of the concept of non-violence in the philosophy of Jainism and Gandhi is immense. My current attempt in this paper is to make a comparative discussion on the nature of non-violence in the Jain and Gandhian philosophies and try to show whether there are any discrepancies between these two philosophies or whether both philosophies agree on this issue.

Discussion

অহিংসা বিষয়ে জৈন মত : জৈন শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'জিন' থেকে যার অর্থ হল জয়ী। কাজেই 'জিন' বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তিদের যিনি সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করে সকল তথ্য জয় করেছেন। অর্থাৎ যিনি সাধনার দ্বারা কামনা-বাসনা জয় করে মুক্ত পুরুষরূপে অবস্থান করেন। জিনদের তীর্থঙ্করও বলা হয়। তীর্থঙ্করদের উপদেশ যারা অনুসরণ করেন তারা জৈন নামে পরিচিত।[১] জৈন একটি ভারতীয় ধর্ম ও একটি ভারতীয় দর্শন। ধর্ম ও দর্শন একে অপরের পরিপূরক যদিও তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। ধর্ম হল ব্যবহারিক তত্ত্বের প্রতিপাদক অর্থাৎ ধর্মের বৈশিষ্ট্য তার আচার-আচরণের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং দর্শনের বৈশিষ্ট্য তার সিদ্ধান্তের সাধক হয়। ভারতীয় ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ধার্মিক আচার ছাড়া যেমন দর্শনের স্থিতি নিষ্ফল তেমনি দার্শনিক বিচার ছাড়াও ধর্মের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ধর্ম বলতে জৈনরা নীতি ভিত্তিক ধর্মের কথায় বলতে চেয়েছেন।

জৈন অহিংসা নীতি তাদের অধিবিদ্যার যৌক্তিক পরিণতি বলে মনে করা হয়। এই অধিবিদ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে প্রতিটি জীব ও জীবনের মধ্যে আত্মা বিরাজমান। জৈন তীর্থঙ্করা মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে পাঁচ প্রকার নীতি বা ব্রতের কথা বলেছেন। যথা - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই এই পাঁচ প্রকার

ব্রত অবশ্যই পালনীয়। এই পাঁচ প্রকার ব্রত যখন গৃহীরা পালন করে তখন তাদের পালনীয় ব্রত গুলিকে অনুব্রত বলা হয় এবং যখন সন্ন্যাসীগণ সেই ব্রতগুলিকে কঠোরভাবে পালন করে তখন তাদের পালনীয় ব্রত গুলিকে মহাব্রত বলা হয়। সন্ন্যাসীগণের পালনীয় ব্রতের তুলনায় গৃহীদের পালনীয় ব্রত কিছুটা সহজ বা শিথিল। কেননা গৃহীদের প্রাত্যহিক জীবনে এমন কিছু কর্ম করতে হয় যাতে জীবের অনিষ্ট সাধিত হয়। আর একথা মাথায় রেখেই গৃহীদের জন্য ব্রতকে শিথিল করা হয়েছে। যেমন জীবিকা বা পেশার বাধ্যবাধকতা, শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে এবং দেশকে রক্ষা করা এই দুটি ক্ষেত্রে হিংসা জড়িত থাকে। আরো কিছু ক্ষেত্রে হিংসা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় থাকে না গৃহীদের সেগুলি নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা হল। এই পালনীয় পাঁচটি ব্রতের মধ্যে প্রথম ব্রত অহিংসা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন।

জৈন ধর্মের প্রধান সর্বাধিক পরিচিত ও জৈন নীতিতত্ত্বের হৃদয় হল অহিংসা। জৈন ধর্মের মূলমন্ত্র হল 'অহিংসা পরমোঃ ধর্মঃ' অর্থাৎ অহিংসা হল সবথেকে বড় ধর্ম। জৈন ধর্মে অহিংসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়। অহিংসা মানে হিংসার পরিত্যাগ। জৈন ধর্ম সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। কোনোরকম আবেগের তাড়নায় কোন জীবিত প্রাণীকে হত্যা করাকে বলা হয় হিংসা। এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকাই জৈন ধর্মে অহিংসা নামে পরিচিত। জৈন মতানুসারে প্রত্যেক দ্রব্যে আত্মার বাস। গতিশীল দ্রব্যের অতিরিক্ত পৃথিবী, জল, বায়ু ইত্যাদি দ্রব্যেও আত্মা স্বীকার করা হয়। তাই অহিংসা বলতে শুধু মানুষ নয়, সমস্ত জীবজন্তু এমনকি সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করাকে বোঝায়। নিজের বাঁচার জন্য অন্যের প্রাণের মৃত্যু এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। অহিংসা তত্ত্বের তাৎপর্য হল কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভাবে হিংসাকে বর্জন করা। হিংসা বলতে শুধুমাত্র সহিংসা কর্মকে বোঝায় না, সহিংসা বাক্যকেও বোঝায়। জৈন দর্শনের চিন্তাজনিত হিংসা হল ভাব হিংসা এবং কর্মজনিত হিংসা বা বাক্যজনিত হিংসা হল দ্রব্য হিংসা। শুধুমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হত্যা নয়, যে কোন প্রাণীর প্রতি যেকোনো আঘাত হল হিংসা আর এই হিংসার অভাবই হল অহিংসা।

শুধু কাজেই নয়, চিন্তা বা বাক্যের দ্বারা কোন জীবের প্রতি হিংসা কর্ম সমর্থন করা উচিত নয়। জৈন সন্ন্যাসীরা অহিংসা ব্রতের পালন অধিক নিষ্ঠার সাথে করে থাকেন যাতে নিজের অজান্তে কোন হিংসা না ঘটে যায়। সেজন্য জৈন সাধুরা বর্ষাকালে তিন মাস ঘর থেকে বের হতেন না এবং নাকের ওপর একখণ্ড কাপড় নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী নাকের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে। জৈনরা অহিংসা ব্রতকে এতটাই কঠিন ভাবে পালন করতেন যে সাধারণ মানুষের জন্য তারা দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণী পর্যন্ত হত্যা না করার আদেশ দেন। তাদের মতে হিংসামূলক কোন কর্মের চিন্তা করা, অন্যকে হিংসামূলক কর্মে উৎসাহিত করা মানে হিংসাকে সমর্থন করা, অহিংসাকে লংঘন করা। এর দ্বারা জৈনগণ বলতে চেয়েছেন সকল জীবই সমান তাই কোন জীবকে হিংসা করা হল অধর্ম।

অহিংসার আদর্শ যেহেতু বাস্তব জীবনে সকলে মেনে চলতে পারবেন না তাই জৈনরা একটি শ্রেণী শৃঙ্খলা মেনে চলেন। এই শ্রেণী শৃঙ্খলায় মানুষের পরে পশুপক্ষী, তারপর কীটপতঙ্গ, তারপর গাছপালার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। জৈন ধর্মের অনুশীলনে নিরামিষ আহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ জৈনরা দুগ্ধজাত নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকেন। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সময় যদি পশুদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করা হয় তাহলে তাঁরা সাধারণ নিরামিষ খাবারের সন্তুষ্ট হন। ইচ্ছাকৃতভাবে কীটপতঙ্গদের ক্ষতি করা জৈন ধর্মে নিষিদ্ধ। তাই সেগুলোকে মেরে ফেলার পরিবর্তে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় জৈন ধর্মে। মানুষ, পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের পর জৈনদের গাছপালার প্রতিও অহিংসা ব্রত পালন করতে দেখা যায়। যতটা না করলেই নয়, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি তারা গাছপালার করেন না। নরমপন্থী জৈনরা মনে করেন খাদ্যের প্রয়োজনে গাছপালার ক্ষতি করতে হবে। আবার কঠোরপন্থী জৈনরা মূল জাতীয় সবজি যেমন আলু, পেঁয়াজ, রসুন খান না। কারণ এগুলো পাওয়ার জন্য কোনো গাছকে উপড়ে আনতে হয় ফলে গাছের ছোট ছোট অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জৈন মতে হিংসার পিছনের উদ্দেশ্য ও আবেগগুলি কাজের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করে। যেমন - যদি কেউ অযত্নের বসে কোন জীবিত প্রাণীকে হত্যা করে এবং পরে তার জন্য অনুতাপও করে তবুও তার কর্ম বন্ধন আসে। অন্যদিকে ক্রোধ, প্রতিশোধ প্রভৃতি আবেগের বশে হত্যা করাও গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। কোন সৈনিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 746 -751
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যখন আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করে এবং কেউ যখন আবেগের বশে কাউকে হত্যা করে - এই দুই ধরনের হিংসার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। জৈন ধর্মে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য হিংসাকে স্বীকার করা হয়েছে।

অহিংসা বিষয়ে গান্ধীজীর মত : অহিংসা প্রত্যয়টি যদি কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তাহলে তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী এমন এক সমসাময়িক দার্শনিক তথা রাজনীতিবিদ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি সর্বত্র অহিংসা প্রত্যয়ের কথা বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন অহিংসা আদর্শের একজন অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ও পালনকর্তা। গান্ধীর দর্শন কোনো রাজনৈতিক দর্শন ছিল না যেটা কাল্পনিক বা তত্ত্বগত ভাবে কোথাও লেখা ছিল। তাঁর দর্শন ছিল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা যা তিনি তার জীবনের ৪০-৫০ বছর বয়সে অর্জন করে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। গান্ধীর দর্শনের বিভিন্ন ধারণাগুলি যেমন অহিংসা, সত্য ইত্যাদি নতুন কোন ধারণা ছিল না। এগুলি প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছিল, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। তিনি আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য এই ধারণাগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধীজী নিজেকে কখনো দার্শনিক বলে মনে করতেন না। তিনি বলতেন বিশ্বকে শেখানোর মতো তার কাছে কোনো মূলনীতি নেই। তাঁর মতে অহিংসা এবং সত্য হল পাহাড় এর মতই প্রাচীন।[২] তিনি আমাদেরকে কোন দর্শনের পদ্ধতি দেননি কিন্তু আমরা যদি তার দর্শন দেখি তাহলে সেটাই হল সম্পূর্ণ দর্শন। আর তাঁর এই দর্শন থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি। তিনি যেটাকে ভালো মনে করেছেন সেটাকেই তাঁর দর্শনে স্থান দিয়েছেন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি তার দর্শনের মূল ভিত্তি হল সত্যের অভিজ্ঞতা। প্রথমে তিনি সত্যকে জেনেছেন তারপর সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তারপর সেটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন রাজনীতিকে শুদ্ধ করতে, মানুষের মধ্যে ভালোবাসা জাগাতে, মানুষকে সাম্য ও স্বাধীনতা দিতে, মানুষের শ্রমকে সম্মান করতে। বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন একটি শক্তি। তবে কোনো শারীরিক শক্তি নয়, তাহল আত্মিক শক্তি যার সাহায্যে তিনি এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর দর্শনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ রূপে এই অহিংসা নতুন কোন আবিষ্কার নয়। গান্ধীজীর মতে তত্ত্ব হিসেবে অহিংসাকে কেউ জানে না। যেমন ভগবানকে ব্যাখ্যা করা যায় না তেমন অহিংসাকেও বোঝানো কঠিন। এর বাস্তব ব্যবহারে আমরা তার সন্ধান পেয়ে থাকি।[৩] অহিংসার প্রতি তাঁর দৃষ্টি জীবনের গভীরতম সংকট ও সংগ্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল।[৪]

গান্ধীজিকে অহিংসার পূজারী বলা হয়। তিনি অহিংসা নীতির মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চান। তিনি এই অহিংসা নীতির ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রে তিনি এই অহিংসা নীতির কথা বলেছেন। তাঁর এই অহিংসা নীতিটি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকায় আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি অহিংসার বিশেষ কিছু দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই গান্ধীর নিজস্ব ভাবনায় অহিংসা এক বিশেষ রূপ লাভ করেছে। সত্য এবং অহিংসা এক অখণ্ড আদর্শের প্রতিফলন মাত্র, একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। বলতে পারি একে অপরের পরিপূরক। তাই গান্ধীজি বলেন যখন আমি অহিংসাকে খুঁজি তখন সত্য বলে আমার মধ্য দিয়ে তাকে পাও আবার যখন সত্যের সন্ধান করতে যায় তখন অহিংসা বলে আমার মাধ্যমে তাকে লাভ করো। অর্থাৎ এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আঙ্গিক সম্বন্ধে যুক্ত। অহিংসা হল উপায় আর সত্য হল লক্ষ্য। সুতরাং অহিংসাই হল আমাদের চরম কর্তব্য।

অহিংসা শব্দটির যেমন একটি নঙর্থক দিক আছে তেমন একটি সদর্থক দিকও আছে। তবে তিনি নঙর্থক দিককে স্বীকার করেননি। কেননা তিনি জানতেন বাস্তব জীবনে এত কঠোরভাবে অহিংসা পালন সম্ভব নয় বা তিনি এও জানতেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন - খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, জল পান করার ক্ষেত্রে, হাঁটাচলার ক্ষেত্রে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যের দেহকে আঘাত না করে নিজের দেহকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। বলা যায় গান্ধীজী কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে হত্যাকে অনুমোদন করেছেন। গান্ধীজি তাঁর ***ইয়ং ইন্ডিয়া*** পত্রিকায় লিখেছেন -

"Taking life may be a duty...regarded as a benevolent man".[৫]

গান্ধীজীর অহিংসা সম্বন্ধে সদর্থক ধারণাটি আমাদের আরো গভীরে ভাবতে শেখায়। তাঁর মতে অহিংসার সদর্থক দিক ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ভালোবাসা হল এক অনুভূতি যা ব্যক্তিকে তার ভালোবাসার বস্তুর সঙ্গে একাকার করে ফেলে। তাই অহিংসার জন্য প্রয়োজন এক স্বাধীন মানসিকতার যেখানে কোন ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 746 -751
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকবে না। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেন অহিংসা ভালবাসার সদর্থক দিক যা অন্যায়কারীরও মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অহিংসা অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের কাজে সাহায্য করবে। তাঁর মতে অহিংসা অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং দুর্বলতার সঙ্গে দূরত্ব যুক্ত।[৬] অধ্যাপক ডঃ ভার্মা তাঁর *Political Pilosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* নামক গ্রন্থে বলেছেন-

> "Ahimsa is not merely the negative act of refraing from doing offence, injury or harm to others, but really it represent the ancient law positive self-sacrifice and constructive suffering."[৭]

অহিংসার পথ ও নীতি নিয়ে গান্ধীজি অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার চালিয়ে গেছেন। মানব কল্যাণের ধারণা ও ন্যায়ের প্রেরণা এক্ষেত্রে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই অহিংসা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে সত্যানুসন্ধান ও আত্মানুসন্ধান। তাঁর অহিংসা ধারনার মধ্যে রয়েছে শ্রমের মর্যাদার কথা। তিনি শিশুর অহিংসা বোধের বিকাশের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন তেমনি আবার শিশুর সামাজিক বিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার কথাও বলেছেন।

জৈন ও গান্ধীজী সম্মত অহিংসা ধারনার তুলনামূলক আলোচনা : অহিংসার সাধারণ অর্থ হল হিংসা না করা। ব্যাপক অর্থে অহিংসা হল কোন প্রাণীর কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি বা আঘাত না করা এবং আক্ষরিক অর্থে অহিংসা শব্দের অর্থ নিজের বা অন্যের ক্ষতি না করা। সুতরাং মনে মনে কারো ক্ষতির কথা না ভাবা, বাক্যের দ্বারা কারো ক্ষতি না করা, কোনো অবস্থাতে কর্মের দ্বারা কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা না করাই হল অহিংসা।

পূর্বে আমি জৈন ও গান্ধী সম্মত অহিংসা ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা মূলত জৈন ও গান্ধীজীর সম্মত অহিংসা ভাবনার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করব অর্থাৎ জৈন ও গান্ধীজি অহিংসার যে ধারণা দিয়েছেন সেই অহিংসা ধারণার মধ্যে তাদের কোন কোন জায়গায় মিল বা সাদৃশ্য এবং অমিল বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা দেখব।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, জৈন দর্শনে মোক্ষলাভের সহায়ক কর্ম হল পাঁচ প্রকার। আর এই পাঁচ প্রকার কর্মের মধ্যে অহিংসা হল প্রথম এবং প্রধান। মোক্ষলাভের সহায়ক পাঁচ প্রকার কর্মকে জৈন দর্শনের ব্রত রূপে পালন করা হয় এবং এই ব্রতগুলিকে সাধারণ মানুষ বা গৃহীরা এবং সন্ন্যাসীরা উভয়ই পালন করে থাকে। গৃহীরা ব্রতগুলিকে শিথিল ভাবে পালন করেন এবং সন্ন্যাসীরা সেটাকে কঠোরভাবে পালন করে থাকে। এই প্রবন্ধে গৃহীদের পালনীয় অহিংসা ব্রতের সাথে গান্ধীজীর অহিংসার অজস্র মিল অর্থাৎ সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। এমন কি এটাও বলা যায় যে গান্ধীজীর অহিংসার ধারণাটি মূলত জৈন দর্শনের গৃহীদের পালনীয় অহিংসা ব্রত থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে সন্ন্যাসীদের পালনীয় অহিংসা ব্রতের সাথে গান্ধীজীর অহিংসার কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য বর্তমান। তবে কিছু কিছু হিংসা আছে যেগুলি না করলে সমাজে মানুষের বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন - শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজ রক্ষার ক্ষেত্রে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে, দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে কিছু কিছু হিংসার পথ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে জৈন দর্শনের গৃহীরা ও গান্ধীজী একই মত পোষণ করেছেন। এছাড়াও সামাজিক স্বার্থে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিকে হিংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে মানুষ স্বাভাবিক ও প্রবৃত্তিগত ভাবে কোন প্রাণীকে হত্যা করার প্রসঙ্গে অত্যন্ত ভীত ও সংবেদনশীল। যেমন, যদি কোন কুকুর রোগাক্রান্ত হয় বা পাগল হয় তাহলে তাকেও তারা কোন জনহীন স্থানে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করার জন্য রেখে আসে। যদিও গান্ধী মতে এই ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল আচরণ কর্তব্য। অন্যভাবে বলা যায় যদি কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনাটি ঘটে তাহলে তাকে স্বস্তি মৃত্যু বা ওষুধ ইনজেকশন প্রয়োগে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া সম্ভব হলেও কুকুরটির ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় সমাধান এর বিকল্প না থাকায় তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে তার শারীরিক কষ্ট লাঘব করা উচিত। এমনকি কোন নিদারুণ রোগে আক্রান্ত শিশুর ক্ষেত্রেও যদি তাকে সুস্থ করা যাবতীয় সমস্ত উপায় ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে অদৃষ্টের দোহাই না দিয়ে তাকে যে কোন উপায়ে ঐ যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করা উচিত। অতএব গান্ধীজী যে অহিংসা ধারণাটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে জৈন গৃহীরা কোনরকম হত্যা স্বীকার করে না।

প্রাচীন জৈন মতের অহিংসার সাথে গান্ধীজির অহিংসার মূল পার্থক্য হল - প্রাচীন জৈন মতে জীবের নির্বাণ লাভের পথ হল অহিংসা কিন্তু গান্ধীজি সমাজ কল্যাণ সাধনকে মানুষের জীবের পরমার্থ রূপে গণ্য করে বলেছেন যে অহিংসা পথেই কেবল ঐ অভীষ্ট লাভ করতে হবে। এছাড়া গান্ধীজি অহিংসা পথকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলেননি, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বলেছেন।

জৈন সন্ন্যাসীদের পালনীয় অহিংসা ব্রতের সাথে গান্ধীজীর অহিংসার অপর একটি বৈসাদৃশ্য হল যে, জৈন সন্ন্যাসীরা অহিংসা ব্রতটিকে অতি কঠোরভাবে পালন করে। অর্থাৎ তারা এমনভাবে কাজ করে যাতে কোন জীবের ক্ষতি না হয়। বাক্য প্রয়োগের সতর্কতা রেখে, মনকে সংযত রেখে সতর্কভাবে তাঁরা গমনাগমন করে। তাঁদের মূল বক্তব্য হল যে একজন সন্ন্যাসী নিজে কোন রকম হিংসা করবে না, অপরকে হিংসা করতে উৎসাহিত করবে না এবং কোনোরকম হিংসা মনোভাব নিজের মধ্যে রাখবে না। সর্বদা নিজে কঠোরভাবে অহিংসার সাথে জড়িত থাকবে এবং অপরকেও সেটাই করতে উপদেশ দেবেন। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর অহিংসার ব্যাখ্যায় এত কঠোরতা রাখেনি, যদিও তিনি সব কিছুর মূল অংশ হিসেবে অহিংসাকে ধরেছেন। তবে তিনি বলছেন যে সমাজে বাঁচতে হলে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কিছু হিংসাকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যদিও সেগুলো হিংসার মধ্যে পড়ে না বলে তিনি মনে করেন। অপরের প্রতি প্রেম ভালোবাসা বিতরণ করে অহিংসা পালন করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জৈনদের মতো কোন এক জায়গায় বলেছেন যে অহিংসা ধর্ম শুধুমাত্র মুনি-ঋষিদের ধর্ম নয়, এটা সাধারণ মানুষেরও ধর্ম।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতির সার্বিক প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছেন, যা জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন অনুশীলনযোগ্য তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু জৈন মতে একত্রে ব্যক্তিকে নয়, প্রতিটা ব্যক্তিকে অহিংসা পালনের কথা বলা হয়েছে।

এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে আর একটি পার্থক্যের কথা বলতে হয় যে, জৈন মতে অহিংসা এবং গান্ধীজি মতে অহিংসা - এই দুই অহিংসার মধ্যে জৈনরা অহিংসাকে একটি মুক্তি লাভের পথ হিসেবে ধরে নিয়েছে কিন্তু গান্ধীজি বলছেন অহিংসা হল একটা আচরণ যার মাধ্যমে আমরা সবকিছুর সমাধান করতে পারি। এমনকি এই অহিংসার পথে শান্তিও আনা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

পরিশেষে আমার মনে হয়েছে যে, গান্ধীজী এবং জৈন গৃহীরা যেভাবে অহিংসা পালন করেছেন ঠিক সেই ভাবে যদি অহিংসা পালন করা হয় তাহলে বিশ্বে শান্তি ফিরবে। কেননা হিংসা পরিহার করাই হল অহিংসা আর এই হিংসা পরিহার করলেই আমাদের মনের সমস্ত ক্লেশ, রাগ, দ্বেষ, অহংকার দূর হবে এবং তখনই একজন ব্যক্তির মধ্যে সহানুভূতি, সহনশীলতা, দয়াশীলতা, প্রেম-ভালোবাসা জন্মাবে। তবে এটাও আমার মনে হয় যে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু হিংসাকে স্বীকার করে নিতে হয় তবে সেই হিংসাগুলি অহিংসারই একটি বৃহত্তম প্রয়োগ মাত্র। আর এভাবেই যদি সবাই অহিংসা পালন করে অর্থাৎ এক ব্যক্তির কাছ থেকে অপর ব্যক্তি, অপর ব্যক্তির কাছ থেকে তার পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে দেশ ইত্যাদি। এইভাবে যদি অহিংসাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে মনে হয় সকলের মধ্যে একটা শান্তির বার্তা শুরু হবে এবং তখনই আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব। তাই আমার মনে হয় যে সকলকে অহিংসা নীতি পালন করা উচিত, তবে কঠোর ভাবে নয়।

Reference:

১. বাগচী, দীপক কুমার; ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৭৭
২. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ; বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা, পৃ. ১৪৪
৩. Tendulkar, D.G; MAHATMA, vol. - v, P. 307
৪. দাশগুপ্ত, পান্নালাল; গান্ধী গবেষণা, পৃ. ২৬
৫. বন্দোপাধ্যায়, ডঃ নিখিলেশ; বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৬৯
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী শ্যামাদাস; গান্ধী রচনা সম্ভার, পৃ. ১১৭

৭. মহাপাত্র, অনাদিকুমার এবং বন্দোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন; ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, পৃ. ১৯১

Bibliography:

শ্যামসুখা., পূরণচাঁদ.; ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈন ভবন, কলকাতা, ১৩৮১
মুনিজী., শ্রী সুজষ.; জৈন ধর্ম ও শাসনাবলি, শ্রী অখিল ভারতীয় স্বারক, জৈন সংগঠন, ২০০০
যশ., ডঃ অনুপ.; তত্ত্বার্থ সূত্র, জৈন ভবন, কলকাতা, ২০১৬
দাশগুপ্ত., পান্নালাল.; গান্ধী গবেষণা, নবপত্র প্রকাশক,কলকাতা, ১৯৮৬
মহাপাত্র., অনাদিকুমার এবং বন্দোপাধ্যায়., প্রদ্যুম্ন.; ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮
চক্রবর্তী., নির্মাল্যনারায়ণ.; বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শন চর্চা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা-৯১, ২০২০
বন্দোপাধ্যায়., ডঃ নিখিলেশ.; বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, স্বদেশ, কলকাতা-০৬, ২০১২
বাগচী., দীপক কুমার.; ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক,কলকাতা, ২০১৪
চক্রবর্তী., ডঃ নিরদবরণ,; ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪
Tatia., Nathmal.; Tattvartha Sutra, Motilal Banarasidass, Delhi,2004
Tara., Sethia.; Ahimsa, Anekanta and Jainism, Motilal Banarasidass, Delhi, 2004
Maitra., S.K.; The ethics of Hindus, Calcutta University, 1963

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 752 - 762
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অসমীয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ‘মেকুরী’ অথবা বিড়াল : একটি প্রতিবেদন

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম
Email ID : jyotirmoysg@pragjyotishcollege.ac.in

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Mekuri (cat), Totem & Taboo, Proverbs, Assamese Fictons, Tradition.

Abstract
‘Mekuri’ or cat is a welknown 'motif' belonging to various folklores and beliefs prevalent in Assam. It was the 'totem' of Chutiya. The third story in Assamese 'Saathar Vrat' is about 'Sato Mekuri'. In Assamese proverbs, Nursery Rhymes, folk tales etc. 'cat' appears with its innate powers. Again, ‘mekuri’ can be found in certain lexical applications and in several modern Assamese fictions. In accordance with the norms of folk culture, over time, the modern society and the cultural influence of other groups have maintained cat motif in Assamese public life. But the positive taboos have disappeared, and the negative taboos have persisted due to the influence of similar folk beliefs of other groups. Further structural analysis associated with the folklore of Assam may throw some new light. However, in Assamese rural and urban life, the cat remains as a symbol of tradition.

Discussion

আশৈশব পরিচিত পরিবেশে যে চতুষ্পদ প্রাণীটির আনাগোনা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারে একটা গোটা জনগোষ্ঠী সে হল বিড়াল বা বেড়াল, অসমে যার পরিচিত নাম ‘মেকুরী’ (বোড়ো ভাষায় মাওজি বা আমিং, রাভায় মিঙ্কু)। ‘বিড়াল’ শব্দটিও বহুল ব্যবহৃত এবং তার স্ত্রী সংস্করণ বোঝাতে ‘বিড়ালীর ব্যবহারও প্রচলিত। অবশ্য পুরুষ ও স্ত্রী বিড়ালকে যথাক্রমে ‘বোন্দা’ এবং ‘জাঁই’ নামেও অভিহিত করা হয় অসমে। এই বিড়ালকে অসমে প্রচলিত বিভিন্ন লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত ‘মোটিফ’ হিসাবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ সুদীর্ঘকাল এখানকার ‘ওমলা’ এবং ‘নিচুকনি গীত’ বা ঘুম পাড়ানো গান, ছড়া, লোকশব্দ, লোককথা ইত্যাদি বিভিন্ন লোক-উপাদানে ‘মেকুরী’ বা বিড়াল সদর্পে বিরাজমান। সেই সূত্রধরে শুধু লৌকিক ব্যবহারেই নয়, আধুনিক কালে প্রাপ্ত নানা ছড়াজাতীয় লেখা, নীতিকথামালা, গল্প, উপন্যাস আর গানেও তার সহজ আনাগোনা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অসমের সমাজ-কৃষ্টিগত (socio-cultural) কাঠামোয় বিড়ালের উপস্থিতি বহু প্রাচীন। আমরা শুরু করব আহোম রাজত্বের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে। অসম বুরঞ্জী অনুযায়ী, আহোমরাজ চুপিমফার পুত্র চুহুংমুং ওরফে দিহিঙ্গিয়া বংশের রাজা স্বর্গনারায়ণ ১৪৯৭ সালে সিংহাসন লাভ করার পর বুঢ়াগোহাঞি ও বরগোহাঞি – এই দুই শীর্ষ মন্ত্রীপদ থাকতেও বরপাত্র গোহাঞি পদটি সৃষ্টি করেন এবং প্রিয়পাত্র কনচেংকে এই পদে বসিয়ে তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যের সীমা বিস্তারে মন দেন।[১] লড়াই বাঁধে শদিয়ার 'চুটীয়া'[২] রাজা ধীরনারায়ণের সঙ্গে। হরকান্ত বরুয়া সদরামিনের লেখা 'বুরঞ্জী'তে এই সময়কার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। যুদ্ধশেষে কনচেং বরপাত্রগোহাঞি চুটীয়া রাজা ও মন্ত্রীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাঁদের সমস্ত সম্পদ দখল করে নিয়েছিলেন। এই সম্পদের মধ্যে অন্যতম হল সোনার বিড়াল, যা যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে স্বর্গদেও স্বর্গনারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।[৩] 'সাতসরী অসম বুরঞ্জী'তে এই কাহিনিই সবিস্তারে লেখা আছে। এখানে অবশ্য চুটীয়া রাজা ধীরনারায়ণ নাম বদলের ফলে বীরনারায়ণ হয়েছেন। যাই হোক, কনচেং বরপাত্রগোহাঞি শদিয়া পর্যন্ত পিছু নিয়েছিলেন চুটীয়ারাজের। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা ধীরনারায়ণ দূতের হাত দিয়ে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠান রাজার কাছে। সঙ্গে উপঢৌকন হিসাবে সোনার 'শরাই' সহ আরও অনেক কিছু। কিন্তু কনচেং রাজাও দূতের মুখে বলে পাঠালেন যে, এসব নয় 'সোনর দণ্ড, মেকুরী, খাটো আছে...' (সোনার ছত্রদণ্ড, সোনার বিড়াল ও সোনার পালঙ্ক) সেগুলোই চাই। সঙ্গত কারণেই সম্মত হলেন না চুটীয়া রাজা। কারণ সোনার 'মেকুরী' বা বিড়াল হল তাঁর 'পিতৃপিতামহর দিন সর্বস্ব' সেটা কিছুতেই দেওয়া যাবে না।[৪] যাকে বংশানুক্রমিক ভাবেই (পিতৃপিতামহর দিন) আগলে রাখতে হয় সেটা বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক অবশ্যই। 'বুরঞ্জী'তে এই ধরনের উল্লেখ সোনার বিড়ালকে চুটীয়া রাজ্যের কূলপ্রতীক বা 'টোটেম' হবার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

অসম বুরঞ্জীরই আরেকটি বিবরণে সোনার বিড়ালের প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। সেটাও আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি সিংহাসনে বসার পর দেবরাজ ইন্দ্র (আহোমরা ইন্দ্রবংশীয় রাজা বলে কথিত আছে) অধিষ্ঠাতা দেবতা 'সোমদেব'কে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে খুব সাবধানে, সম্মান সহকারে রাখতে বললেন। আর বললেন তাঁরই অংশ 'আইক্লান' - এর কাছ থেকে থাওলিপলিঙ এবং থাওবকচেঙ – এই দুজন পণ্ডিতকে যেন তিনি নিয়ে আসেন। সেভাবে স্বর্গনারায়ণ আইক্লানের কাছে গেলে তিনি ওই দুই পণ্ডিতকে তো পাঠালেনই সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আহোমরাজকে দেন। এসবের মধ্যে ছিল 'লাপেত মেকুরী' বা সোনার বেড়াল। এই সূত্রেই বিড়াল আহোম রাজেরও কূলপ্রতীক বলে ভাবা যেতে পারে।[৫] চুটীয়া রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে সোনার বিড়ালকে সযত্নে রক্ষা করতেন। সৌভাগ্যের এই প্রতীককে রক্ষা করতে গিয়েই সতী সাধনী আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই 'Significance of FELIDAE (cat family) in Chutia Culture' শীর্ষক একটি লেখায় বিড়ালকে চুটীয়া জাতির 'টোটেম' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৫ক]

বিড়ালকে জনজাতিসমূহের 'টোটেম' হিসাবে ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, চুটীয়া লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বিড়ালের মধ্যে পূর্বপুরুষের আত্মা বিরাজ করে এবং সে পরকালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি মাধ্যমও বটে। প্রায় একই ধরনের লোকবিশ্বাস সোনোয়াল কছারি উপজাতিদের মধ্যেও বিরাজমান। দ্বিতীয়ত, ডিমাসা এবং বোড়োরাও মনে করেন বিড়াল হচ্ছে সম্পদ বা কুবেরের প্রতীক। তাই বিড়াল মারা, বিশেষ করে কালো বিড়াল, এই উপজাতির মানুষদের বিশ্বাস অনুযায়ী 'পাপ'। যদি কেউ মেরেও ফেলেন তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে এঁরা দেবতার উদ্দেশ্যে একটি সোনার বিড়াল বানিয়ে দান করেন। বলা যায়, আধুনিক কালেও অসমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই সংস্কারকে (ট্যাবু) ধরে রেখেছেন। অসমের পল্লী ও পৌর সমাজে সোনার বিড়াল দান করাটা তাই পরিচিত প্রসঙ্গ।

কাল পরম্পরায় উত্তরাধিকারের প্রতীক হিসাবে এই বিড়াল লোককথার 'মোটিফ' হয়ে উঠল অসমীয়া জনজীবনে। লোককথা ছাড়াও, আঞ্চলিক ব্রতকথায়, প্রবাদ-প্রবচনে বা প্রাত্যহিক প্রয়োগের নানারঙ্গী কথায় 'মেকুরী' বা বিড়ালকে 'মোটিফ' হিসাবে উঠে আসতে দেখা যায়। এমনকি মানুষের স্বভাব, খাদ্যবস্তু, গাছ-লতাপাতার নামকরণে বিড়াল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির – কয়েকটি আভিধানিক প্রয়োগই তার প্রমাণ। যেমন - মেকুরী-কণীয়া (বিড়ালের মতো ছোটো কান যার। কোনো কোনো লেখায় বিশেষ কোনো চরিত্রের বর্ণনায় এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।), মেকুরী-খুজিয়া (গালের ফুসকুড়ি যা বিড়ালের পায়ের ছাপের মতো দেখতে), মেকুরী-খোজ (পা-টিপে টিপে চলার ঢঙ), মেকুরী-ঘিলা (ঝোপ ওয়ালা ছোটো গাছ), মেকুরী-ছালি (পানের সঙ্গে খাওয়ার জন্য একপ্রকার গাছের ছাল), মেকুরী-নখা (লতাজাতীয় উদ্ভিদ),

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেকুরীমাহ (আলকুশি বা বিলাইখামচি নামক একপ্রকার ডাল জাতীয় শস্য)। বিড়ালের অবয়ব, তার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার ইত্যাদি অসমীয়া প্রকৃতি পরিবেশের নামকরণে এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সাধারণত ব্রতসংলগ্ন 'কথা' বা কাহিনিগুলো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে। অসমে প্রচলিত ব্রতকথাগুলো তার ব্যতিক্রম নয়। কামাখ্যা দেবালয় এবং নলবারী, বামুন্দি, হাজো আর শুয়ালকুচি প্রভৃতি অঞ্চলে বিবাহিতা, সন্তানবতী উচ্চবর্ণের মহিলারা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের সাত দিন 'সাথার ব্রত' বা 'সাথা বরত' পালন করেন। সাত দিনে সাতটি ব্রতকথা বা কাহিনি শোনানো হয় ব্রতিনীদের। এর তৃতীয় কাহিনিটি হল 'সাতো মেকুরী'র অর্থাৎ সাতো নাম্নী একটি বিড়ালের। কাহিনির মূল নির্যাস হল, একজন নারী শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী হতে পারেন কিন্তু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র রমণী হিসাবে বিবেচিত হবেন না যতক্ষণ না পঞ্চমাতৃকার প্রতি পরম শ্রদ্ধাভক্তি স্থাপন করতে পারছেন। সেটা অর্জন করার জন্যই তাঁকে নিয়মিত শুদ্ধভাবে এবং শুদ্ধ চিত্তে 'সাত বরত' পালন করতে হবে।[৬] কাহিনিটি একটি সদগুণসম্পন্ন বিড়াল 'সাতো'কে কেন্দ্র করে। এক ব্যবসায়ী স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সুখে ছিলেন। এই বাড়িতেই সাতো থাকত। পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি তার জন্যই বজায় ছিল। পুত্রবধূটি লোভে পড়ে একদিন শ্বশুরের এনে দেওয়া সাতটি 'লাছিম' মাছ (বৈজ্ঞানিক নাম Cirrhinus reba, বাটামাছ) একাই ভেজে খেয়ে ফেলেছিল আর চুরি করে খাবার দায়টা ঠেলে দিয়েছিল বিড়াল সাতোর দিকে। পঞ্চমাতৃকা এতে ক্ষুব্ধ হন এবং পুত্রবধূটির পাঁচটি পুত্র সন্তানকে জন্মের পরই তাঁদের কাছে নিয়ে যান। লোকেরা বলাবলি করে যে, ওই মহিলা নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলেছে। এভাবে ছয় নম্বর পুত্র সন্তানের জন্ম এবং তার অন্নপ্রাশনের দিন উপস্থিত হলে পঞ্চমাতৃকা বণিকের বাড়িতে গিয়ে সব কথা খুলে বলেন। সাতোর চিন্তায় কাতর বণিককে তাঁরা আশ্বাস দেন এই বলে যে, পুত্রবধূটি যদি নিয়ম করে সাত-ব্রত পালন করে তবে 'সাতো' এই পরিবারে আবার ফিরে আসবে।[৭] বিড়াল এখানে সংসারের সৌভাগ্যের প্রতীক, যার সঙ্গে উর্বরা শক্তির যোগ আছে (তুলনীয় বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যত্র প্রচলিত ষষ্ঠীব্রত)। একমাত্র বিবাহিত সন্তানবতী নারী ছাড়া এই কাহিনি আর কেউ বলবার অধিকারী নন – এমনটাই অসমীয়া সমাজে প্রচলিত। সংগ্রাহক অধ্যাপক নবীনচন্দ্র শর্মাকে কাহিনিটি বলেছিলেন নীলাচলের শ্রীযুতা বাসন্তী দেবী। প্রায় একই ধরনের আরেকটি ব্রতকাহিনি 'সুখর মুখ' সংগ্রহ করেছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী। তাঁর 'ব্যালাডস অ্যান্ড টেলস অফ আসাম' গ্রন্থে চন্দ্রমুখী কথিত এই কাহিনিটি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। এই সাত-ব্রতটি এখনও পালিত হয়। সুতরাং চুটীয়ারাজবংশ বা আহোম দিহিঙ্গিয়া রাজবংশের মতোই লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সূত্রে অসমীয়া বর্ণহিন্দু সমাজে 'বিড়াল' আজও সৌভাগ্যের প্রতীক।

অসমীয়া প্রবচনে বিড়ালকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই যে ব্রতকথাটির সম্বন্ধে বললাম, প্রাসঙ্গিক বোধে এই প্রবচনটির উল্লেখ করা যাবে, - 'ঘৈণীয়ে মাছ খায় বোন্দার মরণ'। একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো অর্থে এই প্রবচনটি ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ – পত্নী মাছ খায় কিন্তু দোষ পড়ে হুলো বিড়ালের ওপর। বিড়ালকে নিয়ে তৈরি অসমীয়া প্রবচনের দিকে আরও একটু তাকানো যাক। বিড়ালকে অসমেও 'বাঘের মাসি' বলে। সেই প্রসঙ্গেই একটি প্রবচন এরকম, - 'বাঘ চাব খুজিলে বিড়ালীকে চাবা।

বর মানুহ চাবলৈ আলিবাটলৈ যাবা।' – অর্থাৎ বাঘের স্বভাব, চালচলন ইত্যাদি সম্পর্কে যদি জানতে হয় তাহলে বিড়ালকে দেখলেই হবে। তেমনই গ্রামের রাস্তাতেই বড়োঘরের লোভী সুযোগ সন্ধানীদের আনাগোনা। অনেকে আবার এভাবেও বলেন, - 'বিড়ালী চালে বাঘ চাব নালাগে'। বাঘের সঙ্গে বিড়ালের অনেক কিছুতেই মিল – শুধু চেহারায় নয় কাজেকর্মেও। বিজ্ঞান বলে, প্রাণী দুটির ডি.এন.এ-তে ৯৫.৬% মিল। কিন্তু এই ডি.এন.এ-র ব্যাপারটা না জানলেও গ্রাম-অসমের বিজ্ঞজনেরা এদেরকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই এমন একটি লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন। তবে এই প্রবচনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ। এমন দুজন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত লোক, যাদের মধ্যে একজনের স্বভাব দেখেই অন্যজন কেমন হবে তা আন্দাজ করে নেওয়া যায় – এই বিশ্বাস থেকেই অসমীয়া সমাজে প্রবচনটির উৎপত্তি, মাধ্যম হয়েছে 'বিড়াল'। এর পরের প্রবচনটি হল, 'খাই দাই বোন্দা আঁতর'। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার পর বিড়াল নিঃশব্দে দূরে সরে যায়। এটা তেমন লোকদের লক্ষ্য করে বলা যারা চালাকি করে শুধু বেড়ে দেওয়া খাবার খেয়েই সরে পড়ে, কোনো প্রতিদান দেয় না। এই ধরনের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুবিধেবাদী মানুষদের চিনিয়ে দিতেই এই প্রবচন। মানুষের এরকম সুবিধেবাদী চরিত্র বিড়ালের প্রতীকে আরও কয়েকটি অসমীয়া প্রবচনে ধরা পড়ে। যেমন, –

‘কঁকাল ভগা বিড়ালী গোসাই ঘরত শোয়ে
গোন্ধোয়া মুখখন গাখীরেদি ধোয়ে।’

নিছক গদ্যে এর ভাষ্য – যে বিড়াল কোমর ভাঙার অজুহাতে পবিত্র মন্দিরে ঘুমোতে যায়, সে-ই তার এঁটো মুখ দুধ দিয়ে ধোয়। অর্থাৎ যে লোকটি সুযোগের ব্যবহার করে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, সে আবার সবার সামনে ভালো মানুষ সাজে। আবার আরেকটি প্রবচনে আছে, –

‘হাপাই আনে তিরি
বোন্দা ওপরতে গিরি।’

– হাপা (বনবিড়াল) বিয়ে করে ঘরে বউ নিয়ে এলো আর হুলো বিড়াল তার বিয়ে করা বউএর ওপর সর্দারি শুরু করল। এর লক্ষ্য এমন লোক যারা অন্যের উপার্জনের ওপর বসে খায়।[৮] লক্ষণীয়, পল্লীবিশ্বাসে বিড়াল প্রায় সব প্রবচনেই সুযোগসন্ধানী ও একটি ঋণাত্মক (restrictive) ট্যাবু।

এই মন্তব্যটি সুপ্রমাণিত এ-জন্য যে, অসমীয়া প্রবচনে ‘বিড়ালী ব্রত’, ‘ভিজা মেকুরী’, ‘জোলোঙার মেকুরী ওলোয়া’ ইত্যাদি খণ্ডবাক্যগুলো সহজলভ্য। তুলনাবাচক শব্দ হিসাবে আমাদের মনে পড়তে পারে ‘বিড়াল তপস্বী’, ‘ভেজা বেড়াল’, ‘ঝুলি থেকে বেড়াল বার হওয়া’ ইত্যাদি বাংলা প্রবচন বা বাগধারাগুলো। যে ধার্মিক সাজে অথচ অন্যায় কাজ করা থেকে কিছুতেই বিরত থাকতে পারে না, সে-ই বিড়াল তপস্বী বা সেধরনের আচরণই ‘বিড়ালী ব্রত’। ধূর্ত লোক যখন নিরীহ চেহারা ধারণ করে তখনই সে ‘ভিজা মেকুরী’। অসৎ উদ্দেশ্যটা যখন সর্বসমক্ষে প্রকাশ পায় তখনই ‘ঝুলি থেকে বিড়াল বেরোয়’ (জোলোঙার মেকুরী ওলোয়া)। ঝুলি থেকে বিড়াল বার হবার উৎস হিসাবে কেউ কেউ বলে থাকেন, অনেকদিন আগে কেউ শুয়োরের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে তাদের বস্তায় ভরে, জঞ্জাল ফেলার জায়গায় নিয়ে যান। সেখানে বস্তার মুখ খুলতেই একটা বিড়াল বেরিয়ে আসে। সেখান থেকেই অসমীয়া বাগধারাটি তৈরি হয়েছে। লোকবিশ্বাসে ‘শুয়োর’ আর ‘বিড়াল’ দুটোই ঋণাত্মক ট্যাবু – দুটোরই সহাবস্থান লোকসাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে একটি অনুসন্ধিৎসার জন্ম দেয় না কি?

‘শ্রাদ্ধত মেকুরী বান্ধা’ – শ্রাদ্ধবাসরে বিড়ালকে বেঁধে রাখা একটি অসমীয়া প্রবচন, তবু এর উৎপত্তি একটি লোকবিশ্বাস। সম্ভবত শ্রাদ্ধের জন্য তৈরি খাবারে যাতে মুখ দিতে না পারে সেজন্য বিড়ালকে বেঁধে রাখা হত। তা থেকে প্রবচনটির জন্ম। অযৌক্তিক সামাজিক রীতিনীতিকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না - এটা বিড়ালকে খাবার খেতে না দিয়ে বেঁধে রাখার মতোই ঠুনকো ব্যবস্থা। এই অর্থেই প্রবচনটি ব্যবহৃত হয়।[৯]

এই প্রসঙ্গে আরেকটি লোকবিশ্বাসের কথা বলে নিই। বিড়াল প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ভারতী গগৈ বরুয়া ‘মেকুরী’ (বিড়াল) প্রবন্ধে বলেছেন পল্লী অঞ্চলের একটি সংস্কারের কথা। কারও বাড়িতে যদি পোষা বিড়াল থাকে আর নবজাতকেরও আগমন ঘটে, তবে সেই নবজাতককে মাটিতে বা মাদুর বা চাটাই পেতে শরীর ভালো করে ঢেকে অথবা ছাতার মতো কোনো আচ্ছাদনের নিচে শুইয়ে রাখা হয়। অথবা বিড়ালকে বেঁধে রাখা হয়। নাহলে নাকি ঈর্ষাবশত পোষা বিড়ালটি নবজাতক শিশুটিকে আঁচড়ে বা কামড়ে দিতে পারে।[১০] অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে এভাবে বিড়ালকেন্দ্রিক আরও কিছু লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন নলবারী অঞ্চলের লোকেদের বিশ্বাস সকালবেলা বিড়াল যদি বারান্দায় বসে বারবার সামনের দুই পা দিয়ে নিজের মুখ ঘষে তবে বাড়িতে অতিথি আসে। আবার এটাও কথিত আছে রাতে বাড়ির পোষা বিড়াল কাঁদলে খুব শিগগিরই কোনো অমঙ্গল ঘটবে। ওই অঞ্চলে আরেকটি লোকবিশ্বাস হলো, কোনো মানুষের পায়ের তলা দিয়ে কালো বিড়াল চলে গেলে তার মৃত্যু আসন্ন (তথ্যদাতা জুরি শর্মা)। এর পাশাপাশি উজান অসমের গ্রামজীবনে ‘পহু শিকার’ বলে একটি রসাল কথা প্রচলিত আছে। ‘মেটিং সজিন’এ রাস্তার হুলো বিড়াল যখন আদরের গৃহপালিত মেনিটিকে গর্ভবতী করে তখন সেটা হরিণ শিকারের (পহু চিকার) সমতুল্য। আর পৌরজীবনে সেটাই একটা রসাল সাঙ্কেতিক শব্দ। অঞ্চল বিশেষে হলেও আধুনিক নরনারীর গোপন মিলনে বিড়াল এভাবে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১০ক]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অসমীয়া ‘ওমলা গীত’ (Nursery Rhymes) বা ছেলেভুলানো ছড়ায় ড. নির্মলপ্রভা বরদলৈ লিখেছেন, - ‘মেকুরী আহ আহ/ মিউ মিউ মিউ/ গাখীর আছে, মাছ আছে/ আরু আছে ঘিঁউ।’ অসমীয়া লোকসাহিত্যের এই পর্যায়ে বিড়ালের উপস্থিতি যথেষ্ট। অসমীয়া গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে বিড়াল সম্বন্ধীয় একটি ছড়া বা প্রবাদ বাক্য (‘ফকরা যোজনা’ বা ‘ওমলা গীত’ হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে) এক্ষেত্রে বেশ জনপ্রিয়। উজান ও ভাটিভেদে তার পাঠভেদও পাওয়া যায়। ছড়াটি উল্লেখ করি –

‘বর ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়
ঢাকন পেলাই পঁইতাভাত, পোড়া মাছ চুর করি খায়।’
এর ভাবানুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় –
‘ধনীর ঘরের বিড়াল গরিবের বাড়ি যায়
ঢাকনা ফেলে পান্তাভাত, মাছপোড়া চুরি করে খায়।’

কিন্তু ব্যঞ্জনার্থ হল, সমাজের উঁচুতলার লোকেরা বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সুযোগের ব্যবহার করে চুপিচুপি গরিব মানুষগুলোর অন্দরমহলে ঢোকে এবং ঘরের আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। ছড়াটির এই পাঠ উজান অসমে সহজলভ্য। কিন্তু কামরূপ, রঙিয়া, নলবারী ইত্যাদি অঞ্চলে এই ছড়াটির পাঠভেদ এরকম, -

‘বর ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়
ভজা মাছর চরু ঢাকন মেলি চায়।’ (তথ্য দাতা বৈকুণ্ঠ রাজবংশী)

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিটি বদলে গেছে। পান্তাভাত আর পোড়া মাছের বদলে এসেছে ভাজা মাছ। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল কড়াই বা পাত্রের ঢাকনি ফেলে দিয়ে খাবার পরিবর্তে বিড়াল এখানে ঢাকনিটা খুলে দেখছে, ফেলছে না বা খাচ্ছেও না। তৃতীয় আরেকটি পাঠ আছে বরপেটা, ধুবড়ি অঞ্চলে, -

‘বর ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়
কলিয়ার মেকুরী নুনেভাতে খায়।’ (তথ্য দাতা অভিজিৎ কুমার দত্ত)

‘কলিয়া’ হল কালাপানি বা দ্বীপান্তরের ব্যক্তি, অতয়েব সে অপাংক্তেয়। তার কপালে জোটে নুনভাত, ‘নিমখ’ শব্দটি কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়নি। পয়সাওয়ালা লোক বা অপরিচিত ব্যক্তি – যে-ই হোক না কেন, সে গরিবের ঘরে এলে নুনভাতেই খাবে। কামরূপ হোক বা বরপেটা – দুটি পাঠভেদ কিন্তু শিশু মনোরঞ্জনের জন্য ‘ওমলা গীত’ বা ছড়া হিসাবেই বহু ব্যবহৃত। তাছাড়া সামাজিক ব্যবহারের পার্থক্যটাও এখানে লক্ষণীয়। কখনও মাছ পোড়া আবার কখনও মাছ ভাজা অথবা কড়াইয়ের ঢাকনি ফেলে দেওয়া বা তুলে দেখা হচ্ছে দীর্ঘলালিত ও প্রচলিত পারিবারিক তথা সামাজিক ব্যবহারের প্রতিচ্ছবি। প্রখ্যাত অভিনেত্রী আইমি বরুয়ার একটি ‘ওমলা গীত’-এর ভিডিওতে এর আরেকটি পাঠভেদও পাওয়া যায়, - ‘বড় ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়/ ঢাকন দাঙি পঁইতা ভাত/ পোরা মাছ চুর করি খায়/ ভা-কুতকুত, ভা-কুতকুত।’ এখানে আবার কড়াইয়ের ঢাকনিটা ‘তুলে’ (দাঙি) দেখছে বিড়াল। শিশুকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসানোর জন্য বাংলাতেও সোনামনির ঘরে বিড়াল আসার এরকম খেলা অনেক মা-ই খেলে থাকেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ছড়াটি একটি আধুনিক অসমীয়া গানের উৎসও। শ্রদ্ধেয় খগেন মহন্ত গাইবেন বলে আরেকজন প্রথিতযশা লেখক তথা তাঁর আত্মীয় কেশব মহন্ত লিখলেন, - ‘বরঘরর মেকুরী সরু ঘরলৈ যায়/ সরুঘরর মানুহবোরে চুকত চিনি পায়/ সহজ সহজ মানুহবোরে খোজত চিনি পায়।’ এখানে ‘মেকুরী’ বা বিড়ালটি হতে পারে একজন বিবাহিতা মহিলা। তিনি যখন গ্রামে এলেন কারও পুত্রবধূ হয়ে, তখন গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো তার চলন-বলনেই বুঝতে পারে যে সে বড়ো লোকের মেয়ে। আরেকটি অর্থ এবং যেটা প্রচলিত লোক-মানসিকতার সঙ্গে এই প্রবচনের মাটির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যোগ স্থাপন করে, তা হল – গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের বাড়িতে উঁচুতলার লোকেদের সন্দেহজনক আনাগোনা যার কারণ সহজ সরল মানুষগুলোর বুঝতে বাকি থাকে না। দুটো ক্ষেত্রেই 'বিড়াল'রূপী বড়ো মানুষের ঋণাত্মক ক্রিয়াশীলতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অসমের পল্লীজীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় কেশব মহন্তর গান ও কবিতার কথাকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছিল। অসমীয়া পল্লীসমাজ, নানা লোকব্যবহার ও লোক-মানসিকতা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নমুনা এই গানটি। এই যে একই প্রসঙ্গের নানামুখী পরিবর্তন সেটাকে আমরা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'variables'এর নমুনা হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। শুধু লোককথা নয়, লোকবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত কাহিনি বা প্রবাদ-প্রবচন সংলগ্ন কাহিনিও পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ একজায়গা থেকে আরও এক জায়গায়, একমুখ থেকে শতমুখে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মূল কাঠামোটা বা অন্তর্গত চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা (function) স্থির (constant) থাকলেও কার্যের (action) পরিবর্তন হয়।[১০খ] এখানেও 'বিড়াল' চরিত্রের স্বরূপ কিন্তু স্থির। সে সুযোগসন্ধানী, সে লোভী – পরের, বিশেষ করে গরিবঘরের অন্দরমহলের দিকে তার নজর। যেন সে-ই 'ছোঁই ছোঁই যাইসি বাক্ষ নাড়িয়া'। দূর-দূরান্তের সংযোগ কি এখানে দেখা যাচ্ছে না?

অসমীয়া লোককথা বা নীতিকথা অর্থাৎ 'সাধুকথা' গুলোতে[১১] 'বিড়াল' তার সহজাত ক্ষমতা নিয়ে হাজির। বিড়ালের নানা স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই লোককথাগুলো রচিত হয়েছে। কিছু আছে সংগৃহীত এবং নতুনভাবে রচিত আর কিছু আছে অনূদিত। প্রথম ধরনের লোককথা রচনায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর 'বুঢ়ী আইর সাধু' বা বুড়িমার গল্পকথা এক্ষেত্রে অনন্য। এর সঙ্গে আছে 'সাধুকথার কুকি', বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদে একে বলা যেতে পারে 'নীতিকথার ঝুড়ি'। এছাড়া ঈশপের গল্প, তেনালিরামার গল্প অসমিয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'বুঢ়ী আইর সাধু' বইতে বিড়াল চরিত্র আছে 'মেকুরীর জীয়েকর সাধু' বা বিড়ালের মেয়ের গল্পটিতে। সেখানে সন্তানসম্ভবা বিড়ালটি তার মালকিনের কাছে ভাজা মাছ খাবার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল। মালকিনও তখন সন্তানসম্ভবা। সে বিড়ালকে মাছ যোগাড় করে আনার পরামর্শ দেয়। বিড়াল এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে মাছ এনে দিতে শুরু করল। কিন্তু বদলে জুটল শুধু কাঁটা, মাছগুলো মালকিনই খেয়ে ফেলত। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিড়াল মালকিনকে শাপ দিল – 'তোর পেটেরটা আমার পেটে আর আমার পেটেরটা তোর পেটে যাক।' ফলে বিড়ালের হল দুটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান আর মালকিনের কোলে এলো দুটো বিড়ালছানা। 'সাধুকথার কুকি'তে সামান্য বিড়াল প্রসঙ্গ আছে 'পণ্ডিতমশাই' গল্পটিতে। কিন্তু 'বরাগী মেকুরী' বা 'বিড়াল তপস্বী' গল্পে বিড়ালের নেতিবাচক স্বভাবের গল্প আছে। এই গল্পে বিড়াল প্রথমে ভক্তপ্রাণ লোক হিসাবে শালিক-কবুতর ইত্যাদি পাখিদের নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে রওনা দেয়। মুখে তার সবসময় কৃষ্ণনাম। পাখিরা তার আচরণে বিশ্বাস করে সঙ্গী হয়। কিন্তু রাস্তায় বিশ্রাম নেবার ছলে বিড়ালটি পাখিদের এক এক করে খেয়ে ফেলে।

নগাঁওর মাথন ভূঞা শিশুপাঠ্য দুটি 'সাধুকথা'র বই লিখেছেন – 'কন মইনার সাধু' আর 'জোনবাইর দেশর সাধু'। দ্বিতীয় বইতে দুটি কাহিনি আছে বিড়ালকে নিয়ে। সেখানে ছোটো মেয়ে আর তার আদরের বিড়ালের স্নেহের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে যা বড়োদের আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে। গল্পদুটির একটি 'মিলির মরম' (মিলির ভালোবাসা) আর অন্যটি 'চন্দ্রমুখীর কাহিনী'। মিলি আর চন্দ্রমুখী দুটি দুই গল্পের বিড়াল। প্রথমটিতে কুকি নামনী মেয়েটির সৎ-মা হিংসাবশত মিলিকে কুকির অজান্তে বস্তায় ভরে নদীর ওপারে রেকেহ আসে। কিন্তু কিছুদিন পর কুকির স্নেহের টানে মিলি একটি কচ্ছপের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তার পিঠে চড়ে নদী পার হয় ও এক দৌড়ে কুকির কাছে চলে আসে। এটা দেখে কুকির সৎ-মায়ের ভুল ভাঙে, তিনি কুকিকে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতে শুরু করেন। এরকমই মানবতার গল্প 'চন্দ্রমুখীর কাহিনী'। সেখানে চন্দ্রমুখী মুমুর আদরের বিড়াল। মুমুর বান্ধবীর চিম্পির খুব শখ – তারও ওরকম একটি বিড়াল চাই। চিম্পির মায়ের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। সুযোগ বুঝে মুমুর বিড়ালটিকেই তিনি চুরি করে চিম্পিকে এনে দিলেন। চিম্পি প্রথমে একটু আপত্তি করলেও মুমুর বিড়ালটিকেই নিজের বলে ভাবতে শুরু করল আর তার সঙ্গে খেলাধুলা করতে শুরু করল। কিন্তু চন্দ্রমুখীর তাতে মন নেই। সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। মুমুও ওদিকে মনমরা। চিম্পির জন্মদিনে মুমু গেল তাদের বাড়িতে আর অমনি চন্দ্রমুখী লাফিয়ে চলে গেল মুমুর কাছে। তখন সব পরিষ্কার হল মুমুর কাছে। ওদিকে চিম্পির মা চন্দ্রমুখীর আঁচড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেন।[১২] দুটো গল্পেই মানুষ ও প্রাণীর পরিবাশগত সম্পর্ককে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেখানো হয়েছে। এরকম আরেকটি মানবীয় সম্পর্কের গল্প অসম জাতীয় বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির অসমীয়া ভাষা শিক্ষার বইতে 'পখীর মেকুরী পোয়ালি' শীর্ষক একটি নীতিশিক্ষামূলক পাঠে আছে।

আরেকজন অসমীয়া শিশুসাহিত্য লেখক রত্নেশ্বর বরা 'দৈনিক অসম' পত্রিকায় 'নিগনি আরু মেকুরী' অর্থাৎ 'ইঁদুর ও বিড়াল' শীর্ষক একটি 'সাধুকথা' লিখেছিলেন, পরে তা একটি বইতে সংকলিত হয়। নীতিকথা জাতীয় এই গল্পে শিকারির জালে ধরা পড়া একটি বিড়ালকে ইঁদুর তাকে না-খাওয়া এবং অন্যান্যদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার শর্তে জাল কেটে মুক্ত করেছিল। মুক্তি পাবার পর বহুদিন বিড়াল তার শর্ত পালন করেছে। কিন্তু একদিন তার বাচ্চাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে ইঁদুরকে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। ইঁদুর তার মতলব বুঝতে পেরে বিড়ালের সম্পর্ক ছেড়ে চলে যায়।[১৩] তবে এই জাল কেটে শক্তিমান শত্রুকে মুক্ত করার গল্প ঈশপের কাহিনিতে আছে এবং অসমীয়াতে তা অনূদিত হয়েছে। সেই গল্পটি হল 'সিংহ ও ইঁদুর'। 'ঈশপের গল্প' থেকে বিড়াল সম্পর্কিত প্রায় সব গল্প অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তালিকায় থাকবে বিখ্যাত 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে' প্রবাদের উৎস গল্প 'মেকুরীর ডিঙিত টিলিঙা', বাঁদরের পিঠেভাগের পরিচিত গল্প 'দুটা মূর্খ মেকুরী' (দুই মূর্খ বিড়াল) ইত্যাদি। পঞ্চতন্ত্রের সেই বিখ্যাত মুনি ও ইঁদুরের কথা নিয়ে রচিত 'পুনর্মূষিকভব' গল্পটিও অসমিয়াতে অনূদিত হয়েছে। আর আছে দক্ষিণের তেনালিরামার গল্প যা অসমীয়াতে অনূদিত হয়েছে, ছোটোদের জন্য ইউ টিউব ভিডিও তৈরি করাও হয়েছে। বিড়াল নিয়ে লেখা তেমনই একটি গল্প 'গাখীর নোখোয়া মেকুরী' অর্থাৎ যে বিড়াল দুধ খায় না। এটিও নীতিকথা মূলক গল্প যেখানে বক্তব্য হল, আরামই কষ্টের মূল, পরিশ্রমে কাজের সাফল্য আসে। গল্পটিতে তেনালিরাম রাজ্যে ইঁদুরের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় রাজার আদেশে অন্যান্য সবার মতোই বিড়াল পুষতে শুরু করেছিল। রাজ-ব্যবস্থায় বিড়ালগুলোর জন্য বরাদ্দ ছিল খাঁটি দুধ। সেই দুধ খেয়ে সবার বিড়াল মোটা আর অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। তেনালি তখন উপায় বার করে নিজের বিড়ালকে গরম দুধ দেওয়া শুরু করল। বিড়াল তখন আয়েশ করা ছেড়ে গরম দুধ খাবার চেয়ে ইঁদুর মেরে খাওয়াই ভালো মনে করল। একদিন রাজা যখন বিড়ালদের অবস্থা দেখতে চাইলেন তখন তেনালি প্রমাণ করে দিল যে তার বিড়াল সবচেয়ে ভালো, কারণ সে দুধ খায় না।[১৪]

অসমের কছারি, বোড়ো, রাভা ইত্যাদি উপজাতি মানুষের সংস্কৃতিতেও বিড়ালকে নিয়ে কিছু জনপ্রিয় কাহিনি প্রচলিত। রাভাদের মধ্যে জনপ্রিয় বাঘ আর বিড়ালের ঝগড়ার কাহিনিটি বেশ মজার। একদিন বাঘ আর বিড়াল মিলে একটা হরিণ শিকার করে আনল। বিড়াল সেটা রান্না করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে বাঘ তাকে কোনো লোকের বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসতে বলল। বিড়াল আগুন আনতে গিয়ে সেখানে পোড়া মাছ পেয়ে আর ফিরল না। রাগে বাঘ গরগর করতে লাগল। এই ব্যাপার দেখে বিড়াল নিজের বিষ্ঠাটাও মাটিচাপা দিয়ে চিহ্ন মুছে ফেলল যাতে বাঘ তাকে খুঁজে না পায়। সেই থেকে বাঘের মাসি হয়ে গেল চরম শত্রু।[১৫]

হাফলঙের বিআতে (Biate) উপজাতিদের মধ্যেও বিড়ালের উপকথা প্রচলিত আছে। এরকম একটি কাহিনিতে একবার বিড়ালের সঙ্গে মুরগির বন্ধুত্ব হয়। বিড়াল তার বাড়িতে যেতে চায়। মুরগি বিড়ালের বদ মতলবের কথা আন্দাজ করে ছানাপোনাদের নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। কিন্তু বিড়ালকে বাড়িতে আসতে বলে দেয়। বিড়াল তাদের বাড়িতে না পেয়ে ফিরে আসে। পরদিন আবার মুরগি তাকে কথা দেয় যে রাতে আগুনের পাশেই তারা থাকবে বিড়ালের অপেক্ষায়। কিন্তু সেরাতেও বিড়াল তাদের পায় না। তবে সুযোগ এসে যায় এক রাতে। বিড়াল মুরগি আর তার বাচ্চাদের খেতে উদ্যত হলে মুরগিটি তাকে দুটি ডিম এগিয়ে দিয়ে বাচ্চাদের ছেড়ে দিতে বলে। বিড়াল ডিম দুটো আগুনে সেদ্ধ করে দিতে বলে মুরগিকে। সেই মতো সেগুলো আগুনে দেওয়া হল। আগুনের আঁচে ডিম ফেটে বিড়ালের চোখ অন্ধ হয়ে গেল। সে অপকর্মের শাস্তি পেল।[১৬]

আধুনিক অসমীয়া কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে বেশ কিছু লেখায় বিড়াল প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। 'সধয়াপুরর সোনর মেকুরী' উপন্যাসের বিষয় আহোমের হাতে চুটিয়া রাজ্যের পতন। আগে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপন্যাসে কুবেরের কাছ থেকে সম্পদ হিসাবে চুটিয়াদের সোনার বিড়াল লাভের প্রসঙ্গ আছে।[১৭] সাহিত্য ডট অর্গ-এর দ্বাদশ বর্ষ দশম সংখ্যায় (২০২৩) অনামিকা বরুয়া উপন্যাসটির একটি আলোচনা করেছেন। প্রবীণা শইকিয়ার 'অবিনাশী স্বপ্ন' গল্পে একটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে কালো বিড়াল এসে দেখা দিয়েছিল। দিবাকর নাটকে রামচন্দ্র সেজেছিলেন;

সীতারূপী রমেশ তাকে মালা দিয়ে বরণ করতে এলে তিনি রমেশের চোখের তারায় কালো বিড়ালের সর্বনাশী দৃষ্টি দেখতে পান।[১৮] আরেকজন গল্পকার অপু ভরদ্বাজ 'কথায় কথায়' শিরোনামে একটি গল্প লিখেছেন। এখানে 'মেকুরী চাং' জায়গাটার নামকরণ কীভাবে হল সেই বৃত্তান্ত আছে। ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে দঞিও গাম নামে এক ব্যক্তি এক পোড়ো বাড়িতে অনেকগুলো লোমওয়ালা বিড়াল দেখার গল্প ফেঁদে বসেছিল বন্ধুর কাছে। সেই গল্পই নানা জনের সারজল পেয়ে এমন দাঁড়াল যে দঞিওর বিড়ালগুলো মায়াবী, তান্ত্রিকের সেবা করার জন্য যম এদের পাঠিয়েছিল। তান্ত্রিক মরার পর সেগুলো আবার পাতালে চলে গেছে। এভাবেই দঞিওর চাংঘরের (মাটি থেকে অল্প উঁচুতে তৈরি বাড়ি) বিড়াল লোককথার ভিতর দিয়ে স্থাননামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।[১৯] সুলেখক ভূপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য 'সাতসরী' পত্রিকার ২০১৩-র এপ্রিল সংখ্যায় 'বজারত এইজনী কার মেকুরী?' শীর্ষক একটি গল্প লিখেছিলেন। রাস্তার একটি বিড়ালকে দেখে কয়েকজন বন্ধুর কথপকথনে গল্পটি দানা বেঁধেছে। এখানে বিড়াল আর ঠানুদের প্রেমিকা রাম্না সমার্থক হয়ে গেছে। এরকম ভাবে বেশ কিছু গল্পেই 'বিড়াল'কে প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এখন এই সময় ডিজিটাল মাধ্যমের সাহিত্য আলোচনাতেও বিড়াল ব্রাত্য নয়। অসমীয়াত কথাবতরা, সাহিত্য ডট অর্গ, নীলাচরাই ইত্যাদি ই-ম্যাগাজিন বা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বিড়াল সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা পাওয়া যায়। ২০১৮-তে 'অসমীয়াত কথাবতরা'র ফেসবুক পাতায় রশিদা রহমান বিড়াল নিয়ে তাঁর একটি অভিজ্ঞতা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বিড়াল পুষতেন, একে একে এগারোটা হয়েছিল সবগুলোর নাম ছিল আলাদা আলাদা – বগেরা, মুগা, কলি, শ্বেরু ইত্যাদি। সারাদিন এদের পিছনেই সময় কাটত। তবে লেখিকার ছোট্ট মেয়েটি একদিন একটি বিড়ালের লেজ ধরে টানায় সে আঁচড়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁদের বিড়ালপ্রীতি আর আগের মতো থাকেনি। একই বছরে অন্য একটি লেখায় মাধুরী গগৈ জানিয়েছিলেন বাড়ির বিড়াল – সে সাদা হোক, কালো হোক, যেরকমই হোক – তাকে ভালোবাসার কথা। বিশেষ করে কালো বিড়াল সম্বন্ধে তাঁর অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন পাঠক-পাঠিকার কাছে। কালো বিড়াল কেউ নিতে চায় না, সবাই সাদা বা বাদামি অথবা সাদা-বাদামিতে মেশানো রঙের বিড়ালই পছন্দ করে। মাধুরী দেবীর বাড়িতে একদিন এসে আশ্রয় নেয় সন্তানসম্ভবা মেনি বিড়াল। চারচারটে সন্তানের জন্মও হয় – এর দুটো কালো। মা তার একটি কালো বিড়াল নিয়ে একদিন কোথায় যেন চলে যায় রয়ে যায় অন্য কালোটি - 'মিমি'। লেখিকা ভেবে পান না, অমন সাদা মা-বিড়ালের সন্তান কেন কালো হল। একদিন একটি কালো হুলো এসে মিমির পাশে বসল, তাকে আদরও করল, সঙ্গে করে নিয়েও গেল। তখন বোঝা গেল মিমির কালো চেহারার রহস্য। মিমির বাবাটি কিন্তু সহজে লোকসমক্ষে আসে না, পালিয়ে বেড়ায়, চোখেমুখে একটু ভয়-ভয় ভাব। এটা দেখে লেখিকা একটি অসমীয়া প্রবচনের আদলে কবিতা লেখেন, - 'ফটা হওক চিটা হওক পাটর টঙালি/ ক'লী হওক মলী হওক মিমি আমার মেকুরী।' ছেঁড়া হলেও পট্টবস্ত্র যেমন মূল্যবান তেমনই কালো হলেও মিমি বিড়াল লেখিকার একান্ত আপন।[২০] সাহিত্য ডট অর্গ-এর পাতায় আর্নেস্ট হেমিঙওয়ের 'ক্যাট ইন দ্য রেইন' গল্পটির অনুবাদ করেছেন নাজমা বেগম (দ্বাদশ বর্ষ, নবম সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩)। এখানে আমেরিকান দম্পতীর বিড়ালপ্রীতি ও বর্ষণসিক্ত দিনে হোটেল ম্যানেজারের সহানুভূতির ছবি আছে। আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মনে বিড়াল সম্বন্ধে কিছু অপধারণা আছে। যেমন বিড়াল রাস্তা কাটলে অমঙ্গল হয়। নীলাচরাই নামে একটি আন্তর্জাল পত্রিকায় সুশান্তকৃষ্ণ শর্মা এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন (১১ জুলাই, ২০১৮) 'বরঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ গ'লেই যেনিবা, তাতেনো কি অমঙ্গল হ'ল' শিরোনামে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন, একটি কালো বিড়াল রাস্তা পার হয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ায় কলেজ ফেরত মেয়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে। এমনকি তিনি জায়গাটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এলেও ওই শিক্ষিত মেয়েরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। প্রতিবেদনের শেষে তাঁর প্রশ্ন ছিল 'এই সঙ্কীর্ণতা থেকে আধুনিক মানুষ কবে মুক্ত হবে?' প্রসঙ্গত বলা যায়, ২০১৮তে আন্তর্জালে এই যে বিড়াল নিয়ে কিছু লেখালিখি তার পেছনে আছে 'আন্তর্জাতিক বিড়াল দিবস' পালনের উপলক্ষ। বন্যপ্রাণী কল্যাণ আন্তর্রাষ্ট্র পুঁজি (International Fund for Animal Welfare) ২০০২ সাল থেকে ৮ আগস্টের দিনটি বিড়াল দিবস হিসাবে পালন করে আসছেন।

যাইহোক, এই আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম, সোনা-রূপার বিড়াল সম্ভবত আহোম রাজবংশ বা চুটীয়া রাজবংশের বংশানুক্রমিক মঙ্গলচিহ্ন ছিল। এর আগে কামরূপ বলি বা প্রাগজ্যোতিষপুর, যে রাজবংশই (অসুর হোক, বর্মন

হোক বা পাল হোক) এখানে রাজত্ব করুক না কেন, কেউই এমন কোনো মঙ্গলচিহ্ন বহন করে চলেছিলেন কি না, তা জানা যায় না। তাই আমাদের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে চুটীয়া এবং আহোম রাজাদের সংঘাতের কাল থেকে – কারণ সেটা অসমীয়া 'বুরঞ্জী' লেখার কাল, আর সেখানেই সোনার বিড়ালের প্রসঙ্গ প্রথম দেখতে পাওয়া যায় এবং এটাকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'টোটেম' রূপে শনাক্ত করা যায়। কছারি, বোড়ো, কার্বি, ডিমাসা ইত্যাদি ইন্দোমঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিতে হয়তো একই ভাবে বিড়াল 'টোটেম' হিসাবে উদ্ভুত হয়েছিল। কারণ বিড়ালকে না মারা এবং কোনোভাবে মেরে ফেললে সোনারূপার বিড়াল দেবতার কাছে উৎসর্গ করা এই 'কিরাত' বা কছারি (ইন্দো-মোঙ্গলীয়) জনগোষ্ঠীর বংশগত শুভাশুভ ধারণার অন্তর্গত। আহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর সুবৃহৎ অসমীয়া সমাজ গড়ে ওঠার কালেও বিড়াল কিন্তু এই সাযুজ্যের জন্যই লোকসংস্কৃতির প্রধান 'মোটিফ' হিসাবে তার স্থান ধরে রেখেছিল। আর 'সোনার বিড়াল' টোটেম-এর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বিড়াল সম্বন্ধীয় যাবতীয় 'ট্যাবু'রও পথ চলা শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভেতরেই। সেখানে যোগাত্মক ট্যাবু (positive taboo) আর ঋণাত্মক ট্যাবু (restrictive taboo) দুটোই ছিল। কিন্তু লোকসংস্কৃতির নিয়ম মেনেই কালক্রমে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা এবং অন্য জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাবে অসমীয়া জনজীবনে বিড়াল মোটিফ হিসাবে বজায় থাকলেও যোগাত্মক ট্যাবুগুলো অন্তর্হিত হয়েছে আর অন্য গোষ্ঠীর সমধর্মী লোকবিশ্বাসের প্রভাবে ঋণাত্মক ট্যাবুগুলোই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। নিচের ছবিটা বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে পারে, - মনে করা যাক 'ক' এবং 'খ' দুটো জনগোষ্ঠী আছে, আলাদা ভাবে তাদের টোটেম এবং নির্দিষ্ট লোকবিশ্বাস যুক্ত ট্যাবুও আছে, -

'ক' জনগোষ্ঠী	'চ' টোটেম	'ট' ১ লোকবিশ্বাস
		'ট' ২ লোকবিশ্বাস
		'ট' ৩ লোকবিশ্বাস
'খ' জনগোষ্ঠী	'ছ' টোটেম	'ঠ' ১ লোকবিশ্বাস
		'ঠ' ২ লোকবিশ্বাস
		'ঠ' ৩ লোকবিশ্বাস

এখন কালক্রমে 'ক' ও 'খ' জনগোষ্ঠী দুটর মধ্যে কোনোকালে বিরোধ বা সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলে সমধর্মী বা সমরূপ যোগাত্মক লোকবিশ্বাসগুলো ক্রমে হারিয়ে গিয়ে ঋণাত্মক বা Restrictive লোকবিশ্বাসগুলোই (folk-belief) প্রাধান্য লাভ করে। হয়তো দেখা গেল 'ট' ১ ও ২ 'ঠ' ২ ও ৩ এর সমধর্মী যোগাত্মক (Positive) ট্যাবু। ফলে সম্প্রীতি বা বিরোধিতার সম্পর্কে 'ক' জনগোষ্ঠীতে 'ট' ৩ এবং 'ঠ' ১ ঋণাত্মক লোকবিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেল। সেই সূত্রেই সচরাচর আমরা নিষেধাত্মক ট্যাবু নিয়েই অসমীয়া সাহিত্যে সমাজে বিড়ালের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যেমন, একটু আগেই সুশান্তকৃষ্ণ শর্মার প্রতিবেদনে দেখেছি বিড়ালের রাস্তা কাটা ও কলেজ-যাত্রী ছাত্রীদের ভয় ও আশঙ্কার ছবি, যেন তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটবে। তেমনই অপু ভরদ্বাজের গল্প বা প্রবীণা শইকীয়ার গল্পে মায়াবী আর অশুভ সংকেতময় কালো বিড়াল। আবার দৈনন্দিন ভাবনায় বিড়াল সম্পর্কীয় ঋণাত্মক ট্যাবুকে লোকপ্রচলন হিসাবে স্মরণ করেছেন মাধুরী দেবী অথবা রশিদা রহমান তাঁদের বক্তব্যে। বোড়ো, রাভা, কছারিদের জনজাতীয় কথাতেও বিড়াল ঋণাত্মক ট্যাবু। এমনকি 'সাধুকথা', 'ফকরা যোজনা' এবং ঈশপ বা পঞ্চতন্ত্রের কিছু জনপ্রিয় কাহিনীতে, মেকুরীকণীয়া-মেকুরীখুজিয়া-মেকুরীখোজ ইত্যাদি প্রচলিত শব্দে আর 'বিড়ালী ব্রত', 'ভিজা মেকুরী'র মতো নানা প্রবচন বাক্যে ওই ঋণাত্মক ট্যাবুরই প্রাধান্য। আর আছে লোকবিশ্বাস – সেখানেও ঋণাত্মক ট্যাবুর বাড়বাড়ন্ত। যোগাত্মক ট্যাবু রয়ে গেছে 'সাথ বরত', লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'মেকুরীর জিয়েকর সাধু'র মতো কয়েকটি নীতিকথামূলক লেখায় এবং ঘরে অতিথি আসা সম্পর্কিত দু-একটি লোকবিশ্বাসে।

এটা কবে হয়েছে বা কীভাবে হয়েছে তা নির্দিষ্ট ভাবে বলাটা অসম্ভব। তবে এর পেছনে সমাজ-সংগঠনের যে ইতিবৃত্ত থাকে তার অনুসন্ধান আকর্ষণীয় হতে বাধ্য। আমরা সহজেই বিড়াল তপস্বীকে, ভেজা বিড়ালকে শুধু অসম নয়, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই খুঁজে পেতে পারি। কালো বিড়ালে অশুভ আত্মা বা ডাইনি ভর করে এই বিশ্বাস থেকে যে ভয়ের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উৎপত্তি এবং তার প্রতিফলন যে ঋণাত্মক ট্যাবু সেটাতো শুধু অসম বা ভারতবর্ষ নয়, আমরা তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ইজিপ্টে পৌঁছেও তাকে খুঁজে পাবো। ষোড়শ শতক থেকে বিভিন্ন পাশ্চাত্য উপকথায় বিড়াল সম্পর্কে মানুষের এই বিশ্বাস একটা রূপ পেতে শুরু করে। আবার ভারতীয় জ্যোতিষচর্চায় রাহু অশুভ গ্রহ আর কালো বিড়াল সেই রাহুর বাহন। আমরা তো জানি, প্রাগজ্যোতিষপুর ছিল ভারতীয় জ্যোতিষচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। যখন প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষে জ্যোতিষের চর্চা হত তখন কি 'কালো বিড়াল' লোকচেতনার বাইরের কোনো প্রাণি ছিল? অথবা তন্ত্রচর্চার কেন্দ্র কামরূপ কামাখ্যা? এখনও গুয়াহাটির কাছাকাছি আজারা অঞ্চলে 'প্রেতবিদ্যা' (Demonology) সম্পর্কে প্রচলিত লোকবিশ্বাসে 'কালো বিড়াল' ঋণাত্মক ট্যাবু নিয়েই উপস্থিত। কামরূপ বা অসমের অন্যত্রও এই ধরনের প্রচলিত লোকবিশ্বাস বিদ্যায়তনিক চর্চায় ধরাও পড়েছে।[২১] তাহলে কি সেই 'প্রাচীন' কালেই বিড়াল এতদঞ্চলে 'টোটেম' সত্তা গড়ে তুলেছিল? তখনই কি উদ্ভব হয়েছিল এই টোটেম সম্পর্কিত কিছু যোগাত্মক ট্যাবুর সঙ্গে ঋণাত্মক ট্যাবুগুলোর? কোনো বিশেষ ক্রিয়াচারে অশুভ বা নিষেধাত্মক সত্তাটিই কি ক্রমবিলীয়মানতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল? যুগে যুগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কি অসমে সেই উত্তরাধিকারকেই বয়ে নিয়ে চলেছে? হয়তো সেই প্রাচীনকাল থেকেই একাধিক নৃগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাসের বিরোধ বা সম্প্রীতিমূলক সম্মিলনে ট্যাবুগুলো নানা রূপে সমাজদেহে অবস্থান করছে এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে! হয়তো কোনো সন্ধানী দৃষ্টির কাছে ধরা পড়বে সেই অকথিত বিড়াল বা 'মেকুরী' রহস্য। অথবা অসমের লোকঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত বিড়াল সম্পৃক্ত লোককাহিনি, প্রবচন ইত্যাদির অবয়ববাদী বিশ্লেষণ আমাদের কাছে এনে দেবে নতুন কোনো ভাবনা-প্রস্থান। তবে অসমীয়া পল্লী এবং পৌর জনজীবনে বিড়াল যে এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধ্বজাবাহক, আপাতত এই তাৎপর্যে এসে আমরা ইতি টানতে পারি।

Reference:

১. সদরামিন, হরকান্ত বরুয়া, (১৯৯০) সূর্যকুমার ভুঞা (সম্পা.), 'অসম বুরঞ্জী', বুরঞ্জী আরু পুরাতত্ত্ব বিভাগ, পৃ. ২৩
২. চতুর্দশ শতকে চুটীয়া রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল বর্তমান শদিয়া থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ সংলগ্ন অঞ্চল পর্যন্ত। এখনকার
লখিমপুর, ধেমাজি, তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড়ের কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানীর নাম ছিল সধয়াপুর, রাজাদের অধিষ্ঠান ছিল কুণ্ডিলনগরে। রাজা নন্দীশ্বর থেকে ধীরনারায়ণ পর্যন্ত রাজবংশের কথা জানা যায়। রাজবংশের সৌভাগ্য-সম্পদ এবং উত্তরাধিকার হিসাবে ছিল সোনা ও রূপার বিড়াল, সোনা ও রূপার দন্ড-ছত্র আর সোনা ও রূপার 'চাল-পীরা' বা জলচৌকি।
৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪
৪. ভুঞা, সূর্যকুমার, (সম্পা.), (২০১৪) সাতসরী 'অসম বুরঞ্জী', দ্বিতীয় প্রকাশ, মণিমাণিক, গুয়াহাটি, পৃ. ৪৭-৪৮
৫. তদেব, পৃ. ৩২
৫. ক. চুটীয়া জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি আরু ইতিহাস, https://m.facebook.com>chutiatribe, ১২.১২.২০১৮
৬. শর্মা, নবীন চন্দ্র, (২০০৩), 'Ritual Tales of Assamese Women', লোকসংস্কৃতি গবেষণা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ৪২-৪৩
৮. বরুয়া, প্রফুল্ল চন্দ্র, (সম্পা.), (১৯৬২), অসমীয়া প্রবচন, অসম পাব্লিকেশন বোর্ড, গুয়াহাটি
৯. ওই
১০. অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, (২০২১), ই-ম্যাগাজিন সংখ্যা, ২২ অগাস্ট
১০. ক. গগৈ, মাধুরী, অসমিয়াত কথাবতরা,
https://en.gb.facebook.com/groups/axomiyakothabotora/permalink, ০২-১০-২০১৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. খ. ইসলাম, শেখ মকবুল, (২০১১) 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৩৪

১১. অসমীয়া 'সাধুকথা' সন্ত-সাধুর উক্তি বা সত্য কথা বলে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত হয়ে আসছে। এগুলো উপদেশ বা নীতিকথামূলক। বাংলার রূপকথার সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই। বরং একে লোককথা বলা যেতে পারে।

১২. ভুঞা, মাধন, (২০১৯), 'জোনবাইর দেশর সাধু', পুরনিগুদাম শতদল শাখা সাহিত্য সভা, নগাঁও

১৩. বরা, রত্নেশ্বর, (২০২১), 'মইনাহঁতলৈ মজা মজা সাধুকথা', কৌস্তভ প্রকাশনী, ডিব্রুগড়

১৪. 'তেনালীরামর সাধু', Storiesworld.in, translated by STORIESWORLD789

১৫. অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জিলার রাভা জনগোষ্ঠীর লোককথা, 'বাঘ আরু মেকুরীর খরিয়াল', ৭ম শ্রেণির অসমীয়া ভাষা পাঠ ১৪, শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন, গুয়াহাটি।

১৬. বিঐতে উপজাতিদের এই লোককথাটি সংগ্রহ করেছেন প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রবক্তা ড০ অভিজিৎ দত্ত।

১৭. বরা, দিলীপ, (২০১৪), 'সধয়াপুরর সোনর মেকুরী', এপোকাস, কটন কলেজ, গুয়াহাটি

১৮. ভরালি, বিভা : 'প্রবীণা শইকীয়ার চুটিগল্প', অপূর্ব বরা (সম্পা.), (২০১২), 'অসমীয়া চুটিগল্প : ঐতিহ্য আরু বিবর্তন', যোরহাট

১৯. ভরদ্বাজ, অপু, (২০২১), 'আজি গল্প ক'ম', আঁকবাঁক, গুয়াহাটি

২০. পূর্বোল্লিখিত, 'অসমীয়াত কথাবতরা' ফেসবুক পাতা।

২১. Dutta, Dr. Avijit Kumar, 'Folk Beliefs of Fishing Communities: A Case Study in Kamrup District', (2014), PhD Thesis guided by Dr. Sanjay De, Dept of Folklore Research, Gauhati University.

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 763 - 778
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শিশু মনোবিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার : নৈতিক দায়বদ্ধতার এক পর্যালোচনা

ড. রুবি দাস (চক্রবর্ত্তী)
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ
হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ, মালদা
Email ID : rubichakraborty84@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Child Psychology, Artificial Intelligence, Ethical Responsibility, Philosophy, Mental Health, Data Privacy.

Abstract
In the modern world, Artificial Intelligence (AI) is rapidly evolving and expanding its influence across various sectors, including education, entertainment, healthcare, and psychological support for children. However, it is crucial to deeply examine how this technology impacts children's mental development and moral education, along with its ethical limitations. This research paper presents an analytical review of the ethical responsibility associated with the use of AI in child psychology. AI is a technology that mimics human thought processes and decision-making. Through machine learning, natural language processing, and deep learning, AI systems are utilized in developing educational games, virtual assistants, and therapeutic applications for children. Children are naturally drawn to technology, and AI-powered digital platforms, applications, and educational tools simplify their learning process. However, the excessive use of such technology may negatively affect children's psychological development, social skills, and creative thinking. Furthermore, ethical concerns arise regarding the protection of children's personal data, privacy, and the proper use of AI-collected information. The role of AI in children's mental and emotional development is twofold. On the one hand, AI-based educational platforms enhance children's interest in learning and provide opportunities for personalized education. On the other hand, excessive dependence on technology may adversely affect children's social skills and creative thinking. This research highlights the ethical responsibility of AI usage and the preservation of children's mental health from the perspectives of philosophy and ethics. Drawing upon Rabindranath Tagore's humanistic philosophy and Sri Aurobindo's theory of consciousness development, the study suggests that AI can be effectively utilized for children's moral education and psychological growth. To ensure the positive role of AI in children's mental development, it is essential to uphold ethical responsibility, data privacy, and social justice.

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

The negative impacts of AI can be mitigated through the formulation of policies and awareness campaigns.

Discussion

ভূমিকা : শিশু মনোবিজ্ঞান মানব শিশুর মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশ নিয়ে গবেষণা করে। আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশের সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এখন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু AI ব্যবহারের নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। এই গবেষণায় আমরা শিশু মনোবিজ্ঞান ও AI-এর সংযোগ স্থাপন করে এর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করব।

শিশু মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি : শিশুর মনোবিকাশের ক্ষেত্রে জিন, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিয়াজের, ভিগোৎস্কি, ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরের ওপর গবেষণা করেছেন।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব :

1. **পিয়াজেরের জ্ঞানীয় বিকাশ তত্ত্ব :** জ্যাঁ পিয়াজে (Jean Piaget) একজন সুইস মনোবিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি শিশুদের জ্ঞানীয় বিকাশ (cognitive development) নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুদের চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়। তার মতে, শিশুদের শেখার প্রক্রিয়া একটি গঠনমূলক (constructivist) প্রক্রিয়া, যেখানে তারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণা তৈরি করে। শিশু বিভিন্ন স্তরে চিন্তা ও যুক্তি গঠনের ক্ষমতা অর্জন করে।

পিয়াজেরের জ্ঞানীয় বিকাশের স্তরসমূহ : পিয়াজে শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশকে চারটি প্রধান স্তরে ভাগ করেছেন -

A) **সংবেদী-গত্যাত্মক (Sensorimotor) পর্যায় (জন্ম থেকে ২ বছর পর্যন্ত)**

- শিশুরা ইন্দ্রিয় ও গতিবিধির মাধ্যমে পরিবেশকে বুঝতে শেখে।
- বস্তু স্থায়ীত্ব (Object Permanence) গঠন হয়, অর্থাৎ তারা বুঝতে শেখে যে কোনো বস্তু তাদের দৃষ্টির বাইরে গেলেও তা অস্তিত্বশীল থাকে।

B) **পূর্ব-সংক্রিয়াত্মক (Preoperational) পর্যায় (২ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত)**

- শিশুর ভাষা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- তারা প্রতীকী চিন্তা করতে শেখে, তবে যৌক্তিক চিন্তার অভাব থাকে।
- আত্মকেন্দ্রিকতা (Egocentrism) দেখা যায়, অর্থাৎ তারা অন্যদের দৃষ্টিকোণ বুঝতে পারে না।

C) **সুনির্দিষ্ট সংক্রিয়াত্মক (Concrete Operational) পর্যায় (৭ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত)**

- শিশুরা যৌক্তিক চিন্তা করতে শেখে এবং বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারে।
- সংরক্ষণ (Conservation) ধারণা গড়ে ওঠে, যেমন তরলের পরিমাণ একই থাকে, যদিও পাত্রের আকার পরিবর্তিত হয়।
- তারা আরও ভালোভাবে শ্রেণিবিন্যাস (Classification) ও বিন্যাস (Seriation) করতে শেখে।

D) **সাব্যস্ত সংক্রিয়াত্মক (Formal Operational) পর্যায় (১১ বছর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত)**

- বিমূর্ত (Abstract) ও যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা বিকশিত হয়।
- সমস্যা সমাধানের জন্য কল্পনাপ্রসূত চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে।
- নৈতিক ও তাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পিয়াজের তত্ত্বের গুরুত্ব :

- শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতি উন্নত করার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী।
- শিক্ষাব্যবস্থায় বয়সভিত্তিক পাঠ্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করে।
- শিশুদের শেখার গতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে সহায়ক।
- এই তত্ত্ব শিশু মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও গবেষকদের জন্য অপরিহার্য নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

2. **ভিগোৎস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব :** লেভ ভিগোৎস্কি (Lev Vygotsky) ছিলেন একজন রুশ মনোবিজ্ঞানী, যিনি শিশুদের জ্ঞানীয় বিকাশ সম্পর্কে সমাজ ও সংস্কৃতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক **তত্ত্ব** (Sociocultural Theory) অনুসারে, শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি তাদের সামাজিক পরিবেশ, ভাষা এবং পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির সাথে ক্রিয়াশীল সম্পর্কের মাধ্যমে ঘটে। ভিগোৎস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব আমাদের শেখায় যে শিশুর মানসিক বিকাশ শুধুমাত্র তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, বরং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশু তার পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে শেখে।

ভিগোৎস্কির তত্ত্বের মূল উপাদান :

A) **সামাজিক মিথস্ক্রিয়া** (Social Interaction)

- শিশুদের শেখার প্রধান উৎস হল সামাজিক পরিবেশ ও মিথস্ক্রিয়া।
- তারা অভিজ্ঞদের (যেমন: শিক্ষক, অভিভাবক বা দক্ষ বন্ধুর) সাহায্যে নতুন ধারণা শিখে।

B) **নিকটতম উন্নয়ন ক্ষেত্র** (Zone of Proximal Development - ZPD)

- এটি শিশুর সেই সামর্থ্য বোঝায়, যা সে একা করতে পারে না, কিন্তু একজন দক্ষ ব্যক্তির সহায়তায় করতে পারে।
- উদাহরণস্বরূপ, একজন শিশু গণিতের একটি কঠিন সমস্যা একা সমাধান করতে পারে না, কিন্তু শিক্ষকের সহায়তায় এটি করতে সক্ষম হয়।

C) **স্ক্যাফোল্ডিং** (Scaffolding)

- শেখার প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিশুকে ধাপে ধাপে সহায়তা প্রদান করে।
- শিক্ষক বা অভিভাবক প্রথমে বেশি সহায়তা দেয়, পরে ধীরে ধীরে সহায়তা কমিয়ে দেয়, যাতে শিশু নিজের ক্ষমতা বিকশিত করতে পারে।

D) **ভাষার ভূমিকা** (Role of Language)

- ভাষা হল চিন্তার গঠন ও বিকাশের প্রধান মাধ্যম।
- শিশু প্রথমে সামাজিক ভাষা ব্যবহার করে এবং পরে এটি তাদের নিজস্ব চিন্তার অংশ হয়ে যায়।
- অভ্যন্তরীণ বক্তৃতা (Inner Speech) বা নিজের সাথে কথা বলা শিশুর সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

E) **সাংস্কৃতিক প্রভাব** (Cultural Influence)

- শিশুর শেখার ধরণ তার সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- বিভিন্ন সমাজে শেখার পদ্ধতি আলাদা হতে পারে, কারণ প্রতিটি সমাজে জ্ঞান অর্জনের কৌশল ভিন্ন।

ভিগোৎস্কির তত্ত্বের গুরুত্ব :

- **শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ :** শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নে এই তত্ত্ব কার্যকর।
- **সহায়ক শেখার পরিবেশ :** সহযোগী শিক্ষণ (Collaborative Learning) এবং দলগত কার্যক্রমে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- **ভাষা ও চিন্তার বিকাশ :** শিশুর ভাষা উন্নয়নের সাথে তার চিন্তাধারাও বিকশিত হয়।

3. **ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব :** সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) ছিলেন মনোবিজ্ঞানের মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) তত্ত্বের জনক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ মূলত অবচেতন মন দ্বারা পরিচালিত হয়। তার তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের মানসিক গঠন এবং বিকাশ শৈশবকাল থেকেই শুরু হয় এবং এতে অবচেতন চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশুর মানসিক বিকাশে অবচেতন মন কাজ করে।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের মূল উপাদান :

1. **মনস্তাত্ত্বিক গঠন : চেতনা স্তরসমূহ :** ফ্রয়েড মানুষের মানসিক গঠনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন—

a) চেতনা (Conscious Mind) : যা আমরা সচেতনভাবে ভাবতে পারি ও অনুভব করতে পারি। যেমন: দৈনন্দিন চিন্তা, সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা।

b) অবচেতনা (Subconscious/Preconscious Mind) : যা চেতন মনে নেই, কিন্তু কিছু প্রচেষ্টার মাধ্যমে সচেতন করা সম্ভব। যেমন: স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা।

c) অবচেতন (Unconscious Mind) : এটি আমাদের ইচ্ছা, আবেগ ও অভিজ্ঞতার বিশাল অংশ ধারণ করে যা আমরা সচেতনভাবে জানি না, তবে এগুলো আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। মন: সুপ্ত ইচ্ছা, ভয়, শৈশবের দমন করা স্মৃতি।

2. **ব্যক্তিত্বের গঠন: ইদ, ইগো ও সুপার ইগো :** ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিত্বের গঠন তিনটি প্রধান উপাদানের মাধ্যমে হয়—

a) **ইদ (Id):** এটি জন্মগতভাবে থাকা আদিম ও প্রবৃত্তিগত অংশ, যা তাৎক্ষণিক সুখ চায়। এটি 'Pleasure Principle' অনুসরণ করে। যেমন: ক্ষুধা লাগলে খেতে চাওয়া, রাগ হলে তা প্রকাশ করা।

b) **ইগো (Ego):** এটি বাস্তবতাকে বিবেচনা করে এবং 'Reality Principle' অনুসরণ করে। ইগো ইদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বাস্তবসম্মতভাবে পরিচালনা করে। যেমন: ক্ষুধার্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে না খেয়ে সুযোগমতো খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

c) **সুপার ইগো (Super Ego):** এটি নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি সঠিক-ভুলের ধারণা তৈরি করে এবং ইগোকে নৈতিকভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করে। যেমন: অন্যের জিনিস চুরি না করা, কারণ এটি অনৈতিক।

3. **মনোবিকাশের ধাপসমূহ** (Psychosexual Stages of Development) **:** ফ্রয়েডের মতে, শিশুর মানসিক বিকাশ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এবং প্রতিটি স্তরে একটি নির্দিষ্ট শারীরিক অঞ্চলের (Erogenous Zone) প্রতি ফোকাস থাকে।

a) ওরাল পর্যায় (Oral Stage) (জন্ম-১.৫ বছর) :

- মুখমণ্ডল (শিশুর স্তন্যপান) আনন্দের প্রধান উৎস।
- অতিরিক্ত মুখমণ্ডল সংক্রান্ত আনন্দ বা বঞ্চনা ভবিষ্যতে ধূমপান বা অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে।

b) এনাল পর্যায় (Anal Stage) (১.৫-৩ বছর) :

- পায়ুপথ নিয়ন্ত্রণ শেখার মাধ্যমে শিশু আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রপ্ত করে।
- খুব কঠোর বা খুব শিথিল টয়লেট প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ বা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল স্বভাব তৈরি করতে পারে।

c) ফ্যালিক পর্যায় (Phallic Stage) (৩-৬ বছর) :

- শিশুদের লিঙ্গগত পার্থক্য বোঝার আগ্রহ তৈরি হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- এই পর্যায়ে ওডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) এবং ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Electra Complex) দেখা দিতে পারে, যেখানে ছেলে সন্তান মায়ের প্রতি এবং মেয়ে সন্তান বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

d) ল্যাটেন্স পর্যায় (Latency Stage) (৬-১২ বছর) :

- যৌন ইচ্ছাগুলো দমন হয় এবং শিশু সামাজিক দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে মনোযোগ দেয়।

e) জেনিটাল পর্যায় (Genital Stage) (১২ বছর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক) :

- ব্যক্তি পরিপক্ক যৌন সম্পর্ক ও সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে শেখে।

ফ্রয়েডের তত্ত্বের গুরুত্ব :

- শিশুর মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।
- মানসিক ব্যাধির কারণ ও চিকিৎসায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- অবচেতন মানসিক প্রক্রিয়া কীভাবে আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।
- তবে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ফ্রয়েডের তত্ত্বের কিছু অংশ নিয়ে বিতর্ক করেছেন এবং তার কিছু ব্যাখ্যাকে অতিরঞ্জিত মনে করেছেন। তবুও, তার মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আজও মানসিক বিকাশ ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা ও প্রয়োগ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন একটি প্রযুক্তি যা মানুষের মত চিন্তা করতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এটি শিশুর শিক্ষায় ও মানসিক বিকাশে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ AI প্রযুক্তি :

A) **মেশিন লার্নিং:** মেশিন লার্নিং (Machine Learning) হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) একটি শাখা, যেখানে কম্পিউটার অভিজ্ঞতা থেকে শেখে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নতি করতে পারে। এটি ঐতিহ্যগত প্রোগ্রামিং পদ্ধতির বিপরীতে কাজ করে, যেখানে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং শর্ত অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেশিন লার্নিং এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে কম্পিউটার ডাটা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতে পারে।

মেশিন লার্নিং-এর প্রকারভেদ : মেশিন লার্নিং সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত -

a) সুপারভাইজড লার্নিং (Supervised Learning)

- এতে কম্পিউটারকে পূর্বনির্ধারিত লেবেলযুক্ত ডাটাসেট (Labelled Data) সরবরাহ করা হয়।
- ইনপুট এবং আউটপুট সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকে এবং মডেল ভবিষ্যদ্বাণী করতে শেখে।
- উদাহরণ: ইমেল স্প্যাম ফিল্টার, রোগ নির্ণয়, বিক্রয় পূর্বাভাস।

b) আনসুপারভাইজড লার্নিং (Unsupervised Learning)

- এতে ডাটাসেটে কোনো লেবেল থাকে না, এবং মডেল নিজেই প্যাটার্ন খুঁজে বের করে।
- এটি ক্লাস্টারিং (Clustering) ও অ্যাসোসিয়েশন (Association) এনালাইসিসের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- উদাহরণ: কাস্টমার সেগমেন্টেশন, মার্কেট বিশ্লেষণ।

c) রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং (Reinforcement Learning)

- এটি ট্রায়াল-এন্ড-এরর (Trial-and-Error) পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে শেখে।
- একটি "এজেন্ট" (Agent) পরিবেশ থেকে শিখে এবং সেরা পদক্ষেপটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করে।
- উদাহরণ: স্বচালিত গাড়ি (Self-Driving Cars), রোবোটিক্স, গেম প্লেয়িং (AlphaGo)।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার ক্ষেত্র :

- স্বাস্থ্যসেবা (Healthcare): রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পূর্বাভাস, ওষুধ আবিষ্কার।
- আর্থিক খাত (Finance): শেয়ার বাজার বিশ্লেষণ, জালিয়াতি সনাক্তকরণ।
- ই-কমার্স: পণ্য সুপারিশ (Recommendation Systems)।
- স্বয়ংক্রিয় গাড়ি: টেসলা ও অন্যান্য কোম্পানির স্বচালিত যানবাহন।
- ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP): গুগল ট্রান্সলেট, চ্যাটবট, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট।

মেশিন লার্নিং আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

B) **ডিপ লার্নিং :** ডিপ লার্নিং (Deep Learning) হল মেশিন লার্নিং-এর (Machine Learning) একটি উন্নত শাখা, যেখানে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের (Artificial Neural Networks) মাধ্যমে কম্পিউটার মানুষের মতো শিখতে পারে। এটি বৃহৎ পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং জটিল প্যাটার্ন শনাক্ত করতে সক্ষম।

ডিপ লার্নিং এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে বহুস্তরবিশিষ্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক (Multi-layered Neural Networks) ব্যবহারের মাধ্যমে মডেল তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখে। এটি মূলত মস্তিষ্কের নিউরনের কার্যপদ্ধতি অনুকরণ করে কাজ করে।

ডিপ লার্নিং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

a) **বহুস্তরযুক্ত নিউরাল নেটওয়ার্ক :**

- ডিপ লার্নিং মডেলে ইনপুট লেয়ার, হিডেন লেয়ার (Hidden Layers) এবং আউটপুট লেয়ার থাকে।
- প্রতিটি স্তর ডেটার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য শিখতে সাহায্য করে।

b) **স্বয়ংক্রিয় বৈশিষ্ট্য শেখা** (Feature Extraction) :

- প্রচলিত মেশিন লার্নিং-এ ম্যানুয়ালি বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করতে হয়, কিন্তু ডিপ লার্নিং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিখে।
- বৃহৎ ডেটাসেট ও শক্তিশালী প্রসেসিং ক্ষমতা।
- ডিপ লার্নিং কাজ করার জন্য প্রচুর ডেটা ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার (GPU, TPU) প্রয়োজন।

c) **কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক** (Convolutional Neural Network - CNN) :

- চিত্র ও ভিডিও বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- উদাহরণ: ফেস রিকগনিশন, মেডিকেল ইমেজ ডায়াগনোসিস।

d) **রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক** (Recurrent Neural Network - RNN) :

- ক্রমান্বয়ে আগত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- উদাহরণ: ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP), বক্তৃতা শনাক্তকরণ (Speech Recognition)।

e) **জেনারেটিভ অ্যাডভারসারিয়াল নেটওয়ার্ক** (Generative Adversarial Networks - GANs) :

- কৃত্রিম চিত্র, ভিডিও ও সাউন্ড তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
- উদাহরণ: ডিপফেক (Deepfake) প্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইমেজ জেনারেশন।

ডিপ লার্নিং-এর ব্যবহার ক্ষেত্র :

- স্বয়ংক্রিয় গাড়ি (Autonomous Vehicles): টেসলা ও অন্যান্য কোম্পানির স্ব-চালিত গাড়ির প্রযুক্তি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- চিকিৎসা (Healthcare): রোগ নির্ণয়, মেডিকেল ইমেজ বিশ্লেষণ।
- ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (Natural Language Processing - NLP): চ্যাটবট, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট (Google Assistant, Alexa)।
- সাইবার নিরাপত্তা: জালিয়াতি শনাক্তকরণ, সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ।
- বিনোদন (Entertainment): নেটফ্লিক্স ও ইউটিউব-এর সুপারিশ ব্যবস্থা।

ডিপ লার্নিং প্রযুক্তি বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম শক্তিশালী ও অগ্রগামী শাখা। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

C) ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং : ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (Natural Language Processing - NLP) হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) একটি শাখা, যা মানুষের ভাষা বোঝা, বিশ্লেষণ, এবং প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটারকে সক্ষম করে। এটি ভাষাগত উপাদান যেমন বাক্য, শব্দ, এবং বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করে মানুষের সাথে আরও স্বাভাবিক ও কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলে।

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং হল সেই প্রযুক্তি যেখানে কম্পিউটার মানুষের ভাষা (লিখিত ও মৌখিক) বুঝতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে, এবং সেটি ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ কাজ করতে পারে। এটি ভাষা বিশ্লেষণ, অনুবাদ, কণ্ঠস্বর শনাক্তকরণ, এবং টেক্সট জেনারেশনের মতো কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

NLP-এর প্রধান উপাদান –

টোকেনাইজেশন (Tokenization) : একটি বাক্যকে ছোট ছোট শব্দ বা বাক্যাংশে বিভক্ত করা। উদাহরণ : "আমি বাংলায় গান গাই" → ['আমি', 'বাংলায়', 'গান', 'গাই']

পার্ট-অফ-স্পিচ ট্যাগিং (Part-of-Speech Tagging - POS Tagging) : প্রতিটি শব্দের ব্যাকরণগত শ্রেণি নির্ধারণ করা (যেমন : বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ)।

নেমড এনটিটি রিকগনিশন (Named Entity Recognition - NER) : টেক্সট থেকে নাম, স্থান, প্রতিষ্ঠান, তারিখ ইত্যাদি চিহ্নিত করা। উদাহরণ : "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।" → ['রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' = ব্যক্তি, '১৮৬১' = সাল]

সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস (Sentiment Analysis) : কোনো টেক্সট পজিটিভ, নেগেটিভ বা নিউট্রাল তা নির্ধারণ করা।

ভাষা অনুবাদ (Machine Translation) : যেমন : Google Translate, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারে।

স্পিচ-টু-টেক্সট (Speech-to-Text) ও টেক্সট-টু-স্পিচ (Text-to-Speech) : কণ্ঠস্বরকে লিখিত টেক্সটে রূপান্তর করা এবং লিখিত টেক্সটকে কণ্ঠস্বর হিসেবে উপস্থাপন করা।

NLP-এর ব্যবহার ক্ষেত্র –

- **ভাষা অনুবাদ :** গুগল ট্রান্সলেট, মাইক্রোসফট ট্রান্সলেটর।
- **চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট :** সিরি (Siri), গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আলেক্সা।
- **অটোমেটেড কন্টেন্ট জেনারেশন :** ব্লগ, নিউজ রিপোর্ট তৈরির জন্য AI-ভিত্তিক সিস্টেম।
- **সামাজিক মাধ্যম বিশ্লেষণ :** টুইটার, ফেসবুকের মন্তব্য বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড নির্ধারণ।
- **কাস্টমার সার্ভিস :** অটোমেটেড উত্তর প্রদান ও কাস্টমার সহায়তা।
- **আইনি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে :** আইনি নথি বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্য তথ্য বিশ্লেষণ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা মানুষের ভাষা বোঝার ক্ষমতাকে আরও উন্নত করেছে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর ও কার্যকর করছে, এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও কার্যকর NLP প্রযুক্তির বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

D) রোবোটিক্স : রোবোটিক্স (Robotics) হল বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের একটি শাখা, যেখানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (রোবট) তৈরি, নিয়ন্ত্রণ, ও উন্নয়ন করা হয়। রোবট এমন এক প্রকার মেশিন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা মানুষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে। আধুনিক রোবোটিক্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং (ML), সেন্সর প্রযুক্তি, এবং ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

রোবোটিক্স হল রোবট ডিজাইন, নির্মাণ, প্রোগ্রামিং এবং পরিচালনার বিজ্ঞান। এটি কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, যান্ত্রিক প্রকৌশল, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে গঠিত। রোবট হতে পারে স্বয়ংক্রিয় (Automated) বা আধা-স্বয়ংক্রিয় (Semi-Automated)। এটি বিভিন্ন কাজ যেমন উৎপাদন, চিকিৎসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, গৃহস্থালি সহায়তা, এবং গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

রোবটের প্রধান বৈশিষ্ট্য -

- **স্বয়ংক্রিয়তা (Autonomy) :** কিছু রোবট সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে, আবার কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।
- **সেন্সিং ক্ষমতা (Sensing Ability) :** ক্যামেরা, লিডার (LiDAR), ইনফ্রারেড সেন্সর ইত্যাদি ব্যবহার করে পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে পারে।
- **চলন ক্ষমতা (Mobility) :** কিছু রোবট হুইলচালিত, কিছু হাঁটতে পারে, আবার কিছু উড়তে পারে।
- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI Integration) :** অনেক রোবট শেখার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
- **ইন্টারঅ্যাকশন (Human-Robot Interaction - HRI) :** কিছু রোবট মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যেমন সোফিয়া (Sophia) হিউম্যানয়েড রোবট।

রোবোটিক্স-এর ব্যবহার ক্ষেত্র –

- **শিল্প ও উৎপাদন :** অটোমোবাইল ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পে স্বয়ংক্রিয় রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **চিকিৎসা :** রোবটিক সার্জারি, রোগ নির্ণয়, রোগীদের সহায়তা।
- **গৃহস্থালি :** ক্লিনিং রোবট, স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট রোবট।
- **শিক্ষা :** শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ রোবট।
- **মহাকাশ গবেষণা :** মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধানের জন্য রোভার রোবট।
- **সামরিক ও প্রতিরক্ষা :** নজরদারি ও বিপজ্জনক স্থানে অভিযান পরিচালনার জন্য রোবট।

রোবোটিক্স আধুনিক প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শিল্পে পরিবর্তন আনছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত সেন্সর প্রযুক্তির সমন্বয়ে ভবিষ্যতে রোবোটিক্স আরও শক্তিশালী হবে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা : বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে AI ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। AI-ভিত্তিক শিক্ষামূলক অ্যাপ ও টুল শিশুকে তার মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে কম্পিউটার মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে, শেখার ক্ষমতা রাখে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে AI বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন :

1. **শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা (Personalized Learning) :**

- AI শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও দুর্বলতাগুলো বিশ্লেষণ করে তার জন্য উপযোগী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।
- উদাহরণ: **Coursera, Khan Academy, Duolingo** ইত্যাদি অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম।

2. **স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ও গ্রেডিং (Automated Assessment and Grading):**

- AI-এর সাহায্যে পরীক্ষার উত্তর মূল্যায়ন করা সম্ভব, বিশেষ করে এমসিকিউ ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে।
- উদাহরণ: Google Classroom-এর অটো-গ্রেডিং সিস্টেম।

3. **ভাষা অনুবাদ ও সহায়তা (Language Translation and Assistance):**

- AI ভাষা অনুবাদ করতে পারে, যা বহুভাষিক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক।
- উদাহরণ: Google Translate, Microsoft Translator।

4. **বৈচিত্র্যময় শিক্ষণ উপকরণ তৈরি (Content Creation & Adaptive Learning):**

- AI স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষণ উপকরণ তৈরি করতে পারে।
- উদাহরণ: AI-জেনারেটেড প্রেজেন্টেশন, ভিডিও টিউটোরিয়াল, কাস্টমাইজড টেক্সটবুক।

5. **চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল সহায়ক (Chatbots and Virtual Assistants):**

- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য AI-চালিত চ্যাটবট ব্যবহৃত হয়।
- উদাহরণ: IBM Watson, ChatGPT, Google Assistant।

6. **শিক্ষকের সহায়ক (Teacher Assistance):**

- AI শিক্ষককে প্রশাসনিক কাজ ও পাঠ পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।

7. **বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণ (Predictive Analytics):**

- শিক্ষার্থীদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে তাদের ফলাফল পূর্বানুমান করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা –

1. **শিক্ষার ব্যক্তিগতকরণ (Personalized Learning):**

- প্রতিটি শিক্ষার্থীর শেখার ধরণ অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা যায়।

2. **সহজতর মূল্যায়ন (Efficient Grading System):**

- শিক্ষকদের পরীক্ষা মূল্যায়নে সময় বাঁচাতে সাহায্য করে।

3. **অ্যাক্সেসিবিলিটি বৃদ্ধি (Enhanced Accessibility):**

- দৃষ্টিহীন বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি কার্যকর।

4. **সার্বক্ষণিক শিক্ষা সহায়তা (24/7 Learning Support):**

- শিক্ষার্থীরা যে কোনো সময় প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে।

5. **শিক্ষকের কাজের চাপ হ্রাস (Reduced Workload for Teachers) :**

- প্রশাসনিক কাজ ও ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে AI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা –

1. **প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা :**

- শিক্ষার্থীরা সরাসরি শিক্ষকদের পরিবর্তে AI নির্ভর হয়ে পড়তে পারে।

2. **ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা:**

- শিক্ষার্থীদের ডেটা সুরক্ষিত রাখা বড় চ্যালেঞ্জ।

3. **সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমান সুযোগের অভাব:**

- উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে AI-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি।

4. **নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতা:**

- AI নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কিনা, সেটি নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও সহজতর করবে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা, শিক্ষকদের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনার সুযোগ তৈরি করবে। তবে, এর সীমাবদ্ধতা ও নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি সচেতন থাকা জরুরি। সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে AI শিক্ষার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

শিশুর মানসিক বিকাশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) আধুনিক প্রযুক্তির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। AI-ভিত্তিক যন্ত্র ও সফটওয়্যার শিশুদের শেখার পদ্ধতি, মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক আচরণের ওপর প্রভাব ফেলছে। তবে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক রয়েছে, যা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

শিশুর মানসিক বিকাশ ও AI-এর ভূমিকা –

১. জ্ঞানীয় বিকাশে AI-এর প্রভাব -

(Piaget-এর Cognitive Development Theory অনুসারে)

- AI-ভিত্তিক লার্নিং প্ল্যাটফর্ম (যেমন: Duolingo, ABC mouse, Khan Academy Kids) শিশুদের শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।
- ইন্টারঅ্যাকটিভ গেম ও মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট শিশুদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়।
- চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট (যেমন: Google Assistant, Alexa) শিশুকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করে।

২. সামাজিক বিকাশে AI-এর ভূমিকা -

(Vygotsky-এর Sociocultural Theory অনুসারে)

- AI-ভিত্তিক শিক্ষামূলক রোবট (যেমন: Miko, Cozmo) শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (VR) ও অগমেন্টেড রিয়ালিটি (AR) শিশুকে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।
- AI-চালিত অনলাইন কমিউনিটি ও চ্যাটবট শিশুদের ভার্চুয়াল সামাজিকীকরণ শেখাতে পারে।

৩. মানসিক ও আবেগিক বিকাশে AI-এর প্রভাব -

(Freud-এর Psychoanalytic Theory অনুসারে)

- AI-ভিত্তিক মেন্টাল হেলথ অ্যাপ শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে।
- শিশুর আবেগ বোঝার জন্য AI-ভিত্তিক সংবেদনশীল রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে, যা তাদের একাকীত্ব কমাতে পারে।

৪. ভাষা বিকাশ ও যোগাযোগ দক্ষতা -

- NLP (Natural Language Processing)-ভিত্তিক অ্যাপস শিশুদের ভাষা শেখার দক্ষতা বাড়াতে পারে।
- অডিও-বুক, স্পিচ-টু-টেক্সট সফটওয়্যার শিশুদের উচ্চারণ ও শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

AI-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব -

ইতিবাচক প্রভাব -

1. **শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি :** AI-ভিত্তিক অ্যাপস শিশুদের শিক্ষাকে আরও মজাদার করে তোলে।
2 **ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা :** প্রতিটি শিশুর শিখনশৈলী অনুযায়ী AI পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।
3. **বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি :** সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।
4. **বিশ্বব্যাপী সংযোগ :** শিশুরা বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে।

নেতিবাচক প্রভাব -

1. **মানবিক যোগাযোগ কমানো:** শিশুরা ভার্চুয়াল ইন্টারঅ্যাকশনের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।
2. **গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি:** শিশুর ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও অপব্যবহার হতে পারে।
3. **পরিসীমাহীন স্ক্রিন-টাইম:** অতিরিক্ত ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে শিশুদের একাগ্রতা হ্রাস ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।
4. **সমাজবিচ্ছিন্নতা:** AI-নির্ভরতা শিশুকে বাস্তব সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি শেখার দক্ষতা, ভাষা উন্নয়ন এবং সামাজিক যোগাযোগ বাড়াতে সাহায্য করলেও, এর অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুর আবেগিক ও সামাজিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই, AI-ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকা উচিত, যাতে শিশুরা এর ইতিবাচক দিকগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে এবং নেতিবাচক দিকগুলো এড়ানো যায়।

AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক দায়বদ্ধতা : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) বর্তমানে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ব্যবসা, বিনোদন, আইন এবং প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে AI প্রযুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে, এর ব্যবহার কেবল সুবিধার জন্য নয়, বরং নৈতিক চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে।

AI-এর যথাযথ নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত না করলে এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, বৈষম্য, এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান নৈতিক প্রশ্ন – AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্নগুলো বিবেচ্য :

1. **গোপনীয়তা (Privacy) এবং তথ্য সুরক্ষা :**

- ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে AI-এর ভূমিকা কী হওয়া উচিত?
- ব্যবহারকারীদের অনুমতি ছাড়া তাদের তথ্য ব্যবহার করা কতটা নৈতিক?

2. **বৈষম্য ও নিরপেক্ষতা (Bias & Fairness) :**

- AI অ্যালগরিদম কীভাবে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে?
- AI-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে বর্ণ, লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য রোধ করা যাবে?

3. **স্বায়ত্তশাসন ও দায়বদ্ধতা (Autonomy & Accountability) :**

- AI যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার দায়িত্ব কার?
- স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও সিদ্ধান্তমূলক AI-এর ব্যবহার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে?

4. **কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারে প্রভাব :**

- AI কীভাবে চাকরির বাজার পরিবর্তন করছে এবং এর ফলে মানুষের কর্মসংস্থান কীভাবে প্রভাবিত হবে?
- নতুন ধরনের চাকরির সুযোগ তৈরি করার দায়িত্ব কি AI নির্মাতাদের থাকা উচিত?

5. **নকল তথ্য ও ভুয়া সংবাদ (Misinformation & Deepfake) :**

- AI-চালিত Deepfake এবং অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার প্রতিরোধে কী নৈতিক নীতিমালা থাকা উচিত?
- AI কীভাবে তথ্য যাচাই-বাছাই করে সত্যতা নিশ্চিত করতে পারে?

6. **স্বাস্থ্যসেবা ও AI :**

- রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক চ্যালেঞ্জ কী?
- মানুষের জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে AI-এর সীমাবদ্ধতা কী হওয়া উচিত?

7. **সামরিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে AI :**

- স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহার কতটা নৈতিক?
- যুদ্ধক্ষেত্রে AI-এর ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হতে পারে কি?

AI ব্যবহারের নৈতিক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা :

১. তথ্য গোপনীয়তা ও নজরদারি : AI প্রযুক্তি, বিশেষত ফেসিয়াল রিকগনিশন ও বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, ব্যাপকভাবে নজরদারি ও ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার জন্য বড় হুমকি তৈরি করতে পারে।

২. পক্ষপাতদুষ্ট ও বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ : AI মডেল প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডেটা যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তবে এটি বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় AI নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।

৩. কর্মসংস্থানের ঝুঁকি : অটোমেশন ও AI-এর বিকাশ শ্রমবাজারে ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। অনেক চাকরি হ্রাস পাচ্ছে, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে।

৪. নকল তথ্য ও সামাজিক বিভ্রান্তি: AI-চালিত Deepfake ভিডিও, ভুয়া সংবাদ (Fake News) এবং অটোমেটেড বটস সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

৫. নৈতিক ও আইনগত নিয়ন্ত্রণের অভাব: AI-এর ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এটি অপ্রত্যাশিত এবং ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন ও ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী, তবে এটি নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে পরিচালিত হওয়া উচিত। AI যেন মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হয় এবং কোনো পক্ষপাত, গোপনীয়তা লঙ্ঘন বা সামাজিক বৈষম্যের কারণ না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাই, নৈতিকভাবে AI ব্যবহারের জন্য সরকার, প্রযুক্তিবিদ, নীতিনির্ধারক, এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি সুষম ও দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা জরুরি।

AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুদের জন্য AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নীতিগত প্রশ্ন উঠে আসে:

- **গোপনীয়তা :** শিশুর ব্যক্তিগত তথ্য কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে?
- **নির্ভরযোগ্যতা :** AI কি শিশুর জন্য সত্যিই সহায়ক?
- **অধিকার :** শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায় কীভাবে গ্রহণযোগ্য?

নীতিগত চ্যালেঞ্জ ও সমাধান : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বর্তমানে শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্র, বিনোদন, এবং সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। AI-ভিত্তিক লার্নিং অ্যাপস, চ্যাটবট, রোবটিক টিউটর, এবং ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট শিশুদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। তবে, এর পাশাপাশি বিভিন্ন নীতিগত চ্যালেঞ্জও দেখা দিচ্ছে, যেমন গোপনীয়তা রক্ষা, মানসিক বিকাশে প্রভাব, আসক্তি, এবং তথ্যগত নিরাপত্তা। তাই, শিশুদের জন্য AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি।

AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য প্রধান নীতিগত চ্যালেঞ্জ –

১. গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষা (Privacy & Data Security)

- শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে?
- AI কীভাবে শিশুদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয়?
- শিশুদের ডিজিটাল অধিকার সুরক্ষিত রাখতে কী ধরনের নীতিমালা থাকা উচিত?

সমাধান :

- শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে GDPR (General Data Protection Regulation) এবং COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) এর মতো কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হবে।
- অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া কোনো ডেটা সংগ্রহ করা যাবে না।

- শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্য এনক্রিপশন এবং নিরাপদ সার্ভারে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. পক্ষপাতদুষ্টতা ও ন্যায়সঙ্গততা (Bias & Fairness)

- AI যদি পক্ষপাতদুষ্ট (biased) হয়, তবে এটি শিশুদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি করতে পারে।
- ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে কীভাবে AI-এ অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

সমাধান :

- শিশুদের জন্য তৈরি AI মডেলগুলোতে সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- পক্ষপাত কমানোর জন্য AI সিস্টেমগুলোর নিয়মিত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন করা জরুরি।
- AI-এর Explainability বা ব্যাখ্যাযোগ্যতা নিশ্চিত করা উচিত, যাতে এটি কিভাবে কাজ করে তা বোঝা যায়।

৩. ডিজিটাল আসক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্য (Digital Addiction & Mental Health)

- শিশুরা AI-ভিত্তিক ডিভাইসে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে মানসিক স্বাস্থ্যে কী প্রভাব পড়বে?
- স্ক্রিন-টাইম সীমাবদ্ধ করার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

সমাধান :

- পিতামাতা ও শিক্ষকদের জন্য AI-নিয়ন্ত্রিত অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ (Parental Control) ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- AI-ভিত্তিক শিক্ষামূলক অ্যাপগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট বিরতি ব্যবস্থা (Break Reminders) থাকা দরকার।
- AI-চালিত শিশুদের বিনোদনমূলক প্ল্যাটফর্মগুলোর নীতিমালা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে সেগুলো মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়।

৪. শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশে প্রভাব -

- AI কি শিশুদের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা কমিয়ে দিচ্ছে?
- শিশুরা কি বাস্তব জীবনের পরিবর্তে ভার্চুয়াল সম্পর্কের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে?

সমাধান :

- শিশুদের জন্য AI-ভিত্তিক অ্যাপগুলোর মাধ্যমে বাস্তবজীবনের সামাজিক যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- AI-নির্ভরতা কমানোর জন্য স্কুল ও পরিবারের ভূমিকা জোরদার করতে হবে।
- AI যেন শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা (Critical Thinking) বিকাশে সহায়ক হয়, তা নিশ্চিত করা দরকার।

৫. ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তি (Misinformation & Fake Content) -

- AI-ভিত্তিক চ্যাটবট বা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি ভুল তথ্য দেয়, তবে শিশুদের শেখার ক্ষতি হতে পারে।
- শিশুদের মধ্যে বিভ্রান্তি কমাতে কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত?

সমাধান :

- শিশুদের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যাচাইযোগ্য তথ্যসূত্র নিশ্চিত করতে হবে।
- AI-ভিত্তিক শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মে ফ্যাক্ট-চেকিং (Fact-Checking) অ্যালগরিদম সংযুক্ত করা জরুরি।
- শিশুদের ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার দক্ষতা বাড়াতে হবে।

AI ব্যবহারের নীতিগত নির্দেশনা (Ethical Guidelines for AI in Childcare)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিশুদের জন্য AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো মেনে চলা উচিত:

✓ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Transparency & Accountability)

- AI কীভাবে কাজ করছে এবং শিশুদের কীভাবে প্রভাবিত করছে, তা বোঝার সুযোগ থাকতে হবে।
- AI পরিচালনার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

✓ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা (Security & Privacy)

- শিশুদের ডেটা সংগ্রহের আগে অভিভাবকের অনুমতি বাধ্যতামূলক করা উচিত।
- ডেটা এনক্রিপশন ও নিরাপদ স্টোরেজ পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে।

✓ ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতমুক্ত AI (Fair & Unbiased AI)

- AI যেন জাতি, লিঙ্গ, ভাষা বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- AI-ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

✓ ডিজিটাল সুস্থতা (Digital Well-being)

- শিশুদের স্ক্রিন-টাইম সীমাবদ্ধ রাখতে অভিভাবকদের সহায়তা করা উচিত।
- AI যেন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ক্ষতি না করে, তা নজরদারি করা দরকার।

উপসংহার : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিশুদের শিক্ষাগত উন্নয়ন ও মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, তবে এর ব্যবহার অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ও নৈতিক হওয়া উচিত। গোপনীয়তা রক্ষা, ন্যায়সঙ্গততা, মানসিক সুস্থতা এবং ডিজিটাল আসক্তি রোধের জন্য যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। শিশুদের জন্য AI ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক, এবং শিক্ষকদের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে AI শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, ন্যায়সঙ্গত, এবং কল্যাণমূলক প্রযুক্তি হয়ে ওঠে।

AI শিশুদের শিক্ষায় বিপ্লব আনলেও এর নৈতিকতা নিয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। শিশু মনোবিজ্ঞানের আলোকে AI-এর সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নীতিনির্ধারক, গবেষক ও অভিভাবকদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে যেন শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ব্যাহত না হয়।

Bibliography:

Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. Norton. [pp. 1-30] (Cognitive development in early childhood)
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press. [pp. 79-91] (Zone of Proximal Development and social learning)
Freud, S. (1953). The Interpretation of Dreams. Standard Edition, Vol. 4-5 [pp. 536-620] (Psychoanalytic perspectives on cognitive development)
Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books. [pp. 1-15] (Children's learning and AI-driven education)
Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson. [pp. 1020-1050] (Ethical considerations in AI)
Floridi, L. (2013). The Ethics of Information. Oxford University Press. [pp. 150-170] (AI ethics and information privacy)
Chatterjee, A., & Bhattacharya, S. (2021). "Ethical Challenges of AI in Child Psychology and Education." Journal of Ethics and AI, 3(1), [pp. 45-67]
Sharkey, N., & Sharkey, A. (2010). "The Crying Shame of Robot Nannies: An Ethical Appraisal." AI & Society, 25(1), [pp. 1-18]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 763 - 778
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Borenstein, J., & Howard, A. (2021). "The Ethics of AI in Education: Bias, Privacy, and Psychological Impact on Children." Journal of Educational Technology & Society, 24(2), [pp. 19-30]
Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). "Systematic Review of Research on Artificial Intelligence in Education." International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), [pp. 1-27]
Bryson, J. J. (2018). "The Ethics of Artificial Intelligence and Robotics." Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, [pp. 316-334]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 779 - 785
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 779 - 785
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অথ প্লুটো কথা : পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন প্রান্তজনেদের ঐতিহাসিক আলেখ্য

পল্লব হালদার
স্বাধীন গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, স্নাতকোত্তর প্রাক্তনী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: pallabhalder8055@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
East Kolkata, Creatively, Ecology, Marginalisation, Environment, Cognitive Apartheid, Pluto, Traditional Knowledge.

Abstract
Environmental history has emerged as a highly relevant topic in recent historical studies. At the heart of which is the study of the history of people related to the environment. We will focus on one of the two perspectives on history: 'History from Above' and 'History from Below'. The study of environmental history also begins from the perspective of 'History from Below'. Because the people of the lower classes are always closely involved with the environment. One notable example of this relationship between people and in the environment is the East Kolkata Wetlands, an area spanning 125 square kilometres in the eastern part of Kolkata with 260 fish ponds. This wetland is absorbing the cities clods like Neelkantha Shiva. In fact there is no separate sewage system in Kolkata. Everyday 910 million litres of liquid waste from the city ends up in this wetland. The local people of East Calcutta wetlands here use natural methods to purify the wastewater with their creative knowledge. As a result, they annually produce 20,000 tons of fish, 150 tons of vegetables, 16,000 metric tons of rice by using this purified water. Not only in productivity, but also absorbs about 60% of the city's carbon. Most of which is given to the city dwellers. The clean air, the fish, the vegetables and the fragrance of the beads, this wetlands give back to the city dwellers everything that is good, everything that is pleasant. The local people are the ones who churn out nectar by churning the mechanical clods of the city. The people adjacent to the wetlands have saved the environment of Kolkata city by using their creative traditional knowledge, and have developed a metabolic relationship between Kolkata and its surrounding environment. In the words of environmentalist Ghosh which is well known as 'Living Creatively with Nature'. But this people remain marginalized to the main stream of society. The resident of the East Kolkata Wetlands are treated as 'peripheral' or 'other' by the mainstream city dwellers. This situation replace a type of 'Cognitive Apartheid' or 'knowledge-based discrimination', as described by environmentalist Dhrubajyoti Ghosh. This term highlights the exclusion of this people's traditional knowledge and practices from the main stream recognition

and value systems. According to Marxist theory, when wealth is concentrated from villages to cities, cities become powerful in all aspects, and as a result, marginal areas remain marginal. This evident in the perception of the wetland community by urban dwellers, who often see them as 'backword' or less significant. Despite this margin these people continue to perform essential environmental function, creating a 'living creatively with nature' model that sustains both their livelihoods and the cities ecological health. This discussion shedding light on marginalisation, livelihoods, creativity and the relationship between people and environment of East Kolkata Wetlands.

Discussion

পূর্ব কলকাতার বাস্তুকথন : সময়টা সপ্তদশ শতকের শেষের দশক। জোব চার্ণক তৎকালীন বাংলায় উপস্থিত হয়েছেন ব্রিটিশ বণিকদের শক্তি কেন্দ্র অনুসন্ধানের জন্য। অবশেষে তিনি কলকাতাকেই ব্রিটিশ বণিকদের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে কলকাতাকে ব্রিটিশ শক্তি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। শহরের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল এর মূলে। কলকাতার বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে নিন্দার স্তুতি পাওয়া যায় শাসক বর্গের গেজেটিয়র, ডায়েরি, লেখ্যাগারের তথ্যাদিতে। কলকাতার বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে তাদের সব থেকে অপছন্দের জায়গা ছিল পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করে বেরিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, -

> "শ্রী চার্ণক মহাশয়ের কাছে স্বাধীনতা ছিল, হুগলি নদীর তীরবর্তী যে কোন স্থানকে বেছে নেওয়ার। কিন্তু তিনি সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গাটিকে বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ার কারণ ছিল পূর্বে লবণ হ্রদের অবস্থান। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রচুর মাছ জন্মাতো এই হ্রদে। কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জল শুকিয়ে গেলে মাছগুলো মরে শুকিয়ে যেত, আর উত্তর-পূর্বের বাতাস টেনে আনতো সেই পচা মাছের দুর্গন্ধ।"[১]

জেমস রেনাল্ড মার্টিন তাঁর *'নোটস অফ দ্য মেডিকেল টোপোগ্রাফি অফ ক্যালকাটা'* গ্রন্থতে লিখেছিলেন এই জলাভূমির মড়ক গত গুণাবলীই মিয়াজমা (Miasma) বা কু-বাতাস তত্ত্বের জন্ম দেয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন; কলকাতার অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশ - এর উপরে ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। আর এক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল কলকাতার বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ। তাই কলকাতার সুন্দর প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য তাদের অনুপ্রাণিত করেনি। ফলত জলাভূমি সম্পর্কিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের তথ্যাদিতে পাওয়া যায়। যাইহোক, এই অস্বাস্থ্যকর বাস্তু তান্ত্রিক পরিবেশকে মাথায় রেখে তার সমাধান সূত্র হিসেবে কলকাতার সংস্কার সাধন বা নগরায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮০৩ সালের ১৬ই জুন ওয়েলেসলির মিনিটে কলকাতার ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়, -

> "নিকাশি নালাগুলি হুগলি নদী মুখী করা উচিত হয়নি। কারন কলকাতার ভূমির ঢাল পূর্বে লবণ হ্রদের দিকে। ফলে বর্ষায় জলবন্দি হয়ে পড়া স্বাভাবিক।"[২]

এর থেকেই সৃষ্টি হয় যাবতীয় রোগপীড়ার। ফলত কোম্পানির কর্মকর্তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংস্কার। ১৮০৩ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে লবণ হ্রদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ছিল নানা প্রকল্প, পরিকল্পনা। এই সংস্কার সাধন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কলকাতার জলাভূমির প্রেক্ষিতে হস্তক্ষেপ করে। যাকে বলা হয়; ঔপনিবেশিক *জলবিদ্যার হস্তক্ষেপ বা Colonial Hydrological Interventions*।[৩] ফলস্বরূপ ১৯২৮ সালে বিদ্যাধরী নদীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বিদ্যাধরী ছিল পূর্ব কলকাতা জলাভূমির লবণ জল সরবরাহের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু বিদ্যাধরীর মৃত্যুতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 779 - 785
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নোনা জলের হ্রদ পরিবর্তিত হয় ময়লা জলের হ্রদে বা জলাভূমিতে। আর এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জলাভূমিকে কেন্দ্র করে মাছ চাষের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। আবার শুধু মাছ চাষ নয়, ধান ও অন্যান্য উদ্যান ফসলও এখানে চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তারা হলেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। যারা তাদের সৃজনশীল জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শহরের বর্জ্য জলকে পরিশুদ্ধ করে ফসল ফলায়। কিন্তু কলকাতার শহরবাসী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, গবেষকরা এই সমস্ত মানুষদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক জ্ঞানের যথার্থ মর্যাদা দেয়না। যাকে অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ 'জ্ঞানীয় বর্ণবাদ' বা 'Cognitive Apartheid' বলেছেন।[৫] শুধু জ্ঞান সংক্রান্ত বর্ণবাদই নয় কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন যথাযথ সৃজনশীলতার সাথে বসবাসকারী মানুষদের সম্বন্ধে কলকাতার নগরবাসীর মনে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে প্রান্তিক ও প্রান্তিকতার ধ্যান ধারণার। প্রান্তিকতা এর কোন সাধারণ সূত্র নেই যার দ্বারা একে এক কথায় বুঝে নেওয়া যায়। প্রান্তিকতা একটি বহু আলোচিত ও বহু বিতর্কিত বিষয়। পূর্ব কলকাতা জলাভূমির প্রান্তজনেদের ইতিহাস বোঝার সুবাদে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রান্তিকতার ওপর আলোকপাত করছি।

প্লুটো উপাখ্যান : শৈশবকালে সরব পাঠ করতাম ন-এ নবগ্রহ। কিন্তু পরবর্তীকালে জানতে পারলাম প্লুটো গ্রহের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ প্লুটোকে বামন গ্রহ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ইউনিয়ন। কারণ প্লুটোর বৈশিষ্ট্য কুলীন গ্রহ সমতুল্য নয়। যাইহোক, এই প্রবন্ধে প্রান্তিক মানুষদেরকে প্লুটো হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। রবি ঠাকুরের ভাষায় যারা হলেন *'পিলসুজ সম'*।[৬] ২০০৬ সালে প্লুটোকে যেমন আমরা গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বামন গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরা কলকাতার শহরবাসীর কাছে একইভাবে বামন বা প্রান্তিক রূপে পরিগণিত হয়েছেন। দলিত, শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতে প্রান্তিক শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিকতা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রান্তিকতার সর্বজনীন গ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নেই। প্রান্তিকতা শব্দটির মধ্যে রয়েছে প্রান্ত শব্দটি। অর্থাৎ যা কেন্দ্রের বিপরীতে। মূলত কোন কিছু যখন কেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। সহজ ভাষায়, প্রান্তিকতা হল প্রান্তে ঠেলে দেওয়া, বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা থেকে বাদ দেওয়া বা দূরে সরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে উপেক্ষিত, বর্জিত বা অবহেলিত। প্রান্তিকতা বিভাজিত হয় মূলত সামাজিক প্রান্তিকতা, অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা, রাজনৈতিক প্রান্তিকতা, সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা। এই সমস্ত প্রেক্ষিতে একে বিশ্লেষণ করার কতগুলি সূচক রয়েছে, যথা - শ্রেণিগত সূচক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদর্শিক ব্যবস্থা, সামাজিক সচেতনতা এবং মানবিক কর্মকাণ্ড। এরদ্বারাই প্রান্তিকতাকে বোধগম্য করা যায়। আর পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন মানুষের সঙ্গে জড়িত রয়েছে প্রান্তিকতা বিষয়টি। এই সমস্ত মানুষদের অবস্থান বোঝাতে অধ্যাপিকা জিনিয়া মুখার্জি, পরিবেশবিদ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ প্রমুখরা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংক্রান্ত গবেষণায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন প্রান্তিক ও প্রান্তিকতা শব্দ দু'টি। এই প্রান্তজনেদের প্রান্তিক হয়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যার প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে উঠে আসে কেন তারা প্রান্তিক? কীভাবে তারা প্রান্তিক?

অন্যের চোখে 'তারা' এবং 'তাদের' প্রান্তজীবন : পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ৩৭টি মৌজা জুড়ে বিস্তৃত, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত। এই ৩৭টি মৌজার জনসংখ্যা দেড় লক্ষ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে এখানকার ৮৩ শতাংশ মানুষই তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্ত এবং ৭৪ শতাংশ মানুষ জলাভূমিতে মাছ চাষ কৃষিকাজ এবং উদ্যান পালনে নিযুক্ত।[৭] পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে সরাসরি আয়ের উৎস হিসেবে কৃষি কাজ, মাছ ধরা এবং অন্যান্য ক্রিয়া কলাপে নিযুক্ত পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা[৮] –

ক্রমিক নং	পেশা	পরিবারের সংখ্যা
১.	কৃষিকাজ	৫৮৬৪
২.	মাছ চাষ	৫২০৯
৩.	অন্যান্য	৩০৭৭
৪.	মোট	১৪১৫০

স্থানীয় মানুষেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের দ্বারা সৌরকিরণ, শ্যাওলা, কলিফার্ম ব্যাকটেরিয়া, কচুরিপানা, আগাছা, কেরোসিন প্রভৃতি ব্যবহার করে ময়লা বর্জ্যকে পরিশুদ্ধ করে সবজি চাষ, মাছ চাষ, আমন ও বোরো ধান এবং অন্যান্য ফসল চাষ করে থাকে। জলাভূমি সংলগ্ন মানুষদের ব্যবহৃত এই প্রাকৃতিক জ্ঞানকেই ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ 'Low-cost Folk Technology'[৯] বলেছেন। কিন্তু কলকাতার নগরবাসীর নিকট জলাভূমি ও তার সংলগ্ন এলাকার মানুষেরা প্রান্তিক হয়ে উঠেছেন বা তাদের প্রতি প্রান্তিকতার ধারণা গড়ে উঠেছে। আর এই প্রান্তিকতা বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে জলাভূমি সংলগ্ন খেয়াদহ গ্রামের স্কুল শিক্ষক দিব্যদ্যুতি সরকার রচিত *'বাঁচিয়ে রাখো বেঁচে থাকো কবিতায়'*। বিষয়টি বোধগম্য করতে কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরছি[১০] –

> "আপনারা দিয়েছেন আমাদের পীচ কালো ময়লা জল, আবর্জনা
> ধাপার মাঠ, কিছুটা করুণা আর সীমাহীন ঔদাসীন্য।
> আর আমরা শহরের প্রান্তে পড়ে থাকা, গায়ে গতরে খাটা মানুষেরা
> তার বদলে ফিরিয়ে দিয়েছি আপনাদের ক্ষুধার অন্ন,
> রান্না ঘরে বারোমাসের শাকপাতা সবজী, বাটিতে সুস্বাদু মাছ
> আর আপনাদের ফুসফুসের জন্য অনেকটা শুদ্ধ সবুজ শুভেচ্ছার বাতাস...
> এই শহরটারও যেন সেই অজ্ঞান দশা
> তাই সে বুঝলো না পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার দাম
> তাই সে দিল না গ্রামকে ধন্যবাদ জলাভূমিকে সম্মান।
> শত বছর ধরে এই সভ্যতার সমস্ত গ্লানি ক্লেদ শুষে নিয়েছে
> এই ঘাস জল জংলার ভূমি ফিরিয়ে দিয়েছে...।"

কবিতাটির মাধ্যম্যে ফুটে উঠেছে নগর ও গ্রামবাসীর মধ্যে পার্থক্য। সে পার্থক্য মননের। নগরবাসীর নিকট জলাভূমির সাধারণ মানুষেরা সর্বদা জংলা হয়েই থেকেছেন। অর্থাৎ নগরবাসীর (অন্যের) চোখে তারা কখনই নগরীয় সংস্কৃতির একাংশ হয়ে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে সানা হক তাঁর প্রবন্ধে একজন জলাভূমি সংলগ্ন বাসিন্দা সুদাম মুন্ডার সাক্ষাৎকার তুলে ধরেছেন। সেখানে ওই বাসিন্দা সুদাম মুন্ডা বলছেন; ...এভাবেই বহিরাগতরা বিপুল সংখ্যায় এই সমস্ত এলাকায় এসে আমাদের বাস্তুচ্যুত করছে এবং আমাদের উপজাতীয় (ইনি একজন মূলনিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ) রীতি-নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। জমি বিক্রি ও জমিতে অন্যান্য বহিরাগত মানুষের বসবাস বৃদ্ধির ফলে আমাদের ধর্ম, ভাষা, বিভিন্ন প্রথা ঐতিহ্য সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাদরি ভাষায় এলাকার মানুষ আর কেউ কথা বলেন না। মুন্ডারি ভাষা প্রায় মৃত। আমাদের গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের উৎসবের চেয়ে দুর্গা ও কালীপুজোয় বেশি উৎসাহী।[১১]

জলাভূমি এলাকার মানুষদের জীবন যাপনের মান খুবই নিম্ন। এখানকার মানুষেরা অল্প শিক্ষিত পশ্চিমবঙ্গের অশিক্ষার হার যেখানে ৩৬.৯৪ শতাংশ, জলাভূমি এলাকাতে এই হার একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৭ শতাংশ। প্রায় ৩ শতাংশ বেশি।[১২] যার কারণে বহিরাগত দালাল বা প্রোমোটারেরা তাদের ভুল বুঝিয়ে জমি ভেড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে। বাসিন্দাদের বেশিরভাগেরই নেই পাকা বাড়ি, নেই আলাদা প্রসাধনাগার ও রান্নাঘর। ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন এই এলাকাকে বাদ রেখেছে তাদের মিশন থেকে। ফলত আলাদা কোন প্রসাধনাগার নেই, রয়েছে গোষ্ঠীগত প্রসাধনাগার।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 779 - 785
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যার কারণে সর্বাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন জলাভূমি সংলগ্ন এলাকার নারীরা। এছাড়া মাছ চাষে নিযুক্ত কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন; ডায়রিয়া, রক্তাল্পতা, রাতকানা, টাইফয়েড, কলেরা, ত্বকের সমস্যা প্রভৃতি। জলাভূমি এলাকার মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো জমির মালিকানা সংক্রান্ত। জলাভূমি এলাকার জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অর্থাৎ জমি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাধীনতা নেই। এক্ষেত্রে সরকার ভূমি ব্যবহারকারীদের ভূমি ব্যবহারজনিত কোন সুযোগ সুবিধা না দিয়ে, ভূমি ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে ব্যবহারকারীদের যদি চাষে ক্ষতিও হয়, তবুও তারা জমি বিক্রি করতে পারেন না। যার কারণে তারা জমি মাফিয়াদের কাছে স্বল্পমূল্যে বেআইনি ভাবে জমি বিক্রি করে ক্ষতিপূরনের সচেষ্ট হয়। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও জলাভূমি এলাকার ভূমিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবির উপর ভিত্তি করে আমেরিকার একদল গবেষকমন্ডলী জানাই ১৯৭২ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জলাভূমি এলাকার ভূমি ১৭.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[১৩] নগরায়নের সুবাদে মোটামুটি তিন ধরনের ভূমি পরিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে বলে শর্মিলা ব্যানার্জি ও দেবাঞ্জনা দে উল্লেখ করেছেন; জলাশয় থেকে নগর বসতিতে, কৃষি ক্ষেত্র থেকে নগর বসতিতে এবং ফাঁকা বা খোলা জায়গা থেকে নগর বসতিতে।[১৪] এই ভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবিকা বা পেশারও পরিবর্তন ঘটছে। এখানকার মানুষের জীবিকাকে বা পেশাকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণি, এই শ্রেণির মানুষেরা শহরের বর্জ্য জল ব্যবহার করে কৃষি কাজ করে, মাছ ধরে, নিজের জমিতে হোক বা ভেড়িগুলিতে মজুর হিসেবে কাজ করে কলকাতার হোটেল গুলো থেকে খাবারের বর্জ্য সংগ্রহ করে এবং এই সংগৃহীত খাবার মাছের ভেড়িগুলোতে সরবরাহ করে। দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষেরা জীবিকা উপার্জনের জন্য জলাভূমি সংক্রান্ত পেশা ও অন্যান্য পেশার উপর নির্ভরশীল। তৃতীয় শ্রেণি মূলত জলাভূমি সংক্রান্ত পেশা নয় পুরোপুরি অন্যান্য পেশার ভিত্তিতে জীবিকা উপার্জন করে থাকে।[১৫] সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, প্রান্তিকতার অপর এক দিক নির্দেশক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জলাভূমি এলাকার ৮৩ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতি ও উপজাতি বংশোদ্ভূত। এই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে মুন্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, সর্দার প্রভৃতি। এরা ঔপনিবেশিক আমলে রাঁচি, হাজরীবাগ, সিংভূম থেকে এসেছিলেন। অতি নগরায়নের কারণে জলাভূমি এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের নগরীয় সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নগরীর সংস্কৃতিবান মানুষেরা তাদের (জলাভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের) সাংস্কৃতিক রীতিনীতি,ধর্ম, বিশ্বাস উৎসবকে প্রান্তিকতার দৃষ্টিতে দেখেন। যার কারনে ঐ সমস্ত তপশিলি জাতি উপজাতির মানুষেরা নিজস্ব সংস্কৃতিকে হীন মনে করে, নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ (অন্যের চোখ দিয়ে নিজেদের বিচার করছেন) সংস্কৃতি গ্রহণ করছে। যেমন তাদের সাদরী ভাষাতে আর কেউ কথা বলে না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য; নিম্ন বর্গীয় তত্ত্ব অনুসারে রাজকুমার চক্রবর্তীর মতে,[১৬] গ্রামশি বলেছিলেন নিম্নবর্গের মানুষের দুটি পরস্পর বিরোধী চেতনা (Contradictory Conciousness) থাকে। একটি তার ব্যবহারিক জগৎ - তার কথাবার্তা, চলাফেরা - এখানে সে বিকৃত, নষ্ট। উপর ওয়ালাদের ভাবধারায় নির্মিত। কিন্তু আরেকটি চেতনা তার ব্যবহারিক জীবনের আড়ালে থেকে যায়, উঁকি মারে - এখানে সে স্বাধীন স্বশাসিত। এটিই তার প্রকৃত চেতনা। উচ্চ বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় এই জগৎটাই উঠে আসে সামনের সারিতে। সাব অলটার্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় দিকটিকে নিয়েই গবেষণা করেছিলেন। উক্ত আলোচনাতেও প্রাধান্য পেয়েছে নিম্নবর্গীয়দের দ্বিতীয় চেতনার দিকটি।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকার মানুষদের প্রান্তিক হয়ে ওঠার কতগুলি কারণ হল -

(১) নগরায়ণ/ অতি নগরায়াণ। এখানে একটি অন্যতম বিষয় হল নগরায়নের দ্বৈতসত্তা,উন্নয়ন ও প্রান্তিকতা। সে প্রাচীন কালের হরপ্পা হোক আর আধুনিক কালের কলকাতা। অতি নগরায়নের শিকার শুধু প্রান্তজনেরা নন, কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশও এর শিকার।

(২) উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমীয় মডেলের অনুকরণ। যথা - ডা. বিধানচন্দ্র রায় নেদারল্যান্ডস-এর পোল্ডারভূমি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই মডেলেই গড়ে তোলেন তাঁর স্বপ্নের শহর 'বিধাননগর'। অর্থাৎ গরিব মানুষেরা তাদের জমি, জল ও জ্ঞান থেকে উন্নয়নের পশ্চিমী মডেল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

(৩) রাষ্ট্রীয় অভিজাতদের হস্তক্ষেপ এবং অভিজাতদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মদত।

(৪) জলাভূমির জল ও জমির ওপর রাষ্ট্র ও বাজারের আধিপত্য।

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি। স্বাধীনতালাভ ও তার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের ফলে অভিবাসন। তাছাড়া স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৬) অন্যতম প্রধান কারণ হল, সরকারি উদ্যোগের অনীহা।

তবে এখন বিষয় হল আধুনিক সভ্যতায় এই সমস্ত মানুষদের অবদান কীরূপ?

সৃজনশীলতায় প্রান্তিক মানুষ : কলকাতা নগরীর সন্নিকটে অথচ নগরবাসীর মনন হতে দূরে অবস্থিত পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরা। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের দ্বারা নগর হতে নির্গত বর্জ্যকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করে আর্থিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটায়। ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের ভাষায়, -

> "in the East Calcutta Wetlands this role is played by a blend of positive human intervention and a favorable ecosystem. It is this synergic interaction between man and nature that provided the stock of capital assets from where flows of services are generated. Such services bestow on this wetland it's primary and secondary economic values."[১৭]

রামসার কনভেনশন জলাভূমিগুলোর জ্ঞান সম্পর্কীয় ব্যবহারের (Wise Use) কথা বলেছে –

> "the maintenance of their ecological character achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of sustainable development."[১৮]

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরা শুধুমাত্র তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা এ কাজ করে থাকেন। যাকে পরিবেশবিদ ঘোষ living creatively with nature বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ রাজ্য সরকারকে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি তত্ত্বাবধান করার জন্য আলাদাভাবে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এই পরিশুদ্ধকরন প্রক্রিয়ায় পরিবেশের সঙ্গে তারা গড়ে তোলে এক অনন্য মেলবন্ধন। তাদের এই জ্ঞানের ধারা বংশ পরম্পরায় প্রবাহমান। এক্ষেত্রে মনে পড়ে যায়, গুগি ওয়া থিঙ্গো (Ngugi wa Thing'o) রচিত *'Decolonising the Mind'* – এর কথা। যেখানে আমরা দেখতে পাই, সাম্রাজ্যবাদী ভাষা যখন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ভাষা সংস্কৃতি কে গ্রাস করতে উদ্যত। কিন্তু ল্যাটিন ভাষার ন্যায় আফ্রিকার ভাষাগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই সমস্ত প্লুটোরা'ই (কৃষক, শ্রমিক) আফ্রিকার ভাষা সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছিল। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরাও প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে তুলেছে সুনিবিড় সম্পর্ক। এরাও আফ্রিকার কৃষক শ্রমিকদের ন্যায়, তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের দ্বারা কলকাতার জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে বা রাখবে। তাই তাদেরকে কখনোই প্রান্তিক বলা চলে না। তারা প্রান্তিক নন, তারা হলেন সৃজনশীল মানব।

২০০৬ সালে প্লুটোকে আমরা গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিলেও বা বামন গ্রহ হিসেবে বর্ণনা করলেও তাতে প্লুটোর কিছু এসে যায় না। সে সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজের কক্ষপথে সদা আবর্তন ও পরিক্রমনে ব্যস্ত। একই রকমভাবে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন মানুষদের মূল স্রোতের মানুষেরা বা কলকাতা শহরবাসীরা প্রান্তিক করে দিলেও, জলাভূমির সৃজনশীল মানুষেরাও প্লুটোর ন্যায় জলাভূমিকে কেন্দ্র করে আপন ছন্দে জীবন নির্বাহে ব্যস্ত।

Reference:

১. সুর, নিখিল. *কলকাতার নগরায়ণ: রূপান্তরের রূপরেখা (১৮০৩-৭৬)*, সেতু প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ৫৭

২. সুর, নিখিল. *কলকাতার নগরায়ণ.* তদেব, পৃ. ১০৬

৩. D'Souza, Rohan. "Water in British India : The Making of Colonial Hydrology." *History Compass,* vol. 4, no. 4, 2006, pp. 621-628

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রাশিয়ার চিঠি*, দ্বিতীয় সংস্করণ. বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৬, পৃ. ১

৫. Ghosh, Dhrubajyoti. "Dhrubajyoti Ghosh on Cognitive Apartheid and Positive Ecological Footprint." Filmed 9 Feb. 2017, Bhoomi College Video, 03:01, www.youtube.com. Accessed 22 Mar. 2025

৬. "East Kolkata Wetlands: Management Action Plan 2021-2026." East *Kolkata Wetlands Management Authority and Wetlands International South Asia*, www.environmentwb.gov.in. Accessed 24 May 2023

৭. Chattopadhyay, Kunal. *Environmental Conservation and Valuation of East Calcutta Wetlands.* Indian Statistical Institute, 2001, p. 38

৮. Ghosh, Dhrubajyoti. Ecology and Traditional Wetland Practice: Lesson from Wastewater Utilisation in the East Kolkata Wetlands. Worldview, 2005, p. 94

৯. সরকার, দিব্যদ্যুতি. "বাঁচিয়ে রাখো বেঁচে থাকো." *পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে সমাচার পত্র, পঞ্চায়েতীরাজ*, চতুর্দশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই – আগস্ট -সেপ্টেম্বর- অক্টোবর, ২০২১, পৃ.১৫৭-৫৮

১০. Haque, Sana. "The Impact of Development of Kolkata on Tribal Culture of East Kolkata Wetlands." *Indian Anthropological Association*, vol. 48, no. 2, July-Dec. 2018, p. 55

১১. দাশগুপ্ত, ধ্রুবা. "জলাভূমি সমীক্ষার ইতিবৃত্ত." *উৎস মানুষ*, ৩৫ তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই -সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ. ১০-১৩

১২. Roy, Anamika. "Diminishing Wetlands of East Kolkata and its Socio-Economic Impact on Thakdari Mouza, North 24 Parganas." *Multidisciplinary Journal of Humanities and Social Science,* vol. 3, no. 2, 2019, p. 2

১৩. Banerjee, Sarmila, and Debanjana Dey. "Eco System Complementarities and Urban Encroachment: A SWOT Analysis of the East Kolkata Wetlands, India." *Cities and Environment* (CATE), vol. 10, no. 1, 2017, Article 2

১৪. Ghatak, Debaleena Saha. *Trade of between Conservation of Environment and Economic Development? A Case Study of East Kolkata Wetlands.* The Hague, Netherlands, 2010, p. 21

১৫. ঘোষ, কৌশিক, এবং সুমন, মুখার্জী. ইতিহাস লিখনের অধ্যয়ন এবং গবেষণা প্রকরণ. বুক পোস্ট পাবলিকেশন, ২০১৯, পৃ. ৩০৮

১৬. Ghosh, Dhrubajyoti. *Ecology and Traditional Wetland Practice: Lesson from Wastewater Utilisation in the East Kolkata Wetlands.* Worldview, 2005, p. 94

১৭. Ramsar. "The Wise Use of Wetlands." *The Convention on Wetlands*, www.ramsar.org. Accessed 28 Mar. 2025

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 786 - 792
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সাহিত্যের আলোকে পশ্চিমবঙ্গে নারীশিক্ষা (১৯৪৭-২০১১) : কয়েকটি সূত্র

ড. সমীর মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশিপাড়া
Email ID : samirmandalchak@gmil.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Women, higher education, West Bengal, literature, college, condition, politics, struggle.

Abstract
Today access to education is offered to people from all strata of society in West Bengal. Both the union government and the state government took up the development and expansion of women's education at all stages as a special scheme since independence. I will attempt to show the conditions of women in higher education in West Bengal as reflected in Bengali literatures. The picture of higher education of women is reflected in contemporary Bangla literature. We know that literature is the reflection of human activities. We can cite some important contemporary novels to understand how higher education of women is highlighted. These novels show us the status of women in higher education in West Bengal. The memoir Sreesadaner Sreematira, written by Reeta Basu, is the reflection of the school hostel of girls, established by Rabindranath Tagore in Santiniketan. We can understand the mentality of the parents of women as well as women's education at the time of 1960s and 1970s from her writings. The novel Ekushe Pa, written by Bani Basu, is the story of West Bengal during 1980s and 1990s. The author told the story of a band of youth, who entered the college for undergraduate studies at the age of eighteen years and graduated at the age of twenty one years. Even, after marriage the situation worsened. Bani Basu in another novel, Amrita, portrayed the situation. We can discuss another novel, in where we find another picture of the presence of women in higher education scenario of the state. The novel Jalchhabi written by Suchitra Bhattacharya is the reflection of the college education and struggle of women who had achieved service in schools by the School Service Commission. The novelist showed the complexities of continuing domestic duties and works of public domain, which women had to face. We would also see that the people gradually understood the benefits of higher education. Hence more girls' students were engaged in higher education day after day. The enrolment of students including girls' students was rising step by step.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বর্তমানে সমগ্র ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বিশেষত নারী শিক্ষার বেশ অগ্রগতি ঘটেছে। তবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পূর্বে এ দেশে নারী শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটেছে। বলা হয়, সমাজ জীবনের দর্পণ হল সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার প্রতিফলন সাহিত্যের মধ্যেও ঘটেছে। এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করবো মূলত সাহিত্যের আলোকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষা। এই পর্বে বহু সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যেগুলি নারীদের শিক্ষা সম্পর্কিত। তবে এই স্বল্প পরিসরে এবং আলোচনার সুবিধার জন্য কিছু সাহিত্য নির্বাচিত হয়েছে। এই সাহিত্যগুলিতে নারী শিক্ষা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা দেখানোর চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গত প্রামাণিক তথ্য হিসাবে কিছু সরকারি নথির সাহায্য নিয়েছি। এই আলোচনায় নারী শিক্ষা প্রসারের প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবস্থান, সাফল্য প্রভৃতি দিক দেখানোর চেষ্টা করবো।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এদেশে নারী শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। ঔপনিবেশিক সরকার নারী শিক্ষার বিষয়ে প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ‘উডের ডেসপ্যাচ’-এ। এই পর্বে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখের উদ্যোগে নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এই পর্বের নারী শিক্ষার চিত্র উপলব্ধি করা যায় শ্রীমতী রাসসুন্দরীর *আমার জীবন* থেকে।[১] এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, *আমার জীবন* শুধুমাত্র শ্রীমতী রাসসুন্দরীর নয়, সে কালের অনেক নারীর জীবনের চিত্র এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। সে কালে গ্রাম্য নারীদের ভয়, লজ্জা ও সামাজিক সংস্কার কিভাবে প্রকাশ পেত, তা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই গ্রন্থে শ্রীমতী রাসসুন্দরী বলেছেন যে, ১২১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন, সে সময় একজন নারীকে পরিবারে পাঁচটি ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে হত – কন্যা, বোন, ননদ, পুত্রবধূ এবং গৃহকর্ত্রী হিসাবে।[২] তিনি বলেছেন, বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রথম মা হয়েছিলেন। তিনি ১০ পুত্র এবং ২ কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের যখন জন্ম দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪১ বছর।[৩] তিনি দেখিয়েছেন যে সে সময় পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনাকে অবহেলা করা হত। কোন মেয়ের হাতে পড়াশোনার লক্ষ্যে এক টুকরো কাগজ দেখলেই পরিবারের অন্যেরা, বিশেষত বয়স্ক মহিলারা, ভীষণ আপত্তি জানাতো। তিনি লিখেছেন যে *চৈতন্যভাগবত* পড়ার তীব্র আকাঙ্খা তাঁকে তাঁকে পড়াশোনা শিখতে আগ্রহী করেছিল।[৪] সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে সময় কয়েকজন নারী আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৬১-১৯২৩) এবং চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারী হিসাবে প্রথম স্নাতক হয়েছিলেন। তবে কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে পরবর্তীকালে মেডিক্যাল পড়ার সময় রক্ষণশীল সমাজের তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন (মতান্তরে ২৩শে জুন) কাদম্বিনী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন।[৫] কিন্তু তাঁর মেডিক্যাল পড়ার তীব্র বিরোধী এই কলেজের প্রবল রক্ষণশীল চিকিৎসক রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র মেডিসিন পেপারে মৌখিক পরীক্ষায় এক নম্বরের জন্য কাদম্বিনীকে ফেল করিয়ে দেন।[৬] এরপর ‘লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি’ পড়ার পর ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি আবার তাঁর বিষয়ে কাদম্বিনীকে ফেল করিয়ে দেন।[৭] এরপর কাদম্বিনী বিলাতে গিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁর কাঙ্খিত এল আর সি পি, এল আর সি এস এবং এল এফ পি সি ডিগ্রি অর্জন করেন।[৮] এইভাবে তিনি সেই সময়ের রক্ষণশীল সমাজের সমস্ত উপেক্ষার জবাব দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে যান এবং প্রমাণ করেন যে আন্তরিক ইচ্ছা ও অদম্য প্রচেষ্টা থাকলে যে কোন লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

এইভাবে বাংলায় কয়েকজন ‘নব্য নারী’র আবির্ভাব ঘটে, যারা শিক্ষা প্রসার ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। এই সকল নারীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), লেডি অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১), পন্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২) প্রমুখ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার সময় পশ্চিমবঙ্গে মোট জেনারেল ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৫। এই কলেজগুলিতে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৩৬২৩২ জন। এরমধ্যে নারী শিক্ষার্থী ছিল ৩৭৯৯ জন।[৯] স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে নারী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

এই পর্বে নারী শিক্ষার প্রতিফলন কয়েকটি সাহিত্যে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ে ঋতা বসুর *শ্রীসদনের শ্রীমতীরা* বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১০] এখানে লেখিকা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮০৮-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের মেয়েদের স্কুল হোস্টেল, শ্রীসদনের, কথা বলেছেন। লেখিকা নিজে শ্রীসদনে আবাসিক হিসাবে এসেছিলেন। তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৬০-এর দশকে এবং ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকদের লক্ষ্য ছিল বাড়ির মেয়েদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে দায় মুক্ত হওয়া।[১১] লেখিকা জানিয়েছেন যে সে সময়ে পারিবারিক কাঠামোয় ছেলে-মেয়েদের দিকে বাড়তি কোন মনোযোগ দেওয়াকে আদিখ্যেতা বলে মনে করা হত। অর্থাৎ বর্তমান পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে সে সময়ের তথা ১৯৬০-এর দশক এবং ১৯৭০-এর দশকের সমাজ জীবনে ছেলে-মেয়েদের অবস্থান বেশ আলাদা ছিল।

আবার সে সময় উত্তর কলকাতায় মেয়েদের বাড়ির বাইরে দেখলে মনে করা হত যে এই পৃথিবীতে তাদের মূল চাওয়া হল, এই বিপদসংকুল পরিবেশে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে নিরাপদে এবং অক্ষত অবস্থায় বাড়িতে আবার ফিরে আসা।[১২] অর্থাৎ মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়াটাকে সমাজ ভালোভাবে মেনে নিত না এবং তা নিরাপদও ছিল না।

শ্রীসদনের একটি ঘটনার কথা লেখিকা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে সে সময়ে সমাজের মানুষের মানসিকতা সাধারণভাবে কেমন ছিল। ঘটনাটি হল একদিন পিয়ালী ও মহুয়া নামে দুইজন আবাসিক শিস দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে সময় সুমনা নামে অন্য একজন আবাসিক তাঁদের থামিয়ে দিয়ে জানায় যে তাঁরা যেন ভুলে না যায় যে তাঁরা মেয়ে হয়ে জন্মেছে। অর্থাৎ তাঁরা যেহেতু মেয়ে তাই তাঁরা শিস দিতে পারবে না।

আবার বাণী বসু তাঁর *একুশে পা* উপন্যাসে ১৮৮০-র দশক এবং ১৮৯০-এর দশকের শিক্ষা, বিশেষত নারীদের কলেজ জীবনের শিক্ষার চিত্র তুলে ধরেছেন।[১৩] এই উপন্যাসে উজ্জয়িনী, ইমন, মিঠু ঋতু, রাজেশ্বরী, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রমুখ মেয়েদের কথা লেখিকা বলেছেন, যারা ১৮ বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হয় এবং ২১ বছর বয়সে পা দিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব পড়ুয়াদের শুধুমাত্র শিক্ষার দিকটিই নয়, শিক্ষা লাভের অনেক নির্ধারক দিকগুলি অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, তাদের মানসিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, রুচি, তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন প্রভৃতি অসামান্য দক্ষতায় লেখিকা এখানে তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে একজন টেবল টেনিস খেলোয়াড় ইমন মুখারজী কলেজে নতুন ভর্তি হয়েছে। সে হোস্টেলে থাকে। সেখনে জলি দেবী নামে থার্ড ইয়ারের ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে ইমন জানতে পারে যে জলি দেবী বি এস সি পাশ করে আর এম এস সি পড়বে না। কারণ সে একটি টিচার্স ট্রেনিং কোর্স করে শিক্ষকতা করতে চায়। তারপর লজ্জায় গাল দুটো লাল করে বলে এরপর সে বিয়ে করতে চায়।[১৪] অর্থাৎ লেখিকা এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে সে সময় কলেজে পড়তে আসা অনেক মেয়েদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল বিবাহ করা।

তবে ইমন মুখারজীর স্বপ্ন এর থেকে আলাদা। তাঁর বাবা নেই, মা রানাঘাটের একটি হাসপাতালের আয়া, তাঁর ভাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। তাই তাঁর জীবনে বহু দায়িত্ব – নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, ভাই-এর দেখাশোনা করা এবং মায়ের কষ্ট দূর করা।[১৫] তাই সে তাঁর কলেজের সহপাঠী মিঠুর প্রতিষ্ঠিত দাদা ও তাঁর পরিবারের কাছ থেকে বিবাহের উত্তম প্রস্তাব পেয়েও নিরুত্তর থাকে। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র নিজের সুখ নয়, তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধী ভাই এবং দুঃখী মায়ের জীবনে সুখ ও শান্তি নিয়ে আসাও। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের একাংশ নিজের জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির চেয়ে পরিবারের সুখ ও শান্তির প্রতি বেশি যত্নবান।

এই উপন্যাসে দেখা যাবে যে দুইজন কলেজের শিক্ষার্থী তন্ময় ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ে উভয়কে ভালোবাসে। তন্ময়ের মা একটি কলেজের প্রিন্সিপল। তিনি যেমন কলেজে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন, তেমনি বাড়িতে ফিরেও কলেজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। রান্না করার সুযোগ তিনি পান না। তাঁর বাড়িতে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

তবে তাঁর বোন নিজে মেয়ে বলে বাড়ির কাজ করতে বেশি পছন্দ করে এবং বাইরের কাজ তাঁকে দিয়ে, অর্থাৎ তন্ময়কে দিয়ে করাতে পছন্দ করে। কারণ তন্ময় একজন ছেলে।

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া জানায় যে তাঁর বাড়ির মানুষদের মানসিকতা অন্যরকম। যেমন তাঁর কাকিমা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। কিন্তু প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট তিনিই তৈরি করেন। তাঁর কাকা ও কাকিমা সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে প্রায়ই একসঙ্গে ফেরে। কিন্তু চা, জলখাবার প্রভৃতি তৈরির দায়িত্ব থাকে তাঁর কাকিমার উপর। অর্থাৎ প্রায় একই পরিশ্রমের কাজ নারী ও পুরুষ উভয়ে করলেও এবং উভয়েই চাকুরীজীবি হলেও ‘বাড়ির কাজ নারীর’ – এই ধারণা যেন তাঁদের বাড়িতে প্রচলিত ছিল।

এই উপন্যাসে বর্ণিত মিঠুর পরিবার তুলনায় উদার মানসিকতার ছিল। তাঁর বাবা ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং তাঁর মা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বিবাহের সময় তাঁর মা নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করেননি। এই উপন্যাসে ইমন জানায় যে মিঠুর বাবার মতো উদার এবং ধর্মের সম্পূর্ণ উরদ্ধে থাকা মানুষ বিরল। মিঠুর বাড়িতে ঋতুর মতো একগুঁয়ে, খামখেয়ালি ও রূঢ় চরিত্রের বান্ধবী, ইমনের মতো সরল ও আত্মপ্রত্যয়ী বান্ধবী–সকলে সাবলীল ভাবে থাকতে পারে তাঁদের পরিবারের সকলের উদার মানসিকতা এবং উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য। বাস্তব জীবনেও মিঠুর পরিবারের মতো উদার মানসিকতার পরিবার খুব কম দেখা যায়।

এই উপন্যাসে বর্ণিত ঋতু খামখেয়ালি ও রূঢ় চরিত্রের। সে তাঁর নিজের বাবা-মা ও দিদিকে প্রতিনিয়ত অসম্মান করে। নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলতে সে ভালোবাসে। কিন্তু তাঁর চলার পথটা সঠিক নয়। তাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা অস্বাভাবিক তীব্র। এমনকি এই জন্য সে নিজের বাবা-মা কে মিথ্যা কথা বলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়। পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ ছাত্র-ছাত্রী সুলভ নয়। তাই শেষপর্যন্ত সে তাঁর উচিৎ শিক্ষা পেয়েছিল এবং তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। সে তাঁর অনার্স টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এই ধরণের ঘটনা অনেক সময় বাস্তব জীবনেও দেখা যায়। কোন কোন শিক্ষার্থী কলেজে পড়ার সময় পড়াশোনায় সঠিকভাবে মনোযোগী না হয়ে তাৎক্ষণিক চাওয়া-পাওয়া মেটাতে ব্যস্ত হয়। তাঁদের জীবনের পরিণতিও কখনও ভালো হতে পারে না – এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখিকা সেই সত্যও যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে আরও একজন কলেজ-ছাত্রী উজ্জয়িনী বেশ অহংকারী। তাঁর বাবা একজন নামকরা বিত্তশালী ডাক্তার। কিন্তু তিনি প্রচন্ড রুক্ষভাষী, মেজাজী ও বদরাগী। তাঁর বাবা ও মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই। তাঁর বাবা অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত। উজ্জয়িনী যখন তাঁর মাকে জানায় তাঁর বাবাকে ডিভোর্স দিতে, তখন সে জানতে পারে যে তাঁর জন্মদাত্রী মা তাঁকে প্রসবের সময়ই মারা গিয়েছিলেন। তখন উজ্জয়িনীর জীবনে সব থেকেও কিছুই নেই বলে তাঁর মনে হয়। বাস্তব জীবনেও অনেক সময় দেখা যায় যে বাবা ও মায়ের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব সন্তানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে দেয় – এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখিকা যেন এই সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে ছাত্রীদের কলেজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। রাজেশ্বরী ও উজ্জয়িনী – এই দুইজন ছাত্রীকে কলেজের দুটি ছাত্র সংগঠন - এস এফ আই এবং ছাত্র পরিষদ তাঁদের নিজ নিজ প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করতে চেয়েছিল। কারণ দুটি ছাত্র সংগঠন মনে করেছিল যে রাজেশ্বরী ও উজ্জয়িনী ছাত্র সমাজে বেশ জনপ্রিয়, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। শেষপর্যন্ত রাজেশ্বরী এস এফ আই-এর প্রার্থী হিসাবে এবং উজ্জয়িনী ছাত্র পরিষদের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছিল। নির্বাচনে উভয়েই তাদের সহপাঠীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হলে দেখা যায় যে উজ্জয়িনীকে পরাজিত করে রাজেশ্বরী নির্বাচিত হয়। এরপর রাজেশ্বরীকে ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন কাজে যুক্ত হতে হয়। ফলে দেখা যায় যে তাঁর পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়। এই ঘটনা তুলে ধরে লেখিকা বাস্তব জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং তার পরিণতিই যেন তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসে শেষে দেখা যায় যে সব ছাত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন ইমন কিম্বা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক দিশা পেয়েছে, যেমন অনুকা ও মিঠু। আর যারা পড়াশোনাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাৎক্ষণিক কামনা-বাসনা পূরণ করতে চেয়েছে, তাঁরা জীবনে কোন সঠিক দিশা পায়নি, যেমন ঋতু।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাণী বসুর আরও একটি অসাধারণ উপন্যাস অমৃতা।[১৬] এখানে নারীদের শিক্ষা, বিশেষত বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শিক্ষা আলোচিত হয়েছে। অমৃতা এবং তাঁর বন্ধুদের বিবাহ, জীবনের নানা টানাপোড়েন, বাঁচার লড়াই প্রভৃতি দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে অমৃতা নামে একটি মেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর বাবা একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সে তাঁর বাবা-মায়ের খুবই আদরের একমাত্র সন্তান। তাঁর মা অনেকদিন ধরেই অসুস্থ। তাই বাড়ির অনেক কাজ তাঁকে করতে হত। তাঁর মা চেয়েছিলেন অমৃতাকে বিয়ে দিয়ে দিতে। কিন্তু তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে আরও পড়াশোনা করাতে। অমৃতাও চেয়েছিল পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। কিন্তু তাঁর বিয়ে নিয়ে তাঁর বাবা ও মায়ের মধ্যে অশান্তি দূর করতে শেষপর্যন্ত সে বিয়ে করতে রাজী হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর স্বামী হবেন একজন অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর বিয়ে ঠিক হয় একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তাঁর শ্বশুর একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, শাশুড়ি শিক্ষিকা ও ননদ বিবাহিত।

বিয়ের কথা আলোচনার সময় তাঁর হবু শ্বশুর ও শাশুড়ী বিয়ের পর অমৃতার ভালো থাকার কথা অনেক বাড়িয়েই বলেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর অমৃতা তাঁর শ্বশুরবাড়ির প্রকৃত চিত্র দেখতে পেল। তাঁর বিয়ের পর তাঁর শ্বশুরবাড়ির একটি কাজের লোক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁকেই ঘর-বাড়ি পরিস্কার করতে হত। সকাল সাড়ে ছয়টার আগে তাঁর শিক্ষিকা-শাশুড়ীর চা ও জলখাবার তাঁকে তৈরি করতে হত। এরপর স্নান করে সমস্ত রান্না করে সকাল ঠিক নয়টায় তাঁর স্বামীকে খেতে দিতে হত। তারপর তিন-চারটে ক্যাসরোলে খাবার ঠিক করে রেখে, রান্নাঘর মুছে কোনক্রমে কয়েকদলা ভাত গলার মধ্যে পাঠিয়ে অমৃতা ছুটত ইউনিভার্সিটিতে। এরপর বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যা ছয়টায় সকলের জন্য চা করতে হত। আবার রাতের জন্য রুটি-তরকারি করতে হত। নিজে রান্না করলেও সবচেয়ে ছোট মাছটা তাঁকে খেতে হত। সবার জন্য ডিম রান্না হলেও অনেক সময় সে নিজে ডিম পেত না। এই সব দিকে তাঁর স্বামীর কোন নজর ছিল না।

বাড়ির সমস্ত কাজ সেরে অমৃতা প্রায় দিনই ইউনিভার্সিটিতে দেরি করে পৌঁছাত। তাই তাঁদের জয়িতা ম্যাডাম জানান যে ভালো মেয়েদের পড়াশোনার এই অবস্থা ম্যাডামের ভালো লাগে না।[১৭] কিন্তু তাঁর মনের কথা ম্যাডামকে বলতে পারে না।

এই উপন্যাসে একদিন যখন জানা যায় যে অমৃতা সন্তানসম্ভাবা, তখন তাঁর স্বামী অরিসূদনসহ তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলে সেই ভ্রূণটা নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কারণ অমৃতা সন্তানসম্ভাবা হলে সে বাড়ির কাজ বেশ কিছুদিন করতে পারবে না। কিন্তু অমৃতা চেয়েছিল তাঁর প্রথম সন্তান এই পৃথিবীর আলো দেখুক। শেষপর্যন্ত এক মানবিক ডাক্তার, রঞ্জন কার্লেকর, অমৃতার পাশে থেকে অনেক ঝুকি নিয়ে অমৃতাকে গোপনে এক নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জয়িতা বাগচি তাঁর ছাত্রীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি নিজে জানিয়েছিলেন তাঁর স্বামী চাননি বলে তাঁকেও তাঁর দ্বিতীয় সন্তানকে গর্ভে নষ্ট করতে হয়েছে।[১৮] অর্থাৎ লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাকেও তাঁর স্বামীর (যিনি একজন কলেজের অধ্যাপক) দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে হত। আমাদের বাস্তব জীবনেও এই রকম দৃষ্টান্ত খুব কম নয়। আবার অনেক ঘটনা প্রচারের আলোয় আসে না।

শেষপর্যন্ত রেজাল্ট বার হলে দেখা যায় যে অমৃতা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। অর্থাৎ লেখিকা দেখিয়েছেন অসীম মনের জোর, নিরলস প্রচেষ্টা এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোন নারী তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে দোলার মতো মেয়ে, যে পড়াশোনাকে কম গুরুত্ব দিয়ে জীবনের তাৎক্ষণিক কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দিয়েছিল, তাঁকে শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা করতে হয়েছিল।

আবার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *জলছবি* এই প্রসঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।[১৯] এখানে লেখিকা দেখানোর চেষ্টা করেছেন কলেজ জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষকের প্রতি ছাত্র ইউনিয়নের অসম্মানজনক আচরণ প্রভৃতি। অনেক ছাত্রীও ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতার মোহে অধ্যাপকদের অপমান করতেও দ্বিধাবোধ করে না।[২০] বাস্তব জীবনেও অনেক সময় এই ধরণের পরিস্থিতি দেখা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কলেজের অধ্যাপক সোমনাথবাবুর ছোট মেয়ে সুকন্যা মুখারজী (মিতুল) স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে। স্কুলটি তাঁদের বাড়ির থেকে অনেক দূরে বলে মিতুলের বাবা ও মা ঐ স্কুলে তাঁকে যোগ দিতে নিষেধ করে। কিন্তু মিতুল তাঁর জীবনের প্রথম চাকরিতে যোগ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাঁর মা জানায় যে এবার তাঁর বিয়ে দেবেন। তারপর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কথা বলে সে চাকরির বিষয়ে সবকিছু ঠিক করবে।[২০] অর্থাৎ লেখিকা এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে কোন মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে একজন শিক্ষিকা হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার বিবাহ এবং বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ির মত অনুযায়ী সব কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই স্কুলে যোগ দিতে এসে মিতুল দেখে বাস্তবে স্কুলের অস্তিত্বই নেই। তবে শেষপর্যন্ত মিতুল এবং বড় দিদিমণিসহ[২১] সকল শিক্ষিকার চেষ্টায় অন্য একটি স্কুলের দুটি ঘর নিয়ে তাঁদের মাটিকুমড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়। অর্থাৎ লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আন্তরিকতা ও সৎ সাহস থাকলে যে কোন শুভ কাজ করা সম্ভব বা শুভ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

উপন্যাসের শেষদিকে দেখা যায় যে কোন ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে চাওয়া অধ্যাপক সোমনাথ মুখারজী ছাত্র ইউনিয়নের এক ছাত্রনেতার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই সাহসের প্রেরণা হয়তো তাঁর কন্যা মিতুল। অর্থাৎ লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন যে দীর্ঘদিন একটি কলেজে অধ্যাপনা করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পিতার দৃষ্টিভঙ্গিকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে তাঁর শিক্ষিত ও শিক্ষিকা হিসাবে সদ্য স্কুলে যোগ দেওয়া তাঁর কন্যা।

এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার বিভিন্ন দিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কর্মজীবনে প্রবেশ করে কি ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন নারীদের হতে হয়, তাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারি পরিসংখান থেকে জানা যায় যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় নারীদের শিক্ষার্থী হিসাবে এবং শিক্ষিকা হিসাবে অংশগ্রহণ বেড়েছে। সরকারি রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১০-২০১১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে মোট নারী শিক্ষার্থী ছিল ৪২৩,২৭০ জন এবং সময়ে পুরুষ শিক্ষার্থী ছিল ৬৪২,৮৭৮ জন।[২২] ঐ সময়ে পোস্টগ্রাজুয়েট লেভেলে মোট নারী শিক্ষার্থী ছিল ৪৩,০৫৯ জন এবং পুরুষ শিক্ষার্থী ছিল ৫২,০৩৮ জন।[২৩] অর্থাৎ উল্লেখিত সাহিত্যগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সরকারি নথীগুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে এ কথাও বলা হয়েছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বাড়লেও কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামাঞ্চলে এবং মফঃসল এলাকায় নারীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নারীদের শিক্ষালাভকালে এবং পরবর্তীকালে গৃহজীবনে ও কর্মজীবনে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। আর নারীরা যদি তার পরিবার, অভিভাবক, স্বামী, সর্বোপরি সমাজের সাহায্য পায়, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় এবং তারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষা প্রসারে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা নিতে পারে।

Reference:

১. রাসসুন্দরী, শ্রীমতী, *আমার জীবন,* ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* শনিবার, ১১ই মে, ২০১৯, পৃ. ২
৬. পূর্বোক্ত
৭. পূর্বোক্ত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. পূর্বোক্ত
৯. Mallik, P.C., *Fact Books on Education, An Introduction*, State Planning Board, Government of West Bengal, 30th April, 1977, p. 29
১০. বসু, ঋতা, *শ্রীসদনের শ্রীমতীরা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
১৩. বসু, বাণী, *একুশে পা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, চতুর্দশ মুদ্রণ ২০১৮
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
১৬. বসু, বাণী, *অমৃতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৬
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
১৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *জলছবি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৭
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
২২. *Annual Report of the Department of Higher Education, 2010-2011*, Department of Higher Education, Government of West Bengal, 2011, p. 8
২৩. পূর্বোক্ত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 793 - 801
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রোকেয়ার চেতনা ও আজকের নারীশিক্ষা

ড. নবনীতা বসু হক
সহযোগী অধ্যাপক
চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা
Email ID : nabanitabasuh@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Rokeya's visionary educational philosophy remains highly relevant today.

Abstract
Rokeya Sakhawat Hossain championed women's education not merely as a means of personal empowerment but as a crucial factor in the progress of society as a whole. Her ideas emphasized:
1. Education as Liberation – Rokeya believed that ignorance was the main barrier to women's progress. Without education, women remained subjugated, which in turn weakened society. Reapplying her thoughts means ensuring access to quality education for all women, especially in marginalized communities.
2. Moral and Social Upliftment – She viewed education as a tool for instilling ethics, social awareness, and a sense of responsibility. In today's world, where moral values often take a backseat, her vision can inspire an education system that nurtures not just academic knowledge but also social consciousness.
3. Economic and Political Participation – Rokeya saw women's education as the key to their economic independence and active role in decision-making. By reintroducing her ideals, we can encourage more women to take leadership positions, reducing gender disparity in governance and industry.
4. Cultural Reform and Progressive Thought – Rokeya criticized rigid traditions that kept women confined. Her forward-thinking approach to reforming social norms through education is still needed to challenge regressive ideologies and promote gender equality.
Reapplying her educational philosophy today means designing curricula that encourage critical thinking, gender sensitivity, and practical skills for women. It also requires policy changes to ensure education is accessible and inclusive. Only by following her vision can we prevent further social decay and move toward a more just and progressive society.

Discussion

১. ভূমিকা : রোকেয়াই সর্বপ্রথম মাইয়াখানা প্রথা সম্পর্কে লেখেন, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "গত ১৯২৪ সনে আমি আরায় গিয়াছিলাম। আমার দুই নাতনীর বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছিল। বেচারীরা তখন মাইয়াখানায় ছিল। – আমি মজুর জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না। সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। – শেষে সবুর হিস্টিরিয়া রোগ হইয়া মারা গেল।"[১]

বিহারে ছ-সাত মাস ও কলকাতা ছ-সাত দিন বিয়ের আগে একটি আলো-বাতাসহীন ঘরে পাত্রীকে রাখা হত। বাইরের আলো দেখা ছিল নিষিদ্ধ। অধুনা মাইয়াখানা প্রথা হয়তো এখন অবলুপ্ত, কিন্তু নারীর বাল্যবিবাহ নয়।

কোন শতক গড়বার, কোন শতক আবার ভাঙনের। আবার কোন শতক পচনের। রোকেয়ার নারীশিক্ষার প্রসারে প্রায় একাকী উদ্যোগের পটভূমিকা আলোচনার পটভূমিকায় উনিশ, বিশ ও একুশ শতক প্রসঙ্গে উপরোক্ত কথাগুলি একটু মনে রাখা দরকার। রোকেয়া যে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে সমাজে নারীশিক্ষার দিকে চোখ মেলেছিলেন, সে সময়টাতে মরচে পড়েছিল বাঙালি বিশেষত মুসলিম নারীর জীবনে।মধ্যযুগের বাঙালি মুসলিম নারী অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভর ছিল। শিক্ষিত ছিলেন উচ্চবিত্ত রাজপরিবারের অনেকেই। প্রাচ্যদেশীয় নারীশিক্ষা, স্বনির্ভরতা, ভারতের নিজস্ব বিজ্ঞান চর্চার ধারা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছিল ইংরেজ আগমনে। আর ইংরেজ আমলে ছিল চেপে রাখা ইতিহাস। রোকেয়া সেই সময়টাতেই শিক্ষার প্রদীপ জ্বালতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

২. বাল্যবিবাহ : আবার রোকেয়া রচিত 'নার্স নেলি' আখ্যানে বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধিতা করলেও নায়ীমাকে বিয়ে করেছিল অবশেষে কালেক্টর। সেটা তাঁর দ্বিচারিতা। রোকেয়া সেটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।বর্তমানে দেখা যায়, এখনও প্রান্তিক ও দরিদ্র মুসলিম নারীর পরিবারে বাল্যবিবাহ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের মনিরার মত মুসলমান সম্প্রদায়ের নারী ক'জন আছেন? যিনি নিজের বাল্যবিবাহ আটকান! সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে গ্রামের মেয়েদের পড়াশোনা আর ফুটবল খেলাতে উৎসাহ দেন! নিজের পরিবারকে বৃক্ষের মতো ঠাণ্ডা ছায়ায় জড়িয়ে রাখেন মনিরা। মনিরা জানান, -

> "বাবা হার্টের ব্যামোয় আর কোনও কাজ করতে পারেন না। মায়ের এক রোগ। হাঁটা চলাই বন্ধ।ঘরে আরও তিন বোন। সংসার চালানো কঠিন।"[২]

একুশে দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত সমাজ - এই ছবি এখন স্পষ্ট। বাড়ছে বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্যের পাশে নারীর স্কুলছুট চিত্র। ঠিক যে অন্ধকার দূর করতে রোকেয়া মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য আলোকবর্তিকার সন্ধানে অগ্রসর হন। সেই শিখা এখন মৃয়মাণ। জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও ভারতে নারীরা শিক্ষা সংক্রান্ত সূচকগুলিতে একই মাত্রায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করে না। 'প্রাথমিক ভাবে বলা যেতে পারে যে আমরা প্রাথমিক স্তরে ১০০ শতাংশ ভর্তি অর্জন করেছি এবং লিঙ্গ সমতা সূচকে ১.০১ অর্জন করেছি। তবে, যখন গুণগত দিক এবং শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বিবেচনা করে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়, তখন আমরা সকল স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য দেখতে পাব। বেসরকারি স্কুল, উচ্চমানের প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং পেশাদার কোর্সে মেয়েদের ভর্তির হার পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তাছাড়াও, জ্ঞানীয় দক্ষতা, গণিত এবং পড়ার ক্ষমতায় মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে। সংক্ষেপে, মেয়েরা এখনও মানসম্পন্ন এবং পেশাদার শিক্ষা পেতে তাদের পুরুষদের সাথে সমান হতে লড়াই করছে। এছাড়া পিতামাতার আচরণ, পরিবারের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দ, সাংস্কৃতিক নিয়ম, নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এই বৈষম্যের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধটি শিক্ষাগত উন্নয়নে নারীর অবস্থান, বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত কারণ এবং নির্ধারক এবং শিক্ষায় নারীর পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য সরকারি নীতি বিশ্লেষণ করবে।[৩]

৩. কোভিড-১৯ : একটি গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, -

> "কোভিড-১৯ বাল্যবিবাহের উপর কি প্রভাব ফেলেছে তা এখুনি বলা না গেলেও ইবোলা সংকটের মতোই— ধারণা করা যায় এই সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নারী ও শিশুরাই। – স্বাভাবিক সময়ে বাল্যবিবাহের পশ্চাদে যে কারণগুলি থাকে জরুরি পরিস্থিতিতে সেগুলি আরও বৃদ্ধি পায়।"[৪]

কোভিদ-১৯ ভারত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত নারীশিক্ষাতে প্রভাব ফেলেছে। –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলাদেশের মেয়ে সোহনা। স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবার। কোভিদে স্কুল বন্ধ হওয়ার সময় সোহানা দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল এবং মহামারির বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার আঠারো মাস পর চতুর্থ শ্রেণিতে উঠবে বলে আশা করা হয়েছিল। সোহানার শিক্ষক বলেন, যে সময় শিশুদের বাক্য তৈরি করা শেখার কথা তখন তাদের পুনরায় বর্ণমালা শিখতে হয়েছিল। সোহানার মতো অনেকেই স্কুল পুনরায় খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ফিরে যায়নি। এমন ঘটনা তাদেরকে সহপাঠীদের তুলনায় আরও পিছিয়ে দেয়।[৫] অন্যদিকে বাংলাদেশে এক সমীক্ষা বলছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪১ ভাগ মেয়ে শিক্ষার্থী এবং ৩৩ ভাগ ছেলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।[৬] নারীর সংখ্যা এই সমীক্ষায় কম।

৪. ব্যক্তি উদ্যোগ থেকে সরকার বনাম সরকারি উদ্যোগ থেকে ব্যক্তি উদ্যোগ : উনিশ শতকেই রোকেয়া চেয়েছিলেন নারীশিক্ষার অগ্রগমন। রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত স্কুল সরকার নাম পরিবর্তন করলে স্যার গজনবী, মরহুম সৈয়দ নবাব আলী অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। রোকেয়া লিখেছেন, -

> "দেখুন, গর্ভমেন্ট এই স্কুলের নতুন নামকরণ Goverment HE School for Muslim Girls করেছে।"[৭]

রোকেয়া জানতেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি সরকারি সাহায্য পেলে বাঁচবে স্কুল, অব্যাহত থাকবে মুসলিম নারীর শিক্ষাও। সরকারি সাহায্যে স্কুলের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। স্কুল নিয়ে তাঁর চিন্তা ছিল। এজন্য তিনি ব্যক্তি স্বার্থের কথা ভাবেননি। এক অজ্ঞাতনামাকে একটি চিঠিতে লেখেন, -

> "স্কুলের একটা বাড়ি হল না, হেড মিস্ট্রেসের ঠিক নেই। এই দুটি সমস্যার ওপরে আবার ফরিদপুর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নানা গুজব শুনতে পাচ্ছি। ওখানে আমাদের ২৫,০০০ টাকা রয়েছে।"[৮]

ভারতে নারীর স্কুলছুটের জন্য সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে দুটি কারণ।

এক : সরকার পোষিত স্কুল উঠে যাওয়া।

দুই : ভারতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০।

অথচ সরকারকে কর দাতাদের এডুকেশন সেস দিতে হয় ৪%। তবুও এই বাংলাতে, যা ভারত সরকারের অধীন অঙ্গরাজ্য, সেখানেও সরকার পোষিত স্কুল উঠে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভারত সরকার নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ করে দিতে চাইছে। সরকারি স্কুল তারা তুলে দিতে চাইছে, এই বঙ্গ এখন ভারতের নীতি কার্যকর করার দিকে। শিক্ষাক্ষেত্রে কমছে সরকারি বরাদ্দ। ডিজিটাল এডুকেশনের নাম করে শিক্ষার বাইরে বার করে দেওয়া হচ্ছে প্রান্তিক অংশের ছেলেমেয়েদের।

কিছুটা বিরক্ত হয়েই টুম্পা সরদার বলেন, -

> "কি বলছেন, ইস্কুল বন্ধ হয়ে যাবে? এটা তো সরকারি ইস্কুল। দুপুরে খাবার দেয়।"[৯]

টুম্পারা ভাবে সরকারি স্কুল কখনও বন্ধ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গেও নয়া শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে ভারত সরকারের অধীনে। অনেকগুলি সেমিস্টারের ধাক্কা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় পরে, মহাবিদ্যালয়, এই বছর থেকে বিদ্যালয় স্তরে নেমে এসেছে। ফলে বছরে একটির বদলে দুটি বা তিনটি পরীক্ষা হচ্ছে এবং পড়া লেখা ও শেখার সময় কমে গেছে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দেশে এই কারণে স্কুলস্তর থেকেই ছুট দিচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (নেপ - ২০) এর কিছু সম্ভাব্য কুফল হল, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার অভাব, সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তাভাবনার অভাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ বৃদ্ধি।

প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার অভাব : যদি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা না দেওয়া হয়, তবে বিশেষত সুবিধা বঞ্চিত ও গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা অর্জন করতে পারবে না।

সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তাভাবনার অভাব : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা এবং স্বাধীন চিন্তা-ভাবনাকে প্রায়শই দমন করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিক্ষার মান এবং সুযোগের অভাব : শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামোর অভাব শিক্ষার মান এবং সুযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

পঠন-পাঠন পদ্ধতির পরিবর্তন : নতুন শিক্ষানীতিতে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন এবং পরীক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের জন্য চাপ তৈরি করতে পারে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিক্য : সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও অবকাঠামোর অভাব দেখা যায়, যার ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ বাড়ে। শিক্ষার অধিকার আইনের কিছু দিক অবহেলিত হলে, শিক্ষার মান অবনয়ন হয়।[১০]

৫. ১৯৮৬ শিক্ষা নীতি : যদিও শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল অসাম্য দূর করা। যারা এতদিন বঞ্চিত হয়ে এসেছে তাদের সবাইকে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই অসাম্য দূর করতে হবে। সমাজে নারীদের বিশেষ মর্যাদার আসন দেওয়ার জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে মেয়েদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে শিক্ষালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

Women Education and National Policy on Education, 1986 : জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় নারীজাতির অগ্রগতির উপর বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছিল— The education of girls should receive emphasis not only on grounds of social justice, but also it accelerates social transformation.

এই নীতি এক ঝলক :

* মেয়েদের স্বাক্ষর করে তুলতে ও তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষালাভের পথে যেসব সমস্যা আছে তা দূর করতে হবে।
* বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষায় মেয়েরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
* পেশাগত শিক্ষায় নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দূর করতে হবে।
* প্রচলিত ও অপ্রচলিত নতুন পেশার ক্ষেত্র মেয়েদের জন্য খুলে দিতে হবে।
* সামাজিক ন্যায়ের দাবি ছাড়াও শিক্ষাকে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধানতম হাতিয়ার রূপে বিবেচনা করা হয়েছে।
* সমসুযোগ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে লিঙ্গগত বৈষম্য দূরীকরণের সুপারিশ করা হয়েছে নয়া শিক্ষানীতিতে।
* সর্বস্তরে সাম্য ও ঐক্যের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের প্রধান সূত্র হিসেবে শিক্ষা তার ভূমিকা পালন করবে। এর সাহায্যে দ্রুত নারীর ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটবে।
* নতুন ধরনের পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মনোভাব ও প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীর ক্ষমতায়নকে ব্যাপকতর সহায়তা করবে।

এই কার্যক্রমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে নারীশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছিল। নারীশিক্ষাকে প্রগতিশীল করতে প্রধানত যেসব কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল - স্কুলছুট মেয়েদের জন্য অবিধিবদ্ধ শিক্ষার কার্যক্রম প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারবে অথবা উপযুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।

মুক্তবিদ্যালয় বা দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ দূরবর্তী মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের আহ্বান জানানোর কথা বলা হয়েছে।

গ্রাম ও শহরের বস্তি অঞ্চলের মেয়েরা নানান কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার সুযোগের অভাব ছাড়াও তাদের জল, জ্বালানি, পশুখাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়। পরিবারের ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনা করা বা পয়সার

বিনিময়ে নানান কাজ করতে হয়। তাই লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। এজন্য সমন্বয়মূলক শিশুপালন কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে।

নারীশিক্ষা প্রসারে অন্যতম প্রধান বাধা গ্রামাঞ্চলে মহিলা শিক্ষিকার অভাব। তাই নারীশিক্ষিকা নিয়োগে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। এ বিষয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান প্রক্রিয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই এই পরিষেবার প্রসার ঘটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নারীদের সমসুযোগ লাভের আবহ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও গণমাধ্যে জনসাধারণের চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। যোগাযোগের বিস্তার ও তথ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এই গণমাধ্যম নতুন প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে পারে। (National Perspective Plan regarding Women Education) এই পরিকল্পনায় ছিল, নারীরা যাতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তুলনামূলক অবস্থান লাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষাক্রম গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ভারতের কৃষ্টিগত, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে নারীশিক্ষার মান ও সংখ্যাগত উন্নয়নকল্পে বৈচিত্র্যময় শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নারীশিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্দেশ্য নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে, তা না হলে নারীশিক্ষার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নরূপ লক্ষ্যগুলি অর্জনের কথা বলা হয়েছিল—

* ৬-১৪ বছর বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, স্কুলছুট-এর সংখ্যা হ্রাস, অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ।

* প্রতিটি নারীর বয়সোচিত উপযুক্ত, উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে, যাতে তারা ছেলেদের সঙ্গে তুলনামূলক সাফল্য লাভ করতে পারে। "মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ও নিয়োগের সুবিধার জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যায় সুযোগ প্রসারিত করার" পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

* নারীশিক্ষাকে লিঙ্গগত বৈষম্য দূরীকরণের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা গ্রহণে বাধা অপসারণে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রথাগত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে লিঙ্গগত বৈষম্য নির্দেশিত হয় তা দুর করতে হবে।

* প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে ও আংশিক সময়ের পাঠক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

* প্রতিটি পেশাগত শিক্ষার স্নাতক স্তরে শিক্ষার সুযোগ অধিক মাত্রায় প্রসারিত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

* শিক্ষার প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ আঞ্চলিক, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে অধিক সংখ্যক মেয়েদের অংশগ্রহণ ও যুক্তকরণের মাধ্যমে এক নতুন দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

* জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রয়োগ কার্যক্রম (POA), জাতীয় সাক্ষরতা মিশন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীশিক্ষার প্রসারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে।

ভারতে স্বাধীনতার পর থেকেই নারীশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র সংবিধান স্বীকৃত সমানাধিকারের জন্যই নয়, বা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণই নারীশিক্ষা প্রসারের শেষকথা নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি যত গুরুত্ব লাভ করেছে, নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, অপ্রথাগত বা মুক্তশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা ও সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোগ।[১১] এই শিক্ষানীতিতে অনেকটা কার্যকর হয়েছিল নারী শিক্ষা।

স্কুলছুট তালিকাতে যদিও দেখা যাচ্ছে ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৮-১৯তে ছুট সংখ্যা কমেছিল -

> "The dropout rate among boys in primary school — Classes I to V — was 1.44%, which was 13 basis points more than the dropout rate for girls, 1.31%. This was 1.42 for boys and 1.37 for girls in 2018-19, and 1.31 for boys and 1.53 for girls in 2017-18.

> Officials state education department said that in 2018-19 when the data was collated it was thought that this would be a single anomalous year, but the trend was again witnessed in 2019-20, which has the department worried. Officials said that the focus is on education of the girl child and the overall dropout rate. The overall dropout rate was constantly falling and was not a matter of concern."[১২]

৬. স্কুলের অস্তিত্ব : বর্তমানে একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে, সংখ্যার অজুহাত দিয়ে ৮০০০ স্কুল পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ড্রপ আউটের আওতায় পড়া ছেলে মেয়েদের স্কুলে ফেরানোর? দেড়শো বছর পূর্বে জন্মানো রোকেয়ার স্কুলের সরকারি সাহায্যের হিসেব নিকেশ করলে দেখা যাবে ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত প্রায় সে সময় সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ১২০০০ টাকা। গড়ে প্রতি বছরে ১২০০।[১৩]

৭. ঝোঁকে :

* বেসরকারি স্কুলে ভর্তির দিকে মধ্যবিত্তের ঝোঁক। বেসরকারি স্কুলের বেতন কাঠামো বেশি। মধ্যবিত্ত পরিবারে কন্যার থেকে পুত্রকেই পড়ানো হয় বেশি।
* ইংরেজি মাধ্যমকে মধ্যবিত্তের গুরুত্ব দেওয়া। ফলে সরকার পোষিত স্কুল উঠেই যাচ্ছে। সংখ্যা এর আগেই দেওয়া হয়েছে।
* মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা। যে জাতি যত তার নিজস্ব শিকড়কে অবহেলা করে ততই তার বৈষম্যমূলক ধারণাকে রূপায়ণ করে। বৈষম্য দূর না হলে লিঙ্গবঞ্চনার স্বীকার হয় নারী প্রথমেই।
* অন্য প্রদেশ সেখানকার ভাষা শিখতে হয়, এই বাংলায় সেটা হচ্ছে না।
* বাল্যবিবাহ। গৃহ বা অর্থ অর্জনী শ্রমিক তৈরি।

প্রহর, সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ জানাচ্ছে, সাক্ষরতার হার সর্বাধিক কেরালায়, দশম স্থানে বাংলা। তাঁরা বলছেন, - একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে কি শিক্ষাব্যবস্থার কোনো সরাসরি সম্পর্ক আছে? নাকি সামগ্রিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষার হার? নাকি প্রতিটি বিষয় আসলে পৃথক? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের চোখ রাখতে হবে পরিসংখ্যানের দিকে। আর সম্প্রতি ২০১৯ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে ন্যাশানাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (এনএসও)। আর এই পরিসংখ্যানে যথারীতি সবার উপরে আছে কেরালা। দ্বিতীয় স্থানে দিল্লি। কিন্তু সামগ্রিক পরিসংখ্যান আরও বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে আমাদের সামনে।

যে ২২টি রাজ্যের তথ্য নিয়ে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে সবার নিচে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে সাক্ষরতার হার ৬৬.৪ শতাংশ। অন্যদিকে কেরালায় সংখ্যাটা ৯৬.২ এবং দিল্লিতে ৮৮.৭। আর সমস্ত রাজ্যের গড় সাক্ষরতা ৭৭.৭ শতাংশ। তবে পরিসংখ্যান বলছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাক্ষরতার গ্রাফ চলেনি। বরং দেখা গিয়েছে হিমাচল প্রদেশ এবং আসামের মতো তথাকথিত অনুন্নত রাজ্যেও সাক্ষরতার হার ৮৬.৬ এবং ৮৫.৯ শতাংশ। অথচ মহারাষ্ট্র, গুজরাট বা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যও অনেকটাই পিছিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ৮০.৫ শতাংশ, যা অবস্থান করছে দশম স্থানে। তালিকার একেবারে শেষ ৫ রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরপ্রদেশ।

আবার সাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের দিকটিও উঠে এসেছে এই পরিসংখ্যান থেকেই। উত্তরাখণ্ড বা হিমাচলপ্রদেশের মতো রাজ্যে সাক্ষরতার হার যথেষ্ট বেশি হলেও সেখানে লিঙ্গবৈষম্যও যথেষ্ট বেশি। এই দুই রাজ্যে সাক্ষর পুরুষ আর সাক্ষর নারীর ব্যবধান যথাক্রমে ১৩.৬ এবং ১২.৪ শতাংশ। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার কম হলেও এখানে লিঙ্গবৈষম্য ৮.৭ শতাংশ। তবে এক্ষেত্রেও সবার থেকে এগিয়ে কেরালা। সেখানে লিঙ্গবৈষম্য মাত্র ২.২ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানেই পশ্চিমবঙ্গ।

অন্যদিকে শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হারেও বেশ খানিকটা তফাৎ ফুটে উঠেছে পরিসংখ্যানে। সমস্ত রাজ্যেই গ্রামের থেকে শহরের সাক্ষরতা বেশি। তবে এক্ষেত্রেও কেরালার ক্ষেত্রে তফাৎটা অনেক কম। মাত্র ১.৯ শতাংশ। রাজস্থান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং তেলেঙ্গানায় এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি। এই দুই রাজ্যে পার্থক্য যথাক্রমে ৩৮.৫ শতাংশ এবং ৩৮ শতাংশ। একমাত্র কেরালাতেই গ্রামীন সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে ১৩টি রাজ্যে সংখ্যাটা ৭০ শতাংশের কম।

তবে সামগ্রিকভাবে একথা বলাই যায়, রাজ্যের সাক্ষরতা মূলত প্রশাসনিক সাফল্যের উপরেই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কেরালা মডেল বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের চিহ্ন রেখে চলেছে। অন্যদিকে আর্থিকভাবে উন্নত অনেক রাজ্যেও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে সাক্ষরতা কম। তবে সাক্ষরতার অভাব দক্ষ শ্রমিকের জোগানেও ঘাটতি সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রকে গুরুত্ব না দিলে যে সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয় সেকথা বলাই বাহুল্য।[১৪]

উনিশ শতকে ইংরেজরাজ চেয়েছিল পাশ্চাত্য মডেলে শিক্ষাব্যবস্থা হোক।বিশ শতকের শেষপর্যন্ত সরকারি লণ্ঠনে শিক্ষার জন্য আলো ছিল। একুশ শতকে এসে সরকারি পোষণ প্রায় বন্ধের মুখে। শুধু তাই নয়, গরীব বাংলা মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েদের সামনেও অর্থ জোগান বা শিক্ষাঋণ বা বেসরকারি স্কুল নির্বাচন করা ছাড়া উপায় নেই। যাদের এই ব্যয়বহুল শিক্ষার সামর্থ্য নেই, সেইসব মুসলিম নারীর অভিভাবক বাল্যবিবাহকে বেছে নিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে নারীর জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প জীবনে পরিবর্তন আনলেও; শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বোঝা ও বেসরকারিকরণে ছাত্রীদের স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহ বাড়ছে।

৮. সরকারের অবদান : বর্তমানে কলকাতার লেডিস পার্ক যেখানে, সেখানে রোকেয়া ছাত্রীদের লাঠি খেলার ব্যবস্থা রাখতেন। এখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলে ব্যায়াম চর্চা ঐচ্ছিক। রোকেয়ার স্কুল হোস্টেল খাদ্য হিসেবে সকালে মেয়েদের দেওয়া হত নিম পাতার রস আর ছোলা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গসহ সরকার পোষিত স্কুলে মিড ডে মিল দেওয়া হয়। যেটুকু প্রোটিন বরাদ্দ সেখান থেকেও লাগাতার চুরি হচ্ছে। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যপণ্যের অসম বণ্টন হয়েছে বিভিন্ন জেলায়, ভাত-ডাল এবং সবজি রান্নার ক্ষেত্রে প্রায় ৭০% কম খরচ করা হয়েছে, অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী খাবার পায়নি।বহু জায়গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ পচে যাওয়া, পোকা ধরে যাওয়া চাল ব্যবহার করা হয়েছে। – ২০১৪ সাল থেকে ক্রমাগত প্রতিটি বাজেটে এই প্রকল্পের বরাদ্দ শতাংশের হারে কমেছে। ঠিক যেমন শিক্ষায় বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে সরকার। কোভিড পরিস্থিতিতে প্রায় বৎসরাধিক স্কুল বন্ধ ছিল। সেই সময় মিড ডে মিল হিসাবে চাল আর আলু এবং কালেভদ্রে ছোলা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ স্কুল বন্ধ থাকার সুযোগে সরকার শিশুদের প্রাপ্য খাদ্যের বাজেট কমিয়ে খরচ বাঁচিয়েছে বিপুল পরিমাণে।[১৫]

ভাবলে অবাক লাগে, শিশুদের খাদ্য চুরি করে তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস কেড়ে খাবার মত অমানবিক হচ্ছে সমাজ। আর রোকেয়ার সামর্থ্য থাকলেও, নিজে সম্পন্ন বাড়ির কন্যা ও বধূ হলেও খেতেন ছাত্রীদের সঙ্গে বসে।

এখন পুঁজিবাদী সমাজে ধর্ম বেড়েছে। ফলে পুঁজির বাহুল্য দেখাতে বোরখাকে আশ্রয় করেছে একশ্রেণির মানুষ। আবার ফ্রান্সে বোরখা নিষিদ্ধ হলে ঝড় ওঠে, ভারতীয় খেলোয়াড় সানিয়ার উন্মুক্ত পোশাক ফতোয়া জারি হয়, ভারতে বোরখা পড়া বেড়েওছে। রোকেয়ার ‘অবরোধবাসিনী’ কি চর্চার প্রয়োজন নয় এখনও!রোকেয়া বলেছিলেন, ‘যখনই কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।’[১৬]

শিক্ষা প্রত্যেকের জন্য। শিক্ষা মৌলিক অধিকার, শিক্ষার সুবিধা প্রদানের সময় লিঙ্গভিত্তিক কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়। যে কোনো দেশে মানব জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী; তাই নারীর সাক্ষরতার হার যে কোনো জাতির আর্থ-সামাজিক সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে নারী শিক্ষার হার পুরুষদের তুলনায় কম কারণ বাবা-মা প্রায়ই তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে অস্বীকার করেন। অনেক গ্রামীণ পরিবার বিশ্বাস করে, যে পুরুষ শিশুরা মেয়ে শিশুদের চেয়ে যেন সমস্ত সুবিধা উপভোগ করতে পারে। আইনি, ধর্মীয়, এবং ঐতিহ্যগত অভ্যাস মেয়েদের পড়াশুনা করতে নিষেধ করে। মেয়েরা প্রায়ই প্রান্তিক হয় এবং তুচ্ছ কারণে এবং অকার্যকর সামাজিক নিয়মের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। যারা স্বল্প আয়ের পরিবারে বেড়ে ওঠেন বা, গ্রামীণ এলাকায় বাস করেন বা প্রতিবন্ধী তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা কম। - প্রান্তিক গোষ্ঠী যেমন এসসি, এসটি, মহিলা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বাধার কারণে শিক্ষার সীমিত সুযোগ পেয়েছে।[১৭]

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, ভারতে মুসলিম মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫১.৯। ২৫ জন স্নাতক ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন এবং ৫০ জন স্নাতকোত্তর ছাত্রের মধ্যে একজন কলেজে মুসলিম নারী। নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে

বর্তমান ভারতে আগুনে ঘি-এর মতো কাজ করছে ভারতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০। সেখানে নির্ভর করতে হচ্ছে 'মাস্টারের টিউশনি'র উপর। পড়ার চাপ থাকছে আগের থেকে বেশি। কারণ ছ-মাস অন্তর একটি পরীক্ষা থাকবে। কোর্স ও বিষয় বেড়ে গেছে। এই শিক্ষাতে ক্ষতি কার? দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষ আর নারীদের। ২০১১ সালের ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ (এনসিএম) অ্যাক্ট, ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারত বিশ্বের ইসলাম অনুসারী তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হিসাবে চিহ্নিত হলেও জৈনদের শিক্ষার হার বেশি।[১৮]

উপসংহার : নতুন শিক্ষানীতি-২০২০'-তে সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের অনিশ্চিত অবস্থার উন্নতির আশাকে ক্ষুণ্ণ করছে। "খসড়ায় শিক্ষার অধিকার আইনকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাড়ানোর কথা বলা হলেও, নীতিটি চতুরতর। এই নীতি শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং ডানপন্থীদের দ্বারা আদর্শিক দখলের একটি নীল নকশা। শিক্ষাকে এই নীতিতে ব্যবহার করা হবে মানুষকে আরও ক্ষমতাহীন করার জন্য।" বলেছেন সেন্ট স্টিফেন কলেজের প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক নন্দিতা নারাইন। তিনি আরও বলেন, -

"সংখ্যালঘুদের জন্য এর প্রভাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।"[১৯]

অতিসম্প্রতি স্লোগান উঠেছে, ফুটপাথে গরীব, স্কুলে ধনী, এটাই জাতীয় শিক্ষানীতি! ভারতে এখনও মুসলমান ধর্মের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার আলোবঞ্চিত। ড্রপ আউট হবার জন্য পুঁজিবাদী দৃষ্টি বা কেবলমাত্র অতিমারী দায়ী নয়। বরং অতিমারীকে ব্যবহার করে শিক্ষাকে অনলাইন আর ধনীর কাছে তুলে দিতে চায়। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ দরিদ্রদের থেকে মুখ ফেরানোর আরও ঝকঝকে অস্ত্র। আকুল অন্ধকার শিক্ষার ক্ষেত্রে। ভারতে আরও। রোকেয়া কেবলমাত্র নারীশিক্ষার জন্য ভেবেছেন-এই ধারণা ভুল। যে দিকটাতে ক্ষত সেদিকে উন্নতি ঘটানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা পারবে জাতিকে শক্তি দিতে। রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন চর্চা তাই বড় জরুরি। বড় দরকার এখন।

Reference:

১. কাদির, আবদুল, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৮১
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, স্রবন্তী, আনন্দবাজার অনলাইন, ৬ই মার্চ, ২০১৯
৩. দীপমালা, যাদব ও সুমা সিং, 'ভারতে নারী শিক্ষার অবস্থা,' শানল্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইকোনমিক্স, শানল্যাক্স জার্নালস, খণ্ড ৯(১), পৃষ্ঠা ২৮-৩৫, ডিসেম্বর, ২০২০।
৪. মেনেনদেজ সি ই টি -১, ইবোলা ক্রাইসিস দি আনইকুয়াল ইমপ্যাক্ট অন দ্য উইমেন্স অ্যান্ড চিলড্রেন্স হেল্থ, দ্য ল্যান্ড ভলিউম-৩, পি ১৩০৪
৫. https://www.unicef.org/bangladesh
৬. https://www.bbc.com/be ngali/news-49814749
৭. বসু. হক নবনীতা, নারী জাগরণে অনন্য রোকেয়া, সিংহ দিলীপকুমার, বিশ্বকোষ পরিষদ পত্রিকা, ১৪১৫
৮. ঐ
৯. https://www.ganashakti.com/news/School-Closure-of-State-Influenced-by-NEP
১০. https://aajkaal.in/story/3731/national_education_policy_and_its_challenges, 2023
১১. https://www.ganashakti.com/news/School-Closure-of-State-Influenced-by-NEP
google_vignette
১২. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/more-boys-than-girls-dropping-out/amp_articleshow/81537772.cms,14.03.2022
১৩. বসু, হক নবনীতা, নারী জাগরণে অনন্য রোকেয়া, সিংহ দিলীপকুমার, বিশ্বকোষ পরিষদ পত্রিকা, ১৪১৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১8. https://www.peoplesreporter.in/special-article/west-bengal-more-than-7-thousands-primary-schools-disappeared-in-last-10-years ।
১৫.https://nagorik.net/society/education/wb-midday-meal-scam-incredible-instance-of-stealing/
১৬. https://www.prothomalo.com/opinion/letter/86z81nrk69
১৭.https://www.youthkiawaaz.com/2021/09/over-the-years-how-has-female-muslim-participation-in-education-changed/
১৮. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797310
১৯.https://www.outlookindia.com/magazine/story/india-news-opinion-the-international-corporate-lobby-at-work-behind-our-national-education-policy/302431

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 802 - 808
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাকস্বাধীন অবিভক্ত বাংলা ও স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ : সমাজকাঠামো পরিবর্তনের স্বার্থে ঘটিত রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী অংশগ্রহন ও তার প্রভাব (১৯০৫-১৯৬০)

শিল্পা দেবনাথ
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : Shilpa.debnath997@gmail.com
ও
ড. বিরাজলক্ষী ঘোষ
অধ্যক্ষ, বি.এড বিভাগ
ঘোলদিগরুই শিক্ষন মন্দির
Email ID : birajlakshmigsm@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Social structure, movement, women, exploitation, political participation, transformation, consciousness, organized.

Abstract
Every country carries its own social structure. But in every society, some set of traditional norms and conditions are present which need to be transformed gradually. If the transformational process is not happened, the society become stagnant. For generating the social mobility transformation is necessary. This change is possible through the socio-political consciousness and long-term social movement. If we unfold the history of movement in and out of the country it will be visible to us. But in this short span it will be discussed that the participation and evaluation of women in the political movements, organized for structural change of the society in our country specially focusing on pre independent Bengal and the west Bengal after independence, during this timeframe that is, 1905-1960. In this timeframe the women of India came out from the vail for resolving the socio-political issue. On 1905 In Bengal secession movement organized against Bengal divide rule policy of colonial government. The participation of women in Bengal in the political procession happened first time in history in colonial India and also ordinary women were engaged in the circumstances from vail also. On and after 1930 many women freedom fighters like Pritilata Waddewar, Kalpana das, Bina das joined actively in the armed movement against colonial government. In 1940s the women of Bengal were very much adjoined in the 'quite India movement'. Before and After freedom 'MARS' (MAHILA ATMARAKHSHA SAMITI) encouraged the women from the all of the classes to include themselves in the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

socio- political and economic crisis of the society. The activity of 'MARS' have been seen in the 1942 when famine appeared in the Bengal. At this situation the women members of 'MARS' distributed food among the affected villagers and also in the town area. In the twentieth century, the rise of some women leaders who were attached in the labour movement like Sudha Roy, Prabhabati devi, Sontosh kumari devi, begum Sakina just made the examples that women can be in the front zone, they can lead. They got respect and trust from labours. Manikuntala Sen another notable communist leader, she was engaged in Tebhaga movement, also worked among the labours, she raised voice and collected the complains against dowry system from the women of West Bengal when she was member of parliament. Hance, decades after decades those women from all section, create the environment of political consciousness by engaging themselves in the circumstances. Today it is quite easy thing for women to participate in the socio-political activity but before and just after freedom the structure of Indian society was not like that, these women faced lots of trouble in their personal life. By facing all of those things they create the path for future generation. This study will focus on the role of those brave, radical, and progressive women for changing the social structure in the mentioned timeframe.

Discussion

ভূমিকা : সমাজ কাঠামো এর পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত নারী আন্দোলনগুলিকে পর্যায়ক্রমে উপলব্ধি করার স্বার্থে দুটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, প্রথম ভাগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় নারীর তার নিজের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে এবং তার নারীজাতির প্রতি হয়ে চলা অবমাননার প্রতিবাদে সচেতনতামূলক তত্ত্ব গড়ে তুলেছে তা হল নারীবাদ এবং নারীবাদী আন্দোলনগুলি মূলত নারীর সাথে হওয়া সমস্যাকে তুলে ধরে। এখন প্রশ্ন হল, নারীবাদী আন্দোলনগুলিকে কি সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের চালিকা শক্তি বলা যায়? উত্তরটি হল হ্যাঁ। কেন? কারন নারী তার নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে সমাজেরই অংশ, তাই তার উন্নতির দাবি এবং অবনতির প্রতিবাদ সমাজকাঠামোর পরিবর্তন অবশ্যই ঘটায়। দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনগুলিতে নারীর অংশগ্রহন এবং ভুমিকা। এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করলেই প্রকৃতপক্ষে সমাজ রুপান্তরের পর্যায়গুলি বোঝা যাবে।

বিষয়গত উদ্দেশ্য : সমাজ কাঠামো যেমন মানুষ সৃষ্ট তেমনি সেই কাঠামো ভাঙ্গেও মানুষই। যদিও দেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে সমাজের নিয়মের বেড়াজাল সামাজিক বিধান নারীদের ক্ষেত্রেই বেশি। তা সমূলে উৎপাটন করার কাজে তাই নারীরা এগিয়ে এসেছেন বহুবার, তা শুধুমাত্র নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সামাজিক সমস্যাকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে এবং তা দূর করতে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে ভাবে তারা আন্দোলন এ এগিয়ে এসেছেন, সেটা দেশের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন হোক অথবা শ্রমিক আন্দোলন তা তুলে ধরা এবং এই সকল নারীদের আন্দোলনের পরিধি, পরিশ্রম, সফলতা এবং যুগের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে না ওঠার বিশ্লেষণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

এতৎবিষয়ক গ্রন্থ পর্যালোচনা : নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, সামাজিক দাবি, অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের ইতিহাস বহুদিনের। দেশে বিদেশে বহু আন্দোলন এর মধ্যে দিয়ে এই দাবি তারা আদায় করে নিয়েছে। নারীদের ভোটাধিকার এমনি একটি মাইলফলক। এই রাজনৈতিক উত্তরন এর পর্যায় এর ব্যাখ্যা করে 'রাষ্ট্র ও রাজনীতির তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক' বইটিতে। ভারত ও বাংলার ইতিহাসে অহিংস আন্দোলন এ নারীদের অংশগ্রহন এবং তার কালে কালে অংশগ্রহনের বিবর্তন 'The working women and popular movement in Bengal', এই রচনা গুলির আশ্রয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও পরে মেয়েদের আন্দোলন পরিচালনা এবং লড়াই এর গল্প বলে 'ভারত ইতিহাসে নারী' বইটি এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিপ্লবি ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী মনিকুন্তলা দেবি তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বিবরন লিপিবদ্ধ করেছেন 'সেদিনের দিনগুলি'তে।

আলোচনা : আধুনিক নারীবাদী চিন্তার আভাস পাওয়া যায় Andrew Haywood এর লেখায়, তার পরবর্তী সময় ইটালি তে প্রকাশিত ১৪০৫ এ Chistian de Pisan এর লেখায় 'Book of the city of ledies' গ্রন্থে। তবে এগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তা। এই সচেতনতা স্থায়ী সোপান পায় নারীর ভোটাধিকার এর আন্দোলন এর মধ্যে দিয়ে, উনিশ ও বিশ শতকে। সর্বপ্রথম newziland এ ১৮৯৩ তে, আমেরিকাতে ১৯২০ সালে ব্রিটেন এ ১৯১৮, ভারতবর্ষে ১৯৫০ এ সংবিধানে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়।[১] রাষ্ট্রশক্তি নির্বাচনে নারীকণ্ঠ নিঃসন্দেহে সমাজ পরিবর্তন ইঙ্গিত করে। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মুক্তি থেকে সামাজিক কুসংস্কারগুলি থেকে মুক্তির দাবিতে নারিদের অংশগ্রহন ক্রমাগত সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচায়ক। ভারতের ইতিহাস এ এমন বহু সমাজ সংস্কার এর দাবিতে নারীরা বহু সময় সোচ্চার হয়েছেন।

প্রত্যক্ষ নারী অংশগ্রহণ হয় ১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এ মিছিল মিটিং বহু শহুরে পরিবারের মেয়েরা প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহন করে, বহু গৃহবধূরা অরন্ধন পালন করেন। কলকাতার রাস্তায় খদ্দর বিক্রি করার অভিযোগ ১৯২১ সালে উর্মিলা এবং সুনিতি দেবি গ্রেপ্তার হন। মহিলা হিসেবে গ্রেপ্তার সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অনেক বড় বিষয়।[২] সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সর্বাধিক যোগদান দেখা যায় ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন এর মধ্যে দিয়ে। আসামে কমলা বরুয়া ৫০০ জন মিছিলের নেতৃত্ব দেন, বম্বেতে ঊষা মেহেতা গোপনীয় ভাবে বেতার ব্যাবস্থা চালু করেন।[৩]

অহিংস আন্দোলন ছাড়াও ভারতীয় সমাজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নারী দের অংশগ্রহন চোখে পড়বার মত। মেয়ে দের মধ্যে বিপ্লবি আন্দোলন সংঘঠিত করার উদ্দেশ্যে 'দিপালি সঙ্ঘ'। এই সঙ্ঘের সদস্যারা প্রখ্যাত মহিলা বিপ্লবি বীণাপাণি দেবী, রেনুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। বীণা দাস এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ১৯৩২ সালে গভর্নরকে হত্যা, কল্পনা দাস এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এর চট্টগ্রাম আস্ত্রাগার লুণ্ঠন এ প্রতিদান মেয়েদের বিরত্বকে জাগ্রত করে। মেয়েরা ছিলেন সহযোগী ভূমিকা তেও। দিল্লিতে চন্দ্রশেখর আজাদ এর বোমা কারখানায় ১৭ বছর বয়সি রাজবতি জৈন বোমা তৈরি করতেন।[৪]

স্বাধীনতার পূর্বভাগ থেকেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতির উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে বহু মহিলা সংগঠন গড়ে উঠলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময় সর্বস্তরের মহিলারা অনেকাংশে অংশগ্রহন করেছেন। প্রথম মহিলা সংগঠন হিসেবে ১৯২৭ সালে গড়ে ওঠা 'All India Women's Conference'। এর পরেই আসে ১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। শুরুতেই এর সদস্য সংখ্যা ২০-২২ হাজার ছুঁয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ডঃ বিধান চন্দ্র রায় এর সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে বহু দাবিতে প্রচুর কর্মীরা গ্রেপ্তার হলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মহিলা সদস্যরা বন্দিমুক্তির দাবিতে মিছিল করেন ১৯৪৯ এর ২৭-এ এপ্রিল, পুলিশের গুলিতে সেদিন নিহত হন লতিকা সেন, আমিয়া দত্ত, প্রতিভা গাঙ্গুলি, গীতা কর্মকার। প্রথম উল্লেখিত মহিলা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যা। এছাড়াও মনিকুন্তলা সেন, ফুলরেনু গুহ, কমলা মুখার্জি, গীতা মুখার্জি দক্ষিন কলকাতার কলোনি গুলিতে মহিলা সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, এই ক্যাম্প গুলিতে একদিকে লঙ্গরখানা অপরদিকে চলছিল বস্তায় মৃতদেহ পাচার। এমন পরিস্থিতিতে তারা দিনের পর দিন সেখানে কাজ করেছেন মহিলা দের মধ্যে। অপর দিকে ১৯৫৩ এর ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন এর প্রথম সারিতে ছিলেন মনিকুন্তালা সেন এবং জলি কল। ১৯৪৩-৪৪ এর খাদ্য আন্দোলন, নিয়ন্ত্রিত দামে কাপড় পাওয়ার আন্দোলন, পাট্টার দাবিতে স্ত্রীর সমান অধিকার এর দাবি আরও কত রয়েছে সেই তালিকায়...।[৫]

নারী আন্দোলন শুধু শহুরে শিক্ষিত ছাত্রী বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের নয় তা সেই সচেতনতা আস্তে পারে প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারন চাষি পরিবারের নারীদের মধ্যেও। তেভাগা আন্দোলন এর অনেকাংশে এই মহিলারাই ছিলেন। তেভাগা আন্দোলন এর কারনটি নিহিত আছে বাংলাদেশের কৃষক-ভূস্বামীর ফসল ভাগের চরিত্রের মধ্যে এবং জমির ওপর কৃষকের নড়বরে অধিকার যে দিনের পর দিন বাংলার চাষিদের পিষে দিচ্ছিল সেই সঞ্চিত অবমাননার বহিঃপ্রকাশ। বাংলার জমিদার শ্রেণি ধিরে ধিরে শহরাঞ্চলে বসবাস শুরু করলে জমিদার অধিনস্ত একশ্রেণীর মধ্যস্বত্তভোগী মৌখিক ভাবেই বন্দোবস্ত করতেন। যা ফসল হবে তার অর্ধেক কৃষকের এবং অর্ধেক জমিদার। এই ব্যাবস্থাকে বলা হত 'আধিয়ার'।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আপাত ভাবে বিষয়টি সরল মনে হলেও চাষ এর খরচটুকু চাষির কাধেই চাপান হত তাই অনেক সময়ই চাষিকে কর্জ করতে হতো, কোনো কারনে অই বছরে যদি ফলন ভালো না উঠতো তাহলে ওই অর্ধেক ভাগ এর ফসল থেকে কর্জ শোধ কোরে চাষির ঘরে আর কিছুই উঠতো না। ফলস্বরুপ আগের বছরের ভাগচাষীর পরিবর্তে নতুন ভাগচাষি চাষ করত। অতএব, কৃষক উচ্ছেদের ঘটনা হামেশাই ঘটতো। তাই চাষিরা ফসল এর তিনভাগ করার দাবি জানান একভাগ থাকবে চাষির সরঞ্জাম কেনার জন্য আর একভাগ চাষির নিজের বাকি একভাগ জমিদার এর। এই হল তেভাগার বৃত্তান্ত। এই দীর্ঘকালীন রাগ ছড়িয়ে পড়ে ১৯৪৬ সালের শেষ এর দিকে। যে সব জেলায় ভাগচাষীরা বেশি এই আধিয়ার ব্যবস্থার অধীন তারা আগে বিক্ষোপ এ সামিল হন। প্রথমত, আইন মাফিক জমিতে অধিকার দিতে হবে, অন্যটি হল ফসলের তিনভাগ যা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মেদিনী্পুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মালদা, রংপুর, কাকদ্বীপ, যশোর, খুলনাতে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। চাষিরা দাবি জানায় নিজেদের গোলায় ধান তুলবে তিনভাগ হওয়ার পর ফসলের একভাগ জমিদার এর সেরেস্তায় যাবে, কারন ফসল ভাগ জমিদার এর সেরেস্তায় হলে তারা ফসল এর তিনভাগ হতে দেবে না ফসল সরিয়ে দেবে। তাই কৃষকদের স্লোগান ছিল 'জান দেবো তবু ধান দেব না', 'নিজের গোলায় ধান তোল'।[৬]

আন্দোলন এর প্রথম পর্যায় এ জমির মালিকপক্ষ পুলিশ এর সাহায্যে ও নিজেদের জোরে ফসল কব্জা করে, দ্বিতীয় পর্যায় চাষিরা ফসল গোলায় তুলতে পারে তখন কিছু কিছু জায়গায় গোলায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় কিছু জায়গায় চাষিরা ফসল রক্ষা করতে পারেন। এমনি ফসল রক্ষায় শেষ হয়ে যাওয়া একটি গ্রামের চিত্র কম্যুউনিস্ট নেত্রী মনিকুন্তলা সেন তার আত্মজীবনী 'সেদিনের কথায়' লিখেছেন। দিনাজপুর এর খাপুর গ্রামে পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে তিনি দেখেছেন পুলিশ এর অত্যাচারে সেখানকার পরিস্থিতি থমথমে, তিনটি মৃতদেহ নিয়ে চাষিরা দাহ করতে যাচ্ছে তাদের সাথে মাত্র একটি লন্ঠন অর্থাৎ ভয়ে মানুষের দাহকার্য করার কাউকেও পাওয়া যেত না। তার পরেও গ্রাম এর মহিলারা পুলিশের লাঠি খেয়ে এবং পাল্টা প্রতিঘাত করেও বাড়ির পুরুষদের লুকিয়ে রাখতেন। উত্তমী পুলিশের হাত কেটে দেন। দিনাজপুর এ গ্রামের মহিলারা খেত এর পাশে তাদের দা কুরুল নিইয়ে জমি পাহারায় ছিল অন্য দিকে পুরুষেরা ফসল কেটে জোতদারকে দেওয়ার বদলে নিজের খামারে তুলছিলেন।[৭]

কাকদ্বীপে বামপন্থীরা তাদের শক্ত ভিত তৈরি করতে পেরেছিলেন। তাই ওই প্রত্যন্ত গ্রামেও ১৯৪৪-৪৫ এ গড়ে উঠেছিল কিষাণ সভা। চাষিদের বঞ্চনা সম্পর্কে তাদের সচেতন করার ফলে তেভাগা আন্দোলনে বড় ভূমিকা নেয় কাকদ্বীপের তৃণমূলস্তরের মানুষেরা। এর বর্ণনা দিয়েছেন ইলা বোস। তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজ এর ছাত্রী, তার সাথে তার সহপাঠি পূর্ণেন্দু ঘোষ। তারা সেখানে কৃষক সংগঠনের কাজে গিয়েছিলেন, দেখেছেন, কিভাবে ১৯৪৮ এর শেষের দিকে পুলিশ সেখানে ক্যাম্প তৈরি করে চাষিদের প্রতিরোধ ঠেকাতে, জমিদাররা তাদের অধীন বর্গাদার কৃষকদের শায়েস্তা করতে উচ্ছেদের নোটিস দেন। এর বিপক্ষে ১৯৪৯ গোড়ার দিকে কৃষকরা লাঠিয়াল বাহিনি তৈরি করেন, ৫০০০ বিঘা সহ জমিদারের কাছারি দখল করে। বুধাখালি এবং চন্দ্রপিড়িতে ১৭ জন চাষি মারা যায়, অহল্যা দাস, সরোজিনী দাস পুলিশের গুলিতে মারা যায়। সূর্যমণি গিরি আহত হন তার একটি হাত বাদ যায়। ইলা বোস কোনো রকম ভাবে বেঁচে ফেরেন কিন্তু পূর্ণেন্দু ঘোষ এর কিছু বছর জেল হয়। যদিও কাকদ্বীপের আন্দোলন দমন করা গিয়েছিল কিন্তু সেই সময়ের সেখান কার নারীদের আত্মসচেতন চিরস্থায়ি হয়ে গেছিল, তাই কাঁসারী হালদার ওই তেভাগার আন্দোলনের পরেও গ্রামের সাধারন মহিলার মতো বাকি জীবন কাটাননি, হয়েছিলেন লোকসভার সদস্যা। একজন মহিলাও যদি ওই প্রত্যন্ত স্থান থেকে রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করেন সেটাই আন্দোলনের আসল ফল, তা জমির হিসেব নিকেশ যাই হোক কেন। প্রতি ঘরের একজন গোটা সমাজের কাঠামো বদলে দিতে পারে।[৮]

সেদিনের তেভাগার দিনগুলিতে মনিকুন্তলা সেন সেখানে গ্রামের বউ সেজে ঘোমটায় মুখ ডেকে পুলিশ এর থেকে আড়াল হয়ে ওই গ্রামটিতে থেকেছিলেন দিনের পর দিন। সেদিনের ওই থমথমে পরিবেশে তার সাথে ছিলেন রানি মিত্রও। তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে গ্রামে ছদ্মবেশে কাটিয়েছেন। পরে সেখান থেকে শহরে ফিরে এসে তদানিন্তন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে গ্রামের অত্যাচার সম্পর্কে জানান। সংবাদপত্রে এই বিষয়ে লেখালেখি হতে থাকে। তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুহ্রাবরদি সাহেবের সাথে এই বিষয়ে বৈঠকের চেষ্টা করা হয়। ক্রমে জনমত গড়ে উঠতে থাকে,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 802 - 808
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টপাধ্যায় এর স্ত্রী মঞ্জুশ্রী দেবি এবং রানি দাশগুপ্ত সহ আরও অনেকে গিয়েছিলেন। ধিরে ধিরে কৃষকদের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠায় সুরাবর্দি সাহেব কৃষক নেতাদের সাথে এক টেবিলে বসলেন। তেভাগা আন্দোলনের মহিলা অংশগ্রহনের স্বারক বহন করে সেদিন ছিলেন বিমলা মাজি। সেদিনের বৈঠকের রায় সেদিন কৃষকদের পক্ষে ছিল। তবে এই নিয়ে পাকাপাকি ভাবে আইন পাশ হয় স্বাধিনতার পর বিধানচন্দ্র রায় এর আমলে যা ভূমিসংস্কার আইন হিসেবে পরিচিত।[৯]

তেভাগা এর মত কৃষি আন্দোলন এ যেমন প্রান্তিক শ্রেণির সাধারন খেটে খাওয়া চাষি পরিবারের মহিলারা যেমন প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পরেছিলেন তেমনি শহরাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে যেই অসামান্য নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন সন্তোষকুমারি, প্রভাবতি দেবি, সাকিনা বেগম, সুধা রায় এর মত সাহসি একনিস্ট শ্রমিক দরদি নারীরা। সন্তোষকুমারি নৈহাটির গরিফাতে থাকতেন, এখানেই ছিল গৌরীপুর চটকল, ১৯২১ এর গোরার দিকে তার বাড়ির বাগানের এক প্রান্তে উক্ত চটকলটির শ্রমিক রা তাদের মিল এর ম্যানেজার এর খারাপ ব্যবহার, কাজের অস্থায়িত্ব এবং সর্দারের জোরজুলুম নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করায় সন্তোষকুমারি এগিয়ে এসে তাদের নিয়ে ম্যানেজার এর সাথে কথা বলতে রাজি হন, সেই শুরু...তারপর 'গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি' গঠন করা থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের নানা ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া, শ্রমিকদের উত্তেজিত করার চেয়ে তিনি অনেক বেশি জোর দিতেন তাদের সংঘবদ্ধ করার দিকে, অপর দিকে বিংশ শতকের বিশ এর দশকের জাতীয় আন্দোলনের সাথে শ্রমিক শ্রেণির কোন যোগাযোগই ছিল না, সন্তোষকুমারি এর সমালোচনায় বলেছেন - শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতিয়তাবাদকে উপলব্ধি করা সম্ভব না। এমন মন্তব্য গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়। সোমনাথ লাহিড়ী তার একটি বক্তব্যে বলেন যে একবার সংগঠনের কাজে সন্তোষকুমারি কামারহাটি যাওয়ার পথে মালিক পক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডারা তাকে আক্রমন করলে তিনি এতটুকু বিচলিত না হয়ে ঘোড়ার গাড়ির দুদিকে চাবুক মারতে মারতে সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান। তাঁর সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, লড়াকু মানসিকতার জোড়ে এভাবেই চটকল শ্রমিক দের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাদের প্রিয় 'মাইরাম।'[১০]

এমনই আরও দুইজন শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন ডঃ প্রভাবতী দাসগুপ্ত এবং অপরজন বেগম সাকিনা। যদিও তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন। ১৯২৮ সালের বিখ্যাত 'ধাঙ্গর আন্দোলন' সাথে তিনি যুক্ত। কলকাতা কর্পোরেশন এ সেই সময় ১০-১২ হাজার ধাঙ্গর কাজ করত। কলকাতায় ঝাড়ুদার, মেথর, জমাদার এর কাজ বাঙ্গালিরা কোনকালেই করত না উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে নিচু জাতির লোকেরা এগুলি করতেন, এরা ছিলেন অস্পৃশ্য অবহেলিত, ধাঙ্গড়দের বস্তীগুলিতে দিনের পর দিন গিয়ে দেবনাগরী ভাষায় তাদের মধ্যে লিফলেট বিলি কোরে তাদের বেতন, পরিষ্কার স্থানে ও বাড়িঘর এবং অন্যান্য দাবীতে তাদেরকে একত্রিত করেন প্রভাবতি দেবি, দাবি মনজুর না হলে ধর্মঘট এর আহ্বান দেওয়া হবে এমন ছিল পরিকল্পনা। ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ১০০০ জন ধাঙর দের বিরাট সভা হয়, উপস্থিত ছিলেন মুজাফফর আহমেদ, ধরনি গোস্বামী এর মত ব্যক্তিত্বরা। ধাঙড়রা ১৯২৮ এ ৪ঠা মার্চ ধর্মঘট শুরু করেন, শুরু হয় বিখ্যাত ধাঙর আন্দোলন, এই সমস্থ কিছুর মধ্যমনি ছিলেন প্রভাবতি দেবী।[১১]

এই ধর্মঘট শেষপর্যন্ত সফল হয়নি কিন্তু সমকালিন প্রত্যেকটি পত্রিকার (একমাত্র আনন্দবাজার ছাড়া) ব্যাঙ্গচিত্র উপেখ্যা করে তদানিন্তন সমাজের ভ্রুকুটি পেরিয়ে চির অবহেলিত জমাদার রা যে সভা করে নিজের দাবি জানাবে এ ছিল অভাবনীয় আর তাদেরই নেত্রী হবেন কিনা একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একজন মহিলা! ...সে যাই হোক কালজয়ী নারীরা কবেই বা এসব এর তোয়াক্কা করেছেন, প্রভাবতি দেবি ধাঙর দের কাছে হয়ে উঠেছিলেন তাদের 'মাতাজি'।

কৃষক শ্রমিকদের আন্দোলন এ পাশে দাঁড়িয়েছেন এদেশের নারীরা কখনও নেতৃত্ব দিয়ে কখনো লড়াইের ময়দানে নেমেছেন অধিকার আদায়ে, সেই অধিকার শুধু সমাজের নিত্য নতুন রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আসে না। তা আসে প্রতিদিনকার জীবনে যে দলন এর শিকার হতে হয় তা উপলব্ধি করা এবং দূর করার মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে পণপ্রথার কথা বলা যায়। দেশ স্বাধীন হলেও নারীরা বিবাহের সাথে জড়িত এই কুপ্রথাটির বেড়াজাল থেকে তখনও মুক্ত হতে পারেননি। স্বাধীন ভারতের বহু দশক পরেও চলতে থাকে পনপ্রথার চাপে বধূমৃত্যুর ঘটনা। পনপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিটি

মেয়ের বাড়িতে অনেক অভিযোগ থাকলেও 'পন দেব না' এই কথাটি তারা সাহস জুটিয়ে বলতে পারেন না। লোকসভায় এই আইন নিয়ে আলোচনা চলার সময় মনিকুন্তলা সেন এর মতো বিরোধী নেত্রী সহ কংগ্রেসের নেতা নেত্রী এর সপক্ষয়ে বহু প্রচারসভা, সাক্ষর গ্রহন, মেয়েদের নিয়ে ঘরোয়া সভা করেছেন, তার বিবরন তিনি 'সেদিনের কথা'য় তুলে ধরেছেন যে কি ভাবে শহরের মধ্যবিত্ত বাড়ির গৃহিণী থেকে চাষি বাড়ির মহিলা পনপ্রথার পক্ষে সওয়াল করেছেন ভয়ে, কারন সেই যুগে পন ছাড়া বিয়ে দেওয়া যেহেতু যাবে না তাই এর বিপক্ষে তারা সই দিতে নারাজ, এই ছিল সেদিনকার অবস্থা। শেষ পর্যন্ত আইনসভায় পাশ হওয়া পনপ্রথা বিরোধী আইন সারা দেশে কার্যকর হয় ১৯৬১ সালে ১লা জুলাই জম্মু এবং কাশ্মির বাদে কিন্তু আইনসভায় এই আইনটি কার্যকর হওয়ার সময় শাসক দল কংগ্রেসে এর মধ্যেও এই আইন পাশের বিপক্ষে ছিলেন অনেকে তাই সেই সময় পার্টির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হুইপ জারি করে তবেই এই আইন পাশ হয়েছিল সেদিনের ভারতবর্ষে, আইনসভার ভিতরে ও বাইরের আবহাওয়া ছিল সেদিন এমনই যা তুলে ধরেছেন মনিকুন্তলা সেন তার আত্মজীবনীতে। তিনি নিজেও দীর্ঘদিন বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত। হিন্দু কোড বিল পাশ এর সময়ও তিনি আইনসভায় বহু সাক্ষর সংগ্রহ করে তা পেশ করেন।[১২]

মনিকুন্তলা দেবি নিজ গুনেই অসামান্যা, তার কথা বলতে গেলে ১৯৪২ এর দুর্ভিক্ষে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে নানান জায়গায় ত্রান বিতরন এর কাজ, চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের সচেতন করা তাদের নিজেদের সংগঠন তৈরির আবশ্যকতা সম্পর্কে তাদের বোঝানো, তিনি দেখেছেন কিভাবে পোকামাকর এর মধ্যে একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে শুধুই ভাত আর সামান্য শাক সিদ্ধ খেয়ে সারাদিন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করে কাজের ফাকে শুধু চা ছাড়া আর কিছুই তারা মুখে দিতে পারেনা। তিনি দেখেছেন দেশভাগের পর গ্রাম বাংলার চাষি পরিবারের মেয়েরা কিভাবে বেয়াব্রু হয়ে উদবাস্তু জীবন কাটিয়েছেন। তাদের মধ্যে গিয়ে তিনি তাদের রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত করেছেন, মেদিনীপুর দিনাজপুর এর প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কৃষক বাড়ির মহিলাদের সংগঠিত করেছেন। সেদিনের ওই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে মহিলারা ছিলেন অনেক বেশি অবগুন্ঠনে। তিনি সংগঠনের কাজে গ্রামে কোন বাড়িতে আশ্রয় নিলে বাড়ির পুরুষ সদস্যাই তার রোজকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরাবরাহ করতেন। তিনি মহিলা হলেও বাড়ির মহিলা সদস্যরা তার সামনে আসতেন না, শহর থেকে এসেছেন বলে তিনিও যেন তাদের কাছে পুরুষ। এতটাই গোড়া ছিল তখনকার সমাজ। সেখান থেকে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে এসেছে সামাজিক সচেতনতা।

উপসংহার : আজকের দিনে দাড়িয়ে বহু মহিলা নানা আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের থেকে যুক্ত হন, কিন্তু পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীন ভারতে বহু এর দশক পরও তা এত সহজ ছিল না, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন কিভাবে করতে হয়, তা তারা নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তারই ফলস্বরুপ আজকে যতটুকু সামাজিক উদারতা নারীরা উপলব্ধি করছেন তার পিছনে এই নারীদের অবদান অনস্বীকার্য।

Reference:

১. মুখার্জি, প্রলয়দেব, 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক', কলকাতাঃ বিজয়া পাবলিসিং হাউস, ২০১০, পৃ. ৪৫-৫৮

২. Sen, Sunil, 'The Working Women and Popular Movement in Bengal'. Kolkata: 1985, p. 35-48

৩. Dey, Shubhra, 'Women IN THE REVOLUTIONARY- "TERRORIST" MOVEMENT IN BENGAL, 1928-34: PARTICIPATION, PERCEPTION AND CONSCIOUSNESS'. new delhi: CENTRE FOR HISTORICAL STUDIES SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES JAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, 1992, p. 24-182

৪. Sankar Sengupta, 'A study of women of Bengal'. Calcutta: Indian Pub, 1970, p. 1-50

৫. সেন, কল্পনা, 'স্বাধিনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েরা' (প্রবন্ধ)

৬. সেন, মনিকুন্তলা, ‘সেদিনের কথা’, কলকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬১-১৬৪

৭. সেন, মনিকুন্তলা, ‘সেদিনের কথা’, পৃ. ১৮১-১৮৪

৮. Sen, S. ‘peasent movements’, Report of the Fifth Annual conference of Mars; Interview with Ila Bose. p. 166-169

৯. সেন, মনিকুন্তলা, ‘সেদিনের কথা’ পৃ. ৭৪-৮৮

১০. চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ও গৌতম নিয়োগী, ‘ভারত-ইতিহাসে নারী’, কলকাতা : কে.পি. বাগচি, ২০০৯, পৃ. ৬৫-৭৫

১১. চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ও গৌতম নিয়োগী, ‘ভারত-ইতিহাসে নারী’, পৃ. ৭৬-৯০

১২. সেন, মনিকুন্তলা, ‘সেদিনের কথা’ ২৪১-২৪২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 809 - 816
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ক্ষমতা ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের উত্তরণে প্রতিবাদী নারীর বহুস্বর : আমি বাঁচতে চাই

জয়া দাস
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : jaya25das@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
Right, Dominance, Revolutionary, Rhetoric, Interaction, Power-hungry, Selfish, Patriarchal.

Abstract

Every human being has an equal right to live in a healthy society regardless of gender. In the Vedic period, the status of women was paramount in the society. As the civilization progressed, the male power gradually took away that dominance. As a result, the dignity and prestige of women has gradually decreased. Due to the fact that Abhaman has been crushed till now, they have finally come together and started protesting loudly. The famous French thinker and novelist Simon de Beauvais's revolutionary comment comes to mind in this regard - 'Nobody is born a woman, society makes her a woman'. What should be done and what should not be done since childhood, women are bound by restrictions. A long time ago, Aristotle said that the virtue of men is in eloquence and the glory of women in silence. Although in today's world this comment is quite childish. Most patriarchal societies desire this silent woman; there is no doubt about that even now. However, there is no hesitation in saying this, standing against the trend, prominent feminist men have also demanded women's fair rights, such as Virginia Woolf, Elizabeth Robbins, Dorothy Richardson, Rebecca West, etc. According to Wolf - "All injustice to women is the celebration of patriarchal cruelty". Maggie Hume calls upon women to be supremely independent, remembering the eternal difference between men and women. Although conscious men are not silent spectators. They also need cooperation to push the monopoly of patriarchal society. When a man is able to understand the interaction of both men and women in the society, a healthy society will be developed. On that day, women will not have to fight for their own rights. Women never demand the superiority of society, expect only the respect they deserve.

Four women are oppressed in different ways in the book 'Aami Vakhte Chai' by Sahityabaridhi Tapan Banerjee. Parni is raped, Sucharita is abused, Ipsita is bullied and the trio is a victim of eve-teasing lust. None of them have crouched in the eyes of power, have not hidden in the house, have not bowed their heads; rather, it has roared against injustice. The help of law has been taken to punish the culprits. They have continued their struggle in the face of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

various adversities. Many efforts have been made to stifle everyone's protest by a group of authoritarian money-grubbing interests. The criminal's guilt has been proven - the guilty have finally been punished. A group of people with good sense has come to their side. Women have stood up and shown that they do not compromise with power and 'women are not losers'.

Discussion

এক

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমি বাঁচতে চাই' গ্রন্থে একটি উপন্যাস ও তিনটি উপন্যাসিকা রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়েই এক একজন নারী যার জীবনে ঘটে গেছে অনভিপ্রেত কিছু ঘটনা। 'ধর্ষিতা'য় পর্ণি স্কুলের ভালো ছাত্রী বরাবরই ক্লাসে ফার্স্ট হয়। রাত দশটায় ইংরেজি কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার সময় নর পিশাচ রাতুলের শিকার হয়। স্টেশন চত্বর থেকে বেরোনোর সাথে সাথেই রাতুল তার পিছু নেয় এবং নানারকম ভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। প্রতিবারই পর্ণি প্রত্যাখ্যান জানায়। রাতুল নামক হিংস্র পশুর কাছে প্রত্যাখ্যান মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ -

> "রাতুল রায় এ-শহরে যা চায়, তাই পায়।... আমি যদি ইচ্ছা করি তোকে তুলে নিতে আমার পাঁচ মিনিটও সময় লাগবে না! দদাঁড়া।"[১]

ক্রমশ সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে পর্ণিকে আক্রমণ করে। বিপদের সম্মুখীন হয়ে নয়ানজুলি একলাফে পাড় হয়ে দৌড়ে পালায় ঝুপসি অন্ধকার জঙ্গলে। বহুবারই রাস্তা চলাচলে তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে, বুলেট চালিয়ে কাছ ঘেঁষে চলে গেছে। ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা সেদিন রাতেই প্রথম। রাতুলও পিছু নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে চলেছে -

> "পর্নিকা শুনছে তার কাছাকাছি ঝোপগুলোয় পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে রাতুল, আর বলছে, খুঁজে আমি পাবই। কোথায় আর যাবে! দরকার হলে সারারাত খুঁজব।"[২]

বাড়ি ফেরার সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পর্ণি'র মা তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে মোবাইলে গান বেজে ওঠে। ব্যাগ থেকে বের করে মোবাইল অফ করার আগেই হিংস্র জানোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ে। পর্নি নিজের আত্মারক্ষা ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে আকুতি জানায় বহুবার। সেই মুহূর্তেওই রাতুলকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে। পর্ণিকা সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা চালায়। যুঝতে চাইছে দানবের হাত থেকে যে কিনা তার সমস্ত শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে চাইছে, বিনিময়ে পড়ছে দুই গালে এলোপাথাড়ি চড়। ক্রোধে, প্রতিবাদে, লজ্জায়, ঘৃণায় চিৎকার করে কান্না পেলেও শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় সে শক্তিটুকু ছিল না তার।

> "প্রগাঢ় ও আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রবল কাঁপুনি তার ধ্বস্ত শরীরে, কী করে বাড়ি ফিরবে, কী করে মুখের মুখ দেখাবে সারা পৃথিবীর কাছে!"[৩]

অবশেষে ছিন্নভিন্ন পোশাকে টলতে টলতে রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর বাড়ি ফিরে আসে পর্ণিকা। মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নার ভেঙ্গে পড়ে বলে - 'মা, আমি শেষ হয়ে গেছি'।

যে পর্ণি ধর্ষিতা হয়েছে লজ্জায় সে প্রায় নিজেকে গৃহবন্দী করে নিয়েছে। স্কুল যাওয়া বন্ধ করেছে, দীর্ঘদিন যায়নি কোচিংএ, বন্ধুদের ফোন ধরেনি এমনকি তার প্রেমিক তথা প্রিয় বন্ধু বিতোষের ফোন কিংবা এমত্রমত্রসের রিপ্লাই দেয়নি। অদূরেই তার জীবনের বড় একটি পরীক্ষা মাধ্যমিক। ঘটনার পরদিন সকালে পর্ণির বাবা ব্রতদাসবাবু বাজারে পর্যন্ত যেতে পারেননি লোকলজ্জার ভয়ে। অপরাধী ক্ষমতার আস্ফালন দেখাতে পরদিন যথারীতি পনির বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে বিশ্রী শব্দে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে চলে যায় বিকট হাঁসি দিয়ে। মনের ভেতরে প্রতিবাদী সত্তা জাগ্রত হয় পদক্ষেপ নেয় অপরাধীকে যথা উপযুক্ত শাস্তি দেবার। এ প্রসঙ্গে মনে হয় পর্নি যেন বলে চেয়েছে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"হে বিধাতা, আমায় রেখো না বাক্যহীন,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে।"[৪]

পর্নির বাবার সাথে থানায় গিয়ে এফআইআর লিখে জমা করে অভিযোগ জানাতে গিয়ে নানাভাবে অপদস্ত হতে হয়। ইন্সপেক্টর তাদের আর্জি জমা নেয়নি। অপরাধীকে করা শাস্তি দেওয়ার পদক্ষেপ না তো দূর উপরন্ত থানার ইন্সপেক্টর নিজেই বিষয়টির সাথে আপোষ করে নেবার পরামর্শ দেন। অপরাধী শহরের বিত্তশালী ব্যক্তির পুত্র হওয়ায় অভিযোগপত্র জমা নেবার পূর্বেই তিনি জানিয়ে দেন সাক্ষী ছাড়া মামলা টিকবে না। 'ক্ষমতার ভাষা' প্রবন্ধে প্রফেসর সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন -

> "যখন কোনও বিচারের আগে রায় ঘোষণা হয়ে যায় কিংবা পুলিশি তদন্তের আগেই শাসন ক্ষমতার প্রধানের মুখে শোনা যায়,' 'আমি বলি, ওটা ধর্ষণ ছিল না।'"[৫]

আরো কিছু অনভিপ্রেত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় পর্ণিকে। থানার দারোগা থেকে এস.পি, ডি.এম পর্যন্ত সকলকেই সন্তুষ্ট রাখতে কুশধ্বজ মাঝে মধ্যে ভেট দিয়ে থাকেন 'মাসকাবারি সাথে দুটো বড়ো বোতল'। যার ফলে সকলেই কুশধ্বজ বাবুর চাটুকারিতা ও পদলেহন করে। কুশধ্বজের পুত্রের অপরাধ আড়াল করতে প্রশাসনিক কর্তারা আইন শৃঙ্খলা, নিজেদের কর্তব্য তথা নৈতিকতা সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছেন। কর্মসূত্রে ডি.এম ব্রতদাস বাবুর বস। সাধারণ ইউডিরা সেখান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনা, সঠিক বিচার তো দূরের কথা। বড়ো ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে ক্ষমতা বলে মামলা দখিল হওয়ার পূর্বেই কুশধ্বজের কাছে সে খবর পোঁছে যায়। টেলিফোনে সৎ নিরীহ ব্রতদাসবাবুকে শুনতে হয় আরও কিছু অপমানজনক কটূক্তি। অবশেষে বিএন সিনহার লেখা অভিযোগ পত্রটি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমা করা হয়। পর্নির জীবনে শুরু হয় আরো বড়ো লড়াই।

প্রশাসনিক কর্তারা কখনো কেউ কেউ অর্থের লালসার কাছে এতটাই নিজেদের বিক্রি করে দেন যে, প্রাপ্ত চেয়ারের সম্মানটুকু রাখেতে জানেন না। এক্ষেত্রেও তার প্রমাণ মেলে স্বয়ং ডিএম সাহেব ব্রতদাসবাবু'কে মামলা করার দায়ে পরোক্ষভাবে শাস্তি দিয়েছেন। কুশধ্বজের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করেন। কোর্টের অর্ডার পেয়ে ইন্সপেক্টর পুনরায় মামলা রুজু করার সময়েও পর্নিকে থানায় ডেকে অপমান করায় হয়। নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিক বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন -

> "Every critical handle like author, is itself trained and suspect. Every critic, male or female, is trained in the techniques of paternal criticism."[৬]

অপরাধীকে ফাঁসানো হয়েছে বলে নাবালিকা ধর্ষিতা নারীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। সমাজে প্রশাসন যেখানে নারীর সুরক্ষা দিতে অপরাগ সেখানে আঙুল তোলা হয়েছে ধর্ষিতার ওপরেই। এ লজ্জা যেন ধর্ষকের নয় ধর্ষিতার। মহিলা কমিশনার রশ্মি সরকার পর্নির পাশে লড়াইয়ের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে সেটিং প্রকল্পের পরিকল্পনা করে ফেলে। শত অপমান ও বাঁধা অতিক্রম করে পর্নি তার বাবার সাথে নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে হাজির হয় সঠিক বিচারের আশায়।

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে বসেই পেশকারের নিকট প্রথমেই ব্রতদাস বাগচি'র মামলা কত নম্বরে তা জেনে নেন। একজন নাবালিকা মেয়ের ধর্ষণের মামলা সেটি যথেষ্ট স্পর্শকাতর। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি চলাকালীন সময়ে সেই মামলা বাদী ও উকিল ব্যতীত অন্য মামলার কাউকেই সেখান উপস্থিত থাকার অনুমতি দেননি। মামলা শুরু হতেই কুশধ্বজের নিযুক্ত উকিল রাতুলকে ধোঁয়া তুলসী প্রমান করতে যথেষ্ট তৎপর। থানার ইন্সপেক্টর,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডিএম সাহেব দেখানো পন্থা অবলম্বন করে উকিলবাবুই জোগার করে ফেলে হোটেলের বিল। যাতে প্রমাণ করা যায় তার ক্লায়েন্ট নির্দোষ। ঘটনার দিন শহরের ছিল না রাতুল। এসব তথ্য যে টাকার বিনিময়ে সহজেই পাওয়া যায় তা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও জানেন। এমন ভুঁয়ো প্রমাণ পেয়ে সিজিএম নিজেও বিদ্রুপের হাঁসি হেঁসে ওঠেন। মামলাটি ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের অধীনে পাঠিয়ে দেন।

রোজ ভোরে আজও যেমন নতুন সূর্য উদিত হয় তেমনই সমাজ থেকে আইন শৃঙ্খলা, সততা নি:শেষিত হয়ে যায়নি। ফার্স্ট কোর্টের ম্যাডাম প্রচণ্ড স্ট্রিক্ট। পরবর্তী হেয়েরিং করে চিফ ম্যাডিক্যাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে পর্ণির ম্যাডিক্যাল টেস্ট করে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। কতোয়ালি থানার ওসি রেপ ভিক্টিমের এফআইআর কেন নেননি সেই কারণ ব্যাখ্যাসহ পরের শুনানির দিন আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। বিপক্ষ বাদী পক্ষ আর্থিক বলে বলবান হওয়ায় কোনভাবেই হার স্বীকার করতে অর্থাৎ আপরাধের সাজা পেতে রাজি নয়। কলকাতার খ্যাতিমান ব্যারিস্টার হায়ার করে আনেন। একদিকে ব্রতদাসবাবুকে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে রাখেন। ডি.এমকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে মামলা তুলে নিতে। কাউন্সিলর একজন নারী হয়েও ক্ষমতায়নের কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন। পর্ণির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ধর্ষিতা নারীর সমাজের চোখে কি অবস্থান সে বিষয়ে তার বাবা-মাকে বোঝাতে থাকেন। রেশ্মি সরকার এত জানান মামলা বাগচিবাবুর হার হলে কুশধ্বজ মানহানির মামলা দায়ের করবেন। একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না কোনরূপ সহমর্মিতা নয়, কতদূর বলবান কুশধ্বজ তারই ধ্বজাধারী হয়ে সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন মহিলা কাউন্সিলর। সাম্প্রতিককালেও এমন বহু ঘটনার প্রমাণ মেলে। দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে একজন পিতার হিসেবে ব্রতদাসবাবু অনেকটাই ভেঙে পড়েন। লড়াকু মনের সাহসী কন্যা বাবা- কে সাহস জোগাড়, জোর গলায় বলে -

> "...অত ভেঙে পড়লে হবে না। শেষপর্যন্ত লড়াই করতে হবে। একটা লোফারকে যদি আমরা ছেড়ে দিই, তা হলে তার স্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে। বাবাকে বোলো ভেঙে না পড়তে।"[৭]

কোর্টে মামলা শুরু হয়। ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট স্মিতা সিংহরায় পর্ণির মামলাটি যেন সর্বপ্রথম শুনানি হয় সেই নিদের্শ দেন পেশকারকে। বিচারক নিজের একজন নারী তথা একটি কন্যা সন্তানের মা। চাকুরি জীবনের মধ্যবর্তী সময় পৌঁছে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। চারিদিকে ধর্ষণের মামলা এত বেড়ে যাওয়ায় তিনি সারাদিন নিজেও শঙ্কিত থাকেন নিজের কন্যাকে নিয়ে। বিচারকের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চোখ দিয়েই খানিকটা বিচার করে নিতে পারেন কে অপরাধী কে অপরাধের শিকার। বিপরীত পক্ষের ডাকসেটে উকিল দিল্লি থেকে এসেছেন। পর্নির লিখিত অভিযোগগুলি যুক্তি দেখিয়ে একে একে সব নস্যাৎ করে দেন। উপরন্ত পর্নির ওপর একাধিক দোষারোপ করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত আদালত কক্ষে কেউ শুনতে হয় ধর্ষণকারীকে বিবাহ করার অভিসন্ধিতে পর্ণি ধর্ষণের মামলা সাজিয়েছে এবং তার একাধিক প্রেমিক আছে। কুশধ্বজের পুত্র অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়ায় তার পাখির চোখ রাতুল। চরিত্র নিয়ে এভাবে চটুল কথা শোনার পর সেখানেই পর্নি অজ্ঞান হয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও তা বুঝে বলেন -

> "শিগগির হাসপাতালে নিয়ে যান ওকে। মনে হচ্ছে খুব শক এই জ্ঞান হারিয়েছে।"[৮]

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে পরদিন যথারীতি কোর্টরুমে হাজির হয় ব্রতদাস বাগচি ও তার কন্যা উভয়েই। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ আনা হয়। প্রথমত সে আদৌ ঐ রাতে কোচিং-এ গিয়েছিল কিনা সম্পূর্ণ ঘটনাই মনগড়া। দ্বিতীয় দীর্ঘ নয়নজুলি একটি মেয়ের পক্ষে একলাফে পার হওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয় পর্ণি ছোটখাটো চেহারার নয় যে ধর্ষণের সময় বাধা দিতে অক্ষম। উভয় পক্ষের উকিলের কথা শুনে বিচারক স্থানীয় ইন্সপেক্টর এর তত্ত্বাবধানে ঘটনার পুনর নির্মাণের নির্দেশ দেন সঙ্গে যথাযথ ভিডিও রেকর্ডিং।

দেশের বিচার ব্যবস্থা এমনই যে, ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করতে পারে না। উপরন্ত যে এই ঘৃণ্যতম অপরাধের শিকার তাকেই পুনরায় ঐ দীর্ঘ নয়ানজুলি এক লাফে পাড় হয়ে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত পর্ণি

দ্বিতীয়বার হাসপাতালের শয্যা গ্রহণ করে। অপরদিকে যেকোন শ্রীঘরে যাবার আশঙ্কায় কুশধ্বজ পুত্রের জন্য অগ্রিম জামিনের ব্যবস্থা করে। বিপরীত পক্ষের শঙ্কা বাস্তবে রূপান্তরিত হল। বাদী পক্ষের উকিল বিএম সিনহা তথ্য ও প্রমাণ সমেত পেশ করলেন ধর্ষণকারী রাতে পর্নির পোশাক এবং হাসপাতালের মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট। রিপোর্টে লেখা আছে ধর্ষিতা কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা। ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের রক্ত ও ধর্ষিতার ভ্রুনের ডিএনএ টেস্ট করার নির্দেশ দেয়। যদিও বিচারক খবরের কাগজ পড়ে আগেই জেনে যান মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা।

আদালতের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষী হিসেবে কোর্টে উপস্থিত হন পর্নির ইংরেজি শিক্ষক অবনীন্দ্রনাথ মিত্র যার কাছে ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা সে পড়তে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সাক্ষী আশালতা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস রমলা মুখার্জি এসেছেন বিদ্যালয়ের প্রায় চোদ্দোশো কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। মেরা মৌন মিছিল করে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রথমে ডিএম অফিসে এবং পরে আদালত প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়েছে। প্ল্যাকার্ডগুলিতে লেখা রয়েছে -

> “ ‘মেয়েদের উপর অত্যাচারের জবাব চাই জবাব চাইম।’ কোনটাতেও লেখা, ‘অপরাধীর কঠোর শাস্তি চাই’। কোনটায়ও লেখা, ‘মেয়েদের অসম্মান সইব না সইব না’, কোনওটায় লেখা; ‘প্রশাসন চুপ করে কেন? জবাব চাই জবাব চাই’। কোনওটায় লেখা, ‘পুলিশ কেন এফআইআর না নিয়ে ফিরিয়ে দেয়? জবাব চাই জবাব চাই।’ ”[৮]

প্রধান শিক্ষিকা তার ছাত্রী সম্পর্কে জানান সে খুব ভালো ছাত্রী নয় ভালো সুন্দর মনের মানুষও বটে এবং তার সম্ভাবনার কথাও বলেন। পর্ণি এই বছরের একজন মাধ্যমিকের ছাত্রী। তার শিক্ষিকারা সকলেই আশাবাদী সে জেলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর তো পাবেই রাজ্যেও প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান করতে পারবে। এ এছাড়াও প্রমাণ সাপেক্ষে মনে করিয়ে দিয়েছেন মধ্যমগ্রামে একটি কিশোরীর ভ্রুনের নমুনা ও টিসু স্যাম্পেল দিয়ে সেই রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে আদেশদিতে। হত্যাকাণ্ড মামলাতেও ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দেওয়া হয়েছে এক্সিবিটের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি টেস্টের রিপোর্ট। ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দু-তিন দিন। অভিযুক্ত রাতুল রায় সপক্ষে দুটো শব্দই বলেছিল ‘আমি নির্দোষ’। পর্নিকে ম্যাজিস্ট্রেট কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে জানায় তার কিছু বক্তব্য আছে। সে পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

অন্ধকার ঘটনার পাশাপাশি তুলে ধরে তার লড়াইয়ে যারা সর্বদাই সাহস দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা। সহপাঠীরা, তার শিক্ষক শিক্ষিকারা বারবার তাদের বাড়িতে এসেছে, অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতাল দৌড়ে গিয়েছে। তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বিতোষ এই ঘটনার পরও তাকে ছেড়ে চলে যায়নি বারংবার তাকে টেলিফোন করে, মেসেজ করে ভেঙে না পড়ার পরামর্শ দিয়েছে। যে সব সহপাঠীরা জীবনের কোন কোন সময় শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে তারও পর্নির হাত শক্ত করে ধরেছে। সে জানায় কোন মেয়ে ধর্ষিতা হলে কখনোই অন্য কোন পুরুষের নাম ইচ্ছাকৃত জড়াবে না। ধর্ষকের প্রস্তাবটি ম্যাডামের সম্মুখে ব্যক্ত করেছে। ডিএনএ টেস্টে পর্নির শরীরে বাসা বাঁধা ভ্রূণ এর জনক ধর্ষণকারী হলে সে ধর্ষিতাকে বিয়ে করবে। এই নিষ্ঠুর প্রস্তাব মামলার সচ্ছতা প্রমাণের যথেষ্ট। ধর্ষিতা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে আর সমাজে পাঁচজন নারীর মতোই বাঁচে সেই উদ্দেশ্যেই তার অভিজ্ঞতা সবাইকে জানানো।

ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবশালী মহল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও আরজি জানানো হয় অভিযুক্তের বয়সের কথা বিবেচনা করে শাস্তি কিছুটা লঘু করার। কিন্ত বিচারক যথেষ্ট মেথোডিকাল এবং এথিকস মেনে চলেন। ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টটি ও যথোপযুক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয় মামলায় অভিযুক্ত রাতুল রায়কে দশ বছরের কারাদণ্ড ও দু-হাজার টাকার জরিমানা এবং অনা দায়ে আরো দু-বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করেন ম্যাজিস্ট্রেট। একই সাথে পর্নির শরীরে বেড়ে ওঠা ভ্রণকেও নষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন। নাবালিকা মেয়েটি যেন পুনরায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে আসে। স্কুলের শিক্ষিকাদের অনুরোধ জানান তাদের তত্ত্বাবধানে সে যেন এ বছরেই জীবনের বড়ো পরীক্ষায় বসে। অপরাধী ক্ষমতাবান হওয়ায় তারা উপরের কোর্টে যেতেই পারে। তবে স্কুলের শিক্ষিকারাও পর্ণীকে আশ্বাস দিয়েছে অপরাধীকে সাজা পেতে হবেই। প্রয়োজনে তারা সকলে চাঁদা তুলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যেন লড়াই করার সাহস পায় মেয়েরা। কালো মেঘ কেটে গিয়ে পর্ণির জীবনে আলোয় ভরে ওঠে। পৃথিবীরকে মনে হয় 'সত্যিই সুন্দর'।

দুই

একজন নারী আইএস অফিসারের গল্প। স্বামী অশোক শেষাদ্রি সেও আইএস। সুরিতা অশোক দুজনে একটি ব্যাচের আইএস। দুজনে দুই পদে অবস্থিত। অশোক পাবলিক হেলথ সুরিতা একটা স্টেট লেভেলে কর্পোরেশন এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সুরিতা দক্ষিণ ভারতীয় অপূর্ব সুন্দরী। স্বামী ব্যতীত একটি পার্টিতে তাকে গিয়ে হতে হয় লাঞ্ছিতা। উচ্চ পদস্থ অফিসার জোর করেই তার হাতে উত্তেজক পানীয়ের গ্লাস ধরিয়ে দেয়। বাধ্য করে সিপ নিতে। পাশে বসে প্রথমে তার হাতের আঙুলটি এবং ধীরে ধীরে বলশালী হাতের বাঁধন দিয়ে তাকে বেষ্টন করে ধরে। প্রস্তাব দেয় একটি আলাদা ঘরে একান্ত কিছুক্ষণ সময় কাটাবার। সুডিটা এই বেষ্টনটি ছাড়িয়ে নিতে চাইলে -

> "অজিত সিং আরো একটু সাহসী হয়ে সুরিতার পশ্চাদ্দেশে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে বলেন ইয়োর বাটকস আর ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ।"[৯]

অপমানে ঘৃনায় তৎক্ষণাৎ পার্টি ছেড়ে শুরুটা ফিরে আসে। স্বামী অশোককে জানানোর পর দুজনে সিদ্ধান্ত নেয় তারা লিখিত আকারে বিষয়টি রাজ্যপালকে জানাবেন গভর্নরের সেক্রেটারি সিদ্ধইয়ার কাছে মুখ বন্ধ খাম তুলে ধরেন সুরিতা। কিন্তু রাজ্যপাল এর কাছে কোন খাম সরাসরি গিয়ে পৌঁছয় না তার সেক্রেটারি দু লাইনের তার সারাংশ লিখে পাঠান। অভিযোগ পত্রটি পাওয়া মাত্রই সিদ্ধাইয়া নিজেই খবরটি চেপে যান। কারণ অজিত সিং তখন এ রাজ্যের 'ব্লু-আইড বয়'। তাকে খুশি করতে পারলে ভালো পোস্টিং পাওয়া যায়। গভর্নর হাউস থেকে কোনরূপ সহযোগিতার আশ্বাস না পেয়ে ঘটনাক্রমের নবম দিনে তারা এফআইআর দায়ের করার উদ্যোগী হয়।

পূর্বেও কর্মস্থলে সুরিতাকে প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। গর্ভবতী অবস্থায় আসন্ন সন্তানে আসার আনন্দে সে সময় সেই লাঞ্ছনা সে সহ্য করে নিয়েছে। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় তার গর্ভপাত ঘটে। সেই লাঞ্ছনা আজও সে বয়ে নিয়ে চলছে। একজন আইএস অফিসারের এফআইআর দায়ের করেও কোন লাভ হয় না। এরপর তারাও কোর্টের শরণাপন্ন হয়। কোর্ট এর আদেশনামাটি ও কনফিডেন্সিয়াল ফাইল কভারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টে মহিলা আইএস এর সম্ভ্রমের হানি ঘটিয়েছে তাই নয়, বহু কীর্তিকলাপের কাহিনীও লেখা রয়েছে। একদিকে যেমন তদন্তকারী অফিসার নিরঞ্জন ত্রিপাঠীকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশের বিরুদ্ধে অজিত সিং বাদল হাইকোর্টে আপিল করেন। অজিত সিং এর হয়ে লড়তে এসেছেন সুপ্রিম কোর্টের লইয়ার। হাইকোর্টের আপিল হওয়ায় কেসটি অজিত সিং এর ফেভারে চলে যায় লোয়ার কোটের কিছু টেকনিক্যাল ভুলে। এর পাশাপাশি সুরিচার সুশান্তিকে নিম্ন পদে ট্রান্সফার করা হয়।

অশোক শেষাদ্রি কিছুদিন পরে খবর পেয়েছেন ডিভিশন বেঞ্চ সমর্থন করেছে সিঙ্গেল বেঞ্চের অর্ডারকে তারাও হেরে যাবার পাত্র নয় চ্যালেঞ্জ করেছে ডিভিশন বেঞ্চে। দীর্ঘ সময় ধরে ন্যায় বিচারের আশায় এবং অপরাধীকে শাস্তি দিতে তারা লড়াই চালিয়ে গেছে। দেশের সকল নামী সংবাদপত্রে ছেয়ে গেছে খবর। যদিও একজন মহিলার সম্ভব এর কথা ভেবে কোথাও নাম প্রকাশ করা হয়নি। গোটা দেশেই দ্বিধাবিভক্ত প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। উক্তিগুলি যেমন -

> "এ লড়াই হল - পুরুষের বাহুবল বনাম নারীর শারীরিক দূর্বলতা
> এ লড়াই হল - আইপিএস বনাম আইএএস
> এর লড়াই হল - ক্ষমতার দম্ভ বড়ো না নারীর সম্ভ্রম!
> একজন পুরুষ এক নারীর সম্ভ্রম লাঞ্ছিত করেছেন, সর্বসমক্ষে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন তা যেন খুব সাধারণ ব্যাপার।
> তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে ইগোর লড়াই, ক্ষমতা প্রদর্শন।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুরিতা শেষাদ্রিকে সঠিক বিচার পেতে যেতে হয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সময় লেগে গিয়েছিল পাঁচ বছর। একজন বিদুষী নারীর সম্মানহানিই হয়নি তার অভিজাত সত্তাকে সস্তা করে দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে অজিত সিং বাদলের শাস্তি হয় তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচশো টাকা জরিমানা। অজিত সিং সেসময় কোন প্রবল প্রতাপ সবই ম্লান হয়েছে। কারণ সে সময় কোন চেয়ারের অধিকর্তা ছিলেন না। চাকরি থেকে অবসর পেয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে বিচার চালানোর জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থ। সুরিতার শেষাদ্রি সে ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে হয়নি। একজন আইএসকে এভাবে দিনেরপর দিন ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছে বিচারের আশায়। কিন্তু সাধারণ নারীর না থাকে অর্থবল না থাকে মনোবল। সুতরাং তাদের লাঞ্ছনা মুখ বুজে মেনে নিতে রাতের অন্ধকারে বালিশ শুনতে পায় চাপা কান্নার রোল।

তিন

নিগৃহীতা হয়েছে এক মহিলা সাংবাদিক নিজেরই সাংবাদিক পিতৃসম বসের দ্বারা। দু-দুদিন ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান চলাকালীন একটি হোটেলে রাত্রে লেডিস টয়লেট থেকে ঈপ্সিতা যখনই বেরিয়েছে তখনই তার হাত ধরে টেনে ঢুকে পড়েছেন লেডিস টয়লেটে তাদের চিফ এডিটার অনিল আগ্রবাল। এ কথা কাউকে জানাতে না পেরে একটি মেল করে অভিযোগ জানান অলকা বাজাজ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার 'অনুসন্ধান'র। ঘটনাক্রমে মেইলটি ফরওয়ার্ড হয়ে চলে আসে 'অক্ষর' নামক একটি পত্রিকার অফিসে। অক্ষর পত্রিকা এই খবরটি ছেপে দেয় তাদের সংবাদপত্রে। খবরটি জানা মাত্রই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ঈপ্সিতাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে।

শ্লীলতাহানির অপরাধের অপরাধী কে কঠোর শাস্তি দিতে ইপ্সিতাকেও আইনের আশ্রয় নিতে হয় মুম্বাই থেকে কলকাতায় এসে এফআইআর দাখিল করে অনেক আগারওয়াল অন্তর্বর্তী জামিনের জন্য আবেদন করেন কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি অনিল আগারওয়াল ক্রিকেট গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। যুদ্ধের ফার্স্ট রাউন্ডে লড়াইয়ে জিত হয়েছে ইপ্সিতার। অনেক আগারওয়ালের মতো ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালীরা হয়তো আরও অনেক আদালতে যাবে রায়ের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টের রায় ঐতিহাসিক জয় যাত্রা শুরু।

চার

১৬ই ডিসেম্বর ২০১২ দিল্লিতে রাত্রিতে যে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছিল তার প্রভাব সমস্ত পড়ে সমস্ত ভারতবর্ষের অলিতে - গলিতে। বিশেষত কন্যা সন্তানের বাবা মায়ের প্রত্যেকেই বিচলিত হয়ে যায় তাদের সন্তানকে বাইরে পাঠাতে। পড়াশোনা কিংবা যেকোনো কাজেই তাদের সন্তানটি বাইরে বেরোলে দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। দামিনীর শরীরকে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করেছিল একদল নরখাদক। সেই আতঙ্কে ভয়ে ক্ষোভে গোটা দেশ ফুসছিল। তার প্রভাব পড়েছিল শহর কলকাতা তথা মফস্বল শহরগুলিতেও। মানুষের জীবনযাত্রা কোথাও যেন থেমে গিয়েছিল। এয়ী নবম শ্রেণীর ছাত্রী তাকে টিউশন পড়তে পাঠাতে বাবা-মায়ের কোথাও যেন সেই আশঙ্কায় ঘিরে ধরেছিল। ঘটনার প্রভাবে তার বন্ধুরা দু-একদিন জন্য পড়া বন্ধ দিলেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে জোটবদ্ধ হয়ে পড়তে যায়। টিউশন থেকে ফেরার পথে তুই ও তার বন্ধুকেও ইভটিজারের লালসার শিকার হতে হয়। পরদিন থেকে তারা অভিসন্ধি করে কিভাবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করে দামিনী। ধর্ষকদের কঠোর শাস্তির দাবিতে গোটা দেশ গর্জে ওঠে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। ত্রয়ী-তনুকা-দূর্বা-পায়েল চারজনেই স্যারের সাথে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্মরণ সভায় সামিল হয়। এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন দামিনীর স্মরণ তথা সমাজের অন্ধকারের দূর করে উজ্জ্বল সুন্দর সভ্য সমাজের আশায়।

লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আমলা হওয়ার খুব কাছ থেকে দেখেছেন উপলব্ধি করেছেন আইনের মারপ্যাচ। কিভাবে মানুষকে বিচারের আশায় দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে অর্থবলে ক্ষমতাবলে নীরবে নীরব করার অভিসন্ধি করা হয়। তবুও লেখক আশাবাদী দেরীতে হলেও সত্যের জয়ঢাক বাজবেই।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়ে তপন, 'আমি বাঁচতে চাই', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১২
২. তদেব, পৃ. ১৪
৩. তদেব, পৃ. ১৬
৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র- রচনাবলী (অষ্টম খন্ড), পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৩৫
৫. বিশ্বাস সেনগুপ্ত শ্যামশ্রী, সংকলন ও সম্পাদনা, বহুরূপে ভাষা (প্রথম খন্ড), প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১২ অক্টোবর, ২০১৫ (মহালয়া), কলকাতা- ৭০০০০২, পৃ. ১১১
৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬, কলকাতা-৯, পৃ. ১২১
৭. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'আমি বাঁচতে চাই', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৯৭
৮. তদেব; পৃ. ১৫০
৯. তদেব; পৃ. ১৭৮
১০. তদেব; পৃ. ২০৮

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 817 - 825
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজ

জগন্নাথ বর্মন
সহকারী অধ্যাপক
সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ, সিউড়ী, বীরভূম
Email ID : jagannathbarman55@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Rabindranath Tagore, Crisis of Civilization, Postcolonial Society, Colonialism, Western Civilization, Cultural Hegemony, Social Justice, Colonial Critique.

Abstract
Rabindranath Tagore's essay 'Crisis in Civilization (Sabhyatar Sankat) is a profound critique of colonial rule of Western civilization. Written in 1941 during the final years of British rule in India the essay expresses Tagore's deep disillusionment with Western imperialism and its hypocrisy regarding human values. Initially an admirer of Western literature and philosophy Rabindranath Tagore gradually became disenchanted with the colonial powers. In his essay Rabindranath Tagore not only criticize the colonialism rule but also serves as a philosophical reflection on the true meaning of civilization.

Rabindranath Tagore highlights how British colonialism not only politically subjugated India but also sought to impose cultural dominance. The British justified their rule under the pretense of spreading modern civilization. Tagore challenges the Western notion that technological advancement and military strength alone define civilization. Instead, Rabindranath Tagore argues that true civilization is based on ethical values, mutual respect, and human dignity. He also states that civilization, as translated in Indian languages, lacks an equivalent term, implying that its true essence goes beyond material progress.

One of the key themes in 'Crisis in Civilization' is Rabindranath Tagore's criticism of the moral downfall of the West. According to Rabindranath Tagore, despite its scientific and industrial progress, the West had forsaken fundamental human values. He saw colonial exploitation, global conflicts and racial superiority as symptoms of this ethical decline. The industrial revolution had fueled economic prosperity in Europe but this progress came at the cost of immense suffering in the british colonies. He argues that technology should serve humanity not become a tool for oppression. Furthermore, the rise of fascism and the horrors of war demonstrated how Western civilization was on a self-destructive path.

Despite his critique, Rabindranath Tagore remained hopeful about the future. He believed that humanity could overcome its crises through self-awareness, justice and moral resurgence. His essay carries a universal message- True civilization is not about dominance but about harmony, compassion and shared progress. Even today, in a world marked by economic disparity, cultural imperialism, and conflicts, 'Crisis in Civilization remains

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

relevant. Tagore's vision calls for a civilization built not on exploitation but on human dignity and ethical values.

Discussion

ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি মানবসভ্যতার চরম আত্ম-সংকটের মুহূর্তে লেখা এক অবিস্মরণীয় রচনা। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বিচারিতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ইংরেজ জাতি, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক সময়ের মুগ্ধতা ও অপরিসীম শ্রদ্ধা কালের বিবর্তনের সাথে সাথে কীভাবে হতাশায় পরিণত হয়েছে, তার এক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় 'সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে কেবল রাজনৈতিক নিপীড়নই করেনি, এটি ভারতীয় সমাজে একচেটিয়া সাংস্কৃতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবশিক শাসনামলে তৎকালীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক বিভেদ ব্যাপক ভাবে প্রকট হয়ে পড়েলেও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার চেষ্ঠা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের এই দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, প্রকৃত সভ্যতা কেবল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা বা সামরিক শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা মানবিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি শুধু উপনিবেশবাদী শাসনের সমালোচনা নয়, বরং তা মানবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর বিশ্বাসেরও প্রতিফলন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, শোষণ ও নিপীড়নের এই অন্ধকার অধ্যায় পেরিয়ে মানবজাতি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হবে। বর্তমান বিশ্বেও যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা, বৈষম্য ও অসহিষ্ণুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ পাঠককে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

রবীন্দ্রচিন্তায় সভ্যতার সংকট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি তাঁর গভীর জীবনবোধ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির এক বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪১ সালে লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশবাদী শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে স্বীকার করলেও তার মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সভ্যতার প্রকৃত অর্থ ও তার স্বরূপ কী হওয়া উচিত - এটাই ছিল তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে - সভ্যতা কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা সামরিক শক্তির আধিপত্য নয়। সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে। তিনি তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে বলেছেন, -

> " 'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়।"[১]

এই বক্তব্যে তিনি সভ্যতার অন্তর্নিহিত অর্থের জটিলতা বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সভ্যতা কেবলমাত্র বাহ্যিক জৌলুস বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবিক কল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং সমতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজই প্রকৃত সভ্য সমাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন আদর্শ ছিল 'সদাচার'। এটি ছিল সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ধরনের শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা যা সামাজিক প্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায়। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা এই সংকীর্ণতার বাইরে গিয়েও মানবতার মহান আদর্শকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

> "সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"[২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই উক্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতা মানবিক মূল্যবোধের ত্যাগের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন উপনিবেশবাদ সভ্যতার সংকটের অন্যতম কারণ। ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতবর্ষে যে দারিদ্র্য, শোষণ এবং সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তা ছিল মূলত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষনের ফল। তিনি লিখেছেন –

> "ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।"[৩]

এই বাক্যে তিনি ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের নিপীড়নমূলক নীতির সমালোচনা করলেও পাশ্চাত্যের কিছু মানবিক ও উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রশংসাও করেছেন। উদাহরণস্বরূপ জন ব্রাইটের মতো কিছু ব্রিটিশ চিন্তকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন যাঁরা ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সাথে এটাও দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা এবং ক্ষমতার মোহ পাশ্চাত্যের সেই মানবিক চেতনাকে ধ্বংস করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার সংকটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছেন যেখানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কথা উল্লেখিত আছে। শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপে প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বাড়লেও, সেই প্রযুক্তিকে উপনিবেশগুলিতে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, -

> "যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত।"[৪]

এই মন্তব্যে তিনি ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার জন্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তিকে দায়ী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও দেখিয়েছেন প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও ইউরোপ কিভাবে নিজেই নিজের ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতা এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান ছিল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বলেন, -

> "এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"[৫]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার নৈতিক অধঃপতনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

সভ্যতার এই সংকটের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ঠ আশাবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানবজাতি তার ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে একদিন প্রকৃত সভ্যতার পথে এগিয়ে যাবে। তাঁর মতে, প্রকৃত সভ্যতা তখনই গড়ে উঠবে যখন মানুষ জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভৌগোলিক বিভাজন অতিক্রম করে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। তিনি লিখেছিলেন, -

> "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।"[৬]

এই আশাবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্বজনীন মানবতাবাদী দর্শনের পরিচয় বহন করে। তিনি প্রার্থনা করেছেন, পূর্বদিগন্ত থেকে নতুন সভ্যতার সূর্যোদয় ঘটবে যেখানে মানবিক মূল্যবোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ ও তার প্রভাব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' লেখনীতে উপনিবেশবাদের নির্মমতা, শোষণ, এবং সাংস্কৃতিক বিকৃতির চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যম নয় বরং এটি হল সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। তাই ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের জনগণ কেবল অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হননি বরং তাঁরা আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক গৌরব থেকেও যথেষ্ঠ বঞ্চিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশবাদের এই বহুমুখী প্রভাব গভীরভাবে উপলব্ধি

করেছিলেন এবং তাঁর রচনার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশবাদকে কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক শাসনের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের সম্পদ আহরণ করা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের নিপীড়ন জনসাধারণকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি তাঁর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে লিখেছেন, -

> “অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা - কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।”[৭]

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে উপনিবেশিক শাসন কেবলমাত্র শাসকদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিচালিত হত, জনগণের কল্যাণের কোন লক্ষ্য ছিল না। তিনি দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের শ্রম ও সম্পদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে ব্যয় করা হলেও ভারতবাসীকে তার মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, উপনিবেশবাদের সবচেয়ে সুক্ষ্ম এবং গভীর প্রভাব পড়েছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। ব্রিটিশরা ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে উচ্চতর বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যা ভারতীয়দের আত্ম-সম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাসে গভীর আঘাত হানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করে বলেছিলেন যে, -

> “এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র।”[৮]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ শক্তির আইন-শৃঙ্খলার নামে মানুষের স্বাভাবিক মানবিক বিকাশকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্ঠাকে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন যে, প্রকৃত সভ্যতা কেবল বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না, এটিকে মানব মনের অন্তর থেকে উৎসারিত হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ শুধু অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের মানসিক জগতেও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মনে আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং পরাধীনতার মানসিকতা গেঁথে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে লিখেছেন –

> “আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে।”[৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিতে উপনিবেশিক শাসনের আরোপিত দোষারোপ নীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি দেখেছিলেন কীভাবে ব্রিটিশরা ভারতের সামাজিক বিভাজন ও দুর্বলতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। জাতি, ধর্ম এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজনকে আরও গভীর করে উপনিবেশবাদীরা ভারতীয় সমাজকে বিভক্ত ও দুর্বল করেছে।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির কিছু মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন, তবুও তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ন্যায়সঙ্গত তা কখনোই স্বীকার করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে আসে না বরং মানসিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিও অবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, -

> “ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।”[১০]

এই বক্তব্যে তিনি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের স্থবির অবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শিক্ষা ব্যবস্থারও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয়দের মনকে ক্রীতদাসে পরিণত করছে, যা ভারতীয়দের সৃজনশীলতা ও স্বকীয়

চিন্তাভাবনাকে বিনষ্ট করছে। তিনি শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা জাতীয় চেতনা, সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা কেবলমত্র তথ্য আহরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবিকতা ও সহমর্মিতারও বিকাশ ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী এক তাত্ত্বিক। তিনি মনে করতেন যে, প্রকৃত মানব সভ্যতা কোনো নির্দিষ্ট জাতির জন্য নয়, বরং এটি সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। তাই তিনি উপনিবেশবাদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধেই তাঁর কলম চালিয়েছেন। ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে তিনি বলেন, -

> “মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বন্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়।”[১১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে মানবতার সার্বজনীন চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করে উপনিবেশবাদের সংকীর্ণ জাতীয় অহংকারের তিব্র বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ কেবল একটি শাসন ব্যবস্থা নয়, বরং এটি ছিল মানবতার মর্যাদার উপর সরাসরি আঘাত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সভ্যতা কেবলমাত্র প্রযুক্তি এবং বাহ্যিক সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা মানুষের আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের মধ্যেই নিহিত থাকে।

উপনিবেশবাদ পরবর্তী প্রভাব ও আধুনিক বিশ্ব : উপনিবেশবাদ দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে প্রাভাবিত করে আসছে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির শাসন পরবর্তী সময়ে বিশ্ব যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, তা এখনও সমসাময়িক সমাজে এখনো প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে উপনিবেশবাদী শাসনের নির্মমতা, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বে এর সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। উপনিবেশবাদ-পরবর্তী বিশ্বে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ছিল উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ উপনিবেশবাদী শাসন থেকে মুক্তি পায়। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের দেশগুলো স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে নিজেদের জাতীয় পরিচয় পুনঃনির্মান করে। যদিও এই স্বাধীনতা অর্জন সহজ ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘস্থায়ী শোষণ, সম্পদের অপচয়, জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজনের কারণে নবগঠিত রাষ্ট্রগুলো এক তিব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মুখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে এই সংকটের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, -

> “ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।”[১২]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, উপনিবেশ-পরবর্তী রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি তখনো বাকি ছিল।

উপনিবেশবাদ শেষ হলেও অর্থনৈতিক পরাধীনতা অনেক রাষ্ট্রেই স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। কারন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের জন্য সেই ঔপনিবেশিক তথা পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বিভিন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতির মাধ্যমে কঠিন শর্ত ও উচ্চসুদের ঋণ প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে এই ধরনের অর্থনৈতিক নির্ভরতা উপনিবেশবাদেরই একটি নতুন রূপ। তিনি পশ্চিমা সভ্যতার এই মুনাফাকেন্দ্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, -

> “অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।”[১৩]

এই অবস্থান থেকেই বোঝা যায়, নয়া অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

উপনিবেশিক শাসনামলের চাপিয়ে দেওয়া ভাষা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি উপনিবেশ-পরবর্তী বিশ্বেও অব্যাহত থেকেছে। অনেক রাষ্ট্রে ইউরোপীয় ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। শুধু তাই নয় পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থাকে কিছু কিছু দেশ সার্বিক উন্নতির প্রধান মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে। যদিও বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশগ নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে এই প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

উপনিবেশবাদ-পরবর্তী বিশ্বে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চললেও উপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে একনায়কতন্ত্র, সামরিক শাসন, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি বহু দেশে অব্যাহত থেকেছে। উপনিবেশিক শাসকেরা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি প্রয়োগ করেছিল, তার ফলাফল এখনো অব্যাহত রয়েছে। ফলস্বরূপ জাতিগত সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এখনো অনেক দেশের মূল সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাজন নীতির ফলাফল সম্পর্কে বলেছিলেন, -

> "সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন চালিত দেশে।"[১৪]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে উপনিবেশবাদ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনকে দীর্ঘস্থায়ী করে রেখেছে।

আজকের বিশ্বেও উপনিবেশিক অতীতের ছায়া স্পষ্ট। শরণার্থী সংকট, মানবপাচার, যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য উপনিবেশবাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের অংশ। ইউরোপ এবং আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলো এখনো বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণে আধিপত্য বজায় রেখেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেছেন - মানবতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেছেন –

> "আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে।"[১৫]

এই আশার বাণী আধুনিক বিশ্বে মানবিক মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক সংহতির প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়।

আধুনিক পৃথিবীতে 'সভ্যতার সংকট'-এর প্রাসঙ্গিকতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মগৌরব, উপনিবেশবাদী শাসণ ও শোষণ, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আধিপত্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, সভ্যতা যদি মানব কল্যাণের বদলে ধ্বংস ও শোষণের মাধ্যমে বিকশিত হয়, তাহলে তা কখনোই প্রকৃত সভ্যতা হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বেও এই সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ রূপ হয়তো নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য আজও বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে। তথ্য-প্রযুক্তির বিপুল উন্নতি সত্ত্বেও মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, সংঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশন, নব্য উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রনীতি এবং ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান বিশ্বব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতাকে আরও গভীর করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে মানবিকতা, সাম্য ও শান্তিকে তুলে ধরেছিলেন, যা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

উপনিবেশবাদের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলেও তার প্রকৃত রূপ এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। এখন ঔপনিবেশিক শাসন চলে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো দরিদ্র দেশগুলোর সম্পদ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শোষণ করছে অথবা উন্নত দেশগুলোর বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতির কারণে দুর্বল দেশগুলো তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি অনেক উন্নয়নশীল দেশের ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করে ঋণ প্রদান করছে, যার ফলে তারা স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ কেবল অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে বিরাজমান। পশ্চিমা গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির একচেটিয়া আধিপত্য অনেক দেশেই স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে গ্রাস করে নিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতি ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ফলে জাতিসত্তা ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসারে বড় সংকট দেখা দিচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি এখনো নিজেদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে না পারে, তবে সভ্যতার এই সংকট আরও গভীরতর হবে।

প্রযুক্তি আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি প্রভৃতি মানুষের জীবনকে যেমন সহজ-সরল করে তুলেছে তেমনি তা মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিকতাও বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিজিটাল দুনিয়ার প্রতি মানুষের আসক্তি, ব্যাক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন, সাইবার অপরাধ ও ভুয়া তথ্য সম্প্রচার মানব সমাজে গভীর সংকট সৃষ্টি করছে। আগে মানুষ সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত। কিন্তু এখন ভার্চুয়াল দুনিয়ায় হারিয়ে গিয়ে মানুষ বাস্তব জীবনে একা হয়ে পড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে, এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলো ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নতি তখনই অর্থবহ যখন তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজকের বিশ্বে প্রযুক্তির এই অপব্যবহার সভ্যতাকে ক্রমশ সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েই চলেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলস্বরূপ কিছু দেশ ও ব্যক্তি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এখনো দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে বন্দি। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ, কর্পোরেট কর ফাঁকি এবং শ্রমশক্তির শোষণের মাধ্যমে ধনী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিরা আরও সম্পদশালী হচ্ছে, অথচ দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক দেশেই কর্মসংস্থানের অভাব, ন্যায্য মজুরির সংকট এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন, সভ্যতার প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত থাকে সামাজিক সাম্যের মধ্যে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে এই সাম্যও ব্যাহত হচ্ছে, ফলে সভ্যতা আরও সংকটে পড়ছে।

বিশ্ব আজও যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংঘাতে জর্জরিত। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, দক্ষিণ চীন সাগরের আধিপত্যবাদী প্রতিযোগিতা বিশ্বে অস্থিরতা ও বিশ্ব যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। বড় শক্তিধর দেশগুলো অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্র দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় সংঘাত, জাতিগত সহিংসতা ও অস্ত্র ব্যবসার মাধ্যমে অনেক দেশ রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ছে। উন্নত দেশগুলো অস্ত্র উৎপাদন ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে, যা বিশ্বশান্তির জন্য মারাত্মক হুমকি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার নিষ্ঠুর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, সভ্যতা যদি ধ্বংসের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তবে তা সভ্যতা নয়। আজকের বিশ্বেও যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে যুদ্ধ ও ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে, তবে সভ্যতার প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন মানব সভ্যতার জন্য এক ভয়াবহ সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষ প্রকৃতির ওপর যে শোষণ চালিয়ে আসছে, তার ফলস্বরূপ আজ বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলের বরফগলা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বন উজাড়, কার্বন নির্গমন, প্লাস্টিক দূষণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। উন্নত দেশগুলো শিল্পায়নের মাধ্যমে বিশ্বের জলবায়ুর ক্ষতি করলেও, এর প্রধান ভুক্তভোগী হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতি ও সভ্যতার সহাবস্থান জরুরি। কিন্তু আজকের সভ্যতা যদি পরিবেশের প্রতি অবহেলা অব্যাহত রাখে, তবে সভ্যতার অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃত সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে অর্থ, ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিচালিত হচ্ছে, যা নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। মানুষ এখন স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা এবং ভোগবাদে এতটাই নিমজ্জিত যে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দুর্নীতি, প্রতারণা, সামাজিক অবিচার— এসব সমস্যা বিশ্বব্যাপী সাধারণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসারের ফলে ভুয়া খবর, প্রোপাগান্ডা এবং মিথ্যাচার সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কারণ তাদের সামনে সঠিক মূল্যবোধ গঠনের সুযোগ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা এবং নৈতিক শিক্ষার অভাব এই সংকটকে আরও তীব্র করছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পেশাগত দক্ষতা অর্জন নয়, বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ করে তোলা। তাই, সভ্যতার সংকট কাটানোর জন্য শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় আত্মপরিচয় এবং নিজস্ব সংস্কৃতির গুরুত্ব বারবার তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত সভ্যতা গড়ে ওঠে সংস্কৃতির বিকাশ ও বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে বিশ্বায়ন এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। পশ্চিমা জীবনধারা, ভোগবাদী সংস্কৃতি, ফাস্ট ফুড, পোশাক, বিনোদন ও সামাজিক মূল্যবোধ এখন বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করছে। হলিউড, নেটফ্লিক্স, কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম নিজের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ফলে অনেক জাতির ভাষা, শিল্প, সাহিত্য এবং ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্যিকারের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি তখনই সম্ভব, যখন কোনো জাতি নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, অথচ একই সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি উদার মনোভাব রাখবে। সাংস্কৃতিক চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্থানীয় ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেগুলোর সংরক্ষণে পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি উপনিবেশবাদী শাসনের নির্মম বাস্তবতা ও তার গভীর প্রভাব তুলে ধরে। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার স্বরূপকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে এই সমালোচনার মধ্যেও তিনি মানবতার ওপর আস্থা হারাননি। উপনিবেশিক শাসনের শোষণ, বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি কেবল অভিযোগ তোলেননি, বরং ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন আশার বাণীও শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানব সভ্যতা কেবল ভৌত শক্তি ও অর্থনৈতিক প্রগতির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; বরং তা গড়ে ওঠে ন্যায়, মানবিকতা এবং পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধের ভিত্তিতে। তাঁর মতে, সভ্যতা তখনই প্রকৃত সভ্য হয়ে ওঠে, যখন তা সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে। উপনিবেশবাদ সভ্যতার নামে যে অবিচার ও শোষণ চালিয়েছে, তা মানবতার প্রতি এক চরম অবমাননা। আধুনিক বিশ্বেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা যথেষ্ঠ প্রাসঙ্গিক। আজও বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অসামঞ্জস্য এবং জাতিগত সংঘাত দেখা যায়। আধিপত্যবাদী নীতির মাধ্যমে শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, অন্ধকার যতই গভীর হোক না কেন, মানবতার আলো একদিন পথ দেখাবে। সুতরাং, সভ্যতার সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন মানবিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে ন্যায়, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চাই হতে পারে প্রকৃত সভ্যতার ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের এই বাণী আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যিকার সভ্যতা গড়ে ওঠে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং সম্মানবোধের মাধ্যমে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিচিত্রা, রবীন্দ্র-রচনা-সঞ্চয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা পঁচিশে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৩১৭
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০-৩২১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 826 - 836
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উপনিবেশিত বিশ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা : প্রসঙ্গ *সভ্যতার সংকট*

রাকিবুল হাসান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ডিপার্টমেন্ট অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস
বাংলাদেশ আর্মি ইউনির্ভাসিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
সৈয়দপুর, বাংলাদেশ।
Email ID : rakibulhasanbangla440@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Rabindranath Tagore, Colonialism, Post-Colonialism, Imperialism, Cultural identity, Globalization.

Abstract
This research explores the contemporary relevance of Rabindranath Tagore's thoughts on the colonized world, particularly as articulated in his essay "The Crisis of Civilization" (Sabhyatar Sankat). Written during the later years of Tagore's life, the essay critiques the Western concept of civilization and its detrimental impact on India during the colonial period. Tagore argues that this notion has fueled the exploitation and oppression of colonized nations, urging Indians to reclaim their cultural heritage and reject the imposition of foreign values. The study aims to analyze the themes within the essay, with a focus on its critique of imperialism and the lasting legacy of colonialism. It will investigate how Tagore's insights remain significant in today's post-colonial context, where many nations continue to grapple with the ramifications of their colonial histories. The research highlights Tagore's warning against blind imitation and unquestioning obedience while encouraging critical thought regarding dominant ideologies. By contributing to the discourse on post-colonialism and decolonization, this study underscores the necessity for renewed critiques of Western values and institutions. Furthermore, it illustrates how Tagore's perspectives continue to resonate in contemporary discussions surrounding globalization, imperialism, and cultural identity.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 826 -836
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

১

'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জীবনের শেষ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এটি পরে তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, তা দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনার অপূর্ব উদাহরণ, একই সাথে পাঠকেরও জীবন জিজ্ঞাসার পথনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রথম দিকে সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি এই মহিমার বোধ তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল ইংরেজি সাহিত্য ও ভাবুকদের নানান ভাবাদর্শ। এমনকি তিনি এও মনে করেছিলেন যে বিজিত জাতির স্বাধীনতা বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কিন্তু পরে স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজি রস সম্ভোগের জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গ তিনি নিজেই জানাচ্ছেন সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। তথাকথিত সভ্যতাকে এভাবেই এই শাসকরা 'রিপুর প্রবর্তনায়' অনায়াসে লঙ্ঘন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, 'বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির' কী অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য। এভাবেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেই তাঁর আত্মচেতনার জাগরণ এবং পাঠকের নিদ্রাভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, একদা ইংরেজ জাতির প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তবে তিনি যে সেই আকর্ষণজাল ছিন্ন করেছেন এবং কেন করেছেন তারও কারণসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন। অন্ধ অনুসরণ, বিনা প্রতিবাদে শাসকের হাতে অবলীলায় শোষিত হওয়া যেকোনো জাতির পক্ষে লজ্জাজনক তাই যেন রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি আমাদের শিক্ষা দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, উপনিবেশিত দেশগুলো এখনো সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বের হতে পারেনি। আমাদের এই বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভ্যতার সংকট প্রবন্ধটি আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাঁর লেখায় আমরা কেবল নতুন রূপকল্পই চিত্রিত হতে দেখি না, বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বাদ আর সৌরভ, আশা আর আনন্দ, দুঃখ আর বেদনার শব্দপ্রতিমা যেন খুঁজে পাই প্রতিটি লেখায়। একজন বিশ্বের কবি হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশসহ পুরো বিশ্বকে নিয়েই তিনি ভেবেছেন। তাঁর এই ভাবনার প্রকাশ আমরা পাই জীবনের শেষ পর্যায়ের লেখায়। জীবনের শেষের দিকের প্রতিটি রচনায় তাঁর লেখকসত্তায় ভিন্ন মাত্রা তৈরী করে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম বলি হওয়া পৃথিবীর সর্বত্র সভ্যতার সংকটের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। যা তাঁর লেখক সত্তায় ভিন্ন আঙ্গিক তৈরী করে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের তুঙ্গ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধে তাঁর ভাবনার কথা জানান। কলকাতার নাগরিক জীবনের ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়, বিশেষত প্রবন্ধে উপনিবেশিত বাংলার বহুমাত্রিক রূপ শিল্পিতা পেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় মানব সম্পর্ক কীভাবে নষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্নতায় রূপ নিয়েছে, কীভাবে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন পুরো পৃথিবীকে তাঁদের ইচ্ছের গোলাম বানাচ্ছে তা রবীন্দ্রভাবনায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। বলা যায়, উপনিবেশের অধিবাসী হয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় বাংলার মানুষের আত্মিক ও জাগতিক মুক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধ তাঁর এই নতুন জীবনবাদ উচ্চারণের অভ্রান্ত সাক্ষী হয়ে আছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে, শতবর্ষের অধিককাল আগে ঔপনিবেশিক শাসনের যে-কদর্য রূপ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন, সেসময় অধিকাংশ ভারতীয় ভাবুক-চিন্তাবিদ মোহগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন ছিল পাশ্চাত্য চিন্তাচর্চায়। জীবনের শুরুর দিকের রচনায় আমরা যেই রবীন্দ্রনাথকে পাই শেষ দিকের রচনায় আমরা পাই অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ উপনিবেশিত সমাজ কাঠামোর পটভূমিতে বেড়ে উঠেছেন। উপনিবেশিত সমাজে বসবাস করেও তিনি উত্তর উপনিবেশিক চিন্তা করতে পেরেছেন এক কালোত্তীর্ণ প্রতিভাবলে। অনেকে ইউরোপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগকে বড় করে দেখান। কিন্তু বিষয়টি এত সরল রৈখিক নয়। প্রথম জীবনে বিলেতি সভ্যতার প্রতি কিছু মোহমুগ্ধতা থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর

চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। তাঁর 'সভ্যতার সংকট' এর সবচেয়ে বড় দলিল। তিনি উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে অগ্রাহ্য করে প্রাচ্যের জ্ঞানতত্ত্বকে পশ্চিমের সামনে তুলে ধরেছেন। পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী ডিসকোর্সের পরিবর্তে উপস্থিত করেছেন প্রাচ্যের মানবিক ডিসকোর্স। আর এভাবেই তিনি গড়ে তুলেছেন উপনিবেশবাদ বিরোধী মতাদর্শিক বৌদ্ধিক প্রতিরোধ। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক ছবি, একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিপ্রতীপে কোথায় আছে দ্রোহের উৎস তার সন্ধানও। উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের আলোয় কীভাবে ঘটবে মানুষের আত্মিক মুক্তি তারও অভ্রান্ত ইঙ্গিত আছে রবীন্দ্রনাথের এই লেখায়। এই প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট প্রবন্ধের পাঠ অনুসরণ করে ঔপনিবেশিত বিশ্বের সংকট ও ঔপনিবেশিত বিশ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার দিকটি উন্মোচন করার চেষ্টা করবো।

২

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই সাহিত্য-শিল্পকলা-রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে বিশেষ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব একটি বিশেষ মনোযোগের জায়গা দখল করে নেয়। এসব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং ধারণাগত অনুসন্ধিৎসা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা জানি, সতেরো-আঠারো বা উনিশ শতকে ইউরোপ সমুদ্রপথে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিল। তাদের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বাণিজ্য। মূলত, বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে ইউরোপ এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার শাসনক্ষমতা দখল করেছে, লুণ্ঠন করেছে তাদের দেশ থেকে অধিকৃত সম্পদ, প্রচার করেছে খ্রিষ্টবাদ। একের পর এক সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে ইউরো-মানসিকতায় এক ধরনের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্ম দিয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল কালো-মানুষের ওপর সাদা-মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং এরই অনুষঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল সাদা-কালো প্রভু-দাসের অমোচনীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য (binary-opposition)। পাঠক, সভ্যতার সংকট প্রবন্ধ অনুসারে ইউরোপীয় উপনিবেশের ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী যে সংকট তৈরি হয়েছিল তা আমরা একটু পরই দেখবো।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পনেরো শতক থেকে সমুদ্রজয়ের মাধ্যমে অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করা শুরু করে। তাদের এই সাম্রাজ্য বিস্তার শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা ছিল তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানভাণ্ডার জয়ের অনন্ত অভিযাত্রা। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও ভূগোলজ্ঞানের মাধ্যমে ইউরোপ অন্যদের (native) দুর্বলতা ও সম্পদ সম্পর্কে যেমন অবহিত হয়েছিল, তেমনি ধারণা লাভ করেছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তথা শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে। বোধকরি এ-কারণেই কথাকোবিদ ফ্রানৎস্ কাফকা ইউরোপের সমুদ্রজয়কে আখ্যায়িত করেছিলেন জ্ঞানযন্ত্র বা knowledge machine অভিধায়। নবলব্ধ এই জ্ঞান দ্বারা ইউরোপ যে যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলো তা গভীরভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে, বিজিত দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয় সে যুগ্ম-বৈপরীত্য এবং বিজিত দেশের মানুষদেরও, তাদের দৃষ্টিতে যারা অপর (other), বাধ্য করায় সে যুগ্ম-বৈপরীত্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের কিছু নমুনা এরকম – শাসক-শাসিত, সাদা-কালো, সভ্য-অসভ্য, উন্নত-আদিম, গতিশীল-স্থবির, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, মানবিক-পাশব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জ্ঞানী-মূর্খ, চিকিৎসক-রোগী, কেন্দ্র-প্রান্ত ইত্যাদি। লেখাই বাহুল্য, এসব যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথমটি নির্দেশ করে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিকে আর দ্বিতীয়টি উপনিবেশিত পৃথিবীকে। ইউরোপ বোঝাতে চেয়েছিল, যা কিছু ভালো সুন্দর মানবিক এবং যৌক্তিক তার সবটাই ইউরোপের; উপনিবেশিত পৃথিবী কেবলই অসুন্দর ইতর মূর্খ অমানবিক আর প্রান্তিক। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত ভূখণ্ড ও মানবমণ্ডলী (natives) সম্পর্কে একটা পার্থক্যসূচক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে দিলো ইউরোপ। এই পার্থক্য সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক – সব দিকেই ক্রমে প্রভাব বিস্তার করল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকের এই মন্তব্য -

> "Colonialism could only exist at all by postulating that there existed a binary opposition into which the world is divided. The gradual establishment of an empire depended upon a stable hierarchical relationship is which the colonized existed as the other of the colonizing culture. Thus the idea of the savage could occur only if there was a concept

> of the civilized to oppose it. In this way a geography of difference was constructed, in which differences were mapped (cartography) and laid out in a metaphorical landscape that represented not geographical fixity, but the fixity of power. Imperial Europe became defined as the 'centre' in a geography at least as metaphysical as physical. Everything that lay outside that centre was by definition at the margin of the periphery of culture, power and civilization."[১]

ঔপনিবেশিক শক্তি চায় কেন্দ্র-প্রান্তের এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের সম্পর্কটি দৃঢ়বদ্ধ ও অবিচল রাখতে। যুগ্ম-বৈপরীত্যসূচক সম্পর্কের অবিচলতার ওপরই নির্ভর করে উপনিবেশকের সাফল্য ও স্থায়িত্ব এবং বিজিত জনগোষ্ঠীকে হীনবল রাখার প্রত্যাশিত সফলতা। ফলে ইউরোপের সমুদ্রবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোতে কেবল বাণিজ্যপণ্যই নয়, অধিকৃত ভূখণ্ডে চালান হতে থাকে আরো অনেক কিছু – ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, পোশাক, প্রশাসন, এমনকি মানবিক চিন্তন-প্রক্রিয়া পর্যন্ত, যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ ও তার অধিবাসীদের ওপর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও মানসিক আধিপত্য বিস্তার। ঔপনিবেশিক শক্তির অব্যাহত প্রচেষ্টায় উপনিবেশিতের মনে উপনিবেশী সংস্কৃতির প্রতি সৃষ্টি করে এক অমোঘ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একই সঙ্গে আপন ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতাবোধ। স্মরণ করা যাক ফানোর ভাষ্য -

> "উপনিবেশবাদ শুধু জনগোষ্ঠীকে এর আয়ত্তে শৃঙ্খলিত করেই তৃপ্ত থাকে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মস্তিষ্কের বিকাশ ও ঘিলু অসার করে দেয়। কোনো এক বিকৃতবুদ্ধি যুক্তির মাধ্যমে লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ করা হয় এবং তাদের বিকৃত অবয়বহীন এবং ধ্বংস করা হয়।"[২]

এভাবে আধিপত্যবাদী দর্শন সাম্রাজ্য বিস্তারে ইউরোপীয়দের শক্তি জুগিয়েছে – পৃথিবীকে করেছে লুণ্ঠন। উনিশ-বিশ শতকে আধিপত্যবাদী এই শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড। একইভাবে ভারতবর্ষও বন্দি হয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক শক্তির এই সাংস্কৃতিক-জালে। উপনিবেশী শক্তির এই প্রচেষ্টা টমাস বেবিংটন মেকলের বিখ্যাত উক্তি থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। উপনিবেশিত 'অপর'দের 'সাদা মুখোশ' (white masks) পরানোর কৌশল হিসেবে মেকলে লিখেছেন -

> "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."[৩]

অর্থাৎ বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্য হিসেবে উপনিবেশী শক্তি সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এই পরিকল্পনারই প্রত্যক্ষ ফল উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উপনিবেশীশক্তির এই বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হয় থিয়োঙ্গোর ভাষ্যে -

> "সমষ্টিগত প্রতিরোধীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র পরিচালনা করেছে, সেটা হল সাংস্কৃতিক বোমা। এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হল মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজেদের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেওয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়ো ভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা।"[৪]

৩

বিশ্বমানবিকতার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ সতত চলেছেন তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের সেই অমিয় বাণীই রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিরসত্য 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বিশ্বের যে সমস্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 826 -836
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাষ্ট্রিক সঙ্কট প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা সভ্যতার সংকটে অকপটে স্বীকার করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি নিজের আত্মসমালোচনার পাশাপাশি ইংরেজদের তৈরিকৃত বিশ্বব্যাপী যে সংকট প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল -

১। উপনিবেশিত রাষ্ট্রের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার।
২। সাম্রাজ্যবাদের নামে সন্ত্রাসবাদ, দমন, পীড়ন, শোষণ ও ঔপনিবেশবাদ।
৩। দুই বিশ্বযুদ্ধে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সংকট।
৪। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে সৃষ্টি করছে ভেদ ও ধর্মবিদ্বেষ।
৫। ভারতের মতো দরিদ্র নিঃস্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মবিচ্ছেদ ও আত্মপরাভবের ঘটনা।
৬। ন্যাশনালিজম।

নিজেদের ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে ইংরেজরা প্রথমেই যে জায়গায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তা হল উপনিবেশিত দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তার। বলা প্রাসঙ্গিক যে, এক্ষেত্রে তারা শতভাগ সফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার এই প্রবন্ধে বলেছেন, এমন একটা সময় ছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা, শেক্সপিয়রের নাটক, বায়রনের কবিতা, বার্কের বাগ্মিতা আর মেকলের ভাষা নিয়ে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রেখেছে। ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষার প্রতি এই টান রবীন্দ্রনাথের জীবনের শুরুর দিকে ছিল খুবই প্রবল। ইংরেজদের এই প্রবণতার দিকে রবীন্দ্রনাথের ছিল একনিষ্ঠ আস্থা ও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পারিবারিক প্রভাবের কথা যেটুকু বলা হয়েছে তা পাল্টাতে শুরু করে ১৮৯০ সালের শেষের দিকে জমিদারির কাজে পূর্ববঙ্গে চলে আসার পর। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাক রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য -

> "My banished soul sitting in the civilized isolation of the town-life cried within me for the enlargement of the horizon of its comprehension. I was like the town-away line of a verse, always in a state of suspense, while the other line, with which it rhymed and which could give it fullness, was smudged by the mist away in some undecipherable distance."[৫]

এই প্রবন্ধে তাকে বলতে শুনি, ইউরোপের জ্ঞান ও বিজ্ঞান একদিন সমস্ত মানব জাতিকে পথ দেখাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ডেকে এনেছে ধ্বংসের তাণ্ডব। নিজেদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে।

> "একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংল্যান্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংল্যান্ডে। মানব মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।"[৬]

কিন্তু ইংরেজ সম্পর্কে এই শ্রদ্ধার বোধ বর্তমান পরিস্থিতিতে আর বজায় রাখা সম্ভব নয় বলেই মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিগত কয়েক দশক জুড়ে ইংরেজরা পৃথিবীর উপর যে অমানবিক তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে তাতে তাদের অতীত গৌরব ধূলিসাৎ হয়েছে। জ্ঞানের অগ্রদূত হয়ে যারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, অচিরেই তাদের মধ্যে দেখা দিলো বর্বরতার চূড়ান্ত প্রকাশ। মানবতার দূত হিসাবে যাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া, তারাই বিশ্বজুড়ে মত্ত হল মানবতা লঙ্ঘনের খেলায়। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছেন,-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 826 -836
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"[৭]

বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে ভাষাগত যে সংকট রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তা এই প্রবন্ধের পরতে পরতে যেন তিনি ব্যক্ত করেছেন। আমরা পাই এক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে। ইংরেজদের চাপিয়ে দেওয়া ভাষার এতই প্রভাব যে বর্তমানেও আমরা উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে তাদের ভাষার প্রভাব দেখতে পাই।

বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের প্রতি এই টান অনুভব করেছেন পারিবারিক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে, পাশাপাশি নিজের জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে। বিশেষ করে, যৌবনের শুরুর দিকে যখন ইংল্যান্ডে যান তখন সেখানে ব্রাইটের কণ্ঠে চিরকালের ইংরেজের বাণী শুনেছিলেন যা জাতিগত সীমা অতিক্রম করে তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ অভিজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সবসময় এই ধারণা মনে লালন করেছেন যে, মানব-মনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিগুলো কখনো জাতিগত সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। মেকলের 'এডুকেশন মিনিট'-কে আমরা যেভাবেই মূল্যায়ন করি না কেন এবং তার ফল যেভাবেই ভোগ করি না কেন, খোদ মেকলে এর মাধ্যমে তো তা-ই চাইছিলেন। সেসময় কিছু ইংরেজ অবশ্য আশঙ্কা করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলে ভারতীয়রা আত্মসচেতন হয়ে উঠবে এবং তারা সুযোগ বুঝে স্ব-শাসনও চাইবে— তখন এ কথা শুনে জাতিগর্বী মেকলে বলেছিলেন –

> "whenever it comes, it will be the proudest day in the English History."[৮]

কার্যত তা-ই হয়েছিল।

পৃথিবী বিস্তৃত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ছিল শাসক হয়ে শোষকের ভূমিকায়। তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের নামে শোষণের চিত্র আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের বয়ানে *সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধে। উইল ডুরান্টের একটি বিখ্যাত বই *দি কেস ফর ইন্ডিয়া। এই বইটি ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের ভয়ংকর রূপ প্রকাশিত হতে দেখি।* উইল ডুরান্ট আমেরিকায় বসে যে ভারতকে জেনেছিলেন, এখানে এসে অন্য এক ভারতকে দেখলেন, তাঁর দেখা ভারতের বিবরণই হল *দি কেস ফর ইন্ডিয়া*। অন্য কোনো দেশে তিনি ব্রিটিশদের দেখেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এখানে তিনি ভারতীয়দের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখেছেন। ইউরোপীয়রা যদিও বলেছিল কুসংস্কার আর জনসংখ্যার আধিক্যই এই মৃত্যুর কারণ, কিন্তু, তাঁর মতে, এর মূল কারণ ইতিহাসের নিষ্ঠুর জঘন্য শোষণ। উইল ডুরান্টের এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালে, নিউইয়র্ক থেকে; আর ১৯৩১ সালে দি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে-আলোচনা লেখেন তা পড়লে বোঝা যায় তিনি তখন আর কোনো ভাবে এদেশে ব্রিটিশ-শাসন চাচ্ছেন না; তাই বলছেন - 'ব্রিটিশদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীন হবে, ভারত এই স্বপ্ন দেখলেও বিরক্ত হন এমন কিছু মার্কিন আমি দেখেছি। একদিন মানুষের যে অধিকার অর্জন করতে তারা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আমরাও যে সেই লড়াইয়ের কথা ভাবছি এটা তাদের অসহ্য ঠেকে।' ব্রিটিশদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি নিয়ে তখনই চিন্তা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তার একদশক পরে 'সভ্যতার সংকট'-এ দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরিণামদর্শীর ভূমিকায় কথা বলছেন -

> "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এ ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সাম্রাজ্য চান যেখানে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, রাজনৈতিক স্থিরতা, নীতিগত উন্নতি এবং জ্ঞান ও শিল্পচর্চা পাকাপোক্তভাবে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনানুযায়ী তার জীবনের শুরুর দিকে সভ্যতার সব উপাদানই তিনি দেখেছেন ইউরোপীয়দের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধের উল্লেখ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 826 -836
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করা যেতে পারে যেখানে তিনি ফরাসি মনীষী গিজোর বইয়ের আলোকে লিখেছেন, এশিয়া, প্রাচীন গ্রিস ও রোম সকল সভ্যতায়ই রয়েছে একধরনের একমুখী ও স্থায়ী ভাব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি বহুমুখী, বিচিত্র, জটিল ও বিক্ষুব্ধ। এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের মূলতত্ত্ব, লৌকিক, আধ্যাত্মিক, রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র প্রজাতন্ত্রসহ সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায় বিজড়িত, এরা যেন পরস্পর লড়াই করছে— এই যে এত বৈচিত্র্য, তার মধ্যেও রয়েছে এমন এক পারিবারিক সাদৃশ্য, তাতে তাকে ইউরোপীয় বলে চেনা যায়। এই সভ্যতার প্রতিই আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ। সংকীর্ণ ভূগোল-খণ্ড আর আচারের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং মনু-প্রবর্তিত যে— 'সদাচার' — রবীন্দ্রনাথের মতে যাকে আমরা 'সিভিলিজেশন' বলি— তার শীলিত রূপের সঙ্গে অথবা তার জায়গায় ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শকে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর ঠিক এজন্যই তাঁকে কঠিন দুঃখ পেতে হয়েছে, বিচ্ছেদ সইতে হয়েছে এবং তাঁর বিশ্বাসও ভঙ্গ হয়েছে। মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে তিনি নিজের ইংরেজ প্রীতির সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটি হয়ে উঠে তাঁর আত্মসমালোচনার দলিল। তিনি মনে করেন ইংরেজরা বিশ্ব এবং ভারতবর্ষকে যে সভ্যতা উপহার দিয়েছে তার মূলে রয়েছে শোষণ ও বঞ্চণার করুণ আর্তনাদ। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি একটি অনিশ্চিত আশাবাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে, তিনি বলেছিলেন -

> "আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, একদিন সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে ওই পূর্বদিগন্ত থেকেই।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্ব-রাজনীতি পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ তুলে এনেছেন বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সভ্যতাগর্বী ইংরেজ কি নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। চীনের অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) তেমনই এক আগ্রাসন। চীনে ইউরোপীয় দেশগুলির অবাধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিল। এ সময় চীনে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে আফিমের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ইংরেজ বণিকেরা চোরাপথে চীনে প্রচুর পরিমাণে আফিম সরবরাহ করতে থাকে। এবং কালক্রমে তা চীনাদের নেশায় পরিণত হয়। আফিমের কুপ্রভাব থেকে দেশবাসীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্যান্টন বন্দরে ২০ হাজার পেটি আফিম বাজেয়াপ্ত করে (১৮৩৯) ধ্বংস করে চীনা সরকার। ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে চীনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। চীন তা অগ্রাহ্য করলে শুরু হয় প্রথম অহিফেন যুদ্ধ। শক্তিশালী ব্রিটিশরা সহজেই চীনকে পরাজিত করে। স্পেন থেকে শুরু করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে একই ভাবে ইংরেজেরা নিজেদের মানবতাবিরোধী কর্মধারাকে বজায় রেখেছে শক্তির মদমত্ততায়। অন্য দেশের সম্পদ লুঠ করে এনে নিজেরা হয়েছে সমৃদ্ধতর। ইংরেজকে অনুসরণ করে ফরাসী, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরাও নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষকে লুণ্ঠনের খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের সেই লোভের কারণে ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের অবক্ষয় দেখে মনে হয়েছিল এমন কালো সময় হয়তো আর পৃথিবীর বুকে কোনো দিন আসবে না। কিন্তু তা থেকেও ইংরেজ সহ ইউরোপের দেশগুলি কোনও শিক্ষা নেয় নি। শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন, -

> "এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"[১১]

ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের মতো দরিদ্র নিঃস্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মবিচ্ছেদ ও আত্মপরাভবের ঘটনা ঘটানোর পাশাপাশি সৃষ্টি করছে পারস্পরিক ভেদ, ধর্মবিদ্বেষ ও আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম দিকের যে ধারণা তা আমরা সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে গিয়ে ভিন্নতর রূপ দেখি। ইংরেজ-শাসনের কারণে অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা ও আরোগ্যের যে- শোকাবহ অভাব তৈরি হয়েছে তা আমাদের নিজস্ব সমাজ-শক্তির জোরেই হয়ত পূরণ করা সম্ভব, সে-কারণে এই অভাবের চেয়েও আমাদের মধ্যকার 'আত্মবিচ্ছেদ'-এর ঘটনাটিকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'অতি নৃশংস'।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 826 -836
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই বিচ্ছেদ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার বিচ্ছেদ, যা নৃশংস, যার নেপথ্যে রয়েছে ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরের কোনো গোপন কেন্দ্রের ভূমিকা।

হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ বিষয়ে শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও নানা সময়ে, নানা সংকটে বিষয়টি নিয়ে তিনি ভেবেছেন তারও বহু আগে থেকেই। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী, কালিদাস নাগের এমন একটি প্রশ্নের জবাবে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ইউরোপ যেভাবে সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির মাধ্যমে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে, আমাদের হিন্দু-মুসলমানকেও সেভাবে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। ধর্মকে কবর বানিয়ে সমগ্র জাতিকে সেই 'ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে' উন্নতি হবে না, মিলবারও উপায় থাকবে না।

তারপর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লিখিত তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে দুই ধর্মমত এবং সমাজ রীতির প্রভেদ ও বিরুদ্ধতার কথা স্বীকার করেও বলেছিলেন, এই সব সত্ত্বেও আমাদেরকে মিলতে হবে; এবং রাষ্ট্রিক অধিকার আদায় বিষয়ে দর-কষাকষি করে দুই সম্প্রদায়ের মন-কষাকষি বাড়িয়ে শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধন করা ঠিক নয়। তবে একথাও বলেছেন যে, স্বার্থের জন্য শেষ পর্যন্ত পলিটিক্সের তালি-দেওয়া মিলনকে সমর্থন করেন না। এর কারণ, যেখানে গাছের গোড়ায় বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে জল ঢেলে গাছকে চিরদিন সজীব রাখা যায় না, তাই একদম গোড়ায় গিয়ে আমাদের মিলতে হবে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব, এই বিষয়ে তখনো, ১৩৩৮ সালেও, সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে ভেবে দেখা হয়নি বলে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। একসময় খেলাফতকে সমর্থন করে গান্ধি যে মিলনের সেতু তৈরি করবেন বলে ভেবেছিলেন, সেই উদ্যোগকেও তার কাছে 'বাহ্য'-এর ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। এরপর কাজী আবদুল ওদুদের 'চিত্তবৃত্তির ঔদার্য'কে হিন্দু-মুসলমানের 'মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে' বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' শিরোনামে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লক্ষ করলে দেখব, রবীন্দ্রনাথ বা ওদুদ দুজনেই তখনো এই বিরোধের কারণ হিসেবে সরাসরি শাসকদেরকে দায়ী করেননি। এর কারণ হয়ত এই যে, এই দুজনেই মনে করতেন এ-বিরোধ ইংরেজদের আসার বহু আগে থেকেই চলে আসছে, আকবরও তা নিরসনের চেষ্টা করেছেন, আল-বিরুনিও তাঁর ভারত-বিবরণে এই বিরোধের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক জগদীশনারায়ণ সরকারও তা স্বীকার করেন। এ-প্রসঙ্গে, এখানে, কালিদাস নাগকে লিখিত চিঠির শেষ অংশটির উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের মানস প্রকৃতির অবরোধ ঘোচাতে না পারলে কোনোরকমের স্বাধীনতা পাব না -

> "হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই— কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানুষের মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।"[১২]

এই যুগ-পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার জন্য সাধনার দরকার; কিন্তু কী সেই সাধনা? যেহেতু এই চিঠি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে লিখিত, এর আগে পূর্ববঙ্গের জমিদারি কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে শান্তিনিকেতনের কর্মময় জগতেও ঢুকে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, এর সঙ্গে তাঁর কথিত কল্পনাজগতের 'আসমানদারি'র অভিজ্ঞতা তো তার রয়েছেই, তাই বুঝতে বাকি থাকে না যে এই সাধনার ধরন কীরকম হতে পারে। তিনি সত্য ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির কথা বলেন, ব্রহ্মচর্যের কথাও বলেন, ধারণা করা যায় এই সবকিছুর সঙ্গে তাঁর সকল প্রকার অভিজ্ঞতার বিকিরণও যুক্ত হবে। কিন্তু তা তো এমনি এমনি হয় না, তার জন্য কোনো-না-কোনো প্রেরণা বা অভিঘাতের প্রয়োজন। একদিন ইংরেজরা এখানে এসেছিল বলে সেই প্রেরণার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বারবার ইউরোপের দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর বহুলপঠিত প্রবন্ধ 'কালান্তর'-এর কথা স্মরণ করতে পারি যেখানে তিনি লিখেছিলেন - এক সময় আমাদের স্থাবর মনে ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি এমনভাবে আঘাত করেছিল, যেমন দূর আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা পড়ে মাটির নিচে গিয়ে 'নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্র রূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সেই যুগের চিত্তের জ্যোতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 92
Website: https://tirj.org.in, Page No. 826 -836
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পশ্চিম দিগন্ত থেকে বের হয় হয়ে মানবেতিহাসের আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বোঝাই যায় রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করবেন, কারণ সজীব মন গ্রহণ না-করে পারে না। এই রবীন্দ্রনাথই 'সভ্যতার সংকট'-এ এসে বলছেন -

> "অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্য জগতের মহিমা ধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্য নামধারী মানব-আদর্শের এতো বড়ো নিকৃষ্ট বিকৃত রূপ কল্পনাই করতে পারিনি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম ঔদাসীন্য।"[১৩]

এখানে একবার 'ইংরেজ' আর বাকি তিনবারই রয়েছে 'সভ্য' শব্দের উল্লেখ; বোঝা যাচ্ছে এখন আর এই সভ্য ইংরেজদের প্রতি তার আগের মোহ নেই, একান্ত মনে নিবিষ্ট হওয়ার আগ্রহও নেই। তাঁর বেশকিছু লেখায় খেয়াল করলে দেখব মানুষের দারিদ্র্য প্রসঙ্গে শাসকদের কর্তব্য বিষয়ে কথা বলার চেয়ে আত্মজাগরণ আর সমাজ-শক্তির বিকাশ বিষয়ে বেশি জোর দিয়েছেন, এখন দেখা যায়, দারিদ্র্য আর হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ এই সংকটের জন্য সরাসরি শাসকদেরকেই দায়ী করছেন রবীন্দ্রনাথ। এই মত পরিবর্তনের কারণ 'সভ্যতার সংকট'ময় পরিস্থিতি, নাকি অন্য কিছু?

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনা আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাই। তিনি এই প্রবন্ধে ইংরেজদের উগ্রজাতীয়তাবাদ কীভাবে অবধারিতভাবে সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করেছে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। উনিশ শতকে ইংরেজরা যে ভাবে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা দখল করেছিল। শাসনের নামে শোষণ করে তারা তাদের অধিকৃত রাষ্ট্রকে তাদের দাস বানিয়ে রেখেছিল। বর্তমান সময় সেই ভাবে ক্ষমতা দখল না হলেও বিভিন্ন চুক্তি, ব্যবসা, অর্থনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করছে। আর এর ফলে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভারতবর্ষে শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে সভ্যতার সংকট যেন এখনো প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক শুধু তার ইতিহাস-বিশ্লেষণের কারণে নয়। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তা আজো নির্মমভাবে সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যদিও আর মহাসমর সংঘটিত হয়নি, তবু এমন সময় যায়নি যেখানে আমরা মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে সংঘাত দেখিনি। এশিয়া মহাদেশ তার মূল ঘটনাস্থল, তবে ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকাও তার থেকে বাদ যায়নি। বৃহৎ শক্তির লোভ মানুষের শান্তি ও সম্পদ হরণে ক্ষান্তিহীন। সভ্যতার দাবি আবার তাদেরই প্রবল। কোথাও সংঘর্ষ দেখা দিলে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে শক্তিমান দেশগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার তারাই যুদ্ধরত জাতিগুলোর কাছে মারণাস্ত্র বিক্রি করে সে-সংঘাতকে প্রলম্বিত করার ব্যবস্থা করছে। সভ্যজাতির ক্ষেত্রে এবং অপরের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের মাপকাঠি তাদের কাছে এখনো ভিন্ন। আমরা যখন যুদ্ধাপরাধের জন্যে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করি, তখন তারা আন্তর্জাতিক মানের কথা বলে বারবার। তারা যখন ওসামা বিন-লাদেনের গোপন আস্তানায় বলপূর্বক প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয় তখন আর কোনো মানের প্রশ্ন ওঠে না। সভ্যজাতির এই ভাবলেশহীন দ্বিচারণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯১৭ সালে *Nationalism* বইতে তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থপরতার কথা বলেছিলেন, এবং তার অনুকরণে জাপানের মতো প্রাচ্যদেশেও যে-অনাচার ঘটছিল, তার নিন্দাজ্ঞাপন করেছিলেন।

> "সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে।

কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধি সামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।”[১৪]

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সভ্যতার সংকটে শেষবারের মতো মানুষের প্রতি কৃত মানুষের অবিচার-অন্যায়ের একটা সূত্রবদ্ধ পরিচয় তুলে ধরলেন এবং মানুষের ওপরেই আস্থা রাখলেন সেই সংকট থেকে মুক্তিলাভের। এসব কথা অবিনাশী, এসব কথা কালোত্তীর্ণ। যা আজ একবিংশ শতকেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

৪

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ইংরেজরা যা করেছে সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারেননি রবীন্দ্রনাথ। অথচ এরই পাশাপাশি দেখেছেন জাপান, রাশিয়া, ইরান, এমনকি আফগানিস্তানে সর্বজনীন উৎকর্ষের সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের সমীক্ষণ হল, সভ্যতাগর্বিত কোনো ইউরোপীয় জাতি তাদের অভিভূত করতে পারেনি বলেই ওই দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই উৎকর্ষের পথে এগিয়ে আসা। এভাবেই ইউরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি তিনি হারিয়েছেন তাঁর বিশ্বাস জীবনান্তিকে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ‘সভ্যতা’ বলা যায় কিনা, জেগেছে সেই সংশয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় সূচনায় দাঁড়িয়ে কথিত সভ্যতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কতটা বিচলিত হয়েছিলেন, এই লেখাটি পড়লেই তা বোঝা যাবে। এই প্রবন্ধের বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, সারাজীবন ধরে পর্বে-পর্বে রবীন্দ্রনাথ যা ভেবেছেন তা এই একটি লেখাতেই পেয়েছে সংহত গভীর নির্মোহ বাণীরূপ। পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রতি প্রবল আগ্রহ পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে গভীর অধ্যয়নে রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জ্ঞানের প্রসারতার ফলে বিবেচনাশক্তি গভীরতর হওয়ায় সব কিছুরই শক্তি ও ত্রুটি বোঝা সম্ভবপর হয়েছিল তার। সেই সঙ্গে প্রাচ্য মূল্যবোধের প্রতি ক্রমবর্ধিত জ্ঞান ও শ্রদ্ধাও দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারত তথা এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন আত্মমুক্তির পরম সম্ভাবনা। বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা আমরা এই প্রবন্ধের পরতে পরতে লক্ষ্য করি। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত। একসময় মাছি মারা কেরানি তৈরী করার লক্ষ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। আজও এই শিক্ষাব্যবস্থা অপরিবর্তিত যা ইংরেজদের প্রতি দাসত্বের চিহ্ন বহন করে চলেছে। দীর্ঘদিন যাবত কারো অধীনে জীবন ধারনের ফলে ব্যক্তি যেমন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে, উপনিবেশিক দেশগুলোও ঠিক সেভাবে হারিয়ে ফেলে সার্বভৌম অর্জনের স্পৃহা। আজও আমরা দেখতে পাই, নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি শেখার চাইতে তা ভুলে যেতেই বুঝি মানুষের আগ্রহ বেশি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারা আজকাল বড় কোনো অর্জন মনে হয় আমাদের কাছে। যা ইংরেজ দাসত্বের পরিচয় বহন করে। ইউরোপ সৃষ্ট যুগ্ম-বৈপরিত্যের ধারণা, সাবেক উপনিবেশিক দেশের নাগরিক হিসেবে আজও তা আমরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধারণ করি। আমরা কালো-সাদা, ধনী-নির্ধন, সুন্দর-অসুন্দর ভেদে ব্যক্তি এমনকি সামাজিক পর্যায়েও ভেদাভেদ করে চলি। আমরা আজও ইউরোপ প্রবর্তিত পশ্চিমা সংস্কৃতির দাস। পশ্চিমাদের প্রবর্তিত সবকিছু আজও অনেকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। গুটিকয়েক যারা প্রাচ্য মনোভাবে আস্থাশীল তারা আজ একঘরে। এহেন অবস্থা চলতে থাকলে আমরা হারিয়ে ফেলবো আমাদের ইতিহাস,

ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ। যা আমাদের শিকড় ভুলিয়ে দিবে। এসব কিছু হারিয়ে ফেললে একটি জাতির আর কীইবা থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকটে যা ভেবেছেন সেই ভাবনা আমাদের আজ একবিংশ শতকেও নতুন করে ভাবায়।

References:

১. Bill Ashcroft et. al. (eds.), 1995. The Post-colonial Studies, London, p-36-37

২. Frantz Fanon, 2006. The Wretched of the Earth (জগতের লাঞ্ছিত : অনুবাদ – আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, ২০১৪), ঢাকা, পৃ. ২৮

৩. H. Woodrow, 1862. Macaulay’s Minutes of Education in India, Calcutta, p-115

৪. নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০১০, ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড (অনুবাদ : দুলাল আল মনসুর), ঢাকা,পৃ. ১৫

৫. Rabindranath Tagor, The Religion of Man,The Hibbert Lecture for 1930.

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সভ্যতার সংকট’, রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬ পৃ. ৭৪১

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সভ্যতার সংকট’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬ পৃ. ৭৪২

৮. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ.৭৪৪

৯. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ.৭৪৬

১০. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ.৭৪৬

১১. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ.৭৪৬

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘হিন্দুমুসলমান’, কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ. ৬২০

১৩. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ.৭৪২

১৪. পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৯৬, পৃ.৭৪৫

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 837 - 843
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আদি-মধ্য যুগে নিম্ন গাঙ্গেয় উপকূলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

শুভ্রাংশু সিংহ
প্রাক্তন ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : singhasubhranshu73@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
আদিগঙ্গা, আঞ্চলিক ইতিহাস, সমাজ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, গোত্র, সত্যনারায়ন, মধ্যযুগ, দক্ষিণবঙ্গ।

Abstract
একদা অনার্যদের বাস বলে আর্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত ছিল বাংলার বিশাল অঞ্চল। ভগীরথের ‘গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত’কে যদি আমরা দক্ষিণবঙ্গে আর্য সভ্যতার বিকাশ বলে মনে করি তাহলে বুঝতে হবে মহাভারতের পর্ব থেকে এই অঞ্চলটি আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। মৌর্য–গুপ্ত-পাল-সেন এবং মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে একদা গঙ্গার মূল ধারা অধুনা লুপ্ত আদি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির-বিভিন্ন মানুষের-বিভিন্ন বর্ণের সংস্পর্শে এসেছিল। আঞ্চলিক দেবদেবী-লোকাচার, আর্য সংস্কৃতি এবং সুফি ভাবাদর্শের সংমিশ্রণের ফলে এই অঞ্চলে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, একদিকে যেমন বাণিজ্যের উন্নতি, উন্নত সভ্যতার বিকাশ, বিদ্যোৎসাহী পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তেমনি এক মিশ্র বর্ণ ব্যবস্থা ও জাতি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যার ফলে আমরা এই অঞ্চলে এক উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও এক উদার ধর্মীয় পরিমণ্ডল দেখতে পাবো।

Discussion

মধ্যযুগের শেষের দিকে 1560 এর দশকে বাংলায় ‘বারো ভূঁইয়া’ বা 12 জন আঞ্চলিক শাসনকর্তার উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য তুর্কি আমলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে যশোহর ও দক্ষিণ 24 পরগনা নিয়ে স্বাধীন যশোহর রাজ্য গড়ে তোলেন যার সীমানা পশ্চিমে ভাগীরথী (আদি গঙ্গা নামে পরিচিত) পূর্বে মধুমতি হরিণঘাটা নদী ছিল এর সীমানা। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন মদন মল্ল বা মদন রায় যিনি ছিলেন মধ্যযুগের দক্ষিণ 24 পরগনার একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। দক্ষিণ বাংলার লোকগানে তার নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে যেমন ঘুটিয়ারি শরিফের মোবারক গাজীর মাহাত্ম্য প্রচারক গানে যা ‘গাজিরগান’ নামে পরিচিত ও ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য প্রচারক রায়মঙ্গল কাব্যে তাঁর নাম উল্লিখিত আছে, মদন রায় নামে আজও মদন পালা গীত বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। এই মদন রায় আদি গঙ্গার তীরে জনপদ গড়ে তোলার জন্য সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষকে রাজপুর ও তার আশেপাশের গ্রাম সমুহে বসবাস করার বন্দোবস্ত করেন। কর্মকার, বণিক, মোদক, গন্ধবণিক, কুম্ভকার, সদগোপ, তন্তুবায় প্রভৃতি বর্ণের মতই বৈদিক, বারেন্দ্র, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ’রা এই গঙ্গাতীরে বসবাস করতে লাগলেন[১]। আদিগঙ্গাকে কেন্দ্র করে ক্রমে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু পরবর্তীতে পর্তুগীজদের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গের মানুষজন এই এলাকা পরিত্যাগ করে, পরে মোগল শাসনকালে আবার জনসমাগম ঘটে, আকবরের আমলে টোডরমল 'মদনমল্ল' বলে একটি পরগনার সৃষ্টি করেন। ইংরেজ আমলে দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার জন্য 'দক্ষিণের নবদ্বীপ' নামে খ্যাত হয়েছিল, এখানকার পন্ডিত ব্রাহ্মণরা চতুষ্পাঠী চালাতেন, লর্ড উইলিয়াম বেনটিংক এর আমলে 'মেকলে মিনিট' দ্বারা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু হলে পূর্বেকার সংস্কৃতি গৌরব অস্তমিত হয়।

ঐতরেয় আরণ্যক অনুযায়ী পুণ্ড্র, অঙ্গ বঙ্গ প্রদেশের[২] বর্ণনা পাই। মনুসংহিতায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ[৩] উল্লেখ পাই। দক্ষিণ 24 পরগনার এই ভূখণ্ডটির কথা বাল্মিকী রচিত রামায়ণে[৪] পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্ব[৫] অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বঙ্গের অধিপতি সমুদ্রসেন ও তাম্রলিপ্তের রাজাকে ভিম পরাজিত করেন। এরপর পাণ্ডবেরা গঙ্গা সাগর সঙ্গমে স্নান করে কলিঙ্গের দিকে যাত্রা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণু, গড়ুর, মৎস্য পুরানে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণ অনুযায়ী অন্ধ আর্য ঋষি দীর্ঘতম ঔরসে বলিরাজার পত্নীর গর্ভে পাঁচটি ক্ষত্রিয় সন্তানের জন্ম হয় এরা হলেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। এই অঙ্গ হল বর্তমান ভাগলপুর, বিহার অঞ্চল, উড়িষ্যা কটক নিয়ে কলিঙ্গ, বঙ্গ বা বাংলা হল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পদ্মা-মেঘনার অববাহিকা, সুহ্ম হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম জেলা (যা পূর্বে রাঢ়), পুণ্ড্র হল উত্তর বঙ্গের বগুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি জেলা। পুরান পরবর্তীকালে পুণ্ড, পুন্ড্রবর্ধন ভক্তি রূপে সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডকে বোঝানো হয়। 'রঘুবংশম্' এবং 'বৃহৎসংহিতা'তে আমরা বাংলাদেশের বর্ণনা পাই।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রতটি মন্ডলের পরিদর্শনে আসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ (638 খ্রিস্টাব্দ)। হিউ এন সাং এর বর্ণনায় আমরা বাংলার নানা স্থান এর মত সমতটের বর্ণনাতে পাই যেখানে তিনি সমতটের মানুষজনদের প্রশংসা করেছেন কষ্টসহিষ্ণু খর্বাকার কৃষ্ণবর্ণের বিদ্যার অনুরাগী বলে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় গঙ্গারিডি উল্লেখ পাই, এই গঙ্গারিডি গঙ্গার উত্তর-পশ্চিম দিকের বদ্বীপ অংশ বলে মনে করা হয়। মেগাস্থিনিস ও রোমান কবি ভার্জিলের 'Georgics' কাব্যে গঙ্গারিডি রাজ্য ও জাতির উল্লেখ আছে। এদের বর্ণনানুসারে গঙ্গারিডি ও প্রাসি/ প্রাচি দুটি পরাক্রান্ত শক্তিশালী রাজ্য ছিল, এদের অধিপতি ছিলেন নন্দ বংশের রাজা। হস্তী বাহিনীর ভয়ে গঙ্গারিডি আক্রমণ করতে সাহস করেননি আলেকজান্ডার। প্লিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রাম এর কথা উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান সাগরদ্বীপে সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রম। তাঁর আবির্ভাব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক আগে। 'শ্রীমৎ ভাগবত' অনুযায়ী কপিল তার মায়ের আদেশ সাগর সঙ্গমে আসেন। বায়ুপুরাণ ও কূর্ম পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলকে 'রসাতল' বলা হয়েছে, যেখানে অসুর মহানাগ ও রাক্ষস দের বাসস্থান ছিল, এই অঞ্চলে আর্যরা বাস করতনা, আর্যরা আর্যবর্ত (হিমালয় - বিন্দ মধ্যবর্তী) অঞ্চলে বাস করত। বঙ্গভূমি অনার্যদের অধিকারে ছিল, অস্ট্রিক দ্রাবিড় প্রভৃতি জন জাতির বাসস্থান। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড, সুহ্ম এইসব অঞ্চলে কৌম বা ট্রাইব গোষ্ঠী বাস করত তাদের নামে এইসব অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইসব অঞ্চলের উল্লেখ আছে, 'অষ্টাধ্যায়ী'তে গৌড়ের নাম উল্লিখিত। কপিলমুনি এই অঞ্চলে আসার পর এই অঞ্চলটি আর্য বসতি হয়ে ওঠে ভগিরথ এর গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত আর্য জনপথ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশের সুষেন সাগরদ্বীপে রাজত্ব করতেন।

উক্ত অঞ্চলগুলি মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের পর গৌড়রাজ শশাঙ্কের হস্তগত হয়। মাৎস্যন্যায় এর পূর্ববর্তী যুগে প্রায় 400 বছর ধরে বাংলার ক্ষমতায় ছিলেন পাল রাজারা, ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মালম্বী কায়স্ত পাল রাজারা সাম্রাজ্য পরিচালনাতে পরমতধর্মসহিষ্ণু ছিলেন, এনারা যোগ্যতা অনুযায়ী বর্ণ ভেদে নিয়োগ করতেন। বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দির পালদের সাহায্য পেতে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি ব্যাঘ্রতটি মন্ডলের উল্লেখ পাই, যা পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরবর্তীকালে সেন রাজাদের আমলে খাড়িমণ্ডল পুন্ড্রবর্ধন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই মণ্ডল দুটি দক্ষিণ 24 পরগনার অন্তর্ভুক্ত[৬] হয়। গুপ্ত যুগে এই অঞ্চলের পরিধি বিস্তৃত হয়ে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তী হয়েছে যার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র বরেন্দ্রী, ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পর্যন্ত মেঘনা পর্যন্ত অঞ্চল সমতট। বাংলায় ব্রম্ভ-ক্ষত্রিয় সেন রাজবংশের বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার কারনে সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অত্যাচারিত হয়ে বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণকে স্বাগত জানিয়েছিল যা - রামাই পন্ডিতের শূন্যপুরাণ এ প্রমাণ মেলে, এই নিম্নবর্ণের মানুষরা প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে পরবর্তীকালে মুসলমানদের সময় মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।

সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বোঝা যায় গঙ্গার মূল ধারা হাওড়ার বেতড়ের কাছে উৎপত্তি হয়ে আলিপুর, কালীঘাট হয়ে গড়িয়া, রাজপুর, কোদালিয়া, মালঞ্চ, হরিনাভি ইত্যাদি অঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোবিন্দ পুর, বারাইপুর, সূর্যপুর হয়ে জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রাম পার হয়ে সুন্দর বনের গভীরে প্রবেশ করেছে, তারপর কাকদ্বীপ, সাগরের মনসাদ্বীপ হয়ে কপিল মুনির মন্দিরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, বর্তমানে আদিগঙ্গা মজে[৭] যাবার জন্য ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে পুকুরগুলো যাদের দখলে গেছে সেই অনুযায়ী নাম হয়েছে যেমন ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা, করের গঙ্গা। এইসব গঙ্গা পুকুরে আজ লোকে পুণ্য লাভের আশায় স্নান করে, এইসব পুকুরের ঘাটে আজও শব দাহ করার ঘাট আছে। এই সকল পুকুর যে আদি গঙ্গা তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্ন বর্ণিত প্রমাণে -

বৃন্দাবন দাসের 'শ্রী চৈতন্যভাগবত' কাব্যে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য নীলাচল যাত্রার যে বর্ণনা আছে তার সাথে আদিগঙ্গা পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলি আজও দেখা যায়, এছাড়াও পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই এর 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে আমরা দেখতে পাই চাঁদ সওদাগর কালীঘাটে পুজো দিয়ে ডিঙা ভাসিয়েছিলেন বাণিজ্যের জন্য। ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' পুঁথিতে ধনপতি সওদাগরের আদিগঙ্গা ব্যবসা করতে যাবার উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকে কবি কৃষ্ণরাম এর 'রায়মঙ্গল' কাব্যতে বণিক পুষ্পদত্তর আদিগঙ্গা হয়ে বাণিজ্য করে ফেরার বর্ণনা আমরা পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি অযোধ্যারাম পাঠকের 'সত্যনারায়ণের কথা'তে আছে জনৈক সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে যাত্রার কথা। অষ্টাদশ শতকে হরি দেবের 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে আদিগঙ্গা পথে সাগর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বণিকদের বর্ণনা পাওয়া যায়। এইসব মঙ্গলকাব্যে[৮] যেই সব স্থানগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি আজও বর্তমান যেমন বৈষ্ণবঘাটা, কালীঘাট, মাহিনগর, বারাইপুর, ছত্রভোগ, মগরাহাট, জয়নগর ইত্যাদি। 1550 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক Jao De Barros এর আঁকা নকশা, তাতে তিনি হাওড়ার বেতরের ঠিক বিপরীত থেকে দক্ষিণ পূর্ব মুখী হয়ে কালীঘাটের পাশদিয়ে আদি গঙ্গা ধারা বয়ে গেছে বলে চিহ্নিত করেছেন। 1660 সালে Van De Broucke এর আঁকা ম্যাপে আদিগঙ্গা চিহ্নিত আছে। 1772 সালে Rennell বঙ্গদেশ জরিপ করার সময় পর্যবেক্ষণ করেন আদিগঙ্গা মজে এসেছে, এখানে সেই সময়কার এমন অবস্থা ছিল ছোট নৌকা সারাবছর চলাচল করতে পারত না। আদিগঙ্গা মজে যাওয়ার কারণ হিসাবে প্রাকৃতিক কারণ যেমন ছিল, তার সাথে যোগ হয়েছিল নবাব আলীবর্দী খাঁর ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণে গঙ্গা থেকে খাল কেটে সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। ফলস্বরূপ গঙ্গার মূল স্রোত সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ন নদীর ধারা সাথে মিশে যায় যা হুগলি নদী নামে পরিচিতি লাভ করে কালক্রমে পূর্ব ধারাটি মজে যেতে থাকে। 1777 সালে মেজর টলি ফোর্ট উইলিয়াম এর দক্ষিণ থেকে কালীঘাট পর্যন্ত গঙ্গার সংস্কার করেন। রাঢ়বঙ্গ 'গঙ্গা ভগিরথ' এর স্মৃতি নিয়ে গঙ্গার বর্তমান প্রবাহ মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলি পর্যন্ত 'ভাগীরথী' নামে পরিচিত। ভাগীরথীর তীরে পর্তুগিজরা হুগলি বন্দর গড়ে তোলে হুগলি থেকে মোহনা পর্যন্ত এই বন্দরের নামানুসারে 'ভাগীরথী হুগলিনদী' হয়েছে, বিস্মিত হতে হয় এইখানে- স্বরস্বতীর কাটাখাল আর হুগলি নদীতে স্নান করলে গঙ্গাসাগরের গঙ্গাস্নানের সেই পূর্ণ অর্জন করা যায় না অথচ বাগবাজার অথবা মধ্য ও উত্তর কলকাতার যে কোন ঘাটে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পূর্ণ লাভ হয়, আবার কালিঘাট থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে চলা যেকোনো খালে স্নান করলে পূর্ণ লাভ হয়।

সুন্দরবন দক্ষিণ 24 পরগনার অন্তর্ভুক্ত যার সীমানা পূর্বদিকে ইচ্ছামত, কালিন্দী, রায়মঙ্গল নদী, পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এর আয়তন আনুমানিক 3078 বর্গমাইল। সুন্দরবনের মণি নদীর নিকটবর্তী জটার দেউল থেকে জনৈক জয়ন্ত চন্দ্রের লেখ, মুদ্রা আবিষ্কার হয়েছে, এছাড়াও সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকে মৌর্য ও পরবর্তী যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।সুন্দরবনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে মাটির তলা থেকে গুপ্ত, পাল, সেন যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৯] এরিয়ান এবং টলেমি লেখাতে আমরা গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলের বর্ণনা পাই। কালীঘাটের মুদ্রা ভান্ডার যা[১০] এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রমান দেয়, সাগরদ্বীপের প্রসাদপুর ও মন্দিরতলা, জটার দেউল, ছত্রভোগসহ অন্যান্য জায়গা থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এক সমৃদ্ধ জনপদের এক জীবন্ত প্রমান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাওড়ার ভেতর বন্দরের বিপরীত থেকে আদিগঙ্গা দক্ষিণ মুখী হয়েছে, কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে হিন্দুদের পরম তীর্থক্ষেত্র কালীঘাটের কালী মন্দির গড়ে উঠেছে যা 51 শক্তিপীঠ অন্যতম। রামায়ণ, মহাভারতে এবং রঘুনন্দনের তীর্থতত্ত্বতে কালীঘাটের নাম উল্লিখিত নেই কিন্তু ভবিষ্য পুরাণ, বিপ্রদাস পিপিলাই এর 'মনসা মঙ্গল' এ আমরা কালীঘাটের উল্লেখ পাই ।আদি গঙ্গার তীরে দেবী কালির অবস্থান, প্রথম দিকে মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন কাপালিক ও তান্ত্রিক পরবর্তীকালে শান্ডিল্য গোত্রের ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী তিনি এই মন্দিরের সেবায়েত রূপে নিযুক্ত হন। আকবরের আমলে মানসিংহ কালীঘাট মন্দির সংস্কার করার জন্য পনেরশো মোহর দান করেন, অষ্টম শতাব্দীতে সন্তোষ রায় বর্তমান কালী মন্দির নির্মাণ করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মন্দিরের নিজের জন্য।

কালীঘাট পার হয়ে আদি গঙ্গা ধারা টালিগঞ্জ বৈষ্ণবঘাটা গড়িয়া হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে কুদঘাটের কাছে বাঁক নেয় সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের বসন্ত রায় শাক্ত কালী মন্দির নির্মাণ করেন, যা করুণাময়ী কালী মন্দির নামে পরিচিত।

আদিগঙ্গা দক্ষিণমুখী যাত্রায় বোড়াল গ্রামের কাছে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী মন্দির গড়ে উঠেছে মন্দির বিগ্রহটিতে নীচে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও রুদ্রমূর্তি খোদিত আছে এদের উপরে মহাদেব শুয়ে আছে তার উপর দেবী মূর্তির অবস্থান। মূর্তির তিনটি চোখ চারটি হাত চারটি হাতেই অস্ত্র। এই মন্দির ঘিরেই এক সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল বণিকরা বাণিজ্যের আগে এখানে পুজো দিয়ে যেতেন। প্রবাদ আছে সেন বংশের রাজা সুযোগ্য সেন তুর্কিদের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য আদি গঙ্গার তীরে আত্মগোপন করে থাকাকালে তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দশমহাবিদ্যার তৃতীয় মহাবিদ্যা এই মন্দিরে অনেক সাধক সাধনা করেছেন। মূর্তি দেখে মূর্তিটি দেখে মনে হয় মূর্তিটি নদী উপাসনার দেবী গঙ্গার কিংবা কোন অনার্য লৌকিক দেবী হতে পারে। পুরানে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে দশমহাবিদ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান ত্রিপুরা ও ছত্রভোগে অবস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী কাঠের, তিনি তান্ত্রিক মতে পূজা গ্রহণ করেন। ত্রিপুরারাজের পাঠাগারে আবিষ্কৃত 'রাজ-রত্নাকর' পুঁথিতে উল্লেখ আছে রাজা যযাতির পুত্র দুহ্য আদিগঙ্গা সাগরদ্বীপে বাস করেন তিনি কপিলমুনির আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্য বিস্তার করেন তার উত্তর পুরুষ প্রতদন ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী কিরাত রাজ্য জয় করেন ত্রিপুরা রাজ্য স্থাপন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ 24 পরগনার দক্ষিণ রায়ের বারা বা মুন্ডু পূজার মিল পাওয়া যায় যা থেকে মনে করা হয় ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী উপাসক ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

গড়িয়ার কাছে আদি গঙ্গার ধারে মহামায়াতলার মহামায়া মন্দির এর প্রতিমা দুই হাত বিশিষ্ট যা দেখে মনে হয় কালী পরবর্তীকালে মহামায়া (দুর্গার) রূপ গ্রহণ করেছে।

ধর্ম ঠাকুরের পুজোর নিদর্শন নিম্ন বঙ্গে প্রচলিত ছিল[11] তার আজও বিদ্যমান। কলকাতার কাছে মজে যাওয়া আদি গঙ্গার তীরে রাজপুর বাজারে এখনো ধর্ম ঠাকুরের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বাবা ঠাকুর, দক্ষিণরায় ঠাকুর, ধর্ম ঠাকুর প্রভৃতি আঞ্চলিক দেবতা বৌদ্ধ ধর্মের সাথে মিশে হিন্দু সমাজ ও ধর্মতে প্রবেশ করেছে।

মালঞ্চের কৃষ্ণ কালী মন্দিরে মূর্তিটি চার হাতের তিন হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং চতুর্থ হাত আশীর্বাদ এর জন্য প্রসারিত করা আছে। মূর্তি দেখে মনে হয় কৃষ্ণ ও কালীর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। মূর্তিটির মুখমণ্ডলে কৃষ্ণের ভঙ্গিমা এবং শরীরে কালির অবয়ব লক্ষ্য করা যায় এমন মূর্তি দক্ষিণ 24 পরগনায় দেখা যায় না। মূর্তি দেখে মনে করা হয় এটি বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মের মেলবন্ধনে নির্মিত হয়েছে। দেবীর নৈবেদ্য হিসাবে নিরামিষ নৈবেদ্য দেয়া হয়। রাজপুর সপ্তম শতকে আনন্দময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাজা মদন রায়, প্রভাবশালী ব্যক্তির এই মন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে ব্যক্ত হয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের লোকেরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং উচ্চবর্ণীয়রা শাক্তধর্মের উপাসক ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আদি গঙ্গা দিয়ে নীলাচল যাত্রাকালে আদি গঙ্গার তীরে অনন্ত রামের কুটিরে রাত্রি বাস করেন জায়গাটি মহাপ্রভুতলা নামে পরিচিত যেটি সুপ্রাচীন আটিসারা নগরীর অন্তরগত। এই জায়গায় শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার এবং প্রসার গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল নিম্নবর্ণের মানুষরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে এবং শাক্তধর্মের হিংসা মনোভাব এই বৈষ্ণব ধর্মের অহিংসা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সোনারপুর এর নিকট বোসপুকুরে বাবা ঠাকুরের মন্দির এবং মন্দিরের পাশে পীরের আস্তানা লক্ষ করা যায়। লক্ষনীয় বিষয়টি হোল, অতীতে নিম্নবর্ণের পূজারী দ্বারা তিনি পূজা গ্রহণ করতেন ক্রমে এতে আর্য ধর্মের প্রবেশ দেখা যায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ব্রাম্ভন পূজক, শিবের মন্ত্র, নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা বর্ণহিন্দুরা ইনার পূজা করেন। স্থূলকায় চেহারার গোঁফ যুক্ত মূর্তির রক্তবর্ণের মুখমন্ডল, জটা, কানে ধুতরা ফুল আর তিনটি বড় বড় রক্তবর্ণ চোখ দেখা যায়। মূর্তিটির পরনে শুধু মাত্র বাঘের চামড়া কিন্তু গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও উপবীত। বাবা ঠাকুর একজন লৌকিক দেবতা কিন্তু কোনোভাবেই আঞ্চলিক নন কারণ দক্ষিণ 24 পরগনা ছাড়াও হাওড়া হুগলি বর্ধমান নদীয়াতে বাবা ঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে। বাবা ঠাকুর একজন আদিম অনার্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দেবতা। দ্রাবিড়দের 'তিরুবয়র' নামে দেবতার সঙ্গে পঞ্চানন্দ ও বাবা ঠাকুরের সাদৃশ্য দেখা যায় এবং গুজরাটের ভিল গোষ্ঠীর লৌকিক দেবতাদের নাম 'বাবাদেও'। বাবা ঠাকুরের বিগ্রহ দেখে শিবের বিগ্রহের মিল পাওয়া যায় যা দেখে মনে করা হয় অনার্য দেবতা ক্রমে আর্যদের দেবতা হয়ে ওঠেন।

আদি গঙ্গার পাশে বাগুইপাড়ায় (বর্তমান রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অন্তর্গত) এখানে হারিঝী চণ্ডীর মন্দির। এনার সৃষ্টি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অনেকের মতে বৌদ্ধ ধর্মের দেবী, কারুর মতে নাথ ধর্মের, মূর্তিটি কালো পাথরের মুন্ড মূর্তিতে দেবীর পূজা হয় দেবীর তিনটি গোলাকৃতি চোখ, কপাল থেকে ঠোঁট পর্যন্ত নেমে আসে নাক, মুখে এক কঠিন ভাব প্রকাশ পেয়েছে, এক ফুট লম্বা প্রায় ৪ ইঞ্চি চওড়া মূর্তিটিতে কোন শিল্পকর্মের ছাব নেই। বোঝা যায় মূর্তিটি আর্য পূর্ববর্তী যুগের পাথর পূজার সময়কার, কোন আদিম জনগোষ্ঠীর। এই অঞ্চলে হাড়ি জাতির উপস্থিত দেখে মনে করা হয় মালাধারি বা শব্দের দ্বারা তিনি একসময় পূজিত হতেন। বর্তমানে অন্যান্য অনেক অনার্য দেব দেবীর মত হারিঝীচণ্ডীর মধ্যে আর্য ধর্মের প্রভাব দেখা গেলেও এখনো পুজা মন্ত্রা চন্ডী বা কালীর ধ্যান মন্ত্র ব্যবহার করা হয় না।

আদিগঙ্গা তীরে অনেক জায়গায় বিশালক্ষী দেবীর মন্দির গড়ে উঠেছে। বিশালক্ষী নামটি বাসলি নামের তান্ত্রিক দেবীর আর্য প্রভাবের ফলে বিশালক্ষী নামে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বেদে বাসলি নাম উল্লেখ নেই মনে করা হয় ইনি দুর্গা চণ্ডীর এক লৌকিক রূপ যিনি মাংস মদ সহকারে তান্ত্রিক মতে পূজিত হন। এই বিশালাক্ষী এরমধ্যে অস্ট্রিক আর্য ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। মহাযান শাখার সহযানী বৌদ্ধরা বাসুলি দেবীর উপাসনা করতেন, এর উল্লেখ আমরা চর্যাপদের পাই। সেন রাজাদের সময় সহযানি তান্ত্রিক মতের প্রভাব কমে, সহযিয়া তান্ত্রিকরা তান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে সহযিয়া বৈষ্ণব হয়ে ওঠেন। মদ্যমাংসভোজী দেবী 'বাসলী' উচ্চবর্ণের সমাজ থেকে বর্জিত হয়ে তথাকথিত নিম্নবর্ণ শবর, ধীবর প্রভৃতি সমাজের পূজিতা ছিলেন। পরে দেবীর জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠায় উচ্চবর্ণের মানুষেরাও আকৃষ্ট হয়ে পূজা শুরু করেন। নিম্নবর্ণের পুরোহিতেরা বিদায় নেন। সংস্কৃত মন্ত্রে দেবীর উপাসনা আরম্ভ করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। 'বাসলী' নামটি সম্ভবত তখনই 'বিশালাক্ষী'তে রূপান্তরিত হয়। দক্ষিণ ভারতের 'বিসলমারী' দেবী ও বাংলার 'বাসলী' বা 'বিশালাক্ষী'। বাংলার ধর্ম–সংস্কৃতিতে যে দ্রাবিড় সংস্কৃতির উপাদান আছে তা অস্বীকার করা যায় না। উড়িষ্যাতে বাসলী দেবীর প্রভাব ছিল। জগন্নাথ মন্দিরের এক কোণেও বাসলীর মন্দির আছে। মধ্যযুগে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে বাসলী দেবীর প্রভাব ছিল তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যে বাসলী পূজার উল্লেখ।

আদিগঙ্গা মোহনায় সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির মন্দির গড়ে উঠেছে। মহাভারত, কালিদাসের রঘুবংশ, উপনিষদে আমরা সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির মন্দির এর কথা জানতে পারি। গুপ্ত পরবর্তী যুগ থেকে মন্দিরটি হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

সেনদের পতনের সাথে সাথে মুসলমান শাসকদের শাসনকালে পীর গাজীদের আগমন ঘটে এই অঞ্চলে। দক্ষিণ 24 পরগনততেও এদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় – এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন বড় খাঁ গাজী যার সাথে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ হয়েছিল এছাড়াও ঘুটিয়ারি শরিফের মোবারক গাজী, টালিগঞ্জের মুকসদ গাজী, এলাচির রক্তান গাজী, সোনারপুরের খোঁড়া গাজী, নরেন্দ্রপুর এর কাছে কামালগাজি উল্লেখযোগ্য।

পাল যুগের শেষ থেকে এবং সেন যুগের প্রথম থেকে নারায়ন পূজা প্রচলন হয় বাংলায়। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তীকালে শাক্তধর্ম গ্রহণ করে এবং আরো পরে ফৌজদার রামচন্দ্র খাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে, এরা ক্ষত্রিয় দের মত উপবীত ধারণ করে। এই অঞ্চলের নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা উপবীত গ্রহণ করে। আদিগঙ্গা গঙ্গার তীরবর্তী দেবতাদের পাশেই পীর গাজী আস্তানা গড়ে উঠেছে। মুসলমানদের ধর্মান্তকরণের সময় এই সুফি

গাজিরা নিম্নবর্গের মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। হিন্দু সমাজের এই ভাঙ্গন রোধ অনেকাংশেই শ্রীচৈতন্যদেব রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

সপ্তদশ শতকের শেষদিকে কবি কৃষ্ণরাম এর রায়মঙ্গল গ্রন্থে দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজীর, দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণের সঙ্গে বনবিবির বিরোধ ঘটে এই বিরোধ মীমাংসা করেন স্বয়ং ঈশ্বর যার হাতে ছিল পুরান আর অন্য হাতে ছিল কোরান, এই বিরোধের পর ঠিক হয় ভাটি অঞ্চল দক্ষিণ রায়ের অধিকার গণ্য হবে এবং গাজী সাহেবের স্বীকৃতি বহাল থাকবে। এই কাহিনী থেকে মনে করা হয় গাজী ও পীরের আগ্রাসন থেকে দক্ষিণরায়, যিনি মদন রায় বা মদন মল্ল নামে পরিচিত ছিলেন তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার ভাই কুমার রায় তাকে সাহায্য করেন। দক্ষিণরায় বাঘের দেবতারূপে পূজিত হন এবং কালু রায় কুমির দেবতারূপে এই অঞ্চলে পূজিত হন। বাঘ ও কুমির সম্ভবত স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতীক ছিল। দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণীর নামে রাজপুর অঞ্চলে দুটো মন্দির এখনো বর্তমান।

দক্ষিণ 24 পরগনার ধর্ম স্থান গুলির মধ্যে এক বিচিত্র ধর্ম সমন্বয় গড়ে উঠেছে। হিন্দু শাস্ত্রীয়,[১২] পৌরাণিক দেবদেবী থেকে এখানে লৌকিক দেব দেবীদের পূজার প্রচলন অনেকাংশে বেশি। বাবাঠাকুর, পাঁচুঠাকুর, পঞ্চাননঠাকুরের সাথে সাথে বিশালাক্ষী, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা-সহ নানান লৌকিক দেব দেবী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ মহাযান ও সহজযান, হিন্দু দেবদেবীর, পীর-গাজী[১৩] সাহেব আর বন বিবি উপস্থিতি বা আস্তানা একই সাথে গড়ে উঠেছে। এই সকল দেব দেবীর কাছে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই ভক্তি নিবেদন করে। হিন্দুর নারায়ন আর মুসলমানদের পীর মিলিত রূপ সত্যনারায়ন এর সৃষ্টি করে। লক্ষণ সেনের পরাজয়ের পর এ অঞ্চল হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় প্রভাব এ এক নতুন ভাবনায় পুষ্ট হয়।

সুন্দরবন অঞ্চলে পীর সাহেবদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, 'পাঁচপীর' এর নাম নিয়ে মাঝিরা সমুদ্রযাত্রা করতেন। এ অঞ্চলে আরেক লোকদেবতা হল বনবিবি যিনি অস্ট্রিক চিন্তাধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলেন, তিনি বৃক্ষ ও বনের দেবতা রূপে পূজিত হতেন। হিন্দুদের কাছে তিনি কোথাও বনদুর্গা কোথাও বা বনলক্ষী আর মুসলমানদের কাছে তিনি বনবিবি বন্য পশু বনের রক্ষক। এই বনবিবির অনেক নাম কোথাওবা তিনি ওলা বিবি কোথাও বা তিনি হোলা বিবি নামে পরিচিত, এদের সাত বোন সবাই দেবীরূপে পূজা পান। সুমাত্রা, যব দ্বীপ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তার করলে দেখতে পাই সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি দক্ষিণবঙ্গের লোকেরাও ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আগমনের ফলে মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দু লৌকিক দেব দেবীরা মুসলিমদের মুসলিমদের অর্জন করে এবং এ অঞ্চলের মানুষের উভয় ধর্মকেই প্রাধান্য দেয়। আর্য ভাষা সংস্কৃতি ধর্মাচারের মাধ্যমে সুপ্রাচীন ধ্যান-ধারণাগুলির সংযোজন ও বিভাজন ঘটেছে। বৈদিক ধর্ম দর্শন এর পাশাপাশি এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন[১৪] ধর্ম, তান্ত্রিক আচার আচরণ বিকাশ লাভ করেছে। এ অঞ্চলের জনজীবন ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্ম আঞ্চলিক দেব দেবীর মাহাত্ম্যকে আশ্রয় করে আত্মরক্ষার দ্বারা টিকে থাকার চেষ্টা করেছে আবার কখনো শক্তির উপাসনায় মেতে উঠেছে, কখনোবা এই শক্তি উপাসনার প্রাবল্য স্তিমিত হয়ে গেছে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে। মোগল আমলের এই অঞ্চলে পীর গাজী দের প্রভাব বিস্তার ও ধর্মান্তকরণ ঘটছে সেই সময় শশি-কালী মন্দিরের পাশে বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দের থান আর পীরের আস্তানা একসাথে গড়ে উঠেছে।[১৫]

Reference:

১. হালদার, বিমলেন্দু, দক্ষিণ 24 পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ, দীপালী বুক হাউস, 15 আগস্ট 1999, পৃ. ১৫

২. "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা মগধাশ্চের পাদান্যান্যা অকর্মভিতো বিবিস্র ইতি'। ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।"

৩. "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষ, সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।"

৪. "দ্রাবিড়াঃ সিন্ধ সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥ তন্ত্র জাতং বহুদ্রবাং ধনধান্যমজাবিকম্। ততো ঘৃণীধি কৈকেয়ি! যদযত্তং মনসেচ্ছসি॥" রামায়ণ, অযোধ্যা কান্ড, ১০ স, ৩৭:৩৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. "ততঃ পন্ড্রাধিপং বীরং বাস, দেবং মহাবলম্। কৌশিকীকচ্ছনিলরং রাজানঞ্চ মহৌজসম| উভৌ বলভাতৌ বীরাবভৌ তীব্রপরাক্রমৌ। নিজ্জি ত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজম পাদ্রবৎ॥ সমদ্রসেনং নিজ্জিত চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্। তাম্রলিপ্ত রাজানং কর্ধটাধিপতিং তথা॥" মহাভারত, সভা পর্ব, ৩০'২২-২৪

"স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নপা। নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম, ততঃ সমদ্রতীরেণ জগাম বসধাধিপঃ। ভ্রাতভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান, প্রতি ভারত॥" মহাভারত, বন পর্ব, ১২৪ অ।

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিগশ্চ পণ্ড্রঃ সংহ্মশ্চ তে সতাঃ। তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভাবি|" মহাভারত, আদি পর্ব, ১০৩ অ।

৬. BANGALIR Itihas AADI PARBA by NIHARRANJAN Roy, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. 67

৭. রায়, নিহাররঞ্জন, বাঙালী ইতিহাসের আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. 76

৮. History of ancient Bengal, R. C. Majumdar, G. Bhardwaj & Co, june, 1971, p. 488

৯. চট্টোপাধ্যায়, সাগর, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালার অধিকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 2005

১০. Majumdar, Susmita Basu, Kalighat Hoard – The first Gupta Hoard from India, Library of Nimismatic Studies, 1 January 2014

১১. ibid, পৃ. 486

১২. Ibid, পৃ. 478

১৩. সুন্দরবনের সংস্কৃতি ও প্রত্ন ভাবনা, নব চলন্তিকা, 10 মে 2010, পৃ. 39

১৪. DWIPOBHUMI SUNDARBAN, Edited by Barendu Mandal, পৃ. 95

১৫. সুন্দরবনের সংস্কৃতি ও প্রত্ন ভাবনা, নব চলন্তিকা, 10 মে 2010, পৃ. 84

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 844 - 850
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মণীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যে পরিবেশচিন্তা

ড. তাপস ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল গভঃ কলেজ, পুরুলিয়া
Email ID : tapasbanerjee634@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ecocriticism, Environmental Criticism, Ecology, Anthropocentriism, Nature, Ecocentric, Pollution, Consumerism.

Abstract
Manindra Gupta (1926-2018) was one of the Post-independence writers of West Bengal. His contributions as a writer are manifold. Although originally a poet, he has edited magazines, written novels and various types of prose for over fifty years. Manindra Gupta's literature has been discussed in the light of environmental thinking. Manindra Gupta's literature has also spoken out against this environmental crisis. The philosophy of life that he has expressed in his literature is to save the world. He is aware of the fact that human domination has plunged the world into crisis. So he protested against the aggression of the (Hu) man. This world is not just for the human beings. He spoke of the rights of various non-human animals on this earth. He did not draw the line between man and nature, keeping in mind the ecological system. He thought that human beings are also children of nature. So nature has emphasized on the friendly relationship of man with different lives of species. Instead of human-centered thinking, he emphasized nature-centered thinking.

Discussion

মণীন্দ্র গুপ্ত স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক। তিনি প্রধানত কবি হলেও উপন্যাস, প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী লিখেছেন। বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় তিনি ততটা জনপ্রিয় নন। অথচ পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধারাবাহিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, কবিতা সংকলন করেছেন এবং বিভিন্নপত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে সমালোচনামূলক গদ্য লিখেছেন।

পরিবেশ চেতনা আসলে একটি নতুন ধারার সাহিত্য সংরূপ। বিশেষ করে বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে এই ভাবনাটি বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরিবেশ চিন্তা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এর পরিধি শুধুমাত্র দেশকালের মধ্যে সীমায়িত নয়। ঠিক তেমনই জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখার মধ্যে এর চর্চা পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও সাহিত্য প্রভৃতি শাখা তাদের নিজ নিজ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করছেন। তাই খুবই স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশচিন্তা একটি ‘interdisiplinary’ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শাখা একে অপরের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পেরেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ চিন্তা নিয়ে একটা চর্চার ধারা গড়ে উঠছে। বিশেষ করে কথা সাহিত্যের মধ্যে এর চর্চা অধিক পরিলক্ষিত হয়। সমালোচকেরা বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের মধ্যে পরিবেশ চিন্তার খোঁজ পাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ দাবি করেন, সমগ্র বিশ্বে যখন সত্তরের দশক থেকে পরিবেশ চিন্তা শুরু হয়েছে ঠিক তখন থেকেই বাংলা ভাষাতে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। তবে আবার এই একটা মতও দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ চিন্তক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমালোচকেরা কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশের রচনার মধ্যেও পরিবেশচিন্তার ছাপ দেখতে পান। কালের নিরিখে এই বিচার শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যে ও নানা মত দেখা যায়। তাই পরিবেশ চিন্তায় কাল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এর চর্চার একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে সেকথাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্যিক মণীন্দ্রগুপ্তের রচনাকে পরিবেশচিন্তার নিরিখে দেখার অন্যতম কারণ হল যুগপ্রভাব। তিনি যে দশক থেকে সাহিত্য লেখার সচেতন সূচনা করলেন ঠিক তখন থেকে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশচিন্তার জোয়ার দেখা যায়। এই যুগকে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ বলেছিলেন 'The Ecology of Affluence'[১] অন্য দিকে তিনি ঐতিহ্য গত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবননান্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব, প্রমুখ সাহিত্যিক ও মনীষীদের জীবন ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত এবং লোক জীবন থেকে গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় জীবন-যাপনের ঐতিহ্য। তিনি ছিলেন গ্রন্থকীট। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ তিনি পাঠ করেছিলেন ছোটবেলা থেকে। সেই গ্রন্থের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনী তেমনি জাপানী প্রাকৃতিক চাষের প্রবক্তা ও দার্শনিক মাসানোবু ফুকুওকারগ্রন্থ, জেনধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক গ্রন্থ। এইসব কিছুর মিশ্রণে তাঁর পরিবেশ মনটি গড়ে উঠেছিল। তিনি সরাসরি কোনো পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা যুক্ত থেকেছেন কখনো কখনো। তবু তাঁর পরিবেশ সচেতন মনটির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্যের মধ্যে।

পরিবেশ তত্ত্বের আলোচনা বিভিন্ন বিষয় উঠে এলেও মূলত কতগুলি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল বাস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানকে (Ecosystem) স্বীকৃতি দেওয়া। এই বাস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞান পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের ওপর জোর দেয়। মানব সভ্যতাকে মানুষ যেভাবে গড়ে তুলেছে এই বাস্তুতন্ত্র তার থেকে অনেক আলাদা। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ ও উদ্ভিদ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। অনেকটাই মানুষের ভাবনার নাগালের বাইরে। এই বাস্তুতন্ত্রে কোনো একটি উপাদান ব্যাহত হলে সামগ্রিক ভাবে বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বিগত কিছু শতাব্দী জুড়ে মানুষ নিজের উন্নতির জন্য তথা সুখভোগের জন্য এককভাবে এই বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করে চলেছে। এর ফলস্বরূপ প্রকৃতি তার ভারসাম্যকে হারাচ্ছে বলে পরিবেশবিদরা মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য হল এই পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়। এই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল অজস্র প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনেও বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই ভারসাম্য রক্ষার্থে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য না-মানুষ প্রাণী ও উদ্ভিদেরাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ এই সভ্যতার ওপর একক ভাবে আধিপত্য করছে। এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে সরব হন পরিবেশবিদেরা। মণীন্দ্র গুপ্তও মানুষের এই আধিপত্যকে স্বীকার করতে চাননি। তাই তিনি তাঁর *কবিতাসংগ্রহ* এর ভূমিকাতে বলেছিলেন –

> "আমিতো সব সময় চেয়েছি- লোকসংখ্যা কমুক, বৈভব তৈজস কমুক, শব্দ বাক্য কমুক। মাছ পাখি পশু বাড়ুক, বন বাড়ুক। পৃথিবী শান্ত সৌন্দর্যে টলমল করুক। মানুষের মুখরতাকে চাপা দিয়ে যাক বনমর্মর।"[২]

তাঁর বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি বাস্তুতন্ত্রে শুধুমাত্র মানুষের আধিপত্যকে চান নি। মানুষের অহমিকা কীভাবে বাস্তুতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করছে সে বিষয়ে তিনি সচেতন। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি মানব সভ্যতাকে ভাবতে শুরু করিয়ে ছিল যে, মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই স্বীকৃতি হয়তো প্রাপ্যও। কিন্তু মানুষের বৈষয়িক উন্নতি বা অবনতিতে এই পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। কারণ মানুষকে কেউ অধিকার দেয়নি অন্যপ্রাণী দের হত্যা করতে কিংবা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত করতে।এই মুনাফালোভী, সুবিধাভোগী মানুষদের প্রতি মণীন্দ্রগুপ্তের বিদ্রুপ। তাই জীবনানন্দের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে নিজেকে জাতিদ্রোহী বলে মনে করেছিলেন –

"মানুষের অধিকারে আমার বিশ্বাস নেই – আমি বোধ হয় জাতি দ্রোহী।"[৩]

মানুষের প্রতি এই ক্ষোভ দেখা যায় পরিবেশ দর্শনে। পরিবেশ দার্শনিকেরা মনে করেন, মানুষ যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হত তাহলে সে অন্যদেরও পরনির্ভরশীল হত না। আবার মানুষ নীতি বা যুক্তিতেও শ্রেষ্ঠ নয়। কারণ তা যদি হত তাহলে মানুষ খুন, ধর্ষণ, অত্যাচার ও অন্যান্য অপরাধ করত না। যদি মানুষ প্রকৃতই যুক্তিবান হত তাহলে সে আজ তার ভোগ কমাত। কারণ সে জানে আকাঙ্খা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে কেবল ভোগী হয়ে উঠছে এবং এই প্রকৃতির ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করছে। এই মানুষের বিরোধী মণীন্দ্রগুপ্ত। এই স্বার্থপর, লোলুপ মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেন নি।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারনোর পিছনে দায়ি ছিল মণীন্দ্র গুপ্তের যুগ। তিনি এমন এক যুগে বড় হয়ে উঠছিলেন যখন মানুষের পাশবিকতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের দেশভাগের সময়, কিংবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেখেছিলেন এই মানুষ কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে, যুগের অন্ধকারে তিনি দেখতে পান মানুষ নিজের সুখের জন্য ভোগ্য পণ্যের দিকে ছুটে চলেছে। তাই তিনি বলেন -

> "রবীন্দ্রনাথের সময় ১৯৪১ পর্যন্ত। ইতিহাস তাঁকে 'সভ্যতারসংকট' পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। জীবনানন্দ তারপর যুদ্ধকালীন পরিবর্তন দেখেছেন, পঞ্চাশের (১৯৪২-৪৩) মন্বন্তর দেখেছেন, যুদ্ধ শেষের পৃথিবীকে জেনেছেন, ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা, দেশভাগ ও নতুন স্বাধীনতার কবলে পড়েছেন। সারা জীবন আহত হয়ে শেষ অপঘাতে চলে গেছেন ১৯৫৪ সালে। জীবনানন্দ যেখানে এসে থেমেছেন আমরা তারপরে আরও দেখেছি - নকশাল আমলের নরহত্যা, রাজনীতির ক্রমাগত অধঃপতন, সোভিয়েতের বিলীন হওয়া। এই সময়ে বিশ্বাস স্থানান্তরিত হচ্ছে সমাজ থেকে ব্যক্তির দিকে, ব্যক্তি থেকে শুধু নিজের দিকে, নিজের ও সত্তা থেকে ক্রমশ তা দ্রুত সরে যাচ্ছে জড় ভোগ্য পণ্যের দিকে। এই সাঙ্ঘাতিক চাপের সময়ে 'বিশ্বাস' হঠাৎ এক্সপ্লোড করে গিয়ে আমরা হয়তো পূর্ণজ্ঞানী হয়ে যেতে পারি। আমাদের কবিতা, জীবনানন্দের পরে, অন্য কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করে আছে প্রায় চার দশক।"[৪]

এই অন্যকথা আসলে বিভিন্ন দিকের কথার ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। তার মধ্যে একটি হতে পারে কবিতা তথা সাহিত্যে মানবকেন্দ্রিক চিন্তার বদলে ইকোসেন্ট্রিক বা প্রকৃতি কেন্দ্রিক চিন্তার প্রাধান্য। তাই তাঁর সাহিত্যে মানবকেন্দ্রিক চিন্তার পরিবর্তে ইকোসেন্ট্রিক বা প্রকৃতিকেন্দ্রিক চিন্তার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকৃতিকেন্দ্রিক চিন্তায় মানুষ ও না-মানুষ, উদ্ভিদ প্রকৃতির সমস্ত উপাদানেরও পরেই গুরুত্ব আরোপিত হয়। মণীন্দ্র গুপ্ত এই ভাবনা থেকেই তাঁর সাহিত্যকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস নুড়িবাঁদর এ কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে একটি নুড়িবাঁদর নামে একটি বাঁদর। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এই বাঁদর দেখেছে মানুষের অহমিকা, লোলুপতা এবং নিজ সুবিধের জন্য পরিবেশের ভারসাম্যকে ধ্বংস করার উদ্যোগ।

একশ্রেণির পরিবেশবিদেরা মনে করেন, পরিবেশ সংকটের মূলে রয়েছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা। বাস্তুতন্ত্রের সমগ্র প্রাণের সঙ্গে মানুষের যে আন্তঃসম্পর্ক তা যখন থেকে হ্রাস পেতে শুরু করে সেদিন থেকেই এই পরিবেশ সংকট শুরু হয়েছে বলে কেউ কেউ ভাবেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে এর বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন। কেউ বা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ভোগবাদী জীবনকে এর জন্য দায়ি করেছেন। মণীন্দ্র গুপ্ত সরাসরি 'বাইবেল'কে এর জন্য দায়ি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নিজের মুনাফার জন্য সেখানকার বাস্তুতান্ত্রিক বিন্যাসকে বিপর্যস্ত করেছিল। তিনিও পরিবেশ সংকটের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে মুনাফার বিষয় হিসাবে দেখেননি। বরং আদিবাসীদের মতো প্রকৃতি তাঁর কাছে সর্বপ্রাণময় হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন সর্বপ্রাণবাদী মতে বিশ্বাসী –

"আমি ভাববাদী নই, বস্তুবাদীও নই, হয়তো নাগা কুকিদের মতো সর্বপ্রাণবাদী।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই সর্বপ্রাণবাদের ছোঁয়া তাঁর সাহিত্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাই তাঁর সাহিত্যে সমস্ত প্রকৃতি কথা বলে। মানুষের কণ্ঠস্বর শুধু নয় এই প্রকৃতির সমস্ত উপাদান জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যে – যা পরিবেশচিন্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তাই পিটার ব্লু ক্লাউড (Peter Blue Cloud) বলেছিলেন - "the allness of the creation,"[৬] তাই মণীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যে মানুষ ও না-মানুষ প্রাণীদের সঙ্গে এই প্রকৃতির এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রচিত হয়। তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা-

> "গাছপালা পাখি মাছ জল জন্তু বনের পশু সবাই একদিন সারা পৃথিবীর শিশুর গল্পে ছিল, কবিতার মধ্যেও ছিল। ...কবির জগৎটি যেন এই আদিম রহস্যে টৈটম্বুর থাকে। সে যেন জীবনের সব সুখে দুঃখে দেশের উদ্ভিদ ও পশু পাখিদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর মতো পায়।"[৭]

শুধু এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল তা নয়; তাঁর সাহিত্যে জুড়ে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্য যখন থেকে তথাকথিত আধুনিক হয়ে উঠতে শুরু করে ঠিক তখন থেকে বিস্তৃতি প্রকৃতির নীরবতা ও দেখা যায় কিংবা যেটুকু দেখা যায় তাতে মানবীকরণ ঘটে। মণীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যে তাই কখনো দেখা গেছে অলৌকিকতা, জাদু বাস্তবতার ব্যবহার কিংবা মানুষের কালজ্ঞানের প্রত্যাখ্যান। তিনি নিজে এক নতুন আঙ্গিকের নির্মাণ করেছেন বা বলা যায় করতে হয়েছে। কারণ তথাকথিত আঙ্গিকে তিনি প্রকৃতির বিস্তৃত প্রেক্ষিতকে তুলে ধরতে পারতেন না। তাই দেবারতি মিত্র তাঁর *উপন্যাস সংগ্রহ* এর ভূমিকাতে বলেছিলেন -

> "কেউ কেউ মনে করেন মণীন্দ্র গুপ্তের উপন্যাস মিলান কুন্দেরা, রুশদি বা পল কোয়েলহোর লেখার সমগোত্রীয়। বাস্তব এবং পরাবাস্তবের মধ্যে এই অনায়াস যাতায়াত যেন গেরস্তের এঘর ওঘর করা। পাঠকেরও এই willing suspension of disbelief-এ কোনো আপত্তি থাকে না।"[৮]

পরিবেশ চিন্তার সঙ্গে পরিবেশ দার্শনিকদের একটা বড় ভূমিকা আছে। বিশেষ করে 'Deep Ecology' বা গভীর বাস্তুতন্ত্রের দার্শনিকেরা প্রকৃতিকে তার স্বতঃমূল্যের বিচারে ভাবতে চেয়েছেন। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত ভোগ প্রকৃতিকে শোষণ করছে বলে তাঁরা মনে করেন। এই ভোগবাদী জীবনকে প্রত্যাহারের কথা তাঁরা বলেন। মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে এই ভোগবাদী জীবনকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। জীবন ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটাই গ্রহণ করতে বলেছেন প্রকৃতি থেকে। তাই ভোগবাদী নাগরিক জীবনের পরিবর্তে কুড়ানীদের জীবন-যাপন তাঁর কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছে। কেননা তাদের খাবারের একমাত্র সম্বল প্রকৃতি। কিংবা তিনি আদিবাসীদের জীবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা ও ভয়ের চোখে দেখেছে।প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একধরনের আধ্যাত্মিক যোগ ছিল। তাই মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন। এই কারণেই তিনি সন্ন্যাসী, বিপ্লবী, হিপি, বেদে এবং ভবঘুরেদের জীবনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। জাপানি কৃষিবিজ্ঞানী মাসানোবু ফুকুওকা তাঁর আদর্শ হয়ে উঠেছে। ফুকুওকা কৃষিকাজে আধুনিক কীটনাশক ওষুধ কিংবা আধুনিক যন্ত্রপাতির বিরোধী। ফুকুওকা উন্নতি বা সমৃদ্ধির বিপক্ষে গিয়ে মানুষের সুখের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সুখের আদর্শ মণীন্দ্র গুপ্ত মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনে খুবই অল্প নিয়েজীবন-যাপন করেছিলেন। ভোগবাদী জীবনকে তাঁর বিকারও শূন্যতা বলে মনে হয়েছিল। তাই শৈশব থেকেই জীবন বদলের কথা ভেবে ছিলেন। এই বদলের প্রথম বাণী ছিল বৈষয়িক তাকে জীবন থেকেপ্রত্যাহার। তাই কবিও মণীন্দ্র গুপ্তের স্ত্রী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন -

> "১৯৭০ থেকে ২০১৭ সাল অর্থাৎ ৪৭ বছর মণীন্দ্র গুপ্তকে দেখছি। সাধারণ ভাবে তাঁর দুটি বিশেষত্ব আমার চোখে পড়েছে। এক নম্বর - তিনি নিজেকে নিয়ে প্রায় মাথা ঘামান না, তাঁর কোথা থেকে কী হচ্ছে, হয়েছে বা হবে তা নিয়ে ভাবেন না এবং মোটামুটি নানা রকম শিল্পকাজে তাঁর একটা মাঝারি দক্ষতা আছে...তাছাড়া অতিসংক্ষেপে অনাড়ম্বর ধরনে তিনি জীবন কাটান ও লেখালেখি করেন।"[৯]

এই জীবন 'Deep Ecolgy' বা গভীর বাস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে গভীর মিল পাওয়া যায়।

ভোগহীন যাপনের ভিত্তি এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে এক অভিন্ন সত্তা রূপে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন তাঁর শৈশবে। তিনি ১৯৩০ এর দশকের পূর্ববাংলার এক অজ গ্রামে বড় হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় লোকায়াত জীবনের স্পন্দন তাঁর মনে গেঁথে যায়। তিনি তাঁর গ্রামেই নানা রকম গাছা-পালার সঙ্গে, প্রাণীর সঙ্গে, বিভিন্ন পাখ-পাখালির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মের নাড়ি কাটা হয়েছিল কাঁচের বাঁশের চোঁচ দিয়ে। কল্পনাপ্রবণ একাকী বালকের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তার সম্পর্কে গড়ে উঠে। তাই গাছ কাটলে বা সাপকে মারলে তাঁর মনে আঘাত হত। কোন গাছের রূপ-রঙ কেমন, কোন ফলের স্বাদ কেমন - এই অভিজ্ঞতা তিনি শৈশবে অর্জন করেছিলেন। তিনি এমন একটা সংস্কৃতিতে বড় হয়েছিলেন যেখানে প্রত্যেকের অস্তিত্ব প্রকৃতির ওপর প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভরশীল ছিল। সারা বছরের খাওয়া-দাওয়া ও উৎসব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হত। অসুখ-বিসুখের ওষুধের জন্য নির্ভরশীল ছিল সেখানকার বিভিন্ন প্রাণী ও গাছ-পালার ওপর। সেখানকার অর্থাৎ এমনগোষ্ঠীতে তিনি বড় হয়েছেন যারা – “developing communities integrated with ecosystem,”[১০] তাই সেখানে প্রকৃতি শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট না হয়ে যেন জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠে। এই সংস্কৃতি থেকেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক বা ইকোসেন্ট্রিক দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন করেছিলেন।

সবশেষে বলাযায়, মণীন্দ্র গুপ্ত হলেন একধরনের পরিবেশ বাদী সাহিত্যিক যিনি পৃথিবীকে সকল প্রাণের জন্য সমান ভাবে ভেবেছেন। তাঁর কাছে মানুষের থেকে প্রকৃতি অনেক বেশি বড় বলে মনে হয়েছে। এই ভাবনাটি যে খুব নতুন, তা নয়। এই ভাবনা পৃথিবীর অনেক দর্শন ও সাহিত্যে প্রতিফলিত। ভারতীয় সংস্কৃতি তার দর্শন ও সাহিত্যে এই সামগ্রিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত আদিবাসী তথা চতুর্থ বিশ্বও এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমগ্র বিশ্ব আজ উন্নয়নের দিকে ছুটে চলেছে। এই উন্নয়নের তাগিদে প্রকৃতিকে শোষণ করা হচ্ছে নির্মমভাবে। প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাচ্ছে দ্রুতগতিতে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই পরিবর্তিত পরিবেশের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় -

> “কিন্তু পৃথিবী পাল্টাইতেছে। প্রকৃতি পাল্টাইতেছে। এবং দ্রুত গতিতে পাল্টাইতেছে। এই পাল্টানোর দায় মানুষেরই। কারণ প্রকৃতির উপর যথেচ্ছাচার সে-ইকরিয়াছে। প্রকৃতির যতক্ষণ সেই অত্যাচার বরদাস্ত করিবার ক্ষমতা ছিল, করিয়েছে। এখন প্রকৃতি বিরূপ। বিপদ সঙ্কেতগুলি প্রবল হইতে প্রবলতর। তবু মানুষ কখনও অগ্রগতির দোহাই দিয়া, কখনও ঐতিহ্যের ধুয়া তুলিয়া, কখনও বা নিছক সুবিধার অজুহাতে খাড়া করিয়া প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করিয়া চলিতেছে। গড্ডলিকা প্রবাহের বাহিরে গিয়ে সচেতন ব্যতিক্রম ঘটানো তাহার অভ্যাসে নাই। কিন্তু সেই চেতনা এখন বিশেষ আবস্যক। মানুষের বোঝা দরকার যে, নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রকৃতির যত্ন লইতে হইবে। সমুদ্র দূষিত করিয়া, সেই দূষিত সমুদ্রের বিষাক্ত তিমির মাংস খাইয়া ঐতিহ্যকে বাঁচাইতে চাহিলে মানুষ নিজেকে সুস্থভাবে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেনা।”[১১]

পরিবেশকে রক্ষা করার সচেতনতা থেকেই ভারত তথা বিশ্বে যত পরিবেশ আন্দোলন ঘটেছে তার মূল অভিযোগেই কিন্তু পরিবেশকে লুণ্ঠন করার জন্য। তাই প্রকৃতিকে সংরক্ষণের কথা ভাবা হয়েছে বিভিন্ন দেশে। কিন্তু এ নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক দেখা যায়। বিশেষ করে ভারতের দরিদ্র দেশগুলি নিজেদের দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে কাযেলাগে। তাদের কাছে মূল যুক্তি হয়ে ওঠে, দারিদ্র্য ও অভাব দূরীকরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার অতি আবশ্যক। এক্ষেত্রে পাশভাত্য দেশগুলির অন্ধ অনুসরণ করা হয়। কিন্তু মানুষের উন্নয়নের নেশাতে আসলে ক্রমশ ভোগবাদী হয়ে উঠছে। গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাপন ত্যাগ করে মানুষ ক্রমশ শহুরে হতে যাচ্ছ। তাই দারিদ্রো অভাব দূরীকরণে বিজ্ঞানের ব্যবহার কোনো দোষের নয় ভোগবিলাসের সূচক ঊর্ধ্বমুখী হলে আরও বেশি ভয়ংকর সমস্যা মানুষ পড়বে। মানুষের ক্রম বর্ধিত চাহিদার চাপে জীব বৈচিত্র্যের হ্রাস পাবে, পানীয় জলের সংকট দেখা যাব, আধুনিক যাপনের জন্য প্রয়োজন হবে বেশি মাত্রায় জ্বালানি ও শক্তি। এই জ্বালানির বেশির ভাগটাই আসে জীবাশ্মা-জ্বালানি থেকে। এই জীবাশ্মা জ্বালানি গুলি পরিবেশের ওপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলে। এই জ্বালানি ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস নির্গত হয়। এই সব গ্যাস প্রকৃতি শোষণ করে নিতে পারে না। ফলে এই গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং উষ্ণায়ণ ঘটে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সমুদ্রের জল বেড়ে যাবে, উওরের হিমবাহ গলতে থাকবে, জীব বৈচিত্র্যের সংকট দেখা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত মাত্রায় সাইক্লোন, বৃষ্টিপাত, খরা, বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাসের আবির্ভাব ঘটবে

– যা সামগ্রিক ভাবে মানুষের জীবনকেই বিপন্ন করবে। এই সচেতনতা থেকেই মানুষের পরিবেশ নিয়ে ভাবা দরকার বলে মনে করা হয়। দীপেশ চক্রবর্তী বলেন:

> "পৃথিবী ব্যাপী জীবনের উপর মানুষের এই প্রতিপত্তি দেখে কিছু বিজ্ঞানী বলতে শুরু করেছেন যে মানুষ প্রজাতিটি আজ প্রবল ক্ষমতাশালী আগ্নেয় গিরির মতোই এক ভূতাত্ত্বিক শক্তি। তাঁরা বলছেন, আমাদের এই গ্রহটির প্রাচীন ইতিহাসে আজ এক নতুন যুগ এসেছে, তা মানুষের যুগ, বা অ্যানথ্রোপসিন। কেউ বলছেন, না, তা কেন নাম হবে? এর মূলে আছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তাই নাম হোক 'ক্যাপিটালোসিন'। আজ দুটো জিনিস ক্রমশই পরিস্কার হয়ে এসেছে - যাকে আমরা 'পরিবেশ' যুগ বলি, তাকে উপেক্ষা করে মানুষের সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদি হতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত, পরিবেশ আর মানুষ দুটি আলাদা বস্তু নয়। পরিবেশেরই ফসল মানুষ, আবার মানুষের শরীরের মধ্যেই নানান জীবাণু ও ভাইরাসের রূপ নিয়ে পরিবেশ বর্তমান। বিভিন্ন প্রাণিজগৎ ও এই পৃথিবী নানা সূত্রে সম্বন্ধিত। বিশ্ব পরিবেশ দিবস যদি আমাদের এই সত্য স্মরণ রাখতে সাহায্য করে, এই উপলব্ধির আলোকে উন্নয়নের প্রশ্নটি ভাবায়, তাহলে তা-ইহবে তার সার্থকতা"[১২]

তাই উন্নয়ন ও প্রকৃতি সংরক্ষণ কখনও বিপরীত হতে পারেনা মানুষের জীবনের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে। মানুষ যেমন নিজের পরিবেশকে বিপন্ন করছে ঠিক তেমন মানুষেই এই সমস্যার সমাধান করার কথা ভাবতে পারে। তাই মানুষকে শ্রেষ্ঠ না ভাবলেও মণীন্দ্র গুপ্ত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন তার দায়িত্ব। তাই তাঁকে যখন এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়ে ছিলে চারপাশে দ্রুত বদলে যাওয়া পরিবেশ আর প্রকৃতি তাকে কষ্টদেয় কিনা? এর উত্তরে তিনি বলেন –

> "কষ্টদেয়, তা যেমন ঠিক, আবার আমি এও জানি যে এই পুরো ব্যাপারটাই মানুষের নিজের হাতে তৈরি। তাই তার কিছু দায়িত্ব ও বর্তায় এই বদলের ফলে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলোকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও কাজ করার।"[১৩]

মণীন্দ্র গুপ্ত বাংল সাহিত্যের সেই শ্রেণির সাহিত্যিক যিনি সমকালীন পরিবেশ সংকট নিয়ে ভেবেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাই তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিবেশের গভীর সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। উন্নয়ন, আর্থিক সমৃদ্ধির চেয়ে ও তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তুতান্ত্রিক বিন্যাসের সত্যতা, স্থিতিশীল উন্নয়ন, এবং মানুষসহ সমস্ত পৃথিবীকে জৈবগোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে দেখেছেন।

Reference:

১. Guha, Ramchandra. *Environmentalism: A Global History*. Penguin Books, Haryana, 2016, p. 93

২. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'প্রথম প্রকাশের ভূমিকা', *কবিতাসংগ্রহ*, আদম, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭

৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর ও সাক্ষাৎকার', *গদ্যসংগ্রহ*, অবভাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৪১

৪. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'তাহারা অদ্ভুত লোক', *গদ্যসংগ্রহ*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৮৬

৫. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'উওরদ্বাদশ', *গদ্যসংগ্রহ*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬২

৬. Cloud, Peter Blue. 'Voice Play', *The Remembered Earth : An Anthology of Contemporary Native American Literature*. Edited by Geary Hobson, University of Mexico press, Albuquerque, 1980, p. 23

৭. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'তাহারা অদ্ভুত লোক', *গদ্যসংগ্রহ*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৮৮

৮. মিত্র, দেবারতি, 'ভূমিকা', *উপন্যাস সংগ্রহ*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৯

৯. মিত্র, দেবারতি, 'মণীন্দ্র গুপ্ত অল্পস্বল্প', *স্বকাল : কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা*, সম্পাদক - প্রকাশ দাস, পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৮, পৃ. ১৪১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 94
Website: https://tirj.org.in, Page No. 844 - 850
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. Lynch, Tom, et al., editors. The Boiregional Imagination: Literature, Ecology and place, University of Georgia press, 2012, p. 33

১১. 'আত্মরক্ষা', সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬জুন, ২০১৮, পৃ. ৪

১২. চক্রবর্তী, দীপেশ, 'এক ওভারে চার ট্রাক প্লাস্টিক', আনন্দবাজার পত্রিকা (রবিবাসরীয়), ৩জুন, ২০১৮, পৃ. ১

১৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'একটা ম্যাপ এঁকে যাচ্ছি, আরো জটিল, আরো সুদূর, আরো অসমাপ্ত' (কথোপকথন), *স্বকাল : কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা,* সম্পাদক- প্রকাশদাস, পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৮, পৃ. ১৪১

Bibliography:

কর মহাপাত্র, সুখেন্দুবিকাশ, *প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিণাম,* সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৯৫

খাঁ, সুমিত্রা, *পরিবেশ দূষণের গল্প,* নবচলন্তিকা, কলকাতা, ১৯৯৭

গুপ্ত, শুভেন্দু, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

গুপ্ত, শুভেন্দু, *পরিবেশ নিয়ে ভাবতে শেখালেন যারা,* পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৬

গুহ, মানসমোহন, *পরিবেশচেতনা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৯

গোস্বামী, প্রভাতরঞ্জন, *পরিবেশ ও সমাজবিদ্যা,* ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৮৩

ঘোড়ই, সন্তোষকুমার, *পরিবেশ?,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০

চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৯

চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন, *স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫০-২০১১),* শ্রীময়ী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫

চক্রবর্তী, কবিতা নন্দী, *বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা : রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ,* আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭

চক্রবর্তী, কল্যাণ, *বিপন্নপ্রকৃতি,* নিউ বেথুন প্রেস, কলকাতা, ১৯৯২

চক্রবর্তী, পার্থ, *প্রকৃতি পরিবেশ নিসর্গ নীতি,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২

চক্রবর্তী, পার্থসারথি, *আমাদের পরিবেশ,* শ্রীভূমি, কলকাতা, ১৯৯৫

Abram, M.H. *A Hand Book of Literary Terms.* Cengage Learning, New Delhi, 2009.

Andersn, Linda. *Autobiography.* Routledge, London

Bandyopadhyay, Debarati. *Rabindranath Tagore : A Life of Intimacy with Nature.* Rupa Publication, Kolkata, 2019

Barry, Peter. *Beginning Theory.* Viva Books, Kolkata, 2011

Bate, Jonatham. *The Song of the Earth.* Picador, London, 2000

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 851 - 858
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পরিবেশের ইতিহাস চর্চায় নয়া দিগন্ত : প্রসঙ্গ দীপেশ চক্রবর্ত্তী ও র‍্যাচেল কারসন

সৌতন রুদ্র
SACT
ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ
Email ID : soutan1990@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Environmental history, New Horizons, Chemical Industry, Sea wind, Climate change, Global Warming, Human extinction, Age of the Anthropocene, Planetary crisis.

Abstract
Environment History offers an earth's-eye view of the past. It addresses the many ways in which human beings have interacted with the natural environment over time. As one of the newest perspectives within the discipline of History, it is a field that is still in the process of self-definition. It therefore offers the exciting challenge of engaging in a dialogue with the documents of the past and with historians of the present to create individual interpretations of history.

For environmental historian the term environment refers to the Natural and Human-created surroundings that affect a living organism or group of organisms ability to maintain itself and develop over time. Ecology deals with the relationship between these organisms and their surroundings. In the case of humans, it also includes social and cultural patterns, ecological history is therefore somewhat broader than environmental history but the two terms are often used interchangeably.

Environmental History is a rather new discipline that came into being during the 1960 and 1970. The foundations on which environmental history was founded in the 1960's : Rodrick Nash coined the term environmental history in an article about the impact of past human society on the environment published in the Pacific Historical Review in 1972. Environmental history is always about human interaction with the Natural world, or to put it in another way, it studies the intervention between culture and nature. The Principal goal of environmental history is to defend our understanding of how humans has been affected by the natural.

Environmental history is an interdisciplinary subject that means that historians, scientists and other scholars must look over the boundaries of their own subject the historian must be aware that he or she sometimes needs to apply some principles from natural sciences, such as ecology, biology and forestry, to understand what happened in the past. However, this does not mean that historian must become a scientist. He is and remains and historian with the task to master and understanding past as a key to a better

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 851 - 858
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

understanding of the present. But to do so he or she must look over the boundaries of history and even the humanities and acquaint themselves with the nomenclature and principles of their disciplines, especially the natural sciences. This does not mean that they have to become experts in these fields, but to use it as a tool to get a better understanding of historical problems.

During last 40 years environmental history grew from an interest of some historians and natural scientists into a full-fledged academic discipline. In the United States environmental history gained a firm institutionalized base which is reflected in the fact that the annual meetings of the American Society for environmental history established in 1975.

In this article of mine environmental history practice is new horizon by Rachel Louis Carson and Dipesh Chakrabarty. In 1962 Rachel Carson brought the environmental movement into spotlight with the publication of 'Silent Spring' in which she described the effects of chemical pesticides on biodiversity and other hand Dipesh Chkraborty is a cultural historian and postcolonial theorist who has made particularly important contributions to environmental historiography. Dipesh Chakraborty believes that environmental historiography is an important part of human history, helping to understand the relationship between environment and human society.

Discussion

ভূমিকা : পরিবেশের ইতিহাস চর্চা হল প্রাকৃতিক জগৎ এবং মানুষের মধ্যে সময়ের সাথে সাথে মিথষ্ক্রিয়া এবং প্রভাব নিয়ে গবেষণা। যা মানব সমাজের উপর প্রকৃতির প্রভাব এবং পরিবেশের পরিবর্তনের উপর মানব কার্যকলাপের প্রভাবকে বোঝাতে সাহায্য করে পরিবেশের ইতিহাস আমাদের শেখায় কীভাবে মানব সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তনের পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলছে এবং পরিবেশের পরিবর্তন মানব সমাজকে প্রভাবিত করেছে। এটি মানব সমাজের উন্নয়নের শিক্ষা দেয়। মানবজীবনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। পরিবেশ, সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু মনুষ্য প্রজাতি নানাবিধ নেতিবাচক কাজ ও অসচেতনতা পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। তাই নানা কারণে পরিবেশের ইতিহাসচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের ইতিহাস চর্চার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে। পরিবেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের প্রভাব সম্পর্কে মানব সভ্যতাকে কতটা প্রভাবিত করে তা পরিবেশের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে অবগত হয়। মানুষ বুঝতে পেরেছে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার জনজীবনের বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অর্থাৎ পরিবেশের ইতিহাস চর্চার দ্বারা পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন।

আধুনিক ইতিহাসচর্চায় পরিবেশের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমাদের অতীতের ঘটনাগুলিকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ দেখতে সাহায্য করে। পরিবেশগত ইতিহাস আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে মানুষের ক্রিয়া-কলাপগুলি কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে এবং পরিবেশের পরিবর্তনগুলি কীভাবে মানব সমাজকে প্রভাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি মানব ইতিহাসের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। পরিবেশগত ইতিহাস আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে কীভাবে পরিবেশগত নীতি ও ব্যবস্থাপনাগুলি মানব সমাজকে প্রভাবিত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ পরিবেশগত আইন ও নিয়মগুলি মানব ক্রিয়া-কলাপগুলিকে পরিবেশের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। পরিবেশগত ইতিহাস একটি নতুন এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র। এটি আধুনিক ইতিহাসচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে এবং এটি আমাদেরকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে বুঝতে সাহায্য করছে।[১]

পরিবেশের ইতিহাসচর্চা প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকের পরিবেশ আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে রডারিক ন্যাশ 'ওয়াইল্ডারনেস অ্যান্ড দ্য আমেরিকান মাইণ্ড' প্রকাশ করেন, যা প্রাথমিক পরিবেশগত ইতিহাসের একটি ধ্রুপদী গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান ইতিহাসবিদদের সংগঠনে দেওয়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 851 - 858
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এক ভাষণে ন্যাশ 'পরিবেশগত ইতিহাস' শব্দটি ব্যবহার করেন। সময়ের সাথে সাথে পরিবেশগত ইতিহাস চর্চা আরো উন্নত হয়েছে পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আলফ্রেড ডব্লিউ ক্রসবির বই 'দ্য কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ' (১৯৭২) পরিবেশগত ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক রচনা। ১৯৭০ দশকে পরিবেশের ইতিহাস সামাজিক ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম শাখা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরিবেশের ইতিহাস চর্চায় যে সব ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেগেছেন তারা হলেন আলফ্রেড ক্রসবি, মাইকেল মান, রিচার্ড গ্রোভ, র‍্যাচেল কারসন, ডোনাল্ড ওয়াস্টার, জন রবার্ট ম্যাকলিন, উইলিয়াম ক্রোনেল, আমান্ডা পাওয়ার, স্টিফেন মোসলে। এছাড়া ভারতীয় পরিবেশের ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন রামচন্দ্র গুহ, মহেশ রঙ্গরাজন, মাধব গ্যাডগিল, ইরফান হাবিব, শুভেন্দু গুপ্ত, শমিত কর, সুধাংশু পাত্র, বন্দনা শিবা, দীপেশ চক্রবর্তী, নিলাদ্রী ভট্টাচার্য প্রমুখ। আমি মূলত এই প্রসঙ্গে পরিবেশ ইতিহাস চর্চায় দুই গুরুত্বপূর্ম ইতিহাসবিদ নিয়ে আলোচনা করবো, তার মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত মার্কিন সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী এবং নিসর্গ লেখক, যার লেখার মাধ্যমে পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলন বেগবান হয়েছে, তিনি হলেন রেচল লুইস কারসন। অপর জন হলেন ভারতীয় বাঙালি ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী। যাদের হাত ধরে পরিবেশের ইতিহাস চর্চায় এক নয়া দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে।[২]

র‍্যাচল কারসন : র‍্যাচেল লুইস কারসন ছিলেন একজন জীববিজ্ঞানী, লেখিকা, এবং পরিবেশকর্মী। কারসনের বেশিরভাগ লেখাই প্রকৃতির প্রতি তার উদ্বেগ প্রকাশ করে। কারসনের জন্ম ১৯০৭ সালের ২৭মে। তিনি পেনসিলভানিয়ার স্প্রিংডেলে গ্রামীণ এলাকায় বেড়ে ওঠেন এবং তার শৈশব কেটেছে তার পরিবারের খামারের আশেপাশের পাহাড় এবং মাঠ ঘুরে দেখার মাধ্যমে। তার মা মারিয়া ম্যাকলিন, তাকে স্থানীয় বন্যপ্রাণী সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই কারসন একজন লেখক হতে চেয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি পেনসিলভানিয়া কলেজ ফর উইমেনে ইংরাজি পড়া শুরু করেন। পরে তিনি জীববিজ্ঞানে মনোনিবেশ করেন। ম্যাসাচুসেটসের উডস হোলে গ্রীষ্মকালীন গবেষণা প্রকল্পের সময় কারসন প্রথমবারের মতো সমুদ্রের মুখোমুখি হন। এটি তার বেশিরভাগ কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১৯৩০-এর দশকে তিনি হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মার্কিন মৎস্য ও বন্যপ্রাণী বিভাগে কাজ শুরু করেন।[৩]

কারসন প্রকৃতির একজন ছাত্রী ছিলেন। বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়নের আগে থেকেই একজন জন্মগত পরিবেশবিদ ছিলেন এবং একজন লেখক ছিলেন যিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে প্রাকৃতিক জগৎ থেকে লেখার জন্য কিছু দিয়েছে। তিনি সর্বদা প্রাকৃতিক জগতের উপর মানুষের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি রেডিও প্রোগ্রাম এবং ব্রোশার সিরিজে জনসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করতেন। তার রেডিও প্রোগ্রামে 'Romance under the Waters' সামুদ্রিক জীবন নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সময়ে কারসন তার নিজের কাজ প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রথম বই 'Under the sea wind: A Naturalist's Picture of Ocean Life' (1941)। এই গ্রন্থে তিনি আটলান্টিক উপকূলের সমুদ্রে এবং সমুদ্রের ভেতরে বসবাসকারী জীবের আচরণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনার দ্বারা পেশাদার লেখক হিসাবে কারসনের কর্মজীবন শুরু হয়। প্রবন্ধটি এবং বইটি ইতিমধ্যেই সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক লেখায় তার বৈশিষ্টপূর্ণ একীকরণ প্রদর্শন করে। যা একদিকে ঊনিশ শতকের রোমান্টিক ঐতিহ্য এবং অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং রক্ষণের ধারণার পাশাপাশি বাস্তুশাস্ত্রের নতুন আবিষ্কার দ্বারা রঞ্জিত।

কারসনের দ্বিতীয় বই 'The Sea Around Us' (1951)। এটি সমুদ্রের বিজ্ঞান এবং প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সমুদ্র সম্পর্কে তার বইগুলিতে কারসন সাবমেরিন প্রযুক্তি এবং জলের নিচের গবেষণার থেকে ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্পর্কে লিখেছেন — কীভাবে দ্বীপগুলি তৈরি হয়েছিল, কীভাবে স্রোত পরিবর্তিত হয় এবং একত্রিত হয়। তাপমাত্রা কীভাবে সমুদ্রের জীবনকে প্রবাবিত করে এবং কীভাবে ক্ষয় কেবল তীররেখা নয় বরং লবণাক্ততা, মাছের জীবন এবং ক্ষুদ্র অণুজীবের উপর কী প্রভাব ফেলে। এমনকি ১৯৫০-এর দশকেও সমুদ্র সম্পর্কে কারসনের পরিবেশগত দৃষ্টি দেখায় যে তিনি একটি বৃহত্তর পরিবেশগত নীতি গ্রহণ করেছেন যা প্রকৃতির সাথে জীবপ্রজাতির আন্তঃসম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন।[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 851 - 858
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে গ্রন্থটির জন্য তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সেটি হল সাইলেন্ট স্প্রিং (Silent Spring) এটি একটি পরিবেশ বিজ্ঞানের বই। ২৭শে সেপ্টম্বর ১৯৬২ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের ব্যবহৃত কীটনাশক ডিডিটির নির্বিচার ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৫০-এর দশকে শেষের দিকে কারসন পরিবেশ সংরক্ষণ, বিশেষ করে পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তার গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'সাইলেন্ট স্প্রিং' যা আমেরিকান জনসাধারণের কাছে পরিবেশগত উদ্বেগ নিয়ে আসে। 'সাইলেন্ট স্প্রিং'কে কার্সনের সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজ হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। কোম্পানিগুলি উকুন মারার জন্য সেনাবাহিনীর কাছে ডিডিটি বিক্রি করেছিল। যুদ্ধের পরে কোম্পানিগুলি খামার এংব বাগানে ব্যবহারের জন্য এটি বিক্রি শুরু করে। সরকারী প্রতিবেদন পড়ার পর কারসন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ডিডিটি বেসামরিক ব্যবহারের জন্য পরীক্ষা করা হয়নি এবং পোকামাকড় ছাড়া অন্যান্য বন্যপ্রাণী হত্যা করছে বলে মনে হয়েছিল। কারসন রিডার্স ডাইজেস্টে এই বিষয় সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ম্যাগাজিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রায় বিশ বছর পর, তিনি সাইলেন্ট স্প্রিং প্রকাশ করেন।

কারসন পরিবেশগত বিষয়গুলিতে আরও ব্যাপক গবেষণা করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান। তিনি চেয়েছিলেন জনসাধারণ স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা বলেন। 'সাইলেন্ট স্প্রিং'-এ তিনি সামগ্রিক ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের আন্তঃসংযুক্ততার উপর জোর দিয়েছিলেন। 'সাইলেন্ট স্প্রিং' কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ে জাতীয় বিতর্কের জন্ম দেয়। রাসায়নিক কোম্পানিগুলি কার্সনের লেখা তাদের লাভের উপর কীভাবে প্রবাব ফেলবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিল এবং তাকে অসম্মান করার চেষ্টা করেছিল। তারা দাবি করেছিল যে কীটনাশক নিষিদ্ধ করলে পোকামাকড় আমেরিকান কৃষিতে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং রোগ ছড়াবে। কার্সন পিছু হটতে অস্বীকৃতি জানান। ২০১২ সালে কারসনের যুগান্তকারী কাজ, সাইলেন্ট স্প্রিং-এর প্রকাশনার পঞ্চাশতম বার্ষিকী। এই স্মরণীয় বইটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কারসন সেন্টার কারসনের উত্তরাধিকারের উপর একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, বিপজ্জনক রাসায়নিকের উপর একটি সম্মেলন আয়োজন করে এবং ২০১২ সালের শেষের দিকে সাইলেন্ট স্প্রিং-এর উপর বিশ্বব্যাপী প্রতিফলন নিয়ে RCC পার্সস্পেক্টিভ সংখ্যা প্রকাশ করে।[৫]

সাইলেন্ট স্প্রিং-এর গোড়ার দিকের পরিচ্ছেদে এইসব নতুন রাসায়নিকের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তাদের ব্যবহার ও মাটি জল এবং বনবনানীর উপর তাদের অভিঘাতের কথাও। তারপর এসেছে এইসব আধুনিক, এবং লেখকের মতে, অন্যায় অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিরক্ষামূলক প্রক্রিয়ার কথা। বন্যপ্রাণের উপর একটি পরিচ্ছেদের পরে এসেছে পাখিদের নিয়ে আরেকটি পরিচ্ছেদ, যার কেন্দ্রে রয়েছে নিউ ইংল্যান্ডের কোনও কোনও এলাকায় রঙিন পাখিদের মৃত্যু, যার কারণ হল কীটনাশক দিয়ে এসব গাছে স্প্রে করার ফলে মরা পোকামাকড় খাওয়া। কীভাবে বিষ খাদ্যশৃঙ্খল বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে, এ তার এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত। সাইলেন্ট স্প্রিং লেখার সময় স্বয়ং কার্সনেরই ধরা পড়ে ক্যানসার— কিন্তু বইটা শেষ হয় আশারই বার্তায়, এই আশা যে কীট নিবারণের জীববৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানুষকে একটা শেষ সুযোগ দেবে 'এমন একটা লক্ষ্যে পৌঁছোনোর, যা আমাদের পৃথিবীকে রক্ষার ব্যাপারে ভরসা জোগাবে।[৬]

সাইলেন্ট স্প্রিং-এর অভিঘাত অবশ্য প্রকৃতির এই দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল ছিল না, কেননা কীটনাশকের অপব্যবহার এবং বন্যপ্রাণ ও মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়াই তার প্রমাণ। বইটা প্রকাশের বিশ বছর পর জনৈক ঐতিহাসিক লক্ষ করেছিলেন যে, 'পূর্বতন কোনও পরিবেশ সংক্রান্ত প্রসঙ্গের চেয়ে আরও ব্যাপক পাঠকমণ্ডলী পেয়েছিল ওই বই। একটা (সার্বজনিক) আশঙ্কাকে মোকাবিলা করার জন্য ইতিপূর্বে এত বিচিত্র ক্ষেত্রের মানুষ আর সমবেত হয়নি কখনও : পক্ষী পর্যবেক্ষক থেকে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপক এবং জনস্বাস্থ্য পেশাদার থেকে শহরতলির গৃহমালিক পর্যন্ত।' সাইলেন্ট স্প্রিং-এর প্রথম দিকের গুণমুগ্ধদের মধ্যে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব স্টুয়ার্ট উডাল, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডি, যাঁর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসরি কমিটি কার্সনের সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে।[৭]

বইটার অভিঘাত হয় দূরপ্রসারী। সাইলেন্ট স্প্রিং-এর পিছু পিছু 'শহরগুলো পথপার্শ্বের গুল্ম ও গাছগাছালির উপর তৃণনাশকের নির্বোধ ব্যবহার' সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা শুরু করে, নাগরিক ও আধিকারিকেরা নদীতে মৎস্যনিধন সম্পর্কে আরও সতর্ক হয়; সেনেটর ও কংগ্রেস সদস্যরা কীটনাশক উৎপাদনকে ঘিরে একটা রাজনৈতিক বিতর্কে উদ্বুদ্ধ হন এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 851 - 858
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আইন প্রণয়ন করেন; নতুন প্রোডাক্টগুলোকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য কীট নিয়ন্ত্রণের উপর একটা ফেডারেল কমিটি স্থাপিত হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তর, একদা সংশ্লেষণী কীটনাশকের তুমুল সমর্থক, কতিপয় বিপজ্জনক রাসায়নিককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, বেশ কিছু রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ডিডিটি ব্যবহার আইনবিরুদ্ধ বলে প্রচার করে এবং শেষত, পেস্টিসাইড কন্ট্রোল অ্যাক্ট ১৯৭২ এবং টক্সিক সাবস্ট্যান্সেস কন্ট্রোল অ্যাক্ট ১৯৭৪ রাসায়নিকের উপর নজরদারি করা এবং নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টাকে জোরদার করে।[৮]

দীপেশ চক্রবর্তী : দীপেশ চক্রবর্তী একজন বাঙালি ইতিহাসবিদ। নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে তাঁর কাজের জন্য তিনি বিশ্বের কাছে পরিচিত লাভ করেন। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ ১৫ ডিসেম্বর তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। তার আদি পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরে। দীপেশ চক্রবর্তী একজন সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদ এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক যিনি পরিবেশের ইতিহাস চর্চায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি মানুষের কার্যকলাপের উপর প্রকৃতির প্রভাব এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে গবেষণা করেছেন। দীপেশ চক্রবর্তী পরিবেশগত ইতিহাসকে সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক জগতের সাথে মানুষের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যায়ন হিসাবে দেখেন, যেখানে প্রকৃতি মানব বিষয়কে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, এমনটা জোর দিয়ে বলেন।[৯]

তিনি সাবল্টার্ন বা প্রান্তিক মানুষের পরিবেশগত অভিজ্ঞতার উপর জোর দেন, যেখানে পরিবেশগত সমস্যাগুলো তাদের জীবনযাত্রাকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা তুলে ধরেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তা মানব সমাজে কী প্রভাব নিয়ে আসে এই নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়েও তিনি কাজ করেছেন, যেখানে সুন্দরবন অঞ্চলের বহু মহিলাকে বন্ধ্যাত্বকরণের অস্ত্রোপচার করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের যোগ রয়েছে বলে এমনটো তিনি উল্লেখ করেছেন।[১০]

দীপেশ চক্রবর্তী 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস'-এ অধ্যাপক হিসাবে পরিবেশগত ইতিহাসচর্চার ভাবনা কাজ করে। বর্তমান সময়ে তিনি কাজ করছেন জলবায়ু সংকট ও মহামারীর কার্যকরণ উন্মোচনে ইতিহাসের ভূমিকা নিয়ে। প্ল্যানেটারি তথা গ্রহীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু সংকট ও মহামারির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তার লেখালেখিকে সমগ্র বিশ্বেরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার 'The Climate of History in a Planetary Age' (2021) গ্রন্থ। মানুষী ও না-মানুষী ইতিহাসকে একই মোহনায় সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে দীপেশ চক্রবর্তীর মুন্সিয়ানা সর্বমহলে স্বীকৃত। পুঁজির ইতিহাসের সঙ্গে পৃথিবীর আর প্রাণের ইতিহাস মিশিয়ে পাঠ করার পদ্ধতি বিদ্যায়তনিক ও ক্রিটিক্যাল জ্ঞান-চর্চার জগতে প্রতিনিয়ত অনুশাসনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া বর্তমানে দৃশ্যমান। তার মতে জলবায়ু বা অতিমারির সংকট সার্বিকভাবে বুঝতে গেলে, ভূতত্ত্ব, জীবনের ইতিহাস, প্রাণের ইতিহাস মিলে মিশে আছে।[১১]

দীপেশ চক্রবর্তী 'জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্তমান অতিমারি : মানুষের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ' (২০২১) বইটিতে পরিবেশ সচেতনতার প্রকাশ পায়। এই বইটি শুরু হয়েছে সমুদ্র জয়ের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। যে সমুদ্র বাস্তু সংরক্ষণ হচ্ছে গ্রহীয় ব্যবস্থাপনা প্রধানতম উৎস। কিন্তু উপনিবেশায়ন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় জয়ের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। যে সমুদ্র বাস্তুসংস্থান হচ্ছে গ্রহীয় ব্যবস্থাপনা প্রধানতম উৎস। তার মতে বাস্তু সংস্থানকে নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস হচ্ছে মানুষী সভ্যতা ও পুঁজির জয়ের ইতিহাস নতুন নতুন দেশে উপনিবেশায়নের ফলে মানুষের পাশাপাশি এখানকার প্রকৃতিকেও তাদের দখলে নিয়ে আসা হয়। প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করে রেললাইনের মতো আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমাণ তখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।[১২]

দীপেশ চক্রবর্তী মনে করেন শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে মানবীয় কার্যকলাপের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ফলে শুধুমাত্র বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেল তা নয় বরং এর প্রভাব পড়ল প্রাণের উপর। একদিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি অন্যদিকে মৎস শিল্পায়নের ফলে গভীর সমুদ্রের বাস্তুসংস্থান ধ্বংস তার গ্যাসীয় ধারণ ও শোষণ ক্ষমতার অবনতি ঘটায়। সমুদ্র জলের এসিডিক মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটি সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের বিনাশ ঘটায়। যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় বলে দীপেশ চক্রবর্তী মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন প্রকৃতির উপর

আধিপত্যের বিষয়টি প্রকৃতির প্রতি সহিংসতার সাথে জড়িত। শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান প্রাণ প্রকৃতির দূষণের সাথে আবদ্ধ।[১৩]

'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস'-এর ৫০ বছর পূর্তি। সুবর্ণ জয়ন্তী বক্তৃতার দীপেশ চক্রবর্তীর বিষয় ছিল 'দ্য প্ল্যানেটারি ফিউচার্স অব দ্য হিউম্যান সায়েন্সেস'। সেখানে তিনি ইতিহাসবোধের নব-আঙ্গিকের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন মানবসমাজ নিয়ে যে ইতিহাসচর্চা এত বছর ধরে হয়ে এসেছে, তার বাইরে বেরিয়ে আরও গভীর ভাবে ভাবার সময় এসেছে। তার মতে গ্রহজাগতিক পরিমণ্ডলের যে ইতিহাস আছে তা উপেক্ষা করলে অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। কারণ মানুষ এ জগতে বসবাস করার অনেক আগে থেকে জীবজগৎ রয়েছে। তার ইতিহাসেও রয়েছে। যা হয়তো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় চর্চা করা হয়। কিন্তু সেই ইতিহাসের সাথে যোগ রয়েছে জনসাধারণের জীবন ও সমাজের। জলবায়ু যেভাবে দিন দিন পরিবর্তন হতে চলেছে তা জীবজগৎ-এর উপর নেতিবাচক প্রবাব ফেলেছে অর্থাৎ তিনি পরিবেশের ইতিহাসের চর্চার আলোকে বস্তু জগৎকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।[১৪]

দীপেশ চক্রবর্তী রচিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'One Planet many Worlds : The Climate Parallex' (২০২৪)। এই বইটিতে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে মানবতা, ইতিহাস এবং মানুষের সময়ের বোধকে চ্যালেঞ্জ করে তার একটি চিন্তা-উদ্দীপক, জটিল আলোচনা প্রদান করে এবং বৌদ্ধিক ইতিহাসের উপর একটি নিয়ন্ত্রণের পূর্বাভাস দেয়। তার এই গ্রন্থে মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষ বনাম অ-মানব সম্পর্কের একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তার মতে জলবায়ু পরিবর্তন মানব জীবনে একটি গভীর বাঁধা। তিনি এই গ্রন্থে দেখান জীবাশ্ম জ্বালানির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে মানব প্রজাতির অস্তিত্ব একটা সময়ে যাওয়ার পর সংকটের মধ্যে পড়তে পারে। অর্থাৎ এই গ্রন্থে দীপেশ চক্রবর্তী পরিবেশ অবনমনের এক নতুন অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন।[১৫]

দীপেশ চক্রবর্তীর 'An Era of Pandemics? What is Planetary about COVID-19' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ২০২০ সালে অক্টোবর মাসে 'Critical Inquiry' প্রকাশিত হয়। তিনি এই গ্রন্থে বলেন গ্রহীয় পরিপেক্ষিত থেকে জীববৈচিত্রের সঙ্গে মনুষ্য সভ্যতার সম্পর্ক ভাবাই নতুন ইতিহাস চর্চার কাজ। তিনি এই প্রবন্ধের দ্বারা নতুন পরিবেশ ইতিহাসচর্চার কথা বলেন। তার মতে প্রথাগত পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ যে সকল বিদ্যার অধ্যয়ন করতে হয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি – এসবের সাথে ভূতত্ত্ব, জেনেটিকস, পরিবেশ, জীববিজ্ঞান, জীব ও প্রাণের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিদ্যাও অধিগত করতে হয়। অর্থাৎ তিনি গ্রহীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও সার্বিক প্রাণের তাৎপর্য অনুধাবন করেন। আবার গ্রহীয় দৃষ্টিকোণ নির্ভর করছে পরিবেশের সঠিক ব্যবহারের ওপর। গ্রহীয় ভারসাম্য বজায় থাকবে যদি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার উপর। অর্থাৎ মানব প্রজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করছে গ্রহীয় ভারসাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর।[১৬]

সামগ্রিক প্রবন্ধটি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে এই দুই বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের লেখনীর দ্বারা পরিবেশ ইতিহাস চর্চার এক নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটেছে যা বর্তমান সময়ে পরিবেশ ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের লেখনীর দ্বারা আরও এগিয়ে চলছে। র‍্যাচেল কারসন কেবল একজন সফল বিতর্কবাদী ছিলেন না, বরং একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ চিন্তাবিদ ছিলেন। সম্প্রতি লিন্ডা লিয়ারের র‍্যাচেল কারসন : উইটনেস ফর নেচার নামে একটি সুনির্দিষ্ট জীবনী প্রকাশের মাধ্যমে, আমরা তার পরিবেশগত দর্শন আরও ভালভাবে বুঝতে পারি, কারণ কারসন সেই দর্শনে জীবনযাপন করেছিলেন এবং এটি সম্পর্কে লিখেছিলেন। বিজ্ঞানী এবং প্রকৃতিবিদ কার্সনের সাথে দেখা প্রকৃতির সাথে বৃহত্তর সম্পর্কে জ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে তার বোধগম্যতা স্পষ্ট করে। মার্কিন মৎস্য ও বন্যপ্রাণী পরিষেবার জীববিজ্ঞানী হিসেবে তার পনের বছরের কর্মজীবন অধ্যয়ন করলে ব্যবহারিক সংরক্ষণ বিষয়গুলির উপর তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। কারসনের ব্যক্তিগত গল্প আমাদের নম্রতা এবং সাহস সম্পর্কে অনেক কিছু শেখায়, কারণ তিনি বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে দুর্দান্ত সাহিত্যিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন, একই সাথে পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রকৃতির প্রতি তার অনেক দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছিলেন। তবুও, কারসনের পরিবেশগত নীতিশাস্ত্রকে সর্বোত্তমভাবে বোঝার জন্য, তার শেষ কাজ, সাইলেন্ট স্প্রিং দিয়ে শুরু করার জায়গা।[১৭]

অপরদিকে দীপেশ চক্রবর্তী বর্তমানে মানবপ্রজাতির নতুন এক যুগে প্রবেশের কথা বলছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন অ্যানথ্রোপোসিন যুগ। প্লাইস্টোসিন ও হলোসিন যুগ পার হয়ে মানবপ্রজাতি এ যুগে প্রবেশ করেছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে ১৯৫০ এর দশক থেকে এ যুগের সূচনা হয়েছে। এ যুগে পরিবেশের উপর মানুষের সবোর্চ্চ প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যানথ্রোপোসিন ধারণাটি পরিবেশের ওপর মানুষের প্রভাবশালী আচরণের প্রতি মনযোগ দিতে সাহায্য করে। যে প্রভাবের ফলে সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবপ্রজাতি এখন গ্রহের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে ধ্বংসাত্মক 'কর্তাসত্তা' হয়ে উঠেছে। মানবকেন্দ্রিকতা প্রযুক্তির একমাত্রিক ব্যবহারকে অনুমোদন প্রদান করে। মানব ইতিহাসের সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিসরে ব্যক্তি শুধুমাত্র তার অধিকার ও মর্যাদার লড়াইয়ে অনবরত সংগ্রাম করে আসছে। সেই সংগ্রামের বুদ্ধিবৃত্তিক দশার একটি ফলাফল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির আবিষ্কার। একই সাথে প্রযুক্তিসমূহের আবিষ্কার হচ্ছে মানব প্রজাতির সৃষ্টিশীল সত্তার বহিঃপ্রকাশ। তবে আমাদের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তথ্য সরবরাহ করা হয় যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোকে উপকৃত করে এবং ক্ষমতায়ন করে। একইসাথে এটি প্রকৃতিকে তার ধ্বংসযজ্ঞের কাজে ব্যবহার করে। মানবকেন্দ্রিক পরিসরে যে রাজনীতির বিকাশ ঘটে তা সার্বিক প্রাণের রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন ছিল না। মানবকেন্দ্রিক রাজনীতির পদ্ধতি এখন বুমেরাং হয়ে মানুষের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ফিরে আসছে। পরিবেশের বিপর্যয় এটিই প্রমাণ করে যে পৃথিবীতে মানবপ্রজাতি কোন চূড়ান্ত সত্তা নয় বরং সীমাবদ্ধ সত্তা। তাই মানবপ্রজাতি ধরিত্রীকেন্দ্রিক রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন হতে হবে যেখানে সকল প্রাণের সমান গুরুত্ব থাকবে। মানবকেন্দ্রিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে মানব প্রজাতিকে প্রযুক্তিকে নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। যে প্রযুক্তি সবসময় মানুষের সাথে প্রকৃতির মিথোজীবী সম্পর্কের সমর্থন বজায় রাখবে।[১৮]

Reference:

১. Warde paul, Robin Libby, Sorlin Sverker, (Nov 30, 2018). The Environment: A History of Idea, Johns Hopkins University Press Baltimore, P. 1-5

২. Worster Donald, (March 2024), History and Ecology: A Latin American Tribute to one of the most influential Environmental Histrorians, Historia Ambiental Latinoamericanay. Caribena. P. 313-337

৩. Mac Donald Marilyn, (1993, A Biography of Rachel Carson, Canadian Women Studies/ les cahiers de la fem. Me. p. 105-110

৪. Carson Rachel, (1951), 'The Sea Around us' oxford University press, P. 39-53

৫. Carson Rachel (1962), Silent Spring Houghton Miffline company, New York, P. 53-63

৬. ibid P. 129-135

৭. ibid p. 245-255

৮. Speger join, (2014), Carson's Silent Spring Bloomsbury publishing, London, New Delhi, New York, P. 159-166

৯. উইকিপিডিয়া, দীপেশ চক্রবর্তী : ভারতীয় বাঙালী ইতিহাস বেত্তা, www.com.wikipedia.org

১০. আনন্দবাজার.com (02, Feb, 2023), যোশীমঠ থেকে সুন্দরবন, সবই এক সুতোয় বাঁধা, ইতিহাসকে নয়া আঙ্গিকে দেখার বার্তা অধ্যাপকের।

১১. Chakrabarty Dipesh, (2021), The Climate of History in a planetary age, Chicago University Press, P. 23-29

১২. চক্রবর্তী দীপেশ, (২০২১), জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান অতিমারি মানুষের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ, লৌকিক প্রকাশন, বাংলাদেশ, পৃ. ৫৪-৬৮

১৩. তদেব, পৃ. ৬৮-৭২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 851 - 858
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. Chakrabarty Dipesh, (Feb 2017), The Future of the Human Sciences in the age of Humans: A note, European Journal of Social Theory, P. 39-43
১৫. Chakrabarty Dipesh, (2024), one Planet many Wordls, The Climate Parallax, Primus Books is an academic Publisher, P. 1-18, P. 19-37
১৬. Chakrabarty Dipesh, (2020) An Era of Pandemics What is Global and what is planetary about covid 19, Critical Enquiry, wordPress.com
১৭. Lear Linda, (1997), 'Rachel Carson: Witness for Nature', Houghton Mifflin, Harcourt, Bofton, New York, 110-128
১৮. Chakrabarty Dipesh, (2018), The Crises of Civilization on: Exploring Global and Planetary Histories, oxford University Press, P. 1-5

OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 859 - 862
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার স্বরূপ : বৈদিক আঙ্গিকে

ড. শম্পা দাস
সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ
সুশীল কর কলেজ, চম্পাহাটী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
Email ID : shampadasju@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Veda, Agriculture, Ancient society, Crops, Food, Tillage, Watering, Agricultural industry and policy.

Abstract
Veda is the fountainhead of Indian wisdom. The Vedic literature upholds a panoramic view of ancient Indian society and culture. It is noteworthy that the Vedic scriptures unequivocally established agriculture as the backbone of ancient India's socioeconomic structure. The Vedic seers shed light upon the various aspects of the ancient Indian agricultural system. Preparing the soil, means and methods of tilling, techniques for watering, and guarding ripened crops— all these significant dimensions have been explained by our venerable ancestors. It is fascinating to observe that they engaged in discussions pertaining to agricultural industries and policy. This article is a humble attempt to provide an initial sketch of these interesting facts, which often bear a striking resemblance to the agricultural practices of modern times.

Discussion

বেদ আর্যজাতির প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন। যেকোনো যুগের সাহিত্যই সেই সময়ের ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য না হলেও অতীত ইতিহাস পুনর্গঠনে সাহিত্যিক উপাদানের ভূমিকা অপরিহার্য। সুতরাং 'বেদ' নামক সুবিশাল সাহিত্যকর্মে তৎকালীন বিভিন্ন চিন্তাধারার নিদর্শন বিধৃত থাকাটাই স্বাভাবিক।

কৃষি ও পশুপালন ছিল বৈদিক সভ্যতার দুই প্রধান ভিত্তি। বৈদিক যুগের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এই দুইয়ের ওপরেই বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। আবার এই দুটি বিষয়ই পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সর্বোপরি নিত্য-নৈমিত্তিক চাহিদার খাতিরেই কৃষিব্যবস্থার ক্রমোন্নতির প্রয়োজন ছিল। কারণ কৃষিজাত শস্যই ছিল প্রধান খাদ্য। আবার তুলা থেকে সুতো তৈরি, বস্ত্রে অলঙ্করণ, পশমের কাজ, ঝুড়ি নির্মাণ, রজ্জু তৈরির মতো বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলিও কৃষিজাত পণ্যনির্ভর ছিল। অতএব অধিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত কৃষিপদ্ধতির। যুগের চাহিদা অলঙ্ঘনীয়। তাই বৈদিক সাহিত্য অনুসন্ধান করলে বৈদিক ভারতের কৃষিপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার একটি সুচারু ও স্পষ্ট রূপরেখা সহজেই চোখে পড়ে।

ঋগ্‌বেদের (৩/৫২/৭) যুগে মানুষের উল্লেখযোগ্য খাদ্য ছিল 'ধানা' (ঘি দ্বারা ভাজা যব), 'অপূপ' (পিষ্টক) এবং 'করম্ভক' (মাখন বা দই দিয়ে মাখা ভাজা যবের চূর্ণ)। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় একেবারে শুরুর দিকে যব-ই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল একমাত্র কৃষিজাত শস্য। ঋগ্‌বেদে বহুবার যবের উল্লেখ থাকলেও কোথাও ধানের উল্লেখ নেই। কিন্তু অথর্ববেদে (৬/১৪০/২) ধানের স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াও যব, মাষ ও তিলের উল্লেখ রয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, আর্যরা যত পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে ততই ধান্যক্ষেত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, সময়ের সাথে সাথে যুগের চাহিদা অনুসারে কৃষিজাত পণ্যের বৈচিত্র্য ক্রমশ বেড়েছে।

কৃষিকার্যের প্রাথমিক ধাপ ভূমিকর্ষণ। কর্ষণের মাধ্যমেই পতিত জমি কৃষিযোগ্য হয়। বৈদিক যুগেও ছিল একই পরম্পরা।[২] জমি কর্ষণ করা হত লাঙ্গল দ্বারা। ঋগ্‌বেদের বহু মন্ত্রে লাঙ্গলের উল্লেখ রয়েছে, যেমন — 'যবং বৃকেণাশ্বিনা...' (১/১১৭/২১)। আবার '...কৃষতু লাঙ্গলম্' (৪/৫৭/৪) ইত্যাদি। উক্ত শাস্ত্রানুসারে লাঙ্গল টানে বলদ যাকে রজ্জু দ্বারা লাঙ্গলের সাথে বাঁধা হয়। বলদযুক্ত লাঙ্গলটি একজন পুরুষ কর্তৃক চালিত হয় যার হাতে থাকে চাবুক এবং সে বলদকে তাড়নার জন্য উঁচুস্বরে হাঁকতে থাকে। 'শুনং নঃ ফালা...' লাঙ্গলে যুক্ত থাকে লোহার ফাল। ঋষি ফালের বন্দনা করে তাকে জমির মাটি গভীর করে কর্ষণের প্রার্থনা জানিয়েছেন। মাটি গভীরভাবে কর্ষিত হলে সূর্যের কিরণ মাটির নিচে অনেক দূর প্রবেশ করতে পারবে। ফলে মাটি অধিকতর উর্বর হবে। মন্ত্রটি অতি সুন্দর—

'অবীচী সুমগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি।।' (ঋগ্‌বেদ, ৪/৫৭/৬)

অতএব ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য আজও অপরিবর্তিত। অর্থাৎ কৃষিজমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিই কর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার বেদের যুগে প্রচলিত কর্ষণ পদ্ধতিটিও কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও ভারতবর্ষের বহু গ্রামেই একই পদ্ধতিতে আজও লাঙ্গল ব্যবহার করেই ভূমি কর্ষিত হয়ে থাকে। অনেক সময় আবার যন্ত্রের দ্বারা ভূমিকর্ষণের পরেও বহুকৃষক কর্ষণের পরিপাটির জন্য বলদে টানা লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করেন। বিশেষ করে জমির আল বরাবর অংশ যন্ত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে অনাকর্ষিত থেকে যায়। তখন ঐ প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতিতেই অনাকর্ষিত অংশ কর্ষিত হয়।

সঠিক ও পরিপাটি কর্ষণের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল জলের জোগান। প্রকৃতপক্ষে কৃষিপদ্ধতির প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ মতো জলের জোগান একান্তভাবে প্রয়োজন। বৈদিক যুগে এর যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়েছিল। বেদের সময়ে জলসেচন অত্যন্ত পরিচিত ও উন্নত পদ্ধতি হিসেবেই বর্তমান ছিল। সেসময় দুই ধরণের জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। একটি হল 'খনিত্রিয়া' অর্থাৎ কৃত্রিম জলসেচ প্রথা। অপরটি হল 'স্বয়ংজা' অর্থাৎ প্রাকৃতিক জলসেচ প্রথা (ঋগ্‌বেদ, ৭/৪৯/২)। এছাড়া ঋগ্‌বেদের ৩/৪৫/৩, ১০/১০১/৩-৭ প্রভৃতি মন্ত্রে জলসেচের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কূপ (ঋগ্‌বেদ, ১০/২৫/৪), পুষ্করিণী (ঋগ্‌বেদ, ১০/১০৭/১০) ইত্যাদি খননের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ করা হত এবং জলাভাবে প্রয়োজনে সেই জল কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হত। চিত্তাকর্ষক বিষয় হল বৈদিকযুগে ভৌমজল উত্তোলনের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঋগ্‌বেদের ১/৮৫/১০ মন্ত্রে বলা হয়েছে - মরুদ্ দেবতাগণ পৃথিবী ভেদ করে 'অবত' (নলকূপ) নামক যন্ত্র বসিয়ে অধোদেশ থেকে জল আনয়ন করেছিলেন। অর্থাৎ প্রাকৃতিক জলের অভাবে খরা দেখা দিলেও কৃষিকার্যের উপযুক্ত জলের যথেষ্ট ব্যবস্থা সেকালে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উক্ত পদ্ধতিগুলি আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কৃষিকার্যে জল সরবরাহের এহেন উন্নত পরিকাঠামো যে সেই সময়ের সুদৃঢ় ও সুপরিকল্পিত কৃষি ব্যবস্থাপনাকেই ইঙ্গিত করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখনও রাজস্থানের মতো শুষ্ক অঞ্চলে কূপে সংরক্ষিত জলের সাহায্যে কৃষিকার্যের উদাহরণ সুপ্রচুর।

বৈদিক যুগে জমি কর্ষণ ও অন্যান্য কৃষিকার্যে বলদ (ঋগ্‌বেদ, ৪/৫৭/৪) এবং ঘোড়া (ঋগ্‌বেদ, ৪/৫৭/১ ও ১০/১০১/৭) ব্যবহৃত হত। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এখনও লাঙ্গল করা, শস্য বহনের কার্যে বলদের ব্যবহার সুপ্রচলিত। যদিও কৃষিকার্যে ঘোড়ার ব্যবহার আর হয় না। তবে ইউরোপে এখনও ঘোড়ার ব্যবহার রয়েছে।

ভূমি কর্ষণ, উপযুক্ত জল সরবরাহের পর আসে ক্ষেত্রে সুপক্ক শস্য রক্ষার পালা। বৈদিক যুগে সেদিকেও ছিল সজাগ দৃষ্টি। ঋগ্‌বেদের ১০/৬৮/১ মন্ত্রে বলা হয়েছে, ক্ষেতের শস্য রক্ষা করবার জন্য ক্ষেতরক্ষক সময়ে সময়ে উচ্চস্বরে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিৎকার করত। দৃষ্টান্তটি আধুনিক সময়ের কাকতাড়ুয়া, টিন পেটানো বা জাল দ্বারা শস্যক্ষেত্র আচ্ছাদনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বৈদিক সাহিত্যে ছত্রে ছত্রে কৃষিকেন্দ্রিক বৃত্তির এবং কৃষিকার্যের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুল প্রশংসা করা হয়েছে। সেই অকুণ্ঠ প্রশংসার দৃষ্টান্তগুলি কৃষির প্রতি বৈদিক সমাজের গভীর ভালোবাসা স্পষ্ট করে। এদের মধ্যে দু-একটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

- যাঁরা কৃষিকার্য করেন তাঁরা শ্রমশীল জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রমনির্ভর কৃষিকার্যের ফলে শরীরে রোগ আক্রমণ করতে পারে না। আর নিঃরোগ শরীরের অধিকারী ব্যক্তির মনে কোনো মলিনতা স্থান পায় না।[২]
- কৃষিপ্রধান জীবনে গোরু, ঘোড়া (অর্থাৎ পশুসম্পদ), ধনসম্পদের কোনো অভাব হয় না।[৩]
- বিখ্যাত অক্ষসূক্তে (ঋগ্‌বেদ, ১০/৩৪) দ্যূতক্রীড়া ও কৃষিকার্যের তুলনামূলক মূল্যায়ন লক্ষ্যণীয়। এই সূক্তে দ্যূতক্রীড়ার নিন্দা ও কৃষিকার্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা ঘোষিত হয়েছে—

'অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিং কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া
তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ।।' (ঋগ্‌বেদ, ১০/৩৪/১৩)

অর্থাৎ পাশা না খেলে কৃষিকাজ করাই শ্রেয়। কৃষিকাজ করলে বহু সম্মান ও বিত্তলাভ হয়। কৃষিকার্যের দ্বারাই গাভী (পশুসম্পদ), জায়া (ভাগ্যশ্রী) লাভ হয়, দ্যূতক্রীড়ায় নয়।

কোনো কোনো মন্ত্রে আবার কৃষির স্তুতিতে সমসাময়িক বিজ্ঞান মনস্কতারও ইঙ্গিত মেলে। যেমন— ঋগ্‌বেদের ৪/৫৭/৫ মন্ত্রে প্রাকৃতিক জল দ্বারা ভূমিসিঞ্চনের প্রার্থনা প্রসঙ্গে সূর্য, মেঘ ও বায়ুর ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে। সূর্যের তাপেই জল বাষ্পীভূত হয়ে দ্যুলোকে যায় এবং মেঘে রূপান্তরিত হয়। বায়ু ঐ মেঘকে কৃষিক্ষেত্রে কর্ষণের উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করে, তার ফলেই বৃষ্টির জলে কৃষিজমি সিক্ত হয়। এই বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুভব করেই বোধ হয় ৪/৫৭/৩ মন্ত্রে জল, সূর্য এবং বায়ুর প্রতি মাধুর্যপূর্ণ আচরণের প্রার্থনা করা হয়েছে; যেহেতু জল শস্যকে সরস ও সুপুষ্ট করে। সূর্যের কিরণেই ক্ষেত্রস্থ শস্য পরিপক্ক হয়। আর বায়ুর দ্বারা (বায়ুতে উপস্থিত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির দ্বারা) কৃষিজমি অধিকতর উর্বর হয়। এককথায়, বৈদিক যুগে কৃষিসম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণা যথেষ্ট উচ্চস্তরের ছিল বলা যায়।

ঋগ্‌বেদের ৪/৫৭/৭ মন্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বযুগোপযোগী বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। মন্ত্রে বলা হয়েছে— কৃষি যেন রাজার নিয়ন্ত্রাধীন হয় এবং রাজার প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারেই বৈশ্যরা যেন কৃষিকার্য করেন। এই দৃষ্টান্তে কি কৃষি ও কৃষকের সহায়ক নীতি প্রণয়নের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে? আধুনিককালে প্রতিটি সভ্য দেশে কৃষক ও কৃষি সম্বন্ধীয় নীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো সুনির্দিষ্ট রয়েছে এবং রাষ্ট্র তার সুফল ভোগ করছে। হয়তো বেদের কালেও তা প্রচলিত ছিল বা তা প্রণয়নের দাবি উঠেছিল। এই উদাহরণটি তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কৃষির গুরুত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আলোচিত দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক ভিত্তি মূলত কৃষির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। বৈদিক মন্ত্রসমূহে কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষভাবে কৃষি ও তৎসম্বন্ধীয় যেসকল তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অমূল্য। টুকরো টুকরো তথ্যগুলিকে সাজিয়ে নিলে বৈদিক কৃষি পদ্ধতির একটি গৌরবময় অধ্যায়ের রূপরেখা সহজেই চোখে পড়ে। নিঃসন্দেহে তৎকালীন কৃষি ব্যবস্থাপনা ছিল যথেষ্ট উন্নত ও গঠনমূলক। অল্প হলেও কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও চিন্তাধারা তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। সময় যত এগিয়েছে ভারতবর্ষের কৃষি নির্ভরতা তত বেড়েছে। কৃষিকার্যে এসেছে আধুনিকতার ঢেউ। বেদ-পরবর্তী সময়ে কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর সাহিত্যও বিস্তারলাভ করেছে। যেমন— 'কৃষিপরাশর', সুরেশ্বরপ্রণীত 'বৃক্ষায়ুর্বেদ', শার্ঙ্গধররচিত 'উপবনবিনোদ', 'কৃষিসংগ্রহ'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 96
Website: https://tirj.org.in, Page No. 859 - 862
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রভৃতি। সবশেষে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কৃষিব্যবস্থার আধুনিক চিন্তাভাবনার অনেক বীজই বেদের যুগেই বপিত হয়েছিল।

Reference:

১. ঋগ্‌বেদ, ১/৩/৭
২. তত্রৈব
৩. তদেব, ৪/৫৭/১

Bibliography:

বসু, যোগিরাজ, বেদের পরিচয়ঃ বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ফার্মা কে.এল.প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭০)
ভট্টাচার্য, পরেশ চন্দ্র, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০০৯ (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫)
বিশ্বাস, দিধিতি, বৈদিক পাঠসঞ্চয়ন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩
Ṛgvedabhāṣyam. Ed. Swami Jagadiswarananda Saraswati. Comment. Pt. Harisharan Siddhantalankar. Vol. I-VII. Hidon City, Rajasthan : Shree Ghudmal Prahladkumar Arya Dharmartha Nyas, 2009
Dutt, Romesh Chunder. A History of Civilization in Ancient India, Based on Sanskrit Literature: Vedic and Epic Ages, Vol. I. Calcutta (Now Kolkata): Thacker, Spink and Co., London: Trübner and Co., 1889

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 863 - 870
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতিবাদী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্থ কুমার ভঞ্জ
গবেষক
রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন ইউনিভার্সিটি
রাঁচি, ঝাড়খন্ড
Email ID : parthakumarbhanjamid@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bengali Literature, Environment, Personality, character, Bibhutibhushan)

Abstract
Bibhutibhushan Bandopadhyay had arrived in Bengali literature with his artistic quality to make simple story extraordinary and it enchanted the reader. He did not say the story to readers rather the showed the story. So the readers are so much enchanted with the mode of his description of story that the can see the image of the story in the mirror of his mind. In the Bengali literature very few writers has given the variety of human characters, Bibhutibhushan is the exception.

Bibhutibhushan Bandopadhyay had his immense love towards nature. So, he had travelled many places surrounded with mountains and jungles in his last 6-7 years of life. He had wrote his experience of his traveling life in his letters to his wife. He had mentioned in his writings many unknown river, dam and fountains. He had described in his writings about small rivers, distance of jungles, classification of trees, many forms of nature not only that he also had described the fear of wild animals, the history of unknown kings and the cultural environment in a great extent. The reason of the effect of nature in the writings of Bibhutibhushan was his childhood and the time of his growing up. In every writing of Bibhutibhushan,the impact of nature is clearing visible. Bengali readers have recognised in new way about 'Boichir jhap', 'Bhata ful', the village path etc. He was overwhelmed by the beauty of nature of the village path when he was living there. His attraction towards nature of the village are expressed in his writings. It will not be wrong to say that he is the child of nature. Every forms and fragrance of his writings are taken from the nature and the lives of human being surrounded by the nature.

Bibhutibhushan as an artist is a great lover. In his total literature nature is not only created as nature but also it become a part of human life. The story of family centric Bengali lives are expressed in a lucid mannar in his novels. A renowned critique had said, "There is a mysterious path joy in the writings of Bibhutibhushan. This way is going towards the heaven from the earth. Bibhutibhushan is an exceptional poet with his wide as well as deep fillings towards human lives. He is a great artist who interlinked joy and sorrows and

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

the insignificant stories of men and women with the nature "1(Bibhutibhushan" Man Silpo, Gopikanath Roychowdhury).

Bibhutibhushan, this feelings towards nature is not happened in one day, it is the result of his lifelong worship towards nature. The young Bibhutibhushan always avoid the presence of human being to become United with the nature. In fact Bibhutibhushan relation with the nature is like the relation with his soul.

Discussion

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুধাব্যাপ্ত লেখক উপন্যাস ছোটগল্প ভ্রমণকাহিনী অতি প্রাকৃত এবং বিচিত্র জগতের সবকিছু সম্বন্ধেই তাঁর কৌতুহল। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর গতিবিধি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা আর ভাগলপুরের জমিদারি কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বন-জঙ্গলের আস্বাদ লাভ - এই স্বল্প পরিসরের কর্মজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্য। তাঁর সাহিত্য একান্তভাবেই গ্রামীক এবং আরণ্যক। বাংলা সাহিত্যেই অবশ্য নাগরিক মনন প্রায় অনুপস্থিত। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ব্যতিক্রম।

আবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তফাৎ ও আছে। শরৎচন্দ্রের গ্রামে খড়ো ঘরের চন্ডীমণ্ডপে আর গ্রামীণ দলাদলিতে পূর্ণ সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সচেতন ভাবে। আর বিভূতিভূষণের গ্রাম আমের বন, জামের বনে নিবিড় কলসীদামে ছাওয়া পুরানো দিঘী আর ইতিহাসের কুহেলীকা মাখানো প্রাচীন প্রাসাদের আশেপাশে আঁশ খেওড়া আর কালকা সুন্দরীর ঝোপে ছাওয়া একচিলতে সরুপ পথ দিয়ে মেঠো খরগোশ আর নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধানে যাত্রা করে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে গ্রাম্য জীবনযাত্রা এক সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা আর বিভূতিভূষণের মধ্যে কাশফুলের দোলন লাগা শরতের দুপুর বেলায় ঘর পালানো একটা কিশোর মনের স্বপ্নাচ্ছন্নতা। এই কিশোরের যে উদ্দামতা তাও আবার বিভূতিভূষণ নেই। তার বিদ্রোহ তার প্রতিবাদ কিছুই নেই। এই কিশোর ও তার কৈশোর দুই'ই একান্তভাবে অন্তলীন।অর্থাৎ বিভূতিভূষণের 'অপু' কোনদিন কোন কারণেই হবে না 'ইন্দ্রনাথ' বিদ্রোহী নবীন বীরের জন্য সাধনা করেননি বিভূতিভূষণ – 'স্থবিরের শাসন নাশন' তার কাজ নয়। তিনি নিমগ্নচেত হলেন, "ছিন্ন বাঁধা পলাতক বালকের" মতো এক সুগভীর আত্মসন্তুষ্টিতে মধ্যাহ্নে, একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে সারাদিন বাঁশির সুরে উন্মনা। জীবনের উপভোক্তা তিনি, জীবনের ব্যাখ্যাতা নন কিছুতেই। তুমি আস্বাদন করেন সবকিছু, বিশ্লেষণ করেন না কোন কিন্তু। তিনি কোকিল প্রেম রূপ আমের মুকুলের মধুপানরত রসজ্ঞ কোকিল, অরসজ্ঞ কাকের মত নিমফলের তিক্ততা তাঁর নয়।

বিভূতিভূষণের রচনা বহুপাঠকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছে। কারণ তার রচনা রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এতে মনস্তত্ত্ব নেই, তথাপি এতে কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি জীবনের তুচ্ছতম উপকরণকে আশ্রয় করে, অতিশয় অনাদৃত, উপেক্ষিত বৈচিত্র্য বর্জিত পল্লী প্রকৃতির পটভূমিকায় সুস্থ প্রাণবান মর্ত্য তীর্থযাত্রীর অন্তরকাহিনী উদঘাটিত হয়েছে। কোনখানে কোথাও নেই ভাব বস্তু বা কল্পনার অসামান্যতা, মনে হয় যেন অনন্ত তমিশ্রাগর্ভ থেকে বার হয়ে চিরাভ্যস্ত অতি পুরাতন সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখছি-যে আলোকে পৃথিবী ধূলিকণাটি পর্যন্ত সম্ভ্রম উদ্রেক করে। যেখানে যে কেহ আছে সেখানেই তার চোখে তৃণলতা গুল্ম পর্যন্ত একটি অনর্ঘ প্রিতির মূল্যে মূল্যবান অর্থাৎ সমস্ত চরাচর যেন মূল্যবান বা মধুময় হয়ে ওঠে। এই যে উপন্যাস তার নায়ক তার চিরসহচর শিশু হৃদয়কে, তার সেই ক্ষুদ্র জীবন লীলাকে কেন্দ্র করে সুখ-দুঃখ, ভাব-অভাবের ছন্দে বিপুলকালের পরিধি আবর্তিত হতে থাকে। সর্বকালের, সর্ব দেশের, সর্বজীবের যে জীবন রহস্য তারই বিরাট ছায়ায় চিরসদ্যজাত মানবপ্রাণ অমৃত পিপাসায় অধীর। জীবনের সকল তুচ্ছতার অন্তরালে নৃত্যোন্মত্ত মহাকালের সেই ব্যোমবিশ্রান্ত জটাজাল দেখে সেই তুচ্ছতাকেও যেন প্রণাম জানাতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যুর এপার থেকে মৃত্যুর ওপারে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে এ প্রানের কাহিনী যেন বয়েই চলে-শেষ হতে চায় না। দারিদ্র্যের প্রেরণে এই জীবন চেতনা গভীর হয়, সেই ক্ষমতার তন্তুগুলি দৃঢ় হয়ে ওঠে; অতিরিক্ত কামনার আবেগি কল্পনা দিগন্ত লঙ্ঘন করে, ক্ষুদ্রপল্লীর ক্ষুদ্র ভুসীমার মধ্যেই ভূমন্ডলের আভাস জাগে-সাগর মেঘলা কানন কুন্ডলা পৃথিবীর স্বপ্ন অধীর করে তোলে, যা কিছু ক্ষুদ্র, যা কিছু গ্লানিকর, যা কিছু যুক্তির অন্তরায়, তাই অতি সরল মানবাত্মার আনন্দ চৈতন্য প্রবুদ্ধ করে। মনে হয় মানুষ যেন ললাটে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অমর আত্মার রাজটিকা ধারণ করে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। সংসার সেই রাজঅতিথির সেবায় আপনার খুদকুঁড়া নিবেদন করি ধন্য হতে চায়। তারই অমৃত ভিক্ষার আকিঞ্চনে বিশ্ব তার বিপুল বৈভব, উদঘাটিত করতে বাধ্য হয়। মনে হয় এ জীবন এইটিই যুগ যুগান্তরের শাশ্বত সত্য-মানুষ ছোট নয়, জীবন তুচ্ছ নয় কালের পারাপারে যে অগণিত মন্বন্তর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে, তার মুখে সে অনন্ত বিস্তার ভূমি সৈকতে, আমার সুখ-দুঃখের শঙ্খ-শুক্তির যেন হিসাব নাই, তেমনি তাদের যে বর্ণগরিমাও ব্যর্থ নয়।

সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে তা আছে। চরিত্র সৃষ্টি বা ঘটনা বিবৃতি রচনার রস বৈশিষ্ট্য নয়। দুটির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা আধুনিককালের অতি সজ্ঞান নরনারীর বিষম মানস বিষের ব্যাখ্যা এতে নেই। মানুষ যে দৃষ্টি হারিয়েছে-সেই চির তরুণ, গাড়ো-নীল চক্ষু তারকার অনাবিল দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তিনি তার জীবনকে গভীরভাবে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন; কোন তত্ত্ব নেই, কোন সমস্যাও নেই-সুখের উন্মাদনাও নেই, দুঃখের হাওয়া কারণে, আছে কেবল ডাগর দুটি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দিয়ে এই জীবন দেবতার দিপারতি। তথাপি এই দৃষ্টির অন্তরালে এত বিশেষ কল্পনা, বিশেষ ভাবনাভঙ্গি আছে; কিন্তু সেটাও তত্ত্ব নয়, সমস্যার ইঙ্গিত নয়। সে একটা মনোভাব-জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নয় একটা নতুন ধরনের চেতনা যেন পাঠকের মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করে। এই উপন্যাস রচনার প্রেরণায় কোন বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি পক্ষপাত নেই সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি ধারনাটিকে অনুভূতির গোসল করতে চেয়েছেন – ‘Vastness of Space and Passing Time’ -এই বিপুল রহস্যের অনুধ্যান জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি।

আধুনিককালে কাব্য ব্যক্তিত্বের চাইতে উপন্যাসিক ব্যক্তিত্বকে চিনে নেওয়া সহজ। কারণ এই যুগের ‘ইমেজিজম’ ও প্রতীকিকতার অঙ্গরাগে সাম্প্রতিক কবিতার অন্তর বহিরঙ্গে এমন একটা সাধারন ধর্মিতা এসেছে যা থেকে স্বভাবতই কোন কোভিদ একাত্মতা বেছে নেওয়া কঠিন-যদি না সেই কবি কোন বিশিষ্ট দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত থাকেন। এদের প্রধান অংশের মতটা যতটা গোস্টিক ততটা ব্যক্তিক নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্বের মূল্য অনস্বীকার্য। অবশ্য শিল্প বা ব্যক্তিত্বে জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং ইয়েটস এর সহধর্মিতা আছে, রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস এক নয়। বুদ্ধদেব বসু আর অজিত দত্তের গোত্র এক হলেও রচনা পদ্ধতিতে ও চিত্রকল্পে তাদের স্বাধীনতা প্রমাণের অপেক্ষায় রাখে না। জীবন দর্শন এক হলেও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য উপলব দীর্ঘভিলতা ও ব্যক্তির তারতম্য সাংস্কৃতিকতা এবং চিত্রকর্মের নিজস্বতা - এগুলি কবির চরিত্র আর এই চারিত্রিকতার অভাব হলে কবি অনুচ্ছেদ হতে পারেন, পরিচ্ছেদ নয়।

কবিতা, ছবি ও গান-শিল্প হিসাবে এরা যতটা আত্মলিন ও ভাবকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে তা নয়। এমনকি নাটকেও এ যুগে যতটা বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়িতা চোখে পড়ে - একালের মানের রচনায় যার উৎকট লক্ষণীয়-উপন্যাসে তা সম্ভব নয়। উপন্যাস রূপক হতে পারে কিন্তু সাংকেতিক হওয়া সহজ নয়। তার কারণ বোধহয় এই যে আর্ট হিসেবে উপন্যাস সবচেয়ে আটপৌরে। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হল তার সর্বজনীনতা, উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব সোচ্চার।

ছবি কবিতা এবং গান এমনকি নাটক স্বস্থানে স্বমহিম। এদের প্রয়োজনের রূপ যতখানি প্রসাধনের রূপ তার চাইতেও বেশি। উপন্যাস পথের মানুষ কাছের লোক দিনযাত্রায় সম্পর্কিত। একান্ত প্রতিভা দৈন্যের যুগেও যেকোনো অন্য শিল্পের চাইতে উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব সুনির্দিষ্ট। আর এই জন্যই বিভূতিভূষণকে আমরা খুবই স্পষ্ট করেই চিনি। আমরা জানি তিনি শরৎচন্দ্র নন, শৈলজানন্দ নন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্করও নন। শুধু দেখতে পার্থক্যই নয়, বিভূতিভূষণ এর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের কথা ছেড়ে দিলেও তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এতই অসাধারণ, যে সে দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের খুব কম উপন্যাসিকেই তার সমপর্যায়ী।

যে কালে বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাব সেটা সোজাসুজি প্রশ্নের যুগ। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, কল্লোলের দহন, নদীদিপ্তীতে যুগমানস উত্তেজিত ও উত্তপ্ত। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নৈরাশ্য এবং ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীর্যক আক্রমণ, রাঢ়ের দগ্ধ তৃণপ্রান্তর থেকে তারাশঙ্করের রুঢ় রুক্ষ পদক্ষেপ, অসহযোগ আন্দোলন এবং তার অন্তরালে বিপ্লববাদের আগ্নেয় ফল্গু, এককথায় বাঙালির মন এবং বাংলা সাহিত্যে তখন অঙ্গার শয্যা। এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কোন সুমহান নাগরিক সাহিত্যও গড়ে ওঠেনি। পারম্পর্যহীন খন্ড ছিন্ন ছিন্ন নাগরিক জীবনের টুকরোগুলো

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তখন অসংখ্য ছোটগল্পে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছেন। লক্ষণই হচ্ছে তখন একমাত্র বিভূতিভূষণ ছাড়া স্মরণীয় উপন্যাস কেউ লিখতে পারেননি। পূর্ণ সংশয়ের শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নের' কালে বিভূতিভূষণই একমাত্র সিদ্ধ উপন্যাসিক। যাঁর উপন্যাস পড়ে -

> "আমরা জ্বালা ভুলে গেলাম, তিক্ততা ভুলে গেলাম ও অভিযোগও ভুলে গেলাম। মনে হল, 'এখনো অনেক রয়েছে বাকি'। শহরের জীবন যখন নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান - তখন এই বাংলাদেশেরই গ্রামপ্রান্তে একটা 'সব পেয়েছের জগৎ আছে'। সেখানে দারিদ্র, দুঃখ, বেদনা, শোক সবই আছে। কিন্তু। তাদের সমস্ত কিছুতেই এমন একটি মধুমাখা প্রশান্তি বিকীর্ণ রয়েছে যে তার আশ্রয়ে এখনও নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হয়ে থাকা যেতে পারে।"[২]

নিশ্চিন্দিপুরের ছায়া নিবিড় জীবন পরিবেশ থেকে বিভূতিভূষণ নিয়ে এলেন পথের পাঁচালী তাদের বাঙালি পাঠক ভালোভাবেই তা গ্রহণ করলেন। যেন অঙ্গার শয্যার ওপর শীতল পদ্মপাতা বিছিয়ে দিলেন তিনি - পদ্ম দীঘির মিষ্টি জল নিয়ে এলেন তৃষ্ণার্তের জন্য। তাঁর ছোটগল্প 'জলসত্র' তার শিল্প চিন্তারই প্রতীক। যারা পল্লীকৈশোরের সহজ স্বপ্নে ভরা দিনগুলিকে পিছনে ফেলে এসেছে তারা তার কাছে নতুন করে তা ফিরে পেল, যাদের কাছে সে জীবন কখনো ছিল না - তারাগুলো এর আশ্চর্য জগতের সন্ধান। বাস্তব জল-মাটি-আকাশ-অরণ্যের পটভূমিতে আশ্রয় করে গড়ে উঠল এক রূপকথার পূর্ণসঙ্গী। 'পথের পাঁচালী'-তে বিভূতিভূষণ রূপকথাই শোনালেন। বিভূতিভূষণের অপু শহরে এলো, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চিন্দিপুরের ছেলেটি স্বতন্ত্র ভোলেনি, ভোলেনি অস্তিত্ব। নাগরিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে মুখোমুখি হয়েছে। বিচিত্র মানুষকে দেখেছে কিন্তু তারা কেউই তার শৈশব চরিত্রকে একান্ত ভাবে প্রভাবিত করেনি। ঘর ছাড়া বহিঃপ্রকৃতির আহ্বান নিজের ভিতর থেকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার উত্তর পুরুষের মধ্যে। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে এমন অভিন্নতা খুব বেশি চোখে পড়ে না। অপু বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি।

যেকোনো উপন্যাসিকেরই জীবন দর্শন থাকে। বিভূতিভূষণের দর্শন ঐতিহ্যকে অতিক্রম করেনি। তিনি তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কোন নিজস্ব দীপ্তিতে দীপ্যমান নন। খুব সহজেই চোখে পড়বে যাকে নতুন কথা বলা যায় বিভূতিভূষণের মধ্যে তা নেই; কোন নূতন সত্যের দিকে তিনি অভিযান করেননি। তাঁর রচনায় যুগ সচেতন সাহিত্যিকের প্রশ্নচিহ্ন লক্ষণীয় ভাবে অনুপস্থিত। ঝড়ের যুগে বিভূতিভূষণের প্রশান্তি ঈর্ষণীয়। তাঁর কোন রচনায় সামাজিক প্রশ্নের 'অথৈ জল' যে আভাসিত হয়ে ওঠেনি তা নয়; কিন্তু সমগ্রভাবে বিভূতিভূষণ নির্মোহ। চারিদিকে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মাঝে তিনি দ্বীপবাসী। এই আত্মতৃপ্তি হয়তো ভালো নয় কিন্তু এই আত্মতৃপ্তিই বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা সামগ্রিকতা এনে দিয়েছে। তার উপন্যাসকে দিয়েছে একটা নিটোল পরিপূর্ণতা।

বিভূতিভূষণের বিশেষত্বই হল তার বিশ্বাস প্রবণতা। এই জন্যই তাঁর রচনায় প্রশ্ন নেই। বাংলার গ্রাম এবং বাঙালি পরিবারের ছোট সুখ, ছোট ব্যথা, ছোট আশা, আকাঙ্ক্ষার কারুণ্যে তাঁর বহু চিত্র অশ্রুস্নিগ্ধ কিন্তু দেশকালের সঙ্গে ব্যক্তি মননের সংঘাতে তাঁর নানামুখী আত্মদ্বন্দ্বে যে গভীর ব্যাপ্ত ট্রাজেডি বিকশিত হয়, সেই ট্রাজেডির প্রচণ্ডতা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। এমন যে অনুবর্তন সেখানেও শিক্ষক জীবনে রূপটি মাত্র কারুণ্য ঘন - তা থেকে সমাজের লাঞ্ছিত এই সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার উৎপিরনের কোন ক্ষুদ্র প্রতিবাদ জাগে না - জাগে একটা শান্ত সহানুভূতি।

যে জীবন দৈবায়ত্ত সেখানে অশ্রুমোচন করা যায়, প্রতিবাদ করা চলে না। বিভূতিভূষণও প্রতিবাদ তোলেননি। তিনি বৈষ্ণবদের মত সমর্পিত প্রাণ। আত্মসমর্পণের মধ্যে যে প্রশান্ত আনন্দ আছে তারা আকর্ষণ নেহাত কম নয়। যে তন্ময়তার মধ্যে বিভূতিভূষণ নিবিষ্টচিত্ত তা আমাদের প্রলুব্ধ করে তোলে। ব্যক্তি জীবনেও বিভূতিভূষণের বাসা ছিল বনগ্রামের একটি পল্লী অঞ্চল, আর সাধন ক্ষেত্র ছিল ঘাটশিলার পাহাড়ে জঙ্গলে। প্রত্যক্ষ জীবনের মাঝ খানে বাস করে তার সংঘাত, তার জিজ্ঞাসাগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত 'আরণ্যক'ই তার বঞ্চিত মুক্তি,আর 'কুশল পাহাড়ি'র তীর্থযাত্রায় তাঁর বিস্তীর্ণপক্ষ স্বাচ্ছন্দ।

ধর্মের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ লোকো সংসারের অনুগামী। তিনি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেছেন - তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পগুলি সেই বিশ্বাসসিদ্ধ; 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তার কাছে সহজ স্বাভাবিক – 'দেবযান' নাকি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল। প্রকৃতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সম্পর্কে আস্বাদ্যমানতা ছাড়াও ধর্ম সংস্কারের প্রতি এই অনুরাগ এবং অর্ধস্ফুট অতীতের প্রতি একটা বিমুগ্ধ আকর্ষণ বিভূতিভূষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষ যে মুহূর্তেই বাস্তবাতীত কোন নির্ভরযোগ্য শক্তির আশ্রয় পায় সেই মুহূর্তেই নিজের ভার নিজের উপর চাপিয়ে দিতে চায়; তখন তার ভূমিকায় আর প্রশ্ন করতে থাকে না, থাকে একটা কৌতুহলী মন - যে বিহর বি মুগ্ধ চিত্তে সবকিছু দেখতে চায়, সত্যি কোন বুদ্ধির আলোকে বিচার করতে চায় না।

এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত বিভূতিভূষণ নিজেকে নিয়ে গেছেন অরণ্যে - To the wild wood and the plains! তার অরন্যবিলাসী মন, নিত্য কালীন আদিম প্রকৃতির প্রাণক্ষেত্র একটা অপূর্ব পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁর প্রকৃতি পিপাসা আকণ্ঠ তৃপ্তি লাভ করেছে-বনপ্রান্তে দুচোখ তিনি ভরে নিয়েছেন। অরণ্যের নিধন তার মনে জাগিয়েছে ইংরেজ কবি 'William Cowper' সেই বেদনা -

"The Poplar are filled farewell to
the Shade
And the whispering sound of the
Lone Colonade."[৩]

এখানকার মানুষগুলোকে তুমি দেখেছেন প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে, যারা বনের ফুলের মতো সহজ ভাবে ফোটে-সহজভাবেই ঝরে যায়-বনের একটা পাখি, একটা প্রাণীর মতোই মানুষের জীবন ও এখানে সমাজের শক্তিতে চালিত হয় না- তাকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বাভাবিকতা। শুধু এটুকুই সব নয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে কটি জিনিস আদিম দিনের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা হলো আকাশ-সমুদ্র-নক্ষত্র এবং অরণ্য। ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে আকাশের আবহ তো আছেই-সে সর্বময়; সমুদ্র সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মনোভাব জানা যায় না-বোধ হয় সমুদ্রের মধ্যে দেবতার চাইতেও দানবিক শক্তিকেই তিনি বেশি করে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, -

"The gentelness of heaven Broods O'er the sea."[৪]

ওয়াডসওয়ার্থের এ দৃষ্টি তার নেই। কিন্তু পাহাড় ও জঙ্গল সম্পর্কে নিবিড় প্রীতি আর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিপুলভাবে উৎসারিত।

তাই বিভূতিভূষণ এমনভাবে অরণ্যচারী তাঁর প্রথম জীবন প্রকৃতির যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিল বাংলার পল্লীছায়া সুনিবিড় পথে ঘাটে, সেই প্রকৃতির পূর্ণতর আধ্যাত্মিক রূপটিকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য উত্তরকালে তিনি অরণ্যে এসে পৌঁচেছেন। অরণ্যের অকৃত্রিম আদিমতায় বিশ্ব নিহিত শক্তির সঙ্গে তার সর্বাঙ্গিত মিলন সাধিত হয়েছে। লৌকিক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, প্রয়াসহীন আত্মসমাহীতি - এরা সকলেই সেই সম্পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়ার একটা উপায়ন মাত্র।

আলোচনা থেকে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণ মমত্বহীন। বরং বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের এত বিচিত্র পরিচয় খুব বেশি লেখক দিতে পারেননি এবং তাদের সুখ-দুঃখ আশা ও অভীপ্সার কেউই তাঁর মত করে বলতে পারেনি। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অজস্র অশ্রুবিন্দুতে তার সাহিত্যের বিকীর্ণ। কিন্তু এই সহানুভূতি সেই মানুষের-যিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই হয় একে স্বীকার করো। তারাশঙ্করের পুরুস্কারের প্রেক্ষাভূমিতে অনেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবন দৃষ্টির সামনে এই ভূমিকাটি কৌতূহলোদ্দীপক।

আর, এই কারণেই 'অপু' নামক বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বটি ছাড়া - তাঁর এতগুলি রচনায় কোন বিশেষ মহান চরিত্র পাওয়া যায় না। জীবনে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর অনেক চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্যতা হয়তো এনেছে, কিন্তু স্মরণীয়তা আনেনি। 'স্টাইপ' চরিত্র অনেক আছে-তারা পর্যবেক্ষণজাত সৃষ্ট নয়। এই স্বাভাবিক যুগ এবং সমাজের বিরোধকে যিনি পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন তার কাছে সংক্ষুব্ধকালের কোন প্রবন্ধই জটিল কালসত্তাকে দাবি করলে সেটা অবিচার হয়েই দাঁড়ায়।

আর স্বাভাবিকতার এই রাজ্যটিতে পৌঁছে যাওয়াই বিভূতিভূষণ স্টাইল। এত সহজ ভাষা এবং শিল্পবোধ হয়তো বাংলা সাহিত্যে আর কারোরই নেই। স্টাইল আদর্শ নয় কিন্তু এর মধ্যে বিভূতিভূষণ ব্যক্তিত্ব আরো পরিষ্কারভাবে ধরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিয়েছে। সহজ গুনই এই স্টাইলের বিশেষত্ব আর এ কথা কে না জানে সবচাইতে সহজ করে বলতে পারাটাই সবচেয়ে কঠিন।

বিভূতিভূষণের সমগ্র উপন্যাসের কালোগত বিস্তার ও সামান্য নয়। সমালোচক সৌরেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, -

> "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কালগত বিস্তার বিদ্যমান।"[৫]

তোরে তুলনামূলকভাবে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা', 'ইচ্ছামতী' ও 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের কালগত পটভূমি যতটা স্পষ্ট অন্যান্য উপন্যাস ততটা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং পরিচিত চার পাশে চেনা মানুষের ছবি উপকরণ উপন্যাসের স্থান পেয়েছে।

সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে সারা জীবন স্কুলমাস্টারি করে বিভূতিভূষণ বাংলা উপন্যাসে যে অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করেছেন তা ভাবলেই অবাক হতে হয়। শিশুর মতো কৌতুহল এবং কবির মতো কল্পনার প্রলেপ দিয়ে বিভূতিভূষণ অননুকরণীয় ভাষায় এমন গ্রামীণ জীবনের চিত্র এঁকেছেন যে চিত্র হিসেবে তা অনবদ্য এবং অন অতিক্রমনীয়। দুঃখ-দারিদ্রের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু সেই ছবি কোন সমাজ বা অর্থনীতি ঘটিত প্রকট প্রশ্ন উত্থাপন করে না। কিছু কিছু প্রেমের চিত্রও এঁকেছেন কিন্তু তাতে রোমান্টিক বৈচিত্র্য ও উত্তপ্ত কামরার চেয়ে স্নিগ্ধ মধুর শান্ত ও গার্হস্থ্য রূপটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধা পদ অবলম্বন করেননি। একটা বালক চিত্ত কিভাবে রূপকথার রূপলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল এই কাহিনী তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ বিশাল অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রহস্যময় যোগাযোগের নিবিড় অনুভূতি বিভূতিভূষণের এক প্রকার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। রহস্যময় তা অপূর্ব সৌন্দর্যালোকে সৃষ্টি করেছেন আর 'আরন্যক'কে। যেখানে মানুষ খুঁজে পাবে তার আসল গন্তব্য এবং সত্যিকারের আশ্রয়ের ঠিকানা। কারণ মানুষ প্রকৃতি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। প্রকৃতিই তার আসল সঙ্গী। জল যেমন যেতে চায় জলের কাছে তেমনি মানুষও যেতে চায় প্রকৃতির মাঝে। সেখানেই নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় সে। প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে এভাবেই তো গড়ে উঠেছে আদিম প্রেম এবং যৌথ জীবনের সংসার আরণ্য উপন্যাসে মানুষ আর প্রকৃতির নিজস্ব নিঃসঙ্গতার এক অপরূপ রুপ ফুটে উঠেছে।

মানুষের মতোই প্রকৃতি ও রহস্যময় এবং বৈচিত্র্যময়। এই রহস্যময়ী মানুষ ও প্রকৃতিকে পৃথক স্বাধীন মাত্র এনে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। প্রকৃতি সম্পর্কে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তার একান্ত নিজস্ব মৌলিকতা। বিভূতিভূষণের কাছে কোন নীতি, তত্ত্ব বা মূল্যবোধের কোন বিচ্ছিন্ন অর্থ ছিল না, যদি না সেসব নীতি তত্ত্ব বা মূল্যবোধের রক্ষণশীলতা বিভূতিভূষণ সমর্থন করেননি। তিনি শ্রেণীবিদ্বেষও নন কিংবা ব্যক্তিগতভাবে ও কাউকে ঘৃণা করেননি তিনি নিজে বলেছেন, -

> "সাহিত্য আমাদের কল্পনা অনুভবৃত্তিকা উজ্জীবিত করে।"[৬]

বিভূতিভূষণের প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর লেখায় লিখেছেন, -

> "এমন প্রকৃতি পাগল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। প্রকৃতিকে চোখে না দেখে ভালো না লাগে কার? কিন্তু তাকে ভালোবেসে তার গভীরে অবগাহন করা অন্য জিনিস।"[৭]

প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে যে রোমান্সের রস ও রূপকথার রস এবং ইন্দ্রিয়াদীতে উপলব্ধির রহস্যময় ব্যঞ্জনা রয়েছে বিভূতিভূষণ তার প্রতি তর্জনী তুলেছেন। ড্রয়িং রুমের কৃত্রিমতা, অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাব সমাজ ও নীতিঘটিত কোন প্রখর প্রশ্ন বিভূতিভূষণকে বিচলিত করেনি, চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সেই মানসিক সংঘাত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিবর্তন এসব চিরাচরিত উপন্যাসিক কৌশলও তাকে আকৃষ্ট করেনি তিনি রূপকথাপ্রিয় কৌতুহলী শিশুর দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন।

আর সাহিত্য বিচারে এই কঠিন কথাটার উত্তরই হোক জীবন জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর। জীবন জিজ্ঞাসা যদি একও হয়, উত্তর হয় না কিছুতেই এক। কারণ জীবন তো পাটিগণিত নয়, যে প্রশ্নমালার শেষে উত্তর মালা অবধারিতভাবে থাকবেই। জীবনে তা নয়, হয় না কখনও। জিজ্ঞাসা যত জটিল, যত গভীর, জবাবও তত জটিল ও গভীর, বোধহয় তত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুগভীর। এসো গভীর জীবন পর্বই হল সাহিত্য বিচারে প্রথম ও প্রধান কথা। তাতে যদি এমনও বোধ হয় যে বোধটা শিল্পসম্মত নয় তবুও সেটা হয় জীবন সংগত। যাই হোক না কেন জীবনসম্মত বলে তা গভীর হবেই।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে উপন্যাস সৃষ্টি রোমান্টিকদের জন্মগত অধিকার নয়। সেখানে জীবন নিষ্ঠা, জীবন বোধ প্রভৃতির প্রধান প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যত বড় প্রতিভাই হোন না কেন এরা তিনজনই জাত উপন্যাসিক ছিলেন কিনা সন্দেহ। বৃহৎভাবনা তাঁদের ছিল, জীবনকে তাঁরা বৃহৎ করতে পেরেছেন সেই ভাবনার অনুরূপে তাঁদের লেখা ও প্রতিভার দানে বাংলা উপন্যাস সাহিত্য হয়েছে পুষ্ট, কিন্তু তা জীবনধর্মী কতটা তার ভার সমালোচক তথা বোদ্ধাদের। এই দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রধান বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক এই তিনজনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান উপন্যাসিক।

কাল হিসেবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক উপন্যাসের সূচনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অন্যতম প্রধান ও প্রথম উপন্যাসিক। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। তার জের 'অপরাজিত' আরণ্যক প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য আলোচনার বাধা সড়কে এই আলোচনা নয়, একথা বলাই বাহুল্য।

পথের পাঁচালির মূল সুর আছে। এই সুর ওয়ার্ডসওয়ার্থীয়। সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি যে, এই শুরুটাই হলো নতুন। "Short and simple annals of the poor"[৮] - বলেই যে তা নতুন তা নয়। আর 'পথের পাঁচালী' অবশ্য 'poor' দের কাহিনী নয়, এ হল গ্রামের ভদ্রলোকদের কথা, তবে তারা বিত্তহীন। এঁদের কথাই বলেছেন লেখক, সেই সঙ্গে বলেছেন পথের কথা। যে পথ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় 'অপু'-এর নায়ক। পথের পাঁচালির ওয়ার্ডসওয়ার্থিয় ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতি বোধ। এই প্রকৃতিবোধ পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুবর্জিত হলেও বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন। নর-নারীর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর নর হচ্ছে প্রায়ই শিশু বা শিশু তুল্য সরল। তাঁর নারী 'বালিকা' বিশেষ করে মাতৃজাতীয়া।

আরন্যক উপন্যাসেও তাই। এর পরিকল্পনায় অভিনবত্ব বিস্ময়কর। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। মানুষ ততোটা নয়, যতোটা জনহীন বিশাল অরণ্য প্রান্তরের জ্যোৎস্নারাত্রি তাঁকে বা তার কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। তমসাময়ী বা জ্যোৎস্না ভারাক্রান্ত নিশীথিনী এক গভীর অনুভূতির কসমিক ইমাজিনেশন (Cosmic imagination)-কে সঞ্চালিত করেছে। পথের পাঁচালি, অপরাজিত, দৃষ্টি প্রদীপ এবং বিশ্বাস হবে আরণ্যক কে Prelude এর সমগোত্রীয় করেছে। তাই যদিও অপুর মত জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চিত্রিত চরিত্র বাংলা উপন্যাসে আর দ্বিতীয় নাই তবুও একে ঠিক আধুনিক বলা যায় না। এই বেশ কিছুটা রোমান্সধর্মী এবং রোমান্স প্রধান উপন্যাসের উপন্যাসিক হিসাবে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। লেখক এর প্রচন্ড শক্তি, প্রাচীন যুগের জীবন্ত ব্যঞ্জনা সমর্থিত প্রকৃতি বর্ণনা-এ পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয়। এ যেন জীবন ও মরণের ঐতিহাসিক সীমানায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের পথের অনুসরণে চুপি চুপি কথা বলা। অপু তাই অত্যন্ত জীবন্ত কিন্তু তখনো মধ্যবিত্ত সংসারের গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারেনি। তাই বিভূতিভূষণ দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন 'কল্লোল', 'কালি কলম' ও 'প্রগতি'র লেখকদের প্রভাবের বাইরে। এইটিই ছিল তাঁর ইংরেজি থেকে সাহস পাওয়া নয়, তাঁর অন্তরের ধর্মের থেকে সাহস সঞ্চয় করে লিখেছিলেন তিনি।

তাই কৃত্রিমতা ও Continental -তায় আকৃষ্ট না হয়েও বিভূতিভূষণের লেখায় ধরা পড়েছে বাংলাদেশ প্রধানত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকদের বাংলাদেশ। সমাজ বিকৃতি ও পাত্র পাত্রীর মানস বিকৃতির কোন চিহ্ন নেই। তাঁর চোখে প্রকৃতি হল স্নিগ্ধ মায়াময়, চরিত্রগুলোও তাই। তাই বিভূতিভূষণের মানুষ ও প্রকৃতির বর্ণনায় অনন্য অসাধারণ। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, 'বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প'
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বিভূতিভূষণের শিল্পী সত্তা, রচনাবলী সপ্ত খন্ড, ১৩৯০, পৃ. ২৫৬
৩. Cowper, William, 'The Poplar field'

8. Wordsworth, William, ‘It is a Beauteous Evining,calm and free’
৫. বিশ্বাস, সৌরেন, বিভূতিভূষণের উপন্যাসের শতবর্ষে বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’
৭. রায়, অন্নদাশঙ্কর, বিভূতি রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ডে, ‘বিভূতিভূষণকে যেমন দেখেছি শিরোনামে’
৮. Gray's, Thomas, ‘Elegy written in a country Churchyard’.

Bibliography:

ঘোষ, ডক্টর তারকনাথ, ‘জীবনের পাঁচালী কার বিভূতিভূষণ’, আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫-৩০
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অসিত কুমার, ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’, একাদশ সংস্করণ, হালদার, গোপাল, ‘পরিচয় বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ’, ১৩৫৭, অগ্রহায়ন
মল্লিক, রমেন্দ্রনাথ, ‘বিভূতি সাহিত্য পরিক্রমা’
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, ‘বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’
রায়, কালিপদ, ‘বিভূতি বীথিকা’
ঘোষ, বারিদবরণ, ‘বিভূতিস্মৃতি’

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 871 - 876
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ

সুমন্ত রবিদাস
Email ID : sumantadas49918@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ram, Ramayana, Sita, Lakshmana, Panchavati, Surpanakha, Valmiki, Rabindranath, Bankimchandra.

Abstract
The entire Ramayana revolves around the life of Rama. Where we see Rama as an honest, idealistic, religious man. After composing the mantras and worship methods of the gods and goddesses in the Vedic age, the Ramayana was originally revealed to show who we should see as an ideal in our lives, whose ideal we should follow in our lives. Because if there is no ideal in our lives, then there will be chaos in society. This Ramayana and the character of Rama have been presented to solve that problem and move forward on the right path in life; so that we can adopt his ideals in life. Rama stood at that time and made friends with the Chandals, freed Ahalya from the curse, etc. His caste, religion, caste neutrality and altruistic mentality are identified in the events like this, about 2500-2600 years ago. Again, he left the happiness of the kingdom and went to the forest to keep his father's word. Here, in contrast to Rama, Ravana is shown to do everything for his own happiness. He falls to his death due to greed and arrogance, without listening to anyone, even his mother and brother. Rama is an ideal character of love. But despite loving his wife, Rama could not stand by her side in the end only because of society. There will be many obstacles and dangers in our life as well, just like there were in Rama's life; still we have to accept Rama's ideal and move forward on the right path. This is basically what Rama is for and this is what Ramayana is for. So that we can follow the right path with Rama's ideal by looking at the events of Ramayana. Even then, we see the same effort in Gautam Buddha and Sri Chaitanya Dev.

Discussion

আমরা যদি রামায়ণের আদি-মধ্য-অন্ত্য সর্বত্র দেখি তবে দেখতে পাবো সর্বত্রই রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সমস্ত ঘটনাগুলি রামকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। অর্থাৎ রামায়ণের রামই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। এর থেকে আমরা বলতে পারি রামের গুনাবলী তুলে ধরাই কবির লক্ষ্য। আর এই রামের চরিত্র এবং তার গুণাবলী গুলি যেন আমরা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং রামের মতন সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সঠিক জীবন লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি, এইজন্যই মূলত রামায়ণ রচনা। বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর আভাস ও তাদের পূজা অর্চনা পদ্ধতির সম্বন্ধে নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র জানা গেলেও, ভারতবাসী আদর্শ রূপে কাকে অনুসরণ করবে, সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এরকম অবস্থায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেব-দেবীদের পূজার পাশাপাশি ভারতবাসীরা কার আদর্শ, চরিত্র জীবনে অনুসরণ করে জীবনকে আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবে, সেই জন্যই মূলত রামায়ণের রচনা।

বৈদিক যুগে যে বেদগুলি রচনা হয়েছিল, এই বেদগুলো থেকে বিভিন্ন দেব-দেবীদের কথা জানা যায়। তাদের পূজার পদ্ধতি, রীতি, বিভিন্ন মন্ত্র সম্বন্ধে জানা গেলেও কোনো আদর্শবান মানুষ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এইরকম অবস্থায় শুধু দেব-দেবীদের পূজা করলেই হবে না, জীবনে আমাদের এমন একজন আদর্শবান পুরুষ দরকার, যার আদর্শ গুলি আমরা আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য, চলার পথে প্রতি পদে পদে অনুসরণ করে চলতে পারি। আর রামায়ণে রাম সেই রকমের এক সৎ, আদর্শ, বীর্যবান চরিত্র যাকে আমরা জীবনে অনুসরণ করে চলতে পারি।

বাল্মীকির রামায়ণে বাল কান্ডের প্রথম স্বর্গ, 'নারদ-বাল্মীকির সংবাদ অংশে' বাল্মীকি নারদের কাছে সেই রকম পুরুষের সন্ধান করে বলেছিলেন –

> "পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত; যিনি সচ্চরিত্র, সর্বভূতের হীতকারী, বিদ্বান, কর্তব্য পালনের সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, যিনি আত্মসংযমী, কান্তিমান, জিতক্রোধ ও অসূয়াশূন্য?"[১]

এরকম একজন মানুষ যিনি বিদ্বান হবেন আবার কর্তব্য পালনে সমর্থ্য হবেন আবার ধর্মজ্ঞ হবেন এরকম বিভিন্ন গুণের অধিকারী যে, তাকে জীবনে আমরা যদি সবাই অনুসরণ করে চলি; তাহলে বর্তমান সময়ে যে অনাচার, অত্যাচার, হিংসা – দ্বেষ দেখতে পাই সেই গুলি থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারবে। তার ফলে আমরা সকলেই ভালোভাবে থাকতে পারব, আমরা যদি প্রত্যেকেই নিজের জীবনে রামের আদর্শগুলিকে মেনে চলতে পারি। থাকতে পারি, প্রকৃত একজন মানুষ হতে পারি তার জন্যই রামচরিত্রকে উপস্থাপিত করা এবং তার জন্যই রামায়ণ। এবার রামের মতো একজন আদর্শবান পুরুষ যদি আমাদের সামনে না থাকতো তাহলে আমরা ধর্ম-কর্ম করতাম কিন্তু আমাদের চরিত্র কি রকম হবে, আমাদের আদর্শ কি রকম হবে, আমরা কেমন করে জীবনের লক্ষ্যে চলতে পারব। এই দিকগুলো আমরা রামকে দেখে শিখতে পারি, নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি; যদি রামের মত কেউ না থাকতো তাহলে আমরা আমাদের চরিত্রকে ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারতাম না। সবাই নিজের মতো করে চলতাম, কোনো সর্বজনীন আদর্শ থাকত না আমাদের সামনে, তার ফলে সমাজে আরো বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এই রামকে দেখে যেন আমরা চলতে পারি তার জন্যই রামায়ণ। রামায়ণ দেখলে দেখা যাবে, রাম আমাদের কাছে কোনো দেবতা নয়, একজন আদর্শবান মানুষ। যার জীবনে আমাদের মতোই বিভিন্ন রকমের সমস্যা এসেছে কিন্তু সবকিছুকেই নিজের বুদ্ধি, ধৈর্য, গুণাবলীর দ্বারাই অতিক্রম করেছে।

তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, রামায়ণের অবতারণা করা হয়েছে মূলত আমাদের সকলের জীবনের উন্নতির জন্য। জীবনে বিভিন্ন রকমের অন্যায়, পাপ কর্ম থেকে বিরত করে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যা কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রথম থেকেই জানা যায়, যখন দস্যু রত্নাকর রাম নাম দ্বারা পরিত্রাণ পায়, তখন ব্রহ্মা বাল্মীটিকে রামায়ণ রচনা কথা বলতে গিয়ে বলে -

> "সপ্ত কান্ড কর গিয়া রামের পুরাণ।।
> যেই রাম-নাম হইতে হইলা পবিত্র।
> সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র।।"[২]

অর্থাৎ দস্যু রত্নাকর যেভাবে রাম নামের দ্বারা জীবনের বিভিন্ন অপকর্ম থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং জীবনের উন্নতি করতে পেরেছিলেন; সেইভাবে আমরাও যেন রামের আদর্শগুলোকে গ্রহন করে অপকর্ম থেকে বিরত হয়ে সঠিক পথে চলতে পারি, জীবনের উন্নতি করতে পারি। সমাজের, দেশের, সর্বোপরি সর্বসাধারণের উন্নতি করতে পারি। রাম আমাদের কাছে আদর্শ রূপে আছে, যাতে আমরা তার জীবনকে দেখে শিখতে পারি, আদর্শ মানুষ হতে পারি।

এবার আমরা যদি রামের চরিত্র-গুণাবলীগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে আমরা আরো ভালোভাবে বিষয়টাকে বুঝতে পারব। রামায়ণে প্রথমেই দেখা যায় রাম ও গুহক চন্ডালের মিত্রতার চিত্র। –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালী।।"[৩]

মোটামুটি ভাবে ধরা হয়, যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগের রচনা এই রামায়ণ। তাহলে সে সময়ে সমাজে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা এখন থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। সেই সময় রাম, যে অযোধ্যার যুবরাজ, সে এক চন্ডালের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা, সেটা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনাও করতে পারাটা ধৃষ্টতা। সেই সময়ে এক সাধারণ মানুষও অস্পৃশ্যদের থেকে দূরে থাকত, সেখানে রাজপুত্র হয়ে রাম একজন অস্পৃশ্য চন্ডাল এর সঙ্গে মিত্রতা করে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন আমাদের সামনে। আবার অহল্যার শাপমুক্তি। রাম ইচ্ছা করলে অহল্যাকে এড়িয়ে চলে যেতে পারতেন, তাকে তার শাপ থেকে মুক্তি নাও দিতে পারতেন, অহল্যার ভালো নাও করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না, যাকে সাহায্যের প্রয়োজন তাকে সাহায্য করলেন। রামের এইসব আদর্শগুলি আমাদেরকে আমাদের জীবনে অনুসরণ করা উচিত। সব সময় দুস্থদের পাশে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দাঁড়ানো দরকার, বর্তমান সময়ে যেটা আমাদের কাছে একান্ত জরুরী, তার ফলেই সবার উন্নতি সম্ভব।

রামের গুরু জনদের প্রতি শ্রদ্ধা, নম্রতা, ভক্তি প্রদর্শন, সেই রকম আমাদেরও রামকে দেখে শেখা উচিত। সমস্ত লোভ-লালসা ত্যাগ করে শুধুমাত্র পিতার বচন রক্ষার জন্য রাজ্য ত্যাগ ও ১৪ বছর বনবাসী জীবন যাপন করতেও প্রস্তুত হন। কৈকেয়ীর প্রতি রামের কথায় যার পরিচয় পাওয়া যায় –

"তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।
চতুর্দশ বছর থাকিব গিয়া বন।।"[৪]

আবার রামের রাজ্য ত্যাগ ও বনবাস এর কথা সেটা শুনে তিনিও রাজসুখ ত্যাগ করে বনবাসে গমন করেন। সঙ্গে লক্ষণও রাজ সুখ-ভোগ ত্যাগ করে বনবাসে যান। আবার দশরথের মৃত্যুর পর ভরত রাজা হওয়া সত্ত্বেও রামের পাদুকা এনে, পাদুকাকে রাজা হিসাবে স্থান দিয়ে রাজ্য শাসন করতে দেখা যায়। আবার দেবর লক্ষ্মণ এর সঙ্গে সীতার মাতৃসম সম্পর্ক। এখান থেকে বোঝা যায়, একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত, তা রামায়ণ থেকেই আমরা জানতে পারি। বর্তমান সময়ে পরিবারের ভাঙ্গন, সম্পর্কের অবনতি দূর করে ভালোভাবে জীবন-যাপন করার জন্য রামায়ণ থেকে শেখা দরকার।

পঞ্চবটীর বনে বসবাসের সময় অকাল বৈদব্য সুর্পনখা রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য কামনা করে বসে। কিন্তু রাম এক স্ত্রীতে আসক্ত। স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ ভালোবাসার চিত্র পাওয়া যায় রামের কথাতে -

"আমারে হইলে জায়া পাবে সে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী।।"[৫]

রামের ভালোবাসা ছিল সম্পূর্ণ সীতার প্রতি, এটা ছাড়া তিনি জীবনে কাউকে চাননি তাই তিনি সুর্পনখার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আমরা যদি সুর্পনাখার দিক থেকে দেখি, তিনি এক বিধবা নারী। অকালে বিধবা হয়েছে। রাবণ তার স্বামীকে হত্যা করেছে। সূর্পনখা পূর্ণ যৌবনা ফলে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কামনা-বাসনা গুলো রয়েছে। এজন্যই তিনি রামের রূপে মোহিত হয়ে রামের স্ত্রী আছে শুনেও রামকে পেতে চেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কামনা-বাসনা গুলিকে পূর্ণ করতে না পেরেই রামকে পাওয়ার জন্যই সীতাকে হত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল, তারপরেই তার মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। একজন পূর্ণ যৌবনা নারী তার কামনাগুলোকে পূর্ণ করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। সূর্পনখার কামনাটা সমাজের পক্ষে বা রামের পক্ষে কারো পক্ষেই সঙ্গত ছিল না কিন্তু একজন পূর্ণ যৌবনা অকাল বৈধব্য নারী দীর্ঘদিন পরে তার কামনা পূরণের পথ দেখতে পেয়ে সেটাকে আর হাতছাড়া করতে চায়নি। তার ফলেই তাকে শাস্তিও পেতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এক অকাল বিধবার দুঃখ-কষ্টের পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজে তাদের অবস্থার কথা জানা যায়, সেই সময়ের এক বিধবার চাওয়া পাওয়ার পরিণতিই এখানে দেখানো হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুধু সেই সময়েই নয়, রামায়ণের অনেক পরে আধুনিক যুগে এসেও 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র' এঁরাও বিধবাদের চাওয়া গুলোকে মেনে নিতে পারেননি। চাওয়া পাওয়ার সমস্যা এবং শেষপর্যন্ত সেই অকাল বিধবাদের করুন পরিণতি দেখিয়েছেন। রামায়ণের যুগে যেমন বিধবাদের চাওয়া-পাওয়া গুলোকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, আধুনিক যুগে এসেও 'বঙ্কিম', 'রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র' কেউই বিধবাদের চাহিদাগুলোকে মানতে পারেননি তাঁদের কালে বা সময়ে দাঁড়িয়ে। 'বঙ্কিম' এর যেমন উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ দেখা যায় বাল বৈধব্য কুন্দনন্দিনী এবং রোহিনীর চাওয়া পাওয়াগুলো। তারাও চেয়েছিল সুন্দরভাবে জীবনটাকে কাটাতে, কিন্তু সময়-সমাজ তাতে স্বীকৃতি দেয়নি আবার বঙ্কিমও মেনে নিতে পারেননি। এজন্য শেষে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অকালে জীবন প্রদীপ নিরাপিত হয়েছে। আবার 'রবীন্দ্রনাথ' এর 'চোখের বালি' উপন্যাসেও দেখা যায়, বিনোদিনী চেয়েছিল বিহারীলালকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে তা জোটেনি, তার স্থান হয়েছে কাশিতে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও এরকম দেখা যায়। সমাজ কোনো সময়েই, না তখন আর না এখন বিধবাদের চাওয়া-পাওয়া গুলোকে গুরুত্ব দেয়নি; উপরুন্ত কখনো তাদের তাতে শাস্তি পেতে হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি আমরা সুর্পনখার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। রাবণও তার ভগ্নীর চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি। সূর্পনখা যে পূর্ণ যৌবনা, তারও যে চাহিদা, কামনা-বাসনা থাকতে পারে রাবণ যদি ভাই হিসাবে সেগুলিকে গুরুত্ব দিত, তাহলে সুর্পনখার আর এমন করুন পরিণতি হত না। আর এখানে আমরা রামের মধ্য দিয়েই দেখতে পাই একজন আদর্শবান পুরুষ চরিত্র, যার স্ত্রীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা-প্রেম। অন্য নারী বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া সত্বেও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, আবার তবুও সেই সময়ে যে সময়ে বহুবিবাহ প্রথাও চালু ছিল। রাজারা বহু পত্নী গ্রহণ করতেন, দশরথ তার প্রমাণ। কিন্তু রাম তা করলেন না সেই সময়ে দাঁড়িয়েও।

'লঙ্কা কান্ডে'র দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব রাবণের মৃত্যুর পেছনে অত্যাধিক অহংকারই দায়ী। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে রাবণ সবকিছুকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। রাবণের মতো শক্তিশালী ঐশ্বর্যশালী রাজা পৃথিবীতে ছিল না, সে স্বর্গ- মর্ত্য-পাতাল অনায়াসে জিততে পারত, কিন্তু আমরা হঠাৎ করে কোনো কিছু পেয়ে গেলে অহংকারী হয়ে উঠি - রাবণের মধ্যে দিয়ে আমরা সেটাই দেখতে পাই। রাবণের মা ও বিভীষণ যখন রামের কাছে সীতাকে পাঠানোর কথা বলে, তখন গর্বে মত্ত হয়ে রাবণ বলে -

> "মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
> হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন।।"[৬]

লঙ্কাকে রাম যখন দেখে তখন রাম লঙ্কার ঐশ্বর্য ব্যাখ্যা করে বলেন-

> "পৃথিবী মন্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান।।"[৭]

রাবণ রাজনীতিতেও বিশারদ ছিল তার পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায়।। তাহলে দেখা যায় সম্পদ, ঐশ্বর্য, বীরত্ব সব দিক থেকেই লঙ্কা পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু রাবণের মৃত্যুর পেছনে সবথেকে বড় কারণ ছিল গর্ব, লোভ, অহংকার। কোনো কিছু পেয়ে গেলে আমরাও রাবণের মতন অনেক সময় অহংকারী হয়ে উঠি; আর আমরা আমাদের প্রকৃত কর্তব্য ভুলে যাই, ভুল কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি অহংকারের বশে। রাবণও যদি সীতাকে ফিরে দিত লোভে-অহংকারে মত্ত না হয়ে, তাহলে তার সর্বনাশ ঘটত না। আমরা যতই উন্নতির শীর্ষে আরোহন করি না কেন লোভ, অহংকারে মত্ত হলেই আমরাও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাব। রামায়ণে একদিকে রামের চরিত্র; অন্যদিকে রাবণের চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। রামের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাম বিনম্র, শ্রদ্ধাশীল, ধৈর্য সম্পন্ন, সবার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কষ্ট সহিষ্ণু, প্রজা কল্যানকামী; অন্যদিকে রাবণ অহংকারী, লোভী। এই দুই বিপরীত চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে দেখে শেখার জন্য। আমরাও যেন তাদের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারি এবং সেখান থেকে শিখতে পারি। আর জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

সেই সময়ে নারীদের স্থানটা সমাজে কেমন ছিল সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাবণ হরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সীতাকে বারবার সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। অগ্নি পরীক্ষা ছিল সেই সময়ে সমাজের সতীত্ব পরীক্ষার

মাপকাঠি। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সে সতী, আর না হলেই অসতী। সীতা প্রথম অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছে, উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও লোকের সন্দেহ দূর হয়নি -

"রাবণের ঘরে সীতা ছিলা দশ মাস।
হেন সীতা ল'য়ে রাম করেন বিলাস।।"[৮]

রামায়ণ রচনা হয়েছিল পরবর্তী বৈদিক যুগে, আর সেই সময়ই নারীদের অবস্থান কতটা নিচে নেমে গিয়েছিল, সেটাই রামায়ণে সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। এখন যেমন সতীত্ব পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করা, সেই সময় অগ্নিপরীক্ষায় ছিল নারীদের সতীত্ব পরীক্ষার পদ্ধতি।কিন্তু সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ দূর হত না। সেই জন্য রাম রাজ্যের লোকেদের মুখে সীতার অপবাদ শুনে তাকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হয়। এতকিছু পড়েও লোকের মুখ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। একবার কোনো একটা কিছু ঘটলে লোকচর্চা সেটা নিয়ে চলতে থাকে, সেটা রামায়ণের সময় থেকেই চলে আসছে। একবার একটা মেয়ের চরিত্রে দাগ লাগলে সেটা ওঠা যে কতটা কঠিন সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই লোক অপবাদের জন্যই রাম আবার অগ্নিপরীক্ষা নিতে চাইলে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করতে করতে ক্লান্ত সীতা পাতালে প্রবেশ করে। এখান থেকে আমরা সেই সময়ের নারীদের অবস্থান, সমাজে তাদের কি চোখে দেখা হত তার প্রমাণ পাই। রাম একজন আদর্শ প্রেমিক, স্বামী হয়েও সমাজের থেকে রেহাই পাননি। সমাজের চোখে সীতার চরিত্র প্রমাণ করতে গিয়ে বারবার অগ্নিপরীক্ষা নিতে হয়েছে সতীত্বের। না সেই সময় আর না এখন কেউই আমরা সমাজের থেকে মুক্ত হয়ে কোনো কাজ করতে পারি না; রামায়ণে রাম রাজা হয়েও পারেননি, আমরাও পারি না।

আবার রামায়ণের যে রাম রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, সেটাও আমরা দেখতে পাই। একজন আদর্শ রাজার চরিত্র কি রকম হবে, রাজার কর্তব্য কিরকম হবে প্রজার প্রতি। এটা আমরা রামায়ণে রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই, আবার রামের অনুপস্থিতিতে ভরত কেমন করে রাজ্য শাসন করেছিল সেটাও আমরা দেখতে পাই। একজন আদর্শ রাজার বা শাসনকর্তার কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত তা রামায়ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা এটাই দেখতে পাই রাম একজন সৎ, আদর্শবান, চরিত্রবান, ধার্মিক মানুষ। বর্তমান সময়ে আমাদের সামনে একমাত্র আদর্শবান রূপে রামকে দেখতে পাই। আর এই রামকে অনুসরণ করেই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনে চলার পথে অনেক সমস্যা আসবে; রামের জীবনেও এসেছিল, কিন্তু রাম তার আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। তাই আমাদেরও হলে চলবে না। আমরা জীবনে কাকে অনুসরণ করে চলব, সেই জন্যই তো ব্রহ্মা বাল্মিকীকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দিলেন; যাতে আমরা জীবনে সঠিক ভাবে চলতে পারি। আর বাল্মিকী যেভাবে পাপকর্ম থেকে মুক্তি পেলেন সে কথা তুলে ধরলেন, যাতে আমরাও অপকর্ম থেকে মুক্তি পেতে পারি। এরপরে গৌতম বুদ্ধকেও দেখি তিনিও রাজসুখ ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে গিয়ে যে জ্ঞানলাভ করলেন, সর্বসাধারণের বিতরণ করে গেলেন। আবার শ্রীচৈতন্যদেবকেও দেখি প্রেমধান বিতরণের মাধ্যমে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা। এসবের মূল কারণ হল যাতে আমরা সবাই মুক্তি পেতে পারি। রামায়ণ রচনা উদ্দেশ্যও সেটাই আমাদের সঠিক পথে নিয়ে আসা। তাই আমরা বলতে পারি বর্তমানে রামের আদর্শ ছাড়া আমাদের সঠিক পথে চলা সম্ভব নয় -

"ভেবে দেখো রাম, বিনা গতি নাহি আর।।"[৯]

Reference:

১. লালা, আদিত্যকুমার, বাংলার রামকথা, রামায়ণ এক উত্তরতর অয়ন, সুধাংশু শেখর দে (সম্পাদনা), কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ. ১৪

২. ওঝা, কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কলকাতা ৭০০০০৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৯, পৃ. ২৫

৩. তদেব, পৃ. ৮৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 871 - 876
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. তদেব, পৃ. ১২২
৫. তদেব, পৃ. ১৬৪
৬. তদেব, পৃ. ২৮২
৭. তদেব, পৃ. ৩০৩
৮. তদেব, পৃ. ৩০৭
৯. তদেব, পৃ. ৫৭৩

Bibliography :

বাংলার রামকথা, রামায়ণ এক উত্তরতর অয়ন, আদিত্যকুমার লালা, সুধাংশু শেখর দে (সম্পাদিত,) দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ২০১৭
কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কৃত্তিবাস ওঝা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৯
বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র)-শুভম এর পক্ষে ঐশানী সাহা, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ২০০৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)- এস. বি .এস পাবলিকেশন ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৪২৬
শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস বিরচিত)-সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২৬
গৌতম বুদ্ধ- ড. শ্রীবিমলাচরণ লাহা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড স্টল, ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩৪৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 877 - 882
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মেদিনীপুরের ‘মুকুটহীন রাজা’ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল : স্বাধীনতার অন্তরালে ইতিহাসের নিস্তব্ধতা

দেবাশীষ বেরা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শহীদ অনুরুপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়
Email ID : beradeba@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Independence, Movement, National Struggle, Provincial, Bengal.

Abstract
In the history of India's independence movement, during the early phase of Gandhi's era, three prominent leaders emerged in Bengal, Chittaranjan Das, Birendranath Sasmal, and Subhas Chandra Bose. Unfortunately, the historians of the national struggle did not properly acknowledge Birendranath's role and his fundamental contributions. This great leader did not receive the recognition he deserved. Just as Chittaranjan gained widespread public recognition as 'Deshbandhu' (Friend of the Nation), Birendranath earned the affection of the people and became known as 'Deshpran' (Heart of the Nation). After the death of Chittaranjan Das in 1925, Gandhiji himself sincerely wished for Birendranath to take charge of the Bengal Provincial Congress Committee. However, due to political circles in Bengal, that responsibility never fell upon him. Had it happened, it is likely that Bengal's politics could have moved beyond its divisive nature. It can also be said that this might have played a major role in Subhas Chandra Bose's decision to leave the National Congress later. This article discusses Birendranath Sasmal's role in the national movement.

Discussion

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনেক বীর সেনানীর অবদান অমর হয়ে রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গভূমি থেকে তিনজন বিশিষ্ট নেতা সামনে এসেছিলেন – চিত্তরঞ্জন দাস, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং সুভাষচন্দ্র বসু। এদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাসকে ‘দেশবন্ধু’ এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে ‘দেশপ্রাণ’ বলে সম্মানিত করা হয়। তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিত্তরঞ্জনের নাম যতটা উজ্জ্বল, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অবদান ততটা স্বীকৃতি পায়নি। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর, মহাত্মা গান্ধী নিজে চেয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যেন বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সুযোগ আর তার হয়নি। বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নানা টানাপোড়েনের কারণে সেই দায়িত্ব তাঁর হাতে আসেনি। এটি যদি বাস্তবে ঘটতো, তবে হয়তো বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভিন্ন হতে পারত এবং হয়তো সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কারণও ভিন্ন হত। এই প্রবন্ধে আমরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অবদান, তাঁর সংগ্রাম এবং তাঁর অবিচল দেশপ্রেম নিয়ে আলোচনা করব।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল - ১. বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা। ২. তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা। ৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা, আদর্শ এবং অবদানকে পুনর্মূল্যায়ন করা। ৪. তাঁর অবহেলিত ইতিহাসকে নতুন আলোকে উপস্থাপন করা। ৫. চিত্তরঞ্জন দাসের পর বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ভূমিকা নিয়ে বিদ্যমান ধোঁয়াশা দূর করা।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন একজন অনন্য রাজনীতিবিদ, আইনজীবী এবং সমাজসেবী। মেদিনীপুরের এই 'মুকুটহীন রাজা' তাঁর অসীম সাহস, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং নির্ভীক মনোভাবের জন্য জনমানসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন জনগণের প্রিয় নেতা। তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বীরেন্দ্রনাথের ত্যাগ, আদর্শ এবং তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল ১৯২০-৩০ সালের সময়কাল, যখন তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে ব্রিটিশ প্রশাসন একপ্রকার পঙ্গু হয়ে পড়ে। তিনি স্থানীয় কৃষকদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত 'রায়ত সম্মেলন' কৃষক বিদ্রোহে প্রভূত সাড়া ফেলে।

মেদিনীপুর জেলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নিরলস ভাবে লড়াই চালিয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম শক্তিশালী করেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪) ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। যিনি উদ্বেলিত জনতার জনকল্লোলে 'দেশপ্রাণ', ভয়ে কম্পিত ইংরেজ সরকারের ভাষায় 'বাংলার ষাঁড়', অন্যায়ের কাছে মাথা না নোয়ানো 'চির-উন্নত-শির', অকৃপন আত্মত্যাগ সত্ত্বেও মর্যাদা হীনতার কারনে বাংলার 'মুকুটহীন সম্রাট' নামে পরিচিত। কেবলমাত্র কলকাতা কেন্দ্র বহির্ভূত জেলা মফঃস্বলের বাসিন্দা হওয়ার কারনে কিংবা মাহিষ্য সমাজভূক্ত জাতি সংকীর্ণতার কারনে তিনি জীবিত কালে সঠিক মর্যাদা পাননি। অকুণ্ঠ ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও বঙ্গ রাজনীতির চক্রে (যাকে আমরা 'কলকাতা লবি' বলি) তিনি উপেক্ষিত ও কোনঠাস ছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে নিজ জন্ম স্থান মেদিনীপুরে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চণ্ডিভেটি গ্রামে তাঁর জন্ম। লন্ডন, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্র ঘুরে এসেও তিনি উপলব্ধি করেছেন পরিপূর্ণ গ্রাম স্বরাজ এর মধ্য দিয়েই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। সেই কারণে সবার আগে জরুরী গ্রাম্য জীবনকে উদ্বুদ্ধ করা। বীরেন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে বারবার উপলব্ধি করেছেন, নীতিহীন দেশপ্রেম আর উগ্র জাতীয়তাবাদ কখনোই একটি সুস্থির সমাজের জন্ম দেয় না।
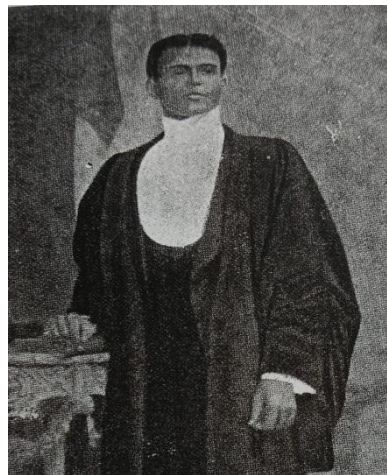
বিলাতে ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ

তাঁর স্বাধীনতার চেতনা ও পল্লী ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গান্ধীজীর ভাবনার অনুসারী ছিল।[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী সমাজ এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে। তাঁর মতে গ্রাম স্বরাজ হল স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা ও পল্লী সংগঠন ভাবনায় এই বিষয়টি অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে। তাই শ্রীনিকেতন ছাড়া শান্তিনিকেতনের ভাবনা অসম্পূর্ণ। নগরায়ন নয়, বস্তুত দেশময় পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত এক নবজাগরণের ধারণা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থকতা দিতে পারে বলে তিনই ভাবতেন। স্বদেশী আন্দোলনের মর্মকথা হল, পল্লীকে আপন করে তোলার ভিতর দিয়ে বিপ্লবের শুরু।[২]

১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। সমগ্র জেলায় মোট ২২৭টি বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল।[৩] এই সময় সমগ্র দেশ জুড়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সহিত মিলাবেন কিনা এ বিষয়ে সংশয়ে ছিলেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত ১৯২১ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[৪] পরবর্তীকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য সমিতি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, ইউনিয়ন বোর্ডের সহিত অসহযোগ না মেলানোই ভাল।[৫] এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীর কাছে আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি চান। গান্ধীজী বীরেন্দ্রনাথের আবেদনে সাড়াদেন এবং বলেন, -

> "সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, তাই অসহযোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি নিজের হাতেই রাখতে চান। তবে বীরেন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে নিজের দায়িত্বে আন্দোলন আরম্ভ করতে পারেন।"[৬]

এই পরিস্থিতিতে বীরেন্দ্রনাথ উভয় সংকটে পড়েছিলেন। একদিকে, মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাধারণ মানুষ কর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বোর্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিল। তাদের বিক্ষোভের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনের প্রতি অনীহা এবং একপ্রকার পরোক্ষভাবে গান্ধীর সমর্থন - এই উভয় সংকটকালে বীরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নেন, অসহযোগ আন্দোলনের সহিত এই আন্দোলনকে কোন প্রকার যুক্ত না করে স্বতন্ত্রভাবে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করবেন। এ বিষয়ে তিনি স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের উপর নির্ভর করে তাদের সম্মতিতে নিজের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।[৭]

ইংরেজ সরকার স্বায়ত্ব মূলক ব্যবস্থাকে ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার নাম করে প্রকৃত অর্থে দরিদ্র জনগণের উপর গ্রামীণ মুরুব্বিদের শাসন কায়েম করার এই অপচেষ্টা সফল ভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। শাসনক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবি করা উচ্চবিত্ত শ্রেণি সেদিন মনেপ্রাণে চায়নি ক্ষমতা দেশের সমস্ত শ্রেনীর মানুষের মধ্যে সমানভাবে বিস্তার লাভ করুক।[৮] সর্বোপরি কৃষকরা নিজেদের জমির অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোগ করুক – চায়নি উচ্চবিত্ত শ্রেণি। তারা চেয়েছিল শাসন ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত রাখতে। সেই কারণে হয়তো উপদলীয় কোন্দল এর নাম করে প্রকৃত জননেতা হয়ে ওঠা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সক্রিয় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র চলে কলকাতা ও দিল্লির উচ্চবর্গের নেতাদের মধ্যে। যদিও নিজস্ব যোগ্যতায় গ্রাম স্বরাজ আদর্শে অবিচল থাকা গ্রাম বাংলার এই বিপ্লবী ভারতের রাজনীতির মঞ্চে উজ্জ্বলভাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন জনমানসে। তাঁর দৃঢ় ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যায় ১৯২১ সালে বরিশালের বি পি সি সি এর সাধারণ সভায় ইউনিয়ন বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কার্যকরী কমিটির সভায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়, আর এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন তৎকালীন উচ্চ পর্যায়ের এবং উচ্চবর্গের নেতারা। অথচ ঐতিহাসিক সত্য হল এই আন্দোলন সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা বিস্তৃত করেছিল, মূলত সেই কারণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা অগ্রগণ্য ও ঐতিহাসকভাবেই উজ্জ্বল থেকেছে।[৯]

স্বাধীনতা আন্দোলনে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের এই সর্বাত্মক অংশগ্রহণের নিদর্শন, সামান্য কিছুটা মহারাষ্ট্র বাদে ভারতবর্ষের অন্য কোন জেলায় ঘটেনি। পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে স্মৃতির অতলে তলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বারবার। কোনো এক আশ্চর্য কারণে রমেশচন্দ্র মজুমদার, অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকদের কলমেও এই আন্দোলন থেকে যায় অনুল্লেখিত। অথচ সেই সময়কালে গুজরাটের সুরাট জেলার বরদৌলি তালুকের পতিতদারদের তথাকথিত কৃষক আন্দোলন কে প্রথম অহিংস আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ভারতবর্ষের বেশিরভাগ ঐতিহাসিক।[১০] এ তথ্য যেমন ঐতিহাসিকভাবে অর্ধসত্য, তেমনি এটি কোনোভাবে সফল আন্দোলনও নয়। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে উচ্চবর্গের আধিপত্য কায়েম করার যে সুচারু প্রক্রিয়া প্রবাহমান কাল ধরে ঘটে এসেছে তা ব্যতিক্রম হয়নি ইউনিয়ন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সফল এই আন্দোলনকে কেবল 'মাহিস্য' আন্দোলন বলে জাতিভেদ দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকীর্ণ করে দেখাতে চাওয়া হয়েছে সেই সময়ে। অথচ ইতিহাস স্বীকার করেছে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধীতায় কেবল এই আন্দোলনে মাহিষ্য, মুসলমান ও 'নিচু জাতের' হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণেই সর্বাত্মক আকার নিয়েছিল। তবে ভুললে চলবেনা, মেদিনীপুরের ৮৫ শতাংশ মানুষই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের।[১১]

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে সভা সমিতি কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে আন্দোলন শুরুর পূর্বে জমি প্রস্তুত করেছিলেন। এ বিষয়ে তার সহযোগী ছিলেন কাঁথির প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঊর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগাযোগ বিশেষ ছিলনা বলে স্থানীয় নেতারা বীরেন্দ্রনাথ এর উপর ভরসা করেছিলেন। তিনি প্রতিটি গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। স্থানীয় নেতারা গ্রামে গ্রামে সদস্য ও সেচ্ছাসেবক নিয়ে 'পল্লি সমিতি' গড়ে তুলেছিল। পাঁচ বা সাতটি পল্লী সমিতি নিয়ে 'পল্লি সংঘ' এবং কতগুলি পল্লী সংঘ নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'প্রাদেশিক শাখা কংগ্রেস'। গ্রাম পর্যায়ে এই বিস্তৃত ও সুনিপুন সংগঠনই হয়ে উঠেছিল আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যম। বীরেন্দ্রনাথ তার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হবে তা ঠিক করতেন।[১২]

আসলে মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার হিসাবে বীরেন্দ্রনাথের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাছাড়া বন্যার সময় ত্রাণ কার্যের মাধ্যমে তিনি মেদিনীপুরের মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। আইন ব্যবসা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে কংগ্রেসের প্রচার ও প্রসার চালান। একটি বিশেষ ঘটনা বীরেন্দ্রনাথের খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়। তখন মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এস এন রায়। তাঁকে কাঁথিতে পাঠানো হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষে লোককে বোঝানোর জন্য। এই কাজে তিনি ব্যর্থ হয়ে মেদিনীপুরে ফিরে এসে লিখেছিলেন, -

> "The subtlety of the whole compaigh lay in the fact that Sasmal as a lawyer was intergreting the sections of the Act ... (and the people were) convinced that sasmal wasrisht".[১৩]

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল রাজনৈতিক আদর্শে ও জীবন চর্চায় অহিংসবাদের প্রকৃত, সফল ও সার্থক রূপায়নকারি স্বাধীনতা সংগ্রামী। মানবিকতার অজেয় মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন, নিজের উপর যত অত্যাচারই হোক না কেন অহিংসবাদের প্রতি অটল-অবিচল থাকা উচিৎ। কিন্তু অসহায় মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুর উপর অন্যায় অত্যাচারে অহিংস পথ সবসময় বাঞ্ছনীয় নয়। রাজনৈতিক আদর্শের অহিংসার প্রতি বীরেন্দ্রনাথ এর এই আত্মনিয়োগকে মান্যতা দিয়েছেন স্বয়ং গান্ধীজী।[১৪]

কেওড়াতলা শ্মশানে চিতার উপর ঊর্দ্ধশিরে বীরেন্দ্রনাথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারত উপমহাদেশ আজ এক কঠিন সমস্যায় বিধ্বস্ত। একদিকে উগ্র ধর্ম উন্মত্ত মানুষের আস্ফালন, অপরদিকে মেকি নাস্তিকতার মোড়কে প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখার প্রবল ষড়যন্ত্র। এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আরো বেশি করে গ্রহণীয় হতে পারেন। যা মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করে, মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, অন্যকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়। সর্বপরি মানবিকতা ভূলুণ্ঠিত হয়। মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচাকে যা অনিশ্চিত করে তাকে তিনি ধর্ম বলে মানতে চাননি। জীবনচর্চায় ধর্ম এবং ধর্ম আচরণকে পৃথকভাবে দেখতে শিখেছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবনায় দেবতার প্রতি ভক্তি-পূজাকে গ্রহণ করলেও তা আচার বিহীন ও ব্রাহ্মণ বর্জিত। অর্থাৎ তাঁর ভাবনায় পূজা হল পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পুর্ন সমর্পণ এবং তা নিশ্চিত আচার বিহীনভাবে।

'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে নয়', এই আদর্শে চালিত হওয়া মানুষটি মৃত্যুর পরও উচ্চশির। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অকুতোভয়। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন, -

> "জীবনে আমি কোথাও মাথা নোয়াই নি, তাই মৃত্যুর পরও যেন আমার মাথা অবনত না করা হয়। আমাকে যেন ঊর্দ্ধশিরে দাহ করা হয়।"[১৫]

তাই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর প্রাণ হীন দেহ কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে পোড়ানো হয়।[১৬] এ দৃষ্টান্ত বিশ্বে অদ্বিতীয়। সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে নতুন এক ইতিহাসের সাক্ষী হল।

ভারত উপমহাদেশ আজ এক কঠিন সমস্যায় বিধ্বস্ত। একদিকে উগ্র ধর্ম উন্মত্ত মানুষের আস্ফালন, অপরদিকে মেকি নাস্তিকতা মোড়কে প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখার প্রবল ষড়যন্ত্র। এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আরো বেশি করে গ্রহণীয় হতে পারেন। যা মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করে, মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, অন্যকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়। সর্বোপরি মানবিকতা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচাকে অনিশ্চিত করে তাকে তিনি ধর্ম বলে মানতে চাননি। জীবনচর্চায় ধর্ম এবং ধর্ম আচরণকে পৃথকভাবে দেখতে শিখেছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবনায় দেবতার প্রতি ভক্তি-পূজাকে গ্রহণ করলেও তা আচার বিহীন ও ব্রাহ্মণ বর্জিত। অর্থাৎ তাঁর ভাবনায় পূজা হলো পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পুর্ন সমর্পণ এবং তা নিশ্চিত আচার বিহীনভাবে।

বীরেনবাবু সুদীর্ঘ জীবন পাননি। রাজনৈতিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং সামাজিক কাজে আত্ম নিয়োজিত কর্মব্যস্ত জীবনে সঙ্গত কারণেই অনেক কিছু লিখে যেতে পারেননি। জেলে থাকা অবস্থায় ১৯২২ এ ক্ষুদ্র খন্ডের আত্মচরিত 'স্রোতের তৃণ' প্রকাশ পায়।[১৭] রাজনৈতিক জীবনে একাকী এবং আপোষহীন সৈনিক তিনি। রাজনীতির ছোট খাটো সমঝোতায় অপরাগ। সে সময়ের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে দল-উপদল করতে পারেননি এবং তা কেবল মাত্র আদর্শের কারণে, নীতির প্রশ্নে। স্রোতের বিপরীতে একাকী আজীবন বিচরণ করেছেন অথচ নিজেকে বলেছেন 'স্রোতের তৃণ'। মার্কিন দেশের গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষটি জাতিবিদ্বেষ এর উর্ধে, জাতি বৈষম্যের ঊর্ধ্বে, ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো গল্প লিখেছেন – 'নিউ ইয়র্কে পাঁচ মাস' বা 'অমল ও রামকৃষ্ণ' প্রভৃতি গল্প। এছাড়াও বালির শিশু সমিতির সভাপতির ভাষণে পরাধীনতার কারণ ও তার প্রতিকার, কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে স্বরাজ সম্পর্কে অসাধারণ বক্তব্য আজও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। এছাড়াও ছোটখাটো অসংখ্য ভাষণ, চিঠিপত্র প্রভৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উজ্জ্বল স্বাক্ষর, সেই সঙ্গে আগামী ভারতের পথ নির্দেশের রূপরেখা।

সকল প্রকার রাজনৈতিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে কেবল আঞ্চলিক ইতিহাসের পাতার এক কোণে অবহেলায় ঠাঁই হয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের। নিজে অহিংসবাদী হলেও রাজনৈতিক কারণে সহিংসবাদী বিপ্লবীরা যখন ইংরেজ সরকারের বিচার ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের মামলা লড়েছেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, মাতৃভূমির মুক্তি, বিদেশি শাসনের অবসান। সারাজীবন কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে মাথা নত করেননি কোথাও। জাতীয় কংগ্রেসের দল ও উপদলীয় কোন্দলে নিজেকে যুক্ত করেননি সচেতনভাবে। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হতে পারেননি কলকাতা লাবির চাপে। সে বার আই.এ.এস. চাকরি ছেড়ে আসা নেতাজী সুভাষচন্দ্র মেয়র হন। নিজের জেতা আসন চিত্তরঞ্জন দাসকে ছেড়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গান্ধীজীর বিমাতৃসুলভ আচরণের পরও তাঁর প্রদর্শিত অহিংস নীতি থেকে সারা জীবনে একবারও বিচ্যুত হননি। একটি রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার রাজনৈতিক ভীত শক্ত করে গড়ে দিয়েছেন।[১৮]

বীরেন্দ্রনাথের জীবনে যে অতুল তেজ, প্রতুল প্রতাপ ও বিপুল বিক্রমের পরিচয় আমরা পেয়েছি তা সত্যিই অনস্বীকার্য। সেই পুরুষ সিংহ দেশপ্রাণকে শতসহস্র কোটি প্রণাম। তাঁর অমর কীর্তির কথা স্মরণ করে তার সুমূর্তি নয়ন সমক্ষে রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি এই মহান ব্যক্তিত্ব বঙ্গভূমিতে আবার আবির্ভূত হয়ে বাংলার তথা ভারতবর্ষের সার্বিক বিকাশ ঘটাক।

Reference:

১. Sanyal, Hiteshranjan, *Swarajer Pathe*, Papyrus, Kolkata, 1994, p. 93

২. *Ibid*, p. 93-94

৩. Bengal Village Self Government Act 1919 (hereafter BVSGA), https://archive.org/details/1919WB5, Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 6

৪. BVSGA, Chapter III, Section 34, p. 25

৫. Chakrabarty, Bidyut, *Local Politics and Indian Nationalism Midnapur (1919-44)*, Manohar Publishers, New Delhi, 1997, p. 86

৬. Sanyal, Hitesh Ranjan, *Swarajer Pathe* (hereafter SP), Pyapiras, Kolkata, 1994, p. 97; also see 'The Anti-Union Board Movement in Medinipur 1921', in R. Sisson and S. Wolpert, *Congress and Indian Nationalism* (Ed), University of California Press, Berkeley, 1988, p.p. 359-60

৭. Sasmal, Birendranath, *Beware of Union Board*, article Amrita Bazar Patrica, 22 October, 1921

৮. Sanyal, Hitesh Ranjan, SP, p. 100

৯. *Ibid*

১০. Bandyopadhyay, Sekhar, *Palashi Theke Partition*, Orient Blackswan, Kolkata, 2008, p. 276

১১. *Mahisha Samaj* (Patrika), Dwitiya Bhag, Nabam Sankha, 1912, p.p. 214-15

১২. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, Gandhari Prakashani, Kanthi, Purbamedinipur, 2005, p 25

১৩. File No. L/2U 5, Sl. No. 1-7, West Bengal State Archives, Local Self Government Bengal, report of S. N. Ray, Joint Magistrate, Midnapore, November 1, 1921

১৪. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, Gandhari Prakashani, Kanthi, Purbamedinipur, 2005, p. 37

১৫. Sasmal, Birendranath, *Beware of Union Board*, article Amrita Bazar Patrica, 22 October, 1921

১৬. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, Gandhari Prakashani, Kanthi, Purbamedinipur, 2005, p. 26

১৭. Sansmal, Birendra Nath, *Sroter Trino*, Prakashak Gopinath Bharati, Calcutta, 1922

১৮. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, p. 32

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 883 - 890
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার রচনায় সমাজ ভাবনা

দেবী মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া
Email ID : debibeng22@klyuniv.ac.in

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Meghnad Saha, Bengali scientist, state-owned industry, industrial policy, science and religion, regime reform, refugee rehabilitation, river dam project.

Abstract

Meghnad Saha (1893-1956) is a prominent Bengali scientist and science-literary of the twentieth century. He is called the 'Father' of modern astronomy and the grandfather of Indian science culture. Born in rural Bengal, this scientist was not only astronomer; he was an educator and social thinker. Standing in the subordinate India, he gave various philanthropic messages for the society and the nation, which are significant literary signs about social science thinking published in literature. Such as 'ways of national development', 'Poverty and unemployment problems in India', 'Industrial policy of Government of India', 'science and religion', 'state-owned Industry'. Through these works, he advised the Bengali nation to be self-reliant as a national development as a means of national improvement, and on the other hand, the Indian government said that various types of new industries on the industrial policy of the Indian government, through which the poverty and unemployment problems of India, think that it will be possible to eliminate India. At the same time, he said that the elimination of illiteracy and the inevitable spread of science technology. Because in the age of modern technology, the key to civilization is science.

So he sought the help of poets to make science heartbreak. Scientists are truth seekers, but their language lacks expression. In this case, poetry is complementary to science. Not only art, society or literature, Meghnad Saha thought was a combined form of science and religion. He believed that if religion was used in a scientific way by freeing superstition, it would be more effective than medicine. And religion can unite people, nature and society. Entering the world of politics, he has taken various social welfare steps. The establishment of the 'River Research Institute' for the construction of a dam on the flood-hit river from the rehabilitation of refugees- his social thoughts are reflected everywhere. And the compositions of the above topics are the main discussion of this article on scientific-social science thinking.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

কর্মবীর মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬) আধুনিক ও জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎই কেবল ছিলেন না, তাঁকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানসংস্কৃতির 'পিতামহ' বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানের সব জটিল তত্ত্ব আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্বমহলে বন্দিত হলেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন স্বদেশী। তাঁর কর্মযজ্ঞের তালিকায় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গবেষণার পাশাপাশি দেশীয় সামাজিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। তিনি যেমন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী ছিলেন, তেমনই ছিলেন দেশ ও দশের কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধ। সমাজ সচেতন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী মেঘনাথ সাহা পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আবহে বড় হয়ে উঠেছেন। স্কুল জীবনেই যোগ দিয়েছেন স্বদেশী আন্দোলনে। দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা ছোটবেলাতেই তাঁর অন্তরে জ্বলে উঠেছিল। বিজ্ঞান গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প গ্রহণের দ্বারা দেশের জাতীয় উন্নতির সাধনায় মগ্ন থেকেছেন আজীবন। বিজ্ঞানকে জনগণের কল্যাণে নিয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি সারাজীবন দেশের সেবাই করে গেছেন। আর তাঁর এই প্রয়াসই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে - যা বৈজ্ঞানিক-প্রাবন্ধিকের সমাজ বিজ্ঞান ভাবনা বিষয়ে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য।

কর্মময় প্রাণশক্তির অধিকারী মেঘনাথ সাহা কর্মযোগের দীক্ষায় বারংবার বিভিন্নভাবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর জীবনযাত্রার পথ কোনো কালেই পুষ্পবেষ্টিত ছিলনা। ১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার নিকটস্থ শ্যাওড়াতলি গ্রামে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে পঞ্চম সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন বিশ শতকের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। পিতা জগন্নাথ সাহা ছিলেন একজন সামান্য ব্যবসায়ী, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী গৃহবধূ। বাড়িতে লেখাপড়ার বিশেষ চল ছিল না বললেই চলে। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু মেঘনাদ সাহার অসাধারণ প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে বাল্যকাল থেকেই। কাজেই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং বড়দাদা জয়নাথের অনুরোধে তিনি মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার অনুমতি পান। গ্রামের স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে ১৯০৫ সালে ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে জড়িয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, ফলত বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থভাবসহ নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে আই সি এস পড়ার জন্য এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে তিনি কলেজ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এরপর ১৯১১ সালে কলকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিদ্যাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, গণিতাচার্য ডি.এন. মল্লিকের পাশাপাশি সহপাঠী বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর প্রমুখর সাহচর্য লাভের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হতে থাকেন।

১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সি থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মিশ্র গণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন। প্রথম হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এরপর উপাচার্য আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর ক্লান্তিহীন বিজ্ঞানচর্চা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ সালে বিকিরিণ চাপ ও তড়িৎ চুম্বকীয় বিষয়ে গবেষণার জন্য ডিএসসি ডিগ্রির অধিকারী হন এবং ১৯১৯ সালে নক্ষত্রের বর্ণালী সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ সালে যুগান্তকারী 'তাপীয় আয়নন তত্ত্ব'র উদ্ভাবন ডক্টর সাহারই কৃতিত্ব। বহুবিধ বিজ্ঞানের সাধনায় একনিষ্ঠভাবে নিমগ্ন থাকার দরুণ ১৯২৬-এ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের সভাপতি নির্বাচিত হন। এমনকি বিজ্ঞানচর্চার জন্য তিনি কলকাতায় ১৯৩৩ সালে 'ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি' এবং ১৯৩৫ সালে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স' সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতায় তিনি যে 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' প্রতিষ্ঠানের স্থাপন করেন, তাঁর মৃত্যুর (১৯৫৬) পর ওই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'।

নিরলস বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তিনি পূর্ণ উদ্যমে আজীবন সমাজের কল্যাণ বিষয়ক কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এই সমাজ কল্যাণের দীক্ষা তিনি লাভ করেছেন রসায়নের অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট। তাঁর জীবনের আদর্শ গঠনে আচার্যের ভূমিকা অসীম। বলা যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্থক উত্তরসূরী হলেন মেঘনাথ সাহা। তাঁর জীবনে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জনসেবার আদর্শের বীজ রোপিত হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্যে। আচার্য্যের অনুপ্রেরণাতেই মেঘনাথের জীবনে বিজ্ঞান ও দেশ সেবা এক সূত্রে মিলে গেছে। ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্যায় ত্রাণ কাজে প্রফুল্লচন্দ্রের সাথে সামিল হয়ে তিনি প্রথম সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং সার্বিকভাবে সমাজ কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেন। আচার্যের বাণী গুরু মন্ত্রের মত তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাহিত হয়েছে প্রতিনিয়ত - 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ পারে না'। ১৯২২ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ বন্যা কবলিত অঞ্চলের ত্রাণকার্যেও অংশগ্রহণ করেন মেঘনাথ সাহা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গৃহহীন উদ্বাস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫২ সালে সামাজিক উন্নতিকল্পে তিনি ভোটে দাঁড়ান এবং নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য মনোনীত হন। মূলত যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিজ্ঞানকে আধার করেই তিনি সমাজের বা দেশের হিতসাধনে এগিয়েছেন।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান গবেষণা বহির্ভূত রচনাগুলীর অধিকাংশই হল সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক। কিংবা সমাজের উন্নতি সাধনে লেখা বাংলা সাহিত্য বিশেষ। সমাজবিজ্ঞান বলতে মূলত বোঝায় মানব সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ মানবিক আচরণের উন্নতি সাধন- যার সাথে বিজ্ঞান ও ধর্ম একাত্ম হয়ে যায়। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মেঘনাথ সাহার সমাজ-ভাবনামূলক রচনাগুলি হল 'জাতীয় উন্নতির উপায়', 'কাব্য ও বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান ও ধর্ম', 'একটি নূতন জীবন দর্শন', 'ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা', সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ের অন্তর্গত 'রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প', 'গ্রামীণ উদ্বাস্তুদের জন্য জমি', 'ভারত সরকারের শিল্পনীতি' প্রভৃতি। এই রচনাগুলিতে প্রাবন্ধিক সমাজের বিভিন্ন দিকের হিত বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন।

আদ্যোপান্ত বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী ভাবনায় ভাবিত মেঘনাথ সাহা সমাজের সার্বিক উন্নতির প্রয়াসে সচেষ্ট হলেও মাতৃভাষার বিষয়ে তেমন মনোযোগী ছিলেন না। বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক ভাবনাগুলি লেখনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ভাষার প্রশ্ন নিতান্ত গৌণ। তদসত্ত্বেও বাংলা ভাষায় রচিত মুষ্টিমেয় রচনাসকল বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে স্থান করে নিয়েছে আড়ম্বরহীন রচনা কৌশলের জন্য। তাঁর বাংলা রচনাগুলি সুখপাঠ্য - যার মধ্যে একটা সহজতা ও সাবলীলতা বিদ্যমান। অযথা জটিল বিজ্ঞান উপযোগী শব্দ প্রয়োগ করে কিংবা বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকারের দুরূহ শব্দের উল্লেখ করে বাক্যকে পরিশ্রমসাধ্য করে তোলেননি লেখক। বরঞ্চ বিভিন্ন উপমার প্রয়োগে রচনাগুলিকে করেছেন সাহিত্য গুণান্বিত।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মেঘনাদ সাহার প্রথম রচনা 'জাতীয় উন্নতির উপায়'। রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নবভারত' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন সংখ্যায়। এই রচনাটি বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে যুবক মেঘনাথ সাহার অভিভাষন। রচনাটির পটভূমিকা কেবল নাটকীয় নয়, ঐতিহাসিকও বটে। কেননা সভায় উপবিষ্ট ছিলেন সভার উদ্যোক্তা সুভাষচন্দ্র বসু। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিজ্ঞান গবেষণায় মেঘনাথের অবদান তখন বিশ্ব স্বীকৃত। সভার মূল বক্তার আসনে উপবিষ্ট হয়ে তিনি বলেন জাতীয় উন্নতির উপায় নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বারবার তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী, যা মেঘনাথ সাহাকে প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ও আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বস্ত করেছে। আর সেই বার্তায় তিনি দিয়েছেন জাতির প্রাণ যুবশক্তির উদ্দেশ্যে। জাতির উন্নতিকল্পের আলোচনায় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রথমেই তিনি একটি পুরাণ কাহিনীর অবতারণ করেছেন- বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামের প্রধান দ্বাররক্ষী ছিল জয় ও বিজয়। কার্যবশত তারা দেবকুমারদের অবমাননা করায় অভিশপ্ত হয়ে মুক্তির উপায় বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি তাদের দুটি পথের কথা বলেন। এক, দেবতাদের প্রতি অনুরাগ রেখে সাত জন্ম পর মুক্তি পাওয়া এবং দুই, দেবতাদের প্রতি বিরাগ রেখে তিন জন্ম পর মুক্তি লাভ। তারা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে এবং তারা যথাক্রমে সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হয়ে বরাহ ও নৃসিংহ আবতারের হাতে, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হয়ে রামচন্দ্রের হাতে, দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্র হয়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বধ হয়ে মুক্তিলাভ করে। এই উপমা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বক্তা বা প্রাবন্ধিকের বলার উদ্দেশ্য এই যে, দেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিষ্ঠিত শক্তির দয়ার উপর নির্ভর না করে, তার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশ্চাত্য জাতির উন্নতির ইতিহাসে দেখা যায় প্রকৃতির বিরূপতা। বিশেষত ইউরোপের তিনদিকে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র, প্রচন্ড শীত, অনুর্বর জমি। তা সত্ত্বেও শতাব্দীর সুপ্ত দশা থেকে মানবাত্মা নিদ্রাত্থিত হয়ে প্রথমে জয় করলো সমুদ্রকে। ক্রমে আজ তারা বিশ্বজয়ী। অগাধ জলরাশি ও প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে তাদের জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল ভিত্তি হয়েছে সঙ্গবদ্ধ আত্মনির্ভরতা ও স্বতন্ত্রপ্রিয়তা। অন্যদিকে প্রাচ্যের প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় উদারতা। মানুষের সামান্য প্রচেষ্টায় খুশি হয়ে প্রকৃতি মুক্তহস্তে তাকে দান করেছে ক্ষুধার উদ্বৃত্ত শস্য। মানুষের অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন না পড়ায় এদের প্রকৃতি হয়েছে কোমল, ঘরমুখো ও নিজস্ব ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ। কাজেই পাশ্চাত্য দেশ তাদের প্রয়োজন মেটাতে প্রাচ্যের দ্বারস্থ হয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং প্রাচ্য তথা ভারতবাসী পরিণত হয়েছে তাদের ক্রীতদাসে। এই দাসত্ব গ্রহণই হলো জাতির উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

কোন জাতির প্রতিভা একদিকে বিকশিত হওয়া চরম অমঙ্গলের বিষয়। তৎকালীন সময়ে এবং বর্তমান সময়েও বাঙালি জাতির মধ্যে দেখা যায় শিক্ষালাভ করে চাকরি করার প্রবণতা। তাদের উচ্চতম লক্ষ্য হল সরকারি চাকরি। এই অংশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটি উক্তি স্মরণ করা যায় –

> “কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চাকুরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল, সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র হতে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকুরীর উমেদার; হিন্দু কলেজের ছেলেরা যাঁরা, মাইকেল, রাজনারায়ণের সমপাঠি, তাঁরা গ্রাজুয়েট হলেই প্রথম Lord Hardinge-এর গভর্ণমেন্ট তাদের ডেকে বড় বড় চাকুরী দিতেন। সেই সময় থেকে মতিগতি যে চাকুরীর দিকে গেল, আর সে ফিরল না। বাংলার ধনে ইংরেজ, মাড়োয়ারীর সিন্দুক বোঝাই হল আর বাংলার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা ডিগ্রী - তাই সিদ্ধি চাকুরী।”[১]

একটা সময় ছিল যখন কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার, হাটখোলার দত্তপরিবার, রানাঘাটের পালচৌধুরীরা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন। পরবর্তীকালে কোম্পানির বাণিজ্য শুরু হলে বাঙালিরা ব্যবসা থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগলেন এবং তার জায়গায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার লাভ করল মাড়োয়ারি, ভুটিয়া, পার্সি, ইহুদি প্রভৃতি ব্যবসাদার জাতি। আর বাংলা সন্তানেরা হয়ে গেল তাদের বেতনভুক্ত দাস। প্রাবন্ধিক এই পরবশতা বা পরমুখাপেক্ষিতার জন্য আমাদের প্রকৃত জাতীয় চরিত্রকেই দায়ী করেছেন। আর এই স্বাধীন বৃত্তি বিমুখতা থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্রতা, যা বাংলার প্রধান সমস্যা।

বাংলার প্রধান সমস্যা দূরীকরণের জন্য কিংবা জাতির উন্নতির উপায় হিসেবে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাবন্ধিক মহাশয়। সংঘবদ্ধভাবে দেশের সকল বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করে নিজের হস্তগত করতে হবে। বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র বিজ্ঞান। তাই তিনি প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয় লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করতে বলেছেন। বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা যেমন তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে, সেই পথেরই অভিযাত্রী হতে হবে বাংলাকে। দেশের যুবকদের আদর্শ হবে দেশের দারিদ্র্যমোচন করা। ভবিষ্যতে এই দেশের প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের হিতে ব্যবহারের জন্য যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে। কেননা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় - ‘সাধনা বিনা সিদ্ধিলাভ হবে না’। মোটকথা জাতীয় উন্নতির উপায়ে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের কথা বলেছেন, যার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হবে। পরাধীন ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বাঙালি জাতিকে স্বনির্ভরতা ও স্বদেশীয় শিল্পের বিকাশে যত্নবান হওয়ার বার্তা দিয়েছেন লেখক। তিনি মনে করতেন দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন দেশ আত্মনির্ভর হবে। তিনি বাঙালি জাতিকে স্বদেশীয় শিল্প উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে অধিক মনোনিবেশ করতে বলেছেন।

‘একটি নতুন জীবন দর্শন’-এ লেখকের অনুভূত বিষয় –

> “দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির ওপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।”[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাজার বছরের অভিজ্ঞতা ও পরম্পরাগত জ্ঞানরাশীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সভ্যতার শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে নতুন নতুন প্রণালী আবিষ্কারের ফলে সমাজে বহুবার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং প্রতিবার নতুনভাবে সমাজ গঠিত হয়েছে। মানুষ তার হাত ও মাথাকে সমানভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সময়ের উপযোগী করে প্রস্তুত করেছে। আমাদের কর্মশক্তি কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান নয়, আমাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যাবতীয় 'চাবি-শিল্প' (শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, যাতায়াত-রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প) যেমন রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন, চাইলেই তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বহির্ভূত হতে পারে না, তেমনি আমাদের দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। দেশকে শিল্প প্রধান করে তার মূলধন রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে –

> "যদি আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জীবনাদর্শকে সামাজিক মৈত্রী, সার্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"[৩]

মেঘনাথ সাহা তাঁর 'ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা' প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিষয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণ কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও অভাবজনিত সমস্যা। সেই সঙ্গে আছে বিশাল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু সেই তুলনায় সীমিত উৎপাদন, শিল্প উন্নয়নের অভাব এবং সর্বোপরি অশিক্ষা। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রাবন্ধিক শিল্পায়ন ঘটাতে বলেছেন, যার মধ্য দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ হবে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারিত হবে। এ ছাড়াও তিনি কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা, কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের নতুন পথ সৃষ্টির কথা বলেছেন তাঁর রচনার মধ্যে।

মেঘনাদ সাহা একজন প্রকৃত কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক, চিন্তাবিদ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক তখনই হবে যখন ধর্মকে সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মুক্ত করে বিজ্ঞানচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করা হবে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম এক সময় বিজ্ঞানের প্রতি সহনশীল ও অনুসন্ধিৎসু ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি, আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতা এবং কুসংস্কার হিন্দুধর্মকে পশ্চাদপদ করে তোলে। আধুনিক বিজ্ঞান মানবসমাজকে যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তাশীল ও মানবকল্যাণে নিবেদিত হওয়ার বার্তা দেয়। তাই ধর্মের মধ্যে থেকে অন্ধবিশ্বাস, জাতপাতের বিভেদ, আচারিক বাধানিষেধ ইত্যাদি দূর করে বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক ধর্ম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন লেখক। ধর্ম যদি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশে সহায়ক না হয়, তবে সেটি জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মেঘনাদ সাহার মতে, ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সাথে তথ্য অনুসন্ধান এবং তার দ্বারা পুরাতন ধ্যান-ধারণার নিরসন ঘটিয়ে মানসিক জড়ত্ব দূর করা।

কাব্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে লেখা মেঘনাদ সাহার দুটি প্রবন্ধ হল 'কাব্য ও বিজ্ঞান' এবং 'বিজ্ঞান ও ধর্ম'। এই রচনা দুটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত। 'কাব্য ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে লেখক বৈজ্ঞানিক যুগের আগ্রাসনে কবি ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। কবিরা এমন এক শক্তির অধিকারী যাদের মননে প্রকৃতির গোপন রহস্য সহজেই ধরা দেয়, তারা হলেন সত্যদ্রষ্টা। ভবিষ্যতের সু-সমাচার তাদের বাণীতে ধ্বনিত হয়। কবিরা হন শব্দব্রহ্ম-বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের ইচ্ছা তাদের মধ্য দিয়ে মানুষের নিকট প্রকটিত হয় ভাষায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে। কবিরাই পারেন সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গান গেয়ে তরুণ সমাজকে কালজয়ী কোনো সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে। তাই প্রাবন্ধিক মহাশয় কবিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। কেননা বিজ্ঞান প্রসারের প্রধান অন্তরায় হলো ভাষা। বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের দ্বারা বিশ্বের খাদ্য সম্পদের অভাব সংকুলান করা গেলেও মানুষের মনকে সাধনার উচ্চমার্গে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তার নেই। বিজ্ঞানীরা ভাষায় তেমন দক্ষ নয়।

কবিরা হলেন শাস্ত্রবাদী, স্বর্গীয় জগতে বিশ্বাসী, অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত মনোভাবসম্পন্ন, তারা বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মকরূপের সাথেই অধিক পরিচিত। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা ধর্মের গোঁড়া অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির অন্তরের সত্তার উপাসনা করে গেছেন, প্রাণহীন মূর্তি পূজার বদলে প্রাণের পূজায় বিশ্বাসী, এরা যজ্ঞবেদীর বদলে গবেষণাগারকে করে তুলেছেন উপাসনার মন্দির।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 100
Website: https://tirj.org.in, Page No. 883 - 890
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রসারে লেখক চেয়েছেন কবিদের সাহায্য। কবিদের কলমে বিজ্ঞানের জয়গান ধ্বনিত হলে তা আরো বেশি গ্রহণীয় হবে। বিজ্ঞানের তুলনায় কাব্যের ভাষা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী। মহান কবিদের মধ্যে একমাত্র গ্যেটেই বিজ্ঞানের সাধনায় বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। যদিও তখন ছিল বিজ্ঞানের যুগের শৈশবকাল, তবুও তাঁর রচনায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, বিজ্ঞানের আগ্রাসনকালে বিজ্ঞানী-প্রাবন্ধিক মেঘনাদ সাহা আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে অপরূপ মাতৃভাষায় সত্য, শিব ও সুন্দরের গান ধ্বনিত হলেও, হোমারের অনুকরণে প্রাচীন বীরের শৌর্য্য বর্ণিত হলেও, হিব্রু সত্যদর্শীদের মতো ভক্তিরস উদ্বেলিত হলেও, কিংবা কালিদাসের মতো শব্দ চয়নের মণিমালা নির্মিত হলেও, লোক সংগীতের সহজ সরল সুরে তাঁর বীণায় কখনো ঝংকৃত হয়নি বিজ্ঞান প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাষার উৎকর্ষতা চরম শিখরে পৌঁছেছে, কিন্তু লেখকের মধুর বাণী থেকে বিজ্ঞান থেকে গেছে শত যোজন দূরে। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ অংশে লেখক তাই বিজ্ঞানীদের হয়ে কবির প্রতি অনুযোগ করে বলেছেন –

> "কবি তাঁহার অতুলনীয় শক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশে কখনও নিযুক্ত করেন নাই। এই দৃশ্যমান পৃথিবীর যে সামগ্রিক রূপ প্রাণীবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং ভৌত বিজ্ঞান উন্মুক্ত করিয়াছে তাহার সঙ্গীত তাঁহার কণ্ঠে আজও বাজে নাই। আমরা আশা করি তাঁহার প্রতিভাধর পূর্বপুরুষ গ্যেটের মত রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী হইবেন এবং তাঁহার তুলনাহীন কাব্যে এই দ্বন্দ্বমুখর পৃথিবীর বর্তমান নৈরাশ্য ভেদ করিয়া মিলন, আশা ও আনন্দের বাণী সোচ্চার হইবে।"[৪]

মেঘনাথ সাহার এই অনুযোগের উত্তর দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, মেঘনাদ সাহাকে উৎসর্গীকৃৎ তাঁর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'বিজ্ঞান ও ধর্ম' প্রবন্ধে দেখা যায় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা মহাশয় মানবজাতির কল্যাণে বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্মকে অধিক গ্রহণযোগ্য ও কার্যকারী বলে মনে করেছেন। কেননা ধর্মই পারে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজকে একসূত্রে বেঁধে রাখতে। ধর্মের মঙ্গলপথে মানুষ তার নিজের প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন সচেতন হবে তেমনি সমাজ-প্রকৃতিতেও প্রবাহিত হবে শুভ বার্তা। আধুনিক সময়ে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের দ্বারা মানবজীবনে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। বিভিন্ন জাতিকে করেছে নিকট, দেশকে করেছে নিকটতর। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করতে পারলেও, নিজের প্রকৃতিকে সে আয়ত্ত্বাধীন করতে পারেনি। বিজ্ঞানের যুগের পূর্বে প্রাকৃতিক নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে মানুষের অসহায় ভাব থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এর সাথে জীবন ও প্রকৃতির কোনো বৈজ্ঞানিক সংযোগ নেই বললেই চলে। লেখক প্রাচীন ধর্মজ্ঞানগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুধাবন করে মানব জীবনে প্রয়োগ করতে বলেছেন। আবহাওয়ার ধর্ম যেমন গ্রীষ্ম, শীত, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র তেমনি মানব প্রকৃতির ধর্ম প্রেম, ঘৃণা, অনুরাগ-বিরাগ, দয়া, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি। এগুলি সময় বিশেষে অসুবিধার সৃষ্টি করলেও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নয়। বর্তমানে ধর্মসকল ঈশ্বরের উপাসনা পর্যন্তই কেবল সীমাবদ্ধ, এর কোন কল্যাণকর দিক সমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। বরং উল্টোটাই ঘটে। তাই লেখক ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে সার্বিক মঙ্গল কামনায় বলেছেন-

> "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধীত হইলে ধর্ম ক্রমে জ্ঞানের এমন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিবে যাহা চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষাও অধিক কার্যকরী - কেননা ধর্ম মানুষের সত্তাকে শিখাইবে সমাজ ও প্রকৃতির সহিত একাত্মবোধ।"[৫]

কর্মদ্যোগী মেঘনাথ সাহা সফলভাবে রাজনীতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি'র সভাপতি হন। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক রচনাগুলীর মধ্যে অন্যতম হলো 'ভারত সরকারের শিল্পনীতি' - ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে লোকসভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতাটি যুগবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের ১৫ই জানুয়ারি; 'রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প' রচনাটি ১৯৫৫ সালের ১৬ই এপ্রিল যুগবাণী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হলেও এটি ১৯৫৫ সালের

৪ঠা এপ্রিল লেখকের লোকসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা; 'গ্রামীণ উদ্বাস্তুদের জন্য জমি' রচনাটি চারুচন্দ্র ঘোষের সহযোগে লিখিত হয়ে যুগবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর।

'ভারত সরকারের শিল্পনীতি' কিংবা 'রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প' বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে মেঘনাদ সাহা তৎকালীন সময় প্রচলিত ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির অনেক ত্রুটিপূর্ণ দিক নিয়ে অবগত করেছেন। এই শিল্পনীতিতে বলা হয় অস্ত্রশস্ত্র, রেল, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি এই শ্রেণীর শিল্পসমূহ রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তবে বেসরকারি সংস্থাকেও নিরুৎসাহিত করা হবে না, মিশ্র অর্থনীতির ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় সরকারি ও বেসরকারি উভয়ই শিল্পোন্নয়নে অংশ নেবে, শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিল্পনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল, কয়লা এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তৎকালীন সময়ে বিড়লা ব্রাদার্স ভারতে লৌহ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য বিদেশি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। তাই শিল্পনীতি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেন-

> "আমাদের শিল্পনীতি আগাগোড়া বদলানো দরকার এবং টেকনিকাল লোক গভর্নমেন্টের নিজের হাতে থাকা দরকার। তাঁহাদের যে কোন বেতন আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র দেশের প্রতি দায়িত্বশীল থাকিতে হইবে, দেশ ছাড়া আর কাহারও স্বার্থ তাঁহারা দেখিতে পারিবেন না।"[৬]

মেঘনাথ সাহার 'গ্রামীণ উদ্বাস্তুদের জন্য জমি' প্রবন্ধটি মূলত দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গৃহহীন মানুষদের পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে লেখা। পূর্ববঙ্গ শরণার্থী সহায়তা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি উদবাস্তুদের জন্য জমি পুনর্বন্টনের প্রস্তাব দেন। তাদের আত্মনির্ভরশীল ও স্থায়ী জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা সরকারকে তাদের উদ্বৃত্ত জমির তথ্য দিয়ে কেন্দ্র সরকারকে সাহায্য করতে বলেছেন। দেওয়া তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমির বেশিরভাগই জলাভূমি, যেগুলি ভরাট করে পুনর্বাসনের বিলি ব্যবস্থা করা গেছে। আসামের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে উদ্বৃত্ত জমি থাকা সত্ত্বেও আসামের পুনর্বাসন মন্ত্রী তা বিনামূল্যে দিতে নারাজ। ত্রিপুরায় যদিও জমির অভাব ছিল না। তাই সেখানে উদ্বাস্ত সেটলমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে। উড়িষ্যা ও বিহারের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নমুখী, যেখানে তাদের নিজেদেরই কর্মসংস্থানের জন্য অন্য রাজ্যবাসী হতে হয় সেখানে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন অনুচিত বলে মনে করেছেন বিজ্ঞানী প্রাবন্ধিক মেঘনাদ সাহা। এমনকি রাজ্য পুনর্গঠন বিষয়েও তিনি লোকসভায় বারবার ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই বাংলা-বিহার এক করার প্রস্তাব উঠলে তিনি তার চরম বিরোধীতা করেন। কেননা, মাতৃভাষা ব্যবহার যেকোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, তা খর্ব করা গণতন্ত্র বিরোধী।

মেঘনাথ সাহা বিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজ ও রাজনীতির সাথেও গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। এক দিকে তিনি যেমন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দ্বারা দেশকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে নানা কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উপরিউক্ত রচনাগুলির মধ্যে যেমন তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি সমর্পিতভাব প্রকাশ পেয়েছে তেমনই লক্ষিত হয়েছে সমাজ কল্যাণ বিষয়ে তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা এবং উদার মানবিকতাবোধ। সহজ সরল ভাষায় তাঁর জীবনের মূল আদর্শকে যেভাবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাতে রচনাগুলি যেমন বাংলা ভাষায় লেখা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপর প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তেমনই বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বাংলা সাহিত্যের ভুবনে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ের সাহিত্যিকরূপে চিরস্থায়ী সিংহাসনে বিরাজিত হয়েছেন।

Reference:

১. 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' - 'সাধনা ও সিদ্ধি', কুন্তলীন প্রেস, চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯২৭, পৃ. ২০২

২. চট্টোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'মেঘনাদ রচনা সংকলন' – 'একটি নূতন জীবন দর্শন', ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ. ১১৫

৩. তদেব, 'একটি নূতন জীবন দর্শন', পৃ. ১১৬

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 891 - 898
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বৌদ্ধযুগে সমাজ ও ধর্মের প্রেক্ষিতে নারীজীবন : 'থেরীগাথা' অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা

ভাস্বতী বসু
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ
Email ID : bbasu1947@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Buddhist order, almswomen, laywomen, nirvana, Apadana, Paramatthadipani, sangha, spiritual experience.

Abstract
'Therigatha' is an anthology of poems composed by the first Buddhist women on their past lives and spiritual experiences on attaining nirvana. Buddha's reluctant permission to found the nuns' order contrasts significantly with the record of early nuns' success, as recorded in the Therigatha. These verses were composed by women from various factions of socio-economic conditions, ranging from members of royal family to brothel. Incapable of bearing the pain they received from the negligence, humiliation and distress in social life, they took refuge in the Buddhist order, though some women joined the order voluntarily being attracted to the asceticism due to their spiritual inclination. This literature work is surprisingly timeless, addressing issues of women's spiritual enlightenment and societal expectations that are still relevant today. The poems in this book provide historical insight into how Buddhism became one of the first religions to welcome women and inspired them for their spiritual attainment. This work is also worthy to be used as the historical document evident for the aspirations and achievements of Buddhist women in the early Buddhism. These poems are relevant forever to study the social, cultural and spiritual progress of women made by themselves following Buddha's teachings. In this paper I have reviewed few verses of Therigatha that are significant for the socio-cultural study of the position of women in early Indian Buddhism and role of Buddhist order in their lives.

Discussion

বৌদ্ধযুগের আদিপর্বে সমাজজীবনে বৌদ্ধসঙ্ঘের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। বৌদ্ধ ভাবধারাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিপুলাকার বৌদ্ধসাহিত্যে মানবজীবনের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের উপযোগী বহু দার্শনিক ও নৈতিক তত্ত্বের সমাবেশ ঘটলেও তার মুখ্য প্রতিপাদ্য দুঃখ হতে চিরমুক্তি। নির্বাণলাভে নির্বাপিত হোক সকল কামনা-বাসনা, আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটুক সকল

দুঃখের হাত থেকে - বুদ্ধমার্গের এটিই চরম লক্ষ্য। সিদ্ধার্থ গৌতম জরা-মরণাদি দুঃখকে মানবজীবনের সারসত্য উপলব্ধি করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। দুঃখমুক্তির জন্য প্রজ্ঞা ও শীলের পথ অনুসরণ করে অন্তিম লক্ষ্য সমাধিতে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য মধ্যমপন্থ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তার নির্দেশিত মুক্তিলাভের পথ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত। কিন্তু বুদ্ধযুগের প্রথম পর্বে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধ, ধম্ম, সঙ্ঘ - এই ত্রিরত্নের শরণে জীবনযাপনা ও স্বীয় সাধনায় অর্হত্ত্বলাভের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংঘে যোগদানের উৎসাহ কি কেবল ধর্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ নির্বাণ লাভের আকাঙ্খায়, না এর সঙ্গে জড়িত ছিল সংসারজীবনের কোন বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের সহজ ও আশু সমাধান – বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের রচিত 'থেরীগাথা'র কবিতাগুলি আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এই নিবন্ধের বিষয় থেরীগাথায় বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের আত্মকথনরূপ কবিতাগুলি অনুসরণে বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভিক পর্বে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ইতিহাসভিত্তিক অনুসন্ধান। বিষয়বস্তুগতভাবে এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় উত্তর ভারতের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের নারীরা বিচিত্র কারণে বৌদ্ধসঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সঙ্ঘপূর্ব অতীত জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে থেরীগাথায়। তাই গ্রন্থখানি ঐ যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান নির্ধারণের এক ঐতিহাসিক প্রামাণ্যরূপে গণ্য হতে পারে। এই গ্রন্থখানি যে ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল একথা 'যৌদ্ধযুগে নারী জীবন' বিষয়ক প্রাজ্ঞ পন্ডিত ও গবেষকরা সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন।

থেরীদের জীবনকাহিনী, ভিক্ষুণী জীবনের অভিজ্ঞতা, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাদের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ও স্বীয় সাধনায় লব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ - এই হল গাথাগুলির প্রধান বিষয়বস্তু। গাথা বর্ণিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাসের সন্ধান এই প্রবন্ধের প্রয়াস। কিন্তু প্রথমেই বলতে হয় গ্রন্থখানি যেন স্বয়ং এক ইতিহাস। প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই বৌদ্ধসাহিত্য আদতে এক সংকলন গ্রন্থ। মোট ৫২৫ টি শ্লোক (শ্রী ধর্মকীর্তি ধম্মানন্দ, ১৯২৬ অনুযায়ী; শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ এর মতে শ্লোক সংখ্যা ৫২৪ এবং রিচার্ড পিশেল এর মতে তা ৫২২)[১] সম্বলিত ৭৩টি গাথা বা গীতিকবিতার এক সংকলন যার অধিকাংশ গাথা থেরীদের রচনা। 'থেরী' শব্দটি সংস্কৃত 'স্থবিরী' পদ থেকে এসেছে যার অর্থ হল বৃদ্ধা। বৌদ্ধসাহিত্যে জ্ঞানবৃদ্ধা ভিক্ষুণীকে 'থেরী' আখ্যা দেওয়া হয়। যে সব বৌদ্ধভিক্ষুণী অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনের দ্বারা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হতেন তারাই 'থেরী'। গৌতমবুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষুণী সংঘের ৭৩ জন মুখ্য থেরীর মুখ নিঃসৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও জীবনকাহিনীই গাথার আকারে সংকলিত হয়েছে। এক একটি কবিতা বা কবিতাংশ এক একজন থেরীর নাম-চিহ্নত। তবে যাঁরা কবিতাগুলি আবৃত্তি করেছিলেন তাঁরাই সেই কবিতাগুলির রচনাকার কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। এমনকি কবিতাগুলির রচয়িতা মহিলা কবিরাই কিনা এ বিষয়েও পন্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত ও গবেষকের মতে কবিতাগুলি ভিক্ষুণীদেরই রচনা। ব্রিটিশ লেখক ও অনুবাদক শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ বলেছেন, 'কবিতাগুলি যে ভিক্ষুণীদের রচনা নয় এ বিষয়ে প্রমাণ কোথায়?' প্রকৃতিপ্রেমী থেরীদের মধ্যে কবি প্রতিভা থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। গাথাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল গৌতমবুদ্ধের জীবদ্দশার এবং কয়েকটি তাঁর মহানির্বাণের কিছুকালের মধ্যেই রচিত বলে মনে করা হয়। তবে বিশেষত চাপা ও সুন্দরী এই দুই থেরীর গাথা দুটি খুবই প্রাচীন। জার্মান ইন্ডোলজিস্ট রিচার্ড পিশেল এর মতে, -

> "We have reason to suppose that gathas 291-311; 312-337 are very old composition. They Indeed bear the stamp of the oldest Indian akhyana, as described by Oldenberg."[২]

সুতরাং, থেরীগাথা হল ভারতের এক অতি প্রাচীন কাব্য সংকলন যা নারীদের রচিত নারীদেরই কথা।

পালি ত্রিপিটকের দ্বিতীয় বিভাগ সুত্তপিটক এর পঞ্চম নিকায় বা সুত্রসংকলন খুদ্দকনিকায় (ক্ষুদ্রকনিকায়)। খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থের বিভিন্ন রকম তালিকা পাওয়া যায়। সিংহলী ঐতিহ্য অনুসারে বর্তমান ত্রিপিটকের ক্ষুদ্রকনিকায়ের গ্রন্থ তালিকার অন্তর্গত নবম গ্রন্থ থেরীগাথা। খুদ্দকনিকায়ের যে গ্রন্থগুলি বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদালাভ করেছে থেরীগাথা তাদের অন্যতম। এই গ্রন্থে ৭৩ জন থেরীর নামাঙ্কিত ৭৩টি কবিতায় থেরীরা তাদের অতীত জীবনের ঘটনা, ভিক্ষুণী জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খুদ্দকনিকায়ের ত্রয়োদশ গ্রন্থ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অপদান এর অন্যতম অংশ 'থেরী অপদান' এও ৪০ জন থেরীর জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে। সংসার-জীবনে বৈরাগ্য প্রচার ও বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম প্রকাশই থেরীগাথার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখই তাদের আত্মকথায় প্রাধান্য লাভ করেছে। থেরীগাথায় তৎকালীন ভারতের (বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ) সমাজব্যবস্থা বিশেষতঃ সমাজে নারীদের অবস্থান ও অধিকারের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। থেরীগাখার অন্যতম ইংরাজী অনুবাদক Charles Hallisey গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "As salt just seems to go with food, the adjective 'first' and the Therigatha seem to go together..."[৩], এটি বুদ্ধের সময়কালে বৌদ্ধদের রচিত প্রথম কবিতা সংকলন গ্রন্থগুলির অন্যতম। যদিও প্রাচীনত্বের দিক থেকে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়, তথাপি 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা'র কবিতাগুলিকে প্রথম ভারতীর গীতিকাব্যগুলির অন্যতমরূপে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষতঃ ঋক্‌বেদে মন্ত্র রচয়িতারূপে ঋষিকাদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধযুগে রচিত থেরীগাথা ও থেরী অপদানের কবিতাগুলি ভারতে নারীদের রচিত প্রথম কাব্যগুলির মধ্যেই স্থান পায়। কবিরা অনবদ্য কবি প্রতিভায় একাধারে দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরূপে নিজেদের প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে।

মূল্যবান কাব্যগ্রন্থটি একসময় আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মাগধী প্রাকৃতে লেখা আদি থেরীগাখা কোখাও পাওয়া যায় না। হয়তো গুপ্তযুগে ব্রাম্ভণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পর বহু প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের মতো এই গ্রন্থখানিও হারিয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে সম্রাট অশোক কন্যা সঙ্ঘমিত্রার মাধ্যমে মূল থেরবাদী মাগধী ত্রিপিটক শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে বইগুলি সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। শ্রীলঙ্কাতেই পাওয়া গিয়েছিল থেরীগাথা তবে সিংহলীরূপে। শ্রীলঙ্কায় ভিক্ষুণী সঙ্ঘের গোড়াপত্তন ও বৌদ্ধধর্মে নারীদের সমানাধিকারের বিষয়টি প্রচারের জন্য হয়তো ধর্মপ্রচারিকা সঙ্ঘমিত্রার এই গ্রন্থটি নিদর্শন হিসাবে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বইটি মাগধী প্রাকৃত রূপে পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরে আসে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুর অধিবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল রচিত টীকাভাষ্যে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্তু, পেতবত্তু, থেরগাথা, থেরীগাখা ও চারিয়াপিটকের টীকা একসঙ্গে গ্রন্থণা করে ধর্মপাল নাম দিলেন 'পরমত্থদীপনী'। তাঁর 'থেরীগাথা -অট্‌ঠকথা' সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত থেরীগাখার প্রাকৃত রূপ। প্রথমে সিংহলী ভাষার ও পরে তা থেকে প্রাকৃতে রূপান্তরিত বইটির মূল রূপটি যে আর অবিকৃত ছিলনা তা সহজেই অনুমেয়। সিংহলী থেরীগাথায় গ্রন্থাকার বেশ কিছু শ্লোক পুনর্বিন্যাস করেছেন। এর অনেক শ্লোকই 'অঙ্গুত্তর নিকায়' (সুত্তপিটকের চতুর্থ নিকায়) এর ভাষ্য 'মনোরথপুরণী' ও 'থেরী -অপদান' এর শ্লোকের অনুরূপ। যদিও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় এক থেরীর নামাঙ্কিত গাথা অন্য থেরীর নামে চিহ্নিত হয়েছে। শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ তাঁর 'Psalms of the Sisters' গ্রন্থে এরকম কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। Edward Muller এর সম্পাদিত থেরীগাথার টীকাগ্রন্থের মুখবন্ধে Muller থেরীগাথা ও থেরী-অপদানের কবিতাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখাবার জন্য একটি তালিকা দিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে থেরীদের নামে বৈসাদৃশ্য থাকলেও এই তালিকায় উভয় গ্রন্থের ৩৩ জন থেরীর কবিতা ও জীবনকাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। পরমত্থদীপনীর অন্তর্গত থেরীগাথা-অট্‌ঠকথায় থেরীদের জীবনবৃত্তান্ত ও ঘটনার সঙ্গে থেরী-অপদানে বর্ণিত থেরীদের কাহিনী ও ঘটনার প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে। থেরী - অপদানের অনুরূপ ধর্মপাল তাঁর ভাষ্যেও ভিক্ষুণীদের পূর্বাশ্রমের কাহিনী বলতে গিয়ে তাঁদের অসংখ্য পূর্বজন্মের ও সেইসব জন্মে আবির্ভূত কাল্পনিক অতীত বুদ্ধদের উল্লেখ করেছেন। ফুস্‌স, বিপস্‌সি, কাশ্যপ, পদুমুত্তর, বেস্‌সভু, কোণাগমন, ককুসন্ধ, তিষ্য, শিখি, পচ্চেক বুদ্ধ - এমন নানা কাল্পনিক বুদ্ধের সময়ে থেরীরা তাঁদের পূর্বজন্মগুলি অতিবাহিত করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও ভূত, প্রেত, যক্ষ, অপ্সরা, ইন্দ্র, বৃক্ষদেবতা - এমন বহু অতিপ্রাকৃত চরিত্র স্থান পেয়েছে টীকাকারের অট্‌ঠকথায়। এতো কাল্পনিক বিষয়ের বাহুল্যতায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধভাবনার বাস্তব রূপটি লঘু হয়ে পড়ে। তবে টীকাকার মূল গাথাগুলি উপস্থাপনার সময় এসব বাহুল্য বর্জন করেছেন। গাখাগুলিকে শ্লোকের সংখ্যা অনুযায়ী ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর আকারে ক্রমিক বিন্যস্ত করেছেন।

থেরীগাথা ৭৩ জন থেরীর গাথা। এরা মূলতঃ বৌদ্ধযুগের সূচনায় বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত উত্তর-পূর্ব ভারতের মহাজনপদগুলির বিভিন্ন নগরীর অধিবাসী। মগধ, কাশী, কোশল, কুরু এই মহাজনপদগুলির এবং বৈশালী, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, সাকেত, দেবদহ, ভারুকচ্ছ, কৌশাম্বী, বারাণসী, মতাবন্তী, সাগল, কপিলাবস্তু - এই নগরগুলির নাম থেরীগাথায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাওয়া যায়। থেরীগাথায় নারী চরিত্ররা এইসব অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের প্রতিনিধি। রাজবংশ, রাজকর্মচারী, ধনী অভিজাত শ্রেষ্ঠী, ধনী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ব্যাধ, ক্রীতদাস, গণিকা অর্থাৎ উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সব ধরণের পরিবার থেকে আগত বিচিত্র কারণে সংসারত্যাগী নারীদের জীবনই থেরীগাতথার উপজীব্য। অবিবাহিতা, বিবাহিতা, অপুত্রক, অনাথা, বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা নারীরা কী কারণে কীভাবে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং অন্তরদৃষ্টির অনুশীলনে ব্রতী হয়ে স্বীয় সাধনায় অর্হত্ত্ব লাভ করেন সেকথাই গাথায় বর্ণনা করেছেন। এ গাথা তাদের সাফল্যের উল্লাসগীতি। থেরীগাথা ও অট্ঠকথায় ভিক্ষুণীদের জীবনবৃত্তান্ত থেকে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে খানিক ধারণা পাওয়া যায়। সীমিত পরিসরের নিবন্ধে ৭৩ জন থেরীর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করার অবকাশ নেই। তাই যে বিষয়গুলি নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক, গাথা অনুসরণে সেগুলি পরিবেশনা করাই এই নিবন্ধের প্রয়াস।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগের সূচনায় অপেক্ষাকৃত আর্যপ্রভাবমুক্ত পূর্বভারতে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষত মগধ (অধুনা বিহার) ও পূর্ব-উত্তর প্রদেশে এই ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। লোহার যন্ত্র ও পশু সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল নতুন কৃষিপদ্ধতি, পরিবর্তিত কৃষিপদ্ধতিতে উৎপাদনে নতুন উদ্বৃত্তের সৃষ্টি, নতুন নগরীর পত্তন, বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী ও গৃহপতি শ্রেণীর উত্থান - এইসব অঞ্চলের মানুষের বাস্তব জীবনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়সছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় জীবনেও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পরিবর্তিত ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন যাগযজ্ঞসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের স্থলে তাদের জীবনযাত্রার অনুকূল মধ্যমপন্থী বৌদ্ধধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনে নারীদের জীবনচর্যাতেও যে পরিবর্তন আসবে তা স্বাভাবিক। বুদ্ধযুগের আদিপর্বে নারীদের বাহ্যিক জীবনের তুলনায় অন্তর্জগতের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। জীবনের বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্তির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা তাদের নতুন মনোজগতের সন্ধান দেয়। ভিক্ষুণী সঙ্ঘার গাথায় যেন তারই প্রকাশ -

“ত্যজিয়াছি গৃহ, পুত্র, পশ্বাদি সম্পদ,
ত্যজিয়াছি রাগ, দ্বেষ, অবিদ্যা, বিপদ।
সমূলে নাশিয়া যত তৃষ্ণা জীবনের
লভিয়াছি শান্তি আমি আজি নির্বাণের।”[৪]

থেরীগাথার কাব্যিক মূল্য সে যুগের নারীর অনন্য কবি প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। কবিতাগুলি তাদের মননশীলতা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। কবিতাগুলি প্রসঙ্গে অস্ট্রিয়ান ইন্ডোলজিস্ট M. Winternitz এর মূল্যায়ণটি যথাযথ। কবিতাগুলি কাব্যিক গুণ ও সৌন্দর্যে ভারতীয় গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে একই সারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তাঁর ভাষায়, -

> “These religious poems which in power and beauty are fit to rank with the best productions of Indian lyric poetry from the hymns of the Rigveda to the lyrical poems of Kalidasa and Amru.”[৫]

বৌদ্ধ দর্শনের সারতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারেও থেরীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। থেরীগাথায় আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, অনিত্যতার মতো বৌদ্ধতত্ত্বগুলি যে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় এর রচয়িতারা ধর্ম ও দর্শনে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। ধর্ম-দর্শনের পাশাপাশি গাথাগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবনের চিত্রও ফুটে উঠেছে। মহিলা কবিরা একাধারে কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরূপে এই গ্রন্থে নিজেদের প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধের সমসাময়িককালে শাস্ত্র বা দর্শনচর্চায় নারীদের যে বিশেষ উচ্চ স্থান ছিল এমন বলা যায় না। তবে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। স্বামীর সহায়িকারূপে ধর্মাচরণ পালন ছিল স্ত্রীর কর্তব্য। থেরীগাথায় দেখা যায় নারীরা সহধর্মিণীরূপে নয়, তারা একক ও স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করছেন নিজেদের মোক্ষলাভের লক্ষ্যে। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপূরণে তাঁরা যে পুরুষের সমানাধিকারী তা তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন। নির্বাণ লাভের বাসনায় সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ অন্তরে উপলব্ধি করে একে একে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামীত্ব, অনাগামীত্ব, অর্হত্ত্ব - নির্বাণের স্তরগুলি অতিক্রম করেছেন। নিজে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে অন্য নারীকে ভিক্ষুনী সঙ্ঘে অভিষিক্ত করার অধিকারী হয়েছেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী, ক্ষেমা, পটাচারা, ধর্মদিন্না,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জিনদত্তা - থেরীগাথায় এই ভিক্ষুণীদের যেখা যায় শিষ্যাদের উপসম্পদা করাতে। এরা নিয়মিত ধর্মোপদেশ দান করতেন। শুক্রা ও ধর্মদিন্না এই দুই থেরীকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিরতা দেখা যায়। শুক্রা পাঁচশত ভিক্ষুনীকে নিয়ে ধর্মপ্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রীমতী রীজ ডেভিড্‌স্ থেরীগাথায় নারীজীবনের পরিবর্তনের এই দিকটি প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "It affords a very instructive picture of the life they led in the valley of the Ganges in the time of the Gotama the Buddha. it was a bold step on the part of the leaders of Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women. But it is quite clear that the step was a great successs and that many of these ladies were as distinguished for high intellectual attainments, as they were for religious earnestness and insight".

ধর্ম ও দার্শনিক ভাবনার পাশাপাশি থেরীগাথায় তৎকালীন সমাজে নারীর বাহ্যিক সমাজ জীবনের চিত্রটিও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। পুত্রলাভে মোক্ষলাভ পরবর্তী বৈদিক যুগের এই প্রচলিত বিশ্বাস নয়, বরং থেরীগাথায় দেখা যায় পরিবারে কন্যাসন্তান অনাকাঙ্খিত নয়, পুত্রসন্তানের মতোই সে সমাদৃত। শ্রাবস্তীর এক অভিজাত পরিবারের কন্যা উব্বিরী কোশলের ক্ষত্রিয় রাজার (সম্ভবতঃ প্রসেনজিৎ) পত্নী ছিলেন। তিনি এক কন্যার জননী হলে রাজা শিশুকন্যাকে দেখে আনন্দিত হয়ে উব্বিরীকে রাজমহিষী পদে অভিষিক্ত করেন। কন্যার অকালমৃত্যুতে শোকাভিভূতা উব্বিরীকে প্রত্যহ শ্মশানে গিয়ে বিলাপ করতে দেখা যায়। উজ্জয়িনী নগরের ধনশালী বণিকের কন্যা ইসিদাসী তার পিতামাতার অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন। থেরীগাথায় এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না যেখানে দেখা যায় পিতৃগৃহে কন্যারা পিতামাতার অনাদর ও অবহেলা পেয়েছে। ঐ সময় অবিবাহিত নারীদের পরিবারে যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। তারা পিতৃগৃহে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারী ছিলেন। থেরীগাথায় নারীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় তা হল প্রথাগত ভাবনায় স্ত্রীস্বভাবসুলভ আশা-আকাঙখার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের প্রতি নারীদের আকর্ষণ। হয়তো বুদ্ধ ও বৌদ্ধসঙ্ঘের মহিমা প্রকাশের জন্য এমন অনেক নারীর বৃত্তান্ত সেখানে আছে যারা নিশ্চিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। উত্তমা, অপরা উত্তমা, দন্তিকা, সুমনা, অনুপমা, গুপ্তা, রোহিণী, সুন্দরী, স্বর্ণকার কন্যা শুভা, সুমেধা - এরা সকলেই পূর্বাশ্রমে ছিলেন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। এই থেরীরা যৌবনেই বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন। সাকেত নগরের শ্রেষ্ঠী মজ্ঝর কন্যা অসামান্যা সুন্দরী অনুপমার প্রাপ্তযৌবনে বহু রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেও তিনি সেসব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী সুমনার যৌবনেই সংসারে অনাসক্তি জন্মালেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারেননি কারণ পিতামহীর জীবনান্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সেবা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর পরেই তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারীর জন্যই সঙ্ঘের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তবে ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ বিধি ছিল। ভিক্ষুদের মতোই পীড়িত, উন্মত্ত, হত্যাকারী নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া সন্তানসম্ভবা ও স্তন্যদায়ী মাতারও অনুমতি ছিলনা এক্ষেত্রে। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণের নিয়মটি বাধ্যতামূলক ছিল। অবিবাহিতাদের পিতামাতা ও বিবাহিতাদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবে অনাথা বা বিধবা নারী নিজ ইচ্ছায় সঙ্ঘে প্রবেশ করতে পারতেন। পিতামাতা অনুমতি না দিলে দৃঢ়সংকল্প কন্যাকে যুক্তির দ্বারা পিতামাতাকে সম্মত করতে দেখা যায়। বৈশালীর বিত্তশালী ব্রাম্ভণকন্যা রোহিণীর পিতা প্রথমে অনুমতি না দিলে তিনি পিতার নিকট বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রজ্ঞা, সদাচার ও কর্মতৎপরতা বিষয়ে গুণকীর্তন করলে পিতা অনুমতি প্রদান করেন। মতাবন্তী নগরের রাজা কোঞ্চের কন্যা সুমেধা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে পিতামাতা বারণাবতীর রাজা অনিকরুত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন। কিন্তু ধর্মানুরাগী সুমেধাকে গৃহত্যাগের সংকল্প থেকে তাঁরা নিবৃত্ত করতে পারেননি। কন্যাকে সম্প্রদান করার জন্য পিতামাতা অনিকরুত্তকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কক্ষে উপস্থিত হলে সুমেধার উপদেশে সকলেরই তাঁর মতানুবর্তী হন। আবার কয়েকটি গাথায় দেখা যায় অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে কন্যারা সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। শাক্য ক্ষেমকের কন্যা অভিরূপনদার সয়ম্বরের দিন তাঁর ঈপ্সিত পাত্র শাক্য যুবক চরভূতের মৃত্যু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হলে পিতামাতা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রব্রজ্যা করান। শ্রাবস্তী নগরের শ্রেষ্ঠীর কন্যা উৎপলবর্ণা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে একাধিক রাজকুল ও শ্রেষ্ঠীকুল থেকে বৈবাহিক সম্বন্ধ আসতে থাকে। কোন একজন পাণিপ্রার্থীর প্রস্তাবে সম্মত হলে অপরদের বিরাগভাজন হতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে দ্বন্ধের ভয়ে শ্রেষ্ঠী কন্যাকে সঙ্ঘে যোগদান করাতে মনস্থ করেন। উৎপলবর্ণা অবশ্য অভিরূপনদার মতো অনিচ্ছায় নয়, সানন্দে পিতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই দুই থেরীর বৃত্তান্ত থেকে অনুমান করা যায় অভিভাবকরা অবিবাহিতা কন্যার সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ ব্যতিরিক্ত সঙ্ঘের ভিক্ষুণী হওয়াকে পরিবারের পক্ষে সম্মানজনক বলে মনে করতেন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কন্যা সুন্দরী নন্দা অভিরূপনন্দার মতো অনিচ্ছায় সঙ্গে প্রবেশ করেন তবে ভিন্ন কারণে। তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন না। কিন্তু গৌতমী, নন্দ, রাহুল, রাহুলমাতা প্রমুখ রাজপরিবারের অনেকেই সঙ্ঘভুক্ত হলে নন্দাও প্রিয় স্বজনদের প্রতি প্রেমবশতঃ সংসার ত্যাগ করেন। বিবাহিত নারীদেরও বিভিন্ন কারণে সংসার ত্যাগ করার কাহিনী থেরীগাথা-অট্‌ঠকথায় পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের বধূ ধম্মা বুদ্ধের ধর্মোপদেশে আকৃষ্ট হয়ে সংসারত্যাগের বাসনায় স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামী তাতে সম্মত না হওয়ায় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। বিশাখ নামক বিত্তশালী নাগরিকের পত্নী ধর্মলিন্না সংসারে বিরক্ত স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন যদিও স্বামী তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রভূত ধনসম্পদ নিয়ে পিতৃগৃহে যাওয়ার বা শ্বশুরগৃহে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আবার বর্দ্ধমাতার গাথায় দেখা যায় বর্দ্ধমাতা এমনই ধর্মপ্রাণা ছিলেন যে একদা এক ভিক্ষুর ধর্ম উপদেশ শ্রবণ করে নিজ পুত্রকে এক আত্মীয়ের হাতে সমর্পণ করে সঙ্ঘভুক্ত হন।

কোনো সমাজে নারীর অবস্থান বোঝার জন্য ঐ সমাজে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত রীতি-নীতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। থেরীগাথা ও থেরীগাথা অট্‌ঠকথায় ভিক্ষুণীদের কাহিনী সে যুগের বিবাহ প্রথা ও নারীদের বিবাহিত জীবনে আলোকপাত করে। ঐ সময় সম্ভবত বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। কেননা একাধিক গাথায় দেখা যায় বয়ঃপ্রাপ্তা হলেই পিতামাতা কন্যার বিবাহ স্থির করেছেন। অট্‌ঠকথায় দেখা যায় সাধারণতঃ অভিভাবকরাই কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করতেন। কন্যার সুখী ও গার্হস্থ্য জীবনের কামনায় তাঁরা সবর্ণ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেন। উজ্জয়িনীর ধনী শ্রেষ্ঠীকন্যা ইসিদাসীর সঙ্গে তাঁর সমান মর্যাদাসম্পন্ন সাকেত নগরের এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। আবার দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা মুক্তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এক কুজপৃষ্ঠ ব্রাহ্মণের। শ্রাবস্তীর দরিদ্র পরিবারের কন্যা সুমঙ্গলের মাতার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এক দরিদ্র ছত্র নির্মাণকারীর। অবশ্য থেরীগাথায় এর ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। যেমন, শ্রাবস্তীর দরিদ্র পরিবারের কন্যা কৃশা-গৌতমীর বিবাহ হয়েছিল বিত্তবান শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে। বহঙ্কার প্রদেশের ব্যাধপল্লীর কন্যা চাপা তার পিতার আদেশে উপক নামক এক তপস্বীকে বিবাহ করেছিলেন। রাজগৃহের কোষাধ্যক্ষ কন্যা ভদ্রার প্রতি স্নেহবশতঃ কন্যার ইচ্ছায় তস্করের সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এই কন্যাই হলেন থেরী ভদ্রা কুন্ডলকেশা। আবার শ্রাবস্তীর রাজকোষাধ্যক্ষের কন্যা পটাচারা পিতামাতা বিবাহ স্থির করলে তাঁর প্রণয়ী গৃহ-পরিচারকের সঙ্গে পলায়ন করেন। সে যুগে পুরুষদের মতো নারীদেরও যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল তার উদাহরণ হলেন ইসিদাসী। তিনি তিনবার বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী না হয়ে গৃহত্যাগের সংকল্প করেন। শ্বশুরালয়ে বধূর প্রাত্যহিক গৃহকর্ম, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য ও সেবার একটি চিত্র ইসিদাসীর গাথায় বর্ণিত হয়েছে । তিনি তাঁর শিক্ষানুসারে যথাকর্তব্য পালন করলেও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন ও পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বৈধব্য জীবনে নারীদের আত্মনিপীড়নের কোনো দৃষ্টান্ত থেরীগাথায় পাওয়া যায় না। বরং সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্মে অনুরাগবশতঃ তাঁরা স্বেচ্ছার ভোগবাসনা ত্যাগ করেছেন। তাঁরা কেশ কর্তন, অলঙ্কার পরিত্যাগ, কাষায় বস্ত্র পরিধান, ভিক্ষান্ন গ্রহণ, একাহার, উপবাস- এসবই করেছেন অর্হত্ত্বলাভের বাসনায়, বৈধব্যহেতু নয়।

থেরীগাথায় দেখা যায় নারীরাও ঐ যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন। পিতার অবর্তমানে কন্যা ও স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী সম্পদলাভের অধিকারী হতেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাকুল হয়ে পিতা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করলেন, এমতাবস্থায় সুন্দরী তাঁর মাতাকে সংসার ত্যাগের অভিপ্রায় জানালে মাতা বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁকে ধনসম্পদ ভোগ করতে বলেন। যদিও তিনি ধনসম্পদ ত্যাগ করে মাতার অনুমতি নিয়ে সঙ্ঘে যোগ দেন।

স্বামী সংসার ত্যাগ করলে ভদ্রা কপিলানী তাঁর স্বামীর সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত সম্পদ আত্মীয়-স্বজনকে দান করে স্বামীর আনুগামিনী হন। আবার, থেরীগাথায় বেশ কয়েকটি গাথায় দেখা যায় ধর্মে অনুরাগবশতঃ বা নির্বাণলাভের বাসনায় নয়, দৈনন্দিন দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও নারীরা সঙ্ঘে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ইসিদাসীর গাথার উল্লেখ করেছি যিনি তিনবার স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারলাভের ফলে স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীরা নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার একটি উপায়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। বিধবা ও অনাথা চন্দ্রা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চরম দারিদ্র-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য সঙ্ঘে আশ্রয় নেন। অপর এক থেরী সোণা দশ সন্তানের জননী হয়েও বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অবহেলায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন। স্বামী সংসার ত্যাগ করার পর তিনি তাঁর বিষয়সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে নিজে ধনহীনা হয়ে অল্পকালের মধ্যেই পুত্র ও পুত্রবধূর নিকট লাঞ্ছিতা হন। উব্বিরী, বাশিষ্ঠী, কৃশা-গৌতমী, পটাচারার পাঁচশত ভিক্ষুণী - এরা সকলেই সন্তান শোকে আকুল হয়ে সঙ্ঘের শরণ নিয়েছিলেন। পটাচারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে গৃহভৃত্যের সঙ্গে পলায়ন করেছিলেন। পরে ঘটনাক্রমে একইসঙ্গে স্বামী, দুই পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকে উন্মাদিনী হয়ে বিবসনা অবস্থায় পথে পথে বিলাপ করে ঘুরে বেড়ালে বুদ্ধ তাঁকে সঙ্ঘে আশ্রয় দেন।

মুক্তা ও সুমঙ্গলের মাতা - এই দুই থেরীর গাথায় দেখা যায় দরিদ্র স্বামীর সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিপীড়ন সহ্য করে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে তাঁরা সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। মুক্তা তাঁর গাথায় স্পষ্টত বলেছেন তিনি কুব্জ স্বামী পরিত্যাগ করে সুখীই হয়েছেন -

"সুমুক্তা হয়েছে মুক্তা, তিন কুব্জমূর্তি মুক্ত হয়ে,
হইতে নমিত তুমি, উথুনি মুসল-পতি-ভয়ে।
জনম-মরণ মুক্ত আজি আমি বাসনার জয়ে।"[৬]

সুমঙ্গলের মাতা অর্হত্বপ্রাপ্ত হয়ে গাইলেন -

"সুমুক্তিকা মোর নাম। মুসল-মুক্তিকা আমি ওরে!
ছাতাটির মত স্বামী (কি নির্লজ্জ।) আচরিত মোরে;
গেছে সে দারিদ্র মোর, আজি বাঁধা নেই ডোরে।"[৭]

অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীরা স্বনির্ভর ছিলেন কিনা, গার্হস্থ্য কর্তব্য ছাড়াও নিজ ইচ্ছানুসারে তাঁরা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন কিনা এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা থেরীগাথায় পাওয়া যায় না। তবে জীবিকা নির্বাহের জন্য দাসীবৃত্তি ও গণিকাবৃত্তি অবলম্বনের কথা পাওয়া যায়। শ্রাবস্তী নগরের শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডকের ক্রীতদাসী পূর্ণা প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে প্রভু তাঁকে দাসত্ব হতে মুক্ত করলে প্রভুর অনুমতিক্রমে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। আম্রপালী, অর্ধকাশী, বিমলা ও অভয়া – এই চারজন থেরীর গাথায় জানা যায় তাঁরা পূর্বাশ্রমে গণিকা ছিলেন। এই রূপবতী বারবণিতারা যে অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন অর্ধকাশীর গাথায় তার পরিচয় পাওয়া যায় -

"যতখানি কাশী জনপদ - ছিনু ধনী ততেক সম্পদে;
অর্ঘ্যরূপে কাশীবাসী কত শুল্ক সমর্পিত পদে।"[৮]

থেরীগাথার কবিতাগুলি ও অট্‌ঠকখার ভাষ্য থেকে অনুমেয় বুদ্ধযুগে সংসার জীবনে বৈরাগ্যবশতঃ স্বেচ্ছায় হোক বা পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার হোক সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণের মাধ্যমে সে যুগে নারীরা এক সম্মানজনক জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। নিরাপদ আশ্রয়ে ত্যাগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চর্চায় মুক্তির আস্বাদ লাভ করেছিলেন। স্বামী পরিত্যক্তা, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অবহেলা, গণিকার বার্ধক্যজীবন, গার্হস্থ্য উৎপীড়ন - জীবনের এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নারীরা সঙ্ঘের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত ও মর্যাদাজনক জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। বুদ্ধযুগের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আধুনিক ভারতের আইনি রক্ষাকবচ কিছুটা স্বস্তি দিলেও নারীজীবনকে সম্পূর্ণ সংকটমুক্ত করতে পারেনি। ভিক্ষুণীদের গাথায় নারীজীবনের যে সব সামাজিক সংকট প্রকট হয়েছে, একুশ শতকের সমাজজীবনেও সে সব সমান প্রাসঙ্গিক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 891 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. Hallisey, Charles, 2015, p.xii
২. তপস্বী অলকা, ২০১৬, পৃ. (গ)
৩. Hallisey, Charles, 2015, p.vii
৪. তপস্বী অলকা, ২০১৬, পৃ. ৪৩
৫. তদেব, পৃ. ৭
৬. তদেব, পৃ. ৩৮
৭. তদেব, পৃ. ৪৫
৮. তদেব, পৃ. ৪৬

Bibliography:

চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৪
লাহা, বিমলাচরণ, বৌদ্ধ রমণী, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ১৯৯৯
তপস্বী, অলকা, থেরীগাথায় নারীজীবন, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৬
শীলভদ্র, ভিক্ষু, থেরীগাথা, মহা বোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৬
সুমনপাল ভিক্ষু, থেরী অপদান (বঙ্গানুবাদ), বোধি-নিধি পাবলিকেশন, কোলকাতা, ২০১৫
Barua, Manmatha Kumar, The Great Ladies in Buddha's Life, Maha Bodhi Book Agency, Kolkata, 2012
Hallisey, Charles, Therigatha - Poems of the First Buddhist Women, Murthy Classical Library of India, Harvard University Press, London, 2015
Barua, Subhra. Monastic Life of the Early Buddhist Nuns, Atisha Memorial Publishing Society, Calcutta, 1997
Murcott, Susan, First Buddhist Women - Poems and Stories of Awakening. Parallax Press, Berkeley, California, 2006
Altekar, A.S, The Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2016
Paul, Diana Y, Women in Buddhism, University of California Press, London, 1985

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 899 - 909
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নদিয়ার অপরাধের গতিপ্রকৃতি ও ডাকাতির সুলুকসন্ধান

তৃষা মণ্ডল
Email ID : trishamondal270@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
নদিয়া জেলা, উনিশ শতক, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, অপরাধ, ডাকাতি , জমিদার শ্রেণীর, লাঠিয়াল, সাধারণ মানুষ, সরকারী উদ্যোগ, ডাকাতির গতিপথ পরিবর্তন।

Abstract

In the British period specially Nineteenth Century is known for its glorious revolution of knowledge, reformation of society and making of new type of humen who has come across with Western knowledge system. But besides of this one side analysis there were numerous incidents in this period which hasn't get so much popularity like this and among these we've chosen the criminality in a district or division of colonial Bengal province. From the 16th century this district had a grorious effect in knowledge system, king Krishnachandra was a popular king residented here. But after the establishment of British East India company in Bengal, they wanted to capture all the power into their own hand. As a result governor Cornwallis established Police system in the last half of the 18th century. As the result all the zamindars in this province had lost most of their political powers which they couldn't accept. They took the help of the Lathials and the Nadia's zamindar's were among them. There were numerous zamindars in this district, most of them had captured their power by Lord Cornwallis's Land-revenue system. Pal Chowdhury was one of them. But there were some old zamindars also, like- Krishnanagar Raj Paribar, Nakashipara Zamindari etc. All of them had a same issue, they all had a or more-great Lathials, who work as a lathial at the day and at the night they all part as a Dacoit and this was increasing day by day. One time it came out at the sight of British governor and government took this advantage to supress again the Indian common people. This was one type of dacoit, most of the dacoits were among them. But there were numerous types of criminals, not only the dacoits, from the records of the Government we come across with them and we become surprise on seeing that the same crime isses were those days which we face today. Like- Rapes, Burglaries, Killing, marriage problem etc. and also suprising thing that the dacoity type also had changed in the second half. People don't go together to do any dacoity, there was also no use Mashal or worshiping like Kalimata, rather it had become smarter with the situation. In this writing we've tried to find out the Criminality and specially how dacoity was there in the district of Nadia in nineteenth century.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

অপরাধের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে কাজ আইনবিরুদ্ধ তাই অপরাধ। অপরাধ সব সময় আইনবিরোধী কার্যকলাপ, যে কাজ ফৌজদারি আইনকে লঙ্ঘন করে।[1] কোনো অপরাধের ফৌজদারি মনে হলেও, সেই অপরাধ সম্বন্ধীয় কোন আইন না থাকলে অপরাধ বলা যায়না সেটিকে। যেমনভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধ সম্পর্কিত চিন্তাধারা, অর্থাৎ কাকে অপরাধ বলব আর কাকে নয় তা পরিবর্তিত হয়েছে। বিধবাবিবাহ ও সতীদাহের কথা প্রসঙ্গত আনা যায়।

ফৌজদারি অপরাধ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপি ইত্যাদি মোটা দাগের অপরাধ, যেগুলির মধ্যে থাকে সুপ্ত বা প্রকাশ্য অমানবিক মানসিকতা। হিংসার মিশ্রণ থাকে এইসব অপরাধের সঙ্গে। কিন্তু কিছু ফৌজদারি অপরাধ এই হিংসাশ্রয়ী অপরাধের তালিকায় পড়ে না। অপরাধ সংগঠিত হয় হিংসার প্রকাশ ছাড়াই, যেমন - জাল, জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি। এই দুরকম অপরাধে জড়িত অপরাধীর শ্রেণিচরিত্র ভিন্ন। চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপি সাধারণত করে থাকে সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষ যারা অশিক্ষিত এবং অসংস্কৃত। কিন্তু জাল-জালিয়াতি করে তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত, সমাজে সম্মানজনক স্থানে যাদের অবস্থান। ইংরেজিতে এই অপরাধীদের বলা হয়েছে White-Collar Criminal. এই অপরাধের উৎসস্থল কলকাতার মতো শহর, নগরায়ণের অবাঞ্ছিত উপহার। কলকাতায় এই অপরাধের সূচনা করেছিলেন কলকাতার প্রথম ডেপুটি জমিদার নন্দরাম সেন, পরে গোবিন্দরাম মিত্র। সায়েবদের মধ্যে এরকম অপরাধের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ক্লাইভ, অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সই জাল করে।

অভাব-তত্ত্ব অপরাধের কারণ হিসেবে আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়। প্রয়োজনটা কি ধরণের এবং কতটা পরিমাণের, তার ওপর নির্ভর করে অপরাধীর চরিত্র। আঠারো শতকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ যেসব ডাকাতি করত, দেখা যেত ডাকাতরা ডাকাতি করতে গিয়ে কোনও মূল্যবান জিনিস বা সোনা-দানা, টাকা পয়সায় হাত দেয়নি, কেড়ে নিয়েছে গোলাভরা ধান কিংবা অন্য কোনও আহার্য বস্তু। কিন্তু অনেক জমিদারের নেশাই ছিল ডাকাতি করা। তারা ডাকাতি করত বংশপরম্পরায়, নিচু জাতের পেশাদার ডাকাতদের মতো। শহরের অপরাধে ছিল ভিন্ন রঙ। শহুরে জীবন উপভোগের আকাঙ্ক্ষায়, লাগামহীন অর্থলিপ্সার তাড়নায় সংগঠিত হত অপরাধ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অপরাধজগত ও নদিয়া জেলা : মনু বলেছিলেন, যে রাজা প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে অথচ তাদের সুরক্ষা ও নিরপত্তার ব্যবস্থা করে না, সে জঘন্য অপরাধে অপরাধী। বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই অপরাধে অভিযুক্ত হন। গ্রামীণ আপরাধদমনে প্রাক-ব্রিটিশ শাসনকালে জমিদারদের যে ভূমিকা ছিল তাতে আঘাত হানেন কর্নওয়ালিশ। জমিদারদের হাতে যে পুলিশি কর্তৃত্ব ও অপরাধীদের বিচারের ক্ষমত ছিল তার ভাল মন্দ বিচার না করে তিনি তাদের হাত থেকে কেড়ে নেন সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। অথচ জমিদারি পুলিশের পরিবর্তে কোম্পানির প্রবর্তিত পুলিশি ব্যবস্থা সফল হতে পারেনি। যার অনিবার্য পরিণাম ছিল অপরাধ বৃদ্ধি।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাগুলোতে প্রচলিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অপরাধগুলির মধ্যে ছিল- রেপ, শিশুহরণ, ভয়াবহ যন্ত্রপাতি সহ আঘাত, মাডার, গবাদি পশু চুরি, চুরি করা সম্পত্তি গ্রহন, জালিয়াতি, ডাকাতি ইত্যাদি। 'রিপোর্ট অফ দ্য পুলিশ অফ দ্য লোয়ার প্রোভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'-র ১৮৭৭-৮০ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আইন করে এইসময় এই সকল ক্রিয়াকলাপগুলিকে 'অপরাধ' হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। ফ্রেডারিক জে, মাউত তাঁর জেল রিপোর্টে জানিয়েছেন, ১৮৫৭ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে ৪৮২ জন কয়েদি ছিল নদিয়ার দয়ার জেলে, যাদের মধ্যে ১৪ জন বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। এই ১৪ জনের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এদের মধ্যে - ৫ জন চুরি, ২ জন ডাকাতি, ১ জন মার্ডার, ২ জন গবাদি পশু চুরি, ১ জন চুরি করা সম্পত্তি গ্রহণ, ১ জন জালিয়াতি এবং ১ জন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।[2]

সরকারি রিপোর্ট থেকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্যান্য জেলাগুলোর অপরাধজগতের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সালের 'রিপোর্ট অফ দ্য লোয়ার প্রোভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' অনুযায়ী, যশোরে ১৮৭৭ সালের ৯টি হত্যাকান্ডের ঘটনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘটেছিল, অন্যদিকে ২৪ পরগণা জেলায় তা ছিল ৭টি। তবে সবথেকে বেশি ঘটেছিল ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, চাকরদের অথবা মহিলাদের দিয়ে চুরি, অথবা অন্যান্য খারাপ কাজে বাধ্য করার মতো ঘটনাগুলি।[৩] নদিয়াতে যেখানে মাত্র ২৭টি মামলা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের জন্য করা হয়েছিল, ২৪ পরগণাতে তা ছিল ৫৯টি, যার মাধ্যমে প্রায় ৩৫ জন দোষী চিহ্নিত হয়েছিল; যশোরে জেলায় দোষীর সংখ্যা ছিল ৬৪টি, ৮১টি মামলার মাধ্যমে যা হয়েছিল, তবে মুর্শিদাবাদে মাত্র ৫ জন দোষী চিহ্নিত হয় ১১টি এই ধরনের ঘটনায়।[৪] বস্তুত এই চিত্রায়ন তৎকালীন সময়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অপরাধ জগৎকে পরিস্ফুট করে।

উক্ত অপরাধগুলোর মধ্যে অবশ্য ডাকাতির মাত্রা অধিক চোখে পড়ে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে নবদ্বীপ, শান্তিপুর থানার থানার দারোগা গিরিশচন্দ্র বসুও তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন -

> "আমি যে কালের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতেই ডাকাতির প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যদিও ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় রসুনাথ, বৈদ্যসাথ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি দস্যুগণ যেভাবে অকুতোভয়ে গৃহস্বামীকে পূর্বে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকাতি করিত, এই সময়ে সেই প্রথার অনেক লাঘব হইয়াছিল, তথাপি ডাকাইতি ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত এবং কখনও কখনও অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস ঘটনা সহকারে তাহা নির্বাহিত হইত।"[৫]

নদিয়া জেলাতেও এই ডাকাতি ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত অপরাধকর্মগুলোর একটি। এটি যেমন একশ্রেণীর মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, অন্যদিকে একদল মানুষের অন্নসংস্থান এবং আরেকদল মানুষের উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, ডাকাতি জনজীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।

ব্রিটিশ বিচারপতি এবং প্রশাসকরা ইতালীয় ডাক্তার Cesare Lombroso-এর (১৮৩৬-১৯০৯) জিন ঘটিত বা বংশজাত অপরাধ তত্ত্ব প্রয়োগ করতেন এদেশের অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, এদেশের অপরাধীরা বংশগতভাবেই অপরাধী। অপরাধপ্রবণতা তাদের রক্তে। তাই বাগদি, ডোম প্রভৃতির মতো নিচু জাতের মানুষকে তাঁরা দাগিয়ে দিয়েছিলেন অপরাধপ্রবণ জাত বলে।[৬]

জন উইলিয়াম কায়ের তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Suppression of Thuggee and Dacoity'-এও ডাকাতির ক্ষেত্রে একইরকমভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে -

> "I do not mean that there was no such thing as accidental that men not bred and born to the profession Dacoity never, under the force of accidental circumstances, took to Dacoity for a livelihood-but that it was established upon a broad basis of hereditary caste, and was, for the most part, an organic state of society."[৭]

কিন্তু দেখা গেছে, ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ সালে নদিয়া ডিভিশনের নদিয়া জেল' - এ যে ১৪ জন বিভিন্ন অপরাধে নিযুক্ত অপরাধীর মৃত্যু হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল গোয়ালা, কায়স্থ, ধোবি, হিন্দু, চন্ডাল, ক্যাওড়া, বোমী, মুসলমান (৫ জন) সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা।[৮]

আলিপুর জেলেও যে ২০৩ জন অপরাধী মারা গিয়েছিল, তারা বর্মি, রাজপুত, ডোম, সিপাই, সাঁওতাল (২২ জন), বর্মি, ক্ষত্রী, বিন্দ, ঘাটাল, পোদ, বুমী, সদগোপ, বাগদি, হিন্দু (১১৫ জন), মুসলমান (৪০ জন) সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল।[৯] অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ জেলে এইসকল অপরাধীরা গোয়ালা, সদগোপ, রাজবংশী, পুরা, বিষ্টা, ধোবী, হিন্দু, মুসলমান (৫ জন) সম্প্রদায় থেকে এসেছিল।[১০] পক্ষান্তরে, যশোর জেলে কেবলমাত্র হিন্দু (৬ জন) এবং মুসলমানদের কথাই জানা যায়।[১১] অর্থাৎ, কোনোভাবেই নির্দিষ্ট করা যায় না যে, অপরাধীদের আবির্ভাব ঘটেছে নির্দিষ্ট শ্রেণী থেকে। বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে মানুষেরা এ সময় অপরাধজগতে প্রবেশ করেছিল, অনেকটা বর্তমানের মতোই।

A. দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকে নদিয়ার অপরাধজগতের গতিপ্রকৃতি : নদিয়া জেলা ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই ছিল অপরাধপ্রবণ একটি জেলা। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অপরাধগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া খুবই দুষ্কর। ১৮১৭ সালে একজন পরিদর্শক লিখেছিলেন -

> "I was in Zillah Nadia the year previous to the development of its real internal condition. There was apparently no business for the magistrate. His darogah sent him no reports of dacoities and murders. The arrears in business were small; the duties of his office were easily performed by the magistrate. They occupied, perhaps an hour or two of the day. His assistant had a very easy life."[১২]

এই বক্তব্য থেকে মনে হয়, অধিকাংশ অপরাধের খবর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছাতো না। অন্যদিকে, দারোগারা অধিকাংশ সময়ে অপরাধীদের অর্থের বিনিময়ে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকতেন। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যগুলিও যে সর্বাংশে সত্য হবে না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

১৮৫০ সালের বাংলার নিম্নপ্রদেশের পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, এই বছরে নদিয়া জেলাতে ৯টি মার্ডার, ৭টি দাঙ্গা, ৭৫৬টি ছিনতাই এবং ২৫৭টি চুরির ঘটনা ঘটেছিল, আর ডাকাতি হয়েছিল ১০২টি।[১৩] পরের বছর অর্থাৎ, ১৮৫১ সালে এই সংখ্যা কিছু ক্ষেত্রে বেড়েছিল। যেমন, মার্ডারের ঘটনা দাঁড়িয়েছিল ১২টিতে, অন্যদিকে চুরির সংখ্যা ২৫৮ হয়েছিল, একই সঙ্গে ডাকাতিও হয়েছিল ১০৯টি। তবে, ছিনতাই কমেছিল, ৬২৫ ছিল তার সংখ্যা এবং দাঙ্গা ১টি কমেছিল।[১৪]

১৮৫২ সালের দিকের রিপোর্টে এই সংখ্যা আরও হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। তবে, ১৮৫৩ ও ১৮৫৪ সালে তা আবার বর্ধিত হয়। নিম্নের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাতেই তা স্পষ্ট হয়[১৫] -

Year	Murder	Dacoities	Affray	Burglaries	Theft
1853	12	74	3	739	285
1854	16	28	41	456	153

তবে, লক্ষ্যণীয় যে, ১৮৫৫ সালে বিশেষ পুলিশ আইন পাশ করা হয়েছিল। একই সাথে পূর্বের ঠগি এবং ডাকাতি আইনও সংশোধিত হয়েছিল এইসময়। অবশেষে আপরাধগুলির আশ্চর্যজনক বৃদ্ধির প্রভাবে ১৮৫৭ সালেও অপর একটি পুলিশ আইন পাশ করা হয়েছিল। অতঃপর ১৮৬১ সালেও এই রকম একটি আইন পাশ হতে দেখি আমরা।

১৮৬০ এর দশকে এইসকল কাঠারতার প্রভাবে এই জেলার অপরাধজগতের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে অগ্রসর হয়েছিল, তা বিশেষ জানা যায় না। তবে, গিরিশচন্দ্র বসুর লেখাপড়ে মনে হয় যতটা দৃঢ়তার সাথে আইন পাশ করা হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন সম্পূর্ণতা পাইনি। কারণ-ছিল পুলিশি ব্যবস্থার গোড়াতেই গলদ। তিনি লিখেছেন -

> "টাকা লওয়াটা সাধারণ প্রথা ছিল এবং পূর্ব্বে সাহেবরা অনেকেই এই দোষে মুক্ত ছিল না। বর্তমান সময়ে ঘুষ লওয়াকে আমরা যেমন দুষ্কর্ম মনে করি, তখন লোকের সে জ্ঞান ছিল না। ঘুষ না দিলে কোনও কার্য্য হইত না।"[১৬]

এমনকি, ডাকাতদের সঙ্গে থানার দারোগা এমনকি চৌকিদারদের যোগসাধনের কথাও জানা যায় সরকারি রিপোর্টগুলি এবং সমসাময়িক লেখনীগুলি থেকে।[১৭] পাশাপাশি ডাকাতি বা অন্যান্য কারণে লুণ্ঠনীকৃত দ্রব্যের ক্রেতা হিসাবে আবির্ভাব ঘটেছিল 'থাঙ্গিদার' - নামক একশ্রেণীর পেশাজীবি মানুষদের।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে, অপরাধ সংঘটিত হচ্ছিল ব্যাপকহারে। ১৮৫৫ সালেই ২০টি মার্ডারের ঘটনা ঘটেছিল। হানাহানি এবং ডাকাতির সংখ্যা কিছুটা কমলেও তার পরিসংখ্যা খুব বেশি হ্রাস পায়নি, যেমন - ডাকাতি হয়েছিল ১৮টি, অন্যদিকে হানাহানি ঘটেছিল ৩৪টি।[১৯] পরবর্তী বছরে অবশ্য আশ্চর্যজনকভাবে মার্ডার, হানাহানি এবং ডাকাতির পরিমাণ খুবই কমে গিয়েছিল, কিন্তু বিস্ময়জনক বৃদ্ধি ঘটে ছিনতাই (৬০৪) এবং চুরির (৩৫৫) ক্ষেত্রে।[২০] এর প্রকৃত কারণ কী ছিল আমরা জানতে অপারগ।

'বেঙ্গল পুলিশ অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান রিপোর্টস' (১৮৬৪-১৯১২) যদি আমরা দেখি, ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৪৪টি মার্ডারের ঘটনা ঘটেছিল। অন্যদিক, 'Robbery' হয়ে ছিল ১৪টি। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ, ১৮৬৬ সালে দেখি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দাঙ্গা ঘটেছে ১৪২টি, ডাকাতির সংখ্যাও ১১৭টি। অন্যান্য আপরাধগুলির মধ্যে রবারি ৫২টি, খুন ৬৮টি, তছরুপি, ১৬৪০টি এবং চুরি ৩৬৫৫টি ঘটেছে।[২১] অনুমান করা যায়, উক্ত ঘটনাগুলির কিছু অন্তত নদিয়াতেও সংঘটিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

B. পরবর্তী দশকগুলোতে অপরাধের চালচিত্র : উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকের তুলনায় পরবর্তী তিন দশকে ডাকাতির পরিমাণ খুবই হ্রাস পেয়েছিল প্রেসিডেন্সি বিভাগে। যদিও সরকারি নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যায় ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল। ১৮৭০ সালে যেখানে বাংলায় ডাকাতি হয়েছিল ৩৪টি, ১৮৭১ সালে তা ৪০টিতে পৌঁছেছিল, এবং ১৮৭২, ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে – ৫৩, ৫৬ ও ৯০টি।[২২] সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮৭৭ সালে নদিয়ায় মাত্র তিনটি ডাকাতিতে পুলিশকে সংযুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে ১৭ জন দোষী হিসেবে স্বীকৃত হয়। তবে, অন্যান্য অপরাধগুলোর প্রভূত সন্ধান এই রিপোর্ট থেকে নদিয়া জেলাতে পাওয়া গেছে, যেমন – ২টি হত্যাকাণ্ড, ১৩টি ধর্ষণ, ৩টি শিশু পাচারের ঘটনা, ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে আঘাতের জন্য ২৭টি মামলা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ১৯ জন দোষী হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, অপহরণ হিসেবে ১৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, ৯ জন দোষী চিহ্নিতও হয়েছিল।[২৩]

বস্তুত, এই সময়ে অন্যান্য জেলাগুলোতে অপরাধের সংখ্যা, অন্তত সরকারি রিপোর্টে খুবই হ্রাস প্রাপ্ত দেখা যায়। ১৮৭৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, চব্বিশ পরগনা জেলায় মাত্র ৭টি মামলা পুলিশের হাতে আসে এবং ১ জন দোষী হিসেবে চিহ্নিত হয়। যশোর জেলাতেও ২টি মামলাতে ১ জন দোষী চিহ্নিত হয়েছিল। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে মাত্র ৪টি মামলা পুলিশের দোড়গোড়ায় পৌঁছেছিল, যার মাধ্যমে ১ জন দোষী চিহ্নিত হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, নদিয়াতে যেখানে মাত্র ২৭টি মামলা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের জন্য করা হয়েছিল, চব্বিশ পরগণাতে তা ছিল, ৫৯টি, যার মাধ্যমে প্রায় ৩৫ জন দোষী চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে যশোহর জেলাতেও একই অপরাধে ৬৪ জন দোষী চিহ্নিত হয়। অবশ্য মুর্শিদাবাদে মাত্র ৫ জনকে একই ১১টি দোষী সাব্যস্ত হতে দেখা যায়।[২৪]

১৮৭৯ সালের ‘রিপোর্ট অফ দ্য পুলিশ অফ দ্য লোয়ার প্রভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি’- এর রিপোর্টে দেখা যায়, ডাকাতির ঘটনায় মামলার সংখ্যা কমেছে এবং ১টি ঘটেছে মাত্র; যেখানে মুর্শিদাবাদে দেখা গেছে ৪টি ডাকাতি মামলা এবং চব্বিশ পরগণাতে ২টি যদিও।[২৫] অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে আঘাতের পরিমাণও কিছুটা কমতে দেখা গেছে নদিয়াতে। রিপোর্ট অনুযায়ী, চব্বিশ পরগনাতে এই কারণে যেখানে ৫৭টি এবং যশোহর জেলাতেও ৪৩টি মামলা দায়ের করা হয়, যার মাধ্যমে যথাক্রমে ৩৩ ও ১৫ জন অপরাধী চিহ্নিত হয়, নদিয়া জেলাতে সেই তুলনায় দেখা যায়, মাত্র ১৫টি মামলা হয়েছে উক্ত অপরাধে, যার জন্য ৮ জন অপরাধী চিহ্নিত হয়েছে।[২৬] অবশ্য অপরাধের অভিপ্রায়ে লুকিয়ে ঘরে প্রবেশ, বা ভেঙে ঘরে ঢোকার জন্য মামলার দৃষ্টান্ত ছিল চমকপ্রদ — চব্বিশ পরগণাতে ৫৪২টি মামলা দায়ের, যার মধ্যে ১০৯টি ঠিকঠাক প্রমাণিত হলেও, নদিয়াতে দায়ের করা মামলার সংখ্যা দেখা গেছে ৭৯২টি, ৮৮টি যার মধ্যে সঠিক চিহ্নিত হয়েছে।[২৭] এর পাশাপাশি কিছুটা কম হলেও ছিল, কিডন্যাপ, মার্ডার, রবারি, ধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনাগুলো।

শতাব্দীর শেষের দিকেও এই অপরাধপ্রবণতার কোনও ব্যত্যয় হয়নি। কালেক্টর নবীনচন্দ্র সেন যিনি, ১৮৯৩ সালে ফেনী থেকে রানাঘাটের কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রায় চার বছর রানাঘাট সাবডিভিশনের চারটি মিউনিসিপ্যালিটি— রানাঘাট, শান্তিপুর, উলা এবং চাকদহের সমকালীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাঁর বর্ণনা থেকে নদিয়ার অপরাধ জগতের পরিচয় পাওয়া যায়; বুঝতে পারা যায়, সেসময় ডাকাতি কীরকম সহজলভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পাশাপাশি উঠে আসছিল — নারীদের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ, সম্পত্তি নিয়ে মামলা, বিশ্বাসঘাতকতা, জুয়োচুরির মতো ঘটনাবলীও।[২৮]

নবীনচন্দ্র সেনের বর্ণনায় শ্লেষ চোখে পড়ে, যখন তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন —

> “আর সেই ‘শান্তিপুর, ডুব ডুব, নদে ভেসে যায়’ — সেই প্রেমের বন্যা, যাহাতে প্রাণ জুড়াইতে আমি রানাঘাট বদলিতে আনন্দিত হইয়া শান্তিপুর আসিয়াছিলাম, সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সেই সীতানাথ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অদ্বৈতের সন্তানেরা আজ কেহ মিউনিসিপেল কমিশনার, কেহ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ বা শান্তিপুরের খ্যাতনামা বদমায়েস!"[২৯]

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকে নদিয়ার ডাকাতির সুলুকসন্ধান : নদিয়া জেলা ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল থেকেই ছিল অপরাধপ্রবণ একটি জেলা। অপরাধগুলোর মধ্যে ডাকাতি একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অপরাধগুলোর মধ্যে প্রথমতম। উনিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই বিশ্বনাথ, রঘুনাথ, রানা ডাকাতদের মতো দস্যুদের কৃতিত্ব জনমানসে নদিয়া জেলায় ডাকাতিকে একটি বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকেও আমরা বিপুল সংখ্যক ডাকাত এবং তাদের নদিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে ডাকাতির পরিচয় পাই।

নদিয়াতে এই সময় স্থল এবং নদীপথ, উভয় প্রকার ডাকাতিরই সন্ধান পাওয়া যায়। (প্রসন্নময়ী দেবীর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'পূর্ব্বকথা'-তে এই নদীপথে ডাকাতির পরিচয় পাওয়া যায় -

> "তখনকার দিনে রাজসাহী হইতে নৌকা যোগে কলিকাতা গমনাগমন যে কত বিপদসঙ্কুল তাহা এদিনে বুঝান বড় শক্ত। পদে পদে লুটেড়া ডাকাত, রাহাগির ও ঠগী। জীবন হাতে করিয়া চলিতে হইত। নদীয়ার গড়োগোয়ালারা সব ডাকাত এবং জমীদারের জ্ঞাতসারেই এ কার্য্য করিত। ডাকাতেরা দিনে গৃহস্থ ব্যক্তির মত নদীতীরে বসিয়া থাকিত, যমদূত বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না।"[৩০]

১৮৫৭-৫৮ সালের ডাকাতি উচ্ছেদ কমিশনের রিপোর্টে ডাকাতি কমিশনার টি.ই. রাজেনশাউ দেখিয়েছেন ১৮৫০ সালে নদিয়া জেলায় ১১৪টি ডাকাতি হয়েছিল। অন্যদিকে ১৮৫১ সালে হয়েছিল ১২৫টি, ১৮৫২ সালে ৬৭টি, ১৮৫৩ সালে ৭১টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে ডাকাতির সংখ্যা কিছু কমতে থাকে। ১৮৫৪ সালে যেমন ৪১টি ডাকাতির পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যদিকে ১৮৫৫ সালে ২৩টি, ১৮৫৬ সালে ৮টি। কিন্তু, ১৮৫৭ সালে এই সংখ্যা কিছু বেড়ে, ১৫টি হয়েছিল। এমনকি ১৮৫৮ সালেও তা একই সংখ্যাতেই ছিল।[৩১]

১৮৫৫-৫৬ সালের ডাকাতি উচ্ছেদ কমিশনের রিপোর্টে জে. আর. ওয়ার্ডের বক্তব্য থেকে সেসময় শান্তিপুর ও সুখসাগরে অবস্থিত বৃহৎ ডাকাতদলের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩২] অন্যান্য স্থানের মধ্যে রানাঘাটেও ছিল বৃহৎ ডাকাতদলের অস্তিত্ব। নদিয়ার পূর্বদিকে কাগজপুকুরিয়া থানাতে ডালু এবং সোনা সর্দারের বড়ো ডাকাতদলের কথা জানা গেছে।[৩৩] স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণনগরের মায়াকোলের গোয়ালা গ্যাংয়ের অস্তিত্বের কথা বলেছেন।

এই সকল ডাকাতদলের পরিচালিত ডাকাতিগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সময়ে বিখ্যাত মানিক ডাকাতের স্বীকারোক্তিতে ঘর ডাকাতির প্রমাণ পাওয়া যায়। সে তার প্রথম ঘর ডাকাতি অগ্রদ্বীপ থানার জগন্নাথপুরে পদ্মযোগীর বাড়িতে করেছিল।

"ভাগ্যি ভালো যে দোকানের চুলো তখনও জ্বলছে। সে চুলো থেকে খড়ে আগুন রিয়ে নিয়ে আবার পদ্ম'র বাড়ীতে এসে চড়াও হ'লাম। বাড়ীটা মাটির বটে, কিন্তু তালা। দরজা দুটো - আমরা পশ্চিমের দরজা ঘেঁষে একটা গর্ত করে ফেললাম। ঢুকে দেখি যে বারান্দায় দু'জন মেয়েছেলে ঘুমোচ্ছে- তাদের একজনের হাতে রূপোর গয়না। গুলি নিয়ে কয়েকজন ওপর তলায় উঠে গ্যালো। সেখানে পাওয়া গ্যালো শুধু একটী - মেয়েরা বললে যে পদ্মযোগী কাপড় খরিদ করতে বাইরে গেছে, ঘরে নেই। পূবের বারান্দায় গিয়ে দেখি যে দু'জন লোক তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের টেনে তুলে কাঁকাকাকি করলাম অনেক। কিন্তু তারা দু ঠোঁট ফাঁকই করলে না। তখন তালা ভেঙে আমরা আর একটী ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সেখানে একটি বড় গোছের সিন্দুক ছিলো-সেটাও ভাঙা হ'লো। এত মেহনতের ফল এতক্ষণে ফসলো। সিন্দুকের মধ্যে থবে থবে নোতুন কাপড় চোপড় সাজানো। আমবা সে সব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিলাম।"

অন্যদিকে এ সময় নাকাশি পাড়ার জমিদারদের ডাকাতি পোষণে সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালের ২৭ জুন গ্রেফতার হওয়া বিষ্টু ঘোষের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সে গলাকাটা হরিশের মাধ্যমে নাকাশিপাড়ার জমিদার ইশান বাবুর অধীনে লাঠিয়াল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল ৭ টাকা ২ আনায়।[৩৪] হরিশ ঘোষ, যে 'গলাকাটা হরিশ' নামেই অধিক

প্রসিদ্ধ ছিল, সে প্রথমে ইশানবাবু এবং পরবর্তীতে নাকাশিপাড়ার অপর জমিদার কেশব বাবুর হয়ে কার্যে নিযুক্ত ছিল।[৩৫] সে জানিয়েছিল -

> "If we said 7 or 8 rupees was not enough pay, they replied they would give more, and we must get where we can. The Zamindari amlah all knew very well we commit Dacoity. The Zamindars never prevent us, because we fight for them and the cannot without us."[৩৬]

বস্তুত সরকার এই সময় উত্তরোত্তর ডাকাতি বৃদ্ধির আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ঠগী নিধন কমিশনের মতোই ডাকাতি উচ্ছেদ কমিশন গঠন করেছিল। কর্নেল স্লিম্যান একসময় যার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বস্তুত এই কমিশনের অতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে ক্রমশ এরা গ্রেফতার হতে থাকে।

থানার নাম	**ডাকাতি অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের নাম**
সুখসাগর	• রাধাপোতনি বাগদি • আনন্দ বাগদি • ভীম বাগদি • নীলকমল ঘোষ • বদন মুসলমান • পরাণ মুসলমান • আজরাঙ শাহ মুসলমান • দুলাল মুসলমান • শার্তুক মুসলমান • কেষ্ট মুচি প্রমুখ।
রানাঘাট	• মদন ঠিকরে • কানাই ঘোষ • গঙ্গারাম ঘোষ • মধু ঘোষ • গোপী গাঙ্গুলী
চাকদহ	• বলাই সর্দার • কার্তিক শেখ • প্রেম শেখ • তারাচাঁদ শেখ • বরোদা ব্রাহ্মণী • সোনা ধোপানী • রামাজান শেখ প্রমুখ।
নদীয়া (বর্তমান নবদ্বীপ)	• রামকুমার ঘোষ • পারু ঘোষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

	• রঘুনাথ ঘোষ গোয়ালা • গদাধর ঘোষ • তিনু ঘোষ • তারিফ মুসলমান • চিনিবাস বাগদি
শান্তিপুর	• সুখা মুসলমান • হরিশ ঘোষ গোয়ালা • রাধানাথ মেথর গোয়ালা • নন্দ ঘোষ গোয়ালা • মাধব ঘোষ প্রমুখ।
কোতোয়ালী	• হরিশ ঘোষ • বিষ্টু ঘোষ • খুদি ঘোষ • জরিপ শেখ • কুবের ঘোষ গোয়ালা প্রমুখ।
মেহেরপুর	• রাজিব যোগী • নুসি শেখ।
করিমপুর	• জরিপ সর্দার • কাদির মুসলমান • কাদির শেখ • জিতু খান • কুকড়া শেখ প্রমুখ।
কাগজপুকুরিয়া	• সুকুর শেখ • শেখ তাজিমুদ্দিন • গোবর্ধন মুসলমান • ভোলে শেখ • নীলু সর্দার মুসলমান প্রমুখ।
অগ্রদ্বীপ	• মদন ঘোষ • লোকনাথ যোগী • ভীম ঘোষ • মেছু ঘোষ • গণেশ ঘোষ প্রমুখ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তথ্য : SELECTIONS FROM THE RECORDS or THE GOVERNMENT OF BENGAL, Published by Authority., N°. XXVI. & SELECTION'S FROM THE RECORDS OF THE BENGAL GOVERNMENT. Published by Authority, N°. XXXI

দ্বিতীয়ার্ধের পরবর্তী দশকগুলোতে ডাকাতির সুলুকসন্ধান : উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকের তুলনায় পরবর্তী তিন দশকে ডাকাতির পরিমাণ খুবই হ্রাস পেয়েছিল। যদিও সরকারী রিপোর্ট জানাচ্ছে সমগ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগে ১৮৭০-১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ডাকাতির বৃদ্ধি হচ্ছিল ক্রমশ।[৩৭] যদিও, রিপোর্ট বলছে, ১৮৭৭ সালে নদিয়াতে মাত্র তিনটি ডাকাতির খবর পুলিশের কাছে পৌঁছোয়, যার ফলে ১৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।[৩৮] এরপর, ১৮৭৯ সালের 'রিপোর্ট অফ দ্য পুলিশ অফ দ্য লোয়ার প্রভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' - এর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, নদিয়া জেলায় ডাকাতির ঘটনায় ১টি মামলা হয়েছিল মাত্র।[৩৯] প্রকৃতপক্ষে হান্টার ও তাঁর 'স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল' (১৮৭৭) এও এই হ্রাসের কথা বলা হয়েছে এবং ১৯১০ সালের নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে গ্যারেট সাহেবও জানিয়েছেন —

> "At present there is no form of crime which is specially prevalent in the district. River dacoity, which is characteristic of the eastern districts of the Division, is practically unknown in Nadia. Professional cattle thefts are fairly common, but not to any very marked extent."[৪০]

এতদসত্ত্বেও, এই শতকের শেষপর্যায়ে কিছু কিছু ডাকাতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে নবীন চন্দ্র সেনের 'আমার জীবন'-এ। তিনি ১৮৯৩ সালে ফেনী থেকে রানাঘাটের কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন এবং প্রায় ৪ বছর রানাঘাট সাবডিভিসনের চারটি মিউনিসিপ্যালিটির সমসাময়িক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লিখেছেন —

> "রাণাঘাটের ভার পাইবার সপ্তাহ মধ্যে চাকদহের এলেকার এ শাস্ত্রসিদ্ধ নৈশ ডাকাতি হইয়া গেল। গভীর রাত্রিতে মশাল আলাইয়া, গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া এবং গৃহবাসীকে নিগ্রহ করিয়া, সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে।"[৪১]

তাঁর লেখাতে আরও কিছু ডাকাতির কথা জানা গেছে।

> "তাহার পর আরও একটি ডাকাতি, এবং মাজিস্ট্রেট-মিশনারি সাহেবের হাতার কাছে এক সিঁদ চুরি হইল।"[৪২]

বস্তুত, ১৮৭৭ সালে জে মনরো তাঁর রিপোর্টে ডাকাতির ধরণে যে রূপান্তর এসেছিল এসময় তার প্রতি অঙ্গুলিনিপাত করেছেন—

> "And, generally, it may be said that many of the cases which are called dacoity are more of the description of highway robberies. very different from the popular idea of dacoity, with torches, sacrifices to Kali, and other ceremonies."[৪৩]

কিন্তু, নবীনচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, ডাকাতি এই সময় সামান্য হলেও বজায় ছিল, প্রয়োজনের তাগিদে চরিত্রে বদল আসছিল কিছু কিছু এবং একই সঙ্গে পূর্বের রীতিনীতিও রক্ষিত হয়েছিল।

Reference:

১. Scott, David, *What is crime?* www.open.edu

২. Report of the Jail of Lower Province of Bengal Presidency for 1857-58, The Alipore jail press, Calcutta, 1858, p. 49

৩. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, Bengal secretariat press, Calcutta, 1878, pp. 35

৪. Ibid, pp. 35

৫. রায় অলোক ও উপাধ্যায়, অশোক (সম্পাদিত), *সেকালের দারোগার কাহিনী,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৫৭, পৃ. ২-৩
৬. সুর, নিখিল, *সেকালের অপরাধ জগৎ,* আশাদ্বীপ, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০২২, পৃ. ১৪
৭. William Kaye, John, *The Suppression of Thuggee and Dacoity*, The Christian Literature Society for India, London & Madras, 1897, p. 24
৮. Mouat, Fred. J., Report of the Jail of Lower Province of Bengal Presidency of 1857-58, Alipore jail press, 1858, p. 49
৯. Ibid, p. 52
১০. Ibid, p. 59
১১. Ibid, p. 57
১২. Literary Panorama and National Register, May 1817, p. 226-27
১৩. RSPLPB for 1850, p. 44-46
১৪. RSPLPB for 1851, p. 51-53
১৫. RSPLPB for 1853, p. 51-54
১৬. রায় অলোক ও উপাধ্যায়, অশোক (সম্পাদিত), *সেকালের দারোগার কাহিনী,* পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৫৭, পৃ. ১৫
১৭. ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল, *বাংলার ডাকাত,* শিশুসাহিত্য প্রচার সংস্থা, কলিকাতা, ১৩৭০ সন, SELECTIONS FROM THE RECORDS or THE GOVERNMENT OF BENGAL, Published by Authority. N. XXVI
১৮. Confession of Bistoo Ghose, Nuddea Gowala Gang. P. 115-117
১৯. Ibid
২০. Ibid
২১. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 35
২২. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, The Bengal Secretariat Press, pp. 35
২৩. Ibid
২৪. Ibid
২৫. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency, 1879, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 35
২৬. Ibid
২৭. Ibid
২৮. সেন, নবীনচন্দ্র, *আমার জীবন,* স্যান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
২৯. ঐ, পৃ. ৩৭৩
৩০. দেবী, প্রসন্নময়ী, *পূর্ব্বকথা,* ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১-১২, ১৪
৩১. Selections from the Records of the Bengal Government, N. XXXI, John Gray, General Printing Department, 1859
৩২. Selections from the Records of the Government of Benga : Reports on the Suppression of Dacoity for 1855-56, N. XXVI, John Gray, Calcutta Gazette Office, Calcutta, 1857, pp. XXII-XXXI

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102
Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৩. Selections from the Records of the Government of Bengal, Published by Authority, N. XXVI, Selections from the Records of the Bengal Government : Report Relating to the Suppression of Dacoity in Bengal for 1859, N. XXXIV, G.A.Savielle, Bengal, Printing Company Limited, Calcutta, 1860

৩৪. Confession of Bistoo Ghose, Nuddea Gowala Gang, pp. 115-117

৩৫. Ibid

৩৬. Ibid

৩৭. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 35

৩৮. Ibid

৩৯. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1879, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1880, pp. 35

৪০. Garrett, J.H.E, *Bengal District Gazetteer Nadia*, Bengal Secretariat Book Depot, 1910, pp. 12

৪১. সেন, নবীনচন্দ্র, *আমার জীবন*, স্যান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

৪২. ঐ, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

৪৩. Report of the Police of the Lower Province of the Bengal Presidency for the Year 1877, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 62

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 910 - 913
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রসঙ্গ : রাগ-প্রকার

ড. সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রিশুলাপটি, বোলপুর, বীরভূম
Email ID : sutapabandyopadhyay008@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Gandhorbo, Marg, Rāga, Deshi, Ālapti, Bostu, Dhrubā.

Abstract
If we try to research the evolution of ragas and ragini by churning out the famous texts of ancient Indian music, we will definitely come to the conclusion that the first song in ancient times was 'Gandharbo rag' or 'Marg Raga', and later in the post-Christian era, Desi Raga emerged. The types of Gandharva or Marga ragas are: - 1) Gram-ragas, 2) Upo-ragas, 3) Bhasha-Vibhasha-Antarbhasha ragas. On the other hand, there were different types of regional ragas - 'raganga', 'kriyaanga', 'pure salag-sankirna', etc. The ancient Gandharva ragas were performed in two ways. For example- a) In songs with one object called 'Dhruba' b) In songs with one to seven objects called 'Prakaran'. But the native ragas were used in songs with 'Prabandho' or 'Pada', where there were two to four 'dhatus' (Udgraha, Melapak, Dhruba and Avoga). Since raga was used in 'Prabhandagan', 'alapti' or 'alap', that is, the unbounded form of raga, was necessarily expressed.

Discussion

'রাগ' বলতে ঠিক কী বোঝায়, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যাঁরা রাগ-সংগীত চর্চা করেন, তাঁদের এ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের পৃষ্ঠাগুলি ওল্টাতেই হবে। দুঃখের বিষয়, মতঙ্গ-মুনি রচিত 'বৃহদ্দেশী' (আনুমানিক ৫ম-৬ষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থের পূর্বে রাগের সংজ্ঞা কোথাও পাওয়া যায় না। 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থের 'রাগলক্ষণম' অধ্যায়ের শুরুতে মতঙ্গ লিখেছেন[১] -

"কিমুচ্যতে রাগশব্দেন কিংবা রাগস্য লক্ষাণম্।
ব্যুৎপত্তি লক্ষনং তস্য যথাবদ বক্ষ্মমহর্ষি॥"

অর্থাৎ, 'রাগ' শব্দের অর্থ, লক্ষণ, ব্যুৎপত্তি কিরূপ, তার যথাযথ বর্ণনা আমি করব।

'মতঙ্গ উবাচ -

"রাগমার্গম্য যদরূপং যন্ত্রোক্তং ভরতাদিভিঃ।
নিরূপ্যতে তস্মাভির্লক্ষ্য লক্ষনসংযুতম্॥"

অর্থাৎ, মতঙ্গ বলছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভরত প্রভৃতি সংগীতজ্ঞানীরা যেখানে মার্গ-রাগের (অর্থাৎ গান্ধর্ব-রাগের) কথা বলেননি, তাই আমি তাদের লক্ষ্য (অর্থাৎ ক্রিয়াত্মক রূপ) ও লক্ষণ নিরূপণ করেছি।

'তত্রাদৌ-

"স্বর-বর্ণ-বিশিষ্টেন ধ্বনিভেদেন বা পুনঃ।
রজ্যতে যেন সচ্চিত্তংস রাগঃ সম্মতঃ সতাম্।"

অর্থাৎ, প্রথমেই বলছি –

বিশিষ্ট স্বরসমূহ, (বর্ণ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী) এবং ধ্বনিভেদ দ্বারা সৎচিও (অর্থাৎ শিক্ষিত-জ্ঞানী) ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে তাকে সর্বদাই রাগ বলে।

অথবা, -

"যোহসৌ ধ্বনিবিশেষস্থ স্বর-বর্ণ-বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগ কথিতো বুধৈ॥
রজনাজ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতা।"

অথবা, এই রকমই ধ্বনি-বিশেষে স্বর-বর্ণ ইত্যাদি বিভূষিত, সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জককেই পণ্ডিতেরা রাগ বলেছেন। রাগ শব্দের ব্যুৎপত্তি রঞ্জন শব্দ থেকে।

এখন প্রশ্ন হল রঞ্জন অর্থাৎ রঞ্জকত্ব সৃষ্টি কিভাবে এবং কোন্ কোন্ গীত-উপাদানকে ভিত্তিক করে হবে। কারণ, গীতের উপাদান অনেক প্রকার, যথা - সুর, স্বর, তাল, ছন্দ, ভঙ্গি ইত্যাদি। উপাদান যে প্রকার হোক না কেন তা যেন শ্রুতিমধুর হয়। এই কথা ভেবেই, সম্ভবত, প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত-জ্ঞানীরা রাগের কতকগুলি লক্ষণ তৈরী করেন। এগুলি হল গ্রহ (রাগের প্রারম্ভিক স্বর), অংশ (রাগের বাদী এবং সংবাদী), ন্যাস্ (বিশ্রান্তিমূলক স্বর), অপন্যাস (স্বল্প-বিশ্রান্তিমূলক স্বর), অল্পত্ব (দুর্বল স্বর), বহুত্ব (অংশ-স্বর ব্যতিরেকে প্রবল-স্বর), তার (সর্বোচ্চ স্বর), মন্দ্র (সর্বনিম্ন স্বর), ষাড়বিত (মাঝে-মধ্যে সাত-স্বরের রাগের দুর্বল-স্বরকে বর্জন করে ছয়-স্বরে রূপান্তরিত করা), এবং ঔড়বিত (সাত-স্বরের কিংবা ছয়-স্বরের রাগের ২টি কিংবা ১টি দুর্বল স্বর বর্জন করে মাঝে মধ্যে পাঁচ স্বরের রাগে রূপান্তরিত করা)। এই হল প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-রাগের লক্ষণ।[২] নিয়মের জটিলতার জন্য গান্ধর্ব বা মার্গ রাগগুলি খ্রিষ্টাব্দের প্রায় শুরুতেই লুপ্ত হয়ে যায়, অথরা 'দেশী' বা আঞ্চলিক রাগের সঙ্গে মিশে যায়।

বাস্তব দৃষ্টিতে মনের কোনও এক বিশিষ্ট ভাবকে লক্ষণ-যুক্ত সুর দ্বারা প্রকাশ করাকে 'রাগ' বলে। তাই রবীন্দ্রনাথ রাগকে 'ভাব' বলেছন (সংগীত চিন্তা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যে-কোনও সুর 'রাগ হতে পারে না'। বিশিষ্ট লক্ষণ ও ভাব থাকতে হবে। 'দেশী' রাগের ক্ষেত্রে লক্ষণ বা নিয়মের কড়াকড়ি না থাকলেও ভাবের নির্দিষ্টতা থাকতো। ভাবকে স্পষ্টীকরন করার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয়, শুধু সুর ও ছন্দ দিয়ে 'রাগ'কে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আবার, ভাবের মুখ্য উপাদান হচ্ছে 'ভঙ্গি' (gestures)। ভঙ্গি নানা প্রকার হয়, যথা - স্বর-ভঙ্গি, সুর-ভক্তি, ভাষা-ভঙ্গি, উচ্চারণ-ভঙ্গি, ছন্দ-ভঙ্গি, বাদন-ভঙ্গি, নর্তন-ভঙ্গি, গেয়-ভঙ্গি...ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'গেয়-ভঙ্গি'কে গীতি যা আঞ্চলিক। পরবর্তীকালে, এই গীতি 'দেশী' প্রবন্ধগানের যুগে 'বান' বা 'বানী' রূপে প্রচলিত ছিল। সুরাশ্রয়ী গীতিকে' রাগ-গীতি এবং সুরাশ্রয়ী গীতিকে জাতি-গীতি বলা হতো। রাগ-গীতি পাঁচ প্রকার, যথা- শুদ্ধ, ভিন্না, গৌড়ী, রেসরা ও সাধারণী। জাতিগীতিগুলি চার প্রকার, যথা- মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা। রাগগীতিগুলি ছিল আঞ্চলিক সুরাশ্রয়ী, তেমনি জাতি-গীতিগুলি ছিল তালাশ্রয়ী। এই তাল কিন্তু গান্ধর্ব বা মার্গতাল। এই তাল-পদ্ধতি কিন্তু অধুনা হিন্দুস্থানী কিংবা কর্ণাটক পদ্ধতির মতন নয়। মার্গ-তালের মোট সংখ্যা ৫টি, যথা– i. চাচ্চৎপুটঃ; ii . চাচপুটঃ; iii. ষট্ পিতাপুত্রকঃ; iv. সংপক্কেষ্টাক; এবং v. উদঘট্ট। কিন্তু মার্গ- ভেদে (যখা- চিত্রমার্গ, বৃত্তি বা বার্তিক মার্গ, দক্ষিণ-মার্গ এবং ধ্রুব-মার্গ) ও কলা-ভেদে (যথা- এক-কল, দ্বিকল, এবং চতুষ্কল) তালের অবয়ব ছোট-বড় হয়। ফলে, তালের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

রাগের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়ে রাখা ভালো যে, গন্ধর্ব জাতির সংগীত-সমাজে দুটি প্রধান সম্প্রদায় ছিল। একটিকে বলা হত - নাট্য-সম্প্রদায় বা ভরত-সম্প্রদায় এবং অপরটিকে বলা হত গীত-সম্প্রদায় বা নারদ-সম্প্রদায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভরত সম্প্রদায়ের সংগীত জ্ঞানীরা তাঁদের নৃত্যনাট্যে দুটি 'অঙ্ক' অথবা দৃশ্যের মধ্যবর্তী সাময়িক বিশ্রান্তিতে যবনিকা বা পর্দার অন্তরালে একপ্রকার ছোট ছোট এক-তুকের গান পরিবেশিত হত, সেগুলিকে বলা হত 'ধ্রুবা' [ধ্রুপদ' নয়]। ধ্রুবা কখনো গ্রাম-রাগে, কখনো বা 'জাতি'তে পরিবেশিত হত। জাতির সংখ্যা ছিল মোট ১৮টি। সাতটি স্বরের নামে ৭টি শুদ্ধ জাতি ষাড়জী, আর্জভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী)। অবশিষ্ট ১১টি বিকৃত জাতি তৈরী হয়েছিল শুদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে আন্তর-মিশ্রণ ঘটিয়ে। ইংরেজীতে এদের Modes বলা হয়। রাগকে Melodies বলে। জাতিগুলির সুর ছিল কাটা-কাটা (অনেকটা ঠাটের স্বরাবলীর মতোন। তাই এতে রঞ্জকত্ব সৃষ্টির জন্য তাল ও ছন্দ-ভিত্তিক 'জিতিভিত্তিক' জাতি-গীতি (মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা) প্রয়োগ করা হত। এই কারণেই আমরা ভরত-মুনির 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে আমরা 'জাতি' ও 'জাতি-গীতি'র বিস্তৃত আলোচনা পেয়েছি। কোথাও 'রাগ' এবং 'রাগ-গীতি'-র (শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, সাধারণী) আলোচনা পাইনি। কারণ, 'রাগ' বিষয়ক যাবতীয় চর্চা গীত-সম্প্রদায় বা নারদ-সম্প্রদায়ের এক্তিয়ারভুক্ত। পরবর্তীকালে (আনুমানিক খ্রিষ্টিয় ২য় শতকে) 'জাতি-গান' লুপ্ত এবং অপ্রচলিত হয়ে পড়লে, ভরত-সম্প্রদায়ের নাট্য-পন্থীরা গ্রাম-রাগ, রাগ-গীতি ইতাদিনে মান্যতা দেয় এবং নিজ নিজ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করতে থাকে যে, 'জাতি' থেকেই গ্রাম-রাগ, উপরাগ, জাতি-রাগ ইত্যাদি জন্মেছে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন আমরা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থেও পাই। যেমন -

১. "জাতি সম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগানাম্...,"
(অর্থাৎ গ্রামরাগগুলি 'জাতি' থেকেই জন্মেছে)
২. "জাতিসম্ভূতত্বাদ্ রাগানাম্"
(অর্থাৎ রাগ বা জাতি-রাগ 'জাতি' থেকেই জন্মেছে)
৩. "যৎকিঞ্চিদ্গীয়তে লোকে তৎসর্বং জাতিষু স্থিতম্-।"
(অর্থাৎ লোকে যা-কিছু গায়, সেগুলি সবই জাতিতে স্থিত হয়)

বর্তমানে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্রের সংস্করণগুলিতে উপরোক্ত শ্লোকগুলি খুঁজে না পাওয়া গেলেও, নিঃশঙ্ক শারঙ্গদেব রচিত 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থের 'রাগ-বিবেকাধ্যায়-এর' ৮ নং ১৪ নং শ্লোকের পঃ কল্লিনাথ প্রদত্ত 'কলানিধি' টাকায় এবং রাজা সিংহভূপাল লিখিত 'সুধাকর' টিকায় শ্লোকাংশগুলি উদ্ধৃত হয়েছ।

প্রাচীনকাল থেকেই রাগের সঙ্গে উত্তর-ভারতে 'গেয়-ভঙ্গি' বা গীতি-র সম্পর্ক অতি নিবিড়। গেয়-ভঙ্গি বা গীতি হচ্ছে আঞ্চলিক গাইবার ভঙ্গি, যা পরবর্তীকালে প্রবন্ধ-গানে অনুসরণ করা হত এবং মধ্যযুগীয় ধ্রুপদ-গানে 'বানী' বা 'বান্' নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। 'ঘরানা' পরিভাষাটি ধ্রুপদ-গানে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে 'বান্' পরিভাষাটি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন - মিঞা তানসেন 'গওরহারী' (অর্থাৎ গোয়ালিয়রী), করীম বকস্ খণ্ডারী, গুলাম হুসেন নৌহারী ইত্যাদি।

প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ রাগগুলির গীতিগুলির বিশ্লেষণ করলে আমরা সবকয়টি বানী বা বানের উৎসমূলে পৌঁছতে পারি। যেমন- শুদ্ধগীতিতে রাগ-স্বরের চলন অবক্র অর্থাৎ সরল ও ললিত এবং মীড়' যুক্ত। এর থেকে দু'প্রকার বানের সম্ভাবনা দেখা দেয়, যথা - ১) সরল-গতিসম্পন্ন, গমক-যুক্ত এবং অন্যান্য বক্রগতির দ্রুত-অলংকার বর্জিত গান; ২) সরল গতি-যুক্ত মীড়-প্রধান গান। প্রাচীন ধ্রুপদ-গায়কেরা প্রথম প্রকারকে বলতেন 'ডগর'-বান (দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে দুটি গড়বা দুর্গের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত গেয়-রীতি এবং দ্বিতীয় প্রকার ছিল গোয়ালিয়র ও তার চার-পাশের অঞ্চলে গাইবার ঢঙ।

ভিন্নাগীতির স্টাইলে বক্র স্বর-সঞ্চারণ, সূক্ষ বা দ্রুতোচ্চারিত স্বরসমূহের উচ্চারন এবং মধুর, ছোট ছোট গমকে। এই গীতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে প্রসিদ্ধ গেয় ভঙ্গির সঙ্গে ধ্রুপদের খাণ্ডারী বানের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে। এরপর আসছে গৌড়ী-গীতি। এই গীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মন্দ-মধ্য ও তার স্থানে ভারী গমকের প্রয়োগ এবং 'ওহাটী নামক স্বর-প্রক্ষেপণের ব্যবহার। গৌড়ী-গীতির ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে সংগীত জ্ঞানীদের মধ্যে। এক সম্প্রদায় বলেন, গৌড়-বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে এই ধরণে গাইবার ঢঙ্ একসময়ে প্রচলিত ছিল। যে-কারণে বাংলা কীর্তনে এর প্রভাব আজও অল্প বিস্তর শোনা যায়। আরেক মতে বলা হয়, গোঁড় অঞ্চলের (গন্ডোয়ানা ল্যান্ড বা মধ্যপ্রদেশ ও বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপজাতীয় গানের মধ্যে এই জাতীয় ভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। একে ‘গয়ড়া’ বান বলা হত। আজ অবশ্য এই বান অবলুপ্ত। পরবর্তী গীতি হচ্ছে ‘বেসরা’ বা ‘বেগস্বরা’। এই ধরণের গেয়-ভঙ্গি পাঞ্জাব অঞ্চলে দেখা যায়। এই গীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রুত স্বর-সঞ্চারণ এবং তজ্জনিত যে-সব অলংকার উৎপন্ন হতে পারে (যথা- খড্ডা, মূরক্, জমজমা ইত্যাদি প্রকৃতির পাঞ্জাবী অলংকার) তাদের প্রয়োগ। একদা পাঞ্জার অঞ্চলে প্রচলিত ধ্রুপদের নৌহারী বান-এর মধ্যে বেসরা-গীতির প্রাচীন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণী-গীতি বলতে মিশ্র গেয়-ভঙ্গি বোঝায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, একই রাগ বান বা বানী-ভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

বান বা বানীর সঙ্গে রাগ-প্রকারের একটা গভীর সম্পর্ক মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতেও। এখানে একটি কথা সবিশেষ উল্লেখ করা যায়। সেটি হচ্ছে গীতি বা বানী বললে শুধু যে নিবদ্ধ-গানটিকে বোঝাবে এমন নয়। অনিবদ্ধ, নিবদ্ধ এবং সমগ্র সংগীত পরিবেশন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যকেও বোঝাবে। এছাড়া, গীতি বা বানীর সঙ্গে রাগের সুর-কাঠামোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন –

I. আধুনিক কালের ভূপালী, মারবা ইত্যাদি প্রকৃতির রাগগুলির সঙ্গে ডগর-বানের।
II. আধুনিক দরবারী কানরা, পূরবী, কোমল আসাবরী, বিলাসখানি টোড়ি প্রভৃতি রাগগুলির সঙ্গে গওরহারী বা গোয়ালিয়রী বানের।
III. বর্তমানের মালকোষ, বাহার ইত্যাদি মধুর গমক-যুক্ত রাগগুলির সঙ্গে খাণ্ডার বানের।
IV. অধুনা প্রচলিত পাহাড়ী, সিন্ধু, কাফী প্রভৃতি চঞ্চল গতির রাগের সঙ্গে নওহার বানীর এবং
V. সংকীর্ণ বা মিশ্র প্রকৃতির রাগগুলির সঙ্গে সাধারণী গীতি বা মিশ্র বান, রূপে স্বীকৃত।

বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতে এখন আর বান্ বা বানীকে মান্যতা দিয়ে গায়ক-গায়িকারা সংগীত পরিবেশন করেন না।

ভরত-মুনির 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য রয়েছে। সেখানে গান্ধর্ব নাট্য গীত ধ্রুবার সঙ্গে মার্গ-রাগের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। প্রাচীন নাট্যে (নৃত্যনাট্যে) দুটি অঙ্ক (Act) বা দৃশ্যের (Seene) মধ্যবর্তি সাময়িক বিশ্রান্তিকে ‘নাট্য-সন্ধি বলা হত। ‘সন্ধি’ ছিল পাঁচ-প্রকার, যথা- ১. মুখ, ২. প্রতিমুখ, ৩. অবমর্শ, ৪. গর্ভ, ৫. নির্বহন।

প্রাথমিক ভাবে, গ্রাম-রাগের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচটি, যথা - ষাড়ব, পঞ্চম, কৈশিক-মধ্যম, সাধারিত এবং কৈশিক। (মতঙ্গ-মুনি-বৃহদ্দেশী)।

যাইহোক, খ্রিষ্টোত্তর কালে এইসব প্রাচীন পদ্ধতি অবলুপ্তির ফলে রাগ-রাগিণীর বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং প্রাচীন নিয়মাবলী বর্তমানে শুধু গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বেঁচে রইল।

Reference:

১. মতঙ্গ-মুনি, বৃহদ্দেশী, বঙ্গাক্ষরে রূপান্তর: ড. প্রদীপকুমার ঘোষ; (১৯৮৬, তৃপ্তি ঘোষ), পৃ. ৭, ৬
২. নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব, সংগীত-রত্নাকর, অনুবাদ ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (রবীন্দ্র ভারতী, ২০০১), রাগ – বিবেকাধ্যায়, পৃ. ৬৬

OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 914 - 921
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বৈশেষিক শাস্ত্রে 'বিশেষ'

প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপিকা
টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ
Email ID : priyankaruna94@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
Nyāya, Vaiśeṣika, Viśeṣa, vyāvartaka, vyāvritta, padārtha, Dravya,

Abstract
In the Vaiśeṣika system the concept of 'Viśeṣa' or particularity is used to differentiate one eternal substance from another. While we typically distinguish objects based on their parts, quality or other attributes, this becomes challenging when dealing with two eternal, ultimate substances, as they are identical in every respect, much like two atoms of earth. However, there must be some distinguishing characteristics between them, otherwise, they would be indistinguishable. In this case, the distinguishing factor can not be a specific quality of the two atoms, as both are qualitatively identical (atom of the earth). Therefore, they do not differ in their inherent characteristics. It is also not due to any distinguishing feature of their parts, as atoms do not have parts. The differentiating factor must then lie in something else within each atom. To address this, vaiśeṣika introduces a category called particularity or Viśeṣa, which exists in all eternal substances and serve to distinguish them from one another. In Sanskrit Viśeṣa refers to any differentiator or a differentiating factor. All tables are recognized as tables because of the common essence of tableness inherent in them, which serves as a unifying principle. At the same time a table is distinguished from a chair by its unique tableness. In this case, universal (sāmānya) serves as both a unifier and a differentiating factor. Viśeṣa or particularity is fundamentally opposed to universal or Sāmānya as it exclusively serves as a differentiator. It distinguishes the substance in which it resides from other substances, and also differentiates itself from other Viśeṣa or particularity (svata-vyāvartaka). Each eternal entities atoms, souls, space, time and manas have their own particularities or Viśeṣa. The concepts of particularity or Viśeṣa represents the individuality of eternal entities. The system is named Vaiśeṣika due to its special emphasis on this category of Viśeṣa or particularity.

Discussion

বৈশেষিক পদার্থবাদী। পদার্থ বিচারই তাঁদের মুখ্য কর্তব্য। যে বিশেষ পদার্থটি এই প্রবন্ধের আলোচ্য তা বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষকে জানেন বা অধ্যয়ন করেন (বিশেষং বেত্তি অধীতে বা) এই অর্থে 'বিশেষ' পদের উত্তর

ঠক্ প্রত্যয় করে বৈশেষিক পদ সিদ্ধ হয়। এই অর্থে বৈশেষিক পদটি বৈশেষিক দার্শনিককে বোঝায়। আর 'বৈশেষিক দর্শন' এরূপ শব্দ ব্যবহারস্থলে বিশেষ পদের উত্তর সংসৃষ্টার্থে ঠক্ প্রত্যয় করে যখন বৈশেষিক পদটি সিদ্ধ করা হয়, তখন বৈশেষিক দর্শন মানে বিশেষ পদার্থের সংসৃষ্ট দর্শন বা যে দর্শনের দ্বারা 'বিশেষ' পদার্থকে জানা যায় সেই দর্শন সুতরাং বৈশেষিক দর্শনে বিশেষের গুরুত্ব কতটা তা বলাই বাহুল্য। কেননা বৈশেষিক নামকরণটিই এসেছে বিশেষরূপ পদার্থকে স্বীকার করার ফলেই। তবে এই 'বিশেষ' পদার্থকে অন্য কোন দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করেননি। কোন কোন নব্যনৈয়ায়িকও এর বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে যাঁরা বিশেষকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেছেন, সেই স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট ও বিশেষের অস্তিত্বসাধক যুক্তিগুলি জানবার ইচ্ছায় এই প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে।

বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' এর গুরুত্ব এতটাই যে এই পদার্থ ব্যাতিরেকে বৈশেষিক দর্শনের অস্তিত্বই থাকে না। বলাই বাহুল্য যে, এই বিশেষ নামক পদার্থকে স্বীকার করার জন্যই এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। ফলতঃ ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ বিশেষকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু আয়াস সাধন করেছেন।

বৈশেষিক দর্শনে সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। তার মধ্যে পঞ্চম পদার্থ 'বিশেষ' একটি অভিনব পদার্থ। কেননা অন্য কোন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এই পদার্থকে স্বীকার করেননি। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে কোথাও বিশেষের উল্লেখ না করলেও মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাঁর ন্যায়ভাষ্যে বিশেষকে প্রমেয় রূপেই গণ্য করেছেন। পরবর্তীকালে ন্যায়াচার্যগণ স্বমর্যাদা সহকারে বিশেষকে পদার্থের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্যের পর পঞ্চম পদার্থ হল বিশেষ। এই বিশেষ নিত্যদ্রব্য সমূহে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। নিত্য দ্রব্য অনন্ত সংখ্যক হওয়ায় তাতে স্থিত বিশেষও অনন্ত। এই বিশেষ নিত্য দ্রব্যগুলিকে একে অপরের থেকে ব্যাবৃত্ত করে। ব্যাবৃত্তির জন্যই 'বিশেষ' নামক পদার্থটিকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, ব্যাবৃত্তির জন্য পৃথক একটি পদার্থ স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? পদার্থের গুণ, ধর্ম প্রভৃতি বিশেষণই তো একটি পদার্থকে অপর পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত করতে পারে, সেখানে 'বিশেষ' নামক পৃথক একটি পদার্থ স্বীকার করলে তো গৌরব অবশ্যম্ভাবী, অথচ ভারতীয় দর্শন তো লাঘবে বিশ্বাসী। এই প্রকার আপত্তির সমাধানের জন্য কেন 'বিশেষ' নামক পদার্থকে স্বীকৃত হয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিশেষ স্বীকারের যুক্তি : সাধারণত একটি বস্তুকে আমরা অপর একটি বস্তু থেকে পৃথক করি সেই বস্তুর বিশেষ আকৃতি, বিশেষ গুণ, বিশেষ প্রকার ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা। ঘটপটাদি দ্রব্য সমূহ স্বগত ধর্ম, আকৃতি ইত্যাদির দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত হতে পারে বলে এইসব বিভিন্ন পদার্থের ভেদক হতে পারে স্ব-স্ব ধর্ম, বিশেষ আকৃতি প্রভৃতি। আবার সজাতীয় ঘটদ্বয়ের ক্ষেত্রে ঘটগুলি নিজ নিজ অবয়বের দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত হতে পারে বলে এক্ষেত্রে ব্যাবর্তক বা ভেদক হবে ঘট গুলির অবয়ব। একইভাবে ঘটাদি থেকে শুরু করে দ্ব্যণুক পর্যন্ত সকল সাবয়ব পদার্থগুলি নিজ নিজ অবয়বের দ্বারা ভিন্ন হয়ে যায়। একটি পার্থিব ও একটি জলীয় পরমাণুও যে ভিন্ন তাও সিদ্ধ করা যেতে পারে সেই সেই পরমাণুগত গন্ধ, শীতস্পর্শ প্রভৃতি গুণের দ্বারা, কেননা এক্ষেত্রে পরমাণুগত গন্ধ, শীতস্পর্শ প্রভৃতি গুণগুলি ভেদক বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল দুটি সজাতীয় পরমাণুদ্বয়ের অর্থাৎ দুটি পার্থিব কিংবা দুটি জলীয় কিংবা দুটি তৈজস অথবা দুটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদক কে হবে? এটাই মুখ্য প্রশ্ন।

বিষয়টি এই রকম – জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব প্রভৃতি ভেদকের দ্বারা অনিত্য দ্রব্যদ্বয়ের ভেদ অনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল দুটি তুল্যজাতি, তুল্যগুণ, তুল্যক্রিয়াবিশিষ্ট পরমাণুদ্বয়ের অথবা বিশেষগুণরহিত মুক্ত আত্মদ্বয়ের অথবা মনোদ্বয়ের ভেদক কে হবে? অথচ সেক্ষেত্রে কোনরূপ ভেদক নেই এমনটাও বলা যায় না। কেননা আমাদের থেকে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট যোগীগণের এইসকল সমানজাতীয় গুণক্রিয়াবিশিষ্ট পরমাণুসমূহে, মুক্ত আত্মসমূহে এবং মনঃসমূহে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। তাই ভেদক তো অবশ্যই আছে কেননা ভেদক ব্যতিরেকে ভেদ প্রতীতি সম্ভব নয়। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ বলবেন এই ভেদক বা ব্যাবর্তকই হল বিশেষ – যার দ্বারা প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্য একে অপরের থেকে ভিন্ন বলে গণ্য হতে পারে। সুতরাং প্রথমত, ভেদক ধর্মরূপে বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয়ত, যোগীগণের প্রত্যভিজ্ঞার কারণরূপেও বিশেষ পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। যোগীগণের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বর্তমান পরমাণুসমূহে 'এই সেই পরমাণু' রূপে প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়। বিশেষ স্বীকৃত না হলে অতিসূক্ষ্ম পরমাণুতে এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা কখনই সম্ভব নয়, তাই বিশেষ স্বীকার আবশ্যক।

আচার্য প্রশস্তপাদকে অনুসরণ করে উদয়নাচার্যও তাঁর কিরণাবলী গ্রন্থে বিশেষ স্বীকৃতির স্বপক্ষে যুক্তি প্রকাশ করে বলেছেন –

> "নিত্যেষু তু দ্রব্যেষু আশ্রয়রহিতেষু সমানজাতীয়েসু সমানগুণকর্মসু চ ভবিতব্যং ব্যাবর্তকেন কেনচিদ্ধর্মেন ব্যাবৃত্তত্বাৎ।"[১]

অর্থাৎ দ্ব্যণুকাদি অনিত্যদ্রব্যস্থলে পরমাণু ইত্যাদি আশ্রয়ের দ্বারা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপন্ন হতে পারে সেক্ষেত্রে আশ্রয়াদির অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আশ্রয়রহিত সমান জাতীয় এবং সমানগুণকর্মবিশিষ্ট নিত্যদ্রব্যসমূহের কোনও ব্যাবর্তক বা ভেদক ধর্ম অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সেই ভেদক ধর্মই হল বিশেষ।

বিশেষ পদার্থের লক্ষণ : বিশেষ পদার্থের নানা লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তবে সর্বপ্রথম বিশেষ পদার্থের লক্ষণ দিয়েছেন আচার্য প্রশস্তপাদ তাঁর পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে যদিও তার বহুপূর্বে মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থে বিশেষের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে – "অন্যত্রান্তেভ্যো বিশেষেভ্যঃ"[২] যার অর্থ হল অন্যত্র যা (সামান্যবিশেষ) নিরূপিত হয়েছে তা হতে অন্ত্যবিশেষসমূহ ভিন্ন।

বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এক অর্থে বিশেষ সামান্য বা জাতির অন্তর্গত অপর জাতি, অন্য অর্থে 'বিশেষ' হল কেবল ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির হেতু অর্থাৎ একটি নিত্যদ্রব্যকে অপর নিত্যদ্রব্য হতে ব্যাবৃত্তকারী বিশেষ। জাতি প্রধানত দুই প্রকার (যদিও কখনো কখনো জাতিকে তিন প্রকারও বলা হয়ে থাকে) –পরসামান্য বা কেবলসামান্য যেমন – সত্তা জাতি। সত্তাজাতি কেবল অনুগত প্রতীতির জনক হওয়ায় সত্তাজাতিকে পরসামান্য বা কেবলসামান্যও বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে সামান্যবিশেষ জাতি বা অপরজাতি যেমন – দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতি। দ্রব্যত্বাদি জাতি যেমন অনুগত বুদ্ধির জনক হয় তেমনই আবার ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিরও জনক হয়ে থাকে। তাই এই জাতিকে সামান্যবিশেষও বলা হয়েছে। মহর্ষি কণাদোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা যায়, পঞ্চম পদার্থরূপে যে বিশেষের নিরূপণ করা হয়েছে তা জাতিরূপ বিশেষ থেকে ভিন্ন। ভাষ্যকার অন্ত্য পদটিরও বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেখানে 'অন্ত্য' বলতে শেষ বা চরম ভেদককে বুঝতে হবে।

পদার্থধর্মসংগ্রহে আচার্য প্রশস্তপাদ বিশেষের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন এইভাবে –

> "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োন্ত্যা বিশেষাঃ। তে চ খল্বত্যন্তব্যাবৃত্তিবুদ্ধিহেতুত্বাবিশেষাঃ এব।"[৩]

অর্থাৎ অন্ত্যবিশেষসমূহ নিত্যদ্রব্যে বৃত্তিমান। এই বিশেষ অত্যন্ত ব্যাবৃত্তির কারণ হওয়ায় সামান্য নয়।

লক্ষ্যণস্থ 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তি' পদটি আশ্রয়সূচক এবং বহুবচনান্ত 'বিশেষা' পদটি লক্ষ্যসূচক। আচার্য্য 'বিশেষা' এই বহুবচনের দ্বারা লক্ষ্যকে সূচিত করায় বুঝতে হবে বিশেষ অনন্তসংখ্যক বা বহুসংখ্যক। পদ্মনাভ মিশ্র তৎপ্রণীত 'সেতু' টীকাতে লক্ষণোক্ত 'বিশেষা' পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন -

> "অত্র বিশেষাঃ ইতি বহুবচনেন বিনা বাধকম্ অসঙ্কুচিতেন আনন্ত্যং বিবক্ষিতম"[৪]

অর্থাৎ 'বিশেষাঃ' এই বহুবচনের দ্বারা বাধকহীনভাবে এবং অসঙ্কুচিতরূপে বিশেষ পদার্থের সংখ্যার আনন্ততা বিবক্ষিত হয়েছে।

লক্ষণস্থ 'বৃত্তি' পদের দ্বারা সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্বকেই বুঝতে হবে। প্রত্যেকটি বিশেষ পদার্থ তার আশ্রয় নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। একটি বিশেষ কখনো দুটি নিত্যদ্রব্যে থাকে না, যেমন - দেবদত্তের আত্মাতে যে বিশেষ থাকে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যজ্ঞদত্তের আত্মাতে সেই বিশেষ থাকে না। যদি দুটি নিত্যদ্রব্যে কোন একটি বিশেষ থাকতো তাহলে তা বিশেষ না হয়ে সামান্যই হত।

ভাষ্য নির্দেশিত 'অন্ত্যা' পদটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ কেননা 'অন্ত্যা' পদটি লক্ষণনির্দেশক। 'অন্ত্যা' পদটির সাধারণ অর্থ হল যা অন্তে বা অবসানে থেকে ব্যাবর্তক হয় অর্থাৎ বলা যায় যার আর কোনো ব্যাবর্তক নেই, যা নিজেই নিজের দ্বারা ব্যাবৃত্ত তাই হল অন্ত্য। বিশেষ পদার্থের পরীক্ষাপ্রকরণে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন –

"অন্তেষু ভবা অন্ত্যাঃ স্বাশ্রয়বিশেষকত্বাদ্বিশেষাঃ"[৫],

অর্থাৎ অন্তে থাকে যারা তারা অন্ত্য, তারা নিজেদের আশ্রয়কে বিশেষিত বা ব্যাবৃত্ত করে বলে তাদের নাম বিশেষ।

আবার 'অন্ত্য' পদের অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন - "বিনাশারম্ভরহিতেষু নিত্যদ্রব্যেষু অন্বাকাশ কালদিগাত্মমনসসু প্রতিদ্রব্যমেকৈকশো বর্তমানাঃ"[৬] অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে 'অন্ত্য' পদের অর্থ হল বিনাশ ও আরম্ভরহিত। এখন বিনাশ ও আরম্ভরহিত হল পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য। সাধারণভাবে 'অন্ত্য' বলতে আমরা বুঝি শেষ। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে কার শেষ? উত্তর হবে - বিনাশ ও আরম্ভের শেষ। সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, যার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তার উৎপত্তি বা বিনাশের শেষে যা বর্তমান থাকে তাই হল 'অন্ত্য' অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য।

আবার জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রশস্তপাদাচার্য নির্দেশিত 'বিশেষ' লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন - অন্ত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ হল চরম বিশেষ অর্থাৎ যার অপেক্ষায় আর বিশেষ বা ব্যাবর্তক ধর্ম থাকতে পারে না। যা নিজেই অন্য কোনো ভেদকের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরের থেকে ভিন্ন। এই রূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করলে 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'স্বতোব্যাবৃত্তত্ব'। স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অর্থ হল - যা অপর কোন ভেদকের অপেক্ষা না রেখেই ব্যাবৃত্ত। বিশেষ 'স্বতোব্যাবৃত্ত' কেননা বিশেষ নিজেই নিজের দ্বারা অপরের থেকে ভিন্ন। সকল বৈশেষিকাচার্যই এই 'স্বতোব্যাবৃত্তত্ব'কেই বিশেষের স্বরূপ বলেছেন।

'স্বতোব্যাবৃত্ত' পদটির অর্থ হল - "স্বপ্রযোয্যস্বনিষ্ঠস্বসজাতীয়প্রতিযোগিকভেদবত্ত্ব"[৭] অর্থাৎ বিশেষনিষ্ঠ ভেদটি স্ব দ্বারা অর্থাৎ বিশেষ দ্বারা প্রযোজ্য। আর সেই বিশেষে অপর বিশেষের ভেদ থাকে বলে সেই ভেদটি স্বনিষ্ঠ এবং স্ব অর্থাৎ সেই বিশেষের সজাতীয় হল অপরবিশেষ, তার প্রতিযোগিক হল উক্ত ভেদটি। এই স্বপ্রযোজ্য স্বনিষ্ঠ স্বজাতীয় প্রতিযোগিক ভেদ কেবলমাত্র বিশেষেই থাকে, অন্য কোনো পদার্থে থাকে না বলে বিশেষ স্বতোব্যাবর্তক। তবে স্বতোব্যাবৃত্তত্বের উপরোক্ত অর্থে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখানো হয়েছে। বলা হয় ঘট অন্য ঘট থেকে ভিন্ন তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটহেতুক। এই অনুমিতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটরূপ হেতুটি ঘটরূপ পক্ষে একাসনে থাকে। আবার সাধ্য ঘটান্তরের ভেদও পক্ষীভূত ঘটে আছে, অতএব স্বনিষ্ঠে, স্বপ্রযোজ্য স্বজাতীয় প্রতিযোগিক ভেদ ঘটেও আছে কিন্তু ঘট তো আর স্বতোব্যাবৃত্ত নয়। সুতরাং স্বতোব্যাবৃত্তের উক্ত লক্ষণটি ঘটে অতিব্যাপ্ত হয়। এই অতিব্যাপ্তি দূর করতে স্বতোব্যাবৃত্তত্বের পরিষ্কৃত অর্থ করা হয়েছে –

"স্বভিন্নলিঙ্গজন্যস্ববিশেষ্যকস্বসজাতীয়েতরভেদানুমিত্যবিষয়ত্বম"[৮]

অর্থাৎ যাতে স্বভিন্ন লিঙ্গের বা হেতুর দ্বারা স্বসজাতীয় অন্যের ভেদের অনুমিতি হয় না, অর্থাৎ বিশেষ স্বতঃই ভিন্ন। বিশেষে কোনো ভেদক ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, এইজন্য একটি বিশেষে অন্য বিশেষের ভেদের অনুমিতি বিশেষে ভিন্ন কোনো হেতুর দ্বারা হয় না। এই বিশেষটি অন্য বিশেষে থেকে ভিন্ন নিজ হেতুক (অয়ং বিশেষঃ বিশেষান্তরভিন্নঃ স্বস্মাৎ)। সুতরাং বিশেষ নিজের আশ্রয়ভূত নিত্যদ্রব্যটিকে সজাতীয় অন্য নিত্যদ্রব্য হতে ব্যাবৃত্ত করে, একই সঙ্গে অন্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষ থেকেও নিজেকে ব্যাবৃত্ত করে। তাই বিশেষ পদার্থ হল স্বতোব্যাবৃত্ত।

প্রশস্তপাদাচার্য্য প্রদত্ত লক্ষণটিতে "তে চ খলু অত্যন্ত ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিহেতুত্বদ্বিশেষা এব"[৯] – এই অংশটির ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার উদয়নাচার্য বলেছেন - বিশেষসমূহ অত্যন্ত ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির কারণ হওয়ায় তা বিশেষই হবে কখনোই সামান্য হবে না। এবং তার ফলে বিশেষের লক্ষণটিকে আচার্য উদয়ন নিরূপণ করেছেন এইভাবে – "এক দ্রব্যাঃ স্বরূপসন্তইতি"[১০] – অর্থাৎ যা একদ্রব্যমাত্রবৃত্তি এবং স্বরূপতঃই সৎ অর্থাৎ সত্তারূপ জাতির আশ্রয়স্বরূপ সৎ এমনটা নয়, তাই বিশেষ। আচার্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর কিরণাবলী প্রকাশ গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন এইভাবে – "নিঃসামান্যত্বে সতি একদ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বম"[১১] অর্থাৎ যা সামান্যবর্জিত হয়ে কেবল এক একটি দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাই বিশেষ।

এই একদ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বের কথা কন্দলীকার শ্রীধরাচার্যও তাঁর বিশেষের লক্ষণে বলেছেন – "নিত্যদ্রবৈকবৃত্তিত্বং বিশেষত্বম"[১২] অর্থাৎ যা একটিমাত্র নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাই বিশেষ।

আবার বল্লভাচার্য তাঁর ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে বিশেষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন – "এক দ্রব্যাঃ স্বভাবসন্তো বিশেষাঃ"[১৩] যা এক একটি দ্রব্যেই বর্তমান এবং স্বরূপত বিদ্যমান, তাই হল বিশেষ। লক্ষণান্তর্গত 'স্বভাবসন্তো' পদটির অর্থ হল সত্তাশূন্য। ন্যায়বৈশেষিক মতে, সত্তাজাতি কেবল দ্রব্য, গুণ, কর্মে থাকে; সামান্য বিশেষাদি পদার্থে থাকে না। সুতরাং বিশেষ পদার্থ সত্তাজাতিশূন্য। এই কারণে হয়ত শংকর মিশ্র তাঁর ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে বলেছেন – "নিঃসামান্যত্বে সতি একৈক দ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বং বিশেষত্বম ইতি ভাব"[১৪] অর্থাৎ নিঃসসামান্যরূপে বা সামান্যহীন হয়ে একটি মাত্র দ্রব্যে বৃত্তিত্বই হল বিশেষের লক্ষণ। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে, তা হল – বিশেষ জাতির আশ্রয় হবে না কেন? বিশেষে বিশেষত্ব জাতি স্বীকারে অসুবিধা কোথায়? উত্তরে বলা হয় বিশেষে যদি বিশেষত্ব জাতি স্বীকৃত হয়, তাহলে বিশেষের 'স্বতোব্যাবৃত্তত্ব' স্বরূপের হানি হয়, কারণ কোন জাতিমান পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত হতে পারে না। বিশেষ নামক পঞ্চম পদার্থে জাতির বাধক হয় রূপহানি বা স্বরূপের হানি। এইজন্য বিশেষে বিশেষত্ব কিংবা অন্য কোনো জাতি স্বীকৃত হয়নি।

এখন, আরও কয়েকটি প্রধান লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। শিবাদিত্য মিশ্র প্রণীত 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থেও বিশেষ পদার্থ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বিশেষ পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে শিবাদিত্য মিশ্র বলেছেন – "বিশেষাস্তু যাবন্নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্বাৎ অনন্তা এব"[১৫] অর্থাৎ বিশেষসমূহ যাবতীয় নিত্য দ্রব্য বর্তমান থাকায় অনন্ত সংখ্যক। বিশেষের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে শিবাদিত্য মিশ্র বলেছেন – "বিশেষাস্তু সামান্যরহিত একদ্রব্যবৃত্তিঃ"[১৬] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ সামান্য বা জাতিরহিত এবং একটি মাত্র দ্রব্যবৃত্তি।

আচার্য বরদরাজ একই ভাবে তাঁর তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন – "অজাতিরেকবৃত্তিশ্চ বিশেষ ইতি শিষ্যতে"[১৭] – অর্থাৎ জাতিশূন্য হয়ে যে পদার্থ একটি মাত্র দ্রব্যবৃত্তিমান তাই বিশেষ।

আচার্য কেশব মিশ্র আবার ভিন্নভাবে তর্কাভাষা গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্ণয় করে বলেছেন – "বিশেষা নিত্য নিত্যদ্রব্যবৃ**ত্তিঃ**"[১৮] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ স্বয়ং নিত্য এবং তা নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান।

আবার তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত বিশেষ পদার্থের নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন – "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষাস্তনন্তা এব।"[১৯] বিশেষ নামক পদার্থটি নিত্যদ্রব্যসমূহে থাকে। নিত্যদ্রব্য অনন্তসংখ্যক হওয়ায় বিশেষও অনন্ত। নিত্যদ্রব্য হল ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুতের উৎপাদক পরমাণুসমূহ, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এদের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক এই দ্রব্যগুলি এক একটি হওয়ায় এদের তিনটিতে তিনটি বিশেষ থাকবে। কিন্তু ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুতের উৎপাদক পরমাণুসমূহ অসংখ্য। আবার আত্মা ও মন সংখ্যাতীত। সুতরাং বিশেষও অসংখ্য। তবে "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষা**স্ত**নন্তা এব"[২০] এইটুকুই বিশেষের লক্ষণ বললে লক্ষণে 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো' পদটি থাকার দরূণ লক্ষণটি আত্মত্ব ও মনস্তে অতিব্যাপ্ত হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্নংভট্টসম্মত বিশেষ পদার্থের লক্ষণ করতে হবে – **"**আত্মত্ব মনস্তভিন্ন নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো ব্যাবর্ত**কা** বিশেষাঃ**"**[২১] (তর্কসংগ্রহ পদকৃত্য টীকা)। এই বিশেষ পরসামান্য বা সত্তাজাতির সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব পরসামান্য কেবল অনুগত প্রতীতির জনক হয়, অপরদিকে বিশেষ বিপরীতভাবে কেবল ব্যাবৃত্তি প্রতীতিরই জনক হয়। তাই তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট গ্রন্থের শেষভাগে আবার বিশেষ পদার্থের লক্ষণ করেছেনে এইভাবে – "নিত্যদ্রব্যবৃত্তায়ো ব্যাবর্ত্তকা বিশেষাঃ।"[২২] ব্যাবর্তক শব্দের অর্থ হল ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিমাত্রের কারণতা, নিত্যদ্রব্য বৃত্তিমান বিশেষ কেবল ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির কারণ হয়।

আচার্য্য বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন – "অন্ত্যে নিত্যদ্রব্যবৃর্ত্তিবিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"[২৩] আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেছেন অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যে বৃত্তিমান পদার্থই বিশেষ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি অন্ত্য পদের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন – "অন্তে অবসানে বর্ত্তঃ ইত্যন্ত যদ**পেক্ষ**য়া বিশেষা নাস্তীত্যর্থ্যঃ"[২৪] – এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অন্ত্য শব্দের অর্থ হল বিশেষান্তররহিত বা বলা যায় যাতে বিশেষ অপেক্ষা অন্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোনো ভেদক ধর্ম নেই, একমাত্র বিশেষই ভেদক। আচার্য্য বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাতে বলেছেন – "স তু স্বতো এব ব্যাবৃত্ত তেন তত্র বিশেষান্তর নাস্তীত্যর্থঃ"[২৫] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ হল স্বতোব্যাবৃত্ত, তাঁর ব্যাবৃত্তিতে অন্য কোন বিশেষের অপেক্ষা নেই, এইভাবে আচার্য্যগণ বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

বিশেষ পদার্থ বিষয় প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন, – "লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধি" অর্থাৎ লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা বস্তুর নিশ্চয় হয়, লক্ষণের দ্বারা বস্তুর অসম্ভবনাবুদ্ধি দূর হয়। তাই লক্ষণের পর বস্তু সিদ্ধিতে প্রমাণ দেওয়াই রীতি। তাই বিশেষ পদার্থ পদার্থ বিষয়ক লক্ষণ আলোচনা করার পর প্রমাণের দ্বারা বিশেষের সিদ্ধি প্রসঙ্গটি আলোচিত হবে।

বিশেষ পদার্থ বিষয়ে প্রমাণ হল যোগীর প্রত্যক্ষ এবং অযোগীর অনুমান। যোগীগণ এক পরমাণুতে একটি বিষয় অপর পরমাণুতে অপর ভিন্ন বিশেষ প্রত্যক্ষ করে দুইটি পরমাণুর পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কখনই অসীম ক্ষমতাশীল যোগীগণের মতো বিশেষের প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নয়। তাই বলা যায়, যোগীগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিশেষের সিদ্ধি করতে পারলেও অযোগীগণের পক্ষে বিশেষ সিদ্ধির একমাত্র উপায় হল অনুমান।

আপত্তি উঠতে পারে, পরমাণু অতীন্দ্রিয় সেই অতীন্দ্রিয় পরমাণুতে ভেদবুদ্ধি স্বীকারের প্রয়োজন কী? আমরা বলতে পারি অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ ভেদবুদ্ধির বিষয়ই হতে পারে না। উক্ত আপত্তির সমাধানে ব্যোমশিবাচার্য একটি অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করে দেখিয়েছেন যে, অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহও আমাদের ভেদবুদ্ধির বিষয় হতে পারে, অনুমানটি এইরূপ – "পরমাণ্বাদয়ঃ ব্যাবৃত্তজ্ঞানবিষয়াঃ দ্রব্যত্বাৎ গবাদিবৎ"[২৬] অর্থাৎ পরমাণুসমূহ ব্যাবৃত্তিজ্ঞানের বিষয় হয় যেহেতু সেগুলি দ্রব্য যেমন –গবাদি। শুক্লবর্ণবিশিষ্ট হওয়ায় দরুন বা শীঘ্রগতি নিমিত্ত কিংবা মহাঘন্টারূপ সংযোগীনিমিত্ত যেমন প্রতিটি গবাদিরূপ দ্রব্য একে অপরের থেকে ভিন্ন তেমনই সমান জাতি, গুণ, ক্রিয়াবিশিষ্ট পরমাণুগুলিও দ্রব্য হওয়ায় কোনও না কোনও ভেদক নিমিত্ত একে অপরের থেকে ভিন্ন বা যথার্থ ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির বিষয়, ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন এই ভেদকই হল 'বিশেষ'।

ন্যায়লীলাবতীতে প্রদত্ত বিশেষসাধক অনুমানটি হল – "সমানজাতিগুণকর্মাণঃ পরমানবঃ ব্যাবর্তকধর্মসম্বন্ধিনঃ যথার্থব্যাবৃত্তজ্ঞানবিষয়াত্বাদ ঘটাদিবৎ"[২৭] - অর্থাৎ সমান জাতি গুন ক্রিয়া বিশিষ্ট পরমাণুসমূহ অবশ্যই ব্যাবর্তকধর্মযুক্ত যেহেতু তারা যথার্থ ব্যাবৃত্তজ্ঞানের বিষয়; যেমন ঘট, আর সেই ব্যাবর্তক ধর্ম বা ভেদক ধর্মই হল বিশেষ যার দ্বারা প্রত্যেকটি পরমাণু একে অপরের থেকে ভিন্ন, ব্যোমশিবাচার্য্য ও অনুরূপ অপর একটি অনুমান প্রদর্শন করে বিশেষকে সাধন করেছেন। অনুমানটি হল এইরূপ - "সমানজাতিগুণক্রিয়াধারা পরমানবঃ বিশেষসম্বন্ধিনো ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বিষয়াত্বাদ"[২৮] - অর্থাৎ সমান জাতি, গুণ, ক্রিয়ার আশ্রয় পরমাণুসমূহ বিশেষ সম্বন্ধী যেহেতু তারা ব্যাবৃত্তবুদ্ধির বিষয়। এইভাবে আচার্য্যগণ অনুমানপ্রমানের দ্বারা বিশেষের সাধন করেছেন। দুটি স্বজাতীয় পরমাণু অতিরিক্ত অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও ন্যায়বৈশেষিক বিশেষ স্বীকার করে থাকেন।

বিশেষ স্বীকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র : ন্যায়বৈশেষিক মতে নিত্যদ্রব্য নয় প্রকার - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুতের উৎপাদক পরমাণুসমূহ এবং আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, ও মন। স্বজাতীয় পরমাণুগুলিকে একে অপরের থেকে ব্যাবৃত্তির জন্য পরমাণুসমূহে বিশেষ স্বীকৃত হয়েছে। সংসারদশায় জ্ঞান, সুখদুঃখাদির বৈলক্ষণ্যের দ্বারা বদ্ধ আত্মার ভেদসিদ্ধি সম্ভব হলেও মুক্ত আত্মাদ্বয়ের পরস্পর ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি মনের পারস্পরিক ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ আবশ্যক।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, পরমাত্মা বা ঈশ্বরও তো নিত্যদ্রব্য, তাহলে ঈশ্বরেও কি বিশেষ স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে? উত্তরে বলা যায় এই বিষয়ে মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন ঈশ্বর নিত্য জ্ঞানবান। তার জ্ঞানের দ্বারাই জীবাত্মা ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে তার ভেদ সিদ্ধ হতে পারে।

অপর পক্ষ বলেন, ঈশ্বরেও ভেদ স্বীকার করতে হবে কেননা নিত্যজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের জীবাত্মা হতে ব্যাবৃত্তি হতে পারে না।এক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে নিত্যজ্ঞানটি কি জ্ঞানত্বরূপে জীবাত্মা হতে ঈশ্বরের ব্যাবর্তক অথবা নিত্যত্ববিশিষ্ট

জ্ঞানত্বরূপে জীবাত্মা হতে ঈশ্বরের ব্যাবর্তক। প্রথম বিকল্পটি সম্ভব নয় যেহেতু জ্ঞানত্ব জীবের জ্ঞানেও আছে কিন্তু তাতে ঈশ্বরেতরের ভেদ নেই বলে ব্যভিচার হয়ে যাবে। আবার নিত্যত্ববিশিষ্ট জ্ঞানত্বরূপে নিত্যজ্ঞানও ঈশ্বরের ব্যাবর্তক হবে না। কেননা নিত্যত্ববিশিষ্ট জ্ঞানত্বটি নিত্যত্বঘটিত বলে উপাধি আর উপাধিরূপে নিত্যজ্ঞান ব্যাবর্তক হতে পারে না। সুতরাং এই যুক্তিতে ঈশ্বরেও বিশেষ স্বীকার করতে হবে। "ঈশ্বরস্বেতরভিন্ন বিশেষবত্ত্বাৎ"[২৯] - অর্থাৎ ঈশ্বর নিজের ইতর থেকে ভিন্ন যেহেতু তাতে বিশেষ আছে। এইভাবে বিশেষের দ্বারাই ঈশ্বরনিষ্ঠ ভেদানুমিতি সিদ্ধ হয়ে থাকে। ন্যায়বৈশেষিক আকাশ, কাল, দিকে বিশেষ স্বীকার করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে আকাশ, কাল, দিকে অনর্থকভাবে বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন কী? এর উত্তরে বলা হয়েছে - আকাশে 'শব্দ' হল একটি বিশেষ গুণ, যা কাল এবং দিকে থাকে না, ফলে 'শব্দ' এই বিশেষ গুণের দ্বারা কাল ও দিক হতে আকাশের ভেদসিদ্ধি হতে পারবে কিন্তু কাল ও দিক তো সমানগুণধর্মবিশিষ্ট। কাল ও দিকে সত্তা ও দ্রব্যত্ব ধর্ম থাকে, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ - এই পাঁচটি গুণ থাকে। সুতরাং কাল ও দিকের পারস্পরিক ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ স্বীকার আবশ্যক।

তবে ন্যায়বৈশেষিক বলেন, আকাশে বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে অন্য কারণে। আমরা জানি, আকাশে শব্দের সমবায়িকারণ ফলে আকাশে শব্দের সমবায়িকারণতা আছে। আর অবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার না করলে কারণতা উপপন্ন হয় না। যেহেতু 'কারণতা_কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না'[৩০] - এইরূপ নিয়ম মানা হয়। এখন আকাশে শব্দসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক কি হবে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- আকাশে একত্বসংখ্যা, একপৃথক্ত্ব, পরমমহৎপরিমাণ - এই তিনটি গুণ থাকে। এই তিনটির কোন একটিকে অবচ্ছেদক ধর্মরূপে গ্রহণ করার পক্ষে কোন অনুকূলযুক্তি নেই, আবার, তিনটিকেই যদি অবচ্ছেদক ধর্মরূপে গ্রহণ করা হয় তবে গৌরব অবশ্যম্ভাবী। তাই লাঘব যুক্তিতে আকাশে শব্দসমবায়ীকারণতার অবচ্ছেদকরূপে আকাশে বিশেষকে স্বীকার করা হয়।

Reference:

১. উদয়নাচার্য, কিরণাবলী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ২৪১
২. বৈঃ সূঃ ১/২/৬, মন্ডল, প্রদ্যোতকুমার, বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স্ কলকাতা, জুন, ২০০৪
৩. প্রশস্তপাদাচার্য, প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথম ভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃ. ২৩০
৪. Praśastapāda, Praśastapādabhāsyam with Comm. Setu, Padmanabhāmiśra and Vyombati, Vyom śivacharyya Chowkhambha Sanskrit Series-Vidyavilas Press, Benares, 1924, p. 56
৫. প্রশস্তপাদাচার্য, প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথম ভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃ. ২৪০
৬. ঐ, পৃ. ২৪০
৭. ঐ, পৃ. ২৩৭
৮. ঐ, পৃ. ২৩৮
৯. ঐ, পৃ. ২৩০
১০. Praśastapāda, Praśastapādabhāsyam, Vindhyeswari Prasad Dvivedi (Ed:), Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi, 1919, p. 24
১১. উদয়নাচার্য, কিরণাবলী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ২৪৩
১২. মিশ্র, শ্রীকেশব, তর্কভাষা, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৩৫৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৩. Praśastapāda, Praśastapādabhāsyam with Nyāyakandali, Śridhar Bhatta (Ed:), with hindi translation by Durgadhar jha, Benares Sanskrit Visvavidyalaya, Benares, 1963, p. 757
১৪. Vallabhacārya, Nyāya Lilāvati, with the commentaries of Vardhamānopadhyāy, Śankara misra and Bhagiratha Thakkura, The Chowkhambha Sanskrit Series office, Varanasi, 1934, p. 757
১৫. Śivaditya, Saptapadārthi, Amrendra Mohan Tarkatirtha and Narendra Chandra bagchi Vedantatirtha, Metropoliton Printing and Publishing House, Kolkata, 1934, p. 17
১৬. ঐ, পৃ. ৫১
১৭. আচার্য্য বরদরাজ, তার্কিকরক্ষা, পন্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ (সম্পাঃ), বারাণসী মেডিকেল যন্ত্রালয়, বারাণসী, ১৯০৩, পৃ. ১৫৬
১৮. মিশ্র, শ্রীকেশব, তর্কভাষা, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৩৫৪
১৯. শ্রীমৎ অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, দীপিকাটীকা সহকৃত, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (অনুঃ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ৫২
২০. ঐ, পৃ. ৫২
২১. Annaṃbhatta, Tarkasaṃgraha with padakritya, Shesharaj Sharma, Benares Chowkhambha Shurabharati Prakashan, Benares, 1977, p. 92
২২. শ্রীমৎ অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, দীপিকাটীকা সহকৃত, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (অনুঃ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ৫২
২৩. বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী (অনুঃ), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩
২৪. ঐ, পৃ. ৬৩, ৬৪
২৫. ঐ, পৃ. ৬৫
২৬. জগদীশ তর্কলঙ্কার, প্রশস্তপাদভাষ্যম, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯২৪, পৃ. ৫৯
২৭. মিশ্র, শ্রীকেশব, তর্কভাষা, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৩৫৮
২৮. জগদীশ তর্কলঙ্কার, প্রশস্তপাদভাষ্যম, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯২৪, পৃ. ৫৮
২৯. প্রশস্তপাদাচার্য, প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথম ভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃ. ২৩৬
৩০. শ্রীমৎ অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, দীপিকাটীকা সহকৃত, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (অনুঃ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ৭২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 922 - 932
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 – 0848

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসদের ভূমিকা

মৃদুল বনিক
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : banik.sindrani@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Razakar, Al-Badr, Al-Sham, Perpetrators, Massacre, Raped, Voluntary, Paramilitary.

Abstract
Razakar, Al-Badr, Al-Sham and Shanti Committee were the paramilitary forces formed at the time of the Bangladesh Liberation War in 1971 to support the Pakistani military against minority Hindu and Awami League supporters. The Razakars were selected from the Bihari community who lived in East Pakistan and migrated from Bihar after 1947. The Razakars were also selected from pro-Pakistani Bengalis who supported an undivided Pakistan. Razakar, Al-Badr and Al-Sham were involved in brutal massacres and human rights abuses during the war. These subsidiary forces had secured the Pakistani army's local support, food, insights and intelligence on targets and locations. The student wing of the religious political party Jamaat-e-Islami also provided them with logistical support like men and information. Initially, these auxiliary forces were only called volunteers and were part of civil defence. But from May 1971 onwards, these perpetrators were formally organized into Razakar, Al-Badr and Al-Shams. They were trained by the Pakistani military. They killed thousands of innocent people during the war and thousands of women and girls were raped and sexually assaulted. This paper will explore the heinous activities of these perpetrators. The paper will also examine the reasons behind the creation of these voluntary groups.

Discussion

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগি কিছু আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়, সেগুলো হল - শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস্ বাহিনী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার জন্য এইসকল সশস্ত্র আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সকল সংগঠনের সদস্যদের কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করা, পাকিস্তান সেনাদের বিভিন্ন অভিযানে সহযোগিতা করা, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে খবর দেওয়া, এলাকার মেয়ে ও মহিলাদের নিয়ে এসে পাকিস্তানি ক্যাম্পে তুলে দেওয়া, পাকিস্তানি বাহিনীর খাদ্যের যোগান দেওয়া এবং গণহত্যায় সম্পৃক্ত থাকা। এই সকল কুখ্যাত সংগঠনের অধীনে বাঙালীরা যেমন ছিল, তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত উর্দুভাষী বিহারীদের অনেকে তাতে যোগ দেয়। পাকিস্তান বাহিনী তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এই রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। রাজাকাররা স্থানীয়ভাবে খুব সক্রিয় ছিল, পাকিস্তানি বাহিনী যখন অভিযান পরিচালনা করত তখন স্থানীয় রাজাকাররা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো কোথায় মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষ লুকিয়ে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের ২৮ মে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' জারি করে এই বাহিনীকে আনসার বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তবে স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'শান্তি কমিটি'র তত্ত্বাবধানে ছিল রাজাকার বাহিনী। সাধারণত, শান্তি কমিটির নেতারাই রাজাকার বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করতেন। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে এইসব আধা-সামরিক বাহিনীর জন্য সদস্য সংগ্রহ করা হত এবং তারা প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজাকার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল জামায়াতে ইসলামীর হাতে। অন্যদিকে, আল-বদর বাহিনী ছিল শিক্ষিত। জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ও ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীরা আল-বদর বাহিনীর সদস্য ছিল। আল-বদরদের বর্বোরোচিত কাজ ছিল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার করা।

রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী গাড়ে তোলার কারণ : ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশের ভেতরে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বা সংগঠন গড়ে উঠেছিল, এগুলো হল - শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস। যুদ্ধের সময় 'শান্তি কমিটি' গঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন পাকিস্তানের সমর্থক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিরা। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জামায়েত ইসলামীর নেতা গোলাম আযম এবং মুসলিম লীগের নেতা খাজা খয়েরউদ্দিন। রাজাকার ছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীন একটি আধাসামরিক বাহিনী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার জন্য এই সশস্ত্র আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। গঠন হওয়ার পাঁচ মাসের মাথায় এই আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাজাকার বাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানে বসবাসকারি উর্দুভাষী বিহারি জনসংখ্যা থেকেও নিয়োগ করেছিল। রাজাকার বাহিনীতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ছিল। এদের কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করা ও গণহত্যায় সম্পৃক্ত থাকা।[১] অন্যদিকে, আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল শিক্ষিত মানুষদের নিয়ে। জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীরা এ বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আল-বদর বাহিনীর তিন থেকে পাঁচ হাজার সদস্য ছিল। বাহিনীটির প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী, যিনি স্বাধীন বাংলাদেশে পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর আমির হন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে একটি সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে আল-শামস গঠিত হয়। আল-শামস বাহিনীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ইসলামী ছাত্রসঙ্ঘের বাছাই করা ব্যক্তিদের নিয়ে এই আল-শামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই বাহিনীর সাথে জামাত ইসলামের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। এদের লক্ষ্য ছিল জামাতি ইসলামের নীতি অনুসরণ করা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা। তাদের আরেকটি লক্ষ্য ছিল আওয়ামীলীগের সদস্যদের হত্যা করা। এরা মানবতা বিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যায় যুক্ত ছিল। এছাড়া আল-শামস বাহিনীর সদস্য সংখ্যাও ছিল প্রায় তিন হাজারের অধিক।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে কিন্তু তখনকার সময়ের সব থেকে বড় বাধা ছিল তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুরা এবং পরবর্তীতে আওয়ামিলীগের সমর্থক ব্যক্তিরা। যারা পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন সমালোচনাসহ তাদের ইসলামীক সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ এর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান চেয়েছিল পূর্ব বাংলায় উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিতে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রথম বিরোধিতা করেছিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সেই সময় বড় চাকরিতে এবং ব্যবসা-বানিজ্যে যুক্ত ছিল হিন্দুরা। পাকিস্তানের আইন সভায় বেশকিছু প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ ছিল হিন্দু। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই ২৬ শতাংশ হিন্দুরা। পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার তাই এমন নীতি নিয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তানকে

হিন্দু শূন্য করতে হবে। হিন্দু শূন্য পূর্ব পাকিস্তানের সেই পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং সরকারের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু গ্রাম গুলো ধ্বংস করা এবং হিন্দুদের হত্যা করা। এই উভয় কাজ পরিচালনার জন্য তাদের দরকার ছিল স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা। কারণ স্থানীয় আধাসামরিক বাহিনীর লোকেরা বাঙালি হিন্দু গ্রামগুলোর ঠিকানা দিতো এবং তাদের রাস্তা দেখিয়ে সেই গ্রামগুলোতে নিয়ে যেতে। গনহত্যার পূর্বে এই হিন্দু গ্রাম এবং হিন্দুদের জনসংখ্যা সম্পর্কে রাজাকার ও আল-বদরেরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে খবর দিতো। এই সকল উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিছু আধাসামরিক বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই সময় যে আনসার বাহিনী ছিল সেই বাহিনীর প্রতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেনি। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই এই আনসার বাহিনী ভেঙে দেয়া হয় এবং সেই আনসার বাহিনীর স্থানে গঠন করা হয় রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ বাহিনী। এই সকল আধাসামরিক বাহিনী যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের অভিযানে অংশ নিতো ও তাদের রাস্তা দেখিয়ে হিন্দু গ্রামগুলোতে নিয়ে যেতো এবং হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করত। এই সকল রাজাকারেরা মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধ সম্পর্কে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের খবর পৌঁছে দিতো। রাজাকারদের অন্য কাজ ছিল যুবতী মেয়ে এবং মহিলাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানী ক্যাম্পে রেখে আসা। এই সকল মেয়ে এবং মহিলাদের উপর পাকিস্তানি সেনারা অমানবিক ধর্ষণ ও নির্যাতন করত।[২] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রতিটা হিন্দু গ্রামে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার, আল-বদরদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল।[৩] তারা হিন্দুদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল, মেয়ে এবং বউদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোতে এবং পুরুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে হত্যা করাতো। অনেক সময় হিন্দুরা রাজাকারদের এবং আল-বদরদের সামনে বলত যে তারা মুসলমান তাই তাদের বাছাই করার জন্য আল-বদর ও রাজাকারেরা হিন্দু বাঙালি পুরুষদের কাপড় খুলে তাদের পুরুষাঙ্গ দেখে তাদের সনাক্ত করতো সে সত্যিকারের হিন্দু না মুসলমান। এই সময় খ্রিস্টান ধর্মের মানুষদের তুলনামূলকভাবে কম হত্যা করা হত। তারা খ্রিস্টানদের চিহ্নিত করতো তাদের গলার ক্রুশ চিহ্ন দেখে। খ্রিস্টানদের বলা হত মালায়ন কারন তারা গলায় ক্রুস চিহ্ন পরে থাকতো। খ্রিস্টানদের হত্যা না করার কারণ ছিল তৎকালীন সময়ে আমেরিকার সমর্থন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি।

ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেন, রাজাকার একটি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী। যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তার জন্য ১৯৭১ খুলনার খান জাহান আলী রোডের একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন পাকিস্তানপন্থী ব্যক্তিকে নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়।[৪] এরপর দেশের বিভিন্ন জায়গায় এ বাহিনীর জন্য সদস্য সংগ্রহ করা হয় এবং তারা প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রাজাকার বাহিনী গঠনের পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ, যিনি পরবর্তীতে দলটির নায়েবে আমির হন।[৫] তিনি রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং খুলনায় শান্তি কমিটির প্রধান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি'র আহবায়ক ড. এম এ হাসান বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর 'ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স' গঠন করা হয়।[৬] তিনি জানান, এর অধীনে রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস্ বাহিনী গঠন করা হয়। এই সকল বাহিনীর অধীনে বাঙালীরা যেমন ছিল, তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বিহারী উর্দুভাষীদের অনেকে তাতে যোগ দেয়।[৭] পাকিস্তান বাহিনী তাদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ ও হাতে অস্ত্রও তুলে দিয়েছিল।

রাজাকারদের ভূমিকা : পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার আধ্যাদেশ' জারি করে এই বাহিনীকে আনসার বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।[৮] ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তবে স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'শান্তি কমিটি'র তত্ত্বাবধানে ছিল রাজাকার বাহিনী। শান্তি কমিটির নেতারাই রাজাকার বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করতেন। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজাকার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল জামায়াতে ইসলামীর হাতে। রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ করা হয়েছিল জামায়াতের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ ইউনুসকে। অনেক রাজাকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সদস্য অবশ্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেও কাজ করতেন। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং ড. এমএ হাসান – দু'জনই বলেছেন যে রাজাকার বাহিনীতে যারা কাজ করতেন, তাদের নাম মুক্তিযুদ্ধের সময় সংশ্লিষ্ট থানায় লিপিবদ্ধ ছিল। ড. এমএ হাসান বলেন, রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতো, মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে আনতো, হত্যা করত কিংবা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতো। আনসার বাহিনীতে যারা ছিল তারা ছিল বাঙালি। পাকিস্তান বাহিনীকে ধারণা দেওয়া হল যে, এদের বিশ্বাস করা যায় না; এরা অনেকে পালিয়ে যেতে পারে, কেউ কেউ পালিয়েও গেছে। তাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আনসার বাহিনীকে বিশ্বাস করতে পারেনি। গণহত্যা শুরুর প্রথম দিকেই এই আনসার বাহিনীকে ভেঙে দেয়া হয়। এই আনসার বাহিনীর পরিবর্তে গঠন করা হয় রাজাকার বাহিনী। এ কারণেই শহরাঞ্চলে যেখানে বিহারিরা ছিল সেখানে তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। রাজাকাররাও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নিতো, প্রশিক্ষণ নিতো। তৎকালীন দলিলপত্র থেকে জানা যায়, কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনসংলগ্ন মাঠে এবং মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মাঠে রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। আজাদুর রহমান চন্দন তাঁর 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা' বইয়ে লিখেছেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এক লাখ সদস্যের রাজাকার বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫০ হাজার নিয়োগ দিয়েছিল। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে চন্দন লিখেছেন, রাজাকারদের দুই থেকে চার সপ্তাহের ট্রেনিং দেওয়া হত। অস্ত্র হিসেবে দেওয়া হতো 'থ্রি নট থ্রি' রাইফেল। প্রথম দিকে একজন রাজাকারের মাসিক বেতন ছিল ৯০ টাকা। তা বাড়িয়ে ১ ডিসেম্বর থেকে একজন রাজাকার সদস্যের মাসে ১২০ টাকা, রাজাকার প্লাটুন কমান্ডারের ১৮০ টাকা এবং রাজাকার কোম্পানি কমান্ডারের ৩০০ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়।[৯] জেনারেল রাও ফরমান আলীকে উদ্ধৃত করে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বরের এক রিপোর্টে বলা হয়, ওই সময় পর্যন্ত রাজাকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০ হাজারে। জেনারেল টিক্কা খান সারা দেশে বাধ্যতামূলকভাবে অনেক চোর, ডাকাত ও সমাজবিরোধীকেও রাজাকার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজাকাররা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার শপথ নিতো। পাকিস্তান সরকার রাজাকারদের অর্থ প্রদান করত। অখন্ড পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় সমর্থকরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে রাজাকারদের সংখ্যা বাড়াতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করার জন্য তাদের আরও অস্ত্র দেওয়ার আহ্বান জানায়। তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের বিরোধীদের এবং নকশালদের সমূলে উৎপাটন করতে। রাজাকার ও আল-বদরেরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পরিচালনা করত, সেখানে সাধারণ মানুষদের আটকে রেখে অত্যাচার করত এবং মেয়েদের ধর্ষন করত।[১০] রাজাকার বাহিনীকে চার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের ব্রিগেডে সংগঠিত করা হয়েছিল। এরা প্রধানত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দেওয়া হালকা পদাতিক অস্ত্রে সজ্জিত। প্রতিটি রাজাকার ব্রিগেড দুটি পাকিস্তান নিয়মিত আর্মি ব্রিগেডের সহায়ক হিসেবে সংযুক্ত ছিল এবং তাদের প্রধান কাজ ছিল স্বাধীনতাক আমি বাঙ্গালীদের আটক করা এবং পরবর্তীতে তাদের হত্যা করা। রাজাকারদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী অস্ত্র চলানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। কয়েকজন কুখ্যাত রাজাকার ছিল গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ, মো. কামারুজ্জামান, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আবদুল কাদের মোল্লা, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর। রাজাকারেরা নির্দিষ্ট ভাতার বিনিময়ে তারা সরকারের হয়ে দুইভাবে কাজ করত। একদল পাকিস্তানের সপক্ষে মানুষকে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা চালাত। আর একদল অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সাধারণ মানুষদের হত্যা করত। রাজাকারেরা গ্রামে গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে পাক সেনার হাতে তুলে দিতো।[১১] রাজাকাররা স্থানীয় নিরীহ মানুষদের বাড়ি থেকে যুবতী মেয়ে ও নারীদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে দিয়ে আসতো। বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দু ও আওয়ামী লীগের সমর্থনকারী পরিবারগুলোকে তারা নিশানা করত। কখনো কখনো তারা নিজেরাও যুবতী মেয়ে ও নারীদের ধর্ষণ করত। যে সকল নারীদের ছোট শিশু থাকতো রাজাকাররা তাদের শিশুদের প্রথমে হত্যা করত তারপর তার মাকে ধর্ষণ করত। ছোট্ট শিশুদের তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিতো এবং পরবর্তীতে সেই শিশুকে তার মায়ের সামনে হত্যা করত। আর যেসব যুবতী মেয়ে ও নারীদের পাকিস্তানি ক্যাম্পে রেখে আসতো তাদের উপর চলত লাগাতার ধর্ষণ ও অমানবিক অত্যাচার। এই সকল যুবতী মেয়ে ও মহিলাদের পাকিস্তানি সেনারা তাদের ক্যাম্পে আটকে রাখতো এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে

মহিলা গুলোকে অমানবিক অত্যাচার ও ধর্ষণ করত। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এই সকল মেয় ও নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনার ক্যাম্পগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ যুবতী নারী ও মেয়েদের উদ্ধার করা হয়েছিল। রাজাকাররা পাকিস্তানি সেনাদের সাথে থাকতো এবং হিন্দু ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতো। শুধুমাত্র নোয়াখালী শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৫০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, পাঁচ হাজার মহিলার ধর্ষণ করেছে এবং ১০ লাখ ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।[১২]

আল-বদর বাহিনীর ভূমিকা : জামায়েত ইসলামের শিক্ষিত লোকের নিয়ে তৈরি হয়েছিল আল-বদর বাহিনী। এই আল-বদর বাহিনী ছিল মূলত তাদের বুদ্ধিজীবী সংগঠন। আল-বদরদের প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন অভিযানের এবং গণহত্যার নীলনকশা তৈরি করা। তাদের এই পরিকল্পনা গুলো তারা পাকিস্তানি সেনাদের সামনে তুলে ধরতেন। পরবর্তীতে তারা যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করত। আল-বদরদের অন্যান্য দায়িত্ব ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা। আল-বদর ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিকদের উপর নৃশংসতা অত্যাচার চালায়। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার রায়ের বাজার এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যাযজ্ঞ। আল-বদর তৈরি হওয়ার পর এই বাহিনী মূলত শহরাঞ্চলে কাজ করে। আর গ্রামাঞ্চলে মূলত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহায়তা করতো রাজাকার বাহিনী। আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যে আদর্শ ধারণ করতো তা বেশ শক্ত ছিল। দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে আল-বদর বাহিনী নিজেদের সম্পর্কে বলে, আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়। আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই! যেখানেই দুষ্কৃতকারী, আল-বদর সেখানেই। ভারতীয় চর বা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল। ২২ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে জামালপুর শহরে আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়।[১৩] দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে ইসলামি ছাত্রসংঘের নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলে, আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনাদের এ দেশের ইসলাম প্রিয় তরুন ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল-বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩।[১৪] এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে ৩১৩ জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১৫] আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল অনেকটা একই রকম। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে এদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। ইসলামি ইতিহাসের বদর যুদ্ধকে আদর্শ করে এই বাহিনী গঠিত হলেও এদের মূলকাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া। ১৯৭১ সালের মে মাসে রাজাকার বাহিনী গঠনের আগেই এপ্রিল মাসে গঠিত হয় আল-বদর বাহিনী। গবেষক আজাদুর রহমান চন্দন মতে একাত্তরে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়েছিল। আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। তিনি ১৯৭১ সালে ছিলেন তখনকার জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান। এই ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়েই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী মিলিশিয়া হিসেবে গঠিত হয়েছিল আল-বদর বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে শেষ কয়েক মাসে এই আল-বদর বাহিনী ঢাকা এবং অন্যত্র পরিকল্পিত ভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। মতিউর রহমান নিজামী নিজেই তখন সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে আল-বদর বাহিনীকে বর্ণনা করেছিলেন 'পাকিস্তানের শত্রুদের কাছে সাক্ষাত আজরাইল' বলে। যাদেরকে পাকিস্তানের শত্রু বলে মনে করা হয়েছিল তাদের নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল রাজাকার ও আল-বদর বাহিনী দ্বারা। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা তৈরি হলে এই তালিকা ধরে হত্যাকাণ্ডের বাস্তবায়ন করে আল-বদর বাহিনী। আল-বদর বাহিনী যুদ্ধের পুরো সময় তাদের কার্যক্রম চালালেও মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দুদিন আগে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করে। বাংলাদেশ ওয়ারক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির প্রধান ড: এম এ হাসান বলেছেন, "আল-বদর বাহিনীকে সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে পাকিস্তান বাহিনী তাদের হাতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ তুলে দিতো, মাসিক ভাতা দিতো। প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বিভিন্ন অপারেশনে যেতো আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা। যাদেরকে শত্রু মনে করতো তারা তাদের সম্পর্কে খবরাখবর নিতো, তুলে নিয়ে যেতো ও গোপন হত্যাকাণ্ড চালাতো। কখনো পাকিস্তান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেনাবাহিনীর হাতেও তুলে দিতো"। গবেষক সাইয়েদ ওয়ালি রেজা নাসের তার 'দ্য ভ্যানগার্ড অব দি ইসলামিক রিভলিউশন : দ্য জামায়াতে ইসলামী অব পাকিস্তান' শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন, "একাত্তরে সরকারের অণুপ্রেরণায় ইসলামী ছাত্রসংঘ হয়ে ওঠে জামায়াতে ইসলামীর মূল শক্তি। সেনাবাহিনীর সহায়তায় এরা আল-বদর ও আল-শামস নামে দুটি প্যারামিলিটারি ইউনিট গঠন করে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। ইসলামী ছাত্রসংঘের তখনকার নাজিম-ই আলা (প্রধান) মতিউর রহমান নিজামী আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর আল-বদর বাহিনীর অনেকেই পালিয়ে পাকিস্তান ও ভারতসহ অন্যান্য দেশে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানে তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ দল ছিল। পাকিস্তানের আই.এস.আই-এর সহায়তা তারা পাকিস্তানে নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতা পরিবেশ এবং মৌলবাদের আদর্শ কায়েম করার জন্য তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। তাদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা। পরবর্তীতে ইসলামী মৌলবাদী আদর্শের অনুকৃত সরকার দ্বারা দেশ পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। তাদের আদর্শ এখনো রয়ে গেছে বাংলাদেশের মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের ভেতর।

আল-বদরেরা যুদ্ধের সময় নারকীয় তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল। আব্দুল খালেক ছিলেন আল-বদর বাহিনীর অন্যতম প্রধান সদস্য। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় আব্দুল খালেকের বয়স ছিল ২৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে, শিক্ষিত, দেখতে বেশ স্মার্ট ও মুখে ছিল সুন্দর দাড়ি। আল-বদর গোষ্ঠীর সদস্যরা যে নর-মুন্ডগুলি তাদের সদর দপ্তরে নিয়ে আসতো, তার জন্য প্রতি মাথাপিছু আব্দুল খালেক নগদ টাকা দিতো। তবে নর-মুন্ডের দর খুব বেশি ছিল না। এতে অবশ্য নরমুন্ডশিকারিদের মনে কোনো রকম ক্ষোভ ছিল না। কারণ, নরমুন্ডের সংখ্যা হাজার হাজার ছিল তাতে তাদের পুষিয়ে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে নরমুন্ড পিছু আড়াই টাকা দেয়া হত।[১৬]

আল-শামসদের ভূমিকা : শিক্ষিত ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের ভেতর থেকে বাছাই বাছাই বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল আল-শামস বাহিনী। এরা ছিল মূলত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রধান স্থানীয় বুদ্ধিজীবী। এই বাহিনীর উপদেশ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মেনে চলত। আল-শামস বাহিনী বড় বড় গণহত্যার পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি করত আর সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আল-শামস বাহিনীতে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাড়াও মুসলিম লীগপন্থী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও মাদ্রাসা ছাত্ররা যুক্ত ছিল। আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল অনেকটা একই রকম। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে এদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীর প্রচারযন্ত্র দৈনিক সংগ্রাম এর মাধ্যমে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ও যুদ্ধের ডাক দিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করে সে বাহিনীর আমীরের পদ গ্রহণ করলে তৎকালীন ছাত্রসংঘের কর্ণধার, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আবদুল কাদের মোল্লার নেতৃত্বে আল-শামস ও আল-বদর বাহিনী গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের আমীর ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর আমীরের পদ গ্রহণ করেন এবং সারা বাংলাদেশে প্রচারণা, সামরিক বাহিনীসমূহের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা নগর ছাত্রসংঘের আমীর ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদও এসব বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। আল-শামস অবকাঠামো রক্ষা করত এবং সেনাবাহিনীকে রসদ ও গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করত। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আল-শামস ফজলুল কাদের চৌধুরীর অধীনে ছিল এবং চট্টগ্রামে তার ছেলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে ছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাবেক এমপি সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এবং সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী। তারা সাতকানিয়া, রাউজান, বোয়ালখালী, পটিয়া ও রাঙ্গুনিয়ার আশেপাশে জিপে টহল দিতো। তারা হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিতো এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতি সমর্থক বলে সন্দেহ করত এমন কাউকে গ্রেপ্তার করতো। সন্দেহভাজনদের সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বাসভবন 'গুডস হিলে' নিয়ে যাওয়া হতো, যেটিকে টর্চার সেলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, সেখানে তাদের নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। তাদের লাশ কর্ণফুলী নদীতে ফেলা হত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর আল-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শামস ও আল-বদর নেতৃত্ব যৌথভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা তৈরি করে। আল-শামস এবং আল-বদর নেতারা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে দেখা করে এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা চূড়ান্ত করে।

বাংলাদেশের গণহত্যায় বিহারী মুসলমানদের ভূমিকা : ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বিহার থেকে মুসলমান উদ্বাস্তুরা ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ১৯৭১ সালের বাঙালি নিধনযজ্ঞে বিহারী মুসলমানেরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সর্বত্রভাবে সহায়তা করেছিল এবং তারা নিজেরাও গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ঢাকার মিরপুর অঞ্চল এক কুখ্যাত ও ভয়ংকর অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর এই অঞ্চলে কোন বাঙ্গালী প্রবেশ করলে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল। ঢাকার এই শহরতলী অঞ্চলে কমপক্ষে লক্ষাধিক বিহারী মুসলমানের বসবাস। পাকিস্তানি সেনারা গত নয় মাস ধরে বিহারী মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করেছে আর বিহারীরাও বাঙালীদের ওপর নিষ্ঠুর হামলা চালিয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে এই বিহারী মুসলমানরা আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই বিহারী মুসলমানদের আশঙ্কা বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যরা চলে গেলে তাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাই বিহারীরা চায় না যে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সরে যাক। বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারী মুসলমানদের অনেকেই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নিজেদের ভারতীয় বলে চালাবার চেষ্টা করছে। তাদের বেশিরভাগই ভারতে ফিরে যেতে চেয়েছিল এবং অনেকে চলেও গিয়েছিল।[১৭]

রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসরা যে সকল গণহত্যার সাথে যুক্ত ছিল : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব নৃশংস গণহত্যাগুলো সংঘটিত হয়েছিল তার পিছনে সবথেকে বড় ভূমিকা ছিল রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং শান্তি কমিটির। এদের দ্বারা সংগঠিত কিছু গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল - চুকনগর গণহত্যা একটি পরিকল্পিত গণহত্যা যা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও এদেশীয় রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর সহায়তায়, সংঘটিত হয়। গণহত্যাটি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২০ মে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর। এটি বিশ্বের কোনো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ একক গণহত্যা।[১৮] পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতা ও অত্যাচারের মুখে প্রাণের ভয়ে খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, শরণখোলা, মংলা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, চালনার লাখ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের উদ্দেশ্য তখন খুলনার ডুমুরিয়া হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছানো। তাদের উদ্দেশ্য একটাই ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়া। ভারতীয় সীমান্তে পাড়ি জমাতে হলে ডুমুরিয়া পর্যন্ত ভদ্রা নদী দিয়ে নৌকায় আসা ছিলো অপেক্ষাকৃত অনেকটাই সহজ। কারণ এরপর সাতক্ষীরা হয়ে ভারতীয় সীমান্ত। তাছাড়াও নদীপথে যাতায়াত সুবিধা ও অনেকটা নিরাপদ। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনাগোনা নেই বললেই চলে। আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগরের চারপাশ তখন নিচু এলাকা। কেবল চুকনগর বাজারটা তখন খানিকটা উঁচু। তখন আটলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন গোলাম হোসেন। শান্তি বাহিনীর সদস্য গোলাম হোসেন এবং ভদ্রা নদীর খেয়া ঘাটের ইজারাদার শামসুদ্দিন খাঁ নামের এক বিহারী ১৯ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাতক্ষীরা ক্যাম্পে যোগাযোগ করে বললেন, চুকনগর বাজারের বর্তমান অবস্থার কথা। হিন্দুদের ঢল নেমেছে চুকনগরে। পাকিস্তানি ক্যাম্পে যোগাযোগ করার পরে হানাদারেরা খবর পেয়ে একটি ট্রাক ও একটি জিপে করে সেনা পাঠায়। তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই সকল নিরীহ হিন্দুদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। তাতে মারা যায় অসংখ্য নারী পুরুষ ও শিশুরা।[১৯] তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন প্রায় ১২ হাজার নিরীহ মানুষ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নারকীয় গনহত্যা ঘটেছিল চট্টগ্রামের পরৈকোড়া। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা পরৈকোড়া, বাথুয়াপাড়া ও পূর্বকন্যারা গ্রামে বাঙ্গালী হিন্দুদের নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত উক্ত তিন গ্রামে ২২টি জমিদার পরিবার বসবাস করত। চট্টগ্রাম শহরের অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী একাত্তরের মার্চে তাঁদের পরিবার–পরিজন নিয়ে পড়ইকোরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রামের বাসিন্দা ও শহর থেকে আসা লোকজনের নিরাপত্তা দিতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র পাহারা ব্যবস্থা করেন। রাজাকার ও মুসলীম লীগ নেতা খায়ের আহমদ চৌধুরী ওরফে খয়রাতি মিয়া চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে এই তথ্য দেয়। ১৯৭১ সালের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২১মে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পড়ুইকোরা গ্রাম আক্রমণ করে। ২১মে সকাল ৯টার দিকে চট্টগ্রাম শহর থেকে পাকিস্তানি সৈন্য ৩৭টি সৈন্যবোঝাই ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ি পড়েকোড়া, বাথুয়াপাড়া ও পূর্বকন্যারা গ্রামে প্রবেশ করে। খায়ের আহমদ চৌধুরী ও তার সহযোগীরা পাকিস্তানি সেনাদের পথ দেখিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। পাকবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের নিয়ে পরৈকোড়া হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে হামলাশুরু করলে মুক্তিযোদ্ধারাও প্রতিরোধ শুরু করে এবং তাদের প্রতিরোধের মুখে কমপক্ষে ৩ জন রাজাকার মারা যায়। অতর্কিত প্রতিরোধের ফলে পাকবাহিনী প্রথমে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক আক্রমণ বন্ধ রেখে পরে আরো সৈন্য ও রাজাকারদের নিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ চালায়। নির্বিচারে গ্রামের হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। গুলি ও ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কুপিয়ে পুরুষদের হত্যা করা হয়। হিন্দু নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী। হিন্দু বাড়ি থেকে লুট করে নেওয়া গবাদি পশু দিয়ে রাজাকার খয়রাতি মিঞা পাকিস্তান বাহিনীর জন্য ভোজের আয়োজন করে। ১৯৭১ সালের ২১মে সকাল ১০টা হতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাদের হত্যালীলায় ১৭৬ জন পুরুষ সহ মোট ২৭৬ জন হত্যাকাণ্ডে মারা যান।

আতাইকুলা গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত নৃশংস হত্যা যজ্ঞ। পাবনা জেলার আতাইকুলা গ্রামের হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল সকাল ৯টা হতে বিকেল ৬টা পর্যন্ত রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনা হত্যালীলা চালায়। ৫২ জন মানুষ হত্যাকাণ্ডে মারা যায়।

ঢাপঢুপ গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে স্থানীয় চিহ্নিত রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার পাঁচপীর ইউনিয়নের ইসলামপুর ও শুকানপুকুরিসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সংগঠিত হত্যাকান্ডকে বোঝায়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের এই হত্যাকাণ্ডে ৩৫০০ জন সংখ্যালঘু হিন্দুদের গুলি করে ও কুপিয়ে করে হত্যা করা হয়।

আখিরা গণহত্যা ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার বাড়ইহাটের নিকটে অনুষ্ঠিত একটি গণহত্যা। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী হিন্দুদের ওপর এই গণহত্যা সংঘটিত করে। গণহত্যায় প্রায় ১০০ জন হিন্দু প্রাণ হারান বলে ধারণা করা হয়।

বাগবাটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল বৃহত্তর পাবনার পূর্ববর্তী জেলা সিরাজগঞ্জ উপ-বিভাগের বাগবাটি ইউনিয়নে। আল-বদর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সমন্বয়ে ২০০ নিরস্ত্র সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল। গণহত্যার একদিন আগে রাজাকার ও শান্তি কমিটির মধ্যে ঘোড়াছাড়া স্কুলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বাগবাটি, হরিণোপাল এবং অলোকদিয়ার পাঁচ শতাধিক লোককে হত্যা করা হবে। ১৯৭১ সালের ২৭মে সকালে, একটি যৌথ অভিযানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, আল-বদর, রাজাকার এবং পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গ্রামগুলিকে ঘিরে ফেলে। আল-বদররা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ২০০ লোককে হত্যা করেছিল। এছাড়াও তারা হিন্দুদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং লুটপাট করেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মহিলাদের ধর্ষণ করেছে।

বকচর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৩ মে পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার বকচর গ্রামে। বকচর গ্রামে আক্রমণের পরিকল্পনা মূলত শান্তি কমিটির একটি বৈঠকে গৃহীত হয়েছিল। ঐ গ্রামের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী কর্তৃক হিন্দুদের হত্যা করা হয় এবং তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মেয়েদের ও মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছিল।

ডাকরা হত্যাকাণ্ড গণহত্যা ১৯৭১ সালের ২১শে মে খুলনা জেলার বাগেরহাট উপ-বিভাগে শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের দ্বারা ডাকার গ্রামে নিরস্ত্র হিন্দু উদ্বাস্তুদের গণহত্যা করা হয়। বাগেরহাট উপ-বিভাগীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান রাজাব আলী ফকিরের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। গণহত্যাতে ২০০০ এরও বেশি হিন্দু পুরুষ, নারী ও শিশু নিহত হয়। ২১ মে বিকালে রাজব আলী ফকিরের নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জন রাজাকারের একটি দল দুই নৌকায় ডাকারে পৌঁছে। রাজাকারেরা নৌকা থেকে নেমে কালী মন্দিরের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিন্দুদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। যার ফলে অসংখ্য মানুষ মারা যায় ও আহত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাকিস্তান বাহিনীর দালাল রাজাকার বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ খুলনার কালিকাপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীধনঞ্জয় দাসের বৃদ্ধা দিদিমা কুমুদিনী দেবী ও মা সুভাষিনী দাস অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর পূর্ব বাংলার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা শুরু হলে খুলনার আতঙ্কিত নর-নারী ও শিশুরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লাভের আশায় কালিকাপুর গ্রামটিকে তাদের সামরিক আশ্রয়স্থল রূপে নির্বাচন করে। এই গ্রামের সহায়তায় তারা দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। এই সংবাদ রাজাকার বাহিনীর কাছে পৌছলে তারা জুলাই মাসে কালিকাপুর গ্রামে হানাদার এবং গ্রামের সাহায্যকারী যুবক নিমাই দাস কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর কালিকাপুর গ্রামের প্রায় সমস্ত অধিবাসী প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। ধনঞ্জয় দাসের মা সুভাষিনী দাস তাঁর ৯০ বছরের বৃদ্ধা মা, কুমুদিনী দেবীকে একা ফেলে পালিয়ে না এসে সে সেই প্রায় জনশূন্য পরিত্যক্ত গ্রামে বাস করতে থাকেন। এই অবস্থায় ৭ই অক্টোবর কুমুদিনী দেবী বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করেন। বর্বর রাজাকার বাহিনী তাঁর মৃতদেহ সৎকার করারও অনুমতি দেয়নি। এরপর শোকে দুঃখে ও মানসিক নির্যাতনে ধনঞ্জয় দাসের মা শোভাষিনী দাস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং গত ৯ ডিসেম্বর ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[২০]

বাংলাদেশকে বুদ্ধিজীবী শূন্য করার পরিকল্পনা করেছিল আল-বদর বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়জুড়ে পাকবাহিনী ও রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস দেশের জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের তুলে নিয়ে হত্যা করে।[২১] তবে বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপকতা ছিল যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে।[২২] বুদ্ধিজীবী হত্যা ছিল একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল দেশীয় আল-বদর বাহিনী। পাকিস্তানি বাহিনী যখন বুঝতে পারে যে বাংলাদেশের মাটিতে তাদের যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তখন নবপ্রতিষ্ঠিতব্য বাংলাদেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল এবং পঙ্গু করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে নিরপরাধ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করে। আল-বদর বাহিনীর মাধ্যমে ১৪ ডিসেম্বর দিনে ও রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে মিরপুর ও রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করে।[২৩] আল-বদর আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে প্রায় একশত বুদ্ধিজীবীকে ১৪ই ডিসেম্বর হত্যা করা হয়।[২৪] এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বধ্যভূমি ও গন কবর আবিষ্কার করা হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ও দেশীয় রাজাকার, আল-বদলরা নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে আসতো বধ্যভূমিতে। সকলকে চোখ বাধা অবস্থায় সারি দিয়ে দাঁড় করানো হত, তারপর তাদের গুলি করে হত্যা করা হতো।[২৫] শুধুমাত্র খুলনা শহরেই প্রায় এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল রাজাকার, আল-বদর ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।[২৬]

ঢাকার বুড়িগঙ্গার জলে দাঁড় করিয়ে ২০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। ঢাকার কাছে হরিহরপাড়া গ্রামটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক বদ্ধ শিবিরে পরিণত করেছিল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই গ্রামের প্রায় কুড়ি হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, 'প্রতি সন্ধ্যায় পাকিস্তানি ঘাতকরা বুড়িগঙ্গার তীরে দলে দলে টেনে এনে তাদের হাটু সমান জলে ভেঙে যেতে বাধ্য করত। তারপর পাক বাহিনীর নরপিশাচরা তাদের গুলি করে হত্যা করত এবং এই সময় বাঙালি নর-নারী ও শিশুদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠত। অতি সকালে গ্রামের মাঝিদের তাদের নৌকা নিয়ে যেতে বলা হত। এই মাঝিরা মৃতদেহ গুলি মাছ দরিয়ায় ফেলে দিয়ে আসতে বাধ্য হত।[২৭]

১৯৭১ সালের গণহত্যা সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দেশীয় রাজাকার আলবোদেররা সৃষ্টি করেছিল বধ্যভূমি। এই বদ্ধভূমিতেই নিরীহ মানুষদের ধরে এনে নিশংসভাবে হত্যা করা হত। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কয়েক হাজার বদ্ধভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লার ময়নামতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টের বারোটি গণকবর পাওয়া গিয়েছিল যেখানে ৭ হাজার মানুষের নর কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছিল।[২৮] ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিদিন নর্দমা ও জলাভূমি থেকে অসংখ্য মাথার খুলি, কঙ্কাল, হাড় ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যাচ্ছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজাকার বিরোধী আন্দোলন : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামশ ও শান্তি কমিটির সদস্যরা আত্মগোপন করে এবং অনেকে ভারতে পালিয়ে আসে।[২৯] রাজাকারদের তৎপরতা ও অত্যাচারের মাত্রা এতই ব্যাপক ছিল যে এখন দেশ ও সমাজবিরোধী যেকোনো তৎপরতাকে 'রাজাকারি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। হুমায়ূন আহমেদের একটি নাটকের সংলাপ 'তুই রাজাকার'ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বহুব্রীহি নাটকে এক টিয়ের ঠোঁটে 'তুই রাজাকার' শব্দগুচ্ছ বলিয়েছিলেন ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল। কেউ তাদের দিকে আঙুল তুলে যখন ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে পারতেন না, সেই স্বৈরাচার আমলে হুমায়ূন আহমেদ নাটকে তুলে আনেন এক পাখি চরিত্র যাকে বলতে শেখানো হয় - 'তুই রাজাকার'।[৩০] জাহানারা ইমামের 'ঘাতক-দালাল নির্মূল' আন্দোলন শুরু হলে রাজাকার নামটি সামনে আসে। স্বদেশের জন্মশত্রু, স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে তিনি গড়ে তুললেন দুর্বার আন্দোলন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তিনি এগিয়ে এলেন। একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৮১ সালে জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আজম পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। এরপর তার নানা ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। শেষপর্যন্ত খোলস ছাড়িয়ে ১৯৯১ সালে গোলাম আজমকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচন করা হয়। তার আগেই জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বি.এন.পি সরকার গঠন করে। গোলাম আজমের রাজনীতিতে ফিরে আসার প্রতিবাদ জানাতেই গড়ে উঠেছিল একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। তখনই দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৯২ সালের ১৯শে জানুয়ারি জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতি শুরুর দিকে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল। ১৯৯৪ সালে এক প্রতিকী বিচারের মাধ্যমে গোলাম আজমের ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। যেটিকে তারা 'গণ আদালত' বলে বর্ণনা করেন।

রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটির সদস্যরা মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লাখ মানুষকে পাকিস্তানবাহিনী, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটি হত্যা করেছে, প্রায় দুই লাখ মা-বোনদের ধর্ষন করেছে, বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। নিরপরাধ মানুষের ওপর এমন অত্যাচার পৃথিবীতে বিরল। নতুন প্রজন্মের কাছে ঘাতক রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটির বর্বরোচিত গনহত্যার তুলে ধরা খুবই জরুরি।

Reference:

১. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন - ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৮১

২. Nayanika Mookherjee, The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh War of 1971, London: Duke University Press, 2015, 35

৩. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন - ২য় খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), ৯২

৪. আজিজুল পারভেজ, 'রাজাকার ছিল অর্ধলক্ষাধিক', কালের কণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ https://www.kalerkantho.com/online/first-page/2019/12/15/851128

৫. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৫

৬. আকবর হোসেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে গঠন করা হয়েছিল রাজাকার বাহিনী, বি.বি.সি বাংলা, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯। https://www.bbc.com/bengali/news-50818613

৭. আজাদুর রহমান চন্দন, একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা, (ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯), ৬৫

৮. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১০

৯. আজাদুর রহমান চন্দন, একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা, (ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯), ৩৮

১০. Jahanara Imam, Of Blood and Fire: The Untold Story of Bangladesh's War of Independence, (University Press Limited, 1998), 85
১১. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ২য় খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), ৯২
১২. দৈনিক বসুমতি, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১ এবং ৫
১৩. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৬
১৪. উদিসা ইসলাম, "জামায়াতের কাছে মানবতাবিরোধী অপরাধ এখনও কথিত" বাংলা ট্রিবিউন, ৭ জানুয়ারি ২০১৬
১৫. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১১
১৬. দৈনিক বসুমতি, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৭. দৈনিক বসুমতি, ২১ জানুয়ারি, ১৯৭২, পৃ. ৫
১৮. Sarmila Bose, Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh War, (New York: Oxford University Press, 2011), 115
১৯. Sarmila Bose, Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh War, (New York: Oxford University Press, 2011), 118
২০. দৈনিক বসুমতি, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭২, পৃ. ৫
২১. Kalyan Chaudhuri, Genocide in Bangladesh, (New Delhi: Orient Longman, 1972), 25
২২. National Herald, 20 December 1971, p. 7
২৩. সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়েরী, (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ১৯৮৯), ১২৮
২৪. National Herald, 24 December 1971, p. 1
২৫. দৈনিক বসুমতি, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৬. দৈনিক বসুমতি, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৭. দৈনিক বসুমতি, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৮. দৈনিক বসুমতি, ১৮ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৭
২৯. দৈনিক বসুমতি, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
৩০. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৯